	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বৃহস্পতিবার, ১৭ই আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | Price : 30 Paise
৭৫ বর্ষ : ১ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | Thursday, 2nd July, 1970

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট

পশ্চিম বাংলার আড়াই লক্ষ সরকারী কর্মচারী পুলিশী নিপীড়নের বিরুদ্ধে এবং জরুরী দাবিসমূহ মীমাংসার দাবিতে গত ২৫শে জুন যে ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মঘট পালনের আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি সার্কুলার জারি করা হয়েছিল ১৯শে জুন। ২০০৯ (২০০) এফ নং সার্কুলারে স্পষ্টভাবে ধর্মঘটেচ্ছু কর্মীদের আচরণবিধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁদের সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। তবু আচরণবিধি লঙ্ঘনের সাবধানবাণীতে কোন কর্মচারী কর্ণপাত করেন নি, এও এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

ধর্মঘট পালনের পর রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে কেন্দ্রীয় সমাবেশের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল গত ২৬শে জুন, সেখানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আরও কঠোর সংগ্রামের জন্য যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি একটি প্রস্তাবে মোটামুটিভাবে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে—(১) অপপ্রচার ও দমন-পীড়নের পথ পরিহার করতে, (২) বহরমপুরে সি আর পি-র অত্যাচারের জন্য দায়ী জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের শাস্তিদানসহ রাজ্যব্যাপী পুলিশী জুলুম বন্ধ করতে, (৩) ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীসহ সমস্ত ধৃত কর্মীকে মুক্তি দিতে, (৪) সি আর পি প্রত্যাহার করতে, (৫) ভিত্তিহীন অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা বাতিল করতে এবং (৬) পে কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করা সহ কর্মচারীদের জরুরী অর্থনৈতিক ও অধিকারগত জরুরী দাবিগুলি পূরণে আর কালবিলম্ব না করতে।

অবশ্য এই সব ঘটনার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচিব গত ২২শে জুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি ও ইউনিয়নের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে যে পত্র দিয়েছিলেন এবং তার উত্তরে যা বলা হয়েছিল, তাও বাগ্‌বিতণ্ডাস্বরূপ। দুটি চিঠিই সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত তেমন বহন করে না। স্বভাবতই উভয় পক্ষের কঠোর মনোভাব রাজ্য সরকারের কাজেকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি করবে, একথা বলাই বাহুল্য।

মুখ্য সচিবের চিঠির জবাবে এক জায়গায় যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুখ্য সচিবের বক্তব্য এই ছিল যে, কো-অর্ডিনেশন কমিটির কতকগুলি প্রশ্ন অস্পষ্ট। কিন্তু কো-অর্ডিনেশন কমিটি তাঁদের লিখিত উত্তরে জানিয়েছেন যে, ঐ সব প্রশ্ন নিয়ে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার লিখিতভাবে জানানো হয়েছে এবং গত ১৭ই এপ্রিল ঐ সব প্রশ্ন নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে কমিটি দীর্ঘ আলোচনাও করেছেন। ঐ সব প্রশ্নের মধ্যে বিশেষভাবে ছিল, (ক) আচরণবিধি বাতিল করার কথা ও (খ) পে কমিশনের রায় কার্যকর করার দাবি।

ঐ দুই ব্যাপারে মুখ্যসচিব নাকি অনাবশ্যকভাবে প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারকে টেনে এনেছেন বর্তমানে ঐ প্রশ্ন তুলে রাখার জন্য, এই হচ্ছে কো-অর্ডিনেশন কমিটির অভিযোগ। কমিটির অন্য বিশেষ দাবি [illegible] রিপোর্ট রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরামর্শ মতো কিছুটা সংশোধনসহ গ্রহণ করতে হবে এবং পে-কমিশনের রায় কার্যকর করা সাপেক্ষে সমস্ত কর্মচারীর চল্লিশ টাকা এ্যাড হক অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া আচরণবিধি বাতিল করার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো রয়েছেই—যদিও আচরণবিধি ভঙ্গ করে কর্মচারীরা ধর্মঘটে যোগদান করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

রাজ্য সরকার ও রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এই ধরনের সম্পর্ক মোটেই সুখকর নয়। ধর্মঘটের পর ধর্মঘটী কর্মচারীরা ছুটির আবেদন না করলে তাঁদের আগামী মাসের মাইনে থেকে একদিনের মাইনে কাটা যাবে, আপাতত এটুকু সংবাদই জানা গেছে। একেই তো মা মনসা, তার ওপর ধুনোর গন্ধ—অর্থাৎ নির্ঘাৎ মাইনে কাটা গেলে কর্মচারীরা আন্দোলনের পথে আরো একধাপ এগোবেন, এটা সহজেই অনুমেয়। আর রাজ্য সরকার কি সেই ফাঁদে পা দিতে প্রস্তুত? সরকারী কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে এখনো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার পথ খোলা আছে। আমরা মনে করি, রাজ্য সরকার সে-পথে পা দিলেই বুদ্ধিমানের কাজ করবেন। সরকারের পক্ষে কতটুকু দেওয়া সম্ভব—আশা করি, তাও কর্মচারীরা বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে কেবল একজন বিপ্লবী নেতা বললে তাঁর বর্ণনা সম্পূর্ণ হয় না। মহারাজ যেন একটা লিজেণ্ডারি ফিগার, রূপকথার নায়ক। যাঁর জীবনের ত্রিশ বছরের ওপর কেটে গিয়েছে জেলের ভেতর, বাইরে তাঁর কাজ করার সময় থাকে কতটুকু? এত স্বার্থত্যাগ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করার পরেও মহারাজ দেহে সতেজ, মনে সবুজ।

মহারাজ দীর্ঘ বারো বছর বাদে ভারতের মাটিতে পা রাখলেন। না, তিনি আর পাঁচজনের মতো পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে আসেন নি, মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে এসেছেন। দেখতে এসেছেন তাঁর পুরনো কর্মস্থলের কী পরিবর্তন হয়েছে। সেই সঙ্গে ভগ্নস্বাস্থ্য মহারাজের কিছু চিকিৎসা। পুরনো বন্ধুদের বেশির ভাগই গত হয়েছেন। তাঁর বয়সও তো কম হয় নি, ৮৩ বছরের বৃদ্ধ তিনি।

১৮৮৭ সালের ৫ মে (কার্ল মার্ক্সেরও জন্মদিন) ময়মনসিংহ জেলার কাপাসটিয়া গ্রামে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর জন্ম হয়। রাজনীতিতে যখন তাঁর হাতেখড়ি হয় তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। ১৯০৬ সালে তিনি অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ব-বঙ্গে অনুশীলন সমিতিই ছিল সবচেয়ে বিপ্লবী, জঙ্গী রাজনৈতিক সংস্থা। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধেই ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী কিশোর বয়সেই ইংরেজ শাসকের বিষনজরে পড়েন ও ধৃত হন।

১৯০৮ সালে যখন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন পুলিশ তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। সেই হলো তাঁর কারাবাসের সূচনা। ছমাস জেল হলো, কিন্তু পাঠ্যজীবনের তাঁর সেখানেই ইতি ঘটলো। তার বদলে সুরু হলো একটার পর একটা দণ্ডাদেশ।

বটে, কিন্তু স্বগ্রামে থাকা নিরাপদ বোধ করলেন না। পলাতক অবস্থায় তিনি শিক্ষকতা করলেন। তিন বছর পরে ঢাকার এক খুনের মামলায় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে অনুসন্ধানে যখন জানা গেল যে, তিনি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম পলাতক আসামী, তখন পুলিশের আনন্দ দেখে কে! ঢাকার সেই মামলা পরিচালনা করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর পরিচয় ঘটে। সে মামলা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বছর দুই কারাগারের বাইরে

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী

ছিলেন। কিন্তু ১৯১৪ সালে আবার ধরা পড়েন। তারপর তাঁকে পাঠানো হলো সুদূর আন্দামানে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক কর্মীদের দেশে রাখা নিরাপদ মনে করতে না পেরেই বন্দীদের হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে দ্বীপান্তরে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে ১৯২১ সালে তাঁকে আলিপুর জেলে বদলি করা হয়। '২৪ সনে ময়মনসিংহ জেলে। এরপর মুক্তি পেলেন। কিন্তু ১০ বছর বাদে তিনি

তখন তাঁকে চিনতে না পেরে তাঁ নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মহারাজের জীবনের একটা বিস্তী অধ্যায়ই কারাকাহিনী। কথনো দ্বীপ ন্তরে, কথনো ব্রহ্মদেশের মান্দালে ভারতের বিভিন্ন কারাগারে, মাদ্রাজে হিজলী ক্যাম্পে। হাতে-পায়ে বেড়ি পরেছেনই, জেলে ঘানিও টানতে হয়েছি তাঁকে। সাধারণ কয়েদী, দ্বিতীয় বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী। কখনো স্টে প্রিজনার, কখনো ডেটিনিউ, নিরাপ বন্দী কখনো বা। অন্তরীণ যেমন তা থাকতে হয়েছে তেমনি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালাতেও হয়েছে। একব পুলিশের তাড়া খেয়ে একনাগাড়ে ৮ মাইল পথ তাঁকে হেঁটে যেতে হয়েছে পথে মাত্র তিন পয়সার ছোল খেয়ে খিদে মিটিয়েছিলেন। দে স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত ছ'বা তিনি ৩০ বছর কারাবাস করেছেন মুক্তি পেলেন ১৯৪৬ সালের ২৩শে দমদম সেণ্ট্রাল জেল থেকে। স্বাধীনতা পর তিনি স্বদেশ পাকিস্তানেই ফি গেলেন। কিন্তু সেখানে আবার তাঁ কারাভোগ করতে হয়।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ছদ্মনাম নিয়ে ছিলেন শশিকান্ত। কিন্তু ময়মনসিংহে মহারাজ শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী নামে তাঁর মহারাজ নামই হয়ে গিয়েছিল সারা জীবনটা যিনি স্বাধীন সংগ্রামে ঢেলে দিলেন, আজ তিনি রাষ্ট্রী অতিথির সম্মান পেলেন না। অ ইচ্ছে করলে তিনি এখানে মন্ত্রিপদ পেতে পারতেন। সীমান্ত গান্ধীকে সম্মান ও যে টাকার তোড়া দেওয়া হয়ে মাত্র কিছুদিন আগে, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ভাগ্যে তা জুটবে বলে মনে হয় না, কার

ভারতবিভাগে জওহরলাল নেহরুর উৎসাহ এবং পরবর্তী ভূমিকা সম্বন্ধে লীলা রায়ের রচনাংশ

[**শ্রীমতী** লীলা রায় ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে যথার্থ বামপন্থী রাজনীতি করতেন। সুতরাং জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখের স্বার্থসন্ধ রাজনীতির তিনি বিরোধী ছিলেন। জওহরলাল তাঁর পাশ্চাত্ত্যদেশীয় জীবনীকারের কাছে স্বীকার করেছেন, ১৯৪৭ সালের মধ্যে তাঁরা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, নতুন লড়াইয়ে নামবার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং তাঁরা একটা কিছু বোঝাপড়া করে স্বাধীনতাকে পেতে চেয়েছিলেন। সেই স্বাধীনতা অর্থাৎ ক্ষমতা-লোলুপতা তখন কংগ্রেস-নেতৃত্বকে আচ্ছন্ন করেছিল—তার বলি হয়েছিল লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান। বামপন্থী স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সমস্ত স্বপ্ন-কল্পনাকে চূর্ণ করে দেশ বিভক্ত হয়। সেই কালে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে লীলা রায় নেহরুর সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। উত্তরে নেহরুর কঠোর নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত মুখের চেহারা দেখা গিয়েছিল— লীলা রায়ের একটি প্রবন্ধে (জয়শ্রীর আশ্বিন, ১৩৬০ সংখ্যার 'বাঁচার পথ সংগ্রামের পথ' প্রবন্ধ) তারই ছবি ফুটেছে। প্রবন্ধটির অংশবিশেষ আমরা উপস্থিত করছি। তার মধ্যে লীলা রায়ের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা থেকে নেহরুর মনোভাব ও ভূমিকার একটা তৎকালীন চেহারা পাই, তাই লেখাটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই সঙ্গে পাই বৃদ্ধ গান্ধীজীর মর্মাহত চেহারাও। গান্ধীজী তখন নিতান্ত অসহায়। দেশবিভাগ তাঁর মনঃপূত নয়—কিন্তু সংগ্রামের ক্ষমতাও নিঃশেষিত। যাঁদের নিয়ে প্রধানত লড়াই চালিয়েছেন—সেই বামপন্থীদের তিনি দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন; উল্টোদিকে দক্ষিণপন্থী ভক্তগণ দোহি দোহি শব্দে ভারতগগন পূর্ণ করে ফেলেছে। গান্ধীজী দেখছেন, তাঁর ভ্রান্ত নীতি এবং অপাত্রে ন্যস্ত বিশ্বাস যে-ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করেছে—তা মারছে সমস্ত নীতি ও আদর্শকে। গান্ধীজীর সেই অসহায় উদ্‌ভ্রান্ত ও ক্লান্ত মূর্তির রূপ দেখি লীলা রায়ের এই রচনায়।

ঠিক বর্তমান মুহূর্তে যখন আবার দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে, আসছে হতাশা ও অনাহারের মুখে—তখন লীলা রায়ের এই ১৭ বছর আগেকার লেখাটি আবার দেখায় [illegible]—ইতিহাস একই স্রোতে বয়ে চলেছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনো শেষ হয় নি। লীলা রায়ের রচনাটি এই প্রশ্ন বড় করে তুলবে—সাম্প্রদায়িক কে বেশি—মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার প্রধান সংগঠক মহম্মদ আলী জিন্না, না সেই সাম্প্রদায়িকতার কাছে সানন্দে আত্মসমর্পণকারী জওহরলাল, প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ইতিহাসের সম্পূর্ণ উত্তর এখনো শোনা যায় নি—গুঞ্জন মাত্র শুরু হয়েছে।

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু]

১৯৪৭ এপ্রিলের শেষ। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী ভারতবিভাগ, পাঞ্জাব ও বঙ্গবিভাগের আলোচনায় মুখর। অতি দ্রুত ভারত এক অন্ধকার অজানা গহ্বরের দিকে ছুটে চলেছে। জনতা জানে না প্রায় কিছুই, বোঝে না একেবারেই, সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছে নেতৃবৃন্দের উপর—ভরসা করে আছে, যা তাঁরা করবেন দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্যই করবেন। রাজনৈতিক কর্মী যাঁরা, যদিও অবস্থাটা তাঁরা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু পর্দার আড়ালে অতি সংগোপনে যে-কলকাঠি নড়ছে, সে সম্পর্কীয় অধিকাংশ তথ্যই তাঁদের নাগালের বাইরে ছিল, ফলে তাঁদের পক্ষে সম্মিলিত অথবা বিচ্ছিন্নভাবেও দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অবস্থা ও তার ফলাফল জানাবার উপায় ছিল না। আর জানালেই বা হোতো কি? অর্ধশতাব্দীর

উপরে যে-প্রতিষ্ঠানকে হৃদয়ের রক্ত দিয়ে জাত তিলে তিলে গড়েছিল, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতিরূপে অতি গোপনে তার যে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে, দেশ তা বিশ্বাস করবে কেন? দক্ষ শিল্পীর জীবনসাধনার বস্তু যে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে (Frankenstein) পরিণত হয়েছে, তা অনুমান করা অসম্ভব ছিল, বিশ্বাস করা সেদিন কঠিন।

১৯৪৭-এর এপ্রিল অথবা মে'র প্রথম। আমরা জন চার-পাঁচ, একজন ব্যতীত, সকলেই কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর সভ্য, গভীর উদ্বেগ নিয়ে পণ্ডিতজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, ভারতবিভাগ ও প্রদেশবিভাগের যে-কথা শোনা যাচ্ছে, তা যথার্থ কিনা? (নেহরু) স্বভাবসিদ্ধ রাগতভাবে বললেন, "Yes, everything is settled." বাংলা দেশের প্রতিনিধি আমরা, বিশেষভাবে বাংলার নজীর দেখিয়ে বলেছিলাম, বাংলাতে যেখানে ৪৫ পার্সেণ্ট হিন্দু ৫৫ পার্সেণ্টের সঙ্গে থাকতে পারলো না মুসলিম লীগের দৌরাত্ম্যে, সেখানে ২৫ পার্সেণ্ট ৭৫ পার্সেণ্টের সঙ্গে কিভাবে থাকবে? উত্তর হোলো—"Most likely the Moslem League will be satisfied when they have got what they had wanted." আশ্চর্য রাজনীতিজ্ঞান! প্রশ্ন করলাম, যদি তা না হয়, যার আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে রয়েছে, তাঁরা তখন কি করবেন? লোক বিনিময়ের কথাই কি ভাবছেন? উত্তর হোলো, "It is hundred percent nonsense." প্রশ্ন হোলো, তবে কিভাবে তাদের রক্ষা করবেন, দুটো সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র যখন হয়ে যাবে? কিভাবে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন? উত্তর হোলো, "There are hundred and one ways by which we can bring pressure upon the Moslem League Govt. In fact we shall be in a much better position to help the Hindus of East Bengal." খুব রাগতভাবে (নেহরু) পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন: "Whom do you represent? I am daily getting hundreds of telegrams from East Bengal supporting Partition." টেলিগ্রাম পাচ্ছেন ঠিকই। বার লাইব্রেরী ও চেম্বার অব কমার্সগুলি থেকে বিড়লার টাকায় হাজার হাজার টেলিগ্রাম পূর্ববাংলা থেকে পাঠান হয়েছে হিন্দুসভার প্রচেষ্টায়। বললাম, "আমরা প্রতিনিধি তাদের, যে-হাজার হাজার মূক যাদের কথা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের।" পূর্ববাংলার গ্রামে শহরে তখন বহু সভা-সমিতি আমরা করে চলেছি জনমতকে সংগঠিত করবার জন্য। ভারতবিভাগ, প্রদেশবিভাগের বিরুদ্ধে পাঁচ-দশ হাজার করে জনতা এসেছে সেসব সভায়—কিন্তু কোন কাগজে তখন তার এক লাইন বিবরণ প্রকাশ পায় নি। তখন অমৃতবাজার পত্রিকায় gallop poll হচ্ছে, সেই নিয়ে নেতারা মেতে আছেন। পণ্ডিত নেহরু রেগে প্রশ্ন করলেন, "What is the alternative? What do you suggest?" বললাম, "মাউণ্টব্যাটেন-প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করুন এবং আবার কংগ্রেস সংগ্রামের আহ্বান দিক জাতিকে।" বললেন: "It is impossible now, everything is settled. We are going to accept Partition. You start a movement under your own leadership." গভীর হতাশা নিয়ে ফিরে এলাম।
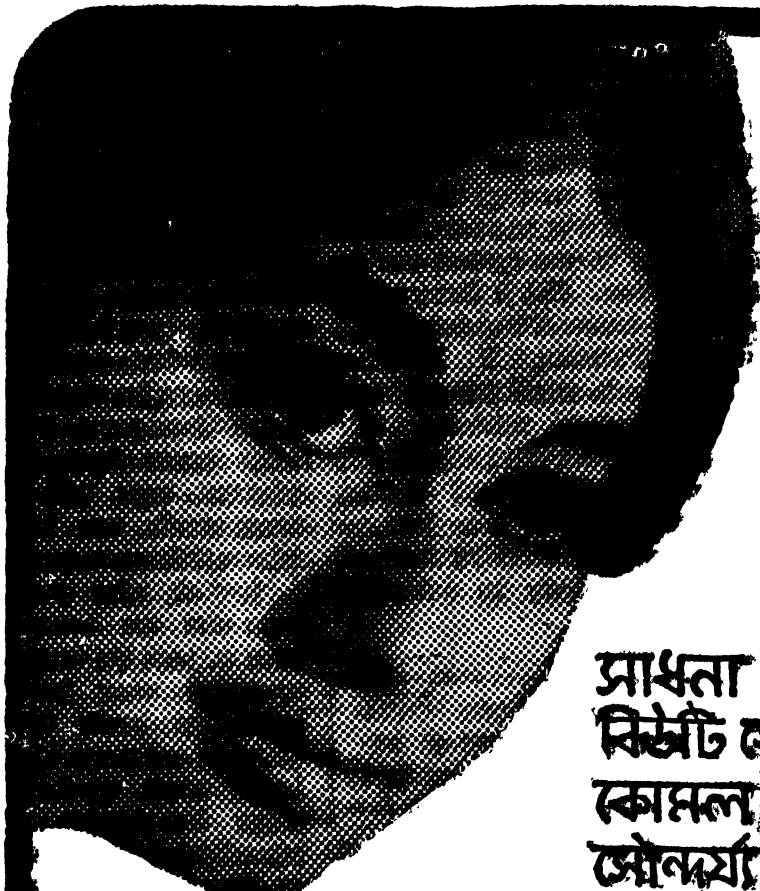
১৯৪৭-এর ১৪ই ও ১৫ই জুন দিল্লীতে এ-আই-সি-সি'র সভাতে ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ হবে—কত দিনের জন্য কে জানে! কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করেছে তখন মাউণ্টব্যাটেন-প্ল্যান। শেষ চেষ্টা হিসাবে গান্ধীজীর নিকট পাটনায় যাওয়া স্থির করে গান্ধীজীকে টেলিগ্রাম করলাম তারিখ দেবার জন্য। মে'র মাঝামাঝি, গান্ধীজী তখন বিহারে। টেলিগ্রামে উত্তর এলো, যে-কোনদিন গিয়ে দেখা করবার জন্য। মে মাসের ১৮ই, ১৯শে হবে, গেলাম পাটনায়, অনিলবাবু ও আমি। অন্য দর্শনপ্রার্থীদের বসিয়ে আমাদের সঙ্গে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা হোলো। গান্ধীজীকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম। প্রথমেই বললেন, "I am much more against Partition than you are—" বিশেষ করে বললেন বাংলার কথা, "Bengal will rue the day the partition takes place." সাগ্রহ দাবি জানালাম, আপনি কেন প্রতিবাদ করছেন না—আপনার মত কেন প্রকাশ করেন না? বললেন, "My lips are sealed. You go to Pandit Nehru, and Sardar Patel". বললাম, এত দ্রুত সব হয়ে যাচ্ছে, সময় কোথায় জনমতকে তৈরি করবার? গভীর বিষণ্ণতার সঙ্গে বললেন, "Who is going to give you time? তোমরা যদি দেশবিভাগ ও প্রদেশবিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে পার—আমি তার নেতৃত্ব নেবো।" চলে এলাম। সেদিন সংগঠিত করবার। দেশ ও প্রদেশবিভ তীব্র প্রতিবাদ এবং দৃঢ়ভাবে নিজেদে ব্যক্ত করা ছাড়া সেদিন আমরা নেতাজীর নেতৃত্বে চলছি, তারা আর করতে পারি নি। এর জন্য সংবা গুলিতে দেশদ্রোহী, মুসলিম লীগে ইত্যাদি বহু আখ্যা ছাড়াও আরো দু আমাদের ভাগ্যে জুটেছিল।

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট, স্বাধ দিবস। পণ্ডিত নেহরু বল "We think also of our brot and sisters who have been off from us by the polit boundaries and who unhap can not share at present in freedom that has come. T are of us and will remain o whatever may happen and shall be sharers in their g and ill fortune alike." আজ প নেহরু বলছেন, "তারা ভিন্ন রা অধিবাসী তাদের জন্য আমরা কি ক পারি? তাদের জন্য এইমাত্র করতে প ভারতে যদি তারা চলে আসতে বাধ্য তবে সাধ্যমত সাহায্য ও পুনর্বাসন ি পারি।" সে সাহায্য ও পুনর্বাসনের বিশ্লেষণ আজ করবো না, ি এই সাহায্য ও পুনর্বাসনের দা সামনে রেখেই কি সেদিন তিনি বলেছি "Whatever may happen shall be sharers in th good and ill fortune alik আজ পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করি পা স্তানে যে হিন্দুমেধ, নারীমেধ যজ্ঞ চ তার অপমান, দুঃখের সহিত সামিল ি বা তাঁর সরকার কিভাবে হচ্ছেন? নির আশ্রয় থেকে সু-উচ্চ উপদেশবাণী ব করে?

১৯৫০ সালের মর্মন্তুদ ঘটনা যখন সমস্ত বাংলার জনমতকে উদ্বে করে তুলেছিল পণ্ডিত নেহরুর মন্ত তখন মুহূর্তের জন্য মাথা তুলে "Ot methods"-এর হুমকি দিয়েছি কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষি যদি ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭-এর উক্তি ি করি, তবে প্রমাণ হয়, ঐ উক্তি ছিল ম কথা, অন্তরের ভাষা নয়, দৃঢ়স্থির সংকল্প ত' নয়ই। ১৯৫০-এর ৭ই তারিখে পণ্ডিত নেহরুর নিকট 'পূর্ব সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতির' থেকে ডেপুটেশনে আমরা যারা গিয়েছি ও অবিলম্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার দাবি জা ছিলাম, তাদের তিনি সেদিন অন্যান্য ক মধ্যে একথাও বলেছিলেন যে, বাংলার স

তাঁর সরকারের রয়েছে, যারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সর্বভারতের স্বার্থ পূরণ করবার দায়িত্বও তার সরকারের। এবং সর্বভারতের মতামত ব্যতীত তিনি শতকরা ২৫ ভাগ জনতাকে রক্ষা করবার জন্য ৭৫ ভাগ জনতার স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারেন না। এ-ধরনের যুক্তি যে অভিনব, তা স্বীকার করতেই হয়। রাষ্ট্রের পরিচালক যাঁরা তাঁরা সামগ্রিকভাবে জাতির সকল অংশের জন্য দায়ী, তার ভেতরে কোনো পার্সেন্টের অঙ্ক আনাটা যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি অ-রাজনৈতিক। আজ যদি ভারতের কোনো অংশ আক্রান্ত হয় বহিঃশত্রুর দ্বারা, তাহলে কি এই একই যুক্তি প্রয়োগ করে বলা যায় না যে, ঐ অংশকে শত্রুর হাতে পরিত্যাগ করাই সমীচীন, সেখানকার অধিবাসীসহ—কারণ সমগ্র ভারতের জনসংখ্যা ঐ আক্রান্ত অংশের তুলনায় সামান্য এবং ঐ স্বল্প-সংখ্যক জনতার স্বার্থরক্ষার জন্য সর্ব-ভারতের কোটি কোটি জনতার স্বার্থহানি করা যায় না! জাতির মান, মর্যাদা এবং স্বার্থকে এ-ভাবে বিচ্ছিন্ন করা জগতের কোনো স্থানের রাজনীতি অথবা কূট-নীতিতে দেখা যায় না। বিশেষত যাঁদের মুখে নীতির বাক্য অহরহই লেগে আছে, তাঁদের সময়মত অঙ্কের হিসেবে নীতি-প্রয়োগের কথাও বিস্ময়কর! অঙ্কের বিচারে ভারতের পক্ষে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হবার যৌক্তিকতা কোথায়? মহাত্মাজীর নীতি এ'রা স্থানে-অস্থানে, দেশে-বিদেশে প্রচার করে থাকেন—তিনি কি বলেছিলেন দেখা যাক। ৩রা জুন, ১৯৪৭ সনে পণ্ডিত নেহেরু যখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে জানান যে, কংগ্রেস দেশবিভাগে রাজী হয়েছে, সে-সম্পর্কে মহাত্মাজী নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন, "To yield even an inch to force of circumstances was wholly wrong. The Working Committee holds that they had to yield to force of circumstances."

হরিজন পত্রিকার ২৭-৭-৪৫-এর সংখ্যায় কোন বন্ধুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বলেছিলেন, "The leaders had agreed to paritition as the last resort. They did not feel they had made a mistake. Rather than let the whole country go to the dogs, they agreed to the partition, hoping to give the country a much needed rest. He felt differently. He had said that he would rather let the whole country be reduced to ashes than yield an inch to violence." মহাত্মাজীর সুস্পষ্ট অভিমত এখানে পাওয়া যাচ্ছে। যাঁরা উচ্চ আদর্শ, মহৎ নীতি এবং অহিংস উপায় প্রয়োগের কথা বলে থাকেন, তাঁদের অহিংস নীতি হচ্ছে, হিংসার নিকট নিরপরাধ সম্বলহীন নর-নারী, শিশুকে উৎসর্গ করা। বলা বাহুল্য সে অহিংসার সঙ্গে মহাত্মাজীর অহিংস নীতির তফাৎ উপরে উদ্ধৃত উক্তি থেকেই সুস্পষ্ট হবে। আরো সুস্পষ্টতর করা যদি প্রয়োজন থাকে তবে নিচে উদ্ধৃত পংক্তিটিতে সে অভাব দূর হবে।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ সনে মহাত্মাজী বলছেন, "I was against war in any form. But if there be no other means of securing justice from Pakistan, if Pakistan refuses to admit her misdeeds and wants to minimise their gravity, then the Indian Union will have to fight against Pakistan. War is no joke, no one wants war. But I shall not advise anybody to submit to wrong."

আগামী সংখ্যা থেকে শঙ্করী-প্রসাদ বসুর 'সুভাষচন্দ্র ও সম-কালীন ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবে।

পণ্ডিত নেহরু আজ যা করছেন তা Out-Heroding-Herod. লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের যে মৃত্যুযজ্ঞ চলেছে—তাতে তাঁর শান্তির ব্যাঘাত হয় নি বিন্দুমাত্র। ১৬ই অক্টোবর কলকাতায় কংগ্রেস-কমিউনিস্ট বাদে সর্বদলীয় যে দাবি উত্থাপিত হয়েছিল, বিপুল সংখ্যক লোকের জনসভায়—তার উত্তরে তিনি সেই মামুলী কথাই বলেছেন—কোনো কঠোর নীতি আমরা নিতে পারি না—ভারতবর্ষ শক্তি-শালী—দুর্বলের নীতি হচ্ছে যুদ্ধ ও সংগ্রাম। কিন্তু সবলের নীতি সংগ্রাম ও সংঘর্ষের পরিবর্তে "healing touch" দেওয়া। কাজেই তাঁর দাওয়াই হচ্ছে, সু-উচ্চ স্তর থেকে শান্তির বাণী প্রচার করা। ১৯৫০ সালের হত্যাকাণ্ডের পরও ৮ই এপ্রিলের দিল্লী চুক্তি মারফৎ পাকিস্তানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে যখন তাঁর বাধলো না, তখনই অহিংস ও শান্তির সু-উচ্চ আদর্শের স্বরূপ সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে।

সকলেরই মনে থাকবার কথা, সেই দিল্লী চুক্তিতে পাকিস্তানের কূটনৈতিক চালের নিকট ভারতের ক্লীব নেতৃত্ব আর একবার পরাজিত হলো। কেন পরাজয়? চুক্তির প্রধান শর্তগুলোর উপর একবার চোখ বুলানো যাক। প্রথমত, যে পাকিস্তান ১৯৫০-এ হিন্দু মেরে পৈশাচিকতার একটি রেকর্ড রেখেছে বিশ্বসভ্যতার পাতায়, তাদের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্র সমকক্ষ-রূপে একটি চুক্তি করলেন—অপরাধী রাষ্ট্র অপরাধ স্বীকার করলো না, কোনোরূপ শাস্তি গ্রহণ করলো না, কিন্তু চুক্তি হোলো ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তানকে সমপর্যায়ে ফেলে।...এই চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরেই মিঃ লিয়াকৎ আলি আমেরিকা সফরে যান এবং সেখানে পাকিস্তান ও ভারতে যুদ্ধনিবারণের কৃতিত্বের জন্য বিচক্ষণ ও উদার রাজনীতিবিদ বলে সর্বত্র সম্বর্ধিত হন। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী হাজার হাজার স্ত্রী, পুরুষ, শিশুর রক্তাক্ত লাঞ্ছনা ও অপমানকে নির্মম ও লজ্জাকরভাবে এক কাগজী মিথ্যা চুক্তির আড়ালে চাপা দিয়ে, প্রেম ও শান্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। ভারতের মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের সেদিন চরম লাঞ্ছনা ঘটে। লক্ষ লক্ষ অসহায় নরনারীর ভাগ্য নিয়ে এভাবে সেদিন কূটনৈতিক খেলা হোলো।

কিন্তু এই চুক্তির পেছনে কোন্ অদৃশ্য শক্তির হাত খেলছে তা অজানা রইলো না, প্রকাশ হয়ে পড়লো। ভারতে যুদ্ধপ্রস্তুতির সংবাদে লিয়াকৎ আলি বিচলিত হয়ে করাচীর মার্কিন দূতের স্মরণস্থ হন এবং শেষোক্ত ব্যক্তিটি আবার দিল্লীস্থ মার্কিন দূত-মারফৎ পণ্ডিত নেহরুর উপর চাপ দেন। সময় বুঝে লেডি মাউন্টব্যাটেনও এসে পড়েন। নেপথ্যের কলকাঠি কাজ করতে থাকে—আর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের উপর প্রেম ও মৈত্রীর বান ডেকে যায়। ভারত পাকিস্তানে যুদ্ধ বাধলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ-ব্যবস্থার ফাটল ধরবে—রাশিয়ার সুবিধা হয়ে যাবে, অতএব যে-কোনো উপায়ে যেন কোনো শর্তে যুদ্ধ বন্ধ হওয়া চাই—কয়েক লক্ষ কালা আদমীর প্রাণের ও মানের মূল্যই বা কতটুকু! আর ইঙ্গ-আমেরিকার ক্রীড়নক হয়ে আমাদের দুর্বল ও পৌরুষ-হীন নেতৃত্ব লক্ষ লক্ষ অসহায় নর-নারীকে বলি দেবার কাজে সহযোগী হয়ে নির্লজ্জ দম্ভে সমস্ত বিশ্বকে অহিংসনীতির মাহাত্ম্য প্রদর্শন করতে ব্যস্ত হলেন। পুরনো বইয়ের পাতায় পড়ে রইলো মহাত্মাজীর কথা, "War is no joke, no one wants war. But I shall not advise anybody to submit to wrong." নিজেদের দুর্বল নীতিকে ঢাকবার প্রয়োজনে কতদূর যাওয়া সম্ভব তার প্রমাণ—ভারতকেও পাকিস্তানের সম-দোষী হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য উদ্যোগী হলেন পণ্ডিত নেহরু নিজে। পাকি-

স্তানের বর্বরতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে কলকাতা ও আশেপাশে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল তার নজীর দেখিয়ে পাকিস্তান ও ভারতকে একই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রায় দিলেন, এ অবস্থায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের 'moral right' নাকি ভারতের নেই !

যবনিকাপাত হোলো জাতীয় জীবনের সেই অঙ্কের উপরে। তরুণ যারা আদর্শ যাদের হাতছানি দেয় অত্যাচারকে অস্বীকার করতে, মনুষ্যত্বের দাবির প্রতিষ্ঠায় যারা সকল কালে আত্মাহুতি দেয় দ্বিধাহীন চিত্তে, জাতির সেই ভবিষ্যৎ বংশের নিকট এই উদাহরণই তুলে ধরা হোলো যে, আমাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছে যারা, তাদের মাথায় দুর্যোগের ঝড় ভেঙে পড়লেও আমাদের করণীয় কিছু নেই—কারণ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া নীতিবিরুদ্ধ, তাতে অহিংসা ও শান্তি বজায় থাকবে না ! !

১৯৫২-র ফেব্রুয়ারী। এলো পূর্ব বাংলায় ভাষা-আন্দোলন। মাতৃভাষা রক্ষার দায়কে বহন করলো মুসলমান তরুণ-তরুণী, আটজন তরুণ রক্ত দিয়ে ইতিহাসের নতুন পাতা লিখলো পূর্ব বাংলায়। মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে মুসলিম ও অ-মুসলিম বাঙালীর নতুন মিলনসূত্র গ্রথিত হলো—সর্বনাশ গণলো মুসলিম লীগের নেতারা, পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে যারা ভয় পায়—যাদের একমাত্র মূলধন ধর্মীয় জিগির তুলে মুসলিম ও অ-মুসলিম জনতার মধ্যে বিভেদ জাগিয়ে রাখা। এই আন্দোলনের পেছনে হিন্দুর এবং ভারতের উস্কানি ও ষড়যন্ত্র রয়েছে এই মিথ্যা প্রচার সুরু হোলো। সমুচিত উত্তর দিল পাকিস্তানের জনতা ও তরুণেরা। তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করলো এই যুক্তি। বিভ্রান্ত তাদের করা গেল না। পাকিস্তানের নেতারা নতুন পথ ধরলেন—উভয় বাংলার মধ্যে স্বাভাবিক যাতায়াতের যে নীতি, দিল্লী চুক্তির যা প্রধান শর্ত ছিল, সে নীতিকে অস্বীকার করে পাসপোর্ট প্রবর্তনের দাবি জানালেন। বলা বাহুল্য, নেহরু সরকার সে দাবি মেনে নিলেন। ফলে উভয় দিককার বহু আলাপ-আলোচনার পর, গত ১৫ই অক্টোবর ভারত সরকার পাসপোর্ট চালু করেন— শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আরো একমাস পেছিয়ে দিতে চেয়েছিল এই তারিখ, যাতে আরো বেশি হিন্দু বিতাড়ন সহজে সাধিত হয়। ভারত সরকার তাতে রাজী না হওয়াতে ১৪ই-১৫ই, ১২টা রাত্রি থেকে ভারত সরকার এবং দু'দিন পরে পাকিস্তান সরকার পাসপোর্ট চালু করেছেন। এবারকার

কংগ্রেসী হিসাবেই ছয় মাসে আড়াই লক্ষের উপর হিন্দু বিতাড়িত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে। এ সরকারী হিসাব। বেসরকারী হিসাবে এর অপেক্ষা বহু অধিক হিন্দু এসেছে এবারে। এভাবে এক এক ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ হিন্দু বিতাড়ন চলেছে। পাকিস্তানী নীতিই হচ্ছে পাকিস্তান হিন্দু-শূন্য করা। অথচ পণ্ডিত নেহরুকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাসপোর্ট প্রবর্তন করবার পেছনে পাকিস্তানের কি মতলব রয়েছে বলে তিনি অনুমান করেন—তিনি বললেন, পাকিস্তানে হিন্দুরা থাকুক এটা পাকিস্তান চায় এবং পাসপোর্ট চালু করে যাতে হিন্দুরা না চলে আসে সে ব্যবস্থাই নাকি পাকিস্তান করতে চেয়েছে! হিন্দুদের ভারত আগমনে বাধা দেবার অভিনব উপায় বটে! ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাষার উপর আক্রমণ করে বা অর্থনৈতিকভাবে তাদের মৃত্যুর ব্যবস্থা করেই শুধু নয়, প্রতিদিন হিন্দুদের নানাভাবে লাঞ্ছিত করে, তাদের জীবনকে অসহনীয় করে, নারীর সম্মানকে ক্রীড়ার বস্তু করে, পাকিস্তান সরকার হিন্দুদের পাকিস্তানে ধরে রাখবার ব্যবস্থা করছিলেন! চমৎকার যুক্তি বটে।...২০শে অক্টোবরের শিলং-এর সভায় তিনি বলছেন যে, পাসপোর্ট ও ভিসা প্রবর্তনের পরেও ভারত-পাকিস্তানের অধিবাসীরা স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে এবং এ-সম্পর্কে একটি চুক্তিও হয়েছে। হায় রে, আবার চুক্তি ও তার উপর আত্মসমর্পণ! শোনা যাচ্ছে আবার একটি goodwill mission পাঠান হবে পূর্ববঙ্গে। goodwill mission-এর দাওয়াই প্রাণ ফিরিয়ে দেবে লক্ষ লক্ষ ভিটেমাটি-ছাড়া হতভাগাদের—ঘরে ঘরে নারীর যে-মর্যাদা গেছে, তার প্রতিকার আনবে এই healing touch! আর হবে পূর্ববঙ্গে উভয়-বঙ্গের সংখ্যালঘু মন্ত্রিদ্বয়ের যুক্ত ভ্রমণ। অথচ পণ্ডিত নেহরুর নিজের বিশ্বাস নেই চুক্তির উপর। তিনিও বলছেন, "জানি না পাকিস্তান এ চুক্তি রাখবে কি না।" আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, এই চুক্তি ফলবতী হবে এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যে কোনো বিঘ্ন ঘটবে না—তা হলেই কি সমস্যার সমাধান হোলো? ব্যবসা-বাণিজ্য করে না যে-হাজার হাজার লোক—গ্রামে শহরে যে-সাধারণ মানুষ ছড়িয়ে আছে, তাদের নিরাপত্তা ও সম্মান, মর্যাদা—কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা না হয় ছেড়েই দিলাম—তাদের পক্ষেও কি এই অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার দ্বারা সমস্যার প্রতিকার হবে? গোড়ার কথা হচ্ছে, আমাদের বর্তমান সরকার যদি আর কিছু না বোঝেন ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার কথা অন্তত বোঝেন—বুঝতে

বাধ্য হন, কারণ এই ধনিক ও বণিক গোষ্ঠীই হচ্ছে বর্তমান ভারত সরকারের পর্দার আড়ালের শক্তি ও প্রধান সমর্থক—তাঁরাই কলকাঠি নাড়েন এবং রঙ্গমঞ্চে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখে সাধারণ মানুষ বিমূঢ়, বিভ্রান্ত হয়, কার্যকারণের যোগসূত্র খুঁজে পায় না। বণিকগোষ্ঠী একটিমাত্র বস্তুর মূল্য জানেন, সোনার মূল্য—মুনাফা—লাভ। সাধারণ মানুষের মান, প্রাণ, ধন যদি তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য বলি দিতে হয়, তবে তাই হবে—মুখ বুজে বলি হবার জন্যই তো সাধারণ মানুষ!...

আমরা একথা স্থির নিশ্চয় বুঝেছি যে—পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবান্বিত করবার ক্ষমতা কোনো ঘটনাবলীর নেই। অন্তত বাংলার বিপর্যয়—বাঙালীর সর্বনাশ তাঁর কোনো ভাবান্তর ঘটাবে না। একটি কারণ হয়তো, বাঙালী ব্যবসায়ী জাতি নয়—বরং ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীর অ-পটুত্ব এবং অক্ষমতা সকলের কৃপা ও উপহাসের বিষয়। কাজেই বর্তমান সরকারের নিকট থেকে কোনো সমাধান আশা করা যাবে না! যে হাজার হাজার দুর্ভাগা আটক পড়ে রইলো পূর্ব বাংলার প্রতি রেল ও স্টীমার স্টেশনে আর লক্ষ লক্ষ হিন্দু যে নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাবে পাকিস্তানের গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, সে-কথা ভুলে গিয়ে পাকিস্তান থেকে ট্রেন খালি আসছে, এই ঘটনাকেই সমস্যার সমাধান হিসেবে ধরে নিচ্ছেন ভারত সরকার। অতীতেও নিয়েছেন। আবার চুক্তি, আবার সংখ্যালঘু মন্ত্রীদের যুক্ত সফরের প্রহসন। ভুলে গেলেন বেমালুম, পাকিস্তানের জেলে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন সংখ্যালঘুদের নেতা শ্রীসতীন সেনের মত লোক—যিনি সমস্ত বিপদ অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানে পড়ে আছেন সংখ্যালঘুদের সেবার জন্য—মনে পড়লো না, আজো জেলে পচছেন সংখ্যালঘু কমিশনের সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন ধর। তবু পাকিস্তানের কথার ও চুক্তির উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। সেই প্রহসন করতে হবে—কারণ অন্য নীতি তাঁরা নেবেন না। যে ধনিক-বণিক গোষ্ঠীর এঁরা প্রতিনিধি, তাঁরা নিতে দেবেন না—নিতে দেবে না ইঙ্গ-আমেরিকান কর্তারা।.....
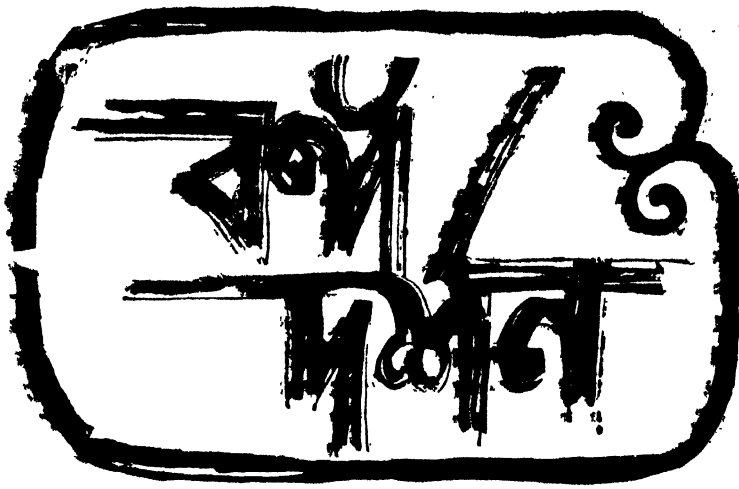
সম্প্রতি দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের পার্লামেন্টীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকের সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার রাজ্যের শ্রম ও শিল্প পরিস্থিতি সম্পর্কে যে উদ্বেগজনক রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে জানা যায় যে, রুগ্ন কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার ফলে রাজ্যের বেকার সমস্যা এমন হু হু করে বেড়ে গেছে যে, তা একটা চূড়ান্ত সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই বছরের ২০শে মে পর্যন্ত রাজ্যের ১৬৫টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং তার ফলে ২২,৪৮১ জন শ্রমিক-কর্মচারী নতুন করে বেকার হয়ে পড়েছেন। এইগুলি সেই সমস্ত কারখানার হিসাব যা পুনরায় খোলা সম্ভব বলে সরকার মনে করেন এবং সেই কারণেই তথ্যগুলি রাখা হয়েছে, যে সকল কারখানা স্থায়িভাবে বন্ধ আছে সেগুলির তথ্য রাখা হয় না। কারখানাগুলি বন্ধ হল কেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করে শ্রম দপ্তর জানিয়েছেন যে, ৩৪টি কারখানা বন্ধ হয়েছে অর্থসংকটে, ১১টি অর্ডারের অভাবে এবং ৭টি কাঁচামালের অভাবে। বন্ধ কারখানাগুলির মধ্যে ছোট এবং মাঝারি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাই সর্বাধিক। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কিছু কিছু শিল্প ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। নতুন শিল্পের আয়া স্থান পেয়েছে এবং বহু কল-কারখানার সম্প্রসারণের কার্যক্রমও বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি।

এতাবৎকাল আমাদের শোনানো হয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘট ও উগ্রপন্থার ফলেই নাকি পশ্চিমবঙ্গের সব কল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উপরের সরকারী তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে, কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়, অর্থসংকট, মন্দা এবং অন্যান্য কারণেও রুগ্ন কল-কারখানা দরজা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। কারখানাগুলির অর্থ-সংকটের ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক-গুলির এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব ছিল, তাঁরা তা যে পালন করেন নি তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। মন্দার ফলে কারখানাগুলি যে কেন বন্ধ রয়েছে তাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য, কেন না সরকারী অভিমত অনুযায়ী বর্তমানে দেশে মন্দাভাব কেটে গেছে, রপ্তানীও আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং পণ্যের রপ্তানী ক্রম-বর্ধমান, তা গত বছরের তুলনায় এ বছরে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং হাতে এখনো ৯০ কোটি টাকার অর্ডার মজুত আছে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের এই অগ্রগতির মুখে পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলি অর্ডারের অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে—এটা কি খুব রহস্যজনক ব্যাপার নয়? ভারতের ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে একদা পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল সকলের শীর্ষে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সংকট কাটছে না কেন, তা বোঝা দুষ্কর। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে কতটুকু উদ্যোগ নিয়েছেন সেটাও জানতে ইচ্ছা করে।

বস্তুত ভারতের যে কোন রাজ্যই, যেভাবেই হোক না কেন, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সকল প্রকার অগ্রগমনই রুদ্ধ। পাঞ্জাব বা তামিলনাড়ুতে বেকার সমস্যা প্রায় সমাধানের পথে, পশ্চিমবঙ্গে তা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। রাজ-নৈতিক অনিশ্চয়তা পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি বড় অভিশাপ, বামপন্থী দল-গুলি দেশকে সুষ্ঠু নেতৃত্ব দেবার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যেই গলা কাটাকাটি করছে, বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী দলগুলি দেশকে একটি জনপ্রিয় প্রগতিশীল মন্ত্রিসভা উপহার দিতে অপারগ। রাজ্যপালের প্রশাসনের নিয়মমাফিক কার্যকলাপ একেবারেই স্তব্ধ, দূরদৃষ্টিহীন অপদার্থ চাকরি-সর্বস্ব কর্তাভজা আমলাতন্ত্র, যা পশ্চিমবঙ্গের ঘাড়ে চেপে আছে, তা পশ্চিমবঙ্গকে নেতৃত্ব দিতে, কেন্দ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবি আদায়ে অক্ষম। আগামী নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রুটিন ওয়ার্কই চলবে, মরা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কোন প্রচেষ্টাই হবে না এবং আমলাতন্ত্রের দ্বারা সেরকম প্রচেষ্টাও সম্ভবপর নয়। ইত্যবসরে ছাঁটাই, লক আউট, লে-অফ, ক্লোজার বেড়েই চলবে, কাজেই আশা করার কিছুই নেই।

খাদ্যশস্যের ফলন বৃদ্ধির বাধা

যদিও গত দু' বছর পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের ফলন মোটামুটি ভাল হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের অধিবাসীদের সারা বছরের চাহিদা পূরণের উপযোগী খাদ্যশস্য এখনো এ রাজ্যে উৎপন্ন হয় না, যার ফলে চাল, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ এখনও কেন্দ্রের ওপর নির্ভর-শীল এবং সে চাহিদা পুরোপুরি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের গরজ মোটেই নেই। ফলে একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন এবং অল্প জমিতে বেশি ফসলের উপায় উদ্ভাবন ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার এ বছর ১৬ লক্ষ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যে সেই পরিকল্পনা বানচাল হতে চলেছে। ১৬ লক্ষ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করতে হলে ২০ কোটি টাকার সার কেনার প্রয়োজন হবে। তার মধ্যে বর্ধিষ্ণু কৃষকরা নিজেরাই পাঁচ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি আরও আট কোটি টাকা দাদন দিতে পারবে। বাকি টাকা কোথায় পাওয়া যাবে তা নিয়ে সরকারী মহলে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই খাতে ৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা ঋণ চেয়েছিলেন, কিন্তু টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে অস্বীকার করেছেন। যদি প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এবার উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, তাহলে সেই আনুষঙ্গিক ক্ষতি টাকার অঙ্কে পরিমাপ করা যাবে না। কাজেই প্রার্থিত অর্থ প্রদান করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিধা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়ত আমন চাষের আগেই কৃষকদের

দানের জন্য কৃষি ঋণ কর্পোরেশন গঠনবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা এখনও পূরণ করা হয় নি। এ ব্যাপারে কৃষি ঋণ-আইন পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রসারণ করতে কেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিধা করছেন, তাও আমাদের বোধগম্য নয়। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সময় শোনা গিয়েছিল, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের টাকা অতঃপর কৃষিক্ষেত্রেও লগ্নী করা হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সে শুধু ফাঁকা কথার ফুলঝুরি।

রাজ্য-রাজনীতি সংবাদ

বিষয়টি আগে বঙ্গদর্শনের প্রথম নিবন্ধ ছিল, কিন্তু তা ক্রমক্ষীয়মাণ গুরুত্ব অর্জন করার দরুণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের শাসক কংগ্রেসের অন্যতম নেতা শ্রীবিজয়সিং নাহার ঘোষণা করেছিলেন যে, সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে যদি পশ্চিমবঙ্গে কোন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তবে শাসক কংগ্রেস তাকে সমর্থন জানাবে। এর পরই শ্রীসুশীল ধাড়া অতিশয় তৎপর হয়ে উঠেছেন এবং শাসক কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করার পর ঘোষণা করেছেন, কংগ্রেসের সমর্থনে সি-পি-এমকে বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব এবং সেটা খারাপ সরকার হবে না। এখন আট পার্টিকে স্থির করতে হবে তাঁরা কংগ্রেসের সমর্থনে কোন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন কিনা। বলাই বাহুল্য, এতে আট পার্টি অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েছেন। বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে রাখবার জন্য তাঁরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কিন্তু এখন যেভাবে বাংলা কংগ্রেস শাসক কংগ্রেসকে জড়িয়ে ধরেছে, তাতে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আঁতাত করে চলাই আট পার্টি জোটের পক্ষে দায় হয়ে উঠেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা শ্রীনির্মল [illegible] বলেছেন, কংগ্রেসের সমর্থনে কোন [illegible]কার গঠনের মধ্যে আট পার্টি থাকবে [illegible]। কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গঠনের [illegible] তুলে কংগ্রেস ও সি-পি-এম'এর [illegible]দশ্যাই সুশীলবাবু সিদ্ধ করেছেন এবং [illegible] একমাত্র উদ্দেশ্য আট পার্টি জোটকে [illegible] প্রতিপন্ন করা। আগামী ৯ই জুলাই [illegible] কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির [illegible]কের কথা আছে, কিন্তু সুশীলবাবু [illegible] করেছেন যে, আট পার্টি জোটকে [illegible] ঘোষণা করতে হবে যে, তাঁরা [illegible]পি-এম'এর সঙ্গে শুধু এখনই নয়, [illegible]ষ্যতেও কোন সম্পর্ক রাখবেন না। [illegible] বাহুল্য, এরকম কোন কিছু কমিট [illegible] আট পার্টি জোটের পক্ষে অসম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে কোন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা আছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য রাজ্যপাল ইতিপূর্বে শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। শ্রীজ্যোতি বসু ও ছয় পার্টির জোটের নেতারা জানিয়ে দিয়ে এসেছিলেন যে, তাঁরা নির্বাচনের ব্যবস্থা চান। পক্ষান্তরে অজয়বাবুও বলেছেন যে, আট পার্টির সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর তাঁর বক্তব্য জানাবেন। আট পার্টির জোট কংগ্রেসের সমর্থনে যে কোন মন্ত্রিসভায় থাকবেন না, তা আজ খুবই স্পষ্ট। কাজেই নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই করার নেই।

অপদার্থতা

১৯৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য ৬ হাজার বিদ্যুৎচালিত তাঁত বরাদ্দ করেন, কিন্তু সেগুলি আজও নাকি বন্টন করা সম্ভব হয় নি। এ সম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, তাঁতগুলি বন্টন করার জন্য ১৯৬৬ সালেই রাজ্য পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে, অর্থাৎ প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সেই কমিটির পুনর্গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালে জেলা পর্যায়ের কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু ১৯৬৯ সালে সেই কমিটিগুলি এক সরকারী সিদ্ধান্তে বাতিল হয়ে যায়। তার বদলে অন্য কমিটিও গঠন করা হয় নি। এই ৬ হাজার তাঁত চালু হলে মোট ৩০ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হত। কারণ এক-একটি বিদ্যুৎচালিত তাঁতে তিনজন করে তন্তুজীবী সরাসরি কাজ পায় এবং সংশ্লিষ্ট কাজে আরও অন্তত দুজনের কর্মসংস্থান হয়। বস্তুত এই সব ক্ষুদ্র-শিল্পের দ্বারাই মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবের বেকার সমস্যা আজ প্রায় একরকম সমাধানই হয়ে গেছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের চিত্র অনারূপ। এই তাঁতগুলি চালু না হবার ফলে বেকার সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ বছরের পর বছর কি পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। উৎসাহী তরুণদের এই তাঁতগুলি বন্টন করে দেওয়াই ভাল, দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে তারা দাম শোধ করবে। সমবায় সমিতি নামক পেশাদার চোর সম্প্রদায়ের হাতে যাতে এগুলি না পড়ে, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পাওয়ারলুম কো-অপারেটিভের কথা শুনলেই মনে ভীতির সঞ্চার হয়।

দুর্গাপুর প্রসঙ্গ

গত ২৪শে জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার আন্তর্বিভাগীয় কমিটি দুর্গাপুরে ইস্পাত শিল্পের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, ইস্পাত মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি শ্রী আর সি দত্ত এবং হিন্দুস্থান স্টীলের চেয়ারম্যান শ্রী কে টি চণ্ডী কলকাতা এসে বিষয়টি আগাগোড়া পর্যালোচনা করবেন। জানা গেছে যে, শ্রমিক সংক্রান্ত ধারাবাহিক গোলযোগের ফলে কারখানার কাজ গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে প্রতি মাসে এক কোটি টাকা করে লোকসান যাচ্ছে। এর জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী করছেন শ্রমিকদের এবং শ্রমিকরা দায়ী করছেন কর্তৃপক্ষকে। দুর্গাপুরে কারখানার কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিভিন্ন দাবিদাওয়া সম্পর্কে যে ২৬টি চুক্তি হয়েছে, সেগুলি বলবৎ করা হয়েছে কিনা তারও পর্যালোচনা করা হবে। ছশো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুর্গাপুরে কারখানার ভবিষ্যৎ সত্যই একটা অনিশ্চিত অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার, শোনা যাচ্ছে, দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তি হচ্ছে যে, প্রতি মাসে এত লোকসান দিয়ে কারখানা চালাবার কোন যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু প্রতি মাসে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ লোকসান যাচ্ছে কেন? শুধু শ্রমিকদের ওপরেই এই লোকসানের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে চলবে কেন? আসল গোলমাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে এবং দুর্গাপুরের পর্বতপ্রমাণ লোকসানের মূল সেখানেই। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, প্রতিটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রেই লোকসানের বাড়াবাড়ি, রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। আসলে ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় আমলাতান্ত্রিক ম্যানেজমেন্ট কখনই সাফল্য-লাভ করে না। এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা মালিকানা থাকা অনুচিত। রাষ্ট্রীয় মালিকানা যাতে সুফলপ্রসু হয় সে জন্য সরকারকে রীতিমত সচেষ্ট থাকতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কর্ণধার পদে নিযুক্ত, তাঁদের ওপর সাফল্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠান চালাবার সর্ত আরোপিত থাকা উচিত, যা না হলে পদচ্যুতি ও শাস্তির ব্যবস্থাও থাকা উচিত। কিছু পেশাদার প্রশাসককে যত্রতত্র নির্বিচারে কর্তৃপক্ষের পদে নিয়োগ করলে লোকসানই তো স্বাভাবিক, কেন না তাঁরা বেতনভুক কর্মচারী, আজ আছেন দুর্গাপুরে কাল আসবেন দুগ্ধপ্রকল্পে। যাঁরা বিভিন্ন সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের পদে থাকবেন, তাঁদের ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে বিশেষ ট্রেনিং থাকা দরকার। কাজেই দুর্গাপুরকে লাভজনক করতে গেলে বর্তমান ব্যবস্থাটাবই আমূল পরিবর্তন করা দরকার। ২৭-৬-৭০

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনর্গঠন

গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভা নতুন করে ঢেলে সেজেছেন। তিনি নিজে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করে অর্থ দপ্তরের ভার চাবনের হাতে তুলে দিয়েছেন। দীনেশ সিংকে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে সরিয়ে শিল্পোন্নয়ন ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছে। জগজীবন রাম পেয়েছেন—প্রতিরক্ষা, ফকরুদ্দীন আলী আমেদ—খাদ্য ও কৃষি এবং বলিরাম ভগত—ইস্পাত ও হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং। মন্ত্রিসভায় নবাগত কে হনুমন্তিয়া পেয়েছেন—আইন ও সমাজকল্যাণ দপ্তর।

শ্রী কে রঘুরামাইয়া ক্যাবিনেট মন্ত্রী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে এল এন মিশ্র বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের ভার পেয়েছেন এবং তিনি স্বাধীনভাবে এই দপ্তরের কাজ দেখাশোনা করবেন. আর কে খাদিলকর, কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি এবং ডাঃ কে এল রাওকে যথাক্রমে সরবরাহ, কোম্পানী বিষয়ক এবং সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে। ডাঃ রাও স্বাধীনভাবে তাঁর দপ্তরের কাজ দেখাশোনা করবেন।

জগন্নাথ রাওকে পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তর থেকে সরিয়ে আইন ও সমাজকল্যাণ দপ্তরে বসানো হয়েছে। অপর দিকে কে সি পন্থ, পি সি শেঠী ও ভি সি শুক্লাকে তাঁদের পুরোনো দপ্তর থেকে সরিয়ে যথাক্রমে স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা উৎপাদন এবং অর্থ দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে।

পরিমল ঘোষ আবার প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন, তবে এবার তিনি পেয়েছেন স্বাস্থ্য এবং পরিবার-পরিকল্পনা দপ্তরের ভার।

প্রতিমন্ত্রী নন্দিনী সৎপথীকে বর্তমানে কোন নির্দিষ্ট দপ্তর দেওয়া হয় নি।

৫৫ জন মন্ত্রী নিয়ে গঠিত এই মন্ত্রিসভায় আছেন ১৬ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ২০ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ১৯ জন উপমন্ত্রী।

কেরালায় বিধানসভা বাতিল

গত ২৬শে জুন কেরালার রাজ্যপাল শ্রী বি. বিশ্বনাথন মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুৎ মেননের পরামর্শক্রমে কেরালা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের আদেশ দিয়েছেন। আগামী অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে কেরালায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন দল এবং রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের তারিখ স্থির করবেন।

অপ্রত্যাশিত, অপর দিকে তেমান অভিনবও বটে। মাস আষ্টেক আগে নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার পদত্যাগ করার পর অচ্যুৎ মেননের নেতৃত্বে ক্ষুদে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। বিধানসভায় তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন ঠিকই, তবে বিরোধী দলের শক্তিও কিছু কম ছিল না। তা সত্ত্বেও গত ৮ মাসে বিধানসভায় একাধিকবার শক্তি পরীক্ষা হয়েছে এবং তাতে ক্ষুদে ফ্রন্টকে ঘায়েল করা সম্ভব হয় নি। বর্তমানে বিধানসভার অধিবেশন মুলতবী আছে। কাজেই সেদিক দিয়ে মন্ত্রিসভা বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত নিরাপদই ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্ষুদে ফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ বিরোধ এমন চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, অচ্যুৎ মেনন আর তাঁর সরকারকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারেন নি। তাই তিনি রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙে নতুন নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছেন। এর আগে ভারতের কোন রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার বিধানসভায় শক্তি পরীক্ষার আগেই এভাবে বিধানসভা ভেঙে দেবার পরামর্শ দেন নি এবং রাজ্যপালও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে এভাবে বিধানসভা ভেঙে দেন নি। সেদিক দিয়ে কেরালায় একটা নতুন নজির সৃষ্টি হল।

ক্ষুদে ফ্রন্টের আভ্যন্তরীণ বিরোধের মূলে রয়েছে আই-এস-পি-পি-এস-পি বিরোধ। আই-এস-পি হচ্ছে এস-এস-পি'র একটি ভাঙা দল। এস-এস-পি'র কচ্ছ সত্যাগ্রহের সময় কেরালার যেসব সদস্য সেই সত্যাগ্রহে অংশ নিতে অস্বীকার করেন, তাঁরাই আই-এস-পি দলের স্রষ্টা। এই দলের পি. কে. কুঞ্জু নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ ওঠায় তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নাম্বুদ্রিপাদ-মন্ত্রিসভার পতনের পর অচ্যুৎ মেননের সরকার গঠিত হলে আই-এস-পি ক্ষুদে ফ্রন্টে যোগ দেয় এবং তাদের দলের শেসান মন্ত্রী হন। ইতিমধ্যে কুঞ্জুর বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত টেকনিক্যাল কারণে হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল হয়ে যায়। তখন আই-এস-পি দল কুঞ্জুকে আবার মন্ত্রিসভায় গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্ত অচ্যুৎ মেনন তাতে রাজী হন নি। তিনি কুঞ্জুর বিরুদ্ধে নতুন তদন্তের আদেশ দেন। তখন আই-এস-পি দল চাপ সৃষ্টির জন্য শেসানকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু শেসান মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে সদলবলে পি-এস-পিতে যোগ দেন। অতঃপর পি-এস-পি যুক্তফ্রন্টের শরিক হিসাবে সকল প্রকার অধিকার দাবি করেন এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য হতে

টান। আই-এস-পি (ইণ্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি) তাতে ঘোর আপত্তি তোলেন এবং বলেন যে, দলত্যাগীদের মন্ত্রিসভার ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেওয়া যায় না। আই-এস-পি'র সদস্যরাও যে আসলে দলত্যাগী, সেই সত্যি কথাটা তখন তাঁরা একেবারেই ভুলে থাকেন। ইতিমধ্যে গুজব রটে যে, আই-এস-পি মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আঁতাত করে বিকল্প মন্ত্রিসভা গড়বার কথাবার্তা চালাচ্ছে। আই-এস-পি'র সমর্থন ছাড়া অচ্যুৎ মেননের সরকারের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। সম্ভবত সেই কারণেই অচ্যুৎ মেনন বিধানসভা ভাঙবার পরামর্শ দিয়েছেন।

তাঁর এই সিদ্ধান্ত যে অত্যন্ত যুক্তি-যুক্তই হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন, মন্ত্রিসভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে। কাজেই এই অবস্থা আর বেশিদিন চলতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

বিধানসভা ভাঙলেও মন্ত্রিসভা শনিবার পর্যন্ত ভাঙে নি। তাই রাষ্ট্রপতির শাসন এখনও চালু হয় নি। নির্বাচন পর্যন্ত কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিসভা চালু থাকবে কি না, তা এখনও সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না। অচ্যুৎ মেনন বলেছেন, সংবিধান অনুযায়ী তাঁদের মন্ত্রিসভা আরও ৬ মাস কাজ চালিয়ে যেতে পারেন, কারণ বিধানসভায় মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটে নি। কিন্তু বিরোধী পক্ষ এই কেয়ারটেকার গভর্নমেণ্ট বাঞ্ছনীয় বলে মনে করবেন কি না, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

গত ২২ বছরে কেরালায় ১১টি মন্ত্রি-সভার উত্থান-পতন হয়েছে। এই বাইশ বছরে বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রপতির শাসনও চালু ছিল। কাজেই গড়ে এক-একটা মন্ত্রিসভার পরমায়ু দেড় বছরের বেশি নয়। অর্থাৎ স্বাধীনতার পর থেকেই রাজ্যের অবস্থা অস্থিতিশীল। আসন্ন নির্বাচনে বিভিন্ন দল কিভাবে জোট বাঁধবেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয়, তিনটি পৃথক পৃথক জোট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এক জোটে নেতৃত্ব করবে সি-পি এম, দ্বিতীয় জোটে সি-পি-আই এবং তৃতীয় জোটে কংগ্রেস। এই ত্রিদলীয় প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় কেরালার রাজনৈতিক আকাশ পরিষ্কার হবে বলে মনে হয় না। সমস্ত বামপন্থীর একটি ফ্রণ্টে মিলিত হবার সম্ভাবনা খুবই কম।

দেশের সব বামপন্থী দলই যুক্তফ্রণ্টের তত্ত্বে বিশ্বাসী বলে ঘোষণা করেছেন, কিন্তু প্রত্যেক দলই যুক্তফ্রণ্টের তত্ত্বকে নিজের আশু সুবিধা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে থাকেন। প্রত্যেক দলই ভাবেন, যুক্ত-ফ্রণ্টে তাঁরাই হবেন প্রধান এবং অন্যান্য শরিকরা হবে তাঁদের তল্পীবাহক। তাই যুক্তফ্রণ্টের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হলেও প্রকৃত যুক্তফ্রণ্ট গঠন করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। বিরাট কংগ্রেসী মহীরুহ যখন প্রায় সমূলে উৎপাটিত, তখন বামপন্থীরা নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি, খুনোখুনি করে সমাজ-বিরোধী শক্তিগুলোকেই উপরে উঠে আসতে সাহায্য করছেন। বামপন্থী আন্দোলনে এর চেয়ে বড় সংকট আর কিছু কল্পনাই করা যায় না। কেরালার নির্বাচনের আগে বামপন্থীদের মধ্যে যদি শুভবুদ্ধির উদয় হয় এবং তাঁরা যদি আত্মানুসন্ধানের দ্বারা নিজেদের সংশোধন করতে পারেন, তাহলে হয়ত তার একটা সুফল পাওয়া যেতে পারে। নইলে কেরালার অবস্থা যা ছিল, তাই থাকবে। কারণ, নির্বাচনে কোন একটি গোষ্ঠীর সর্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা খুবই কঠিন।

স্বাক্ষর করুন এটাতে।

সোয়েকার্ণো

সোভিয়েত য়ুনিয়ন :

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ সোভিয়েত য়ুনিয়নে পাঁচ দিনব্যাপী শুভেচ্ছা সফর শেষ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

এবার ইয়াহিয়া খাঁর সোভিয়েত সফরের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের জন্য সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য সংগ্রহ করা। পাকিস্তানের প্রধান মুরুব্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইদানীং খুব বেশি সাহায্য পাকিস্তানকে দিচ্ছে না। তাই তাকে অন্যত্র সাহায্যের খোঁজ করতে হচ্ছে। রাজনৈতিক কারণে সোভিয়েতের কাছ থেকে পাকিস্তানের সাহায্য আদায় করার সুযোগও আছে। এশিয়ার এই অঞ্চলে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে পাকিস্তানকে হাতে রাখা দরকার।

শেষ পর্যন্ত কতটা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ইয়াহিয়া খাঁ সোভিয়েত নেতাদের কাছ থেকে আদায় করতে পেরেছেন, তা জানা যায় নি। তবে কিছু সাহায্য নিশ্চয়ই পাবেন। পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজনের কথা ইয়াহিয়া খাঁ ও তাঁর সঙ্গে সফররত অফিসাররা বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে এসেছেন।

ইয়াহিয়া খাঁ সোভিয়েত নেতাদের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে একগাদা নালিশ করেছেন। ২৩শে জুন মস্কো পৌঁছেই তাঁর প্রথম বক্তৃতায় ইয়াহিয়া খাঁ বলেছেন, পাকিস্তান তার সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে পেরেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারত। আর ভারতের বৈরী মনোভাবই এর জন্য দায়ী। ক্রেমলিনে সোভিয়েত নেতারা পাক রাষ্ট্রপতির সম্মানে যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন, সেখানে ইয়াহিয়া খাঁ এই কথা বলেন। সোভিয়েত য়ুনিয়নের সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামের সভাপতি নিকোলাই পদগরনি, প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন, সহকারী প্রধানমন্ত্রী মাজুরভ প্রমুখ ভোজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

২৪শে জুন পদগরনি ও কোসিগিনের সঙ্গে আলোচনার সময় ইয়াহিয়া খাঁ ভারতের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফারাক্কা, কাশ্মীর ও সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের কথা বলেন। পাকিস্তান রেডিও থেকে এই সংবাদ প্রচার করা হয়েছে।

যদি সত্যি ইয়াহিয়া খাঁ সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে আলোচনার সময় এই সব প্রসঙ্গ তুলে থাকেন, তবে সোভিয়েত নেতারা ভারতের একান্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলি কেন আলোচনায় তুলতে দিলেন, সে প্রশ্ন অবশ্যই করা যায়।

তবে, মনে হচ্ছে, সোভিয়েত নেতারা ভারতবিরোধী বক্তব্যে বিশেষ পাত্তা দেন নি। ২৬শে জুন মস্কো ও ইসলামাবাদ থেকে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রচার করা হয়, তাতে বলা হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে সব বিরোধ রয়েছে, 'তাসখন্দ মনোভাবে'র ভিত্তিতে উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার দ্বারা তার নিষ্পত্তি করার জন্য চেষ্টা করা হবে বলে সোভিয়েত ও পাক নেতারা আশা প্রকাশ করেছেন।

জাপান :

জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির মেয়াদ আবার বাড়ানো হ'ল। এতদিন এই চুক্তি দশ বৎসর করে বাড়ানো হচ্ছিল। এবার বলতে গেলে, অনির্দিষ্টকালের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হ'ল। এর পর অবশ্য যে কোন পক্ষ এক বৎসরের নোটিশ দিয়ে এই চুক্তি বাতিল করতে পারবেন।

২৩শে জুন তারিখে, যেদিন পুরনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হ'ল এবং নতুন করে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হ'ল, সেদিন টোকিওতে ছাত্র ও শ্রমিকরা এই সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করে। টোকিওর পথে পথে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষও হয়। কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংঘ 'সোহিয়ো'র ডাকে বিভিন্ন শ্রমিক প্রতিষ্ঠান বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট দলগুলি এবং শান্তিবাদী দল, এমন কি কিছু সংখ্যক দক্ষিণপন্থী দলও এই চুক্তির বিরোধিতা করে।

তবু, ১৯৬০ সালে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধির সময় সারা জাপান জুড়ে যে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, এবার তা হয় নি। মোটামুটি জাপানীরা যেন এই চুক্তিটা মেনেই নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে আপত্তির তীব্রতাটা আগের চেয়ে অনেক কম।

এর কারণ কি?

প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ১৯৭২-এর মধ্যে ওকিনাওয়া দ্বীপ ও রিকুয়ু দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দখলকরা দ্বীপ তারা জাপানকে ফিরিয়ে দেবে। এতে জাপানীরা খুব খুশি।

দ্বিতীয়ত, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ইসাকু সাটো ও তাঁর দল গত ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ

[illegible] নির্বাচনী প্রচারে সাতো জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি চালু রাখার কথা বলেছিলেন। তাই এ কথা বলা হচ্ছে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাপ জনসাধারণ, অন্তত নির্বাচকমণ্ডলী এই চুক্তির পক্ষে রায় দিয়েছে। সাতো অনেক বেশি সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এবার চুক্তির ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছেন।

তৃতীয়ত, জাপ জনসাধারণের এক বিরাট অংশ মনে করে, মার্কিন সামরিক নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে জাপানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নষ্ট হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ঘনিষ্ঠ মার্কিন সম্পর্কের জন্যই তাদের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। তাদের কাছে সার্বভৌমত্বের চেয়ে এখন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বেশি মূল্যবান।

তাই, কিছু ছাত্র, শ্রমিক ও বামপন্থী দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করলেও জাপানের অধিকাংশ মানুষ এবার এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে নি।

ইন্দোনেশিয়া :

ইন্দোনেশিয়ার 'জনগণ মন অধিনায়ক' 'বাং কর্ণ' সোয়েকার্ণো মারা গিয়েছেন।

গত ২১শে জুন জাকার্তা সামরিক হাসপাতালে ৭০ বৎসর বয়সে সোয়েকার্ণো মারা গিয়েছেন।

ওলন্দাজ শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে তোলেন সোয়েকার্ণো। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। এমন কি তাঁকে একবার নির্বাসিতও হতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার সময় তিনি ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করেন। পরে অবশ্য ওলন্দাজরা এই প্রজাতন্ত্র ভেঙে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওলন্দাজরা সোয়েকার্ণোর সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়।

তখন থেকে সোয়েকার্ণো ইন্দোনেশিয়ার একচ্ছত্র নেতা। জনসাধারণের বিপুল সমর্থন ও ভালবাসা পেয়েছেন সোয়েকার্ণো। তিনি কেবল ইন্দোনেশিয়া নয়, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেছেন। ১৯৫৫ সালে ঐতিহাসিক বান্দুং সম্মেলনের তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা। এই সম্মেলন থেকেই তিনি নেহরু, চৌ এন-লাই ও অন্যান্য আফ্রো-এশীয় নেতার সঙ্গে 'পঞ্চশীলের' নীতি ঘোষণা করেন।

সোয়েকার্ণোর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোটামুটি প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করে চলেছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিন একটানা শাসন-কর্তৃত্বে থাকার ফলে এবং একচেটিয়া ক্ষমতা পাবার জন্য সোয়েকার্ণোর মধ্যে নানা বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে'র নামে তিনি দেশে প্রায় একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চীনের সঙ্গে যোগসাজসে সঙ্কীর্ণতার পথ ধরেছিলেন। (যদিও পরে চীনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়েছিল।) মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ সুরু করেছিলেন। মুসলিম ধর্মান্ধদের প্রভাবে পড়ে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত সোয়েকার্ণোর বিরুদ্ধে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করল। ১৯৬৫ সালে সোয়েকার্ণোকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল সুহার্তো সকল ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৬৭ থেকে সোয়েকার্ণো কার্যত স্বগৃহে বন্দী। তাঁর সকল সম্মান ও ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এক সময় সোয়েকর্ণো নিজেকে আজীবন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন। সুহার্তো তাঁর এই মর্যাদা কেড়ে নিয়ে নিজে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন।

আশ্চর্যের বিষয়, যে সোয়েকার্ণো এত জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর ক্ষমতাচ্যুতিতে, তাঁর মর্যাদাহানিতে, তাঁর প্রতি নানা অসম্মান প্রদর্শনে জনসাধারণ প্রতিবাদ করে নি। গর্জে ওঠে নি। সুহার্তোরা বলতে গেলে নিরাপদেই তাঁদের শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

মৃত্যুর পর সোয়েকার্ণোর প্রতি পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়েছে। সুহার্তো থেকে সুরু করে বর্তমান শাসকমণ্ডলীর সকলেই জাতীয় নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন। দেশব্যাপী শোকের ছায়া পড়েছে।

মৃত্যুতে সোয়েকার্ণো তাঁর পূর্ব সম্মান কিছুটা ফিরে পেলেন, এইটুকুই সান্ত্বনা।

বৃটেন :

এডওয়ার্ড হিথ প্রধানমন্ত্রীরূপে কাজ সুরু করেছেন। নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। মন্ত্রীরা যে যাঁর কাজ বুঝে নিয়েছেন।

কিন্তু, এ ক'দিনের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে, রক্ষণশীল দলের নতুন সরকার কি পরিমাণ প্রতিক্রিয়াশীল নীতি অনুসরণ করবেন।

হিথ মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম। হিউম কিছুদিন আগে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছিলেন, তখন সেখানে বলে এসেছিলেন, রক্ষণশীল দল [illegible] ক্ষমতায় [illegible] এলে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করা হবে। আর উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সাইমনস্ সামরিক ঘাঁটির ব্যাপারে বৃটিশ সাহায্য দেয়া হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা, বৃটেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামরিক অস্ত্রাদি বিক্রি করবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ঘোষণা করেছে, এই সব বিষয়ে বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিউম ও অন্যান্যদের সঙ্গে কথা বলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মুলার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই লণ্ডন যাবেন।

হিউম যদি সত্যি এই সব করার চেষ্টা করেন, তা হলে খুব গোলমাল হবে। হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে প্রাক্তন শ্রমিক সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করেছিলেন এবং সামরিক অস্ত্র বিক্রয় একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্তমত এই সব করা হয়েছিল। রাষ্ট্রসংঘ এখনও বর্ণবৈষম্যবাদী দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাচ্ছে। এই অবস্থায় হিথ, হিউমরা যদি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব স্থাপন ও তাদের সামরিক সাহায্য দেবার চেষ্টা করেন, তবে রাষ্ট্রসংঘ ও কমনওয়েলথে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।

কেবল দক্ষিণ আফ্রিকা নয়, রোডেশিয়ার ইয়ান স্মিথের বর্ণবিদ্বেষী বিদ্রোহী সরকারের সঙ্গেও রক্ষণশীল সরকার একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করবেন, এই আশংকা রয়েছে। কমনওয়েলথের আফ্রিকীয় দেশগুলি কিছুতেই এই অবস্থা মেনে নেবে না।

বৃটেনে বহিরাগত কৃষ্ণাঙ্গ সকলেরই বিপদ উপস্থিত। হিথ বহু পূর্বেই উগ্র শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষী এনক পাওয়েলকে তাঁর ছায়া মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দিয়েছেন। তাই, এবার তিনি মন্ত্রী হতে পারেন নি। কিন্তু, রক্ষণশীল দলের একেবারে অপ্রত্যাশিত জয়ের যে সব কারণ এখন আলোচনা করা হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম কারণ বলা হচ্ছে বিপুল সংখ্যক ভোটদাতার বহিরাগত-বিরোধী মনোভাব। ফলে পাওয়েলবাদ শক্তিশালী হবে, বহিরাগত বিতাড়নের চেষ্টা বাড়বে।

শ্রমিক দল বিরোধী ভূমিকায় থেকে কি বহিরাগতদের পক্ষে দাঁড়াবে? না, পরবর্তী নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে তারাও চুপ করে থাকবে?

[illegible]

গোদা বাংলায় একটা কথা আছে—অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে, অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়ে খাবে। এই কথার মূলমর্ম হ'ল বেশি বেড়ে যাওয়া ভাল না, আবার বেশি ছোট হওয়াও ভাল না। ঝড় ও ছাগল দুই-এর আওতার বাইরে থাকাই নিরাপদ। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে গত সপ্তাহে যে ডামাডোল হয়ে গেল, তার মধ্যে অতি বাড় বেড়ে যাওয়া ও অতি ছোট হওয়ার বিপত্তির এক চরম বিয়োগান্ত পরিণতি দেখা গেল। অতি বাড় বেড়েছিলেন শ্রীসুশীল ধাড়া, তাই প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে তাঁর মুখ বেশ কিছুটা থেবড়ে গেল আর অতি ছোট হয়েছিল আট পার্টি, তাই তাদেরও শেষ পর্যন্ত ছাগলের গ্রাসে পড়তে হ'ল। গত সপ্তাহে রাজ্য রাজনীতির যে দ্রুত পটপরিবর্তন সুরু হয়, তা সুরুর দিন ছিল ২০শে জুন শনিবার। ঐদিন সকালবেলা ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীঅশোক ঘোষ আর শ্রীনির্মল বসু গেলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে। দীর্ঘ সময় আলোচনা করে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির বৈঠকের দিন ঠিক করে এলেন। অনেকদিন বাইরে ছিলাম, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ও বাইরে ছিলেন। শনিবার দুপুরে প্রচণ্ড রৌদ্রে নিশ্চিন্ত অবসর ভেবে গাড়ি করে বের হ'লাম শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। ভাবলাম যাই শুনে আসি অশোক ঘোষ-নির্মল বসুর সঙ্গে কি কথা হ'ল। কাঠফাটা রৌদ্রে বেলেঘাটা ... বেল-ভেডিয়ারে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতেই দেখি আর একখানা কালো রংয়ের ভ্যান গাড়ি দাঁড়িয়ে। গাড়ীর নম্বরটা বাংলাদেশের নয়। মনে মনে ভাবলুম কি জানি বাবা বাইরে থেকে কেউ এল নাকি।

আমাকে দেখে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে উপস্থিত নিরাপত্তা বাহিনীর একজন অফিসার একটু হাসলেন, হাসিটা খুবই উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে হ'ল। একটু এগুতেই শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা রক্ষার আর একজন কর্মী আমাকে দেখে একেবারে মাথায় হাত দিল। দ্রুত কাছে এসে বললো—দয়া করে এখন চলে যান, একটু পরে আসবেন, উনি খুব ব্যস্ত, আপনার সঙ্গে ওঁর দেখা হবে না। আর আপনি এখন এসেছেন এই কথাও বলা যাবে না ওঁকে, আপনি একটু পরে আসুন।

ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক মনে হ'ল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি সেই নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার একইভাবে অর্থপূর্ণভাবে হাসছেন। নিজের গাড়িতে উঠে গাড়িখানা একটু দূরে রেখে গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম। গাড়ি গরমে তেতে আগুন, ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দূরে আর একটা গাছতলায় জামা খুলে বসে পড়েছে আর আমি গাড়ির মধ্যে ভ্যাপসা গরমে ঘেমে জল হচ্ছি। এইভাবে আধ ঘণ্টা থাকবার পর দেখি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে নেমে আসছেন রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক তথা অন্যতম প্রধান নেতা শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—সঙ্গে আবার এক ভাই, তিনিও কংগ্রেসের নেতা। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ গাড়িতে গিয়ে বসলেন, গাড়ি ছেড়ে গেল। দেখলাম—জলে ভাসে শিলা। সেই শনিবার যেদিন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম শ্রীঅশোক ঘোষ আর পরে শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের বৈঠক হ'ল, সেই-দিন থেকে সুরু হ'ল রাজ্য রাজনীতিতে নতুন টালমাটাল। কলকাতায় এলেন শ্রীনন্দা। কাটলো বিরাট কর্মব্যস্ত দিন। '৬৭ সালের এ্যাড হক কংগ্রেসের নায়ক—শ্রীঅজয়বাবুকে ২রা অক্টোবর পদত্যাগ করিয়ে কংগ্রেসে ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায় মুখ্য নায়ক শ্রীনন্দা কলকাতায় এলেন ঠিক সময় বুঝে। শ্রীনন্দার কলকাতা আসবার একদিন আগে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবিজয়-সিংহ নাহার এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে বললেন—রাজ্যে যদি আট পার্টি একটা সরকার গঠন করে, তবে সেই সরকারকে কংগ্রেস সমর্থন করবে। শ্রীনন্দাও সাংবাদিকদের কাছে একই কথা বললেন। রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন শ্রীঅজয় মুখো-পাধ্যায়। একই প্রস্তাব এল সম্ভবত রাজ্যপালের কাছ থেকে যে, আট পার্টিকে নিয়ে আপনি সরকার করুন। বেজে উঠলো সরকার গড়ার দামামা।

শ্রীসুশীল ধাড়া ছিলেন এই দিন অর্থাৎ ২৩শে জুন ডায়মণ্ডহারবারে। সেখান থেকে টেলিফোনে অফিসে যোগা-যোগ করে জানালেন একটা বৈঠকের বন্দোবস্ত কর সিদ্ধার্থবাবু-তরুণবাবুর সঙ্গে। বুধবার ২৪ জুন সকালে শ্রীসুশীল ধাড়া কলকাতায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে-ছেন, এমন কি টেলিফোনেও কথা বলতে পারলেন না শ্রীনির্মল বসু সহ কয়েক-জনের সঙ্গে। অথচ সকাল সাড়ে নয়টায় চলে গেলেন বেলতলায় শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বাড়ি—সেখানে এলেন শ্রীতরুণ-কান্তি ঘোষ, বৈঠক বসলো। বৈঠক শেষে বৈকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনেও অনেক কথা বললেন শ্রীধাড়া। বুধবার—এই দিন আট পার্টির বৈঠক শেষে শ্রীনির্মল বসু সাংবাদিকদের বললেন, শ্রীধাড়া অসুস্থ তাই টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় নি।

মির্জা গালিবের একটি কবিতা অধ্যা-পক শ্রীনির্মল বসু জানেন কিনা জানি না। সেই কবিতাটার সারমর্ম হ'ল—"কাল তুমি বলেছিলে তোমার বিছানা ছেড়ে উঠে বসবার শক্তি নেই, কিন্তু একদিন

পরে তুমি এত শক্তি কোথায় পেলে যে, শুধু বিছানা নয়, এই জগৎ ছেড়ে চলে যেতে পারলে"। আট পার্টির বৈঠকের পর শ্রীনির্মল বসু শ্রীধাড়াকে জানাতে পারলেন না যে, আট পার্টি ঠিক করেছে—৯ই জুলাই বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির বৈঠক হবে। কিন্তু এই দিন শ্রীধাড়া বেলতলায় শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের বাড়িতে গেলেন, আর সাংবাদিকদের কাছে বললেন অনেকগুলি মোক্ষম কথা। শ্রীধাড়ার সঙ্গে শ্রীবসুর যদি সাংবাদিক সম্মেলনের আগে কথা হ'ত, তবে কখনই এতটা জল ঘোলা হ'ত না। শ্রীধাড়া সাংবাদিকদের কাছে শুধু শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের সঙ্গে কি কথা হয়েছে সেই কথা বললেন না—জানিয়ে দিলেন শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়ের রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে এক বৈঠকের খুবই প্রয়োজন ছিল। শ্রীধাড়া বললেন—কংগ্রেস আট পার্টির সরকার গঠনের অকপট ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, কাজেই আজ নয় পার্টির দায়িত্ব এসেছে তাঁরা সরকার করবেন কিনা। সেই সঙ্গে আরো জানিয়ে দিলেন, আট পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠকের প্রশ্ন এখনও শূন্যে ঝুলছে—কারণ আট পার্টি যতক্ষণ না কবুল করছে সি পি এম-এর সঙ্গে কোনদিন কখনও আর সহবাস করব না, ততক্ষণ বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির মুখদর্শনও করবে না। এই সঙ্গে শ্রীধাড়া আট পার্টির অন্যতম শরিক এস ইউ সি-কেও প্রকাশ্যে এক হাত নিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এই দিনই শ্রীসুশীল ধাড়ার অতি বাড়ের চরম রূপ প্রকাশ পেল আর আট পার্টির অতি ছোট হবার চরম দৈন্য প্রকাশ পেল। এর পরদিনই আবার চাকা ঘুরতে সুরু করলো। শ্রীধাড়ার সব বক্তব্য শুনে ফরোয়ার্ড ব্লক দলের শ্রীনির্মল বসু বললেন—বেশি কথা বলতে চাই না, এই সব কথা বলে শ্রীধাড়া সি পি এম ও কংগ্রেসের উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করছেন। কিন্তু শ্রীঅশোক ঘোষ বৃহস্পতিবার প্রকৃতপক্ষে সবটুকু কাপড়ই খুলে দিলেন। শ্রীঘোষ বললেন—**প্রথম কথা আট পার্টির সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা বাংলা কংগ্রেসই প্রকাশ করেছে—কাজেই আমাদের কিছু কবুল করার প্রশ্ন ওঠে না। আর কি কবুল করতে হবে? সি পি এম-এর সঙ্গে কখনও সমঝোতা করবো না? এই কথাটাই তো অরাজনৈতিক, বরং আমরা উল্টে বলি—কংগ্রেসের সঙ্গে কোন দিন কোন সমঝোতা চলবে না। কারণ কংগ্রেস হ'ল শ্রেণী শত্রু। সি পি এম-কে ফরোয়ার্ড ব্লক শ্রেণী শত্রু মনে করে না। সি পি এম-এর আগ্রাসী মনোভাব ও হঠকারী নীতির দরুণ যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছে, আমরা চাই সি পি এম তার আচরণ পরিবর্তন করুক। শুধু তাই নয় শ্রীঘোষ আরো বলেছিলেন, বাংলা কংগ্রেসকেই আজকে পথ বেছে নিতে হবে তারা কংগ্রেসের সঙ্গে যাবে, না আট পার্টির সঙ্গে যাবে।**

ফরোয়ার্ড ব্লক তবু কিছুটা রেখে-ঢেকে বলেছিল, কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'কালান্তর' শুধু কাপড় নয়, অন্তর্বাসও খুলে দিল কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার করা আর কংগ্রেসের সঙ্গে হবনব করার। ২৬শে জুন কালান্তর সম্পাদকীয় লিখল, "ধাড়া মশাই-এর মাতব্বরী"।

'কালান্তর' লিখলো—

> "মোড়লীই যাদের নেশা ও পেশা, গাঁয়ে না মানলেও তারা মোড়ল থাকার চেষ্টা করেন। ধাড়া মশাই হলেন সেই রকম এক ব্যক্তি, যিনি শুধু কথার চাতুরীতে আট পার্টিকে তাঁর নিজের ইচ্ছার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে সি পি এম ও কংগ্রেসের হাতে হাতিয়ার তুলে দিয়েই নিশ্চিন্ত নন, আট পার্টির সঙ্গে বসার আগে তিনি একটা সর্ত আদায় করে আট পার্টির উপরে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান।"

আরো বহু কথার মধ্যে 'কালান্তর' লিখলো—

> "ধাড়া মশাই মাঝে মাঝে পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা একাধিকবার করে ব্যর্থ হয়েছেন।" "সি পি এম-এর দলীয় স্বার্থসিদ্ধির ন্যক্কারজনক রাজনীতি যুক্তফ্রন্ট থেকে বাংলা কংগ্রেসকে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করেছে সত্য, কিন্তু বাংলা কংগ্রেসের কায়েমী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক একটি অংশ এই সুযোগকে তারা তাদের সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার নিরলস চেষ্টা করছে। শ্রীধাড়া মশাই তাদের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে পশ্চিম বাংলায় শাসক ও সিন্ডিকেট কংগ্রেসকে আবার নতুন করে মর্যাদা দানের চেষ্টা করেছেন।"

এর পর শুধু বলতে হয়, "লাগ ভেল্কি লাগ"। শুক্রবার সকালে কালান্তরের এই সম্পাদকীয় বের হবার আগের দিন রাত্রে শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গেছিলেন শ্রীসুশীল ধাড়ার কাছে। সুশীলদা আর 'দামু'র মধ্যে সেই দিন রাত্রে যে কথাই হয়ে থাক না কেন, 'কালান্তর' সম্পাদকীয় যে সেই সাক্ষাৎকারের পরে লেখা তাতে সন্দেহ নেই। শ্রীসুশীল ধাড়া যেসব কথা বলছেন, সেইসব কথা সত্যি বাংলা কংগ্রেস দলের কথা কিনা, বা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কথা কিনা সেটা অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। তবে একটা ঘটনা পরিষ্কার হয়ে গেছে—যার ইঙ্গিত আমি গত সপ্তাহের লেখায় প্রকাশ করেছিলাম। সেটা হল বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিকে একটা ডিক্টেটিং টার্মে আনতে চায়—সেই জায়গায় একটা মস্ত-বড় বাগড়া পড়ে গেল। আবার আট পার্টি যেভাবে ভেবেছিল অতি সহজে বাংলা কংগ্রেসকে তাদের দলে পাবে, যার কথা আমি গত সপ্তাহে বলেছি যে, অজয়বাবু দুইবার আঙুল পুড়িয়েছেন, কিন্তু তিনবার পোড়াবার আগে ছয়বার ভাববেন সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেল।

একটা কথা কিন্তু অনেকের মনে রাখা দরকার। সেটা হল মেদিনীপুরে বাংলা কংগ্রেসের মুখ্য শত্রু সি পি এম নয়, সি পি আই। ২৪ পরগণায় সি পি এম অপেক্ষা এস ইউ সি বাংলা কংগ্রেসের বড় শত্রু। তাই শ্রীধাড়া হয়ত অতি বড় হয়ে আট পার্টিকে বগলে পুরতে চেয়েছিলেন—যেমন রামশিষ্য হনুমান রেখেছিল সূর্যকে। কিন্তু এই সূর্যের আবার অপর রূপ অগ্নি, সে-ই রামশিষ্যের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল। অবশ্য এখনও পাকাপাকিভাবে বলা যায় না কে কাকে বগলে পুরবে আর কে কার মুখ পোড়াবে। সেটা বুঝতে আরো একটু সময় লাগবে।

—২৭শে জুন, '৭০

[পূর্বানুবৃত্তি]

হেমচন্দ্রের বিষাদবোধের কথা থেকেই বোধ হয়,—আনন্দ এক সময়ে আমাদের মহিলা-কবিদের প্রসঙ্গে গিয়ে পৌঁছোয়,—এবং পর পর কয়েকজন লেখিকার কয়েক ছত্র রচনা শুনিয়ে দেয় সেদিন। সে-সব ছত্র হুবহু উদ্ধৃত ক'রে দেখানো এখানে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আনন্দ সেই সূত্রে যা বলতে চেয়েছিল, সেটা লিখে রাখবার চেষ্টাতেই সে-সব কথা মনে আসছে।

সে জিজ্ঞেস করেছিল—জানো তো হেমচন্দ্র কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া'র ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন?

তারপর বললে—সেকালে তো বটেই, তার পরেও অনেকদিন আমাদের স্ত্রী-কবিদের লেখায় লেখায় ইনিয়ে-বিনিয়ে কান্নার ঝোঁকটাই প্রধান ছিল। খুবই হাল আমলে সে-ঝোঁক কতকটা বদলেছে বটে। এখন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের বয়স অপেক্ষাকৃত কম,—এখনো পঁচিশ-তিরিশের মধ্যে,—তাঁরা অবশ্য অন্য ফ্যাশান অনুসরণ করছেন। কিন্তু সে-কালে,—হেমচন্দ্রের আমলে—তাঁরা কান্নাতেই অধিক নিপুণা ছিলেন।

আমি বললুম, গিরীন্দ্রমোহিনীর মতো কবিও তো ছিলেন,—যাঁর কান্নাও অকৃত্রিম? এবং তা কি শুধু কান্না-ই?

সে বললে—সে যাই হোক, হেমচন্দ্রকে তাঁরা পছন্দ করতেন।

আমি বললুম—ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথও তাঁকে পছন্দ করতেন। মেঘনাদ-বধ কাব্যের তুলনায় 'বৃত্রসংহার'-ই বেশি প্রশংসিত হয়েছে সে-কালে। হেমচন্দ্র যে বাংলার আধুনিক কাব্যধারার দু'টি প্রবাহ সম্বন্ধেই উৎসাহী ছিলেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সে বললে—তোমার মুখে এই যে দু'টি প্রবাহের উল্লেখ শোনা গেল, একথা শুনে কামিনী রায় সম্বন্ধে উজ্জ্বল-কুমার মজুমদারের সেই 'বাংলা কাব্যে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব' বইখানিতে যে দু'টি ধারার উল্লেখ দেখেছি, সে-কথা মনে পড়ে। মজুমদারমশাই কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) লেখাপড়ার কথা লিখেছেন—১৮৮০তে তিনি বেথুন ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; ১৮৮৩তে এফ-এ পরীক্ষায়; ১৮৮৬তে বি-এ পাশ করেন সংস্কৃত অনার্স নিয়ে। ১৩১৭ সালের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে প্রকাশিত—সম্ভবত স্বর্ণ-কুমারী দেবীর একটি প্রবন্ধ থেকে কামিনী রায় সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি তুলে দেওয়া হয়েছে যে,—তাঁর আদর্শ ছিল ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কবিতা। ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ১১ই জুলাই মন্মথনাথ ঘোষকে লেখা একটি চিঠি মজুমদারমশাই তাঁর ঐ আলোচনায় ব্যবহার করেছেন,—কিন্তু কে লিখেছিলেন, সেটা বোধ হয় আমারই মনে পড়ছে না অথবা উজ্জ্বলকুমারই উল্লেখ করেন নি; যাই হোক, সেই চিঠি কামিনী রায়েরই চিঠি বলে মনে হয়। তাতে বলা হয়েছিল—'রবীন্দ্রের অভ্যুদয়ের পূর্বে হেমচন্দ্র বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।' উজ্জ্বলকুমার বলেছেন, স্বর্ণকুমারী কামিনী রায়ের মধ্যে দুটি ধারা দেখে গেছেন,—এই দুটিকে স্বর্ণ-কুমারী নিজে আলাদা পৃথক ধারা বলে দেখিয়েছিলেন কি না, জানি না, তবে মজুমদারের ব্যাখ্যা আমার মনে আছে। তিনি লিখেছেন—

> স্বর্ণকুমারী দেবীর কথিত ইংরেজি আদর্শ হলো বিষাদময়তার ও বিশ্ব-প্রেমের রোমাণ্টিক আদর্শ এবং সংস্কৃত আদর্শ হলো বিষয়-বস্তুর ক্ষেত্রে সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্র গ্রহণ।

এক নিশ্বাসে এই কথাগুলি বলে ফেলে আনন্দ আমাকে জিজ্ঞেস করে-ছিল, হেমচন্দ্র সম্বন্ধে তুমি কি এই-রকম দু'টি ধারার চেতনা দেখতে পাও? তা যদি বলতে চাও তো আমাকে বলতেই হবে—এ দু'টিকে কোনোমতেই ধারা বলে ব্যাখ্যা করা চলবে না।

আমি বললুম—ও-দু'টি ধারা কি রকম,—কোথা থেকে শুরু হয়েছে, কোন্ কোন্ কবির রচনায় ব্যক্ত হয়েছে, সে-সব আমি বলতে পারি না, তবে কামিনী রায় যে আমাদের অন্যান্য মহিলা-কবিদের ধারাকেই প্রধানত অনু-করণ করেছেন এবং তাঁর সারা কর্ম-জীবনই যে অনুকরণে কেটেছে,—এ রকম ধারণা আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত ধারণা—এ-ধারণা আমি ব্যক্তিগতই রাখতে চাই। ও-নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই।

সে বললে—এটা ঠিক বই-বাছাইয়ের অনুকূল মেজাজ নয়। আলোচনা করতে হবে, তর্কও আসুক না—মহিলা-কবিদের বিষাদ আর হেমচন্দ্রের বা মধুসূদনের বা রবীন্দ্রনাথের বিষাদ সমগোত্রীয় কিনা, সেটাও দরকার-মতন ভেবে দেখা দরকার।

—কবিতায় মহিলাদের বিষাদ সম্বন্ধে আমার কী রকম যেন অ্যালার্জি আছে।

—কেন অ্যালার্জি?

—কারণ, সেসব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতা নয়।

আনন্দ বললে—উদাহরণ দাও দু-একটি।

আমি তখন ১২৯৭ সালে প্রকাশিত 'কবিতামালা' নামে একখানি বই থেকে 'পতিবিয়োগে' কবিতাটি আনন্দকে শোনাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু হাতের কাছে বইটি না থাকায় ১৩১৩ সালে প্রকাশিত সরোজা দেবীর 'দুঃখ-গাথা', ১৩০৮ সালে প্রকাশিত সরোজ-কুমারী দেবীর 'অশোকা', এবং ১০১২ সালে প্রকাশিত সুশীলাসুন্দরীর 'অশ্রু-মালিকা' থেকে কয়েক ছত্র পদ্য—যা আমার মুখস্থ ছিল, সে-সব শোনালুম কিছু কিছু।

আনন্দ বললে—পতিবিয়োগ, সন্তান-

এখানে

মনোরঞ্জন হাজরা

এ কোন্ রাখালিয়া মাঠ,
শিশিরের অশ্রুজলে ভেজা!
রামধনু মালাগাঁথা
বর্ণালী বিচিত্রা।
বুড়ো বট জটা খুলে
খতিয়ান নাড়ে—
প্রতিদিন পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণ,
ঘর্মাক্ত নির্যাস হেথা
প্রাতের শিশির!

এখানে দিনান্তে ঝরে
দিগন্তে পলাশ—
নির্মম রক্তের স্মৃতি
প্রাণের গভীরে।
তবুও ধানের ঢেউ
প্রত্যয়ের ছবি,
দীপকে বাজায় বাঁশি কোন্ সে রাখাল!
বুড়ো বট জটা নেড়ে
সাক্ষ্য দেয় তার।

বিয়োগ, সাংসারিক এবং পারিবারিক নানারকম উৎপাত বা ঝঞ্ঝাট যে তাঁদের জীবনের অকৃত্রিম ঘটনা, তা তো ঠিকই। কবিতায় সে-সব কথাই তাঁদের বলতেই হয়। কিন্তু অন্য কথাও কি তাঁরা বলেন নি? ১৮৯৭ সালে চুঁচুড়া থেকে বেরিয়েছিল বিনোদিনী দেবীর 'নীহার মালা' নামে একখানি কবিতার বই,—তার একটি কবিতার চার ছত্র আমার মনে আছে—

চমকে চেরেট বগী চলে ঘড় ঘড়।
দোতলার খড়খড়ি করে খড় খড়।
হুস্ হুস্ শব্দে চলে টানা পাখা
দড়ি।
ঢং ঢং বাজিতেছে গির্জার ঘড়ি।

অনেক দিন আগেকার চুঁচুড়ার একটি দুপুর যেন হঠাৎ স্বরূপে ফিরে আসে। এসব ছত্র দুর্বল বটে, কিন্তু দীন নয়।

হেমচন্দ্রের বিষাদবোধ স্থগিত রেখে, কামিনী রায়ের প্রসঙ্গ থেকে আনন্দ এইভাবে আমাদের মহিলা-কবিদের রচনার বিষয়বস্তু নিয়ে গভীর আলোচনায় উদ্যত হয়। আমি তাকে মূল প্রসঙ্গে ফেরবার তাগিদ দিতে থাকি। সে সেই অবস্থায় ফুলকুমারী গুপ্ত নামে এক মহিলার নাম করে। আমি এর আগে কখনোই সে-নামটি শুনি নি। আনন্দই জানায় যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে 'অবসর' নামে তাঁর একখানি কবিতার বই ছাপা হয়। ফুলকুমারী কানপুরে বাস করতেন। 'অশ্রুজল' নামে একটি কবিতায় তিনি লেখেন—

কে তোরে কহিল, তুই দুঃখীর
সম্বল
ওরে ও আনন্দপ্রদ নয়নের জল?
তুই ছেড়ে যাস যারে
দুঃখী সেই এ সংসারে;
রহিস যাহার চক্ষে
এ সংসার তারি পক্ষে
যথার্থই সুসময় আনন্দের স্থল
ওরে সর্বদুঃখহর নয়নের জল।

এই কয়েক ছত্র আবৃত্তি শেষ করে আনন্দ বললে—মেয়েদের দুঃখ বড়ো খাঁটি ব্যাপার! বিশেষত সেকালে যাঁরা এই দুঃখমাত্র সম্বল নিয়ে একটা আত্ম-প্রকাশের পথ চর্চা করে গেছেন, তাঁরা পুরুষ-কবির তুলনায় কম ছিলেন বলতে আমার মন কিছুতেই সায় দেয় না। কামিনী রায় তো সে তুলনায় অনেক ভাগ্যবতী ছিলেন। অনেক লেখাপড়া শিখেছিলেন তিনি। স্বর্ণ-কুমারীও সেই রকম। বরং ওঁদেরই দুঃখের ক্ষেত্র পৃথক। উজ্জ্বলকুমার কামিনী রায়ের মধ্যে যে রোমান্টিক বিষাদময়তার কথা তুলেছেন স্বর্ণকুমারীর প্রবন্ধ থেকে,—শুধু সেটা অনুসরণ করেই আমাদের মহিলা-কবিদের বিষাদ-ভাবনার একটা ধারা খোঁজবার চেষ্টা চলা মন্দ নয়। কিন্তু যাক এসব আনু-ষঙ্গিক চিন্তা,—হেমচন্দ্রের মধ্যে তুমি যে দুটি ধারার অনুবর্তনের কথা বল-ছিলে সে দুটির কথা শোনা যাক।

আমি বললুম—এক আসরে সব আলোচনা সম্ভব নয়, আনন্দ। আজ তুমি মহিলা-কবিদের বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়েছ। অতঃপর হেমচন্দ্রের প্রসঙ্গ ফিরিয়ে আনতে কি ভাল লাগবে?

—কেন? আমি কি বাধা দিয়েছি?

—না, না, তুমি বাধা দেবে কেন? কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনার ভঙ্গিই আজকাল কীরকম যেন হয়ে যাচ্ছে! বেশির ভাগই চর্বিতচর্বণ, সত্যিকার একটা অনু-সন্ধানী মন, সত্যিকার বিনয়, দরদ, পরিশ্রমের সামর্থ্য এবং প্রকাশের ক্ষমতা নিয়ে প্রস্তুত বলে কি মনে হয় তোমার?

আনন্দ বললে—গ্লানি এবং অবসাদ পরিত্যাগ করো বন্ধু। এ-দুর্ঘটনা পৃথিবীর স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। এর অনেক কারণ আছে। শিক্ষার মান নেই, দাম নেই,—কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামা-বার মাথা নয় তোমার—আমার। তুমি হেমচন্দ্রের কথা থেকে এ-কথায় এলে কেন?

—এলুম এই কথা ভাবতে ভাবতে যে, আমাদের উনিশ শতকের গৌণ কবিদের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ, নির্ভরযোগ্য একটিও গবেষণা-গ্রন্থ বেরোয় নি আজ পর্যন্ত। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—দুজনকেই লক্ষণীয় গৌণ কবি বলে আমার মনে হয়। গৌণ কবিরাও বিখ্যাত হতে পারেন। হেম, নবীন দুজনেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের কবি বিহারীলালকে, দ্বিজেন্দ্রনাথকে এবং আরও অনেককেই গৌণ কবি বলতে হয়। কাকে 'মুখ্য' বলব, কাকেই বা 'গৌণ' বলব, সেসব সূত্র আগেই ভেবে নেওয়া দরকার। তারপর গৌণ-কবিদের মধ্য দিয়ে জাতি মনের কবিত্বের কোন্ কোন্ প্রবণতা অনুশীলীত হয়েছে, সেটা আলোচ্য। হেমচন্দ্রের মধ্যে আমি সেই আমাদের জাতিগত প্রবণতার সুস্পষ্ট দুটি পৃথক ধারা দেখতে পাই। তাই তাঁর বই-বাছাই করতে হলে আমি বোধ হয় 'বৃত্রসংহার' আর 'কবিতাবলী'—এই দুটি নিয়েই আমার দায়িত্ব পালন করতে পারি। মহিলা-কবিদের বিষাদ বা এরকম অন্য কোনো প্রসঙ্গের কথা আমার মনে আসছে না এ-সূত্রে। কামিনী রায়ের কাছে হেমচন্দ্র ছিলেন সমকালের প্রিয় কবি। রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের আগে হেমচন্দ্রই ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি। এ সবই বেশ পরিচিত কথা। পরের আসরে আমরা এই দিকটা একটু খুঁটিয়ে দেখতে চাই।

আনন্দ বললে—তথাস্তু।

[ক্রমশ]

॥ পূর্ব-প্রকাশিতের পর ॥

॥ পনেরো ॥

শঙ্কর মাছের ল্যাজের তৈরি চাবুকটা সাত-আট বছর আগে কেনা হয়েছিল পুরীতে। এতকাল ওটা দেওয়ালেই শোভা পাচ্ছিল, কোনোদিন কাজে লাগতে পারে এ-রকম চিন্তাই কারো মনে জাগে নি। আজ উমা সেইটেই খুলে নিলে দেওয়াল থেকে। রাগে টকটক করছে মুখের রঙ, চোখের কপিশ তারা দুটো থেকে ছিটকে পড়ছে আগুন। দাঁতে দাঁত কিশকিশ করে হাঁপানো গলায় বললে, 'এই চাবুক দিয়ে পিঠের চামড়া তুলে নেব তোর। আই উইল স্কিন ইয়ু অ্যালাইভ!'

আতঙ্কে সিঁটিয়ে গিয়ে দেওয়ালের দিকে সরে যাচ্ছিল টিনটিন। বললে 'না'।

'খুন করে ফেলব তোকে নচ্ছার মেয়ে! ভেবেছো কী! বাইরে গিয়ে তুমি ড্রিংক করে—'

'বা-রে, কোথায় ড্রিংক করেছি? আমি তো একটু বীয়র ছাড়া—'

'একটু বীয়র! কী বলা হয়েছিল তোমায়? জাস্ট অকেজেনালী এক-আধটু বীয়র খাওয়ার পারমিশান দেওয়া হয়েছিল তোমায়, তার বদলে তুমি টিপ্সি হয়ে বাড়ি ফিরবে? এইটুকু মেয়ে—এর মধ্যে এত বখে গেছ তুমি? আজ তোকে খুন করে ফেলব।'

এবার দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল টিনটিন। মুখ ফ্যাকাশে, একটু-একটু কাঁপছে ঠোঁট দুটো। বাঘিনীর মতো এগোচ্ছিল উমা, চাবুকটা উঠে এল এবার।

'না, আমাকে কক্ষণো মারতে পারো না তুমি, কক্ষণো না—' হঠাৎ তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল টিনটিন।

আচমকা চিৎকারে উমা থমকে দাঁড়ালো।

'কেন মারব না, শুনি?'

'আমি তো গোড়াতে খেতে চাই নি—' টিনটিন অস্বাভাবিক জোর নিয়ে এল গলায়: 'তুমি আর বাপীই তো আমাকে ডিনারের পর পেগ দিয়েছ—বলেছ, এ-সব ম্যানার্স, সোসাইটিতে মিশতে গেলে এগুলো শিখতে হয়। এখন বুঝি সব দোষ আমার?'

উমা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার ভয়ের ছায়া তারই মুখে।

ছেলেমানুষ হলেও টিনটিন বুঝতে পারছিল, 'মাম্মী' একটু থমকেছে। তেমনি জোরের সঙ্গে বলে চলল, 'আমি তো খেতেই চাই নি, বিচ্ছিরি তেতো লাগত। তোমরাই তো শেখালে।'

উমা আবার জ্বলে উঠল: 'টেবল-ম্যানার্স শেখাতে চেয়েছি, মাতাল হতে বলেছি সেই জন্যে?'—উমা নিজের ম্যানার্স ভুলে গিয়ে বাঙালী মতে চিৎকার ছাড়ল একটা: 'হারামজাদা, বজ্জাত মেয়ে কোথাকার!'

'মাম্মী—ইয়ু আর সো ভাল্গার!'—টিনটিনের মুখে ঘৃণার চিহ্ন দেখা দিল।

'ভাল্গার!'—পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গিয়ে উমা গর্জন করল: 'ইয়ার্কি দেওয়া হচ্ছে আবার? আমি যদি আজ তোকে খুনই না করে ফেলি—'

'না!'—আবার টিনটিনের সেই অস্বাভাবিক জোরালো প্রতিবাদ: 'আমাকে তুমি মারতে পারবে না। আমাদের কিটেন ক্লাবে বীয়র ছাড়া আর কিছু দেয় না। সবাই-ই তো তাই খায়।'

'তা খায়। তুই কতটা খাস? ক' বোতল?'

'বেশি তো খাই না।'

'বেশি না খেলে নেশা হয়? এর মধ্যেই মাতাল হতে শিখেছ—গোল্লায় যাচ্ছ? আমি ভেবেছিলুম, তোকে আমি একটা আইডিয়াল মডার্ন গার্ল করে তুলব, আর তুই—'

শাং করে চাবুকের একটা জোরালো ঘা পড়ল টিনটিনের কাঁধের ওপর।

যন্ত্রণায় শিউরে উঠল টিনটিন, চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

'আমাকে মারলে তুমি, চাবুক মারলে আমায়? তুমি বীস্ট্—তুমি বীস্ট্। নিজের বেলায় মনে থাকে না? পার্টিতে গিয়ে তুমি মাতাল হও না? বাপী এক-একদিন বাইরে ডিনারের পর ক্রল করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে না? যত দোষ আমার বেলায়?'

উমা থরথর করে কাঁপতে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ল চাবুকটা।

'আমরা বড়োরা যা করব, তুইও তাই করবি?'

'কেন করব না? তোমরাই তো শিখিয়েছ।'

টলতে টলতে সরে এল উমা, ধপ করে বসে পড়ল সোফার ওপর। যেন পায়ের তলা থেকে মেঝেটা কেউ টেনে সরিয়ে নিয়েছে তার। ধরা গলায় বললে, 'শেষে তুই এত বড়ো কথা বলতে পারলি টিনটিন! এত করে তোকে ট্রেনিঙ দেবার চেষ্টা করলুম, আর তুই এইরকম বেয়াড়া আর নচ্ছার হয়ে গেলি! আয়্যাম রুইন্ড—আয়্যাম ক্রাশ্ড্—আমি সুইসাইড করব।'

দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল উমা। চাবুকের ঘায়ে তখনো গলার কাছটা জ্বালা করছিল টিনটিনের, কিন্তু মাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হতে দেখে জয়ের আনন্দের সঙ্গে এইবার একটু সহানুভূতিও বোধ হল তার।

আস্তে আস্তে সরে এল উমার কাছে।

'ও মাম্মী, ডোন্ট ব্রেক ইয়োর হার্ট! আচ্ছা, মাই ওয়ার্ড অব অনার—এর পর থেকে আমি খুব কম করে খাব। জাস্ট্ লাইক এ গুড্ গ্যাল। প্লীজ মাম্মী—

"দিলীপের মুখ থেকে খবরটা শুনে আমার যে কি আনন্দ হল! ওকে দুহাতে বুকে টেনে নিলাম। ও যথেষ্ট অনুশীলন করেছে, খেটেছে। তবুও বলবো এর জন্য যে-বাড়তি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন তার সবটুকুই ও পেয়েছে বোর্নভিটা থেকে। দুধের সঙ্গে মিশিয়ে বোর্নভিটা খেতে ও বরাবরই বড্ড ভালোবাসে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে ব'লে ওকে আমি নিয়মিত বোর্নভিটা খাওয়াই। তাই কি খেলাধুলায়, কি পড়াশুনায় সবদিকেই ছেলে আমার সমান চৌকশ।"
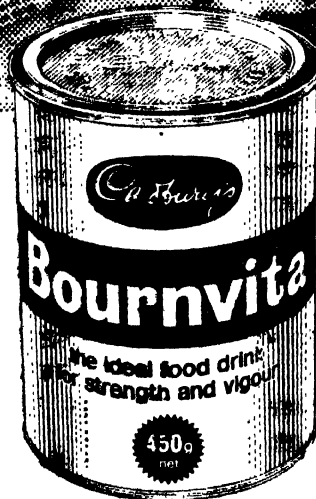
বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি— প্রাণোচ্ছল পানীয় জগতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ !

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

অমন করে কেঁদো না, আমার মনে ভারী কষ্ট হচ্ছে।'

পাকামো করে পিঠ চাপড়ে দেবার জন্যেই বোধ হয় হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, উমা একটা ঝট্‌কা মারল তার হাতে। আবার সেই ভাল্‌গার 'বাঙালী' গালাগাল দিয়ে বললে, 'দূর হয়ে যা হারামজাদী—দূর হয়ে যা সামনে থেকে। তোর আর মুখ দেখব না আমি। আসুক তোর বাপী, আর তোকে কলকাতায় রাখব না—হাজারীবাগের সেই স্কুলটায় ভর্তি করে দেব, মাদাররা কম্পাউন্ডের বাইরেও বেরুতে দেবে না! চলে যা আমার সামনে থেকে—চলে যা বলছি—! ও আয়্যাম রুইন্ড—আয়্যাম ক্রাশড্!'

টিনটিন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেন্ড। হাজারীবাগের সেই স্কুল! এর আগে মাম্মী আর বাপী মধ্যে মধ্যে এক-আধবার ঠাট্টা করেছে স্কুলটাকে নিয়ে। সে তো স্রেফ জেলখানা। সেখানে গিয়ে থাকতে হবে কলকাতা ছেড়ে, কিটেন ক্লাব ছেড়ে, ডনকে ছেড়ে! ওয়েল—ওয়েল, তা হলে মাম্মীর আগে তাকেই সুইসাইড করতে হবে!

'দাঁড়িয়ে রইলি কেন—দূর হ বলছি! তোকে হাজারীবাগে পাঠিয়ে তবে আমি নিশ্চিন্ত হব।'

'আমি যাব না হাজারীবাগে।'

উমা সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল, ব্যাপার বুঝে টিনটিন ছুটে পালিয়ে গেল পাশের ঘরে। উমা খুব সম্ভব আবার চাবুকটা কুড়িয়ে নিত, ঠিক এই সময় ডোর বেলটা বেজে উঠল।

মনীশ? উমা সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হল বিস্ফোরণের জন্যে। আজ স্বামীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে তার। সে-ই অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছে মেয়েকে। এখন দেখুক, এক ফোঁটা মেয়ে কিভাবে বখে যাচ্ছে, উদ্ধত হয়ে উঠছে, মুখের ওপর তুরুক্ জবাব দিয়ে বলছে, 'তোমরাই তো শিখিয়েছ আমাকে!' মনে মনে গাছ-কোমর বাঁধল উমা—একেবারে বাঘিনীর মতো।

আবার ডোর বেলে আওয়াজ। কিন্তু মনীশ? কই, গাড়ির শব্দ তো পাওয়া গেল না।

বাইরে থেকে বেয়ারা ডাকল: 'মেম-সায়েব?'

চোখ মুছে স্বাভাবিকভাবে উমা বলতে চেষ্টা করল: 'কে এসেছে?'

'ছোট মামা।'

তার মানে টুলু। উমা বললে 'একটু বসতে বল্—আমি আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই টুলুর সামনে যাওয়া যায় না এখন। এতক্ষণ রাগারাগি আর কান্নাকাটি করে নিশ্চয় মুখ-চোখের চেহারাটা ভারী বিশ্রী হয়ে আছে।

'বসতে বল্ ছোটমামাকে, আমি আসছি।'

খবর সামান্যই দেবার ছিল। অফিস থেকে বেরুবার মুখে মনীশদার সঙ্গে দেখা। গাড়ি করে বেরুচ্ছিল। বললে, 'ভালোই হল টুলু। বাড়ির টেলিফোন লাইনটা খারাপ, অনেক চেষ্টা করেও কানেকশান পাচ্ছি না। তুই একটা খবর দিবি। জরুরি একটা ট্রান্‌জ্যাকশানের কাজে আমাকে এক্ষুণি যেতে হচ্ছে দমদমে। ফিরতে রাত হবে। যাওয়ার পথে তোর দিদিকে একবার বলে যাস।'

বলবার ছিল এইটুকুই। কিন্তু আজ আর দিদি বসতে বলল না তেমন করে। কি রকম গম্ভীর আর অন্যমনস্ক হয়ে আছে। একবার কেবল আলতোভাবে জিজ্ঞেস করল: 'চা খাবি একটু?'

'থাক এখন। বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আচ্ছা।'

টুলু পথে বেরিয়ে এল। রাস্তায় হাওয়া। গাছের পাতার শব্দ। ওপাশ দিয়ে ওরা সব জোড় বেঁধে ঢুকছে লেকের দিকে। সাদার্ণ অ্যাভিন্যুর এদিকটায় বড়ো বড়ো বাড়ি আর ছায়ার শান্তি। দু'-চারজন লোকের চলাফেরা। কেবল কালী-বাড়িটার সামনে বিরাট ভিড়। দল বেঁধে মেয়ে-পুরুষেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। কোন্ এক সিদ্ধপুরুষ নাকি ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেন ওখানে।

সেও যাবে নাকি একবার? নিজের ভাগ্যটা গণিয়ে আসবে?

দূর—বাজে কথা ওসব। কোনো মানে হয় না। টুলুর মন ছটফট করে উঠল একবার। কিছুই হচ্ছে না, কিছুই করা যাচ্ছে না। কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া কবে যে হবে! অ্যাটর্নি অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় মেরুদণ্ডটা যেন ভেঙে যেতে চায়। দাদাই ঠিক বলেছিল। তাড়াতাড়ি করে কিছুই—কিন্তু বুড়ো হেড ক্লার্কটাকে কিছুতেই সহ্য করা যাচ্ছে না। এক-একদিন মেরে বসতে ইচ্ছে হয় বুড়োকে।

লেকের দিক থেকে হাওয়া, ছায়া, পাতার শব্দ, মধ্যে মধ্যে মাথার ওপরে ঝরে-পড়া ফুলের পাপড়ি—এরই ভেতরে ক্লান্ত শরীর ডুবিয়ে হেঁটে চলছিল প্রতুল: আরো একটা চাপা অস্বস্তি। সন্ধ্যার পরে, এই দিকটা দিয়ে হাঁটতে গেলেই চাড়া দিয়ে ওঠে সেটা। মাণিক বলছিল, ফণী আর কার্তিক—

মিথ্যে—সব মিথ্যে। গৌরবাবু দারোগার কাছে কারো নামে একটা কথাও বলে নি সে। বোমার খোঁজ কোথা থেকে পেয়েছে পুলিশই জানে। ওদের আর কী—মাথা মোটা ইডিয়ট সব—যে হোক কাউকে সন্দেহ করতে পারলেই হ'ল। টুলুর মাথার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল। শয়তানের সঙ্গই এইরকম—একবার তার জালে জড়িয়ে গেলে তার হাত থেকে বুঝি আর নিস্তার মেলে না।

একটি ছোটখাটো চেহারার মেয়ে তার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছিল, ছাড়া ছাড়া আলো-ছায়ায় প্রতুল লক্ষ্য করে নি তাকে। সে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। একবার দ্বিধা করল, একবার ভাবল থাক, তারপর ছোট্ট করে ডাকল: 'টুলুদা!'

তৎক্ষণাৎ থেমে গেল প্রতুল। পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেল।

স্বপ্না পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে।

'টুলুদা, চিনতে পারছ না?'

ফণী নয়, কার্তিক নয়, ছোরা হাতে কোন বিভীষিকা নয়—তার চাইতেও বড় আতঙ্ক। এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা না হলেই সবচেয়ে সুখী হত সে।

সহজ, স্বাভাবিক গলায় স্বপ্না বললে, 'কী, কথা বলবে না নাকি?'

এতক্ষণে, জোর করে হাসতে চেষ্টা করল প্রতুল।

'মানে, অন্ধকারে—ঠিক চিনতে পারি নি।'

'কিংবা চিনতে চাও না?'

'না—না—মানে আমি—'

'কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই—' স্বপ্না বিষণ্ণভাবে হাসল: 'তুমি তো ভুলে যেতেই চাও। আমিই পেছন থেকে ডেকে তোমাকে বিরক্ত করলাম।'

'স্বপ্না, তুমি জানো না—' অস্পষ্টভাবে প্রতুল বলবার চেষ্টা করল: 'মানে, তোমার কাছে আমার মুখ দেখাতে লজ্জা করে। একদিন তুমি আমার জন্যে—অথচ আমি—'

'কেন বিব্রত হচ্ছ টুলুদা?'—স্বপ্না স্নিগ্ধ গলায় বললে, 'তোমায় কিছু বলতে হবে না। এখন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছ—না? খুব ক্লান্ত?'

'আমি অফিসে চাকরি করছি, তুমি জানো?'—হঠাৎ যেন পায়ের তলায় মাটি পেলো প্রতুল। আত্মবিশ্বাস নিয়ে দাঁড়া-বার মতো একটু জায়গা। তা হলে স্বপ্নাও জানে যে সে এখন বদলে যাচ্ছে, সে আর অপদার্থ একটা মস্তান নয়!

স্বপ্না বললে, 'শুনেছি। সেদিন বাবা এসেছিলেন তোমাদের বাড়িতে, তিনিই বললেন ফিরে গিয়ে।'

'আমি সেদিন জ্যাঠামশাইয়ের সামনে যেতে পারি নি। সাহস হয় নি আমার।'

'বাবাকে তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি। বাবা যে কতখানি ক্ষমা করতে পারেন,

[শেষাংশ ২৯ পৃষ্ঠায়]

মহারাজ সন্দর্শনে

রজত রায়চৌধুরী

সকাল থেকেই দলে দলে সবাই আসছেন। সবার মুখেই একই প্রশ্ন। কখন তিনি আসবেন? আর যাঁরা আসছেন, তাঁরাই বা কারা। প্রায় সকলেই বৃদ্ধ। মাথার চুলে সবার পাক ধরেছে অনেকদিন আগে। রুগ্ন দেহ কারুর। তবু তাঁরা আসছেন। ডাক্তারের নিষেধ চলাফেরার—এ নিষেধ আজ তাঁরা অনেকেই মানেন নি। ২৭শে জুনের সূর্যকে মাথায় নিয়ে শহরতলীর দক্ষিণ প্রান্তের সেই শ্বেতগৃহটির প্রশস্ত কক্ষে তাঁরা হাজির হয়েছেন। একবার মহারাজকে দেখবেন বলে। তাঁদের প্রিয় মহারাজ। যিনি দেশ বিভক্ত হবার পরে এই সর্বপ্রথম এসেছেন ভারতে।

মহারাজ এসেছেন। প্রাক্-স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদারদের বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। অনুশীলন ভবনের সর্বত্র সেই পরম প্রীতিস্পর্শের চিহ্ন। যেন সুদীর্ঘকাল পরে পরম প্রিয় মানুষকে পেয়েছেন সহযোগী ও ভক্তবৃন্দ। সবার মুখেই 'মহারাজ', মহারাজ।

কত বয়স হল মহারাজের? তা প্রায় একাশি। স্বভাবতই দেহ এখন জীর্ণ, চোখের দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীয়মাণ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ—কিন্তু মনের সেই দুর্জয় সংকল্প আজও অটুট। সুদৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি স্বীয় মতামত প্রকাশে আগেকার মতনই নির্ভীক। সেই কথাই ব্যক্ত করলেন তিনি। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী। আগামী নির্বাচনের ওপর নির্ভর করছে তার সমস্ত কিছু। মহারাজ একটু থেমে বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক সংগ্রাম আমি দেখেছি। অনেক সংগ্রামের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ও আছে—আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, পূর্ব বাংলায় সরকারী শাসকবর্গের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তরুণ ছাত্রসমাজ যে আন্দোলন করেছে তা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের যে কোন বড় আন্দোলনের সমগোত্রীয়। এই প্রগতিশীল ছাত্রসমাজের ওপর আমি আশা রাখি। এরাই পাকিস্তানের ভরসা। এরাই পাকিস্তানে প্রগতির ধারক হবে—এ বিশ্বাস আমার আছে। মহারাজ বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ পূর্ব বাংলার ওপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করতে সর্বরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারী নীতিনিয়ম এমনভাবে তৈরি হচ্ছে, যা সুযোগমতন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। বাঙালী মুসলমানদের সমস্ত দাবিকে নস্যাৎ করবার জন্য এখন বহু পরিমাণে পশ্চিমা মুসলমানদের পূর্ব বাংলায় বসবাস করবার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। কিন্তু, সে সব চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই। সেই ক্ষীণ কণ্ঠস্বর উত্তেজিত হল। চোখের দৃষ্টি স্থির। বললেন, প্রভিন্সিয়াল অটোনমির দাবি আমরা করেছি। তা আমাদের অধিকার করতেই হবে, না হলে চরম দুর্ভাগ্য নেমে আসবে পূর্ব পাকিস্তানে।

আবার দলে দলে উদ্বাস্তু আসছে কেন ভিটেমাটি ছেড়ে—এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য মহারাজ যেন তৈরি হয়েই ছিলেন। বললেন, ঠিক। দাঙ্গা হয় নি—তবু কেন মানুষ সব ছেড়ে চলে আসছে। এর মূলেও পশ্চিমা মুসলমানদের হাত রয়েছে, আর রয়েছে সরকারী নিয়মকানুন এবং সরকার পক্ষের পক্ষপাতমূলক আচরণ ও বিচারব্যবস্থা। আগেই বলেছি, নতুন চলে আসা মানুষদের পরিত্যক্ত স্থানে পশ্চিমা মুসলমানদের বসবাস করবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। জনসংখ্যা যদি পশ্চিমা মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় বাড়াতে পারে—তবেই তাদের কায়েমী স্বার্থ চিরকালের মতন বজায় রাখা সম্ভব হবে।

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় ঢাকার চিঠি প্রকাশ করা গেল না, এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যা থেকে চিঠিটি যথারীতি প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

সাপ্তাহিক বসুমতীর একুশে ফেব্রুয়ারী সংখ্যাটি দেখতে দেখতে প্রদীপ্ত হল মহারাজের মুখমণ্ডল। এমন আন্দোলন যে দেশের তরুণদল করতে পারে, সে দেশের যুব-গণশক্তির জয় হবেই। ভাষা নিয়ে এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার সমস্ত ছাত্রসমাজকে একটি বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের পতাকাতলে সমবেত করিয়ে দিয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকেই সংস্কৃতির নব রূপান্তর হচ্ছে পূর্ব বাংলায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দু' বাংলার। এ বিচ্ছিন্নতা থাকবে না। মুছে যাবে একদিন সাংস্কৃতিক অভিন্নতার জন্য।

কেমন লাগছে ভারতে এসে? শুনে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে দ্বিধা করেছেন মহারাজ। বলেছেন, আমি পাকিস্তানের নাগরিক। পাকিস্তানের সমস্যাই আমার চিন্তার সর্বস্তরে কেন্দ্রীভূত। তবে মনে হয়, যা শুনি, তাতেই এই ধারণা জন্মেছে, দুর্নীতি ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল। তার মূলোচ্ছেদ দরকার। আর দরকার, একটু থেমে, আস্তে আস্তে, অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে বলেছেন, একটা চরিত্র গড়ে তোলার। জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠলেই সমস্ত দুর্বলতার অবসান হবে।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যাঁর জীবনের তিরিশ বছর কারাগারের নির্জন কক্ষে কেটেছে। তিনি আজীবন ভালবেসেছেন সত্যকে। তিনিই তো বলতে পারেন, "সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম।" কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি কখনও পিছু হটেন নি, ভয় পান নি, নিরাশায় পীড়িত হন নি। কঠিন সত্যকে যিনি ভালবেসেছেন, তিনিই জানেন, অনেক কিছুকে বিসর্জন দিলে তবে সত্যের সাধক হওয়া যায়। লোভ, মোহ, খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা, অর্থ—এ সব তার প্রতিবন্ধক। তাই দেখলাম, অনুশীলন ভবনের সর্বত্র, হলঘরে, বারান্দায়, উঠানে, পথে—অগণ্য মানুষের ভিড়। আজ তাঁরা নেপথ্যে রয়েছেন, একদিন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা নিঃসঙ্কোচে জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন—তাঁরা মহারাজকে দেখতে এসেছেন—চোখের দেখা। গণ্যমান্যরাও এসেছেন, শ্রীভূপেশ গুপ্ত এম-পি এসেছেন। এসেছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশ মজুমদার ও আরো অনেকে।

অনুশীলন ভবনের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীসত্য ঘটক বললেন, আজ বড় আনন্দের দিন। মহারাজের দুর্বল শরীর। তবু তিনি তাঁর মতামত সবার কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। সবাই আশঙ্কা করছেন হয়তো আবার তাঁকে কারাগারে যেতে হবে। কিন্তু মহারাজ যে ভয়হীন। সত্য যাঁর মর্মমূলে, তাঁকে আটকাবে কে?

পথে বিপথে

মনসুর আলি যখন মিছিলের সঙ্গে কইলক্যাতার উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিল তখন আমিনা বিবি হয়ত দাওয়ায় দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় চোখভরে দেখে নিয়েছে তার জোয়ান মরদ শরীরটাকে। কইলক্যাতা, বাপস্রে বাপস্, সে দূর কত্ত গো!

মনসুরের দলে কেউ হয়ত গুনগুনিয়ে গানও ধরেছে টপটপিয়ে ছোলা সেদ্ধ মুখে ফেলতে ফেলতেঃ

চল টেঁপীর মা হাঁমরা দুজনা
ঘুইরা আসি কইলক্যাতা,
রেল গাড়িত চৈড়া,
যেইব দৌড়া,
মনে সাধ ছিল বড়াই।

কে কার সাধ কেমনভাবে পূরণ করেছিল কে জানে। তবে মনসুরের বিচিত্র সাধপূরণের জন্য রাধাবল্লভ তো বটেই, তার গোটা পার্টি অফিস পর্যন্ত তোলপাড় হয়ে গেছে। তিন দিন তিন রাত, কমরেড-দের কানে টেলিফোন। রাধার পায়ে ফোস্কা।

হাওড়া পার্কে সমাবেশ। দূর-দূরান্তের মানুষ গ্রামগঞ্জ খুঁটে খুঁটে ট্রেনে ট্রাকে শহর জাগাতে এসেছে। রাধাবল্লভ মালদার ক্যাম্প-লীডার। মনসুর তার পার্টির পতাকা সেবক। এসেছে মালদা থেকে রাধার তত্ত্বাবধানে। মিটিং শেষ হল, মিছিল ক্যাম্প অফিসে এসে বিশৃঙ্খল হ'ল। রুটি গুড়ের আপ্যায়ন হল সারা। তখন লিস্টি মিলিয়ে আমদানীকৃত শ্রমিক-কৃষাণ যথাযোগ্য স্থানে ফেরৎ পাঠানোর দায়িত্ব স্ব স্ব এলাকার কমরেডদের। মালদার হিসেব কিন্তু মিলল না। মনসুর নিখোঁজ। রাধার মাথায় হাত। মনসুরের দলবলে হা-হুতাশ।

ঃ হা রাধাবাবু, হাগেমাগে মনসুর আলি কোনঠে গেলো গো! উঁয়ার বেটিছাওয়াকে (বৌ) কী কহিমু হাঁমরা? ভরজোয়ানী নয়া বৌ! ইটটা কেমন হল গো!

ঃ না হে, ভেবো না! আশ্বাস দেয় পার্টি অফিস।

ঃ তোমরা ঘরের পথ ধর। সুবিমলবাবুর সঙ্গেই যাও। রাধাবাবু রইল, মনসুরকে ঠিকই খুঁজে বার করা হবে। খবরটা বরং দুদিন চেপে রেখো। থানায় থানায় সংবাদ দিয়েছি আমরা।

কিন্তু শুধু থানার ওপর বিশ্বাস কি! কাজ বাড়ল রাধাবল্লভের। নাওয়া খাওয়া শিকেয় তুলে মনসুরের খোঁজে দিবারাত্র ঘর্মাক্ত দৌড়োদৌড়ি। বাড়িতে শ্রীমতীর মুখ ভার। 'কেন যে এসব দায়িত্বে থাকো'। আর কেন! সব কেনর জবাব কি শ্রীমতীরা সঠিক ধরতে পারে? মালদার সেই গ্রামে এরপর রাধাবল্লভ কি আর সহজভাবে প্রবেশ করতে পারবে? বত্রিশ বছরের জোয়ান মনসুরকে ফিরিয়ে দিতেই হবে তার ভরজোয়ানী নয়া বৌ'র বাহুডোরে। মনসুরের ওপর বিরক্তিতে সমস্ত মনটা টাটিয়ে থাকে রাধাবল্লভের। বত্রিশ বছরের জোয়ান মরদ, মিছিল থেকে খসে গেল? বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শিশু-নারী শ্লোগানে মুখর হয়ে এ'লো আবার হৈ হৈ করে, যে যার ঘরে ফিরেও গেল, আর সবচেয়ে চনমনে মনসুরই বাধিয়ে বসল এই কান্ডটা! পার্টির কাছেও এ কী কম বেইজ্জৎ! মিছিল তো একটা নয়, আসছিল ভাঙা ভাঙা ছোট ছোট একাধিক। ব্রিজ পেরিয়ে বড়বাজারের মুখে নামলেও হুগলী নদীর ওপার থেকে পতাকার নিশানা দেখেই চলে আসা যায়। মনসুর যথেষ্ট সুস্থ ছিল তো?

কেউ কেউ বললেনঃ কলকাতা বড় শক্ত ঠাঁই। দিনেদুপুরে ডাঁশা মেয়ে-মরদ চুরি হয়ে যায় এখানে। মানুষ চালানি কারবার পৃথিবী জুড়ে অফিস সাজিয়ে জাঁকিয়ে আছে। দেখো, মনসুর আলিকে স্লেভ ক্যাম্পে চালান করল কিনা এমনতর কোনো কসাই বিজনেস পার্টি।

এসব দুর্ভাবনা অবশ্য অন্যের নয়। গ্রামদেশ থেকে আসা কর্তাব্যক্তিগোছের মানুষদেরই এ চিন্তা। কিন্তু দুর্বল মুহূর্তে কুচিন্তাও কম কাহিল করে না। রাধা প্রায় নির্ঘুম।

অবশেষে চতুর্থ দিনের মাথায় রাধার ডাক পড়ল পার্টি অফিসে। প্রত্যেক সিঁড়ির পদক্ষেপ যেন তার বুকের ওপর বাজছিল। সিঁড়ি পেরিয়ে হলঘর। লম্বা টেবিল ঘিরে জনকয় ফাইল গাঁথা দিনের সংবাদপত্র বুকের কাছে 'বুক' করে হলের এক কোণে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে রাধা থমকে দাঁড়াল। ঐ তো মনসুর। নির্লজ্জের মতো দাঁত ছরকুটে হাসছে। তেরাত্তির হয়ত তার দন্তমার্জনার সুযোগও ঘটে নি।

রাধা এগিয়ে গেল ধীর পায়ে ঃ কোনঠে ছিলি মনসুর?

মনসুরের কণ্ঠতালু-জিহ্বা-ওষ্ঠ-দন্তই শুধু নয়, কথা কয় সর্বাঙ্গ। ঝাঁকি দিয়ে মাথা নেড়ে সোৎসাহে কৃতী পুরুষের মতো চোখ বড় বড় করে বলে উঠল সেঃ এ্যা রাধাবাবু, ইরে বাপরে, এ্যাতা বড় শহর কইলক্যাতা—আ! ...বোঝা গেল, মনসুর এতোক্ষণ অফিসসুদ্ধ লোককে নতুন করে কইলক্যাতা-দর্শনই করাচ্ছিল। সেই রেশ টেনেই সে তার পূর্ণ উৎসাহ পুনশ্চ প্রকাশ করল দেশের মানুষকে কাছে পেয়েঃ বুঝলেন না রাধাবাবু, হামি খুব ঘুরন্‌। ইরে বাপ রে, এ্যাতা গাড়ি! আচ্ছা রাধাবাবু, এ্যাতা গাড়ি কোনঠে থেকে আসছে আর য্যাইছে। বা-আ-প-রে বা-প, বুক হামার ধড়াস ধড়াস, ধড়াস ধড়াস।

ধমক দিল রাধা। রাগও হচ্ছে। ফিরে পাওয়ার স্বস্তিও মনটাকে প্রফুল্ল করছে। সুতরাং ধমকের মধ্যেও কেমন একটা স্নেহের প্রশ্রয় ঃ এ্যাই মনসুর, কোনঠে ছিলি এ্যাতাদিন?

ঃ ক্যানে? রাস্তায়। খুব ঘুরন্‌ গো রাধাবাবু। বাপস্ রে, রাতের আঁধারে আসমান আলায় আলায় আলো। জ্বলছে আর নিভছে, জ্বলছে আর ..

ঃ মিছিল ছেড়ে চলে গেলি কেন?

ঃ হাওড়া বিরিজ, শালা! বাপরে বাপ, এ্যাতা বড়। দেখতে দেখতে হাঁমি শালা থোইকা গেনু। হাঁমার মিছিল যে কোনঠে গেলো, বুঝলেন না রাধাবাবু, হাঁমি আর পানু না। হাঁ, একটা বিরিজও করেছে বটে! কেমনে যে করল! মনসুর চিন্তিতমুখে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে তারিফের ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেঃ আরে বাপরে, কত্‌ত জিনিস, গোল গোল। তবে, বুঝলেন না রাধাবাবু, খু-উ-ব বুদ্ধি আছে। যে করেছে না, উঁয়ার খুব বুদ্ধি আছে। আর বাড়ি বটে! হাঁমার তো মাথা ভিরমি যায়। শ্যাষে হাঁমি মাঠে শুইতা (শুয়ে) গেছি (পড়লাম)। শুইতা শুইতা বাড়িগুলা দেখছি। বাপ রে, উ সব বড়া বাড়িত কাঁয় (কারা) থাকে গো! হুঁই আসমানের উপর ঘর...শালা উঠছে কেমুন করে?

মনসুরের দার্শনিকতায় বাধা দেওয়ার মেজাজ তখন আর কারো নেই। তার দেশওয়ালী টানে বড় মিষ্টি শোনাচ্ছিল শহর কলকাতার রূপ বর্ণনা।

সুতরাং প্রশ্ন হলঃ আর কি দেখলে হে কর্তা?

ঃ দেখনু? বড়া আজব শহর আছে বটে। এ্যাতা মেম? হ্যাঁ রাধাবাবু, এ্যাতা কালা মেম কোনঠে আইছে? বোঁটছাওয়া সব পেন্‌ট পহরে? তবে যা ই বলেন ক্যানে, দেখতে শালা বড়া মজা! বাপ রে, খটোখট আইছে আর যেইছে।

অতঃপর থামানো দরকার মনসুরকে। রাধা ধমকে বললে ঃ তা রাস্তা চিনে এলি কী করে আবার?

ঃ বড়া ঘুরন্‌ গো রাধাবাবু। খু-উ-ব কষ্ট হ্যাছে।

বাস্তবিক কষ্ট তার হবারই কথা। আসবার সময় মনসুরের চাচা সাবধান করে বলেছিল, খবরদার, মনসুর যেন পথ হারালে সেকথা কোন অচেনা মানুষকে জানতে না দেয়। কইলক্যাতার পথে পথে ঠগ-জোচ্চোর সব ওৎ পেতে থাকে। হারানো গ্রাম্য মানুষের গন্ধ পেলে এক গ্রাসে নিভাঁজ হজম করে ফেলবে মনসুরকে। বরং মনসুর তো কিছু ইংলিশ-বাংলা বানান করে পড়তে পারে। রাস্তার নাম আর দোকানের সাইনবোর্ড পড়ে সে যেন নিজেই হারানো বায়গা খুঁজে নিতে চেষ্টা করে। আর চাচার নির্দেশ পালন করতে গিয়েই মনসুর দিনরাত পথে পথেই রয়ে গেছে। কলকাতার পথঘাট এখন নাম-সমস্যায় দ্বিজ। এক রাস্তার একই সঙ্গে দুই নাম। মহাত্মা গান্ধীই মিঃ হ্যারিসন, মিঃ গ্রে-ই ঋষি অরবিন্দ, কর্নওয়ালিশই বিধানচন্দ্র, সার্কুলার রোডে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আর স্যর জগদীশচন্দ্র। এক জায়গায় লেনিন সরণী লেখা থাকলেও বাকি জায়গায় ধর্মতলা। বেচারী মনসুর দিশে-হারা। পূব থেকে উত্তর হয়ে পশ্চিমে গিয়ে দক্ষিণে নেমে মধ্যে দাঁড়িয়ে হতাশ। শেষে বুদ্ধি করে পার্টি অফিসের নাম করতে কোনও সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে 'সঠিক জায়গায়' এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

মনসুরের জবানীতে ঃ আরে বাপ রে বাপ, এইঠে এক আজব শহর বটে রাধা-বাবু! রাস্তার ইদিকে এক নাম তো উদিকে আব এক নাম। ই রাস্তায় পর পর তিনটে বাড়ি, বোঝলেন কি না রাধা-বাবু, ফেন (আবার) শালা উ রাস্তার নাম পাইছি চার লম্বর বাড়িতে। শালা, চুনতে চুনতে...হাঁ, কপালে জোর করাঘাত করে মনসুর শেষ করে ঃ শ্যাষে পানু গো। গাঙ্গুলী পানু। হাঁ, বোঝলেন কিনা রাধাবাবু, হাঁমিও খু-উ-ব রুখে গেছনু কিনা। হাঁমিও লিখাপড়া জানা মানুষ! খুউব রুখে গেছনু, হাঁ!

ঃ বড়া বুদ্ধিমান রে তুই মনসুর! রাধা তারিফ করতে জনৈক কমরেড একটা সিগারেট বাড়িয়ে ধরে বললেন ঃ নাও হে কমরেড ধরাও একটা। এখন মনের সুখে খেয়ে দেয়ে গান গেয়ে রাধাবাবুর সঙ্গে মালদা চলে যাও।

ঃ গান?

মনসুরের ক্লান্ত চোখ বুজে আসে। সিগারেটে হুস করে এক টান দিয়ে গুন-গুনিয়ে আপন মনে গান ভাঁজে সে ঃ

বিবিজান বিবিজান অরে বিবিজান,
ছমাস থেইক্কা তোকে না দেইখ্খা
ধরে না হাঁমার মন।
বিবিজান অরে বিবিজান!!

হেঁদি পেঁদি লোক নইত হাঁমি, গাঁয়ের হেডমাস্টার, দশটা থেইকা পাঁচটা ডিউটি, তিরিশ টাকা বে-থন!!

রাধা তখন জনৈককে বলছিল ঃ বাস্তবিক, রাস্তার নাম পাল্টাল, কিন্তু এমন একটা নির্দেশ থাকল না যে নতুন নামেই সকলকে ঠিকানা পাল্টে দিতে হবে।

সাহিত্যে বৃহৎ কর্মকাণ্ড :

'হর্ষ-বিষাদ' বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। ওর অর্থ যে কি তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'ভারতকোষ' চতুর্থ খণ্ডটি হাতে পেয়ে উপলব্ধি করা গেল। আমি এর রেজিস্টার্ড গ্রাহক। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহ যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মতো একটি পবিত্র সংস্থার প্রতি গভীর আস্থা নিয়েই আমার অত্যন্ত কষ্টার্জিত টাকা অগ্রিম গচ্ছিত রাখি এই নিশ্চিত প্রত্যাশায় যে, বহু জ্ঞান-তপস্বীর সাধনালব্ধ ফল পাব এবং এমন একটি জিনিস রক্ষা করতে পারলে আমার উত্তরপুরুষদের সম্পদ হবে।

কিন্তু লক্ষ্য করে আসছি এর সূচনাকাল থেকে এই পরিকল্পনাটি যেন অভিশপ্ত। পরিষদের নিজস্ব অর্থ-সঙ্গতি নেই। নিজের টাকায় এটি সম্পন্ন করা সম্ভব তখনো ছিল না, আজও নেই। অনুমান করছি, উদ্যোক্তাদের এই ভরসা ছিল যে, মহৎ কাজে অর্থাভাব হয় না। কিন্তু বাস্তবজগতে এ কথা সম্ভবত একমাত্র বিড়লা মহোদয়রাই বলতে পারেন এবং অঢেল অর্থবলে লক্ষ্মী-তথা-বিড়লা মন্দির গড়তে পারেন। সৌষ্ঠবে, সৌকর্যে, রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি থাকবে না, আরব্ধ কাজ অসমাপ্তও থাকবে না।

অথচ আদর্শের পেছনে যাঁরা ছোটেন এবং ঐ কথায় সান্ত্বনা পান, তাঁদের সম্পন্ন-অসম্পন্ন কাজ তোলাদণ্ডে তুললে দেখা যাব, ব্যর্থতা বা অসম্পূর্ণতার পাল্লাটাই ভারী। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন, এত বড় একটা মহৎ কাজে গণভোটে শাসনাধিষ্ঠিত রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার মুক্তহস্তে দান করবেন এবং এ কাজ কিছুতেই ব্যর্থ হবে না। সেদিক থেকে তাঁরা যে একেবারেই নিরাশ হয়েছেন তা বলা যায় না; কিন্তু কাজটা যে কতবড় হয় উদ্যোক্তাদের সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না, নতুবা রাজ্য-কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান সম্পর্কে একটা মাত্রাতিরিক্ত আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালীরা যে অব্যবসায়িক, কোনো পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত বেড় পায় না, একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যয়বরাদ্দও প্রস্তুত করতে পারে না, বহুক্ষেত্রের মতো এ ক্ষেত্রেও তা প্রতিপন্ন হ'ল। আরম্ভ যেমন আড়ম্বর ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে হয়, তার শেষ রক্ষা হয় না। প্রস্তুতির ত্রুটি এর একটা মূল কারণ।

ভারতকোষের আরম্ভ হয় ১৯৫৮-'৫৯-এ। পরিকল্পনা ছিল চার খণ্ডে সমস্ত বিষয় পরিব্যাপ্ত এবং সম্পূর্ণ হবে। এখন দেখা যাচ্ছে, চতুর্থ খণ্ডে 'ফ' অক্ষরের বেশি এগোনো গেল না। পঞ্চম খণ্ডের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আশা করব, তাও একদিন হবে, কেন না, একদল উদ্যোক্তার প্রাণপাত পরিশ্রমের কার্পণ্য নেই, কারও কারও ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তবু এর সমাপন এক অনিশ্চয়তা ও সংকটের আবর্তে পড়েছে।

তার একটা লক্ষণ এই চতুর্থ খণ্ড। দীর্ঘ প্রতীক্ষা, অপরিমেয় বিরক্তি, নৈরাশ্য, সংশয়ের পর যখন সর্বপ্রথম ভারতকোষের প্রথম খণ্ডটি পেলাম, স্বীকার করব, ওর ভেতরের বিষয়বস্তু কিছুমাত্র বিচার-বিবেচনার আগেই প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলাম। ৬৬৯ পৃষ্ঠার প্রথম খণ্ডটির ছাপা, বাঁধাই, সম্পাদনার যত্ন ও সজ্জার মন খুশি হয়েছিল। প্রথম খণ্ড ছিল 'ঊ' অক্ষর পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্য আবার দীর্ঘ বিরতি। 'ক' অক্ষর পর্যন্ত। এর ছাপা ও অঙ্গসৌষ্ঠবেও অভিযোগের কারণ ঘটে নি: পৃষ্ঠা সংখ্যা কিছু কম; ৫১১; সম্ভবত উৎকণ্ঠিত গ্রাহকদের অসন্তোষ প্রশমনের জন্যই কিছু ক্ষীণ কলেবরেই ওর প্রকাশন ত্বরান্বিত হয়ে থাকবে। তৃতীয় খণ্ডটি বৃহত্তম। বলা উচিত ছিল 'এযাবৎ বৃহত্তম'; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭৬; কিন্তু চতুর্থ খণ্ডের দশা দেখে ভরসা পাই নে, তৃতীয় খণ্ডের চাইতে বড় বা বৃহত্তর আর কোন খণ্ড হবে। বিশেষ করে ভারতকোষ পরিচালন ব্যয় ব্যবস্থার যে দুর্গতির কথা শুনছি, তাতে চতুর্থ খণ্ডের অবনতির নিরসন পঞ্চম খণ্ডে হতেও বা পারে এতবড় প্রচণ্ড আশাবাদী আমি নই।

চতুর্থ খণ্ডটি পাওয়া গেল এই আমার হর্ষের কারণ; কিন্তু যেভাবে পাওয়া গেল, তাই বিষাদের কারণ। চতুর্থ খণ্ড ছেড়ে পঞ্চম খণ্ডে যাবার জন্য, ধরে নেওয়া যেতে পারে, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা হয়েছে সব চাইতে কম। ৫১০। তাতেও ক্ষতি ছিল না। সব চাইতে আপত্তিকর এর অযত্নের বাঁধাই। এ পর্যন্ত খণ্ডগুলো দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য মোটা কার্ডবোর্ডে বেশ ভালো জ্যাকেট বাঁধাই হয়েছে। কিন্তু চার খণ্ডের বদলে গ্রাহকদের একই দামে পাঁচ খণ্ড দেবেন বলে চতুর্থ খণ্ড পাতলা পেস্টবোর্ডের বাঁধাই অর্থ গ্রাহককে প্রকারান্তরে বলা যে, যদি স্থায়ী ও অন্যান্য খণ্ডের সমরূপ করতেই হয় তো সে দায়িত্ব গ্রাহকের। এ যেন চার খণ্ডের বদলে পাঁচ খণ্ড দেবার পেনাল্টি। কাগজও বিচিত্র; অর্ধেক তার কালক্ষয়ে বিবর্ণ, পাণ্ডুর; অর্ধেক নতুন। বিষয়বস্তুর কথা থাক, আগে দর্শনধারী হিসেবে চারের মধ্যে এটি নিকৃষ্টতম ও হতাশাব্যঞ্জক সন্দেহ নেই। এ না-হওয়া, ঐ না-হওয়া ইত্যাদির পক্ষে যুক্তি ও সওয়াল সব সময়ই হতে পারে। অতবড় সর্বনেশে দেশ-বিভাগকেই যেদেশ যুক্তি ও সওয়ালে জয়-জয়কার করেছে ও করে চলেছে, কেলেঙ্কারীর পর কেলেঙ্কারী চাপা দেবার জন্য ভারত-স্বর্গের দেব-নেতৃবৃন্দ অনর্গল যে যুক্তি-সওয়াল দিয়েছেন ও দিয়ে চলেছেন, তা যখন আমরা সর্বনাশের পাঁকে

ছ্বকেও সহ্য করেছি, করব বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেখানে অতি ক্ষুদ্র, অতি দরিদ্র সংস্থার যুক্তি-সওয়াল বাহুল্যমাত্র। লজ্জা পাই, যখন অন্যান্য রাজ্যের অন্যান্য সাহিত্যের অসাধারণ অর্থানুকূল্যে সমৃদ্ধির কথা শুনি। ভারতকোষের মত পরিকল্পনা অন্যান্য রাজ্যেও হয়েছে এবং সেসব রাজ্যের তৎপরতা যখন খবর হয়ে কানে আসে। সেদিক থেকেও ভারতকোষের শ্রীহরণ ও ক্রমাবনতি বাঙালী সাহিত্যিক বা বাংলা সাহিত্য-রসিকমাত্রেরই চোখে জল আনবে। বাংলাদেশের কিছুই তো নেই, রত্নগর্ভা বাংলা মা অনেক মনীষীর জন্ম দিয়েছেন, যাঁদের ছাপ রয়েছে বুদ্ধি-মেধা-পাণ্ডিত্যের সবুজ বাগানে; কিন্তু বৈষয়িক ব্যবহারিক জীবনে আমরা 'স্বদেশী' আমল থেকে হেরে এসেছি। হৃদয়াবেগের বহু প্রমাণ আমরা দিয়েছি, আজও দিই, কিন্তু তাকেই মূলধন করে যে কারবারীরা বৈষয়িক জীবনে আমাদের হাততালি কুড়োতে দিয়ে কাজের বেগ দেখিয়েছে, তারা আমরা নই। আমরা স্বদেশীতে প্রাণ দিয়েছি, স্বদেশী মিল দিয়েছে রাজ্যান্তরবাসী, আমরা সর্বস্ব বিলিয়েছি, আপনাদের

জীবনে শোষণের হাড়-চোষা অংশীদার হয়েছে ভিন্‌প্রান্তীয়েরা।

সুতরাং, কাজটা যত সোজা মনে করা যাচ্ছে, আসলে তা তত সোজা নয়। অথচ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মত সম্পূর্ণ বাঙালী সংস্থা ছাড়া এ কাজ করবেই বা কে? কিন্তু যে বাংলাদেশে বিশেষ করে দেশ-বিভাগের পর পশ্চিম বাংলা সরকার বাংলা ভাষা সম্পর্কে মমত্বহীন, সেখানে এমন একটা প্রকল্প সার্থক করা অসম্ভবই প্রায়। পশ্চিম বাংলায় কখনো "বাংলা সরকার" প্রতিষ্ঠিত হয় নি; হয় হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রমুখীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়েছে এবং তাঁদেরই নির্দেশে তাঁদেরই মন ও মুখের দিকে চেয়ে 'বাংলা' 'বাংলা' করে নি বা যেটুকু করেছে, তা ভোট কুড়োবার দায়ে মাত্র; নতুবা আন্ত-র্জাতিকতা, অপ্রাদেশিকতা, অসাম্প্রদায়িক-তার শালগ্রাম শিলা রক্ষার জন্য বাংলা সম্পর্কে নিস্পৃহা প্রকাশের বাহাদুরি দেখিয়েছেন ভিন্নতর চৌদ্দশাকের সরকার। মৃগী রোগীর মত মাঝে মাঝে যে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণে কাউকে কাউকে হাত-মুখ খিঁচোতে দেখা যায়, ওটার সঙ্গে হৃদয়ের, অন্তরের, প্রাণের কোন যোগ নেই। কেন না, ঐ বিমাতার কাছে অর্থ পেয়েও কোন উন্নয়নমূলক কাজে সে অর্থ নিয়োগ করতে এহেন বঙ্গ-রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত কিছু কম নেই। লক্ষ টাকা ফেরৎ গেছে। অন্য বিভাগের দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক হলে বলব, সম্প্রতি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারকে, অর্থাৎ শিক্ষা বিভাগকে কেন্দ্রীয় সরকার যে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই প্রকাশনার জন্য টাকা দিয়ে-ছিলেন, তার সাত লক্ষ টাকা ফেরৎ গেছে এ সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে অভিশাপ দিতে হয় নিজের কপালকেই।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যে ভারত-কোষ বেরোলো, তাতেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা পোস্টাফিসের মাত্র; কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যেই এবং গ্রাহকদের চাঁদায়ই তা সম্ভব হয়েছে। ব্যর্থতার ফলে যে ৭ লক্ষ টাকা ফেরৎ গেছে, তা থেকে লাখ দুই টাকা দিলেই পরিষদ-প্রকল্পিত পঞ্চম খণ্ডটি নির্বিঘ্নে প্রকাশ করা যেত। কিন্তু কোন বাংলা সরকারেরই বাংলা ভাষা-সাহিত্যের জন্য দরদ নেই—তা তেরঙাই হোক, লাল রঙাই হোক। এই পঞ্চম খণ্ড প্রকাশনে সাহিত্য পরিষৎ বাধ্য হচ্ছেন, কেন না, চার খণ্ডে সকল বর্ণ শেষ করা যায় নি। আর এটি সম্ভবত হবে তুলনায় বৃহত্তম: 'ফ' অক্ষরের পর 'ব' থেকে বাকীটাই শুধু নয়, একটা পরিশিষ্টও থাকবে, কিছু কিছু সংস্কার, সংশোধন ও সংযোজনার জন্য। একদা ভারতকোষ উদ্যোক্তারা ব্যয় ধরেছেন ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা মাত্র; কেন্দ্রের কাছে আবেদন করেছেন ১ লক্ষ ৪৫ হাজারের জন্য, বাকীটা তাঁরা বিক্রি-বাট্টা থেকে মিটোবেন। কাগজের দাম বেড়েছে, ছাপা খরচ চড়েছে এবং চার ছেড়ে পাঁচ খণ্ড করতে হচ্ছে।

বাঁধাই-সৌষ্ঠব সম্পর্কে আমি যে অভিযোগ রেখেছি, তার জবাবও দিয়েছেন একজন পরিষৎ মুখপাত্র। বলেছেন, চারটি ছেড়ে পাঁচটি করতে হলেও তাঁরা দর বাড়ান নি; যাঁরা ৪০-এ চারটি পেতেন, তাঁরা পাঁচটি পাবেন এবং খুচরো ক্রেতারাও ২০ টাকার বদলে ১০ টাকা করে চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড পাবেন; অর্থাৎ, সাকল্যে সেই ২০ টাকাই হল। অথবা রেজিস্টার্ড গ্রাহকেরা ৪০ টাকায় চারের বদলে পাঁচ খণ্ড পাচ্ছেন, খুচরো ক্রেতারা ৮০ টাকায় চারের বদলে পাঁচ খণ্ড পাচ্ছেন। কিন্তু খরচ বাঁচাতে গেলে জ্যাকেট সুদ্ধ মোটা বোর্ডের সুষ্ঠু বাঁধাই পরিহার করা ছাড়া উপায় কি?

এ যুক্তি অবশ্যই একেবারে ফেলনা নয়। কিন্তু তাঁদের প্রথম পরিকল্পনা তো ছিল সূচীসুদ্ধ ৪×৮০০=৩২০০ পৃষ্ঠা ছাপা। এ পর্যন্ত চারে তাঁরা ছেপেছেন সূচী বাদে ৬৬৯+৫১০+৭৭৬+৫১০=২৪৬৫ পৃষ্ঠা; বাকী থাকে ৭৩৫। কিন্তু ওঁরা ভাবছেন পঞ্চম খণ্ড ৮০০ পৃষ্ঠার কমে হবে না। সুতরাং, পৃষ্ঠার দিক থেকে হয়তো কিছু ইতরবিশেষ হবে, কিন্তু তার অনুকূলে সৌষ্ঠবহানির যুক্তি খুব জোরালো নয়। পৃষ্ঠা যেখানে প্রায় একই, সেখানে দুটি বাঁধাতে হলো বলে ব্যয়সংক্ষেপের যুক্তি সহজগ্রাহ্য নয়।

তবু ভারতকোষ ফণ্ডের দুর্দশাটা কঠোর সত্য। উদ্যোক্তারা ছাপছেন মাত্র ৮০০০ করে; কিন্তু হাজার তিনেকের মতো অবিক্রীত থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ৮০০০ ঘরেও ভারতকোষ পৌঁছোতে পারল না, এ এক পরম দুর্ভাগ্য। পৌনে চার কোটির ভাঙা বাংলায় স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরী তো কিছু কম হয়নি। মাত্র একবার পড়ার দামী উপন্যাসের পাঠকও লক্ষ লক্ষ।

প্রথম তিন খণ্ড বাবদ ভারত সরকারের অর্থানুকূল্য পাওয়া গেছে সোয়া দুই লক্ষের মতো; বাকী বিক্রি-বাট্টায় পাওয়া গেছে। টায়ে টায়ে কুলিয়ে গেলেও চতুর্থ খণ্ড বাবদ চাইতে হয়েছিল ১,৫৫,০০০; শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছল মাত্র ৩০ হাজার!!

রেজিস্টারভুক্ত গ্রাহকের সংখ্যা হাজার তিনেক; তাতে আগাম অর্থাগম হয়েছিল ১,১২,০০০ টাকা। খুচরো ক্রেতার পক্ষে দাম প্রতি খণ্ড ২০ টাকা বটে, কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে পূর্ণ সেট ৫০ টাকা কি ৬০ টাকা দরে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। এভাবেও ৫৫০ মতো যায়। লেখার বিনিময়ে অর্থাৎ নগদ টাকা না দিয়ে গ্রাহক হয়েছেন শ' দুইয়ের মতো। লেখার জন্য যাঁরা টাকা নিয়েছেন, তাঁদের খাতেও হাজার বারো টাকা গেছে। আরও যাবে। তবে প্রখ্যাত লেখকেরা প্রায়ই টাকা নেন না। কমপ্লিমেণ্টারী বাবদ কিছু যায়; বই বিক্রেতাদের দিতে হয় ২৫ শতাংশ।

একাজে সর্বক্ষণ নিযুক্ত আছেন ৬ জন; পার্টটাইম কাজ করেন ৫ জন; তদ্বির-তত্ত্বাবধানের জন্য জনতিনেক একটা সম্মাননা নেন; সাকল্যে ১৪৭৬ টাকা লাগে। এঁরা কিন্তু প্রাণপাত পরিশ্রম করেও সচ্ছল সরকারী কর্মচারীদের মতো কথায় কথায় কর্মবিরতি বা ধর্মঘটের কল্পনাও করেন না। স্বল্পবেতনভুক এদের কথা ভেবে কর্মে অমনোযোগী রাজনীতিক সরকারী কর্মচারীদের অভিশাপ দিতে হয়।

শেষ পর্যন্ত অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে প্রার্থিত সাহায্য ১ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা যদি না পাওয়া যায়, তবে পঞ্চম খণ্ডের প্রকাশনা সংকটের মুখে পড়তে হতে পারে। উদ্যোক্তারা প্রকাশনায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও আশাবাদী হলেও স্বীকার করতে হবে আগাগোড়াই পরি-কল্পনা-প্রযোজনা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। বিমুখ রাজ্য সরকার, উদাসীন বাঙালী পাঠক-সমাজের পটভূমিকায় একমাত্র হিন্দী সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রানুকূল্যের ওপর নির্ভর করা সঙ্গত হয়নি। হলেও ব্যয়-বরাদ্দ স্থির করে সমস্ত লেখা একত্র করে, সেগুলো সুসম্পাদিত ও সদৃশ আকারে এনে—টাকাটা হাতে পাবার পর একবারে কাজ আরম্ভ করলে ব্যবসায়িক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যেত। তবু যে তাঁরা বাঙালীর স্বাভাবিক আবেগ-প্রাবল্যে দুঃসাহসে এত বড় কাজে অবতীর্ণ হয়েছেন এজন্য বিদগ্ধ বাঙালীমাত্রেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন সন্দেহ নেই।

বাংলা ভাষায় সত্যিকারের পণ্ডিতের অভাব ছিল না; এখনও নেই; ভারতকোষের সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি তালিকা দেখলে আশ্বস্ত হতে হয়। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও বিষয়বুদ্ধির সমযোজনা বড় একটা দেখা যায় না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা বা অন্যান্য এনসাইক্লোপিডিয়ার কথা ছেড়ে দিলাম; সেগুলো এত বৃহৎ ব্যাপার যে, আমাদের কল্পনাতীত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যাপারেও ওঁদের পাণ্ডিত্য সমাবেশ ও সম্পাদনা-প্রযোজনা কি রকম বৈজ্ঞানিক তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। একটা মাত্র উদাহরণ দি—ডঃ উইলিয়াম রোজ সম্পাদিত ও লণ্ডনের ভিক্টর গোলাঞ্জ লিমিটেড প্রকাশিত 'এন আউটলাইন অব মডার্ন নলেজ'; ২৪টি বিষয়ই বিশেষজ্ঞের দিয়ে লেখা।

এই বইটির ব্যাপারে আমি বহু রকমে কৃতজ্ঞ; রাজসাহী জেলে থাকতে কিনেছিলাম এবং প্রচুর অবকাশে পড়েছি একাগ্রতায়। এমনি আরও বই আছে, বাল্যদশায় আমিই কিনেছিলাম ৮ খণ্ডের 'চিলড্রেন্স ডিক্সনারী'; বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি ওঁদের নির্ভুল প্ল্যানিং।

বাংলাদেশেও ভারতকোষ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা এ যে প্রথম নয়, ভারতকোষের প্রথম খণ্ডের মুখবন্ধেই তার বহু সংবাদ আছে। কাজটা যে সহজ নয় এবং একটা উপন্যাস সমাপ্তির ব্যাপারমাত্র নয়, বরং এটি একটি অব্যাহত অবিরাম কাজ, একথা কে অস্বীকার করবে? তাই ভারতকোষের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উল্লেখযোগ্য:

"রাধাকান্ত দেবের সংস্কৃত 'শব্দকল্পদ্রুম' (১৮২২—৫৮ খৃঃ) ছিল অভিধান ও বিশ্বকোষের সমন্বয়। পরিশিষ্ট সহ ইহা ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার সংকলন ও প্রকাশ-কার্যে প্রায় ৪০ বৎসর লাগিয়াছিল এবং বহু পণ্ডিতজনের সহযোগিতার প্রয়োজন হইয়াছিল। অজস্র অর্থব্যয়ে সম্পাদিত এই গ্রন্থ রাধাকান্ত দেব বিনামূল্যে বিতরণ করেন।......ইহার একাধিক সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ হইয়াছে।......পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি আঠার বৎসরের প্রচেষ্টায় অনুরূপ আর একখানি গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন। ৬ খণ্ডে সম্পূর্ণ (১৮৭৩—৮৪ খৃঃ) এই গ্রন্থের নাম 'বাচস্পত্য' অভিধান।

"বাংলা বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজে প্রথম অগ্রসর হন উইলিয়াম কেরির পুত্র ফেলিক্স কেরি। ১৮১৯—২১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবলম্বনে 'বিদ্যাহারাবলী' নামক গ্রন্থ-প্রকাশে উদ্যোগী হন। ইহার প্রথম খণ্ড 'ব্যবচ্ছেদবিদ্যা' এবং 'স্মৃতিশাস্ত্র' নামক দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সংকলিত ও অনূদিত 'সংক্ষিপ্ত সম্বিদ্যাবলী'র (১৮৩৩ খৃঃ) নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিদ্যাকল্পদ্রুম বা 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গালিনসিজ' নামক গ্রন্থের ১৩টি কাণ্ড প্রকাশ করেন (১৮৪৬—৫১ খৃঃ)।

"তিন ভাগে ১৬৫০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত (১২৮৯—৯৯ বঙ্গাব্দ) ভারতবর্ষ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণপূর্ণ 'ভারতকোষ' বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রসঙ্গ সংকলিত প্রথম বিশ্বকোষ। ১২৮৭ বঙ্গাব্দ হইতে ইহা খণ্ডশঃ প্রচারিত হইতেছিল; রাজকৃষ্ণ রায় ও শরচ্চন্দ্র দেব ছিলেন ইহার সংকলক।"

বিশ্বকোষের ইতিহাসে নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থ বাঙালার একটি গৌরবস্তম্ভস্বরূপ।" এই সম্পর্কে পারষদ-কর্তা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় কিছু চর্চা করেছেন। বিশ্বকোষের ভূমিকা থেকে তিনি যে একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য তৈরি করেছেন, সেটিও উদ্ধৃত করছি: বিশ্বকোষ মোট ২২ খণ্ড; পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭ হাজার। সূচনা ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১ম খণ্ড), শেষ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে (২২শ খণ্ড)।

১২৯১ বঙ্গাব্দে অথবা ১৮৮৩ খৃীস্টাব্দের শেষ ভাগে রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় এর সূচনা হয়। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে উপক্রমণিকা সহ ২২ সংখ্যায় ১ম খণ্ড এবং তাতে 'অ' বর্ণমাত্র প্রকাশিত হয়। ত্রৈলোক্যবাবু বিলাতে গেলে একমাত্র রঙ্গলালবাবুর সম্পাদনায় তিন সংখ্যায় 'আ' বর্ণের 'আমিক্ষীয়' শব্দ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়। ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুদ্রণের পর বিশ্বকোষ প্রকাশ কার্যতঃ বন্ধ হয়ে যায়। ৮১ থেকে ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত তাঁর নিজের গ্রাম রাহুতায় (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) মুদ্রিত হলেও প্রকাশ করবার অবসর পান নি। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে অথবা ১৮৮৭ খৃীস্টাব্দে এটি প্রকাশের ভার পড়ে নগেন্দ্রনাথ বসুর ওপর। রঙ্গলালের সম্পাদনায় অধিকাংশই লেখা তাঁর; কেবল 'অভাব' এবং 'অঙ্কুর' ও 'অণুবীক্ষণ' শব্দ তিনটি যথাক্রমে নবদ্বীপের পণ্ডিত হরিনাথ তর্করত্ন এবং শ্রীশচন্দ্র দত্তের লেখা। ১২৯১ বঙ্গাব্দে (১৮৮৪ খৃীঃ) বিশ্বকোষের যখন ২য় সংখ্যা বেরোয়, তখন 'শব্দেন্দু-মহাকোষ' নামে একখানি এনসাইক্লোপিডিয়া সংকলনের ভার পড়ে নগেন্দ্রনাথ বসুর ওপর। তখন তাঁর বয়স ১৮। অল্পদিনের মধ্যেই ওর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় নগেন্দ্রনাথের চরম দারিদ্র্য। এ সময় তিনি 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর কাজ পান। পুঁথি সংগ্রহের কাজে বহরমপুরে গিয়ে শোনেন বিশ্বকোষ প্রকাশ বন্ধ হয়ে আসছে। যোগাযোগ স্থাপন করে রঙ্গলাল-ত্রৈলোক্যনাথের কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষ রচনার ভার, এমন কি পূর্বখণ্ডের স্বত্বও পান। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে তিনি কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁর দারিদ্র্যে সাহায্যের কেউ ছিল না। বিশ্বকোষে লেখকদের মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দীনেশচন্দ্র সেন, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রমুখ পণ্ডিতেরা।

এক্ষেত্রে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "বঙ্গীয় মহাকোষ" গ্রন্থ প্রণয়নের চেষ্টাও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তিনি দুটি খণ্ডের বেশি সম্পূর্ণ করে

ভারতকোষ ভারতেরই অন্যান্য রাজ্যে অন্যান্য ভাষায় যে উদ্যোগ চলেছে, তারও একটা হিসেব দিয়েছেন। তাতে মহারাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগ সম্পর্কে বলা হয়েছে: "১৯৬১ খৃস্টাব্দে মহারাষ্ট্র সরকার ৯ বৎসরে ও ১৯ খণ্ডে সমাপ্য একখানি বিশ্বকোষ প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার আনুমানিক ব্যয় হইবে ৩০ লক্ষ টাকা।" অহো, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

আমাদের লজ্জা পাবার কারণ আছে। কিন্তু যে কথাটি এই জাতীয় প্রকাশনা সম্পর্কেই প্রযোজ্য তা হচ্ছে, এ কেবল রবীন্দ্র রচনাবলী, শরৎ রচনাবলী বা বিবেকানন্দ রচনাবলীর মত যা আছে তা প্রকাশ করা নয়, এর সৃষ্টিশীলতার অন্ত নেই। মানুষের সভ্যতার সংগে সমতালে একে নব নব রূপ দিতে হবে। একথা ভারতকোষের মুখবন্ধে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' প্রকাশের বৃহৎ কর্মকাণ্ড প্রসংগে বলা আছে। এই বিরতিহীন সম্পাদনার কাজ যদি না চলে, তবে এই ভারতকোষেরও পূর্বসূরীদের দুর্দশা ও দুর্গতি হবে; একটা ছেদ-পড়া অতীতের অসম্পূর্ণ এবং অচল কর্মপ্রচেষ্টা হয়ে থাকবে শুধু, ওর শুকিয়ে যাওয়া জীবনে করুণাধারায় আসবে না সদাজাগ্রত প্রাণ। বিরতিহীন সম্পাদনাই সেই প্রাণ।

॥ স্রোতের সংগে ॥

[২২ পৃষ্ঠার পর]

তা তুমি জানো না—কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে যাচ্ছিল: 'একদিন এসো আমাদের বাড়িতে।'

'না—সে আমি পারব না।'

'কোন ভাবনা নেই তোমার—' হঠাৎ স্বপনা টুলুর হাত চেপে ধরল: 'কাউকে ভয় করতে হবে না।'

স্বপনার হাতের ছোঁয়ায় টুলু শিউরে উঠল। একটা কিছু বলতেও যাচ্ছিল, সেই সময় সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা জনচারেক। কার্তিক সকলের আগে।

টুলুর দিকে তাকিয়ে, সাপের মতো একটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে বললে, 'এই যে শালা! আজ ক'দিন ধরে তোকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি।' [ক্রমশ]

গত ৩০শে এপ্রিলের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত আমাদের একটি প্রতিবাদপত্রের (তুষার চট্টোপাধ্যায়ের) এক প্রতিবাদপত্র আমাদের চোখে পড়েছে। প্রতিবাদপত্রের যথাযথ উত্তর না দিয়ে তিনি যা বলেছেন, তা' আর যাই হোক, জর্জ ডিমিট্রভের তত্ত্বানুসারী নয়। কয়েকটি দল একত্র হয়ে সরকারে এলেই তাকে ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট বলা যাবে না। আর এই যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে বুঝবার একমাত্র হক যে তুষারবাবুর একার, তা যে-কোন যুক্তিবাদী মানুষই স্বীকার করবেন না।

ভূমিকায় তুষারবাবু বলেছেন, ডাঃ নরেন ভট্টাচার্যের 'ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব' তিনি ভাল করে পড়েছেন এবং তাঁর মতে ডিমিট্রভের তত্ত্বের বিকৃতি মোটেই হয় নি। যদি তাই হয়, তবে আমাদের প্রতিবাদপত্রে ডাঃ ভট্টাচার্যের তথাকথিত দলীয় স্বার্থ-সিদ্ধি, তাঁর রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণী-চরিত্র বিচারের ভুলত্রুটি ও শাসকশক্তির চরিত্র নির্ণয়ে আমরা যে-সব বক্তব্য রেখে-ছিলাম, তুষারবাবু সে বিষয়ে কোন বক্তব্য রাখেন নি। কোন বিচার-বিশ্লেষণ না করেই মন্তব্য করেছেন। কোন বক্তব্যের বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ ছাড়া মন্তব্য করা অবিবেচনার কাজ ও সেটাকে গোঁড়ামী বলে চিহ্নিত করা সহজ হয়। শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে ভুল ধারণার জন্যই শ্রীভট্টাচার্য কংগ্রেসের একাংশকে প্রগতিশীল বলেছিলেন। আবার সেই অংশের প্রগতি-শীলতায় তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বলেই আমরা তাকে স্ববিরোধিতা বলে-ছিলাম। আশ্চর্যের কথা, তুষারবাবু এই বিষয়ে কিছু না বলে নীরব থাকাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

তিনি বলেছেন—'সুতরাং যুক্তফ্রন্ট নীতির শুরুটা সোস্যাল ডেমোক্রাটদের মধ্যে ভাগের কথা দিয়ে নয়, সোস্যাল ডেমোক্রাটকে যুক্তফ্রন্টে আনতে হবে এটাই হচ্ছে ভিত্তি। সেই জন্য কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কথা ডিমিট্রভ কোথাও বলেন নি।' মনে হয় আমাদের প্রতিবাদপত্রটি তুষারবাবু যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে পড়েন নি। ডিমিট্রভ খোলাখুলি বলেছেন, 'লিডিং রোল' থাকবে কমিউনিস্ট পার্টির। ডিমিট্রভ বলেছেনঃ

'In the struggle for the establishment of the united front, the importance of the leading role of the communist party increases extraordinarily.' (পৃঃ ৮১, United Front of the Working Class, Calcutta Publishers, Calcutta, 1969).

আসলে তিনি যে এটা বোঝেন না, তা নয়। নিজের বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদটি প্রচারের জন্যই তিনি যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্ট নেতৃত্বের কথা অস্বীকার করতে চাইছেন। কোয়ালিশন সরকার সম্পর্কে কমরেড মাও সে তুং বলেছেনঃ

'Some people are suspicious and think that once in power, the Communist Party will follow Russia's example and establish the dictatorship of the proletariat and a one party system. Our answer is that a new democratic state bend on the alliance of the democratic classes different in principle form a socialist state under the dictatorship of the proletariat. Beyond all doubt our system of New Democracy will be built under the leadership of the proletariat and of the Communist Party.'

চীনে কমিউনিস্টদের ক্ষমতা দখলের আগে মুক্ত অঞ্চলে যে-সব সরকার ছিল, তার নেতৃত্বে ছিল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে বিপ্লবী অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে তারও নেতৃত্বে আছে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কমিউনিস্ট পার্টি। তাই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বহীন যুক্তফ্রন্ট, জর্জ ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট নয়। সেটা তুষার-বাবুর মনগড়া। তিনি আরও বলতে চেয়েছেন যে, সোস্যাল ডেমোক্রাটদের ভাগা-ভাগি নয়, তাদের আনতে হবে যুক্ত-ফ্রন্টে। ডিমিট্রভ কিন্তু ভাগাভাগির কথাই বলেছেন ও তাদের মধ্যে বামপন্থীদের (যারা কমিউনিস্ট বিরোধী নয়) নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে সে কথা বলেছেন। তাঁর কথায়—The reactionary Social Democrats are against the United Front; they slander the United Front movement, they sabotage & disintegrate it as it undermines the.r policy of compromise with the bourgeoisie. The left Social-Democrats are for the United Front; they defend, develop and strengthen the United Front movement. (পৃঃ ৭১)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যুক্তফ্রন্টে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সকল অংশকেই আনা যায় না। ডিমিট্রভ সে কথা বলেন নি। তুষারবাবু কিন্তু জেনেশুনেই এই বিকৃতির রাস্তা বেছে নিয়েছেন, নিজের বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদকে তুলে ধরবার জন্য।

কল্পনা শব্দটির ব্যবহারে তুষারবাবু একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। তাই 'ইমাজিনেশন্' এবং 'ফ্যানসি' শব্দ দুটির পার্থক্য তুষারবাবু ঠিক ধরতে পারেন নি। শব্দ দুটির বাংলা অনুবাদে কল্পনাই ব্যবহৃত হয়। 'ইমাজিনেশন্'-এর মধ্যে আছে বাস্তব ভিত্তি, কিন্তু 'ফ্যানসি' শব্দের মধ্যে আছে উদ্ভট কল্পনা। কল্পনা শব্দটির এই বাস্তব ভিত্তি বুঝতে না পেরে তিনি একে নিয়ে প্রায় ছেলেমানুষী করেছেন। তা ছাড়া রাজনৈতিক তত্ত্ব যতক্ষণ না ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ

হচ্ছে, ততক্ষণ তা [illegible] থাকবে। [illegible] কালে যখন ডাঃ ডিমিট্রভ এই যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের কথা তুলে ধরেছেন, তখন তাঁর জ্ঞানানুসারে পৃথিবীর কোথাও এই যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব ছিল না। তুষারবাবু শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের মানে বুঝেছেন কমিউনিস্ট নেতৃত্বের ফ্রন্ট। এই অদ্ভুত ফ্রন্ট শব্দটির কোন উল্লেখ কোন মার্কসবাদী সাহিত্যেই নেই।

এই বক্তব্য থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তিনি বহু কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু সকলেই জানেন যে, কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটাই যা মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের যথার্থ প্রয়োগে শ্রমিক-শ্রেণীর একনায়কত্বে বিশ্বাসী। রাশিয়ায় এককালে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের নামাবলীধারী অনেক দলই ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বলতে শুধু বলশেভিক পার্টিকেই বোঝাত। সুতরাং কমিউনিস্ট ফ্রন্ট বলতে তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা শুধু তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারুর কাছে পরিষ্কার নয়। আসলে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের সঠিক অর্থ তিনি বুঝতে পারেন নি। নিচের তলা থেকে সংগ্রামের ফলে কৃষক শ্রমিক ও মেহনতী মানুষদের যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠবে, তাই হবে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের ভিত্তি। ডিমিট্রভ বলেছেন:

'This United Front movement is a militant movement against fascism and reaction, it will be a constant motive force, impelling the United Front Government to struggle against the reactionary bourgeoisie. The more powerfully this mass movement develops the greater the force which it can offer to the movement to combat the reactionaries. And the better this mass movement will be organized from below, the wider the net-work of the Non-partisan class organs of the United Front in the factories, among the unemployed, among the workers districts, among the small people of town and country, the greater will be then guarantee against a possible degeneration of the policy of the United Front Government.' (পৃঃ ৭১)। আসলে শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের কথা শুনলেই তুষারবাবু আঁতকে উঠেছেন। [illegible] কারও কোন কোন বিষয়ের প্রতি এলার্জি দেখা যায়। শ্রেণীভিত্তিক যুক্তফ্রন্টের শব্দগুলিতে তুষারবাবুর সেই এলার্জির লক্ষণ খুবই স্পষ্ট।

'To reject communism is, in fact, to reject United Front'—কমরেড মাও সে-তুংয়ের এই উদ্ধৃতি থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন কি করে যে, কোন সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি সেই যুক্তফ্রন্টের অংশীদার হতে পারবে না। তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, যুক্তফ্রন্ট হবে কার সঙ্গে? যদি কমিউনিস্টরা যথেষ্ট শক্তিশালী হন, তাহলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করবার কোন প্রয়োজনই হয় না। কারণ যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতা দখল করবার হাতিয়ার নয়। ডিমিট্রভের শিক্ষার আলোকে যুক্তফ্রন্ট শুধু শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্রতর করে অসংগঠিত শ্রমিক কৃষক ও মেহনতী জনতাকে শ্রেণী-সচেতন এবং রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে পারে। এর আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুদয়ে বাধা দেওয়া। এই সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে 'লিডিং রোল' হচ্ছে প্রোলেতারিয়েত পার্টির বা কমিউনিস্ট পার্টির। নিজের বিশ্বাস মত রাজনৈতিক বক্তব্য রাখবার জন্যই কি তিনি এই ইচ্ছাকৃত বিকৃতি ঘটিয়েছেন! কমরেড মাও সে-তুংয়ের উপরোক্ত বক্তব্য হচ্ছে: কমিউনিস্টরাই এই যুক্তফ্রন্টের চালিকা-শক্তি। সুতরাং যে-যুক্তফ্রন্টে তাদের শক্তি খর্ব করবার জন্য অন্য সব অংশীদাররা উঠে পড়ে লাগে এবং শেষ পর্যন্ত সম্মিলিত শক্তির জোরে তাদের বুর্জোয়া-ঘেঁসা বক্তব্য কমিউনিস্টদের ওপরে চালিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করে, তাকে কিভাবে ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট বলে স্বীকার করা যাবে? আসলে তুষারবাবু এখানেও সেই শ্রেণী-সমঝোতার রাজনীতি আমদানী করতে তৎপর হয়েছেন, যার বিরুদ্ধে জর্জি ডিমিট্রভ বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব না থাকলে যদি ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট হয়—তাহলে তাঁর মতানুযায়ী ১৯৬৭ সালে সি-পি-আইয়ের শরিকানায় বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এবং ১৯৬৯ সালে সি-পি-আই নেতৃত্বে কেরালায় যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বা হয়েছে—তা ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট সরকার। খুব স্বাভাবিক কারণেই আমরা একমত নই। কারণ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে এই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে কোন গণসংগ্রাম পরিচালিত হয় নি। অসংগঠিত শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষদের শ্রেণী-সচেতনতা বাড়িয়ে সংগঠিত করা হয় নি। তাই উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের গত মধ্যবর্তী নির্বাচনে মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের নামাবলীধারী দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের কোন শক্তিবৃদ্ধি হয় নি, বরং হ্রাস পেয়েছে। আর কেরালার দক্ষিণ কমিউনিস্ট নেতারা তো প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, একই সঙ্গে সরকার পরিচালনা ও গণসংগ্রাম করা চলে না। মনে রাখা দরকার যে, ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ওপর ভিত্তি করেই গঠিত। কিন্তু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দিয়ে যে কোনরকমের যুক্তফ্রন্টকে ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট বলে চালানো নিছক সুবিধাবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এ কথা পরিষ্কার যে, তুষারবাবু ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বকে আদপে বুঝতে পারেন নি।

আমরা রাজনৈতিক দলগুলির শ্রেণী বিশ্লেষণ করে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছিলাম। অথচ তুষারবাবু সেদিকে গেলেন না। বিচার-বিশ্লেষণের আলোকে মন্তব্য করা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন বোধ হয় নি। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন যে, তিনি নিজে যা বলবেন, তাই সকলের গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং তিনি বলেই খালাস যে, বাংলা কংগ্রেস জমিদার জোতদারের প্রতিভু নয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই মন্তব্য কিসের ভিত্তিতে রাখলেন। বাংলা কংগ্রেসের যে শ্রেণী-চরিত্রের ব্যাখ্যা রাখা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে শ্রীসুকুমার রায়ের সেই চাঞ্চল্যকর বিবৃতিতেই সমর্থিত হয়েছে।

আমাদের দেশের সোস্যাল ডেমোক্রাট পার্টিগুলির মধ্যের প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল অংশের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে বি-কে-ডি, পি-এস-পি ও এস-এস-পি'র নেতৃত্বের একাংশ যখন কমিউনিস্ট-বিরোধী নীতি পরিত্যাগ করেন তখন তাঁদের তুষারবাবু প্রগতিশীল বলে স্বাগত জানাতে চান। এই সব দলগুলির বাস্তব কার্য প্রয়োগের কোন্ ধারা অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন তা তিনি বলতে চান নি। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যে, মুখে প্রগতিশীল বা বামপন্থী তথাকথিত কার্যসূচীর ঘোষণায় কি প্রমাণ হয় তাদের বামমার্গিতা বা প্রগতিশীলতা? বামপন্থী বা প্রগতিশীল হতে হলে 'ডিডস'-এ প্রমাণ দিতে হবে—শুধুমাত্র কথায় বা প্রগতিশীল কর্মসূচীর ঘোষণায় নয়। ডিমিট্রভ বলেছেন:

'The attitude of the practical realization of the United Front will be chief indication of the true position of the various groups among the Social-Democrats. In the fight for the practical realization of the United Front, those Social Democratic leaders who come

forward as lefts in word will be obliged to show by deeds whether they are really ready to fight the bourgeoisie and the Right Social Democrats, or are on the side of the bourgeoisie that is, against the cause of the working class.' (পৃঃ ১৪৬)। তুষারবাবুর মতানুযায়ী এই সব বামপন্থী (?) দলগুলি কি 'বাই ডিড্' দ্বারা সেই নামের যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছেন? তুষারবাবু কিন্তু প্রগতিশীলতার সার্টিফিকেট দিয়েই খালাস। যুক্তফ্রন্টের প্রগতিশীলতার এই লক্ষণের সাথে আর একটি লক্ষণও পরিস্ফুট হচ্ছে যে, এককালের নামজাদা সব কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি রাতারাতি কংগ্রেসের মিত্রতে পরিণত হয়েছে। এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে যুক্তফ্রন্টের বিরাট সাফল্যের দিকটা চোখে না পড়ে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা তুষারবাবুর 'সঠিক ও নমনীয় কৌশলের' কথা না তুলে পারছি না। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে পরিস্থিতি ও শক্তি বিন্যাসের সঠিক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক ও নমনীয় কৌশল নিতে হবে। ডিমিট্রভের 'ফ্লেক্সিবল্ ট্যাকটিস্'-এর বাংলা অনুবাদে তুষারবাবু নমনীয় কৌশল বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোন্ পরিস্থিতির বিচারে ডিমিট্রভ এই মন্তব্য করেছেন, তুষারবাবু ইচ্ছা করেই তার উল্লেখ করতে চান নি। তা ছাড়া এই নমনীয় কৌশল যে 'মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পলিসি'-র বাইরে হবে না, তাও তিনি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ডিমিট্রভের পুরো বক্তব্যটি তুলে ধরতে চাই—

'The Communist Parties can ensure the mobilization of the broadest marses of the toilers for a united struggle against fascism and the offensive of capital only if they strengthen their own ranks in every respect, if they develop their initiative, pursue a Marxist-Leninist Policy and apple correct, flexible tactics which take into account the concrete situation and alignment of class forces.' (পৃঃ ৮১)। আগের বক্তব্যকে না রেখে দু-একটি লাইন নিজের সুবিধা হবে ভেবে তুষারবাবু ব্যবহার করেছেন। ডিমিট্রভের উদ্ধৃতির নিজের সুবিধাবাদী রাজনীতির ব্যাখ্যায় বিকৃতরূপে উপস্থাপিত হতে দেখে যে-কোন রাজনীতি-সচেতন মানুষের দুঃখবোধ হওয়া স্বাভাবিক।

তুষারবাবু কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বীকার করেছেন যে, আমরা এই বিষয়ে ডিমিট্রভের যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি, তা নিশ্চয়ই ঠিক। আবার বলেছেন—'সেইজন্যেই কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্টের Initiator, organiser এবং Driving force বলতে কি বোঝায় তাও তাঁরা বুঝতে পারেন নি।' কারণ তুষারবাবুর মতে মার্কসবাদের ভাষায় Driving force মানে অন্য সব দলকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মার্কসবাদের কোন্ অভিধানে তুষারবাবু পেয়েছেন তা তিনিই জানেন। আমরা জানি Driving force মানে চালিকা-শক্তি। অন্য যে সব দলগুলি class collaboration-এ বিশ্বাসী কিন্তু reformist or legalist illusion-এ ভুগছে, তাদের সকলকে উৎসাহ ও অনুপ্রাণিত করে তাড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে যুক্তফ্রন্ট গড়া যায়। তবে সেটা ডিমিট্রভের যুক্তফ্রন্ট হবে না। উৎসাহ দিয়ে ও অনুপ্রাণিত করে এই জড়ো করবার দায়িত্ব পালন করেছেন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি বিহারে জনসংঘ, উত্তরপ্রদেশে স্বতন্ত্র ও জনসংঘ আর পাঞ্জাবে আকালীদের সঙ্গে। এই সব দক্ষিণ প্রতিক্রিয়ার অঙ্গে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল, সেই যুক্তফ্রন্ট ডিমিট্রভে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সেখানে কো কমিউনিস্ট পার্টি না থাকাতে 'লীড রোল'-এ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। কার যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টি অন্য দল গুলির লেজুড়বৃত্তি করবার জন্য থাকতে পারে না। এই লেজুড়বৃত্তি 'টেইলিজম্' সম্পর্কে কমরেড লেনিনের বহু সতর্ক বাণী আছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আবিষ্কার করেছেন যে, আভিধানিক অর্থে 'ড্রাইভিং ফোর্স' হতে চেষ্টা করেছে সি-পি-এম। অর্থা জবরদস্তি অন্য সব দলকে চালাতে চেষ্টা করেছে। এখানেই তুষারবাবু তাঁর রাজনৈতিক সুবিধাবাদকে আর চাপা দিয়ে রাখতে পারেন নি। বিধানসভায় সর্ববৃহৎ দল হয়েও যখন সি-পি-এম অন আর একটি দলের মুখ্যমন্ত্রিত্বে রাজী হয় তখন সেটা কি জবরদস্তির লক্ষণ। কিংবা ৩৩ জন বা ৩০ জন এম-এল-এর দলকে যে অনুপাতে মন্ত্রিদপ্তর দেওয়া হয়, সেই অনুপাতে যখন ৮৩ জন এম-এল-এর দলকে দেওয়া না হলেও তাতে রাজী হওয়া কি সি-পি-এমের জবরদস্তির লক্ষণ। কিম্বা শরিক দলগুলির মন থেকে মিথ্যা সন্দেহ দূর করবার জন্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরের কাজকর্মে পরামর্শের জন্য 'অ্যাডভাইসরি কমিটি'-র দাবি সি-পি-এমের পক্ষে স্বীকার করাটা কি জবরদস্তির কথা! আসলে সি-পি-এমের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের যে ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা চলেছে, তার থেকে তুষারবাবুও নিজেকে আলাদা করতে চান নি।

পরিশেষে তিনি যুক্তফ্রন্টের সংকটের জন্য মূলত সি-পি-এমকে দায়ী করতে চেয়েছেন। পশ্চিম বাংলার যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ তিনি ধরতে পারেন নি। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি সকলের কমবেশি 'লিগালিস্ট' আবার কেউ বা 'রিফরমিস্ট'- কিন্তু সকলেই শ্রেণী-সমঝোতায় বিশ্বাসী। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই শ্রেণী-সমঝোতার বিরোধী। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী। আসল সংকটটা এখানেই ছিল। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় মুখ্য ও উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ উত্তর-প্রত্যুত্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই এই সত্য আত্মপ্রকাশ করবে। রাজনীতি-সচেতন প্রতিটি মানুষ এটা সহজেই বুঝতে পারেন। কিন্তু সুবিধাবাদের স্বভাব হচ্ছে কোন সমস্যার সমাধান বা প্রকৃতি নির্ণয়ের পথকে সে এড়িয়ে যাবে এবং সর্বদা মধ্য পথ খুঁজে বার করবে।

—সত্যপ্রিয় দাশ ও কুমার সেনবর্মা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছয় ॥
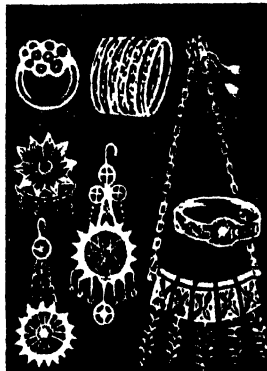
এইভাবেই এগিয়ে চললো "বিশ্বরচনা" বইয়ের কাজ। প্রথম অধ্যায় "পরমাণু-লোক"-এর লেখা শেষ করে গুরুদেবের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে দু' সপ্তাহের মধ্যেই। তারপর দ্বিতীয় অধ্যায় "সৌর-জগৎ"-এর লেখা শেষ হলো মাসখানেকের মধ্যেই। সেই লেখাটা ওঁর হাতে দিতে গিয়ে দেখি, ক্ষিতিমোহনবাবু ও শাস্ত্রী-মশাই বসে আছেন, ঘরের আবহাওয়া বেশ থমথমে, ঝড়ের পূর্বলক্ষণ বলেই আশংকা হলো। কারণ যা শুনলাম, তা হলো জার্মানী থেকে এক বন্ধু গুরুদেবকে একটি দামী 'ফাউণ্টেন পেন' উপহার দিয়ে-ছিলেন ওঁর জন্মদিনে। সেই মূল্যবান জিনিসটির সেদিন নাকি অন্তর্ধান ঘটেছে টেবিল থেকে। কয়েক ঘণ্টা আগেও তিনি ঐ কলম দিয়ে লিখেছেন, একবার মাত্র ঘর ছেড়ে দশ-পনের মিনিটের জন্য অন্যত্র গিয়েছিলেন, তারপর ফিরে এসে দেখেন কলমটি যথাস্থানে নেই। সম্ভাব্য, অসম্ভাব্য সব জায়গাতেই কলমের জন্যে খোঁজ করা হয়েছে, কিন্তু সন্ধান মেলে নি। বাড়ির প্রত্যেকেই খুঁজেছেন—এমন কি রথীবাবু, প্রতিমা দেবী পর্যন্ত, কেবল পুরাতন ভৃত্য বনমালী বাদে। সেই নাকি শেষ ভরসা, অনেক হারানো জিনিস ওর হাত দিয়ে উদ্ধার হয়েছে। বনমালীকে বোলপুর পাঠানো হয়েছে, সে ফিরে এসে শেষবারের মতো খুঁজে দেখবে সেই ভরসায়ই বসে আছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে বনমালী ফিরে আসতেই গুরুদেব তাকে বললেন—"আমার কলমটা হারিয়ে গেল তোমরা এতো লোক থাকতে।" বলতেই যে-টেবিলটায় বসে তিনি লিখছিলেন, বনমালী সেদিকে একটু এগিয়ে গিয়েই বলে উঠলো—"এজ্ঞে বাবুমশাই কলম তো হারায় নি, এতো রয়েছে আপনার কাছেই।" গুরুদেব বললেন—"কোথায়, দাও তো দেখি।" বনমালী—"তা পারব না, কলম রয়েছে আপনার কানে।" কানের উপরকার শুভ্র কেশগুচ্ছ একটু সরিয়ে কলমটি টেনে বার করলেন গুরুদেব। প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরে উঠল, বললেন—"কখন লেখার ফাঁকে কলমটা কানে গুঁজে বসে আছি মনে নেই। বনমালী আবার রসিকতা করে কবিত্ব করলেন, 'কলম রয়েছে কানে, কী করে হাত দিবেন তিনি ওখানে'।" ক্ষিতিবাবু ও শাস্ত্রীমশাইকে উদ্দেশ করে বললেন—"এভাবে জিনিস হারানো আমাদের পরি-বারের একটা বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে বড়দা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়) কিন্তু সবাইকে হার মানিয়েছেন—একদিন নিচু বাংলার পূবদিকের বারান্দায় বসে লিখ-ছিলেন, হঠাৎ আবিষ্কার করলেন তাঁর চশমা গেছে হারিয়ে। সে এক তুমুল কাণ্ড, চোখের উপর থেকে চশমা হারানো! বাড়ির সবাই মায় বড়বৌমা খুঁজে হয়রান, চশমা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মুনীশ্বর (পুরনো ভৃত্য) কোথায় একটু গিয়েছিল, ফিরে আসতেই তাকে বললেন—'তোমরা এতো সব তত্ত্বাবধায়ক থাকতে আমার চশমা গেল হারিয়ে।' মুনীশ্বর বড়দার দিকে একবার তাকিয়েই বলে উঠলো—'বাবুমশাই চশমা তো আপনার কপালে রয়েছে।' বড়দা তখন কপালের উপর থেকে চশমা নামিয়ে চোখের উপর রেখে বললেন—'তাই তো বলি মুনীশ্বর না হলে কে আর হারানো জিনিস খুঁজে বের করবে!' কলমটা আমার তো তবু কানে চুল দিয়ে ঢাকা, হঠাৎ চোখে পড়ে না, বড়দার চোখের ঠিক উপরেই চশমাটা, তাও গেল হারিয়ে।" আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—'দাও দেখি লেখাটা।' দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি 'সৌরজগৎ' ওঁর হাতে তুলে দিলাম। একটু দেখেই বললেন—'পরমাণুলোকের পরে নক্ষত্রলোক এলে ভালো হয়, তারপর 'সৌরজগৎ' বা 'সৌরলোক', তারপর গ্রহলোক, ভূলোক, ইত্যাদি।" ক্ষিতিবাবু ও শাস্ত্রীমশায় সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন।

কলমটা ফিরে পেয়ে গুরুদেব বেশ প্রসন্ন। দার্শনিক তথ্য নিয়ে ওঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন। তারপর আমাকে বললেন—"তোমার পরমাণুলোক রচনাটা পড়ে একটা জিনিস আমায় ভাবিয়ে তুলেছে—বলেছ, সমধর্মী বৈদ্যুৎ-দলের মধ্যে একটা স্বভাবগত বিরুদ্ধতা আছে, এদের টানটা বিপরীত পক্ষের

থেকে।" আমার মনে এই প্রশ্ন জেগেছে—"এই যে প্রোটোনের দল, কেন্দ্রের বাইরে যাদের চিরানন্দ্যতা, কেন্দ্রের ভিতরে তারা কেমন করে, কোন্ শক্তির প্রভাবে, স্বজাত-ঠেলা-মারা মেজাজ নিয়ে বিরোধ মিটিয়ে পরমাণুর শান্তি রক্ষা করছে। কেন্দ্রের বাইরে এদের ঝগড়া মেটে না, কেন্দ্রের ভিতরে এদের মৈত্রী। অদ্ভুত, এ যে একটা বিষম সমস্যা।" বললুম—"একটা বিশেষ নৈকট্যের মধ্যে এলে প্রোটোনের দল তাদের পরস্পর ঠেলাঠেলি চুকিয়ে দিয়ে প্রবলতর এক আকর্ষণের টানে বাঁধা পড়ে! এই নৈকট্য হলো এক ইঞ্চির বহু কোটি ভাগ, এই সীমানার মধ্যে এলে সমগোত্রীয় প্রোটোনদের ঠেলা-মারা শক্তি যত, তার চেয়ে অনেক বড়ো একটা শক্তির সীমানায় এরা ধরা পড়ে, সে হলো টানার শক্তি। এই শক্তিটা পরমাণুর অন্দরমহলে প্রোটোনকেও যেমন টানে, বৈদ্যুৎহীন ন্যুট্রনকেও তেমনি টানে। অর্থাৎ বৈদ্যুৎ-অবৈদ্যুতের উপর এর কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। এই অভিনব প্রবলতর আকর্ষণ শক্তিই সমস্ত বিশ্বকে বেঁধে রেখেছে। প্রকৃতির এই হলো অমোঘ শাসন, এই শাসনেই বিশ্বে একটা আপাত শান্তি বিরাজ করছে।" গুরুদেব বললেন—"তা হলে দেখা যাচ্ছে পরমাণুলোকের রাষ্ট্র-তন্ত্রে এমন একটা দুর্দমনীয় শক্তি আছে, যা সকল শক্তির উপরে, এরই শাসনে যারা স্বভাবত মেলে না, তারাও মিলে বিশ্বের শান্তি রক্ষা করছে। আর এও দেখছি, বিশ্বের শান্তি পদার্থটি নিছক ভালো-মানুষি শান্তি নয়। যত সব দুরন্তদের মিলিয়ে নিয়ে তবেই একটা ঘনিষ্ঠতর মিল হয়েছে; যারা স্বতন্ত্রভাবে সর্বনেশে, তারাই মিলিতভাবে সৃষ্টির বাহন।" বললুম—"তবে হাল্কা পরমাণুতে মৈত্রী এদের অটুট, কিন্তু অত্যন্ত ভারী যারা, যাদের কেন্দ্রবস্তুতে প্রোটোন-ন্যুট্রনের ভিড় জমেছে বেশি, যেমন য়ুরেনিয়ম, রেডিয়ম, থোরিয়ম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ, তাদের মধ্যে চলেছে একটানা দুর্নিবার প্রলয়কাণ্ড। এদের পরমাণুর মূল সম্বল ছিটকে পড়তে পড়তে হাল্কা হয়ে এরা এক থেকে অন্য রূপ ধরছে। এরা সর্বনাশের স্বরূপীন দল।" গুরুদেব একটু ভাবলেন, তারপর বললেন—"দেখো, বিশ্ব-রচনার মূল ব্যবস্থায় ধ্রুবত্বের পাকা সংকেত খুঁজে বের করা অসাধ্য। নিত্য বলে যদি কিছু থাকে, তবে সে কেবল এক আদি জ্যোতি, যা রয়েছে সব কিছুরই ভূমিকায়, যার প্রকাশের নানা অবস্থান্তরের ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে বিশ্বের এতো বৈচিত্র্য। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের নিদর্শন হলো মানুষের প্রাণ ও মন। অতি ক্ষুদ্র অবস্থানের মানুষের অহ, কিন্তু ইতিহাসের কণামাত্র অস্তিত্বতে মন বর্তমান, বিরাট বিশ্ব-সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীম বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অপরিমেয় বৃহৎ দূরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে। এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই যে, মানুষের মন বিশ্বের ঘটনাবলীর সব কিছুই জানছে। ভূমা বাইরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।" তারপর একটু থেমে বললেন—"এই আলোচনার বিষয়বস্তু যথাযথ লিখে রেখো, 'নক্ষত্রলোক' অধ্যায়ে এটা সন্নিবিষ্ট করলে ভালো হয়, পরমাণু সম্বন্ধে আলোচনাটা 'পরমাণুলোক' অধ্যায়ের শেষাংশে কোথাও দিয়ে দিও।" ক্ষিতিবাবু বললেন—"মাঝে মাঝে আপনার এরকম কলম হারালে আমাদের বেশ লাভ, আমরা জড়বিশ্ব ও মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে আপনার অপূর্ব দার্শনিক আলোচনা থেকে অমূল্য সম্পদ আহরণ করতে পারি—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।" গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"তা হারাক, কিন্তু খুঁজে পাওয়া চাই; একেবারে হারানোটা সইবে না, তখন কিন্তু দর্শনের বদলে বিকৃত-দর্শন অঘটন ঘটারই সম্ভাবনা বেশি। আপনি রসিক মানুষ, বিজ্ঞান ও দর্শন থেকে স্বচ্ছন্দে রস-আস্বাদন করতে পারেন।" ক্ষিতিবাবু ও শাস্ত্রীমশায় বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, ঠিক সেই মুহূর্তে শাস্ত্রী-মশায়ের মাথার উপর ঘরে যে-ইলেকট্রিক বাল্‌বটি ছিল, তা সশব্দে ফেটে গিয়ে কাঁচের টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই অতর্কিত আক্রমণে শাস্ত্রীমশায় বিভ্রান্ত হয়ে মাথায় হাত দিয়ে আত্মরক্ষার জন্য মেঝেতে বসে পড়লেন। গুরুদেব অবিচলিত, শাস্ত্রীমশায়ের দিকে চেয়ে তামাসা করে বললেন—"ঘোর কলিকাল, কোথায় ব্রাহ্মণের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হবে, তা না হয়ে অগ্নিবৃষ্টি।" শাস্ত্রীমশায় একটা অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দ্রুতবেগে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। চলে আসার উপক্রম করছি, এমনি সময় কৃষ্ণকৃপালনী এলেন। তাঁকে দেখেই গুরুদেব বললেন—"কি, বন্ধুর সন্ধানে এসেছ? তিনি ছুটি নিয়ে কলকাতা গেছেন। 'নিমাই'-এর ভূমিকায় তোমার শিক্ষানবিশি শেষ হওয়ার আর কত বাকি। তোমার টানের কেন্দ্রটি তো এখানেই।" কিছু বুঝতে না পেরে কৃষ্ণ ও আমি তাকিয়ে রইলাম। গুরুদেব ক্ষিতিবাবুকে বললেন—"মনে হচ্ছে, 'নিমাই' থেকে কী করে 'জামাই'-এ প্রমোশন পাওয়া যায়, আপনার সেই গল্পটা ওদের জানা নেই, তাই রসগ্রহণ করতে পারলো না।" তারপর কৃপালনীর দিকে তাকিয়ে বললেন—"মনে হচ্ছে, তোমার শিক্ষানবিশির সময়টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখন ছুটি নিয়ে দাঁত তোলাবার অছিলায় ঘন ঘন কলকাতা যাতায়াত করছেন। দাঁত তো জানি বত্রিশটার বেশি থাকে না, অথচ তাঁর প্রার্থিত ছুটির ফর্দ যোগ করলে দেখা যাবে, দাঁতের সংখ্যা বত্রিশের কোঠা পেরিয়ে প্রায় চৌষট্টির কোঠায় এসে ঠেকেছে।"

ক্ষিতিবাবুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম ওঁর "নিমাই-জামাইয়ের" গল্পটা কি। যা বললেন তা হলো—আজকাল 'কন্‌ভোকেশন্' হয়, তাতে 'ডিগ্রি' বা উপাধিপত্র বিতরণ করে। প্রাচীনকালেও আশ্রমিক শিক্ষায় ছেলেরা গুরুর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে এসে বাস করে শিক্ষা গ্রহণ করতো। শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরু তাদের 'সমাবর্তন' দান করতেন, অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের শিক্ষান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের পাশপোর্ট তারা পেত। এই 'সমাবর্তনই' হলো আজকের দিনের 'কন্‌ভোকেশন্'। এক গুরুর আশ্রমে একটি বয়স্ক ছেলে সমাবর্তনের জন্য এলো। পড়াশুনোয়, কাজেকর্মে, গুরুর সেবায় তার মনোযোগের নিতান্ত অভাব। তাই গুরু তার উপর অত্যন্ত বিরক্ত। এদিকে তার দৃষ্টি গুরুর পরমাসুন্দরী কন্যার দিকে, কাজেই শিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক কোথায় ও কী, তা সুস্পষ্ট হলো সহপাঠীদের কাছে। তারা বললো, গুরু যতদিন না প্রসন্ন হয়ে তাকে সমা-বর্তন দিচ্ছেন, ততদিন গৃহী হবার অধিকার তার হবে না, কেউ তাকে কন্যা-দান করবে না, গুরু তো নয়ই। কী করা যায় এ নিয়ে ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে ছেলেটি একদিন গুরুকন্যাকে নিভৃতে পেয়ে তার মনের কথাটা জানালো। মেয়েটি তাকে এই পরামর্শ দিলো যে, গুরু যখন তার উপর বিরূপ, তখন প্রথমে তাঁকেই তুষ্ট করতে হবে যাতে ছেলেটির উপর তাঁর আস্থার ভাব জাগে। তারপর ধীরে ধীরে সমাবর্তন পাবার অবস্থা সৃষ্টি হবে। তাই প্রথমেই সে গুরুর একনিষ্ঠ সেবায় আত্মনিয়োগ করলো; দেখলো রোজ প্রত্যূষে গুরু নিমের ডাল দিয়ে দন্তমার্জন করেন। রোজ শেষরাত্রে উঠে নিমগাছে চড়ে ডাল ভেঙে দাঁতন নিয়ে গুরুর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। গুরু ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে এলেই তাঁর হাতে দাঁতনটি তুলে দেয়। এভাবে কয়েকদিন গেলে গুরু বললেন, "দেব-দ্বিজে তোর দেখছি ভক্তির উদ্রেক হচ্ছে।" গুরুর তুষ্টিবিধানের জন্য এভাবে কিছুদিন দাঁতন সরবরাহের পালা চলবার পর একদিন শেষরাত্রের দিকে প্রবল ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। গুরু শুয়ে শুয়ে ভাবছেন, এই ভীষণ দুর্যোগে আশ্রমবাসী ঐ শিষ্য কিছুতেই দাঁতন ভাঙতে গাছে

উঠবে না, যেভাবেই হোক তাকেই দাঁতন সংগ্রহ করতে হবে। যথাসময়ে তিনি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখেন, প্রবলবর্ষণ মাথায় নিয়ে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিমের দাঁতন হাতে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে কাঁপছে ছেলেটি। খুব খুশি হয়ে দাঁতনটি গ্রহণ করে গুরু সস্নেহে বললেন, "সত্যি তোর গুরুসেবা প্রশংসনীয়, কত কষ্ট করে রোজ তুই আমাকে নিমের ডাল ভেঙে দিস, আজ থেকে তাই তোর নাম দিলাম 'নিমাই'। প্রশান্ত হাসিতে ছেলেটির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল "গুরুদেব, কাল থেকে তাহলে 'জামের' ডালই ভেঙে দেব।" রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম। ক্ষিতিবাবু বললেন, "তাহলে রসবোধ আছে, মাঝে মাঝে এসো গল্প করা যাবে।" কথা বলতে বলতে তাঁর বাড়ির দরজায় এসে পৌঁছালাম. ঠানদি (ক্ষিতিবাবুকে শান্তিনিকেতনে সবাই বলতো 'ঠাকুর্দা', আর ওঁর স্ত্রীকে 'ঠানদি') দরজায় দাঁড়িয়ে লণ্ঠন হাতে। ঘরের বারান্দায় মোড়া পাতা ছিল, বসতে বললেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর বললেন—"এই দেখো একটা ছোটো ঘটনা মনে পড়ে গেল। দেখছো তো আমার দশাসই চেহারা, ওজন আড়াই মণের কম নয়; তোমাদের ঠানদি কিন্তু বরাবরই তন্বী, শরীরে কোনোদিন জোয়ার-ভাঁটা খেলতে দেখিনি। বিয়ের পর আমার বন্ধুরা ওঁকে দেখে বললেন, "ক্ষিতিমোহন, তোমার স্ত্রী কিন্তু দারুণ রোগা।" বললাম, "হ্যাঁ, বাইরে রোগা, কিন্তু ভিতরে দারোগা"।"

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসছেন কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে। তাঁদের ইচ্ছা ইন্দিরা কিছুদিন এখানে থেকে শিক্ষাভবনে লেখাপড়া করুক। কমলাদেবী অসুস্থ, চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠানো দরকার হতে পারে। আর পণ্ডিতজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অক্লান্ত যোদ্ধা—এই মহান ব্রতে জীবনযাত্রার যে-সুনির্দিষ্ট ধারা বেছে নিয়েছেন, তাতে যে-কোনোদিন বিদেশী শাসকের রুদ্ররোষে তাঁকে হয়তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাবরণ করতে হবে। এই অবস্থায় ইন্দিরার পড়াশুনোর কোনো বিঘ্ন যাতে না ঘটে, তার জন্যে ওকে আশ্রমে রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন। গুরুদেব ও তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির উপর পণ্ডিতজীর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা, ইন্দিরা যাতে এই শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে এই ছিল তাঁর মনের একান্ত বাসনা। যেদিন তিনি কমলাদেবী ও ইন্দিরাকে নিয়ে শান্তিনিকেতন এলেন, সেদিন বিকেলে গুরুদেব সব অধ্যাপক ও কর্মিমণ্ডলীকে আমন্ত্রণ জানালেন উত্তরায়ণে। পণ্ডিতজীর সঙ্গে উপস্থিত সকলের পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারপর ডক্টর সেনকে ডেকে বললেন, "ধীরেন, জহর-কমলা ওঁদের ইন্দিরাকে রেখে যাচ্ছেন তোদের কাছে, ওর মা-বাবার অভাবটা এখানে কিন্তু তোদেরই পূরণ করতে হবে।" অধ্যাপকমণ্ডলী থেকে পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করা হলো কিছু বলতে। তিনি ইতিহাস ও ভারতের অখণ্ডতা নিয়ে ইংরেজিতে একটানা দেড় ঘণ্টা ধরে এমন একটি সারগর্ভ ভাষণ দিলেন যার তুলনা হয় না। এমন অপূর্ব দীপ্ত ভাষণ এর আগে শুনি নি, অনেকক্ষণ অভিভূত হয়েছিলাম। ইন্দিরাকে আশ্রমে রেখে পণ্ডিতজী ও কমলাদেবী এলাহাবাদ চলে গেলেন। ইন্দিরা শান্ত, সুন্দর, স্বল্পভাষিণী, বুদ্ধিদীপ্ত মুখশ্রী। আশ্রমের জীবনধারার সঙ্গে এমন সহজ ও সরলভাবে মিশে গেল যে, সবাই ওকে খুব স্নেহ করতেন। নেহেরু-পরিবারের আভিজাত্যের এতটুকু গর্ব ওর মধ্যে ছিল না, ছিল একটা দৃঢ় অনমনীয় অথচ সুন্দর মধুর ব্যক্তিত্ব। কোনো কাজের ভার দিলে অম্লান বদনে, হাসিমুখে তা সুসম্পন্ন করতো।

'রবিবাসরীয় আলোচনার' এক অধিবেশন হলো শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের উপস্থিতিতে। বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও গুণীজন এলেন প্রবীণ সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে। অধিবেশন বসেছে উত্তরায়ণে গুরুদেবকে প্রধান অতিথি করে। জলধরদা একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর ভাষণ দিলেন। তারপর শুরু হলো আলোচনা —এক নবীন আধুনিক কবিতা লেখক হঠাৎ গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি তো বলেছিলেন যে, মেয়েদের পুরো নাম ও পদবী না লিখে শুধু নামের শেষে দেবী লিখলেই ভালো হয়—যেমন শ্রীমতী মায়ারাণী সরকার না লিখে শুধু 'মায়া দেবী' বললেই হয়।" গুরুদেব বললেন—"বলেছিলুম কি হে, এখনো তো তাই বলি"। নবীন কবি বললেন—"কিন্তু তাতে তো মহিলার জাত বোঝা যাবে না, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র"। গুরুদেব বললেন—"মেয়েজাত এটাতো বোঝা যাবে তাহলেই যথেষ্ট, এর বেশি আর কি দরকার"। নবীন কবি নাছোড়বান্দা, আবার বললেন—"কিন্তু বিবাহিতা কি অবিবাহিতা তাতো বোঝা যাবে না"। গুরুদেব সহাস্যে কৌতুক করে বললেন—"তোমার প্রয়োজন হলে খবর নিও"। চারদিক থেকে হাসির রোল উঠল, নবীন কবির প্রগল্‌ভতা এভাবে মার খেয়ে থেমে গেল। জলধরদা তো রেগে আগুন, নবীন কবিকে ধমকে বললেন—"কেমন হলো তো, বার বার তোমাকে নিষেধ করেছিলাম গুরুদেবের সামনে বাচালতা করো না।" নবীন কবির 'দীপ্তি' এর পর এমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল যে, অধিবেশনের বাকি সময়টুকু তিনি একেবারে নির্বাক হয়ে রইলেন। অধিবেশন শেষে কবি ও সাহিত্যিক দল ফিরে যাবার আগে একটু বিশ্রাম করছিলেন, তখন পাঠভবনের ছেলে-মেয়েরা ভিড় করে এসে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবিদের কাছ থেকে তাঁদের অটোগ্রাফ আদায় করে নিচ্ছিল। জলধরদার কাছে ভিড় করেছে মেয়েরা, আর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশায়ের কাছে জুটেছে ছেলের দল। জলধরদা মেয়েদের অটোগ্রাফের খাতার কোনোটাতে লিখছেন "দেশের মা হও", কোনোটাতে "মহীয়সী নারী হও", কোনোটাতে "সতী সাবিত্রী হও" ইত্যাদি। পাঠভবনের একটি গোবেচারা ছেলে বহু চেষ্টা করেও ছেলেদের ব্যূহভেদ করে তার খাতাখানা উপেনবাবুর হাতে পৌঁছে দিতে, বিফল হয়ে মেয়েদের ব্যূহের প্রান্তদেশে এসে অনেক কষ্টে খাতাখানা কোনোরকমে জলধরদার হাতে পৌঁছে দিল। জলধরদা সঙ্গে সঙ্গে তাতে কিছু লিখে সই করে ফেরৎ দিলেন। ছেলেটি খুব খুশি হয়ে খাতাখানা খুলে জলধরদার 'বাণী' পড়েই একেবারে চুপসে গেল। আর্টিস্ট পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী তখন গল্প করছিলেন উপেনবাবুর কাছে বসে। ছেলেটির মুখের নিদারুণ ভাববিপর্যয়ে পূর্ণচন্দ্র ওর খাতাখানা নিয়ে দেখলেন, তাতে বেশ বড়ো বড়ো অক্ষর সাজিয়ে জলধরদা লিখেছেন, "দেশের মা হও"। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন পূর্ণচন্দ্র; তাতে উপেনবাবুর দৃষ্টি এদিকে পড়লো. পূর্ণর হাত থেকে অটোগ্রাফের বইখানা প্রায় কেড়ে নিয়ে জলধরদার উদাত্ত 'বাণী' পড়েই চেঁচিয়ে উঠলেন. "জলধরদা, এ কী করেছেন, ছেলেটির যে জাত মেরে দিলেন! 'মা' এর সঙ্গে অন্তত আরো একটা 'মা' যোগ করে দিন, এ যাত্রা ওর জাতটা বাঁচুক।"

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কয়েকদিন পরে আমাদের শিবিরের কর্মাধ্যক্ষ আমায় ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, চিঠির লেখক আমি কিনা। আমি আজ অবধি জানতে পারি নি যে, এইভাবে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তিনি ওপরওয়ালার কাছ থেকে কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন, না তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে আন্দাজে ঢিল ছুড়েছিলেন? যাই হোক, আমি চিঠি লেখার কথা স্বীকার করি এবং কর্মাধ্যক্ষ আমাকে বলেন যে, সে জন্য আমাকে শাস্তি পেতে হবে। আমরা দ্বিতীয়বার মানিয়ানি—আমার 'পরই এক আদেশ জারি করা হয়েছিল শিবিরের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যে, বন্দীদের ভেতর কেউই তাঁদের অনুমতি না নিয়ে বাইরের কোন লোককে যে কোন কারণেই চিঠি লিখতে পারবে না। কাজেই আমি যে এই আদেশ অমান্য করেছিলাম, তাতে আর সন্দেহ কি? অবশ্য এ কথাও তাতে আর সন্দেহ কি? অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, আমার ঐ নালিশভরা চিঠি শিবিরের কর্তৃপক্ষ কখনোই পাঠাবার জন্য অনুমোদন করতেন না, কাজেই আদেশের অমান্য করা ছাড়াও আমার কোন উপায় ছিল না। যাই হোক, আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হবে তা দেখাবার জন্য কর্তৃপক্ষ শিবিরের প্রত্যেক বন্দীকে একত্রিত করেন, তাতে প্রায় চার হাজার কালো আফ্রিকান ছিল। কর্মাধ্যক্ষ তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এই মোয়াংগি নিজেকে তোমাদের সকলকার মুখপাত্র বলে মনে করে। আসলে লোকটা বড় ভয়ানক, কেবলি সে শিবিরের বিরুদ্ধে নালিশ করে বাইরে চিঠি লেখে, যদিচ এরকম কাজ সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ। কিছুদিন আগে আমরা ওর ওপর দয়া করে দক্ষিণ য়্যাটায় পাঠিয়েছিলাম এই আশায় যে, সেখানে ভাল ব্যবহার করে শেষ অবধি ছাড়া পাবে হতভাগা। কিন্তু সেখানে গিয়েই আবার সেই চিঠি লেখার অপরাধে তাকে ফেরৎ আসতে হয়েছে মানিয়ানিতে। তার পর এখান থেকে আবার একটা নালিশভরা চিঠি পাঠিয়েছে বদমাশটা এই শিবিরের বদনাম করে। এ কাজের সাজা এবার দেওয়া হবে ওকে এবং তোমাদের সবাইকে আমি সাবধান করে দিতে চাই যে, যদি কেউ ওর মতো চিঠি লেখার চেষ্টা করো, তাহলে তার অবস্থাও আমরা সঙ্গীণ করে তুলবো।" এর পর আমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে একজন মুকামবা সৈনিক বারো ঘা বেত মারে আমার পাছায়। এতো ব্যথা আমি আর কখনো পাই নি আমার জীবনে এবং বেতের ঘায়ে আমার পাছা কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে। বন্দীরা সবাই আমার দুর্দশা আর ক্ষীণ, অবশ চেহারা দেখে রাগে-দুঃখে একপাল মৌমাছির চাকে ঢিল পড়ার মতো গুঞ্জন করে উঠেছিল। তারা সবাই জানতো যে, এমনিতেই ছয় নম্বর তাঁবুর বন্দীদের ওপর খুব বেশি দুর্ব্যবহার করতেন কর্তৃপক্ষ এবং প্রায়ই খাওয়া জুটতো না তাদের, ফলে তারা সবাই রুগ্ন হয়ে পড়েছিল, আর তার ওপর এই নির্দয় মার! এতো শারীরিক কষ্ট সত্ত্বেও আমি কিন্তু ভেঙে পড়ি নি, কারণ মনে মনে আমি জানতাম যে, উচিত কাজই করেছি আমি এবং বন্দীরা সকলেই আমার কাজের সমর্থন করছে। এই রকম মনোবলকে কখনোই মেরে বা আঘাত করে নষ্ট করা যায় না এবং মানিয়ানির কর্তৃপক্ষও সেদিন পারেন নি। কিন্তু মোট কথা এই যে, শাসকগোষ্ঠী কবে এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারবেন যে, এভাবে শাসিতের মনকে শুধু আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করতেই সাহায্য করছেন তাঁরা? যদি কেউ কোনো দোষ করে থাকে, তবে হয়তো তাকে মেরে শায়েস্তা করা যায়, যদিচ সে সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু যদি উচিত কাজ করার ফলে কাউকে মারধোর করা হয় (অন্তত সে যদি মনে করে যে, সে উচিত কাজ করছে) তাহলে তার জেদ শুধু আরও বেড়ে যাবারই কথা। এভাবে আমার ওপর মারধোর করে করে কর্তৃপক্ষ শুধু আমার মনকে ক্রমাগত বিষিয়েই তুলছিলেন এবং আমাকে এক শহীদে পরিণত করছিলেন এবং তা তাঁদের পক্ষে মোটেই লাভজনক ছিল না। এজন্যই আগে বলেছি যে, মানিয়ানি এবং কেনিয়ার অন্যান্য বন্দিশিবিরে ক্রমশই শাসক এবং শাসিত দু' দলই সাধারণ মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়িয়ে অমানুষে পরিণত হতে চলেছিলেন ধাপে ধাপে। শাসকবৃন্দ বুদ্ধির ব্যবহার করার বদলে তাঁদের ভাবাবেগের দ্বারায় পরিচালিত হয়েছিলেন, আর শাসিত কোণঠাসা অবস্থায় পড়ার ফলে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তখন আর প্রাণ যাবার ভয়ও তাদের ছিল না।

বেত্রাঘাতের পর কর্মাধ্যক্ষ আমাকে আদেশ করেন সকলকার সামনে স্বীকার করার জন্য যে, আমি আর কখনো এভাবে নালিশ করে চিঠি লিখব না। হায়, মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের দিক থেকে এর চেয়ে বেশি ভুলের কাজ আর বোধহয় তিনি করতে পারতেন না, কারণ আমার উত্তরে আমি মনের সমস্ত বিষ ঢেলে দিয়ে আগের মতোই আবার বলেছিলাম যে, "যদি কর্তৃপক্ষ আমাদের ওপর খারাপ ব্যবহার করা বন্ধ করেন, তাহলেই আমি চিঠি লেখা বন্ধ করবো, নচেৎ কেউই আমাকে নালিশ করা থেকে নিরস্ত করতে পারবে

মা, মেরে বা জ্বালা আমি। মেরে ফেললেও অবশ্য কোন লাভ হবে না। কারণ আমার দেশের লোকেরা তাহলে জানবে যে, আমি তাদের জন্য এবং সত্য-রক্ষার জন্যই প্রাণ দিয়েছি, কাজেই এতে কোনিয়া সরকারের কলঙ্ক বাড়বে বই কমবে না।" আমার এই উক্তিতে কর্মাধ্যক্ষ আরও বেশি রেগে গিয়ে আমাকে সাত-দিনের জন্য নিঃসঙ্গ কারাবাসের আদেশ দেন। কিন্তু সেখানে নিয়ে যাবার আগে প্রথমে আমাকে শিবিরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কারণ আমার পাছা থেকে তখনোও রক্তপাত হচ্ছিল সমানে। হাসপাতালে যে বন্দীরা ডাক্তারের সহায়ক হিসেবে কাজ করতো, তারা সকলেই আমার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে এবং এই বলে আমাকে সান্ত্বনা দেয় যে আমার দীর্ঘচিত কার্যে মানিয়ানির প্রত্যেক বন্দী আজ গর্ব অনুভব করছে। [illegible] আমি যথেষ্ট শক্তি-[illegible] কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য। ক্ষতস্থানে মলম [illegible] লাগাবার পর আমাকে শিবিরের [illegible] কাছে অবস্থিত এক বিশেষ "[illegible]" নিয়ে যাওয়া হয় বন্দী করে [illegible]।

এই "কারাগার" দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাত্র [illegible] এবং চার ফুট, চারিদিকে টিনের [illegible] দেয়াল। কোনরকম জানালা ছিল না তাতে। এইরকম ঘর মোট [illegible] ছিল সে সময় মানিয়ানিতে। এক [illegible] চারটে করে। আমি সেখানে কোনরকম খাবার বা জল পাই নি ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার জন্য, তার ওপর আবার কেউ দয়া করে মেঝেতে এক বালতী জল ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল, ফলে সেখানে বসা বা শোওয়াও ছিল কষ্টকর। মানুষ কতো ক্রূর হতে পারে মানুষের ওপর! যাই হোক, আমার পক্ষে কিন্তু মেঝের এই জল শাপে বর হয়েছিল। কারণ তিনদিন অবধি এই জল শুকোয় নি এবং আমিও প্রয়োজন মতো জিব দিয়ে মেঝের মাটি চেটে তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হয়েছিলাম কোনো রকমে। এই তিনদিন আমি স্থির-মস্তিষ্কে ভাবতে পেরেছিলাম এবং নিজের সঙ্গে সরবে কথাবার্তা বলে সময় কাটিয়ে-ছিলাম। চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে ক্রমাগত আমার গা বেয়ে ঠাণ্ডা জল বেরিয়েছিল, ঘামের মতো। কেউ আমাকে দেখতে আসে নি বা একফোঁটা খাবার এগিয়ে দেয় নি মুখের কাছে। পরের দু'দিন আমার চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছিল এবং নানারকম বিকৃত ভয়-ভাবনার চাপে আমি অবশ হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, যেন বিরাট বিরাট পাগড়ী মাথায় ভারত-বর্ষের শিখদের মতো লোকেরা আমার

[illegible] জেমসন্যোর করেছে, আজকে শাড়ির [illegible] টক্টকে লাল; রং-বেরং-এর তারা আমার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছিল; বৃদ্ধা ভগ্নদেহ কিকুয়ু নারীরা নেচে বেড়াচ্ছিল; সর্বোপরি আমার চারিদিকে সব সময়ই যেন প্রচুর লোকজন চলাফেরা করছিল, তাদের ভিড়ে আমি হাঁফিয়ে উঠছিলাম। তাদের কারুরই মুখ আমি ঠিক চিনতে পারি নি। কিন্তু তবু যেন সবাই আমার জানা লোক। মনে হয়েছিল, আমার বিগত জীবনের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। কিন্তু একটায় থাকে অন্যটা মিশিয়ে গিয়ে নিকেন জগাখিচুড়ি পেকে যাচ্ছিল। অষ্টম দিনে আমি আর কোথায় আছি বা কি করছি তা বুঝতে পারি নি, আমার মন এবং দেহ যেন একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। বেগে ধাবমান গাড়ির চাকার মতো আমার মনও বোঁ বোঁ করে ঘুরছিল, তারপরই মনে হল যেন খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ে গেছি আমি, মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে নিচের দিকে পড়ছি, পড়ছি, সেখানে গভীর ঘন জঙ্গল আমার জন্য অপেক্ষা করছে, এবং নিরবচ্ছিন্ন কালো অন্ধকার নিয়ে, ক্রমশই বড় ও গভীর হয়ে আসছে সেই চির অন্ধকার। তারপর সেই মহা-শূন্যের ভেতরই হঠাৎ অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে চারিদিক উজ্জ্বল নীল আলোয় ছেয়ে গেল—অনেক দূরে অবধি পরিষ্কার দেখতে পেলাম আমি, সব কিছুই সেই নীলের আভায় মাখান। বুঝতে পেরেছিলাম আমি যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত এগিয়ে আসছে আমার কাছে তার চিরশান্তির হাতছানি দিয়ে, কোন মতেই তাকে রোধ করবার ক্ষমতা নেই আমার, সে আসছে, আসছে। কিন্তু তার ভেতরই আমার মনের কোনো এক অজানা কোণ থেকে বেরিয়ে এলো দৃপ্ত শক্তি, হুংকার দিয়ে বলে উঠলো মৃত্যুর চিরশীতল ছায়াকে "না, যাব না আমি তোমার সঙ্গে, আমার এখনো অনেক কাজ বাকি আছে এই জীবনে। আমাকে আমার দেশের জন্য সংগ্রাম করতে হবে, মিথ্যার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতেই হবে।"

যদিচ আমি সে সময় জানতে পারি নি, আমার এই নিঃসঙ্গ কারাজীবনের ষষ্ঠ দিনে লাদ্ কামাউ গাথুমবি এবং তিনজন আরও চরমপন্থী বন্দীকে আমার পাশের খুপরীগুলিতে বন্দী করে রাখা হয়। তাদের অপরাধ ঃ তারা ১৩ নম্বর তাঁবুর কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত প্রতিনিধি আদমকে মেরেছিল। গাদ্ জানতো যে, আমিও ঐখানেই কোনো এক খুপরীতে বন্দী হয়ে আছি, কাজেই তার পরের দিন সকালে (আমার সপ্তম দিনে) বন্দীদের প্রাত্যহিক নাম ডাকার সময় আমাকে না

দেখতে পেয়ে বা কোনরকম সাড়াশব্দ না পেয়ে সে খুব অধীর হয়ে উঠে। সারাদিন ছটফট করার পর সন্ধ্যেবেলা জোর করে আমাদের ভারপ্রাপ্ত সৈনককে দিয়ে আমার খুপরীর দরজা খোলায় এবং আমাকে অচৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে। পরে গাদ্ আমাকে বলেছিল যে, তার প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে, আমি ইহকালের মায়া ত্যাগ করে পরকালে পৌঁছে গেছি। [illegible] ডাক্তার এসে আমাকে পরীক্ষা করেন এবং সৃষ্টি [illegible] আমার চৈতন্য ফিরিয়ে আনতে [illegible]। [illegible] আমার [illegible] করা হয় এবং গাদের [illegible] আমি জীবনশক্তি আমার ধীরে ধীরে ফিরে পাই। একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, গাদ না থাকলে ঐ খুপরীতেই আমার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে যেত সেবার।

রবিনসন কোয়ার্নিগ এ সময় এক নম্বর তাঁবুর প্রতিনিধি ছিল এবং আমার প্রতি বন্দিশিবিরের কর্তৃপক্ষ কিরকম দুর্ব্যবহার করেছিলেন, তার সবই সে জানতো। বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে সে ক্রমাগত ওপরওয়ালার কাছে নালিশ করতো এবং আমার মতো চেষ্টা করতো, যাতে আমাদের সকলকার অবস্থা আর একটু সহ্যকর হয়। অন্যান্য শিক্ষিত বন্দীদের ভেতর অনেকেই আমাদের এই প্রচেষ্টাকে পাগলামির সামিল ধরতো, তারা বুঝতে পারতো না যে, সরকার পক্ষে গিয়ে "বাছাইকারেরা" অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক জীবনযাপন না করে কেন আমরা বন্দীদের পক্ষে লড়ছি এবং ফলে ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক কষ্টভোগ করছি! কিন্তু এই সব লোকেরাই আসলে ভুল করছিল এবং বোধ হয় সেই জন্যই দ্যানিয়েল, যে কি সরকার পক্ষে যোগ দিয়েছিল, পরবর্তী জীবনে কেনিয়ার বিধানসভার নির্বাচনে বিফলকাম হয়েছিল। জনসাধারণ সে সময় সিদ্ধান্ত করেছিল যে, দ্যানিয়েলের মতো লোককে, যে দেশের প্রয়োজনের সময় দশকে নিরাশ করে শুধু নিজের সুখের জন্য বিপক্ষে যোগ দেয়, নির্বাচন করার থেকেও একজন অজানা লোককে নির্বাচিত করা শ্রেয়ঃকর হবে।

রবিনসন ক্রমাগত বন্দীদের হয়ে সংগ্রাম করার জন্য এবং সরকারের সঙ্গে আপোষ করতে অস্বীকৃত হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ তার ওপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে বদলী করে ৬ নম্বর তাঁবুতে, যেখানে প্রায় সমস্ত চরমপন্থী বন্দীদের রাখা হয়েছিল, পাঠিয়ে দেন। নিঃসঙ্গ কারাগারে সাতদিন শাস্তিভোগ করার পর ৬ নম্বর তাঁবুতে আবার ফিরে এসে রবিনসনকে দেখতে পেয়ে আমি অত্যন্ত

আনন্দলাভ করি, কারণ সে ছিল আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধুদের ভেতর একজন। পরের বার যখন সরকারী পরিদর্শক সমিতি আমাদের তাঁবুতে আসেন, রবিনসন বন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নালিশ করে এবং ফলে ৬ নম্বরের প্রায় সব বন্দীকে বদলী করে ২১ নম্বরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় ম্যাকিনন রোডস্থ "বিশেষ" বন্দিশিবিরকে কেনিয়া সরকার বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেখানকার প্রায় ৬০০০ বন্দীকে মানিয়ানিতে চালান করেন। তাদের কাছ থেকে আমরা এমন অনেক দুর্ব্যবহারের কাহিনী জানতে পারি যা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ ছিল না এবং ঐসব ঘটনা থেকে বুঝতে পারি যে, তাদের অবস্থাও আমাদের থেকে কোন অংশেই ভাল ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তৈরি উড়োজাহাজ রাখবার 'হ্যাঙ্গার'-এ তাদের শোবার বন্দোবস্ত ছিল এবং তার ভেতরের জায়গাকে জাল দিয়ে ভাগ করে করে খাঁচার মতো করে নেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকটি হ্যাঙ্গার-এ এক হাজার দুশোজন বন্দীকে শুতে হতো এবং এর বাইরে তারা কখনোই যেতে পেতো না, ফলে বেচারারা দিনরাত্রির প্রভেদই প্রায় ভুলে গিয়েছিল। যখন তাদের ঘুমোতে বলা হতো তারা ঘুমাতো, উঠবার জন্য ঘণ্টা বাজলে উঠতো। এতো লোকের একসঙ্গে বাস ও কলগুঞ্জনের ফলে সব সময়ই সেখানে মনে হতো যেন মৌমাছির চাকে ঢিল পড়েছে। তাদের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা প্রায় সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন, একজন জার্মান কর্মচারীও নাকি এই দলেই ছিলেন। মোট কথা, সেখানকার প্রায় প্রত্যেকটি বন্দীই শিবিরের অবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি।

রবিনসন ও আমি অনেক ভেবেচিন্তে আর একটি নালিশভরা চিঠি ওপরওয়ালার কাছে পাঠানর সিদ্ধান্ত করি এবং দু'জনে মিলে এর একটা খসড়া তৈরি করে ফেলি অবিলম্বে। এই চিঠিতে আমরা ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক কর্মসচিবকে আমাদের প্রত্যেকটি নালিশের বিষয় জানাই এবং বন্দিশিবিরের বাইরে অর্থাৎ আফ্রিকান রিজার্ভগুলির দুরবস্থার কথাও সবিশেষ বর্ণনা করি। কিছুদিন আগে আমরা "জেনারেল" কিবেরা গাটুর কাছ থেকে এ বিষয়ে ওয়েয়্যা টাইমস-এর এক বিশেষ সংস্করণে অনেক কিছু জানতে পারি। গাটু এবারডেয়ারের পাহাড়ী জঙ্গলের কাছে ওথাইয়া শহরতলীতে হঠাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে ধরা পড়ে এবং মানিয়ানি শিবিরে আমাদের তাঁবুতে চালান হয় বন্দিজীবন ভোগ করার জন্য। (গাটু এখন ওথাইয়্যাতে হোটেলের ব্যবসা খুলেছে)। সে আমাদের জানায় যে, রিজার্ভগুলিতে দিনের চব্বিশঘন্টার ভেতর তেইশ ঘন্টাকাল "সান্ধ্য আইন" জারি আছে এবং বাচ্চা, ছেলে, বুড়ো সবাই না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে। এর সঙ্গেই সে অবশ্য আরও বলে যে, আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতি এবং তাদের বিলেতের শাখা দপ্তর যতদূর সম্ভব গ্রামের ও রিজার্ভের লোকেদের দুঃখকষ্ট দূর করবার চেষ্টা করছেন এবং এই মহান্ কাজে অনেকগুলি খ্রিশ্চান মিশনারি সমিতিও চেষ্টার ত্রুটি করছেন না। বন্দীদের সবাই এই সংস্থাগুলির কাজের প্রশংসা করে এবং একবাক্যে স্বীকার করে যে, এঁদের সাহায্য না পেলে আরও অনেক সংখ্যক আফ্রিকান প্রাণে মারা পড়তো। আমাদের চিঠিতে আমরা আরও লিখি যে, মাইনা মাটাওয়া নামক এক বন্দী ম্যাকিনন্ রোডের শিবির থেকে অসহ্য দুর্ব্যবহারহেতু পালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে মারা পড়ে এবং সে বিষয়েও যথারীতি তদন্ত করা প্রয়োজন।

আমরা চিঠিখানি ডাকে দেবার জন্য আগের মতোই বন্দোবস্ত করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর একটা নকল আমাদের তাঁবুর খানাতল্লাসীর সময় বেরিয়ে পড়ে কর্তৃপক্ষের হাতে পৌঁছায়। এই নকলটি ওয়ামবুগু মানুগুয়া এবং নগুনুজিরি গিথিওমি নামক দু'জন নেয়েরী অঞ্চলের বন্দী, যে কাপড়ের থলেতে নিজেদের কাপড়-জামা রাখতো তার ভেতর লুকানো রাখা ছিল। এরা দুজনেই এখন নেয়েরীতে চাকরি করছে। চিঠির লেখক কে, এ বিষয় কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞাসা করায় আমি এর পুরো দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিই, কারণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে আমি রবিনসনকে বাধ্য করেছিলাম এই বলে যে, আমাদের দুজনকেই নিঃসঙ্গ কারাগারে চালান করে দিলে বন্দীদের পক্ষে লড়বার জন্য কেউ থাকবে না। রমুনি নামক একজন ইউরোপীয়ান কর্মচারী আমাকে চিঠির বিষয় জেরা করেন, তিনি রবিনসনের হাতের লেখা চিনতেন এবং আমার স্বীকারোক্তির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তিনি আমাদের দুজনকেই নিঃসঙ্গ কারাগারে পুরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি শেষ অবধি আমার জবানবন্দী পাল্টাই নি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন আমি ঐ চিঠি লিখি এবং আমার এই মর্মে উত্তর দেওয়ার, যে কারণসমূহ তিনি ভাল করেই জানেন এবং আমার চিঠিতেও তার উল্লেখ আছে, তিনি খুবই রেগে যান। তারপর চিঠিখানি কিভাবে আমি তাকে দিই সে কথাও তিনি জানতে চান। শিবিরের কোন প্রহরীর হাতে যে চিঠি বাইরে পাঠাই, সে কথা অবশ্য আমি তাঁকে একেবারেই বলতে রাজি ছিলাম না, যাতে আমাদের ভবিষ্যতের রাস্তা বন্ধ না হয়ে যায়। কাজেই আমি হেসে তাঁকে শুধু বলি যে, চিঠিখানি আমার বন্ধু ছোট্ট এক পাখী তার ঠোঁটে করে নিয়ে উড়ে গিয়েছিল। কর্মচারীটি এতে রেগে আগুন হয়ে যান এবং তখনি আমাকে নিঃসঙ্গ কারাগারে পাচার করেন। সেখানে আমার বন্ধু গাদ্ কামাউ গাথুমবি তখনো ছিল। এ দফায় আমি মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে জুন মাসের আট তারিখ অবধি নিঃসঙ্গ কারাগারে থাকাকালীন তার পাশের খুপরীতেই ছিলাম, কাজেই আমরা নিজেদের ভেতর কথাবার্তা বলতে পারতাম।

নিঃসঙ্গ কারাগারে নিয়মানুসারে আমরা অন্যান্য বন্দীদের তুলনায় মাত্র অর্ধেক খাবারই পেতাম, কিন্তু কয়েকজন বন্দী মিলে মাংসাদি ভাঁড়ার থেকে চুরি করে আমাদের কাছে পাচার করার বন্দোবস্ত করেছিল। তারা আমাদের ঘরের সংলগ্ন নালা পরিষ্কার করার সময় খাবার কাগজে মুড়ে নালার ভেতর পুরে বাইরে থেকে এক লম্বা লাঠি দিয়ে ঠেলে এপারে পাঠিয়ে দিতো। শিবিরের কর্তৃপক্ষ কেবল জানতেন যে, তারা ঐভাবে নালা পরিষ্কার করছে। এভাবে নালার ভেতর দিয়ে আসার সময় খাবারের গায়ে অল্পবিস্তর ময়লা লেগে যেত ঠিকই, কিন্তু আমরা আধপেটা খেয়ে খেয়ে এতোই ক্ষুধার্ত থাকতাম যে, সেই ময়লামাখা খাবারই নির্বিকারচিত্তে গলাধঃকরণ করে ফেলতাম। এই সময় কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সকলকার ওপর এই বলে দোষারোপ করেন যে, অনেকেই আবার শিবিরের ভেতরই "মানিয়ানি ২৫ থেংগে" নামক শপথ গ্রহণ করেছে। তাঁরা আরও বলেন যে, এই শপথ ২৫ নম্বর তাঁবুতে নেওয়া হয়েছে, যার প্রতিনিধি ছিল দ্যানিয়েল মাথেংগে নামক উত্তর টেটু জেলার একজন বন্দী। সে ১৯৫০ সালে সেখানকার কে-আ-ন্যা-ইউর সভাপতি নির্বাচিত হয়। কর্তৃপক্ষের এই দোষারোপের পেছনে কোন সত্যতাই ছিল না, কারণ আসলে পূর্বোল্লিখিত কয়োপ শিবিরেই শুধুমাত্র দুজন বন্দীকে শপথ দেওয়া হয়েছিল একবার। এইভাবে দোষারোপ করার অজুহাতে অবশ্য তাঁরা আর একদফা কয়েকজন বন্দীকে ধরে মারধোর করবার সুযোগ পান এবং বন্দীরাও অনেকে এই শপথ গ্রহণের কথা "স্বীকার" করে মার খাওয়ার হাত থেকে নিস্তার পেতে চেষ্টিত হয় এবং সমস্তটাই একটা প্রহসনের পর্যায়ে

গিয়ে পড়ে। অত্যাচার, উৎপীড়নের বোঝা এতো বোঝা হয়ে গিয়েছিল যে, সবাই চেষ্টা করতো শুধু কিভাবে যথাসম্ভব কম মিথ্যা কথা বলে কর্তৃপক্ষ যা শুনতে চান, তাই বলা যেতে পারে।

মোটামুটিভাবে বন্দীদের অবস্থা মানিয়ে নিতে সহনশীল ছিল এ সময়ে, তাই যেন হয় কর্তৃপক্ষ আবার হঠাৎ এক হুকুম জারী করেন যে, সব বন্দীর মাথার চুল সম্পূর্ণভাবে কামিয়ে ফেলতে হবে। এর বিরুদ্ধে আমরা প্রত্যেকে সবলে নালিশ করি, কারণ আমাদের সামাজিক নিয়ম-মাফিক কেবল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারাই চুল কামিয়ে ফেলে আর আমাদের, অর্থাৎ যুবকদের পক্ষে মাথার চুল কামান ছিল অপমানজনক। তা ছাড়া সেসব বন্দী সূর্যের প্রচন্ড তাপের ভেতর বাইরে কাজ করতো, তারা কিছু মাথা ঢাকার জন্য টুপি পেত না, ফলে সব চুল কামিয়ে ফেললে তাদের কষ্ট শতগুণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

[illegible] সময় তাঁহাদের [illegible] আক্রমণকালীন [illegible] অঞ্চলের এক সর্দারের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে জঙ্গলে লুক্কায়িত সংগ্রামীদের সঙ্গে থেকে কিছুদিন সশস্ত্র লড়াই করেছিল, তা ছাড়া সেখানকার [illegible] দলেও কিছুদিন ছিল। যে সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী সরকারের হাতে ধরা পড়ার পর অন্তত মৌখিকভাবে সংগ্রামীদের বশ্যতা স্বীকার করে নিত, তাদের নিয়ে তৎকালীন কেনিয়া সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে এই "নকল গুন্ডা"র দলগুলি তৈরি করেছিলেন। এদের ওপর আদেশ ছিল সংগ্রামী সৈনিক সেজে আবার জঙ্গলে ফিরে যাবার এবং সেখান থেকে সত্যকার সংগ্রামীদের ছলেবলে কৌশলে বার করে এনে সরকারের হাতে তুলে দেবার। এরা কেন এইভাবে বিদেশী সরকারকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হতো তা জানবার জন্য আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে পাঠককে ভালভাবে বোঝাতে গেলে অবশ্য গোড়ার কথা বলে নেওয়া দরকার যে, কেনিয়ার স্বাধীনতার জন্য যারা সশস্ত্র সংগ্রাম করেছিল, গোলাবারুদ বন্দুকের সাহায্যে, তাদের দু' দলে ভাগ করা যায়। প্রথম দলের নাম দিয়েছিলাম [illegible] 'ন[illegible]মুরা সিরা ইটা', অর্থাৎ [illegible] সৈন্যদল। এদের আমরা শ্রদ্ধাভরে অনেক সময় 'ইঁহি' বা 'অসান্ত' (অর্থাৎ খাঁটি) বলেও ডাকতাম। এদের কাজ ছিল জঙ্গলে লুক্কায়িত থেকে বৃটিশ সৈনিকদের বা কেনিয়া সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করা, যারা তাদের ধরবার জন্য জঙ্গলেও ধাওয়া করতো। ইঁহিরা ছিল কেনিয়ার ল্যান্ড ফ্রিডম্ আর্মি বা চাষ জমি মুক্তিকরণ সৈন্য দলের সদস্য এবং এদের গঠন ও শাসন পদ্ধতি যে কোনো দেশের সৈন্যদলের মতোই সুপরিকল্পিত এবং সম্বদ্ধ ছিল। জঙ্গলে তাদের থাকার জন্য প্রস্তুত বিভিন্ন শিবির-গুলির এক, দুই ইত্যাদি নম্বর দেওয়া ছিল যথাযথভাবে সুপরিকল্পিত যে কোনো সৈন্যদলের মতোই। মাঝে মাঝে ইঁহিরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কখনো বা আফ্রিকান রিজার্ভগুলিতে নেমে আসতো সেখানকার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য বা নিকটবর্তী কোনো শহর-তলীর অথবা বাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করবার জন্য এবং তারা তাদের রণভেরী বা বাঁশী বাজিয়ে বিপক্ষ দলকে যুদ্ধে আহ্বান করতো সরবে। তারা কখনোই সাধারণ নাগরিকদের ওপর আক্রমণ করে নি, শুধু যে সৈন্যরা ইঁহিদের আক্রমণ করতো, তাদের বিরুদ্ধেই তারা লড়তো প্রাণপণে এবং সুযোগ সুবিধা পেলে ঐ সব সৈন্যদলের ঘাঁটির ওপর চড়াও করতেও ছাড়তো না। যেমন পৃথিবীর সব দেশেই যুদ্ধরত সৈন্যদল "লড়াই" করে, ইঁহিরাও তাই করতো।

এদের দলের ভেতর খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের ভার ছিল "মুন্ডু মুগো ওয়া ইটা" অর্থাৎ দলের ভবিষ্যদ্বাণী করনেওয়ালার ওপর। সে তার অতি-মানবিক বা বিশেষ ক্ষমতার দ্বারায় ইঁহিদের উপদেশ দিতো কখন, কোথায়, কাকে, কিভাবে আক্রমণ করবে। ওয়ান-গোমবে রুগা নামক নেয়েরী অঞ্চলের একটি লোক, যার পূর্বপুরুষেরা সেখান-কার বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বাণী করনেওয়ালা ছিলেন, এবারডেয়ার পাহাড়ের ন্যায়ান-ডারুয়া নামক জঙ্গলে অবস্থিত দিদান কিমাথির সৈন্যদলের ভবিষ্যদ্বক্তার কাজ করতো। বন্দিজীবনে আমি ও রুগা এক সঙ্গে মানিয়ানি, আগুথি এবং শো-গ্রাউন্ড নামক বন্দিশিবিরে একসঙ্গে ছিলাম। সে আমাকে বলেছিল যে, জঙ্গলে ইঁহিদের নিয়মকানুন ছিল খুবই কড়াকড়ি, যেমন ছিল শপথগ্রহণকারী আমাদের মতো সংগ্রামীদের। ঐ সব নিয়মগুলি আমাদের তৈরি "কেনিয়া বিধানসভা"র বাৎসরিক অধিবেশনে যথাযথভাবে গৃহীত হতো। পর পর তিন বছর এই বিধানসভার অধি-বেশন এবারডেয়ার পাহাড়ের জঙ্গলে লুক্কায়িত এক গুহায় অনুষ্ঠিত হয়। ইঁহির আর একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তার কাছে আমি জানতে পারি যে, তদানীন্তন কেনিয়া সরকার তাদের ধ্বংস করবার জন্য অযথা অনেক গোলাগুলি ও বোমা নষ্ট করেছেন ঐ পাহাড়ের জঙ্গলে। যদিচ সামান্য কিছু সৈন্যদল ঘটনাচক্রে এইভাবে মারা পড়ে, বেশিভাগ ক্ষেত্রেই ইঁহিরা জঙ্গলের এক জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করতো কেনিয়া সরকারের বিমান বাহিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এবং যখন তারা ওপর থেকে বোমা ফেলতে আসতো, তখন ইঁহিরা আসলে থাকতো সেখান থেকে অনেক দূরে কোন নিরাপদ জায়গায়। এইরকম আরও অনেক ক্ষেত্রে কেনিয়া সরকার সংগ্রামীদের আসল উদ্দেশ্য এবং তাদের বুদ্ধির ঠিক আঁচ করে উঠতে পারেন নি, ফলে অযথা নষ্ট করেছেন আর্থিক ও সামরিক বল। ইঁহিরা বিমানগুলিকে "ন্যায়্যাগিকোনিও" বলে ডাকতো, কারণ তাদের তলায় অবস্থিত বোমা রাখার র‍্যাকগুলি মানুষের পেটের নাভির মতো দেখাতো।

সংগ্রামীদের দ্বিতীয় দলটির নাম ছিল "কোমেরিয়া", যার অর্থ হল, যারা জেগে ঘুমাবার ভাণ করতে পারে। এরা জঙ্গলের প্রান্তে বা আফ্রিকান রিজার্ভ-গুলির কাছে-পিঠে লুকিয়ে থাকতো এবং সুযোগ-সুবিধা পেলে খাবার দাবার বা গোলাগুলি, বন্দুকের লোভে হাতের কাছে যাকে পেতো, তাকেই খুন করতেও দ্বিধা করতো না। নাগরিক বা সামরিক দু' দলই এদের কাছে নির্যাতিত হয়েছে সমভাবে এবং এদের বন্দুকাদি তৈরি করার মতো বুদ্ধি বা ক্ষমতা ছিল না ইঁহিদের মতো। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, কোমেরিয়া দলের লোকেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল খুব কম এবং এরা পূর্বোক্ত কেনিয়া বিধানসভার বা ভবিষ্যদ্বক্তার বাণীর দ্বারাও পরিচালিত হতো না। এদের কার্যপ্রণালীর মূল নিয়ম ছিল সুবিধাবাদ; যদিচ এদের অনুষ্ঠিত কুকার্যের বহুগুণ বিকৃত বিবৃতি কেনিয়া সরকার দিয়েছেন বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে। তবু এরা যে বেশ কিছুটা অন্যায় ও কুকার্য করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে আমি একথাও বলতে চাই যে, এদের এ সমস্ত কার্য-কলাপের আমরা কোনদিনই অনুমোদন করি নি, যদিচ সে সময় এদের রোধ করার ক্ষমতা বা সময় ছিল না আমাদের। কিন্তু ইঁহিদের বীরত্বের এবং ন্যায়োচিত যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্পূর্ণ সমর্থন করতাম আমরা সবাই।

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের জুন মাসে জেনিভা চুক্তিবলে জন্ম নিল নতুন কম্বোডিয়া ফরাসী শাসনমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে। দেশের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের অনেকটা ভূমি জুড়ে লাওস ও থাইল্যান্ডের সীমানা। পূর্ব ও দক্ষিণের বেশ কিছু অংশ জুড়ে ভিয়েতনামের সীমানা। বাকী অংশটা শ্যাম উপসাগরের মুক্ত জলধারা বিধৌত। সব মিলিয়ে এক মনোরম ভূখন্ড। এক উদার ও সহজ সরল বিশ্বাসী মানুষের দেশ।

হাজার বছর আগের ইতিহাস, এই নদীমেখলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দেশ এবং দেশের শান্তিকামী মানুষ সম্পর্কে এক উজ্জ্বল রেখায় চিহ্নিত। কম্বোডিয়ার তখন স্বর্ণযুগ। আংকোরভাট-এ ছিল দেশের রাজধানী। বর্তমান রাজধানী নমপেন থেকে প্রায় দেড়শ মাইল দূরে। বিখ্যাত জলাধার গ্রেট লেক এর উত্তরে। পশ্চিম সীমান্ত থেকে শ্যামদেশীয়গণের ক্রমাগত আক্রমণ ও দক্ষিণ থেকে ভিয়েতনামের চাম রাজাদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তখনকার কম্বোডিয়ার রাজা আংকোরভাট থেকে রাজধানী নমপেন-এ সরিয়ে আনেন। সে প্রায় পাঁচশ' বছর আগেকার কথা। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজধানী স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়।

চাম রাজারা মেকং নদী বরাবর এসে দেশে নানারূপ ধ্বংসলীলা চালাত। কম্বোডিয়ার নানাস্থানে এই ধ্বংসচিহ্ন আজো বিদ্যমান। ভাঙা অট্টালিকা, পাথরের মন্দিরের স্তূপ এই সাক্ষ্য বহন করছে।

কম্বোডিয়ার হাজার বছরের ইতিহাস পাওয়া যায় আংকোরভাট-এর মন্দির গাত্রে আকীর্ণ বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি ও শিলালিপি থেকে। আংকোরভাট প্রাচীন কম্বোডিয়ার স্থাপত্যবিদ্যার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এক উন্নত শিল্পকলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শুধু তাই নয়, এর গঠনসৌকর্য ও নির্মাণকৌশল আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যাকে হার মানায়।

এই আংকোরভাট মন্দির দৈর্ঘ্যে দেড় হাজার গজ ও প্রস্থে এক হাজার গজ। সব মিলিয়ে যেন এক বিশাল রাজপুরী। মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে মন্দির চূড়াগুলি দেখে মনে হবে যেন তিনটি পদ্মকোরক। মাঝেরটি বড়, পাশের দু'টি ছোট। মন্দিরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে দেখলে এরূপ দেখায়। পাশে জলাধারের স্বচ্ছ জলরাশির দিকে তাকালেও এই চিত্রটিই ফুটে উঠবে। আসলে মূল মন্দিরের চারপাশে চারটি ছোট মন্দির।

মন্দিরগুলির উচ্চতা ও দূরত্বের জন্য চারটি প্রবেশপথের যে কোন দিক থেকে দেখলে এরূপ দেখায়। এই দৃশ্যটি আবার কম্বোডিয়ার জাতীয় পতাকারও প্রতীক। কম্বোডিয়া তার জাতীয় সত্তা ও চেতনাকে এভাবে তার প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধ্যে মূর্ত করেছে।

আংকোরভাট-এর মন্দিরগুলোর গায়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলি হচ্ছে সংস্কৃত। সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ ভারতীয় পন্ডিতগণ এর পাঠোদ্ধার করে লিপিবন্ধ করেছেন। চীনা ইতিবৃত্তও এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে। তা ছাড়া মন্দিরগুলোর গায়ে আকীর্ণ চিত্রগুলি রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীর অনুসরণে অঙ্কিত। রাম-রাবণের যুদ্ধ, দশমুন্ড বিশ হাতবিশিষ্ট রাবণের সীতাহরণ, কপিলরাজ হনুমানের উল্লম্ফনে লঙ্কা গমন, রাবণ বধ, সীতার উদ্ধার। কুরুক্ষেত্রে কুরু-পান্ডবের যুদ্ধ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর, পঞ্চ পান্ডবের বনে গমন প্রভৃতি চিত্র রামায়ণ-মহাভারতের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ থেকে অনুমান হয় যে, তখন কম্বোডিয়ায় হিন্দুধর্মের প্রভাব ও প্রাধান্য ছিল এবং তাদের লিপি ছিল সংস্কৃত।

আংকোরভাট মন্দিরের চারপাশে বিরাট চত্বর হচ্ছে প্রস্তরমন্ডিত। মূল মন্দিরটি মেরু পর্বতের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী নির্মিত। কম্বোডিয়াবাসীদের বিশ্বাস, এই মেরু পর্বত হল দেবতাদের আবাসস্থল। দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাগণ মেরু পর্বতের এরূপ প্রস্তরনির্মিত গৃহে বাস করেন। এরূপ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে সাধারণ মানুষ কাঠের তৈরি ও বাঁশের তৈরি গৃহে বাস করে। মানুষ ত আর দেবতাদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। সুতরাং দেবতারা থাকবেন পাথরের গৃহে আর মানুষ, এমন কি রাজারাও থাকবেন কাঠের বা বাঁশের তৈরি গৃহে। শ্যামদেশীয়দের অভিযানে ও চাম্ রাজাদের অত্যাচারে বিধ্বস্ত পাথরের তৈরি বাড়ির ভগ্নস্তূপ তাদের এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করে। তারা ভাবে এ সব দেবতাদের অভিশাপের ফল। মানুষের পাথরের বাড়িতে বসবাসের হঠকারিতার ফলে দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে নানা বেশে নানা রূপে এই ধ্বংসসাধন করে গেছেন।

মূল মন্দিরগাত্রের চিত্রগুলি পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী বিভিন্ন দেব-দেবীর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হরিহর, ইন্দ্র, বরুণ ও অন্যান্য দেব-দেবীর চিত্র। এ ছাড়া কিছু কিছু স্বর্গের নর্তকী-অপ্সরাদের চিত্রও রয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রকে নরদেহীরূপী বিষ্ণু অবতাররূপেই দেখানো হয়েছে। হরিহর চিত্রটি অভিনব। বিষ্ণু (হরি) এবং শিবের (হর) যুগ্ম দেহকে হরিহররূপে একাত্ম দেখানো হয়েছে। মেরু

পর্বতের দেব-দেবীর সঙ্গে হিন্দু পৌরাণিক আখ্যানে বর্ণিত দেবভূমি সুমেরু গিরিশিখরের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এই আংকোরভাট মন্দিরের নির্মাণ-কার্য সম্পর্কেও কম্বোডিয়ায় এক মনোরম কাহিনী প্রচলিত আছে।

দেবরাজ ইন্দ্র একবার দেবপুরী ছেড়ে মর্ত্যে এলেন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা স্বচক্ষে দেখবার জন্য। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক রাজপুত্রের দেখা পেলেন। ব্যস, রাজপুত্রের রূপ দেখে তাঁর আর চোখের পাতা নড়ে না। মর্ত্যে মানুষের এত রূপ? এ যে দেবতাদের হার মানায়। ফিরে যাবার সময় তিনি রাজপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। রাজপুত্র সেখানে ইন্দ্রের সঙ্গে দেবভোগ খায় আর অপ্সরীর নৃত্য দেখে, মহানন্দে দিন কাটে। কিন্তু এদিকে অপ্সরীরা বাদ সাধে। তাদের নাকে মানুষের গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠল, ইন্দ্রের অনুরোধ-উপরোধেও কিছু হল না। মহা ফাঁপরে পড়লেন, তিনি নিজে সেধে রাজপুত্রকে এনেছেন। এখন উপায়? সব শুনে রাজপুত্র মর্ত্যে ফিরে যেতে রাজী হল। কিন্তু এক শর্তে, সেখানেও মেরুশিখরের দেব-পুরীর অনুরূপ এক রাজপুরী নির্মাণ করে দিতে হবে। শুধু তাই না। এখানে দেবপুরীর দেয়ালে যেরূপ চিত্র নকশা রয়েছে, সেখানেও সেরূপ সব কিছু থাকা চাই।

ইন্দ্রের অগত্যা রাজপুত্রের প্রস্তাবে রাজী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। তিনি দেবপুরীর সেরা সেরা স্থপতি, চিত্রকর, ভাস্করদের মর্ত্যে পাঠালেন ইন্দ্রপুরীর অনুরূপ মন্দির তৈরি করে দেবার জন্য। স্বর্গের কারিগররা এসে এই আংকোরভাট মন্দির তৈরি করে দিয়ে গেছেন। এটা কোন মানুষ তৈরি করে নি। কারণ মানুষের হাতের কাজ অত সূক্ষ্ম, অত নিপুণ হতে পারে না।

আংকোরভাট মন্দির নির্মাণের এইরূপ কাহিনী কম্বোডিয়ার মানুষ গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে অন্তরে পোষণ করে। কম্বোডিয়ার সহজ, সরল বিশ্বাসী মানুষের এই ধারণা পোষণ করার আরো একটি গভীর কারণ বিদ্যমান। মন্দিরের পাথরগুলি সিমেন্ট বা ঐ জাতীয় কোন আঠাযুক্ত পদার্থে পরস্পর যুক্ত নয়। এমনি পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে ঐ অপূর্ব পদ্মকোরকের মত মন্দির তৈরি। অথচ একটি পাথরের উপর আরেকটি পাথর এক সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে সাজিয়ে বসানো যে, হাজার বছরেও তার একচুল এদিকে-ওদিকে নড়ে নি। হাজার বছরে কত অসংখ্য ঋতুর খেলা বয়ে গেছে এই পাথরগুলির উপর। কিন্তু একটি পাথরের চাকচিক্য বা ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয় নি তাতে। মেরুশিখরের দেব স্থপতি বিশ্বকর্মা ছাড়া কোন পার্থিব কারিগরের সাধ্য নেই এই অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করার। কম্বোডিয়াবাসীর মনে এ বিশ্বাস সন্দেহাতীত।

এ ছাড়া আংকোরভাট ও কম্বো-ডিয়ার অন্যান্য মন্দিরে বিভিন্ন নাগ মূর্তির চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। অনুমান হয় হিন্দু সভ্যতার পরবর্তী যুগে যখন সর্প পূজার ব্যাপক প্রচলন সুরু হয়, তখন অবধি এখানে হিন্দু-ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। অতঃপর কম্বোডিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্লাবন এলেও মানুষের মন থেকে হিন্দু দেব-দেবীর প্রভাব ও নাগ পূজার ধারণা একেবারে লুপ্ত হয় নি। তাই বৌদ্ধ প্যাগোডায়ও সাপ চিত্রের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি অনেক প্যাগোডায় তথাগত বুদ্ধের নির্বাণ মূর্তির মাথার উপরে বিস্তারিত সর্পফণা দেখতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, বুদ্ধের নির্বাণপ্রাপ্তির সময় এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে যায়। তখন নাগরাজ ফণা বিস্তার করে বুদ্ধদেবের শির ও দেহকে ঝড়ের তাণ্ডব থেকে রক্ষা করে। কম্বোডিয়ায় ধর্মের সহনশীলতা সম্পর্কে এক অপূর্ব সুন্দর ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যেটা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বিরল। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় সহিষ্ণু মনোভাব তাদের মধ্যে প্রবল। কম্বোডিয়ার মানুষের এই ধর্মীয় সহনশীল মনোভাব থেকেই তাদের অন্তরের ছবি দর্পণের মত দেখা যায়। এ থেকেই তাদের নিরপেক্ষ নীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের আগ্রহ উপলব্ধি করা যায়। তাদের সত্যিকারের সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়।

কম্বোডিয়াবাসীরা ধর্মে বৌদ্ধ। এটা সরকারী ধর্ম। তাদের লিপিও এখন সংস্কৃত নয়। বৌদ্ধ লিপি পালিও নয়। কিন্তু কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বা পাল-পার্বণে, এমন কি হলকর্ষণের প্রাক্কালে বৌদ্ধ শ্রমণ ও হিন্দু পুরোহিতরা এক সঙ্গে বসে প্রার্থনা ও অর্চনামন্ত্র উচ্চারণ করেন, এতে ধর্মাচরণে ব্যাঘাত ত' হয়ই না, বরং তারা এটাকে মহা পুণ্যের কাজ বলে মনে করে। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মকে একই সঙ্গে গ্রহণ করার মধ্যে তাদের মনের উদার ও সহনশীল ভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি—নির-পেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান মানুষের মনের এই মধুর পরিচয় বহন করে।

কম্বোডিয়াবাসী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও, দেশের মানুষের নাম, স্থানের নাম, রাস্তার নাম, হোটেল ও বাড়ির নাম প্রভৃতির মধ্যে অনেক নামের সঙ্গে সংস্কৃত শব্দের সাদৃশ্য আছে। ক্ষমতাচ্যুত রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম—নরোত্তম (নর। উত্তম, শ্রেষ্ঠ মানুষ) এই সংস্কৃত শব্দেরই পরিচায়ক বলে অনুমিত হয়। বহু বাড়ি ও আধুনিক হোটেলের সুখালয়, আরামালয়, বিরামালয়, মনোরম এমনি সব নাম।

ওখানে সাধারণ রাস্তাকে বলা হয় বীথি আর বড় প্রশস্ত রাস্তাকে বলা হয় মহাবীথি। ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নামের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ রাজধানী নমপেনের একটি বড় রাস্তার নাম রাখা হয়েছে নেহরু মহাবীথি।

ফরাসী উপনিবেশবাদীরা কম্বো-ডিয়ার প্রায় আশি বছর ধরে শাসন-শোষণ চালিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, এই দীর্ঘদিন ধরে কোন কম্বো-ডিয়াবাসীর মন জয় করতে পারে নি। প্রচুর খৃষ্টীয় ধর্মযাজক পাঠিয়েও কাউকে ধর্মান্তরিত করতে পারে নি। শীল মন্ত্রের বাণী নিয়ে নিঃসম্বল বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেখানে দেশময় ধর্মের প্লাবন বইয়ে দিল, দেশের মাটিতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ আশি বছর ধরে নানা কৃপা-প্রলোভনের পশরা খুলেও খৃষ্ট যাজকরা মানুষের মনে কোন রেখা-

পাত করতে পারল না। এ থেকে কম্বো-ডিয়াবাসীর মনের আরেকটি দিকের পরিচয় মেলে। তারা সহজ সরল, কিন্তু অধঃপতিত নয়। ফরাসীদের বিষ-নিশ্বাস তাদের শ্বাসরোধের উপক্রম করেছিল। তুচ্ছ লোভের শিকার হয়ে আত্মজ্ঞান বিসর্জন দেয় নি।

নমপেনের গীর্জায় উপাসনার সময়ে ফরাসীরা ছাড়া কিছু ইংরেজ, ওলন্দাজ ও আমেরিকাবাসী যেত। আর যেত ভিয়েৎনামী খৃস্টানরা। এ ছাড়া কোন কম্বোডিয়াবাসী ফরাসীদের গীর্জায় যেত না।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে প্রতিটি জাতির জীবনে একটা বিশেষ উৎসবের স্থান আছে। স্থানভেদে এবং দেশের মানুষের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ঐ উৎসব নানারূপে উদ্যাপিত হয়। কোথাও ধর্মের আঙ্গিকে, কোথাও সমাজজীবন বা জনজীবনের বিমূর্ত প্রকাশে, কোথাও প্রকৃতির সঙ্গে জীবনের যোগসাধনে এ উৎসব প্রতিপালিত হয়। কিন্তু এ উৎসব সর্বত্রই সর্বজনীন ও জাতীয় উৎসব।

কম্বোডিয়ার জাতীয় উৎসব হচ্ছে কার্তিক মাসে কোজাগরী পূর্ণিমা তিথিতে জলোৎসব। তিনদিন ধরে এ উৎসব চলে। কম্বোডিয়াবাসীর জীবনে এ উৎসব শুধুমাত্র আনন্দ-আহ্লাদ প্রকাশের প্রতীক নয়, পরবর্তী বছরে ফসলের পরিমাপ, পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রকৃতির রূপের একটা মোটা-মুটি অনুমানও করা হয় এ থেকে। এই উৎসবের প্রাক্কালে রাজা ও রাণী নমপেনের রাজপ্রাসাদ ছেড়ে টনলিসেপ নদীর অপর পারে নির্মিত ক্ষুদ্র প্রাসাদে চলে আসেন। এখানে নদীর চারটি ছোট জলধারা এসে মিলিত হয়েছে। এ উৎসবে রোজ সন্ধ্যায় নৌকাবিহার সুরু হয় এবং সমস্ত স্থানটি আলোক-মালায় সজ্জিত করা হয়। এ উপলক্ষে বিশেষভাবে নির্মিত কিছু নৌকা কাছে-পিঠে বিভিন্ন প্যাগোডায় সারা বছর ধরে তুলে রাখা হয়। উৎসবের প্রাক্কালে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দাঁড়ীরা এসে নানা বিচিত্র পোষাক পরে নৌকা-বিহারে অংশ নেয়। তারা বিভিন্ন প্যাগোডায় রাখা নৌকাগুলি এনে দলে দলে ভাগ হয়ে নৌ-দৌড়ে অংশ গ্রহণ করে। উৎসব শেষে আবার সেগুলো প্যাগোডায় রেখে আসে।

উৎসবে নানা অঙ্গের অন্যতম হচ্ছে কলাপাতার উপর জল ও মোমবাতি গলানো ফোঁটা ফেলা। এই গলা মোমের ফোঁটা দেখেই তারা আগামী ফসলের ভাল-মন্দ, পারিবারিক সুখ-শান্তি ইত্যাদি অনুমান করে নেয়।

উৎসবের শেষে রাজা সমবেত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে টনলিসেপ নদীর জলোচ্ছ্বাসকে শান্ত হতে আদেশ দেন। নদী-জল সে আদেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন না করলেও আস্তে আস্তে নিম্নাভিমুখী হয়। কম্বোডিয়াবাসীর এ বিশ্বাস ও সংস্কার গভীর। তাই কার্তিক মাসে কোজাগরী পূর্ণিমার বার্ষিক উৎসবের আবেদন কম্বোডিয়াবাসীদের মনে খুবই ব্যাপক। দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এ উৎসব ক্ষুদ্রাকারে প্রতিপালিত হয়। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার অবর্তমানে রাজকার্যে অংশ গ্রহণ করেন।

কম্বোডিয়া আয়তনে ফরাসী দেশের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু জন-সংখ্যা ফরাসী দেশের এক-সপ্তমাংশ মাত্র মোটে ষাট লক্ষ। এই ষাট লক্ষ জন-সমষ্টির মধ্যে খেমের জাতিই সংখ্যাগুরু, তারাই দেশের আদি অধিবাসী। এই খেমেররাই নবম শতাব্দীর প্রাক্কালে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মার রাজত্বকালে আংকোর মন্দির নির্মাণ করেন. এ ছাড়া কয়েক লক্ষ চীনবাসী ও ভিয়েৎনামের চম্পা অধিবাসী এই মোট সংখ্যার অন্তর্গত।

চীনের দক্ষিণাংশে হুনান প্রদেশে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ ও নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ চীনবাসীরা মাতৃভূমি ছেড়ে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের চাম রাজারা মাঝে মাঝে এসে কম্বোডিয়ায় আক্রমণ চালাত, সে সময়ে বহু চাম বা চম্পাবাসী এখানে এসে আর দেশে ফিরে যায় নি। এখানেই স্থায়িভাবে থেকে গেল। তারাও সংখ্যায় কম নয়, কয়েক লক্ষ ত' বটেই।

এত বড় বিশাল ভূখণ্ডে এই ক্ষুদ্র জনসমষ্টি পরস্পর মিলেমিশে পরম শান্তিতে নির্ভয়ে বাস করে। ধর্মগত মিলের জন্যই হোক কিম্বা দেশের মানুষের সহনশীল মনোভাবের জন্যই হোক, তাদের মধ্যে কোন প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা বা বিরোধ নেই। ফরাসী শাসকরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের মধ্যে বিভেদের বীজ ছড়াতে পারে নি। জাতি-গত বিদ্বেষ বা বৈরী মনোভাব সৃষ্টির সমস্ত অপকৌশল কম্বোডিয়ার ব্যর্থ

রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

কম্বোডিয়ার মাঝ বরাবর প্রবাহিত মেকং নদীর দক্ষিণে প্রধানত খেমের চীন ও চম্পারা বাস করে, উত্তরে খেমেররা সংখ্যাধিক্য। দেশের ভৌগোলিক সমান্তরাল দশম ও চতুর্দশ রেখার মাঝে অবস্থিত বলে এখানে উষ্ণতা বেশি। তাই দেশের জনজীবন, এমন কি কর্মব্যস্ত স্থল, অফিসও বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। সবাই একরকম গৃহবন্দী হয়ে থাকে এ সময়। কয়েক ঘণ্টা বাদে অপরাহ্নে আবার রাস্তাঘাট, কর্মস্থল জনসমাগমে ঝলমল করে ওঠে। সুরু হয় কর্মচাঞ্চল্য।

কম্বোডিয়াকে সাধারণত বন, ধান ও মাছের দেশ বলা হয়। অর্থাৎ দেশের সর্বত্রই এই তিনটি জিনিষের প্রাচুর্য বিদ্যমান। এই তিনটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের কল্যাণে কম্বোডিয়ায় সারাজীবন মানুষের কোন অভাব নেই। কোন হাহাকার নেই দেশে। এত বিভিন্ন ধরনের মাছ এখানে পাওয়া যায় যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে বিরল।

ফরাসীরা দীর্ঘ আশি বছর ধরে কম্বোডিয়াকে তাঁবে রেখেও এদেশের সম্পদ বাড়াবার বা দেশের সম্পদকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার কোন চেষ্টাই করে নি। নিজেদের প্রয়োজনের বাইরে তারা একপাও এগোয় নি। ফলে কৃষিজ, বনজ, খনিজ ও এক অনন্যসাধারণ জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও কম্বোডিয়া অবহেমান কাল ধরে এক অনগ্রসর, অনুন্নত দেশ হিসাবে বিশ্বরাষ্ট্রে অবহেলিত, অবজ্ঞাত। এমন কি উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের জুন মাসে ফরাসীরা জেনিভা চুক্তিমত যখন এদেশ ছেড়ে চলে যায়, তখন ষাট লাখ অধিবাসীর দেশে সর্বোচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত স্নাতকের (গ্রাজুয়েট) সংখ্যা ছিল সর্বসাকল্যে আটজন। তন্মধ্যে একজন স্বয়ং প্রিন্স নরোদম সিহানুক। অবশিষ্টরাও ঐ জাতীয়, হয় রাজপরিবারভুক্ত, না হয় রাজপরিবার সম্পর্কিত।

কম্বোডিয়ায় স্নাতক পর্যায় দূরে থাকুক, উচ্চশিক্ষারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। অবিভক্ত ইন্দোচীনের হ্যানয়ে ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে, না হয়, খোদ ফরাসী দেশে গিয়ে এদের গ্রাজুয়েট হয়ে আসতে হত। কৃষি, শিল্প বা বাণিজ্য ব্যাপারে অনগ্রসর একটি দেশের মানুষের পক্ষে এটা একটা কল্পনার ব্যাপার মাত্র ছিল। বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে সারা বিশ্বে যখন শিক্ষা-দীক্ষা, প্রগতিতে একটা অলিম্পিক প্রতিযোগিতা চলছিল, তখন কম্বোডিয়ায় শিক্ষার প্রতি অবহেলার এই চিত্র এক বাস্তব ঘটনা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ষাট লক্ষ অধিবাসীর দেশে প্রতি দশ বছরে একজন আর লোকানুপাতে প্রতি আট লক্ষে একজন গ্রাজুয়েট, তাও আবার স্বচেষ্টায়। উপনিবেশের মানুষের প্রতি উপনিবেশবাদীদের মংগলচিন্তার এক নিখুঁত ছবি এতে দেখতে পাওয়া যায়। আর খোদ ফরাসী দেশে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। সেখানে শতকরা পঁচানব্বই-জন শিক্ষিত। গ্রাজুয়েটের কথাই নেই, লাখে লাখে। তারা রাজার জাত, সুতরাং তাদের সঙ্গে প্রজাদের তুলনা অবান্তর। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানে ফরাসীরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সারিতে।

কম্বোডিয়ার মানুষ দলে দলে পাঠশালায় ভীড় করুক, লেখাপড়া শিখে দেশের অবস্থা জানুক, আত্মসচেতন হোক, শিল্প-বাণিজ্যবৃদ্ধির দিকে নজর দিক, তারপর বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মেতে উঠুক, জোট বাঁধুক, ঔপনিবেশিক শাসনের কর্মসূচীতে এরূপ ক্রিয়াকলাপ অলীক বিলাস ছাড়া কিছু না, উদার চরিতনামের ঢালাও কারবার নৈব নৈব চ। তাদের অভিধানে এটা লেখা নেই। তারা মেপে মেপে পা ফেলে ওজন করে কাজ করে। নির্বিঘ্নে রাজ্য পরিচালনার জন্য যতটা প্রয়োজন তার বেশি একচুলও নয়। পৃথিবীর অন্যান্য উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রসমূহের মতই কম্বোডিয়ার ফরাসীনীতি কিছু ব্যতিক্রম নয়। তারপর উপনিবেশসমূহে শিক্ষাপ্রসার সম্পর্কে ঐ সব রাষ্ট্র নেহাৎ উদাসীন বা অনুদার তা মোটেই সঠিক নয়। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের একটা সুচিন্তিত হিসাব আছে। এর বাইরে তারা পা ফেলে না। পৃথিবীর তাবৎ উপনিবেশসমূহে এই একই চিত্র। কোন হেরফের নেই।

দেশে শিল্পপ্রসারণ বা সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে সেই একই অতি-হিসেবী নীতি। শম্বুক গতি। কম্বোডিয়ায় শিল্প-বাণিজ্য রম রম করবে, বুকজোড়া অফুরন্ত কাঁচামালের সম্ভাব নিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে নানা কল-কারখানা তৈরি হবে, তাহলেই হয়েছে মেসিনে মরচে ধরবে না? ফরাসী শ্রমিক-ফ্রান্সের পেল্লাই পেল্লাই কারখানার মেসিনে মরচে ধরবে না? ফরাসী শ্রমিক-দের কাজ জুটবে কোত্থেকে? দেশের আর্থিক কৌলিন্য শিকেয় উঠবে। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ধসে গেলে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য টিকবে কোন্ ভিত্তির ওপর? তাই উপনিবেশ শাসনের মূলে অঙ্কে কোন গরমিল নেই।

এটা ফরমুলায় বাঁধা। তোর শিল তোর নোড়া, তোর ভাঙি দাঁতের গোড়া। সস্তাদরে কম্বোডিয়ার কাঁচামাল ফ্রান্সে আসবে ফরাসী বাণিজ্যপোত ভর্তি হয়ে। এখানে কারখানার ফরাসী শ্রমিকদের হাতে পড়ে সে সব কাঁচামাল পণ্যে রূপান্তরিত হবে। নানা চকচকে প্যাকেট মোড়া হয়ে নানা নতুন নতুন নামের চমক নিয়ে ফরাসী জাহাজে চড়ে আবার কম্বোডিয়ার মাটিতে ফিরে আসবে। কম্বোডিয়ার সেই আদি উৎপাদক মানুষেরা চোখ বিস্ফারিত করে স্বপ্রশংস দৃষ্টিতে সেই সব জিনিষের দিকে তাকাবে। আর পকেট উজার করে সেগুলোকে নেবে। মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার এই মূলধনী প্রবৃত্তি উপনিবেশবাদের বীজ ও শেকড়।

সুতরাং সবই হিসেবের ব্যাপার। এর যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগফলের কোন অমিল নেই। কম্বোডিয়ার ভাগ্যও এই ফরমুলার ছকে বাঁধা। নানা প্রাকৃতিক সম্পদে ভাগ্যবান এই দেশটিও যেন সম্পদ সৌভাগ্যের চাবিকাটির খবর জানে না। বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশ যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাদু ছোঁয়ার পরশমণির সন্ধান লাভ করে স্বর্ণখনির অধিকারী হচ্ছে, দেশের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করছে, এদেশের মানুষ তখন সেই সনাতন প্রপিতামহদের মত আপনভাবে আপনি মগ্ন। খেতের ধান, নদীর মাছ,কাঠের কুটীর সবই ত' আছে। আর কি চাই? পেট ভরে মাছ-ভাত খাও। নির্বিঘ্নে কাঠের তৈরি শীতল কুটীরে বিশ্রাম কর। কারো অন্তরে লোভ নেই।

ফরাসীরা কম্বোডিয়াবাসীর জীবনের চিন্তাধারার এই সুরটি যেন টের পেয়েছিল। তাই এদিকে তারা কোন তরঙ্গ সৃষ্টি করে নি। আশি বছর ধরে সরের ভাগটুকুই নিয়েছে, দুধে হাত দেয় নি। অর্থাৎ তাদের স্বল্পে তুষ্ট ছন্দহীন জীবনের ধারাবাহিকতায় কোন খোঁচা দিয়ে সরল সহজ মানুষের ঘুম ভাঙাতে চায় নি। এ ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ সুচতুর। [ক্রমশ]

পূর্ব পাকিস্তানের রূপপুরে বেলজিয়ান সাহায্যে ২০০ মেগাওয়াটের আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের সাম্প্রতিক ঘোষণা সর্বত্র উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য পাকিস্তানের রাজনীতিকরা বার-বার ঘোষণা করে আসছেন যে, এই আণবিক শক্তি ব্যবহৃত হবে শান্তির উদ্দেশ্যে।

যা হোক, পাকিস্তানে আণবিক শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু হয় ১৯৬১-৬২ সালে। "আই-এ-ই-এ" ("ইণ্টারন্যাশনাল এটমিক এনার্জি এজেন্সী")-এর সাহায্যে ৫ মেগাওয়াটের "সুইমিং পুল" ধরনের একটি রিসার্চ রি-অ্যাক্টর স্থাপিত হয় ইসলামাবাদের সন্নিকটবর্তী নীলহোরে ১৯৬৩ সালে। নিজস্ব আণবিক বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটানোই ছিল তখন পাকিস্তানের মূল উদ্দেশ্য। এই রি-অ্যাক্টরটি চালানোর ভার গ্রহণ করেন পাকিস্তানের "ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি" (পি-আই-এন-এস-টি)। ১৯৬৫ সাল থেকে "পি-আই-এন-এস-টি" বেশ ভালো কাজ করতে থাকে। সে সময় থেকে অনেক পাকিস্তানী বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার আণবিক-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যায় উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করেন।

পাকিস্তানে লাহোর এবং ঢাকা শহরে আণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে রিসার্চের উদ্দেশ্যে। অনুসন্ধান আণবিক প্রযুক্তিবিদ্যায় অনেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ার উক্ত দুটি কেন্দ্রে শিক্ষা পেয়ে থাকেন। উক্ত দুটি কেন্দ্রে 'নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বসানো হয়েছে ১৪ Mev নিউট্রন জেনারেটর, ৩ Mev 'ভ্যানডার গ্রাফ এ্যাক্সিলেটর' এবং অনেক ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। এছাড়া plant physiology সংক্রান্ত ব্যাপারে রিসার্চের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের টাণ্ডাজামে বসানো হয়েছে একটি আণবিক কৃষি কেন্দ্র। এ ছাড়া genetics আর Medical radiation isotope শিক্ষা গ্রহণের জন্য কেন্দ্র বসেছে করাচী, ঢাকা, লাহোর, মুলতান আর জামশোর শহরে। এগুলি কাজ করছে বেশ কিছুদিন যাবৎ।

১৯৬৭ সালের শেষ ভাগে পাকিস্তানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজারের কাছাকাছি। ওঁদের মধ্যে ২৬৫ জন ছিলেন ভূতত্ত্ববিদ। ও'রা কাজ করছিলেন Pakistan Atomic Energy Commission-এর হয়ে। হয়তো সাম্প্রতিককালে ও'দের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। কেন না, শিক্ষাদান কেন্দ্রগুলির সাথে সংযোজিত হচ্ছে করাচীর আণবিক শক্তি উৎপাদন প্রকল্প। সুতরাং এখন পাকিস্তান আণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য মোটামুটি কাঠামো দেশে দাঁড় করাতে পেরেছে এবং বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। এখন সে দেশ আণবিক শক্তির অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম।

প্রথম আণবিক শক্তি উৎপাদন প্রকল্প বসানো হয় করাচী শহরে। উক্ত প্রকল্প ছিল ১৩৭ MWe Pressurised Heavy Water Reactor (PHWR) সম্বলিত। যন্ত্রটি তৈরি হয় ক্যানাডীয় সাহায্যে করাচীর পাশে প্যারাডাইস পয়েন্টে। ১৯৭০ সালের শেষ ভাগ নাগাদ এই স্টেশনটি সম্পূর্ণভাবে চালু হবার কথা।

দ্বিতীয় প্রকল্পটি রূপপুরে বসানোর কথা হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। কিন্তু পাকিস্তানের পক্ষে কিছু করা অসম্ভব ছিল মার্কিন আর বৃটিশ-সাহায্য ছাড়া। পরে পাকিস্তান রুশ-সাহায্য পেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত।

এখন জানা গেছে, বেলজিয়াম পাকিস্তানকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। সাহায্যের পরিমাণ হবে ৫২ কোটি টাকা (৬৮·৩ মিলিয়ন ডলার)। রূপপুরে বসানো রি-অ্যাক্টরের ক্ষমতা হবে ২০০ MWe। শতকরা আড়াই ভাগ হারে সুদ দেবার কথা। প্রকল্পের কাজ শেষ হবে ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ।

ক্যানাডিয় সাহায্যে প্রস্তুত করাচীর রি-অ্যাক্টর প্লাণ্ট সম্পর্কে বলা চলে, এটি একটি ১৩৭ MWe, PHWR রি-অ্যাক্টর, যাতে জ্বালানী (fuel) হিসেবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম এবং ভারী জল (Heavy Water) ব্যবহার করা হয় moderant ও Coolant হিসেবে। রি-অ্যাক্টরটি আধুনিক ধরনের, যা "one-line" কম্পিউটার সংযুক্ত। এর দ্বারা 'রি-অ্যাক্টর অপারেশন' নিয়ন্ত্রণ করা চলে। বাদ বাকি দুটি কম্পিউটার fuelling Machine পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রি-অ্যাক্টরের নিরাপত্তার জন্যই এটা ব্যবহার করা হয়। হয়তো তাই আধুনিক ক্যানাডিয়ান পদ্ধতির সুফল ভোগ করবে পাকিস্তান।

এই রি-অ্যাক্টরের মূল্য ৩২ কোটি টাকা। ভারী জলকে moderant এবং coolant হিসেবে ওটা ব্যবহার করে থাকে। এই ব্যবস্থা প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। কেন না, প্রতি কিলোগ্রাম জলের পেছনে খরচ হয় প্রায় তিনশো টাকা। ১৫০ টন জলের প্রাথমিক প্রবেশকরণের জন্য লাগবে আনুমানিক ৪·৫ কোটি টাকা। যদি প্রতি মাসে ৫ থেকে ৭ টন খরচ হয়, তবে বাৎসরিক খরচ পড়বে ১৫০,০০০ থেকে ২১০,০০০ টাকা। ইউরেনিয়ামের কি খরচ পড়বে তা বলা শক্ত। কেন না, তা ধাতুর গুণ ও পরিমাণের ওপরে নির্ভর করে থাকে। এ ছাড়া, রি-অ্যাক্টরের জ্যামিতিক আকারের ওপরেও তা নির্ভরশীল।

যা হোক, আশা করা হচ্ছে, রি-অ্যাক্টরটি সহজপ্রাপ্য অল্প মূল্যের ইউরেনিয়াম ধাতুর সাহায্যে চলতে সক্ষম হবে।

রূপপুরে বেলজিয়ান সাহায্যে যে রি-অ্যাক্টর গঠিত হবে, তা চলবে Pressurised Water Reactor দিয়ে। এর ক্ষমতা থাকবে ২০০ MWe সম্পন্ন। এই রি-অ্যাক্টরে সাধারণ জল Coolant ও moderator হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এতে Enriched ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয় জ্বালানী হিসেবে। এই ধরনের রি-অ্যাক্টর ব্যবহার করে আমেরিকায় প্রচুর সুফল পাওয়া গিয়েছে। এতে ভারী জল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কম, তবে, সামান্য পরিমাণ Enriched ইউরেনিয়াম জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা দরকার হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত এই ধরনের ইউরেনিয়াম তৈরি করতে পেরেছে মাত্র আণবিক শক্তির অধিকারী পাঁচটি দেশ। হয়তো [illegible] [illegible] বটেন, [illegible] আর পশ্চিম

[illegible] করবে অবশ্যই। হয়তো [illegible]।

যদি আণবিক শক্তি উৎপাদন প্রকল্পের ১০০০ থেকে ১২০০ MWe Generating Capacity হয়, তবে, আর্থিক সাশ্রয়ের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই অন্তত ৮০ ভাগ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হওয়া উচিত। প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশই উক্ত পরিমাণ শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। সুতরাং আণবিক শক্তির সাথে কৃষি ও শিল্প প্রকল্প সমতা রেখে যদি না চলতে পারে আর্থিক অপচয়ের সম্ভাবনা থাকে। ফলে বিভেদ বাড়ে। হয়তো তাই আণবিক শক্তিকে "ধনীর বিদ্যুৎ" বলা হয় অনেক সময়। যা হোক, অনেক দরিদ্র দেশও আণবিক শক্তি বাড়াতে চেষ্টা করে। কারণ, প্রাথমিক খরচ বেশি পড়লেও শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। কাজেই দেশের উন্নতি বাড়াতে হলে আণবিক শক্তির প্রসার ঘটা প্রয়োজন। উন্নয়নকামী দেশগুলির জনসংখ্যা বাড়ছে। সংযোজিত হচ্ছে প্রভৃত জটিল সমস্যা। হয়তো তাই আণবিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা এখনও আরও বেশী।

রূপপুরের ক্ষেত্রে বলা চলে—এই তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র দ্বারা পাকিস্তান লাভবান হবে অবশ্যই। যদি পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের মাধ্য বাণিজ্য আবার শুরু হয় তবে বিহার ও বাংলা থেকে অল্প মূল্যে কয়লা সে ক্রয় করতে পারে। পাকিস্তানের যে দেশে আণবিক শক্তি কেন্দ্র বসাতে ইচ্ছুক, তা রূপপুরের পদক্ষেপই প্রমাণ করছে। হয়তো Desalination প্রকল্প পশ্চিম পাকিস্তানে বসবে। এতে শক্তিশালী হবে পাকিস্তানের অর্থনীতি।

এখন যদি রূপপুরে আণবিক রি-অ্যাক্টর চালু হয়, তবে দেশে প্রচুর পরিমাণ প্লুটোনিয়াম জমা হবার সম্ভাবনা থাকে। এটাকে বলা হয় fissionable material. সুতরাং আণবিক রি-অ্যাক্টর চালু করে পাকিস্তান সহজেই প্রচুর প্লুটোনিয়াম ধাতু জমিয়ে বেশ কিছু-সংখ্যক এ্যাটম বোমা বানাতে পারবে অবশ্যই।

যা হোক, এখনই ভয় পাবার মত কিছু নেই। প্রথমত পাকিস্তানের সব রি-অ্যাক্টরগুলিই বেলজিয়াম কিংবা কানাডীয়-সাহায্যে গঠিত। যেসব দেশ বাইরের সাহায্যে রি-অ্যাক্টর গড়েছে, ওসের ক্ষেত্রে monitoring arrangement যেভাবে প্রযোজ্য, পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও সেভাবেই প্রযোজ্য। কাজেই যে সমস্ত fissionable material প্রস্তুত হবে, তা তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা করা হবে রি-অ্যাক্টরের [illegible], [illegible] দিয়ে অবশ্যই এবং monitoring agency থাকার ফলেই পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব হবে না শুধুমাত্র শান্তির উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে প্লুটোনিয়াম ধাতু ব্যবহার করা।

দ্বিতীয়ত, রি-অ্যাক্টরের অতিরিক্ত জ্বালানী দিয়ে বাদ দেওয়া fission নামক বস্তু থেকে, প্লুটোনিয়াম থেকে আবার ইউরেনিয়াম আলাদা করতে হবে। এর জন্য আবার জটিল ধরনের রাসায়নিক প্রকল্প দরকার। কিন্তু প্রযুক্তি-বিদ্যায় পাকিস্তান দুর্বল হওয়াতে এখনই উক্ত কারখানা গঠন করা অসম্ভব। হয়তো তাই করাচী ও রূপপুরের বাদ দেওয়া জ্বালানী 'প্রসেসিং'-এর জন্য পাঠাতে হবে ক্যানাডা কিংবা বেলজিয়ামে।

তৃতীয়ত, International Atomic Energy Agency'র সাধারণ নিয়ম অনুসারে যে সমস্ত দেশে Power Reactor বসানো হয়েছে, ওসব দেশের বাড়তি জ্বালানী সাহায্যকারী দেশ কিনে নেয় এবং প্লুটোনিয়াম এবং ইউরেনিয়াম আলাদা করে নতুন জ্বালানী বিক্রয় করে থাকে।

চতুর্থত, করাচী ও রূপপুর কেন্দ্রের রি-অ্যাক্টর চালাতে হলে ইউরেনিয়াম অক্সাইড (natural uranium) এবং Enriched ইউরেনিয়াম প্রয়োজন। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচুর পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া যাবে বলে প্রকাশ। কিন্তু ওটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার এবং এর জন্য প্রয়োজন "Ore" রিফাইনারী কেন্দ্র গড়ে তোলা। কেন না, ভারী ধাতু থেকে "Ore" আলাদা করা খুবই অসুবিধাজনক ব্যাপার। যদি ধাতুটিকে প্রসেস পদ্ধতির মাধ্যমে ময়লামুক্ত করা যায়, তবে, পাকিস্তানের স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে। পাকিস্তান অবশ্য 'ভারী জল' প্রস্তুত করার জন্য সার উৎপাদন কারখানার পাশে আর একটি ছোট প্রকল্প তৈরি করায় এখন ব্যস্ত। কিন্তু যতোদিন পর্যন্ত ওটা না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত রূপপুর প্রকল্পের জ্বালানীর জন্য পাকিস্তানকে নির্ভরশীল থাকতে হবে আমেরিকা কিংবা হল্যান্ড-বৃটেন-জার্মান কনসর্টিয়ামের ওপর। এই বিশেষ ধরনের জ্বালানী—Enriched Uranium তৈরি করার জন্য অগ্রসরমান প্রযুক্তিবিদ্যার দরকার পড়ে। Gaseous diffusion পদ্ধতি চালু করতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয়। এই সব ধরনের প্রকল্প তৈরি করতে হলে প্রচুর পরিমাণ অর্থের দরকার। কেন না, এতে খরচ অসম্ভব। এ ছাড়া দেশব্যাপী আণবিক বিদ্যুৎশক্তি পরিকল্পনা রচনা থাকা প্রয়োজন। এবং অতিদ্রুত Gas Centrifuge পদ্ধতি চালু করতে হলে আরো উন্নত প্রযুক্তি-বিদ্যার দরকার পড়ে। আর্থিক খরচ যা পড়ে, তা ব্যয় করা এখনই পাকিস্তানের সাধ্যের অতীত।

সুতরাং জ্বালানী সরবরাহ করে প্রসেসিং পদ্ধতির মাধ্যমে পাকিস্তান কতদূর এগোতে পারবে তা বলা শক্ত। কাজেই সমারাম্ভ নির্মাণ যে রি-অ্যাক্টর দিয়ে হবে না, তা বলা বাহুল্য। তাই রি-অ্যাক্টর বসালেই পাকিস্তান শক্তিশালী হয়ে যাবে বলে যে ধারণা করা হয়েছে, তা ভুল। একমাত্র ভয়ের কারণ তখনই সৃষ্টি হবে, যখন বাড়তি জ্বালানী থেকে প্লুটোনিয়াম ধাতু আলাদা করতে পাকিস্তান সক্ষম হবে। কিন্তু এটা করতে প্যাকিস্তানের আরো অনেক দেরি এবং এর জন্য দরকার বিশেষ ধরনের পরিকল্পনা ও বিশেষ ধরনের অবস্থা তৈরি করা।

যা হোক, আমরা সব সময় আঞ্চলিক সহযোগিতা ও অর্থনৈতিক সমঝোতার কথা বলে থাকি। তাই পাকিস্তানে আণবিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের সাহায্যে ভারতের এগিয়ে আসা উচিত। যদি এটা ভারত করতে পারে, তবে পাকিস্তানের সংগে মিত্রতা বাড়বার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য প্রথম থেকেই পাকিস্তান ভারতের প্রতি বিরূপ। তবু ভারত যদি একান্ত-ভাবে হার্দ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়, তবে হয়তো বিরূপ পাকিস্তানের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্বের আহ্বান আসতেও পারে। কাজেই উভয় দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। ভারত যদি পাকিস্তানকে ভারী জল ও বাড়তি জ্বালানীর 'প্রসেসিং' করে সরবরাহ করে, তবে পাকিস্তান সাড়া দেবে অবশ্যই। পাকিস্তানের আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভারতীয় সাহায্যে গঠিত হলে আঞ্চলিক সমঝোতা দৃঢ় হবার সম্ভাবনা থাকে। হয়তো পাকিস্তান নিজের ভুল বুঝতে পারবে। কাজেই পাকিস্তানের আর্থিক উন্নয়নে ভারত যদি এগিয়ে আসে, তবে উভয়ের সংযুক্ত সহযোগিতার মাধ্যমে এই এলাকায় শান্তি স্থাপিত হবে অবশ্যই।

ফানুস

মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘরের মেঝেয় উবু হয়ে বসে পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন ভূধর মাস্টার। টেস্ট পরীক্ষার খাতা। যদিও প্রাইমারির সেকশনের, কিন্তু তাতে নিষ্ঠায় একটুও ভাটা পড়ে নি ভূধর মাস্টারের। গত ত্রিশ বছর ধরে তিনি একইভাবে খাতা দেখে যাচ্ছেন। তাঁর হাত পার হয়ে যেসব ছেলেরা ফাইনাল পরীক্ষায় বসে, তাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনকেই আর ফিরে আসতে হয় না—প্রাইমারির সদর দেউড়ি পেরিয়ে তারা হাযার সেকেন্ডারির দরদালানে প্রবেশ করে।

উত্তরের লাইনগুলো পরখ করতে করতে ভুলের জায়গাগুলোতে লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটছিলেন ভূধর মাস্টার। কোন কোন ভুল শব্দে আবার গোল্লাও পাকিয়ে দিচ্ছেন। তারপর এক-একটা উত্তরপত্র দেখা শেষ করে নম্বরগুলো পর পর যোগ দিয়ে মোট নির্ভুল সংখ্যাটা ছাত্রের নামের পাশে লিখে রাখছেন।

পঞ্চাশটা খাতার মধ্যে চল্লিশটা খাতাই দেখে ফেলেছেন ভূধর মাস্টার। আর মাত্তর দশখানা বাকি। এই দশখানা দেখে শেষ করে দিতে পারলে হাফ ছেড়ে বাঁচেন তিনি। খাতাগুলোও তাহলে জমা দিয়ে দিতে পারেন। আগামীকালই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

খাতার ওপর আরও একটু গভীর মনোযোগ দিলেন ভূধর মাস্টার। আরও তিনখানা খাতা দেখে ফেললেন তিনি। ছোট মেয়ে উমা কানা-ভাঙা পাথরের বাটিতে বাপের জন্যে চা রেখে গেল। চায়ের বাটিতে চুমুক দিতেই ভূধর মাস্টারের মুখখানা অস্বাভাবিক রকমের বিকৃত হয়ে উঠল। যেন একঢোক কড়া চিরতার জল গলাধঃকরণ করে ফেলেছেন তিনি। মেয়েকে উদ্দেশ্য করে মুখ ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন: ওরে উমী, পোড়ারমুখী বাপকে না খি গ্রাহিার সঙ্গেই আনিস না -কী চা দিয়েছিস, বিষ তিত .. চিনি নেই, লিকার নেই- তাও একটা ভাঙা পাথর বাটিতে

: থাক থাক, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই, উমার হয়ে উমার মা সর্বাণীই কর্কশ স্বরে চীৎকার করে উঠলেন: বলি ক' জোড়া কাপ কিনে দিয়েছো যে অত লম্বা-চওড়া কথা? আছে তো মাত্তর তিনটে কাপ- তার মধ্যে দুটোই তো ফাটা। আর তিনটে কাপ রেখেছি যক্ষের ধনের মত। কালে-ভদ্রে কেউ এলে এক-কাপ চা দিতে হলেও তো একটা কাপ চাই।

সর্বাণীর কথায় একেবারে চুপ না করে গজ্ গজ্ করতে লাগলেন ভূধর মাস্টার: অ না হয় হল—কাপ না জুটুক, কিন্তু তাই বলে চায়ের স্বাদটাও এরকম যাচ্ছে-তাই হবে—চা নয়ত বিষ......
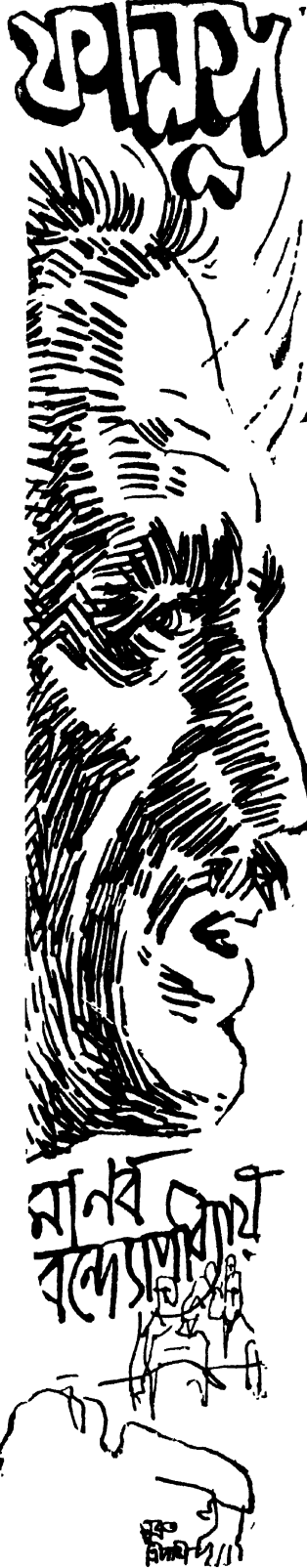
: বিষই তো, বিষ হবে না তো অমৃত হবে? [illegible] খাঁকি মেরে উঠলেন সর্বাণী: বারে বারে চা ফিল্টারে বিষই জুটবে খালি সকাল থেকে এই নিয়ে তো তিনবার হল—তাই উমিকে বললুম আবার যখন চা চাইছে, ঐ আগের চায়ের পাতাগুলোই গরম জলে ভিজিয়ে একটু গুড় দিয়ে দে-তবু সাধ মিটুক......। শেষের দিকে সর্বাণীর গলার আওয়াজটা যেন বর্ষায় ভিজে-ওঠা দাওয়ার মত স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠল।

খাতা দেখা বন্ধ করে হাতে পেন্সিল নিয়ে ঘাড় গুঁজে সর্বাণীর কথা শুনছিলেন ভূধর মাস্টার। সর্বাণীর কথার শেষে মাথাটা তুলে অকৃত্রিম হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে বললেন: তা বেশ করেছো, এরকম হলেই যথেষ্ট—এতেই আমার নেশা জমবে। আর তো কোন নেশা করার উপায় নেই, একটু চা শুধু..... বলতে বলতে আবার বাটিটায় চুমুক দিলেন ভূধর মাস্টার।

আবার খাতা দেখতে শুরু করলেন ভূধর মাস্টার। আরও খানচারেক খাতা দেখে ফেললেন তিনি। দশের থেকে আগের তিন, আর বর্তমানের চার বাদ দিলে সর্বসাকল্যে এখনো রইল তিন। এই তিনখানা দেখা সাঙ্গ হলেই আপাতত খাতা দেখার ছুটি ভূধর মাস্টারের। বেশ দীর্ঘ দিনের ছুটি। সেই আবার ফার্স্ট টার্মিনালে খাতা দেখা। কিংবা ফার্স্ট টার্মিনালে না হলে সেকেন্ড টার্মিনালে দেখার পালা।

গায়ের বিবর্ণ আলোয়ানটাকে এতক্ষণে পিঠ থেকে সরিয়ে ফেললেন ভূধর মাস্টার। বেলা বাড়তে শীতের প্রকোপটাও একটু কম লাগছে। পিঠের গেঞ্জিটায় দীর্ঘকায় একটি বৃত্তের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকদিন ধরেই একটা নতুন গেঞ্জি কেনার কথা ভাবছেন ভূধর। সর্বাণীরও জিনিসটা নজরে পড়েছে। কিন্তু সুরাহা হয় নি। একটা গেঞ্জি আর শেষ পর্যন্ত কেনা হয়ে ওঠে নি কিছুতেই। এখন যেন না-কেনাটাই ভাল লাগছে ভূধরের। তাহলে রোদের উত্তাপ এত সোজাসুজি তাঁর পিঠ স্পর্শ করতে পারত না।

আরও একটা খাতা দেখা শেষ করে পরের খাতাটা শুরু করলেন ভূধর। কিন্তু সে-খাতা দেখা বেশিদূর এগোতে-না-এগোতে বড়মেয়ে রমার ছেলে খোকন এসে ভূধর মাস্টারের গলা জড়িয়ে ধরে তাগাদা দিল: দাদুভাই, অনেক বেলা হয়ে গেছে, এবারে উঠে চান করতে যাও—দিদা বকছে। গলা ছেড়ে দিয়ে হাতের খাতাটা ধরে টানাটানি করতে থাকে খোকন।

ভূধর হাতটা ছাড়িয়ে দিয়ে খিঁচিয়ে ওঠেন: নে নে, তোকে আর জ্যাঠামো করতে হবে না, তোরা খেয়ে নে গে'।

: যারা খাওয়ার তারা খেয়ে নিয়েছে, এবারে তুমি খেয়ে উদ্ধার করলেই বাকি

সকলে খেয়ে নিতে পারো। ভূধর মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে কর্কশ কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন সর্বাণী।

এবারে শান্তস্বরে বললেন ভূধর মাস্টার : রতন যে এখনো ফিরল না— ও [illegible] আর আমার ভাত ঢাকা দিয়ে রেখে [illegible] খেয়ে নাও। ও এলে আমরা [illegible] খেয়ে নেবো।

এবারে কণ্ঠস্বর আরো উচ্চগ্রামে উঠল সর্বাণীর : রতন না রত্ন—তোমার গুণধর ছেলে কখন ফিরবে, তার জন্যে তাকিয়ে থাকতে হবে নাকি? আর এদিকে উপোসী বিধবা মেয়েটা বসে আছে—বুড়ো বাপ না খেলে খায় কী করে?......

কোন জবাব দিতে পারলেন না ভূধর মাস্টার। তিনটে বাচ্চা নিয়ে বিধবা হয়েছে রমা সেই দশ বছর আগে। আর তখন থেকেই বাপের সংসারে বাধ্য হয়ে আস্তানা নিতে হয়েছে তাকে।

একটা কিছু করার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে রমা। [illegible] লেখাপড়া জানা [illegible] জোটে না, সে দেশে [illegible] মত [illegible] আশা [illegible] নিজের [illegible] না। ব্যাকুল দৃষ্টিতে ছোট ভাই রতনের দিকে

চেয়ে আছে। চার-চারটে বছর হল হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে রতন। ওর যদি একটা কিছু হ'ত তা হলেও না হয় বাপের কষ্টের একটু লাঘব হ'ত। কিন্তু না, তা হবার নয়। তাই একটা অপরাধ-বোধ রমার মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে থাকে। বাপের সামনে পারতপক্ষে সে বেরোয় না। কোন কথা বলে না। শুধু তাঁর টুকিটাকি জিনিসগুলো এগিয়ে দেয়, জামা-কাপড়টা কেচে রাখে, বই-খাতা-কলম গুছিয়ে দেয় স্কুলে যাওয়ার সময়।

কিছুক্ষণ ধরেই খাতা দেখা বন্ধ রেখে-ছিলেন ভূধর মাস্টার। একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। নিজের সংসারের কথা, রমার কথা ভাবছিলেন বুঝি। রমা বিধবা হওয়াতে বাঁচোয়া। বিয়ের ভাবনা নেই। কিন্তু শ্যামা আর উমা? শ্যামা তো তিরিশ পেরিয়ে গেছে, উমারও পঁচিশ হল। আর কিছুদিন বাদেই তো বিয়ের বাজারে বাতিল হয়ে যাবে শ্যামা। তখন কি হবে ওর? আগেকার প্রথা থাকলেও না হয় ফাউ হিসেবে চালান দেওয়া যেত সতীনের ঘরে। কিন্তু বর্তমানে? শেষ পর্যন্ত একটা অঘটন ঘটবে না তো আজকাল আকছার যা ঘটছে! মুদিখানার ছোকরা কর্মচারী তারকের চাউনিটা খুব ভাল মনে হয় না। বয়সে শ্যামার থেকে ছোট হলে কী হবে, একেবারে আসল ঘুঘু। শ্যামা দোকানে গেলে একটু বিশেষ খাতির পায়। আর কেউ কোন জিনিস ধারে আনতে গিয়ে ফিরে এলে শ্যামা স্বচ্ছন্দে নিয়ে আসে জিনিসটা। ধারের পর ধার জমে যাচ্ছে, তবুও কিছু বলে না তারক। একদিন হয়ত এই তারকের সংগেই ...সাঁকিটা জানাবে আর প্রয়োজন বোধ করেন না ভূধর মাস্টার।

একবার ডেকে বলবেন নাকি শ্যামাকে কথাটা? — না, থাক। পরক্ষণে নিজের মনেই ভাবলেন ভূধর। কী হবে ওকে ঘাঁটিয়ে, ক্ষমতা যখন নেই কোন কিছু করবার। কিন্তু রতন এখনো আসছে না কেন, কোথায় গেল ছেলেটা? চার বছর হয়ে গেল পাশ করে বসে আছে তবু কিছু হল না। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করায় আশার আলো দেখছিলেন ভূধর মাস্টার। দু'-একজন নেতৃস্থানীয়েরা আশ্বাসও

দিয়েছিলেন। কিন্তু এতোদিনে সব আশাই নির্মূল হতে চলেছে। ছেলেটাও যেন মুষড়ে পড়ছে দিনকে দিন। আর কোন উপায় না দেখে রাজনীতির মধ্যে খুঁজি বা আশ্রয় খোঁজার চেষ্টা করছে ইদানীং।

হঠাৎ দূরে একটা সোরগোল শোনা গেল। সোরগোলটা ক্রমে যেন ভূধর মাস্টারের বাড়ির নিকটবর্তী হতে থাকল। ভূধর উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। মনে মনে ভাবলেন, এ সময় আবার এত গোলমাল কিসের? কলোনীর সব লোক যেন বেরিয়ে পড়েছে। বাদশাপুর, সীতাপুর, সুভাষ কলোনীর সমস্ত শাখা রাস্তা-গুলো যেন মেইন রোডে পড়ে উত্তাল তরংগের মত ছুটে আসছে।

দাঁড়িয়ে পড়লেন ভূধর মাস্টার। খাতা-গুলো পড়ে রইল। দাওয়া থেকে নেমে সদর দরজার দিকে এগোলেন তিনি। সর্বাণী, রমা, শ্যামা, উমা সকলে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উঠোনটায়। এমন কি রমার বাচ্চাগুলো পর্যন্ত সদরমুখো ছুটতে লাগল। ইতিমধ্যে এক এক করে লোকের ঢেউগুলো আছাড় খেল ভূধর মাস্টারেরই সদর দরজায়। ক্যানাস্তারার টিনে তৈরি একপাল্লার দরজাটা যেন আর্তনাদ করে উঠল। সংগে সংগে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জনের ঐকতান শোনা গেল। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, কমরেড রতন ভটচায্ জিন্দাবাদ। শহীদ রতন জিন্দাবাদ!

কেমন যেন বিভ্রান্ত, বিহ্বল হয়ে পড়লেন ভূধর মাস্টার। দরজার বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। এমন সময় ভূধর মাস্টারের এক প্রাক্তন ছাত্র ছুটে এসে তাঁর কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলল: মাস্টার মশাই, বাজারের সামনে দুই শবিরে জোর লড়াই হচ্ছে। একজন রতনের মাথায় লাঠি মেরেছে—ও ছেনোদাকে বাঁচাতে গিয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট গঠন হওয়ার পর ছেনোদা এ পাড়ার অবিসংবাদিত নেতা। সে আশ্বাস দিয়েছিল রতনকে চাকরি দেবে। আশ্বাস পাওয়াতে আজকাল তার পেছন পেছনই ঘুরে বেড়াত রতন।

মাতালের মত টলতে টলতে বাজারের পথের দিকে ছুটে চললেন ভূধর মাস্টার। পেছনে সর্বাণী মেয়েদের নিয়ে উঠোনে আছড়ে পড়লেন। কারোর জন্যে অপেক্ষা করার অবসর নেই ভূধরের। মত্ত মাতঙ্গের মত দাপাতে দাপাতে তিনি সোজা বাজারের দিকে চললেন। তাঁর পেছনে উজান বেয়ে চলল জনতার ঢেউ।

বাজারের কাছাকাছি এসে পড়লেন ভূধর মাস্টার। অদূরেই রতনকে ঘিরে একটা জটলা দেখা গেল। মৃতদেহ সামনে রেখেই কয়েকটা ছেলে পর পর বক্তৃতা দিয়ে চলেছে। রক্ত গরম করা বক্তৃতা। খুনের বদলা খুন। হত্যার বদলে হত্যা। ঐ এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট লোক ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কে একজন ভূধর মাস্টারকে দেখতে পেয়ে সমবেদনা জানালেন। কোন প্রতি-উত্তর করতে পারলেন না ভূধর। দ্রুতপদে ছেলের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রক্ত আর কাদায় মাখামাখি হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রতন। মাথার ঘিলুটা ফেটে ছিটকে গেছে একধারে। যেন মস্ত একদলা থকথকে রক্তমাখা লেই আঠা। সেদিকে চোখ পড়তেই শিউরে উঠলেন ভূধর মাস্টার। আর এক পাও এগোতে পারলেন না তিনি। মনে হল একটা খাড়া পাহাড়ের কিনারে এসে তিনি দাঁড়িয়েছেন। মাঝখানে অনতিক্রমণীয় সুগভীর খাদ। খাদ পেরিয়ে ওপারে যাওয়ার তাঁর ক্ষমতা নেই। নিজের ছেলেকে আর তিনি স্পর্শ করতে পারবেন না। সে ভিন্ন পথের শরিক হয়েছে—যে-পথ তাঁর থেকে অনেক দূরে, যে-পথের নাগাল এ-জীবনে কখনো তিনি পাবেন না। তাঁর দু' চোখ বেয়ে জল-প্রপাতের মতই জলের ধারা নামল। সম্বরণ করতে পারলেন না নিজেকে। চীৎকার করে ছেলের নাম ধরে ডেকে উঠতে গিয়েও ডাকতে পারলেন না। শুধু যে স্বপ্নটা দেখছিলেন তিনি, সেটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল। রতনকে ঘিরে আর কোন স্বপ্ন দেখার আশা তাঁর রইল না।

ছেলেবেলাকার কথা হঠাৎ ভূধর মাস্টারের মনে পড়ল। শীতালক্ষার পাড়ে তাঁদের স্কুলের খেলার বিস্তীর্ণ মাঠ। সেই খেলার মাঠে গেম-টিচার সদানন্দবাবু একবার বিরাট একটা ফানুস ওড়াবার পরিকল্পনা করেছিলেন। অনেকদিনের চেষ্টায় লাল-নীল আর সবুজ কাগজ জোড়া দিয়ে দিয়ে ফানুসটা তৈরি করে-ছিলেন তিনি। ওড়াবার দিন সে কী উৎসাহ আর উদ্দীপনা সদানন্দবাবুর! সমস্ত গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছিল মাঠে। সলতে জ্বালিয়ে ফানুসটা উড়িয়েও দিয়ে-ছিলেন তিনি। কিন্তু সামান্য একটু উঁচুতে উঠতেই আগুন ধরে গেল। লেলিহান অগ্নিশিখা গ্রাস করল ফানুসটাকে। ছাই হয়ে গেল সব। আকাশ থেকে পড়ল শুধু তারের তৈরি বলয়টা।

এই আকস্মিক ঘটনায় শুধু সদানন্দ-বাবুই নয়, উপস্থিত গ্রামের সকলেই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। সদানন্দ-বাবুর সংগে সংগে গ্রামের অন্যান্য ছেলে-বুড়ো সবাই যখন ফিরে যাচ্ছিলেন ঘরে, তখন মনে হচ্ছিল কোন আত্মীয়ের শবানুগমন করেই যেন তাঁরা ফিরছিলেন।

এখন যেন বারে বারে ছেলেবেলাকার সেই ফানুসটির কথাই মনে পড়তে লাগল ভূধর মাস্টারের।

মানুষের মুখ ঃ (নভেম্বর, ১৯৬৯) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ঃ তিন টাকা।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর কবিতা যেন বিদ্যুতের চাবুক। একনিষ্ঠ সংগ্রামী সৈনিকের শপথের মত উচ্চারিত তাঁর কবিতাবলী আমাদের চেতনাকে উদ্দীপিত করে, অনুপ্রেরণা দেয়। অদ্ভুত এক জ্বালাময় অনুভূতি ব্যাপ্ত হয় শরীরে। নতুন করে প্রস্তুত হই। এই কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত 'স্যাটা-[illegible]' কবিতাগুলি যন্ত্রণার অধিক [illegible] ঃ [illegible]ময়। 'বানভাসি,' 'কয়েকজন ভিখারি', 'শান্তি' প্রভৃতি কবিতায় বঞ্চনা, [illegible] ও নিষ্ঠুর কৌতুকে কিভাবে পিষ্ট হচ্ছি, তা' সুপরিস্ফুট। ১৯৬৭ সনে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার পর যে আন্দোলন হয়, কবি তাতে অংশ নিয়েছিলেন এবং কারাবরণও করেছিলেন। 'জেল-খানার কবিতা'তে সেই সময়কার চারটি কবিতা স্থান পেয়েছে। মুক্তি যে কত-বড় আকাঙ্ক্ষিত বস্তু তা যেন নতুন করে বুঝেছেন. 'তবু গেট খুলে যাওয়া ভাল: বাইরে একটু পায়চারি করা যাবে।/ মশাই হে! রাস্তায় হাঁটবার গেট খুলে দাও।'

নিষ্ঠুর পীড়ন এবং অনাচারে জন্মভূমির 'দু' চোখে জল' ('আমার সোনার বাংলা), 'কোথাও নেই আঙিনা জুড়ে লক্ষ্মীর পা:/শুধু শ্মশান।' (কোজাগরী পূর্ণিমা), তবু কবি জানেন 'তিমির বিনাশী তুই, জন্মভূমি' (জন্ম-ভূমি)। একথাও ধ্রুব সত্য—বিপ্লব কারুর হুকুম মেনে চলবে না, দেওয়ালের লেখাগুলোকে মুছে দিতে চাইলেও কি মোছা যায় (দেয়ালের লেখা)?

তবু বেদনাহত হতে হয়, এমন কবি যখন দুঃস্বপ্ন দেখেন (একটি দুঃস্বপ্ন), যখন তাঁর কবিতায় 'বিসর্জন' (বৃষ্টিতে মিলায়) আর 'অন্ধকার' (আশ্বিন)-এর কথা থাকে। বারবার তাঁর কবিতায় কেন ঈশ্বর বা ঈশ্বরীর কথা এসেছে? (বোকা মানুষ, অমল ছবি, শীত, উলঙ্গের স্বদেশ, একটি দুঃস্বপ্ন প্রভৃতি কবিতা দ্রষ্টব্য) কী অর্থে তিনি বলেছেন, 'এ মাটির গর্ভে কী আছে/আজও আমাদের জানা নেই, (উলঙ্গের স্বদেশ)। প্রগতিবাদী কবি কি কখনও কোন কারণেই হতাশ হতে পারেন? তেমন মানুষের মুখই তো তিনি আঁকতে চেয়েছেন, যারা জানে, 'মাথা সোজা করে রাস্তা হাঁটিতে হয়।' এই তো তাঁর সংগ্রামী অজেয় কণ্ঠস্বর,—তবু 'মানুষ', এই শব্দেই, এক আশ্চর্য শক্তি নিহিত./এখন বাতাসের পিছনে স্পষ্টই উচ্চারিত হচ্ছে তার নাম/তাই বিশ্বাস রাখি,/ শেষ পর্যন্ত তারা কোথাও গিয়ে পৌঁছাবে।' (এই হাওয়া)। 'রক্তাক্ত দক্ষিণা', 'লেনিন', 'রক্তে ভাসা মানুষ', 'সূর্য ওঠার গান' প্রভৃতি কবিতায় মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠায়, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর নিষ্ঠা ও প্রত্যয় অভ্রভেদী। হো-চি-মিনের কবিতার অনুবাদ অনবদ্য। কবিকল্পনার চমৎ-কারিত্ব—'চন্দনা তোর সঙ্গে যাব/ আলোর চুমায় পুড়ে যেতে' (আকাশ-ভরা প্রেমের আগুন), 'মেঘ নাচানো কান্নাগুলি' (শীত), 'তুষারের পাহাড়-চূড়ায় কী আছে আগুন ছুঁয়ে স্বপ্নগুলি (কী আছে তিমিরবিনাশী গান) প্রভৃতি। কবির কণ্ঠে সুর মিলিয়ে রিক্তসর্বস্ব জনগণও আজ চাইছে—'শরীরের শেষ রক্তবিন্দুগুলি অবশ দশ আঙুলে জড়ো করে/ছিঁড়ে ফেলব তোর মুখোশ, মূর্তিমান অহংকার, কাপুরুষ পাপ!' (ছিঁড়ে ফেলব তোর মুখোশ)।

দুই কবি ঃ প্রমোদনাথ সেন ঃ ইউনিভার্সাল বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স (প্রকাশন বিভাগ), ৮/২, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-১ ঃ ১ম সংস্করণঃ মূল্য দশ টাকা।

'সন্ধ্যাসংগীত' রচনা করে রবীন্দ্রনাথ এমন এক বন্ধু পেয়েছিলেন যাঁর উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত তাঁর কাব্যরচনার বিকাশচেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করে দিয়েছিল। ইনি কবি প্রিয়নাথ সেন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে প্রিয়নাথ সেন সম্পর্কে লিখেছিলেন—"তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষায় সকল সাহিত্যের বড়ো-রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা।......সাহিত্যের সম্বন্ধে পুরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন, তাঁহার ভালোলাগা মন্দ-লাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রস-ভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করি-য়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বাংলা দেশে একাধিক সাহিত্যিকই কবি প্রিয়নাথের নিকট বিশেষ ঋণী। তাঁদের সাহিত্য-জীবন গঠনকালেই ভাবের কাণ্ডারী প্রিয়নাথের গভীর জ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে 'ভাবরাজ্যের দূর-দিগন্তের দৃশ্য' তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের সাথে প্রিয়-নাথের সৌহার্দ্যের বহু বিবরণ, নানা ঘটনা এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে সুন্দর-ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক আলোচনাও করা হয়েছে। প্লেটো, জন রাস্কিন, গী দ্য মোপাসা, জর্জ স্যাণ্ড, নিউম্যান, জন স্টুয়ার্ট মিল, মেকলে, ডিকেন্স প্রমুখ দিকপাল সাহিত্যিক এবং দার্শনিকদের সম্পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ অথবা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলোচনার ভিতর দিয়ে প্রিয়নাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং বিস্তৃত চিন্তার দিগন্তের অদ্ভুত পরিচয় পাওয়া যায়। কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী তাঁকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "প্রতিভাসম্পন্ন চিকিৎসক যেমন চট্ করিয়া দেহের কোন্ জায়গাটায় জখম হইয়াছে ঠিক করিতে পারেন আপনি কাব্য নিয়ে ঠিক তদনুরূপ। এরূপ কাব্যানুভূতি বড় দুর্লভ।" এই গ্রন্থে প্রিয়নাথ সেনের At the Year's End নামে একটি সনেট মুদ্রিত হয়েছে। এই সনেটটি ছাড়া প্রিয়নাথের কয়েকটি বাংলা কবিতা এবং একাধিক চিত্র গ্রন্থটির বিশেষ সম্পদ। প্রিয়নাথ সেন বাংলা সাহিত্যে এমন আসন অধিকার করে আছেন যাঁর তুলনা বিরল।

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

অনিবার্য কারণে অনেকদিন মুরশিদ আসরে হাজির হতে পারেন নি। এই আসরের সমঝদার রসিকজনদের কাছে সেজন্য মাপ চাইছি। আজকের আলোচনা আরম্ভ করার আগে অতীতের একটু জের টানতে হচ্ছে। আমার গত লেখাটা ছিল ময়মনসিংহ গীতিকার মঞ্চায়ন প্রসঙ্গে। ইদানীং কলকাতার কলামন্দির, রবীন্দ্রসদন প্রভৃতি অভিজাত নাট্যমঞ্চে ময়মনসিংহ গীতিকা অবলম্বনে নৃত্যনাট্য কিংবা গীতিনাট্য উপস্থিত করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করেছিলাম—গীতিকাকে তার নিজস্ব আঙ্গিকে উপস্থিত না করলে সেটা আর গীতিকা পদবাচ্য থাকে না। দ্বিতীয়ত গীতিকাকে তার নিজস্ব আঙ্গিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে আধুনিক ধরনে মঞ্চায়নে—পল্লীবাংলার খেটে-খাওয়া নিরক্ষর মানুষগুলির এই স্পর্শকাতর কোমল সৃষ্টিগুলি—মহানগরীর শিক্ষিত-অজ্ঞ ভদ্রশ্রেণীর হাতে পড়ে কি রকম মাটির গন্ধ একেবারে হারিয়ে ফেলতে পারে সে বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম।

আজ লোকসাহিত্য বা লোকসংগীত চর্চার পিছনের তাগিদটা অর্থকরী। এই চর্চার পিছনে দিল্লীর জলপানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট এবং বরাতে থাকলে বিদেশভ্রমণ ইত্যাদি প্রলোভন কাজ করছে। এই লোকসঙ্গীতের স্রষ্টা যাঁরা—তাঁদের জীবনে একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে বিদ্রোহের যে আলোড়ন এসেছে—আমাদের গবেষক বা চর্চাকারীদের মনে তা কোনো দাগই কাটে না— লোকসঙ্গীত চর্চা যে গণমানসের সাথে আমাদের ক্ষয়িষ্ণু বিদগ্ধ শিল্পসাহিত্যের সেতুবন্ধনের সাধনা—সে কথাটা তাঁরা ভুলে যান। মনে করিয়ে দিতে গেলে বলেন, বিশুদ্ধ লোকসঙ্গীত চর্চায় এ সব রাজনীতি হাজির করেন কেন? এই যেখানে আবহাওয়া সেখানে যদি কোনো রবীন্দ্র অধ্যাপক দাঁড়িয়ে শহরের শিক্ষিত লোকের রুচির খাতিরে গীতিকাকে শহরে পেশ করে হাজির করবার জন্য ওকালতি করেন, তখন তিনি যে-ই হোন, মুরশিদ তাঁকে খাতির করতে পারে না।

আমার সেই আলোচনা 'বিদ্বেষবিষ-সঞ্জাত' বলে জনৈক পত্রপ্রেরক (শ্রীবিভু চক্রবর্তী) মুরশিদকে কাফের বলে গালাগালি করেছেন। আমি যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলাম, সেগুলি খণ্ডন করার কোনো চেষ্টা পত্রলেখক মশাই করেন নি। আমার বক্তব্য ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। আমি লিখেছিলাম, গীতিকা (ব্যালাড)-কে গীতিকার আঙ্গিকে উপস্থিত না করলে গীতিকা আর গীতিকা থাকে না। দ্বিতীয়ত আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় শহরের রুচি অনুযায়ী উপস্থাপনার কথা বলে এই মূল বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে "শহরের রুচি" অনুযায়ী উপস্থিত করার কথা বলে নাগরিক বিকৃতিকে সাহায্য করছেন। তৃতীয়ত স্থানীয় 'গীতিকার' সুরেই "মলুয়া" নৃত্যনাট্য উপস্থিত করা হচ্ছে বলে আশুবাবু পূর্ববঙ্গের সুর সম্বন্ধে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন; চতুর্থত সাধারণ লোকসংগীতের আসর নয়—ময়মনসিংহ গীতিকার বিশেষ মঞ্চায়ন উপলক্ষে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিতে উঠে সেখানে ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম আত্মপ্রকাশ করার কথা বলতে গিয়ে শুধু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কয়েকবার বলে একবারও চিরস্মরণীয় ডঃ দীনেশচন্দ্রের নাম না করাটা যে নেহাৎ স্মৃতি-ভ্রান্তি নয় সে কথা বলে—আমি আশুবাবুর নিজের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছি—কিভাবে তিনি দীনেশ সেনকে আমাদের চোখে হেয় করতে চেয়েছেন—যাকে তিনি "আনট্রেন্ড" সংগ্রাহক বলে বলেছেন। পক্ষান্তরে আমি বলেছি—আশুবাবু একজন সংগ্রাহক মাত্র—সমীক্ষক নন। ডঃ দীনেশ সেনের সঙ্গে তাঁর কোনো তুলনাই চলে না।

আমার এই বক্তব্যগুলিকে খণ্ডন করার কোনো চেষ্টা পত্রপ্রেরক মশাই করেন নি। আশুবাবুর সম্বন্ধে মুরশিদের এই মন্তব্যে পত্রপ্রেরক যদি হাজির না করে ক্ষিপ্ত হয়ে লিখেছেন : "মনে হয় লেখকের বিদ্বেষবিষ চিত্ত থেকে উৎসারিত। কোনো পত্রিকায় যে তা ছাপা যায় ভাবা যায় না। জানি না এ প্রতিবাদপত্রের কি গতি হবে। যে পত্রিকায় নোংরামী ছড়ায়, তাতে প্রতিবাদপত্রের জায়গা সাধারণত হয় না; তবু সাংবাদিক সততা বা অন্য পত্রিকায় পত্রিকার প্রতিবাদপত্র দেয়া অসৌজন্যমূলক, তাই পনেরটা পয়সার ঝুঁকি নিতে হল।" পত্রপ্রেরকের পনেরটা পয়সার বেগতি হয় নি তাতে মুরশিদ আনন্দিত। কারণ মুরশিদ কোনো বিতর্কে ভীত নয়, কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে কলম ধরে নি, কলম ধরেছে নাগরিক ব্যবসায়িক বিকৃতির বিরুদ্ধে। তবে যদি কেউ মুখে সারিগান গেয়ে ধনপতি সদাগরের সপ্তডিঙায় স্বার্থের বৈঠা মারেন—আবার সে কাজের জন্য 'থিওরি' আবিষ্কার করেন—তবে তার সম্বন্ধে মুরশিদের বিদ্বেষ আছে বৈকি! এটা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়, বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ। পত্রপ্রেরক আমার বিরুদ্ধে "নোংরামী ছড়াবার" যে অভিযোগ এনেছেন, তার উত্তরে শুধু বলবো, পত্রপ্রেরক কাদামাটির উপর দাঁড়িয়ে লড়ছেন—মুরশিদ দাঁড়িয়ে আছেন শক্ত মাটির উপর। পত্রপ্রেরক বোধহয় জানেন না যে—১৯৬৬ সনের অক্টোবর মাসে "দৈনিক বসুমতী"তে শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তাঁর লোকসাহিত্যের পুস্তকে কুম্ভিলক বৃত্তি অবলম্বন করার বিষয়ে কয়েকটি চাঞ্চল্যকর চিঠি প্রকাশিত হয়। পত্রপ্রেরকদের মধ্যে শ্রীকামিনীকুমার রায়ের মতো লোকসাহিত্য গবেষকরা ছিলেন। তাঁদের অকাট্য তথ্যসমৃদ্ধ অভিযোগের কোনো উত্তর দেবার সাহস করেন নি আশুবাবু। সেই চিঠিগুলি গরীব মুরশিদের ঝোলায় আছে। যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছড়ানোই আমার উদ্দেশ্য হতো তা হলে সে চিঠিগুলি এই প্রসঙ্গে একটু ঘাঁটতে পারতাম। যদি পত্রপ্রেরক চান তবে আমি অনেক অকাট্য তথ্য হাজির করতে পারি। কিন্তু আমার মতে

বক্তব্যকে প্রমাণ করতে যা বলা প্রয়োজন, তার বেশি বলা আমার স্বভাব নয়। পত্রপ্রেরক আমাকে 'কাফের' বলে গালি দিয়েছেন। শরিয়তী কড়া শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সুফী ধর্মের উৎপত্তি। বাংলা দেশে সামন্তীয় জাতিকুল কণ্টকিত সমাজে লৌকিক ধর্মাচারের বিরুদ্ধে মানবধর্ম প্রচার করে বাউল ও সুফীরা একদা সমাজপতিদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছিলেন। সুফীবাদী মুরশিদরা সমাজ থেকে বাইরে মোকামে বাস করতেন। শরিয়তী কাঠমোল্লারা এদের কাফের বলে গালাগালি করতেন। আমাকে কাফের বলে পত্রপ্রেরক যে সম্মান দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। পূর্বতন সমাজপতিদের জায়গায় এসেছেন নতুন সমাজপতিরা। তাঁরা আরো কুটিল, আরো বলবান। সঙ্গীত নাটক একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয়, আকাশবাণী, বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন প্রভৃতি মিলে লোকসঙ্গীতের এই সমাজপতিদের এক শক্তিশালী 'এস্টাব্লিশমেন্ট' গড়ে উঠেছে, আজ তাদের চেলারা মুরশিদের লেখায় ক্ষিপ্ত হবেন—তা তো স্বাভাবিক। মুরশিদের লক্ষ্যভেদে মুরশিদ ও খাঁটি লোকসঙ্গীতপ্রিয় অসংখ্য অনুরাগী আনন্দিত হবেন নিশ্চয়।

রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি প্রসঙ্গে

ইদানীং এক খবরে লোকসঙ্গীতের মধুসঞ্চয়নকারীদের মৌচাকে ঢিল পড়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উন্নততর শিক্ষার সুযোগের জন্য মাসিক ২৫০, বৃত্তি দু'বছরের জন্য দেবার ব্যবস্থা আছে। পারদর্শিতা দেখাতে পারলে আরো এক বছরের জন্য বৃত্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়।

কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রণালয় নাকি লোকসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের জন্য অল্প বয়সের তরুণ-তরুণীদের বৃত্তিদান বন্ধ করে দেবার পরিকল্পনা করেছেন। কারণ হিসাবে নাকি বলা হচ্ছে যে, এই দু'টি বিষয়ে শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের মতো বিধিবদ্ধ নিয়মে সুর সাধনা বা কণ্ঠসাধনার রীতি নেই। শিক্ষার্থীরা নাকি সামান্য কিছু গানই কেবল শেখে। এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয় সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় যা লিখিতভাবে বলেছেন তার মোদ্দা কথা হলো—

(১) ভারতীয় লোকসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুণ বিচার উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সঙ্গে এক পর্যায়ে হতে পারে না। প্রতি সঙ্গীতেরই নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র রূপ ও ঢং আছে।

(২) তান, আলাপ, বিস্তার এবং ছন্দ-বৈচিত্র্য সম্বলিত উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কণ্ঠ-সাধনার প্রয়োজন হয়, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতে এরকম কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা কণ্ঠসাধনা ও ছন্দসাধনার প্রয়োজন হয় না সত্য, কিন্তু এই সরলতার জন্যে বৃত্তি বন্ধ করা হবে গুরুতর ভুল।

(৩) কণ্ঠসাধনা সহজ হলেও দু' হাজার রবীন্দ্রসঙ্গীত আয়ত্ত করা এবং হাজার হাজার লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করে আয়ত্ত করা মোটেই সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তা পরিশ্রম সাপেক্ষ। কাজেই বৃত্তি বন্ধ করা অনুচিত।

শান্তিদেব ঘোষ মশাইয়ের সমর্থনে স্বনামধন্য শার্ঙ্গদেব মহাশয় যা বলছেন, তা লোকসঙ্গীত সম্পর্কীয় অংশ থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবার কোনও হেতু নেই, কারণ এর বিকাশ-ধারাটাই স্বতন্ত্র। লোকসঙ্গীত এমন একটা জিনিষ যার চর্চায় সমগ্র দেশের সাধারণ্যের সঙ্গে নানাভাবে পরিচিত হওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সমগ্র জাতিকে উপলব্ধি করবার একটি উপায় হচ্ছে লোকসঙ্গীতের অনুশীলন। কেন্দ্রীয় সরকার এটা নিশ্চয়ই অনুমোদন করবেন যে, লোকসঙ্গীত সব সময় ঘরে বসে শেখা যায় না। এর জন্য বিভিন্ন গ্রামে জনপদে পরিভ্রমণ করতে হয়। তার জন্য প্রচুর খরচ হয়। এর কিছুটা এই বৃত্তি থেকে পূরণ করা সম্ভব। যদি এই বৃত্তিটি বিলোপ করা হয়, তাহলে লোকসঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ বিশেষভাবে ব্যাহত হবে।"

শ্রীশার্ঙ্গদেবের বক্তব্যের সঙ্গে নীতিগতভাবে মুরশিদ একমত। কিন্তু এই 'সত্যমেব জয়তে'র দেশে নীতি সব দুর্নীতি হয়ে গেছে—তা কি তিনি জানেন না? বিশেষ করে লোক-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই দুর্নীতির রূপটা শার্ঙ্গদেব না জানলেও শান্তিদেব-বাবু তো ভালো করেই জানেন। এই বৃত্তির ব্যাপারটা অনেকেই জানেন না তাই এখানে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করবো।

মাসিক ২৫০, টাকার লোভনীয় বৃত্তিটা লাভ করতে অনেক কাঠখড় জ্বালাতে হয়। দরখাস্তকারীর জন্য কতকগুলি নিয়ম করে দেয়া আছে—প্রথমত বয়সের একটা বিশেষ সীমা আছে। দ্বিতীয়ত একজন গুরুর শিক্ষাধীন থাকতে হয় এবং সে গুরুর সুপারিশ এবং অনুমোদন লাগে। তৃতীয়ত বিবাহিত হলে—বিশেষত মেয়েদের বেলা এই বৃত্তি পাওয়া দুষ্কর, ছেলেপুলের মা হলে কোনো আশা নেই, চতুর্থত বৃত্তি পেলে বিনা অনুমতিতে কোনো রেডিও প্রোগ্রাম করা চলবে না—রেডিও প্রোগ্রাম করলে, পারিশ্রমিকের টাকাটা বৃত্তি থেকে কেটে রাখা হবে। পঞ্চমত বৃত্তিধারী কোনো মেয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। এরকম আরো বিধিনিষেধ আছে। এর মধ্যে একটি কঠিন সর্ত হলো কলকাতায় বাড়ি আছে এরকম একজন ধনী গ্যারাণ্টার লাগবে। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক দেশে নিয়ম ভাঙাটাই নিয়ম। এ সব নিয়ম অবশ্য বড়ো কথা নয়। কিসের জন্য এই নিয়ম? মূল কথা বৃত্তিটা হলো—গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ আর শিক্ষার জন্য। আমার কথা হলো কোনো বৃত্তিধারী শিক্ষার্থীই তা করেন না। আজ পর্যন্ত যে সব ভাগ্যবান বা ভাগ্য-বতী এ সব বৃত্তিলাভ করেছেন, তাঁদের সম্বন্ধে অন্তত তাঁদের কণ্ঠের গতি-বিধি সম্বন্ধে মুরশিদ লক্ষ্য রেখেছেন। কারও নাম এখানে উল্লেখ করবো না, কারণ তাঁরা নিমিত্তমাত্র। এ কথা সবাই জানেন কেবল গলার জোরে কেউ বৃত্তি পায় না, পায় মামার জোরে। এই বেকারীর যুগে কোনো ভাগ্যবানের যদি মামার জোর থাকে, তবে তার জন্য তাকে দায়ী করা ঠিক নয়।

যাক সে কথা। গলার জোরের কথাটাই যদি কেবল বিবেচনা করি, তবে নির্বিবাদে বলতে পারি যে, বৃত্তি পাওয়ার আগে বৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীর যে গলা শুনেছি, দু' বছর বৃত্তিভোগ করার পর শিক্ষার্থীর সেই গলার চরিত্র অনেকখানি নষ্ট হয়ে যেতে দেখেছি। সরকারী টাকার এমনি মহিমা যে, যে পায় আর যে চায় দুজনেরই চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।

গুরুর হাজিরার খাতায় নামটা রেখে আরামে দু'বছর বা ততোধিক সময় নিশ্চিন্তে কেটে যায়, কেউ গ্রামে যায় না। গলায়ও জঙ ধরে যায়।

যে গুরুর সার্টিফিকেটে বৃত্তি মেলে এবং যে গুরু দক্ষিণাস্বরূপ বৃত্তি থেকে একশ টাকা পান (বাঁটোয়ারা নিয়ে কোনো কোনো সময় গুরু-শিষ্যের বিসম্বাদের খবরও মুরশিদের কাছে এসেছে) সে গুরুরা কারা? খবর নিয়ে দেখুন—গুরুগিরিতে একজনেরই মনোপলী চলেছে। তাঁর সঙ্গে শেয়ারে অবশ্য আরেকজন আছেন। এঁরা অবশ্য লোকসংগীতের গুরু। কিন্তু শান্তিদেববাবু ডবল গুরু। একাধারে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতে তাঁর কর্তৃত্ব। আগে যে এস্টাবলিশমেন্টের কথা বলেছিলাম—সেই এস্টাবলিশ-মেন্টের তিনি একজন মুখ্য সভ্য। সুরের সঙ্গে এই কর্তৃত্বের জোর মিলেই এস্টাবলিশমেন্টের ভিত গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে মুরশিদ বলবার অধিকারী নন। তবে বিশ্বভারতীর কলাসাধনার পরিণতি কোথায় পৌঁছেচে, দেশবাসী আজ তা জানেন। ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ এনড্রুজকে বিশ্বভারতী সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লেখেন : "অর্থ হয়তো এর বর্তমান অনেক অভাব দূর করতে পারে, কিন্তু ভয় হয় সে অর্থ শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতমের এই মন্দিরকে না দক্ষ খাজাঞ্চি পরিচালিত এক অফিসে পরিণত করে তোলে।" আজ এই "দক্ষ খাজাঞ্চিরা" লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মন্দিরের মোহান্ত। এঁরা কেবল দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু নন—এঁরা আজ বৃত্তিলাভের, প্রতিষ্ঠালাভের গুরু।

আরেকটা কথা এবং এ কথা মুরশিদ বহুবার বলেছেন, সেটা হলো রবীন্দ্রসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গসঙ্গীত গুরু-মুখী, কিন্তু লোকসঙ্গীত গুরুমুখী নয়। গলা ভালো থাকলে গুরুর কাছে ঘরে বসে রবীন্দ্রসংগীত শেখা যায়, কিন্তু লোকসংগীত পাওয়া যায় না। লোক-সঙ্গীতের কোনো "ঘরানা" নেই—আছে 'বাহিরানা' অর্থাৎ আঞ্চলিকানা। লোকসঙ্গীতের তিনিই সুশিক্ষক, যিনি সত্যিকারের গাইড্। বিভিন্ন অঞ্চলের গায়কী একজন শিক্ষকের কণ্ঠে থাকতে পারে না—তাছাড়া উপ-ভাষার বুৎপত্তির সমস্যাও আছে। টেপ রেকর্ড করে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় গায়কদের গান যদি ছাত্রদের শোনান, তবে তাদের একটা ধারণা জন্মাতে পারে। যদি সে কলকাতা শহরের ছেলে হয়, তবে যে অঞ্চলের গান তার গলায় আসে, সে অঞ্চলে গিয়ে লোকদের সঙ্গে গভীরভাবে মেলামেশা করে—স্থানীয় গায়কদের কাছে দিনের পর দিন শুনে কিছুটা আয়ত্ত করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটা বৃত্তিতে সম্ভব নয়—এজন্য চাই লোকসঙ্গীত সম্পর্কে গভীর আবেগ। অবশ্য বৃত্তি তাতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। কিন্তু কেউ গ্রামে যাচ্ছে না—এ কথাটা আগে বলেছি। শহুরে গুরুর "গোপন খাতা" থেকে একটি-দুটি করে গান ছাত্র বা ছাত্রীর খাতায় স্থানান্তরের নামই সংগ্রহ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে শহরের ছেলে-মেয়েরাই যে বৃত্তি পাবে এমন কি কথা। গ্রামে থাকা কোনো গরীব ছেলে-মেয়ে—গ্রাম্যগুরুর কাছে কি বৃত্তি নিয়ে শিখতে পারে না? কিন্তু কে তাদের গ্যারাণ্টার হবে? কোন অশিক্ষিত গ্রাম্যগুরু তো সার্টিফিকেট লিখতে পারবে না, কলকাতার প্রথম পরীক্ষায় এসে তদারকী করতে পারবে না আর কলকাতা সেমিফাইন্যালে যদি পারও হয়, তবে দিল্লীর ফাইন্যালে যাবার সাহস ও সঙ্গতি তার কোথায়? মহানগরীর একচেটিয়া গুরুদেরই বা গতি হবে কি—তাঁরাই বা এটা হতে দেবেন কেন?

এখানে কোনো গুরুর চেলা রেগে গিয়ে আমাকে বলতে পারেন : তাহলে কি আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ওকালতী করে এই বৃত্তিটা বন্ধ করে দিতে চাইছেন। উত্তরে বলবো : আমার চাওয়া না চাওয়ার উপর কেন্দ্রীয় সর-কারের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে না। যখন বারো ভূতে সরকারী টাকা লুটে-পুটে খাচ্ছে—তখন লোকসঙ্গীতের নামে কিছু গুরু বা চেলা যদি সামান্য কিছু তা থেকে পায় আমার তাতে ঈর্ষা করা বা আপত্তি করা ঠিক হবে না। আমার কেবল একটা অনুরোধ—লোকসঙ্গীতের উৎকর্ষতার নামে—লোক-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচলনের নামে—ঐ টাকাটা খাবেন না। লোকসংগীতকে লোকসংস্কৃতির নীলামের ঢোলের কাঠি করবেন না। দোহাই আপনাদের।

লেসিং

গ্রেইট ইওরোপীয়ান বলতে তিনটি নাম সম্বন্ধে কারোর কোন সন্দেহের কারণ থাকতে পারে বলে আমার মনে হয় না—বলেছেন টি. এস. ইলিয়ট। এই তিনজন হচ্ছেন—দান্তে, শেক্সপীয়ার এবং গ্যয়টে। এলিয়ট আরও মন্তব্য করেছেন—অবশ্য গোড়া থেকেই পাঠকদের সাবধান করে দিচ্ছি। গ্রেইট ইওরোপীয়ান হতে হলে, গ্রেইট পোয়েটও হওয়া দরকার। কিন্তু এর উল্টোটা সত্য নয়। এমন অনেক গ্রেইট পোয়েট আছেন, যাঁদের গ্রেইট ইওরোপীয়ান বলা চলে না—উদাহরণ হিসাবে ইংরাজ কবি ওয়ার্ডসওয়াথের কথা মনে করুন। তিনি নিঃসন্দেহে ইংরাজদের কাছে গ্রেইট পোয়েট—অন্যান্য ইওরোপীয়ান জাতির কাছে নয়।

শেক্সপীয়ার এবং গ্যয়টের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৃষ্ট দুই বিরাট মিথিক্যাল চরিত্রের কথা মানসপটে ভেসে ওঠে—হ্যামলেট এবং ফাউস্ট। এ দু'টি চরিত্র যেন ইওরোপীয়ান সিম্বলে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে এরা অডিসিয়াস এবং ডন কুইকজোটের সমপর্যায়ের—একদিকে এরা স্বদেশীয়, তেমনি আবার ইওরোপের অন্যান্য দেশের লোকের সমজাতীয়। Who could be more Greek than Odysseus, more Spanish than Don Quixote, more English than Hamlet, or more German than Faust. Yet they have all entered into the composition of all of us, they have all helped—as is the function of such figures—to explain European man to himself—T. S. Eliot.

ইয়োহান ভোল্‌ফগ্যাঙ্গ ফন্‌ গ্যয়টে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—"১৭৪৯ সালের ২৮শে অগাস্ট দুপুর বারোটার সময় ফ্র্যাঙ্কফার্ট অন্‌ মেইনে আমার জন্ম হয়।" তাঁর মায়ের সেবারতা মহিলারা মনে করেছিলেন শিশুটি বোধহয় মৃত, অনেক রকমে চেষ্টা করার পরে তবে এই শিশু চোখ মেলে চায়। অতি শুভক্ষণেই এই শিশুর জন্ম হয়েছিল—কারণ ভবিষ্যতে ইওরোপের মহাশিল্পীদের পাশেই—যেমন শেক্সপীয়ার, দান্তে এবং লিওনার্দো ডা ভিন্সি—ইনি নিজের স্থান করে নিতে পেরেছিলেন স্বীয় শিল্পপ্রতিভাগুণে।

গ্যয়টে জার্মান জাতির সব থেকে বড় কবি, নাট্যকার, সমালোচক এবং ঔপন্যাসিক। বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তাঁর অবদান কম নয়। এক কথায় ইউনিভার্সাল জিনিয়াস বলতে যা বোঝায়, তিনি ছিলেন তাই। প্রধানত সাহিত্যিক হিসাবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি থাকলেও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রায় সমস্ত শিল্পকলা সম্বন্ধেই তাঁর অগাধ জ্ঞান এবং পারদর্শিতা ছিল। তাঁর আঁকা ছবি আমি দেখেছি ভাইমারে গ্যয়টে হাউসে। গ্যয়টে যে কত উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন তা এইসব ছবি দেখেই বোঝা যায়। এ ছাড়া মিনারেলজি, অপটিক্স, [illegible] এ্যানাটোমী [illegible] সম্বন্ধে [illegible]।

গ্যয়টে [illegible] পরিবারে। [illegible] [illegible] গ্যয়টে [illegible] সুযোগ পান।

এই সময় ফরাসীরা ফ্র্যাঙ্কফার্ট অধিকার করে বসলো এবং একটি ফ্রেঞ্চ থিয়েটারও সেইসঙ্গে এল। এই থিয়েটারটির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন গ্যয়টে এবং ফ্রেঞ্চ নিওক্লাসিসিজমের দ্বারা আকৃষ্ট কয়েকটি নাটকও রচনা করেন। ১৬ বছর বয়সে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তিন বছরের জন্য আইন অধ্যয়ন করতে গেলেন। গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে দেড় বছরের জন্য তিনি দেশে ফিরে এলেন এবং প্রায় অকর্মণ্য হয়ে থাকলেন। এই সময় বেশ নিবিষ্টভাবে এ্যালকেমী এবং কেমিস্ট্রী অধ্যয়ন

গ্যয়টে

করলেন। তারপর স্ট্র্যাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে আইন পড়া শেষ করলেন (১৭৭০-৭১)। কিন্তু এখানে তাঁর আসল শিক্ষা শুরু হল হার্ডারের কাছে। হার্ডার তখন নিওক্ল্যাসিসিজমের বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন শুরু করেছেন। ঐ জাতীয় সাহিত্যকে তাঁরা কৃত্রিম সাহিত্য বলে অভিহিত করে হোমার, শেক্সপীয়ার, ওসিয়ানিক কাব্য এবং লোকসঙ্গীতের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছেন।

এরপর গ্যয়টে ফ্র্যাংকফার্টে পাঁচ বছর ধরে অসংলগ্নভাবে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তবে সাহিত্যিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যই এই সময় তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কিছু কিছু সাধারণ স্তরের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এবং কিছু ভাল প্রেম-কাব্যও তিনি লিখেছিলেন। এই সময়েই গ্যয়টে ফাউস্ট রচনার কাজেও হাত দিয়েছিলেন—কিন্তু এই মহাকাব্য প্রকাশিত হয় অনেক বছর বাদে। যথাস্থানে ফাউস্ট সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করবো।

বাইশ বছর বয়সে গ্যয়টে তাঁর বিখ্যাত নাটক Gotz Von Berlichingen প্রকাশ করেন। লুথারের দ্বারা উদ্দীপ্ত রিফরমেশনের সময় জার্মানীর পেজেন্ট-রাও সামাজিক পরিবর্তন দাবি করেছিল—

নাটকটি জার্মানীর এই কৃষক যুদ্ধের সময়কার একজন নাইটের কাহিনী নিয়ে লেখা। এ নাটক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যজগতে গ্যয়টের নাম এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। নাটকের নায়ক নাইটটি একজন মধ্যযুগীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। তিনি কৃষক বিদ্রোহে কৃষকদের দলে যোগ দিয়েছিলেন—এ বিদ্রোহ অবশ্য সাফল্য লাভ করে নি। নাটকটির বলিষ্ঠতা, প্রচলিত একঘেয়ে গাঠনিক আকৃতির পরিবর্জন, স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি বিরাট শ্রদ্ধা এবং আস্থা—এই সব থেকে বিচার করে Sturm und Drang পিরিয়ডের একটি সেরা নাটক হিসাবে এর পরিচিতি আছে।

নারীর প্রেম পৃথিবীর বহু সাহিত্যিক এবং শিল্পীকে মহৎ শিল্পের সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। কাউন্টেস অভ্ গিওকোণ্ডার দৈহিক এবং নিবিড় আত্মিক সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন বলেই ডা ভিন্সি মোনালিজা ছবিটি আঁকতে পেরেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। অত্যন্ত নীচ মনোবৃত্তির কাউন্ট নানাভাবে নির্যাতন করতেন স্ত্রীর প্রতি। তাই কাউন্টেসের মুখভাবে সব সময়েই একটা বিষাদের ছায়া দেখা যেত। তাঁর ছবিটি আঁকবার সময় কাউন্টেসের মুখে হাসির ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য লিওনার্ডো ভাল সঙ্গীতের ব্যবস্থা করতেন। তাই বিষাদ এবং আনন্দ এই দুটি ভাবই ফুটে উঠেছে মোনালিজার হাসিতে।

গ্যয়টেও তাঁর জীবনে বহুবার নারীর প্রেমে আত্মহারা হয়েছেন। এবং এই জাতীয় প্রেম শিল্পসৃষ্টির পথে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে—স্থাণু অবস্থায় রাখে নি। এ সম্পর্কে Dr. Georg Gusmann লিখেছেন :

"Leipzig was the scene of one love affair. A more serious one followed in Strasbourg, and Goethe got engaged when he returned to Frank Furt. Thus began a lifelong chain of such relationships. They have afforded the historians, commentators and authors with a vast amount of material for examination and criticism. Indeed the women in Goethe's life are a myth in themselves. Again and again they caused that agitation of spirit which later found expression in words.

After completing his legal studies Goethe took a post at the Reich Supreme Court in wetzler. There he had a remarkable friendship with a friend's fiancee, who in the end, however, did marry the man she had promised her hand. The affair inspired Goethe to write the epistolary novel "The Sorrows of Young Werther". Napoleon was one of its great admirers, reading it numerous times, as he told Goethe when they had their remarkable meeting in Erfurt. The novel was an unprecedented success when it came out, and at twenty five Goethe was regarded as one of the premiere writers of his day."

ভার্দার সম্বন্ধে অপর একজন সমালোচক লিখেছেন :

"This epistolary novelelte about a young man who brooded over a hopeless love until he finally blew his brains out plunged all Europe into tears."

এ জাতীয় ভাবাবেগ অবশ্য আজকের দিনের পাঠকের কাছে আতিশয্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এবং যেভাবে কাহিনী পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, সেদিক দিয়ে বিচার করলে, ভার্দার আজও এক বিরাট শিল্প-কীর্তি বলেই বিবেচিত হয়। গ্যয়টের জীবনের এই সময়কার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই ভার্দার রচিত হয়, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এক সময় গ্যয়টে মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত রচনার ভেতরই টুকরো টুকরোভাবে তাঁর আত্মস্বীকৃতি পাওয়া যায়। এ কথা সবাই জানেন যে, এই জার্মান মহাকবি সারা জীবন ধরেই কোন না কোন নারীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন এবং সেই প্রেমই তাঁকে মহৎ রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

ভার্দারে ভাবাতিশয্য থাকতে পারে। কিন্তু তার জন্য বইটি মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। পড়তে শুরু করে শেষ না করে ছাড়া যায় না। পড়তে পড়তে পাঠক নিজের অজান্তেই ভার্দারের সঙ্গে কখন একাত্ম হয়ে পড়েন।

[ক্রমশ]

রেডিওর কথা

রেডিওর সংবাদ সমীক্ষা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রেডিও প্রতিনিধি গিয়ে টেপ রেকর্ড করা সম্পর্কে এক ভদ্রলোক বেশ মজার কথা শোনাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের কথার অনুরূপ অভিজ্ঞতা সম্প্রতি আমাদের হয়েছে। মে মাসে শহরে বিভিন্ন সংগঠন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব করেছে। একটি সুপরিচিত সংগঠনের অনুষ্ঠানে রেডিওর প্রতিনিধিকে দেখা গেল অনেকক্ষণ বসে বক্তৃতা ও গান টেপ রেকর্ড করলেন। উদ্যোক্তারা সব রকমে এই প্রতিনিধির কাজে সহায়তা করলেন। রেডিওর প্রতিনিধি আসবার সময় বলে আসলেন আজ রাতে না হলেও আগামীকাল এই অনুষ্ঠানের কথা সংবাদ সমীক্ষা বিভাগে প্রচারিত হবে। স্বভাবতই উদ্যোক্তারা এ কথায় বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন গেল এই সংবাদ প্রচারিত হল না। উদ্যোক্তাদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল সংবাদ প্রচারিত হলো না কেন? যদি সংবাদ প্রচারিত না হবে, তাহলে রেডিওর দুজন প্রতিনিধি মঞ্চে গিয়ে বসলেন কেন, কেনই বা টেপ রেকর্ড করলেন!

ভদ্রলোক বললেন, ব্যাপারটার মূলে গোলমাল আছে। অর্থাৎ উদ্যোক্তারা যখন রেডিও কর্তৃপক্ষকে অনুষ্ঠানের কথা জানালেন তখন তাঁদের মান রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রচারের কথা বললেন, কিন্তু যাঁকে পাঠালেন তিনি লোকদেখানো ব্যাপার খাটলেন। হয়ত ফিরে এসে রিপোর্ট দিলেন টেপ খারাপ হয়ে গেছে। ব্যস, তার উপর তো করার কিছু নেই। এভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেশ একটা প্রহসন চলছে। কোন্ অনুষ্ঠান যে ওদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আর কোন্‌টি যে নয়, তা বোঝবার উপায় নেই। এমন এমন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে রেডিওতে যার কথা শোনাই যায় না। বিদ্রোহী কবির জন্মদিনের অনুষ্ঠানের কথা একদিন অন্তত প্রচারিত হয়েছে। বিশ্বের জনগণের শ্রদ্ধেয় লেনিনের জন্মশতবর্ষের ক'টা অনুষ্ঠানের কথা রেডিওয় শোনা গেছে? লেনিনকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পঞ্চাশটির মত গান রচিত হয়েছে। এই গানগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কতবার গাওয়া হয়েছে তার কোন হিসাব নেই। কিন্তু একটি ছাড়া রেডিওর শ্রোতারা কি কোন গান শুনেছেন? একটি গানের কয়েক পংক্তি শুনেছেন, তার কারণ রাজ্যপাল যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে গানটি গাওয়া হয়েছিল। গায়কদের সৌভাগ্য যে, তাঁরা রাজ্যপালের সভায় গানটি গেয়েছিলেন। লোকসঙ্গীত যাঁরা অনুশীলন করেন এবং গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের কণ্ঠে লেনিন সম্পর্কিত চমৎকার গান শোনা যায়। সে গান-গুলি তাঁরা অনুষ্ঠানে গেয়ে থাকেন। কিন্তু রেডিও কর্তৃপক্ষের কানে এই গানগুলি বোধ হয় ভাল লাগে না। লেনিন নামটি একদিন এ দেশের শাসকদের কাছে ভয়ের কারণ ছিল, আজো সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল-দের ভাল লাগে না। রেডিও কর্তৃপক্ষ পুরাতন শাসকদের অনুসরণ করেন কি না কে জানে! —সুজন।

মা [illegible] মমতা' ছবিতে নূতন

'অরণ্যের দিনরাত্রি' ও 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবি বার্লিন উৎসবে প্রদর্শন উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভায় রবি ঘোষ, কনসাল জেনারেল অফিসের কালচারাল এ্যাটাচি মিসেস উতে ব্যানার্জী-কোমার, সত্যজিৎ রায় ও শুভেন্দু চ্যাটার্জী।

পদ্ম-গোলাপ

অন্তরা ফিল্মসের 'পদ্ম-গোলাপ' ছবি মুক্তি পাচ্ছে মেট্রো সিনেমায়। মেট্রো সিনেমায় বাংলা ছবি মুক্তিলাভ দর্শকদের কাছে কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হবে। কারণ এই সিনেমায় ভারতীয় ছবি দেখানো হয় না। চন্দ্রনাথ-এর বেশ কয়েক বছর পরে "পদ্ম-গোলাপ" মুক্তিলাভ করলো।

'পদ্ম-গোলাপ' একটি রহস্য কাহিনী-চিত্র। কাহিনীর শুরুতে রয়েছে চোরাই মাল সরিয়ে নেবার দৃশ্য। পাহাড়ী পথে, উপভোগ্য বনের দৃশ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে কাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। সূচনায় একটা চিঠিতে দর্শকরা অনুমান করতে পারবেন দুই বোনকে নিয়ে কাহিনীর নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে প্রেমের মধুররস আর গোয়েন্দা কাহিনীর ঔৎসুক্য। পাঁচমেশালী রসের এই কাহিনী-চিত্রের ভিলেন চরিত্রটিকে মনে হয়েছে কোন কারখানার মালিক। পাহাড়ে এক পুরনো দুর্গে তার মালপত্র লুকিয়ে রাখার জায়গা —সেটা ভূতের বাড়ি বলে পরিচিত। কি মাল নিয়ে তার চোরা কারবার, কিভাবে এত করকরে টাকার আমদানী, সেকথা শেষ পর্যন্ত অনুক্তই থেকে গেছে। দেখা গেল তার ওপর পুলিশের নজর রয়েছে এবং একজন চালাক-চতুর গোয়েন্দা ওদের পেছনে লেগেছে। তার কাজের আরো সুবিধা হল, সে ভিলেনের কন্যা রীতার সঙ্গে ভাব জমিয়ে একটা চাকরী জোগাড় করে নিল এবং বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলো। এই গোয়েন্দা ধীরে ধীরে আবিষ্কার করল পাহাড়ের দুর্গে এক ছায়ামূর্তি এসে গান গায়। তার গান শোনা যায়, তাকে দেখা যায় না। ভিলেনও এই গান শোনে, একটা মূর্তি দেখে আঁৎকে ওঠে, যার ছায়ামূর্তি দেখে তার তো এভাবে গান গাইবার কথা নয়। তাকে তো পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। গোয়েন্দা আরো আবিষ্কার করে—কিছু দূরে এক বাড়িতে রীতার যমজ বোন রয়েছে। আর রীতার মা-বাপ হারানো কন্যার জন্য অস্থির হয়ে দিন গুণছে। গোয়েন্দা এতদিন সপ্রতিভ যুবকরূপে রীতার সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। এখন সে গোবেচারা ধর্মভীরু মাস্টার সেজে রীতার বোনের সঙ্গে পরিচয় করলো। একদিন রীতাকে পরিচয় করে দিল তার যমজ বোনের সঙ্গে এবং দুজনে নিজেদের বাড়ি বদল করে অভিজ্ঞতা বিনিময় করলো, অনেক গোপন কথা জানলো। তার পরে একদিন পাহাড়ের দুর্গে রীতা ও গোয়েন্দার কাছে ভিলেনের পরিচয় ধরা পড়ল, ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়েছে। ভিলেনও ছাড়বার পাত্র নয়, কাজেই গুলী-বিনিময় চললো। এ সময় কোথা থেকে কি করে রীতার বোন এসে পড়েছে এবং ভিলেনের গুলীতে সে প্রাণ হারালো।

এত ঘটনার পরও কিন্তু এই রহস্য-কাহিনীর রহস্যের মূল অনুদ্ঘাটিত থেকে যায়। কাহিনী স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বিশ্বাস্যতার দিক থেকে বিচার করলে

বি, নাগি রেড্ডির "ঘর ঘর কি কাহানী" ছবিতে বলরাজ সাহানী, মহেশ কুমার ও নিরূপা রায়।

সামঞ্জস্য পাওয়া যাবে না। দেখতে দেখতে কখনো 'মহল', কখনো 'মায়ামৃগ', কখনো আরো দুয়েকটি হিন্দী ছবির কথা মনে হবে। কাহিনীকার ডাঃ বিশ্বনাথ বেশ কয়েকটি কাহিনীকে এক জায়গায় করে পাঁচমেশালী রস পরিবেশন করতে চেয়েছেন —তবে গল্প হয় নি। হিন্দী ছবির অনুকরণ হয়েছে।

ছবিতে জায়গার দুরত্ব এবং দিন ও রাত্রির ব্যবধান বোঝা না যাওয়ায় গল্পের বিস্তারেও অসুবিধা ঘটিয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, অনুপকুমার, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা দেবী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজিত লাহিড়ী।

শোনা গেছিল। ছবিটির নির্মাণকালে ছাত্র ও যুবকগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। প্রকাশ যে, ছবি নির্মাণকালে পরিচালক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। ছাত্র ও যুবসমাজ এই ছবিটি সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

শপথ নিলাম

শচীন অধিকারী পরিচালিত 'শপথ নিলাম' ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্রিটিশ শাসনকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ছবির চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, দিলীপ রায়, শমিতা বিশ্বাস, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, মাধবী দেবী, শেখর চট্টোপাধ্যায়, নবাগতা সুনন্দা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

বার্লিন উৎসবে দু'টি বাংলা ছবি

বার্লিন আন্তর্জাতিক বিংশতি চলচ্চিত্র উৎসবে দুটি বাংলা ছবি প্রতিযোগিতায়

মেদিনীপুরে একাংক নাটক প্রতিযোগিতা

মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক সংস্থা নিশান আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতা গত ৮ই থেকে ১৪ই জুন বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে যথাক্রমে বাণীমন্দিরের 'ওরা দুইজন' এবং খড়্গপুর মৈত্রী সংঘের 'নাটুকে'। শ্রেষ্ঠ পরিচালনার পুরস্কার পেয়েছে অরুণ মাইতি। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে যথাক্রমে বিশ্বনাথ মাঝি ও শ্রীমতী মায়া মুখার্জী। নাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছে চিত্তরঞ্জন পাল 'ওরা দুইজন' নাটকের জন্য।

সাগিনা মাহাতো

তপন সিংহ পরিচালিত 'সাগিনা মাহাতো' ছবিটি আগস্ট মাসে মুক্তি পাবে বলে জানা গেছে। গৌরকিশোর ঘোষ লিখিত কাহিনী শ্রমিক আন্দোলন-বিরোধী ও রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিযোগ
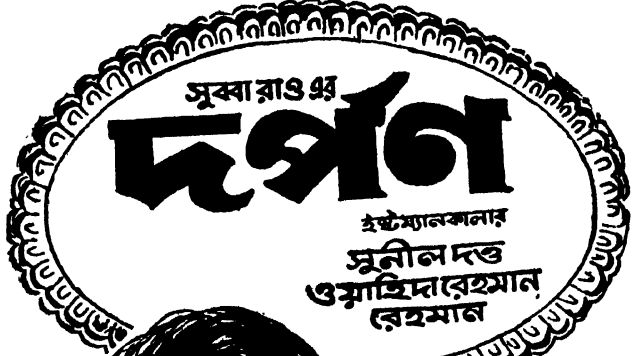
হিন্দী ছবি 'দর্পণ'-এ ওয়াহিদা রহমান ও রেহমান

অংশ গ্রহণ করবে। এই দুটি ছবি যথাক্রমে সত্যজিৎ রায়ের "অরণ্যের দিনরাত্রি" এবং নারায়ণ চক্রবর্তী ও বি ভৌমিকের পরিচালিত "দিবারাত্রির কাব্য"। জুন মাসের ২৬ তারিখ থেকে ৭ই জুলাই পর্যন্ত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ৩৭টি দেশের ছবি এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করবে।

এই উৎসবে যোগদান উপলক্ষে পশ্চিম জার্মানীর কলকাতাস্থ কনসাল জেনারেল অফিসের কালচারাল এটাচি মিসেস উতে ব্যানার্জী-কোমার এই দুটি ছবির প্রযোজক, পরিচালক এবং শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সত্যজিৎ রায়, নেপাল দত্ত, অসীম দত্ত, নারায়ণ চক্রবর্তী, বি ভৌমিক, বসন্ত চৌধুরী, রবি ঘোষ, শুভেন্দু চ্যাটার্জী প্রমুখ।

পশ্চিম জার্মানীর পথে 'সারা আকাশ'

বাসু চ্যাটার্জীর 'সারা আকাশ' হিন্দী ছবিটি পশ্চিম জার্মানীর রেকলিন আউসেন ওবারহাউসেন ফিল্ম ফ্যাসিবলে বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে। জুন মাসের মাঝামাঝি প্রতি বছর এই উৎসব হয়ে থাকে। ভারত থেকে এই একটি মাত্র পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে।

পার্শোনাল ফিল্মস

অনেক আমেরিকান ছাত্রের কাছে ক্যামেরা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ হয়েছে। তাদের ক্যামেরায় শহরের পরিচিত দৃশ্য; সারি-সারি বাড়ি, রঙ-বেরঙের গাড়ি, রাস্তার উপর ছেলেদের খেলার দৃশ্য তোলা হচ্ছে।

ছিপছিপে মেয়ে জেনী রোজ দক্ষিণ [illegible] স্কুল বানিয়েছে বেড়াতে আসে। জেনীর ছবি তোলার একটি আকর্ষণীয় জায়গা এটি। তার প্রথম ছবি তোলার হাতে-খড়ি ১৬ মিলিমিটার ক্যামেরায় রঙিন ছবি। এই ছবিটির নাম দিয়েছিল 'দি ইনোসেন্ট'। সে একাই এই ছবির প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং চিত্রগ্রাহক। একাই সব।

ফিলাডেলফিয়ার ফিল্ম মেকার্স সেণ্টার প্রায় ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, যারা এভাবে ছবি তোলে। ১৯৬৮ সাল থেকে এই সেণ্টার হয়েছে। এখানে গেলে নানারকম কৌতূহলজনক দৃশ্য দেখা যায়। কোন ক্লাসে ব্ল্যাক বোর্ডগুলিকে নিয়ে কার্টুনচিত্র করার স্টুডিও বানিয়েছে ছাত্রছাত্রীরা, কোন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের তোলা ছবি দেখছে।

ছাত্রদের তৈরি এই [illegible] লিকে বলা হয় পার্শোনাল ফিল্মস বা [illegible] চলচ্চিত্র। সম্প্রতি এই ছবিগুলি নিয়ে একটা আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় [illegible] বলেছে, "ফিল্ম তৈরি করা মানুষকে দেখা এবং জানার এক উপায়"। এই মেয়েটি তার 'নিউ ইয়র্কে বাসযাত্রী' ছবিতে যাত্রীর চোখ দিয়ে নিউ ইয়র্ককে দেখাচ্ছে।

মধ্য এশিয়ার সভ্যতার নৃতত্ত্বভিত্তিক ছবি

বিশিষ্ট সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক মালিক কায়ুমোভ সম্প্রতি ইউনেসকোর প্রকল্পাধীনে মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিসমূহের সংস্কৃতি সম্পর্কে এক ছবি তোলায় হাত দিয়েছেন। সোভিয়েত প্রাচ্যের ঐতিহাসিক-গবেষণামূলক চলচ্চিত্র নির্মাণে কায়ুমোভ সুপরিচিত।

ফিলাডেলফিয়া স্টুডেন্টস ফিল্মসের অন্যতম উৎসাহী জেনী পথে পথে ছবি তুলছে।

'আরাধনা' ছবির সংগীত সার্থকতার জন্য শচীন দেববর্মণ ও শক্তি সামন্তকে হিজ মাস্টার্স ভয়েস রৌপ্য নির্মিত ট্রেড মার্ক দিয়ে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে।

এই নৃকুলতাত্ত্বিক ছবিটি তিরিশ মিনিটের। মধ্য এশিয়ার সভ্যতা সম্পর্কে ইউনেসকোর এক বিজ্ঞানমূলক গবেষণা-প্রকল্পের অংশ হিসেবেই এই ছবিটি তোলা হচ্ছে।

ইউনেসকোর বিগত পঞ্চদশ সাধারণ অধিবেশনে এই প্রকল্প গৃহীত হয়। ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সহযোগিতায় এই কাজটি করা হবে।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায় জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসব

আগামী ২০শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বিশ্বরূপা রঙ্গালয়ে তরুণ অপেরা ও যাত্রা শিল্পী সংঘের যুক্ত উদ্যোগে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শেষে 'তরুণ অপেরা'র শিল্পীরা শম্ভু বাগের 'লেনিন' অভিনয় করবেন। অমর ঘোষ নির্দেশিত এ পালার নামভূমিকায় অভিনয় করবেন শান্তিগোপাল।

নবোদয়ের বর্ষামঙ্গল নৃত্যানুষ্ঠান

নব প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতার (বেহালা) নবোদয় শিল্পীগোষ্ঠী গত ১৬ই জুন সন্ধ্যায় এক বিচিত্রানুষ্ঠান ও 'বর্ষামঙ্গল' নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বর্ষামঙ্গলের রচনা ও গ্রন্থনায় ছিলেন শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এবং সুনন্দা দত্তচৌধুরী।

নৃত্য ও সংগীত পরিচালনা এবং রবীন্দ্রসংগীত তত্ত্বাবধানে ছিলেন যথাক্রমে কুমারী বন্দনা ভট্টাচার্য ও শ্রীসৌরেন পাল।

নৃত্যে এবং নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন মালা ঘোষ, শিখা দত্তচৌধুরী, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, তাপস ভট্টাচার্য, সুশান্ত ভট্টাচার্য, পূর্ণিমা ভট্টাচার্য, আলপনা ভট্টাচার্য, চিত্রা ভট্টাচার্য, শিখা ভৌমিক, শর্মিলা মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় ও বন্দনা ভট্টাচার্য।
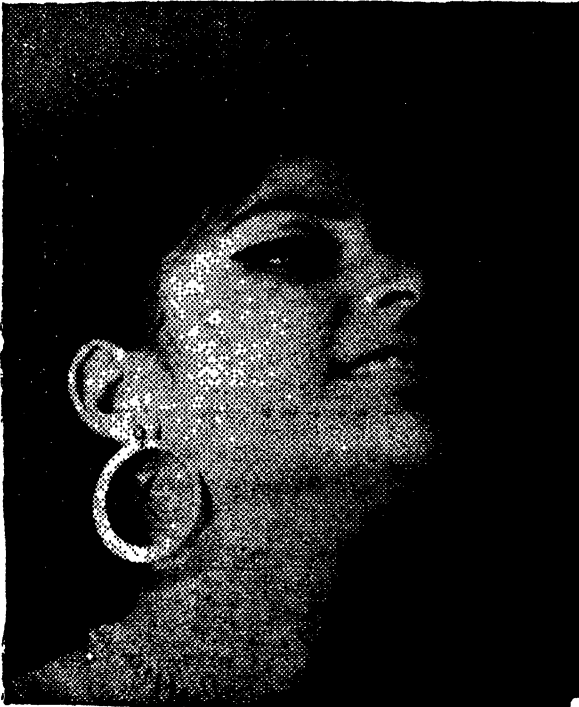
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রথম টেস্টে ভারত পরাজিত হলো।

বিশ্রীভাবে হেরে গেলো। অমরনাথ ও সি· কে· নাইডুর স্মরণীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের জন্যে ভারত ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল বটে, কিন্তু নয় উইকেটে হারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারলেন না ভারতের খেলোয়াড়রা। জার্ডিনের নেতৃত্বে ভারত সফরকারী এম· সি· সি· দলটি যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল ঠিকই—তবু সকলেই আশা করেছিলেন যে, এক বছর আগে ইংলণ্ড সফরে গিয়ে ভারতের খেলোয়াড়রা যেভাবে খেলে এসেছেন—ভারতের মাটিতেও তাঁরা সেইভাবেই খেলতে পারবেন। তাঁরা সমানে এম· সি· সি'র নামী খেলোয়াড়দের সংগে পাল্লা দিতে পারবেন।

তা হয়তো ভারতীয় খেলোয়াড়রা পুরোপুরি পারেন নি। পিছিয়েই তাঁরা পড়েছিলেন বার বার। এম· সি· সি'র খেলোয়াড়দের সংগে ঠিকভাবে পাল্লা দিতে না পারার জন্যে শেষ পর্যন্ত তাঁদের পরাজয় স্বীকারও করে নিতে হল।

কিন্তু ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দিক দিয়ে ভারতের কয়েকজন খেলোয়াড়ের খেলায় বম্বের ক্রিকেটাঙ্গন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে ছিল লালা অমরনাথের জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী করা, চোট লাগা হাতে ব্যাট ধরেও সি· কে· নাইডুর স্মরণীয় দৃঢ়তা, আর তরুণ খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্টের শেষ রক্ষা করার দুরন্ত প্রচেষ্টা।

বোলিং-এও ভারতের অমর সিং, মহম্মদ নিসার আর জামসেদজী দেখিয়েছিলেন যথেষ্ট কৃতিত্ব। তবু কেন ভারত পারলো না ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে?

এই প্রশ্নের যতোগুলো উত্তরই আসুক না কেন—সবার আগে বলতে হবে ফিল্ডিং-এর কথা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের দুর্বল ফিল্ডিংই ভারতকে সরাসরি পরাজয়ের পথে ঠেলে দিয়েছিল, কারণ মহম্মদ নিসার কিম্বা অমর সিং-এর বোলিং-এর বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা কোন সময়ই সহজভাবে খেলতে পারেন নি।

বার বার তাঁরা অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সেই দুর্বলতার পুরো সুযোগ নিতে পারেন নি ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ক্যাচ ফেলে দিয়েছিলেন একের পর এক। আউট হবার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে আরো সকর্তভাবে খেলে রান তুলেছিলেন ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা। রান তোলার ক্ষেত্রেও সেই একই প্রশ্ন জড়িত। যে বলে মেরে-কেটে এক রান হতে পারে—ভারতীয় ফিল্ডারদের দাক্ষিণ্যে সেই মারে হলো চার রান। তাই রানও উঠলো যেমন অনেক, তেমনি উঠলোও তাড়াতাড়ি।

তাই একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, প্রথম টেস্টে ভারতের পরাজয়ের পেছনে ছিল ব্যাটসম্যানদের স্নায়বিক দুর্বলতা আর ফিল্ডারদের দুর্বলতায় ভরা ফিল্ডিং। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্ট দল যখন ঘোষণা করা হলো তখনো যে সেদিকে খুব একটা নজর দেওয়া হয়েছে এ কথা মনে হলো না।

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ শুরু হলো কলকাতায় ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখে। চার দিনের খেলা। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের পক্ষে খেলার জন্যে মনোনীত হলেন—

এন· জিওমল, দিলওয়ার হোসেন, এস· ওয়াজির আলী, সি· কে· নাইডু, লালা অমরনাথ, ভি. এম. মার্চেণ্ট. মুস্তাক আলী, সি· এস· নাইডু, অমর সিং, মহম্মদ নিসার ও এম· গোপালন।

প্রথম টেস্টে ভারতের পক্ষে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকে বাদ পড়লেন ন্যাভলে, এল· পি· জয়, এস· কোলহা, এল. রামজী ও জামসেদজী। এ'দের বদলে এলেন জিওমল, দিলওয়ার হোসেন, মুস্তাক আলী, সি· এস· নাইডু ও এম· গোপালন।

ভারতবর্ষের কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে মুস্তাক আলী টেস্ট খেলার সুযোগ পেলেন। মুস্তাকের বয়েস তখন মাত্র উনিশ। প্রথম টেস্টে অমরনাথ প্রথম আবির্ভাবে শতরান করে রেকর্ড করেছেন আর দ্বিতীয় টেস্টে মুস্তাক রেকর্ড করলেন সব থেকে কম বয়সে টেস্ট খেলে।

কলকাতায় টেস্ট ম্যাচের আগে একটা মজার ঘটনা ঘটলো। ১৯৬৭ সালে ইডেন উদ্যানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে ভারতের টেস্ট ম্যাচ খেলার সময় সেই ঘটনার নায়ক লালা অমরনাথের মুখেই শুনেছিলাম মজার সেই ঘটনার কথা। নিজে বোকা বনে যাওয়ার কথাই সেদিন লালাজী বড় রসিয়ে রসিয়ে আমাদের শুনিয়েছিলেন।

ঘটনার কথা শুনে আমরা সেদিন প্রাণ খুলে হেসেছিলাম। লালাজীও হেসেছিলেন। পাশে বসে ভিনু মানকাদ, গোলাম আমেদ—ওঁরাও হাসছিলেন। কিন্তু ওঁদের সেই হাসিমাখা মুখের ওপর পড়েছিল একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বেদনার ছায়া। সেই মুহূর্তে আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছিলাম যে,

ওঁরা আর তখন ১৯৬৭ সালের সেই বিকেলে ইডেন উদ্যানে নেই। ওঁদের মন চলে গেছে অনেক পেছনে—অনেক সুখ-দুঃখ আর আনন্দে ভরা খেলোয়াড়ী জীবনের বছরগুলোতে।

অনেক বছর আগের সেই ঘটনার কথাই বললেন লালা অমরনাথ।

'জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলতে কলকাতায় আসছি। আনন্দে মন তখন আমার ডগমগ করছে। বেশ একটা আত্মপ্রসাদের ভাবও আছে মনে। জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী করেছি। দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী আর প্রথম ইনিংসেও বেশ ভালোই খেলেছিলাম। একটা টেস্ট খেলেই নাম করে ফেলেছি। সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে আমার নাম।

"ওদের সঙ্গে আমরা, অন্যান্য খেলোয়াড়রা কলকাতায় আসছি। ট্রেন এসে পৌঁছলো হাওড়া স্টেশনে। আমি তার আগে কখনও কলকাতায় আসি নি। তাই নিশ্চিন্ত মনে জামা-প্যান্ট না বদলে বসে আছি। ভাবছি এবার জামা-প্যান্ট পরে নিতে হবে, কলকাতা বোধহয় এসে গেল।

"হঠাৎ দেখি ক'জন কুলি উঠে আমার জিনিষপত্র নিয়ে টানাটানি শুরু করছে। আমি নামবো কলকাতায়—হাওড়া স্টেশনে নামতে হবে কেন! আমিও ছাড়বো না, কুলিরাও ছাড়বে না। কুলিরা ছাড়ে না দেখে শেষকালে রেগে গিয়ে তাদের ধমক দিয়ে উঠলাম।

"আরে এ হচ্ছেটা কি শুনি? আমি তো মোটেই এখানে নামবো না। আমি যাবো কলকাতায়।'

"আমার কথা শুনে কুলিরা এ ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চাইতে লাগলো। তারপর ওরা কিছু বলার আগেই স্থানীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষরা এসে হাজির হলেন ট্রেনের কামরায়।

"ওদের দেখে আমি রেগে গেলাম। আমার মাথায় তখনো ঢুকছে না যে, হাওড়ায় কেন নামবো। আমরা তো যেতে হবে কলকাতায়। তারপর ব্যাপারটা যখন জানতে পারলাম তখন বুঝলাম আমি কেমন বুদ্ধু বনে গেছি...!"

[চলবে]

॥ বিজয় আনন্দ ॥

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার পর ব্রেজিল দলের অধিনায়ক কার্লোস এলবার্টো সোনার নারী অর্থাৎ জুলে রিমে কাপটিকে মাথার ওপর তুলে বিজয় আনন্দে মেতেছেন। আজটেক স্টেডিয়ামে সমবেত হাজার হাজার ব্রেজিল সমর্থকদের তাঁকে ঘিরে আনন্দ করতে দেখা যাচ্ছে। এই খেলায় ব্রেজিল ৪—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল ইটালীকে।

পেলেকে মাথায় তুলে ব্রেজিলের সমর্থকদের আনন্দ উৎসব।

ওরা ও আমরা

'সাবাস ব্রেজিল, সাবাস পেলে'। কথাটা বলা ঠিক হবে কি না ভেবে দেখা দরকার। কারণ শুধু পেলে ন· ব্রেজিল দলের এগারোজন খেলোয়াড়কেই সাবাস বলতে হবে। সকলে বলছেনও তাই। তবু পেলের যে আরো একা আলাদা সম্মান পাওয়ার কথা। কারণ পেলে পেলেই। আর যে দলে পেলের মতো খেলোয়াড় থাকে সে দলের মনোব যে কতো বেড়ে যায় তা যেন ঠিক লিখে বোঝানো যাবে না। তাই পেলের ব্রেজিল যখন এবারের বিশ্বকাপ ফুটব প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ইটালীর সম্মুখীন হলো, তখন সকলেই ধরে নিয়েছিলেন যে, ব্রেজিল জিতবেই। শে পর্যন্ত জিতলোও তাই। ইটালী এক-আধ গোলে নয়—হেরে গেল ৪—১ গোলে। ফলে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা পুরস্কার 'জুলে রিমের' আয়ু হলো শেষ। সোনার পরীকে নিজেদের সম্পত্তি করে দেশে নিয়ে গেছে ব্রেজিল। তা ১৯৭৪ সালে মিউনিখের বিশ্বকাপে পুরস্কার হিসেবে তৈরি হচ্ছে নতুন কাপ। নামও তার নতুন। 'অর্থাৎ ১৯৩০ সা থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সমস্ত ফুটবল বিশ্বকে মাতিয়ে রেখে সোনার পরী এবার স্থান নিল ইতিহাসের পাতায় জুলে রিমে কাপ পর্ব এইখানেই সমাপ্ত।

মেক্সিকোয় জুলে রিমে কাপ যখন বিশ্ব ফুটবলের আসর মাত করছে, ঠিক তখনই কলকাতায় ফুটবল খেলা নিয়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর সেই সংগে তাল দিয়ে নোংরামির চূড়ান্ত চলেছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ যখন ফুটব খেলার উন্নতির জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে, ঠিক তখনই আমরা ফুটবল খেলার মানের কথা ভুলে গিয়ে প্রদর্শনী খেলার টিকিটের বিষয়টি নিয়ে বাজার কালো করছি কিম্বা গট-আপ গেমের ব্যবস্থা করে পয়েন্ট সংগ্রহের ব্যাপারটা আরো পাকা করছি। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশে ঠিক খেলার জন্যে আজকাল আর খেলা হয় না। খেলোয়াড়রা শুধু আনন্দ পাবার জন্যে খেলেন না, ক্লাবগুলো খেলোয়াড়দের খেলান ট্রফির দিকে চোখ রেখে আর আই· এফ· এ কিম্বা এ· আই. এফ. এ কতকগুলো খেলা পরিচালনা করে আর দল গঠন করেই নিজেদে কর্তব্য সারেন। ফলে বিশ্ব ফুটবলের নিরিখে আমাদের দেশের খেলার মান দিন-দিন নেমেই যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে নজর নেই কারো। নজর দেবার যে প্রয়োজন আছে এ কথাও বোধ হয় কেউ অনুভব করেন না। ফলে আজ আমরা নিজেরাই জানি না যে, আমরা কোথায় আছি...! —শান্তিপ্রিয়॥

ফুটবল মাঠে

([illegible]কো আর কলকাতা বোধ হয় একই সংগে মেতে উঠেছিল ফুটবলানন্দে। শুধু সময়ের হের-ফের। একটা খেলা বিকেল সাড়ে চারটায় আর একটা গভীর রাত্রে।

প্রথম খেলার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কলকাতার দুই প্রধান—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল। ইডেনের সেই খেলা নিয়ে সমস্ত বাংলা দেশ যেন মেতে উঠেছিল। শুধু টিকিট আর টিকিট। টিকিট ছাড়া যেন কারো মুখে কোন কথা নেই। [illegible] টিকিটের আশায় এক একজন [illegible] করেছেন।

[illegible] পর্যন্ত সেই টিকিট পর্বকে [illegible] চললো লাঠি, জুড়তে হলো [illegible], শেষ পর্যন্ত গুলীও [illegible] হয়েছিল। শুধুমাত্র একখানি টি[illegible]টের আশায় এতো কাণ্ড।

এতো কাণ্ডের পর শেষ পর্যন্ত খেলা কিন্তু বিরতির পর আর অনুষ্ঠিত হতে পারলো না। ঝড়ো হাওয়া আর প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়ে গেল। ইস্টবেঙ্গল তখন জিতছিল এক গোলে। গোল দিয়েছিলেন শ্যাম থাপা।

তাই দুঃখ ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের। তাঁরা কাক ভেজা ভিজলেন, কিন্তু জয়লাভের পুরো আনন্দ তাঁরা পেলেন না। ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকরা যেমন জিততে জিততেও জিততে পারলেন না বলে দুঃখিত, তেমনি মোহনবাগানের সমর্থকরা হারতে হারতেও হারলেন না বলে আনন্দে আত্মহারা। দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঐ খেলাটার জন্যে আবার সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হবে সম্ভবত আগস্ট মাসের কোন এক সময়ে।

তাই কলকাতার লীগ ফুটবলের অবস্থা যে এখন কার অনুকূলে তা কিছুতেই বলা যাবে না। কারণ একক লীগ খেলার পয়েন্ট সুপার লীগের পয়েন্টের সংগে যোগ করা হবে। তাই শেষ মুহূর্তে কি যে হবে তা এখনই বলা একরকম অসম্ভব।

তবে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবার অসম্ভবকে সম্ভব হতে দেখা গেছে। প্রথমে ইংলণ্ডের পরাজয় আর পরে ওয়েস্ট জার্মানীর ইটালীর কাছে হেরে যাওয়া কিছুটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তবে ফাইনালে যে ইটালী ব্রেজিলের কাছে হেরে যাবে এ বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত ছিলেন।

কিন্তু গণকযন্ত্র (কম্পিউটার) দ্বিতীয়বার তার গণনায় ভুল করলো। প্রথমবার ভুল করেছিল ইংলণ্ড বিশ্বকাপ জয় করবে এ ঘোষণা করে আর তার দ্বিতীয় ভুলটি হলো, ফাইন্যাল খেলায় ইটালী ব্রেজিলকে পরাজিত করবে এই খবর দেওয়ায়।

যাই হোক তৃতীয়বার বিশ্ব বিজয়ীর সম্মান অর্জন করায় জুলে রিমে কাপ এখন হয়ে গেল ব্রেজিলের সম্পত্তি। ৪ কিলোগ্রাম ওজনের এক ফুট লম্বা কাপটিকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই জুলে রিমে কাপের আয়ু বিশ্ব ফুটবলের আসর থেকে এ বছরই ফুরোল...।

॥ পেলের দেওয়া প্রথম গোলের দৃশ্য ॥

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইটালীর গোলের মুখে একটা উঁচু বল পেয়ে চিলের ছোঁ মারার ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে পেলে চকিতে হেড করলে ইটালীর গোলরক্ষক এনরিকো এলবারতোসি বলটা ধরার কোন সুযোগই পেলেন না।

খ্যাতনামা ব্যঙ্গচিত্রী সঞ্জয়ের চোখে এ বছরের বিশ্ব ফুটবল ॥

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বৃহস্পতিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
৭৫ বর্ষ : ২য় সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
PRICE : 30 Paise
Thursday, 9th July, 1970

সমাজবিরোধীদের কবলে

পশ্চিমবঙ্গ বোধ হয় পকেট ফাঁক করার রাজত্বে পরিণত হতে চলেছে। পাঁচ হাজারী উপদেষ্টাদের আমলে সমাজবিরোধীদের এখানে এখন পোয়া-বারো। অথচ এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর দারুণ তৎপরতার সঙ্গে সরকারী বড় কর্তাদের, বিশেষ করে পুলিশের হোমরা-চোমরাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, জ্যোতি বসুর জন্যই তাঁরা কিছু করতে পারেন নি। এবার তাঁরা সমাজবিরোধীদের নির্মূল করবেনই। সেই সমাজবিরোধীরাই এখন শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ করে রাজ্যের সর্বত্র জনজীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে সংবাদপত্রগুলিও একযোগে তারস্বরে চীৎকার সুরু করেছিল—সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিষ্ক্রীয়তায় পশ্চিমবঙ্গ গেল, গেল, গোল্লায় গেল। এখন ঐ সব সংবাদপত্র নীরব ও নিশ্চিন্ত।

রাজ্যপালের উপদেষ্টারা কাজ করছেন না, এ কথা কেউ বলবে না। কাগজে কাগজে জমি দখল সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলেও, আসলে তা রহস্যময় থেকে গেছে। কারণ সরকারের পুলিশ এখন কৃষকদের অধিকার রক্ষা করার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে রণমূর্তি ধারণ করেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে যে সব কল-কারখানা চালু করার জন্য আলাপ-আলোচনা সুরু হয়েছিল, তার ভরাডুবি ঘটেছে; অপর দিকে আরো কিছু কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বহু বেকারের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে আজ পর্যন্ত অনুদান পৌঁছয় নি, শিক্ষকরা মহার্ঘ্য-ভাতা কবে পাবেন তার কোনো স্থিরতা নেই। হু হু করে দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলেছে। অথচ উপদেষ্টাদের মুখ দিয়ে হৈ-চৈ করে প্রশাসনিক সমন্বয় সাধনের কথা আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। যুক্তফ্রণ্টের এক মাসের শাসনের মধ্যেই সংবাদপত্রে চুলচেরা বিচার সুরু হয়েছিল—ঐ সরকার জনসাধারণের কল্যাণের কাজ কতটুকু করতে পেরেছেন। আর কয়েক মাস পার হলেও, রাষ্ট্রপতির শাসনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলেও, তা যেন তেমন কিছু ব্যাপার নয়। অথচ রাজ্যব্যাপী এখন বোমা-পটকা ও গুলীগোলার তান্ডব চলছে, দিনের পর দিন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে সমাজবিরোধী গুন্ডারা। এদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন এ কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই। তবে উদ্যোগ-আয়োজনের অভাব নেই। সি-আর-পি, ইস্টার্ন রাইফেলস্, এণ্টি বোম্ব স্কোয়াড প্রভৃতির নামে কয়েক হাজার সশস্ত্র পুলিশকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে বহাল রাখা হয়েছে।

দলীয় রাজত্বের অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা আশা করেছিল এবার সমাজবিরোধীরা শায়েস্তা হবে, তাদের মোহভঙ্গ হয়েছে। তাদের অনেকেই এখন অদৃষ্টের দোষ বলে সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এ ব্যাপারে যে উদ্বিগ্ন, তা তাদের কার্য-কলাপ দেখে বোঝা যায় না। সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্য আজ এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, কলকাতার যে কোনো প্রকাশ্য রাস্তায় কিংবা অলিতে-গলিতে যখন-তখন তাদের দর্শন মিলবে। রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের চোখের সামনেই গুন্ডারা পথচারীদের আক্রমণ করছে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে জিনিসপ[illegible] ছিনিয়ে নিচ্ছে। অবাধগতিতে গুন্ডারা দমদম, পাতিপুকুর, সুকিয়া স্ট্রীট, গড়পার, রামমোহন রায় রোড, বরানগর বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বোমাবাজী করে যাচ্ছে, ট্যাংরা-ধাপ এলাকার নিরীহ লোকের বাড়িতে হানা দিয়ে বোমা বা ছোরা[illegible] ভয় দেখিয়ে বোমা তৈরি[illegible] জন্য জন্য চাঁদা আদায় করছে। এ[illegible] সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিগৃহী[illegible] ব্যক্তিরা থানায় খবর জানাতে[illegible] ভ[illegible] পায়। ভয়ের কারণ অনেকেরই, বিশে[illegible] করে ভুক্তভোগীদের ভাল করেই জানা মুহূর্তের মধ্যে অভিযোগকারীদের না[illegible] গুন্ডারা জেনে যায়। তাই থানা পুলিশের কাছ থেকে সাধারণ মানু[illegible] দূরে থাকাই সমীচীন মনে করে।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে কোথা[illegible] কোথাও সন্ধ্যের এর এমন [illegible] দিনে-দুপুরে রাস্তায় বের হওয়[illegible] হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ রাস্তায় বের হওয়া[illegible] অন্য অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাসপাতালে[illegible] দিকে পা বাড়ানো। রাজ্যের উপদেষ্টা[illegible] এই অসহনীয় অবস্থা আর কতোদি[illegible] চালিয়ে যেতে দেবেন, তাঁদের কা[illegible] আমাদের সবিনয় জিজ্ঞাসা। সমাজ-বিরোধীদের নাম-ধাম ও তাদের দুষ্কা[illegible] গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে থানা থানায় অজানা থাকার কথা নয়। তব[illegible] তাদের শায়েস্তা করতে রাজ্য সরকা[illegible] ব্যর্থ হচ্ছেন কেন? এখন তো আ[illegible] যুক্তফ্রণ্ট সরকার বা জ্যোতি বসু[illegible] রাজত্ব নেই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট না. দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুরুষ। বিধান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে যত ক্ষমতা দিয়েছে ততখানি ক্ষমতা পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্রনায়ককেই দেয় নি। কিন্তু যত চতুর প্রেসিডেন্টই হোন না কেন, তিনি ডিক্টেটর হতে পারেন না, স্বৈরাচারী হতে চাইলেই বাধা পাবেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে সেই ধাক্কাই খেতে হয়েছে। সেনেট বা প্রতিনিধিসভাকে ডিঙিয়ে তিনি চলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কতদূর তিনি যেতে পারেন এবং কী তিনি পারেন না। সেনেটে কুপার-চার্চ সংশোধনী প্রস্তাবটা ৫৮—৩৭ ভোটে গৃহীত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের যতখানি বাড় বেড়েছিল, ঠিক ততখানি বাড় ছাঁটাই করে তাঁকে তাঁর মূল কাঠামোতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, ৩০ জুনের পর প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর সেনেটের অনুমোদন ছাড়া কম্বোডিয়ায় সৈন্য পাঠাতে বা এখানকার বিদেশী সৈন্যদের কোন অর্থসাহায্য দিতে পারবেন না। গত ৩০শে এপ্রিল কম্বোডিয়ায় মার্কিন অভিযানের কথা ঘোষণা করার আগে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এই গুরুতর বিষয়টি সেনেট বা প্রতিনিধিসভাকে জানানো প্রয়োজনই বোধ করেন নি। সে উদ্ধত চ্যালেঞ্জের জবাবই আজ সেনেট দিয়েছে।

কম্বোডিয়া অভিযানের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক প্রচণ্ড প্রশাসন-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্টের একতরফা সিদ্ধান্তে দেশের প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং দু' দলের সাধারণ কংগ্রেসসদস্যরা ক্রোধে ক্ষেপে যান। কুপার-চার্চ সংশোধনী প্রস্তাব সেই বিরুদ্ধতারই প্রতিফলন।

জন শেরম্যান কুপার নিজে একজন বিবেকবান আইনজ্ঞ। তার ওপর আবার তিনি একজন প্রবীণ, পোড়খাওয়া রাজনীতিজ্ঞও বটেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর কুপার হার্ভার্ড ল' কলেজে যান আইন পড়তে। নিজ রাজ্য কেন্টাকির নিম্নতর পরিষদে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি জজ হলেন। এ পদে বেশ কিছুদিন কাটলো তাঁর। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এলেন ১৯৪৬ সালে যখন তিনি

জন শেরম্যান কুপার

সেনেটে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন সে আসন তিনি রাখতে পারেন নি, '৪৮ সনে তাঁর হার হলো। আবার জিতলেন কুপার, সুযোগ পেলেন '৫২ সালে, ফিরে এলেন সেনেটে। কিন্তু এবারও মেয়াদের আসন তিনি বেশিদিন রাখতে পারলেন না। তবে ১৯৫৬ সালে নির্বাচনে জিতেই কুপার সেনেটে জাঁকিয়ে শেকড় গেড়ে বসলেন :

সেনেটর কুপারের জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। গ্র্যাজুয়েট হবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যথারীতি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে ব্যাভারিয়ার বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিশনের চেয়ারম্যান হন। পরে তিনি একটা আইন বিষয়ক সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন।

আরও দায়িত্ব পেলেন কুপার ১৯৪৯ সালে যখন তাঁকে রাষ্ট্রসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব ডীন এ্যাচিসনের ন্যাটোবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি কিছুকাল কাজ করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়ে শেরম্যান কুপার কিছুদিন ভারতেও ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি নিহত হবার পর তিনি কমিশনের অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

সেনেটের ডেমোক্রেটিক সদস্য ফ্রাঙ্ক চার্চের সঙ্গে যৌথভাবে গাল্ফ অব টংকিন প্রস্তাবের সংশোধনী এনে জন কুপার একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের রিপাবলিকান দলভুক্ত হলেও কুপার যুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে লিখিত থাকবে। এবং কুপার-চার্চ নিশ্চয়ই আমেরিকার স্বাধীনচেতা তরুণদের মনে বহুদিন প্রেরণা ও সাহস যুগিয়ে যাবেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

THE STATESMAN

PARTITIONING OF INDIA

MOSLEM LEAGUE DEMAND

RESOLUTION PASSED AT LAHORE

"ONLY CONSTITUTIONAL PLAN ACCEPTABLE"

LEAGUE & THE KHAKSARS

LAHORE RESOLUTION

DEMAND FOR REMOVAL OF BAN

LAHORE, Mar 24

A resolution deploring the loss of life which occurred in the clash between the Khaksars and the police on March 19 in Lahore and requesting the Punjab Government to institute an impartial inquiry into the police firing and to remove the ban on the Khaksar organisation was unanimously passed at the open session of the All-India Moslem League to-night.

The resolution which was considered earlier by the Subject Committee, was moved from the chair when Mr. Jinnah made a statement on the Khaksar situation

২৪শে মার্চ, ১৯৪০-এর স্টেটসম্যান পত্রিকায় লাহোরে লীগ অধিবেশনে ভারত-বিভাগ প্রস্তাব পাশের রিপোর্টের চিত্র

বসু ও জিন্না—(১৮)

পা-কি-স্তা-ন—জিন্না এবার চাইলেন, কোনোদিন পাবেন না, এই বিশ্বাস নিয়ে। মহম্মদ ইকবাল এই পাকিস্তানের দার্শনিক পিতা।

ইকবাল কবি এবং দার্শনিক। ১৮৭৬ সালে তাঁর জন্ম; লাহোর, কেমব্রিজ এবং মিউনিকে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত। দেশপ্রেমের গান লিখে তিনি জাতীয়তাবাদী ভারতের অন্তরে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। তাঁর আশ্চর্যজনক সাফল্য এই—'হিন্দুস্থান হামারা' নামক অমর জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা হয়েও একই সঙ্গে তিনি ভারতে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম পরিকল্পনাকারী হতে পেরেছিলেন। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম লীগ গ্রহণ করার পরে জিন্না বলেছিলেন, "ইকবাল আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে জেনে খুশি হতেন যে, আমাদের যা করতে তিনি বলেছিলেন, আমরা ঠিক তাই করেছি।"

১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে ইকবাল জানালেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল: "অখণ্ড

ভারত—এই ধারণার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র নির্মাণের কিংবা বৃটিশ গণতন্ত্রের মনোভাবকে ভারতে চাপানোর চেষ্টার অর্থ অজানিতে ভারতবর্ষকে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা।" পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে ঐ সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন:

"আমি দেখতে চাই, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্থান একত্র হয়ে একটি রাষ্ট্র হোক। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন সহ বা বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা সহ এই উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের গঠনই আমার বিবেচনায় ভারতীয় মুসলমানদের, অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের চরম নিয়তি।"

স্যার মহম্মদ ইকবাল গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেছিলেন। সেখানে জিন্নার সঙ্গে তাঁর বহু আলোচনা হয়। ফলে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ইকবাল তাঁকে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রতত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেন। জিন্না তখনকার মত সেকথা মেনে নেন নি। তারপরে ১৯৩৭-এর নির্বাচন ঘটে গেছে, বিজয়ীর উল্লাসে নেহরু লীগকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন কথায় ও কার্যে, "জিন্না ফিরে গেছেন মাউন্ট প্লেজেন্ট রোডের বাসভবনে আশাহত হয়ে, কিন্তু ভগ্নোদ্যম হয়ে নয়; নিঃসঙ্গে তিনি কাজ করেছেন। ......একগোছা চিঠি ছিল তাঁর ড্রেয়ারে, সান্ত্বনার জন্য সেগুলি খুলে ওল্টাতেন; সেগুলি লিখেছিলেন স্যার মহম্মদ ইকবাল, ১৯৩২-এ ইংলন্ডে তাঁদের সাক্ষাৎ আলাপের পরে।"* ২৮শে মে, ১৯৩৭-এ ইকবাল তাঁর এই বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেছিলেন—মুসলিম-ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য "দেশকে এমন নূতনভাবে গঠিত করতে হবে, যাতে এক বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হয় যেখানে মুসলমানদের সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্য।" জিন্নাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি কি মনে করেন না—সেই দাবি উত্থাপন করার সময় ইতিমধ্যেই এসে গেছে?" জিন্না এই চিঠির কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। ২১শে জুন একবাল আবার লেখেন, "আপনি ব্যস্ত মানুষ তা আমি জানি। কিন্তু যদি প্রায়ই চিঠিপত্র লিখি, আশা করি, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে লিখি এইজন্য যে, যে ঝড় আসছে, তার মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের উপযুক্তভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার মত মানুষ আপনি ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ে দ্বিতীয় কেউ নেই।"

পাকিস্তান শব্দটি কিন্তু ইকবালের বা জিন্নার দান নয়—এই মন্ত্রের দ্রষ্টা কেম্ব্রিজের এক ছোকরা ছাত্র—চৌধুরী রহমৎ আলী। গোলটেবিল বৈঠকে যখন অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের পরিকল্পনা ওঠে, ইনি সেটাকে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে ট্রাজেডি বলে মনে করেছিলেন। ফেডারেশনের অর্থ হিন্দু সংখ্যাধিক্যের নিচে মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিষ্পেষিত হওয়া। সুতরাং মহম্মদ আলী ১৯৩৩-এ 'পাকিস্তান ন্যাশনাল মুভমেন্ট' আরম্ভ করে দিলেন, যা পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারকার্য করবে। 'নাউ অর নেভার' নামে একটি চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা তিনি বার করলেন, তার মধ্যে ফেডারেশনের বিরোধিতা করা হল এবং

---

*জওহরলাল নেহরুর অনপনেয় ইকবাল-প্রীতি ছিল। তার অনেকগুলি কারণ নেহরুর লেখা থেকে অনুমান করা যায়। একটির কথা আগে বলেছি, 'রাজনৈতিক' জিন্নার তুলনায় 'দেশপ্রেমিক' নেহরুকে তিনি মৃত্যুশয্যায় প্রশংসা করেছিলেন—নেহরুর কাছেই। অন্য কারণগুলি—ইকবাল উর্দু ও ফার্সীর বড় কবি এবং ইকবালের মধ্যে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-রক্ত প্রবহমান। তা হলেও নেহরুকে বলতে হয়েছে, 'Iqbal was one of the early advocates of Pakistan.' একথা বলার পরেই নেহরু দ্রুত ঐ কথাগুলোর ওপরে চুনকাম করতে চেয়েছেন: "তবু ইকবাল পাকিস্তান পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত বিপদ ও উদ্ভট অসংগতি বুঝতে পেরেছিলেন। এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথোপকথনকালে ইকবাল তাঁকে বলেছিলেন যে, মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন বলে কার্যত বাধ্য হয়ে তাঁকে পাকিস্তানের কথা বলতে হয়েছিল; কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, পাকিস্তান ভারতের পক্ষে সাধারণভাবে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর হবে। সম্ভবত তাঁর মন বদলে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে তিনি পূর্বাহ্নে বিস্তৃতভাবে ভাবেন নি, যেহেতু ঐ প্রশ্নের তখন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তাঁর সমগ্র জীবনদৃষ্টি পরবর্তীকালে পাকিস্তান ও ভারত বিভাগ ব্যাপারে যেসব নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার সঙ্গে মেলে না।

"জীবনের শেষ বছরগুলিতে ইকবাল ক্রমেই বেশিভাবে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহী হন। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাট অগ্রগতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল।"

ইকবালের সমাজতন্ত্রের জাতি-চরিত্র ঠিক কি ছিল বলতে পারব না। এইটুকু দেখি যে, তিনি জীবনের একেবারে শেষ পর্যায়ে জিন্নাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ মুসলমানের অবস্থার উন্নতিতে সচেষ্ট নয়, তা জনগণকে আকর্ষণ করতে পারবে না।" জিন্নার জীবনীকার বলেন, ইকবালের ইঙ্গিত জিন্না গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ, জনসম্পর্কহীন নেতৃত্ব-প্রকৃতি ত্যাগ করেছিলেন, তার ফলে ইকবালের মৃত্যুর মাসেই তিনি বলতে পেরেছিলেন: "লীগের শক্তি বাড়ছে প্রতিদিন। যখনো অধিবেশনের আগে সদস্যসংখ্যা ছিল কয়েক সহস্র, কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ মুসলমান লীগের পতাকার তলায় সমবেত।"

পাকিস্তান-পরিকল্পনাকারী ইকবালকে কে ঠিক বুঝেছিলেন, জিন্না, না নেহরু?
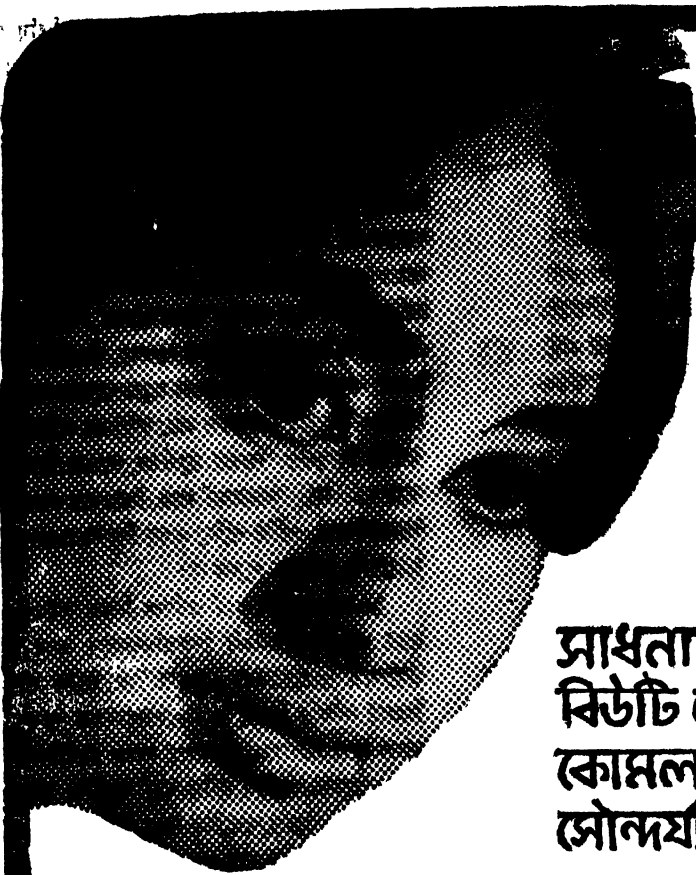
এমন কি ইকবালের পাকিস্তান পরিকল্পনাকেও যথেষ্ট নয় বলে বাতিল করে দেওয়া হলঃ "ইকবাল প্রস্তাব করেছেন, (মুসলিম) প্রদেশগুলিকে মিলিয়ে দিয়ে একটি অখণ্ড রাজ্য তৈরি করে তাকে অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশনের অঙ্গ করা হোক। কিন্তু আমরা প্রস্তাব করি যে, প্রদেশগুলি পৃথক থেকে নিজেদের মধ্যে একটি ফেডারেশন গঠন করুক। এদেশে কোনো শান্তি বা স্বস্তি সম্ভব নয়, যদি মুসলমান-দের বোকা বানিয়ে হিন্দুপ্রধান ফেডারেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে তারা নিজের ভাগ্যের প্রভু হবে না, হবে না নিজের আত্মার নিয়ন্তা।"

মহম্মদ আলীর এই কেম্ব্রিজ প্যামফ্লেট কিন্তু ঐকালে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয় নি। ১৯৩৩-এর আগস্টে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ দেখান নি। "পরি-কল্পনাটিকে আমরা উদ্ভট এবং অবাস্তব বলে মনে করি", "যতদূর জানি এটা একটা ছাত্রের পরিকল্পনা"—তাঁরা বলে-ছিলেন। ছাত্র-যৌবন কিন্তু উদ্দীপনায় অক্লান্ত। রহমৎ আলী ১৯৩৫ সালে আর একটি পুস্তিকা বার করে ফেললেন। তারপরে ১৯৪০ সালে ইংলণ্ড থেকে যে বিবৃতি দিলেন তাতে সুর গরম বই নরম হয় নি। দেখা গেল যে, উক্ত পাকিস্তান-পরিকল্পনায় বাংলা ও হায়দারাবাদ বাড়তি যুক্ত হয়েছে।*

পাকিস্তানের উচ্চতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চৌধুরী মহম্মদ আলী বলেছিলেনঃ পাকিস্তান শব্দটি উর্দু ও পার্শি দুই ভাষাতেই পাওয়া যাবে। মুসলমানের সকল হোমল্যাণ্ডের নামের ভিতর থেকে অক্ষর সংগ্রহ করে শব্দটি তৈরি হয়েছে। ঐ নিজস্ব ভূমিগুলি হল—পঞ্জাব, আফ-গানিয়া (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধু (কচ্ছ ও কাথিয়াবাড়স্থ সহ), তুর্কিস্থান, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান। পাকিস্তান—পাক্ অর্থাৎ পবিত্র ও পরিস্কৃতদের বাসস্থান। তা মুসলিম জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও জাতিগোত্রের প্রতীক ইত্যাদি। (বাংলাথে)

["*Pakistan* is both a Persian and Urdu word. It is composed of letters taken from the names of all our homelands—'Indian' and 'Asian' that is, Punjab, Afgania (North West Frontier Province), Kashmir, Iran, Sindh (including Kutch and Kathiawar), Tukharistan, Afganistan and Baloshistan. It means the lands of the *Paks*—the spiritually pure and clean. It symbolizes the religious beliefs and ethnical stocks of our people ; and it stands for all the territ[illegible] constituents of our original fatherland."]

অসম্ভব, অবাস্তব বলে লীগ যে পাকিস্তান প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে সে আঁকড়ে ধরল কিছুদিনের মধ্যেই। তার আগে দ্বিজাতিতত্ত্বকে অবশ্যই সে বিশ্বাস করেছিল। এই তত্ত্বেরও যুবক প্রবক্তা ছিলেন চৌধুরী মহম্মদ আলী। মাদাম হালিদা এদিবকে মহম্মদ আলী বলেছিলেন, যে ভৌগোলিক অংশ নিয়ে তিনি পাকিস্তানের পরিকল্পনা করেছেন, তা কখনই ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—সেখানে মুসলমানেরাই থাকত এবং সেখান থেকে ভারতের ওপর অভিযানকারীরূপে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইনি আরও বলে-ছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক কারণে নয়, তা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘর্ষ। হিন্দু ও মুসলমান মূলগতভাবে ভিন্ন জাতি। তাঁর মূল বক্তব্য, "আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা, বিবাহ ব্যবস্থা হিন্দুদের থেকে মূলে পৃথক। তা কতকগুলি প্রধান নীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা মুসলিম, আমরা হিন্দুদের সঙ্গে বসে খাই না, আমাদের মধ্যে বিয়ে হয় না। আমাদের আচার-বিচার, পাঁজি-পুঁথি, এমন কি আমাদের পোষাক ও আহারাদি পর্যন্ত পৃথক।"

১৯৪০-এর ৯ই মার্চ তারিখে জিন্না 'টাইম এণ্ড টাইড' নামে এক প্রবন্ধে এই দ্বিজাতিতত্ত্বকে প্রথম খোলাখুলি উপস্থিত করেছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক সূত্রে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি হিন্দু ও মুসলমানদের পার্থক্য সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিল, আনন্দের সঙ্গে সেগুলি উদ্ধৃত করে জিন্না বলেনঃ "বৃটিশ জাতি ধর্মে খৃস্টান; তারা নিজেদের ইতিহাসের ধর্মযুদ্ধগুলির কথা ভুলে যায়। আজ তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে—যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একান্ত সম্পর্কের ব্যাপার। হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু কদাপি ওভাবে চিন্তা করা যাবে না। কারণ এই দুই ধর্মই সুস্পষ্ট সমাজনীতির ভিত্তিতে স্থাপিত, যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক যতখানি নির্ধারণ করে, তার থেকে মানুষের সঙ্গে তার প্রতিবেশীর সম্পর্ক কম নির্ধারণ করে না। এই ধর্মগুলি কেবল বিধি-ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতিকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, সেই সঙ্গে সমাজজীবনের সকল অংশকেও তাই করে। এ ধরনের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে আত্মস্বতন্ত্র, গণ্ডীবদ্ধ বলে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যে ধরনের চিন্তার ঐক্য এবং ব্যক্তিসত্তার বিলয় দাবি করে, তা এখানে থাকা সম্ভব নয়।"

এই প্রবন্ধেই জিন্না প্রথম 'টু নেশন' শব্দগুলি ব্যবহার করেন। বলেছিলেন যে, এমন একটি শাসনতন্ত্র উদ্ভাবন করতে হবে, যা ভারতে দুটি জাতি আছে স্বীকার করে নেবে।

["A Constitution must be evolved that recognises that there are in India two

* রমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয়—পৃঃ ৭২-৭৪।

nations, who must both share the governance of their common motherland."]*

আমরা আলাদা—আলাদা—আলাদা—। ঘৃণার মশলায় দ্বিজাতিতত্ত্বকে মজবুত করবার জন্য জিন্না ঐ কথাগুলো ছটোতে লাগলেন। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধলে কংগ্রেস দাবি জানান, ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা না করলে সে যুদ্ধব্যবস্থায় সাহায্য করতে প্রস্তুত নয় এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি ভারত সরকারের যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করল। তখন জিন্না ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ তারিখটিকে 'মুক্তি দিবস' বলে ঘোষণা করলেন, ইংরেজের যুদ্ধব্যবস্থায় সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেই জন-দেনে ইংরেজের কাছ থেকে যতপ্রকার সম্ভব সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সচেষ্ট হলেন। ইংরেজকে চাপ দেবার উপযুক্ত সময় বুঝে মুসলিম লীগ তার লাহোর অধিবেশনে ১৯৪০-এর ২৩শে মার্চ তারিখে পাকিস্তান-প্রস্তাব পাশ করল। প্রস্তাব উঠিয়েছিলেন বাংলার লীগ প্রধানমন্ত্রী। প্রস্তাবের বয়ান:

"অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের সুবিবেচিত এই অভিমত হল—এই দেশের জন্য কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না, বা তা মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদি না তা এই সকল মূলনীতির ওপরে নির্ভর করে নির্মিত হয়: ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূখন্ডের যে সকল স্থানে মুসলিম সংখ্যাধিক্য রয়েছে সেই স্থানের ভৌগোলিকভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অঞ্চলকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে (দরকার হলে সেজন্য অঞ্চলের পুনর্বিন্যাসও করতে হবে), যাতে করে ভারতবর্ষে ঐ অঞ্চলগুলি 'স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে' স্বীকৃতি পায়।"

পাকিস্তান 'অবাস্তব' প্রস্তাব—জিন্নার থেকে কেউ বেশি জানতেন না। পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের কয়েকদিন আগে স্যার পার্সিভ্যাল গ্রিফিথস্ ও অন্য কয়েকজন জিন্নার সংগে নৈশভোজে বসেছিলেন। জিন্না পাকিস্তান প্রস্তাব সেখানে ওঠালে সমবেত সকলে ঐ প্রস্তাবের অযৌক্তিকতার চেহারা খুলে ধরলেন। অর্থনৈতিক বিপদ, সীমান্ত সমস্যা, সামরিক এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা প্রভৃতির কথা তাঁরা বললেন। "জিন্না সব কিছুকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, খুঁটি-নাটি বিষয় আলোচনায় একেবারে গররাজি হলেন।" স্যার পার্সিভ্যাল মুগ্ধভাবে বলেছেন—"পরিষ্কার একটা ধারণাকে আঁকড়ে ধরে, বাদবাকি খুঁটিনাটি বিষয়ের এবং রীতিনীতির সম্বন্ধে অবজ্ঞা করার সামর্থ্যই বোধ হয় মিঃ জিন্নার সর্ব-শ্রেষ্ঠ শক্তি-উৎস।"

'অবাস্তব' পাকিস্তান কিন্তু বাস্তব হয়েছিল। পাকি-স্তান হবার পরে জিন্না স্বীকার করলেন, পাকিস্তান হবে, তিনি কোনোদিন ভাবেন নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন গভর্ণমেণ্ট হাউসে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ে লেফ্‌টন্যাণ্ট আস্‌হানকে তিনি বলেছিলেন: "জানো, আমার জীবনে পাকিস্তান সম্ভব হবে ভাবি নি! আমরা যা অর্জন করেছি, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"

জিন্না কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে এবং

* বলিথো বলেছেন, এই প্রবন্ধেই জিন্না শেষবারের মত *Common Motherland* কথাগুলি ব্যবহার করেছিলেন। বৃটিশ-সহায় জিন্নার নেতৃত্বের চাতুর্য এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বের দুর্বলতা জিন্নার কলম থেকে 'কমন মাদারল্যান্ড' লিখবার প্রয়োজনীয়তা কেড়ে নিয়েছিল। জিন্নার থেকে কে বেশি জানতেন যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব কোনো যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্বই নয়! ১৯৪৪-এর ৯ই সেপ্টেম্বর জিন্নার বাসভবনে গান্ধী-জিন্না আলোচনাসভা আরম্ভ হয়েছিল। ১৫ই নভেম্বর গান্ধী জিন্নাকে তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করে চিঠি লিখলেন, তাতে ঐ তত্ত্ব একেবারে ফেঁসে গিয়েছিল। গান্ধী লিখেছিলেন:

"আমাদের আলোচনার মধ্যে আপনি তীব্র ভাবের সংগে বলতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতি আছে এবং ভারতবর্ষ দুই জাতিরই বাসভূমি। যতই আপনার যুক্তিতর্ক এগিয়েছে, ততই আপনার উপস্থাপিত চিত্রখানি আমার কাছে আতঙ্কজনক মনে হয়েছে। যদি তা সত্য হয়, তা হলে তা প্রলোভনজনক হবে, কিন্তু আশঙ্কা হয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণত অবাস্তব। একদল ধর্মান্তরিত মানুষ ও তাদের বংশধরেরা পিতৃজাতি থেকে ভিন্ন জাতিত্বের দাবি করছে—ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজির আমি পাই নি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারত যদি এক জাতি থাকে, তা হলে তার সন্ততিগণের বৃহৎ সংখ্যায় ধর্মান্তর সত্ত্বেও সে এক জাতিই থাকবে।" গান্ধীজী একটি মোক্ষম প্রশ্ন করেছিলেন: "সমস্ত ভারত যদি আজ মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে কি সে আবার এক জাতি হয়ে যাবে?"

জিন্নার পক্ষে যুক্তি তখন একটা বাতিল ব্যাপার; পুনঃপুনঃ উচ্চারিত মিথ্যা সত্য হয়ে ওঠে—এই গোয়েবলস্-নীতিই একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু। সুতরাং উত্তরে বলেছিলেন:

"আমাদের ধারণা, জাতির যে-কোনো সংজ্ঞাই নেওয়া যাক, তদনুযায়ী মুসলমান ও হিন্দুরা দুটি বৃহৎ জাতি। দশ কোটি লোক নিয়ে আমাদের জাতি। তারও বড় কথা, আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট আকারের সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, নামরীতি, মূল্যবোধ, পরিমাণবোধ, আইন ব্যবস্থা, নৈতিকবোধ, রীতি, পঞ্জী, ইতি-হাস, ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক ও নিজস্ব। আন্ত-র্জাতিক আইনের যে-কোনো বিধি অনুযায়ী আমরা জাতি।" (বলিথো, পৃঃ—১৪৯)

বোধ হয় তার পরেই ভেদধর্মের শিক্ষাপীঠ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে! ১৯৩৯-এর ৩০শে তারিখে জিন্না উইল করে তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। সে উইল পার্টিশান হয়ে যাবার পরেও তিনি বদলান নি—ভেদশিক্ষাদানকে সাহায্য করার বাসনা তাঁর পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।

কতখানি বিদ্বেষ ও আতঙ্ক থেকে পাকিস্তানের জন্ম, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় সামরিক বিষয়ে তাঁর মনোভাব থেকে। সামরিক ব্যাপারে সাধারণভাবে জিন্নার কোনই ধারণা ছিল না। রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সামরিক বাহিনীর কোনো স্থান আছে তা তিনি কার্যত বুঝতেন না (বুঝবেন কি করে, যখন তিনি জানতেন, ইংরেজের বাহিনী তাঁর রাষ্ট্র সৃষ্টি

১৯৪১-এর ২০শে জুন তারিখে পাইওনীয়ার পত্রিকায় প্রকাশিত কার্টুন। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান-প্রস্তাবের সম্বন্ধে কাঠের ঘোড়ার পিঠে অনমনীয়ভাবে উপবিষ্ট জিন্না, তিনি সমস্ত দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। এধারে কঠোর মনোভাব নিয়ে নীচে কংগ্রেসের টানা কাঠের গাড়িতে বসে আছেন দৃঢ়ভাবে বুকে হাত দিয়ে গান্ধীজী; আর দুজনের মধ্যে একটা কথাবার্তার বোঝাপড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঁচু মুখে হাঁক দিচ্ছেন বাংলার তাঁর প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক। ফজলুল হক যদিও লাহোর-অধিবেশনে পাকিস্তান-প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন না।

বিদীর্ণ

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভেঙেচুরে দিই—
যা কিছু দু'পাশে আসে, ক্ষেতখামার ছায়াশ্রিত নীড়
কলাবাগান কিম্বা ইঁটের ভাটি,—
অথবা মন।

আমার জলস্রোতের উদ্দামতায় ভাসিয়ে নিতে চাই
যা কিছু দু'পাশে থাকে,—
শান্তির আশ্রয়, সুখের প্রত্যাশা অথবা খ্যাতি
কিম্বা ভালোবাসা।

শক্তির উদ্বেল আবেগে
কীর্তিনাশার মত উদ্দাম হ'তে হ'তে
দু'হাতে সমস্ত পৃথিবীকে ভাঙতে ভাঙতে
হয়ত কোন অতর্কিত মুহূর্তে আমি
নিজেও প্রবাহিত হ'য়ে যাই।
উৎস থেকে ছুড়ে দেওয়া এক জলস্রোতের মত
ছিন্নমূল এবং
বিদীর্ণ।

করে দেবে!)। পাকিস্তান আর্মির প্রথম সেনাপতি স্যার ফ্রাঙ্ক মেসারভেরী লিখেছেন: "তিনি যথার্থত স্থল সৈন্য-বাহিনী সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না, ও-বিষয়ে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না; তিনি আমাকে বলেছিলেন, সামরিক ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই; ওটা আমি আপনার ও লিয়াকতের ওপরে ছেড়ে দিয়েছি।" স্থলসৈন্যের মত বিমানবাহিনীর বিষয়েও তাঁর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। বিমান তাঁর কাছে 'তাড়াতাড়ি যাতায়াতের যন্ত্র' ভিন্ন আর কিছু নয়। কেবল তিনি নৌবাহিনী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। "তিনি সম্ভবত বুঝেছিলেন, হিন্দুরা যতদিন শত্রুভাবাপন্ন থাকবে, ততদিন যদি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ রেখে জাতিকে বাঁচাতে হয়, তা হলে সমুদ্রপথে যোগাযোগই একমাত্র উপায়।"

জিন্না তাঁর কল্পনাতীত বস্তু পেয়েছিলেন, সুতরাং পাকিস্তানকে 'কীটদষ্টরূপে' পেয়েছেন বলে আক্ষেপের অধিকারও রেখেছিলেন। কাশ্মীর—মুঘল উদ্যানে পূর্ণ কাশ্মীরকে করায়ত্ত করতে না পারার মর্মান্তিক আঘাত কায়েদে আজম কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কলঙ্কহীন চন্দ্রই জিন্নার অভিলাষ ছিল। কাশ্মীরের মহারাজা যখন কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করে দিলেন (২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৮), জিন্না চাইলেন যে, পাকিস্তান বাহিনীকে এখনই কাশ্মীরে সরকারীভাবে পাঠানো হোক, কিন্তু ব্যাপারটাকে ভারত-পাকিস্তানের ঘোষিত যুদ্ধে পরিণত করতে ফিল্ড মার্শাল অচিনলেক আপত্তি করলেন। সেই আঘাত এবং কাশ্মীর হাতছাড়া হওয়ার আঘাত জিন্না সামলাতে পারলেন না, শয্যাগত হয়ে পড়লেন, ডাক্তাররা কঠোরভাবে নিষেধ করে দিলেন—সংশ্লিষ্ট কোনো কাগজপত্র যেন জিন্নার কাছে পাঠানো না হয়।

প্রত্যাশার অতীত প্রাপ্তিতে অভ্যস্ত জিন্নার পক্ষে মর্মান্তিক ঐ আঘাত। ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি দেহত্যাগ করেন। ৫ই সেপ্টেম্বরের একটি চিত্র সবশেষে বলিথোর রচনা থেকে তুলে দিই:

"৫ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় কায়েদে আজমের নিউ-মোনিয়া দেখা গেল। তিনদিন ধরে তাঁর জ্বর বাড়তে লাগল। অস্থির প্রহরে অর্ধব্যক্তস্বরে মৃত্যুসমাচ্ছন্ন মনের কথা ফুটে বেরুতে লাগল। একেবারে প্রায় শেষের অসংলগ্ন কথাগুলি কাশ্মীর নিয়েই। হঠাৎ রাগে গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন: 'কাশ্মীর কমিশনের আজ আমার সঙ্গে দেখা করার কথা। তারা এলো না কেন? কোথায়—কোথায় গেল তারা?'"

[ক্রমশ]
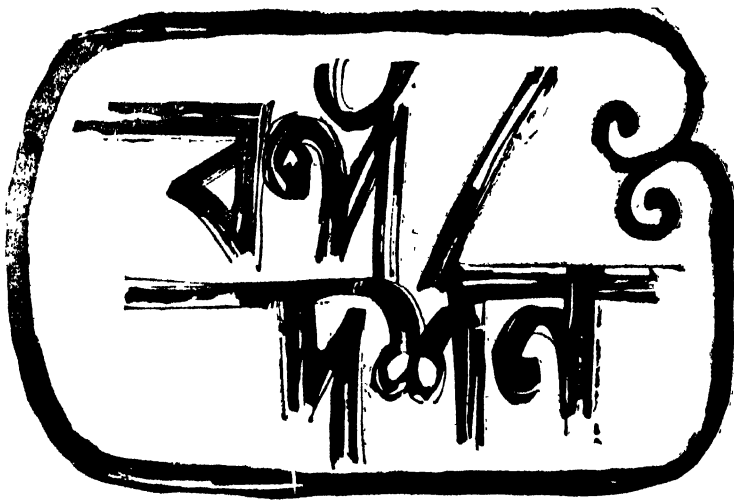
ছয় পার্টি ১৪ই জুলাই এবং আট পার্টি ১৬ই জুলাই বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন। দুই তরফের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য বেশি, বৈসাদৃশ্য কম, তথাপি দুটো পৃথক দিন ধার্য হয়েছে। এই বাংলা বন্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের আশংকার কারণ অন্যত্র। আমরা যা আশঙ্কা করছি তা হচ্ছে এই যে, দুদিন পৃথক পৃথকভাবে বাংলা বন্ধ হলে নীট লাভ দাঁড়াবে কয়েকটি প্রাণহানি। যেহেতু এদেশে মানুষের জীবনের দাম সবচেয়ে সস্তা এবং যেহেতু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এই প্রাণহানির জন্য প্রত্যক্ষ-ভাবে দায়ী করা যাবে না আইনানুযায়ী, সেইহেতু তাঁদের সিদ্ধান্তের বলি হবে কিছু মানুষ। ষোল তারিখে আট পার্টি প্রস্তাবিত বাংলা বন্ধের দিন ছয় পার্টির তরফ থেকে তাকে ভাঙার চেষ্টা করা হবে, তাতে যে সংঘর্ষ হবে তার ফলে কিছু প্রাণহানি ঘটবে এবং চৌদ্দ তারিখে ছয় পার্টি প্রস্তাবিত যে বাংলা বন্ধ হবে, আট পার্টির তরফ থেকে তা ভাঙবার চেষ্টা করা হবে, যার ফলেও সংঘর্ষজনিত প্রাণহানি সুনিশ্চিত। কাজেই আমাদের বক্তব্য, যদি বাংলা বন্ধ করতে হয় তাহলে সেটা দু' তরফে একদিনে করলেই মঙ্গল, তাতে খামোকা প্রাণহানি ঘটবে না।

যেখানে দুটি বিবদমান রাজনৈতিক গ্রুপ বর্তমান, সেখানে সংঘর্ষ আশংকা করাটাই স্বাভাবিক, এমন কি দু' তরফের নেতৃবৃন্দ যদি ক্যাডারদের শান্তি বজায় রাখারও নির্দেশ দেন, তা যে পালিত হবে এমন ভরসা করার কোন কারণ নেই। কারণ এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় স্বার্থও রীতিমত জড়িয়ে থাকে। পুরোনো শত্রুতা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রই হচ্ছে এইরকম পরিস্থিতি। আশংকা করার রীতিমত কারণ আছে যে, বিগত সতেরই মার্চের ধর্মঘটের জের আগামী বাংলা বন্ধ-গুলির উপরেও রীতিমত প্রভাব বিস্তার করবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর সতেরই মার্চ যে বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেই উপলক্ষে বহু স্থলে রীতিমত শরিকী সংঘর্ষ হয়ে গেছে—যার ফলে হতাহত নেহাৎ কম হয় নি। সেই উপলক্ষে যেখানে যে পার্টি অ্যাগ্রিভ্‌ড রয়েছে, তারা বর্তমান ক্ষেত্রে পাল্টা বদলা নেবার ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। যে সব ক্ষেত্রে সেবারে সি পি এম মার খেয়েছে, এবার তারা সে সব ক্ষেত্রে মার দেবে এবং যে সব ক্ষেত্রে সেবার সি পি আই বা অন্য দল মার খেয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধ নেবে। তর্কচ্ছলে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, উভয় তরফের নেতৃবৃন্দই শান্তির জন্য ফতোয়া দেবেন, তা কার্য-করী যে হবে না, সে কথা হলফ করেই বলা যায়। কাজেই যদি ইতিমধ্যে দু' তরফের সুমতি ফিরে আসে এবং দু' তরফই যদি একটা দিনকেই বাংলা বন্ধের জন্য ধার্য করেন সেটা নিশ্চয়ই ভাল হবে।

রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসানের দাবিতে, সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে, সি আর পি প্রত্যাহারের দাবিতে এবং আরও নানা কারণে বাংলা বন্ধ করা হচ্ছে—এ-কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার জন্য কি যুক্তফ্রন্টেরই শরিক দলগুলি দায়ী নন? আজ যদি তাঁরা একজোট হন, তাহলে তো কালই এ অবস্থার অবসান হতে পারে। তা তাঁরা হচ্ছেন না কেন? প্রত্যেকটি দলেরই সোজা যুক্তি, আমাদের কোন দোষ নেই, আমরা প্রত্যেকেই মার্কামারা সতী, এর জন্য অমুক দলই দায়ী। এ হচ্ছে ঝড় এলে উটের আত্মরক্ষার যুক্তি অর্থাৎ কোন যুক্তি নয়। দায়িত্ব আছে। [illegible] এই যা, ধরে নেওয়া গেল [illegible] আনা চার আনা, কিন্তু নিজেদের ওই চার আনাটুকুকেই স্বীকার করে তো বোঝাপড়ায় আসতে হবে। কিন্তু সে পথে কেউ যাবেন না। আমরা পূর্বে বহুবার বঙ্গদর্শনে লিখেছি যে, প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব যখন শুরু হবে, তখন সি পি আই-সি পি এম ভেদ করা হবে না—কার্যত তা হচ্ছেও না, নতুবা সি আর পি রাখার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই কেন সোচ্চার? কিন্তু এ-কথা কি কেউ অনুধাবন করেন নি যে, রাষ্ট্রপতি শাসন সি আর পি'র ওপর নির্ভর করেই চলে, সৈন্যবাহিনীর ওপর নির্ভর করে নয়? কাজেই আমাদের কথা হচ্ছে, যে ইস্যু-গুলির বিরুদ্ধে বাংলা বন্ধের ডাক দু' তরফ থেকেই দেওয়া হয়েছে, সেগুলির প্রতিকার করা যায় সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে, বাংলা বন্ধ করে নয়।

কলকাতা বন্দরে অচলাবস্থা

কলকাতা বন্দরের মাঝি-মাল্লারা বহুদিন যাবৎ ধর্মঘট করে আছেন। এই ধর্মঘট মীমাংসার কোন চেষ্টা শুরু হবার আগেই পোর্ট কমিশনের শোর লেবার নামে পরিচিত শ্রমিকরা গো স্লো নীতি অবলম্বন করার ফলে বন্দরের কাজকর্ম একেবারে শ্লথগতি হয়ে পড়েছিল। এর ওপর গত পয়লা জুলাই থেকে জাহাজে মাল বোঝাই ও মাল খালাসের কর্মে নিযুক্ত ১৮ হাজার ডক-শ্রমিক অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্ম-ঘট করায় কলকাতা বন্দরের কাজ একে-বারেই অচল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে কলকাতা বন্দরে ৪৩ খানা জাহাজ মাল বোঝাই ও মাল খালাসের অপেক্ষায় নোঙর করে আছে; তার মধ্যে পাঁচটা জাহাজ খাদ্যশস্যের। বন্দরের এই দীর্ঘ-দিনের শ্রম-বিরোধের ফলে ৩০ কোটি টাকার রপ্তানীযোগ্য মালপত্র গুদামে আটক পড়েছে। তার ফলে রপ্তানী-কারকেরা গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন। মালপত্র ক্রেতার কাছে যথাসময়ে চালান না গেলে তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করবে, ব্যাংকগুলি প্রদত্ত অর্থের ওপর অতিরিক্ত সুদ দাবি করবে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রার বুকিং-এর ওপর পেনাল্টি চাপিয়ে দেবেন, অনুরূপভাবে আমদানীকারকেরাও ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। সর্বোপরি খাদ্যবাহী জাহাজ-গুলি থেকে মাল খালাস বন্ধ হলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই বৃহত্তর কলকাতার রেশনিং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। ডক-শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণ সম্পর্কে

[illegible] [illegible] নেতৃবৃন্দ আর উক্ত গৃহ বলেছেন যে "ক্যালকাটা ডক ওয়ার্কার্স রেগুলেশন [illegible] স্কীম ১৯৭০" প্রয়োগের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা এই ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রমিকেরা উক্ত স্কীমের কোন কোন অংশ সংশোধন করবার দাবি জানিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার সেই দাবি বিবেচনা করতে রাজি হন নি। শ্রীগুহ বলেছেন যে, উপরিউক্ত স্কীমে শ্রমিকদের কোন লাভ হবে না, লাভ হবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এই স্কীম চালু না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। আগে উক্ত শ্রমিকেরা কাজের ঘণ্টা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেতেন, নতুন স্কীমে তাঁরা নাকি কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবেন। শ্রমিকেরা প্রতিদিন ঘণ্টাভিত্তিক যতখানি কাজ করে যে পারিশ্রমিক পেতেন, নতুন স্কীমে সেই পরিমাণ কাজ করে যদি তাঁদের পারিশ্রমিকের হার কমে যায়, তাহলে তাঁদের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু উক্ত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, কলকাতা বন্দরে যে পরিমাণ কাজের জন্য যে পরিমাণ পারিশ্রমিক ধার্য করা হয়েছে, অন্যান্য বন্দরে নাকি সমপরিমাণ কাজের মজুরি তার অর্ধেক। এই বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে শ্রমিকেরা যে রকম ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘট করেছেন তাতে মনে হয়, তাঁদের অভাব-অভিযোগ বোধ হয় একেবারে ভিত্তিহীন নয়। সেই কারণেই বোধ হয় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া বিরোধ মীমাংসার জন্য ৬ই জুলাই দিল্লীতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করেছেন এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সেই বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর নাকি আপোস-আলোচনা সাপেক্ষে ধর্মঘট প্রত্যাহারেরও আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু শ্রমিক ফেডারেশন সেই প্রস্তাবে রাজি হন নি। এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা ভিন্ন আর কিছুই করার নেই।

জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

গত কয়েক মাসের মধ্যে জলঢাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ চারবার বন্ধ হয়ে যায়, শেষবার বন্ধ হয় গত জুন মাসে। উত্তরবঙ্গে শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জলঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই একমাত্র ভরসা। বস্তুতপক্ষে উত্তরবঙ্গের প্রচুর অরণ্য ও খনিজসম্পদ [illegible] [illegible] নিয়ন্ত্রণ না হবার অন্যতম প্রধান বাধা হ'ল বিদ্যুতের অভাব, যে কারণে জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের গুরুত্ব অসাধারণ। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প রূপায়ণে চরম গাফিলতি ও দুর্নীতি এই প্রকল্পের সর্বনাশ করে দিতে বসেছে। ১৯৬৯ সালের আগস্টে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই প্রকল্পের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন তার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং একটি অনুগৃহীত কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজের শ্লথগতির জন্য দায়ী করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবার আগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া একটি সমীক্ষা মারফত জানিয়েছিলেন যে, প্রকল্পের স্থান ভূপ্রকৃতির দিক থেকে অত্যন্ত প্রতিকূল এবং সেই কারণেই এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর দেওয়া উচিত, যাদের অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততা আছে। কিন্তু বর্তমান তদন্ত রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, সেই পরামর্শ প্রথম থেকে অগ্রাহ্য করে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি টেন্ডার কমিটি মারফত এমন একটি কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানকে প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যে প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে ছিল অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য। যদিও এর চাইতেও অধিক অভিজ্ঞতা ও খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান টেন্ডার দিয়েছিল। যে প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল তাদের কাজকর্ম অত্যন্ত নিম্নমানের, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অযোগ্যতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ে পাওয়ার হাউস, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল, এই অনুগৃহীত প্রতিষ্ঠানটি টেন্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও কোন একটি গূঢ় কারণে (যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না) এই সব কাজেরও দায়িত্ব পেয়েছিল। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ কমিশনের পরামর্শক্রমে গৃহীত পরিকল্পনাটাই অত্যন্ত অবাস্তব। তদন্ত কমিশন বলেছেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, অন্তর্নিহিত গলদগুলি কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের মত একটি কারিগরী দক্ষ ব্যবস্থার কাছে ধরা পড়ে নি। আসলে যে-কোন উপায়েই হোক, ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হয়েছিল। ফলে একদিকে প্রকল্পের ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে। শুরুতে প্রকল্পের ব্যয় ৪·৪০ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছিল, এখন ব্যয়ের উক্ত পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি হয়েছে—১০ কোটি টাকা। এবার বিলম্বের দিকটা দেখা যাক। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের কাজ ১৯৬৪ সালে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু নয় হাজার কিলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম যন্ত্র চালু হয় ১৯৬৭ সালের মার্চে, দ্বিতীয় যন্ত্র তার কয়েক মাস পরে চালু হয়। প্রথম পর্যায়ে তৃতীয় আর একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালু করার কথা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে চার হাজার কিলওয়াট শক্তিসম্পন্ন দুটি যন্ত্র চালু করার কথা। তা কবে হবে বলা শক্ত। ১৯৬৮ সালের প্রবল বন্যায় জলঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তিন মাইল লম্বা টানেল পলিমাটিতে বুজে যাবার ফলে উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ মাসাধিককাল বন্ধ থাকে মেরামতির জন্য। তারপর থেকেই শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাঝে মাঝে অচল হওয়া, যা আজও হয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ করতে দেরি হবার যেসব কারণ তদন্ত কমিশন নির্ণয় করেছেন তা হ'ল টানেল এলাকায় যে ধরনের মাটি রয়েছে তাতে কাজ করতে গেলে যে সব বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি লাগে, তা ওই অনুগৃহীত কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানের নেই। তা ছাড়া ওই অনুগৃহীত প্রতিষ্ঠানের ওপর অত্যধিক কাজ চাপানো হয়েছে, যা তার ক্ষমতার বাইরে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন কর্তৃক কন্ট্রাক্টরকে কাজের নক্সা ও নিয়মাবলী সরবরাহ করতে অযথা বিলম্ব, প্রতি ক্ষেত্রে ত্রুটি ও দুর্নীতি—সব কিছুর জন্য ওই কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের কিছু পদস্থ ব্যক্তিদের অশুভ একটি আঁতাতের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তদন্ত কমিশন আরও বলেছেন, উপযুক্ত অনুসন্ধান ছাড়াই এই প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন যদি পূর্বাহ্নে ভূতাত্ত্বিক উপযুক্ত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নকশা প্রভৃতি করতেন, তবে, প্রকল্পের ব্যয় কমানো যেত। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদেরও জানা ছিল যে, সার্ভের তথ্যাদি পর্যাপ্ত নয়, বরং অসম্পূর্ণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও পর্ষদ জিওলজিক্যাল সার্ভের পরামর্শ অবজ্ঞা করেছে। তা ছাড়া তদন্ত কমিশন উ' অনুগৃহীত কন্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানের প্রতি

রাজ্য বিধানসভা সদস্যদের মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। টানেল তৈরির কাজ দু' বছরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল, কিন্তু শেষ করতে সময় লেগেছে ছয় বছর। টানেলের মুখ বন্ধ হয়ে গেলে বা টানেল স্থানে স্থানে ভেঙে পড়লে তা মেরামত করা হয়েছে সরকারী ব্যয়ে, অথচ সে ব্যয় বহন করার কথা উক্ত কণ্ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠানের। জলঢাকা প্রকল্পের মত একটি গুরুতর ক্ষেত্রে এই সব বিচ্যুতির ফলে এই প্রকল্পের স্থায়ী যে-কোন উপকারিতা সম্পর্কেই সন্দেহ করার বিলক্ষণ কারণ দেখা গেছে।

—৪ঠা জুলাই, ১৯৭০

খরা-রিলিফ-দুর্নীতি ও রাজনীতি

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলা খরা-ক্লিষ্ট এলাকা বলে রাজ্যপাল কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছেন। অবশ্যই ইতিমধ্যে সেখানকার অধিবাসীদের নানাভাবে সাহায্য করা আরম্ভ হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত ১৯৬৭ সালের কথা মনে পড়ছে। সরকারীভাবে ঘোষিত না হলেও পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলায় (পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ) দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছিল। কংগ্রেসী আমলে গ্রামকে মেরে শহরকে খাওয়ানোর নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, যার ফলে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের অবস্থা শোচনীয়তম পর্যায়ে নেমে এসেছে। এতদিন ধরে গ্রামগুলি যেভাবে অবহেলিত হয়েছে কোন সভ্য দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে এমন অব-হেলার পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৯৬৭ সালের আর একটি কথা এর পাশাপাশি ফুটে ওঠে চোখের সামনে। যুক্তফ্রন্টের পঞ্চায়েতমন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত একটি বিবৃতিতে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও সেগুলির অধীনস্থ আঞ্চলিক পরিষদ ও অঞ্চল পঞ্চায়েতসমূহের ১৯৬৬-৬৭ সালের ত্রাণকার্য পরি-চালনা ও হিসাবপত্র রাখার বহু বেআইনী, অসংযত ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করেছিলেন। ঐ বছরের জন্য বরাদ্দ টাকার হিসাব তখনো সম্পূর্ণ হয় নি। তিনি বিবৃতিতে বলেন—

"পুরুলিয়া জেলায় টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনাগুলি শতকরা আশীটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদের ফিনান্স এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা পুরুলিয়া জেলা পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পরিষদের নিকট থেকে আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ যে নগদ টাকা পেয়েছেন, ক্যাশ বই-এ তার কোন হিসেব নেই। ফিনান্স এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটিকে না জানিয়েই আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি 'পে-মাস্টার' নিয়োগ করেছেন। কিন্তু ঐ চারজন পে-মাস্টারের কোন অস্তিত্বই নেই, অথচ খাতায় তাঁদের নাম আছে। নিদারুণ খরা ও জলকষ্ট সত্ত্বেও টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনার শতকরা ছিয়ানব্বইটি সম্পন্ন হয় নি।

"বাঁকুড়াতেও টেস্ট রিলিফ পরি-কল্পনা স্ট্যান্ডিং ফিনান্স এন্ড এস্টাব্লিশমেন্ট কমিটির নিকট পরীক্ষার জন্য যায় নি। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিদের যে ৮৪ হাজার টাকা দিয়েছেন ক্যাশ বই-এ তা লিপিবদ্ধ হয় নি। পে-মাস্টাররা প্রায় এক লক্ষ টাকার 'মাস্টার রোল' দাখিল করেন নি।

"মেদিনীপুর জেলার ত্রাণ পরি-কল্পনার তালিকা ও তার সম্ভাব্য ব্যয় জেলা শাসককে আইনত জানানো কর্তব্য ছিল, কিন্তু তা জানানো হয় নি। জনৈক প্রাক্তন এম-এল-এ'র আদেশে ময়না ব্লকে টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনার টাকা তার ওভারশিয়ারের মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতির হাতে প্রায় দশ হাজার টাকা থাকার কথা, কিন্তু তা তিনি দেখাতে পারেন নি।

"চব্বিশ পরগনা জেলায় যে সকল টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে তার অধিকাংশই বৈধভাবে অনুমোদিত হয় নি। এই পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান বেআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত। ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য বরাদ্দ টাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার হিসাব এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। আঞ্চলিক পরিষদের ক্যাশ বইতে সকল হিসাব ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি।"

পূর্ববর্তী বিশ বছরে তাহলে কিভাবে টাকা তছনছ করা হয়েছে তার চিত্রটিও বেশ ভাল করেই ফুটে উঠছে। প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েত, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ দুর্নীতি ও দলীয় রাজনীতির শিকার হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গ্রাম্য অভিজাত-তন্ত্রের কবলিত। স্বভাবতই কংগ্রেসী আমলে (এখনও) এইগুলিই ছিল দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার।

তাই কিভাবে রিলিফের নামে দুর্নীতি চলতো তারই কাহিনী এখানে নিবেদন করছি। এ কেবল গল্প নয়, নিছক রূপকাহিনী নয়। যা যা ঘটে ও ঘটেছে এবং যা প্রায় সর্বজন-বিদিত তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কেবল পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিকারের দুরাশা নিয়ে অপেক্ষা করা।

টেস্ট রিলিফ মানেই কাজের বিনি-ময়ে সাহায্য। এটা প্রযোজ্য হয় কেবল সক্ষম ব্যক্তির বেলায়। আর রিলিফ দেওয়া হয় অন্ধ, কানা, খোঁড়া, অকর্মণ্যদের। রিলিফ অর্থাৎ ভিক্ষা দেওয়া? এর আগে অর্থাৎ বিদেশী শাসনের আমলে এটা একটা কাগজে-কলমের ব্যাপার ছিল। নেহাৎ দায়ে ঠেকলে কোন কোন স্থানে সাময়িক খয়রাতী—যাকে চলতি কথায় ভিক্ষা বলা যায়—দেওয়া হত। ১৩৫০ সালের পর এই দেশে (বাংলা দেশে) ভিক্ষুকের দল যেন বেড়ে গেছে। দেশ বিভাগের পর ভিক্ষুকের দল আরও ভারী হয়েছে। দিন দিন বাড়তির পথে। ভিক্ষা করা সবচেয়ে লজ্জাকর কাজ। পারতপক্ষে কেউই এরূপ কাজে নাম লেখাতে চায়ও না। তা ছাড়া "দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর হয় না, বরঞ্চ তা' পাকা হয়ে ওঠে।" (রবীন্দ্রনাথ)

বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে, তথাকথিত অনুন্নত, দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারকে সাহায্য দিয়ে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য যত না, খাদ্যদ্রব্যের চড়া দামের সুযোগে স্বাধীন যুগের দেশগতপ্রাণ লীডারগণ লীডারশিপ কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এবং অনুচরগণকে "টু পাইস" পাইয়ে দেবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভিক্ষা শব্দটাকে রিলিফে রূপান্তরিত করেই লক্ষ লক্ষ লোককে এই ভিক্ষুকের পর্যায়ে ফেলেছেন। ভিক্ষা দিয়ে দিয়ে ও ভিক্ষা নিইয়ে নিইয়ে সাধারণ মানুষকে পরমুখাপেক্ষী, অসহায় ও পঙ্গু করে ফেলেছেন। রিলিফ দিয়ে দল গড়া সহজ। শোনা যায়, আমে-রিকান সাহেবরা যখন প্রথম এ দেশে এল, তাদের দেখার জন্য ছেলে-বুড়োর দল হাজির হলে তারা নাকি পয়সা, রুটির হরিলুট দিয়ে বাঙালীদের অভিনন্দন জানাত। আর সেই হরিলুটের মাল আমাদের সমগোত্রীয়রা কুড়িয়ে নেবার জন্য ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি করতো, তাই দেখে সাদা চামড়ার দল হেসে উঠতো হো হো করে। ভিক্ষা দিয়ে মজা লুটতো। আর আজ স্বাধীন যুগের সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার নামে দয়ার অবতার সেবক

[illegible] সরকারের কাছে [illegible] দিয়ে কাগজে লিখে লিখে আটা, চাল, টাকা এনে দেশকে ভিক্ষুকে পরিণত করছেন। তাঁরা হাসেন না, পরিবর্তে জাতিকে দুর্বল করে চোখ রাঙিয়ে কাজ হাসিল করার পথ প্রশস্ত করেন। দেশকর্মিগণ কি জবাব দিতে পারবেন, রিলিফ-নামীয় ভিক্ষা দিয়ে জাতির যথার্থ কল্যাণ হয়েছে এবং হচ্ছে? সবরমতী, ওয়ার্ধা আর সেবাগ্রামের পরে আর কেন সবরমতী, ওয়ার্ধা ও সেবাগ্রামের সৃষ্টি হয় না? কল্যাণ কোথায়?

টেস্ট রিলিফের ব্যাপারে তবু কিছু মাটি কাটা হয়। কিন্তু রিলিফে? চুরি করতে কোন কষ্ট নেই। কোনও-ক্রমে নামটা একবার লিস্টিভুক্ত করতে পারলেই চার মাসের খোরাকীর বন্দোবস্ত (কয়েক বছর টিকে থাকতে পারলেই পাকা বাড়িও তৈরি হয়)। রিলিফের লিস্টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার কারও অবকাশ নেই। শতকরা কতজনকে রিলিফ দেওয়া হবে উপরওয়ালা কর্মকর্তাদের শুধু তাই জানালেই হবে।

মাত্র কয়েকজন দেশসেবকের (?) উপর দুঃখীদের জীবন-মরণ নির্ভর করে। এঁরা অন্ধকে পদ্মলোচন, কানাকে অন্ধ, দুঃখীকে ধনী, ধনীকে দুঃখী, বিধবাকে সধবা, সধবাকে বিধবা, কুমারীকে বিবাহিতা, পঙ্গুকে সক্ষম, কর্মঠকে অকর্মণ্য, ছেলেকে বুড়ো, আবার বুড়োকে জোয়ান করে দিতে পারেন বলে শোনা যায়। পি. সি. সরকারের ভোজবাজী সত্যই অনেক স্থলে এঁদের কাছে নস্যি। লিস্টি তৈরির পর সকলের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন সদস্য সহি করে উপরে পাঠিয়ে দিলেই পাস। ডিলার নিযুক্ত হলেই আটা বা চাল এসে উপস্থিত।

এই প্রাথমিক আয়োজন সমাপ্ত হবার পর যে দৃশ্য অভিনীত হয় তা ভুক্তভোগী ব্যতীত বলা শক্ত। টোকেন লেখা হবে, একজন সনাক্তকারী সাক্ষী হবেন। ইস্যুইং অফিসার ইস্যু করবেন টোকেন। রিলিফের সেন্টারে যান, শুনতে পাবেন—'নাম আছে বাবু আমার?' উত্তর—'নেই।' 'কেন, গতবারেও তো লিস্টিতে নাম ছিল।' উত্তর—'কেটে দেওয়া হয়েছে। তুমি তো আর অক্ষম নও, ভিক্ষে করেও তো খেতে পার। এ সব তোমরা পাবে না। তোমাদের চেয়ে আরো অনেক গরীব রয়েছে।' কথা বলার অধিকার সংবিধানেই আছে। এখানে তার প্রয়োগ চলবে না। সুতরাং কপালে করাঘাত করে ঘরে এসে হরিমটর চিবানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

অনেক ভুয়া নাম না দিলে নাকি চলে না। অনুযোগ আছে, ডিলারের পাওনা আছে, ডিলারের বাড়তি-পড়তি-কমতি আছে, কণ্ট্রোলার অফিসের খরচাও যে কিছু নেই এমন নয়। তার উপর কাগজ-কলমের দামও আছে। এ সব জোটে কোত্থেকে? সরকার তো আর এগুলো দেন না। তা ছাড়া প্রত্যেককে যতটা দেবার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই ঠিক ততটা দেওয়া হয় না. কিছু কম দিতেই হয়।

গ্রামের সদস্য ও এম-এল-এ মহাশয়রা কোনদিনই রিলিফ বিতরণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন না। কেন না তাঁরা থাকলে নাকি অনেক ভাল লোকদের রিলিফ নিতে লজ্জা হবে; সেজন্য সর্বদিক (?) বজায় রাখার জন্যই নাকি তাঁরা সেন্টারে আসতে চান না।

বছর বছর ধরে সরকারী অর্থ ও খাদ্য এভাবে অপচয় না করার জন্য জনসাধারণকে চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। আপনারা বুঝুন, জানুন, এ সম্পদ আপনাদেরই। দুটো মিষ্টি কথা বলে আপনাদের নাম ভাঙিয়ে যাঁরা চলছেন তাঁদের দূর থেকে নমস্কার করুন। সম্মিলিতভাবে দেশের জনসাধারণ নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নেবার দিকে লক্ষ্য রাখুন। তবেই হবে নিজেদের ও দেশের মঙ্গল।

—মাখনলাল ঘোষ

বাম ও দক্ষিণপন্থী জোট

প্রতিক্রিয়াশীল সিণ্ডিকেট গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার পর তাঁদের নেতারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসী সরকারের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দিরা সরকার কুপোকাত হবে। সেই সব সিণ্ডিকেটী জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে ইন্দিরা সরকার নিরাপদেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন। সেই সরকারকে ওল্টাবার সকল প্রচেষ্টা তো ব্যর্থ হয়েছেই, উপরন্তু বিভিন্ন উপনির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস অতি অনায়াসেই সিণ্ডিকেটী প্রার্থীদের ধরাশায়ী করেছেন। তাতে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সিণ্ডিকেটের পরমায়ুই ফুরিয়ে এসেছে এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাঁদের ভরাডুবি অনিবার্য। শেষের সে দিন ভয়ংকরের কথা চিন্তা করে সিণ্ডিকেটের নেতারা একেবারেই বে-সামাল হয়ে পড়েছেন। বেঁচে থাকার শেষ প্রচেষ্টায় গত সপ্তাহে সিণ্ডিকেটী হাই কমাণ্ড স্থির করেছেন যে, দেশের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোকে নিয়ে তাঁরা একটা "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" গঠন করবেন। এই ফ্রন্টে কাদের নেওয়া হবে, তা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেন নি ঠিকই, তবে তাঁদের লক্ষ্য যে স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং এস এস পি দল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সিণ্ডিকেটের এই নতুন সিদ্ধান্তে জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র দল খুব খুশি হয়েছেন। স্বতন্ত্র দলের চেয়ারম্যান মাসানীর আর দেরি সইছে না। তিনি বলেছেন, দেরি করার আর কোন দরকার নেই। এখনই পার্লামেণ্টে একটা "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" গঠন করে ফেলা হোক। আগামী ২৭শে জুলাই পার্লামেণ্টের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হবে। তার আগেই প্রস্তাবিত ব্লক গঠন করে তার একজন নেতা নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে তিনি সংশ্লিষ্ট দলগুলির একীকরণের পক্ষপাতী নন। মাসানী চান, ব্লকের প্রত্যেক দলের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে তাদের মধ্যে একটা মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হোক। তাহলে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিকল্প নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত হতে পারে। "গণতন্ত্রের কাঠামো বজায় রেখে কম্যুনিস্ট চ্যালেঞ্জের সক্রিয় মোকাবিলার জন্য" মাসানী এই ধরনের ব্লক গঠনের পক্ষপাতী। মাসানী আশা করেন, আপাতত প্রস্তাবিত ব্লকের কাজ কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও

মোরারজী দেশাই

পরে এটা রাজ্য পর্যায়েও সম্প্রসারিত হতে পারে। আগামী ২০শে জুলাই মাদ্রাজে স্বতন্ত্র দলের জেনারেল কাউন্সিলের বৈঠক বসবে। সেখানে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্লক' গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হবে না বলে মাসানী ঘোষণা করেছেন। সি রাজাগোপালাচারী এবং এন· জি· রঙ্গ—দুজনেই এ ব্যাপারে মাসানীর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

প্রস্তাবিত ব্লক সম্পর্কে জনসংঘ দলের আগ্রহ স্বতন্ত্র দলের চেয়ে কিছু কম নয়। গুলোর মধ্যে এতদিনে একটা মিত্রতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি আশা করেন, শুধু স্বতন্ত্র আর জনসংঘ নয়, এস-এস-পি, পি-এস-পি, এবং বি-কে-ডিও প্রস্তাবিত ব্লকে যোগ দিতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) এবং অন্যান্য দলেও এমন অনেক সদস্য আছেন, যাঁরা জনসংঘের চিন্তাধারায় বিশ্বাস করেন। তাঁদের একসূত্রে গেঁথে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে।

এস-এস-পি দলের নেতা রাজনারায়ণও প্রস্তাবিত ব্লকের পক্ষপাতী বলেই মনে হয়। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টকে ওল্টাবার জন্য দরকার হলে এস-এস-পি দল শয়তানের সংগেও হাত মেলাতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু এই দলের মধু লিমায়ে এবং অপর দু'-একজন নেতা কোন কমিউনিস্ট-বিরোধী জোটে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

এস-এস-পি দলের এক এক নেতা এক এক রকমের মতামত পোষণ করেন। কাজেই তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন তা অনুমান করা শিবেরও অসাধ্য বলে মনে হয়। তবে নানা মতভেদের ফলে দলের যা অবস্থা তাতে নেতারা যে পথেই যান না কেন, দলের ভাঙন অনিবার্য। বিহারেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্ভবত সেই ভাঙন এড়াবার জন্য এঁরা একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করছেন। এস-এস-পির সেক্রেটারী ফার্নাণ্ডেজ এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা। তিনি বিষয়টা নিয়ে সিণ্ডিকেটী নেতা মোরারজী দেশাই এবং স্বতন্ত্র নেতা রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দেশাইকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের প্রস্তাবিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্লক যদি কমিউনিস্ট-বিরোধিতাকেই তাঁদের মূলমন্ত্র করেন,

মাসানী

তাহলে সেই ব্লকে এস-এস-পি যোগ দিতে পারবে না।

অপর দিকে রাজাগোপালাচারী ফার্নাণ্ডেজকে বলেছেন যে, সি-পি-এম দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে তাঁর আপত্তি নেই। রাজাজীর ধারণা, "ডাঙ্গে-পন্থী কমিউনিস্টরা একেবারেই গোল্লায় গেছে। তারা মস্কোর বুড়ো আঙুলের তলায় রয়েছে এবং তারা ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। অন্য দিকে সি-পি-এম দলের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা অপর কোন দেশের কোন সম্পর্ক নেই। তারা এখন আশপাশে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই তাদের অনায়াসেই 'জাতীয় কমিউনিস্ট' বলে গণ্য করা যায়।"

সি-পি-এম দলের পলিট ব্যুরোর আসন্ন বৈঠকে এস-এস-পির প্রস্তাব আলোচিত হবে। দলের নেতা রামমূর্তি বলেছেন যে, এস-এস-পি যে ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হয়েছে, সেটা সফল করবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন। রামমূর্তি আরও বলেছেন, সি-পি-আই ইন্দিরা গভর্নমেণ্ট-বিরোধী কোন জোটে যোগ দেবে বলে তিনি মনে করেন না। দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠতর হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।

সব মিশিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সিণ্ডিকেট, স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ একটি জোটে সংঘবদ্ধ হতে চলেছে। সেটা যে রক্ষণশীল দলগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল জোট, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এস-এস-পির রাজনারায়ণ ও অন্যান্য কিছু নেতা সেই জোটে যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু দলের অন্য নেতারা দক্ষিণপন্থীদের জোটে ভিড়তে চাইছেন না। তাই তাঁরা একটা তৃতীয় জোট গঠন করতে চাইছেন। সি-পি-এম সেই জোট সম্পর্কে নিরাসক্ত নন। অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলো এখনও তৃতীয় জোট সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন নি। সেটা দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই জানা যাবে।

ঘটনার গতি যে পথে এগোচ্ছে, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর কোন একটি দলের পক্ষে ক্ষমতা লাভ করা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। সেই কারণেই সমমতাবলম্বী দলগুলো জোটবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলগুলোর জোটবদ্ধ হতে বিশেষ দেরী লাগবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বামপন্থীদের একজোট হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে। কেরালা আর পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্টের তিক্ত অভিজ্ঞতাই তার সূচক। তবে এও ঠিক যে যুক্তফ্রণ্ট ছাড়া বামপন্থীদের কোন পথ নেই। তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি বন্ধ করে একজোট হতে পারেন, তবেই মঙ্গল। নচেৎ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুশ্চিন্তার অনেক কারণ আছে।

ফার্নাণ্ডেজ

পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার সঙ্কট

পাঞ্জাব বিধানসভার বিগত বাজেট অধিবেশনের সময় গুরনাম সিং-এর নেতৃত্বাধীন আকালী-জনসঙ্ঘ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বিরোধী দল মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে পারেন নি, ঘটিয়েছিলেন আকালী নেতা সন্ত ফতে সিং। তিনি গুরনাম সিংকে ভিতর থেকে ঘায়েল করে তাঁর মন্ত্রিসভার পরমায়ু শেষ করে দেন। অতঃপর আর একটি আকালী-জনসঙ্ঘ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং সন্ত ফতে সিং-এর প্রিয়পাত্র পি এস বাদল হন তার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সম্প্রতি সেই মন্ত্রিসভার অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। জনসঙ্ঘের সদস্যরা মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছেন এবং আকালী দলের অনেক সদস্যও আবার গুরনাম সিং-এর দলে ফিরে গেছেন। বিধানসভায় মোট সদস্যসংখ্যা ১০৪ জন কিন্তু ব্যাপক দলত্যাগের ফলে বাদল মন্ত্রিসভার সমর্থকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫ জন। কাজেই বিরোধী পক্ষ এখন শ্রীবাদলকে চেপে ধরেছেন—অবিলম্বে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। বাদল গোড়ায় বলেছিলেন, বিধানসভার একটা অধিবেশনের পর ৬ মাস আর কোন অধিবেশন না ডাকলেও চলে। কাজেই সেই নিয়ম অনুসারে ৩০শে সেপ্টেম্বরের আগে বিধানসভার অধিবেশন ডাকবার আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিরোধী পক্ষের চাপে তিনি এখন নতি স্বীকার করেছেন। স্থির হয়েছে, ৫ই আগস্ট বিধানসভায় অধিবেশন বসবে এবং সেখানেই শক্তিপরীক্ষা হবে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ তাতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা ২০শে জুলাই বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানাচ্ছেন। সিণ্ডিকেটী কংগ্রেস পাঞ্জাবে রাজ্যপালের শাসন চালু করবার আহ্বান জানিয়েছেন। অপর দিকে গুরনাম সিং বিধানসভা সাসপেণ্ড করার দাবী জানিয়েছেন। গুরনাম সিং-এর দলে ১৪ জন সদস্য আছেন। তিনি ভেবেছিলেন, এস-এস-পি, সি-পি-আই, কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) এবং পি-এস-পি সদস্যদের সহায়তায় তিনি গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে পারবেন। কিন্তু সম্ভাব্য মিত্রদের ভাবগতিক দেখে তিনি ভরসা পাচ্ছেন না। সেই কারণেই তিনি বিধানসভা সাসপেণ্ড করার দাবী তুলেছেন।

কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) দলও চুপ-চাপ বসে নেই। তাঁদের নেতারা একটি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের নেতা সৎপাল মিত্তল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁকে বলেছেন যে, কোন একটা আকালী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট বাঁধা উচিত। তবে কোয়ালিশন গভর্ন-মেণ্ট গঠিত হলে তার নেতৃত্ব রাখতে হবে কংগ্রেসের হাতে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পাঞ্জাবের সহকর্মীদের বলেছেন, পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যান, হঠাৎ কিছু করবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী বাদলের ধারণা, তাঁর মন্ত্রিসভার সামনে কোন সঙ্কট নেই। তিনি মনে করেন, দলত্যাগীরা আবার দলে ফিরে আসবে এবং আকালী দলের বাইরের ১০।১২ জন সদস্য তাঁর গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করবে।

পাঞ্জাবে দলাদলির রাজনীতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে বাদল মন্ত্রি-সভার পরমায়ু আর বেশি দিন নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু বিকল্প কোন মন্ত্রিসভার সম্ভাবনাও যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার সম্ভাবনাই বেশি।

৫।৭।৭০

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ

কয়েক সপ্তাহ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন যখন ক্ষুদ্র কম্বোডিয়ায় সশস্ত্র মার্কিন অভিযান শুরু করে দেন, তখন সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ তো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেনই, খোদ আমেরিকার অধিবাসীরাও কম ক্ষুব্ধ হন নি। মার্কিন ছাত্ররা নিক্সনের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বেরিয়ে পড়েন। নিক্সন তাঁদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের নৃশংস দমন-নীতির ফলে বেশ কয়েকজন ছাত্র ও যুবক হতাহত হন। অপরদিকে মার্কিন সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরাও চুপ-চাপ বসে থাকেন নি। তাঁরা অনেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গত সপ্তাহে তাঁরা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য কুপার-চার্চ (সংশোধনী) বিল পাশ করিয়ে নিয়েছেন। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলে কংগ্রেসের অনুমোদন চাই। প্রেসিডেন্ট নিজের খুশিমত আমেরিকাকে কোন যুদ্ধে জড়াতে পারেন না। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা সুকৌশলে কংগ্রেসের এই অধিকার হরণ করে বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট জনসনই সর্বপ্রথম এই অপকৌশল প্রয়োগ করেন। ১৯৬৪ সালের ৭ই আগস্ট টংকিং উপসাগরের একটি সাজানো ঘটনা সামনে রেখে জনসন ভিয়েৎনাম যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের তাৎপর্য উপলব্ধি না করে কংগ্রেসের উভয় সভা বিপুল ভোটাধিক্যে সেই প্রস্তাব অর্পণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন সেই টংকিং উপসাগরীয় প্রস্তাবের ভিত্তিতেই কম্বোডিয়ায় আক্রমণ করেছেন। তাতে কংগ্রেসের সদস্যরা বেশ বুঝতে পারছেন যে, প্রেসিডেন্ট আসলে সংবিধানের নির্দেশ লঙ্ঘন করবার জন্যই টংকিং প্রস্তাবটা পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার প্রেসিডেন্টের হাতে ছেড়ে দিতে কংগ্রেস রাজী নয়। তাই তারা কুপার-চার্চ (সংশোধনী) বিলের দ্বারা প্রেসিডেন্টের আত্মসাৎ করা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

সিনেটে ৫৮—৩৭ ভোটে অনুমোদিত উপরোক্ত বিলে প্রেসিডেন্টকে বলা হয়েছে যে, ৩০শে জুনের (১৯৭০) পরে প্রেসিডেন্ট কম্বোডিয়ায় কোন সামরিক অভিযান চালাতে পারবেন না, অথবা সেই কাজে [illegible] দিয়ে কোন বিদেশী ফৌজও নিয়োগ করতে পারবেন না। কারণ আমেরিকা কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না করবে সেটা স্থির করার অধিকার এবং দায়িত্ব একমাত্র কংগ্রেসের।

কংগ্রেসের কাছে প্রেসিডেন্ট নিক্সন যেভাবে অপমানিত হলেন, এর আগে আর কোন প্রেসিডেন্ট তেমনটা হয়েছেন বলে মনে হয় না।

সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয় বিলের ওপর আলোচনাকালে রিপাবলিকান দলের শেরম্যান কুপার এবং ডিমোক্র্যাটিক দলের ফ্রাঙ্ক চার্চ উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, নিক্সন ৩০শে জুনের পর কম্বোডিয়ার যুদ্ধে একটি পয়সাও ব্যয় করতে পারবেন না। ব্যয় করতে হলে কংগ্রেসের অনুমতি চাই।

সিনেটের এই প্রস্তাবের ফলে কম্বোডিয়া অথবা ভিয়েৎনামে মার্কিন সামরিক অভিযান বন্ধ হবে—এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। মার্কিন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এত ক্ষমতার অধিকারী যে সারা দুনিয়ায় আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু মার্কিন সিনেট যে প্রেসিডেন্টের অসংযত রণপিপাসা খর্ব করতে এগিয়ে এসেছেন, সেটাই একটা মস্ত সুলক্ষণ বলে শান্তিকামী মানুষ মনে করেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ গায়ের জোরে বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল ঠিকই কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সেটা আর সম্ভব নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই সত্য যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল। "জোর যার মুলুক তার" নীতির দিন শেষ হয়ে গেছে।

পশ্চিম এশিয়ায় আরব-ইসরাইল বিরোধ মীমাংসার জন্য গত সপ্তাহে নানা মহলেই তৎপরতা দেখা গেছে। শোনা যাচ্ছে ভারত সরকারও নাকি এই বিরোধ মীমাংসায় সহায়ক হতে ইচ্ছুক। প্রেসিডেন্ট নাসের এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সন দুজনেই নাকি বিষয়টা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সম্প্রতি চিঠি লিখেছেন। শ্রীমতী গান্ধী সেই চিঠির জবাব দিচ্ছেন।

ওদিকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের বর্তমানে পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য মস্কোয় রয়েছেন। সেখানে তাঁর দৌত্যের ফলাফল এখনও জানা যায় নি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব-ইসরাইল বিরোধ মীমাংসার একটা নতুন ফর্মুলা দিয়েছে। সেটা আশাব্যঞ্জক বলে বিভিন্ন মহলের ধারণা। রাষ্ট্রসংঘ মহলের এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে নাকি অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলকে এখনই সরে আসতে বলা হয় নি। সোভিয়েত প্রস্তাবে নাকি বলা হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ে ইসরাইল অধিকৃত আরব এলাকা ছেড়ে আসতে সুরু করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবরাও ঘোষণা করবে যে, ইসরাইলের সঙ্গে তারা সদ্ভাবে বসবাস করতে রাজী আছে। পরে ইসরাইলকে অধিকৃত আরব এলাকার পুরোটাই ছেড়ে আসতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নাকি ইসরাইলের আঞ্চলিক অখণ্ডতার গ্যারান্টি দিতেও রাজী আছে। এর তাৎপর্য এই যে, আরব গভর্নমেন্ট-গুলো প্যালেস্টাইনী কমান্ডোদের ইসরাইলে অনুপ্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রস্তাব ইসরাইল এবং আরব নেতারা কিভাবে গ্রহণ করেছেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নাসের মস্কো থেকে ফিরলে সেটা জানা যেতে পারে। তবে আরব নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে রুশিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছে বলে মনে হয় না।

আরব-ইসরাইল সশস্ত্র বিরোধ যে রকম ক্রমবর্ধমান এবং সেখানে বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তিজোট যেভাবে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন, তাতে সেখানেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হওয়া অসম্ভব নয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিম এশিয়ায় তিনি কিছুতেই শক্তিসাম্য নষ্ট হতে দেবেন না। অর্থাৎ শক্তির পাল্লায় একদিকে থাকবে ইসরাইল আর অপর দিকে থাকবে আরব দেশগুলো। আরবদের দেশে তিনি আরবদের বাড়তে দেবেন না। ইসরাইলকে মদত যুগিয়ে আরবদের ঠেকিয়ে রাখবেন। তাই মনে হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন মীমাংসার যে প্রস্তাবই উত্থাপন করুক না কেন, পশ্চিম এশিয়ায় বিরোধের মীমাংসা হওয়া খুব কঠিন। আরব দেশগুলি এক সময় ছিল অনুর্বর মরুভূমি কিন্তু এখন সেখানে তেলের স্রোত বইছে আর সেই স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিম দেশগুলোর দিকে। পশ্চিম এশিয়ায় তেলের কারবার করে হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে আমেরিকার ব্যবসায়ীরা। আর পশ্চিম এশিয়ার মানুষ পাচ্ছেন তার ছিবড়েটা। আরবদের বেশি বাড়তে দিলে তেলের কারবারটা যদি তারা ছিনিয়ে নেয়? কাজেই ইসরাইলকে ঘাঁটি করে আরবদের ওপর ছড়ি ঘোরাতে হবে। আমেরিকা যতদিন এই নীতি নিয়ে চলবে, ততদিন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুব কঠিন।

৫।৭।৭০
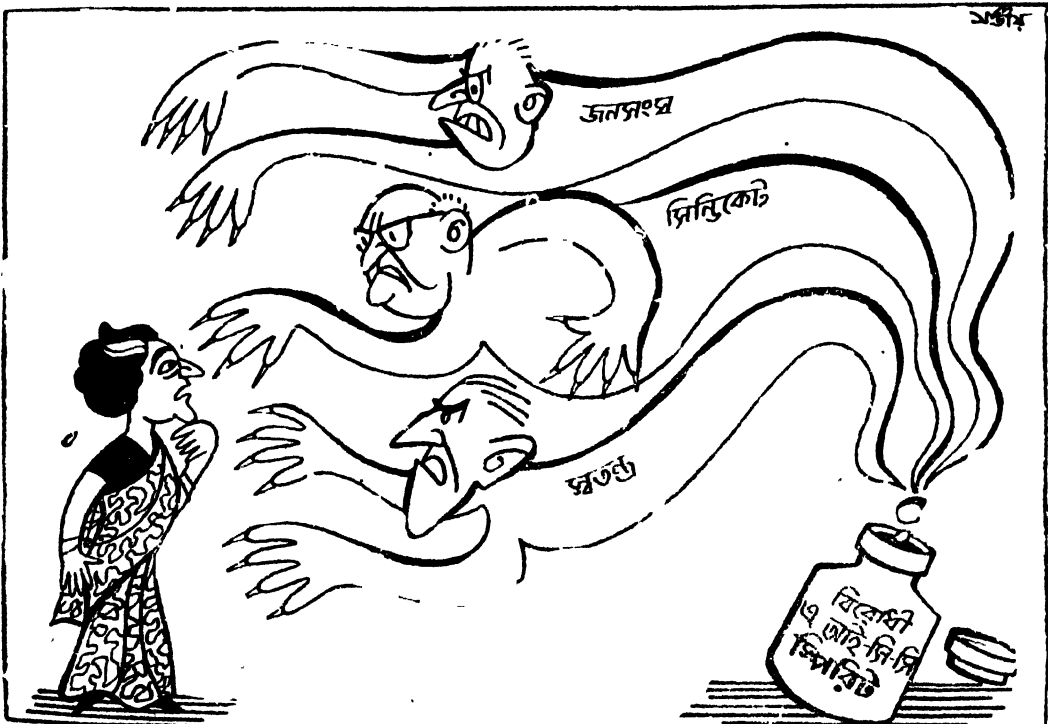
সিনেমা আমি দেখি না, কারণ সময় হয় না, তবে আমাকে সিনেমার নিত্য-নতুন বইয়ের পোস্টার দেখতে হয় ও পড়তে হয়। এর কারণ, আমার বাড়ির সামনে করোগেট বাড়ির দেওয়াল ২০। সিনেমার পোস্টার মারার নির্দিষ্ট জায়গা। প্রতি সপ্তাহে বা মাসে স্থানীয় সিনেমায় যেসব বই আসে, আগে থাকতে দেওয়ালে তার পোস্টার পড়ে যায়। এমনি একখানা বইয়ের পোস্টার পড়েছে সামনের বাড়ির দেওয়ালে। বইখানির নাম "শেষ থেকে শুরু"। বইখানির অভিনেতা-অভিনেত্রী তালিকায় বেশ আকর্ষণীয় তারকা আছে। এইদিনই আবার সকালে কাগজ খুলে দেখি—রাজ্যের নবগঠিত রাজনৈতিক জোটের অন্যতম জোট আট পার্টি ১৬ই জুলাই রাজ্যব্যাপী হরতাল-ধর্মঘট অর্থাৎ বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন। রাজ্যের অপর বামপন্থী জোট কয়েকদিন আগে ২০শে জুলাই হরতাল ডেকে রেখেছেন। অর্থাৎ রাজ্যবাসীর সামনে এখন দুটো হরতালের দিন ঝুলছে। ১৬ই ও ২০শে। আমি ভাবছিলাম রাজ্য-রাজনীতিতেও এখন যে খেলা শুরু হল, সেটাও দেখছি "শেষ থেকে শুরু"।

এতদিন দেখে এসেছি নানা দাবিতে জোরদার আন্দোলন হয়েছে, নানা নির্যাতন-অত্যাচার হয়েছে, দমন-পীড়ন চলেছে তারপর রাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে হরতাল ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। প্রশাসন, জনজীবন সবকিছু অচল স্তব্ধ করে আন্দোলনের পরিবেশকে তুঙ্গে তুলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে হরতালের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি দরকার হ'ত—অনেক ত্যাগ ও পরিশ্রমলব্ধ পরিবেশে হরতালের ডাক

আন্দোলন নেই, জনজীবনকে আন্দোলনের একাত্ম করার কোন প্রস্তুতি নেই, শুধু আছে দাবিপত্র—সংবাদপত্রে প্রকাশ, সেই সঙ্গে হরতালের তারিখ ঘোষণা। অর্থাৎ যা হবার কথা সকলের শেষে, যা প্রয়োগ হবার কথা সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে, সেটাই হচ্ছে সকলের আগে। যা দিয়ে শেষ হবার কথা, তা-ই হরতাল দিয়ে আন্দোলন শুরু হচ্ছে। তাই মনে মনে ভাবছিলাম, সিনেমায় হচ্ছে 'শেষ থেকে শুরু' চিত্র, আর রাজ্য-রাজনীতির যা চলছে, সেটাও শুরু হচ্ছে শেষ থেকে।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হবার মুখে শুধু সিপিএম-এর একার ডাকে ১৭ই মার্চে হরতাল হয়েছিল। সেই হরতালের স্মৃতি রাজ্যবাসীর মন থেকে মুছে যায় নি, সেই স্মৃতি সহজে যাবার নয়। বর্ধমান সাঁই বাড়ির হত্যাকাণ্ড, কেশোরাম রেয়নে হত্যাকাণ্ড, গৌরীপুরে হত্যাকাণ্ড, দমদমের কাছে দক্ষিণদাড়ির হত্যাকাণ্ড এখনও দুঃস্বপ্ন হয়ে রয়েছে। বর্ধমান আর রেয়ন কারখানার ও দক্ষিণদাড়ির ঘটনা নিয়ে তদন্ত কমিশন বসেছে, তদন্ত চলছে, খবর কাগজে এখনও বাঁধা দুই কলম খবর বেরুচ্ছে। ১৭ই মার্চের এক দলের ডাকা হরতালের পরিণতিতে মরেছিল কম করে ১৭ জন। কিন্তু সে ছিল এক দলের হরতাল, আর এবার আর এক দল নয়—রাজ্য-রাজনীতির দুই শিবির। শুধু শিবিরে ভাগ হওয়া নয়, প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে এক দলের হরতাল আর এক দল বিরোধিতা করবে। অবস্থাটা অনুমান করা সম্ভবত দুঃসাধ্য নয়, রাজ্যে হরতাল-হাঙ্গামায় শহীদ সংখ্যা কত হবে। এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় ১৬ই

তারিখের হরতালের হাঙ্গামায় যদি ১০ জন শহীদ হয়, তবে ২০শের হরতালে শহীদ সংখ্যা ডবল করার চেষ্টা হবে নিশ্চয়ই। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন—আট দলের হরতালের বিরোধিতা করা হবে, শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন—ও'রা যেমন করবেন আমরা সেই রকম করবো।

আমার প্রশ্নঃ আমরা কি শুধু শহীদ হলেই দায়িত্ব শেষ করবো? আমরা সকলেই সমাজব্যবস্থায় ও পরিবেশগুণে নিত্য-দিনেই শহীদ হচ্ছি, অনাহারে, বেকার থেকে, অচিকিৎসায়, অশিক্ষায়, জীবনের সবরকম ব্যর্থতায় শহীদের মৃত্যু বরণ করছি। সেই মৃত্যুর কি একটা আইটেম বাড়বে? অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি হরতালের ডাক দিয়ে হাঙ্গামা করবে আর আমরা মরবো। সে না হয় মরলাম। রামে মারলেও মরবো, রাবণে মারলেও মরবো, কিন্তু সবার আগে একটু বুঝে নিতে দোষ কি—কেন মরছি, আর কার কাছে মরছি?

যাবে। ছয় পার্টি হরতাল ডাকলো ২০শে জুলাই। কিন্তু কেন ডাকা হ'ল এই হরতাল? কোন আন্দোলনের শীর্ষে উঠে এই হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে? ......রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান যদি হরতালের উদ্দেশ্য হয়, পুলিশের অত্যাচার-নির্যাতন যদি হরতালের লক্ষ্য হয়, তবে দাবি যুক্তিসংগত সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য আজ পর্যন্ত যা-কিছু করা হয়েছে, সেটা কি হরতাল ডাকার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য হরতাল ডাকা ও করার মধ্যে এখন কোন কষ্ট নেই। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেবার অপেক্ষা করার দরকার বড় বেশি নেই। রাজ্যের কুটির শিল্পে বিপুল উৎপাদনলক্ষ মজুত হাতবোমা, পটকা কিছু বাজারে ছাড়লে বাপ বাপ বলে ডাক ছেড়ে হরতাল হয়ে যাবে। কিন্তু হরতালের মহান উদ্যোক্তারা শুধু একটু বুঝিয়ে বলবেন একদিন হরতাল হ'লে বর্তমান পরিস্থিতির কতটুকু পরিবর্তন হবে? আমরা রাজ্যের মানুষ যারা খুঁটোয় বাঁধা ছাগলের অধম জীবন যাপন করি, তাদের কতটা লাভ হবে হরতালে?

আমি জানি হরতালের পক্ষে অনেক যুক্তি হাজির করে আমাকে শেষ পর্যন্ত শয়তান, বজ্জাত সাংবাদিক বলে প্রমাণের চেষ্টায় যুক্তির কোন অভাব হবে না। কিন্তু ছয় পার্টির নেতারা দয়া করে শুধু বলুন হরতাল পালনে তাঁরা যদি সত্যি সিন-সিয়ার হন, তবে এই ২০শে জুলাই হরতালের দিন ঘোষণার আগে কতটা চেষ্টা করেছেন আট পার্টির সঙ্গে একমত হতে। বিশেষ করে ছয় পার্টি যখন এই বাস্তব অবস্থাটা জানে যে, ছয় পার্টির ফ্রন্টে নামে ছয় পার্টি হলেও সি পি এম ছাড়া অন্য সকলেই প্রায় এলে-বেলে, যাদের কাজ হ'ল খেলবার সময় বল মাঠের বাইরে চলে গেলে কুড়িয়ে আনা। মাঠে নেমে গোল, ব্যাক, সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলার কোন যোগ্যতা তাঁদের নেই, যত রং-বেরং-এর জার্সি তাদের পরানো হোক না কেন? অবশ্য আট পার্টির ফ্রন্টেও এমন জার্সি-সর্বস্ব প্লেয়ারের অভাব নেই। যা হোক, কতটা চেষ্টা হয়েছে যে, যাতে একটা দিনে রাজ্যব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট-হরতাল হয়। বিশেষ করে ১৭ই মার্চের অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেই সঙ্গে আরো যখন জানা রয়েছে যে, রাজ্যের বামপন্থী শিবির এখন দুটো মতে বিভক্ত, আর সি পি এম যতই মনে করুক দেশের সব মানুষ তাদের পিছনে আছে, অন্য দলও একেবারে শূন্যে ভেসে রাজ-নীতি করে না। কিন্তু কোন সিনসিয়ার চেষ্টাই হয় নি, যাতে হরতাল ঘোষণার ব্যাপারেই কোন ঐক্যমত হয়।

এই সঙ্গে এই কথাও ছয় পার্টি জানে, ওরা একটা তারিখ ঘোষণা করলে সেই তারিখ রক্ষা করা যেমন তাদের মর্যাদার প্রশ্নে পরিণত হয়, তেমনি অপর পক্ষের সেই তারিখ সুবোধ বালকের মত মেনে নেওয়াও মোটেই মর্যাদার হয় না। এই সব পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা না করে শুধু টেক্কা দেবার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলে তার ফল ভাল হয় না—সেই কথা বোঝা সি পি এম দলের নেতৃবৃন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সব প্রশ্ন জেনে-বুঝেও সাত তাড়া-তাড়ি হরতালের তারিখটি ঘোষণা করে দেওয়া হল। সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যে গায়ের জোরের নীতি পরিচালনার অভি-যোগ অন্য অনেকে করেন এবং অনেকেই যাঁরা মনে করেন সি পি এম-এর এই গায়ের জোরের নীতি চালাবার চেষ্টাই হ'ল রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার অন্যতম কারণ, হরতাল ডাকার রাজনীতিতে সি পি এম ছয় দলের নামে সেই অভিযোগের ময়লাই আর একবার গায়ে মাখলো।

আর একটা প্রশ্নঃ ২০শে জুলাই সোমবার হরতাল ডাকবার কারণ কি? সবকিছুরই একটা নিয়ম আছে। তবে প্রচলিত নিয়ম ভাঙা যায় না, হয় না এমন নয়—কিন্তু একান্ত আকস্মিক জরুরী ব্যাপারে ছাড়া রবিবার ছুটির পরের দিন সোমবার হরতাল—কে কবে শুনেছেন বলুন। না এটার মধ্যেও কোন রাজনীতি আছে। হরতালবাবুরা সকলেই জানেন, হরতালে আমরা শুধু অনেকে শহীদ হই না, অনেককেই তাদের বেতনের কড়ি গুণতে হয়। সপ্তাহের মাঝে হলে যেখানে একদিন, সেখানে রবিবারের পর সোমবার হলে দু'দিন বেতন হারাবার সম্ভাবনা—এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নেতারা ভুলতে পারেন কি? সব ছা-পোষা মানুষের পক্ষে কি ব্যাপারটা সহজ হবে?

এইবার প্রশ্ন আট পার্টির কাছে। বলি তাঁরা হঠাৎ হরতাল ডাকতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন কেন? আট পার্টি তো আন্দো-লনের কথা বলতে যেয়ে একদিনও বলেন নি—আমরা জুলাই মাসে হরতাল করবো। ছয় পার্টি না হয় বহুবার বলেছে যে, জুলাই মাসের মধ্যে দাবি পূরণ না হ'লে হরতালের ডাক দেওয়া হবে, কিন্তু আট পার্টি তো বলে এসেছেন—আগে বিক্ষোভ, তারপর মহাকরণ ও সরকারী দপ্তর ঘেরাও, তারপর লাগাতর ঘেরাও করে প্রশাসন অচল করা। তাতেও যদি ফল না হয়, তবে আগস্ট মাসে যেয়ে সর্বাত্মক হরতাল। কিন্তু সেই সব কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ ১লা জুলাই রাত্রে গদা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোষণা করা হল—হরতাল, হরতাল হবে না ছয় পার্টি ডেকেছে ২০শে, আমরা করবো ১৬ই। কেন ১৬ই, চারদিন আগে। একবারও কি মনে এই প্রশ্নটা এল না—এক পক্ষ হঠাৎ ডেকেছে, আমরা ১৬ই ডাকলে এক সপ্তাহে রাজ্যে দুটো হরতাল হবে। কেন, তারিখ ঘোষণা কি একটু অপেক্ষা করে, একটু বিবেচনা করে করা যেত না? ওরা করছে বলেই আমাদের করতে হবে—কারণ খুঁটোয় বাঁধা জীবরা ওদের কথা শুনবে, আমাদের কথাও শুনবে। গুরুর কাছ থেকে জুতো মেরে মন্ত্র আদায় করা শিষ্য আমরা—গুরু মন্ত্র না দিয়ে যাবে কোথায়? তার-পর কিসের দাবিতে হরতাল? না পুলিশ ও সি পি এম যোগসাজসে অত্যাচার করছে। অন্য অনেক দাবিও আছে, তবে সি পি এম-এর বিরুদ্ধেও একটা দাবি আছে। আবার এই দাবির অপর একটা অংশে রয়েছে যদি যুক্তফ্রন্ট পুনরুজ্জীবন সম্ভব না হয়, তবে মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই। অর্থাৎ সি পি এম-কে নিয়ে যুক্ত-ফ্রন্ট পুনরুজ্জীবনও আমাদের কামনার অন্যতম—আবার সি পি এম-এর অত্যা-চারের বিরুদ্ধেও হরতাল। গোঁজামিল শব্দটার সার্থক প্রয়োগ হবার জায়গা সম্ভবত আট দলের ১০ দফা দাবির মধ্যে যেমন প্রশস্ত আঙিনা পেয়েছে, তেমনটি সহজে পাবার নয়। তবু আমি সেই কথা ফাঁস করবো না কিভাবে ১০ দফা দাবির মধ্যে সি পি এম-বিরোধী অংশ যুক্ত হয়েছে বা শ্রীঅশোক ঘোষের আট পার্টি ও ছয় পার্টির হরতাল আহ্বানের দিন এক করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

'সপ্তাহের বোঝা' লেখা শেষ হবার পর রবিবার রাত্রে ছয় পার্টির ডাকে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ২০শে জুলাইয়ের হরতালকে এগিয়ে ১৪ই জুলাই তারিখে আনা হয়েছে। ১৬ই জুলাই আট পার্টির হরতালের দু'দিন আগে এগিয়ে আনা হ'ল ছয় পার্টির হরতাল। ছয় পার্টি নিশ্চয়ই সংগত কারণে হরতালের দিন ২০শে জুলাই থেকে সরিয়েছেন। কিন্তু সরানোই যদি হ'ল, তবে সেই দিনটি ১৬ই জুলাই হ'লে কি ক্ষতি হ'ত এবং কেন ১৬ই জুলাই হ'ল না সেটা বোঝা গেল না। সব কথা সকলে বুঝবে এমন দাবি করি না, তবে ১৪ই আর ১৬ই দু'দিন হরতাল জমবে কেমন, সেটাই প্রশ্ন?

ছয় পার্টি ও আট পার্টি দুই পক্ষকেই ভেবে দেখতে বলবো—আন্দোলন করুন, দাবি আদায় করুন, নিজেরা যত পারেন লড়াই করুন, শুধু নিরীহ জন-গণকে অপ্রয়োজনে শহীদ করে বাহবা কুড়াবার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন এই জনগণ ২৮০-র বিধানসভায় আপনাদের ২১৮টি আসন দিয়ে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংখ্যাধিক্য দলের সরকার গঠনের সুযোগ দিয়েছিল, সেই সরকার আপনারা রাখতে পারেন নি।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ষোলো ॥

নিদারুণভাবে চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে গেল স্বপ্না। টুলুর মুখ শুকিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

'অ্যাই কার্ত্তিক, কী হচ্ছে? জামা ছাড় বলছি।'

'জামা ছাড়ব মক্কেল এমনিতেই? খুব ভদ্দরলোক হয়ে গেছিস, না-রে শালা?'

জামা ছাড়ানোর নিষ্ফল চেষ্টা করে টুলু বুঝল, লাভ হবে না, জামাটাই ছিঁড়বে মাঝখানে থেকে। স্বপ্না সঙ্গে থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে, এই কথা ভেবে লজ্জায় দুঃখে তার চোখে জল আসছিল। নিজে খুব দুর্বল সে না। অন্য সময় হলে এখন সোজা একটা ঘুষি বসিয়ে দিত কার্ত্তিকের মুখে। কিন্তু স্বপ্না! তা ছাড়া দলে ওরা জন চারেক, আর মানিক বলছিল—

ঠাণ্ডা একটা ভয় শিরশিরিয়ে ছড়িয়ে গেল বুকের ভেতরে। সব ব্যাপারটাকে বেশ হাল্কা একটা রূপ দেবার চেষ্টা করল সে। 'স্বপ্না, ইয়ে—কিছু মনে কোরো না, মানে এরা আমার পুরোনো বন্ধু, মাঝে মাঝে এক-আধটু ঠাট্টা-ফাট্টা করে। এ হ'ল কার্ত্তিক—এরা—'

কথাটা শেষ করতে পারল না টুলু, তার আগেই বানরের মতো দাঁত খিঁচিয়ে উঠল কার্ত্তিক।

'ঠাট্টা! ব্যাটা কুত্তার ছা—ব্যাটা হারামী। নিজের জান বাঁচাবার জন্যে দারোগার কাছে ফণেকে ফাঁসিয়ে এসেছিস, নইলে পুলিশ মালের খোঁজ পায় কী করে? আজ শালা এইখানে তোর লাশ ফেলে না যাই তো আমার নাম কার্ত্তিক

দলের বাকী তিনজন সঙ্গে সঙ্গে তিন দিক থেকে একটা বূহের মতো তৈরি করে ফেলল। কার্ত্তিকের একটা হাত ঢুকে গেল পকেটের ভেতর, সেখানে বড়ো একটা আলুর গায়ে সেফ্‌টি রেজরের একটি ব্লেড্ গাঁথা। বেশি কিছু করবার দরকার নেই, বার কয়েক আলতোভাবে মুখের ওপর আলুটা বুলিয়ে নিলেই চমৎকার-ভাবে বদন বিগড়ে যাবে।

কিন্তু হাতটা পকেট থেকে বেরুবার আগেই সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে টুলু আর কার্ত্তিকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্না। কোমল গলায় ডাকল: 'কার্ত্তিকদা, আমার একটা কথা শুনুন আগে।'

খরখরে গলায় হেসে উঠল দলের একটা ছেলে।

'লে মাইরি! এ শালার ময়না যে আবার দাদা বুলি ছাড়ছে রে!'

কার্ত্তিকের হাতটা কিন্তু শক্ত হয়ে গিয়েছিল পকেটের মধ্যে। হঠাৎ চড়া গলায় একটা ধমক দিয়ে উঠল কার্ত্তিক।

'চুপ কর, উল্লুক। ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দে।'

দলের তিনটে ছেলের চোখ গোল হয়ে উঠল। এ-রকম তো কথা ছিল না। দু' মিনিটের মধ্যে মামলা মিটিয়ে দিয়ে সটকে পড়বার কথা বলেছিল কার্ত্তিক। হঠাৎ ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দেবার সুবুদ্ধি তার কোথা থেকে গজিয়ে উঠল? একজনের লুব্ধ দৃষ্টি স্বপ্নাকে লেহন করছিল, কার্ত্তিকের কাজ শুরু হয়ে গেলে সে নিজেও একটুখানি মতলব হাসিল করে নিত। কিন্তু এ যে একেবারে আলাদা ঠেকছে!

স্বপ্না বললে, 'কার্ত্তিকদা, বোনের মতো একটা অনুরোধ করছি। টুলুদা কী

অন্যায় করেছে জানি না, কিন্তু আজ ওকে ছেড়ে দিন। আমার শরীর ভালো নেই, অনেক দূরে থাকি। টুলুদা সঙ্গে করে আমাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে।'

আশাভঙ্গে মরীয়া ছেলেটা বলে ফেলল: 'মাইরি আর কী! বললেই ছেড়ে দিতে হবে? আজ এই শুয়োরকে আচ্ছা-মতন ধোলাই দিয়ে তবে অন্য কথা। বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে ভাবতে হবে না, আদর করে—'

চাউনি আর গলার আওয়াজে স্বপ্না শিউরে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ ঠাস্ করে একটা প্রকাণ্ড চড়ের আওয়াজ। মাথা ঘুরে উলটে পড়তে গিয়ে সামলে নিলে ছেলেটা।

কার্ত্তিক গর্জন করে উঠল: 'চোপ-রাও কুত্তার বাচ্চা! ইয়ার্কির জায়গা পাওনি আর? ফের যদি একটু বদিয়তী করেছিস শালা, তাহলে একদম জবাই করে লেকের জলে ভাসিয়ে দেব।'

চড়-খাওয়া ছেলেটার দু-চোখ অক্ষম ক্রোধে জ্বলতে লাগল, হিংসার নীলচে আলো মিটমিট করতে লাগল সেখানে। বাকী ছেলে দুটো যেন স্বপ্ন দেখছে দাঁড়িয়ে রইল এমনিভাবে। টুলু একটা কাঠের পুতুলের মতো নিঃসাড় হয়ে কার্ত্তিকের দিকে চেয়ে রইল, আর স্বপ্নার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থর থর করে।

কার্ত্তিক একটু বোকার মতো হাসল। তাকালো স্বপ্নার দিকে।

'কিছু মনে করবেন না দিদি, ও শালা ছোটলোক, ওর পেটে এক ডজন বোম মারলেও একটা ভাল কথা বেরুবে না। আচ্ছা—চলে যান আপনারা। আপনার জন্যেই হারামীর বাচ্চা এই টুলুটাকে আজ ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ফয়সালা বাকী রয়ে গেল।'— বলে একটা মাডধাকা দিয়ে

টুলুকে হাত তিনেক এগিয়ে দিলে ঃ 'যা শালা—খুব বেঁচে গেলি আজকে।'

'বড় উপকার করলেন কার্তিকদা।'—আবার নরম গলায় স্বপ্না বললে, 'আচ্ছা আসি তা হলে। নমস্কার।'

'আঁ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ন্-নমস্কার।'

'চলো টুলুদা।'

ভূতে পাওয়ার মতো টুলু স্বপ্নার সঙ্গে পা বাড়ালো, আর এখানে দুজন হাঁ করে দেখতে লাগল কার্তিককে, যেন তারা তাকে চিনতে পারছে না। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকল মার-খাওয়া ছেলেটা, চড়ের জ্বালায় গাল চিনচিন করছে এখনো, চোখে ঝিক ঝিক করছে নীল হিংসা।

নীরবতা ভাঙল একজনের কথায়।

'এটা কী হল কার্তিকদা?'

আবার বোকার মতো হাসল কার্তিক।

'কিরকম করে কার্তিকদা বলে ডাকল রে মেয়েটা - সব গোলমাল হয়ে গেল। নিজেকে বেজায় ছোটলোক বলে মনে হল তখন। ভাবলুম, বলছে যখন ভদ্দরলোকের মেয়ে—'

মার-খাওয়া ছেলেটা অশ্লীল গাল দিয়ে উঠল একটা।

'টুলো শালার সঙ্গে আবার ভদ্দর-লোকের মেয়ে! কোত্থেকে—'

লাফিয়ে উঠে কার্তিক তেড়ে গেল তার দিকে।

'আর একটা বদজোবান করবি তো তোকে এইখানেই সাবাড় করব আজকে।'

ছোকরা পাশের একটা রাস্তা দিয়ে জোর পায়ে দৌড় দিলে। যেতে যেতে বলে গেল, 'আচ্ছা শালা, দেখে নেব তোকে।'

আবার তিনজনের বিমর্ষ সমাবেশ। সব অন্যরকম হয়ে গেল। ক'দিন তক্কে-তক্কে ঘুরে টুলুটাকে আজ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে যায় কেউ জানে না।

কার্তিক একবার সঙ্গীদের দিকে তাকালো। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে, 'কেমন যেন বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল, না রে?'

সঙ্গীরা চুপ।

'মাইরি—বোন-ফোন তো নেই—তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে চাদ্দিকে যাদের দেখেছি, সব খেলোয়াড় মেয়ে। কিরকম গলায় যে কার্তিকদা বলে ডাকল, শুনে মেজাজই খারাপ হয়ে গেল! তবে টুলো শালা আর যাবে কোথায়—এক মাঘে তো শীত যায় না, ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকলেও টেনে বের করব।'

একজন গম্ভীর গলায় বললে, 'তবে হীরুটাকে না মারলেও পারতিস। ও আবার কথায় কথায় চাকু চালায়!'

'যা—যা। ও-সব ছুঁচো-চামচিকেকে কার্তিক সমাদ্দার পরোয়া করে না। এখন একটা সিগ্রেট দে—কিছু ভালো লাগছে না মাইরি।'

প্রবীর বলেছিল, 'তোমাকেই একটু চেষ্টা করতে হবে।'

সাবিত্রী জবাব দিয়েছিল, 'চেষ্টা করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হয়।'

'উল্টো ফলও হতে পারে। আমি তো অন্য পার্টির লোক। সুজাতা বৌদি হয়তো ভাববে যে, স্বরাজদার কুপরামর্শে আমি ওর বিপ্লবের কাজ পণ্ড করতে এসেছি।'

'সে তো আমার সম্বন্ধেও ভাবতে পারে।'

'ভাববে কেন? তোমরা তো একসঙ্গে কলেজে ইউনিয়ন করতে।'

'করেছি। কিন্তু সুজাতা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত না। বলত, আসলে আমার মন এ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের দিকে, আমি পুরো স্যাক্রিফাইস করতে পারি না। ওদের মতো ভোক্যাল হওয়া আমার পক্ষে সব সময় সম্ভব হত না, প্রিন্সিপ্যালের ঘরের সামনে অ্যাংগি ডেমোনস্ট্রেশনে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতুম।'

'বুঝেছি।'

'তা ছাড়া কী জানো—' সাবিত্রীর মুখে একটা ছায়া পড়েছিল ঃ 'ওদের সঙ্গে একটা জায়গায় আমার সম্পূর্ণ মত মিলত না। আমি বলতুম, পার্টি পলিটিক্স্ প্রত্যেকের আলাদাভাবে থাকে থাকুক, কিন্তু স্টুডেন্টস ফ্রন্টে আমাদের কতগুলো সাধারণ স্বার্থ—কমন প্রবলেম নিয়ে এগোতে হবে। সেখানে পার্টির চাইতেও বড়ো দরকার ইউনিটি। প্রত্যেকে যদি নিজের দলের প্রোগ্রামকে স্টুডেন্টস্ ফ্রন্টে টেনে আনতে চায়, তা হলে ছাত্র-আন্দোলন নষ্ট হয়ে যাবে, জোর পাবে রি-এ্যাক্শনারীরা। সেইখানেই ওদের আপত্তি। পার্টি লীডারশিপের ডিক্টেশন ছাড়া ওরা পা ফেলবে না।'

প্রবীরের ভুরু কুঁচকে এসেছিল। সেই পার্টি! যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্বাস টানছে, ছাত্র-ঐক্য টুকরো টুকরো। কৃষক সংগঠন তো গেছেই, ট্রেড ইউনিয়নও হয়তো যাবে। চমৎকার!

প্রবীর বলেছিল, 'তুমি তো এখন পুরোপুরি কলেজের দিদিমণি। রাজ-নীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই।'

'তা বলতে পারো। সম্পর্ক রাখবার সময় কোথায়? এত কাজ! তার ওপর থিসিসটাতেও হাত দিয়েছি।'

'এবার ডক্টরেটও হবে তা হলে? এমনিতেই তো কত দূরে ছাড়িয়ে গেছ, এর পরে একেবারে দূরে আকাশের নক্ষত্রের মতো—'

সাবিত্রী এবার দু' হাতে জড়িয়ে ধরেছিল প্রবীরের গলা ঃ 'খুব হয়েছে, আর চালাকি করতে হবে না।'

'ছি, ছি, এমন ভালো ছাত্রী, অধ্যাপিকা, ভাবী ডাক্তার, শেষকালে একজন বি-এ ফেল কেরানীকে—'

অমোঘ উপায়ে সাবিত্রী তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। কতকাল পরে! এই সময়, এই যন্ত্রণার কালে জীবনের এইসব সুর—এই সব মুহূর্তগুলোকে কীভাবে যে নির্বাসন দিতে হয়!

একটু পরে সাবিত্রী বলেছিল, 'তা হলে আমি গেলেই ভালো হবে বলছ?'

'আমার তাই মনে হয়। একালে কারো দল না থাকলে সে বরং সহনীয়, এমন কি ঘানু দক্ষিণপন্থীও অসহ্য নয়, কিন্তু এক লালকে দেখলেই আর এক লালের মাথায় আগুন ছোটে। তুমিই যাও।'

'কিন্তু রবিবারের আগে তো সময় পাব না।'

'রবিবারেই যেয়ো।'

রবিবারেই এসেছে সাবিত্রী। এ বাড়ি তার অচেনা নয়—কলেজে পড়বার সময় এসেছে কয়েকবার, সুজাতার সঙ্গে বিয়ের পরেও। আর এই বাড়িতেই প্রবীরের সঙ্গে তার প্রথম দেখা—স্বরাজদার বন্ধু হিসেবে।

কতদিন আগে? আট-ন' বছর নিশ্চয়। নীলু তখন আসছে। প্রবীর বি-এ পড়ছে, সে বি-এসসি। তার বছর তিনেকের সিনিয়র সুজাতা। দু'বার বি-এতে ড্রপ করে স্বরাজের সঙ্গে বিপ্লবী জীবনের জোড় মিলিয়েছে।

হ্যাঁ, অন্তত আট বছর, কিছু বেশিই হবে। এর মধ্যে কত বদলে গেছে জায়গাটা। মানুষ বেড়েছে, বাড়ি বেড়েছে, দোকান-পাট বেড়েছে, এত রিক্সা, এত বাসও বুঝি তখন ছিল না। কিন্তু বিশেষ বদলায় নি এই বাড়িটাই। সামনের একটুখানি ঘাসের জমিতে সেই রঙ্গন গাছটা, একদিকে নালার ধার ঘেঁষে তেমনি বুনো ওলের জঙ্গল।

সুজাতা বিকেলে গা ধুতে গিয়েছিল, তার মা এসে আদর করে বসালেন।

'তোমার মেসোমশাই কলে বেরিয়েছেন, ছেলেমেয়ে দুটো ব্যারাকপুরে গেছে তাদের পিসির কাছে বেড়াতে। বাড়িতে আমি আর মনুই আছি। বোসো—মনু এক্ষুণি আসবে।'

মনু সুজাতার ডাক নাম।

ভেতরের একটি ঘরে গিয়ে বসেছিল সাবিত্রী। ঘরটা চেনা। কুমারী জীবনে এই ঘরেই থাকত সুজাতা, সেলফে এখনো বোধ হয় তারই বইপত্র। দেওয়ালে লেনিন-স্তালিন-মার্কসের ছবি। রবীন্দ্রনাথও

আছেন। একদিকে একটা ভাঙামতন আলমারীর মাথায় একগাদা পুরনো কাগজ-পত্র বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, না দেখেও বুঝতে পারা যায় ওগুলো রাজনৈতিক পত্রিকা আর বুকলেট। বোধ হয়, ফিরে এসে এই ঘরেই আবার জায়গা নিয়েছে সুজাতা। এদের মধ্যে বসে আবার পুরনো দিন-গুলোকে অনুভব করতে চায় সে।

বাইরে দিনের আলো বিষণ্ণ হয়ে আসছিল। গাছপালার ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বাড়িটার ওপর। পাখিদের ক্লান্ত ডাক। একটা উত্তপ্ত বেলা কেটে গেছে, এখন বেলা শেষের হাওয়ায় ঝোপ-জঙ্গল-মাটির সেই সোঁদা গন্ধ।

বেড-কভার ঢাকা বিছানাটার ওপর চুপ করে বসে রইল সাবিত্রী, সুজাতার মা বসেছেন সামনে একটা মোড়া টেনে। সাবিত্রী দেখল, বিকেলের বিবর্ণতায় মাসিমার মুখের ওপরেও ছায়া নেমেছে।

মাসীমা বললেন, 'কী করছ এখন?'

'একটা কলেজে পড়াই।'

'হ্যাঁ, শুনেছি বটে। বিয়ে করবে না?'

একবার একটু রাঙা হল সাবিত্রীর মুখ।

'এখনো ও নিয়ে ভাবি নি মাসীমা।'

ডাক্তারের স্ত্রী, ম্যাট্রিক পাশকরা মাসীমার কপালে কয়েকটা রেখা পড়ল।

'কী জানি, হয়তো বিয়ে না করাই ভালো। তোমাদের আজকাল ছেলেমেয়ে-দের আমরা চিনতে পারি না।'

সাবিত্রী মাসীমার দিকে তাকালো। কথাটার অর্থ সে বুঝেছে। দশ বছর স্বরাজের সঙ্গে ঘর করবার পরে, নীলুকে ফেলে কত সহজে চলে আসতে পেরেছে সুজাতা। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে যে মাসীমা ম্যাট্রিক পাশ করে বিদুষীর মহিমা পেয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে সুজাতা-দের মনের চেহারা আঁচ করা শক্ত। সুজাতার বছর ছয়েকের বড়ো বোন সুলতা—সেও গ্র্যাজুয়েট—সে তো বিয়েই করল না, চাকরি করছে মুর্শিদাবাদের কোন্ স্কুলে। না—একালের মন তিনি বুঝতে পারবেন না।

মাসীমা ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললেন।

'মনু চলে এসেছে, জানো বোধ হয়।'

মাথা নামিয়ে সাবিত্রী বললে, 'জানি।'

'কিছু বুঝতে পারছি না। কী নিয়ে এ-রকম হ'ল? আমি স্বরাজকে চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম। তাতে বললে, তুমি যদি ওদের চিঠি দাও তাহলে এক্ষুণি আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো বেরিয়ে যাব, আর কোনদিন আমার খোঁজও পাবে না। জানো তুমি, কী হয়েছে?'

সাবিত্রী দ্বিধা করল। প্রবীরের মুখে যেটুকু শুনেছে, তা কি বলা যায়? বলা উচিত, স্বরাজদা আর কোনো রাজ-নীতিতে বিশ্বাস করে না, আর সুজাতা রাজনীতি বাদ দিয়ে জীবনটাকে ভাবতে পারছে না? ওদের বিয়ের আসল মন্ত্রটাই ব্যর্থ হতে চলেছে?

আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল সাবিত্রী। না—সে কিছুই জানে না।

'ওর বাবা তো রাতদিন তার ডাক্তারী নিয়ে আছে। বলে, কিছু না, একটু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে, দু'দিন পরেই সব মিটে যাবে। এ-রকম হয়।'

'আমারও তাই মনে হয় মাসীমা।'

মাসীমা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। তাহলে নীলুকে সঙ্গে করে আনল না কেন? কোনোদিন তো তাকে ফেলে আসে না। তা ছাড়া—'

নিঃশব্দ কৌতূহলে চেয়ে রইল সাবিত্রী।

'জানো—' মাসীমা শিউরে উঠলেন: 'জানো, ওর সিঁথিতে এবার সিঁদুর নেই।'

শিউরে উঠল সাবিত্রীও, অনেকদূর পর্যন্ত শিকড় ছড়িয়েছে তাহলে। জোর করে হাসল একটু।

'ওরা ও-সব মানে না মাসীমা।'

'জানি। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বরাবর তো ও সিঁদুর পরত। আমার ভারী খারাপ লাগছে সাবিত্রী। ঠিক কথা, স্বরাজের সঙ্গে ওর বিয়েতে আমা-দের মত ছিল না—মেয়েটা দুরন্ত, ছেলেও জেলখাটা। কিন্তু বিয়ের পরে স্বরাজের দায়িত্ব এসে গিয়েছিল, চাকরি-বাকরি করত, দেখেছি অপাত্র নয়। আর বেয়াই মশাই তো শিবতুল্য লোক। কেন যে এতদিন পরে—'

মাসীমা থেমে গেলেন। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ।

ডাকলেন, 'মনু!'

'আইতাছি মা কাপড় ছাইড়্যা।'

মাসীমা স্বর নামালেন: 'সেই অসুখের পর থেকে মেয়েটার শরীর বলে আর কিছু নেই—কিন্তু এখানে এসে আবার সেই সব পাগলামি আরম্ভ করেছে। পার্টি অফিসে যায়, আবার সব দলের ছেলেমেয়েরা আসে, তর্ক করে, চেঁচামেচি করে। অথচ আমরা ভেবে-ছিলুম, ও-সব ও ছেড়ে দিয়েছে।'

এতদিনের নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্ত তাহলে দ্বিগুণভাবে শুরু করে দিয়েছে সুজাতা!

'ওর বাবা বলছিল, শরীরে একেবারে হিমোগ্লোবিন নেই, যত্ন দরকার, বিশ্রাম দরকার। সে বিশ্রামের এই নমুনা? এ যে কী পাগলামি ওর আরম্ভ হয়েছে—'

এবার পায়ের শব্দ ঘরের দরজায়। তৎক্ষণাৎ থেমে গেলেন সুজাতার মা। তারপর গলার স্বর বদলে ডাকলেন, 'মনু—দ্যাখ্—কেডা আসছে।'

'কে?'

দরজায় পা দিয়ে সুজাতা থমকালো। ঘরে আলো জ্বলবার সময় নয়, অথচ বাইরের ছায়া এসে সব আচ্ছন্ন আর আবিষ্ট করে ধরছে। সেই ছায়াসঞ্চারে সুজাতা সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রীকে চিনতে পারল না। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে, বার কয়েক চোখ কুঁচকে, তারপর খুশিতে আর বিস্ময়ে বলে উঠল: 'সাবিত্রী!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'তুই এতদিন পরে? আকাশ থেকে পড়লি নাকি?'

'আকাশ থেকে পড়ব কেন? বাসে চেপে সোজা চলে এসেছি।'

সুজাতা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল সাবিত্রীকে। এইমাত্র স্নান করে এসেছে, একটা শীতল শীর্ণ শরীরের ছোঁয়ায় সাবিত্রী যেন কেঁপে উঠল একবার।

'যাক—তাহলে মনে পড়েছে আমাকে!'—উল্লসিত গলায় সুজাতা বললে, 'মা, হেনাদিরে এট্টু চা দিতে কও আমাগো।'

হেনাদি বাড়ির পুরনো কাজের লোক। মা মোড়া ছেড়ে উঠে বললেন, 'হেনা ক্যান, আমিই যাইত্যাছি। খালি চা দিমু, নাকি খাইয়াটারে?'

মা বেরিয়ে গেলে সাবিত্রীর দিকে তাকালো সুজাতা। ঘরের আবছায়া আলোতেও সাবিত্রী টের পেলো, তাকে দেখে খুশি হওয়ার আনন্দটা হঠাৎ মিলিয়ে আসছে সুজাতার, তার চোয়াল-ওঠা মুখটা শক্ত হয়ে আসছে একটু একটু করে।

[ক্রমশঃ]

অঙ্গার

হরপ্রসাদ মিত্র

কালের অঙ্গার এই তুমি আমি গ্রাম-গঞ্জময়
বেঁচে আছি রাত্রিদিন,
—মৃত্যুর শিকার যতো মুখ।
কোথাও গাঢ়তা নেই। ফটকে ফটকে অবসাদ
আর মারীভয়।
উপমন্যু, রুরু, দ্রোণ, দ্রুপদ, অর্জুন—কেউ নেই।
চালের চোরাই কিংবা মদের বেসাতি, যাই হোক—
রূপান্তর প্রতিরোধহীন।

সমস্ত জীবন ক্রমে ছাইয়ে আর আগুনে জড়িয়ে
কী যে অন্যরূপ হয়।
দাঙ্গাই জীবিকা,—এই
জীবিকাই সম্পূর্ণ জীবন।
ঘাসের জঙ্গল থেকে প্রতিটি ঘাসের শীষ খুঁটে
মনে হয় বলি শোনো—একলব্য গভীর শপথে
অরণ্যে শরণ্যে স্থির ঈষিকাকে ধ্রুব লক্ষ্যভেদে
করেন নিপুণ।
তুমি ধর্মে সহজিয়া,—এ তোমার পরিবেশগুণ।

বীজে আর পরিবেশে অব্যাহত এই প্রচুরতা
কালের অঙ্গার।
পুকুর, বাগান, বাড়ি, ইস্কুল, মন্দির—সবই আছে।
কাঁচা রাস্তা বাড়ে কলোনিতে।
তবু শান্তি নেই।
মৃত্যুর শিকার যতো মুখ।

এক পাগল হাসছে

বেণু দত্তরায়

রক্তে নেশাবিষ—এক অস্থির পাগল
মন্ত্র জপ করছে
অহর্নিশ
রক্তে এক উন্মাদ পাগল
অট্টহাসি হাসছে, গলির মোড়ে
এক যুবতী
ছুটে পালাচ্ছে
মাতালদের হাত থেকে দ্রুত এবং উত্তেজিত,
অস্থির এবং ত্রাস, ...

সূর্য
আগুন ঢালছে, মধ্যদিন
রাস্তার পীচ গলছে, সর্বনাশ
এখন সর্বনাশ—পালিয়ে যেতে হয়
এক অস্থির পাগল বেহেড্ পাগল
মন্ত্র জপ করছে
রক্তলাল চোখ......
বদ্ধ পাগল অট্টহাসি হাসছে!

মধ্যদিন গলির মোড়
কেঁপে কেঁপে উঠছে
হাসিতে
অট্টহাসিতে!
আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে!

কলকাতার কালরাত্রিগুলি

ঠিক যখন রাতের 'বিবিধ ভারতী'তে সতর্কীকরণ ঘোষণা, 'নিরোধ ব্যবহার করুন', তখন কিন্তু জনসংখ্যার চাপে চ্যাপসা শহরের বাস থাকে হাল্কা। ধাক্কার বহর অপেক্ষাকৃত কম। তবে মাঝে-মধ্যে দু-একটি অর্ধচান্দ্রীয় গলাধাক্কার ঘটনা অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। ফুটবোর্ড থেকে কোথাও কোথাও দু-একজন গন্ধরাজ যাত্রীকে জবরদস্তি নামিয়ে দিতে হয়। নাছোড় যাত্রী হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে জড়িত কণ্ঠে আপত্তি জানায়। বাসসুদ্ধ দাবি ওঠেঃ নামিয়ে দিন মশায় গলাধাক্কা দিয়ে। মাতলামো করাব আর জায়গা পায় নি!

বস্তুত বাসযাত্রীদের আপত্তি অযৌক্তিক নয়। একে তো দিনান্তের ঘর্মাক্ত দেহ গাড়ির অভ্যন্তরভাগ গন্ধবিধুর সমীরণে সমাকীর্ণ করে রাখে, তার ওপর রাত-কা-সুলতান কশ্চিৎ ব্যক্তিবিশেষ গন্ধাপ্রয়াব দৃষ্টি করলে কার না সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়! অথচ গন্ধরাজও তখন হাত-পা ছুড়ে তার লম্বা লেকচার শুরু করে। দাবি করে মদ্যপানের গণতান্ত্রিক অধিকার। যা অনস্বীকার্য। কারণ যদ্যপি কলকাতার সর্বত্র সুরাপানীয়ের আইনত ব্যবসায় চালু আছে এবং যেহেতু 'স্মোকিং প্রোহিবিটেড'-এর মতো মদ্যপায়ীদের সম্বন্ধে কোনও লেবেল আঁটা নেই, সে কারণ প্রকৃত কোনও টিকিটধারী মদ্যপ যাত্রীকে অর্ধচন্দ্র প্রয়োগ করা আইনানুগ নয়। অতএব এটা গণতান্ত্রিক অধিকারের আর্ষ-প্রয়োগ বলে মেনে নিতে হয়। অধিকাংশের এবং সুনাগরিকের আপত্তিতে অর্ধচান্দ্রীয় অভ্যর্থনা ও 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' ব্যবস্থা সচল। অন্তত কোনও রাত-কা-সুলতান দিনমানে কোর্টে গিয়ে বাস কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করে আসতে পারবেন না। তবে নালিশ হ'লে চালকের পেছনে পার্টিশনের ওপর আর একটি লেবেল আঁটতেই হবে, বড় বড় 'বারে'র দরজায় সম্ভবত অমদ্যপদের উদ্দেশে যেমন সতর্কবাণী থাকে: রাইটস্ অব এ্যাডমিশন রিজার্ভড। মদ্যপায়ীদের লক্ষ্য করেও ট্রামে-বাসে এমন প্লাস্টিকবাণী অংকিত থাকতে পারে। তবে তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। রাত-কা-সুলতানরা বাদশাহী মেজাজ গরম করার আগেই নিজের টলন্ত প্রতিরোধের উত্তেজনায় নিজেরাই হস্তপদ বিক্ষেপণের ফলে পপাত ধরণীতলে। এর পর মহারাজ নিরুপদ্রব নর্দমাশয্যায় কর্দমবমন-সিক্ত নির্বিঘ্ন বিশ্রাম গ্রহণ করেন।

সেকালে বেহেড মাতালের পায়ে 'তুড়ুন' ঠোকার রেওয়াজ ছিল ফরাসী চন্দননগরে। একালে এ শহরেও ব্যাপারটা চালু হ'লে শহুরে কালরাত্রির কৃপা থেকে অনেক নিরীহ ঘরণী হয়ত অব্যাহতি পান। অনেক বাদশাহী মেজাজের মাতাল নাগরিক যখন স্ব স্ব গলিপথে আপন গৃহদ্বারে এসে তাঁর নড়বড়ে বায়ুবাহিত শরীরটিকে খাড়া করিয়ে দেন, তখন নিশিজাগরণক্লান্ত অসহায়া ঘরণীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়। পড়শি-গৃহে নিষিদ্ধ রাতের মাধুর্য। বাদশাহের কুটীরে একমাত্র বাঁদি [illegible]র অপেক্ষায়। কেউ তার পাশে [illegible] দাঁড়াবার নেই। [illegible] প্রহৃত অপরের [illegible] ঘৃণা এবং জ্বালার [illegible]। [illegible] অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ [illegible] ফিরে অতিরিক্ত অধিকার দাবি করে। কোথাও বা নষ্টামি সীমাতিক্রান্ত। আর এতো কোর্ট-কাছারী যে নগরে সেখানেও দুর্বল নারীর নেই কোনো কোর্ট অব আপীল। কেন না, স্ত্রী পরিজনের অত্যাচারিত না হওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার এখনও আদালতী গড়িমসি আর উকিলী সওয়ালের ঘোর-প্যাঁচে নিমজ্জিত। মধ্যযুগীয় সামাজিক সংস্কার আজও স্বামী নামক (এমন কি দুষ্ক্রিয়াসক্ত) দেবতাটিকেও প্রায় ইংলণ্ডের ক্রাউন-হেন মর্যাদায় সম্রাট বানিয়েছে। ওদেশে যেমন ক্রাউন সব ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে, অনুরূপে এদেশে 'দি হাজব্যান্ড ক্যান ডু নো রং'!

সুতরাং নিখুঁত ক্ষুদে লাটসাহেব তাঁর রাতের 'স্যাডিজম' চরিতার্থ করে গৃহিণীবাহিত ভোরের চায়ে যথারীতি সগর্বে চুমুক দিয়ে থাকেন। অতঃপর পোষ্যকুলের নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য কিছুক্ষণ প্রচণ্ড গৃহস্বামিসুলভ কর্তব্য পালনকরত সান্ধ্য-বাদশাহী তখ্তের খাজনা সংগ্রহের জন্য কর্মচঞ্চল শহরের জনারণ্যে খাঁটি নির্ভেজ নাগরিকের মতো মিশে যান। সেই একই ট্র্যাডিশন চলেছে যুগ যুগ ধরে। সুতানুটি গোবিন্দপুরের গঞ্জিকাসেবী মদ্যপ দুশ্চরিত্ররা কলকাতা কর্পোরেশনের শাওয়ারে গা ধুচ্ছেন অম্লানবদনে। শহরের কালরাত্রি ভোর হয় নি।

* * * *

কিন্তু কোন্ কথা থেকে কোন্ কথায়। ভয়ঙ্কর কালরাত্রির আসল চিত্রে এখনো পেনসিলের দাগই পড়ল না, কলম খোঁচা দিয়ে গেল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সমস্যার বুকে।

ঘটনাটি সে রাত্রে আমাকে কিন্তু প্রথমে মদ্যপ সমস্যার ওপরেই ভাবিত করে। তাই কলম ধরতে একই মানসিকতা ক্রিয়া করে গেছে। মূল বিষয় পশ্চাতে বিবেচ্য হয়েছে সে কারণেই। মূলেই অবরোহণ করা যাক অতঃপর।

রাতের বাসে একটু সতর্ক হয়েই চলাফেরার অভ্যাস রপ্ত করতে হয়েছে উল্লিখিত কারণে। সহযাত্রীটিকে সে রাত্রে তাই তীক্ষ্ণ চোখে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করতে হ'ল। পাশে বসামাত্র সহযাত্রীটি বিনা ভূমিকায় বললেঃ ফ্র্যাঙ্ক রয়েসের দোর এখন খোলা পাওয়া যাবে? নাম শুনেছি, রোলস্ রয়েস। ইদানীং ও নামের গাড়ি কেন, একচেটিয়া দেশী কোম্পানীর কল্যাণে অন্যতর গাড়িও দুর্লভ। কিন্তু

এক এক সময় কোন একটা পংক্তি

[illegible]

এক এক সময় কোন একটা পংক্তি
কোন একটা উক্তি
কোন একটা কথা
কুমারীর স্বপ্নের শিশুর মতো
বুকের মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে
নীরবে প্রতীক্ষা করে
অস্থি-মজ্জাময় কোন আলিঙ্গনে
গভীর ইচ্ছের ফুল
কবে হবে উন্মুখ মুকুল
রক্তের ভিতরে।

এক এক সময় এক একটা গান
কোন একটা সুর
কোন একটা লয়
অতলে তলানো কোন স্মৃতি-গন্ধময়
তুলে আনে একটি উপলা
কোন একটা শব্দ
কোন একটা ছন্দ
কোন একটা রঙ
পুরাতন এলবামের বন্ধ-করা দরোজার
খোলে অর্গল।

এক এক সময় কোন একটা পাখী
কোন একটা পাতা
কোন একটা কুঁড়ি
দৃষ্টির সমুদ্রে যেন ভেসে-ওঠা আকস্মিক একটি ঝিনুক
তেমনই ইঙ্গিতবহ সাবধানে মুঠি ভরে রাখি
তারই শুক্তি দিয়ে যত্ন করে গড়তে একাকী
নিভৃতে মুকুট কোন কবিতার
কুড়োতে শব্দের সোনা বার বার
সখনি এ জেনানীতে
ছেয়ে দিই
হৃদয়ের খনি এই বুক।

ফ্র্যাংক রয়েসটা আবার কী বস্তু? সহযাত্রীটি প্রকৃতিস্থ তো? ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণতর করে পার্শ্বস্থ ব্যক্তির পরিমাপের চেষ্টা করলাম। কিন্তু বোধ হল, ব্যাপারটা নির্দোষ। যদিও তার পোষাক অবিন্যস্ত। খোড়ে জল হওয়ায় চতুশ্চক্রযানের কৃপায় স্থানবিশেষ কর্দমাক্তও বটে। তবু পাকস্থলী-উত্তেজক পদার্থসেবী বলে মনে হল না তাকে। সহযাত্রী এক টুকরো কাগজ এগিয়ে ধরে বিমর্ষ ক্ষোভের সঙ্গে বলল: ইনজেকশনটা কোথাও পাচ্ছি না। শ্যামবাজার থেকে লেনিন সরণীর বাঁক পর্যন্ত প্রত্যেকটা দোকান লক্ষ্য করে আসছি। কী করি বলুন তো? রাতের রোগীর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই! কী শহর!—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল যুবকটি: আমার বাবা হাসপাতালে। আমি বেকার, জানেন!

এতক্ষণে বুঝলাম। তার্কিক রসের নয়, এটা আতঙ্ক রস—ডাক্তারখানা হবে। সিনেমাকে হাসপাতালের সঙ্গে আজকের কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ চষে বেড়াচ্ছে একটি অসহায় নাগরিক। হাসপাতালের এমারজেন্সিতে ইনজেকশন নেই। অথচ রাতের রোগীরা করবে কি? অসুখ-বিসুখ এমনিতেই রাত্রে ভয়ঙ্কর। বাবা গেলে বেকার যুবক আর তার পরিবার করবে কি!

মনে মনে দ্রুত সব কটি পরিচিত ড্রাগিস্ট-কেমিস্টকে স্মরণে আনলাম। কিন্তু কৈ? কিছুদিন আগে ট্যাক্সি নিয়ে সামান্য একটা ট্যাবলেট খুঁজেই হতাশ হয়েছি। 'ফ্র্যাংক রস' চৌরঙ্গীতে রাত দশটা, পার্ক স্ট্রীটে আটটায় বন্ধ। 'দে'জ মেডিক্যাল'ও খোলা পাই নি। লিন্ডসে সমবায়িকার উল্টো দিকে খোলা ডাক্তারখানা পেয়েছিলাম, ওষুধ পাই নি প্রয়োজনীয়। পার্ক স্ট্রীটের সাহিব সিং সারা রাত খোলা থাকে বটে। কিন্তু প্রয়োজনীয় ইনজেকশন মিলবে কি? রাত কলকাতার ডাক্তারখানা প্রায় নেই-ই। দু'-একটার ওপর ভরসা কি? আর উত্তর থেকে দক্ষিণে যদি মাইল ছয়েকের ব্যবধানে দু-একটি থাকে তো শেষ মুহূর্তের ওষুধ রোগীর ভাগ্যে জুটবে কেমন করে! যুবকটিকে জানিত কয়েকটির হদিশ দিলাম। ঠিক এই সময় সামনের আসন থেকে এক ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন: এই বাস রোকো! যান দাদা নেমেই ছুটে যান। চাঁদনীর ঐ দোকানটায় সবে তালা পড়ছে, ওখানে না পেলে একটা গাড়ি নিয়ে......

বাস এমারজেন্সির তোয়াক্কা করে না। দাঁড়াল না। উদ্ভ্রান্ত যুবকটি লাফ মারল বাস থেকে।

ফুটবোর্ড থেকে শঙ্কিত কণ্ঠস্বর: গেল, গেল!

যুবকটি পড়ে গেছে। বাস ছুটছে।

জানি না, আমার সহযাত্রী ওষুধ পেয়েছিলেন কি না। বিরক্ত দু'-একজন সক্রোধে চালকের উদ্দেশে কটু মন্তব্য করেছেন। চালক নির্বিকার। আমি বাড়ি ফিরেছি নির্বিঘ্নে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে নি। শহরবাসের সুখে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখেছি শুধু।

॥ দশ ॥

নির্লজ্জতা বুর্জোয়া রাজনীতির প্রথম ও প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের, যে-কোনও বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল এই নির্লজ্জতাকে তার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার এবং অন্যতম রক্ষাকবচ বলে মনে করে। যে যত বেশী নির্লজ্জ, সে ঠিক সেই পরিমাণে সুবিধাবাদী, স্বার্থপর এবং নোংরা হতে পারে। নির্লজ্জতা তাকে যাবতীয় সমাজবিরোধী, গণ-বিরোধী কাজে প্রেরণা দেয় এবং এই নির্লজ্জতার প্রভাবেই তার কাছে সত্য ও মিথ্যার কোনও মূল্যভেদ থাকে না। পাকিস্তানের কনভেনশন মুসলিম লীগ সম্পর্কে ঠিক এই একই মন্তব্য করা যেতে পারে। কনভেনশন লীগ নেতাদের কলঙ্কিত ইতিহাসের যে বিবরণ এই পর্যন্ত আমার চিঠিতে দিয়েছি, তা থেকে তাদের নির্লজ্জতার সুস্পষ্ট প্রমাণ আপনারা নিশ্চয় পেয়েছেন। যারা আয়ুবের পতাকা-তলে দাঁড়িয়ে "বুনিয়াদী গণতন্ত্রে"র পিরামিড তৈরি করেছে, কিংবা বলা যেতে পারে যে, লক্ষ লক্ষ আওয়ামের জন্য গণ-তান্ত্রিক স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়েছে, যারা ডিকেডী রাজত্বের এগার বছরে অগ্রগতির খুঁটিনাটি হিসাব দেখিয়ে, চুলচেরা বিচার করে পাকিস্তানকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রগামী দেশ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তারাই আবার বছরের পর বছর পরম কর্তব্যপরায়ণ বি, ডি সেজে "ওয়ার্কস প্রোগ্রামে"র টাকা চুরি করে লাল হয়ে গেছে। পাড়ার কুখ্যাত গুন্ডা রাতারাতি পরিণত হয়েছে লক্ষপতি বণিকে, নেহাৎই হা-ঘরে মেছো বা রিক্সাওয়ালা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে উঠে গেছে প্রতি-পত্তির শিখরে, যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে। আর যারা এই প্রদীপের আলো দেখেনি, তারা অর্থাৎ কোটি কোটি চাষী, শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষ অনাহারে, অভাবে আধ-বাঁকা মেরুদন্ড নিয়ে আরও নুয়ে পড়েছে। আয়ুবশাহীর এগার বছরে কনভেনশনিস্টদের এই প্রকাশ্য লুণ্ঠনাভিযানের মূল প্রেরণা ছিল তাদের নির্লজ্জতা। এই নির্লজ্জতা ছিল বলেই তারা অক্টোপাশের মত দেশকে শোষণ করে "আওয়াম", "আজাদী", "গণতন্ত্র" ইত্যাদি অর্থহীন গালভরা বুলি শুনিয়ে জনগণকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। আর এই নির্লজ্জতা আছে বলেই তারা নোংরা হাতে তোবড়ানো বাটি নিয়ে আবার ভোট ভিক্ষা করছে। অন্যান্য যে-কোনও রাজনৈতিক দলের মত কনভেনশনিস্টদেরও উদ্দেশ্য দেশসেবা নয়, কায়েমী-স্বার্থসেবা।

কিন্তু এই কথা খুব জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানের মানুষ, বিশেষ করে যারা পূর্ব পাকিস্তানের, তারা কনভেনশনিস্ট-দের পক্ষে রায় দেবে না। যাদের পক্ষে তারা রায় দেবে, তারাও যে খুব সৎ এবং অপাপবিদ্ধ, সে কথা আমি বলছি না, কেন না তারাও ঘষা-পয়সার উল্টো পিঠ। তবে তাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের মানুষের এখনও একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং মোহ আছে এবং এই ভ্রান্ত ধারণা এবং মোহের অবসানের জন্য এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় বাস করে, বুর্জোয়া-চিন্তা ও চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে দেশের মানুষ এখনও কেবল-মাত্র নির্বাচনকেই একমাত্র অবলম্বন মনে করছে। নির্বাচনের অন্তঃসারশূন্য চেহারাটা তাদের সামনে স্পষ্ট না হলে বা নির্বাচিত বুর্জোয়াদের নগ্ন স্বার্থপরতা সুপ্রমাণিত না হলে তাদের মোহ ভঙ্গ হবে না। যাই হোক, কনভেনশন লীগের অবস্থা যে এইবার খুবই শোচনীয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফকা চৌধুরী (ফজলুল কাদের চৌধুরী), সবুর খাঁ প্রমুখরা যতই কায়দা করুক না কেন, তাদের দলের ভরা-ডুবি হবেই। কনভেনশনিস্টদের যাবতীয় কুকীর্তির পূর্ণ বিবরণ দিতে হলে যে বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন ছিল, আমার চিঠিগুলিতে তার একান্তই অভাব। প্রথমত রচনাগুলি মূলতঃই চিঠি এবং সেই হেতু সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়ত এতদূর থেকে পাঠানর অসুবিধাও যথেষ্ট। তা হলেও প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে আয়ুবের এই অক্ষয় কীর্তিটি সম্পর্কে আরও কিছু লিখলাম। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে কনভেনশন লীগের ব্যর্থতার [illegible] চাইবেন, তাঁদের সুবিধা হবে।

যে আঞ্চলিক বৈষম্য পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের জনগণের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলেছে, পারস্পরিক ঈর্ষা, ঘৃণা, অবিশ্বাস ও বিরোধের জন্ম দিয়েছে, মহামান্য আয়ুব খাঁ এবং তাঁর পেয়ারের কনভেনশন লীগ তাদের এগার বছরের শাহী জমানায় সেই আঞ্চলিক বৈষম্যকে আরও বিস্তৃত করেছে। আয়ুব খাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল (সম্ভবত "মিলিটারী ম্যান"দের এই সব থাকে), তিনি কারণে-অকারণে দেশের মানুষকে বোঝাতে চাইতেন যে, তাঁর মধ্যে বিশেষ মারপ্যাঁচ নেই এবং তিনি দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের হিতার্থে তিনি যেসব কাজ করেছেন, তার মধ্যে ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যেমন ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের ১৪৫(৮) ধারায় বলা হয়েছিল যে, প্রতি বৎসর জাতীয় পরিষদে অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ঐ রিপোর্টে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ সুফল পাওয়া গেছে, এইসব তথ্য পরিষ্কার করে তুলে ধরা হবে। অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখার প্রয়োজন আছে। এই রিপোর্ট আয়ুব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করতে চান নি। গত উনিশ শ' বাষট্টি সালে যখন সারা পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত মানুষ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, তখন আয়ুব খাঁ তাড়াহুড়ো করে এই ধরনের রিপোর্ট পেশ করার কথা ঘোষণা করেন। যাই হোক, জাতীয় পরিষদে পরিবেশিত বৈষম্য-মূলক রিপোর্টগুলি থেকে দেখা গেছে যে, আয়ুবের আমলে বৈষম্য কমা তো দূরের কথা, ক্রমশ বেড়েছে। উনিশ শ' সাতষট্টি-আটষট্টি সালে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, সারা পাকিস্তানের মোট জাতীয় উৎপাদন ৮·৩ হারে বেড়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বেড়েছে ৮·৬ হারে। আয়ুবের পেটোয়া কাগজগুলি অর্থাৎ ডন, পাকি-স্তান টাইমস, মর্নিং নিউজ ইত্যাদি ঘটা করে আঞ্চলিক বৈষম্যের ক্রমোবিলুপ্তি ঘোষণা করল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা যে কি, তা খুব তাড়াতাড়ি টের পাওয়া গেল। ঠিক পরের বছর অর্থনৈতিক জরিপের (ইকনমিক সার্ভে) ফলে জানা গেল যে, সাতষট্টি-আটষট্টি সালে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন বেড়েছে ৭·৮ হারে। অর্থাৎ এই প্রদেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার জাতীয় বৃদ্ধির হারকে এক বছরের জন্যও ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। ফলে বৈষম্য হ্রাসের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আটষট্টি-উনসত্তর সালে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন নানা কারণে

ব্যাহত হয়। [illegible] করা হয়েছিল যে, উৎপাদনের হার স্থায় না থাকলেও [illegible] না, কিন্তু [illegible] যা ঘটল, তা সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। কেন না, এই বছর মোট জাতীয় উৎপাদনের হার কমে দাঁড়াল ৫·২ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ২·১। জাতীয় উৎপাদনের হার যে গতিতে নেমে গেল, পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদনের হার ঠিক সেই গতিতে এবং অনুপাতে নামলেও ব্যাপারটা বোধগম্য হতে পারত। কিন্তু ৭·৮ থেকে একেবারে ২·১-এ পতন হওয়ায় স্পষ্টই বোঝা গেল, আয়ুবের সর্ষেয় ভূত ঢুকেছে। উনিশ শ' সাতষট্টি-আটষট্টি সালে সারা পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল চার শ' দুই টাকা, [illegible] বছর [illegible] বেড়ে দাঁড়ালো চার শ' আট টাকা। অথচ এই দুই বছরে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় তিন শ' চার থেকে তিন শ' আট টাকায় নেমে গেল। নিচে সারা পাকিস্তান এবং পূর্বাঞ্চলের বাৎসরিক মাথাপিছু আয়ের একটি হিসাব দিলাম। হিসাবটি পরীক্ষা করে দেখতে পাবেন যে, গত সাত-আট বছরে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় একরকম বাড়েই নি।

মাথাপিছু আয়

	পাকিস্তান		পূর্ব-পাকিস্তান	
১৯৫৯-৬০	৩১৮ (টাঃ)	---	২৬৯ (টাঃ)	
১৯৬০-৬১	৩২৬	” ---	২৭৭	”
১৯৬১-৬২	৩৩৭	” ---	২৮৬	”
১৯৬২-৬৩	৩৪০	” ---	২৭৭	”
১৯৬৩-৬৪	৩৫৯	” ---	২৯৯	”
১৯৬৪-৬৫	৩৬৫	” ---	২৯৪	”
১৯৬৫-৬৬	৩৭২	” ---	২৯৬	”
১৯৬৬-৬৭	৩৮১	” ---	২৯১	”
১৯৬৭-৬৮	৪০২	” ---	৩০৪	”
১৯৬৮-৬৯	৪০৮	” ---	৩০৩	”

একই সঙ্গে দুই প্রদেশের মাথাপিছু আয় এবং বৈষম্যের একটি হিসাব দিলাম।

মাথাপিছু আয় (টাকায়)

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য
১৯৫৯-৬০	২১৫	৩৫৩	৬৪%
১৯৬৪-৬৫	২৩১	৪১৬	৮০%
১৯৬৮-৬৯	২৪০	৪৬৯	৯৫·৫%

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রদেশের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও অনেক বেশি। দুই প্রদেশে টাকার ক্রয়-ক্ষমতার যথেষ্ট তারতম্য থাকার দরুণ এই বৈষম্য আরও ১২% বেশি [illegible] [illegible] সময় কেন্দ্রীয় [illegible] [illegible] ইত্যাদি যদি হিসাব করা যায়, তবে এই বৈষম্য আরও ২·৫% বেশি হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদনকে গুরুত্ব দেখিয়েছে। উদ্দেশ্য পূর্ব পাকিস্তানকে বাজেটের বরাদ্দ থেকে ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু আসলে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিজাত ফলন না বেড়ে ক্রমশই কমেছে, ফলে বৈষম্যের পরিমাণ আরও ৬·৫% হারে বেড়ে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপেই ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্যের সুতীব্র জ্বালা অনুভব করছে। পূর্বাঞ্চলের কনভেনশন লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অভিযোগ এই যে, তারা বাঙালী হয়েও বাংলার সর্বনাশ করেছে। ব্যক্তিগত সুখ ও সম্পদের লোভে তারা উজবুকের মত খাল কেটে ঘরের দুয়ারে কুমীর এনেছে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে পাকাপোক্তভাবে পশ্চিমাদের জন্য উপনিবেশ বানিয়েছে। মাথাপিছু আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—সাধারণ মানুষের পক্ষে অপরিহার্য এই তিন বিষয়ের মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে যে বৈষম্য গড়ে উঠেছে, তার খানিকটা আভাষ আপনারা পেয়েছেন। এইবার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্পর্কে কিছু লিখছি।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ডিকেডী আমলে পূর্ব পাকিস্তানে কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ হয় নি। যা হয়েছে, তা নেহাৎই লোকদেখানো, অর্থাৎ টেলিভিশন এবং রেডিওযোগে বিদেশী সাংবাদিক ও সরকারী প্রতিনিধিদের ধাপ্পা দেওয়ার সুপরিকল্পিত প্রয়াস। এই বিষয়ে আর বেশি কথা না বলে কয়েকটি ফিগার তুলে দিচ্ছি। আশা করি, এইগুলি পরীক্ষা করে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, তা আপনারা বুঝতে পারবেন।

ডিসপেন্সারীর সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিঃ
১৯৫৮	৩০৪	১,১১২
১৯৫৯	৩১২	১,১৫৫
১৯৬০	৩২৪	১,১৯৫
১৯৬১	৩৬০	১,২৫১
১৯৬২	৩৬০	১,৩৭৪
১৯৬৩	৩৯৬	১,৫১৪
১৯৬৪	৩৯৭	১,৬২৬
১৯৬৫	৪৮৮	১,৬৯৫
১৯৬৬	৪৮৯	১,৭৫৪

হাসপাতালের সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিঃ
১৯৫৮	৭১	৩৩৮
১৯৫৯	৭১	৩৩৮
১৯৬০	৭১	৩৪৩
১৯৬১	৭১	৩৪৫
১৯৬২	৭১	৩৬৫
১৯৬৩	৭২	৩৬৯
১৯৬৪	৭২	৩৬৮
১৯৬৫	৭৬	৩৮৩
১৯৬৬	৭৬	৩৯৩

হাসপাতালের শয্যার সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিঃ
১৯৫৫	৩;৯০২	১৯,১৯৭
১৯৬০	৪,৯৭৮	২২,১০০
১৯৬৬	৬,৯৮৪	২৬,২০০

সরকারীভাবে স্বীকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮	৪,৫৮০	৫,০৩৪
১৯৬০	৫,৪৯২	৬,১৩২
১৯৬২	৬,১৪৯	৭,৫৪৩
১৯৬৪	৬,৬০৮	৯,০৬১
১৯৬৬	৬,৯৮৯	১০,৪৮৮

পাকিস্তানের মত **অনুন্নত দেশে প্রাথমিক** শিক্ষার দ্রুত প্রসার **একান্তই** প্রয়োজনীয়। আয়ুব সাহাব তাঁর ডিকেডী আমলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমোবিস্তৃতি হচ্ছে বলে নানা রকম বিজ্ঞাপন ছেড়েছিলেন এবং বিভিন্ন জনসভায় তাঁকে এবং তাঁর তাঁবেদার গোষ্ঠীকে প্রায়ই এই ব্যাপারে গলাবাজী করতে দেখা যেত, কিন্তু তাঁরা যাই বলে থাকুন না কেন, তাঁদের তত্ত্বাবধানে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। যেখানে ঊনিশ শ' ঊনষাট সালে পাকিস্তানে পাঁচ কোটি নিরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার লোক নিরক্ষর ছিল, সেখানে দশ বছর বাদে অর্থাৎ আয়ুবের পতনের সন্ধিক্ষণে এই সংখ্যা বেড়ে হয় সাত কোটি তিরানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার। গত গণ-আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা ও গ্রামে কাজ করতে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা যথার্থই স্মরণীয়। যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি নড়বড়ে খুঁটি আর পচা খড়ের জরাজীর্ণ কতকগুলি কুঁড়েঘর। ভাঙাচোরা বেঞ্চি, হাতলবিহীন চেয়ার, রঙচটা, ফাটা ব্ল্যাকবোর্ড, আর অনাহারে, অযত্নে বেড়ে-ওঠা কিছু ছাত্র-ছাত্রী। এরই নাম পাঠশালা। খুব কম করেও শতকরা নব্বুইটি পাঠশালার এই একই অবস্থা। তাও যদি উভয় প্রদেশে এই ধরনের পাঠশালাই সমানানুপাতে গড়ে উঠত!

পাঠশালার সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পঃ পাকিস্তান
১৯৫৮-৫৯	২৬,৬৮৮	১৭,৫৩৬
১৯৫৯-৬০	২৬,৫৮৩	১৭,৯০১
১৯৬০-৬১	২৬,৬৬৫	২০,৯০৯
১৯৬১-৬২	২৭,৭৪৭	২৪,৯৩০
১৯৬২-৬৩	২৭,১৫৪	২৮,৩৩৮
১৯৬৩-৬৪	২৭,৫৬২	৩০,৯৫০
১৯৬৪-৬৫	২৭,৬৪৯	৩২,৫৮৩
১৯৬৫-৬৬	২৭,৭৩৬	৩৪,৩১৩

প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে, একজন সাধারণ ঘরামীর বাৎসরিক আয়ও তাঁদের থেকে বেশি। আমরা এমন পাঠশালা দেখেছি যার শিক্ষক মাস গেলে মাত্র দশ টাকা বেতন পেয়ে থাকেন! বলা বাহুল্য, এত অল্পবেতনে সন্তুষ্ট হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকতা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

নিচের ফিগারটি থেকে ঘরামী ও প্রাথমিক শিক্ষকদের আয়ের তারতম্য বুঝতে সুবিধা হবে৺

শ্রমিকের আয়	২৩০ দিনের মজুরি (টাকা)
প্রধান রাজমিস্ত্রী	১৯৫২,৭০
রাজমিস্ত্রী	১৪৫৮,২০
ছুতার	১৪৬৯,৭০
কর্মকার	১১৭০,৭০
যোগাড়ী	৮২৮,০০
কুলি	৬৯০,০০

প্রাথমিক শিক্ষকের এক বছরের আয়

ম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	১৩৫১,৪৪
ম্যাট্রিক প্রধান শিক্ষক	১১১১,৪৪
ম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক	১১১১,৪৪
ম্যাট্রিক সহকারী শিক্ষক	৮৭১,৪৪
ননম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক	৭৯১,১৪
সাধারণ শিক্ষক	৫৪০,০০

আয়ুবের আমল অর্থাৎ কনভেনশন লীগের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ঠিক এইভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

'সাপ্তাহিক বসুমতী' প্রসঙ্গে

আমরা আপনার সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' নিয়মিত পাঠক। নিরপেক্ষ, নির্ভীক, প্রগতিশীল, বলিষ্ঠ মতবাদের মুখপত্র বলিয়া আমরা এই পত্রিকার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু গত ২রা এপ্রিলের সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় 'রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হউক' আমাদের স্তম্ভিত করিল। ইহার পর আপনার পত্রিকার বিশেষণ হিসাবে আর যাহাই বলা যাউক না কেন, 'নিরপেক্ষ', 'প্রগতিশীল' বলা চলে না।

একথা আজ কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইবার নহে যে, আপনার এই শ্লোগানে কাহাদের সুর ধ্বনিত হইতেছে। যে বিশ্বাসঘাতকের দল পশ্চিম বাংলার মেহনতী জনগণের দীর্ঘ তিক্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের ফল তাহাদের প্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আইন-শৃংখলার দোহাই দিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির শাসনকে সসম্মানে আহ্বান জানাইয়াছে, বাংলার সংগ্রামী জনগণের ওপর পরোক্ষ কংগ্রেসী শাসন চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারাই আজ আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া রব তুলিতেছে রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হউক। আপনিও ইহাদের সহিত সুর মিলাইয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার জনগণের নিকট রাষ্ট্রপতির শাসন এই নতুন নহে। ইহার আগেও একবার তাহারা এই রাজত্বের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এইবারও ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় নন্দী-ভৃঙ্গী পুলিশ দল নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আর আপনারা রাষ্ট্রপতির শাসনের দীর্ঘমেয়াদ কামনা করিয়া এই অত্যাচারকেই দীর্ঘজীবী করিতে আহ্বান জানাইতেছেন। এই কথা হইতেই আপনাদের গায়ের 'নিরপেক্ষ' এবং প্রগতিশীলতার নামাবলী খসিয়া পড়িয়াছে এবং আসল রূপ প্রকাশিত হইতেছে।

মাননীয়া সম্পাদিকা, আপনার নিকট ও আপনার অনুগামী রাজনৈতিক দলগুলির নিকট আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথমত রাষ্ট্রপতির শাসনের কারণ হিসাবে আপনারা যে আইন-শৃংখলার অবনতির কথা বলেন, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, প্রায় চার মাস হইল পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হইয়াছে, কিন্তু আপনারা কি দেখাইতে পারেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃংখলার এতটুকু উন্নতি হইয়াছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল যে, রাজ্যের জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে রাজ্যপালের নন্দী-ভৃঙ্গী পুলিশের দল নিরীহ জনগণের ওপর যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে আপনারা চুপ কেন? নাকি এই জনগণের কান্না

আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াও করে না?
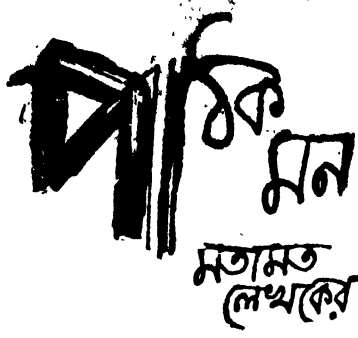
আপনাদের নিকট আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন, বর্তমানে নির্বাচন প্রসঙ্গে। আপনারা বর্তমানে নির্বাচনের বিরোধী—কারণ হিসাবে আপনারা বলেন, আগে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার পর নির্বাচন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইল যে, আপনারা তো মনে করেন, রাষ্ট্রপতি শাসন মানেই আইনের শাসন, তবে আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়া অবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন কোন যুক্তিতে? আইন-শৃংখলার অবনতির জন্য তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তাঁহার দল সি-পি-এমকে প্রধানত দায়ী করেন এবং নানাভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপনারা উষ্মা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে আপনাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন যে, যদি জ্যোতি বসু এবং তাঁহার দল প্রকৃতপক্ষেই রাজ্যের আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটাইয়া থাকিবে, আর আপনাদের কথামত তাঁহারা রাজ্যে বিভীষিকার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে, তবে বাংলার জনগণ নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে অবগত আছেন এবং এই হিসাবে তাঁহাদের সি-পি-এমকে বরদাস্ত করিবার কথা নহে, বরং ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিবার কথা। অতএব এইদিক দিয়া সি-পি-এম'এর ভয় হইবার কথা ও আপনাদের সাহস বাড়িবার কথা। কিন্তু কার্যত দেখিতেছি, সি-পি-এম-ই জনগণের সামনে বুক খুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, নির্বাচনের আহ্বান জানাইয়াছে এবং আপনারা নানা দোহাই দিয়া নির্বাচনে অগ্রসর হইতে ভয় পাইতেছেন। ইহাতে আমাদের কি মনে হইতে পারে? আপনারা জনগণকে বিশ্বাস করেন না? না-কি সবকিছু জানিয়াও ন্যাকা সাজিয়া দেউলিয়া রাজনীতির বুলি আওড়াইয়া জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছেন।

আশা করি, সম্পাদিকা মহাশয়া, দয়া করিয়া আমাদের এই প্রশ্ন কয়টির উত্তর দিবেন।

—শ্রীসমীর দত্ত, শ্রীসমর চক্রবর্তী, শ্রীস্বপন রায় ও শ্রীঅজিত ভাওয়াল, কাঁচরাপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া (চব্বিশ পরগনা।)

"সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ" প্রসঙ্গে

গত ২রা বৈশাখ, ১৩৭৭ সালের সাপ্তাহিক বসুমতীতে শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু "সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ" নামক রচনাটিতে পরলোকগত মহম্মদ আলী জিন্নার দ্বিতীয়া স্ত্রী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—"জিন্না কিন্তু সরোজিনীর কবিতায় নয়, শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছিলেন এক সুন্দরী পার্শী তরুণীর সৌন্দর্যে, মেয়েটিও এগিয়ে এসেছিলেন, কন্যার পিতামাতার অমত ছিল বলে পালিয়ে গিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন।"

এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। জনৈক সাংবাদিক 'বিক্রমাদিত্য' ছদ্মনামের আড়ালে "দেশে দেশে" নামে একটি বই লিখেছেন; বইটির প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। সম্ভবত ১৯৫৩ সালে এটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। যে সংস্করণ আমার কাছে আছে, তার বাইশ পৃষ্ঠায় জিন্নার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে। অংশ বিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

যেদিন জিন্নার দ্বিতীয়া স্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন জিন্না ছিলেন স্যার দীনশার বাড়ির অতিথি। স্যার দীনশা এই নবজাত শিশুকে জিন্নার কোলে তুলে দিয়ে বললেন, এর ভার নেবার অধিকার আমি তোমাকেই সর্বপ্রথম দিলাম। আঠারো বছর পরে জিন্না এই মেয়েটিকে বিয়ে করেন।"

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শংকরীবাবুর বক্তব্য অনুযায়ী পিতামাতার অমতের জন্য পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার কাহিনীটি সঠিক নয়। —কনক বসু, কলকাতা-১২।

লেখকের বক্তব্য

শ্রীকনক বসুর পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য—জিন্নার দ্বিতীয়া পত্নী বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছি, তা বলাই বাহুল্য আমার রচিত নয়। জিন্নার প্রামাণ্য জীবনী 'হেক্টর বলিথো'র 'জিন্না' গ্রন্থ থেকেই তা নেওয়া। পত্রলেখক যে বিক্রমাদিত্যের লেখা উদ্ধৃত করেছেন (কোন্ উৎস থেকে তা সংগৃহীত, জানি না, নিশ্চয় কোনো উৎস থেকেই সংগৃহীত), তা অবশ্যই ইন্টারেস্টিং। ওর থেকে এইটুকু বুঝেছি, কোনো শিশুকে জন্মের দিনে কোনো যুবকের কোলে তুলে দিয়ে ভার নেবার কথা বলার মানে তাকে বিয়ে করতে বলা।

[পূর্বানুবৃত্তি]

(৭)

সেদিনটা ছিল বুধবার, শান্তিনিকেতনে ছুটির দিন। সর্বত্র ছুটির দিন রবিবার, আর শান্তিনিকেতনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণের দিন 'বুধবার' বলে ঐ দিনটি ছুটির দিন নির্ধারিত হয়েছে। প্রায় ১১টার সময় 'তনয়দা' এলেন আমার কাছে, সঙ্গে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু (সবাই ওঁকে বলেন 'মাস্টারমশাই') ও তাঁর ছাত্র-অধ্যাপক বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলাম। বললেন—তুমি দুদিন গিয়েছ আমার বাসায়, দেখা পাও নি, তাই তনয়বাবুকে আর বিনোদকে নিয়ে এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে। দেখলাম বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল, গায়ে খদ্দরের বেনিয়ান, পরনে খদ্দরের আটহাতি ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠে এসেছে। মাথার উপর একটি গামছা ভাঁজ করে রাখা। বললেন, "কী রোদ! মাথা বাঁচাতে হলে এই ভেজা গামছাটায় ভারি সুবিধে"। তনয়দা তাঁর কেশবিরল মাথাটা দেখিয়ে বললেন—"এই খালি মাথায় আমি এলাম ওঁর সঙ্গে, আর মাথা ভর্তি কালো চুল নিয়ে উনি এলেন মাথায় ভেজা গামছা জড়িয়ে"। নন্দলাল বাবু হেসে বললেন—মাথায় কালো চুল আছে বলেই তো গরম লাগে বেশি, আপনার মতো চকচকে টাক থাকলে আলো-উত্তাপ প্রতিফলিত হয়ে চলে যেত আয়নার মতো"। তনয়দা বললেন—"সত্যিই তো কথাটা আমার খেয়াল ছিল না যে, কালো পদার্থমাত্রই সবটুকু আলো, উত্তাপ শুষে নেয়"। নন্দলালবাবুর চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর, মনে হয় এখানে ফাঁকি চলবে না, নিরহংকার ও নিরভিমান মানুষটি, অত্যন্ত সহজ ও সরল। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন, অনন্যসাধারণ ও'র মনীষা, মিতভাষী কিন্তু রসগ্রাহী। শিল্পকলায় জ্ঞান ওঁর অত্যন্ত গভীর, তাই বোধ হয় সবাই বলেন, "মাস্টারমশাই", কিন্তু পাণ্ডিত্যের এতটুকু অভিমান ও'র মধ্যে নেই। সত্যি, এমন নিরহংকার মানুষ অত্যন্ত বিরল। জ্ঞানের গভীরতা, অসামান্য প্রতিভা, রূপ ও রসের পরিপূর্ণতার এক অপূর্ব সমাবেশ এই মানুষটির মধ্যে। মনে হয় শিল্পী নন্দলালের সঙ্গই একটা শিক্ষা। এর পর অনেকদিন ওঁর কাছে গিয়েছি, কারণ ওঁর সাহচর্যটা আমাদের কাছে ছিল খুবই মূল্যবান। রং ও রূপরেখার জগতের মানুষ আমি নই, তাই শিল্পী নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার আলোচনা করা হবে নিতান্ত অনধিকার চর্চা। মানুষ হিসেবে তিনি যে কতো উদার ও মহৎ, তারই সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলব। স্বভাবশিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি তাঁদের হাতের কাজে, তাঁদের রং-রেখার ভাষায়, তা নয়, দেখা যায় তাঁদের ব্যবহারে, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় ও ভঙ্গীতে। নিকটে থেকে নানা অবস্থায় শিল্পীর অন্তরের মানুষটিকে সম্যক জানবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

গুরুদেবের আমন্ত্রণে ১৯২২ খৃস্টাব্দে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন শান্তিনিকেতনে, তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই শান্তিনিকেতনেই। কলাভবনে একটি অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হওয়ার অর্থ ছিল অনেক ত্যাগ স্বীকার ও অস্বচ্ছলতা বরণ। এই অবস্থায় তিনি প্রায় ১২ বছর কাটিয়েছেন কলাভবনে, তখন তাঁর মাইনে ছিল মাত্র ২১৫ টাকা। এর ৬।৭ গুণ মাইনেতে নানা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন থেকে একাধিকবার ডাক এসেছে। প্রতিবারেই নির্বিকারচিত্তে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই প্রাচুর্যের আহ্বান। তাঁর এই স্বার্থত্যাগের কাহিনী আজ শান্তিনিকেতনে রূপকথার গল্প বলেই মনে হয়। এই যে দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার—এ হলো তাঁর দায়িত্ব পালনের মূল্য। গুরুদেব শিল্পী নন্দলাল সম্বন্ধে বলেছিলেন—"বিধাতা যখনই প্রতিভা দেন তখনই তার দায়িত্বও দেন, এই দায়িত্ব পালন করেই প্রতিভার মূল্য দিতে হয়।" শিল্পাচার্য নন্দলালও সেই দায়িত্ব পালন করেছেন যেমন ত্যাগের

ক্রুকস
ল্যাকটো-ক্যালামাইন
কি একটি ফাউণ্ডেশন?
হ্যা, তাই!
ফাউণ্ডেশন-রূপে ক্রুকস্ ল্যাকটো ক্যালামাইন ব্যবহার করুন
লাবণ্যময় আভা এনে দেবে, সন্তর্পনে ঢেকে যাবে সব দাগ।
স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর হবে চেহারা।
ক্যালামাইন ও উইচ হেজল সহ-ক্রুকস্ ল্যাকটো ক্যালামাইন
এছাড়াও আপনার ত্বক পরিষ্কার রাখে, আদ্রতা এনে দেয়।
ত্বক সুরক্ষিত করে, দাগ ইত্যাদি হতে দেয় না।
ক্রুকস
ল্যাকটো-ক্যালামাইন
সমগ্র
সৌন্দর্য/প্রসাধন
সামগ্রী
Lacto Calamine
এখন
মিনি সাইজেও পাওয়া যায়

নিষ্ঠায়, তেমনি কঠিন শ্রমে। নিরলস প্রয়াসে তাঁর সৃষ্টিধর্মী মন নিয়ত সৃষ্টি-কার্যে নিয়োজিত রেখেছেন, অপরদিকে ছাত্রদের নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষকে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন, কোথাও সে জন্য নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন নি। বলেছেন—"শেখাই নি, এক সঙ্গে কাজ করেছি, ছাত্রদের নিয়ে পাশা-পাশি বসে কাজ করেছি। আমারটা দেখে দেখে ওরা শিখেছে, ওদেরটা দেখে আমি। কে ছাত্র, কে মাস্টার মনেই হয় নি।" এই হচ্ছে আদর্শ শিক্ষকের কথা, এই এক কথায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথাটি নন্দলাল ব্যক্ত করেছেন। ভারতের আদর্শ অনুযায়ী গুরু-শিষ্যের যে-সম্পর্কের কথা এতো পড়েছি, শুনেছি, এ যুগে তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। ছাত্রদের এতখানি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা আজকের ভারতবর্ষে আর কোনো গুরু পেয়েছেন বলে জানা নেই।

শান্তিনিকেতনের প্রতিটি আনন্দের আয়োজনে, মঞ্চসজ্জায়, অভিনয়ে, উৎসবে নন্দলালের অমর প্রতিভার ভূমিকা অনস্বীকার্য। গুরুদেব উৎসব অনুষ্ঠানে যে নূতন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, নন্দ-লালের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শ না পেলে তা এমন চিত্তগ্রাহী ও সার্থক হতো কিনা সন্দেহ। মহাকবির অমর ভাবধারার সঙ্গে মিলন ঘটেছিল মহারূপকারের অমর শিল্পসৃষ্টির ধারা। তাই শান্তিনিকেতনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল রূপে, রসে, গন্ধে ভরা এক অপূর্ব মহান্ জীবনধারা।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন ততদিন তিনিই কেন্দ্রীয় পুরুষ, তাঁকে ঘিরেই নিকেতনের জীবনধারা প্রবাহিত ছিল। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর যদি কোনো এক ব্যক্তির প্রতি শান্তিনিকেতন আনুগত্য দেখিয়ে থাকে তো তিনি আচার্য নন্দলাল। বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, কর্মী সকলের কাছে তিনি যে "মাস্টার-মশাই" নামে পরিচিত ছিলেন তাতেই প্রমাণ যে আশ্রমবাসী সকলেই তাঁকে শিক্ষাগুরু হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

১৯৬৬ সালে নন্দলাল পরলোকগমন করেন। কলাভবনের 'নন্দনের' মায়া কাটিয়ে নন্দলাল চলে গেছেন আর এক নন্দনলোকে। ভারতের মহাকাশ থেকে খসে পড়লো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনের কর্মসচিব ও সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় সহ-কর্মসচিব। রথীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বহুগুণের অধিকারী, ব্যবহারে নিরতিশয় ভদ্র। সূক্ষ্ম শিল্প কাজে খুবই দক্ষ, শুনেছি 'বাটিকের' কাজ ও চামড়ার ওপর বাটিকের কাজ তিনিই প্রথম বিশ্বভারতীতে প্রচলন করেন। এরকম সহজ উদার ও প্রতিভাবানদের অন্তঃকরণ বিরল; বিপদে-আপদে তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনে সকলেরই ভরসা-স্থল, এমন নিঃশব্দে তাঁর দান প্রার্থীজনের হাতে পৌঁছোতো যে, দাতা ও গ্রহিতা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি তা জানতে পারতেন না। বিশ্বভারতীর প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ, নিজেও ছিলেন অক্লান্তকর্মী, আর সহকর্মীদের মধ্যে এমন সুষ্ঠুভাবে কাজ ভাগ করে দিতেন, যাতে কোনো কাজই পড়ে থাকত না। খুবই প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন তিনি, রবীন্দ্র-নাথের ছেলে বলে তাঁর প্রতিভার পরিমাপ হতো রবীন্দ্রনাথের অসামান্য বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে, তাই রথিবাবুর প্রতিভার সম্যক স্বীকৃতি মেলে নি। বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ মনীষীর ও প্রতিভাধরের ছেলে হবার একটা মস্তো অসুবিধা এই যে, বাপের অসাধারণ প্রতিভার তুলনায় তাঁর নিজস্ব প্রতিভা সহজেই ম্লান হয়ে যায়। রবীন্দ্র-নাথের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম কিছু হয় নি, কাজের ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর নিজস্ব প্রতিভা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে বিচার করলে তাঁর প্রতিভা অনেক বেশি স্বীকৃতি পেত। প্রথম থেকেই এই নিরহংকার ভদ্র মানুষটিকে খুব ভালো লেগেছিল। একদিন একটা কাজে রথিবাবুর অফিসে তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন। হঠাৎ রথিবাবুর হাতঘড়িটা চামড়ার ব্যান্ড ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেল। ভালো একটা দামী ঘড়ির হঠাৎ এই অপঘাতে সবাই খুব বিচলিত হলেন। রথিবাবু ঘড়িটাকে অনেক ঝাঁকুনি দিয়ে আবার চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, তাই দেখে বললাম যে, 'ব্যালান্স হুইলের পিভট্' যদি ভেঙে না থাকে তাহলে এই 'শকে' 'এ্যাসকেপ্-মেন্টের' সীমার বাইরে চলে গেছে হুইলটা, খুলে দেখলেই বোঝা যাবে কি হয়েছে। ঘড়ির ডালাটা খুলে দেখা গেল 'পিভট্' ভাগ্যক্রমে ভাঙে নি, এ্যাসকেপ্মেণ্টকে স্বস্থানে এনে দিতেই ঘড়িটা চলতে শুরু করলো। রথিবাবু বললেন—"ঘড়ি মেরামতের কাজ জানেন দেখছি। বাবার অনেক দামী ও ভালো ঘড়ি অকেজো হয়ে পড়ে আছে, কলকাতার বড়ো বড়ো দোকানে সেগুলি দেখানো হয়েছে, দক্ষিণাও দিতে হয়েছে অনেক, ফল বিশেষ কিছু হয় নি, দু-চারদিন চলার পর আবার অচল। একবার দেখবেন, এদের কোনো গতি করা যায় কিনা।" সেদিন বিকেলেই রথিবাবু একটা অচল ঘড়ি পাঠিয়ে দিলেন, ফেরৎ পেলেন সচল অবস্থায় দু-তিন দিনের মধ্যেই। এভাবে অনেক অচল ঘড়ি সচল অবস্থায় প্রাপ্ত হবার পর গুরু-দেবের কানেও এই খবর পৌঁছলো। তিনি ডেকে বললেন যে, ওঁদের তিন পুরুষ আগেকার একটা খুব ভালো সোনার বড়ো ঘড়ি ওঁর কাছে রয়েছে। তবে কয়েক বছর হলো ওটা অচল হয়ে পড়ে আছে, সুন্দর বাজনা বাজতো ভিতরে, সেটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার পরেই ঘড়িটা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। নামজাদা ঘড়ির ডাক্তারকে দেখিয়েও নাকি কোনো ফল হয় নি একমাত্র অর্থব্যয় ছাড়া। ঐ ঘড়িটার ওপর গুরুদেবের একটা বিশেষ মায়া আছে। ওর ইতিহাস হলো—গুরু-দেবের ঠাকুর্দা প্রিন্স দ্বারিকানাথ ঠাকুর যখন বিলেতে ছিলেন, বিখ্যাত ঘড়ি নির্মাতা Mc Cabe নিজের হাতে ওঁর জন্য ঐ ঘড়িটি তৈরি করে ওঁকে উপহার দেন। ঘড়ির ডালাটার উপর Mc Cabe-এর নিজের হাতে নাম সই করা আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘড়িটি এসে পৌঁছলো গুরুদেবের টেবিলে, তিনি বললেন—"এটার যদি একটা সদ্গতি করতে পার, একটা সার্টিফিকেট দেব।" ঘড়িটা সত্যিই সাধারণ ঘড়ির পর্যায়ভুক্ত নয়, অদ্ভুত তার গঠন প্রণালী, জীবনে এই ধরনের ঘড়ির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধৈর্য ধরে ঘড়িটাকে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল একটা ছোটো স্প্রিং স্থানচ্যুত হয়েছে, তাকে স্বস্থানে স্থাপন করতেই বাজনাটা সুন্দর বেজে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটাও চলতে শুরু করলো। দুদিন ঠিক মতো চলার পরে গুরুদেবকে ঘড়িটা ফেরৎ দিয়ে এলাম। খুব খুশি হলেন তাঁর সযত্নে রক্ষিত ঘড়িকে আবার সচল দেখে, বললেন—"এতোগুলি অচল ঘড়িকে যে সচল করেছে, তাকে আজ থেকে 'ঘড়িয়াল' বলেই ডাকব, দেখো আবার যেন কেউ 'ঘড়েল' না বলে বসে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তদানীন্তন অধ্যক্ষ অনাথ বসু মহাশয় এসেছেন শান্তি-নিকেতনে। অনাথবাবু এখানকারই একজন প্রাক্তন অধ্যাপক, ক্ষিতিমোহন-বাবুকে 'ঠাকুর্দা' বলে ডাকেন। তিনি, বিশেষ করে ক্ষিতিমোহনবাবুকে ধরে বসলেন ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলতে। ক্ষিতিবাবু বললেন, "আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর মতের অনেক অমিল আছে, তাই সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হবে না। তবে আশ্রমের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি কিছু আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু সেটা আধুনিক শিক্ষকশিক্ষণের ধারায় যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদের পক্ষে হয়তো খুব মধুর হবে না। দেখো অনাথ, পরে আমাকে দোষ দিও না। তুমি বরং আমার মতো প্রাচীনপন্থীকে

ছাত্র নিয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ধারক ও বাহক যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান করা।" অনাথবাবু বললেন—"ঠাকুর্দা, আপনার গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের ও শিক্ষার্থীর কাজের ক্ষেত্রে অমূল্য পাথেয় হয়ে থাকবে।" ক্ষিতিমোহনবাবু খুব সুন্দর বলতে পারতেন, বহু উপমা দিয়ে, বেদ-উপনিষদ থেকে বাণী উদ্ধৃত করে সুললিত ভাষায় অতি প্রাঞ্জল করে তিনি তাঁর বক্তব্য শ্রোতৃবর্গের মর্মস্থলে পৌঁছে দিতেন। সেদিন শুরু করলেন "মেথড্‌স্ অফ্ এ্যাডুকেশন" নিয়ে—বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি, যার সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলেই থামলেন—তারপর কণ্ঠস্বর আরো একটু উচ্চগ্রামে তুলে বললেন—"আজকাল অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, কোনো কিছু পুঁথিতে লেখা থাকলে তা প্রায় সকলেই বিনা বিচারে মেনে নেয়, আর সে-পুঁথি যদি বিদেশী ভাষার পুঁথি হয় তাহলে তো কথাই নেই। তাকে ক্ষেত্রজ 'ট্রায়াল' অর্থাৎ পরীক্ষণের ব্যবস্থা করার প্রশ্নই যেন মনে আসে না।" এই প্রসঙ্গে তাঁর ছেলেবেলায় কাশীতে শিক্ষালাভ করার সময়কার একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন—তিনি, ললিতবিহারী সেনরায় (যিনি পরে কাশীর রাজার এস্টেটের ম্যানেজার হয়েছিলেন) ও আর একজন সহপাঠী (নামটা ভুলে গেছি), এই তিন সতীর্থ একদিন ওঁদের স্কুলের লাইব্রেরীতে 'হাউ টু লারন্ সুইমিং' নামে একখানি সচিত্র বইয়ের সন্ধান পেলেন। স্থির হলো, সবাই মিলে ঐ পুস্তকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সাঁতারটা তাড়াতাড়ি শিখে ফেলবেন। ঘরে দরজা বন্ধ করে মেঝেতে সতরঞ্চি বিছিয়ে তিন বন্ধুতে মিলে অদম্য উৎসাহে Stroke No. 1, No. 2, No. 3, No. 4 ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি ছবিতে নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুযায়ী আরম্ভ করার জন্য কঠিন সাধনা শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সাঁতারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এতো সড়গড় হয়ে গেল যে, তিন বন্ধু নিঃসংশয়ে মেনে নিলেন সাঁতার তাঁদের শেখা হয়ে গেছে. পুঁথির লেখার ওপর এমনি দৃঢ় আস্থা তাঁদের। একদিন ললিতবিহারী বললেন, "ক্ষিতি, সাঁতার আমরা তো শিখেই গেছি, তবু 'ক্ষেত্রজ ট্রায়াল' দেওয়াটা দরকার। তোমার বাসা গঙ্গার খুব কাছেই, তুমিই প্রথম ট্রায়ালটা দাও।" পুঁথিতে বর্ণিত প্রক্রিয়ার ওপর এমনি অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তার পরদিনই নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে চলে গেলেন, গিয়ে দেখেন ঘাট-ঘাটের সংস্কার চলছে; নদীর জলে অনেক বাঁশ পুঁতে ভারা বেঁধে পূর্ণোদ্যমে মেরামতির কাজ চলছে। কোনো রকমে একটা বাঁশ ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ক্রমে ক্রমে জলের নিচে তলিয়ে যেতে লাগলেন। পর পর Stroke No. 1, 2, 3, 4 প্রয়োগ করে কোনো ফল হলো না, যতোই নূতন নূতন 'স্ট্রোক' প্রয়োগ করলেন ততোই জলের উপরে না উঠে আরো নিচে তলিয়ে যেতে শুরু করলেন, পেটে তখন বেশ খানিকটা জলও ঢুকে গেছে। দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, মৃত্যু আসন্ন, হঠাৎ হাতে পিছল্ একটা কিছু ঠেকতেই বুঝলেন সেটা ভারা-বাঁধা একটা বাঁশের গুঁড়ি। দুই হাতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে 'সনাতনপন্থা' অবলম্বন করে বাঁশ ধরেই তিনি জলের উপরে ভেসে উঠলেন, পৈত্রিক প্রাণটা সে-যাত্রা রক্ষা পেল। কাহিনী শেষ করে অনাথবাবুকে বললেন—"দেখ অনাথ, যে-পদ্ধতিতে প্রাণটা বাঁচল সেই 'সনাতনপন্থাকে' ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাই আজও আমি প্রাচীনপন্থী হয়েই রইলাম।"

তারপর আরেকবার শিক্ষার যুগে ও শিক্ষার স্নাতকীকরণ সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে বললেন—আজকাল যেমন তোমাদের 'কন্‌ভোকেশনে' মানপত্র পেলে তবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার জন্মায়, তেমনি আশ্রমের যুগেও গুরু 'সমাবর্তন' না দিলে কারও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার জন্মাতো না। কেউ তাকে কন্যা সম্প্রদান করতো না, তিনি গৃহী হবার অধিকার পেতেন না। পুরোনো দিনের সেই ব্যবস্থার কিছুটা এখনও রয়ে গেছে, তাকে একেবারে অপাংক্তেয় বলে এখনও ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি, তা এখন অনেকটা আচারে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন, হিন্দুবিবাহে এখনও বিবাহে প্রবৃত্ত হবার আগে পাত্রকে প্রকাশ্য বিবাহসভায় গুরুর অনুমতি নিতে হয়। এই গুরু শিক্ষা-গুরু নয়, কুলগুরু, তাঁর অনুমতি নেওয়া আবশ্যক। এই আচার বর্তমানে যে কী
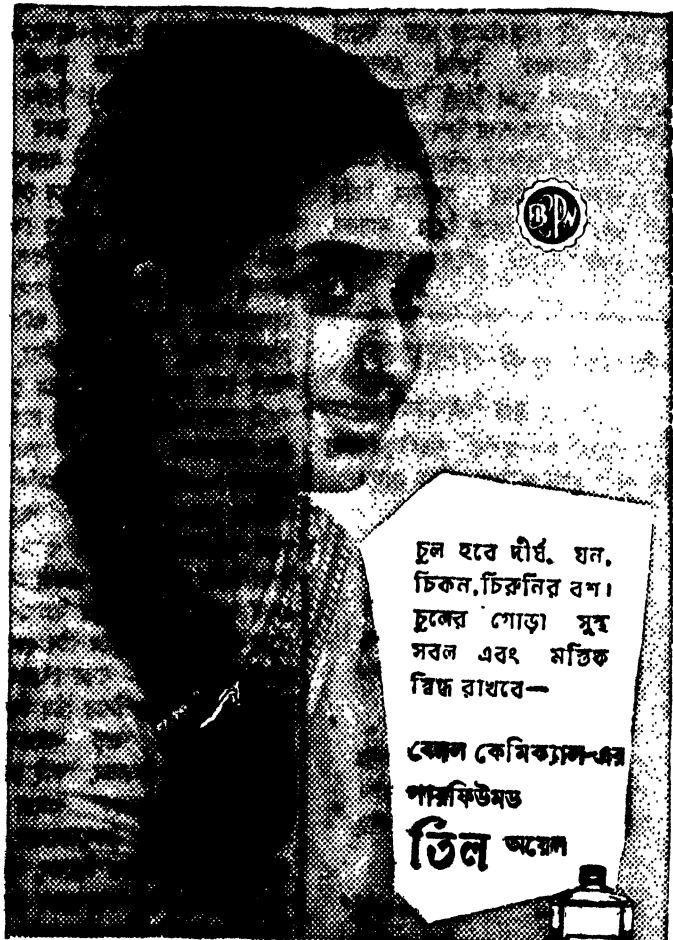
ঘোর অনাচারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। মাদারীপুরে এক ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়েতে উনি উপস্থিত ছিলেন। পাত্র বিবাহে প্রবৃত্ত হবার আগে গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করার শুভমুহূর্ত যখন সমাগত, দেখা গেল, যে গুরুদেবকে সভায় উপস্থিত করা হলো তিনি ৬।৭ বছরের একটি বাচ্চা ছেলে। রাত তখন প্রায় দুপুর, সেই ঘুমভাঙা চোখে চারদিকে অতো বড়ো জনসমাগম দেখে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন গুরু, "মার কাছে যাবো"। কিছুদিন আগে কুলগুরুর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর ৬।৭ বছরের ছেলে এখন শিষ্যদের 'বাচ্চা-গুরু'। পুরোহিতের নির্দেশমতো পাত্র যতো গলবস্ত্র হয়ে 'গুরুর' অনুমতি ভিক্ষা করছে "গুরুদেব আপনি অনুমতি দিলে বিবাহে প্রবৃত্ত হই", গুরুও ততো উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠছে "মার কাছে যাবো"। বিয়ে পন্ড হবার উপক্রম দেখে বরকর্তা ক্ষিতিবাবুর শরণাপন্ন হলেন, এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য বরপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন না। ক্ষিতিবাবু বরকর্তাকে এই দায় থেকে মুক্ত করার আশ্বাস দিলেন। তিনি ক্রন্দনরত 'গুরুকে' কোলে তুলে নিয়ে বিবাহমন্ডপ থেকে বেরিয়ে গৃহসংলগ্ন অন্ধকার বাগানে এসে তাকে ভয় দেখিয়ে প্রথমে তার কান্না বন্ধ করালেন, তারপর বললেন, তিনি তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু একটু কাঁদলেই এই বনের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়ে যাবেন। এই অবস্থায় 'গুরুকে' কোলে নিয়ে বিবাহসভায় ফিরে এসেই পাত্রকে বললেন, 'গুরুর' অনুমতি ভিক্ষা করার জন্য। পাত্র সঙ্গে সঙ্গে গলবস্ত্র হয়ে অনুমতি চাইলো—"গুরুদেব আপনি অনুমতি দিলে বিবাহে প্রবৃত্ত হতে পারি।" ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষিতিবাবু 'গুরুর' কানের কাছে মুখ নিয়ে, আর কেউ শুনতে না পায়, খুব চুপি চুপি বললেন, "মার কাছে যাবি?" বাচ্চা-গুরু খুব খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো "হ্যাঁ"। উপস্থিত অভ্যাগত সবাই শুনলেন পাত্রের অনুমতি-ভিক্ষার কথা আর সঙ্গে সঙ্গে 'গুরুর' "হ্যাঁ" বলে অনুমতি দান। এভাবেই শঠতার আশ্রয় নিয়েই সেই যাত্রা ভদ্রলোককে তাঁর ঐ বিষম দায় থেকে তিনি মুক্তি দিলেন। অনুশাসন বা পদ্ধতি যখন আসল জিনিসটাকে চাপা দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তখন অন্ধ সংস্কারের মতো তাকে অনুসরণ করতে গেলেই ঘটে প্রতি-পদে বিড়ম্বনা।

এই প্রসঙ্গে আরো দুজন সুরসিক অধ্যাপকের কথা মনে পড়ে। নেপালচন্দ্র রায় ও প্রমদারঞ্জন ঘোষ—দুজনেই বেশ বয়স্ক। নেপালবাবুকে সবাই 'দাদা-মশাই' বলে ডাকতো। তিনি ছিলেন আপনভোলা মানুষ, ডান হাতের কব্জীতে বাঁধা চামড়ার ব্যান্ডের মধ্যে থাকতো একটি হাতঘড়ি, তবে সেই ঘড়ির সময় দেখে যে তিনি কোথাও যেতেন তা নয়। তাঁর একটা মহৎ গুণ ছিল, কাউকে কোনো বিষয়ে দোষারোপ করতেন না, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটলেই ধরে নিতেন তাঁরই ত্রুটিতে ঘটেছে, বলতেন "তাই তো বড়ো অন্যায় হয়ে গেল" বা "তাই তো বড়ো গোলমাল হয়ে গেল।" ওঁর অন্যমনস্ক স্বভাবের কথা সবাই বলতেন। একটা কাহিনী শুনেছি, একবার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে হাওড়া থেকে বোলপুর আসবেন, গাড়িতে ওঁদের বসিয়ে দিয়ে তিনি প্ল্যাটফরমের একটা বেঞ্চে বসে এমন তন্ময় হয়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেন, কখন যে ট্রেন ছেড়ে গেল, টেরই পেলেন না। যখন খেয়াল হলো দেখলেন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ট্রেন চলে গেছে, তিনি স্টেশনে পড়ে আছেন। উঠে দাঁড়িয়েই নাকি বললেন, "তাই তো বড়ো গোলমাল হয়ে গেল।" আরো একটি কাহিনী শুনেছি। নেপালবাবুর পাশের বাড়িতে যে অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর মেয়ে ও আর একজন অধ্যাপকের মেয়ে সমবয়সী, একত্রেই তারা লেখাপড়া করতো, রাত্রে এক সঙ্গে একই ঘরে শুতো। নেপালবাবুর সঙ্গে দাদা-নাতনী সম্পর্ক, তাই কিছু রসিকতাও তিনি ওদের সঙ্গে করতেন। উঠতেন খুব ভোরে, বেড়িয়ে যখন ফিরতেন তখন এক অনলঙ্করণীয় বেসুরো গলায় গান ধরতেন "সখী জাগো", এসেই ঘরে ঢুকে মেয়ে দুটির কপালে ঠান্ডা হাত ঠেকিয়ে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন। এতো ভোরে রোজ এভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো মেয়ে দুটি মোটেই পছন্দ করত না, বিশেষত প্রচন্ড শীতের ভোরে ওরা যখন আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোতো। একদিন ঐ অধ্যাপকের মা এলেন ছেলের বাড়িতে, নাতনী ও অপর মেয়েটির সঙ্গেই তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা হলো। মেয়ে দুটি সে রাত্রে গোপনে কী যেন একটা পরামর্শ করলো। এদিকে নেপালবাবু যথারীতি খুব ভোরে "সখী জাগো" গান ধরে যখন আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো; একটা পাশবালিস গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন অধ্যাপকের মায়ের পাশে লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে দুজনে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। মনে হলো যেন লেপ মুড়ি দিয়ে দুজনে বিছানার উপর ঘুমুচ্ছে। এই মারাত্মক ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও এই আপনভোলা ভদ্রলোকটি জানতে পারলেন না, তাই অন্য দিনের মতোই অন্য দরজা দিয়ে "সখী জাগো" গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে যথারীতি লেপের নিচে ঠান্ডা হাত ঢুকিয়ে ভদ্রমহিলার কপাল স্পর্শ করতেই তিনি জেগে লাফিয়ে উঠে অন্ধকারে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই চীৎকার করে উঠলেন, "কে রে, দাঁড়া তোর সখী জাগাচ্ছি"। মুহূর্তে অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে নেপালবাবু প্রায় কেঁদে ফেললেন, "তাই তো বড়ো অন্যায় হয়ে গেল, বড়ো গোলমাল হয়ে গেল, সব দোষ ঐ মেয়ে দুটোর, আমি জানতাম না, মাপ করুন" বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কথাটা গুরুদেবের কানেও পৌঁছে গেল। সেদিন বিকেলে নেপালবাবু গুরুদেবের কাছে গেলে তিনি স্বল্প-গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "আশ্রমে দুর্নীতি প্রবেশ করেছে, এমন কি আশ্রমবাসীর হাতে ভদ্রমহিলার সম্মান পর্যন্ত ক্ষুন্ন হতে চলেছে। স্থির করেছি অপরাধীকে দন্ড দেব।" বলেই গুরুদেব তাঁর ঘরের কোণে রক্ষিত একটি লাঠি তুলে নিয়ে নেপালবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—"নিন্, দন্ড গ্রহণ করুন, এই দন্ডটি কাল এখানে ফেলে গিয়েছেন।" গুরুদেবের এই নির্মল পরিহাস উপস্থিত সকলেই খুব উপভোগ করলেন, স্বয়ং নেপালবাবুও। তাঁর বুক থেকে একটা পাষাণের ভার নেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, "তাই তো বড়ো অন্যায় হয়ে গেল।"

[ক্রমশ]

। পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।

নকল গুন্ডাদের আপাতদৃষ্টিতে এরকম অদেশাত্মক ব্যবহারের কারণসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, কেনিয়ার রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার যে সময় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি অবধি কেনিয়া সরকারও যে সমস্ত সংগ্রামীরা ১৯৫২ সালে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, তাদের অনমনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিলেন এবং দু' বছরের চেষ্টার পরে তাঁরা আর দু' হপ্তা বা দু' মাসের ভেতর সংগ্রামীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার বড়ফাট্টাই করছিলেন না। মাউ-মাউ আন্দোলনের প্রারম্ভে সরকার পক্ষের যে অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের চরমপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল, তারও রূপান্তর দেখা যাচ্ছিল সরকারী ভাবধারায় ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি এবং নকল গুন্ডাদের ভেতর অনেকে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা সংগ্রামীদের জানাতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক পথেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবপর হয়ে উঠছে, কাজেই সশস্ত্র সংগ্রামের আর প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, নকল গুন্ডাদের কয়েকজনকে কর্তৃপক্ষের লোকেরা প্রচুর মারধোর করেছিলেন, ফলে তাঁদের মনে ধারণা হয়েছিল যে, সরকারী নির্দেশমতো কাজ না করলে মারধোরের পরিমাণ আরও বেড়েই যাবে। কাজেই তাঁরা অনেক সময় নিজের ইচ্ছার এবং যুদ্ধবন্দীর প্রতি সরকারী আচরণের যে সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী আছে তার বিরুদ্ধেই আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, এঁরা সংগ্রামরত আফ্রিকানদের একথাও জানাতে চেয়েছিলেন যে, "সংগ্রাম অথবা মৃত্যু" এই চরমপন্থা ছাড়া এক মধ্যপথেরও আবির্ভাব হয়েছে সরকারী ভাবধারায়, যার ফলে সংগ্রামীরা ধরা পড়ার পরও প্রাণে বাঁচবার আশা করতে পারে। অবশ্য জঙ্গলে লুক্কায়িত সংগ্রামীদের অনেকেই একথা ১৯৫৬ সালের অনেক পরেও বিশ্বাস করেনি, কারণ তারা শুধু শুনেছিল যে, কেনিয়া সরকার মাউ-মাউ সংগ্রামীদের "বন্দী" করার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না, তাঁরা তাদের সমূলে উৎপাটন করতেই চেয়েছিলেন। তাদের এ বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না, কারণ, চিন্গা নামক এলাকায় অনেকদিন পর্যন্ত কোন সংগ্রামীকে সরকার বন্দী করেন নি, ধরতে পারলে শুধু হত্যাই করেছেন। ১৯৫৭ সালে কেনিয়ায় সাধারণ নির্বাচন হবে এবং আইনসভায় আফ্রিকান সদস্যদের নেওয়া হবে—এই মর্মে সরকারী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। এর ফলেই আজ বহুল সংখ্যক সংগ্রামী জেনারেল বা সৈনিক নিরাপদে কেনিয়ার নানাস্থানে স্বাভাবিক নাগরিক জীবনযাপন করছেন চাষবাসে, হোটেলের মালিক হিসাবে বা জীবজন্তুর বেচাকেনার কাজে। আজ আমরা আমাদের ঈপ্সিত সব কিছুই পেয়েছি, কাজেই এখন আর নিরীহ নাগরিকদের ওপর কোনরকম অত্যাচার করা বা কোন গুপ্ত সাংঘাত ইত্যাদি চালনার স্বপক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় প্রাক্তন সংগ্রামী এখনো এই প্রকার অসামাজিক কার্যে লিপ্ত আছে, তারা আমাদের কোনই সমর্থন পেতে পারে না। বরং এখন স্বাধীন কেনিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের বিনষ্ট করতেই চেষ্টা করছি।

১৯৫৬ সালের ৮ই জুন তারিখে মানিয়ানি শিবিরের তথাকথিত ২০৮ জন সংগ্রামী 'দলপতিকে' তিরিশ নম্বর তাঁবুতে একত্রিত করেন সেখানকার কর্তৃপক্ষ, তারপর তাদের প্রত্যেকের পায়ে বেড়ি পরানো হয়, সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া হ্রদের মাইয়ুসি নামক দ্বীপে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এইরকম অবস্থার ভেতরও আবার মিলিত হতে পেরে রাবিনসন, গাদ্ এবং আমি অত্যন্ত খুশি হই এবং আমরা স্থির করি যে, পায়ে বেড়ি পরার ব্যাপারটাকে এমনভাবে নেব, যেন এটি খুব একটা কিছু আনন্দের বিষয়। আমরা সবাইকে বলি হাসিমুখে দৌড়ে গিয়ে নিজ নিজ বেড়ি নিয়ে আসতে, যাতে কি কর্তৃপক্ষ একবারও একথা মনে করতে না পারেন যে, তাঁরা আমাদের স্বাধীনতালাভের উৎসাহকে নির্বাপিত করতে বিন্দুমাত্রও সক্ষম হয়েছেন। মাইয়ুসি ভিক্টোরিয়া হ্রদের পূর্বতীরবর্তী কিসমু শহরের নিকটবর্তী এক দ্বীপ, পরিধি যার তিন বর্গমাইল মাত্র। কেনিয়া সরকার এ দ্বীপের তখন নামকরণ করেছিলেন : ফিরে না আসার দ্বীপ।

॥ সপ্তম অধ্যায় ॥

শৃঙ্খল, দ্বীপ ও ধুলো

আমি জানি না, কে বা কারা পদশৃঙ্খল তৈরি করে, কিন্তু ১৯৫৬ সালে তাদের বাণিজ্য নিশ্চয় খুব ভাল হয়েছিল কারণ কেনিয়া সরকার ঐ সময় প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন বহুসংখ্যক পদ-শৃঙ্খল কেনবার জন্য। আজকের দিনে খুব কম লোকেই এর ব্যবহারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পান; কয়েকশত বছর আগে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীদের

দমন করবার জন্য স্থাপিত বিচারালয়-গুলির পতনের সংগে সংগেই এর ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশেই বন্ধ হয়ে গেছে বা বহুল পরিমাণে কমে গেছে। কাজেই আমি এখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে দু-এক কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। শৃংখলিত অবস্থায় যথাসম্ভব কম চলাফেরা করা উচিত, কারণ মানুষের যথেচ্ছ চলচ্ছক্তিরহিত করার জনাই এর ব্যবহার। এই অবস্থায় বন্দিশিবির থেকে তিন মাইল দূরে রেল স্টেশনে হেঁটে যেতে আমাদের ভোর পাঁচটা থেকে সকাল সাড়ে নটা অর্থাৎ পুরো সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লেগেছিল। পাঠকদের ভেতর অনেকেই হয়তো জানেন যে, একজন সাধারণ মানুষ তিন মাইল পথ এক ঘণ্টায় হেঁটে অতিক্রম করতে পারে অনায়াসেই। ছোট মাপের শৃংখলের তুলনায় বড় মাপের শৃংখল পরে চলতে অসুবিধা হয় অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু ছোট মাপের শৃংখল পরে বেশ দু'পা জোড়া করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলা যায়, যা বড় শৃংখলে সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী বন্দীদের অনেকেই প্রথমে বেশ খানিকক্ষণ অবধি লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছিল শৃংখল পরেই, তারপর আর পারে নি। যেভাবেই চলা যাক্ না কেন, অল্প সময়ের মধ্যেই পায়ের চামড়ার সংগে শৃংখলের ইস্পাতের ঘর্ষণ হওয়ার ফলে পায়ে ফোস্কা পড়তে বাধ্য, আর তারপর আরম্ভ হয় নরকযন্ত্রণা। কোন কোন শৃংখলের দু পায়ের মধ্যবর্তী ইস্পাতের জোড়টি বেশ বড়, ফলে পা ফাঁক করে হাঁটলে একটু পরেই পায়ে ভীষণ ব্যথা আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সাধারণভাবে হাঁটলে এই জোড়ের কিছু অংশ মাটি স্পর্শ করে এবং ফলে দুপায়ের মাঝে ধূলিকণার রাশি ক্রমশই বড় হতে থাকে, ভুক্তভোগীর অগ্রগমন গতি আরও শ্লথ ও কষ্টদায়ক করে তোলবার জন্য। অনেক ভেবে আমরা শেষে একগাছা দড়ি যোগাড় করে তার এককোণ এই জোড়ের মাঝে বেঁধে অন্য কোণ কোমরের বেল্টের সংগে টান করে বেঁধে দি এবং এইভাবে জোড়টিকে মাটি থেকে তুলে রাখতে সক্ষম হই। এইজনাই বোধ হয় গুণিজন বলেছেন যে, প্রয়োজনই মানুষকে আবিষ্কার করতে শেখায়।

এ ছাড়া আরও একটা অসুবিধা ছিল আমাদের। পরনের প্যান্ট ছিল আমাদের মাত্র একজোড়া করে এবং তাকে মাঝে মাঝে শরীর থেকে পুরো খুলে ফেলতে হ'ত কাচবার জন্য। শৃংখলপরা অবস্থায় কিভাবে এ কাজ করা যেতে পারে তা ভেবে বার করতে আমাদের অনেক সময় লেগেছিল। জোমো কেনিয়াটা পরে আমায় একবার বলেছিলেন যে, লোকিটাউঙ্গ-এ শৃংখলাবন্ধ অবস্থায় থাকাকালীন তাঁরাও প্রথমে পরনের প্যান্ট শরীর থেকে পুরো খুলে ফেলার কোন সোজা উপায় খুঁজে পান নি। যাক, এ বিষয়ে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর আমি চাই না যে, ভবিষ্যতে আর কেউ এই অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ুন, তাই তাঁদের বলে রাখি এখনই যে, এ অবস্থায় প্যান্ট খোলার এক বিশেষ কায়দা আছে। এই পদ্ধতির মূল কায়দা হ'ল এক-পা এক-পা করে প্যান্ট খোলা। প্রথম ধাপে কোমর থেকে নামিয়ে দিয়ে যে-কোন একটা পায়ের বেড়ির ভেতর দিয়ে যথাসম্ভব প্যান্টকে নিচের দিকে টানতে হয়, তারপর সে পায়ের বেড়িকে ওপরের দিকে যথাসম্ভব টানলে পর সে পা থেকে প্যান্টকে মুক্ত করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ধাপে প্যান্টের সমস্ত কাপড়কে প্যান্টমুক্ত পায়ের বেড়ির ভেতর দিয়ে গলিয়ে ফেরৎ আনতে হয় এবং দ্বিতীয় পায়ের সংগে কিছুক্ষণ ধরে আগের মতো কসরৎ করার পর প্যান্টকে কাচার জন্য শরীর থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা যেতে পারে। তারপর আবার প্যান্ট পরা তো খুবই সোজা, শুধুমাত্র উপরোক্ত কর্মপন্থার বিপরীত গতিতে চললেই সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের নিয়ে রেলগাড়ি মানিয়ানি থেকে নাইরোবি পৌঁছালে পর সেখান থেকে আরও তিনজন বন্দীকে আমরা সহযাত্রিরূপে পাই, এর ভেতর ছিলেন মাউ মাউ চরমপন্থীদলের অন্যতম নেতা জেনারেল কাহিংসা। তারপর নাকুরু স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি তিন ঘণ্টাকাল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ গাড়িতে মাউ-মাউ বন্দীরা আছে জানতে পেরে শহর থেকে অনেক লোক আমাদের দেখতে আসে, তার ভেতর অনেকেই আমার পরিচিত। এরা বন্দীদের দেবার জন্য খাবার, তামাক ইত্যাদি এনেছিল, কিন্তু প্রহরীরা প্রথমে আমাদের এ সব জিনিষ গ্রহণ করতে দিতে রাজী হয় নি। গাথোগো মুইট্টুমি নামক একজন বন্দীকে প্রহরীরা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় ডেকে পাঠায় এবং তাকে পায়ে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে দেখে সমবেত জনতামণ্ডলী ক্রুদ্ধ ও শোকাহত হয়ে পড়ে, অনেকে তো দুঃখে কান্নায় ভেঙেই পড়ে। আমরা তাদের এভাবে শোকে মুহ্যমান হতে বারণ করি ও বোঝাই যে, আমাদের আর এখন শৃংখলাবন্ধ অবস্থায় থাকতে কোন অসুবিধা হয় না, বরং একে আমরা একরকম ছেলেখেলা বলেই ধরে নিয়েছি। আসলে অবশ্য শৃংখল পরে থাকা খুবই কষ্টকর, কিন্তু আমরা জনতাকে সে কথা বলতে চাই নি, কারণ বিশেষ করে যাতে সমবেত কিকুয়ু নারীরা এ কথা না ভাবে যে, আমরা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ছি। তা ছাড়া কর্তৃপক্ষ যে আমাদের এভাবে হয়রান করতে সক্ষম হয়েছেন, তাও আমরা তাঁদের জানতে দিতে চাই নি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা ভাবুন যে, আমরা বিশেষ কোন অসুবিধাই ভোগ করছি না শৃংখলাবন্ধ হবার ফলে, তাহলে তাঁরা শেষ অবধি এর ব্যবহার নাকচ করবেন। সমবেত নারীদের ভেতর কাবুরা নামে একজন কিকুয়ু সাহস করে আমাদের ভারপ্রাপ্ত ইউরোপীয়ান কর্মচারীকে অনুরোধ করে তাদের আনা খাবারদাবার আমাদের হাতে দেবার জন্যে এবং তিনি এ বিষয়ে প্রহরীদের নিষেধাজ্ঞা নাকচ করে দেন। মাইয়ুসি দ্বীপে পেঁছে আমরা কাবুরার সাহসের প্রশংসা করে এবং অন্যান্য নারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এক গান রচনা করি।

আমরা ১১ই জুন ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরবর্তী শহর কিসুমুতে পেঁছাই এবং রেলগাড়ি থেকে নেমে সোজা সেখানকার ওডিয়াগা জেলে চলে যাই। তার পরদিন আমাদের দুই দলে ভাগ করা হয়, প্রথম দলের ১০০ জনকে ওডিয়াগাতেই রাখবার এবং দ্বিতীয় দলের ১০৮ জনকে মাইয়ুসি দ্বীপে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমি দ্বিতীয় দলে পড়ি, কিন্তু আমার সুহৃদ বন্ধু রবিনসন মোয়ান্‌গি ওডিয়াগায় থাকতে বাধ্য হয়। যদিচ তার সংগে এভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আমি বেদনা পাই, তবু সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে দুই দলেই একজন করে শিক্ষিত লোক থাকবে ভেবে আমরা সান্ত্বনা দিই নিজেদের। ১২ তারিখের সকালে আমরা সরকারী লরীতে চাপি, এক-একটি লরীতে ৩৫ জন করে এবং তারপর প্রহরীরা আমাদের লরীর ওপরে জাল দিয়ে মাছ ঢাকার মতো ঢেকে দেয়। এই নতুন পন্থায় অপমানিত ও মানসিক বিপর্যস্ত করার চেষ্টায় খুবই খারাপ লেগেছিল আমাদের, কিন্তু আগেকার মতোই কর্তৃপক্ষকে আমরা সে কথা বুঝতে দিতে চাই নি, কাজেই জাল নিয়ে আমরা হাসাহাসি আরম্ভ করে দিই যেন এটা একটা খুবই মজার ব্যাপার। ওডিয়াগার জেলবন্দীরা এই জাল তৈরি করেছিল এবং এর ছিদ্রগুলি

আকারে প্রায় ফুটবল খেলার গোল-পোস্টে যে রকম জাল ব্যবহার করা হয়, সেইরকমই ছিল। এভাবে আমাদের দৃঢ়তাকে বিনষ্ট করার প্রত্যেকটি সরকারী প্রচেষ্টাকে আমরা অবহেলাভরে বাতিল না করলে সরকারের পক্ষে খুবই সহজ হত মাউ-মাউ আন্দোলনকে বর্বর, সেকেলে এবং বহু পুরাতনপন্থী এক প্রচেষ্টা বলে উড়িয়ে দেওয়ার এবং ফলে আমাদের নেতা জোমো কেনিয়াটাকেও সহজেই একজন অদূরদর্শী, অপরিণতবুদ্ধি লোক বলে জাহির করতে পারতেন তাঁরা। জালের ভেতর বসে বাইরের সব কিছুই বড় অদ্ভুত ও ঘোলাটে লেগেছিল আমাদের। এই-ভাবে বন্ডো এবং মাক্ওয়া গ্রাম পার হবার পর অবশেষে আমরা ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছাই, যেখান থেকে মাইয়ুসি দ্বীপ খুবই কাছে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, এই সময় আমাদের পায়ের শৃংখল খুলে নিয়ে শুধুমাত্র হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়, ফলে আবার সোজা হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারি আমরা। যে নৌকায় চেপে আমরা মাইয়ুসি দ্বীপে যাই তার এক-একটিতে পঞ্চাশজন করে লোক ধরে। আমি জীবনে এই প্রথমবার নৌকাযাত্রা করে তার দোলানি অনুভব করি এবং আমাদের ভেতর অনেকেই দোলানির ফলে বমি করতে আরম্ভ করে।

মাইয়ুসিতে কর্মাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসস্থানগুলি ১৯৫৪ সালে এখানে আনীত মাউ-মাউ আসামীরা তৈরি করেছিল। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে এদের কারাবাসের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে এবং সরকার তার জায়গায় মাউ-মাউ বন্দীদের আনছিলেন ঘরবাড়ি তৈরির কাজ শেষ করার জন্য। আমাদের মাইয়ুসিতে পৌঁছাবার আগে মানিয়ানি থেকে প্রায় আটশত বন্দী এখানে এসে গিয়েছিল এবং আমাকে দেখে তারা যেভাবে চীৎকার করে উল্লাস প্রকাশ করে, তাতে আমি একাধারে অত্যন্ত প্রীত এবং বিচলিত হই। আমাকে কাঁধে করে ফটক থেকে তাঁবু অবধি নিয়ে গিয়ে তারা আরও অবাক করে দেয় এবং সেখানে খাঁটি মাখন ও পাঁউরুটি সহযোগে চা-পান করিয়ে আমার সম্বর্ধনা করে। প্রায় চার বছর পরে আবার আমার অন্যতম প্রিয় খাদ্য মাখন ও পাঁউরুটি খেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম আমি সেদিন। এখানকার বন্দীদের অনেকেই আমার সঙ্গে মানিয়ানির ১৩ নম্বর তাঁবুতে কিছু-কাল কাটিয়েছিল। তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে গালগল্প করার পর অবশেষে আমি যখন আমার জন্য নির্ধারিত তাঁবুতে শুতে যাই, ততক্ষণে আমার মনে আবার নতুন আশা ও উৎসাহের জোয়ার এসে গিয়েছে।

পরদিন সকালে এখানকার অন্যান্য বন্দীদের মতো আমাদের ওপরও হুকুম এল জন খাটতে যাবার জন্য, কিন্তু এ আদেশ বিধি-বিরুদ্ধ জেনে আমরা তা পালন করতে অস্বীকার করি। বন্দীদের তরফ থেকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য চারজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়, তাতে ছিলাম আমি, হ্যারি কামান্ডা নজোরোগে, গাথোগো মুইটুমি ও ওয়ামবুগু কামুইর। আমরা কর্মাধ্যক্ষকে ধীর কিন্তু নিশ্চিত-ভাবে জানাই যে, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী না হওয়ার ফলে জন খাটতে কেউ আমাদের বাধ্য করতে পারে না এবং এইভাবে জন খাটতে অস্বীকার করার স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক অস্থায়ী চুক্তির ১৮ ই খ নম্বর ধারার সমর্থনও আছে। তাঁকে আরও বলি যে, এ নিয়ে আমরা কোনরকম মারামারি বা অযৌক্তিকর কাজ করতে চাই না, কিন্তু জন আমরা খাটব না। আমাদের প্রতিবাদ কর্তৃপক্ষ মেনে নেন এবং বলেন যে, শুধুমাত্র খাওয়াদাওয়া বা চান করার জন্য ছাড়া আমরা যেন তাঁবুর বাইরে না যাই। আমাদের তাঁবুগুলি খুবই বড় আকারের ছিল এবং এক-একটিতে ১০০ জন করে শুতে পারতো; আমরা এগুলি ব্যারাক বা সৈনাশিবির বলতাম। কোন কাজ না থাকায় আমরা সারাদিন রাজ-নৈতিক আলোচনা ও লেখাপড়া শেখার বা শেখানর কাজে ব্যস্ত থাকতাম। এখানে আবার আমাদের কাগজ-কলম, বইপত্র কিনতে দেওয়া হবে জেনে আমি খুবই আশ্বস্ত হয়েছিলাম। আমরা কিছু কিছু ইংরাজী মাসিক পত্রিকা এবং একটি ইংরাজী অভিধান আনাই। পড়ানর বিষয় বেশিরভাগ কাজের ভার ছিল জন্ গাকুয়ার ওপর, সে এখন নেয়েরী শহরে স্কুল মাস্টারের কাজ করছে। জন খুব ভাল পড়াতে পারতো এবং বন্দীদের সকলকেই সে খুব সাহায্য করেছিল তাদের 'নিরক্ষর' নাম ঘোচাতে। দলের নেতা হিসেবে অন্যান্য কাজ করার পর আমার আর পড়বার বিশেষ সময় থাকতো না। আমি বেশিরভাগ নিরক্ষর বন্দীদের হয়ে তাদের বাড়িতে চিঠিপত্র লিখে দিতাম, প্রয়োজনমতো প্র তি বা দ প ত্রা দি লিখতাম, কর্মাধ্যক্ষর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতাম এবং শিবিরের পরিচালনার কাজ করতাম।

এ ছাড়া আমার আরও কাজ ছিল 'কামোংগো টাইমস্' নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা করা, যা আমরা মাইয়ুসিতে আসবার পর চালু করে-ছিলাম। লাও উপজাতীয় ভাষায় কামোংগো শব্দের অর্থ হল একরকম বড় মাছ, যা ভিক্টোরিয়া হ্রদে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট এবং চওড়ায় আঠারো ইঞ্চি অবধি হয়, তা ছাড়া খেতেও খুবই সুস্বাদু। মাইয়ুসি দ্বীপে অবস্থিত বন্দীরা প্রায়ই হ্রদের ধারে জলা জায়গায় এই মাছ ধরতো এবং এর ঝোলও ভারি ভাল হয় খেতে। এই মাছেদের খাদ্য অন্বেষণের ধারাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরা জলো জায়গায় মাটির তলায় গর্ত করতে করতে দশ-বারো ফিট এগিয়ে আসে ডাঙার দিকে ও তারপর মাটি ভেদ করে ঘাসের ওপর ওঠে, ফলে সেখানে একটি ছোট জলার সৃষ্টি হয়। তারপর গর্তের ভেতর লুকিয়ে থেকে তারা অপেক্ষা করে ছোট ছোট পোকা-মাকড় বা জীব-জন্তুর ঐ জলায় জল খেতে আসবার জন্য এবং তখন তারা শিকার হয় মাছের পেটে গিয়ে। বন্দীদের ভেতর কেউ ঐ রকম একটি জলা দেখতে পেলে আরও কয়েকজনকে ডেকে আনতো মাছ ধরবার জন্যে এবং জলার মুখে শুধু তার ল্যাজের অবস্থান থেকে মাথা কোথায় আছে তার আন্দাজ করে সবাই একসঙ্গে পাঙ্গা (দা জাতীয় অস্ত্র) চালাত—যদিচ মাথা এবং মাছের বাকি অংশ মাটির তলায় বন্দীদের দৃষ্টির অগোচরেই থাকতো। এভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা শিকার ধরতে সক্ষম হতাম, যদিচ কখনো কখনো শুধু ল্যাজের টুকরাই পেতাম আমরা, আর ল্যাজহীন বাকি মাছ তখনকার মতো পালিয়ে বাঁচতো জলের ভেতর। কামোংগো মাছ ওজনেও খুব ভারি হয়, দুজন লোকের কমে তাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আমরা কিকুয়ু উপজাতীয় লোক,

কাজেই মাইয়ুসির মতো ছোট দ্বীপে চারদিকে সবুজ শ্যামলিমা এবং হিংস্র কুমীরে ভর্তি অথৈ হ্রদের জলের মাঝে থাকতে বড় অদ্ভুত লাগতো। এখান থেকে পালিয়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না এবং কয়েকদিন থাকার পরেই আমাদের মনে ভাবনা উদয় হতে আরম্ভ করেছিল : এই জায়গা ছেড়ে কি কোনদিন আর আমাদের নীল পাহাড়, লাল মাটি এবং সবুজ প্রান্তরের মাঝে ফিরে যেতে পারবো? আমাদের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন কেণ্ডাল বলে একজন কানাড়ার অধিবাসী, আমরা তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'কাবিমানজাগা'—উলঙ্গ ফকির, কারণ, মাইয়ুসিতে থাকাকালীন তিনি শুধু ছোট্ট একটা হাফপ্যাণ্ট পরেই সময় কাটাতেন, গায়ে অন্য কোন জামা বা গেঞ্জি না পরেই। তিনি আমাদের ওপর কোনরকম মারধোর করতেন না, কিন্তু জন খাটতে আপত্তি করার ফলে আমাদের ওপর তিনি একেবারেই সদয় ছিলেন না। আমরা মাইয়ুসিতে পৌঁছবার আগে যে সব বন্দী সেখানে ছিল, তারা সবাই দ্বীপের ব্যাপক ক্ষেত-খামারে কাজ করতো। এখানে পেঁপে, কাসাভা (রাঙা আলুর মতো, শর্করাজাতীয় এক খাবার), ভুট্টা ও নানারকম তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। আমরা দ্বীপে যাবার পরেই যাতে ঐ সমস্ত বন্দীদেরও উস্কে দিতে না পারি, এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের প্রায় সবাইকেই বদলি করে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেন, শুধু জনা তিরিশেক চরমপন্থী ছাড়া। এর ভেতর ছিল আমার পুরনো বন্ধু জেমস্ থুকু মানুগোথি, সে বহুকাল আগে গ্রাইয়নের ফার্মে এসে তার সঙ্গে পরিষ্কার ইংরেজীতে কথাবার্তা বলে আমার বালকমনেও ইংরেজী ভাষা শেখার স্পৃহা জাগিয়েছিল।

আমরা জন খাটতে আপত্তি জানিয়েছিলাম বলে কর্মাধ্যক্ষ আমাদের র্যাশনের পরিমাণ কমিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশ বলবৎ হলে পর আমরা নিরস্ত্র সত্যাগ্রহ ব্রত অবলম্বন করি এবং বন্দীরা সবাই আমাকে কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে অনুরোধ করে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ নিয়মের বলে তিনি আমাদের র্যাশন কমিয়েছেন এবং সে নিয়মের উল্লেখও করতে বলি তাঁকে। তিনি কোন লিখিত নিয়ম দেখাতে পারেন নি, বরং আমি যখন তাঁকে বন্দীদের নিম্নতম খাবার পরিমাণ কতটা হবে, এর নিয়মকানুনগুলি মুখস্থ বলে শোনাই, তখন তিনি খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মানিয়ানি শিবিরে থাকার সময় থাকাকালীন আমি কুড়ি শিলিং খরচ করে এক আকামুবা প্রহরীর সাহায্যে কেনিয়া সরকারের বন্দিশিবিরের নিয়মাবলীর একটি কপি যোগাড় করেছিলাম। আট পৃষ্ঠার এই চটি বই-এর জন্য কুড়ি শিলিং পয়সা খরচ করতে আমার খুবই গায়ে লেগেছিল, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনবোধে আমি তা কিনেছিলাম ও অতি সাবধানে আমার কোটের আস্তরের ভেতর লুক্কায়িত টাকা-পয়সার সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি কর্মাধ্যক্ষ কেণ্ডালকে বলি যে, আমরা এ বিষয়ে কোন গোলমাল করতে চাই না, কিন্তু আমাদের র্যাশন যেন অবিলম্বে আগের মতো দেওয়া হয়। মাইয়ুসি শিবিরে মশার সংখ্যা ছিল অগুন্তি, কাজেই আমি তাঁকে আরও বলি যে, আমাদের ডাক্তারি চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের বন্দোবস্ত আরও ভাল হওয়া প্রয়োজন। আমার দুটি নিবন্ধই গ্রাহ্য হয়।

তথাপি, বন্দিশিবিরের মহাধ্যক্ষ আমাকে ষোলদিন যাবৎ নিঃসঙ্গ কারাগারে বন্দী করে রাখবার ও শুধুমাত্র শাস্তিমূলক (খুব কম পরিমাণে) খাবার দেবার জন্য কর্মাধ্যক্ষের অনুরোধকে মেনে নিয়েছিলেন। আমি বন্দীদের নেতা হিসেবে তাদের জন খাটতে বারণ করেছিলাম এবং তাদের নিয়ে জোট পাকিয়ে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহের আয়োজন করেছিলাম, তাই আমার জন্য এই শাস্তি নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু নিঃসঙ্গ কারাগারে ষোলদিন আমার মোটের ওপর ভালই কেটেছিল, কারণ, এখানকার লুও উপজাতীয় প্রহরীরা ছিল আমার প্রতি সহানুভূতিশীল, কাজেই তারা সানন্দেই আমাকে রান্নাঘরে যে সব বন্দী কাজ করছিল তাদের পাঠান বাড়তি খাবার পৌঁছে দিত। ফলে আমার ওজন ক'দিনে একটু বেড়েই গিয়েছিল! আমার সব থেকে বেশি অসুবিধা হয়েছিল এই কারণে যে, ঐ ক'দিন আমি নিজের মনে ভাবনায় মগ্ন থাকা ছাড়া আর অন্য কিছুই করতে পারি নি। ঐভাবে আমার একা থাকার সময়েই কিমুমুর ওডিয়াগা বন্দিশালা থেকে বাকথাকি ১০০ জন বন্দীও মাইয়ুসিতে এসে পৌঁছায়। এর ভেতর আমার বন্ধু রবিনসন মোয়ানগীও ছিল, তার কাছে আমি পরে জানতে পারি যে, যদিচ সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ ছিল না, তবুও তাদের খাবার-দাবার অন্তরীণ বন্দীদের বদলে শাস্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মতো ছিল। সে আরও বলে যে, তারা সবাই মাইয়ুসিতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। [ক্রমশঃ]

দুনিয়াজোড়া শ্রেণী-সংগ্রাম উদ্বেল হয়ে উঠছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। পর্তুগীজ উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই চলছে নিজস্ব কায়দায়। এ সবই শ্রেণী-সংগ্রামের অভিব্যক্তি। নির্যাতীতরা সারা দুনিয়ার নিপীড়নকে রুখতে আজ কদম ফেলেছেন। বিশ্বব্যাপী মতাদর্শগত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক—সব রকমের শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র রূপ নিচ্ছে। শোষক আর শোষিতের মধ্যে, নিপীড়িত আর নির্যাতনকারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে উঠছে।

বিভিন্ন শ্রেণী হল জনসাধারণের কতকগুলো বড় বড় জোট। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা কে কোন স্থান অধিকার করে রয়েছে তারই দ্বারা, উৎপাদনের উপায়-উপকরণের (কলকারখানা, যন্ত্র, খনি, পিট, জমি) সঙ্গে কার কি সম্পর্ক, তার দ্বারা এই জোটগুলোর পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচীত হয়। উৎপাদনের এই উপায়-উপকরণগুলো যাদের কব্জায় থাকে, তারা অপরের শ্রমকে শোষণ করে। যাদের কোনও সম্পদ নেই বা প্রায় নেই বললেই চলে, তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তিকে শুষে নিয়ে সেই মুনাফায় এরা জীবন নির্বাহ করে ফুলে-ফেঁপে ওঠে। গায়ের রং, জাতি-ধর্মের দ্বারা নয়—শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কিছু লোককে বিশেষ বিশেষ সুবিধা ভোগ করার ব্যবস্থা রাখা হয় অন্যদের দারিদ্র্য অধিকার-বঞ্চিত শেকল-পরানো শর্তে মুনাফা কামানোর উৎস হিসেবে বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের গহ্বরে।

পুঁজিতন্ত্র সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি সৃজন করার সাথে একই সময়ে এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক শক্তিকে—শ্রমিক শ্রেণীকে জন্ম দিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করার সাথে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির ব্যবস্থা করে—তার নেতৃত্বে মানুষ এমন দিগ্‌দর্শন পায়, যেখানে সামাজিক ও জাতীয় নির্যাতন থাকে না।

শ্রমিক শ্রেণী হল একমাত্র শ্রেণী, যাদের উৎপাদনের সম্পর্কগুলোর ওপরে মালিকানা অধিকার নেই এবং সেকারণ সাধারণ মালিকানাধীনে আনতে আগ্রহী। এরা সব সময় সবচেয়ে বেশি ধনবাদী শোষণ সম্পর্কে সচেতন। তার ফলে এই শ্রেণী ধনবাদী ব্যবস্থার অবিচলিত ও অপ্রতিরোধ্য শত্রু। এর মূলগত শ্রেণী স্বার্থই একে ধনবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রেরণা যোগায়।

বড় বড় শ্রমশিল্প প্রকল্পে শ্রমের অবস্থাই শ্রমিকদের সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করেছে।

শ্রমিক শ্রেণীর সুসংগঠিত অবস্থা, তার সুতীক্ষ্ণ শ্রেণী-চেতনা, তাকে কার্যকরী বৈপ্লবিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে। সারা দুনিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর কাছে পুঁজিবাদই একমাত্র ও অভিন্ন শত্রু। তাদের উদ্দেশ্যও এক এবং অভিন্ন—পুঁজিবাদী শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করা, আর তার লক্ষ্যও অভিন্ন তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিজম গড়ে তোলা। শ্রমিক শ্রেণী তাই আন্তর্জাতিক ভিত্তিতেই সঙ্ঘবদ্ধ এবং তার ব্যাপকতা বিশ্বব্যাপী।

মুক্তি সংগ্রামে তাই অপরাপর মেহনতী জোটের চেয়ে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক দায়িত্ব ও গুরুত্ব বেশি। মাত্র একটি শ্রেণী—সাধারণভাবে শ্রমশিল্প প্রকল্পের শ্রমিকরা ধনবাদী জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির লড়াইয়ে সমস্ত মেহনতী জনতাকে নেতৃত্ব দেয়। একই কারণে সৃষ্টিশীলতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়। আন্দোলনের ক্ষেত্র শুধু অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ রাখা চলতে পারে না—রাষ্ট্র, গোষ্ঠী, পরিবার, ব্যক্তি তথা সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সামাজিক প্রথা সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করতে হয়। অন্যথায় অর্থনীতিবাদী প্রবণতা প্রাধান্যলাভ করে চরম লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ততাবাদের গাড্ডায় ফেলে দেবে। শ্রমিক শ্রেণীকে তার সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অর্থাৎ সর্বাত্মক সংগ্রামের দিকে সম্মুখে ঘোরাতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মৃগয়া ক্ষেত্র এই ভারত। এখানকার ৫০ কোটি মানুষ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস, সামন্তদের শোষণের ফলে দারিদ্র্যে জর্জরিত। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের পালের গোদা মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের সঙ্গে মহান সোভিয়েট দেশের দলত্যাগী রাষ্ট্রকর্তৃত্ব শুধুমাত্র সহ-অস্তিত্বের শান্তিপূর্ণ বাহনই নয়—পরন্তু ভাগীদার।

ভারতের ব্যাপক জনতার বুকে তাই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আরও তিন পাষাণ চেপে তার দৈনন্দিন জীবনকে ওষ্ঠাগত করে ছাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজির উৎখাত ছাড়া ভারতের জনতার মুক্তির কোনও সর্টকাট নেই। স্বাভাবিকভাবে আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতের বর্তমান বিপ্লবের স্তর হল নয়া গণতান্ত্রিক—যার মূল লক্ষ্য কৃষি-বিপ্লব। কৃষক শ্রেণীই এর প্রধান শক্তি এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ও মিত্র শ্রেণীর যুদ্ধই এর পথ এবং সমস্ত শোষণজর্জর গ্রাম এলাকাই এই লড়াই-এর প্রধান ঘাঁটি। এ যুদ্ধ

যেতে সমর্থ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রের ওপরে আর তার স্নায়ুগুলোর ওপরে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী অর্থনৈতিক দিক থেকে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—দু'ভাবেই মেহনতী জনতার বিপুল সংখ্যাধিক্যের যথার্থ স্বার্থগুলির অভিব্যক্তি দিয়ে থাকে। সমকালীন বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলনের জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাধিনায়কত্ব শর্তহীনভাবে অপরিহার্য।

শ্রেণী-শত্রু উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকের আক্রমণাত্মক সংগঠন হল তার পার্টি। আর ট্রেড ইউনিয়ন হল শ্রেণী-শত্রুর আক্রমণ থেকে শ্রমিকের আত্মরক্ষার সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়ন অর্থনৈতিক দিক

বিপ্লবী জনযুদ্ধ। বিপ্লবী জনযুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ, ব্যাপক জনগণকে জাগ্রত ও সমবেত করে এই যুদ্ধে চরম জয়ের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে তার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বিপ্লবী পরিস্থিতি যখন চমৎকার, সে সময় শ্রমিক শ্রেণীকে নির্বাচনবিলাসী বা আন্দোলনির্ভর করে রাখা আন্তর্জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা।

এখন আর শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ নেই। আইনসভার অন্তর্গত সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মুখ্যরূপ পরিগ্রহ করা কোনওক্রমে সম্ভব তো নয়ই—পরন্তু আইনসভার মোহ কাটিয়ে সংঘাত শুরুর সময়ে প্রবেশ করা গেছে। প্রকাশ্য বিপ্লবী লড়াই-এর যুগে শ্রমিক সংগঠন যে বিরাট ও চূড়ান্ত গুরুত্ব লাভ করে, পূর্বে তার সে গুরুত্ব থাকে না। ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলো শান্তির পথে নিয়মতান্ত্রিকতার পথিক—সংগ্রামের হাতিয়ার নয়। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য সাধনে শ্রমিকদের পরিচালনা করার উপযুক্ত জঙ্গী সংস্থা নয়, শ্রমদপ্তর, সরকার ও মালিক শ্রেণীর কাছে 'কনসেসন' আদায়ের জন্য দর কষাকষির যন্ত্রমাত্র। উন্নত পর্যায়ে আইনসভার নির্বাচন ও সংসদীয় কায়দার কচকচানীতে পারদর্শিতা প্রদর্শনের শিক্ষায়তন হয়েছে। শ্রমিক সংগঠন পার্লামেণ্টারী উপদলের লেজুড়ে পরিণত হলে এ অবস্থাই ঘটে। এহেন শ্রমিক সংস্থার নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লবের পরিচালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কোন স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়।

মন্ত্রিত্বের রঙের হেরফেরে শাসনকাঠামোর চরিত্র বদলায় ও শাসনযন্ত্রের ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে বলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের মুখ দিয়ে কিছু বুলি শাসকশ্রেণী ফুটিয়ে তুলছেন। অবশ্য ঐসব বুলির সঙ্গে বিপ্লবী অর্কেস্ট্রার সুরব্যঞ্জনা রেখে তাকে সংগ্রামী কোটিং ধরানো হচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, পুরনো শোষণকারী সমাজব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যেই এই শাসনযন্ত্র। তারা কায়দা বদলিয়ে শোধন ব্যবস্থার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে মাত্র।

অর্থনীতিবাদসর্বস্ব নেতৃত্ব দীর্ঘকাল সংগঠনকে কব্জায় রাখলেও অনুন্নত অর্থনীতির এই লীলাক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনসাধারণের দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতায় বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী একটা ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আজ রঙ-বেরঙের শোধনবাদীরা এক অংশকে অপরের নানান ফন্দীতে প্রভাবিত অংশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে সেই ঐক্যকে চূর্ণ করছে এবং জঘন্য প্রয়াসকে পবিত্র রাজনৈতিক কর্তব্য বলে জাহির করে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার নিরলস প্রোগ্রাম রাখছে।

প্রতিক্রিয়াশীলেরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে তাদের কব্জায় নিয়ে গেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কব্জা করেছে যোগাযোগ, পরিবহণ ও বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রগুলি। রাসায়নিক শিল্প ও সার তৈরির ক্ষেত্রেও তারা নাক গলিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে তারা অনেক শিল্পকে তাবে এনেছে। ভারতীয় সাইনবোর্ড এঁটে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছে। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ন্ত্রণ করছে লোহা ও ইস্পাতশিল্পের সিকি ভাগ, তৈল শোধনের অর্ধেক এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ। এ ছাড়া রপ্তানী বাণিজ্যের বহুলাংশে ওদের 'খবরদারী' এসে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ওপর স্বত্বভোগ করে শুধু যে জনগণকেই শুষে ফেলছে, তাই নয়, এটা আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতিও বটে। অর্থনীতি এবং প্রশাসনের ওপর তাদের থাবাকে দৃঢ়তর করার জন্যে শ্রমিক ঐক্যকে ধ্বংস করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে যে মুক্তি-যুদ্ধ চলেছে, তাতে ভারতের শ্রমিকরা যাতে সামিল হবার, একাত্ম হবার সুযোগ না পায়, তার জন্যে বিপ্লবী বুলির আড়ালে শ্রমিকদের ছিন্নভিন্ন করার ঠিকাদারী কিছু তাঁবেদার সংগঠনকে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে জাতিদম্ভের প্রকাশ ঘটাতে পারলে শ্রমিকের আন্তর্জাতিকতাকে অঙ্কুরে নাশ করা যায়।

সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য নব চেতনায় উন্মেষ যখনই লক্ষ্য করেছে, তখনই সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় সেবাদাসগোষ্ঠী চঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং নতুন কায়দায় তাদের লড়াইকে পরিচালিত করতে চাইছে।

এ সবের জবাব শ্রমিকের সংহতি। সে সংহতি শ্রমিক নতুন কায়দায় লড়াই-এর পথ চালু করে গড়ে তুলতে পারে। যার ফলে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে হবে ত্রাসের সঞ্চার এবং শ্রমিকরা ক্রমান্বয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকবে। শ্রমিকরা কখনই ভুলতে পারে না যে, তাদের ক্ষমতা দখলের যুগ শুরু হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষের রক্ষক হচ্ছে রাষ্ট্রযন্ত্র। তার সঙ্গে নিরস্ত্র লড়াই-এর অর্থ মৃত্যু। শত্রুকে তার দুর্বল কেন্দ্রে আঘাত হেনেই তার পতন ঘটাতে হবে। মিত্র শ্রেণী আজ প্রস্তুত। তাদের নেতৃত্ব দেবার চরম মুহূর্তে শ্রমিক শ্রেণী তার সংহতিকে ধ্বংস করতে দিতে পারে না। বিজয়ের পথে এগুতে চরম ত্যাগের জন্য শ্রমিক আজ প্রস্তুত। সব চক্রান্ত তাই ব্যর্থ হবে—মোহজাল ছিন্ন হবে। সংহতির বুনিতে এর জন্য নতুন কোনও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গজাবার দরকার নেই। পুরাতন কেন্দ্রের মাধ্যমেই শ্রমিকের সংহতি গড়ে উঠবে নতুন কায়দায় লড়াই-এর মধ্যে—তবে তার মন্ত্র হবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা ও তার শ্রেণী-বোধ এবং বিপ্লবী পরিস্থিতিতে তার কর্তব্য সম্পর্কে প্রেরণা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তাই ফরাসীরা যখন ১৯৫৪ ছেড়ে যায়, তখন কম্বোডিয়া শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল তাই নয়, শিল্পক্ষেত্রেও ছিল এক অনগ্রসর দেশ। উন্নয়নমূলক কাজ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যমূলক কাজ, কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা, আমদানী-রপ্তানী ও নানা ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে এক উদাসীন অর্ধমৃত নরনারীর বাসস্থান। আশি বছর শেষে তবু ও দেশে আটজন গ্রাজুয়েট ছিল, কিন্তু একটিও বড় কারখানা ছিল না। কম্বোডিয়াবাসীও ছিল তেমনি। সারা দেশময় প্রচুর অনাবাদী জমি ছিল। কিন্তু নিজের প্রয়োজনীয় ধান উৎপাদনের বাইরে তারা বেশি জমিতে চাষ করত না। ফলে কৃষিযোগ্য জমির ওপর কোন চাপ ছিল না বলে জমি নিয়ে মানুষের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হত না। জমিতে চাষও হত সেই সনাতন আদিম প্রথায়। বলদ বা মোষ দিয়ে হলকর্ষণ। বাদবাকী কাজে মানুষের দুখানি অক্লান্ত হাতই ছিল একমাত্র নির্ভরশীল যন্ত্র। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগে দেশের আবাদী-অনাবাদী জমিতে চাষ হলে কম্বোডিয়া পৃথিবীর বহু অন্নক্লিষ্ট মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে পারবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় দেশের বহু সমস্যার সমাধান করতে পারবে, দেশের রূপ পাল্টে দিতে পারবে। কম্বোডিয়ায় আজ কৃষি-বিপ্লব শুরু হয়েছে। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

কম্বোডিয়ায় মাছ ধরার পদ্ধতিও আদিম। নদী ও জলাশয়ে জাল ফেলে মাছ ধরা। ঠিক যেন বাংলা দেশের জেলেদের মাছ ধরা। বাংলা দেশের জেলেরা এক আলাদা সম্প্রদায়। তাদের পেশা ও জীবিকা হচ্ছে মাছ ধরা ও মাছ বিক্রি। কিন্তু কম্বোডিয়ায় আলাদা সেরূপ কোন সম্প্রদায় নেই।

[illegible] পেশা ও জীবিকাভেদে কোন বর্ণ সৃষ্টি হয় কি? বলে [illegible] নেই। নেই তার প্রতিক্রিয়া, সবাই জাতিগতভাবে কম্বোডিয়াবাসী, ধর্মে বৌদ্ধ, তাই মেকং টনলিসেপ, গ্রেটলেক প্রভৃতির তীরে যারা বাস করে, তারা প্রায় সবাই মাছ ধরে নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে। কারণ ও দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ-ভাত।

আবার কৃষিজীবী বলেও কম্বোডিয়ায় পৃথক কোন সম্প্রদায় নেই। যার জমি আছে, সেই চাষ করে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি-জমি নেই এরূপ পরিবার বিরল। একই ধর্মে বিশ্বাসী মানুষ বলেই হোক, কিম্বা তেমন অগ্রচিন্তা নেই বলেই হোক, কিম্বা বর্ণ ও শ্রেণীর কুফল না থাকার ফলেই হোক, সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ-বিদ্বেষ ছিল না। প্রত্যেকের মনে একটা সম্প্রীতির শুভভাব বিরাজ করত। তাই দেশে কেউ হেয় নয়, কেউ শ্রেয় নয়। সবাই সমান।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, হাজার বছর আগে কম্বোডিয়া এক স্বাধীন নৃপতির অধীনে উন্নত জাতি হিসাবে খ্যাত ছিল। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শৌর্যে, ভাস্কর্যে ও স্থপতিবিদ্যায় দেশবাসী বিশেষ পারদর্শী ছিল। সংস্কৃত-বিশেষজ্ঞ ভারতীয় পন্ডিতদের ও চীনা পরিব্রাজকদের নানা বিবরণ থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।

বিশেষ করে আংকোর ভাট মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে এবং তখনকার রাজধানী হরিহরালয়ের ধ্বংসস্তূপে শিলালিপির পাঠোদ্ধার করলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। পরবর্তীকালে বাওতাম জোট-এর যৌথনির্মিত বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধখচিত বৌদ্ধ মন্দির-এর কিছু আভাস দেয়। আজ কম্বোডিয়ার সেই স্বর্ণযুগের [illegible] ইতিহাসের পাতায় [illegible] নিয়েছে।

[illegible] প্রথম শতাব্দীর [illegible] রাজধানী [illegible] কম্বোডিয়ার দক্ষিণে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁদের আধিপত্য উত্তর কম্বোডিয়া অবধি বিস্তৃত ছিল। উত্তরের অধিবাসীরা ছিল খেমের জাতীয়। এই খেমেররা ছিল রাজার স্বজাতি। ইতিহাস-বিখ্যাত আংকোর ভাট এবং পরবর্তী সময়ে আংকোর টম, জোড়া সর্পমন্দির, মেবো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য মন্দির এই খেমেররাই তৈরি করেন। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুমূর্তি ও ভেতরে বৌদ্ধমূর্তি, সর্পমূর্তি, কপিলরাজ বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধরত মূর্তি, গণেশমূর্তি প্রভৃতি তাঁদের সূক্ষ্ম ভাস্কর্য প্রতিভার পরিচয় দেয়।

চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ, নানা ইতিবৃত্ত ও ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার গবেষকদের মতে, এখানে তখন ফুনান বংশ রাজত্ব করত। ফুনান রাজত্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে ফুনান সভ্যতা ও সামাজিক কাঠামোয় বৌদ্ধ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তা হলেও দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব পাশাপাশি অবস্থান করে মানুষের মনে এক অপূর্ব সহনশীল ভাবের সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও দেশের মানুষ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের শিরে লগুড়াঘাত করে নি। আজকের কম্বোডিয়ার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সদিচ্ছার মূল শেকড় মানুষের মনে সেই সময় থেকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফুনান রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে, শাসনব্যবস্থায় নানা অযোগ্যতা প্রকাশ পায়। সে সময়ে চেনাল নামে এক সামন্ত নৃপতি দেশ আক্রমণ করে ফুনান রাজবংশের অবসানে সচেষ্ট হন।

দেশের উত্তর অংশে তখন কাম্বোজা নামে এক জাতি ছিল। এই কাম্বোজরা ফুনান বংশের এক শাখা ছিল বলে অনুমান করা হয়। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কম্-

বোজার শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং শাসনকর্তা ও তাঁর ভাই মিলে ফুনান সাম্রাজ্যের অধীনতামুক্ত হয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করেন। পরবর্তী শতাব্দীতে এই কামবোজা রাজবংশের উত্তরাধিকারগণ ফুনান রাজত্বের পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে সমস্ত দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই কামবোজা থেকেই সম্ভবত কম্বোডিয়া নামের উৎপত্তি।

এর পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কম্বোডিয়ার ইতিহাস এক গৃহযুদ্ধের কলঙ্কিত অধ্যায়। ফলে দেশ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত হয়। পরিণামে জাভার সম্রাট গৃহযুদ্ধের ফলে দ্বিখণ্ডিত কম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশ দখল করে রাজপুত্রকে বন্দী করে জাভায় নিয়ে যান। যুবরাজ বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করে কম্বোডিয়ায় ফিরে এসে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মা নাম গ্রহণ করেন। তিনি কম্বোডিয়াকে জাভার অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত করে সারা দেশকে এক শাসন-শৃঙ্খলার আয়ত্তে আনেন। গ্রেট লেক জলাধারের কাছে আংকোর-এ রাজধানী স্থাপন ও পরবর্তীকালে আংকোর নগরে নানা কীর্তি-কাহিনীর তিনিই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আংকোর নগরে তাঁর রাজপ্রাসাদের নামকরণ করা হয় হরিহরালয়। হরি ও হর অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের মিলনক্ষেত্র। রাজপ্রাসাদের উপরে এই যুগ্মমূর্তি স্থাপন করা হয়। রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মা নিজেকে কম্বোডিয়ার অধীশ্বর ঘোষণা করা ছাড়াও নরদেহরূপী বিষ্ণু অবতার বলে সর্বত্র প্রচার চালাতে থাকেন। তিনি দেবরাজ বলে নিজেকে প্রচার করে বলেন যে, মৃত্যুর অর্থাৎ নরদেহ ত্যাগ করার পর তিনি স্বস্থান মেরু পর্বতে আপন গৃহে প্রস্থান করবেন। দ্বিতীয় জয়বর্মার পরবর্তী রাজারাও এই ধারণার জের টেনে মৃত্যুর পর বসবাসের জন্য পর্বতে কল্পিত দেবালয়ের অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করে রাখতেন। এভাবে আংকোর টম-এর পত্তন হয়। আংকোর শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ। টম শব্দের অর্থ হচ্ছে নগরী, তাই সাধারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই অতি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, দেবতারা ও দেবপ্রতিনিধি রাজারা প্রস্তরনির্মিত গৃহে বাস করেন।

রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রাজা সপ্তম জয়বর্মার কীর্তি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কম্বোডিয়ার সভ্যতা ও স্বর্ণযুগের প্রধান কীর্তি-কাহিনীর তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারিগণ আংকোর ভাট-এর হানা-বিধ্বস্ত মন্দির ও কীর্তিস্তম্ভ রক্ষায় সক্ষম হন নি। উপরন্তু তাঁরা শ্যাম ও চম্পকবাহিনীর অবিরত হানা ও আক্রমণ রোধে ব্যর্থ হয়ে চৌদ্দশ' বত্রিশ খৃস্টাব্দে আংকোর নগরী থেকে রাজধানী নমপেন-এ স্থানান্তরিত করেন। শ্যাম রাজারা এই পরিত্যক্ত নগরী কয়েক বছর দখলে রাখেন। অবশেষে নানা অবস্থা বিপর্যয়ে হতাশ হয়ে তাঁরা আংকোর ত্যাগ করে চলে যান।

আংকোর নগরীর জাঁকের প্রাসাদে অবাধে জাঁকিয়ে পশুরাজ ও টিকটিকিদের আসর জমে ওঠে। হানাদারদের স্থান দখল করে জঙ্গল বাহিনী। নানা তরুলতায় পরিবেষ্টিত হয়ে উঠে আংকোর নগরী। পাতায় ঢাকা পড়ে পাথরের খিলান। আস্তে আস্তে বিস্মৃতির গর্ভে চলে যেতে থাকে এক প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণরাঙা মুহূর্তগুলি। তখনকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের নিপুণ ও পারদর্শী খেমের জাতিদের বংশধরেরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই সব লতাপাতা-ঘেরা মন্দির চূড়াগুলির দিকে। চেয়ে থাকে আর ভাবে, এই সব পরিত্যক্ত দেবলীলার মহিমার কথা। নানা গল্প-কাহিনীতে তাদের মন ছড়িয়ে আছে এই সব প্রাচীন স্বর্গরাজ্যের অধিবাসীদের মর্তলীলা। কম্বোডিয়ার সেই স্বর্গরাজ্যের কথা আজো ইতিহাসের গবেষণাগারে, চিত্রলিপি বিশারদদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়সূচীতে।

আংকোর নগরীর খেমের জাতীয় শিল্পী-কারিগররা শ্যাম রাজ্যের সেনাবাহিনীর তাণ্ডবের ভয়ে নগরী ছেড়ে পালাবার সময় শুধু তাদের সঙ্গে যন্ত্রপাতি ফেলে যায় নি, তাদের শিল্পমনকেও ফেলে গিয়েছিল। তারা যেন এক আত্মবিস্মৃত মানুষ। শিল্পের পেশা-নেশা ছেড়ে পাশপারণের তাগিদে জীবনের বৃত্তিতে আত্মনিয়োগ করেছে। অশিক্ষার ফলে অন্ধ সংস্কারের এক অলৌকিক ধারণা তাদের মনে বাসা বেঁধে আছে। ভাবতেই পারে না আংকোর নগরীর স্থাপত্যকীর্তি তাদের পূর্বপুরুষদের মস্তান অবদান।

কম্বোডিয়ার হীনবল রাজারা চৌদ্দশ' বত্রিশ খৃস্টাব্দে তাঁদের রাজসিংহাসন আংকোর নগরীর রাজপ্রাসাদ হরিহরালয় থেকে সরিয়ে আনেন মেকং নদীর পশ্চিম তীরে স্থাপিত নতুন রাজধানী নমপেন-এ। তার ঠিক ৪৩০ বছর পরে ১৮৬২ সালে ফরাসীরা কম্বোডিয়া দখল করে। কম্বোডিয়ার তদানীন্তন রাজা বর্তমান প্রিন্স নরোদম সিহানুকের প্রপিতামহ নরোদম একরকম বিনা প্রতিরোধে ফরাসী সেনাপতির হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেন। চতুর ফরাসীরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করল না বা রাজবংশের বিলোপসাধনের পথে পদক্ষেপ করল না। তারা রাজা নরোদমকে মসনদে রেখে দেশশাসন দণ্ডটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিল। প্রত্যক্ষভাবে রাজা রইলেন নরোদম, কিন্তু পরোক্ষে রাজার রাজা হলেন ফরাসী রেসিডেণ্ট গভর্নর। ফরাসী গভর্নর অবশ্য রাজকোষের আসল চাবিকাঠিটিও নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কারণ অর্থবিহীন শাসনদণ্ড হল অর্থহীন।

বাহ্যত কম্বোডিয়ার একজন সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তনের ছবি প্রতিভাত না হলেও মূলত সবই পালটে গেল। এনাটমীর ছবিতে শিরা-উপশিরায় রক্তসঞ্চালনের মত ফরাসী শাসন-শোষণের ক্রিয়াকলাপ দেশের সর্বত্র এক কম্পন সৃষ্টি করল।

রাজা নরোদম বুঝলেন, রক্তক্ষয় বৃথা। আধুনিক রণবিদ্যায় শিক্ষিত, সর্বপ্রকার মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ফরাসী সেনাবাহিনীর কাছে কম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর শৌর্য, অস্ত্র অকিঞ্চিৎ। চার বছর আগে ফরাসী রণতরী ভিয়েৎনামের সায়গন ও টুরিন বন্দরে অবতরণও ছিল একপ্রকার বাধাহীন। অনাম ও চম্পক সেনারা ফরাসীদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি।

তা ছাড়া প্রায় সাড়ে চারশ' বছরের ইতিহাসে কম্বোডিয়ার সিংহাসনে কোন রাজনৈতিক, কোন সামরিক আবর্তের ঢেউ লাগে নি। তাই রাজপুরীর বিলাস কামরায় থেকে থেকে রাজার মনোবলও গড়ে ওঠেনি দৃঢ় সংকল্পে। নরোদম তেমন শক্ত ধাতুতে গড়া মানুষ ছিলেন না। সায়গন ও টুরিনের অবস্থাই যেন তাঁর কাছে নির্দেশের মত ছিল। তিনি বৃথা রক্তক্ষয়ের পথে এগোলেন না, শান্তির পথেই গেলেন।

পরাধীনতার বেদনায় বিক্ষুব্ধ হলেও জনসাধারণ নিরুপায়। রাজা রইলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। কিন্তু প্রধান নিয়ামক হলেন কম্বোডিয়ার
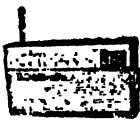
ফরাসী রেসিডেন্ট - গভর্নরের। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী, রবার বাগিচা, আখ ক্ষেত, নারকেলকুঞ্জ, ধান-ক্ষেত, মাছের আড়ত সর্বত্রই ফরাসী শক্তির অক্টোপাশ প্রসারিত হল।

রাজকীয় বাহিনী এল পূর্ণ ফরাসী সামরিক কর্তৃত্বাধীনে। রাজার নিজস্ব কিছু লাঠিধারী সেপাই রইল বটে, কিন্তু দেশরক্ষার মূল কর্তা হল ফরাসী ব্রিগেডিয়ার ও জেনারেলেরা। বিশ্বের সমস্ত উপনিবেশে এই একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কম্বোডিয়ায় ফরাসী কিছু ভিন্ন পথ নেয় নি শনৈ শনৈ এগিয়ে সব কিছু করতলগত করেছে। এইভাবে কয়েক দশক চলে গেল। রাজা নরোদম গেলেন। এলেন রাজা শিশোয়াত্ মণিভঙ। তিনিও ফরাসী শাসনের ছত্রচ্ছায়ায় কাটালেন দীর্ঘ কয়েক বছর। তাঁরও রাজত্বের কাল ফুরিয়ে এল এক সময়ে। এল রাজা নির্বাচনের পালা।

ঊনিশ শ' একচল্লিশ সাল। রাজা নরোদমের উত্তরাধিকারী হিসাবে মণিরথ রাজা হবেন নিয়মমাফিক। কিন্তু বাধা এল ফরাসীদের থেকে। তারাই এখন কম্বোডিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সুতরাং রাজা নির্বাচনের দায়িত্ব তাদের। তারা দেখল বৃদ্ধ স্বল্প-শিক্ষিত মণিরথের চেয়ে নবীন উচ্চ-শিক্ষিত প্রিন্স নরোদম সিহানুক অনেক নিরাপদ। কাজেরও বটে। সবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে এসেছেন। গায়ে এখনো ফরাসী সংস্কৃতির বিলাস। বহিরঙ্গে আধুনিকতা ও ফরাসী আভিজাত্যের ছাপ। চোস্ত ফরাসী ও ইংরাজী বলে। এক প্রাণোচ্ছল সাহেবী-শিক্ষিত নবীন যুবা। ফরাসীরা তো সেটাই চায়। তারা বাইরে এ সব চেপে গেল। এতো মনের কথা। মুখে বলল মণিরথ প্রৌঢ় হয়েছেন। তা ছাড়া পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই সিহানুকের দাবি অনেক বেশি। আঙ্কোরের রাজবংশের ধারা অনুযায়ী এটা তাঁরই প্রাপ্য।

রাজসিংহাসনের উ ত্ত রা ধি কা রী হিসাবে প্রিন্স নরোদম সিহানুকের দাবি স্বীকৃত হল ফরাসীদের অভিপ্রায় অনুসারে। মণিরথের প্রতি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজধানী নমপেন-এ মৃদু গুঞ্জন উঠল বটে, কিন্তু তা সোচ্চার হল না। ফরাসীরা এভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে পুষ্পহার ভেবে কাঁটার মালা গলায় পরাল। একেই বলে গ্রহের ফের, অদৃষ্টের পরিহাস।

ঊনিশ শ' একচল্লিশ সালে সিংহাসনে অভিষেকের সময় প্রিন্স নরোদম সিহানুককে মাত্র ঊনিশ বছরের এক নবীন যুবক রাজা হলেন বটে, কিন্তু রাজমুকুটের স্বর্ণশিখায় আত্মহারা হলেন না। বরং আত্মস্থ হলেন। দৃষ্টিপাত করলেন দেশের দুরবস্থার দিকে। দেশের শান্ত, সরল মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দিকে। বিদেশী শাসন-শোষণ ও নিপীড়নের চিত্র তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে তুলল। রাজমুকুট তাঁর কাছে কাঁটার মুকুট। সিদ্ধার্থের মতপ্রাণ ধর্মে দীক্ষিত রাজপুত্র যেন নির্বাণের স্বপ্নে মেতে উঠলেন। তবে এ নির্বাণ সন্ন্যাস গ্রহণ-মুখীন নয়, নয় আত্মকেন্দ্রিক। যেন দেশের সমস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ করে এক মহা বিজয়যাত্রা, স্বাধীনতা, শান্তি প্রগতির এক মহানির্বাণ মিছিলের স্বপ্ন।

প্রিন্স নরোদম সিহানুক যখন রাজতখত্ পেলেন, তখন সারা বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় মহাসমরের নিধনযজ্ঞের তান্ডব-নৃত্য চলছে। ফ্যাসীবাদ ক্ষিপ্ত বাজ-পাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিকারের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সুরু হয়েছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবি, স্বাধীনতার আন্দোলন। বিভিন্নভাবে এই আন্দোলন রূপ নিয়েছে এশিয়ার দেশগুলিতে। ভিয়েৎ-মিনদের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় ইন্দো-চীনে, বিশেষ করে ভিয়েৎনাম অঞ্চলে এ আন্দোলন সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দো-লনের রূপ নিয়েছে। দিন দিন এই আন্দোলন ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হচ্ছে। ফরাসী উপনিবেশ শাসনের বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র প্রতিরোধের ঢেউ ভিয়েৎনামের সীমানা ছাড়িয়ে লাওস ও কম্বোডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঢেউ নমপেনের রাজপ্রাসাদের অলিন্দ ভেদ করে খোদ রাজার অন্তরে এসেও আলোড়ন তুলেছে।

এর পর ইতিহাসের গতিপথে অনেক আবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ফরাসীদের হাত থেকে কম্বোডিয়া কেড়ে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৫ সালে ফরাসীরা আবার কম্বোডিয়া অধিকার করে। তাদেরও অবশেষে চলে যেতে হয় ১৯৫৪ সালে জেনিভা সন্ধিচুক্তি অনুসারে।

ইতিমধ্যে প্রিন্স নরোদম সিহানুক প্রথমে সম্রাটতন্ত্র ও পরে রাজতন্ত্র বিলোপ করেন। রাজা রইলেন শুধু দেশে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে। তিনি নিজেও রাজ্যভার ত্যাগ করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র-ক্ষমতা তুলে দেন। তিনি দেশে "সংকুম" দল প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধানরূপে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

তারপরও বহু পরিবর্তনের শেষে তিনি ১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ পর্যন্ত রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। সেই সময় তাঁর বিদেশ পরিদর্শনের সুযোগ নিয়ে দক্ষিণ-পন্থী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র লন নল সিরিক মাটাক, চেং হেং প্রমুখ মিলে এক অভ্যুত্থান করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সৈন্য কম্বোডিয়ায় এসে এই দক্ষিণপন্থী চক্রকে সহায়তা করছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়া চক্রকে সমূলে দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করবার জন্য দৃঢ়পণ সংগ্রাম করছে।

কম্বোডিয়া অশান্ত। অশান্ত তার স্বাধীন নিরপেক্ষ নীতির উপাসক জনগণ ও শান্তিকামী রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক। কেন এই অশান্তি?

জেনারেল লন নল তাঁর কাছে কম্বোডিয়াকে দ্বিধাবিভক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সিহানুক কে? লন নল কে? দেশ কম্বোডিয়ার জন-সাধারণের। তারা কি এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ চেয়েছে? পিতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করে, দুর্বল করে চির অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছে? তবে……

আজ শান্তিপ্রিয় দেশবাসী তথাগত বুদ্ধের মূর্তির দিকে দৃষ্টি মেলে শাশ্বত জিজ্ঞাসা তুলেছে :—

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছ ভালো।"

॥ সমাপ্ত ॥

অবিস্মরণীয়—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র। প্রাপ্তিস্থান, ৫৯ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ অথবা 'মনীষা', কলকাতা-১২। মূল্য : দশ টাকা।

"অবিস্মরণীয়"-এর প্রথম খণ্ডের সঙ্গে কৌতূহলী পাঠকদের নিঃসন্দেহে পরিচয় আছে। অবিস্মরণীয়-এর ১ম খণ্ড সম্বন্ধে বিস্ময়কর সংবাদ এই যে, ঐ গ্রন্থের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর জনমনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, স্বাধীনতার বেদীমূলে যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেছেন—তাঁরা কেউ নন। স্বভাবতই তার জন্য দায়ী সুবিধাবাদীর দল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, একদা যাঁরা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে স্পাইং করেছিলেন তাঁরাই রামরাজত্ব কায়েম করার চেষ্টা করেছিলেন। সেখানেই শেষ নয়। বিপ্লবীদের কথা লোকে যেমন ভুলতে বসেছিল, তেমনি প্রচার সুরু হয়েছিল তথাকথিত সাহিত্যের—যা মরবিড়িটি ও সিনিসিজমে ভর্তি এবং পঙ্কিল বর্ণনার গুণে আবর্জনার স্তূপে ভস্মহুতে নিক্ষেপ করার যোগ্য। বলা বাহুল্য, দিনগত পাপক্ষয় হতে হতে ক্ষুধিত ও ক্ষুব্ধ মানুষ সে অবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের আসল চেহারাটা বুঝল। তখন তারাই সাদরে অভ্যর্থনা জানাল মরণজয়ী বিপ্লবীদের, শুনতে চাইল নতুন করে তাঁদের আত্মোৎসর্গের কাহিনী। মরণসাগর পারে যাঁরা অমর তাঁদের অমরত্ব লাভের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে পেতে চাইল অনুপ্রেরণা। সেই কারণে, সুরু হল সত্যিকারের বিপ্লবীদের দিয়ে অগ্নিযুগের কাহিনী লেখানো। আলোড়ন সৃষ্টি করল অনন্ত সিংহ ও ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের বিপ্লববাদ ও বিপ্লবীদের নিয়ে লেখা মূল্যবান গ্রন্থগুলি।

"অবিস্মরণীয়"-এর বিপ্লবী লেখকের প্রথম খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশের কালে সন্দেহ ছিল, এই গ্রন্থ বিক্রয় হবে কি না—কিন্তু দেশের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায় "অবিস্মরণীয়" দ্বিতীয় সংস্করণের মর্যাদা লাভ করায় একথা প্রমাণিত হল যে, দেশের মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। তারা নিজেদের নৈতিক মান ও চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে বলেই "অবিস্মরণীয়"-র মতো গ্রন্থ থেকে বিপ্লবীদের মহান কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তার আয়োজন-সমাপনের চমকপ্রদ বিবরণগুলি পড়ে নতুন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে চায়।

"অবিস্মরণীয়"-এর ঐতিহাসিক ও দলিলভুক্ত ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নির্ণয় বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবী লেখক সে দায়িত্ব সম্পর্কে স্বয়ং সচেতন হওয়ায় গ্রন্থ রচনাকালে ও ২য় সংস্করণের সংশোধনকালে অন্যান্য বিপ্লবীদেরই পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলেছেন,—"গঙ্গানারায়ণবাবুর এই ইতিহাস লেখা সার্থক হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আরও ঐতিহাসিক তথ্য শুনবার জন্য অপেক্ষা করে থাকব। 'অবিস্মরণীয়' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অমূল্য গ্রন্থ।"

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংক্রান্ত কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ ইতিমধ্যে বের হয়েছে। 'অবিস্মরণীয়' সেখানে আর একটি মূল্যবান সংযোজন এবং একথাও মনে রাখতে হবে—সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিপ্লবীর নিজের হাতে লেখা কাহিনীর সমষ্টিগত ফল হবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস—যা কখনো বেতনভুক বা ভাড়াটে ঐতিহাসিকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। যথার্থ বিপ্লবীর লেখা "অবিস্মরণীয়" অবিস্মরণীয় হোক প্রতি বাঙালীর ঘরে ঘরে।

ইথারে সজাগ (বৈশাখ,১৩৭৭)—জয়ন্ত সাহা। নীলাঞ্জনা প্রকাশনী। ১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা—৬। দাম—তিন টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের ৪২টি কবিতার মধ্যে দিয়ে একটি [illegible], অনুভূতি-প্রবণ, দরদী কবি মনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। আড়ষ্টতা দুর্লক্ষ্য। কতকগুলি কবিতা প্রতীকধর্মী বলে মনকে আকর্ষণ করে, নাড়া দেয়। 'একটি চাবি' কবিতায় ফেরিওয়ালার 'হরেক তালার হাজার চাবি' নয়, কবির দরকার একটি চাবি। এইরকমই একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতীক হয়ে উঠেছে 'কম্পাস' কবিতাটি। প্রেমের কবিতাগুলি মিষ্টি, গীতিকবিতার সুরে। 'বাইরে যাব', 'বাইরে চলো' এই দুটি কবিতায় কবি পূতিগন্ধময়, বিবর্ণ বর্তমান থেকে উন্নততর নতুন সমাজে উত্তরণই চেয়েছেন, যার প্রতিষ্ঠা কামনায় আপাতশান্ত নির্বিরোধী চিত্তেও তাঁর 'বারুদজ্বালা', 'শান্তির ভেতরে' ও 'ভিসা হাতে' কবিতায় কবি বেদনামুখর স্মৃতিচারণ করেছেন অবিভক্ত বাংলার। সাধারণ জীবন উপজীব্য করে লেখা 'হাবুডুবু খেলায় মেতে' ও 'বাপকে বেটা' রসোত্তীর্ণ। শব্দ প্রয়োগে এবং ছন্দে কিছুটা অনামনস্কতা আছে। 'শপথগুলো বিন্ধ্য পাহাড়', 'ঘুম আসে না কবরগুলোর', 'সারা দুপুর ঘুঘু চরে বুকের ভিটায়', 'কুয়াশা নীরব দুটি চোখ', 'তখন আমার বুকটা ছিল সাদা কাগজ' ইত্যাদি চিত্রকল্প, সমাসোক্তি উপমা উল্লেখযোগ্য। কাব্যগ্রন্থখানি কাব্যপিপাসুদের আনন্দদান করবে।

লেনিন শতবর্ষ স্মারণিকী সংখ্যা : সম্পাদনা : প্রতুল দত্ত। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির (হাওড়া ও কলকাতা) সদস্যরা যে যথেষ্ট সমাজসচেতন সে কথা বোঝা গেল সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক সংখ্যাটি দেখে। লেনিন জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখা, ছবি এবং সাজানোর দিক থেকে এই সংখ্যা প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণের উপযুক্ত। লেনিনের ছবি সম্বলিত প্রচ্ছদপটটির তুলনা হয় না। এই সংখ্যায় স্তালিন, হো চি মিনের লেখার সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা রয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষায় মলয় মুখার্জী, এস. বর্ধন এবং প্যারী কমিউন সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের ইংরেজী প্রবন্ধ এবং কবিতাগুলি পাঠকদের চিন্তার সহায়ক। হিন্দী এবং উর্দু প্রবন্ধও এই সংখ্যায় রয়েছে, যাতে ব্যাঙ্কের প্রত্যেকটি কর্মচারী শতবর্ষ উৎসবের তাৎপর্য অনুভব করতে পারেন। বহু ছবি সম্বলিত এই স্মারণিকী সযত্নে রক্ষা করার মত। সযত্ন সম্পাদনার জন্য সম্পাদক ধন্যবাদভাজন।

কপালের রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রিয়তোষের। আরও গভীর মনে হচ্ছে, যেন এ'টেল মাটি দিয়ে কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী মূর্তি গড়েছে। মাটির মূর্তির মতই বসে রয়েছে প্রিয়তোষ বাইরের রকে একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর। এমনি করেই কপালের রেখাগুলো গভীর হয়, মোটা হয়ে ওঠে যখন সে তলিয়ে চিন্তা করে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরোনো গালে প্রিয়তোষ বার কয়েক হাত বোলায়। হাতের তালুতে থুতনিটা রাখে, দু'গালে আঙুলের চাপ পড়ে। রকে বসেই শুনতে পায় পাশের ঘরের কাণ্ড-কারখানা। ঠিক পাশের ঘরটাতেই মেঝের ওপর আলুথালুভাবে উপুড় হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আরতি। কি ভীষণ যন্ত্রণা, এ যন্ত্রণা যার হয় সেই বোঝে।

আকাশটা এমন বিশ্রী হয়ে আছে, বিকেল কি সকাল বোঝবার উপায় নেই। সকাল থেকে শুরু হয়েছে বিষণ্ণ কান্নার মত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। বিকেল গড়াতে চললো, বৃষ্টি থামবার নাম-গন্ধ নেই। এই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজে ভিজে দোকান-বাজার করতে হয়েছে, ডাক্তার ঠিক করতে হয়েছে, টাকা জোগাড় করতে হয়েছে আরতির জন্যে। টাকা জোগাড় করতে তাকে প্রাণান্ত হতে হয়েছে আজ। এতটা অসুবিধে হতো না, যদি কারখানাটা খোলা থাকত। কারখানা পাঁচ মাসের ওপর বন্ধ। লক-আউট। একেতেই সংসার চলে না, তার ওপর পাঁচ মাস ধরে কারখানা লক-আউট। দমবন্ধ হয়ে মারা যাবার দাখিল। তার মত অল্প আয়ের লোকের বিয়ে করে সংসার করতে যাওয়াটাই ঝকমারি হয়েছে। বিধবা মা, মেয়ে, বউ—তিন-তিনটি প্রাণীর খোর-পোষ জোগাড় করা এ বাজারে কম কথা? কম টাকার দরকার? বিয়ে করার ইচ্ছে তার থাকলেও সামর্থ্য নেই সে জানতো। চরম খাদ্যাভাব, চড়া বাজার-দর দেখে বিয়ে করার কথা সে ভাবতেই পারতো না। ভাবলে ভয় লাগতো। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, মা এমন-ভাবে তাকে চাপ দিতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে বাধ্য হোল সে। সকলেই বললে দায়িত্ব নেই বলেই ভাবতে অতো ভয় লাগছে। দায়িত্ব এসে পড়লেই দায়িত্ব রক্ষা করবার জন্যে সজাগ থাকতে হবে, কর্তব্যবোধ এসে পড়বে। আপনা হতে সব ঠিক হয়ে যাবে, সহজ হয়ে উঠবে। বিয়েটা করব না, করব না করে একটু বেশি বয়সেই করতে হয়েছে তাকে—যার পরে আর অন্তত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করা চলে না। মা বরাবরই অসুস্থ। রান্নাবান্না সবদিন হয়ে উঠতো না। কোন কোন দিন প্রিয়তোষকেই রান্না করতে হোত দু'বেলা। এর ওপর কারখানায় ওভার-টাইম খাটা। বাড়িতেও মন টিকতো না। কতকটা ঝুঁকি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতই বিয়েটা করে ফেলতে হয়েছিল। ভেবেও দেখেছিল সে। বহু বছর ধরেই ভেবেছে। সবাই কি আর পাঁচশো টাকা মাইনে পেয়ে বিয়ে করছে? না পাঁচশো টাকা মাইনে সকলেরই হয়? হিসেব করে দেখেছে প্রিয়তোষ কারখানায় কেরানীর কাজ করে সে যা আয় করে তাতে কোনমতে তিনটি প্রাণীর চলতে পারে। তাতেও ধার-দেনা করতে হয়। বড্ড বেশি হিসেব করে টিপে টিপে চলতে হয়। এ হিসেব বিয়ের আগেও করেছিল। এ অবস্থা জেনেও

একদিন হঠাৎই বিয়ে করে ফেলতে হয়েছিল। আশ্চর্য, অত অভাবের মধ্যে বিয়ে করেও ফুলশয্যার রাতে আরতিকে মুখোমুখি কাছে বসিয়ে পরিপূর্ণ মনে হয়েছিল সেদিন প্রিয়তোষের জীবনটা। মনে হয়েছিল, এটাই যেন জীবন—এরই মধ্যে রয়েছে ছন্দ, আনন্দ। বিস্ময়ে-পুলকে, অনাস্বাদিতবোধে আত্মহারা হয়েছিল প্রিয়তোষ কয়েক মাস ধরে। তারপর দুটি বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মেয়ে হোল একটা। প্রথম পিতা হবার আদিম তীব্রতায় আর প্রচন্ড আনন্দে অভাবের তাগাদাটা তুচ্ছ মনে হোল প্রিয়তোষের। উত্তাল রোমাণ্টিক মন তখন। তবে টাকা পয়সার প্রয়োজনটা যেন আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করল সে। চল্লিশের পরে বিয়ে করে প্রথম সন্তান হবার পুলকের ধরনটা প্রিয়তোষের কাছে মনে হয়েছিল উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরাদের মত চনমনে। তখন যেন মনে হয়েছিল, বিয়েই যখন করল, আরও কয়েক বছর আগে করলেই ভাল হোত। বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজনেরা বলতো নিজের ভাগ্যটাই নাকি সব নয়—স্ত্রীর ভাগ্যের ওপরও কিছুটা ভরসা করতে হয়। কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে প্রিয়তোষের—চরম দুর্দশা। আত্মহত্যাই বোধহয় এর মুক্তির পথ। তার সংগেই রেকর্ড সেকশনে কাজ করে হারাধন চক্রবর্তী, সে নাকি সত্যিই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল একদিন। এ বাজারে পাঁচটি ছেলে মেয়ের বাবা সে। স্ত্রী ছাড়াও এক আইবুড়ো শালী আর বিধবা শাশুড়ি ঘাড়ে। হারাধন আত্মহত্যা করলে নাকি কাগজে কাগজে বেরুতো খবরটা। বিরাট কারখানা, পাঁচ মাসের ওপর লক-আউট। চরম দুর্দশায় পড়েছে কয়েক হাজার ধর্মঘটী। বোনাস আর কর্মী ছাঁটাই নিয়ে বিরোধ চলছে মালিকের সংগে কর্মচারীদের।

পাশের ঘরে আরতির চিৎকারটা আরও বেড়ে চলেছে, মনে হোল প্রিয়তোষের। বাড়বারই কথা। এরকম বাড়াবাড়ি দু-তিন দিন হয়ে গেল। আজ বোধহয় এ যন্ত্রণার শেষ! কাতরানিটা তাই বোধ হয় এতো বেশি। যন্ত্রণাটা অবশ্য এর আগেও বহুবার হয়েছে, তবে এ দু-তিন দিনের মত এতো তীব্র নয়, এতো প্রাণান্ত নয়। গর্ভাবস্থায় একবার বাড়িতেই পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল আরতি। পড়ে যাওয়ার পর থেকে প্রায়ই যন্ত্রণা হোত। ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিল। ডাক্তার তেমন কিছু ভয়ের কারণ খুঁজে পান নি। ইনজেকশন, ওষুধও পড়েছিল বহুবার। উপশমও হয়েছিল যন্ত্রণায়, কিন্তু [illegible] যেত। তখন [illegible] চার মাস পরে ক'দিন হোল আবার নতুন করে যন্ত্রণাটা বেড়েছে। ডাক্তার নাকি বলেছেন আজই হয়ে পড়বে। আরতির কাছে প্রিয়তোষের বুড়ো মা বসে রয়েছে সামনে। মারও সময়মত ওষুধ-পথ্যি পড়ছে না কদিন থেকে। পড়বে কি করে? আরতিই সব দেখাশোনা করে। চরকীর মত ঘুরে ঘুরে কাজ করে আরতি। সাড়ে ছ'টার মধ্যে কারখানায় বেরিয়ে যায় প্রিয়তোষ। এখান থেকে কারখানাটা অনেক দূরে। আটটার মধ্যে হাজরে দিতে হয়। একটু সময় হাতে রেখেই বেরোতে হয়। আজকাল ট্রামে-বাসের যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে—একে তো বীভৎস রকম ভিড়—তার ওপর কথায় কথায় জ্যাম। খুব ভোরবেলাতেই উঠতে হয় আরতিকে। আঁকপাক করে উনুনে আঁচ দিয়ে রান্না চাপাতে হয়। প্রিয়তোষ খেয়ে বেরোবে—সংগে টিফিন নিয়ে যাবে! প্রিয়তোষ একটা অ্যালু-মিনিয়মের কৌটো কিনেছে টিফিনের খাবার নিয়ে যাবার জন্যে। কৌটোটা কাগজে মুড়ে কাপড়ের থলেতে ভরে নিয়ে যায় সংগে করে। তবুও তো যেদিন-যেদিন পেরে ওঠে না আরতি, ক্যান্টিনেই খেয়ে নেয় প্রিয়তোষ। প্রিয়তোষ বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তটস্থ থাকতে হয় আরতিকে। তারপর নিজেদের জলখাবার হবে। নিরামিষ রান্না হবে একপাট বিধবা শাশুড়ীর জন্যে। এরই মাঝে ঘর গুছনো আছে, বাসী বিছানা তোলা আছে, প্রিয়তোষের এলোমেলো জামা-কাপড়, টুকিটাকি জিনিসগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রাখতে হয়। এর পরেও আছে শাশুড়ীর পুজোর বাসন মাজা, নিজের চান সেরে পুজোর জোগাড় করে দেওয়া। এই করতে করতেই বেলা দুটো বেজে যায়। এরই মধ্যে মেয়েটাকেও আবার দেখতে হয়। সাড়ে তিন বছরের মিঠুটা বড় দুষ্টু হয়ে উঠেছে। আজ-কাল আর ঠাকুমার কাছে বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। রান্নাঘরে ঢুকে গিন্নী-পনা করে ডালের মধ্যে ফোড়ণ ফেলে দেবে, নুন ফেলে দেবে। বাটি করে বালতি থেকে জল নিয়ে ভাতের মধ্যে ঢেলে দেবে। জুতো ঘেঁটে এসে খাবার জলে হাত ডুবিয়ে দেবে। এই দিব্বি খেলা করছে বাড়িতে—ফুরুক করে কোন ফাঁকে বেরিয়ে পড়বে বাড়ির বাইরে, কেউ বুঝতেই পারবে না। প্রিয়তোষের মা ব্যস্ত হয়ে হাঁক পাড়বে। আরতি তক্ষুণি রান্না ফেলে রেখে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজতে বেরুবে মিঠুকে। কোন কোন দিন মিঠু [illegible] মারি করে, অথবা পড়ে গিয়ে হাত-পা-ঠোঁট কেটে বাড়ি ফিরবে কাঁদতে কাঁদতে। চেঁচামেচি পড়ে যাবে বাড়িশুদ্ধ। যেদিন সেদ্ধ কাচতে হয়, গরম দিতে হয়, বাসন কয়েকখানা বেশি মাজতে হয়, সেদিন দেহ যেন আর বইতে চায় না আরতির—ইচ্ছে হয় বিছানায় পড়ে থাকে: এ সবই জানে প্রিয়তোষ। তবুও পড়ি-মরি করে একলা হাতে সব কিছুই করতে হয় আরতিকে।

বৃষ্টিটা এবারে জোরেই নেমেছে। মুষল-ধারে হচ্ছে। বাড়ির চাল অ্যাসবেসটাসের, রকের উপরের ছাউনিটাও অ্যাসবেসটাসের। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো বেশ আওয়াজ তুলেছে। চড়বড় চড়বড় আওয়াজ। প্রিয়-তোষের মনে হচ্ছে বৃষ্টির তোড়ে চাল বোধ হয় ভেঙে পড়বে। বাড়িশুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে অগাধ বৃষ্টির মধ্যে সে তলিয়ে যাচ্ছে। এখুনি ডাক্তার আসবার কথা আছে— বার বার করে বলে এসেছে সে। কিন্তু ডাক্তার আসবে কি করে এই বৃষ্টির মধ্যে? ডাক্তারের মোটর নেই। এলে রিক্সা করেই আসবে। আরতিকে হাসপাতালে পাঠালেই ভাল হোত কিন্তু সুযোগ-সুবিধে হয়ে উঠলো না। এখান থেকে হাসপাতাল অনেক দূর। তাছাড়া আরতি হাস-পাতালে যেতেও চায় না। হাসপাতালের নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। প্রিয়তোষ নিজেও ভেবে দেখেছে আজকাল হাসপাতালগুলো সব কেমন যেন হয়ে গেছে। রোগী পাঠিয়ে ভরসা নেই। বেঁচে ওঠার লোক মারা যায় ডাক্তার আর নার্সদের চরম অবহেলায়। রোগী নিখোঁজ হয়, আত্মহত্যা করে। তারপর দুধ চুরি, খাবার চুরি, ওষুধ চুরি। কাগজে এ সব ঘটনা প্রায়ই বেরোয় ফলাও করে। মিঠু অবশ্য হাসপাতালেই হয়েছিল। কোন যত্ন পায়নি আরতি সেবার। বড্ড অবহেলা করেছিল। তাই এবারে আরতিকে কিছুতেই পাঠানো গেল না হাস-পাতালে। বৃষ্টির বিপুল তোড়ের সংগে আরতির কাতরানিটা ক্ষীণ শোনা যাচ্ছে। কখন কখন মনে হচ্ছে দূরের ওই নারকোল গাছটার ওপর বসে একটা শকুনী কাঁদছে। বিকেল গড়িয়ে গেছে। অন্ধকার, অন্ধকার। স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবুও মনে হচ্ছে প্রিয়তোষের নারকোল গাছটার ওপর সত্যিই একটা শকুনী বসে রয়েছে। ভিজছে—ভিজে ভিজে চুপসে ছোট হয়ে গেছে। ও গাছটায় কাকের বাসা নেই। লক্ষ্য করল প্রিয়তোষ—একটা ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে রকের ওপর উঠে এলো। এ বাড়িতে এই

কথা। জল হলেই ব্যাঙ, কেঁচো এসে হাজির হয়। একবার একটা সাপও ঢুকেছিল—সেটা মিঠু হবার আগে। মিঠু এতক্ষণ ঘরের ভেতরেই ছিল। ব্যাঙ দেখতে পেয়ে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ব্যাঙ ধরতে এগিয়ে গেল। প্রিয়তোষ তাড়াতাড়ি উঠে মিঠুর হাত দুটো চেপে ধরল। ব্যাঙটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মিঠুকে কাছে নিয়ে তক্তপোষটার ওপর উঠে বসলো। অন্যান্য দিনের থেকে মিঠু আজ একটু কম কথা বলছে, কম ছটফট করছে। মায়ের অমন অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেছে সে। প্রিয়তোষ মিঠুর চুলগুলোতে হাত বুলোতে লাগল। মিঠুর চুলগুলো খুব ভাল হয়েছে। মাথা ভর্তি থোকা থোকা চুল। আরতির মাথাতেও বেশ চুল। মিঠুকে দেখতে তার মায়ের মতই হয়েছে। মুখখানা তো কেটে বসানো। আরতির যেমন লম্বা ছড়ানো চেহারা—বড় বড় চোখ—ঢলঢলে রঙ—মিঠুটা কেবল তার একটু বেশি ফরসা হয়েছে। মেয়েরা ফরসা হওয়াই ভাল। তবে আরতির রঙ ছিল

না কলজেও ভুল হবে। মিঠু হবার পরই রঙটা যেন তামাটে হয়ে গেল। বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর আরতিকে দেখতে অপূর্ব ছিল। এই যে [illegible] হয়েছে—দুশ্চিন্তায় ভাল করে খাওয়ার [illegible] প্রিয়তোষ [illegible] না পেলে-

চমকে উঠলো প্রিয়তোষ। দেওয়ালের ওপরে অনেকক্ষণ টিকটিকি ছুটাছুটি করছিল—অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল প্রিয়তোষ। জোড়া টিকটিকি তার পায়ের কাছে এসে থপ করে পড়ল। মিঠু ভয় পেয়ে প্রিয়তোষকে সজোরে আঁকড়ে ধরলো। বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই টিকটিকি দুটো ছাড়াছাড়ি হয়ে তক্ষুণি চলে গেল।

ঝম ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। উঠোন বুক জলে একাকার। বাড়ির বাইরে অনেকখানি খোলা মাঠ। খোলা দরজা দিয়ে দেখলো প্রিয়তোষ বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে মাঠে। অল্প অল্প ওঠা সবুজ ঘাসগুলো ডুবে গেছে। বাইরেটা কেমন ছায়াম্লান। তবুও বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে সব। রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম বর্ষা। বাইরে অশোক, বকুল, শিরীষ ভিজছে, দূরের ওই নারকোলগাছটা ভিজছে। শহরতলীর এই অ্যাসবেসটাসের চাল দেওয়া বাড়িটাকে জেটি বলে মনে হচ্ছে প্রিয়তোষের। এক ঝলক ঠাণ্ডা জোলো বাতাস তাকে ভিজিয়ে দিল। ঝিলিক দেওয়া খাড়া বিদ্যুতে দিগন্ত আলোকিত হোল এক মুহূর্তের জন্যে—কড়কড় করে মেঘ ডেকে উঠলো। মিঠু আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল প্রিয়তোষকে। মিঠু এবারে প্রিয়তোষের কোলে বসে নেই - পেছনটায় প্রিয়তোষের পিঠ ঘেঁষে বসেছে। প্রিয়তোষের গায়ে বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে। বেশ ভালই লাগছে। বৃষ্টির ছাট প্রিয়তোষের ভালই লাগে। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে স্কুলে যেতো - ইচ্ছে করেই ভিজতো। কত বকুনি খেয়েছে মার কাছে—এখনও ভেজে। আরতি ভীষণভাবে কঁকিয়ে উঠলো। আওয়াজটা বিশ্রী শোনালো—কেমন যেন ভয় ভয় করল প্রিয়তোষের। ঘরের ভেতর থেকে মা অস্পষ্ট গলায় চিৎকার করে বলে উঠল—প্রিয়, ডাক্তার আসতে আর কত দেরী রে? বউমা যে আর সহ্য করতে পারছে না।

প্রিয়তোষ কোন কথা বলল না। একটু আগেই আরতির অবস্থা জানিয়ে কল দিয়ে এসেছে ডাক্তারকে। তা ছাড়া অত ভয়ের কি আছে? এই তো প্রথম নয়।

প্রিয়তোষের মা আরও হেঁকে বলে উঠলেন—কোন্ ডাক্তার ঠিক করেছিস রে? সতীশ ডাক্তার? ওর হাতে প্রসূতি বাঁচে না—আর কয়েকটা টাকা বেশি দিয়ে—

আরতি বিকট চিৎকার করে উঠল। প্রিয়তোষ একটু ভয় পেয়ে ঘরের ভেতরে মুখটা বাড়ালো। লাইট জ্বলছিল ভেতরে। লাইটের আলোয় দেখল—আরতি এবারে চিৎ হয়ে পা ছড়িয়ে শুয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়েই মা আরতির মাথার কাছে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করছে। মাঝে মাঝে কপালে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আরতি যন্ত্রণায় থাকতে না পেরে কখনো কখনো দু'হাতে নিজের পেট চেপে ধরছে—কখনও মা ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রিয়তোষ বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সতীশ ডাক্তারকেই ঠিক করেছে প্রিয়তোষ। সতীশ ডাক্তার বয়স্ক, প্রবীণ, অভিজ্ঞ। তা ছাড়া ভিজিটও কম। কাছাকাছি কম ভিজিটের মেয়েদের আর ডাক্তার নেই। এখানকার মধ্যে নামকরা বিলেত ফেরৎ গায়নাকোলজির ডাক্তার প্রণবেশ মুখার্জী। বাড়িতে নিয়ে আসতে গেলে ভিজিট অনেক। শুধু সতীশ ডাক্তারই আসবে না—সংগে এক-জন মিডওয়াইফও থাকবে! তাকেও আলাদা করে টাকা দিতে হবে। সারাদিন ধরে প্রসব করানোর আনুষঙ্গিকও জোগাড় করেছে প্রিয়তোষ—গজ, বোরিক-তুলো, কাপড়ের প্যাড, ডেটল, লাইফ-বয় সাবান, শিশুদের কলাইকরা বাথ টাব। এগুলো কিনতেই কি কম টাকা লেগেছে? এর ওপর ডাক্তার আর মিডওয়াইফের ভিজিট আছে—ওষুধ, ইনজেকশন কিনতে হতে পারে। বেশি টাকা দিয়ে ডাক্তার আনবার ক্ষমতা কোথায় তার? পাঁচ মাসের ওপর মাইনে পায় না—কারখানা বন্ধ। এই দুর্দিনের বাজারে সংসারটা বড় হয়েই চলেছে। এ ক'টা মাস কেমন করে চলেছে সে শুধু প্রিয়তোষই জানে। আরতি আর মাকে এতটুকুও জানতে দেয় নি সে।। ইউ-নিয়নের অফিস থেকে ধর্মঘটী কর্মচারীদের মধ্যে কৌটো বিলি করেছে পয়সা সংগ্রহের জন্যে। লাল হরফে কাগজে কোম্পানীর নাম ছেপে—লক-আউটের কথা উল্লেখ করে ছোট ছোট টিনের কৌটোয় কাগজখানা লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় জনসাধারণের কাছে ট্রামে-বাসে ঘুরে ঘুরে পয়সা সংগ্রহ করতে হয়েছে প্রিয়তোষকে।

বিয়ের আংটি, বোতাম, আরতির দু'গাছা চুড়ি, খাঁটি কাঁসার দুটো জামবাটি, একটা ভাল ঘড়া বন্ধক রাখতে হয়েছে। কখনো কখনো একবেলার রান্না দুবেলায় খেতে হয়েছে। কেবল মিঠুর জন্যে যা হোক করে চারবেলার ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে—মিঠু শিশু। সংসারে বোধ হয় শিশুদের নিয়েই ঝামেলা বেশি। আবার শিশু না থাকলে, ছেলেমেয়ে না থাকলে সংসারকে সংসার বলেই মনে হয় না। এই তো পাশের বাড়ির ভূপেনদার সংসার। স্বামী-স্ত্রী। আর কেউ নেই। কোন সন্তানই হয় নি তাদের—আর হয়তো হবেও না। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে—তা বছর পনেরো তো হবেই। অনেক মাদুলি, ওষুধ, টোটকা, মায় অপারেশন—কিছুই হয় নি। বেশ আছে। ঝাড়া ঝাপটার সংসার। কিন্তু মাঝে মাঝে সংসার আছে বলে মনে হয় না—প্লাস্টিকের ফুল দিয়ে ফুলদানী সাজিয়ে রাখার মত। কিন্তু পয়সা না থাকলে ছেলে-মেয়ে থেকেই বা সুখ কোথায়? এটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে প্রিয়তোষ—ভালভাবে সংসার করতে হলে, ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে হলে পয়সা থাকা চাই। প্রিয়তোষের কত আর আয়? সর্বসাকল্যে একশো পঁচাত্তর টাকা। ওভারটাইম খেটে আরও পঞ্চাশ-ষাট টাকা বেশি হয়। কিন্তু এতেই বা সংসার চলে কি করে? বাড়ি-ভাড়া, মাসে চারটে রেশন—এর ওপর ঘুঁটে-কয়লা, দোকান-বাজার, মিঠুর দুধ, ধোপা-নাপিত, ট্রামে বাসে যাতায়াত, দৈনিক হাতখরচা। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আসা-যাওয়া রয়েছে। লোক-লৌকিকতা রয়েছে। আবার জিনিসপত্তরের দাম দেখ—আকাশছোঁয়া। আজ চাল কিনে নিয়ে এলো আড়াই টাকায়—কালকেই দেখ সেটা তিন টাকায় উঠেছে। সরষের তেল কিনে নিয়ে এলো চার টাকায়—কালকে দেখ সাড়ে চার টাকায় উঠে গেছে। কোন্ জিনিসটা না! ডাল, মশলাপাতি, কাঁচা আনাজ, মাছ। এমন কি মিঠুর জন্যে সেদিন সামান্য চিড়ে কিনতে গিয়েছিল প্রিয়তোষ—আড়াই টাকা কিলো দর বলেছিল। আজকে মায়ের জন্যে কিনতে গিয়ে দেখে তিন টাকায় উঠে গেছে! এ যেন ঠিক ট্যাক্সির মিটার ওঠার মত। বাজার দরের মিটার করে দিলেই তো হয়! প্রিয়তোষ ভাবে, শুধু বাংলা দেশই নয়, গোটা ভারতের চেহারাই যেন হঠাৎ পালটে গেছে। গোটা পৃথিবীটাই ঝড়ের মত ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে চলেছে—রেসের মাঠে ঘোড়দৌড়ের মত। রেস খেলতে এক-বার গিয়েছিল সে। জিততে পারে নি সেবার। পরে জানতে পেরেছিল, ঘোড়া ধরার হিসেবটা তার ভুল হয়েছিল।

আজের মত লোকেদের এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যাবে না। শ্রমিক-চাষী. কেরাণী-মাস্টার সকলেই যেন লাঞ্ছনায় সম্পূর্ণ। চারিদিকেই জতুগৃহ, চারিদিকেই প্রচণ্ড ক্ষুধার গহবর, সকলেই উপবাসী—অনির্বাণ খাণ্ডবের মত সকলের বুক-পেট—এ জীবন ছোট্ট হয়ে এসেছে হ্যাণ্ডগ্রেনেডের মত। বিয়ে তো সে করতেই চেয়েছিল না। বিয়ে করা তার কোন মতেই উচিত হয় নি। কিছুতেই না. কখখনো না।

প্রিয়তোষের চোখে পড়ল ওই দারুণ বৃষ্টিতেই বাইরে দু'খানা রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে। বুঝতে পারল সতীশ ডাক্তার এসে পড়েছে—সংগে মিডওয়াইফও রয়েছে। রিক্সা থেকে পর্দা সরিয়ে দুজনেই বাড়ির দিকে উঁকি মারছে। তাড়াতাড়ি করে একটা ছেঁড়া ছাতা নিয়ে এগিয়ে গেল প্রিয়তোষ। পায়ে বুট আর ধুতির ওপর কোট পরে সতীশ ডাক্তার ঢাউস একটা ব্যাগ হাতে ছাতা মাথায় দিয়ে প্রিয়তোষের সংগে বাড়িতে এসে ঢুকল। পেছনে পেছনে মিডওয়াইফও এলো লেডিজ ছাতা মাথায় দিয়ে—পরনে পরিষ্কার ধপধপে সাদা শাড়ি. সাদা ব্লাউস, পায়ে পা-ঢাকা জুতো—তারও সংগে একটা ব্যাগ।

সতীশ ডাক্তার আরতিকে পরীক্ষা করে মিডওয়াইফের সংগে কি যেন আলোচনা করল। মিডওয়াইফ সতীশ ডাক্তারের মতেই মাথা নেড়ে সায় দিল। তক্ষুণি গরম জল চাইল সতীশ ডাক্তার। আজ প্রিয়তোষ নিজেই রান্না করেছে—ক'দিন থেকেই করছে। গুমো গুমো আঁচ রেখেই দিয়েছিল সে উনুনের ওপর কয়লা ছড়িয়ে।

তাড়াতাড়ি করে জল বসিয়ে দিল। বুঝল প্রিয়তোষ—প্রসবের সময় হয়েছে। ডেটল. গজ, কাপড়ের প্যাড, বাথ টাব, ছেঁড়া পরিষ্কার কাপড় এগিয়ে দিল সে ডাক্তারের কাছে। মিঠুটা একবার প্রিয়তোষের পেছনে পেছনে ঘুরছে, একবার ঠাকমার কোলে গিয়ে বসছে, একবার আরতির কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। সতীশ ডাক্তার বড় বড় দু'টো ফরসেপ, একটা কাঁচি, হাতে পরবার গ্লাভস, ওষুধ. ইনজেকশানের বড় একটা সিরিঞ্জ বার করল ব্যাগ থেকে। প্রিয়তোষের মা আর মিঠু দেখছিল অবাক হয়ে। প্রিয়তোষ তাড়াতাড়ি করে সমস্ত কিছু জোগাড় করে দিয়ে মিঠুর কাছে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ গম্ভীরভাবে মিডওয়াইফ প্রিয়তোষকে বাইরে যেতে বলল মিঠুকে নিয়ে। প্রিয়তোষ তক্ষুণি মিঠুর হাত ধরে বাইরের রকে চলে এলো। মিডওয়াইফ ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। প্রিয়তোষ মিঠুকে নিয়ে ভাঙা নড়বড়ে তক্তপোষটার ওপর উঠে এসে বসল।

সন্ধ্যে উতরে গেছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। বাইরের লাইটটা জেলে দিল প্রিয়তোষ। বৃষ্টির বিরাম নেই. সমানে পড়ে চলেছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্। মুষলধারে পড়ছে। ভাবল প্রিয়তোষ, বিয়ে না করেও যে অস্বোয়াস্তি ছিল. মনের মধ্যে যে অস্থিরতা ছিল. অশান্তি ছিল. বিয়ে করেই বা তা গেল কোথায়? স্বোয়াস্তি কোথায়, স্থিরতা কোথায়. শান্তি কোথায়? সংসারে আবার আর একটা মানুষের সংখ্যা বাড়ল আজ থেকে। কি করে সংসার চলবে বুঝতে পারছে না। এতোদিন যা হোক করে চালিয়েছে। কারখানা কবে খুলবে তার কিছু ঠিক নেই। খুললেও তার যে চাকরি থাকবে তার কিছু নিশ্চয়তা নেই। আবতিকে ভাল টনিক খাওয়াতে হবে, একটু দুধ খাওয়ানো দরকার. কিছু ফলমূল, মাখন। অন্তত কয়েকটা মাস। তা না হলে রোগে ধরে যাবে। এর ওপর বাচ্চাটার ভাবনাও রয়েছে। অয়েল ক্লথ, মধু, মিছরি, বেবীফুড জোগাড় করা। বেবীফুড বাজারে মেলে না। আবার ছেলে হলে এক চিন্তা. মেয়ে হলে আর এক। মিঠুটাকে নিয়েই তার কম চিন্তা? এখন থেকে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ঘুরতে হবে টাকার জন্যে। ভাবল প্রিয়তোষ, গর্ভের শিশু কত নিশ্চিন্ত। যতক্ষণ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ না হচ্ছে ততক্ষণ পরম নিশ্চিন্তে আছে শিশু তার মায়ের গর্ভে। এ পৃথিবীর আলো দেখেই তো কেঁদে উঠতে হবে। এই মুহূর্তে প্রিয়তোষ নিজেকে শিশু মনে করল। গর্ভের বাসিন্দা ভাবতে ভাল লাগল। কোন যন্ত্রণা নেই, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-শোক কোন কিছুই নেই। খালি ঘুম—অকাতরে ঘুম—প্রগাঢ় ঘুম-- ঘুম না তো যেন প্রশান্তি। সমুদ্রের গভীর তলদেশের মত শান্ত স্থির। পৃথিবীর মানুষের ঘুমের মধ্যেও অশান্তি। গর্ভ থেকে শিশুর বেরিয়ে আসার সময় হলে মাকে যেমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, সংগে সংগে শিশুরও যন্ত্রণার সূত্রপাত হয়। বেরিয়ে আসতে চায় সে এই পৃথিবীর আলোতে। বহুদিনের বহুকালের ধ্যান ছুটে যায়—কেঁদে ওঠে শিশু অপরিচিত জগৎ দেখে--হয়তো বুঝতে পারে সে, এ জগৎ যন্ত্রণার জগৎ, এ জগৎ লড়াই করবার জগৎ—তাই বোধ হয় অমন করে কেঁদে ওঠে সে পেট থেকে পড়েই। কিন্তু এ পৃথিবীতে আলো কোথায়? প্রতিদিন সূর্য ওঠাটাই কি আলো? হঠাৎ সিরসির করে উঠল প্রিয়তোষের গাটা। কি যেন চরে বেড়াচ্ছে ঘাড়ের ওপর। তক্ষুণি হাত দিয়ে ঝটকা মেরে ফেলে দিল সে। একটা বড় মাকড়সা—লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছে। আশ্চর্য. মাকড়সাকে দেখলেই প্রিয়তোষের কেন যেন অকটোপাসের কথা মনে পড়ে যায়—যদিও কোন মিলই নেই চেহারায়। চলাটার মধ্যে বোধ হয় মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সত্যিকার অকটোপাস দেখেনি সে কখনও —দেখেছে ছবিতে—আর. আর হ্যাঁ— আর দেখেছে সিনেমায়—ইংরেজী ফিল্মসে—টয়েণ্টি থাউজেণ্ড লীগ বিনিথ দি সী—

চমকে উঠল প্রিয়তোষ। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল তার রুগ্না মা কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। মুখখানা থমথমে। প্রিয়তোষ কতকটা অস্থির আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠে জিগ্যেস করে উঠল—কি খবর মা? এখনও হয়নি?

ঈষৎ বিষণ্ণ গলায় জবাব দিল প্রিয়তোষের মা—হয়েছে।

—কান্না শুনলাম না তো?

—কাঁদবে কি? আরতি একটা মরা ছেলে প্রসব করেছে।

অস্ফুট আহত কণ্ঠে বলে উঠল প্রিয়তোষ—ম—মরা ছেলে!

রক্তের চাপটা যেন হঠাৎ নেমে গেল প্রিয়তোষের। ম্লান দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাল একবার সে। মৃত শিশু পড়ে আছে কাপড়ে জড়ানো. কেবল মুখখানা বেরিয়ে রয়েছে। ঘরেতে ডেটল আর নানারকমের ওষুধের তীব্র গন্ধ। রক্তমাখা কাপড়। আরতি ক্লান্ত, প্রায় বেহুঁশ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সতীশ ডাক্তারের মুখখানা গম্ভীর, মিডওয়াইফেরও মুখখানা ভারাক্রান্ত। ডাক্তারী সরঞ্জামগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরে নিতে ব্যস্ত তারা। মৃত শিশুটির দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ খানিকটা কেঁপে উঠল। আহত অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া করবার আর কিছুই নেই। কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা বেঠিক, ভাল-মন্দ কিছুই আন্দাজ করতে পারল না সে সেই মুহূর্তে। প্রিয়তোষের মনে হোল. শিশুটি তার মায়ের গর্ভে যেমনটি ছিল, তেমনি পরম নিশ্চিন্তেই ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে থাকতেই সে চেয়েছিল, না কি এ পৃথিবীর যন্ত্রণার বলি হয়ে কটাক্ষ করে হাসছে সে? কেবলি হাসছে—হাসছে—হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ— যেন এ পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ নিমেষে হয়েছে নষ্ট। পড়ে রয়েছে হিম মৃত্যুময় বরফের স্তূপ। প্রিয়তোষের চৈতন্যে মহানদীর বান ডেকে উঠল-- সেই বানে ভেসে চলল হাজার হাজার

জার্মান থিয়েটার ঃ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জার্মান থিয়েটার ঃ গায়টের রচনা ভাইমারের যুবক ডিউককে মুগ্ধ করে। ডিউক কার্ল অগাস্ট ছিলেন সে সময়কার জার্মানীর অনেক ছোট ছোট প্রিন্সদের মধ্যে অন্যতম। তিনি গায়টেকে ভাইমারে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বয়সে তিনি গায়টের থেকে আট বছরের ছোট ছিলেন এবং সুযোগ খুঁজছিলেন কিভাবে এই বিখ্যাত সাহিত্য-শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করা যায়। প্রথমটায় ঠিক ছিল গায়টে অল্পদিনের জন্য ভাইমারে এসে থাকবেন instead it became a life task.

১৭৭৬ সালে গায়টে ভাইমারে এসে হাজির হলেন। এটি ছিল একটি ছোটখাট জমিদারীর মত—এর সমগ্র জনসংখ্যা ১০০,০০০-এর বেশি ছিল না। আর শহরে লোক ছিল মাত্র ৯০০০। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিউক কার্ল অগাস্ট ভাইমারকে জার্মানীর ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপিটাল রূপে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। কারণ, তখনকার জার্মানীর সেরা প্রতিভাবান ব্যক্তিরা ডিউকের সাদর আমন্ত্রণ এবং অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হয়ে ভাইমারে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। গায়টে ছাড়া আর যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা হচ্ছেন ভাইল্যান্ড হার্ডার এবং শিলার।

শাসন সংক্রান্ত অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজে ডিউককে সাহায্য করতে হোত গায়টেকে। এর ফলে নানা বিষয়ে তাঁর মনের প্রসার এবং বাস্তবজ্ঞান বেড়ে যায় - কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির অবসরও কমতে থাকে। এর বছর দশেক বাদে গায়টে ইটালী বেড়াতে যান (১৭৮৬-৮৮)। পরে ইটালীয়ান জার্নি নামে কবি তাঁর এই সফরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন (১৮১৬-১৭)। এই সফরের পর তাঁর রচনায় একটা বিরাট পরিবর্তন আসে—হার্ডারের প্রভাবমুক্ত হয়ে তিনি রচনা-ধারার ক্লাসিক্যাল গঠনের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর মনের এই পরিবর্তন তখনকার রচিত অনেকগুলি নাটকে প্রতিফলিত হয়।

১৭৮৮ সালে তাঁর রচিত গদ্য নাটক 'এগমণ্ট' দেখা যায় হার্ডারের প্রভাব অপসারিত হচ্ছে এবং ক্ল্যাসিসিজম মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে কবির রচনায়। স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহ এবং নেদারল্যান্ডের এক বীর সন্তানের চরিত্র নিয়েই নাটকটি লিখেছিলেন গায়টে। লেখার স্টাইল ট্র্যানজিশ্যনাল। 'এগমেণ্ট' নাটকটি আর এক হিসাবেও বিখ্যাত। এতে গায়টে এবং বেটোফেন একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে জেরিমি লেন লিখেছেন: 'In 1810 Beethoven worked on the incidental music to Goethe's "Egmont", a play that treated the theme of national liberation in the Netherlands and not in Germany. This brought him into contact with Goethe, the supreme writer of his day in Germany. Beethoven wrote to Goethe that he would soon receive the music for "Egmont", and he said—"I would like to hear your judgement. Criticism would be of profit to myself and my art and would be received as readily as the greatest praise." For Beethoven to write something like that, even to Goethe, showed a very high degree of admiration. In 1812 they met. Goethe said later "His talent amazed me. Unfortunately he is a completely untamed person, not entirely wrong in regarding the world as detestable, but with an attitude that does not make it more enjoyable, either for himself or for others . . . "

'ইফিজেনিয়া ইন টাউরিস' নাটকটি গায়টে আগে গদ্যে রচনা করেছিলেন। ১৭৮৭ সালে এটির সংস্কার করে নাটকটিকে ক্লাসিক্যাল কাব্য-নাটকে রূপায়িত করলেন। ইটালীয়ান কবি টাসোর জীবনী নিয়ে আর একটি ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যনাট্য লেখেন গায়টে ১৭৯০ সালে—এটি একটি অসাধারণ নাটক। ১৭৯০ সালে গায়টে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ফাউস্টের অংশবিশেষ প্রকাশ করেন; কিন্তু সম্পূর্ণ ফাউস্ট প্রকাশিত হয় কয়েক বছর বাদে—প্রথম ভাগ ১৮০৮ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮৩২-এ। ইটালী থেকে ফিরে আসবার পর ভাইমারে গায়টের জীবন খুব ঘটনাবহুল নয়। সরকারী কাজকর্ম থেকে তাঁকে প্রায় অব্যাহতি দেওয়া হয়—অবশ্য আরও পঁচিশ বছর ধরে তিনি কোর্ট থিয়েটার পরিচালনা করেন। শিলারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় ১৭৯৪ সালে এবং এর সমাপ্তি ঘটে ১৮০৫ সালে শিলারের মৃত্যুতে। এ বন্ধুত্বে দুজনেরই নানাদিক থেকে উপকার হয়।

গায়টের জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁকে বেশ বিচ্ছিন্নভাবে এবং নির্জন জীবনযাপন করতে হয়। তাঁর যশ এবং খ্যাতি এ সময় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ, সবাই তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সত্যিকার বন্ধু এ সময় তাঁর কেউ ছিল না। থাকবেই বা কোথা থেকে—সমতুল প্রতিভাবান লোক না পেলে তো আর সত্যিকার বন্ধুত্ব হতে পারে না। সমসাময়িক লোকেরা এই সময় গায়টেকে অলিম্পিয়ান হাইটে তুলে দিয়েছেন—তিনি সেই উচ্চশিখরে উঠে তো আর নিচে নেমে এসে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে পারেন না। জীবনের শেষ চল্লিশ বছর তাঁর পক্ষে খুব সৃজনশীল এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল। শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে রঙ্গমঞ্চ কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা নিয়ে উপন্যাস লিখলেন 'উইলহেলম্ মাইস্টারস এ্যাপ্রেনটিসসিপ্ (১৭৯৫-৯৬)'। একই আদর্শে ১৮২১-২৯ সালে রচিত হল 'উইলহেলম্ মাইস্টারস্ জার্নিম্যান ইয়ার্স'। এর পরেও তাঁর বহু প্রেমকাব্য, জীবনী ইত্যাদি ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ফাউস্টের দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ কাব্যরসে ভরপুর হয়ে রচিত হয় এবং তাঁর মাস্টারপিসকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে সৃষ্টি করেন গায়টে।

মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই বিশ্ব-সাহিত্যে গায়টের একটা বিশেষ স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, এই 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটিও গায়টেরই আবিষ্কার। তাঁর রচনার অনুবাদ শুরু করেন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকেরা—যথা কার্লাইল, স্কট, জেরার্দ দ্য নার্ভল প্রভৃতি।

He is now generally admitted to be the most recent writer who can confidently be placed in the class of the supremely great—the class of Homer, Dante and Shakespeare .

[illegible]

এই নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে একটি মধ্যযুগীয় কাহিনী গড়ে উঠেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর এক ভ্রমণকারী যাদুকর ইয়োহান ফাউস্ট (১৪৮৮-১৫৪১)। কিংবদন্তী ছিল যে, অলৌকিক ক্ষমতা লাভের জন্য তিনি শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রী করেছিলেন। এই কাহিনী ফ্র্যাংকফার্টে একটি চ্যাপবুক বা প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় ১৫৮৭ সালে এবং এর পর ইংলণ্ডেও এর ইংরাজী অনুবাদ করা হয়। ইংরাজী অনুবাদটির বিষয়বস্তু নিয়েই ক্রিস্টোফার মারলো (১৫৬৪-৯৩) তাঁর বিখ্যাত নাটক 'দি ট্র্যাজিক্যাল হিস্ট্রী অভ ডক্টর ফস্টাস (১৫৮৮)' রচনা করেন।

ফরাসী সমালোচক এমিল লেগুই মারলোর নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'Marlowe divided the Ger-
man Legend of Faust, as he
had read it, into scenes. His
forceful egoism is projected
to the character of the nec-
romancer who vows himself to
the devil in return for sover-
eign knowledge and sovereign
power, and who is thus able
for twenty-four years to
satisfy his appetites. They
are poor and coarse enough in
the legend, leading him mainly
to play practical jokes on the
great ones of his day, the pope
and the cardinals, and to make
poor wretches the butt of his
magic. Marlowe takes little
interest in these distractions,
which he barely outlines. But
when Faustus evokes the
spirits of the past and obtains
a vision of the Greek Helen,
the poet, imagining her supre-
me beauty, is rapt to incom-
parable lyricism.

Retribution follows: Faus-
tus has to keep his bargain
with Lucifer, and tremblingly
awaits death and hell. Mar-
lowe, the atheist, alone in a
Christian world, must also, at
times, have felt to the full the
horror of his denials and his
blasphemies. He was too near
faith to be indifferent. The
very vehemence of his profes-
sions of impiety, was a [illegible]
that his emancipation was in-
complete. He shook his fist at
heaven and feared at the same
moment that heaven might
fall and crush him. The last
scenes of Faustus are among
the most pathetic and most
grandiose in Renascence
drama. They stand by them-
selves distinct from all the
rest of the drama. They are
unsurpassable, even by Shakes-
peare. Marlowe, incapable of
a complete masterpiece, yet
had genius to reach here and
there, the sublime beauty
which has no degrees. When
Goethe took the same legend
for the basis of one of the
Chief accomplishments of
modern poetry, he could not
eclipse the poignant greatness
of his forerunners scenes. He,
who did not know how the im-
pious tremble, could not recap-
ture that anguish of horror.

সত্যিই মারলোর এগো-ইজমের প্রতিফলিত রূপায়ণ দেখা যায় ডক্টর ফস্টাসের চরিত্রে। তাঁর আগেকার নাট্যকারেরা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যবহার করেছেন জোলোভাবে—তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। মারলো তাঁর ব্ল্যাঙ্কভার্সকে পৌরুষপূর্ণ, ধ্বনিময় এবং প্রাণবন্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ট্যাম্বারলেন থেকে শুরু করে তাঁর সমস্ত নাটকই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তা ছাড়া ক্রমশই তাঁর মঞ্চ সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সে জ্ঞানকে তিনি পূর্ণভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন নাট্য রচনায়। তাঁর কাব্যিক প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। ডক্টর ফস্টাসের শেষ দৃশ্যগুলি একদিকে বিষাদঘন—আবার অন্যদিকে অপূর্ব মাহাত্ম্যমণ্ডিত। শেক্সপীয়ারের রচনাও এ সব দৃশ্যকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছে, একথা বলা চলে না। অত অল্প বয়সে মারা না গেলে তিনি যে শেক্সপীয়ারের সমকক্ষ হয়ে উঠতেন না, একথা বলা যায় না। হ্যাঁ, তিরিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই একটি পান্থশালায় কয়েকটি গুণ্ডা প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ঝগড়া এবং মারামারির ফলে মারলো মারা যান। অবশ্য নিজেও তিনি উগ্রস্বভাবের লোক ছিলেন। তবে তাঁকে যে প্ল্যান করে হত্যা করা হয়েছিল, এ বিষয়ে আজ আর বিশেষ দ্বিমত নেই। একদিকে তিনি ছিলেন নাস্তিক—তা [illegible] তাঁর হত্যাকারীদের নাম [illegible] ফ্রাইজারকে সাহায্য করেছিল স্কেরিস এবং গুপ্তচর রবার্ট পোলী। শেক্সপীয়ারের ওপর মারলোর প্রভাব বড় কম নয়—হ্যামলেটেও ফাউস্ট লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ডক্টর ফস্টাস পড়ে।

এ্যালারডাইস নিকল তাঁর 'ওয়ার্লড ড্রামা' বইতে স্বীকার করেছেন যে, শেক্সপীয়ারের তুলনায় (মারলো এবং শেক্সপীয়ার একই বছরে জন্মেছিলেন) মারলোর অন্তরের পাবকশিখা ছিল বেশি উদ্দীপ্ত—শেক্সপীয়ারের প্রতিভার বিকাশ হয় ধীরে ধীরে এবং এই প্রতিভার পূর্ণ প্রস্ফুটনে সময় লেগেছিল, তবে বিকশিত হবার পর সে প্রতিভা দুই দশক সমভাবে প্রজ্বলিত ছিল। মারলোর প্রতিভা যেন আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল শুরু থেকেই, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

"It burned too fiercely to have lasting qualities"—মন্তব্য করেছেন নিকল।

মারলোর পর ফাউস্ট-কাহিনী ইংরাজ কমেডিয়ানদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে হতে আবার এর জন্মস্থান জার্মানীতে ফিরে আসে, অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি একে চালু রাখা হয় জনপ্রিয় পাপেট-শো-এ। কাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করে একে ফের রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন লেসিং ১৭৫৯ সালে। ফাউস্টের ভেতর লেসিং যেন নিজের জীবনের সমস্যার খোঁজ পেয়েছিলেন—

That of a scholar's enquiring mind in conflict with the limits imposed by the almighty.

[ক্রমশ]

মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব

এক সংবাদে প্রকাশ, সিংহলের সর্বোচ্চ পরিষদ মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছেন। সিংহলের সরকারী মহল থেকে এ খবর জানা গেছে। প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক নিযুক্ত এই পরিষদ বলেছেন যে, সিংহলে মেয়েদের অশোভন ও নীতিবিগর্হিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান থেকে নিবৃত্ত করা উচিত।

মিনি স্কার্ট কেবল সিংহলের মেয়েদের মনে নেশা ধরায় নি, পৃথিবীর সব দেশেই কমবেশী মিনির প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তো মিনি স্কার্ট নগ্নতার পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার প্রভাব চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও সোভিয়েতের মত সমাজতান্ত্রিক দেশেও দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের মিনি সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, ইংল্যান্ডে গিয়ে সব দেখ, কিন্তু সেখানকার মেয়েদের পোষাক অনুকরণ করো না। অথচ যুদ্ধপূর্বকালে এই ইংল্যান্ড রক্ষণশীল দেশ বলে পরিচিত ছিল। আজও রক্ষণশীলরা ভোটে জেতে।

মিনি স্কার্টের মূল রয়েছে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংকট। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অতি দ্রুতগতিতে ভেঙে পড়ছে, দেশে দেশে মানুষ নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। নতুনকে পথ ছেড়ে না দিয়ে ধনতন্ত্র মরণ কামড় দিয়ে সভ্যতার সংকট সৃষ্টি করছে। শুধু ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়ায় বোমাবর্ষণ নয়, প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি ও নৈতিক মূল্যবোধকেও ভেঙেচুরে দেবার চেষ্টা করছে। সিনেমার মাধ্যমে ধনিকশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক আক্রমণ চলছে। সিনেমা-গুলিতে মিনি স্কার্ট আর সর্ট পরা ছেলেমেয়েদের অবাধ কেলির দৃশ্য দেখে দেখে সারা জগতে এক সংক্রামক রোগের মত এই মিনি ফ্যাসান ছড়িয়েছে। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও রীতিনীতি ভুলে ঐতিহ্য-বোধহীন তরুণ-তরুণীরা মিনির শিকার হচ্ছে। ভারতে কিছু কিছু শাড়ীপড়া মেয়ে মিনির অনুকরণে মেতেছে। এদের প্রধান প্রেরণা অবশ্য সিনেমার নায়ক-নায়িকারা। পর্দায় 'তারকা'দের নাভির নিচে নামিয়ে কাপড় পরতে দেখে—তাকে অনুকরণ করার জন্য প্রলুব্ধ হয়। পথ-চারীদের নিজের নাভিদেশ দেখিয়ে দেহ প্রদর্শনীর এক বিকৃত বাসনায় অনেককে পেয়ে বসেছে। এই বিকৃত মানসিকতা

'জনতার আদালত' ছবিতে সন্ধ্যারাণী। পরিচালক মধু বসু

বিজাতীয় ফ্যাসনের প্রধান প্রচারক সিনেমা।

সিংহলে শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক এই বিকৃত ফ্যাসানের বিপদ সম্পর্কে যে সচেতন তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার কি বলেন? তাঁরা কি মার্কিন সিনেমাগুলিকে অবাধ প্রদর্শনের সুযোগ দিয়ে বিকৃত ফ্যাসনের পথ খোলা রাখবেন?

—সুজন।

মা আউর মমতা

বোম্বাইর সুচিত্রা কলা মন্দিরের "মা আউর মমতা" কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন বাংলার খ্যাত পরিচালক অসিত সেন।

বক্তব্যের দিক থেকে ছবিটি অভিনন্দনীয়। বিশেষ করে যখন স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও প্রতি বছর কোন না কোন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হচ্ছে। এখনো ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করা হচ্ছে—সে সময় "মা আউর মমতা" দর্শকদের কাছে একটা বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছে। এই ছবির নায়িকা হিন্দু কুমারী, তার পালক পিতার একজন মুসলমান ট্যাক্সি ড্রাইভার, সন্তান খৃস্টান। এই তিনজনকে কেন্দ্র করেই ছবির নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে মাতৃহৃদয়ের মমতায়।

মায়ার স্বপ্ন ছিল তার মনের মত মানুষের সঙ্গে সংসার গড়ে তোলার। কিন্তু ফাদার হেনরী গভীর রাত্রে তার হাতে তুলে দিল এক শিশু। এই শিশুকে নিয়ে অপবাদের অপমান মাথায় নিয়ে সে বোম্বাই এসে আশ্রয় পেল মুসলমানের বাড়িতে। শিশুটির নাম হলো রাম। একদিন মায়া জানতে পারলো, যার বাড়িতে সে নার্সের কাজ করে, সেই উইলিয়মের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র রাম। মাতৃহৃদয়ের বেদনা সত্ত্বেও রামের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সে উইলিয়মের কাছে জানালো রামকে গভীর রাতে পাবার কথা। কিন্তু উইলিয়ম তাকে ভুল বুঝলো। শেষ পর্যন্ত ফাদার হেনরী এসে সব মীমাংসা করে দিল।
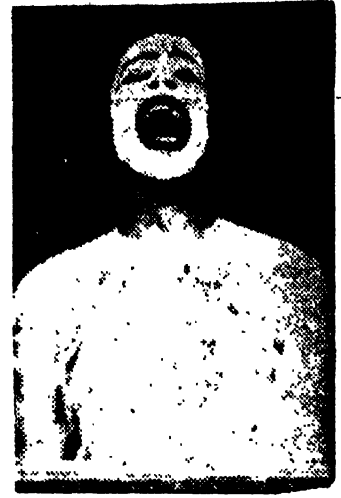
ছবিতে মাতৃত্বের মাধুর্যে ও মমতায় এক কুমারী নারী কিভাবে নিজের সুখ, ভবিষ্যৎ বিসর্জন করে পরের ছেলেকে মানুষ করলো, তার মহত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই কাহিনী দর্শকমাত্রেরই ভাল লাগার কথা।

মূকাভিনয়ে তপন দত্ত

কিন্তু হিন্দী ছবির ছক এবং মনোরঞ্জনী দিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায়, পরিচালক বাস্তববোধের সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেন নি, ঘটনাবলীর যৌক্তিকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উপস্থিত হয়েছে। গতানুগতিক মনোরঞ্জনীর দিকে আরো কম প্রাধান্য দিলে ছবির বিষয়বস্তু দর্শক-মনে বেশি রেখাপাত করতো। এই ছবিতে ভাঙরা নাচ, নৌকাবিহার গান থেকে কাওয়ালি পর্যন্ত সবই রয়েছে। পরিচালক অসিত সেন বোম্বাইয়ের দৃশ্যাবলীকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। বোম্বাইয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার দৃশ্যাবলী তিনি চমৎকার উপস্থিত করেছেন, যা অন্য কোন পরিচালকের দৃষ্টিতে এত সুন্দরভাবে দেখা যায় নি। বাস্তবের দিক থেকে সঙ্গত না হলেও, জাঁকজমকপূর্ণ সেট, রঙিন দৃশ্যাবলী, নাচ, গান ও জনপ্রিয় তারকা সম্মেলনে যাঁরা মনোরঞ্জনী ছবি পছন্দ করেন তাঁদের ভাল লাগবে।

ছবিতে অভিনয় করেছেন অশোককুমার, নতুন, মমতাজ, জীতেন্দ্র, রেহমান, জয়ন্ত, শবনম, নিরুপা রায়, লীলা মিশ্র, কেষ্ট মুখার্জী প্রমুখ। মায়ার চরিত্রে নতুনের অভিনয় অভিনন্দনীয়। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল পরিচালিত গানগুলি সুগীত এবং চিত্রগ্রহণ চমৎকার।

'দুটি মন' ছবিতে সুপর্ণা

বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চণ্ডালিকা' নৃত্য-নাট্যের একটি দৃশ্যে মা ও প্রকৃতির ভূমিকায় স্বপ্না সেনগুপ্তা ও কৃষ্ণা রায়।

ঋত্বিক ঘটকের ছবি

রোগ ভোগের পর সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করে সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটক মাত্র চার মাসের মধ্যে সুমেনা ফিল্মসের পতাকাতলে তিনখানি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি শেষ করেছেন। প্রথম ছবিটি পুরুলিয়ার লোকনৃত্য ছৌ সম্বন্ধে। দ্বিতীয়টির নাম "আমার লেনিন" এবং তৃতীয়টি বিশেষভাবে ফরাসী টেলিভিশনের জন্য নির্মিত রঙীন ছবি, যার নামকরণ এখনও হয় নি।

বাংলার সামসময়িক চিত্রশিল্পীদের নিয়ে শ্রীঘটক তাঁর পরবর্তী ছবি করতে যাচ্ছেন। নাম "আনন্দ বেদনা"। একই সঙ্গে আর একখানি ছবি করছেন ওড়িশার লোকশিল্পের ওপর, নাম "নীরবতার ভাষা"। দুটি ছবিই, বলাই বাহুল্য রঙীন এবং "চিত্রবহা" চিত্র সংস্কার পতাকাতলে নির্মিত হচ্ছে। প্রযোজনা করছেন শ্রীঅমিতাভ রায়, যাঁর সদ্য নির্মিত হিন্দী ছবি "গুপ-চুপ।" পরিচালক শ্রীদেবকুমার বোস।

এই দুটি আকর্ষণীয় ছবি নির্মাণে ঘটক-রায় জুটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী, কবি বিষ্ণু দে, ভাষাবিদ বিনয় রায় এবং লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার ডি· পি· ঘোষ। বম্বের হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছবিগুলি সম্পাদনা করার কথা। সুরারোপ করতে পারেন আলী আকবর খাঁ এবং রবিশঙ্কর।

ঘর ঘর কি কহানী

সুন্দর বাড়ি, পরিপাটি করে সাজানো বাসরঘর; বলরাজ সাহানী আর নিরুপা রায় উপস্থিত হলেন জয়প্রকাশ আর শশিকলার ঘরে। এই দৃশ্যের ছবি তুললেন মার্কাস বার্টলে। বিজয় বাওহান, স্টুডিওর বি· নেগী রঞ্জি প্রযোজিত ছবি 'ঘর ঘর কি কহানী'র এটি একটি দৃশ্য। একজন সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী নিয়ে ছবির চিত্রনাট্য। পরিচালনা করছেন টি· প্রকাশরাও। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।

সোভিয়েতে অপেরা দর্শক

গত বছর সোভিয়েতে অপেরা দর্শকের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ।

সোভিয়েত সাংস্কৃতিক মন্ত্রী দপ্তরের পরিচালনাধীন সঙ্গীতবিষয়ক ব্যবস্থা-পনার উপ-প্রধান স্টেপান মিরোনভ বলেছেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩৮টি অপেরা গৃহ আছে। এগুলি ১৫টি ইউনিয়ন রিপাবলিক ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সব থেকে বড় মস্কোর বলশই থিয়েটার, যার আসন-সংখ্যা ২,১০০। বলশই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু' শতাব্দী পূর্বে। এই থিয়েটার ঐতিহ্যসম্পন্ন এবং উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত এবং মঞ্চনৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। বলশয় থিয়েটারের অনুষ্ঠান নব নির্মিত কংগ্রেসসমূহের ক্রেমলিন প্রাসাদেও অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আসনসংখ্যা ৬ হাজার। সোভিয়েত ইউনিয়নে এটি সর্ববৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ।

লেনিনগ্রাডের কিরভ অপেরা এবং ব্যালে থিয়েটারের খ্যাতি বিশ্বময়। অন্যান্য বড় অপেরা হাউসগুলি হচ্ছে নভোসিবির্স্ক, কুইবিশেভ, স্বারর্ড-লভস্ক, ওডেসা, কিয়েভ এবং খারকভ। জর্জিয়ার সর্বপ্রাচীন অপেরা

কুরখানগাজার নামানুসারে কাজাক লোক বাদ্যযন্ত্র-এর ঐকতান অনুষ্ঠান

...হচ্ছে টিবলিসিতে। সোভিয়েত ...পেরার সাজ-সরঞ্জাম প্রচুর।

প্রতি বছর সোভিয়েতে অপেরা ...কদের সংখ্যা বাড়ছে। সোভিয়েত ...গণের সাংস্কৃতিক বিকাশের এটি ...টি লক্ষণ। টিকেটের দাম বেশ কম। ...শই থিয়েটারে সব-থেকে দামী ...কটের দাম ৩·৫০ রুবল মাত্র। সব-...র কমদামী টিকেট ৪০ কোপেক, ...প্যাকেট ভাল সিগারেটের দামের ...ন। রাষ্ট্র প্রতি বছর এই থিয়েটার-...গুলিকে অর্থ সাহায্য দান করে।

এ সব থিয়েটারে অন্যতম বৈশিষ্ট্য ...য়তধর্মী নাটক, সংগীত ও নৃত্য। ... বছর চাইকোভস্কি "ইউজেন ...জিন" ৩৫০ রজনী অনুষ্ঠান ...ছে। তার পরে জনপ্রিয় হয়েছে ...দিন-এর "প্রিন্স ইগোর", রিমস্কি ...কভের "দি জারস্ ব্রিট্রোথেড" এবং ...সার্গস্কির "বোরিস গডোনভ"। ...চম ইউরোপের চিরায়ত নাটক ...র্কে আগ্রহ আছে। ভার্দির ...গোলেট্টো" গত বছর ৬,৫০,০০০ ...ক দেখেছে।

সোভিয়েত ব্যবস্থায় নতুন নতুন ...জার এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ...ষ সাফল্যলাভ করেছেন সের্গেই ...ফিয়েভের 'ওয়ার এণ্ড পীস', ...ন খেনিকভের "ইন দি স্টর্ম" ...ভান বেলিস্কির "এণ্ড কোয়ায়েট ...দি ডন", ডিমিত্রি থোসটা-...ভিচের "কাতেরিনা ইজমাইলোভা"। গত বছর ব্যালে নাচের দর্শক ...১০ লক্ষ ৫০ হাজার।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে আগামী ৮ই, ৯ই, ১০ই ও ১১ই জুলাই সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। 'প্যাসেঞ্জার' (পোল্যাণ্ড), 'ফ্রোজেন লাইটনিং' (জি· ডি· আর), 'সাইলেণ্ট ব্যারিকেড' ও 'মে স্টারস্' (চেক-সোভিয়েত) দেখান হবে। ৮ই জুলাই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১৩ই জুন শনিবার দিলীপ চক্রবর্তীর সৌজন্যে এ্যাঞ্জেল ক্লাবের পরিচালনায় একটি মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান হয়ে গেলো। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, অজয় ভট্টাচার্য, দীপংকর ভট্টাচার্য, সমীরণ মুন্সী ও আরো অনেকে। আবৃত্তিতে অরুণাভ গঙ্গোপাধ্যায়। যন্ত্র সংগীতে নিমাই দাস ও সম্প্রদায় এবং মূকাভিনয়ে তপন দত্ত।

একক অভিনয়

গত ১৩ই জুন হাজরা রোডে শান্ত নীড় সংস্থার উদ্যোগে সাহাদৎ হোসেন 'আমরা বাঙালী' নাটিকা একক অভিনয় করেন। এই সঙ্গে রমা গুহ 'পৃথিবীর প্রথম আদম' মূকাভিনয় করেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কলকাতার ইডেন উদ্যানে শুরু হলো ভারত বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ।

বাংলা দেশের ক্রিকেট উৎসাহীরা এসে মাঠে হাজির হয়েছেন। ১৯৩৪ সালের ৫ই জানুয়ারী তাঁদের কাছে স্মরণীয় দিন। কলকাতায় সেই প্রথম অনুষ্ঠিত হলো সরকারী টেস্ট ম্যাচ।

সেদিনের ইডেন উদ্যানকে কেন্দ্র করে শুধু শহর কলকাতা নয় বাংলা দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে শুরু হলো একটি নতুন অধ্যায়।

সারি সারি গাছে ঘেরা, দূর্বাঘাসের সবুজে ভরা মনোহর ইডেন উদ্যান। একপাশে কলকাতার হাইকোর্ট, তার উল্টো দিকে বিশাল ময়দান। প্যাভিলিয়নের পেছনে পার্কটা পার হলেই রাস্তার ওপাশে গংগা, আর এ পাশে এ্যাসেম্ব্লি ভবন আর রাজভবন।

ইডেনের সেই মনোরম রূপ যিনি দেখেছেন তিনিই সব ভুলেছেন। সত্যিকারের ভালো পিচ ছিল সেদিন ইডেন উদ্যানে। সে পিচ থেকে সাহায্য পেয়েছেন ব্যাটসম্যানরা, সাহায্য পেয়েছেন বোলাররাও। বড় বড় গাছে ঘেরা ইডেন উদ্যানে শিশিরসিক্ত পিচ খেলার প্রথম আধ ঘণ্টা ছিল পেস বোলারদের কাছে স্বর্গ। ফাস্ট বোলারদের হাতের বল তখন যেন কথা কইতো। যেন বোলে বোলে সুইং করাতে পারতেন তাঁরা।

৫ই জানুয়ারী সকালে প্রায় তিরিশ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে শুরু হলো দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ।

ভারতের অধিনায়ক সি· কে· নাইডু টসে হেরে গেলেন। জার্ডিন প্রথমে ব্যাটিংই নিলেন।

খেলা শুরু হলো।

ওয়াল্টারস আর মিচেল শুরু করলেন ইংলণ্ডের ব্যাটিং। ভারতীয় দলের আক্রমণের ভার পড়লো মহম্মদ নিসার আর অমর সিং-এর ওপর। রান উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। ২৯ রান করে ওয়াল্টারস আর ৪৭ রান করে মিচেল আউট হয়ে গেলেন। বারনেটও আউট হয়ে গেলেন খুব তাড়াতাড়ি। তাঁর সংগ্রহ মাত্র ৮ রান।

কিন্তু তারপর জোট বাঁধলেন ল্যাংগরিজ আর জার্ডিন। খেলার ধারা গেল বদলে। ইংলণ্ড যে বিপদের সামনে পড়েছিল, সেই বিপদ কেটে গেল আস্তে আস্তে। তবে ভারতের বোলারদের তীব্র আক্রমণের সামনে বেশ সংযতভাবেই খেলতে হল ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের।

তাই খুব একটা বেশি রান উঠলো না। দিনের শেষে ইংলণ্ড ৫টি উইকেট হারিয়ে করলো ২৫৭।

পরের দিন বাকী ৫টি উইকেটে ইংলণ্ড যোগ করলো আরো ১৪৬ রান। ৪০৩ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস। ল্যাংগরিজের ৭০ রানই ইংলণ্ডের পক্ষে প্রথম ইনিংসে সব চেয়ে বেশি রান। তারপর ছিল জার্ডিনের ৬১ ও ভেরিটির ৫৫ রান।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন অমর সিং। তিনি ৪টি উইকেট লাভ করেছিলেন ১১৬ রানের বিনিময়ে। সি· কে· নাইডু ৪০ রান দিয়ে দখল করলেন ৩টি উইকেট। আর তরুণ খেলোয়াড় মুস্তাক আলি তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেটটি লাভ করলেন জার্ডিনকে আউট করে।

দ্বিতীয় দিন ভারত শুরু করলো তাদের প্রথম ইনিংস। নওমল জিওমল আর দিলওয়ার হাসান এলেন ভারতের ইনিংস সূচনা করতে।

কিন্তু শুরুতেই বিপর্যয়।

মাত্র ২ রান করে নওমল আউট হয়ে গেলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে শক্ত হাতে ব্যাট ধরলেন দিলওয়ার হাসান আর ওয়াজির আলী। খেলতে নেমেই উইকেট হারাবার পর ভারত আবার খেলতে লাগলো প্রাণ দিয়ে। রানও উঠতে লাগল ধীরে ধীরে।

কিন্তু সেই গতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। ৩৯ রান করে ওয়াজির আলী আউট হলেন। আর তার পরই মাত্র ৫ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন সি· কে· নাইডু। তখন এলেন লালা অমরনাথ।

জীবনের প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী করে অমরনাথ খ্যাতির উচ্চতম শিখরে। অমরনাথের প্রথম টেস্টের খেলার কথা তখন সকলের মুখে মুখে। ইডেন উদ্যানের তিরিশ হাজার দর্শকের সমবেত উল্লাসধ্বনির মধ্যে দিয়ে ধীর পায়ে উইকেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন বম্বে মাঠের হিরো লালা অমরনাথ।

কিন্তু তারপর?

তারপর তিরিশ হাজার দর্শককে হতবাক করে ক্লার্কের বলে জার্ডিনের হাতে ক্যাচ তুলে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। দর্শকরা ব্যাপারটা ভালোভাবে উপলব্ধি করার আগেই অমরনাথ ফিরে গেছেন।

... [illegible] ইনিংস [illegible] করে [illegible] বিজয় মার্চেন্ট (৫৪) আর সি. এস. নাইডু (৩৬) রান তুলে ভারতীয় দলের হার বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলেন না তাঁরাও। ২৪৭ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। মাত্র ৬ রানের জন্যে ফলো অনের হাত থেকে রেহাই পেল না ভারত।

দ্বিতীয় ইনিংসে নওমল আর দিলওয়ার হাসান শক্ত হাতে ব্যাট ধরে ধীরে ধীরে রান তুলতে শুরু করলেন। কিন্তু এবারও সেই একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো ভারতকে। নওমল ৪৩ আর দিলওয়ার হাসান ৫৭ রান করে প্রথম উইকেটে যে প্রয়োজনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের পরবর্তী ব্যাটসম্যানেরা পারলেন না তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে।

ওয়াজির আলী আউট হলেন কোন রান না করেই। সি. কে. নাইডু (৩৮) চেষ্টা করলেন খেলতে। কিন্তু পারলেন না। দ্বিতীয় ইনিংসেও অমরনাথ নিরাশ করলেন দর্শকদের। মাত্র ৯ রান করে আউট হয়ে গেলেন লালাজী। সি. কে. নাইডু, নওমল আর দিলওয়ার হাসান ছাড়া কোন ব্যাটসম্যানই কুড়ির ঘরে পা দিতে পারেন নি।

ফলে মাত্র ২৩৭ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। দু' ইনিংস মিলে ইংলণ্ডের চেয়ে মাত্র ৮১ রানে এগিয়ে থাকলো ভারত।

কিন্তু তখন আর পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ খেলার সময় শেষ হয়ে এসেছে। বাকী সময় মাঠে নেমে ইংলণ্ড দু'টি উইকেট হারিয়ে করলো মাত্র ৭ রান।

ফলে ইডেন উদ্যানের প্রথম ও ভারত বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় সরকারী টেস্ট ম্যাচ শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সব চেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ভারতের উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হাসান। কারণ তিনিই ছিলেন তখন প্রথম উইকেটরক্ষক যিনি দু' ইনিংসেই [illegible] অধিক রান।

ভারত বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের ফলাফল নিচে দেওয়া হলো—

ইংলণ্ড

১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
সি ওয়ালটারস ক গোপালন ব অমর সিং	২৯	নট-আউট	২
এ মিচেল ক গোপালন ব সি কে নাইডু	৪৭		
সি বারনেট এল-বি-ডব্লিউ ব অমর সিং	৮	ক গোপলন ব নিসার	৩
জে ল্যাঙরিজ ক নিসার ব গোপালন	৭০		
ডি জার্ডিন ক সি কে নাইডু ব মুস্তাক আলি	৬১		
বি ভ্যালেনটাইন এল-বি-ডব্লিউ ব সি কে নাইডু	৪০	স্টাঃ দিলওয়ার হাসান ব নওমল	৩
ডব্লিউ লেভেট ব সি কে নাইডু	৫		
এম নিকলস এল-বি-ডব্লিউ ব নিসার	১৩	নট-আউট	২
এল টাউনসেণ্ড ক দিলওয়ার হাসান ব অমর সিং	৪০		
এইচ ভেরিটি নট-আউট	৫৫		
ই ক্লার্ক ক মার্চেণ্ট ব অমর সিং	১০		
অতিরিক্ত (বাঃ ১৩, লে বাঃ ১০, নোঃ ২)	২৫		
মোট	৪০৩	(২ উইকেটে)	৭

ভারত

১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
নওমল জিওমল ক জার্ডিন ব নিকলস	২	ক লেভেট ব টাউনসেণ্ড	৪৩
দিলওয়ার হাসান ক জার্ডিন ব ক্লার্ক	৫৯	ব ক্লার্ক	৫৭
ওয়াজির আলি ক নিকলস ব ভেরিটি	৩৯	ক নিকলস ব ভেরিটি	০
সি কে নাইডু ব ক্লার্ক	৫	ক নিকলস ব ভেরিটি	৩৮
অমরনাথ ক জার্ডিন ব ক্লার্ক	০	ক লেভেট ব ক্লার্ক	৯
বিজয় মার্চেণ্ট ব ভেরিটি	৫৪	ক জার্ডিন ব ভেরিটি	১৭
মুস্তাক আলি এল-বি-ডব্লিউ ব নিকলস	৯	ক বারনেট ব নিকলস	১৮
সি এস নাইডু ক ভেরিটি ব নিকলস	৩৬	এল-বি-ডব্লিউ ব ভেরিটি	১৫
অমর সিং ক নিকলস ব ভেরিটি	১০	ক জার্ডিন ব টাউনসেণ্ড	১৮
মহম্মদ নিসার ক ওয়াল্টারস ব ভেরিটি	২	নট-আউট	০
এম গোপালন নট-আউট	১১	ক লেভেট ব ক্লার্ক	৭
অতিরিক্ত (বাঃ ৫, লে বাঃ ৫, নো ১০)	২০	(বাঃ ১০, লে বা ৪, নো ১	১৫
মোট	২৪৭		২৩৭

বোলিং

ভারতের পক্ষে

	১ম ইনিংস				২য় ইনিংস			
নিসার	৩৪	৬	১১২	১	২	১	২	১
অমর সিং	৫৪'৫	১৩	১০৬	৪	২	১	১	০
গোপালন	১৯	৭	৩৯	১				
মুস্তাক আলি	১৯	৫	৪৫	১				
অমরনাথ	২	০	১০	২				
সি এস নাইডু	৮	১	২৬	০				
সি কে নাইডু	২৩	৭	৪০	৩				

ইংলণ্ডের পক্ষে

	১ম ইনিংস				২য় ইনিংস			
ক্লার্ক	২৬	৮	৩৯	৩	১৯'৩	৪	৫০	৩
নিকলস	২৮	৬	৭৮	৩	২০	৬	৪৮	১
ভেরিটি	২৩'৪	১৩	৬৪	৪	৩১	১২	৭৬	৪
ল্যাঙরিজ	১১	৭	২৭	০	১০	৪	১৯	০
টাউনসেণ্ড	৮	৪	১৯	০	৮	৩	২২	২
বারনেট					২	০	৭	০

(চলবে)

সাহায্য ভাণ্ডার

কলকাতার ফুটবল খেলার মান নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক সময় নানা রকম কথা বলি। এক সময় ছিল, কলকাতার ফুটবল বলতে পুরো ভারতবর্ষের কথাই বোঝাতো। সত্যি কথা বলতে কি এখন সে দিন আর নেই। ফুটবল খেলায় বাংলাকে কোণঠাসা করার একটা পরোক্ষ চেষ্টা চলেছে। তাই সর্বভারতীয় দলে বাংলার খেলোয়াড়দের সংখ্যা দিনের পর দিন কমছেই। যদি বাংলা দলের খেলোয়াড়দের পরিপূরক হিসেবে সত্যিকারের ভালো এবং সর্বগুণে সেরা খেলোয়াড়-দের দলে নেওয়া হতো তাহ'লে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তাই কি হচ্ছে? ভেবে-চিন্তে দেখারও দরকার নেই, বিনা দ্বিধায় বলে দেওয়া যায় যে—তা হচ্ছে না। আর সে কথা সকলেরই জানা। তাই আজ অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু না বলে আত্মসমালোচনা করাই ভালো। সত্যিই তো বাংলা দেশের খেলোয়াড়রা কি এমন খেলছেন যে তাঁরা ভারতীয় দলে চান্স পাবেন? কি ছোট দল, কি বড় দল—কোন দলের খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যে আন্তরিকতার ছিটে-ফোঁটাও দেখা যায় না। তাই আজ কথায় কথায় এসে পড়ে অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়দের কথা। এ'দের তুলনায় তাঁরা কতো বড় খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এ'দের মধ্যে ধরতে গেলে কেউই আজকের দিনের খেলোয়াড়দের মতো সুখ ও সুবিধে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেন নি।

আজো দেখছেন না--আজো তাঁরা রয়ে গেছেন অন্ধকারেই। কিন্তু আমরা তাঁদের জন্যে কি করেছি আর আজই বা কি করছি? যে ক্লাবগুলিতে তাঁরা খেলতেন সেই ক্লাবগুলো তাঁদেরই সাহায্যের জন্যে কতোটুকু এগিয়ে এসেছেন। আই· এফ· এ· কর্তৃপক্ষ আর সরকারই বা এতোদিনে কি করলেন? সত্যি কথা বলতে কি, কেউ কিছুই করেন নি, অতীতের দিকপাল আর আজকের দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্যে। দিন কয়েক আগে বৃষ্টির জন্যে ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান বনাম মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। এখন কথা উঠেছে টিকিটের টাকা ফেরৎ দেবার। কিন্তু সকলের কাছে কি টিকিটের ছেঁড়া অংশ আছে? মনে তো হয় না। কেউ কেউ মাঠে ঢুকেই টিকিটের অংশ ফেলে দেন, তা ছাড়া সেদিনের সেই কাক-ভেজা বৃষ্টিতে টিকিটের অংশ হয়তো নষ্টই হয়ে গেছে। তাই টিকিটের দাম ফেরৎ দিলে কেউ পাবেন, কেউ পাবেন না। কেউ বা আবার ঐ সামান্য টাকার জন্যে ছুটোছুটি করতে চাইবেন না। ফলে অনেক টাকাই ফেরৎ দেওয়া হবে না। সেই টাকাগুলোর দশা কি হবে? তার চেয়ে এক কাজ করা যেতে পারে, টিকিটের টাকা ফেরৎ না দিয়ে সেই টাকা দিয়ে দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হোক আর প্রত্যেক মাসে দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সেই ভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়া হোক। আমাদের এই আবেদন বাংলা দেশের ফুটবল-রসিকদের কাছে, ক্লাবগুলোর কাছে, আই· এফ· এ· কর্তৃপক্ষের কাছে এবং সরকারের কাছেও। আপনারা সকলে ভেবে দেখুন।

—শান্তিপ্রিয়

ফুটবল মাঠে

মেক্সিকো এখন শান্ত। ব্রেজিলেও উৎসাহ-উদ্দীপনা আর বিজয় আনন্দের উত্তেজনার জোয়ার কমে এসেছে।

কিন্তু কলকাতায় ফুটবল খেলা নিয়ে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে। একক লীগের পয়েন্ট এবার সুপার লীগের খেলার পয়েন্টের সংগে যোগ করা হবে। তাই বড় দলের, বিশেষ করে তিন প্রধানের প্রতিটি খেলাই এখন পরম আকর্ষণীয়। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান স্পোর্টিং পয়েন্ট সংগ্রহের দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলেছে ধীর পায়ে।

॥ বলাই দে ॥

মারডেকাগামী ভারতীয় ফুটবল দল গঠনের জন্যে আয়োজিত ট্রেনিং ক্যাম্পে বলাই দে'র ডাক না পড়ায় অনেকেই অবাক হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে যদি খেলার মানের কথা এসে পড়ে তাহলে আপশোসের আর সীমা থাকে না। দিন কয়েক আগে মোহনবাগান বনাম স্পোর্টিং ইউনিয়ন দলের খেলার যে হাল দেখা গেল তার তুলনা মেলা ভার। মোহনবাগানের অতো খারাপ খেলা এর আগে খুব একটা দেখা যায় নি।

খারাপ খেলার পাল্লায় ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহমেডান স্পোর্টিংও কম যায় না। ছোট দলগুলোর বিরুদ্ধে এঁদের খেলা দেখে শুধু একটা কথাই মনে হয় যে, ছোট দলের বিরুদ্ধে খেলাগুলোকে [illegible] খেলা [illegible] না।

তাই খাপছাড়া খেলা, কোন বাঁধুনী নেই, খেলোয়াড়রা ইচ্ছামত খেলছেন, কি আক্রমণ, কি রক্ষণ, কোন বিভাগেই নেই নিজেদের মধ্যে সহজ এবং সুন্দর বোঝাবুঝি। ফলে খেলার মান যেমন যায় নেমে, তেমনি খেলার দশা হয়ে ওঠে শোচনীয়।

যাই হোক পর পর তিনটে রবিবার কলকাতার ইডেন উদ্যানে তিনটি চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম খেলায় বৃষ্টির মধ্যে খেলে ইস্টবেঙ্গল এক গোলে হারিয়ে দেয় মহমেডান স্পোর্টিংকে। দ্বিতীয় খেলাটি ছিল মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে। এই খেলাটিকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাংলা যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই খেলাটা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির জন্যে বিরতির পর আর অনুষ্ঠিত হতে পারলো না। পরিত্যক্ত হলো। সেই সময় ইস্টবেঙ্গল জিতছিল এক গোলে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকদের এমনই পোড়া কপাল —গোলের দেখা সেদিন যদিও মিলল, কিন্তু জয়লাভের টিকি তাঁরা ছুঁতে পারলেন না। পরিত্যক্ত ঐ খেলাটা আগস্ট মাসের কোন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। এর পরের রবিবারে ছিল মোহনবাগান আর মহমেডান স্পোর্টিং দলের চ্যারিটি খেলা। কিন্তু খেলা আরম্ভ হবার আগে এমন বৃষ্টি শুরু হলো যে খেলা মোটে আরম্ভই করা গেল না।

অথচ ঐ খেলা দুটির ব্যবস্থা যদি অন্য মাঠে অর্থাৎ মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গল মাঠে হতো তাহলে মনে হয় দু'দিনই খেলা শেষ পর্যন্ত চলতে পারতো। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে, ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলা চলতে পারে না। কারণ ইডেনের মাটি এঁটেল আর ঘাসগুলোও দুর্বা। ফলে বৃষ্টি হলেই খেলোয়াড়দের বুটের স্পাইক এঁটেল মাটিতে টেনে ধরে আর বৃষ্টির জলেই দুর্বাঘাসগুলো পেছল হয়ে যায়, তাই খেলোয়াড়রা পারেন না তাঁদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাই ফুটবল মাঠে বালির ভাগ থাকে বেশি আর ঘাসগুলোও থাকে সাধারণ। সেইজন্যে বৃষ্টির সময় ইডেনে ভালো ফুটবল অসম্ভব। আশা করি, ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান-মহমেডান স্পোর্টিং দলের খেলার হাল দেখার পর এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন এবং এই কথাই বলবেন যে, দরকার নেই ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করে।

[এই সপ্তাহের খেলা]

৮ই জুলাই : বুধবার

ইস্টবেঙ্গল : ভ্রাতৃসংঘ
কুমারটুলী : কালীঘাট
খিদিরপুর : বালী প্রতিভা

৯ই জুলাই : বৃহস্পতিবার

মহঃ স্পোর্টিং : জর্জ টেলিগ্রাফ
রাজস্থান : বাটা
ঐক্যসম্মিলনী : টালীগঞ্জ অগ্রগামী

১০ই জুলাই : শুক্রবার

মোহনবাগান : এরিয়ান্স
ভ্রাতৃসঙ্ঘ : উয়ারী
স্পোর্টিং ইউনিয়ন : বি এন আর

॥ নিউকম্বে ॥

উইম্বেলেডন ফাইন্যালে তাঁর নিজের দেশেরই খেলোয়াড় রোজওয়েলের প্রতিদ্বন্দ্বী।

১১ই জুলাই : শনিবার

ইস্টবেঙ্গল : ইস্টার্ণ রেল
বালী প্রতিভা : হাওড়া ইউনি
জর্জ টেলিগ্রাফ : খিদিরপুর

১৩ই জুলাই : সোমবার

মহঃ স্পোর্টিং : কালীঘাট
কুমারটুলী : উয়াড়ী

১৪ই জুলাই : মঙ্গলবার

ইস্টবেঙ্গল : হাওড়া ইউনিয়ন
বি এন আর : ইস্টার্ন রেল
ঐক্যসম্মিলনী : পোর্ট কমিশনার্স

প্রশ্ন-উত্তর

দেবেশ দাশ (হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা)

উত্তর : সম্পাদিকা মহাশয়ার বাড়ির ঠিকানায় লেখা আপনার চিঠি আমাদের হস্তগত হয়েছে। কতকগুলো ক্লাবের মধ্যে কোন্ কোন্ দলের স্থান (ক্রমান্বয়ে) কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিশেষ কোন বছরের ফলাফলের ওপর কোন মতেই নির্ভর করা চলে না। ক্লাবগুলির ঐতিহ্য, সুনাম, খেলার ধারা, বয়স, খেলোয়াড়ী মনোভাব, খেলার ফলাফল প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে ক্লাবগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের যে কোন অন্ধ সমর্থকও মোহনবাগানকে ইস্টবেঙ্গলের আগেই স্থান দেবেন। আর ভিন্ন প্রদেশী দলগুলি যে কোনমতেই মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গলের ধারে কাছে আসে (কোন দিক দিয়েই) না—সে কথা বলাই বহুল্য। তাই আপনার অবগতির জন্যে জানাই যে, সাপ্তাহিক বসুমতীর কোন লেখাই কাউকে খুশি করার জন্যে লেখা কিম্বা প্রকাশ করা হয় না। আপনি যদি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক হন তাহলে এ কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। যাই হোক, সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলা বিভাগ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানালে আমরা খুশি হবো এবং আরো কি কি করলে বিভাগটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে—এ কথাও আশা করি আপনি জানাতে ভুলবেন না। আমরা সব সময়ই আপনাদের সহানুভূতি কামনা করি।

শংকরপ্রসাদ মজুমদার (সংঘশ্রী ক্লাব, পাদাবাড়ি কলোনী, গৌহাটি—১২)

প্রশ্ন : প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় কে· দত্তের ছেলে এখন কোন্ ক্লাবে খেলছেন? তাঁর পুরো নাম ও ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : আমার ঠিক জানা নেই। কেউ জানালে জানিয়ে দেবো।

অলোক রায়চৌধুরী ও অরূপ রায়চৌধুরী (বনগ্রাম, গতিগঞ্জ)

প্রশ্ন : এ বছরের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় ক'টি দেশ অংশগ্রহণ করেছে—তাদের নাম জানতে চাই।

উত্তর : আগেই জানানো হয়েছে, দেখেছেন নিশ্চয়ই।

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিকেট অনুরাগীদের যদি প্রশ্ন করা যায় রঞ্জি ট্রফিতে নাটকীয়তায় ভরা বাংলা দলের কোন্ খেলাটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে?—তা'হলে অনেকেই একসঙ্গে বলবেন ১৯৫৩ সালে ইডেন উদ্যানে হোলকারের বিরুদ্ধে ফাইন্যাল খেলাটির কথা।

বাংলা টসে জিতে ব্যাটিং সুরু করে প্রথম দিনের শেষে পি· বি· দত্তের অপরাজিত ১৪০ রান পুঁজি করে ২ উইকেটে ২৬১ রান তুললো। দ্বিতীয় দিনে পি· বি· দত্তের ১৪১ রানে বিদায় নেবার পর নির্মল চট্টোপাধ্যায় (৫২), এস· কে· গিরিধারী (৪৫), মণ্টু ব্যানার্জী (৩১), এন চৌধুরী (২৯ অপঃ) প্রমুখের দৃঢ় ব্যাটিং-এর ফলে বাংলার মোট রান হল ৪৭১।

হোলকার ৩য় দিনে ব্যাট করতে নামলো। দু'শো মিনিট উইকেটে থেকে মুস্তাক আলী ৯৯ রান করে আউট হলেন, বি· বি· নিম্বলকর কিন্তু ১১৫ রানে নট আউট রইলেন। দিনান্তে হোলকারের রান হল ৪ উইকেটে ৩৫৬। বাংলা দলের থেকে মাত্র ১২৩ রান পিছনে, হাতে ছ'টি উইকেট। চতুর্থ দিনেও নিম্বলকর সবিক্রমে ব্যাট করতে লাগলেন এবং সবশেষে আউট হলেন ২১৯ রান করে, দলের তখন মোট রান ৪৯৬। বাংলা দলের থেকে ১৭ রান এগিয়ে। বাংলা দল খুব দ্রুত রান তুলতে লাগলো। ২য় ইনিংসে চতুর্থ দিনে ১৫৫ মিনিটে ৫ উইকেটে ২৫৭ রান করলো (নির্মল চ্যাটার্জী ৫৪, বি· ফ্রাঙ্ক ৬২)। পঞ্চম দিনে বাংলা দল মিনিট দশেক ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৩২০ রান করে ডিক্লেয়ার্ড করে দিল।

পুরো একটা দিনও হাতে সময় নেই। হোলকার দলে আছেন সি· কে· নাইডু, নিম্বলকার, মুস্তাক আলি প্রমুখ বাঘা বাঘা খেলোয়াড়। তাঁদের দলের ১০ জনকে এক দিনে আউট করা খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা দল প্রায় তা ঘটাতে পেরেছিল। কিন্তু বাংলা দলের জেতার পথে বাদ সাধলেন ধানওয়াদে ও হীরালাল গাইকোয়াড়। এক মুস্তাক ছাড়া ২য় ইনিংসে কেউ ৩০ পেরুন নি। মুস্তাক করেন ৪৬ রান। হোলকারের শেষ জুটি ধানওয়াদে ও গাইকোয়াড়কে কিন্তু বাংলার বোলাররা চেষ্টা করেও আউট করতে পারলেন না। দর্শকরাও খুব নার্ভাস হয়ে পড়লেন। তাঁরা একবার আসন ছেড়ে উঠে যান, আবার পর মুহূর্তে বসে পড়েন। এই বুঝি বাংলা জিতল, এই বুঝি হেরে গেল! গাইকোয়াড় শ্লিপে ক্যাচ তুললেন সুনীত সোমের বলে কিন্তু উইকেটরক্ষক আর শ্লিপ ফিল্ডসম্যান ব্যর্থ হলেন ক্যাচটি ধরতে। ধরতে পারলেই বাংলা জিততো, কিন্তু উল্টে বাংলা দল এক উইকেটে হেরে গেল।

—প্রশান্ত বসু,
কল্যাণী ভবন, ইয়ং রোড,
আসানসোল।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বৃহস্পতিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
৭৫ বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
Price : 30 Paise
Thursday, 16th July, 1970

পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ বেকার সমস্যা

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর পাশের হার দেখে অনুমান করা গেছে, অভিভাবকদের টাকার শ্রাদ্ধ করাটা স্বল্পমতিসম্পন্ন কিশোর-যুবকদের গ্রাহ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও পরীক্ষার বিচার-আচারের শাসনদণ্ড যাঁদের হাতে তাঁরা নির্দ্বিধায় অভিভাবকদের ঘাড় মটকাচ্ছেন।

পরীক্ষার প্রচলিত রীতিতেই নাকি পরীক্ষা-কর্তাদের অরুচি! কোন্ নীতিটা আসলে ঠিক, তা যাঁরা নির্ণয় করতে আজো পর্যন্ত অপারগ, তাঁরা একমাত্র সক্ষম তাঁদেরই অরুচিকর নিয়মবলে ফেলের মাত্রা বৃদ্ধি করতে। ফেলের কারণানুসন্ধান করতে তাঁরা হয়তো যতো দোষ নন্দ ঘোষ মাস্টার মশায়দের গর্দান নেবার হুকুম দেবেন। সেখানে হুকুম দানের ব্যাপারটা বেশ সহজ এবং সরল। ভবিষ্যৎ গড়ার কাজ যাঁদের হাতে ন্যস্ত, তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ কিছু না থাক, ভবিষ্যতে তাঁদের গর্দান নেবার হুকুমটা অনায়াসে দেওয়া যায়। আমরা কিন্তু পরীক্ষায় হাজার হাজার ছাত্রের পণ্ডশ্রমের জন্য দায়ী করতে চাই পরীক্ষা-কর্তাদের।

সম্প্রতি পরীক্ষা-কর্তাদের বিশেষজ্ঞ কমিটির এক প্রস্তাব কাগজে কাগজে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রস্তাবটি মাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষা-পদ্ধতির অদল-বদল সম্পর্কে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পর থেকে আশুতোষেরই ছত্র-ছায়ায় বহুবার পরীক্ষার নিয়মকানুন পালটানো হয়েছে। অধুনা পরীক্ষায় সর্বজনজ্ঞাত একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—চাকরীপ্রাপ্তি। এখন পাশ করলেও চাকরী পাওয়া যায় না, ফেল করলে তো কথাই নেই। তাই পাশ বা ফেল যাই করুক—বাধ্য-অবাধ্য সব ছেলের প্রধান আশ্রয় পাড়ায় পাড়ায় রকগুলি। সেখানেই অযথা বকবক করে তারা তাদের ঘোরতর শত্রু সময়কে বধ করে। জীবনের এই যৌবন-মুহূর্তে, প্রথম অনুভব করে সময়ের কোনো মূল্য নেই। স্বভাবতই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধীরে ধীরে মনে পোষণ করতে সুরু করে অশ্রদ্ধা। অথচ এদের বিরুদ্ধেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম সমাজ ও রাষ্ট্রের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে বড় বেশী। ষষ্ঠ জোট বা অষ্ট জোট, কিংবা অষ্ট জোটের বদলে নব জোটই হোক, অথবা নব কংগ্রেস কিংবা আদি কংগ্রেস যিনিই শাসনে থাকুন না কেন, এদের চাকরী দিতে না পারলে কারো রক্ষা নেই এবং এরাই যে একদা সমাজ ও রাষ্ট্রে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করবে সে কথা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি কয়েকবারই সম্প্রতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নাকি রাজ্যে রাজ্যে বেকারদের চাকরীতে নিয়োগ করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু চাকরী দেবার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা তো নির্বিকার চিত্তে একটি একটি করে কল-কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

রোটারি ক্লাবের অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন বেশ বড় বড় কথা শুনিয়েছেন, তার মধ্যে আছে শান্তিপূর্ণ ছাত্রদের জন্য তাঁর সপ্রশংস পিঠ চাপড়ানি, অশান্তি সৃষ্টিকারী যে মুষ্টিমেয় ছাত্র বোমা, ছোরা ও লাঠি নিয়ে অন্যান্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ধমক; এম এ, এস সি, এম-কম ছাত্রদের অধিকাংশ ব্যয়ভার জনগণের অর্থ-ভাণ্ডার থেকে আসে সেজন্য সেই জনগণের প্রতি আছে তাঁর দরদ; আর আছে রোটারিয়ানদের প্রতি ডঃ সেনের নিষ্ফল করুণ আবেদন। তিনি বলেছেন, "রোটারিয়ানদের উচিত এদের সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করা, ওদের মধ্যে বেকারত্ব দূর করার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা। তাহলে হয়তো তাদের এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দূর করা সম্ভব।"

ঐ অনুষ্ঠানে ডঃ সেনের [illegible]পর-বিরোধী উক্তিগুলি অত্যন্ত আকর্ষ[illegible]একবার তিনি বলছেন, "কিন্তু এই মুষ্টিমেয় ছাত্র বোমা, লাঠি, ছোরা নিয়ে এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা চিন্তার বিষয়।" আবার তিনিই বলেছেন, ওদের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হলে, ওদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দূর করা সম্ভব হবে। দেশের লাঠিগাছটি যাঁদের হাতে তাঁদের কাছে নিষ্ফল আবেদন করাতেই কি ডঃ সেনের মতো খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে গেল? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তি আনতে পারবেন না, কারণ সমস্যা আরো গভীরে। আর আমাদের সরকার? সরকারী শিক্ষার মূল পীঠস্থান প্রেসিডেন্সিতে বেঞ্চি-চেয়ারগুলি এখন ছাত্র-শিক্ষকের অভাবে অশ্রুজল ফেলছে। একদা লাটসাহেবদের অফিস চালাবার জন্য যেখানে চাকুরীয়াদের সৃষ্টি করা হোত, এখন তা লাটে উঠতে বসেছে!

চারিদিকে এমন অনাসৃষ্টির মধ্যে লজ্জা নেই শুধু পরীক্ষা-কর্তাদের। তাঁদেরই বেহিসেবী পদ্ধতিতে ফেলের সংখ্যা বাড়ছে, কলেজে ভর্তির নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে আর পাশ করেও যে রাজস্বে চাকরী পাওয়া যায় না পরীক্ষা-কর্তারাই সে রাজস্বের ভিত ভাঙবার পথ প্রশস্ত করছেন। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ঋদ্ধ, বিজ্ঞানে অনগ্রসর এ দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তারা যদি নৈতিক নিয়মের দোহাই না পেড়ে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে অপহৃত মাটি পুনরুদ্ধারের আদেশ দিয়ে নতুন করে আবাদের ডাক দিতেন তাহলে অবশ্যই সোনা ফলত। কিন্তু সোনা ফলনের চেয়ে পরীক্ষার তালে তালে গেলে সবকিছুই ঢিলে তালে চলে! কিন্তু সেটাই কি শেষ সত্য?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

দুম্ করে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে দেশাই-সাহেব রাজনীতিকদের তাজ্জব করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের নায়ক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন শ্রী ডি এস দেশাই। মন্ত্রি-গিরি করছেন যুগাধিক কাল ধরে। নায়ক মন্ত্রিসভারও তাঁর স্থান ছিল দ্বিতীয়, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর পরেই। মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছিল যাঁর বাঁধা, তিনি কেমন অম্লান-বদনে সামান্য কারণে বৈরাগ্য প্রকাশ করলেন। আজ যখন চারদিকে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা চলছে, মন্ত্রিত্ব বা একটু ক্ষমতার জন্যে এক-একজন দিনে তিনবার করে দলত্যাগ করতেও দ্বিধা করছেন না, তখন ডি এস দেশাইয়ের ত্যাগের এই দৃষ্টান্তে অনেকেই অবাক হলেন সন্দেহ নেই।

বিস্ময়ের কারণ এখানে যে, শ্রীদেশাইয়ের মনে যে কিছুকাল থেকে ধিকি ধিকি তুষের আগুন জ্বলছিল, এ-খবর বাইরের বেশি লোক জানতো না, সাধারণ লোক তো নয়ই। শ্রী ভি পি নায়ক মন্ত্রিসভার রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন শ্রীদেশাই। পদত্যাগের কারণ হিসেবে অবশ্য শ্রীদেশাই যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর যে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে, তার পর মন্ত্রিসভায় থাকা আর তিনি সঙ্গত মনে করেন নি। মন্ত্রিসভা বা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীদের সমালোচনা কোন্ দেশে না হয়ে থাকে? যে দলের সরকার দেশ শাসন করছেন সে দল থেকেও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীদের কাজের বা ভূমিকার বিস্তর সমালোচনা করতে দেখা যায়। একই সভায় মুখ্য-মন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়কও সমালোচিত হয়েছিলেন। শ্রীনায়ক টেলিফোনে শ্রীদেশাইকে অনুরোধও করেছিলেন, নাগপুর থেকে তাঁর না ফেরা পর্যন্ত তিনি যেন পদত্যাগ না করেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতীক্ষা দেশাই করেন নি।

কেন করেন নি? আর শ্রীদেশাই-য়ের পদত্যাগপত্র সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হলো কেন? পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করে নেবার কোনো অনুরোধই বা করা হলো না কেন? এখানেই সেই তুষের আগুনের সন্ধান মিলবে। অভিযোগ উঠেছে যে, সেচমন্ত্রী শঙ্কররাও চবন এবং সমবায়মন্ত্রী যশোবন্তরাও মোহিতই ষড়যন্ত্র করে শ্রীদেশাইকে অপসারণের অসুস্থ আবহাওয়া গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীদেশাইয়ের কাজে মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই হস্তক্ষেপ করে বাধা দিতেন বলেও কথা উঠেছে। শ্রীদেশাই কি সেজন্যই তিতি-বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে,
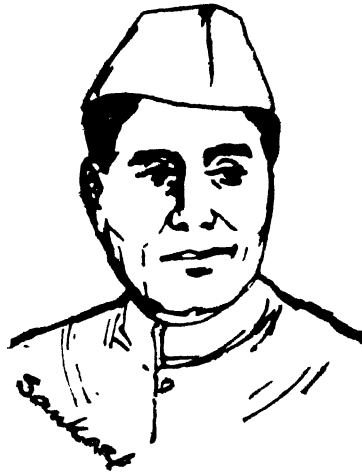
ডি. এস. দেশাই

"কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের পক্ষেই মন্ত্রিসভা বা (কংগ্রেস) সংগঠনে থাকা আর সম্ভব নয়?"

শ্রীদৌলতরাও শ্রীপৎরাও দেশাই পরি-চিত মহলে বাবাসাহেব দেশাই নামেই খ্যাত। পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় এক মারাঠা পরিবারে ১৯১০ সালে বাবাসাহেবের জন্ম—সাতারা জেলাই উপহার দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচ্যবনকে। কোল্হাপুরের সাইক্স ল কলেজ থেকে আইন পাশ করার পর শ্রীদেশাই দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন রাজ-নীতিতে যোগ দিয়ে তিনি প্রথমে পাটানের গ্রামীণ উন্নয়নী বোর্ডের সভা-পতি নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ ১১ বছর ধরে জেলা আঞ্চলিক বোর্ডের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব বোম্বাই রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই শ্রীদেশাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন এবং প্রতিবারই তিনি সাফল্য অর্জন করে-ছেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জিতে তিনি বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতকের পদ লাভ করে-ছিলেন। পরের বার ১৯৫৭ সনে জেতার পর তাঁকে পূর্তদপ্তরের মন্ত্রিত্ব দেওয়া হয়। যখন আলাদা রাজ্য হিসেবে মহারাষ্ট্র গঠিত হলো তখন শ্রীদেশাইকে তার প্রথম সরকারের শিক্ষাদপ্তরের ভার দেওয়া হয়, শ্রীচ্যবন ছিলেন তখন নতুন রাজ্যটির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। এর পর '৬২-র নির্বাচনে জয়ী হয়ে শ্রীদেশাই শ্রীকান্নামওয়ারের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের কৃষিমন্ত্রী হন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনায়ক পুরস্কার হিসেবে তাঁকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর দেন বটে, কিন্তু '৬৭-র নির্বাচন জিতে যেন তিনি অপরাধ করে ফেললেন। কারণ তাঁর স্বরাষ্ট্রদপ্তর কেড়ে নেওয়া হলো, দেওয়া হলো রাজস্বদপ্তর।

এই প্রবীণ রাজনীতিক এবার কী করবেন? বি কে ডি থেকে তাঁর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে, সংগঠনপন্থী কংগ্রেসী-রাও চাইছেন এই অভিজ্ঞ, স্বার্থত্যাগী দেশসেবককে। তাঁর পদত্যাগ মহারাষ্ট্র সরকারকেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে শ্রীদেশাইয়ের একটু সময় লাগবে বৈকি।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(১৯)

পাকিস্তান জিন্নার কাছে প্রাণ স্বর্গ, সুভাষচন্দ্রের কাছে সমস্ত স্বপ্ন ও সাধনার সমাধিক্ষেত্র। পাকিস্তান—তার মানে ভারত-বিভাগ—তার মানে ভারতের পূর্ব ইতিহাসের ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি। পাকিস্তান স্বীকার করার অর্থ ঘৃণার ও বিদ্বেষের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার। একটা জাতিকে চিরদিনের জন্য অন্ধ ও খঞ্জ করে রাখার চক্রান্তে সায় দেবার চেয়ে বড় কাপুরুষতার কথা সুভাষচন্দ্র জানতেন না। তথাকথিত সর্বনাশের সামনে অর্ধত্যাগের পণ্ডিত হওয়াকে ক্ষত্রিয় সুভাষচন্দ্র ঘৃণ্য মনে করতেন।

পাকিস্তান প্রস্তাব সরকারীভাবে মুসলিম লীগ গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশবিভাগের সর্বনাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন। তাঁর হরিপুরা-ভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে যা বলেছিলাম, তা এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, স্বাধীনতা সন্নিকট এবং সেই স্বাধীনতাকে বানচাল করবার জন্য ইংরেজ সর্বপ্রকার ভেদনীতির আশ্রয় নিতে বদ্ধপরিকর। ইংরেজের চক্রান্তের প্রথম প্রকাশিত রূপ ফেডারেশন পরিকল্পনা, যার দ্বারা 'দেশীয় রাজ্যের ভারত' এবং 'অবশিষ্ট ভারত'—এই দুই ভাগে ভারতকে বিভক্ত করার মতলব করা হয়েছিল। ইংরেজের দ্বিতীয় চক্রান্ত, হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতের বিভাগ-পরিকল্পনা। দ্বিতীয় চক্রান্ত সম্বন্ধে হরিপুরা-ভাষণে সুভাষচন্দ্র কী বলেছিলেন, তা পুনশ্চ উদ্ধৃত করছিঃ

"An internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power ... I have no doubt that British ingenuity will seek some other (other than the Federal Scheme) constitutional device for partitioning India and thereby neutralising the transference of power to the Indian people."

সুভাষচন্দ্রের এই 'দৈববাণী' তখন দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের বধির কর্ণে কোনো সাড়া জাগায় নি। ইংরেজের যে কোনোরকম বদ মতলব থাকতে পারে তা নেহরু, আজাদ, প্যাটেল প্রমুখ ব্যক্তিরা সজোরে ভুলেছিলেন। যা কিছু দোষ সবই আমাদের; আর ইংরেজ, গণতান্ত্রিক শক্তির রামচন্দ্র—ওঁরা বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন। তা বিশ্বাস করতে তাঁরা আবার বাধ্য ছিলেন, কারণ অবিশ্বাসের অর্থ হাইকম্যাণ্ডের গদী ও বালিশ চলে যাওয়া।*

*ভারত বিভাগের রক্তনদীতে সোনার তরী ভাসিয়ে এবং তার উপরে ভারতীয় নেতাদের তুলে নিয়ে যে দুই 'হে সুন্দর', 'হে সুন্দরী' বিদেশী ও বিদেশিনী অর্থাৎ লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেন সর্ব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের গুপ্ত ভাবের আপ্তলীলা, হায়, স্যাণ্ডহার্স্টে শিক্ষাপ্রাপ্ত লেফ্‌টেন্যাণ্ট-জেনারেল এল পি সেনের কাছেও কিভাবে ধরা পড়েছিল, তার কিছু পরিচয় স্টেটসম্যান পত্রিকার ৫ই জুলাই, ১৯৭০ সংখ্যায় পেয়েছি। কাশ্মীর যুদ্ধের উপরে লেখা *Slender was the Thread* বইয়ের মধ্যে জেনারেল সেন পরিষ্কার লিখেছেন, কাশ্মীর সমস্যা ইংরেজেরই সৃষ্ট। কাশ্মীর যুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারতীয় বাহিনী এমন একটি অবস্থায় পৌঁছেছিল, যখন উরি পেরিয়ে কিছু অগ্রসর হয়ে ডোমেল অধিকার করলে সামরিক দিক থেকে বিশেষ সুবিধা ঘটে—তখন দিল্লীর ইংরেজ সমরকর্তারা সে প্রচেষ্টা বানচাল করে দেন। জেনারেল সেন আরও লিখেছেনঃ "যে বৃটেন ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়নের জন্মক্ষণে উভয় দেশের জন্য কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ সরবরাহ করেছিল, সে ইচ্ছা করলে গোড়াতেই কাশ্মীর-সমস্যাকে নির্মূল করতে পারত। পাকিস্তান আর্মি হেড কোয়ার্টার যে-বাড়িতে, সেই বাড়িতে বসেই উপজাতিদের কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ইংরেজ সেনানায়ক একে বন্ধ করতে পারতেন; দ্বিতীয়ত তা না পারলে, ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের সরকারী বাহিনী যখন কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল, তখন বৃটিশ অফিসারদের সরিয়ে নেবার হুমকি দিতে পারতেন। তার পরিবর্তে বৃটেনের প্রতিনিধিরা মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যানের নির্লজ্জ লঙ্ঘন দেখেও দেখে নি। ......ব্যাপারটা যে কিছু ব্যক্তির দুষ্টবুদ্ধি থেকে ঘটে নি, তা বোঝা গেল রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর প্রশ্নে বৃটেনের প্রতিনিধিদের আচরণে।"

রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকেই সুভাষচন্দ্র কিন্তু ইংরেজের কূট চেহারা সম্বন্ধে চোখের চামড়া-ছাড়ানো জ্বালাময় দৃষ্টি খোলা রেখেছিলেন। রাজনীতির ইতিহাস পড়ে, উত্তম বক্তৃতায় বা অত্যধিক উত্তম রচনায় ইংরেজের স্বরূপ প্রকাশ করে, তার দ্বারা বাহবা কুড়িয়ে আবার সময়-সুযোগমত তাকে ভুলতে পারতেন না। উদারনৈতিক অভিজাত ইংরেজদের বনভবনের সুরম্য আতিথ্যে তিনি সুখাবিষ্ট হয়ে পড়তেন না। তাঁর বিশেষ দর্প ছিল, শৃগালের মত ধূর্ত ইংরেজ যদি তাঁকে প্রতারিত করতে না পারে পৃথিবীর আর কোনো শক্তি তা পারবে না। ইংরেজের ভেদনীতির চেহারা তিনি বারে বারে খুলে ধরে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে ইংরেজের ভেদনীতির ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বলেছেন। ১৮৫৭-র সিপাহী বিপ্লবের পরে ইংরেজ ভারতবর্ষকে নিরস্ত্র করতে আরম্ভ করে। ভারতবাসী সেই নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। এর ফলেই ক্ষুদ্র সুশিক্ষিত একটি সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখতে পেরেছিল। তারপর সুভাষচন্দ্র লিখেছেন:

"এই নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার "ভেদ ও শাসন" নীতির প্রবর্তন করল। ১৮৫৮ থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৪৩) ভারতে বৃটিশ শাসনের এই হল মূল নীতি। ১৮৫৭-র পরে প্রায় ৪০ বছর ধরে তিন-চতুর্থাংশ ভারতকে সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণে এবং বাকি অংশকে দেশীয় রাজ্যের অধীনে রাখার দ্বারা ভারতকে বিভক্ত রাখার নীতি অনুসৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে বৃটিশ সরকার বৃটিশ-ভারতের বড় বড় ভূম্যধিকারীদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাতে লাগল। এক্ষেত্রে দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে ১৮৫৭-র পর থেকে বৃটিশ সরকারের নীতি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৭ পর্যন্ত বৃটিশ নীতি ছিল, যেখানে সম্ভব সেখানে দেশীয় রাজাদের হঠিয়ে দিয়ে তাঁদের রাজ্যের শাসনভার সরাসরি নিয়ে নেওয়া। ১৮৫৭-র সিপাহী বিপ্লবের সময়ে দেখা গেল, বীরাঙ্গনা ঝাঁসীর রাণীর মত কয়েকজন দেশীয় রাজ্যের শাসক যদিও বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অধিকাংশই কিন্তু নিরপেক্ষ ছিলেন বা সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। নেপালের মহারাজা শেষোক্তদের অন্যতম। ইংরেজের চোখে সেই প্রথম ধরা পড়ল যে, দেশীয় রাজাদের নাড়া-চাড়া দেওয়া বোধহয় আর ঠিক হবে না; তাঁদের সঙ্গে চুক্তি ও বন্ধুত্ব করাই ভাল; বিপদের সময়ে তাহলে এঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। দেশীয় রাজাদের তোষণের ইংরাজ নীতির সূত্রপাত ১৮৫৭ সাল থেকেই। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে অবশ্য ইংরেজ বুঝল, জনগণের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজা বা ভূম্যধিকারীদের কেবল লাগিয়ে রেখেই ভারতকে পদানত রাখা যাবে না। সুতরাং তারা লর্ড মিন্টো ভাইসরয় থাকাকালে ১৯০৬ সালে মুসলিম সমস্যা আবিষ্কার করে ফেলল। তার আগে পর্যন্ত এই সমস্যা কোথাও ছিল না। ১৮৫৭-র মহান বিপ্লবের সময়ে মুসলমান বাহাদুর শাহের পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছে।

"গত বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) সময়ে ইংরেজ যখন দেখল যে, ভারতীয় জনগণকে আরও কিছু রাজনৈতিক অধিকার দিতেই হয়, তখন তারা বুঝল যে, শুধু মুসলমানদের অন্য ভারতবাসীদের থেকে বিভক্ত করে রাখলেই যথেষ্ট হবে না। তখন তারা হিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ ঘটাবার চেষ্টায় নেমে পড়ল। এই পথে তারা ১৯১৮ সালে হিন্দুদের জাতিভেদ সমস্যা আবিষ্কার করে ফেলল ও সহসা তথাকথিত অনুন্নতদের সমর্থক ও মুক্তিদাতা সেজে বসল। ১৯৩৭ পর্যন্ত ইংরেজ আশা করেছিল যে, রাজন্যবর্গ, মুসলমান এবং তথাকথিত অনুন্নতদের বড় সমর্থক সেজে সে ভারতকে বিভক্ত রাখতে পারবে। কিন্তু ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী (১৯৩৭-এ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে চমৎকৃত হয়ে দেখল, তাদের সকল কৌশল ও ধাপ্পাবাজি ব্যর্থ হয়েছে, সমস্ত জাতি ও অন্তর্ভুক্ত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে। তখন ইংরেজ-নীতি শেষ আশার সূত্রটি মুঠিতে ধরল: ভারতীয় জনগণকে যদি বিভক্ত করা না যায়, তাহলে ভারতবর্ষ নামক দেশটিকে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিকভাবে ভাগ করে দিতে হবে। এই মতলবের নামই পাকিস্তান, জনৈক ইংরেজের উর্বর মস্তিষ্কে এর জন্ম, যার অপরাপর নজির রয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র। যথা, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে যে-সিংহল ভারতবর্ষেরই অংশ, দীর্ঘদিন আগে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। গত যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) পরেই চিরদিনের অখণ্ড আয়ারল্যাণ্ডকে ভাগ করে আলস্টার ও আইরিশ ফ্রি স্টেট করা হয়েছে। ১৯৩৫-এর আইনের পর ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ভারত থেকে। আর যদি বর্তমান যুদ্ধ বাধা সৃষ্টি না করত, তাহলে দেখা যেত, প্যালেস্টাইন ইহুদী রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্র—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে বৃটিশ করিডর। পাকিস্তান বা ভারত বিভাগ পরিকল্পনা আবিষ্কার করার পর থেকে ইংরেজ তার পক্ষে নিপুণ এবং বিপুল প্রচারকাজ চালাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ যদিও মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষকে চায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি যদিও একজন মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমানদের কিছু মানুষই মাত্র যদিও পাকিস্তান পরিকল্পনা সমর্থন করে—বৃটিশ প্রচারযন্ত্র তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীময় এই ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, ভারতীয় মুসলমানেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে নেই, তারা ভারত বিভাগ চায়। ইংরেজ নিজেই জানে সে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে, তা হলেও তারা আশা করে বার বার একই মিথ্যা বলতে বলতে তারা পৃথিবীর সামনে সেটাকে সত্য করে তুলতে পারবে। উদ্ভট পাকিস্তান পরিকল্পনা যখন প্রথম উদ্ভাবন করা হয়, তখন তথাকথিত হিন্দু-ভারত ও তথাকথিত মুসলিম-ভারত—এই দুই ভাগে ভারত বিভাগের কথা বলা হয়েছিল। ইংরেজের উর্বর মস্তিষ্ক বিভাগ-পরিকল্পনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে

এবং এ-ব্যাপারে যদি তারা স্বচ্ছন্দে কাজ চালিয়ে যেতে পারে, তাহলে ভারতকে দুটো রাষ্ট্রেই ভাগ করে দেবে না, পাঁচটি-ছ'টি রাষ্ট্র তৈরি করে ফেলবে। বৃটিশ রাজনীতিকরা বলছেন, দেশীয় রাজারা যদি বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলে তাদের 'রাজস্থান' নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে দেওয়া উচিত। তেমনি শিখরা আলাদা হতে চাইলে তাদের রাষ্ট্র হবে খালিস্থান। ধূর্ত ইংরেজরা আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিবাসী ভারতীয় মুসলমানদের—যাদের পাঠান বলা হয়—প্রতি বিশেষ দরদ দেখিয়ে বলছে, সেখানে পাঠানিস্থান নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়া দরকার। ঠিক বর্তমান মুহূর্তে পাঠানিস্থান বৃটিশ রাজনৈতিকদের কাছে দারুণ প্রিয় বিষয়। তারা আশা করে, এই পাঠানিস্থান পরিকল্পনা দ্বারা তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের [illegible] বাতিবাস্তকর কিছু [illegible] ও আফগানিস্থানের [illegible] মনও জয় করবে, [illegible] আফগানদের।"

[illegible] লীগ কর্তৃক গৃহীত [illegible] হন। অন্তরীণ [illegible] সুতরাং ভারতে [illegible] তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য [illegible] অবস্থাতেই তিনি ভারত [illegible] সময় যায় যে উদ্দেশ্যে [illegible] প্রস্তুতির কাজে। তারপরে [illegible] এখনই পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে [illegible] বলেছেন। ১৯৪৩ সালের [illegible] ভাষায় পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেনঃ "পাকিস্তান অদ্ভুত, উদ্ভট পরিকল্পনা, একাধিক কারণে তা অবাস্তব প্রস্তাব। প্রথমত, ভারতবর্ষ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অবিভাজ্য। দ্বিতীয়ত, ভারতের অধিকাংশ জায়গায় হিন্দু ও মুসলমানেরা এমনভাবে মেশামেশি হয়ে আছে যে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, যদি জোর করে মুসলিম রাষ্ট্রগুলি গঠন করা হয়, তাহলে ঐসব জায়গায় নতুন করে সংখ্যালঘু সমস্যার উদ্ভব হবে, যা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে।" সুভাষচন্দ্র এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান একজোট হয়ে লড়াই না করলে ইংরেজ দূর হবে না, আর ইংরেজ না গেলে হিন্দু বা মুসলমান কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রই সম্ভব নয়। ভারতকে বিভক্ত হতে দেওয়া মানে ইংরেজের আধিপত্যকে বজায় রাখতে দেওয়া। সুভাষচন্দ্র জিন্নার উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন, পাকিস্তান-সৃষ্টি ইংরেজের সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নয়।*

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম সুভাষচন্দ্রই করেছেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িকদের কথা বাদ দিচ্ছি, হিন্দু সাম্প্রদায়িকরাও ভারত বিভাগ চেয়েছিল, অন্য কারণে না হলেও অব্যাহতি-কামনায়। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ক্ষমতালোভে এবং সংগ্রাম-ভীতিতে তাকে মেনে নিয়েছিলেন। এবং পাকিস্তান মেনে নেওয়ার জন্য এখন যেসব ভাষায় কামউনিস্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বলদোৎসর্গ শ্রাদ্ধ প্রতিপাদন করছেন, তাঁরাই বিচিত্র, জটিল এবং একমাত্র নিজেদের পক্ষে বোধগম্য যুক্তিতে রাজাগোপালাচারীর সহযোগে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারে নেমে পড়েছিলেন (ভাবের সেই পুরনো মুখ এখনো দেখা যায়, স্বাধীন কাশ্মীরের ছদ্মবেশী সমর্থকদের মধ্যে)। এইসব কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে ভারতের এই কালের সর্ববৃহৎ পুরুষ সুভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে নতুন ভারতবর্ষ গড়েছিলেন অশ্রু, রক্ত ও ত্যাগের উৎসর্গের মধ্যে। সে ভারতবর্ষ হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান, জৈন, পার্সিক—সকলের। আশ্চর্য সেই ঐক্য-ভারতের অনৈক্যে পীড়িত গান্ধীজীকে তা এমনই মোহিত করেছিল যে, তিনি এই জন্য সুভাষচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত স্তুতি করেছেন। সর্বশ্রেণীর ভারতীয়ের ঐ ঐক্য সুভাষচন্দ্র সম্ভব করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি দোকানদারীর রাজনীতিতে ছিলেন না, সংগ্রামের রাজনীতি করছিলেন। "তোমার সব দাও, সর্বস্ব দিয়ে ফকির হও"—তিনি ডাক দিয়েছিলেন। "রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব" সকলে শিহরিত হয়ে শুনেছিল। যারা সাড়া দিয়েছিল, তারা হিন্দু-হাত বা মুসলমান-হাত বাড়ায় নি, বাড়িয়েছিল ভারতীয়ের হাত, কিংবা মানুষের হাত। যুদ্ধক্ষেত্রে "ঐক্য, বিশ্বাস, বলিদানই" ছিল মন্ত্র, রক্তের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার হিসাব-নিকাশ সেখানে ছিল না। এই সমস্তই সম্ভব হয়েছিল—কারণ নেতাজী নিজে সত্যই 'বিশ্বাস' করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিপদসংকুল যাত্রাগুলিতে, যেখানে মৃত্যু সামনে-পিছনে, উপরে-নিচে, সেখানে পাশে নিয়েছিলেন মুসলমান ভ্রাতাকে।

ভারতের বাইরে সকলের ভারতবর্ষকে সুভাষচন্দ্র যখন গড়ছিলেন, তখন ভারতের ভিতরে দেশপ্রাণ নেতৃবৃন্দ কিন্তু ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ কিংবা সুগোল টেবিল ঘিরে বসে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কি করে ঐ সাধনার ভারতবর্ষকে টুকরো করা যায়। স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করছিলেন, ওয়াভেলের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করছিলেন, অক্লান্ত আলোচনার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ক্রিপসের সৌম্য চতুরতার লাবণ্যে মোহিত হচ্ছিলেন, ওয়াভেলের সামরিক চোয়ালের পুরুষালি গঠন দেখে আনন্দ পাচ্ছিলেন, লাভের অঙ্কে একেবারে ঢেরা পড়তে খানিক

* ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের দ্বিতীয় খণ্ডে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ঃ

"It is noteworthy that in his latest utterances Mr. Jinnah, the President of the Muslim League, and a Champion of Pakistan, has acknowledged that the creation and maintenance of Pakistan is possible only with the help of the British."

হিমেল সন্ধ্যায় বনের ধারে থমকে থামা

রবার্ট ফ্রস্ট

কে যে মালিক এই বনানীর, হয়ত সেটা জানি—
কাছের গ্রামেই থাকে তো সে; ঐ, ঐ তো ঘরখানি।
দেখবে না সে—থমকে গেছি—দেখছি একমনে
তুষারে তার উঠছে ভরে স্তব্ধ অরণ্যানি।

ছোট আমার টাট্টু। সেটাও ভাবছে ঠিকই মনে
আজব এখন থামা—খামার নাই যদি নির্জনে
তুষার-জমাট জল-জঙ্গল বিল-বাদারের মাঝে
এই বছরের চরম আঁধার যখন সান্ধ্য বনে।

ঘন্টা-গাঁথা হাঁসুলি সে একটুখানি ঝাঁকায়,
ভুল-চুক তো হয় নি কিছু?—যেন শুধু শুধোয়।
অন্য আওয়াজ সন্-সনানো হিমেল হাওয়ার শুধু,
ঝির্-ঝিরিয়ে তুলোট তুষার পড়ছে হেথায় সেথায়।

শোভন এ বন, গভীর আঁধার তার
তবু রাখতেই হবে অঙ্গীকার;
আর নিদ্রার আগে যেতে হবে বহু দূর,
আর নিদ্রার আগে যেতে হবে বহু দূর।

অনুবাদক : অক্ষয়কুমার চন্দ

চটে গিয়ে ঘরে ফিরে কিছু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই সঙ্গে আবার কান খাড়া রাখছিলেন কখন ডাক পড়ে। সুভাষচন্দ্র এইসব ভারতীয় নেতাকে চিনতেন, জানতেন যে, এঁদের অসাধ্য কিছু নয়, যে-কোনো অসম্মানজনক বা ক্ষতিকর আপসে এঁরা রাজী হয়ে যেতে পারেন—অথচ এঁদের বিবেকের কাছে আবেদন করা ছাড়াও তখন গত্যন্তর নেই। ইউরোপ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে বারে বারে তিনি সেই আবেদন জানিয়েছেন।

১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে, তখন প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তাঁর 'প্রস্তাব' নিয়ে ভারতে আসেন। আসার কারণ, ইংলণ্ডের পক্ষে তখন সংকটময় যুদ্ধপরিস্থিতি। ইংরেজ ভারতকে সত্যিই কিছু দিতে চায় নি, দেওয়ার নাম করে ভারতীয় স্বাধীনতা-স্পৃহার তীব্রতা কিছু হরণ করতেই চেয়েছিল। সেই সঙ্গে সুপরিচিত ভেদনীতিকেও ঝালিয়ে নিচ্ছিল। জার্মানী থেকে ২৫শে মার্চ, ১৯৪২-এ সুভাষচন্দ্র এক বেতার ভাষণে এ বিষয়ে বলেন: "বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য যে প্রস্তাব হাজির করেছে এবং সেই সূত্রে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যে রেডিও বক্তৃতা করেছেন তাকে আমি খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা করেছি। তার ফলে পরিষ্কার বুঝেছি যে, তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘপোষিত 'ভেদ ও শাসন' নীতিকেই আবার চালাবার চেষ্টায় ভারতে গেছেন। ভারতের অনেকেই কিন্তু আশা করেন নি যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এই খেলায় নামবেন, যা ইতিপূর্বে মিঃ আমেরী জাতীয় রক্ষণশীল রাজনীতিকদের জন্যই তোলা ছিল!.....

"স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আমাদের বলছেন, ভারত একটি উপ-মহাদেশ, নানা জাতির নানা ধরনের মানুষের দ্বারা অধ্যুষিত। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, খৃীস্ট জন্মাবার কয়েক শতাব্দী আগে ভারতবর্ষ মহান্ অশোকের দ্বারা এক-সাম্রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ইংলণ্ড ঐক্যবদ্ধ হবার হাজার বছরেরও বেশি আগের সে ঘটনা।

"বৃটেন তার সাম্রাজ্যের অন্যত্র, যথা আয়ারল্যান্ড ও প্যালেস্টাইনে ধর্মীয় ব্যাপারকে ব্যবহার করেছে জনগণকে বিভক্ত করার কাজে। সেই একই অস্ত্র ভারতের ক্ষেত্রেও সে ব্যবহার করতে চাইছে। না, তাতেই সে সন্তুষ্ট নয়—অনুন্নত সম্প্রদায়, দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী অস্ত্রও ব্যবহার করেছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস একই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এখন এসেছেন ভারতবর্ষে একই অস্ত্র হাতে নিয়ে। এটাও কম লক্ষণীয় নয় যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড এক সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে অন্য সম্প্রদায়কে দমিত করার পুরাতন সাম্রাজ্যনীতি প্রয়োগ করে যাচ্ছেন।"

স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভণ্ডামীর মুখোশ সুভাষচন্দ্র টেনে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। বৃটিশ যে কিছুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী নয়, দৃষ্টান্তযোগে তা খুলে ধরেছিলেন। ইংরেজের প্রলোভনে ধরা দেওয়ার অর্থ, যুদ্ধান্তে পীড়ন ও অত্যাচারের নতুন অভিজ্ঞতা লাভ—সতর্ক করে তা বলেছিলেন। মুসলিম লীগকে ইংরেজ কিভাবে চেষ্টা করে ফাঁপিয়ে তুলেছে তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।*

[ক্রমশ]

---

* "Since the beginning of this century, the British Government has been using another organisation as a counterblast to the Congress in order to reject its demands. It has been using the Muslim League for this purpose, because that party is regarded as pro-British in its outlook. In fact, British propaganda has tried to create the impression that the Muslim League is almost as influential a body as the Congress, and that it represents the majority of India's Muslims. This, however, is far from the truth. In reality there are several influential and important Muslim organisations which are thoroughly nationalist. Moreover, of the 11 provinces in British India, out of which only four have a majority of Muslims, only one, the Punjab, has a Cabinet which may be regarded as a Muslim League Cabinet. But even the Punjab Premier is strongly opposed to the main programme of the Muslim League, namely the division of India."
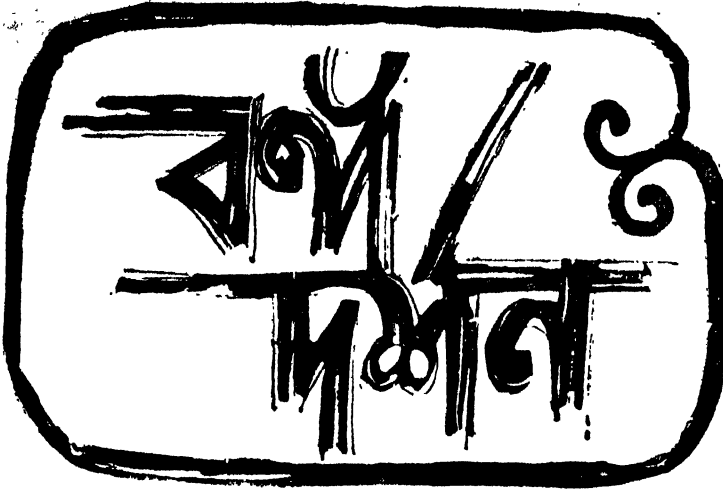
এ সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতী যখন প্রকাশিত হবে তখন চোদ্দই জুলাই-এর বাংলা বন্ধের ঘটনা ঘটে যাবে। কোন অঘটন না ঘটলেই মঙ্গল। কেন না, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে; রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি সেই সব মানুষেরই প্রাণহানি ঘটায়, যারা আসলে সর্বহারা শ্রেণীরই অন্তর্গত। অথচ যাদের বিরুদ্ধে আসল সংগ্রাম হওয়া উচিত তাদের গায়ে কোনদিনই আঁচড় লাগে না। দোষ রাম কি শ্যামের সেটা বড় কথা নয়, যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে, তার বলি হয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক নিম্নবর্গের মানুষ-গুলিই। সুবিধাভোগী শ্রেণীর গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগানো যায় নি, তাদের মোটর বিহার, নাইট ক্লাবে গমনে কোন বাধাই পড়ে নি, অথচ তারাই আপার হ্যান্ড নিয়েছে এবং দেশজোড়া আইনশৃংখলার ধুয়ো তুলে প্রচার চালাবার সুযোগ পেয়েছে। বামপন্থী নেতারা যদি একটু সহৃদয় হতেন, একটু ধৈর্যশীল হতেন, একটু কম প্রভোকেটিভ হতেন তাহলে অনেক প্রাণের অপচয় অকালে ঘটত না।

তাই যখন পশ্চিমবঙ্গের পরস্পর-বিরোধী দুটি বামপন্থী শিবির ভিন্ন ভিন্ন দিনে বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন, তখন আমরা স্বভাবতই শংকিত হয়েছিলাম এই কারণে যে, এর ফলে অনেকগুলি প্রাণহানি ঘটবে, যা রোখা অসম্ভব। এ আশংকা আমরা বিগত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছিলাম এবং নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেছিলাম যে, তাঁরা যেন দু' তরফই একদিনে ধর্মঘট ডাকেন, তাহলে পরিস্থিতি একটু নিরাপদ হবে। আমাদের অনুরোধের ফলে না হোক ঘটনাচক্রে দু' তরফই যে শেষ পর্যন্ত একটা দিনেই এসে পড়েছেন, সেটা কম স্বস্তির কথা নয়। তবে চোদ্দই জুলাই (ফরাসী বিপ্লবের মুখে ওই তারিখেই বাস্তিল দুর্গের পতন হয়) বর্তমান ব্যবস্থার ওপর কি প্রভাব ফেলবে, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা বন্ধের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। রাষ্ট্রপতির শাসন যে পশ্চিমবঙ্গে খোলাখুলিভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। কিন্ত বাংলা বন্ধের দ্বারা তো আর সে শাসনের অবসান হবার কোন সম্ভাবনা নেই, এটা বামপন্থী দলগুলির সদিচ্ছার ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু যেহেত দুটি বিবদমান বামপন্থী শিবির একত্র হবেন না বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসে আছেন, তখন নির্বাচন ভিন্ন উপায় নেই। কাজেই অন্তর্বর্তী নির্বাচন ও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া বাংলা বন্ধের কারণসূচীর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

শোনা যাচ্ছে যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং তাই যদি হয় তাহলে নির্বাচনের দিনও একটা ধার্য করতে হবে। আসলে এটা অনিবার্যই ছিল। তার জন্য ধর্মঘট অত্যাবশ্যক ছিল না। তথাপি এই ধর্মঘট কেন? আসলে এটা একটা শক্তি পরীক্ষার মহড়া। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে বামপন্থী দলগুলি শক্তির পরীক্ষার জন্য জনগণকে এই কয়মাস মিছিলে ও সমাবেশে কাতারে কাতারে হাজির হতে আহ্বান দিয়ে এসেছেন। এবার কত লোক কার ডাকে ... থাকেন তার শক্তি পরীক্ষাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এদিকে আট পার্টি জোটের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠকের ফলে একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বোঝা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কোন বিকল্প জনপ্রিয় সরকার হবার সম্ভাবনা নেই, বাংলা কংগ্রেস বাদে আর সব দলই বিধানসভা ভেঙে দেবার পক্ষপাতী। কাজেই আজ না হোক কাল বিধানসভা ভেঙে দেওয়াই হচ্ছে। কাজেই বাংলা বন্ধের রাজনৈতিক মুনাফাও যে সত্যই কিছু আছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। তবে এটা ঠিক কথা যে, রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে একটা অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আগেই আমরা বলেছি যে, যাঁরা এই অবস্থার প্রতিকার করতে পারতেন, তাঁরা নিজেরাই দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘায়ত হবার সুযোগ দিয়েছেন। এ তো গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

রাজ্য রাজনীতি সংবাদ

আট পার্টি জোটের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বৈঠকের পর অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। বৈঠকের ফলাফল দেখে বোঝা যায় যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টি জোটে যোগ দিচ্ছে না, যদিও সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেস কাছাকাছি কিছুটা এসেছে। এ'দের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী জানিয়েছেন যে, তের দফা দাবির ভিত্তিতে উভয়পক্ষের মধ্যে মনখোলা আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনা উভয় তরফের কাছেই সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়েছে। অপর এক সূত্র থেকে জানা গেছে যে, যে তের দফা দাবির ভিত্তিতে আট পার্টি মোর্চা ধর্মঘট আহ্বান করেছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটি দু'দিনের বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নাকি বলেছেন, কোথাও অন্যায়ভাবে জমি দখল হয়ে থাকলে আট পার্টি মোর্চা যদি তা সংশোধনের নির্দেশ দেন তা অবিলম্বে কার্যকরী হবে। তা ছাড়া পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকায় কয়েকটি স্থানে জোতদারদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কৃষকেরা হিংসার পথ গ্রহণ করেছে। কিন্তু পুলিশকে যদি জনগণের সঙ্গে রাখা যায়, তাহলে অবস্থার এরকম অবনতি হবে না। আসলে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির মৌলিক পার্থক্যটা এই একটি বিষয়ে। বাংলা কংগ্রেসের যা শ্রেণী-চরিত্র, তার সঙ্গে জমি দখলের নীতি খাপ খায় না এবং এক্ষেত্রে যদি হঠাৎ কোন বোঝাপড়া হয়ে যায়, বুঝতে হবে সেটা একটা একান্তই সাময়িক ব্যাপার হতে বাধ্য। তবে উপরি উক্ত দু' তরফের বৈঠক থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় মন্ত্রিসভা গঠনের কোন প্রচেষ্টা করছেন না এবং আট পার্টি জোট বিধানসভা ভেঙে দেবার দাবি জানিয়েছেন। ফলে অনুমান করা চলে যে, রাজ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে কয়েকদিনের মধ্যে বিধানসভা বাতিল হচ্ছে এটা প্রায় সুনিশ্চিত, তবে নির্বাচনী দামামা কবে থেকে বাজবে, সেটা এখনই বলা সম্ভবপর নয়।

কলেজে ভর্তি সমস্যা

গত সপ্তাহে হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর থেকে শহরের কলেজে-কলেজে ভর্তির লাইন পড়ে গেছে। এ বছরে মোট এক লক্ষ আঠার হাজার ছাত্র-ছাত্রী হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের মধ্যে তিয়াত্তর হাজারের মত পাশ করেছে। কিন্তু এই তিয়াত্তর হাজারের মধ্যে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে সাতাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং বাকি সাড়ে আটত্রিশ হাজার তৃতীয় বিভাগে। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের একটা মোটামুটি আশা থাকলেও তৃতীয় বিভাগে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে যারা পাশ করেছে, তারাও সকলে মনের মত বিষয়ে অনার্স পাচ্ছে না। কেমিস্ট্রিতে অনার্স চেয়ে ফিজিক্স নিতে বাধ্য হচ্ছে, ইকনমিক্স চেয়ে সংস্কৃত নিতে বাধ্য হচ্ছে।

অথচ অনার্স ছাড়া পাশ কোর্সে ডিগ্রী পাশ করা যে আজকে চাকরীর দুনিয়ায় কতখানি অপরাধজনক ব্যাপার তা কে না জানে। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ইচ্ছামত বিষয়ে অনার্স নেবার উপায় নেই। আর তৃতীয় বিভাগে যারা পাশ করেছে তাদের তো কলেজের চৌকাঠ ডিঙানোই দুঃসাধ্য। বিশেষভাবে বিজ্ঞান বিভাগে। অনার্স পাওয়ার প্রশ্নই তো ওঠে না, যেমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সকলেই সমান হবে না, এমন অনেক উদাহরণ আছে—যাঁরা প্রথম পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করে পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নিজেদের চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু এখন প্রথম পরীক্ষাতেই ভাগ্য নির্ধারিত. তার জীবনে ওঠার রাস্তা একেবারেই বন্ধ তাকে সর্বনিম্ন বেতনের পেশাতেই দারিদ্র্যপূর্ণ আজীবন কাটাতে হবে।

সে কথা যাক্। এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি ঘটল কেন? কেন ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ করে কলেজে ঢোকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার কারণ এই যে, প্রয়োজনের তুলনায় কলেজের সংখ্যা নিতান্তই কম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা ২০১—যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত ছাত্রভর্তি করতে পারেন না, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশ মেনে চলতে হয়, নইলে আর্থিক অনুদান মেলে না। ফল হয়েছে এই যে, কলেজের ইচ্ছা এবং ছাত্রের সামর্থ্য থাকলেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আজকাল কলেজের সংখ্যা বছরে দু-একটি করে বাড়লেও প্রতি বছর কলেজ পাঠেচ্ছু ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে প্রায় দশ হাজার করে। আমাদের জিজ্ঞাসা, কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না কেন? পাশ করলে কলেজে পড়তে দেবো না, কলেজ থেকে পাশ করে বেরুলে চাকরী দেবো না, এরকম অমানবিক নীতি কোনো সভ্য রাষ্ট্রে চালু আছে বলে আমাদের জানা নেই। রাষ্ট্রযন্ত্র এ-ক্ষেত্রে একেবারেই ভাবনাহীন। মনুষ্যশক্তির এই বিপুল অপচয় একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব।

যারা ভাল রেজাল্ট করেছে তাদেরও ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ নেই বাপের টাকা না থাকলে। বাবার মাসিক আয় এত টাকার কম হলে চলবে না। এরকম দাবিও ছাত্রভর্তির ব্যাপারে বড় বড় কলেজগুলি করে থাকে। অর্থাৎ যারা সুবিধাভোগী শ্রেণী নয়, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমেই সংকুচিত করে আনা হচ্ছে।

আমাদের জিজ্ঞাস্য : এ অবস্থা কতদিন সহ্য করা যায়?

স্বাস্থ্যদপ্তর প্রসঙ্গে

দীর্ঘকাল পরে আবার আমরা স্বাস্থ্যদপ্তর প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমাত্রেই জানেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ বরাবরের। কেন না, এই দপ্তরের সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ক খুব নিবিড়। কংগ্রেসী আমল থেকে যুক্তফ্রন্টের আমল পর্যন্ত এই দপ্তরের পংকোদ্ধারের চেষ্টা আমরা আন্তরিকভাবে করেছিলাম, আমাদের অবিরাম লেখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিকার হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য হয়ও নি। কিন্তু আমাদের কর্তব্যে আমরা ত্রুটি করি নি। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমাত্রেই জানেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তরে দীর্ঘকাল ধরেই কয়েকটি বিশেষ আমলার একচ্ছত্র অধিকার ছিল, আজও আছে, ঐটি একটি ঘুঘুর বাসা—যার বিনাশ নেই বললেই চলে। আমরা দেখিয়েছিলাম যে, এমন কি যুক্তফ্রন্টের আমলেও এই চক্র খোদ মন্ত্রীমশাইকেও হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছিল। চক্রের মূলে গায়েনকে অবশ্য আমাদের লেখালেখির ফলে একদিনের জন্যও পুনর্নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি, তিনি অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যে সব শিকড় তিনি রেখে গেছেন সেগুলি এখন বটবৃক্ষে রূপান্তরিত হয়ে দপ্তরের সকল রসই নিংড়ে নিচ্ছেন। বর্তমান স্বাস্থ্য অধিকর্তা দৃঢ় প্রকৃতির লোক নন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকলেও তিনি অসহায়। এই দপ্তরের উপদেষ্টারূপে যিনি এসেছেন, তাঁর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। কতিপয় পদস্থ আমলা বিচিত্র যোগসাজসের মাধ্যমে স্বাস্থ্যদপ্তরে দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের বন্যা বইয়ে চলেছেন, যথাকালে আমরা তা একের পর এক দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরব। এই সংখ্যায় নতুনভাবে পুনরায় স্বাস্থ্যদপ্তরের কাহিনী শুরু করছি একটি দুর্নীতির কাহিনী দিয়ে। এই কাহিনীর নায়ক জনৈক ক্লার্ক—যাঁকে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে হসপিটাল সেক্রেটারী পদে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অফিসার পর্যায়ের এই পদটিতে উক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করার পিছনে যাঁর নেপথ্য হস্ত রয়েছে, তিনি হচ্ছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের জনৈক পদস্থ আমলা। উক্ত পদটির জন্য তাঁরাই একমাত্র আবেদন করতে পারেন—যাঁরা ৪০ মানে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত আছেন। আমাদের আলোচ্য ক্লার্কটি তেমন কোন পদে নিযুক্ত কোনদিনই ছিলেন না, অথচ তাঁর পৃষ্ঠপোষক ঐ পদস্থ আমলা তাঁকে ঐ মর্মে একটি মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়েছেন, যা তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দাখিল করেন। তাঁর মক্কেলকে চাকরিটি পাওয়াবার জন্য উক্ত পদস্থ আমলা নিজেই সিলেকসন বোর্ডে ডিপার্টমেন্টাল এক্সপার্টরূপে হাজির থাকেন। সিলেকশান লিস্টে উক্ত ক্লার্ক ভদ্রলোক তৃতীয় স্থান পেলে তাঁকে চাকরি দেওয়ার অসুবিধা দেখা যায়, কারণ হসপিটাল সেক্রেটারীর একটি পদই খালি ছিল। কিন্তু উক্ত প্রবল প্রতাপান্বিত পদস্থ আমলা এতে নিরস্ত হবার পাত্র নন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন পদ না থাকলেও পদের সৃষ্টি করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে গুণধরটির জন্য পদস্থ আমলা উঠে পড়ে লেগেছেন, তিনি নাকি পূর্বে সেন্ট্রাল মেডিকাল স্টোর্সে কর্মরত থাকাকালীন ঘুষ নেবার দায়ে অপসারিত হয়েছিলেন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রাঞ্চের পদস্থ আমলা সাহেবের কীর্তির শেষ অবশ্য এখানেই নয়, মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত তাঁর জনৈক আত্মীয়কে বিদেশে (কলম্বো প্ল্যান) পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে তিনি এমনই একটা বেচাল কান্ড বাধিয়েছেন যে, তাঁর সহযোগী একজন ডেপুটি ডিরেক্টারের পক্ষে তা হজম করা দুঃসাধ্য হয়েছে, যে কাহিনী পরবর্তী একটি সংখ্যায় নিবেদন করব।

সাধন ভট্টাচার্য স্মরণে

নাট্যতত্ত্ববিদ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১০ই জুলাই তারিখে অকালে পরলোকগমন করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও নাট্য বিভাগের ডীন ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন কৃতী, শিক্ষকজীবনে যশস্বী। নাট্য বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ও বাংলায় এম-এ পাশ করেন। এরিস্টটলের পোয়েটিকসের ওপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট হন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের স্নেহধন্য। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, এরিস্টটলের পোয়েটিক্স, নাট্যতত্ত্বের মীমাংসা, শিল্পতত্ত্বের ভূমিকা প্রভৃতি বিখ্যাত। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকার্ত পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জানাই।

বি-কে-ডি-কংগ্রেস সংযুক্তিকরণ

ভারতীয় ক্রান্তি দলের (বি-কে-ডি) সঙ্গে কংগ্রেসের (ইন্দিরাপন্থী) মিলনের যে কথাবার্তা চলছিল, গত সপ্তাহে তার প্রথম অঙ্কে যবনিকাপাত হয়েছে। তবে উপসংহারটা এখনও বাকী আছে। বি-কে-ডি'র জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতি মিলনের প্রস্তাব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করেছেন যে, পার্টির চেয়ারম্যান সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতিকে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাবেন। অর্থাৎ মিলনের প্রস্তাব কার্যনির্বাহক পরিষদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নি, তবে প্রস্তাবটা তাঁরা একেবারে বাতিল করে দেন নি। বিষয়টা বিবেচনা করবার ভার চেয়ারম্যানের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয় নি।

বি-কে-ডি'র কার্যনির্বাহক পরিষদের বৈঠকের যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই নাকি মিলনের পক্ষপাতী নন। কিন্তু যেহেতু দলের নেতা চরণ সিং স্বয়ং মিলনের প্রস্তাব পার্টির সভায় বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন, সেহেতু প্রস্তাবটা সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয় নি। একটু ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই ধরনের প্রস্তাব জাতীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ আগে দুবার অগ্রাহ্য করেছেন।

গত সপ্তাহের বৈঠকে মিলনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন উত্তর প্রদেশের [illegible] সদস্য (জয়নারায়ণ বর্মা এবং উদিতনারায়ণ শর্মা প্রমুখ) কিন্তু প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন প্রভাবশালী সদস্য প্রকাশবীর শাস্ত্রী (এম-পি) এবং মোতিরাম শাস্ত্রী। চরণ সিং প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। পার্টির সেক্রেটারী এস কে সিং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মিলনের বিরোধিতা করেন। মধ্যপ্রদেশের তাকতমল জৈনও মিলন প্রস্তাবের বিরোধী। উড়িষ্যার নেতা হরেকৃষ্ণ মহতাব এবং পবিত্রমোহন প্রধান বৈঠকে যোগ দেন নি।

যাঁরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) এখন নিজের ঝামেলায় ব্যস্ত। আগামী নির্বাচনের আগে সেই দলের অবস্থাটা যে কি দাঁড়াবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাদের কোন পতাকা অথবা নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন নেই। এ অবস্থায় বি-কে-ডি'র পক্ষে নিজের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য তো আর বি-কে-ডি জন্মায় নি। তার একটা পৃথক লক্ষ্য আছে। বি-কে-ডি-কংগ্রেস মিলন ঘটলে কংগ্রেসই লাভবান হবে বেশি। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে বি-কে-ডি'র সাহায্য ছাড়া উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস দাঁড়াতেই পারবে না। সুতরাং কংগ্রেসকে বি-কে-ডি'র সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখতে বাধ্য হবে। নইলে সি বি গুপ্তের দল আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

বি-কে-ডি মিলনের প্রস্তাব কার্যত অগ্রাহ্য করায় কংগ্রেস হাইকমান্ড খুব খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা আশঙ্কা করেছেন, এর ফলে উত্তর প্রদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

মিলনের প্রস্তাবে বি-কে-ডি'র অনীহার কারণ সম্পর্কে দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, বি-কে-ডি'র সিন্ডিকেট ভক্ত সদস্যরা আসলে বি-কে-ডিকে সিন্ডিকেটের "জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটে" ঢোকাবার মতলব এঁটেছেন। তাঁরা চরণ সিং-এর কানে মন্ত্র দিয়েছেন। চরণ সিং-এর সাহায্য ছাড়া ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশে এক পা এগুতে পারবেন না। চরণ সিং-এর নিজের মনেও সেই ধারণা বলবৎ হয়েছে। তারই ভিত্তিতে তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দর কষাকষি করছেন। তাঁদের দাবি হচ্ছে (১) কংগ্রেস নেতৃত্বকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, দুই দলের মিলনের পরও চরণ সিং মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এবং আগামী নির্বাচনের পরও চরণ সিংকে মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। (২) চরণ সিং-এর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী কমলাপতি ত্রিপাঠিকে রাজ্যের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যেতে হবে এবং রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনের ভার ছেড়ে দিতে হবে চরণ সিংএর ওপর। কোন কোন বি-কে-ডি নেতা নাকি আরো দাবি করেছেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বি-কে-ডি দল থেকে একজন মন্ত্রী নিতে হবে। তাঁদের ধারণা বি-কে-ডি'র সাহায্য ছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে

প্রকাশবীর শাস্ত্রীর সঙ্গে বি-কে-ডি-কংগ্রেস সংযুক্তিকরণ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনারত চরণ সিং (বাঁ দিকে)

উত্তর প্রদেশ থেকে ৬০/৭০ জন এম-পিকে জিতিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। সিণ্ডিকেট ও বি-কে-ডি সদস্যরা জানেন যে, শ্রীমতী গান্ধী এই আব্দার মেনে নিতে রাজী হবেন না। তখন চরণ সিং-এর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর মন কষাকষি হবে এবং চরণ সিং সদলবলে সিণ্ডিকেটের দলে ভিড়ে পড়তে বাধ্য হবেন।

চরণ সিং নাকি দক্ষিণপন্থী জোট গঠনের সিণ্ডিকেটী প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবার জন্যই দিল্লীতে এসেছিলেন।

অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে বি-কে-ডি-কংগ্রেস মিলন দূরে অস্ত। কিন্তু মিলন হব হব করে না হওয়ার ফলে দুই দলের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশের বি-কে-ডি-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পরমায়ু নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। সিণ্ডিকেটের দক্ষিণপন্থী জোট গঠনের পদ্ধতি কিভাবে এগোয়, তার ওপরই সেটা নির্ভরশীল বলে মনে হচ্ছে। বি-কে-ডি কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত পার্টি নয়। উত্তর প্রদেশে এই দল জাঠ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বললেই চলে। কাজেই সুবিধানুযায়ী কংগ্রেস অথবা সিণ্ডিকেট যে-কোন দলে ভিড়ে পড়তে তার কোন নীতিগত বাধা নেই। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা, জাতি-ভেদ, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি কুসংস্কার বজায় থাকাতে এই ধরনের ধান্দাবাজ পার্টির হাত থেকে দেশের মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই।

পাঞ্জাব সঙ্কট

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ডঃ ডি, সি, পাভাতে আগামী ২৪শে জুলাই বিধান-সভার অধিবেশন হবে বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কাজেই বাদল মন্ত্রিসভা (আকালী) শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন।

মুখ্যমন্ত্রী বাদল এবং আকালী দল নাকি কংগ্রেসের (ইন্দিরাপন্থী) সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসবার চেষ্টা করছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক পাতাবার জন্য আকালী দল নিজের নীতি এবং কার্যক্রম রদবদল করতেও অরাজী নয়। আকালী দল সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করে একটা ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি হতে চায় এবং দলের সদস্য পদ যে-কোন সম্প্রদায়ের লোকের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করে কৃষি-সম্পত্তিকরের বিরোধিতা ত্যাগ করতেও আকালী দল নাকি পিছপা নয়।

পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বাদল কংগ্রেসের কাছে সহযোগিতার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে ২৪শে জুলাইয়ের আগেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে আকালী দলের একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতে পারে। এই দুই দল নাকি বহুদিন ধরেই গোপনে গোপনে বোঝাপড়ার আলোচনা চালাচ্ছিলেন। কয়েকদিন আগে নাকি শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির প্রেসিডেন্ট সন্ত চন্নন সিং (সন্ত ফতে সিং-এর পরেই এঁর স্থান) দিল্লীতে এসে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে গেছেন।

গত সপ্তাহে সমগ্র বিষয়টা নিয়ে পাঞ্জাব কংগ্রেসের জ্ঞানী জৈল সিং হংসরাজ শর্মা, জেঃ মোহন সিং এবং ক্যাপ্টেন রতন সিং প্রমুখ নেতারা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জৈল সিং পরে সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, পাঞ্জাবে কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, সেটা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যকরী করা হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বরণ সিং-এর (কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী) উপদল বহুকাল ধরেই আকালী-কংগ্রেস কোয়ালিশনের পক্ষপাতী।

পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতারা নাকি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছেন যে, গুরনাম সিংকে (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) সমর্থন জানানো কংগ্রেসের পক্ষে খুবই বোকামী হবে। কারণ গুরনাম সিং আকালী দল থেকে বেশি সদস্য যোগাড় করতে পারেন নি। কাজেই কংগ্রেস তার সঙ্গে যোগ দিলে কোন স্থিতিশীল গভর্নমেন্ট গঠিত হবে বলে মনে হয় না।

কংগ্রেস নেতা কে, ডি, মালব্য চণ্ডীগড়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, বাদল মন্ত্রিসভা যদি সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম অনুসরণ করে চলে, তা হলে কংগ্রেস সেই মন্ত্রিসভাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবে।

কিন্তু প্রস্তাবিত আকালী-কংগ্রেস কোয়ালিশনের প্রধান প্রতিবন্ধক বোধ হয় সন্ত ফতে সিং। কংগ্রেস দল নাকি চান না যে, সন্ত ফতে সিং তৃতীয় শক্তি হিসাবে পাঞ্জাবে বিরাজ করুন। তাই গত সপ্তাহে জোর গুজব রটেছিল যে, সন্ত ফতে সিং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। সন্তের ঘনিষ্ঠ মহল নাকি এই গুজবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করতে রাজী নন। শোনা যাচ্ছে, শুধু কংগ্রেস দলই নয়, আকালী দলের একটি শক্তিশালী অংশও নাকি সন্ত ফতে সিং-এর অতিমাত্রায় মাতব্বরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং সন্ত উপদলের দ্বারা পদচ্যুত হবার পর দাবি করেছিলেন যে, সন্ত ফতে সিংকে রাজ্যের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। তাঁর সেই দাবি শেষ পর্যন্ত পূরণ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

আকালী-কংগ্রেস কোয়ালিশনে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সেই প্রশ্ন নিয়েও দুই দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক, পাঞ্জাবের দলীয় রাজনীতি যে পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে অদূর-ভবিষ্যতে সেখানে কংগ্রেস-আকালী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য কোন ধরনের কোয়ালিশন গঠিত হওয়া একটু কঠিন। তবে সেই মন্ত্রিসভাই যে স্থিতিশীল হবে—এমন মনে করবার কোন হেতু নেই।

(১১-৭-৭০)
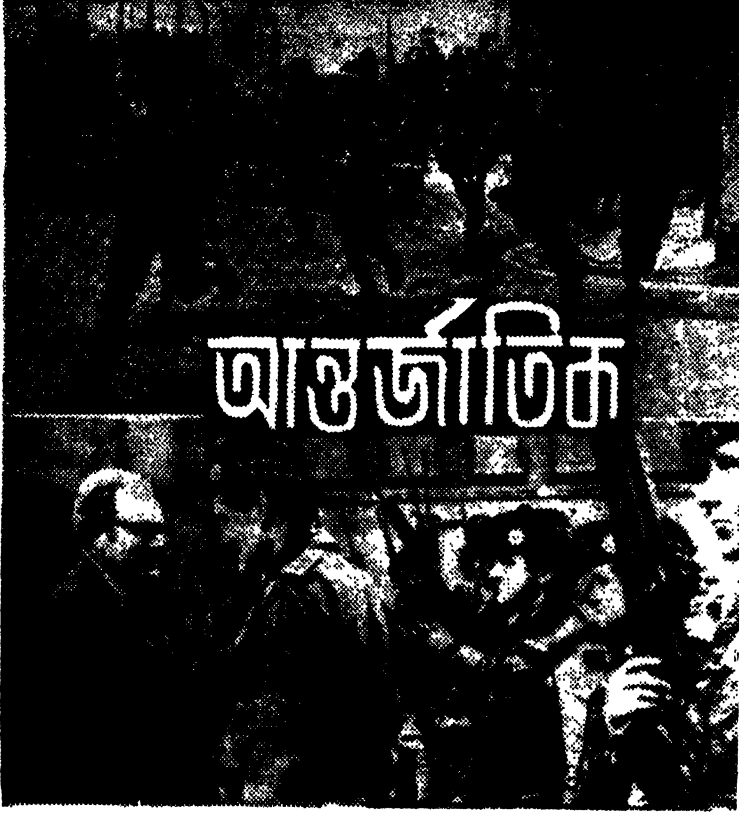
বেলফাস্টে বৃটিশ সেনাদলের সঙ্গে মডলিং

উত্তর আয়ার্ল্যান্ডঃ

প্রায় এক বছর ধরে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রোটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের এই দাঙ্গা থামাতে প্রাদেশিক সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, বৃটেনের সরকারও ব্যর্থ হয়েছেন।

ক্যাথলিকরা আয়ার্ল্যান্ড বিভাগের বিরোধী এবং তারা আয়ার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে উত্তর আয়ার্ল্যান্ড বা আলস্টারের মিলন চায়। প্রোটেস্ট্যান্টরা এই একীকরণের বিরোধী। তারা বৃটেনের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে চায়। এই থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ। মাঝে মাঝেই নানা ঘটনাকে উপলক্ষ করে এই বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

গত বৎসর নাগরিক অধিকারের দাবিতে ক্যাথলিকরা আন্দোলন শুরু করলে প্রোটেস্ট্যান্টদের সঙ্গে তাদের জোর সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহুজন নিহত ও আহত হয়।

দিন পনেরো আগে তরুণী ক্যাথলিক নেত্রী বার্নাডেটে ডেভ্‌লিনকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করায় আবার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

বার্নাডেটে ডেভ্‌লিন ক্যাথলিকদের প্রিয় নেত্রী। সবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হয়েছেন। এর মধ্যেই তিনি দু'-দু'বার বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। রাজধানী বেলফাস্টে, আলস্টারের অন্যত্র, লণ্ডনে কমন্সসভায় কিংবা নিউ ইয়র্ক বা রাষ্ট্রসংঘে, সর্বত্র তিনি ক্যাথলিকদের দাবির সমর্থনে জোর বক্তব্য রেখেছেন। ডেভ্‌লিনের জ্বালাময়ী ভাষণ ক্যাথলিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

তাই ডেভ্‌লিনের কারাদণ্ডের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিকরা বেলফাস্টের পথে বিক্ষোভ জানাতে বেরিয়ে পড়ে। প্রোটেস্ট্যান্টরাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। ৬ জন প্রোটেস্ট্যান্ট ও ১ জন ক্যাথলিক এই দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন এবং আহতের সংখ্যা ২৫০-এর বেশি। বহু ঘরবাড়ি পুড়েছে, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জেমস চিসেস্টার-ক্লার্কের সরকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমনে ব্যর্থ হয়েছেন। লণ্ডন থেকে এগারো হাজার সৈন্য পাঠানো হয়েছে বেলফাস্টে দাঙ্গা থামাবার জন্য। জেনারেল স্যার ইয়ান ফ্রিল্যান্ডের অধীনে বৃটিশ সৈন্যদল এখন উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের শান্তিরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। তাও দাঙ্গা থামছে না।

গত মাসে বৃটিশ সাধারণ নির্বাচনে দিয়েছে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের দাঙ্গা। হিথ তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেজিন্যাল্ড মডলিংকে পাঠিয়েছিলেন বেলফাস্টে। রেজিন্যাল্ড মডলিং বেলফাস্টে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী জেমস চিসেস্টার-ক্লার্কের সঙ্গে কথা বলে লণ্ডন ফিরে এসেছেন। বেলফাস্টে অবস্থানরত বৃটিশ সেনাদলের প্রধান ইয়ান ফ্রিল্যান্ডের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। কিন্তু বিশেষ কোন ভরসা নিয়ে মডলিং বেলফাস্ট থেকে ফিরতে পারেন নি।

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ উত্তর আয়ার্ল্যান্ডের জটিল সমস্যা আলোচনার জন্য তাঁর মন্ত্রিসভার প্রধান চারজনের এক বিশেষ বৈঠক আহ্বান করেছেন। এই চারজন হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম, প্রতিরক্ষামন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেজিন্যাল্ড মডলিং ও অ্যাটর্নি-জেনারেল স্যার পিটার রলিনসন।

বৃটিশ সরকার বিশেষভাবে চিন্তিত। আগামী ২০শে জুলাই বেলফাস্টে প্রোটেস্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বড় রকমের এক সংঘর্ষ বাধার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রতি বৎসর এই দিনে হাজার হাজার প্রোটেস্ট্যান্ট বেলফাস্টে 'অরেঞ্জ প্যারেডে' অংশ গ্রহণ করে। ২৮০ বছর আগে এই দিনটিতে বয়েন যুদ্ধ জয় হয়েছিল। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় জেমসের নেতৃত্বাধীন ক্যাথলিকরা অরেঞ্জের উইলিয়ামের নেতৃত্বাধীন প্রোটেস্ট্যান্টদের হাতে পরাজিত হয়। আয়ার্ল্যান্ডে ইংরেজ শাসন রাখার পক্ষে ছিলেন অরেঞ্জের উইলিয়াম ও প্রোটেস্ট্যান্টরা।

গত বৎসর বয়েন যুদ্ধ জয়ের বার্ষিকী দিবস থেকেই সংঘর্ষ শুরু হয়।

পাকিস্তানঃ

অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানের প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন হবে কি-না, এই নিয়ে কথা উঠেছে।

অনেকেই বলছেন, এই সময়টা পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। বর্ষা শেষ হলেও। নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখনও জলমগ্ন থাকবে। গ্রামাঞ্চলে চলাফেরা করার বিশেষ অসুবিধা হবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী, তাঁরা চান না পূর্ব পাকিস্তানের বেশি লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুক, তাই তাঁরা কায়দা করে এই সময়টা বেছেছেন।

এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু নেতা নির্বাচনের সময় পিছিয়ে দেবার জন্য দাবি করেছেন। কিন্তু সমস্যা হল,
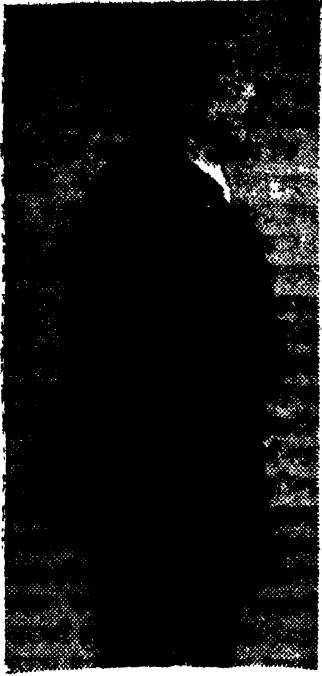
মুজিবর নির্বাচনের তারিখ পেছানোর পক্ষপাতী নন।

এর পরেই রমজান মাস। রমজানের সময় নির্বাচন তো নয়ই, নির্বাচনের পক্ষে প্রচারকার্যও অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পছন্দ করবেন না। তা হলে?

শেখ মুজিবর রহমান তাই বলেছেন, নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। অনেক কষ্টে, অনেক চাপে পড়ে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনে রাজী হয়েছেন। একবার পিছিয়ে দেবার কথা উঠলে এই সুযোগে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন বন্ধ করে দেবেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষ অনেক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে. দরকার হলে তারা প্রাকৃতিক অসুবিধার বিরুদ্ধেও লড়াই করবে। এতে ভয় পেলে চলবে না।

বামপন্থী মহলে নির্বাচন বর্জনের কথাও উঠেছে। যে সরকারী আদেশবলে নির্বাচন হচ্ছে, তা অগণতান্ত্রিক। নির্বাচনের ফলে যে আইনসভা, বিশেষ করে সংবিধান রচনা পরিষদ বা গণপরিষদ গঠিত হবে, তার হাতে প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকবে না। সুতরাং, এই নির্বাচন প্রকৃতপক্ষে একটা প্রহসন এবং এতে যোগদান করা উচিত নয়। এই বক্তব্য রেখেছেন পিকিংপন্থী মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ তোয়াহা। ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করায় তোয়াহা তাঁর দলবল নিয়ে এই দল ত্যাগ করেছেন। মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগেরও কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই মত পোষণ করেন। তাই মুজিবর রহমান ও তার দল নির্বাচনে দাঁড়াবার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় কিছু লোক দল ছেড়ে ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগে যোগ দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা এবং প্রগতিশীল শক্তি নির্বাচনে জয়লাভ করলে তাঁদের সরকার চালাতে দেয়া হবে কিনা ও প্রগতিশীল একটি সংবিধান রচনার সুযোগ নবনির্বাচিত সদস্যরা পাবেন কিনা, এই সব বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের উভয় অংশের অধিকাংশ বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দল নির্বাচনে যোগ দিচ্ছে। তাদের ভরসা, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জনমতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ কিংবা সেনাবাহিনীর হবে না।

চরম দক্ষিণপন্থী, ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল দল জমায়েতে ইসলাম দাবি করেছে, সেনাবাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। এই দলের নেতা মৌলানা মাওদুদি ও ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা নবাবজাদা নসরুল্লা খাঁ বলছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ 'দেশদ্রোহীদের' অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনবাদী বামপন্থীদের পক্ষে চলে গিয়েছে। এই অবস্থায় 'স্বাধীন নির্বাচন' যদি করতে হয়, তবে সৈন্যদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব দিতে হবে।

মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ওয়ালি খাঁ, পিপলস পার্টির জুলফিকার আলি ভুট্টো, আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান, পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মৌলানা ভাসানী প্রভৃতি সেনাবাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সেনাবাহিনীর হাতে নির্বাচন চলে গেলে তা আর নির্বাচন থাকবে না। সৈন্যদের খুশি মত লোকেদের নির্বাচন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর শতকরা ৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। এই অবস্থায় এদের দিয়ে নির্বাচন করালে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি হবে।

জমায়েতে ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তানের পাঁচটি দক্ষিণপন্থী দল একত্র নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য একটি ইসলামিক জোট গঠন করেছে। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এখনও কোন মোর্চা গঠিত হয় নি।

তবে এবারের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের সর্ববৃহৎ দলে পরিণত হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

লাক্সেমবার্গ।

য়ুরোপীয় কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দেশ, যথা—ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠক বসেছিল গত সপ্তাহে লাক্সেমবার্গে।

এবারেও কমন মার্কেট বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, বৃটেনকে কমন মার্কেটে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কিনা।

নতুন রক্ষণশীল বৃটিশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম উপস্থিত ছিলেন লাক্সেমবার্গে যোগদানের আবেদন নিয়ে।

কেবল বৃটেন নয়, আয়ার, নরওয়ে ও ডেনমার্কও কমন মার্কেটে প্রবেশ করতে চায়।

বৃটেনের কমন মার্কেটে প্রবেশে সব চেয়ে বেশি আপত্তি ফ্রান্সের। অনেকের আশা ছিল, ফরাসী রাজনীতি থেকে উগ্র

লাক্সেমবার্গ বৈঠকে ডগলাস হিউম

বৃটিশ বিরোধী চার্লস দ্য গলের বিদায় গ্রহণের পর নতুন রাষ্ট্রপতি জর্জ পম্পিদুর আমলে ফরাসী বিরোধিতা কমবে। কিন্তু এখনও তার বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। লাক্সেমবার্গ বৈঠকে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস স্যুমান বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হিউমের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করলেও কমন মার্কেটে বৃটেনের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি তিনি দেন নি।

তবে ঠিক হয়েছে, বৃটেন সহ যে চারটি দেশ কমন মার্কেটে যোগ দিতে চায়, তাদের যোগদানের বিষয় সম্পর্কে অবিলম্বে য়ুরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থার (ই-ই-সি) সদর দপ্তর ব্রাসেলসে আলোচনা সুরু করা হবে। হয়তো কয়েক মাস ধরে এই আলোচনা চলবে। (১২-৭-৭০)

বর্তমান সপ্তাহের লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিপদের দিনটি কেটে গেছে। ১৪ই জুলাই হরতালের দিনকেই রাজ্যবাসীর কাছে বিপদের দিন বলে বলছি। তবু এত দুঃখের মধ্যেও সুখের কথা হ'ল রাজ্যের দুই ফ্রন্ট অর্থাৎ ছয় পার্টি ও আট পার্টি তাঁদের হরতালের দিন একদিনে রেখেছেন, কাজেই রক্তগঙ্গা বইবার সম্ভাবনা কিছুটা হয়ত হ্রাস পেয়েছে—কিন্তু একেবারে চলে গেছে এই কথা বলা যায় না। যা হোক, সেই হিসাব নিকাশ পরে হবে, এখন শুধু মনে মনে দুর্গানাম জপ করে বিপত্তারিণীর চরণ ভরসা করে দিন কাটানো। কেউ হয়ত বলবেন—কেন? বেশ তো, হরতালের দিন এক হয়ে গেছে, আবার বিপদটা কিসের? আবার ঝগড়া-দ্বন্দ্বের অবকাশ কোথায়? এর জবাব হ'ল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যে ধারা ও গতিতে চলেছে, তার একমাত্র লজিক্যাল কনক্লুশন হ'ল সংঘর্ষ—পরস্পরের মাথা ফাটানো।

আর যদি মাথা ফাটানো আর বোমা ফাটানো বন্ধ হয়ে যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি রাজনৈতিক দলই বেকার হয়ে যাবে। স্বেচ্ছায় বেকারত্ব বরণের ঝুঁকি কেউ নেবে না। এই তো দেখুন না, রাজ্যে হরতাল-ধর্মঘট ডাকা হয়েছে কেন? না, বিধানসভা বাতিল করতে হবে। কিন্তু বিধানসভা বাতিলের জন্য হরতাল-ধর্মঘট ডেকে আন্দোলন করার চেয়ে তো আরো একটা সহজ পথ ছিল। রাজ্য বিধানসভার কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস আর অন্য ছুটকো-ছাটকা দল মিলিয়ে মোট প্রায় একশত জন সদস্য বিধানসভা বাতিলের পক্ষে নন। কিন্তু অবশিষ্ট

—খবরদার, আমাদের ডাকে ধর্মঘট সফল হয়েছে!

১৮০ জন সদস্য যে সব দলে যুক্ত আছেন, তাঁরা তো বিধানসভা বাতিল চান। এই দলগুলির মধ্যে সি পি এম, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলও আছে। আচ্ছা, এই সব দল যদি মনেপ্রাণে বিধানসভা বাতিল চায়, তবে তারা নিজেরা চেষ্টা করলেই তো বিধানসভাকে ভেঙে দিতে পারে। সেই পথ হ'ল—যে সব দল বিধানসভা বাতিল চায়, সে সব দলের সকলে একযোগে পদত্যাগ করুন, এমন কি তাঁদের বিজয়দাকে (স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়), ডেপুটি স্পীকার শ্রীঅপূর্ব মজুমদারকে পদত্যাগপত্র দাখিল করে দিন না। দেখুন, বাপ বাপ বলে বিধানসভা বাতিল হয়ে যাবে। দেখুন কত সহজে এই কাজ হতে পারে। কোন হরতাল লাগবে না, ধর্মঘট লাগবে না, মাথা ফাটাফাটি হবে না—শুধু একখানা কাগজে চার লাইন লিখে সদস্যরা স্পীকারের কাছে দিন আর স্পীকার তাঁর পত্রখানি রাজ্যপালের কাছে দিন। দেখুন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়ে বিধানসভা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু জানি এই সহজ পথে যাওয়া অপেক্ষা আন্দোলন করা, লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় ঘটানো, অনেক মানুষের রক্তপাত ঘটানো অনেক সহজ কাজ।

সহজ কাজ এই কারণে—পদত্যাগ করলে মাসের নিয়মিত সদস্যপদের বেতন মারা যাবে। একেই ১৯৬৭ সালের পর থেকে সদস্যদের বড়ই লোকসানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারণ যে পুঁজি নিয়োগ করে সদস্যরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এবং সেই পুঁজি নিয়োগ করতে গিয়ে যে ধার-দেনা হয়েছে, সেটা উসুলের কোন সুযোগই সদস্যরা পান নি। '৬৭ সালের পরও কয়েক মাস নানা টাল-মাটালে দিন কেটেছে, একনাগাড়ে বেশ কয়েক মাস বিধানসভা চলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেটাও শেষ পর্যন্ত কপালে সইল না। বিধানসভা বাতিল হয়ে গেল, আবার নির্বাচন এল।

নির্বাচন মানেই নতুন করে পুঁজি নিয়োগ, আগের নির্বাচনের ধার-দেনা মেটান ও পুঁজি উসুল হবার আগেই নতুন করে নির্বাচনে নামতে হওয়ায় অনেক সদস্যই মাথায় হাত দিয়েছিলেন।

যাই হোক, ১৯৬৯ সালে সরকার হল, সকলে বেশ একটু জাঁকিয়ে 'বসলেন,' কিন্তু সেখানেও বিধি বাম হ'ল। বছর না ঘুরতেই সরকার গেল—তবু রয়েছে সদস্যপদটুকু। মাসের বেতনটা ঘরে আসছে—ঘর মানে পার্টির ঘর। তবুও সার্টিফিকেটটা লিখতে সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার অবশ্য মন্দের ভালোতে আছেন। স্পীকার মশায় বিধানসভা অচল হলেও দেশে-বিদেশে নিমন্ত্রণটা পাচ্ছেন, এই কাশ্মীর বা এখানে-সেখানে যাবার সুযোগ হচ্ছে। বিদেশে ছেলেদেরও দেখার সুযোগ হয়েছে। ডেপুটি স্পীকার মশায় এখনও গাড়ি-বেয়ারা-টেলিফোন এইগুলোর সুবিধা পাচ্ছেন; কাজেই এইগুলো ছেড়ে দিয়ে বিধানসভা ভাঙবার ব্যবস্থা করার চেয়ে মানুষকে লেলিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করা অনেক সহজ। কারণ এই হরতাল-ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে পার্টি সংগঠন মজবুত হয়, প্রচারের সুযোগ মেলে—আরো কত কি।

আমি তাই হলফ করে বলতে পারি—বিধানসভা বাতিলের স্বার্থে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার পদত্যাগ করবেন না, এমন কি বিধানসভা বাতিল হয়ে গেলেও স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মমত পরবর্তী বিধানসভার বৈঠক পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন। 'আমার কি দায় কাজ চালাবার?'—কে তাঁকে মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছে মড়া আগলে তাঁকেই বসে থাকতে হবে? এত ত্যাগ স্বীকারে তাঁর কি প্রয়োজন? কিন্তু কথাটা

সম্ভবত তা নয়। রাজ্যের যে সব দল বিধানসভা বাতিলের জন্য আন্দোলন করছে, তারা একটা উদ্দেশ্য মনে করেই করছে—সেটা হল বিধানসভা বাতিল চাই, কিন্তু সেই সংগে এম-এল-এরা অবশ্য মাসোহারা ছাড়া থাকুন এটা চাই না।

হরতালের দিন ১৪ই জুলাই নির্দিষ্ট হওয়াতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের মানুষ খুশি হলেও ছয় পার্টির আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার মোটেই খুশি হতে পারেন নি। আর শ্রীকুমারের কথায় যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা যদি ছয় পার্টির বক্তব্য হয়, তবে বুঝতে হবে ছয় পার্টিও হরতাল এক দিনে হচ্ছে, এই সংবাদে খুশি নয়। আট পার্টির নেতারা দুই দিন বৈঠক করে ঘোষণা করলেন যে, দুই দিন হরতালের মধ্যে যে রক্তপাত ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে, সেটাকে এড়াতে তাঁরা হরতালের দিন ১৬ই থেকে ১৪ই করছেন। অবশ্য এই কথা বলতে গিয়ে সি-পি-এম ও সহযোগীদের তাঁবেদার বলে যা বলবার বলেছেন। কিন্তু আট পার্টি তাদের হরতালের দিন ১৬ই থেকে ১৪ই করাতে শ্রীসুধীন কুমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—"আট পার্টির রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছে।" সেই সংগে শ্রীকুমার বলেছেন, "সি-পি-এম-বিরোধী বক্তব্য বলে আট পার্টি তাদের রাজনৈতিক পরাজয় ঢাকতে পারবেন না।" শ্রীকুমারের আরো বক্তব্য হল "১৪ই রারিখে হরতাল ডাকলেও আট দলের মোর্চা কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করা ছাড়া নীতির কোন পরিবর্তন করে নি। তাই সি-পি-এম ও ছয় পার্টি জোট-বিরোধী মিথ্যা কুৎসাই প্রচার করছেন। অবশ্য এতেও তাঁরা তাঁদের পরাজয় ঢাকতে পারেন নি।" বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি অথবা ঢেঁটা ঢেঁকির বাদ্যি বড়—এই সব গ্রাম্য কথাগুলি প্রয়োগের এমন সার্থক জায়গা আর আছে কি না জানি না। রাজনৈতিক পরাজয় কার হয়েছে, সেই বিচার করতে চাই না। কিন্তু শ্রীকুমার এই কথা বলে কার হাত শক্তিশালী করলেন, সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার। একেই রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক মা মনসা হয়ে আছে, তার ওপর আবার শ্রীকুমার কিছুটা ধোঁয়া দিয়ে সেই সাপকে আরো ক্ষেপিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক পরাজয় যদি আট পার্টির দিন পরিবর্তনে হয়ে থাকে, তবে সেই পরাজয় তো শ্রীকুমারই ২০শে তারিখের ধর্মঘট ১৬ই তারিখের দুইদিন আগে এনে বরণ করেছেন। রাজনৈতিক পরাজয় হয় আর শ্রীকুমার দিন পরিবর্তন করলে হয় না—এমন কথা কে মেনে নেবে? বেশ তো, শ্রীকুমার ভদ্রলোকের এক কথার মত হরতালের দিন ২০শে রেখে সফল করে হিম্মতের পরিচয় দিলেই তো পারতেন। বেশ তো বলেছিলেন সকালে যে, আট পার্টির সি-পি-এম-বিরোধী বক্তব্য রেখে ডাকা হরতালে তাঁরা বাধা দেবেন, ২০শে হরতাল সফল করবেন, হঠাৎ শ্রীকে জি বসু আর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের শরণাপন্ন হয়ে শ্রীঅমিতাভ সেনকে ঘাঁটিয়ে ২০শে তারিখকে ১৪ই করা হল কেন? কতখানি দায়িত্ববোধের অভাব থাকলে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এক সপ্তাহে দুই দিন হরতাল ডাকবার কথা চিন্তা করা যায়। সে আট পার্টি হোক আর ছয় পার্টিই হোক, তাদের ভিতরের ঝগড়া যাই হোক, সাধারণ মানুষের কথা তারা ভাবলে কখনই কি ২০শে ও ১৬ই বা ১৬ই ও ১৪ই হরতাল ডাকতে পারতেন! এ সব দলের নাকি আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য রাজ্য থেকে সি-আর-পি প্রত্যাহার করানো। হ্যাঁ, ওরা সি-আর-পি সরিয়ে পুরো মিলিটারী বসাতে চায়। নইলে ওরা কি আশা করে, ওরা তিন দিনের মধ্যে দুই দিন হরতাল করবে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার হুমকি দেবে আর সরকার তুলসীমালা হাতে নিয়ে হরিনাম জপ করবেন? আট পার্টি ও ছয় পার্টি রাজ্যের মানুষকে অনেক উপহার দিয়েছে—যেমন এখন রোজ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয় শুধু পুলিশ দিয়ে, সি-আর-পি দিয়ে শান্তিরক্ষা করতে। এবার তার সংগে যোগ হবে মিলিটারী এবং মিলিটারীর খরচও রাজ্যকে দিতে হয়। যা হোক, এই অবস্থায় দুই পক্ষের এক দিনে হরতাল আহ্বানে যে সামান্য স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে শ্রীসুধীন কুমার এক পক্ষকে রাজনৈতিক পরাজয় স্বীকারকারী বলে প্ররোচনা দিলেন, যাতে তাঁরা পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেন, শ্রীকুমার কারো হয়ে ঢাল না ধরে শুধু যদি বলতেন, যে বক্তব্য রেখেই হোক আর যে পরিস্থিতিতেই হোক আট পার্টি হরতালের দিন ১৪ই করাতে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের মানুষ এক হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে, এর জন্য অন্তত তারা ধন্যবাদ দাবী করতে পারে। এই কথা বললে কতটুকু মানের কোণা খোয়া যেত ছয় পার্টি বা শ্রীসুধীন কুমারের? কিন্তু তা নয়, বিরোধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শ্রীকুমার বলে রাখলেন রাজনৈতিক পরাজয় অর্থাৎ হরতাল সফল করলেও এই পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে না আট পার্টি। তাই বিরোধ চলছে—চলবে, হরতালের পরও চলবে—সেই পথই পরিষ্কার করা হল।

—১০ই জুলাই, ১৯৭০

দিন পরিবর্তন ক

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সতেরো ॥

দু' বছরের সিনিয়র হলেও মেয়েদের ভেতরে দূরত্বটা কম—স্বাভাবিক নিয়মেই কম। তারপরে এক সঙ্গে ইউনিয়ন করা। এ ওকে নাম ধরেই ডাকে। সাবিত্রী আস্তে আস্তে বললে, 'তুই খুব রোগা হয়ে গেছিস সুজাতা।'

ঘরে আলো জ্বলে নি, আলো জ্বলবার সময় হয় নি এখনো। সুজাতার ভাঙা গাল শক্ত হয়ে উঠছে, রেখা পড়ছে কপালের ওপর, ঘনিয়ে আসা ছায়ার ভেতরেও তা দেখতে পাচ্ছিল সাবিত্রী।

এক টুকরো বিস্বাদ হাসি ফুটল সুজাতার মুখে।

'বাংলা দেশের মেয়েদের মা হওয়ার দাম এমনি করেই দিতে হয়। সংসারও তার পাওনা ছেড়ে দেয় না।'

পাথরের মতো একটা ভার কিছুক্ষণ নেমে রইল দুজনের ভেতরে। বাইরে থেকে বেঙ্কা শেয়ের সোঁদা গন্ধ। মশার শব্দ উঠতে শুরু হয়েছে। কোথায় ডাহুক ডাকছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে চলতি লরীর গর্জন কানে এল। সুজাতার স্নান করা ঠান্ডা শরীরের চাইতেও গলার স্বরটা শীতল। মা হওয়ার সময় খুব ভুগতে হয়েছিল—ঠিক কথা, কিন্তু সেদিন সুজাতার চোখে অন্য আলো দেখেছিল সাবিত্রী; তার যত দূর মনে পড়ছে—সংসারটাকে সেদিন তার খুব খারাপ লাগে নি। এখন সুজাতা নিষ্ঠুর। এখন অন্য রকম। ছায়া ছড়ানো ঘরে, মশার ডাক আর সোঁদা গন্ধের ভেতর হঠাৎ কেমন একটা অবসাদ বোধ করল সাবিত্রী। মনে হল, প্রবীর তাকে না পাঠালেই পারত, তার এখানে আসবার দরকার ছিল না। যেখানে রাগ, যেখানে উত্তেজনা, সেখানে কিছু বলবার থাকে, স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে এলে তার সঙ্গে তর্ক করা যায়, বিচার করা চলে। কিন্তু বিতৃষ্ণা আর অবসাদের ভার গলায় বেঁধে নিয়ে যে ডুবছে, তাকে তুলতে গেলে নিজেকেই বুঝি তলিয়ে যেতে হয়।

সাবিত্রী টের পেলো, খুব খারাপ দেখাচ্ছে এই চুপ করে বসে থাকাটা—এখানে এসে সে যেন আরো বেশি বিমুখ করে তুলছে সুজাতাকে। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে কিছু একটা শুরু করতে চাইল।

'তোমারই দোষ, শরীরের তো কোনো কেয়ার নিস নে।'

সুজাতা চেয়ে রইল, জবাব দিল না।

'নীলুকে তো দেখছি না, ওকে আনিস নি সঙ্গে করে?'

এবারও জবাব দিল না সুজাতা। উঠে পড়ল, সুইচ টিপে জ্বালিয়ে দিলে ঘরের আলোটা। ফিরে এসে বসল নিজের জায়গাটিতে। বললে, 'সাবিত্রী!'

'কী বলছিস?'

'একটা সত্যি কথা বলবি?'

সাবিত্রীর অস্বস্তি বোধ হল।

'কেন বলব না?'

'তোকে এখানে আসতে বলেছে কে? স্বরাজ?'

একেবারে তীক্ষ্ণ সোজা কণ্ঠস্বর। সাবিত্রীর মনে পড়ে গেল কলেজের কমন রুম। ঠিক এইরকম ধারালো স্পষ্ট গলায় প্রতিপক্ষের মুখের ওপর প্রশ্ন ছুড়ছে। কেমন কুঁকড়ে গেছে অরুন্ধতী রায়—হঠাৎ যেন তর্ক করতে ভুলে গেছে। সুজাতা তাকে জিজ্ঞেস করছে: তোর এত আপত্তি কেন? যেহেতু তোর বাবার কলকাতা শহরে সাতখানা বাড়ি আছে বলে?

সাবিত্রী একটা ঢোক গিলল।

'একথা বলছিস কেন? বছর তিনেকের ভেতরে স্বরাজদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।'

'এমনিই এসেছিস?'

'কোনো ক্ষতি আছে?'

'না—ক্ষতি নেই—' সুজাতা হাসল: 'তোকে দেখলে এখনো ভালো লাগে। যদিও তুই পলিটিক্সে চিরকাল গা বাঁচিয়ে চলেছিস, তবু তোর মন ভালো। কিন্তু সাবিত্রী, এতদিন যখন মনে পড়ল না—তখন এই কো-ইনসিডেন্সটা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। তুই বরং বলতে পারতিস—বানিয়েও বলতে পারতিস—এদিকে একটু কাজ ছিল, যাওয়ার সময় তোর সঙ্গে দেখা করে গেলুম।'

সাবিত্রীর গাল রাঙা হল একটু।

'তুই সিনিক হয়ে গেছিস সুজাতা।'

'সিনিক?'—সুজাতা বললে, 'না—আমি মার্কসিস্ট। সিনিক হওয়ার মতো ডিজেনারেশান আমার ঘটে নি। তার স্পেসিমেন দেখতে চাস তো তোর স্বরাজদা আছেই।'

সাবিত্রী চুপ করে রইল। স্বাভাবিক-ভাবে কথা শুরু করা যাচ্ছে না। সব বিস্বাদ করে দিচ্ছে সুজাতা।

সুজাতা আবার বললে, 'ওই সিনিসিজমের কাছ থেকে বাঁচতে চাই বলেই চলে এসেছি। সাবিত্রী—প্রটেন-শ্যানের কোনো মানে হয় না। সত্যি বল তো—কেন এসেছিস আজকে?'

আর কোনো মানে হয় না আড়াল রাখবার। সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ভালো।

সাবিত্রী সোজা সুজাতার মুখের দিকে তাকালো।

'সব আমি জানি না, কিছু শুনেছি।

ⓡ দি ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড
ট্রেডমার্কের রেজিস্টার্ড ব্যবহারকারী

BBC. 1008

কিন্তু সুজাতা, যে নিজেকে মার্কসিস্ট বলে দাবি করে—এত সহজেই তার ধৈর্য-চ্যুতি হওয়া উচিত নয়। স্বরাজদার কেন এ-সব ফ্রাস্ট্রেশান এসেছে? অব্জেকটিভ কনডিশানগুলো তো ভেবে দেখবি তুই। এক সময় মনপ্রাণ দিয়ে কাজে নেমেছিল, পনেরো-ষোলো বছর পলিটিক্স করেছে। তারপর যদি দেখে কেবল কনফিউশান—'

'কে বলেছে কনফিউশান?—' কোটরের ভেতরে দপদপ করে জ্বলে উঠল সুজাতার চোখ: 'কনফিউশান কোথাও নেই। সে যদি কতগুলো পুরোনো বিশ্বাসেই স্থির হয়ে থাকে, তা হলে দুঃখ তাকে পেতেই হবে। কমিউনিজম স্ট্যাটিক নয়—সময় বদলায়, অবস্থা বদলায়, প্রত্যেক দেশের কতগুলো নিজস্ব প্রব্লেম আছে। দেশকাল বুঝে মার্কসের থিয়োরীকে প্রয়োগ করেছেন লেনিন, ব্যবহার করেছেন মাও সে-তুং, হো চি মিন কিংবা কাস্ত্রোকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। স্বরাজ যদি এই সহজ সত্যিটাকে বুঝতে না পারে, যদি বিশ বছর আগেকার পার্টি নীতিই তার লাস্ট ওয়ার্ড বলে মনে হয়, তা হলে তার ফ্রাস্ট্রেশানের জন্যে সে কারো সহানুভূতি পেতে পারে না।'

'কিন্তু নিজেদের ভেতর ভাঙাভাঙি—'

'কী করে ঠেকাবি? প্রথম দিকে একটা ব্রড আউট্ লাইন থাকে, তখন অনেকে এক সঙ্গে চলতে পারে। তারপর আন্দোলন যত এগোয়, কাজের চেহারা তত স্পষ্ট হয়, দায়িত্ব কঠিন হয়, অনেক বেশি স্যাক্রিফাইসের সময় আসে। তখনই ধরা পড়ে কে সাচ্চা, কে মেকি, কে বিপ্লবী, কে ভীরু। ভাঙন তখন আসবেই। লেনিনও মেনশেভিক আর সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে চলা শুরু করেছিলেন, আর তারাই শেষে লেনিনকে খুন করবার জন্যে ক্ষেপে গিয়েছিল।'

অনেকদিন শীতল নির্বাণের পর হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে সুজাতা, অনেক বেশি জ্বলে উঠেছে। একটু চুপ করে রইল সাবিত্রী। এইভাবে তর্ক চালিয়ে গেলে সারা রাতেও শেষ হবে না। সুজাতা দশ বছর আগে ফিরে গেছে আবার। ঘরের হাওয়াটা থমথম করতে লাগল।

তখন মাসিমা এলেন। সঙ্গে হেনাদি। পরোটা আর তরকারী করে এনেছেন, আর মিষ্টি।

সাবিত্রীর যেন স্বস্তির শ্বাস পড়ল।

'এত কেন মাসিমা?'

'বেশি নয়, খাও।'

'কিন্তু কেবল আমার জন্যে কেন? সুজাতা খাবে না?'

সুজাতা বললে, 'বিকেলে আমি কিছু খেতে পারি না। মানে সহ্য হয় না।'

'শরীরটাকে কী করেছিস বল্ তো?'

আবার সেই বিস্বাদ রেখা ফুটল সুজাতার মুখে।

'বাঙালী মেয়ের সংসার—বুঝলি। তার পরম তীর্থ। এতদিন যখন একাই আছিস, তুই আর ওই বোকামোটা করিস নি সাবিত্রী।'

মাসিমার কপাল জুড়ে ছায়া নামল। একবার তাকালেন সাবিত্রীর দিকে। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সুজাতা বললে, 'হেনাদি, আমাগো চা দিলা না?'

'হু—আনি।'

সাবিত্রীর খিদে পেয়েছিল, অথচ খাওয়ার স্বাদ মুখ থেকে মুছে গেছে এখন। একবার বলতে ইচ্ছে করল, মাসিমার সামনে কথাটা অমন করে না বললেও পারতিস, কিন্তু ভালো লাগছিল না, নিঃশব্দে তরকারীর একটা আলু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সে।

সুজাতা বললে, 'থেকে যা আজ। অনেকদিন পরে দেখা হল, প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে।'

'গল্পের নমুনা তো দেখছি। আগুন হয়েই রয়েছিস তুই।'

সুজাতার কঠিন মুখটা এবারে কোমল হয়ে উঠল একটু।

'আলোচনা তো তুই-ই তুললি। স্বরাজের কথা টেনে আনিস নি, তা হলেই আর কোনো গোল থাকবে না।'

'তুই আর ফিরে যাবি না?'

'না।'

'কোনো উপায় নেই?'

'না—ইট্‌স্ এ সীল্‌ড্ চ্যাপটার।'

'কী করবি তা হলে?'

'সারা জীবন যা করতে চেয়েছি। আমি আমার কুমারী জীবনে ফিরে এসেছি আবার। ও'দের ছেলের বয়েস বেশি হয় নি, চাকরী করে—সুপাত্রই বলা যায়। ও'রা স্বচ্ছন্দে আবার ছেলের বিয়ে দিতে পারবেন।'

বুকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা বোধ করল সাবিত্রী।

'তুই এত নিষ্ঠুর হতে পারলি সুজাতা?'

'অনেক তর্ক করেছি, কেঁদেছি, তিন বছর ধরে প্রাণপণে অ্যাডজাস্ট করতে চেয়েছি। পারা গেল না। স্বরাজের স্যানিটি বলে আর কিছু নেই। ও বাড়ি-টাবই হাড়ে হাড়ে ঘুণ ধরেছে। তাই ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আনন্দ। তার প্রাণ আছে, তার জোর আছে। যদিও একটা অন্ধ অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তবু ওদের ওই থিয়োরীটা আমি মানি যে জলে না নামলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না—তেমনি বিপ্লবে নেমেই সৈনিক হতে হয়। তোকে একটা সাচ্চা কথা বলি সাবিত্রী। ঠাকুরপো যদি ওই-ভাবে ভেঙে বেরিয়ে না যেত, তা হলে আমি এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারতুম না—ধীরে ধীরে তোদের স্বরাজদার সঙ্গে চূড়ান্ত ডিফিটিজমের চিতায় সহমরণে যাত্রা করতুম।'

হেনাদি চা দিয়ে গেল।

একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে সুজাতা বললে, 'ওকি, হাত গুটোচ্ছিস যে? খেলি না তো কিছুই।'

'আর খিদে নেই।'

'মানে আমার ওপর রাগ করে তুই খেলি না।'

'না—না—তা নয়।'—সাবিত্রী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো: 'আর বেশিক্ষণ বসব না—এবার ফিরতে হবে কলকাতায়।'

'ফিরবি কেন? থেকে যাবি আজকে।'

'না রে, অনেক কাজ আছে।'

সুজাতার মুখে শ্রান্ত একটা হাসির আভাস ফুটল: 'আমাকে খুব অসহ্য লাগছে—না?'

চায়ে চুমুক দিয়ে সাবিত্রী ম্লান গলায় বললে, 'সম্পূর্ণ ভালো লাগছে এ-কথা বলতে পারলে খুশি হতুম। তুই নীলুর কথাটাও একবার ভেবে দেখলি না?'

সুজাতার চোখ নেমে এল। একটা যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে—সেটা চোখ এড়িয়ে গেল না সাবিত্রীর। মাথা নামিয়ে সুজাতা বললে, 'ওকে নিয়ে এলে আমার শ্বশুরের ওপর দারুণ নিষ্ঠুরতা হত একটা—ওই মানুষটি ভালো, ও'কে আমি শ্রদ্ধা করি। তা ছাড়া ও'দের ছেলে ও'রা ইচ্ছে মতন মানুষ করুন—আমি দাবি করতে চাই না।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা রূঢ় মন্তব্য এসে গেল সাবিত্রীর ঠোঁটে।

'নিজের পথও তোর নিষ্কণ্টক থাকে—এই তো?'

হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ নিবে গেল সুজাতা। বেদনায় কালো হয়ে গেল মুখ।

'তুইও তো কম নিষ্ঠুর হতে পারিস না সাবিত্রী।'

সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী অনুতাপ বোধ করল।

'আমি—আমি ঠিক ও-ভাবে কথাটা বলতে চাই না সুজাতা। মানে, আমি—'

'তোর দোষ নেই সাবিত্রী—' ক্লান্ত গলায় সুজাতা বললে, 'সকলে এই কথাটাই ভাববে। আমার কিরকম লাগছে তা আমিই জানি। কিন্তু বিপ্লবীকে দাম দিতে হয়।'

আবার ঘরের হাওয়াটা গুমোট হয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। এখন ঝিঁঝির ডাক। এখানে-ওখানে টুকরো-

মা আমার তাড়ায় আঁধার

শান্তনু দাস

তারা তিনজন—
কলের হাপরে হৃৎপিণ্ড বাঙা করে ঘরে ফিরতো রোজ;
হাপরের লাল আগুনে তাদের চোখ দুটো
যেন উন্মাদ কুত্তার মত জ্বলতো॥

সেই আদ্যিকালের অভ্যেস,
এক থালাতে ভাত খাওয়া।
ভাতের দলা
পাকাতে পাকাতে ঠাক্‌মা তাদের মুখে ঠেলে দিতো॥

সেই স্মৃতির পিঠে চেপে
সে এবং দুই ভাই
তাদের মা
গায়ে গা লাগিয়ে মুখে মুখ দিয়ে সোঁদা জলের গন্ধে ভেসেছিলো॥
ভেলাস গায়ে লটকে ছিল কণ্ঠনালী
বাবার;

খোড়ো বাতাস আগুন হয়ে মেঘ হয়েছে, মেঘের পরে মেঘ
ছাত ভেঙেছে বৃষ্টি,
তিনটে বালিশ বুকের উপর বুক রেখেছে
তাপের উপর তাপ॥

অথচ কেউ কাউকে চিনতে পারে না
আজ
মাঝরাতে চাবুক নাড়ালে মেঘ
তারা তিন ভাই, মায়ের গলা জড়িয়ে কেঁপে ওঠে না,
একা একাই হাতড়ে চলে পথ।
এক রাস্তার তিন ভাগেতে তিন সড়কে হোঁচট খেয়ে চলে॥

তিন রাস্তার মোড়ে তাদের মা
রাত অব্দি লম্ফ হাতে দাঁড়িয়ে থাকে,
সাঁঝ থেকে রাত, রাত বেয়ে হয় গভীর॥

কোমরে বল্‌সায় চাকু
এপাশে ওপাশে
অন্ধকারে কারা যেন গোঁজে রাখে হাত;
সে কিংবা অন্য দুটি ভাই,
হাপরের মতো বুক ওঠানামা করে, জ্বলে তিন জোড়া চোখ॥

সে নাকি অন্য দুটি ভাই?
সারারাত লম্ফ জেবলে মা আমার তাড়ায় আঁধার।

টুকরো ছায়া জমে আছে মনের ভারের মতো। দেওয়ালে লেনিনের ছবিটা যেন জীবন্ত হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

হেনাদি এসে বললে, 'দীপকবাবু আর মন্টুবাবু আসছে।'

'বসতে কও হেনাদি—আমি আসতাছি।' —হেনাদি চলে গেল, সাবিত্রীর দিকে তাকিয়ে সুজাতা বললে, 'আমাদের পার্টির ছেলেরা। তুই একটু বোস সাবিত্রী—আমি দু-মিনিট ওদের সঙ্গে কথা কয়েই ফিরব।'

সাবিত্রী বললে, 'তুই বুঝি এখানে এখন হোল-টাইম পার্টি ওয়ার্কার?'

'কী করব বল? চারদিকে জমি-দখলের লড়াই চলছে। এই মুভমেন্টটা যদি একবার দেখতিস সাবিত্রী! চিরকালের এক্সপ্লয়টেড ভাগচাষী আর ক্ষেত-মজুরের, ভূমিহীন মানুষগুলোর একটুকরো জমির জন্যে কী আকুলতা! চীনের থিসিসই ঠিক—আমাদের আগে দরকার কৃষি-বিপ্লব। তুই একটু বোস—আমি দু' মিনিট ওদের সঙ্গে কথা কয়ে আসছি।'

'আমি উঠব। আমার দেরী হয়ে যাবে।'

'কিছু দেরী হবে না। বিস্তর বাস পাওয়া যাবে অনেক রাত পর্যন্ত। এই তো সন্ধ্যে—বোস—বোস।'

আসবার আগে মাসিমা এক কোণায় ডেকে নিয়ে বললেন, 'কিছু বুঝলে? ও কী করতে চায়?'

'অনেকদিন বসে থেকে একঘেয়ে লাগছিল মাসীমা, একটু রাজনীতি করে দিন কয়েক ঝালিয়ে নিতে চায়। কিছু ভাববেন না, স্বরাজদাকে—নীলুকে ফেলে ওকি থাকতে পারে? দু'দিন পরেই ফিরে যাবে আবার?'

'আগে যা করত, করত—কিন্তু এখন এই শরীর নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে—'

'বেশিদিন চালাতে পারবে না মাসীমা, আপনিই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

নিরাশ স্বরে মাসীমা বললেন, 'কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু কপালের সিঁদুরটা মুছল কেন?'

'ওটা খেয়াল মাসীমা, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আবার আসিস—' সুজাতা বলেছিল।

'আসব।'

কিন্তু বাস যখন দু' পাশের ঘরবাড়ি, বাগান, ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে তীরবেগে ছুটছে, তখন জানলার ওপর, হাওয়ার মধ্যে মাথাটা মেলে দিয়ে সাবিত্রী ভাবছিল, আসব? কেন আসব? এসে কী হবে? প্রবীর তাকে মিথ্যেই পাঠিয়েছিল এখানে। যে সান্ত্বনা সে মাসীমাকে দিয়ে এল, নিজেই তা সে কি বিশ্বাস করে?

বাসে কে একজন ট্র্যানজিস্টর রেডিও খুলেছে। সেই খবর। সেই তিক্ততার ইতিহাস।

শরিকী সংঘর্ষ। মুখ্যমন্ত্রীর উক্তির প্রতিবাদে উপমুখ্যমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলছেন—

হঠাৎ মনে হল, এই বাসটা—এই সব যাত্রীরা—এক অন্ধকার আর অনিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে—কোন্ পরিণামে গিয়ে যে পৌঁছোবে কেউ জানে না। দূরে দমদম এয়ার পোর্টের রানওয়েতে সারি সারি আলোগুলো চোখে পড়ল, বোধ হল যেন একরাশ আলেয়া।

[ক্রমশ]

প্রেসিডেন্সির প্রেসিডেন্সী নড়েছে

এতোদিনে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইজ্জত গেছে। সংবাদপত্রে দেখলাম, এ বছর প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভালো ছেলেমেয়ের মধ্যে তেমন আর প্রতিযোগিতা নেই। শুধু ছাত্রমহল কেন, প্রেসিডেন্সীতে বদলী হয়ে আসার জন্য শিক্ষক মহলেও যেকালে উমেদারি চলত, হঠাৎ সে যুগেও ড্রপ সীন পড়েছে। প্রেসিডেন্সী বর্তমানে হানাবাড়ির মতো এক ভীতিপ্রদ হর্ম্যবিশেষ।

অথচ আমাদের কালে দেখেছি, ঐ প্রেসিডেন্সীর কী রবরবা অহংকারী ঔদ্ধত্য। তার চওড়া চওড়া সিঁড়ি ভেঙে দৈনিক ক্লাস করা ও ক্লাস শেষে কফি হাউজে অভিজাত ছাত্রছাত্রীদের আসর সাজানোর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণী-আভিজাত্য বাকি ছাত্রসমাজকে জাত্যাভিমানে তাচ্ছিল্য করার সুযোগ ভোগ করত। ভর্তির সময় বাছাই-করা প্রথম শ্রেণী আর এক-একটা সজীব—হাই নম্বর রেজিস্টার-বন্দী করে প্রেসিডেন্সী বরাবরই তার রেজাল্ট-বাহাদুরী দেখিয়ে এসেছে। সরকারী আনুকূল্যেও শ্রেণীভেদটুকু ছিল সুস্পষ্ট। সেই প্রেসিডেন্সীর প্রেস্টিজ এ্যাট স্টেক!

আমাদের প্রেসিডেন্সীতে পড়ার সৌভাগ্য হয় নি। মাহিনার জন্য তো বটেই, বাছাই-করা বড়মানুষীয়ানার জন্যও ওখানে বড় একটা ঘেঁষ নেওয়া সাহসে কুলায় নি। আমি তো ফর্ম ফিল-আপ করেও শুধু লম্বা-চওড়া সিঁড়ি আর পালিশ করা বন্ধ দরজাগুলি দেখে পালিয়ে এসেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখেছি, প্রেসিডেন্সীর ছাত্রছাত্রীরা একটা চাক বেঁধেই থাকত। মাস্টার মশায়রা কেমন যেন বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে তাদের প্রফেসরস রুমে গতায়াতে প্রশ্রয় দিতেন। কি জানি, হয়ত ঈর্ষাই হত। এড়িয়ে চলতাম আমরাও। আবার হয়ত বা মনের কোণে কারণে-অকারণে কিছু সমীহও জমা থাকত। দূরে থাকার সে-ও এক কারণ। অথবা এ-ও এক ধরনের শ্রেণী-বিদ্বেষ?

সেকালে রাজনীতি থেকে গা বাঁচিয়ে লাইব্রেরী অধিকারই ছিল প্রেসিডেন্সী-ছাপমারা ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য। রাজনীতি-সচেতন ছাত্রদের ধারেকাছেও ঘেঁষতই না তারা। ওরা পড়তে ও প্রেমে পড়তে জানত। পরীক্ষার পর পড়ানোর চাকরি নিতে পারতো, অথবা বড় অফিসে মোটা মাইনের অফিসর বনতে পারতো, কিন্তু কখনই নিজের পায়ে রাজনীতির কুড়ুল মেরে আখের নষ্ট করতে দেখতাম না প্রেসিডেন্সী ফেরতদের। এক কথায় আমরা ওদের ভালো ছেলে আর ভালো মেয়ে বলেই জানতাম।

ভারি অবাক লাগে তাই, যখন দেখি, আজকের প্রেসিডেন্সীর চেহারা ঠিক উল্টো। রাজনীতির পেটো ওখানেই ফুটছে ফাটছে সর্মাধক! অধ্যক্ষ চাইছেন বদলী: অভিভাবকরা চাইছেন প্রেসিডেন্সীর স্পর্শ বাঁচিয়ে ছেলেমেয়েদের অন্যত্র ব্যবস্থা করতে। সত্তরের দশকে এ একটা বাস্তব পরিবর্তন অনস্বীকার্য। ভালো ছেলেরা হেলায় কেরিয়ার করিছে ক্ষয়!

অবশ্য প্রেসিডেন্সী যে শুধু গোলমাল-বিমুখ রাজনীতিছুট পড়ুয়ার পীঠস্থান, এমন কথা বলা শক্ত। শহরের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্রের স্মরণে সুবিখ্যাত [illegible] থেকেই। কিন্তু সুভাষ সেদিন ছিলেন একটি। আজ প্রেসিডেন্সী বিক্ষোভে উত্তাল। কেন? চিন্তাবিদদের একই বক্তব্য: বেকারত্ব। ফ্রাসট্রেশন। হতাশা। [illegible] প্রেসিডেন্ট গিরিও বললেন: হতাশাই ছাত্র অসন্তোষের অস্থিমজ্জা।

কিন্তু যদি তা-ই হবে, তবে কনসেন-ট্রেশন, বিশেষ করে প্রেসিডেন্সীতে কেন? বেছে-তোলা ছাত্রসমাজ চাকরির বাজারে তবু প্রথম প্রেফারেন্সই পাবে। পড়ে থাকবে না। বাংলা দেশে যদি বাঙালীর জন্য কাজ থাকে, তবে সেরা কাজে সেরা ছাত্রছাত্রীর ডাকও পড়বে। আর তাই যদি হবে তাহলে কেবলমাত্র কেরিয়ারগত হতাশা নিশ্চয় কলেজ স্ট্রীটের ঐ জাঁদরেল অট্টালিকায় বাসা বাঁধে নি। হতে পারে জুৎসই কাজ জোটার সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাই বলে ভালো ভালো কেরিয়ারের সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি! ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ নয়।

অবশ্য বাঙালী ভালো ছাত্রকে 'লেগপুল' করে জাতীয় চাকরির ক্ষেত্রে অবাঙালীর ছলে-বলে-কৌশলে পদাধিকার, হতাশার (বেকারত্ব-সম্পর্কিত) অন্যতম কারণ হতে পারে। এ 'বুর্জোয়া শিক্ষা' ব্যবস্থা, এই কুটিল সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার নির্লজ্জ রাজনীতি, বাংলার ছাত্র-অসন্তোষ, বিশেষ জুয়েল ছাত্রের অসন্তোষ তীব্রতর করে থাকতে পারে। মনে হয়, প্রেসিডেন্টের এ বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমান সুযোগের বাণীবক্তব্য-সম্বলিত সংবিধান যে বিশেষ ক্ষেত্রে অসমান মনোভাবকে তাড়না করার ইতিকর্তব্য পালন করতে পারছে না। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সেদিকটা বরং ভাবুন না কেন। বাণীর ফুলঝুরির চেকনাই দিতে দিতে বিশ বছরে ম্লান হয়ে গেছে। দেউলে নেতৃত্বের মগজে কোনো সমস্যারই উপযুক্ত ব্যাখ্যা তো নেই-ই, সমাধানের সদিচ্ছাও নেই। একে খুঁচিয়ে ওকে তাতিয়ে তাকে পেড়ে ফেলে আপনি বেঁচে বাপের নাম রক্ষার ব্যস্ততায় কেমন যেন বুড়ো-বেহদ্দ কচিকাচা একাধারে শশব্যস্ত। এমতাবস্থায় দেশব্যাপী পেটো-পিটানো বিক্ষোভ বিপ্লব তো হবেই। এসব যে বরং খুব কম কম হয়ে থাকে, এই তারই রকম-সকম বোঝা ভার। পারাবত নেতৃত্ব চিলের ছাদে বসে বকম বকম করবে বলে প্রকৃতির নিয়মে গ্রীষ্মের মাটি চিড খাবে না, গাছের পাতা হিমেল হাওয়ায় হলুদ হবে না, বর্ষায় নদীপ্রান্তরে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে না এবং বসন্তের কোকিল গান গাইবে না, এ আবার হয় নাকি? তবে তো প্রলয়।

সুতরাং আশঙ্কার কিছু নেই। সব ঠিকঠাক নিয়মমত চলছে। সংসারে বেনিয়মই যাবতীয় দুর্ঘটনার জন্য দায়ী, এ কথা খাঁটি সত্য।

নয়া জমানার কৃষক

কৃষককে নিয়ে রাজনীতির অন্ত নেই। অন্ত থাকার কথাও নয়। কৃষি-প্রধান ভারতের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি লোক যেখানে কৃষক, সেক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতি মূলত কৃষককে কেন্দ্র করে দানা বাঁধবে—এইটাই তো স্বাভাবিক। তাই, কি কংগ্রেস, কি অ-কংগ্রেস—প্রায় প্রতিটি দলের রাজনীতিতে কৃষককে নিয়ে এত অজস্র কথা, এত মাথা ব্যথা, মাতামাতি, প্রায় মাতলামি পর্যন্ত। দাপাদাপি সারা ভারত ভূখণ্ডে। আরো লক্ষ্য করা যায়, সৌখীন এক রাজনৈতিক দলের সস্তা কৃষক-দরদী সেজে বাহাদুরী আর হাততালি নেবার হাস্যকর অপচেষ্টা। অংশত যার ফলে মাঠে-ময়দানে, গ্রামে-গঞ্জে, মুখে-মাইকে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এত হৈ-চৈ আর দেশজোড়া সোরগোল।

কিন্তু এই প্রচণ্ড সোরগোলের আসল কথাটি ভুলে গেলে চলবে না, চলবে না ধামাচাপা দিয়ে মূল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া। খতিয়ে দেখতে হবে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে দলীয় রাজনীতির কাছি টানাটানির ফলে কৃষকের স্বার্থ-রক্ষা হয়েছে কি না। দলীয় কাছি তাকে টেনে ওপরে তুলেছে, না ক্রমশ ফাঁস হয়ে তার গলায় চেপে বসেছে। এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে দলীয় রাজনীতির কথা, বিভিন্ন দল আর তাদের ভূমিকার কথা। কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে তারা কি করেছে আর কি তাদের করা উচিত ছিল—তার খতিয়ান নিয়ে আলোচনা।

প্রথমেই আসে কংগ্রেসের কথা। দীর্ঘ ২২ বছরের কংগ্রেসী শাসনে কৃষক পায় নি প্রায় কিছুই। কৃষিঋণ, উন্নত বীজ, সার প্রভৃতি চাষের অপরিহার্য জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্য কৃষিজীবীদের দিন দিন অন্ধকারের পথে ঠেলে দিয়েছে। তাই কৃষকরা মহাজনদের খপ্পরে পড়ে চক্রবৃদ্ধিহারে তার ঋণ শোধ করতে পারে নি। শেষে মহাজনের সিন্দুকে চাষীর জোত-জমি, ঘরবাড়ি, ঘটি-বাটি সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। অথচ সরকারী কৃষিবিভাগ প্রচারের ত্রুটি করেন নি, কিন্তু সময়োচিত সাহায্যের প্রত্যাশা তাঁদের কাছ থেকেও নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছে। প্রাচীরে বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের রঙের খেলায় সরকারী সহায়তার সদম্ভ ঘোষণা বাস্তবক্ষেত্রে কৃষকের কাছে কল্পনার বস্তুই থেকে গেছে।

কিন্তু জমি, সেচ, সার, ঋণ আর ছোট-বড় পরিকল্পনাগুলোর মারফৎ যৎসামান্য যা চাষী পেয়েছে সেটা তার রক্তের দাম। পুলিশের বুলেট, জোতদারের ল্যাঠি আর জেলের লপসী খেয়ে সেটা তাকে আদায় করে নিতে হয়েছে। বিড়লার বাৎসরিক মুনাফাকে ৩০০ কোটি টাকার অংকে আনতে গেলে রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখের আয় বাড়তে পারে না। তাই বাড়ে নি, বাড়তে পারে নি। কংগ্রেস জমিদারী উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু কৃষক জমি পায় নি। অথচ কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে ক্ষতিপূরণ বাবদে, চুকেছে জমিদার আর চকদারদের পকেটে। কংগ্রেস তেভাগা আইন পাশ করেছিল, কিন্তু তার সঙ্গে জুড়েছে উচ্ছেদের লেজুড়। সে লেজুড় ঝাপটা মারে আর জমি থেকে চাষী ছিটকে পড়ে। এই তো হ'ল কংগ্রেসী আদর্শের খতিয়ান—কৃষক দরদের নমুনা। কিন্তু কৃষকের জিজ্ঞাসা এখানে থামে না। কারণ কৃষক জানে, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি কৃষকের স্বার্থরক্ষার যে দায়িত্ব কংগ্রেসের ওপর ছিল—তা সে পালন না করে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার শাস্তি অংশত হলেও কংগ্রেস পেয়েছে। তার সাজানো সাম্রাজ্য আজ খান্ খান্ হয়ে ধসে পড়েছে। জঘন্য আত্মদ্বন্দ্বে ও আত্মদম্ভে বিকৃত কংগ্রেস আজ আসন্ন মৃত্যুর দিন গুণে হাঁফাচ্ছে। গত ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন আর তার পরবর্তী ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এর পরে স্বভাবতই সমাজতন্ত্রী আর লেনিনবাদী দলগুলির কথা ওঠে। মেহনতী মানুষের দল হিসাবে কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্বও অপরিসীম। তাই, কৃষক আন্দোলনকে সংহত করে রাজনৈতিক শিক্ষার আলোকে কৃষকসমাজের শ্রেণী-চেতনাকে স্পষ্ট করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা কতদূর কি করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তারও সালতামামির প্রয়োজন হয়।

সমাজতন্ত্র গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে মনীষী লেনিন বলেছেন যে, কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলাই হবে সমাজতন্ত্র রচনার প্রথম ধাপ। কারণ কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ মূলত এক আর অভিন্ন। কিন্তু সে ঐক্য কি গড়ে উঠেছে? কৃষক আর শ্রমিক কি আজ একই বনিয়াদে এসে দাঁড়িয়েছে? কোন্ সমাজতন্ত্রী দল গেঁথেছে সে বনিয়াদ, নির্লজ্জ শোষণের মুখে রুখে দাঁড়াবার সেই সম্মিলিত পাটাতন, সংহত মোর্চা?

বরং আমরা উল্টোটাই দেখলাম এ যাবৎ। গ্রামের চাষী যখন মার খায় জোতদারের হাতে, মহাজনের নিকট দেনার দায়ে যখন মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যায়, যখন তারা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে পথে নামতে বাধ্য হয়, তখন তো কই শহরে শ্রমিক গর্জে ওঠে না! ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ছুটে আসে না তো মিছিলে! আওয়াজ তোলে না লড়াইয়ের! আবার শহরে শ্রমিকের চাকুরী গেলে, বোনাস চেয়ে বুলেট পেলে গ্রামের চাষী নির্বিকার। চোখ বোজে আর ধোঁকে। কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙে না।

গ্রামের চাষী অবশ্য কালে-ভদ্রে শহরে যায়। মিছিল বানায়, মিছিলে যোগ দেয়। খাদ্য চায়, জমি চায়—শ্লোগান দেয়। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস আর মাঝে মাঝে গুলী খেয়ে গ্রামে

[১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

॥ এগার ॥

আসন্ন মুষলযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নির্বাচনের ময়দানে জামাত ও কনভেনশনীদের পাশাপাশি তাঁবু খাটিয়ে আর এক দল বুর্জোয়া এবং পাতিবুর্জোয়া নিয়মিত পাঁয়তারা কষছে। তাঁবুর মাথায় বিরাট বংশদণ্ডের গায়ে ডোরাকাটা, বিচিত্র এক নিশান বাঁধা। তাতে লেখা আছে পি. ডি, পি. অর্থাৎ "পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি"। কিন্তু জনসাধারণ, যাঁরা কৌতূহলী হয়ে মাঠের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছেন, তাঁরা পড়ছেন, "পাকিস্তান ডেমোগ্রাস পার্টি"। এই ভুল শুধরে দেবার জন্য পি, ডি. পি-ওয়ালারা প্রথমে নিশানটা নামিয়ে "ডেমোক্রেসী" কথাটাকে রঙ মাখিয়ে আরও ধ্যাবড়া করে দিয়েছিল, কিন্তু তাতেও কিছু হোল না দেখে এখন তাঁবুর চারপাশে চোঙা ঝুলিয়ে তারস্বরে "ডেমোক্রেসী"র বহুতর ব্যাখ্যার আয়োজন হয়েছে। নুরুল আমিন, আবদুস সালাম, মামুদ আলী, ফরিদ আমেদ, আজিজুল হক প্রমুখ পি, ডি, পি নেতারা পালাক্রমে তাঁবুর সামনে এক কেঠোমঞ্চে উঠে অজ্ঞ, অপদার্থ আওয়ামকে চক্ষু-বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছে এবং তাদের অনুর্বর মস্তিষ্কে "গণতন্ত্র", "দেশসেবা", "আত্মত্যাগ" ইত্যাদি অশ্রুত, অজ্ঞাত কথা ঢুকিয়ে দেওয়ার আগ্রহে নাছোড়বান্দা দালাল বা লটারীর টিকেটওয়ালার মত বক্ বক্ করছে। তাঁবুর পাশেই একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে বিনা টিকেটে পি, ডি. পি-র মহান্ রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও পটভূমির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঢালাও সুযোগ আছে। যদিও দর্শকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য—তা হলেও পি, ডি, পি-ওয়ালাদের উৎসাহের অভাব নেই, বোধ হয় তারা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে, সারা পূর্ব পাকিস্তান তাদের তাঁবুতে ভেঙে পড়েছে! এই পি, ডি, পি-ওয়ালাদের নিয়েই আমার এবারের চিঠি শুরু হোল।

নুরুল আমিন, মামুদ আলী, আবদুস সালাম প্রমুখ নেতারা তাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কেবলমাত্র একটি কাজই করেছে, তারা ক্রমাগত পুরনো দল ছেড়ে বা ভেঙে নতুন দল গড়েছে। বুর্জোয়া স্বভাবসুলভ এই বিশেষ কাজটি ছাড়া তারা আর কোনও কিছুই দাবি করতে পারে না। দেশকে তারা কিছু দেয় নি, দিতে চায় নি কোনওদিন। তবুও নির্লজ্জের মত গলা ফাটিয়ে দেশসেবার লম্বা ফিরিস্তি আওড়াতে তাদের জুড়ি মেলে না এবং এটাও তাদের বুর্জোয়া মানসিকতার অপর এক লক্ষণ। নুরুল আমিন প্রথম জীবনে ছিল মুসলিম লীগার। পূর্ব পাকিস্তানীদের দুর্ভাগ্য যে, সে একটানা সাত বছর এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব করে গেছে! অতঃপর আয়ুবের আমলে ঊনিশ শ' তেষট্টি সালে যখন এন, ডি, এফ বা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট হয়, নুরুল আমিন তাতে যোগ দিয়েছিল। এর কিছুদিন আগে আমিন সাহেব বুনিয়াদি গণতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। যে বুনিয়াদী গণতন্ত্রকে গরু, মহিষের খাটাল অপেক্ষাও নোংরা মনে করা হোত এবং যার বিরুদ্ধে আমিন সাহেব নিজের অন্তরঙ্গদের কাছে অহোরাত্র বিষোদ্গার করেছিল, দেখা গেল, সেই বুনিয়াদী নির্বাচনেই আটঘাট বেঁধে সে নেমে পড়েছে! নির্বাচনে জয়ী হয়ে নুরুল আমিন জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা বনে গেল! দেশসেবার আর বাকী রইল কি? একদিকে এন, ডি, এফ, অপরদিকে বিরোধী দলের নেতৃত্ব, কপালের দুই পাশে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা এই দুই শিঙ বাগিয়ে নুরুল সাহেব আয়ুবশাহীর পাথুরে দেওয়ালে ঢুঁ মারতে লাগল।

অতঃপর, ঊনিশ শ' সাতষট্টি সালে যখন প্রদেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে আয়ুবের শাহী জমানার পাথুরে দেওয়াল ধ্বসে পড়ার উপক্রম হোল, তখন ঝোপ বুঝে কোপ মারার আশায় নুরুল তারই মত সুবিধাবাদী এবং ধূর্ত কিছু লোকের সাথে হাত মিলিয়ে মিছিল আর বক্তৃতার বিপ্লব আমদানী করল এবং এই মজাদার ব্যাপারটার একটা গালভরা নামও রাখল। সাতষট্টির পয়লা প্রচণ্ড জোরে ঢাক, ঢোল, জগঝম্প ইত্যাদির আওয়াজে ঘুম ভেঙে উঠে ঢাকার মানুষ শুনল যে, "অদ্য হইতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট শুরু হইবে। আয়ুবের পতন ঘটাইয়া দেশে প্রকৃত, অর্থাৎ নিভেজাল গণতন্ত্র কায়েম না করা পর্যন্ত এই মুভমেন্ট চলিবেই।"

কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতই পি, ডি, এম মাত্র দুই বছরের মধ্যেই আঁতুড়িরঙ বিপ্লব করে হাঁপিয়ে উঠল। ইতিমধ্যে আয়ুবের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের সংঘবদ্ধ আক্রমণের কাছে বারংবার মার খেয়ে খাঁ সাহেবের মত জঙ্গী লোকও নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। নুরুল আর তার সাকরেদরা বুঝল, "মহা মুস্কিল, তারা তো পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রোগ্রেসিভ থাকছে না, অথচ দেশের স্বার্থে তাদের টিকে থাকা একান্ত প্রয়োজন। অতএব, নতুন কিছু কর।" "এবার কেবল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট নয়, একেবারে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন শুরু করে দাও।" তাই হোল। ঊনিশ শ' ঊনসত্তর সালের জানুয়ারীর আট তারিখে আরও বেশি জাঁকজমকের মধ্যে, আরও বেশি ঢাক, ঢোল আর ক্যানেস্তারা পিটিয়ে নুরুল আমিন তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে "ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি" গঠন করল। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই "ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি" বানিয়ে নুরুল আমিন প্রমুখ গত গণ-আন্দোলনের যোদ্ধাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেন না, সেদিন আন্দোলনের তীব্রতা এবং গতিবেগ এতই বেশি ছিল যে, আয়ুব খাঁ তার মার্কিনী বা রুশ দাদাদের দেওয়া একমারী বন্দুক, সঙ্গীন এবং টোটার অবিরাম অপচয় করেও আমাদের রুখতে পারছিল না। বাধ্য হয়ে খাঁ সাহেবকে চোরাগলির পথে পা বাড়াতে হোল। এক বেতার ভাষণে সে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে এক বৈঠকে বসার অনুরোধ করল। এই সেই বিখ্যাত গোলটেবিল বৈঠক! সংগ্রামী আওয়াম আয়ুবের বেতার ভাষণের প্রকৃত অর্থ বুঝে নিয়ে লীডার বাহাদুরদের এই ধরনের কোনও বৈঠকে যোগ না দেওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিল। কেন না, তারা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিল যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়ে রুখে না দাঁড়ালে তার অত্যাচার ক্রমশই বেড়ে যায়। "কলসীর কানা খেয়েও জগাইকে প্রেম দিতে হবে"—এই রকম ধারণা সংগ্রামী আওয়ামের চিন্তারও বাইরে ছিল। কিন্তু ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি, যার মধ্যে পাকিস্তানের প্রায় সব বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলিই ছিল, তার নেতারা আওয়ামের পরামর্শে কান দিল না। কেন না, রাজনীতি এদের কাছে সৌখীন মজদুরী মাত্র বা সখের

পশু-পাখি শিকার। প্রকৃত শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সশস্ত্র বিপ্লবের কথা শুনলেই ওদের পিলে চমকে ওঠে। ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গোল-টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। প্রথমত আয়ুবের মত তারাও সমাজের তথাকথিত ধোপদুরুস্ত শ্রেণীর মানুষ, যারা প্রকৃত বিপ্লবের কথা শুনলেই কায়েমী স্বার্থকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চায়। সুতরাং, গণ-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে তারা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে আয়ুবের কাছ থেকে নিজেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু কনসেশন আদায় করে নেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত, এই ধরনের কনসেশন আদায়ের মাধ্যমে তারা দেশবাসীর কাছে নিজেদের প্রগ্রেসিভ প্রমাণিত করতে চেয়েছিল। যাই হোক, গোলটেবিল বৈঠকে গিয়েও ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি শেষ রক্ষা করতে পারল না। আয়ুবের উপস্থিতিতেই তারা শেয়াল-কুকুরের মত পরস্পরের দফা নিয়ে সোর-গোল শুরু করে দিল এবং বৈঠকের শেষে দেখা গেল যে, কমিটি ভেঙে গেছে। কিন্তু জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার আর একটা চেষ্টা করল নেতারা। যেমন নসরুল্লা (কমিটির কনভেনর) ঘোষণা করল যে, জনগণের দাবি-দাওয়া সবই আদায় হয়েছে, সুতরাং কমিটিরও প্রয়োজন শেষ হোল! কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কখনই যায় না। পাকিস্তানের মানুষ বুঝল যে, ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি তাদের ঠকিয়েছে। সুতরাং, তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নেতারা গা ঢাকা দিল। এই নির্লজ্জ দালালের দল যারা দশ বছর ধরে আয়ুবের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে গণ-বিরোধী কাজকর্ম চালাচ্ছিল, তারাই আবার নতুন জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়ার রাজত্বে পাকি-স্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি গড়েছে। দেশের মধ্যে যারা প্রকৃত বিপ্লবী, তারা সবাই জানে যে, পুরনো মদ নতুন পাত্রে ঢালা হয়েছে মাত্র। পি, ডি, পি তার রাজ-নৈতিক বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য তার কর্মসূচী এবং লক্ষ্য যে সাংঘাতিক রকমের গণতান্ত্রিক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক, তা প্রমাণ করার জন্য নানা রকমের প্রচার চালাচ্ছে। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হবে যেন পাকিস্তানে এত পবিত্র, এত সৎ এবং এত আত্মত্যাগী আর কোনও রাজনৈতিক দল ইতিপূর্বে জন্ম নেয় নি! বাহাত্তুরে নুরুলের বাহাদুরি আছে বলতে হবে! প্রথমে মুসলিম লীগ, তারপরে এন, ডি, এফ, তারপরে পি, ডি, এম, তারপরে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি এবং বর্তমানে পি, ডি, পি। একটার পর একটা খেল দেখিয়ে সে আজও একেবারে তরুণ, তাজাই আছে।

॥ গ্রামবাংলার কথা ॥

[১৫২ পৃষ্ঠার পর]

ফিরে আসে। আন্দোলন ছাড়ে। কানমলা আর নাকখৎ খেয়ে জোতদারের উঠানে ঠাঁই পাতে। যথারীতি কংগ্রেসকে ভোট দেয়। জোড়াবলদের খুরে আর ধুলো থাকে না। পক্ষান্তরে, শহরের শ্রমিক গ্রামে আসে, এসেই ভাগচাষী উচ্ছেদে মদত জোগায়। অথচ সেই শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করে। মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দেয়।

সমাজতন্ত্রের অপর একটি শর্তের কথা প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়ে। লেনিন বলেছেন, কৃষক ও শ্রমিকের সংহত ঐক্যের মধ্যে টেনে আনতে হবে স্বল্পবিত্ত চাষীকে। শোষণ আর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারাও অংশীদার। প্রশ্ন ওঠে : এ শর্ত কি পূরণ হয়েছে? নিশ্চয়ই না। কারণ গ্রামের চিত্র বিপরীত। স্বল্পবিত্ত আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষী দিনের পর দিন পুঁজিবাদী স্বার্থের তাঁবেদার হয়ে পড়ছেন। নিম্নস্তরের কংগ্রেস সংগঠনের তাঁরাই হলেন খুঁটি। গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনের তাঁরাই হলেন স্বরাট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কায়েমী স্বার্থেরই যন্ত্র। যে যন্ত্র নিয়ত পিষছে, পিষে মারছে কৃষককে—অথচ যে কৃষকের সংগে তাঁদের স্বার্থের গাঁটছড়া বাঁধা। কিন্তু কোনো বামপন্থী দল তাঁদের টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কি সাধারণ কৃষকের সারিতে, বেঁধেছে কি মিলন-সূত্রে, সমাজতন্ত্র গঠনের মহান শর্তে?

বরং দেখা গেছে, কোনো বিভ্রান্ত বামপন্থী কর্মী তাঁর মনগড়া শ্রেণী-বিশ্লেষণের দ্বারা সেই স্বল্পবিত্ত শ্রেণীকে পুঁজিবাদী অথবা জোতদার বলে বর্জন করেছেন। এ আত্মঘাতী রাজনীতির খেলা আজ প্রায় সর্বত্রই। লেনিনবাদের এ অপপ্রয়োগ প্রায় ক্যান্সারের মত সংক্রামক। কিন্তু এটা নিয়ম না হয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম হোক [illegible] চাষীরা বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু বুঝতে চায়। তাই কৃষকও পথ খোঁজে। বাঁচতে চায়। বাঁচার ইচ্ছা তার উদগ্র। তার ছাপ দেহে-মনে পড়ছে। উপরে-নিচে, সামনে-পিছনে সে তার অস্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে ধরে। হয়ত পথ পায় না, তাই ভুল করে।

কিন্তু রাজনৈতিক পটভূমি আজ পাল্টে গেছে, পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে রাজনীতির ধারা। লয় তার দ্রুত। গতি তার অবাধ। তারই তালে তাল রেখে চাষীকেও আজ যথাসম্ভব ঠিক করতে হবে তার পথ। অপেক্ষা আর টালবাহানা প্রগতির শত্রু। জনগণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। "দুনিয়ায় কোনো শাসকশ্রেণীই সংগ্রাম ছাড়া কোনদিন পরাজয় স্বীকার করে নি।" তাই, নতুন পটভূমিকায় নতুন শিক্ষাটুকু নিয়ে কৃষককে আজ আসতে হবে এগিয়ে। গড়তে হবে সংগঠন। আনতে হবে সংহতি। [illegible] ফাটল ধরাতে গিয়ে পুঁজিবাদ। কায়েমী স্বার্থ খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে।

শ্রমিকেরা আজ [illegible] অত্যাচারিত মেহনতী কৃষক সে তার প্রকৃত শত্রুকে [illegible] বুদ্ধিজীবী ও [illegible] তাত্ত্বিকেরাই আজ তৈরি নেই। [illegible] কৃষকের রাজনীতির [illegible] কৃষক। জোতদার আর কায়েমী স্বার্থের দালাল তাদের প্রতিনিধি হতে পারে না। তাঁদের হাতে আর সে তুলে দেবে না তার রাজনীতি তথা ভাগ্য-রচনার ভার। নিজের মাথা বিকিয়ে দলে সে আর দেউলিয়া হয়ে যাবে না। আজ এসেছে লণ্ডন ভুয়া গণতন্ত্রীদের ডাকবার। ডেকে সোচ্চারে বলতে বলবার—"ওরে তোমাদের গণতন্ত্র মিথ্যা আর ছলনা। তোমরা এতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলে মিথ্যা বড়াই করেছ। কারণ, আমরাই সেই গরিষ্ঠ। আমরা শতকরা আশি—আমরা লক্ষ-হাজার-কোটি। তোমরা এতদিন গণ-তন্ত্রের নামে আমাদের ঘাড়ে বসে রক্ত শোষণ করেছ। তোমাদের দাঁতে আর নখে এখনো সেই রক্তচিহ্ন। কিন্তু আমরা পথে-মতে আজ এক। তাই আমরা সংহত, তাই দুর্বার। রক্ত আর ঘামের পলি পড়ে যে সমাজ ও সভ্যতার জন্ম হয়েছে, রক্ত আর ঘাম দিয়েই তাদের রাখতে হবে। তাই তোমাদের দন্ত-নখর গুটিয়ে নাও শয়তান, নইলে ধূলিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে।

—আধমনজাল ঘোষ

সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

১৮ই জুন তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীর ৫১শ সংখ্যায় প্রকাশিত "সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ" প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে ইচ্ছা করি। লেখক ইন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি অবলম্বনে রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবমাধুর্য নিঃসন্দেহে সকল চিত্তকেই উদ্বেলিত ক'রে এক অনির্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ করে। কারণ এমন সহজ ভাষায়, এমন সুললিত ভংগীতে এত গভীর ভাবের প্রকাশ সারা পৃথিবীতেই, মনে হয়, খুবই দুর্লভ। কিন্তু আমার মনে হয়, সে কৃতিত্ব সুরকার রবীন্দ্রনাথের যতটা, গীতিকার রবীন্দ্রনাথের তার থেকে অনেক বেশি। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রসঙ্গীত অতুলনীয়, কিন্তু সুরের একঘেয়েমির অভিযোগ থেকে খুব কম রবীন্দ্রসঙ্গীতই অব্যাহতি পেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন, "কলা-কৌশলের কলা অংশটা থাকে গান-কর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে কৌশলের অংশটা।......ওস্তাদ মানুষটাই মাঝারি এবং মাঝারির প্রভুত্বই জগতে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।" আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে গীতিকার বা গান-কর্তার আসনে বসিয়েছেন তাঁর মত একজন লোকোত্তর প্রতিভাধরকে আর ওস্তাদের আসনে রাম-শ্যাম-যদু-মধুকে। ওস্তাদ মানুষটা সকল সময়েই কিছু মাঝারি কিন্তু হয় না, আর গীতিকার মাত্রেই স্রষ্টা হন না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রমুখ কয়েকটি নামের পরে বাংলা দেশের আর ক'জন গীতিকারকে স্রষ্টার পর্যায়ে ফেলা যায়? কিন্তু বড়ে গোলাম আলির ঠুংরি, ওস্তাদ আলি আকবরের সরোদ বা পণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার অনবদ্য সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করার যোগ্য। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর বাঁধাবাঁধি আছে বলে সেখানে কোন কিছু সৃষ্টি করা যায় না, এ তথ্য আমার মনে হয় একটু একপেশে। মালকোষ রাগে কোন্ কোন্ স্বর লাগে তা অনেকেই জানেন। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনেই সকলে মালকোষ গেয়ে থাকেন। তবু গোলাম আলির মালকোষ বা তারাপদ চক্রবর্তীর পুরিয়া বা গঙ্গুবাঈ হাঙ্গলের শুদ্ধ কল্যাণ আর সকলের থেকে পৃথক,—যা' সবার জানা বাঁধনের মধ্যেই এক অজানা রসলোকের সৃষ্টি করে।

তাছাড়া, বর্তমানে যা দেখা যায় তা হচ্ছে এই বাধ্যবাধকতাটা রবীন্দ্রসংগীতে যতটা প্রবল, উচ্চাঙ্গসংগীতে ততটা নয়। স্বরবিতানের স্বরলিপির সামান্য ইতরবিশেষ হ'লেই বিশেষজ্ঞরা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর স্বরলিপির কিছুটা হেরফের বা সরলীকরণ যে একেবারে হয় নি তা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরের পরিবর্তন কখনও সহ্য করেন নি। জ্ঞান গোঁসাইয়ের মত শিল্পীকেও তিনি বিমুখ করেছেন। এ বিষয়ে দিলীপকুমার রায়ের সংগে তাঁর অনেক পত্রালাপ হ'য়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথের "অল্প লইয়া থাকি তাই মোর" যেমন ভাবমাধুর্যে অসাধারণ, তেমনি নজরুলের লেখা এবং জ্ঞান গোঁসাই-এর গাওয়া "শূন্য এ বুকে পাখী মোর" সুরমাধুর্যে অনবদ্য। কিন্তু এত বাধ্যবাধকতা উচ্চাংগসংগীতে নেই। রবীন্দ্রসংগীতে ছোট থেকে বড় গায়ক সকলে একইভাবে গাইতে বাধ্য, কিন্তু উচ্চাংগসংগীতে তা নয়। বিভিন্ন শিল্পীর বৈশিষ্ট্য সেখানে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়। দরবারী কানাড়ার রাগ-রূপ সকলেই জানেন। কিন্তু ওস্তাদ আমীর খাঁর হাতে যেটা হয় সৃষ্টি, সাধারণ শিল্পীর কাছে সেটা সুললিত সংগীত হয় বটে, সৃষ্টি হয় না। স্বরলিপির সামান্য হেরফের সেখানে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। 'দেশ' রাগের গানে "পা নি সা' র্রা"র স্থানে "মা পা নি সা' র্রা" করলে গানের বিন্দুমাত্রও হানি হয় না বা সংগীতের সুপ্রিম কোর্টে কেউ মামলা রুজু করেন না।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুস্থানী সংগীতের সংগে বাংলা গানের একটা বড় প্রভেদ এই যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুরেরই প্রাধান্য, আর বাংলা গানে "সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন"। কীর্তন, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি সম্বন্ধে এ তথ্য সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু বর্তমান বাংলা আধুনিক গান রবীন্দ্রনাথ দেখে যাবার দুর্ভাগ্য লাভ করেন নি, করলে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হ'ত। এতে বাণী তো নেই ই, সুর যা আছে তাকে চীৎকার বলা বোধ হয় অসংগত নয়। বাংলা দেশের অন্যতম বিখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী তাঁর জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর অনুকরণে বাংলা গান রচনা করছেন, "আহা ঐ আঁকা বাঁকা যে পথ" ইত্যাদি যে গানের পূর্বাপর সংগতি আবিষ্কার তাঁর নিজের পক্ষেও অসম্ভব। ব্যতিক্রম যাঁরা ছিলেন এই উৎকট আধুনিক গানের রাজ্যেও, তাঁরা কেউ কেউ এদের দলে মেশার ব্যর্থ প্রয়াসের পরে হয় বিষণ্ণ অবসর নিয়েছেন অথবা নজরুলগীতি, শ্যামাসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি প্রকৃত গানের মাঝে আশ্রয় নিয়েছেন। আর দিনের পর দিন ক্রমশ বেড়ে গেছে সংগীতের নামে উৎকট চীৎকার, লম্ফ-ঝম্প, উন্মত্ত যথেচ্ছাচার। আর এই সব Record Sale-এর Record ক্রমশ আকাশ স্পর্শ করছে জনপ্রিয়তার। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশকে শুধু নয়, সারা বিশ্বকে যা দিয়েছেন, তাতে তাঁর ঋণ আমরা কোনদিনও পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু "বিশ্বযাত্রার তালে তাল" রাখার জন্য তিনি বন্ধনদশা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন বাংলা গানকে। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভায় পুরাতন বিধিনিষেধ ভেঙে নতুন সৃষ্টির অমৃতলোক তিনি গঠন করলেন। কিন্তু তারপর আজ? আজকের অবস্থা দেখে মনে হয় এ বেড়া না ভাঙলেই বোধহয় ভাল হ'ত। ঐ অসাধারণ প্রতিভা ছাড়া এ বেড়া কেউ ভাঙতে পারে না। আর প্রতিভার সংগে যে প্রচলিত রীতি লঙ্ঘনের ইচ্ছা, তার সংগে একটা স্বাভাবিক সংযম থাকে, সৃষ্টিকে যা কখনো বিপথগামী হ'তে দেয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ রীতি ভেঙেছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কখনো বিপথগামী হয় নি। কিন্তু তাঁর পরের ক্ষমতাহীনেরা উৎসাহের আতিশয্যে, আর্থিক লালসায় মানুষের রুচিবোধকে টেনে যেখানে নামিয়েছেন তাকে বলা যায় রুচিবিকার এবং নির্দ্বিধায় সেখানে সংগীতের রাজ্যে চলছে উন্মত্ত ব্যভিচার। "পাওয়া-না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়েই" এ সব অপসৃষ্টির আত্মপ্রকাশ, এ কথা বিশ্বাস্য নয়।

—ভূদেব গুপ্ত
রিষড়া (হুগলী)

সচল জীবনে অবিরাম জিজ্ঞাসা ঃ

সমাজের মতে সাহিত্যে বিতর্ক স্বাস্থ্যের লক্ষণ; ওতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ বরং বরণীয়। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও সেই এক কথা। সুতরাং ঋতু আবর্তনে বৈশাখে যদি আদৌ প্রাকৃতিক কালবৈশেখীর ঘনঘটা না-ই হয়, কিন্তু ২৫শে বৈশাখকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের আঙিনায় ঝড় ওঠে, বুঝতে হবে ওটা জীবনের লক্ষণ। ২৫শে বৈশাখে যিনিই ডাক দিন না কেন, কিছু রবীন্দ্র-প্রকাশকের হাঁক-ডাক শোনা যায় এবং দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সর্বজনীন পুজোর মধ্যে বিতর্কের ব্যঞ্জনও সাহিত্যের উপভোগ্যকে কিছু বিচিত্র করে তোলে।

এ কেন হল, এমন অভিযোগ যাঁরা তোলেন তাঁরা স্পষ্টতই লখীন্দরের লোহার গরাদ থেকে বেরিয়ে আসতে ভয় পান। ভয় কি? জীব-বিজ্ঞানের শিক্ষাও এই যে, জলে অরণ্যে অগণিত অসংখ্য বিষধর জীব ও অতিকায় ম্যামথদের অতিক্রম করেই পিঁপড়ের মত মনুষ্যজীব সবার ওপরে সজ্ঞ হয়ে উঠেছে। তেমনি যে-সমাজ ডাইনীতন্ত্রে আর শিলাতন্ত্রে জড় হয়ে থাকতে চায় সে সমাজ ভাগ্যহীন। খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধধর্মী দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের সৌভাগ্য যে, তারা ধর্ম নিয়ে, সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কের অবকাশে একদিকে অন্ধ যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে নতুন বাণী-বাহককে, আর একদিকে নববাণীকে আত্মস্থ করে এগিয়ে গেছে বৃহত্তর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ, প্রাথমিক কার্পণ্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ঔদার্যে একের সম্মুখ করেছে। নইলে মানুষ চাঁদে কোনকালে পদার্পণ করা দূরস্থান, একটা গ্রামোফোনও তৈরী করতে পারত না, কল্যবিজ্ঞান দুরস্থান ম্যালেরিয়া বিনাশের কারণ ও ওষধীও আবিষ্কার করতে পারত না। যে-সম্প্রদায় যা ধর্ম বিতর্কে নারাজ, মানুষের অগ্রগতিতে তাদের কিছুমাত্র দান নেই, তাদের সে সামর্থ্যই রয়েছে আদিম গুহায় বন্দী। তাদের কাছে অনাগত মানবসমাজের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নেই। তারা উপভোগ করে, সৃষ্টির আনন্দ জানে না।

রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসি কবেকার? কালজয়ী, কালাতীত, কালো-ত্তীর্ণ—না—আজকেরও? আজও, আজও এই চাঁদে-যাওয়া বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ আনন্দ পায়—বিতর্ক তোলে। কিছুতেই এরা প্রাচীন জীর্ণ হয় না। ঝকঝকে তকতকে। এবং বিতর্কই তাদের প্রাণপ্রবাহ। ওদের স্তুতি হয়েছে, পুজো হয়েছে, ভাব-সম্প্র-সারণ, ভাব-চুরি হয়েছে, আবার বিতর্কও হয়েছে। যার ভেতরেই মানবমনের কিছু মৌলিক কথা আছে তাই বার বার মানব-মনই আবার উল্টেপাল্টে যাচাই করে, তর্ক তোলে।

রামমোহন সেকালে জড় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ ঋজু হয়ে না দাঁড়ালে আমরা আজকের ১৯৭০-এর সমাজে আসতে পারতাম না। জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেলে আদম-ইভ আজও সবয়কমে বিবস্ত্র নিঃসম্বল থেকে যেত। মনে আনন্দ জাগে না যখন দেখি এই বিরাট পৃথিবীতে ছড়ানো বহু অরণ্যে পাহাড়ে প্রশ্নহীন বন্য সভ্যতা লতায় জড়িয়ে আছে। রামমোহন বুক ফুলিয়ে না দাঁড়ালে অন্য বন্য উপ বা প্রজাতির হেড-হাণ্টিংকে নিন্দা করতাম কি জোরে যদি জলন্ত বিধবা একটা মানুষকে আজকের চিতায় দগ্ধ সতীপ্রথা চালিয়েই যেতাম? তাঁকে সক্রেটিসের মতো হেমলক বিষ পান করতে হয় নি, কেন না, মানুষের সৃষ্টির রথ তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু নির্যাতন যন্ত্রণা কিছু কম হয় নি। আজও একমাত্র ব্রাহ্মণেরাই টোলে টোলে মৃত সংস্কৃতের শিখা নাড়তেন ব্রাহ্মণেতর নির্বোধ শির-মালায় পা রেখে, যদি-না রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সর্বজনীন করার সংগ্রামে নামতেন। গঙ্গায় অগ্রমতী মায়েরা সন্তান নিক্ষেপে বিরত হতেন না।

এ সবই সম্ভব হয়েছে প্রচলিত সমাজ-বিধি এবং সর্বোপরি প্রশ্নাতীত বলে গণ্য শাস্ত্রের মন্থনে, মূল্যায়নে, পুনর্মূল্যায়নে, তর্কে-বিতর্কে। আমাদের ষড়দর্শনের ও অন্যান্য গ্রন্থেরও রচনার গর্ভে এই তর্ক, বিতর্ক, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ। গৌতম বুদ্ধ, চার্বাক মুনিরও আবির্ভাব এ একই গর্ভে থেকে। বেদ-বেদাঙ্গকে প্রশ্ন করে কার সাধ্য? কিন্তু করেছিলেন তো বুদ্ধদেব ও চার্বাক? অথচ মানবসভ্যতায় কারোরই মৃত্যু হয় নি, কেউ বিলীন হয় নি। বরং, দেখা যায়, সেই একই যুক্তি, একই খণ্ডন, একই বিচার পুনরাবৃত্তিও হচ্ছে। জ্ঞান-বৃক্ষের এইটিই ফল; মানুষ বুঝে নিতে চায়। সে কষ্টিপাথর নিয়ে জন্মায়।

কাপালিকেরাও এককালে ছেয়ে গেছল, এসেছিল তো বৈষ্ণবেরাও? বাংলা দেশের বৌদ্ধেরা ন্যাড়ানেড়ির কেত্তনও তো করেছে? একেবারে চরমে গিয়ে হিন্দুর ছেলে খৃস্টান, মুসলমান হয়েছে অথবা আত্মহননও করেছে? জানবার বোঝবার চেষ্টা মানুষের অশেষ। এজন্য ব্যষ্টি-জীবনে যেমন সমষ্টিজীবনেও তেমনি বারংবার প্রচলিত রীতির, প্রথার, শাস্ত্রের, গ্রন্থের নব-মূল্যায়ন হয়েছে।

আজকের মস্তানদের ছোরা-দেখানো চাঁদায় "শরবোয়োনিন" পুজোর জড় পুতুল প্রকৃত ভক্তিমানদের যেভাবে দুঃখভারে আকুল করেছে, একদা নিষ্প্রাণ পৌত্তলিক-তার দৌরাত্ম্যে বিক্ষুব্ধ সমাজকে তেমনি বাঁচিয়েছেন রামমোহন; ঐ কৃত্রিম আড়ম্বর সরিয়ে

বেদ উপনিষদকে বিকৃত করবেন ব্রহ্মোপাসনায়। আজকে যারা স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙে তৎপর হয়েছে তারাও জড় পৌত্তলিক, তারা ইতিহাস বোঝে না বলেই স্বীকার করে না, স্বীকার করে না ক্রমাভিব্যক্তি বা বিবর্তন বা বিপ্লব, ইভলিউসান বা রিভলিউ-সান, কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটির ক্রম-গুলো দেবনাদায়ক; গত সংস্কারের সঙ্গে সংগে তাকে কেটে ছিঁড়ে বের করা যায় না। বাংলা দেশে তথা সারা ভারতবর্ষে, আমি বলব, মানবসমাজে রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রাহ্মধর্ম শঙ্করের অথ তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই একটা ক্রম এবং আজকে ১৯৭০-এর বহু আলোকপ্রাপ্ত বঙ্গসমাজ বা ভারতসমাজের একটা ক্রম—কতকগুলো ভুলের বিন্দুক মালা নয়, অব্যাহত প্রাণ-প্রবাহের এক-একটা পর্যায়। আজই এই মুহূর্তে রাষ্ট্র শুকিয়ে গেল না বলে যারা কপাল চাপড়ায় তারা নৈরাজ্যবাদী এনার্কিস্ট; কয়েকটা বোমা মারলেই বা পিস্তল তুললেই প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যায় না। গুণ্ডার জীবনও শান্ত নয়, তার অন্তিমও সুখকর নয়।

কিন্তু মূল্যায়ন, আবার মূল্যায়ন, আবারও মূল্যায়ন, মানুষ ও সমাজের সচ্ছল উজ্জ্বল প্রদীপ্ত জীবনের লক্ষণ। বেদ, বেদান্ত বা উপনিষদের কত ব্যাখ্যা হয়েছে তার অন্ত নেই। গীতার কত ভাষ্য হয়েছে কে তার ঠিকানা রাখে? পুরাণে গল্পের আকারে তারা কতভাবে প্রবাহিত হয়েছে কে তার তালিকা করেছে? রামায়ণ, মহাভারত,—কতবার কতরকমে কত কথকতায়, যাত্রায়, নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, মনু, কৌটিল্য, চাণক্য নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা হয়েছে।

মার্ক্সবাদী, মাওবাদীরা যতই আস্ফালন করুন এবং সক্রেটিস-গ্যালিলিও নিধনের যত কসরবাজিই করুন, বিরাট-বিপুল জনসাধারণের অতি গভীরে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা দৃঢ়মূলে ছড়িয়ে আছে। হানাহানি ও জবরদস্তি গোলাগুলির দুষ্প্রবৃত্তি সত্ত্বেও এইসব গ্রন্থের বিক্রি ও প্রচার নাগাল পায় না এইসব আলোকপ্রাপ্ত প্রগতিবাদী নতুন পৌত্তলিকেরা।

অর্থাৎ, মূল্যায়ন, নব মূল্যায়ন, অপ-মূল্যায়ন যতই হোক যার যার মাহাত্ম্য ঠিকই আছে, থাকে এবং মানুষ বর্তমান প্রাগৈতিহাসিক অসভ্যকাল উত্তীর্ণ হলে তাদের সমাদর আরও বাড়বে—একমাত্র এই কারণে যে, বর্তমান মানুষ আন্তরিকভাবে অতীত-মুখী, অতীতেই তার বর্তমান পরিচয়। তাকে ফিরে ফিরে দেখতেই হবে, সে কে, কোথা থেকে এই চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে পা ফেলল; কিন্তু স্পেস-পরিক্রমার মূল টানটা আসবে এই মাটির পৃথিবীতেই।

শুনেছি, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত সব চাইতে অগ্রসর সমাজবাদী সোভিয়েট রাশিয়ায়ও অনূদিত, সমাদৃত। চীনে আজ লেফপন্থার দাহ্য হলেও ভবিষ্যৎ স্থিতিকালে পুনর্বাসন হবে, বৌদ্ধ কনফুসিয়াস চিন্তাধারারও পুন-র্মূল্যায়ন হবে বারে বারে। সভ্যতার প্রগতি এই নিয়মচক্রেই এগিয়ে যায়।

রামায়ণে কি আছে যে তা মহাকাব্য হল? সত্যরক্ষা, পিতৃসত্য রক্ষায় রাজ-সিংহাসনের প্রলোভন ছেড়ে বনবাস, বন-বাসে চরম দুঃখ ঘটল সীতাহরণে, সুগ্রীবের সখ্যে সখ্য, তারপর স্বর্ণলংকা জয়। তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, পাতাল প্রবেশ। আর কি আছে? সহোদর লক্ষ্মণ ও কাব্যে-উপেক্ষিতা ঊর্মিলা। সহোদর ভরতের জ্যেষ্ঠের পাদুকা রক্ষা করে রাজ্যশাসন ইত্যাদি। মহাভারতে কি আছে? ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্ব, মারাত্মক কুরুক্ষেত্র, তারপর সমূহ সর্বনাশের শ্মশানে পা ফেলে ফেলে মহাপ্রস্থান যাত্রা। আর কি আছে? —আছে যারা সংখ্যালঘু তাদের পক্ষে যদি ধর্ম থাকে, কৃষ্ণ সারথি বা যোগ্য নেতৃত্ব থাকে তো অক্ষৌহিণী সৈন্য পরাস্ত হয়, ধর্মের জয় হয়। কাফির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখে হো হো করে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সে-হাসির আয়ুও কাফির ধোঁয়ার মতই ক্ষণ-স্থায়ী। কতকগুলো এমন মৌলিক সত্য বা মানবিক বা সামাজিক সম্পর্কের চিরন্তনী থিতিয়ে যে থাকে সর্বকিছু ধোঁয়া-ধূলি হয়ে যাবার তলায় সংশয়ী তা কানাচোখে দেখতেও পায় না।

তবু সংশয়ী, নাস্তিক, নব নব ভাষ্য-কারেরা সাহিত্যসমাজের অপরিহার্য কল্যাণেরই উদ্গাতা। বাল্মীকির রামায়ণ, রামচরিতমানস, কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে সোজা যদি আমরা বিদ্রোহী খৃস্টানধর্মী মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যে আসি, সেখানে পাই মানব-সভ্যতার সাহিত্য-সমৃদ্ধিরই উপকরণ, অগ্রাহ্য করবার অনাদর করবার তো নয়। পয়ারের মল না বাজিয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যঞ্জনামাত্রও নয়। কেন প্রশ্ন হবে না স্বর্ণলংকার মর্মকথা সম্পর্কেও—ধ্বংসের আর একটা দিকও? অশোক কাননে বন্দিনী সীতা নিঃসন্দেহে করুণার পাত্রী, কিন্তু লংকাধিপতি দশবাহু রাবণের সংযমও তো অনুপেক্ষণীয় নয়? এবং—সর্বোপরি আক্রান্ত লংকার অধিবাসীদের দেশপ্রেম, শৌর্য, বীরবাহু—শ্রদ্ধা করবে না মানুষ? স্বীকার করবে না মেঘনাদের অতুলনীয় বীরত্ব? বিভীষণ, কুইসলিং, রুশ-চর, চীনা-চর, সাম্রাজ্যবাদী সখা খাল কেটে কুমীর আনলে সে-ই থাকবে চিরসত্য হয়ে? মেঘনাদ বধ-এ রামায়ণ ক্ষুন্ন হয়েছে একথা যাঁরা বলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি, রামায়ণ তারই মাহাত্ম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখান থেকে তাকে অপসারণ করে এমন সাধ্য কারও নেই; কিন্তু 'মেঘনাদ বধ'ও তার স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল, সেখানেও অনস্বীকার্য চিরন্তনী মাহাত্ম্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। রামচন্দ্রের লঙ্কা জয়ে মধুসূদন রামায়ণের রেখায় রেখা টানলেন না, কনফর্ম করলেন না, এইটি কি কথা? —না, তাঁর শিল্পকর্মে মেঘনাদের মত একটি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বিভীষণের মত একটি দেশদ্রোহী এবং আপসহীন সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করে অকুণ্ঠ পদচারী রাবণের চরিত্র কোন ছোট কথা?

নির্বোধ শিখা-নাড়া দলে ভিড় বাড়ালে বিদ্যাসাগর মহত্তর হতেন, না, শাস্ত্রসমুদ্রের রত্ন-মন্থনে লব্ধ মানবিক শাস্ত্র-রত্নোদ্ধারে তিনি ছোট হয়েছেন? আজকের প্রগতি-বাদীদের কাছে বাল-বিধবার করুণ আর্ত-নাদ বা বহু-বিবাহের যন্ত্রণা তুচ্ছ বা সামান্য, হয়তো বা প্রতিক্রিয়াশীল—কেন না, একেবারে আদিকালের হেড হান্টার-দের মতো এইসব গ্রন্থ, শঙ্কর, রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়কের আলেখ্য ভাঙার খেলায় মেতেছে তারা, নতুন এক দেবতাকে, দেবতার চিত্রপটকে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে। এইসব কালা-পাহাড় এক সম্প্রদায়ের বিগ্রহমন্দির ভেঙে আর এক সম্প্রদায়ের প্রার্থনাভবন গড়ছে এবং অজান্তেই তাদের নর্মমন্দিরে ও চিত্রে নতুন দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা করছে। করুক। কিন্তু এই অর্বাচীন কুতর্কেরা জানে না যে, আজকে তাদের পায়ের নিচে লাফাবার যে মাটি, যে ভিত,

তা বিদ্যাসাগরের মতো প্রতিক্রিয়াশীলেরাই তৌর করেছেন; নইলে এখনও তাদের সেকালের আবদ্ধ জলাশয়ে হাবুডুবু খেতে হ'ত। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবদ্দশায়ই এত অপরিমেয় যন্ত্রণা সহ্য করেছেন যে, আলেখ্য-ভঙ্গের খবর যদি তাঁর কানে পৌঁছনো যেত, হাসতেন। হয়তো বা যে-হৃদয়বত্তা বিদ্রোহী মধুসূদনকে মায়ের মত রক্ষা করেছে, তা এদেরও অনায়াসে ক্ষমা করত। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বিতর্ক সেকালেও বিদ্যাসাগরকে খাটো করতে পারে নি, একালেও পারবে না; বিদ্যাসাগর যে বিতর্কের একটি বিষয়, এইখানেই তাঁর অম্লান মাহাত্ম্য।

সমাজে ও সাহিত্যে কালাপানি পারাপারের পাপমুক্ত হয়েছি আমরা অনেককাল; ঘরে এনেছি বিদেশিনী বধূ; অস্পৃশ্যতাকে শুধু নোংরামীর মধ্যে রেখেছি, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। সাগর পার হলে বা জেলে গেলে প্রায়শ্চিত্তের প্রকাণ্ড কাণ্ড এখন বরং অগৌরবেরই। আজকের সামাজিক মানুষ বা সাহিত্যিক হয়তো জানেনও না কখন কোন্ বিতর্ক, বিদ্রূপ, লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে এ সত্য হয়ে উঠেছে।

সুতরাং, বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে যদি বিতর্ক হয়ে থাকে এবং আজও হয়, তবে বুঝতে হবে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি, ব্যক্তিত্বের ও শিল্পকর্মে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলা আছে, যা বুঝে নেবার জন্য লোকের আগ্রহের সীমা নেই। বন্দেমাতরম্/আনন্দমঠ লেখা সত্ত্বেও তিনি কতখানি ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, সে তাঁর ব্যক্তি, ব্যক্তিত্বের কথা; তাঁর সাহিত্য, শিল্পকর্ম তাতে কুণ্ঠিত হয় না। যদি প্রশ্ন ওঠে, তাঁর দুর্গেশনন্দিনী আইভান হো-র প্রতিধ্বনি, তৎক্ষণাৎ তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির ওপর দৃষ্টিপাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমি কখনো তাঁদের দলে নই, যাঁরা ব্যক্তিকে শিল্পকর্ম অথবা শিল্পকর্মকে আলাদা করে দেখেন। শিল্পকর্ম ব্যক্তিকে জড়িয়েই যেমন সমগ্রভাবে বুঝতে হবে, ব্যক্তিকেও তেমনি তাঁর কর্মক্রিয়া, এক্ষেত্রে, সাহিত্য-শিল্পকর্ম দিয়ে বুঝতে হবে। এ দু'টি মিলিয়ে এক অখণ্ড সত্তা, একটা ছাড়িয়ে বা বাদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করার অর্থ খণ্ড করে বোঝা, অসম্পূর্ণ করে বোঝা, অথবা ওটা মোটে বোঝাই নয়।

আরও একটি কথা। কে বুঝবে, কোথা থেকে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝবে এটিও একটি বোঝাবুঝির ভিত্তিগত কথা। ম্যাথু আর্নল্ড যেখানে বলছেন—পার্সোনাল এস্টিমেট, হিস্টরিকাল এস্টিমেট ও রিয়াল এস্টিমেট, সেখানে আমি একমত নই। অথবা আমি জিনিসটা এভাবে বুঝি:

এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে বুঝবেন; ধরে নিচ্ছি, ব্যক্তির শিল্পকর্ম বা কীর্তিকেও বুঝবেন। যে ব্যক্তি বুঝবেন, তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধিশক্তি প্রথম কথা; যাঁকে বুঝতে যাবেন, তাঁর ওপর বিচারকের বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি আলোকপাত করে। অর্থাৎ, তিনি তাঁর ছাঁচেই তাঁর নায়ককে বুঝবেন, বোঝাবেন। এ সোজা কথা নয়। যাঁকে বুঝতে হবে, তাঁর সমপর্যায় শুধু নয়, আরও একটু ওপরে ওঠা চাই, সাধারণ চোখ নয়, এক্স-রে চোখ চাই। সুতরাং, ব্যক্তিকে ব্যক্তির বোঝাবুঝি যিনি বুঝতে যাচ্ছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পরিবেশটাই প্রথম কথা, সেটিই ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ। বিজ্ঞানও এই কথা বলে। ফলে অবস্থিতি অনুসারে দৃষ্টিকোণ স্থির হয়। একই হলের মাঝখানে একখানি চেয়ার চারদিক থেকেই সব লোকে এক দৃষ্টিকোণ (angle of vision) থেকে দেখতে পারে না। রিপোর্টারদের মধ্যেও দেখা যায়, একই ঘটনা সবাই এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। একইভাবে লেখে না। একই এমফ্যাসিস দেয় না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের এস্টিমেট একান্তভাবে যিনি করবেন, তাঁর নিজস্ব জীবনের এস্টিমেটটা অনুপেক্ষণীয় নয়; কেন না, তারই ওপর নির্ভর করবে ব্যক্তিগত এস্টিমেট। আমার এটি ব্যক্তিগত অভিমত এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিটি এই—একথা বলা বড় সোজা নয়। আমার জীবনের যেমন অভিব্যক্তি, এমন কি ক্রমাভিব্যক্তি বা বিবর্তন আছে, যে ব্যক্তির এস্টিমেট করতে যাচ্ছি, তাঁরও অভিব্যক্তি, ক্রমাভিব্যক্তি বা বিবর্তন আছে। পার্সোনাল এস্টিমেটের ভিত্তি হবে তাই।

দ্বিতীয়ত, হিস্টরিকাল এস্টিমেট ও রিয়াল এস্টিমেটের মধ্যে পার্থক্যটা কি? হিস্টরিকাল এস্টিমেটটাই রিয়াল এবং রিয়াল এস্টিমেটটাই হিস্টরিকাল। অর্থাৎ, এ বোঝাবুঝিটা হচ্ছে, বিনয় সরকারের ভাষায়, এ সমঝোতা হচ্ছে, যথাযথ পটভূমিকায়, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কনটেক্সটে। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট এবং বঙ্গদর্শন প্রসাদে সাংবাদিক হয়েও, তৎকালীন শাসকশ্রেণীর সুরে সুর মিলিয়ে যদি বলে থাকেন, দেশে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্র বহুলাংশে দায়ী, তবে তা ঐ তাৎকালিক পটভূমিকায় দেখতে হবে। আমি এই কালের দূরত্বে দাঁড়িয়ে যদি তাঁর সে আচরণের নিন্দা করি (সেকালেও অমৃতবাজার পত্রিকা করেছিলেন) তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সেইটেই শেষ কথা হবে না। ওটা বঙ্কিমজীবন অভিব্যক্তির একটা দিক, একটা ক্ষণ, একটা কাল, একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা।

আর যদি যথাযথ হিস্টরিকাল পটভূমিকায় কাউকে, কারও *শিল্পকর্মকে, কীর্তিকে, কর্মকাণ্ডকে বিচার করা যায় বা হয়, তবে তাই তো হবে রিয়াল বা* আমাদের ব্রহ্মবাদীদের ভাষায় সৎ, আর সবই অসৎ বা অবিদ্যা বা আভাসিত মাত্র, প্লেটোর ছায়া মাত্র। বর্তমান বিজ্ঞানও তাই বলে, বলে—যা তোমার দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, আভাসিত, তা আসল বস্তু নয়, আসল বস্তু এদের আড়ালে—সেই চঞ্চল অণু-পরমাণু। হিস্টরিকাল সত্যে পৌঁছনো অর্থই সেই রিয়াল সত্যে, রিয়াল এস্টিমেটে পৌঁছনো। সমালোচকের এই গুরু-দায়িত্ব; এই বাহ্য এই বাহ্য করতে করতে গভীরে, আরও গভীরে যেতে হবে।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুকে নিয়েও বিতর্ক ওঠে, রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। সাহিত্যেও তার রঙ পড়ে। কিন্তু সেই শিল্পকর্মে যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের জবরদস্তি চলে তখনই ইলিয়া এরেনবুর্গের মতো কনফর্মিস্টকেও বিদ্রোহ করতে হয়।

এস্টিমেটের ক্ষেত্র থাকবে অবাধ, নিরঙ্কুশ। সেখানে ব্যক্তি আসে, ইতিহাস আসে, সত্য আসে। এ তিনের যেখানে সমন্বয় হয় না, প্রায়ই হয় না, তখনই তো বিতর্ক বাধে। আজ চার শ' বছর ধরেও যদি শেক্সপীয়ারকে নিয়ে নানা বিতর্ক চলে থাকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তো মাত্র ১০৯ বছরের শিশু। আন্দাজ ৬০।৬৫ বছর একনাগাড়ে বিস্তর লিখে গেছেন—কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। বিস্তর। তাদের মূল্যায়ন শেষ হয়ে গেছে?

চেষ্টা চলেছে তাঁকে তাঁর কোন একটি কবিতা বা কোন একটি লেখা নিয়ে বোঝবার। হাস্যকর। যদি আগাগোড়া সকল লেখায় একটা সূত্র থাকে, তা যেমন বিস্ময়কর, যদি না থাকে তাও বিস্ময়কর। কিন্তু সত্য, রিয়াল, হিস্টরিকাল এবং পার্সোনাল এস্টিমেট, এই দুই সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য, দুইয়ের বৈপরীত্য নিয়েই, একটিকে নিয়ে নয়।

এই সুদীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা সেই বিদগ্ধ ব্যক্তিগোষ্ঠীদের বুঝে নেবার জন্য যাঁরা পরোক্ষে বলতে চাইছেন, আর তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অবিরাম ঘ্যানঘ্যানানী ভাল লাগে না, ভালো লাগছে না লোকের; ও'র সম্বন্ধে কি শেষ কথা আজও হয় নি? বিরক্ত ব্যক্তিদের অনুকূলে এইটুকু বলা যায় যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যদি কাউকে শুধু লিকুইড দুধের ডায়েট দেওয়া হয় এবং দিনের পর দিন চলে, শরীরে অপারগ হলেও সজ্ঞান রোগীর চিত্তও বিদ্রোহ করে ওঠে। সুস্থ শরীরেও প্রতিদিন এক মেনু দেখলে মন বিরূপ

"এই দুর্দিনে বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি! ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অনেক কাটছাঁট করতে হয়। আর এর পুরো ঝক্কিটাই মেয়েরা নিয়ে নেন নিজেদের ওপর—হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে অথবা একেবারে ছেঁটে ফেলে। কিন্তু শরীর মাটি ক'রে এই ব্যয় সংকোচ পরিণামে ভালো হয় না। সেইজন্য বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে আমিও বোর্নভিটা খেয়ে নিই। একচুমুকে ক্লান্তি দূর হয়, বেশ ঝরঝরে লাগে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

হতে পারে, তেমনি যদি সারাক্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতই শুধু শুনতে হয়, তবে অতি ভক্তেরও 'অনীহা' আসতে পারে। কিন্তু সে কি রবীন্দ্রনাথের, না, পরিবেশকের দোষ? আসলে সাহিত্য [illegible] নয়, রবীন্দ্র-নাথও একক নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, ব্যাপ্তি [illegible] মনে অস্পষ্টতার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু যা সত্য, তা অনস্বীকার্য এবং দেখেছি, ব্যক্তিগত বুদ্ধি-মেধার ওপর যখন বোঝাবুঝি নির্ভর করছে, তখন বিতর্কের অবকাশ থেকেই যাবে। আরও একটা সোজা কথা এই যে, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য না পড়ে, রবীন্দ্র-জীবনী না জেনে এবং রবীন্দ্রকালকে না উপলব্ধি করে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক তোলেন, তাঁদের যাঁরা আমল দেন, তাঁরাও সমবোধসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, এইসব তার্কিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, একমাত্র তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কেই যে অসংখ্য বই বেরিয়েছে, তার খোঁজও হয়তো রাখেন না, রাখলে হয়তো তাঁদের এই নবতর আয়াস বা প্রয়াস অকারণ পুনরাবৃত্তি অবান্তর ও পণ্ডশ্রম মনে হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ চিত্রও আঁকতেন, কেউ কেউ তা নিয়ে কিছু কটু মন্তব্যও করেছেন, সেটা তাঁর অভিরুচি: আমিও তাঁর বহু চিত্র উপলব্ধি করতে পারি নি। কিন্তু এ বুঝেছি, এও রবীন্দ্রনাথের একটা দিক, যা আমার বোধগম্য না হলেও আর কারও সহজবোধ্য হয়েছে। আমার বোধেরও একটা সীমা আছে। কিন্তু তাই বলে আমার এই অবোধ মনের মানদণ্ডে যদি রবীন্দ্র-নাথকে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকর্মকে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে বিচার করতে বসি, সে কি সুবিচার হবে, না, আমারই অজ্ঞতা প্রকট হবে?

সম্প্রতি দেখছি, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উপলক্ষ করে অনেক ধুলিঝঞ্ঝা উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' কবিতাটি নিয়েও এককালে এত ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য ঘটেছিল, শেষে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথকেও বিতর্কের প্রাঙ্গণে নেমে স্বস্তি-বাচন উচ্চারণ করতে হয়েছিল। এমনি হয়েছে তাঁর আরও অনেক কবিতা, অনেক উক্তি নিয়ে, অনেক গল্প, উপন্যাস নিয়ে। মাঝে মাঝে কবিকেও নেমে আসতে হয়েছে সেই তর্কের আসরে। আমি অবশ্য সে দলের ভক্ত নই, যাঁরা তাঁর ব্যাখ্যাকেই শেষ চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বলে মেনে নেবেন; মানলে, আমরা সেই হিস্টরিকাল রিয়াল এস্টি-মেটের সূত্রগুলো ঘুলিয়ে ফেলব। রবীন্দ্র-নাথ নিঃসন্দেহে সচেতন লেখক, কিন্তু যেভাবে তার পরিবেশ তাঁকে তৈরি করেছে, সেইভাবে সচেতন, তাঁর চেতনার বাইরেও যে বৃহৎ জগৎ রয়েছে, তার প্রভাব তাঁর সৃষ্টিকর্মে কিভাবে এসে পড়েছে তা তাঁর জানবার কথা নয়। তার আবিষ্কারক হবে সমালোচক। একমাত্র তিনিই পার্সোনাল, হিস্টরিকাল, রিয়ালকে অখণ্ড করে দেখাতে পারবেন। স্রষ্টা যেখানে সাবজেকটিভ, সমালোচকও সেখানে সাবজেকটিভ, কিন্তু তারও কিছু অতিরিক্ত—অবজেকটিভ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক তাঁর জীবদ্দশায় হয়েছে, কখনো খুশি হয়েছেন, কখনো বিরক্ত হয়েছেন, জবাব দিয়েছেন নম্রভাবে, তীক্ষ্ণ শ্লেষেও। আজ সেই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থিতি নেই, তাঁর সৃষ্টিকর্ম রয়েছে। আজ প্রায় বছর ত্রিশেক তিনি নেই। কিন্তু শতবর্ষ পরেও তাঁর পাঠক আছে। এককালে যাঁরা তাঁকে বুর্জোয়া বলে বর্জনের আন্দোলন করেছিলেন এবং একটি প্রদীপকে সমসূর্য করেছিলেন, তাঁদের অতিক্রম করেও তাঁর পাঠক অগণিত। বিরক্তিভরে যাঁরা প্রশ্ন করতে সাহস পান, তাঁদের 'নেতি' 'নেতি'র মধ্যেই তিনি সমগ্রতায় পরিস্ফুট হয়ে উঠবেন। যে বিতর্কের ধুলিঝঞ্ঝা এখন চলছে, তা থিতিয়ে গেলে তাঁদের বক্তব্যের পরিধি মেপে দেখতে চেষ্টা করব। শুধু বলি, একটিমাত্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে পরি-মাপের অর্থ গোষ্পদের জলে সূর্যকে পরিমাপ করা।

অচলাবস্থা—

উদ্বাস্তু আগমন প্রসঙ্গে

সাগর বিশ্বাস

দেশ বিভাগের সংগে সংগে বাংলা দেশ ও বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে বেদনার ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই ক্ষতস্থান থেকে আজও সমানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সেদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রবক্তারা এবং ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটি জাতির জীবন কলমের এক খোঁচায় দ্বিখণ্ডিত করে যে পাপ করেছিলেন, বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের রক্তে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। পূর্ব বাংলা থেকে ১৯৫০ সালের সেই ঐতিহাসিক উদ্বাস্তু আগমনের পর উদ্বাস্তু আগমনের স্রোতে যে সামান্য ভাটা পড়েছিল, ১৯৬৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাংগার পর তার গতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে উদ্বাস্তু আগমনে নতুন জোয়ার এসেছিলো। আগের পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে সীমান্ত বন্ধ করে দেবার ফলে মানুষের এপার-ওপার হওয়া একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেলো। সীমান্তে তখন আয়ুব খানের সেনাবাহিনী বন্দুক উঁচিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু পথ রোধ করা যায় নি। আইনের কড়া অনুশাসন আর বন্দুকের উন্মুখ লোহ-নালিকা অগ্রাহ্য করে শত শত মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেছে।

সম্প্রতি পূর্ব বাংলা থেকে নব-পর্যায়ে পশ্চিমবংগে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়েছে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবংগে এসে উঠেছে। এ যাবৎ আমরা দেখেছি, যখনই পূর্ববংগে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ওখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার অভাব বোধ হয়েছে, তখনই সীমান্তে উদ্বাস্তুর চাপ এসে পড়েছে। কিন্তু ১৯৭০ সালে পূর্ববংগে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় নি। সংবাদে দেখা যাচ্ছে এখনও প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিনশত উদ্বাস্তু পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবংগে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এ পর্যন্ত সত্তর হাজার উদ্বাস্তুকে বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। চব্বিশ হাজারের মত মানুষ এখনও হাসনাবাদ-বসিরহাট সীমান্ত এলাকায় আকাশের ছাদ মাথায় করে সদাশয় ভারত সরকারের বদান্যতার আশায় প্রহর গুণছে। এই প্রহর গুণতে গুণতে, বন্যা, কলেরা, অনেকেরই জীবনের শেষ প্রহর সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, পঞ্চাশজন উদ্বাস্তু ইতিমধ্যে কলেরায় মারা গেছে (হায়, ওরা বাঁচতে এসেছিল!)। হাসনাবাদ থেকে যখন এদের রেলগাড়িতে তুলে দেওয়া হয় এবং বারাসাত জংশনে যখন সেই গাড়ি থেকে নেমে ওরা প্লাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ে তখনকার দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝা যায় না—উদ্বাস্তু জীবন কি। আমি নিজে এ দৃশ্য অনেক দেখেছি। সম্প্রতি এদের মধ্যে অনেকটা সময়ও ব্যয় করেছি ঘুরে ঘুরে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আজ কোন হাঙ্গামা না হওয়া সত্ত্বেও এই উদ্বাস্তু স্রোত কেন?

একটা কথা আমরা সকলেই জানি যে, স্বাধীনতার পরে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্তানে উপযুক্ত নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা সকলে জানি না যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্না একটি বেতার ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, "আপনারা আজ স্বাধীন। মন্দির, মসজিদ এবং পাকিস্তানের যে-কোন উপাসনার স্থানে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের আছে। আপনারা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, যে-কোন ধর্মাবলম্বী হোন না কেন, তাতে আমরা যে পাকিস্তানের নাগরিক এই মূল নীতির কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। আমার মনে হয় এবং আপনারাও দেখবেন একদিন আমাদের এই নবলব্ধ রাষ্ট্রে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না। সেটা অবশ্যই ধর্মীয় দিক থেকে নয়, কারণ ধর্ম হলো মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। সেটা সম্ভব হবে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে; আমরা প্রত্যেকেই পাকিস্তানী।" অপরদিকে ভারতের কংগ্রেস সরকার সেই সময় এক বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের চাকুরী স্থানান্তর করার জন্য Option চেয়েছেন। এর ফলে বহু উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বিশেষত ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলসের সকল বিভাগের সমস্ত হিন্দু অফিসার পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে চলে এলেন। পূর্ব বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঘটনা দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো এবং তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলেন। শুরু হলো উদ্বাস্তু আগমন। কিন্তু এহো বাহ্য। ১৯৪৮ সালে মহম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা যাঁদের হাতে এসে পড়লো তাঁরা জিন্নার দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হলেন এবং ধীরে ধীরে মোল্লাতন্ত্রের হাতে মর্টগেজড্ হয়ে গেলেন। ফলে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বার বার তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। এবং একদিন পাকিস্তানী নেতারা পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছেন। জানি না মহম্মদ আলী জিন্নার কবরের মাটি সেদিন আচমকা কেঁপে উঠেছিল কিনা।

ভারতীয় নেতারাও প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, "রাজনৈতিক সীমান্ত সৃষ্টির ফলে আমাদের যেসব ভ্রাতা ও ভগ্নীর সংগে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং যাঁরা বর্তমানে এই নবলব্ধ স্বাধীনতার অংশীদার হতে পারছেন না তাঁদের কথা আমরা চিন্তা করছি। তাঁরা আমাদেরই আপনজন এবং যা কিছুই ঘটুক না কেন তাঁরা আমাদের আপনজন থাকবেন এবং আমরা তাঁদের সুখ-দুঃখের সমভাগী থাকবো।"

ওই বছরেই ১৫ই [illegible] তারিখে গান্ধীজী বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি যদি সে দেশের সরকার বিদেশিকের মত ব্যবহার করেন তবে তাঁদের পক্ষে সেখানে বাস করা সম্ভব নয়। "ভারতীয় ইউনিয়নের প্রদেশসমূহে এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীকে সাদরে আশ্রয় দেওয়া ও সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত সুবিধা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। তাঁরা যেন অনুভব করেন যে, তাঁরা কোন অপরিচিত দেশে আসেন নি।"

গান্ধীজী এ পর্যন্ত বলেছিলেন, যে সকল হিন্দু পাকিস্তানে তাঁদের সম্পত্তি ফেলে রেখে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হবেন, স্বাধীন ভারত সরকার তাঁদের সেই সম্পত্তির পূর্ণ মূল্য তাঁদের দান করবে।

১৯৫০ সালেও নেহরু পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বললেন, "পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় আমাদের নেই। কিন্তু পাকিস্তানের বহু নরনারীকে অবর্ণনীয় দুঃখ ও নির্যাতন ভোগ করতে দেখেও আমরা উদ্বেগ বা সমবেদনা বোধ করব না, এমন কথা বলা সম্পূর্ণ নিরর্থক।"

খুবই দুঃখজনক এবং লজ্জাকর হলেও এই নেহরুর মুখেই পরবর্তীকালে উচ্চারিত হলো, "পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সেটা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমরা বহন করতে পারব না।... ... ভারত সরকার কিংবা কোন সর্বভারতীয় নেতা কোন সময় এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব আমরা অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বহন করব। এটা অসম্ভব ব্যাপার।" (পার্লামেন্টে বক্তৃতা, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৭)।

বিশ্বাসভঙ্গের এর থেকে বড় নজীর আর কি থাকতে পারে?

১৯৫৮ সাল থেকে ভারত সরকারের পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার চক্রান্তে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মাইগ্রেশন পাওয়া কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। মাইগ্রেশনের আবেদনকারীর সামনে দুটো শর্ত তুলে ধরা হলো: (১) আবেদনকারীকে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে যে, ভারতে গিয়ে তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য নেবেন না, (২) আবেদনকারীর ভারতস্থ কোন আত্মীয়-স্বজনকে ঘোষণা করতে হবে যে, ভারতে আবেদনকারীর পরিবারের জীবনধারণের সকল ব্যয়ভার তিনিই বহন করবেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শর্তসাপেক্ষে একটি অন্ধকার অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ানো সহজসাধ্য নয়। এই ঘটনায় পূর্ব বাংলার অগণিত হিন্দু নরনারীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু, পুনর্বাসনমন্ত্রী খান্না এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সেদিন বিশ্বাসভঙ্গের যে নজীর সৃষ্টি করলেন স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পাক-ভারতের ইতিহাসে তা বঞ্চনার অদ্বিতীয় নজীর হয়ে রইল।

এর পর আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা বসালেন পাকিস্তানের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী জঙ্গী শাসনকর্তা আয়ুব খান। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জব্দ করবার জন্য তিনি দুটো কুখ্যাত আইন প্রস্তুত করলেন। তার একটি হলো, মাইনরিটি প্রপার্টি এ্যাক্ট এবং অপরটি এনিমি প্রপার্টি এ্যাক্ট। মাইনরিটি প্রপার্টি এ্যাক্টের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁদের সম্পত্তি বিক্রয় করবার নৈতিক অধিকার হারালেন আর এনিমি প্রপার্টি এ্যাক্টের বলে বহু হিন্দু-সম্পত্তি আয়ুব সরকারের করায়ত্ত হলো। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে যখন আয়ুব খানের অশুভ আবির্ভাব ঘটেছিল তখন আমি পূর্ববঙ্গেই ছিলাম। দেখেছি কত হিন্দু বণিকের অপরাধের বিচার হয়েছে সামরিক আদালতের খেয়ালীপনার মানদণ্ডে। অপরাধ যত লঘুই হোক না কেন কিংবা নাই বা থাকলো অপরাধ—সামরিক পুরুষদের বেত্রাঘাতের নির্মমতার মাত্রা তাতে হ্রাস হয় নি! ভারতে তৈরি কাপড়চোপড় কারো ঘরে থাকলেও সামরিক বিচারে তাকে দেশদ্রোহী হিসাবে বেত্রাঘাত করা হতো। কখনো কখনো এই অত্যাচারের মাত্রা এমনভাবে সহনশীলতার মাত্রা অতিক্রম করতো যে, অনেকে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হতেন। এমনি মামলা করতে দেখেছি ঢাকা জুট কোম্পানীর শ্রী এইচ· বি· নোপানীকে, খুলনার বিখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী শ্রী জে· এল· দত্তকে। এমনি আরো অনেকে করেছেন। আদালতে কেউ হেরেছেন, কেউ জিতেছেন। সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সেই জটিল সন্ধিক্ষণে এটা অনেকেই আশা করেছিলেন যে, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলি নিশ্চয়ই নিন্দিত হবে। কার্যত কিন্তু দেখা গেল একদা যাঁদের চোখে মহম্মদ আলী জিন্না হিরো ছিলেন, তাঁদের চোখেই আয়ুব খান ধীরে ধীরে হিরো হয়ে উঠলেন (পূর্ব-পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তখনও দানা বেঁধে ওঠে নি)। কিন্তু এহো বাহ্য। কয়েক বছর পরে তাঁদেরই দেখলাম দেওয়াল থেকে আয়ুবের [illegible] [illegible] [illegible]মূর্তিকে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে। সেদিনই বুঝেছিলাম মানুষের আত্মা জাগছে, আর এ আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করবে না।

তবু আত্মতৃপ্তি কোথায়? দিনের পর দিন যে একশ্রেণীর মানুষকে তাঁদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হলো, এমন কি বারবার যাদের গরু-খেদা করে সীমান্তের এ পাশে ঠেলে দেওয়া হলো, সেই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমতের কণ্ঠ সোচ্চার হলো কই? পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে, সাহিত্য ও সংগীতচর্চার স্বাধীনতা আদায় করেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র-স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে, এমন কি প্রতাপশালী ডিক্টেটর আয়ুব সরকারের পতন ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু পারে নি পাকিস্তান সরকারের চিরাচরিত সংখ্যালঘু-বিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংহত করতে। এ কথা দুঃখের হলেও সত্য। আজ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার হিন্দু নরনারী সীমান্তের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করছে। প্রতিদিন প্রায় তিনশত পরিবার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত এলাকায় এসে দাঁড়াচ্ছেন। কিছুদিন ধরে আমি নিজে এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপৃত ছিলাম। তার জন্য বহুবার এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, সীমান্তে ছুটে গেছি কয়েকবার, সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। অনুসন্ধানের ফলে যে কারণগুলি আমার চোখে ধরা পড়েছে, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ তুলে ধরছি:

(১) পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সরকার পূর্বতন আয়ুব-সরকার প্রচলিত মাইনরিটি প্রপার্টি এ্যাক্ট তুলে নেওয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামনে জমিজমা বিক্রয় করবার একটা সুযোগ এসেছে। অনেকে এই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতে চলে আসার ব্যবস্থা করছেন।

(২) পাকিস্তানের সর্বত্র অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং খাদ্যমূল্য যে হারে বেড়ে চলেছে সেই হারে মানুষের মজুরী বৃদ্ধি হয় নি। শুধুমাত্র দিনমজুরী যাদের পেশা, তাদের মজুরী অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায় জীবন অনেকটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই কারণে যে সকল উদ্বাস্তু সম্প্রতি চলে আসছেন তাঁদের মধ্যে সর্বহারার সংখ্যা প্রচুর। এঁদের মধ্যে কিছু কিছু মুসলমানও চলে আসছেন বলে শুনতে পেয়েছি। কারণ ওই অর্থনৈতিক সংকট।

(৩) গ্রাম্য দলাদলি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অত্যাচার, ব্যক্তিগত রেষারেষির ফলেও অনেককে চলে আসতে হচ্ছে।

(৪) দাঙ্গাঘটিত সমস্যাজনিত ভীতি বা নিরাপত্তার অভাববোধ অনেককে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য করছে।

(৫) আগামী অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা। পাকিস্তানের সর্বত্র এখন তাই নির্বাচনী প্রচারের মত্ত হাওয়া। প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলি জানে, এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কোনক্রমেই তাদের বাক্সে ভোট দেবে না। সেইজন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা চলছে বিভিন্ন ধরনের উপদ্রবের মাধ্যমে। সংখ্যালঘুরা যত চলে আসবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির ততই ক্ষতি। আর নির্বাচনে প্রগতিশীলদের ক্ষতি মানেই প্রতিক্রিয়াশীলদের লাভ।

(৬) পূর্ব পাকিস্তানকে জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যালঘু এলাকায় পরিণত করার পশ্চিম পাকিস্তানী চক্রান্ত। অথচ পরিতাপের বিষয় হলো প্রতিক্রিয়াশীলদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠে কোন ধিক্কার নেই। প্রতিরোধ করবার চেষ্টা ত' দূরের কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ কি কিছুই করছে না? উত্তরে জানতে পেলাম, না, তেমন কিছু করবার সুযোগও নেই। কারণ গ্রামাঞ্চলে ছাত্রসমাজের প্রভাব এবং কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত নয়। অথচ এই সমস্ত অন্যায় উপদ্রবগুলি প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই ঘটছে এবং আজ যারা সীমান্ত পেরিয়ে এ পাশে চলে আসছে তারা প্রায় সবাই গ্রাম্য মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, গ্রামাঞ্চলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীরাও কি নেই? গ্রামের মানুষের ওপর তাঁদের কি কোনই প্রভাব নেই? যদি না-ই থাকে তবে তাঁরা আর কিছু না পারেন চীৎকার করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও কি পারেন না? অথচ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের অনেক দফা কর্মসূচী, অনেক দফা বড় বড়

দুটি বিশিষ্ট প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় আওয়ামী পার্টির যথাক্রমে ৬-দফা কর্মসূচী এবং ১১-দফা দাবির বিষয়গুলো সামনে রাখছি।

আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচীঃ

(১) পাকিস্তানের সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়, সরকার পার্লামেন্টারী এবং আইনসভা হবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলি প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্রীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

(৩) (ক) পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্য সহজে বিনিময়যোগ্য আলাদা মুদ্রাব্যবস্থা থাকা উচিত; অথবা, (খ) পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন সরাবার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাসহ একই মুদ্রাব্যবস্থা।

(৪) কর এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা রাজ্যগুলির থাকবে; রাজ্য থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের একটি অংশ কেবল কেন্দ্রীয় সরকার পেতে পারেন।

(৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব থাকবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রয়োজন দুই পাকিস্তান সমানানুপাতে মেটাতে পারে।

(৬) প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী এবং একটি সামরিক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানেই স্থাপিত হবে।

জাতীয় আওয়ামী পার্টির ১১-দফা দাবিঃ

(১) শিক্ষা-প্রসার, ছাত্র-বেতন হ্রাস, সরকারী সাহায্যপুষ্ট ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবহনের ক্ষেত্রে ছাত্র-কনসেশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্ট বাতিল।

(২) ব্যাঙ্ক, বীমা এবং বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।

(৩) কর এবং ভূমিরাজস্বের হ্রাস।

(৪) শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরী ও বোনাস।

(৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

(৬) সমস্ত নিরাপত্তা আইন এবং নিবর্তনমূলক আদেশ প্রত্যাহার।

(৭) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি।

(৮) সিয়াটো, সেন্টো থেকে পাকিস্তানের অপসারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বাতিল।

(৯) প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র।

(১০) স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

(১১) বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুর জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

লক্ষণীয় যে, এই সকল কর্মসূচী বা দাবিপত্রে সবই আছে, নেই কেবল পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথা, যে প্রশ্নটি স্বাধীনতার পরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিরাট বিতর্কিত এবং বহু আলোচিত সমস্যা হয়ে আজও টিকে আছে। আমি জানি, এক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্ন উঠবে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য যা যা প্রয়োজন, সমস্ত দাবি জানানো হয়েছে। এর ফল মেজরিটি, মাইনরিটি সকল সম্প্রদায়ই তো ভোগ করবে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন তোলাটাই একটা বিরাট সংকীর্ণতার পরিচায়ক। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই এটা সংকীর্ণতা, অন্তত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা এতে নেই। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে এ প্রশ্ন অবান্তর হতে পারে যদি সেই রাষ্ট্র কোন ধর্মনিরপেক্ষ এবং শ্রেণীসমন্বয়বাদী রাষ্ট্র হয়। পাকিস্তানের মতো একটি ইসলামী রাষ্ট্রে, যেখানকার সংখ্যালঘুদের সমস্যার কথা বিশ্বব্যাংক, এমন কি রাষ্ট্রসঙ্ঘ পর্যন্ত জানে, সেখানকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দাবিপত্রে এই সমস্যার কথা থাকলে তা সংকীর্ণতা হতে পারে না। কারণ এটা সেখানকার একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা।

তাছাড়া প্রগতিশীল নেতারা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গলামঙ্গল বা লাভালাভের কথা বলেন না এমনও তো নয়। এই তো কয়েকমাস আগে জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানী আমেদাবাদে মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার প্রতিবাদে সারা পূর্ববঙ্গে হরতাল আহ্বান করেছিলেন। সে হরতালের ডাক যদি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করা না হতো তাহলে কে বলতে পারে আর একবার পূর্ব বাংলার মাটি সংখ্যালঘু মানুষের রক্তে ধূসর হয়ে উঠতো না? তবু যে শুভবুদ্ধিটুকু মৌলানা ভাসানীকে হরতাল প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল, সেটুকুই আজ পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু মানুষের একমাত্র সহায়ক শক্তি। স্বাধীনতার পর থেকে এই শুভবুদ্ধির ক্রমবর্ধমান বিকাশ আমরা চেয়েছি। কিন্তু আশাহত হতে হয়েছে বারবার। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসমাজের কাছে তাই আমাদের অনেক প্রত্যাশা। তাঁরা যদি মনে করেন দেশ ইসলামীও থাক, আবার গণতান্ত্রিকও হোক, তাহলে ভাবনার ক্ষেত্রে আজ যে জটিলতার প্রশ্রয় দিচ্ছেন, তার জন্য গণতন্ত্রের কাছে তাঁদেরও একদিন জবাবদিহি করতে হতে পারে। পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৈনিকদের তাই ন্যূনতম দুর্বলতাটুকুও ঝেড়ে ফেলে দুর্বার হয়ে উঠতে হবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক মর্যাদা দিতে হবে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সেই আন্দোলনের শরিক করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে যে অন্যায় আর গ্লানিকর বিভেদ—শুধুমাত্র ব্যালট বাক্স তা মুছে দিতে পারে না।
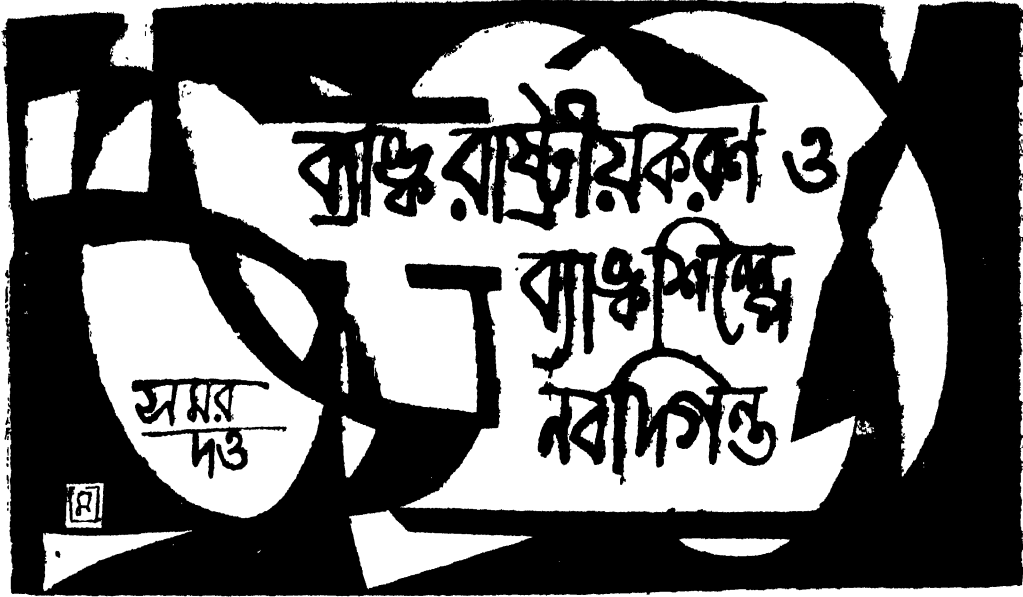
ব্যাঙ্ক শিল্পের একটি বৃহৎ অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয়করণকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে গেলে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ এবং আর্থিক অবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে যে জিনিসটি অত্যাবশ্যক সেটি হল রাষ্ট্রীয়করণের অর্থনৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যগুলিকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা এবং সেই উদ্দেশ্যগুলিকে কর্মে রূপায়িত করে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যাতে রাষ্ট্রীয়করণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে সমর্থ হয় সে সম্বন্ধে যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

১৯৬৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী-গুলির অধিগ্রহণ এবং হস্তান্তর সংক্রান্ত আইনে রাষ্ট্রীয়করণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—'to serve better the needs of development of the economy in conformity with national policy and objectives and for matters connected therewith or incidental thereto.'

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের উদ্দেশ্য হল—'to promote rapid growth in agriculture, small industries and exports, to encourage new entrepreneures and to develop all backward areas.'

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের যে সকল অঞ্চলে ব্যাঙ্ক শিল্পের পত্তন হয় নি অথবা যে সকল অঞ্চলে এই শিল্পের খুব সামান্যই পত্তন হয়েছে সেই সকল অঞ্চলে এই শিল্পের পত্তন এবং প্রসার ঘটিয়ে শিল্পটিকে উত্তরোত্তর জনকল্যাণকর এবং জনপ্রিয় করে তোলবার ব্যাপারে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির সর্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। যুগপৎ অর্থলগ্নীর ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির নীতি এমনই হওয়া উচিত যাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব একটা সমতা রক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সংসদে 'অর্থনৈতিক গণতন্ত্র' বিষয়ে তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেন—'Banking and Insurance are highly important in the economy of a country. Speaking from a strategic point of view it is essential that they should be controlled in any economy.' এই বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু ব্যাঙ্ক শিল্প সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত এবং মানসিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে স্টেট ব্যাঙ্কে পরিণত করায়। কেবলমাত্র পণ্ডিত নেহরু নন, ভারতবর্ষের প্রগতিশীল এবং এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী বহু ব্যক্তি ব্যাঙ্ক শিল্পের রাষ্ট্রীকরণ, বিশেষ করে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে ভারতীয় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে টি শাহ তো ভারতীয় সংসদে দিনের পর দিন তাঁর বক্তব্য রেখে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়-করণের স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিগত ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীকৃত স্টেট ব্যাঙ্ক বড় বড় শহর ছাড়াও শহরতলী অঞ্চলে এবং গ্রাম ভারতের বিভিন্ন অংশে জন-সাধারণের কাছে ব্যাঙ্ক শিল্পের সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটি কৃষিঋণের ব্যবস্থা করছে; ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্প্রসারণে অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে; নতুন নতুন শিল্পোদ্যোক্তা-দের ঋণ লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে; বহির্বাণিজ্যের সম্যক্ উন্নতির উদ্দেশ্যে এবং দেশের সমবায় সংস্থাগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থনৈতিক দাদন দিচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে স্টেট ব্যাঙ্ক আজ এক বিরাট কর্মযজ্ঞে ব্যাপৃত। অপরদিকে রাষ্ট্রীয়করণের পরবর্তী ১৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২ শ' নতুন কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং আনুমানিক ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার নতুন লোক প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কার্যালয়ে নিযুক্ত রয়েছেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয়করণের ফলে স্টেট ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতি তো হয়ই নি, বরং দেশহিতকর অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদনে এই ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক পদচারণা বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। একথা অবশ্য ঠিক যে, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিচারে স্টেট ব্যাঙ্ক একটি সতর্ক, রক্ষণশীল, ধীরগতি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে এবং সর্ব-স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধনে তথা জাতীয় উন্নয়নের পথ রচনায় স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা অবশ্যই বিবেচ্য। আমার বক্তব্য এই নয় যে, কেবলমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কর্মধারার উপর ভিত্তি করেই বে-সরকারী ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীয়করণের মূল্য নিরূপিত হওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক

রাষ্ট্রীয়করণের যথার্থ মূল্য তখনই নিরূপিত হওয়া সম্ভব হবে যখন বর্তমানের ব্যাংকিং প্রথার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হবে। তথাপি আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে নীতিগতভাবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গেলে স্টেট ব্যাংকের কর্মপ্রণালীর এবং অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রীয়করণের পথ-পরিক্রমা করা অযৌক্তিক হবে না।

ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিই এদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বৃহত্তম আধার। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অবনতি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কর্তৃক অনুসৃত নীতির ওপরই নির্ভরশীল। এই কারণে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাংকগুলির কর্মপদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে এই ব্যাংকগুলির শাখা-কার্যালয়গুলির মাধ্যমে অথবা এদের সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা দেশের সর্ব অঞ্চলের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রীকৃত ব্যাংকগুলির কর্তব্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে বৈষয়িক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনভাবে ঋণদান করা, যাতে দেশীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণ অচিরে সম্পাদিত হয়।

এই প্রসঙ্গে কৃষিখাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণদান সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের ৭ ভাগ কৃষিজীবী এবং মোট জাতীয় সম্পদের প্রায় অর্ধেক অংশই কৃষিজাত। কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থাহেতু কৃষক ও কৃষিকার্যের অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। সেইজন্য দেশের মাটিতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তাতে ৫০ কোটির ঊর্ধ্ব দেশবাসীর জীবনধারণ সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থার নিরাকরণ সম্ভব যদি এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকার্য সম্পাদনের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কাজে প্রচুর অর্থবিনিয়োগ প্রয়োজন। রুরাল ক্রেডিট রিভিউ কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আগামী ১৯৭৩-৭৪ সালে যে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদিত হবে তার জন্য দু' হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক দাদন দানের প্রয়োজন হবে। এই টাকার ৪২·৫ শতাংশ অর্থাৎ ৮৫০ কোটি টাকা উন্নত ধরনের উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন বীজ, সার এবং শস্য ধ্বংসকারী কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ বাবদ ব্যয় করা হবে। কৃষিকার্যের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে এই পরিমাণ অর্থের এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণ অর্থের যোগান দেবার উপায় রাষ্ট্রীকৃত ব্যাংকগুলিকে উদ্ভাবন করতে হবে।

এরপর ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। বলা বাহুল্য, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকরণে বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প অত্যাবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র কল-কারখানা সৃষ্টি এবং যান্ত্রিক উৎপাদন দেশের নিদারুণ বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। বিগত কয়েক বছরে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে শিল্প-শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত হয় নি। বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বৃহদায়তন শিল্প প্রসারের সংগে সংগে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপুষ্ট করে সেগুলিকে শিল্পপণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তোলবার জন্য শিল্পগুলির আধুনিকীকরণ একান্ত প্রয়োজন। আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংক থেকে অর্থ কর্জ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে কার্যকর মূলধন ছাড়াও মেয়াদী ঋণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঋণদানের ব্যাপারে স্টেট ব্যাংকের ভূমিকা এই প্রসংগে বিবেচ্য। এযাবৎ এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পখাতে ১১৭·২৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এই শিল্পে আরও অধিক অর্থনৈতিক দাদন দানের ব্যবস্থা এই ব্যাংক কর্তৃক অবলম্বিত হয়েছে। যদিও স্টেট ব্যাংকের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণদানের শর্তগুলি বেশ খানিকটা উদারতার পরিচায়ক তথাপি এই ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ এই মত পোষণ করেন যে, এই ধরনের ব্যবসায় অর্থনৈতিক লোকসানের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই, বরং দেশের আভ্যন্তরীণ অনুন্নত
লাভজনক। স্টেট ব্যাংকের মত অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্যক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য দানে অগ্রসর হতে পারে।

সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে উপযুক্ত জামানত রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে লগ্নির কারবার চালায়। এই রকম ব্যবস্থার ফলে কারিগর, যানবাহন চালক, ছোট ছোট ব্যবসাদার এবং এই ধরনের সাধারণ লোকেদের পক্ষে

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া সহজসাধ্য হয় না। কারণ এই ধরনের সাধারণ লোকেরা প্রয়োজনীয় জামানত রাখতে অক্ষম। কিন্তু এদের কাজের দ্বারা নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উন্নয়ন পরোক্ষভাবে সাধিত হয়। সেইজন্য এই পর্যায়ের কর্মিগণ যাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ লাভে সমর্থ হয় সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব আছে। স্টেট ব্যাঙ্ক খুব কঠিন শর্ত আরোপ না করে এই পর্যায়ের সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক দাদন দিয়ে তাদের ঋণ লাভের বহু পুরাতন সমস্যার বেশ খানিকটা সমাধান করেছে। স্টেট ব্যাংকের মত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিও যদি এই ধরনের সাধারণ মানুষদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে তাহলে তারা যে পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করবে সেগুলির বাজার দর স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের হবে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সুবিধা হবে এবং আলোচ্য সাধারণ মানুষেরা কিছু আর্থিক সঞ্চয়েরও সুযোগ পাবে। অপরদিকে দেশের মধ্যে বহু নতুন নতুন ক্ষেত্র থেকে ব্যাঙ্কের আমানত সংগ্রহের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের আরও একটি ক্ষেত্রের উন্নতির ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ক্ষেত্রটি রপ্তানি-বাণিজ্য উন্নয়নের ক্ষেত্র। রপ্তানি-বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি ব্যতিরেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা অসম্ভব। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অসমর্থ হলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণ সুদূরপরাহত। সম্প্রতিকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আনুকূল্যে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি বহির্বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য শিল্পপতিদের সুবিধাজনক সুদের হারে ঋণ দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতে উৎপন্ন শিল্পপণ্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করতে গেলে পণ্যসামগ্রী নিখুঁত এবং গুণগতভাবে উচ্চ ধরনের হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, নিখুঁত এবং গুণগতভাবে উচ্চ ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা, আন্তর্জাতিক বাজার আয়ত্তে আনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী চালান দেওয়া প্রচুর অর্থব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং রপ্তানি-বাণিজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য শিল্পপতিগণকে সুবিধাজনক শর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ দাদন দেওয়ার এক বিশেষ দায়িত্ব রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির ওপর এসে পড়েছে।

এতদিন ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি শিল্পপতি গোষ্ঠী নতুন নতুন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু এমন বহু মানুষ আছে যারা দেশীয় শিল্পোন্নয়ন কর্মে পারদর্শী হয়েও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাংকগুলির কর্তব্য শিল্পকর্মে দক্ষ ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পেয়ে যাতে ভারতবর্ষের শিল্পায়নের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠান (টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউশনস) এবং শিল্প অঙ্গীকার (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এণ্টারপ্রাইজেস)-গুলির সহায়তায় এই কাজ সম্পন্ন করা সুবিধাজনক। ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উচিত তাদের অধীন প্রযুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারিগণকে আপনাপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা গড়ে তোলবার অনুমতি দেওয়া। এই রকম ব্যবস্থায় তারা শিল্প সম্প্রসারণের সহায়ক বহু বস্তু উৎপাদনে সমর্থ হবে। এর ফলে, সুদক্ষ কর্মিগণ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবে। যুগপৎ শিল্পায়নের ব্যাপারে দেশ উপকৃত হবে।

এতাবৎ ভারতীয় ব্যাংক ব্যবস্থা একটা গতানুগতিক ধারায় চলে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক শিল্পের নবদিগন্ত নিরূপণের সময় এসেছে। এখন ব্যাংক শিল্প পরিচালনায় শুধুমাত্র পেশাদারী কর্মনৈপুণ্যই যথেষ্ট নয়, যুগপৎ দেশ-কল্যাণের ব্যাপকতর স্বার্থে ব্যাংক পরিচালকগণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপদ্ধতি অত্যাবশ্যক। এই ব্যাপারে ব্যাংকসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতিকালে বম্বেতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমনিভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে গেলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ প্রয়োজন। সেইজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলিকে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে। দেশের অব্যবহৃত অর্থসম্পদ সংগ্রহ করা যাতে সম্ভব হয়, জনসাধারণের মিতব্যয়িতার মনোভাব ও সঞ্চয়ী মনোবৃত্তি যাতে গড়ে ওঠে এবং সর্বস্তরের মানুষ যাতে ব্যাঙ্ক কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে সেই সম্বন্ধে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির কর্ম আয়োজন যাতে সম্প্রসারিত হয়, দেশের জনবহুল এবং অপেক্ষাকৃত জনহীন অঞ্চলগুলিতে ব্যাংকগুলির নতুন নতুন কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হওয়া উচিত।

এতদিন দেশের বৃহৎ বৃহৎ ব্যাংকগুলির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকগণ শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে কল্পনাতীত মুনাফা অর্জন করেছে। দেশে যেটুকু অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তাতে ধনিকশ্রেণীর লাভবান হয়েছে। বিশাল ভারতবর্ষের ৫০ কোটির ঊর্ধ্ব জনসংখ্যার বিরাট অংশ আজও কঠোর দারিদ্র্যের মসীময় অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই একথা আশা করা ভুল হবে বলে মনে হয় না যে, ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ একদিকে সরকারের হাত শক্ত করে তুলবে, অপরদিকে ছোট-বড় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তথা জনসাধারণের মধ্যে নতুন কর্মচাঞ্চল্য এনে দেবে। এমনি করে ভারতবর্ষের পরিকল্পিত অর্থনীতির এবং সমাজনীতির সার্বিক সাফল্যের সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

। পূর্বানুবৃত্তি]

(৮)

প্রমদারঞ্জন ঘোষ সদাশিব শান্ত মানুষটি, সুরসিক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি সজাগ, ধুলো ও জীবাণু সম্বন্ধে খুবই সতর্ক। শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি হলে আশ্রমের ছেলেমেয়ে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এককথায় আশ্রমবাসী সবাই, বৃষ্টিতে ভেজার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসেন। খোয়াই দিয়ে গৈরিক জলের ধারা যখন প্রবলবেগে বয়ে যায় তার মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করে সবাই এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। এমনি একদিন বৃষ্টির পর শিশুবিভাগের ছোট ছোট ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে পড়লো, মাঠে এসে 'হেলে সাপের বাচ্চা দেখে তাদের ল্যাজে ধরে একটু ঘুরিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিল। প্রমদাবাবু ব্যাপারটা দেখে বলে উঠলেন, "বাঙালী, বাঙালী!" অর্থাৎ নির্বিষ হেলে সাপ আর বাঙালীতে বিশেষ তফাৎ নেই, ছেলেদের হাতে এই লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'ফোঁস' করে যে একটু প্রতিবাদ জানাবে তারও ক্ষমতা নেই, যেমন শত নির্যাতন ও অত্যাচারেও বাঙালী নির্বিকার। একদিন ক্লাশে 'লজিক' পড়াবার সময় কী একটা উপমা দিতে গিয়ে তিনি বললেন, "......ছুচোর মতন ইত্যাদি......"। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বলে উঠল, "ছুচোটা কী, মশাই (ওঁকে সবাই 'মশাই' বলে ডাকতো) ?" উনি নানাভাবে ঐ জীবটির আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করতে শুরু করলে ছেলেমেয়েরা সমস্বরে বলে উঠলো, "ওঃ, ছুঁচো, তাই বলুন।" প্রমদাবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, "ঐ হলো, জানিস্ না ঁ(চন্দ্রবিন্দু) পদ্মা পার হয় নি।" উনি পূর্ববঙ্গের লোক, পান্ডববর্জিত দেশের মতো পূর্ববঙ্গও ঁবর্জিত। আর একদিন এই ঁপ্রসঙ্গে বললেন—রাজনৈতিক অপরাধীর identification parade-এ পূর্ববঙ্গের লোক identify করার যে-সহজ পন্থা শাসকবর্গ আবিষ্কার করেছেন সে হলো দশ-বারোজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে বলা হতো। যে ব্যক্তি "পাঁচের" বদলে "পাচ" বলতেন তাঁকেই নিঃসন্দেহে পূর্ববঙ্গবাসী বলে সনাক্ত করা হতো।

এদিকে 'বিশ্বরচনা' বইয়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। আরো দুটি অধ্যায় 'নক্ষত্রলোক' ও 'গ্রহলোক' শেষ করে গুরুদেবের হাতে দিয়ে এসেছি। এই দুটি অধ্যায়ই বেশ বড়ো হলো, বিশেষ করে 'গ্রহলোক' অধ্যায়ে পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা বেশ দীর্ঘ হলো। পৃথিবীর জন্মকথা, তারপর অগ্নিবাষ্পের একটা পিন্ড থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে প্রায় দুশো কোটি বছর ধরে তার বর্তমান কলেবর গড়ে উঠেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ খুব অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এই অধ্যায়ের কলেবর হয়েছে বেশ বড়ো। একটা কঠিন স্থায়ী রূপ নিতে পৃথিবীর কেটেছে বহু যুগ। প্রায় দেড়শো কোটি বছর ধরে চলেছে তার ওপর তেজের এক প্রবল উদ্দামতা, যার অভিঘাতে বিভিন্ন জড়ের পদার্থের ওলটপালট ভাঙাগড়ায় বিচিত্র সৃষ্টি ও পরিবর্তন চলছিল। এই ভাঙাগড়ার দ্বন্দ্বে বহুকাল চলেছে ভূপৃষ্ঠে একটা ভয়ানক অস্থিরতা। তারপর তেজের উদ্দামতায় যখন কিছু ভাটা পড়লো তখনই কঠিন আবরণ একটু স্থিতির অবকাশ পেল ; তারপর সেই বিরাট প্রাণহীনতার মধ্যে, কেমন করে জানি না, জেগে উঠলো এক অস্ফুট প্রাণের স্পন্দন। এই প্রাণের প্রথম প্রকাশ হলো একটি অদৃশ্য জীবকোষকে বাহন করে, ধীরে ধীরে এরা সংঘবদ্ধ হয়ে উৎকর্ষ, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে এই প্রাণলোককে নিয়ে চললো এক অভিনব সৃষ্টির পথে। নিজেকে বহুগুণিত করার একটা পরমাশ্চর্য শক্তি দ্বারা ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে তারা মৃত্যুকে জয় করলো।

ভূতত্ত্বের প্রশ্ন খুবই জটিল, এমন একটা সময়ের খবর জানতে চাই যখন কোনো জীবই পৃথিবীতে আসে নি, বা এলেও এমন কোনো ভাষা তাদের ছিল না যা তারা লিখে রেখে গেছে। সেই না-জানা ইতিহাসের শূন্য পৃষ্ঠায় মানুষের দুর্বোধ্য ভাষায় পর পর যে-সব রহস্য সাজানো আছে তা আহরণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অতীত যুগের যে-সব চিহ্ন থেকে পৃথিবী-সৃষ্টির

ইতিহাস রচনার জটিল কাজ সমাধান করতে হয়, তা বইয়ের পাতার মতো পর পর সাজানো নেই, ওলট-পালট হয়ে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের পারম্পর্য স্থির করতেই ভূতাত্ত্বিকের বহু যুগ কেটেছে। শুধু পৃথিবী সম্বন্ধেই এতটা বিস্তারিত আলোচনা 'বিশ্বরচনা' গ্রন্থে দেওয়া সমীচীন হবে কিনা ভাবছিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই গুরুদেব ডেকে পাঠালেন। বললেন যে, 'বিশ্বরচনা' বইটির কলেবর বৃদ্ধি হতে চলেছে তাতে তার অঙ্গচ্ছেদ করা তিনি আবশ্যক বলে মনে করেন। দুটো আলাদা বই হলেই ভালো হয়। স্থির করলেন, একটায় থাকবে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌর-লোক, খুব সংক্ষেপে গ্রহলোক ও ভূলোক। আরেকটায় থাকবে পৃথিবী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা—বিভিন্ন মতবাদ সহ তার জন্মবৃত্তান্ত, ক্রমবিকাশ, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডল প্রাণের উদ্ভব, প্রাক্‌কালীন প্রাণিবৃত্তান্ত, মানুষের আবির্ভাব ও তার বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি। প্রথম বইটার নাম হবে "বিশ্ব-পরিচয়", দ্বিতীয়টার নাম "পৃথ্বী-পরিচয়" গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির সমস্যাটা গুরুদেব এভাবেই সমাধান করার সিদ্ধান্ত করলেন, আরও নির্দেশ দিলেন প্রথমে ছাপা হবে "বিশ্ব-পরিচয়" তারপর "পৃথ্বী-পরিচয়"। আদেশ হলো, বিষয়বস্তু পুনর্বিন্যাসের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র হওয়া চাই, বেশি দেরী করলে চলবে না। পুনর্বিন্যাসের কাজ খুবই কঠিন, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ এর জটিলতা [illegible] করতে পারবেন না। তখন

যেহেতু গুরুদেবের 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থের নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে।

তখন শীতকাল, একদিন অপরাহ্নে বনমালী এসে সমন ধরিয়ে দিল, গুরুদেব অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন। অসময়ে এরকম জরুরী তলব! শংকিত হয়ে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লাম "বিশ্ব-পরিচয়ের" নতুন শুরু-করা পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে। গুরুদেবের ঘরের কাছাকাছি যেতেই দেখি র‍্যাপার গায়ে এক ভদ্রলোক (তাঁর নাম আমি করব না) তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। কাছাকাছি এসে "এই যে" বলেই আরো দ্রুতবেগে চলে গেলেন। অন্যদিন দেখা হলে ভদ্রলোক অনেক কথা বলেন, সেদিন এই ব্যতিক্রম দেখে খুব আশ্চর্য হলাম। ঘরে ঢুকে দেখি গুরুদেব প্রসন্নমুখে বসে আছেন, হাতে Sir Arthur Eddington-এর একখানা Astronomy-র Popular Series-এর বই, সামনে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর আরো অনেক বই ও গুরুদেবের ছবি আঁকার ও লেখার সরঞ্জাম। স্মিতহাস্যে বললেন—"Popular Science Series-এর দু'খানা বই আনিয়েছি, একখানা Arthur Eddington-এর, আর একখানা James Jeans-এর। বড়ো ভালো লাগলো বই দু'খানা; এদের মধ্যে অনেক নতুন তথ্য আছে যা 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থের পরমাণুলোক ও নক্ষত্রলোক অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে একটা গোপন খবর দিচ্ছি।" বলেই একটা ছোটো ট্রে সামনে ধরে বললেন, "যেটা পছন্দ হয় নিয়ে নাও।" ট্রে-ভর্তি প্রায় ডজনখানেক 'ফাউণ্টেন পেন', নানা রঙের; চমকে উঠে বললাম—"সে কী, আপনার কলম কেন নেব!" বললেন—"না দিলে তো আবার চাদর চাপা দিয়ে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যাবে। সেদিন কলম কানে গুঁজে রেখে আমার কলম হারিয়েছিল, আর বনমালী তা খুঁজে বের করেছিল, সেই কলমটাই আমার চোখের ওপর দিয়ে আজ চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। এই একটু আগেই যিনি এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে গায়ের চাদরখানা দিয়ে কলমভর্তি এই ট্রের একাংশ ঢেকে ফেললেন, পরিষ্কার দেখলুম আমার কলমটায় হঠাৎ গতিসঞ্চার হলো, তারপর ভদ্রলোকের চাদরের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। লজ্জায় ঘৃণায় স্তব্ধ হয়ে রইলুম, কলমটা পরহস্তগত হতে দেখে আমিই লজ্জা পেলুম, কিন্তু গ্রহীতা নির্বিকার, প্রতিবাদ করতেও ঘৃণা বোধ হলো। তিনি চলে যেতেই মুহূর্তে [illegible] [illegible] [illegible] অগ্নিকুণ্ডতার [illegible] থেকে প্রবেশ করলে Eddington-এর লেখা এই উদার মহান নাক্ষত্রলোকে।"

তারপর নাক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে অপূর্ব সুন্দর এক আলোচনা করলেন, তার সারাংশ হলো—ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় কেউ বা শিশু, কেউ বা যুবা, কেউ বা বৃদ্ধ; নক্ষত্রের ভিড়ের মধ্যেও দেখি কেউ বা নবীন, কেউ বা প্রৌঢ়, কেউ বা প্রাচীন। এই প্রৌঢ়ের দলেই সূর্যের স্থান। যে-ছায়াপথের এলাকায় আমাদের সূর্য রয়েছে তার দখলে আছে কোটি কোটি নক্ষত্র; আপাতদৃষ্টিতে স্থির বলে মনে হলেও এদের প্রত্যেকেই এই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে প্রচণ্ড-বেগে ঘুরছে, সূর্য তার গ্রহপরিবার নিয়ে দৌড়োচ্ছে সেকেণ্ডে প্রায় দুশো মাইল বেগে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাইরে উধাও হয়ে যায় না। এক বাঁকা টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা ঘালি পাক খাচ্ছে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের দূরবর্তী বাইরেকার জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এদিকে পরমাণু জগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটোন-ইলেকট্রনের এই ঘূর্ণিনাচ। কালস্রোত বয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবর্তে। এই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বকে বলে 'জগৎ'। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে: এ চলছে, চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব। নাক্ষত্রলোকের দেশকালের পরিমাপ, পরিমাণ, গতিবেগ ও তার অগ্নি আবর্তের অচিন্তনীয় প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি, এ-কথা স্বীকার করতেই হবে, বিশ্বে সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, মানুষ তাদের জানছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্ব-সংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীম বিশ্বলোকের অপরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসেব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছু নেই। ভূমা বাইরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়। আরো একটা জিনিস দেখতে পাই, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তেজের যে দুর্নিবার উন্দামতা চলছে তারই প্রবল অভিঘাতে পরমাণুর বিনাশ ঘটে, পরিবর্তে সৃষ্টি হয় এক সুতীব্র তেজ। নক্ষত্রের ভাণ্ডার এতো বৃহৎ যে, তার মধ্যে পরমাণু ধ্বংসের এই প্রলয়কাণ্ড বহুকাল ধরে চলতে পারে, এই অপরিমিত লোকসানেও তার রিক্ত হতে লাগে বহু কোটি বছর। নক্ষত্রের মধ্যে [illegible] শুরু [illegible] নতুন বস্তু সৃষ্টিতে তার অন্তরে খানিকটা জমাও হয়। জানি না, নক্ষত্র-লোক বস্তুক্ষয়ে ধ্বংসের দিকে চলেছে, না নতুন বস্তু সৃষ্টিতে গড়ে ওঠার দিকে চলেছে, না লাভ-লোকসানের সমন্বয়ে একটা স্থিতির দিকে চলেছে। কথাগুলি মনে রাখতে বললেন, বিশ্ব-পরিচয়ে নক্ষত্রলোক অধ্যায়ে যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে হবে; আরো অনেক অভিনব তথ্য এই দুটি বইয়ের মধ্যে আছে যা পরমাণুলোক ও সৌরলোক অধ্যায়ে সংযোজন করা যেতে পারে। আলোচনা শেষ করে বললেন—"পৃথিবীর বৃহত্তর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কেরা যদি জ্যোতির্বিদ্যার বইগুলি ভালোভাবে পড়তেন তাহলে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের পরিসমাপ্তি হতো, পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যেত হানাহানি, দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ। পৃথিবী হতো শিব ও সুন্দরের আবাসস্থল। ইচ্ছে হয় এঁদের এক সেট করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই উপহার দিয়ে দেখি পৃথিবীব্যাপী এই প্রলংকর হানাহানির উন্দামতা প্রশমিত হয় কি না।"

Carl Hujer নামে অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের এব অধ্যাপক এলেন শান্তিনিকেতনে। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে, বিশেষ করে নীহারিকামণ্ডলী ও নক্ষত্রের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে, অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তিন দিনে এমন তিনটি সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন যে, যাঁরা এই বক্তৃতামালা শুনেছেন তাঁরা সবাই অভিভূত হয়ে পড়েন। গুরুদেব খুবই খুশি হয়ে Carl Hujerকে বলেছিলেন—"আপনারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিন আপনাদের নব জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদাত্ত বাণী, হিংসা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকূপ থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে আলোর পুণ্য-ধারায় স্নান করে বৃহত্তর নবজীবনের মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।"

শান্তিনিকেতন ছেড়ে যাবার আগে প্রফেসর Hujer গুরুদেবের কাছে বিদায় নিতে গেলেন, বললেন—Poet, I would be grateful for a message from you. গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন—"Science reveals light and light reveals life."

প্রফেসর Hujer এই message পেয়ে ভারি খুশি; বললেন, তিনি প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন কিন্তু এরকম মহান উদার বাণী আর কোথাও পান নি। এ একটি অমূল্য সম্পদ, তিনি সারা জীবন সযত্নে রক্ষা করবেন। [ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দীশিবিরের কর্মাধ্যক্ষ আমরা জন খাটতে আপত্তি করায় প্রহরীদের ওপর আদেশ দিয়েছিলেন যে, দিনে-রাতে সব সময় যেন আমাদের তাঁবুর ভেতরই রাখা হয়। আমরা এই নিয়মের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলাম কিন্তু কোনই ফল হয় নি, কাজেই একদিন রান্নাঘর থেকে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁবুতে ফেরবার সময় আমরা সবাই একজোটে ভেতরে ঢুকতে আপত্তি জানাই। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং আমাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য। এইরকম যে হতে পারে তা আমরা আগে থেকেই আঁচ করে নিয়েছিলাম এবং স্থির করেছিলাম যে, প্রয়োজন মতো আমরাও তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করব। ঝটপট করে সবাই পাথর, নুড়ি, থালা-বাসন যে যা হাতের কাছে পাই, তাই তুলে নিয়ে একযোগে প্রহরীদের প্রতি আক্রমণ করি; কিছুসংখ্যক গাছের ডাল বেড়া তৈরি করবার জন্য এক জায়গায় জড়ো করে রাখা ছিল, তারও যথাযথ ব্যবহার করতে দ্বিধা করি নি আমরা। রবিনসন এবং তার দলের লোকেরা পাশের তাঁবুতে তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল, আমাদের মারপিট, হৈ-চৈ-এর আওয়াজ শুনে তারাও ভেতর থেকে জোর করে প্রহরীদের সরিয়ে বেরিয়ে আসে আমাদের দলবৃদ্ধি করতে। উড়ন্ত থালা-বাসন ও পাথরের টুকুরার সংঘর্ষে এসে দুপক্ষেই কিছু কিছু লোক জখম হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা প্রহরীদের হটিয়ে দিতে সক্ষম হই। আমার বন্ধু গাদ্ কামাউ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বেশ চোট পেয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত অল্পদিনের ভেতরই সে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে আমরা চারবার গুলী ছোড়ার আওয়াজ পাই এবং দেখি যে, কর্মাধ্যক্ষ কেন্ডাল বন্দুক হাতে একা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি আমাদের সবাইকে চুপ করে বসতে বললেন এবং আমরা কতোজন বন্দী সেখানে উপস্থিত ছিলাম তা গোণবার পর সবাইকে তাঁবুতে ফিরে যেতে বলেন। আর কোন রকম মারামারি করতে নিষেধ করে তিনি বলেন যে, তারপর দিন সকালে আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন।

আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে আমাদের অসন্তোষের কারণ বুঝিয়ে বলি : ঐ নিচু টিনের ছাদের তাঁবুর ভেতর সারাদিন সারারাত বন্দী হয়ে থাকা এবং আগুনের চুল্লির ভেতর গিয়ে বসে থাকা প্রায় একই ব্যাপার এবং বন্দী এমন কোন নিয়ম কোথাও লেখা নেই, কাজেই......। কর্মাধ্যক্ষ আমার যুক্তি মেনে নেন এবং তারপর থেকে সারাদিনের ভেতর বেশ কয়েকঘণ্টা বাইরে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি আমাদের। অবশ্য আমার তরফ থেকে এখানেই এর ইতি হতে দিইনি আমি। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমি কেনিয়া সরকারের প্রধান কর্মসচিবকে একটি চিঠি পাঠাই এবং তার নকল মিঃ মাথু এবং মিঃ আয়োরিকেও পাঠাই। তাঁরা তখন কেনিয়ার বিধানসভায় মনোনীত আফ্রিকান সদস্যরূপে কাজ করছিলেন। যদিচ প্রহরীদের সঙ্গে মারামারি করার ফলে তাদের ও আমাদের ভেতব বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, তবু দু-একজনকে তার পরেও আমি হাতে রাখতে পেরেছিলাম এবং এদেরই একজনের সাহায্যে চিঠিগুলি যথারীতি ডাকে পাঠাতেও সক্ষম হই আমি। একজন প্রহরীর স্ত্রী ছুটিতে কিমুমু বেড়াতে যাচ্ছিল এবং সে নিজের অন্তর্বাসের ভেতর চিঠিগুলি লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

মাগেটা নামক দ্বীপেও কিছুসংখ্যক মাউ-মাউ বন্দী ছিল ঐ সময়ে এবং সেখান থেকে আগত কয়েকজন প্রহরীর কাছে আমরা জানতে পারি যে, সেখানেও বন্দীদের ভেতর যথেষ্ট অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এই খবরে অবশ্য আমি আশ্চর্য হই নি, কারণ মানিয়ানি থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বার আগে আমরা সবাই স্থির করেছিলাম যে, যেখানেই পাঠান হউক না কেন বা যাই হউক না কেন, আর আমরা জন খাটব না। এইভাবে কাজ করতে অস্বীকার করাই ছিল কেনিয়া সরকারকে বিব্রত করার সবচেয়ে ভাল উপায় এবং আমরা এর যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম।

বন্দীদের ভেতর অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর এবং এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করার জন্য কেনিয়া সরকার পাঁচজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান আরক্ষা বাহিনীর কর্মচারীদের নিয়ে একটি কমিশন তৈরি করেন। তারা প্রথমে মাগেটা এবং পরে সাইয়ুসি দ্বীপ পরিদর্শনে আসে এবং "যথাকর্তব্য" যে তারা করেছিল তাতে আর সন্দেহ কি! সাইয়ুসিতে তারা বাছা বাছা বিয়াল্লিশজন বন্দীকে প্রশ্নাদির জন্য দপ্তরখানায় ডেকে নিয়ে যায় এবং সেখানে প্রত্যেককে যতদূর সম্ভব ভয় দেখানোর পর লাঠি ও মুষ্টি সহযোগে বেশ কয়েক-ঘা বসিয়ে দিতেও পেছপা হয় নি। তারা ছিল একসঙ্গে পাঁচজন, আর আমরা প্রত্যেকে একা. কাজেই বাধা দেওয়ার ক্ষমতা

আমাদের কারুরই ছিল না। তবু যতদূর সম্ভব আমি নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলাম অযথা মারের হাত থেকে। এইভাবে মারধোরের পর আমাদের ভেতর থেকে পাঁচজন বন্দী সরকার পক্ষকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু আমরা বাকি সাঁইত্রিশ জন ছিলাম অটল। আমাদের আরও সাজা দেওয়ার জন্য একটা খুপরিতে রবিনসন ও আমাকে বন্দী করা হয় এবং বাকি পঁয়ত্রিশ জনকে আর একটা বড় ঘরে চালান দেওয়া হয়। বেধড়ক প্রহারের চোটে আমাদের গায়ের জামা ছিঁড়ে একেবারে ফালি মেরে গিয়েছিল এবং সারা গায়ে ফুলো ফুলো দাগে ভরে গিয়েছিল। সে রাত্রি আমাদের বড় কষ্টে কাটে; গায়ে ঢাকা দেবার জন্য কোন কম্বল পাই নি আমরা, আর রাত্রিবেলার দারুণ শীতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরা ছাড়া শীত নিবারণের আর কোন উপায়ও খুঁজে পাই নি।

সেখানে আমাদের নিরাভরণ গায়ের উপর মশার অত্যাচারও হয়েছিল অন্যান্য রাতের চেয়ে বেশি এবং সব থেকে বেশি কষ্টকর হয়েছিল প্রস্রাব করার ইচ্ছাকে দমন করে রাখা, কারণ এর জন্যে কুঁড়েঘরের ভেতরে কোন পাত্র বা কোন নালাও ছিল না। বহু অপেক্ষার পর দরজার তলা থেকে প্রভাতসূর্যের আলো দেখতে পেয়ে সেদিন আমরা আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

তার পরদিন আবার আমাদের কিসুমুর ওডিয়াগা বন্দিশিবিরে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে মাগেটা দ্বীপ থেকেও কয়েকজন বন্দীকে ফেরত আনা হয়েছিল এর ভেতর। তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ওডিয়াগাতে আমাদের সংখ্যা দাঁড়ায় সব সমেত প্রায় চার শত। আমাদের আগেকার সেই বেড়ি আবার পায়ে উঠে এবং প্রতি পদক্ষেপে তার রিনটিন শব্দ আমাদের জানিয়ে দিতে থাকে যে, আমরা বন্দী, আমরা অন্তরীণ আমরা দেশকে ভালবেসেছি এই মহান অপরাধে অপরাধী। এই ওডিয়াগাতেই সেবার আমার জোসেফ কিরিরা কারেতর সাথে প্রথম আলাপ হয়, এবং তখন থেকেই আমরা সুহৃদ, বন্ধু ও সহকর্মীরূপে কাজ করছি আজ অবধি। জোসেফকে আমার প্রথম থেকেই খুব ভাল লেগেছিল, সে ভারি সৎ চরিত্রের এবং অক্লান্তকর্মী দেশসেবক হিসেবে সুনাম করেছে। রবিনসন, জোসেফ এবং আমি তিনজনে মিলে স্থির করি যে, অন্য সমস্ত বন্দীর ভেতর জাতীয়তাবাদ, আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রীতির অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলাই হবে আমাদের কার্যপ্রণালীর মূল উদ্দেশ্য। ওডিয়াগার প্রহরীরাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, তাদের একজনকে পাঁচ শিলিং ঘুষ দিয়ে আমরা একটি চিঠি কেনিয়ার বন্দিশালার মহাধ্যক্ষের কাছে পাঠাই—তাতে আমাদের নালিশ ছিল যে এখানে আবার আমাদের রেশনের পরিমাণ কেটে অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে।

কেনিয়া সরকার বোধ হয় এর ভেতর আমাদের মতো চরমপন্থী বন্দীদের নিয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং ঠিক কোথায় পাঠাবেন বা কি করবেন আমাদের নিয়ে তা স্থির করতে পারছিলেন না। একদিন আরক্ষাবাহিনীর বিশেষ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান কর্মচারী আমাকে বলেন যে, "কেনিয়া সরকার এবার তোমাকে ও আরও কয়েকজনকে লড্ওয়ার নামক এক বন্দিশিবিরে চালান করবেন, সেখানে ভীষণ গরমে তুমি পুড়ে মরতে পারবে সহজেই।" উত্তরে আমি শুধু হেসে তাঁকে বলি যে এভাবে কোনদিনই সরকার আমাদের অনমনীয় উৎসাহকে বিনষ্ট করতে পারবেন না, সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন। আমাদের ভেতর অনেকের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, যত দুঃখকষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রণা আমরা এযাবৎ ভোগ করেছি, তারপর আর কোন কিছুই আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। একমাস কাল ওডিয়াগায় থাকার পর ১৯৫৬ সালের ১১ই আগস্ট আমাদের কিসুমু বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়, লড্ওয়ারে চালান করবার জন্য। এখানে বলে রাখা দরকার যে, লড্ওয়ার কেনিয়ার উত্তরে মরু অঞ্চলের কাছে অবস্থিত, সেখানে কাছেপিঠে কোন লোকালয় নেই এবং মোটর গাড়ি যাবার রাস্তাও খুবই খারাপ, কাজেই বিমানে যাতায়াত করাই সব থেকে সুবিধা। আমাদের মতো বন্দীদের ভাগ্যেও তাই কিছু বিমানযাত্রা জুটে গিয়েছিল।

এই বিমানযাত্রার সময় আমাদের পায়ের বেড়ি খুলে নিয়ে তার বদলে দুজন করে বন্দীকে একসঙ্গে করে একটি হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আমার জোড়া হিসেবে পেয়েছিলাম আমি কিরোরি মটোকে, ষাট বছরের জোয়ান এবং খাঁটি জাতীয়তাবাদী এক কিকুয়ুকে। এই বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটিকে নিয়েও কেনিয়া সরকার কি করবেন ভেবে ঠিক করতে না পেরে শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে লড্ওয়ারে চালান দিচ্ছিলেন। কিরোরি মাউ-মাউ বন্দী হবার আগে নেয়েরী অঞ্চলের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার এবং সেখানকার আফ্রিকানদের হিতৈষী বন্ধু ছিল। ১৯৬১ সালে সে আবার নেয়েরী অঞ্চলে কে. আ. ন্যা. ইউর নির্বাচিত নেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বিমানে আমরা সব সমেত পঁয়ত্রিশ জন বন্দী ছিলাম; ১৭ জোড়া হাতকড়া ৩৪ জন বন্দীকে ধরে রেখেছিল এবং গাথোকিয়া নামক এক বৃদ্ধের দুই হাত একসঙ্গে করে বাঁধা ছিল আর একজোড়া হাতকড়ি দিয়ে। বেচারা সারা পথ কুঁকড়ে-মুকড়ে এককোণে পড়ে ছিল এবং দুই হাত দিয়ে নিজের পেট চেপে ধরে ক্রমাগত কাঁপছিল, যেমন ভীষণ জ্বর হলে পর কারুর অবস্থা হয়। পরে সে আমায় বলেছিল যে, বিমানের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকালে পর সে দেখতে পায় যে, ইঞ্জিন থেকে টপ্টপ্ করে তেল চুঁইয়ে পড়ছে। প্রথমে সে ভেবেছিল যে, বিমানের চালককে এ বিষয়ে জানাবে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়েছিল যে, যদি চালক এ বিষয়ে তদন্ত করতে আসে, তাহলে তো তাকে বিমানের স্টিয়ারিং ছেড়ে আসতে হবে এবং তাহলে বিমানের ধ্বংসও অনিবার্য। অনেক ভেবে-চিন্তে বেচারা শেষ অবধি কাউকেই কিছু না বলে নিজের পেট চেপে ধরে যে-কোন মুহূর্তে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায় কালাতিপাত করেছিল সারা পথ।

বিমান ছাড়বার অল্পক্ষণ পরেই যাত্রীদের বসবার জায়গার সামনের দেওয়ালে একটি লাল বাতি জ্বলে উঠে এবং স্বরবিবর্ধক যন্ত্রের ভেতর থেকে ইংরাজীতে আমরা শুনতে পাইঃ "ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের জলে ভাসবার জন্য ব্যবহৃত উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে আপনাদের জলে ভাসিবার জন্য ব্যবহৃত কটিবন্ধ প্রত্যেকের আসনের তলায় পাবেন!" বিমানের ভেতরের খুব কমসংখ্যক বন্দীই ইংরাজী বুঝতে পারতো, কাজেই আমরা যে ক'জন এই উক্তির মর্মোদ্ধার করতে পেরেছিলাম, তারা আর সবাইকে বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা এবং হাতকড়ি পরা অবস্থায়ই যথাসম্ভব চেষ্টা করি কটিবন্ধ টেনে বার করবার আসনের তলা থেকে। বেচারা গাথোকিয়া কোনরকম নড়বার-চড়বার চেষ্টা না করে আগের মতোই নির্জীব অবস্থায় পড়ে ছিল, হয়তো সে তখনো ইঞ্জিনের তেল চুঁইয়ে পড়ার কথাই ভাবছিল। কটিবন্ধের উপর কোন ভরসাই সে করতে পারে নি এবং দুই হাতই বন্ধ থাকার ফলে তার ক্ষমতাও ছিল না কিছু করবার এ বিষয়ে। আমরা ভাবছিলাম যে, যদি কোন কারণে বিমান জলেই নামতে বাধ্য হয় হঠাৎ করে, তা হলে কি চালক বা অন্য কেউ পারবে সময়মতো আমাদের হাতকড়ি খুলে দিতে? শেষ অবধি ভগবানের ভরসায় নিজেদের ছেড়ে দিয়ে গল্প এগিয়ে দিয়ে

চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নি আমরা।

আমরা যে সমস্ত বন্দী ঐ বিমানে লড্ওয়ারে গিয়েছিলাম কিস্মদ্ থেকে, তারা সবাই খুব ভাগ্যবান বলতে হবে, কারণ আমাদের বিমান সেখানে পৌঁছেছিল সন্ধ্যের পর এবং ফলে লড্ওয়ারের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আয়োজিত "বন্দী-অভ্যর্থনা" থেকে আমরা রেহাই পেয়েছিলাম। জোসেফ কিরিয়া আমাদের আগের বারে লড্ওয়ারে পৌঁছেছিল এবং তার কাছে আমি জানতে পারি যে, বিমান থেকে অবতরণ করবার পরই তাদের প্রত্যেককে মাথায় এককড়া পাথর নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়াতে হয়, নিতান্ত অকারণে! তা ছাড়া সেখানকার তুর্কানা উপজাতীয় প্রহরীরা প্রত্যেককে ধরে বেশ একচোট মারধোরও করেছিল কোনরকম অন্যায় করবার আগেই। ন্গুদীন মোয়ানজারি নামক একজন বন্দী এতো আঘাত পেয়েছিল যে, বেচারা সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং তাকে স্ট্রেচারে করে শিবিরের ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হয় শুশ্রূষা করবার জন্য। সেখানেই আমি, রবিন্সন

আর জোসেফ তিনজনে মিলে শিবিরের কর্মাধ্যক্ষ বাকস্টন নামক একজন ইউরোপীয়ানকে একটি নালিশ করে চিঠি লিখি এবং এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তার পরদিনই কথাবার্তা বলতে অনুরোধ করি। তিনি এসেছিলেন এবং সব বন্দীকে একত্রিত করে ভাঙা ভাঙা শোয়াহিলি ভাষায় যা বলেছিলেন, তার মর্মার্থ হল ঃ "তোমরা সবাই অত্যন্ত বদমাইস এবং চরমপন্থী মাউ-মাউ বন্দী; তোমরা সাইয়ুসি এবং মাগেথা দ্বীপে অবস্থিত বন্দি-শিবিরে থাকাকালীন জন খাটতে অস্বীকার করেছিলে এবং সেখানকার কর্মাধ্যক্ষদের জ্বালিয়ে মেরেছিলে। এখানে তোমরা সবাই জন খাটবে, তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এবং আমি যে-কোন উপায়েই তোমাদের বাধ্য করবোই এ বিষয়ে। যদি তোমরা এ আদেশ অমান্য করো, তাহলে এর ফল কি হবে তাও দেখতে পাবে।" এরপর তিনি আসন গ্রহণ করলে পর গাথোগো মুইটুমি উঠে দাঁড়িয়ে বাকস্টনকে বলে যে, তিনি যেন লড্ওয়ারের জেলা মহাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠান, কারণ তাঁর সাথে আমরা জন খাটার বিষয়ে কথাবার্তা বলতে চাই। বাকস্টন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে উত্তর দেয়ঃ "তোমরা—আমি চাই যে তোমরা খুব ভাল করে একটা কথা এখনি বুঝে নাও। আমি এই শিবিরের অধ্যক্ষ এবং আমি-ই তোমাদের ভাল-মন্দ সমস্ত কিছুর মালিক। আমি লড্ওয়ারের জেলা-মহাধ্যক্ষ এবং আমি-ই এখানকার রাজ্যপাল। আমি লড্ওয়ারের ভগবান! আমি সবরকমে তোমাদের শায়েস্তা করতে প্রস্তুত এবং আমার হুকুম না মানা পর্যন্ত যে-কোনভাবেই হোক না কেন, আমি তোমাদের টিট করবো।" গাথোগো তখন আবার জিজ্ঞাসা করে বাকস্টনকে যে, কোন্ সরকারী নির্দেশানুযায়ী তিনি আমাদের জন খাটাতে বাধ্য করতে পারেন এভাবে। বাকস্টন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দেয়ঃ "তোমরা যেসব নিয়ম-কানুনের কারিগরি সাইয়ুসি ও মাগেথায় চালিয়েছিলে, সেগুলো ভুলে যাও বিলকুল এখানে। কেনিয়া সরকার কিছু বোকা নয়। তোমাদের শায়েস্তা করবার জন্য এখানে পাঠান হয়েছে এবং শায়েস্তা আমি করবোই। লড্ওয়ারে আমার হুকুমই হ'ল নিয়ম এবং সে নিয়ম তোমাদের মানতে হবে। জন তোমাদের খাটতেই হবে। বাস্, আমার আর কিছু বলবার নেই। যাও তোমরা এখন।" এর পরেই সে আর কাউকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই সেখান থেকে চলে যায়। তার এই দৃঢ়চিত্ততা, স্পষ্টতা এবং কর্মপরায়ণতা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যদিচ সে যা করতে চাইছিল, তা আমাদের পছন্দ হয় নি, তবুও একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, সে তার উপর আরোপিত কর্মসূচী পালন করছিল মাত্র এবং তাতে কারুর হস্তক্ষেপ যে সে সহ্য করবে না, সেকথাও খুব প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। এইরকম স্পষ্টবক্তা লোকটিকে আমার প্রথম থেকেই ভাল লেগেছিল, যার কথায় এক, আর কাজে অন্য নেই। বোধ হয় এই জন্যই আফ্রিকান রাজনীতিজ্ঞরা বিপথগামী মনোবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও ব্রিগস্ এবং ক্যাভেন্ডিশ-বেনটিঙ্ক প্রমুখ কেনিয়ার ইউরোপীয়ান রাজনীতিজ্ঞদের ব্লানডেল্ বা হেভেল্‌কের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। এই মনোবৃত্তির কারণ সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একটি নরম তুলার বালিশের চেয়ে একটুকরা শক্ত কাগজকে কাটা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য।

সভাস্থল থেকে শিবিরে ফেরবার পথে আমরা সবাই ভাবছিলাম যে, কি কারণে কর্মাধ্যক্ষ এতো চরমপন্থী ব্যবহার করছেন আমাদের সঙ্গে। আমার জন্য ১০ নম্বর তাঁবু নির্দিষ্ট হয়েছিল লড্-ওয়ারে এবং সেদিন গভীর রাত্রি অবধি আমরা অনেকে সেখানে বসে বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার আলোচনা করেছিলাম। এই সময় কিছুসংখ্যক মাউ-মাউ বন্দী নাইরোবি শহরের নিকটস্থ "আথি-রীভার" শিবির থেকে বদলী হয়ে লড্ওয়ারে এসেছিল এবং তারা বলে যে, সেখানেও তারা জন খাটত। এই দলের ভেতর জেরেমিয়া কিয়ুম ওয়া কিয়েরুও ছিল, এখন সে আমার সহযোগীরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। তারা সবাই লড্-ওয়ারেও জন খাটার স্বপক্ষে রায় দেয়। কিন্তু ওভিয়াগা ও মাগেথা থেকে আগত আমাদের দলের অনেকেই এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এবং বলে যে, যে-কোন অবস্থাতেই আমাদের কেবল শিবিরের প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য কাজকর্ম ছাড়া অন্য কিছু করা বাঞ্ছনীয় হবে না। এই বাগ্‌বিতণ্ডা, আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমার মনে কেবলই বাজছিল যে, কর্মাধ্যক্ষ আমাদের একেবারেই বাজে হুমকি দেন নি এবং নিশ্চয় এমন কিছু একটা হয়েছে, যার ফলে তিনি এতো স্থিরনিশ্চিতভাবে আমাদের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের কিকুয়ু প্রথানুযায়ী এইরকম সঙ্কটকালীন অবস্থায় স্থানীয় দলপতি আর সকলের বক্তব্য শোনবার পর প্রত্যেকের মতামতের বিচার করেন এবং তারপর তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেন, যার বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হয় না। উপস্থিত সবাই তাদের বক্তব্য শেষ করার পর আমি সকলকে উদ্দেশ করে বলেছিলাম সেদিন ঃ "ভাই সব, আমি অনেকদিন থেকে তোমাদের দলপতির কাজ করছি এবং এই কাজে তোমাদের সবরকম বিপদাপদ থেকে রক্ষা করাই হ'ল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। উপস্থিত আমরা বন্দিজীবনের এক সংকটকালীন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। আমার মনে হয় যে, এখনকার অবস্থা ঠিক সক্রিয় যুদ্ধের মতোই এবং খুব সাবধানে না এগুলে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।" তারপর আমি তাদের সকলকে নেপোলিয়ান বোনা-পার্টের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাশিয়া অভিযানের কথা বলি, যখন তিনি সমগ্র ইয়োরোপ জয় করতে করতে রাশিয়া অবধি এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে রাশিয়ান সৈন্যরাও ক্রমাগত পিছনে হঠতে থাকে এবং বিজয়োল্লাসে মত্ত নেপোলিয়ান তাদের খেদাতে থাকেন। তারপর এলো বিরাট শীতকাল, আর নেপোলিয়ান তাঁর অজস্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে দারুণ ঠান্ডায়, অনাহারে কিভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচবেন ঠিক করতে পারেন নি। প্রচুর সংখ্যক ফরাসী সৈন্য সেবার বেঘোরে প্রাণ দিয়েছিল বিজয়ের শেষ মুহূর্তে। এই ঘটনার উল্লেখ করার পর আমি সমবেত সবাইকে মনে করিয়ে দিই যে, কর্মাধ্যক্ষ তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, যদিচ আমরা সাইয়ুসি এবং মাগেথায় সরকারী নিয়ম-কানুনের জোরে জন খাটতে অস্বীকার করেছিলাম, তবুও কেনিয়া সরকার একেবারে বুদ্ধিহীন নন। আমার মনে হয়, এর একমাত্র অর্থ এই যে, হয় কেনিয়া সরকার, না হয় বিলেতের ঔপনিবেশিক দপ্তর এখন নিয়ম-কানুনের রদবদল করে দিয়েছেন, যার ফলে তাঁরা এখন আমাদের জন খাটতে বাধ্য করতে পারেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা বরাবরই নিয়মমাফিক লড়তে চেষ্টা করেছি। যতদূর সম্ভব আমরা কোন অন্যায় বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করি নি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাতেই পেয়েছি আমরা সব থেকে বেশি মানসিক বল। আমি একথা তোমাদের বলা উচিত বলে মনে করি যে আমার মতে এখন আর জন খাটার বিরুদ্ধে সরকারী নিষমের আশ্রয় আমরা নিতে পারব না এবং বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করা খুবই বোকামির কাজ হবে আমাদের পক্ষে, কারণ সরকার তাহলে সহজেই আমাদের একেবারে বিনষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হবেন। কাজেই আমার মনে হয়, উপস্থিত আমাদের জন খাটতে রাজী হওয়া উচিত এবং অন্য কিভাবে আমরা

স্বাধীনতার [illegible] চালিয়ে যেতে পারি তার জন্য [illegible] সময়েই যথেষ্ট থাকাও উচিত।

আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর আমরা সবাই সোমবার ১৩ই আগস্ট থেকে জন খাটব এই সিদ্ধান্ত করি। সেদিন খুব ভোরবেলাই কর্মাধ্যক্ষ প্রহরী-দের ডেকে তাদের হাতে রাইফেল, বন্দুক ইত্যাদি দিচ্ছিলেন, কারণ তিনি তখনও জানতেন না যে, আমরা কাজ করতে স্বীকৃত হব কি-না। আমরা পরে জানতে পারি যে, লড্‌ওয়ারের জেলা কর্মাধ্যক্ষও নিকটেই ১২০ জন কেনিয়া আরক্ষা-বাহিনীর লোক এবং চল্লিশ জন তুর্কানা উপজাতীয় সৈনিককে নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় লুকিয়ে ছিলেন, যাতে আমরা জন খাটতে অস্বীকার করলেই তারাও এসে আমাদের এ বিষয়ে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু তারা যখন দেখলো যে, আমরা সবাই কোনরকম গোলমাল না করে কাজ করতে যাচ্ছি, তখন একটা বিরাট জয়ের আনন্দে সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। হায়, তারা বুঝতে পারে নি যে, আমরা শুধু আমাদের কর্মপন্থাই বদলেছি, হার স্বীকার করি নি। আমার মনে এর ভেতরই 'আস্তে-কাজ' এই কৌশলের সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছিল, যাকে পরে আমরা শামুক-গতি নাম দিয়েছিলাম। এ ছাড়া অন্য আরও ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতার কথাও ভাবছিলাম আমি। সরকারী প্রহরী-দের সশস্ত্র অবস্থায় দেখে আমাদের দলের সবাই খুব খুশি হয়েছিল সেদিন যে, তারা আমার কথা মেনে নিয়েছিল, না হলে কিছুসংখ্যক বন্দী নিশ্চয় খুব জখম হতো জোর-জুলুমের ফলে।

কেনিয়ার মরুভূমির উত্তরাঞ্চলে রুদ-লফ্ হ্রদ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে লড্-ওয়ারের অবস্থিতি। এখানে বৃষ্টি হয় খুবই কম, আর সেখানকার বেলে মাটি সব সময়ই ধূলি-ধূসর করে রাখে চারি-দিক। লড্‌ওয়ার কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে সাড়ে চারশো মাইল উত্তরে, এমন কি সব থেকে নিকটস্থ কিটালে শহরও লড্‌ওয়ার থেকে দুশো মাইল দূরে। কয়োপ শিবিরের মতো এখানেও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী এবং নিকটস্থ টার্ক-ওয়েল নদী, গরমকালে শুকিয়ে একেবারে বালুর চর দেখা যায়, যদিচ বর্ষাকালে সামান্য কয়েকদিনের জন্য সে ফুলে-ফেঁপে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। প্রখর সূর্যের তাপ সকাল ছ'টার পর থেকেই শুকনো মাটিকে তাতিয়ে গরম [illegible] মতো করে দেয়, আর রাত্রে সে তাপ মিলিয়ে গিয়ে ধরণী ঠাণ্ডা হবার আগেই পরের দিনের সূর্যদেব আবার দেখা দেন। গরমের সময়ে রাত্রে কম্বল বা অন্য কিছু চাপা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। লড্‌ওয়ারের কাছে-পিঠে তুর্কানা উপজাতীয় লোকেরা বসবাস করে এবং তাদের দারিদ্র্যপূর্ণ কণ্টকর জীবনযাত্রা যে-কোন লোকের মনেই দয়ার উদ্রেক করবে। এদের অনেকেই গরমের এবং অভাবের হেতু সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে চলাফেরা করে দিনে-দুপুরেও এবং গৃহপালিত গবাদির দুধ এবং মাংস খেয়ে কালাতিপাত করে। তাছাড়া পেঁপে জাতীয় মুকোমা নামক এক গাছের ফলের উপরও এরা নির্ভর করে প্রচুর পরিমাণে। এই গাছগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় পনেরো থেকে কুড়ি ফিট উঁচু হয় এবং এদের ফল আকারে প্রায় আপেলের মতো। তুর্কানারা এই ফলকে পিষে গরু বা ছাগলের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে বেটে খায়। জীবন্ত গৃহপালিত গরু-ছাগলের গলায় অতি ক্ষুদ্র এক তীর-ধনুকের সাহায্যে একটি ছোট ফুটো করে সেখান থেকে কিছু পরিমাণ রক্ত তারা প্রায়ই বার করে নেয় খাবার জন্য এবং এই রক্তই মুকোমা ফলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এ ছাড়া ঐ ফলকে গাঁজিয়ে নিয়ে তার থেকে মদও তৈরি করে তুর্কানারা এবং গাছের নরম পাতা দিয়ে তৈরি করে ঝুড়ি, বাক্স বা মাদুর। আমরা লড্‌ওয়ারে আসার পর মুকোমার পাতা আমাদের কুঁড়েঘরের চালায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করি তাপ নিবারণের জন্য, কিন্তু তুর্কানারা তাকে এভাবে ব্যবহার করতো না। মাত্র কয়েক-দিনের ভেতরই আমি এই পাতা দিয়ে ঝুড়ি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি করতে শিখে ফেলি এবং এই সব জিনিস প্রহরীদের কাছে পাঁচ থেকে কুড়ি শিলিং অবধি দামে বিক্রি করে যৎসামান্য আয়ের উপায় করি। আমাদের নেতা জোমো কেনিয়াট্টাকে আমার হাতে তৈরি একটি বাক্স এবং টুপি পাঠাই এবং কিছুদিন পরে তাঁর মারালাল নামক বন্দিশিবিরে নেওয়া কয়েকটি আলোকচিত্রে ঐ টুপিটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। এর কিছুদিন পরেই তাঁকে লোকি-টাউংগ শিবিরে বদলী করে পাঠান কেনিয়া সরকার। বন্দিশিবিরের প্রহরীরাও প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী হ'ত, ফলে আমরা তাঁর খবরাখবর পেতাম।

লড্‌ওয়ারের যে শিবিরে আমরা অন্তরীণ হিসেবে ছিলাম আসলে সেটাই সেখানকার বন্দিশালা। মাউ-মাউ বিদ্রোহের প্রথম দফায় শাস্তিপ্রাপ্ত লোকেদের ঐ বন্দিশালায় পাঠান হয়ে-ছিল সেখানকার বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য। বন্দিশালাটি একটি বড় চতুষ্কোণ জায়গাকে ডবল করে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে তৈরি করা হয়েছিল; ঘেরা জায়গাটিকে মাঝামাঝি দু'ভাগ করে দিয়ে প্রত্যেক অংশটিকে আবার তিনটি ফালিতে ভাগ করা হয়েছিল এবং এই-ভাবে গঠিত ছয়টি ফালিই অন্য ফালি-গুলি থেকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আলাদা করা হয়েছিল। প্রত্যেক ফালিতে একটি পাথরের তৈরি দেওয়াল ও টিনের ছাদ দেওয়া কুঁড়েঘরের মতো ছিল, যার ভেতর ছিল চারটি করে খুপরি ঘর। কোন্ ঘরে কে কে শোবে তা আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতাম। ১৩ নম্বর ঘরে আমি ও আরও এগারো-জন বন্দী ছিলাম। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ঐ চতুষ্কোণ জায়গার বাইরে আমাদের রান্নাঘর, অন্য একটি ঘরে সেলাই মেসিন সমেত জামা-কাপড় সেলাই করার জায়গা এবং আমাদের জন্য ব্যবহৃত তেলের বাতিগুলি পরিষ্কার করার জায়গা ছিল। কিরোরি মটোকুর কাজ ছিল শিবিরের সব আলোগুলির দেখাশুনা করা। এই প্রথম আমরা বন্দি-জীবনে রাত্রে ব্যবহারের জন্য আলো পেয়েছিলাম। রান্নাঘর থেকে অল্প একটু দূরে একসঙ্গে আরও দু'টি ঘর ছিল, এগুলি কোন বন্দীকে নির্জন কারাবাস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হ'ত।

লড্‌ওয়ারে চৌদ্দ মাসকাল থাকার সময় জোসেফ কিবিরা ও আমি একই ঘরে একই বিছানায় শুতাম, কারণ সেখানকার নিয়মানুযায়ী এক-একটি বিছানায় দু'জন করে বন্দীর শোয়ার বরাদ্দই ছিল। সোয়াহিলি ভাষার একটি প্রবাদে বলা হয়েছে, "উঁসিমুয়ামিনি মটু ইকিয়্যা হামজামালিজা গুণিয়া লা চুম্বি পামোজা", অর্থাৎ কারুর সঙ্গে বাস করে এক বস্তা নুন শেষ না করা অবধি তাকে তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো না। জোসেফ এবং আমি এখন একত্রে দ্বিতীয় নুনের বস্তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি; সে আমার রাজনৈতিক জীবনের ও ব্যবসার অন্তরঙ্গ বন্ধুবিশেষ।

[ক্রমশ]

এ-দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জন। আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। কিছুক্ষণ আগে অন্যান্য বন্ধুরা বালুর উপর হুটোপাটি করছিল, হৈ-হল্লা করছিল। তারপর রাত হলে ওরা কে কোন্‌দিকে হারিয়ে গেল। আমি আনন্দকে কাছ-ছাড়া করছিলাম না। দুপুরে ওরা আনন্দকে জোর করে জলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আনন্দ প্রবলভাবে আপত্তি করছিল, হাত-পা ছুড়ছিল, কেউ শোনে নি সে কথা। তারপর বিরাট একটা ঢেউ ওদের দিকে যখন তীব্রবেগে ছুটে আসছিল, তখন আতঙ্কগ্রস্ত আনন্দ চিৎকার ক'রে বলেছিল, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম। আমরা সকলে ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা টানতে টানতে বালুর উপর এনে ফেলেছিলাম। সেই থেকে আনন্দ চুপ ক'রে আছে। ওর দিকে তাকাতে কখনও কখনও ও একটু মৃদু হেসেছে। জলকে, সমুদ্রকে ওর ভীষণ ভয়। বন্ধুদের উৎসাহে, হয়ত বা সমুদ্রের ধারে সে বেড়াতে এসেছে বটে, কখনও জল থেকে অনেক দূরে শুকনো বালুর উপর পায়চারীও করে, কিন্তু এ কয়দিনে একবারও সে সমুদ্রের জল স্পর্শ করে নি। বেশির ভাগ সময়ই সে ঘরে থাকে, শুয়ে-বসে বইপত্তরের পাতা উল্টায়, অথবা সব কিছুর আড়ালে লুকিয়ে সে নিজে নিজে কথা বলে, গভীর একপ্রকার মগ্ন চিন্তায় ডুবে থাকে। বাইরে অশান্ত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ যখন ভয়াবহ রূপ নেয়, আর্তনাদ ক'রে বালুভূমিতে আছড়ে পড়ে, আনন্দ তখন ঘন ঘন সিগারেট টানে, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়। আমরা যখন সাগরে নেমে লাফালাফি করি, জল ছিটাই, হুল্লোড়ে মাতি, তখন সে অদূরে রেস্টুরেন্টের জানলার ধারে এক পেয়ালা চা নিয়ে বসে থাকে। দৃষ্টি তার সাগরের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোথায় কোন্‌ অতল রহস্যের জগতে হারিয়ে যায় কে জানে। এমনিতে সে কথা বলে কম। এখানে এসে একেবারে যেন থমকে গেছে। কী-সব ভাবে। সম্ভবত সেই জন্যই সে আমাকে ভীষণ আকর্ষণ করে। সমুদ্রের মত গভীর এবং রহস্যময় মনে হয় ওকে।

আমি বুঝতে পারছিলাম আনন্দর কথা বলা প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই আমি করছিলাম। বন্ধুরা এখন নেই। দূরের ঝাউবনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, কেমন লাগছে আনন্দ? সমুদ্র তোমার কেমন লাগে?

আনন্দ বলল, সমুদ্রকে আমার ভয় করে, অথচ কী দুর্বার আকর্ষণ, দুপুরের ঘটনায় আমি সত্যিই দুঃখিত হিমাংশু। আমি এখন বুঝতে পারছি, আরও একটু সাহস সঞ্চয় করা প্রয়োজন ছিল।

নিশ্চয়ই! তুমি, আমরা এতগুলো লোক থাকতে জলে ডুবে যাবে—ভাবতে পার আনন্দ? আমাদের কি তুমি বিশ্বাস করতে পার নি?

আসলে নিজের উপর বিশ্বাস ছিল না। এখন বুঝি, একটা বড় রকমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমি আর একবার হেরে গেলাম।

আমরা বালুর উপর বসলাম। শীত-শীত একটা নোনা বাতাস সাগরের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। কতদূর থেকে এই হাওয়া আসছে, আমরা জানি না। আমি আনন্দর খুব কাছে ঘন হয়ে বসলাম। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল সামনে সাগরের দিকে তাকিয়ে।

আমার বাবা, মা'র মুখে শুনেছি, মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। পদ্মানদীতে তখন এই রকম উত্তাল তরঙ্গ—

কথা কয়টা ব'লে আনন্দ সামনে অনেকদূর তাকিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করল। অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমুদ্র প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে। আমাদের সামনে বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়ে ঢেউগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে অনেকটা আত্মগত-ভাবে বলতে লাগল আনন্দ, একখণ্ড কালো মেঘের ঝড়ে সেইদিনই বাবার মৃত্যু হওয়ার কথা। আমি অবশ্য বরা-বর লক্ষ্য করেছি, মৃত্যু-এই শব্দটা ব্যবহার করতে মা কখনও চাইত না। শব্দটাই এমন যে, মা শিউরে উঠত। বাবার সেই যুবক বয়সের চেহারা, সাহস, পদ্মাপারে পাবনা শহরে তাঁর গোমস্তাগিরি, ঠাকুরমার কঠিন অসুখে

সংবাদ শুনে বিচলিত মন এবং নৌকাপথে বাড়ি ফেরার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে কেমন ক'রে সেই সাংঘাতিক বিপদের হাত থেকে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন, ধীরে ধীরে মা সবই বলত। পরে আমি ভেবে দেখেছি, অন্তরালে একটা মৃত্যুভয় ছিল বলেই মা ঘটনাটাতে এমন গুরুত্ব আরোপ করত। মৃত্যু হতে পারত, খুবই নিশ্চিত ছিল, বলতে পার মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থেকে বাবা ফিরে এসেছিলেন।

সামনে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একজোড়া নরনারী ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। ওরা আজ অনেক হালকা, হেসে কথা বলে, স্পর্শ করে জীবনের স্বাদ গ্রহণ করছে।

হাঁ, ঠিক। মৃত্যুর উদ্যত আলিঙ্গন থেকে তিনি ফিরে এলেন। ফিরে এলেন এবং আমাদের জন্ম হলো,—আমার এবং আমার বোনের। একটিই মাত্র বোন আমার। আমাদের পিতার তারপর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তখন আমার বয়স তিন বছর এবং বোনটির দুই মাস।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে আনন্দ বলল, ভয় কাকে বলে আমি জানতাম না। জল বল, আগুন বল, ট্রেন বল, অন্ধকার বা সূর্যালোক—কখনও ভয় করি নি। এখন, আজকাল, দেখলে ত' আমি জলের ধারে যেতে ভয় পাই। মনে হয় ডুবে যাব। কতদিন কেবল বসে থাকতে থাকতে আমি জলে ডুবে গেছি। আমার চার পাশে কোন অবলম্বন নেই, এক টুকরো খড়কুটো নেই, বন্ধুরা নেই—আমি তখন ঈশ্বরকে ডেকেছি, আমি মনে মনে কত বলেছি, আমাকে একটু অবলম্বন দাও, আমি তলিয়ে যাচ্ছি, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—তারপর এক সময় তাকিয়ে দেখি, বসে আছি চুপ করে, আমার সামনে বই, কখনও বা অফিসের ফাইল।

আনন্দ এই জাতীয় কথার মনে তলিয়ে যাক, এ আমি চাই না। তার দৃষ্টি ফেরানোর জন্য বললাম, তোমার ছেলে-বেলার কথা বল, যখন ভয় কাকে বলে তুমি জানতে না।

ছেলেবেলার কথা। ছেলেবেলার কথা মনে হলে আমার পিসিমার কথা মনে পড়ে। পিসিমা আমাকে কোলে করে পাখি দেখাতে দেখাতে ভাত খাওয়াত। নতুবা আমি খেতে চাইতাম না। ছেলেবেলার খেতে ইচ্ছা হত না, একটু বড় হয়ে চেয়েও পেতাম না—এই যা তফাৎ—আনন্দ শব্দ করে হাসল। কেন না দেশ ভাগ হলো, আমরা তখন জেলে বেড়াচ্ছি—রেল স্টেশন, উদ্বাস্তু কলোনী, সরকারী ক্যাম্প, ভাতের জন্য দীর্ঘ লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা! থালা কাঠা ব্যাগ ডেকচিতে সেই ঠেলাঠেলি চরমটা, ওঃ! কী ভীষণ দুর্বিসহ সেই জীবন!

: আনন্দ, ছেড়ে দাও এ-সব কথা, আমি তোমার ছেলেবেলার,—খুব যখন ছোট ছিলে—তখনকার কথা জানতে চাইছি।

: হাঁ, ছেলেবেলাকার কথা বলছি। আমাদের বাড়ির পাশে একটা বকুল গাছ ছিল। সেখানে দত্তদের মেয়ে পুতুলের সঙ্গে লাট্টু ঘোরাতাম। কাগজের নৌকো বানিয়ে পাশে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিতাম। পুতুল অদ্ভুত সব গল্প বলত। আমি শুনতাম। আমি নাকি রাজপুত্র, একদিন ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যেন চলে যাব। তারপর কোন এক ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাতে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসব। পুতুলকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটতে থাকব। সামনে আমাদের নদীনালা, খালবিল, তেপান্তরের মাঠ। অবশেষে আমরা পৌঁছুব সেই বিরাট পাহাড়ের উপর, যেখানে সারা মাস বরফ পড়ে। সেই তুষারধবল পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় যেন আমাদের যেতে হবে। আমরা পাহাড়ে উঠব সন্তর্পণে। চারদিকে জীবজন্তু, ধারালো দাঁত আর নখ তাদের উদ্যত। আমরাও হুঁশিয়ার। তারপর এক সময় সে কী ভীষণ এক লড়াই!

আনন্দ চুপ করল। উত্তীর্ণ সন্ধ্যার নির্জন বালুবেলায় মহারহস্যকে সামনে রেখে আমরা দু'জনে বসে আছি। দূরে অদূরে অন্ধকারে ঢেউ ভাঙছে। বিরাটাকার দৈত্য হা করে বেলাভূমি গ্রাস করতে ছুটে আসছে। কেন তার এ-আক্রোশ, কার উপর তার এ-রাগ কে জানে! আমি সেদিক থেকে আনন্দর দৃষ্টি ফেরানোর জন্য বললাম, তারপর রাজপুত্র আর রাজ-কন্যার কি হল?

আনন্দ বোধহয় একটু হাসল। বলল, রাজপুত্র প্রচণ্ড উৎসাহে পড়াশুনা শুরু করল। একদিন যে তাকে কোথায় যেন যেতে হবে পতুলকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ধুলো উড়িয়ে। কিন্তু হায়রে কপাল! রাজপুত্রের আর সে সাধ পূর্ণ হলো না। রূপকথার রাজকন্যা আর একজনের পাশে বসে, লালচেলি মালা চন্দনে শোভিত সুন্দর কচি মুখখানি ছবির মত, কোথায় হারিয়ে গেল। রাজপুত্রের জন্য রেখে গেল ঐ ছবিটুকু আর একটা দৃষ্টি, চোখের জলে ঝাপসা।

আনন্দর কথা শুনতে শুনতে আমারও কৈশোরকে মনে পড়ছিল। বাল্য-কৈশোর বোধহয় সকলেরই এক, সুখের এবং কান্না-ভরা। আনন্দর সেই বয়স, পুতুল, কল্পনা-প্রিয় বালকের প্রথম বিয়োগ-ব্যথা, এই সময়ে,—দেখতে দেখতে মন কোন এক অসীম অস্পষ্ট রহস্যালোকে চলে গেল!

আনন্দ বলল, মা আর বোনকে নিয়ে একদিন অজানার উদ্দেশে ভাসতে হলো। তুমি বুঝতে পারছ হিমাংশু, দেশ তখন ভাগ হয়েছে। আর তোমাকে বলতে সঙ্কোচ কি, তখন এবং এখনও দেশ বিভাগটাই আমার কাছে বড় ঘটনা। স্বাধীনতার ব্যাপারটা আমি আজ পর্যন্ত ভাল বুঝতেই পারলাম না। ফুলটা গাছ থেকে তুলে তুমি দেবতার কাজে লাগালে, প্রিয়জনকে উপহার দিলে, ভাল কথা, তাতে ফুলের বেদনা কমল কি, বা আয়ু?

একটু চুপ করে আবার বলল সে, অবশ্য তার কারণও আমি ভেবে দেখেছি, আমার জীবনে সুখ চুঁইয়ে পড়ার মত কোন ঘটনা নেই। আমি নিজেকে বুঝার চেষ্টা করি যখন, তখন এই বোধটা আমাকে খুব পীড়িত করে তোলে যে, গাছ থেকে আমাকে না তুলে আনলে হয়ত আমি শুকিয়ে যেতাম না এমনি করে। অবশ্য বলতে পার, তার জন্য আমার বাবাও কম দায়ী নন। তিনি, আমি মার মুখে যেমন শুনেছি, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। পদ্মানদীর সেই ভয়ঙ্কর ঢেউ-এ তিনি জলমগ্ন হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধ করে বেঁচে গিয়েছিলেন। আট দশ মাইল সাঁতার কেটে তবে তিনি ডাঙায় উঠেছিলেন, মা বলতো চড়ায় এসে প্রায় সংজ্ঞাহীন দেহটা তাঁর আটকে ছিল। তুমি বলতে পার, ঠিক এই জায়গা থেকেই আমার জীবন শুরু। আমিও প্রায়শ সাঁতার কাটি, কেন না আমার অস্তিত্ব ঘিরে সর্বক্ষণ ঢেউগুলি উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ডুবে যাই আবার ভেসে উঠি।

...তখন আমরা সরকারী ক্যাম্পে। দীর্ঘ লাইন দিয়ে খয়রাতি দানের জন্যে উন্মুখ প্রতীক্ষা! রোদে মাথা ফেটে যায় দুই ভাই-বোনের, তবুও লাইন থেকে সরতে পারি না! তখন দেখতাম, মা

মাঝে মাঝে আঁচলে কয়েক মুঠো চাল বেঁধে কোথা থেকে আসত। সরকারী নির্দেশে একদিন আবার উঠতে হলো। বা বলতে পার, অন্যতর কোন মারাত্মক ঢেউ-এর মুখে আমাদের আর একবার ছেড়ে দেওয়া হল। নতুন কলোনীতে আমরা সামান্য মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই পেয়েছিলাম। কিন্তু মা আর বোনটিকে আমি খাওয়াব কি? ততোদিনে কোন্ ফাঁকে আমি বড় হয়েছি, বোনটিও। আমরা টুইশন করে বা ছোট-খাটো কাজকর্ম করে বাঁচার জন্য লড়াই করতে লাগলাম। সঙ্গে পড়াশুনো। দুই ভাই-বোন পাশ করলাম বটে, কিন্তু চাকরি জুটল না। জুটল একটা উপসর্গ। পাড়ার একজন সুহৃদ আমাদের উপকারের জন্য এগিয়ে এল। তার দলবল ছিল ভারী। মা আর বোনের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ঝগড়া হতে লাগল। মা বলতে শুরু করল, খেতে দিতে পারি না, ওকে আমি শাসন করব কি দিয়ে? ওফ, আমাকে কিছু একটা করতেই হবে। আমি ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াই তখন। কিন্তু সময় আমাকে সুযোগ দিলে না। সময়ের অনিবার্য ফল পাওয়া গেল। প্রথমত, মায়ের শরীর শীর্ণ হতে হতে বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। মা আর উঠতে পারল না। তার হাত-পা শিথিল হয়ে গেল, মাথা নিচু হয়ে গেল। দ্বিতীয়ত, বোনটির জীবন নষ্ট হয়ে গেল। হিমাংশু, এই দুটি ঘটনা—ক'টা কথায় বলা গেল.—অথচ কতটুকু বলতে পারলাম। সেই ঘটনা, আমাদের সেই কলোনীর জীবন, লোকের ভ্রুকুটি এবং নিজের বেকারত্ব সব মিলে ঐ দেশ বিভাগের কথাটাই আবার ভাবলাম। কতবার কতভাবে ঐ একই কথা ভাবলাম। স্বাধীনতার স্বাদ, সত্যি বলছি হিমাংশু, তখনও কিছুই বুঝতে পারি নি। বলতে পার, তখন পর্যন্তও জীবনের দিকে মুখ বাড়িয়ে কিছু খুঁজছিলাম। হৃদ-স্পন্দের শব্দ গুনতাম। একে কি স্বার্থ বলবে, মোহ বলবে? এমন হতে পারে, লোকে যাকে অহং বলে, সে বস্তু পুরো-পুরি আমার মধ্যে তখনও বর্তমান। ফলে অন্যতর সত্য উপলব্ধি করতে আমি পারি নি। এই সেই অহং যা পদ্মানদীর অতল স্পর্শ থেকে ফিরে এসে বাবা আমাকে দিয়ে গেছে। সেই অহং যা পুতুলের টানা টানা চোখের বিস্মিত দৃষ্টি থেকে পেয়েছি, যা আমার শিক্ষক এবং সুহৃদ সহপাঠীদের নিকট থেকে পেয়েছি। আমার বাবা, পুতুল, শিক্ষক এবং বন্ধুদের আমি তখনও হারাতে পারি নি। বস্তুত সেই অহং-বোধই আমাকে মাথা উঁচু করে রাখতে সাহায্য করেছিল। বোনটির পিঠে হাত দিয়ে জীবনের স্বপক্ষে অনেক কথা বলতাম। মাকে বেঁচে থাকার কথা বললাম। এমনিভাবে আমিও কাজ করে চললাম, এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও কাজ করে চলল। বোনটি দেখলাম একদিন সেই সময়-স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিল। মা, আনন্দ এবং অনীতার মা, কত সহজে বলতে পারল, হতভাগী বেঁচেছে। মায়ের চোখে তখন অজস্র অশ্রুর বন্যা। পৃথিবীর প্রাণ যদি কঠিন না হোত হিমাংশু, সে চোখের জলে সব গলে যেত।

আনন্দ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ নাটক নাটক মনে হচ্ছে, না? দাও, একটা সিগারেট দাও।

টিন খুলে সিগারেট দিলাম। শূন্যে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, গলা যে ভাই শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। চল, চা খাওয়া যাক।

আমরা সাগরের তীর বেয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। আনন্দ সাগরের স্পর্শ বাঁচিয়ে আমার ডান দিকে শুকনো বালির উপর দিয়ে হাঁটছিল। মাঝে মাঝে সাগরের দু'-একটা তরঙ্গ আমাদের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছিল। সমুদ্রকে আমিও ভয় করি। আবার আকর্ষণও অনুভব করি। সেদিন কোণারকের সমুদ্র দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছিল, সম্মোহিত হয়ে মানুষ সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। বললাম, দেখেছ কী বিস্ময়! কী রহস্য এখানে! একে তুমি বুঝতে চাও না?

আনন্দও হয়ত এমনিতর কোন রহস্যের কথাই ভাবছিল। বলল, মানুষের জীবনটাও কম রহস্যময় নয়। তোমাদের গল্প-কাহিনী বল, যে-কোন প্রাকৃতিক শক্তি বল, আমার মনে হয়, তার চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মানুষের জীবন। এখানে অনেক বড় নাটক আমরা নিত্য অভিনয় করে থাকি। আমরা অভিনেতারা সারাক্ষণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছি বলে তার রস-টুকু তেমন গ্রহণ করতে পারি না।

রেস্টুরেন্টের জানলার ধারে আনন্দর প্রিয় টেবিলে আমরা বসলাম। চায়ের পেয়ালায় অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিল সে। পূর্ব কথার সূত্র ধরে বলল, তুমি শুনে হয়ত দুঃখ পাবে হিমাংশু, আমার বোন অনীতার মৃত্যুর ঠিক পরে আমি একটি চাকরি পেয়ে গেলাম। তোমাকে বলতে দ্বিধা কি, আমি খুব সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, আমি এতদিনে মা এবং বোনের সম্মান রক্ষা করতে পারি। গঙ্গার ধারে ঘাসের উপর সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বসে ছিলাম। বাবার কথাও মনে পড়ছিল। এমনি এক নদীতে—আরও গভীর এবং ভয়ঙ্কর নদীতে ডুবতে ডুবতে বাবা জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। আমার চাকরি না-পাওয়া এবং পাওয়ার বোধ খুব পাশাপাশি, নিকট-সম্বন্ধযুক্ত। এর থেকেই বাবার মৃত্যু-সম্ভাবনা এবং আমার জন্মের বোধে চলে গেলাম। গঙ্গার জলে সেদিন

বাবাকে দেখলাম, এই প্রথম জীবনে প্রত্যাবর্তনের মত। কা শ্বাসকণ্ঠ তখন আমার। আসলে আমরা ক্ষণে ক্ষণে, আমার পিতার মৃত্যু-সম্ভাবনা এবং জীবন ফিরে পাওয়ার মত, আর এক জীবনে ফিরে ফিরে আসি নাকি? আসি এবং ছটফট করি। হয়ত একটা যন্ত্রণার জগৎ সৃষ্টি করি, তবুও আসি।

এক পেয়ালা চা শেষ করে সে আরেক পেয়ালার অর্ডার দিল। আনন্দকে যেন আজ কথায় পেয়েছে। এতদিনের এত রুদ্ধ জীবনের অনেক কথা বলতে পারলে সে বাঁচে যেন। একটা কথার সঙ্গে অন্যটার খুব যে একটা মিল ছিল তা নয়। না থাকাটাই হয়ত স্বাভাবিক। পর পর সাজিয়ে-গুছিয়ে সে কিছুই বলছিল না। তবুও সমুদয় ঘটনার মধ্যে দুরাশ্রয়ী কোন যোগ হয়ত থাকেই, আনন্দর কাহিনীও সেদিক থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নয়।

আনন্দ বলল, চাকরির কথা যখন উঠল, তখন আমার চাকরি জীবনের দুটো-একটা ঘটনা বলি। কোন একটা সকালে অফিসে এসে খবরের কাগজের দিকে একটু তাকিয়েছিলাম। সেদিন কি যেন একটা পড়ার মত সংবাদ ছিল বলে আমি উৎসুক হয়েছিলাম। নইলে খবরের কাগজ আমি বড় একটা পড়ি না। তখন অফিসার ভদ্রলোক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি বুঝতে পারি নি। পরে চোখ পড়তেই আমাকে উঠে দাঁড়াতে হল। তিনি বললেন, যু আর মার্কড্ অ্যাবসেন্ট, যে গো হোম। তিনি তাঁর কামরায় ফিরে গেলে আমিও চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। বড়বাবু এলেন। ভদ্রলোক বিনীত কর্মী হিসাবে সুনাম কিনেছেন যথারীতি উন্নতিও করেছেন। খুব ধীরে ধীরে কথা বললেন। তিনি আমাকে যা বললেন, তার সারমর্ম হল, নতুন চাকরি, নতুন উদ্যমে কাজ করতে হবে, নিষ্ঠা এবং সততা দেখাতে হবে। এখন থেকে অফিস এবং অফিসের কাজকে ধ্যান-জ্ঞান করতে হবে। আমাকে তিনি অফিসারের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সেদিন কাগজ পড়ার অপরাধে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হল। এই অফিসারের ঘরেই আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সে কথা বলে লাভ নেই। অফিস যে আমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করে সবই তোমার জানা। আসলে আমাকে ঠিক আমার মত করে ওরা গ্রহণ করতে পারে নি। ওদের কাছে জীবিকা মানেই জীবনকে গলা টিপে হত্যা করা। দাসানুদাস না বানাতে পারলে ওদের মেজাজ ঠিক থাকে না। এমন কি, ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ওরা হস্তক্ষেপ করতে চায়। সেই অফিসের একজন মহিলা কর্মীর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। আমরা একদিন একটা ইংরেজী ছবি দেখতে যাই সাহেব পাড়ায়। পরদিন অফিসার ভদ্রলোক আমাকে ডেকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কথাগুলো প্রত্যক্ষভাবে আমার ব্যক্তিত্বকে আঘাত করল। আমি সেই দিনই চাকরি ছেড়ে দিলাম।

: ভালই করেছিলে, না হলে আমরা তোমাকে পেতাম না।

: পেয়েই বা লাভ হলো কি? জানো, ঐ অফিসার ভদ্রলোকটির সঙ্গে একবার এই সমুদ্রের ধারে আমার দেখা হয়। আমি তখন সবে তোমাদের অফিসে ঢুকেছি। ভদ্রলোক আমাকে দেখে কিঞ্চিৎ বিচলিত-বোধ করলেন। এমন হতে পারে যে, তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন বলে তিনি সহজ হতে পারছিলেন না। তাঁরই একজন অধস্তন কর্মচারীর স্ত্রী। তখনও খুব বিস্ময় লাগে, জলকে আমি মোটেই ভয় করতাম না। কাউকেই ভয় করতাম না। এখন সকালবেলা তোমরা যেমন স্নান কর, আমিও তেমনি সমুদ্রে... ... ... না, সেখানে নেমে স্নান করতাম। সে কথা মনে হতেই এখন আমাকে শুধু ভাবি; হাত পা শিথিল হয়ে আসে।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, সেদিন ভদ্রলোককে আমি ডেকেছিলাম কিন্তু তিনি কূল থেকে এক পা-ও নড়েন নি। জানো হিমাংশু, এই ভদ্রলোক ঠিক আমার বাবার মত বা এখনকার আমার মত, জল দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আমার বাবা শুনেছি, পদ্মানদীতে নৌকাডুবির পর, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়ে জল দেখে খুব ভয় পেতেন। নদী তো দূরের কথা, মা বলত, কোনদিন একটা খাল-বিলও আর পাড়ি দেন নি। তোলা জল ছাড়া স্নান করতেন না।

পরদিন সকালে আনন্দ সমুদ্রের তীরে বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে নুলিয়াদের মাছ-ধরা দেখছিল। আমি বালির উপর শুয়ে গায়ে রোদ লাগাচ্ছিলাম। বন্ধুরা জলে নেমে হৈ-চৈ করে স্নান করছে। হঠাৎ আনন্দ আমাকে বলল, দেখ দেখ, কী মারাত্মক স্রোতের সঙ্গে ওরা লড়াই করছে!

আমি দেখলাম। কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না। মন্তব্য করার প্রয়োজনও ছিল না। কেন না, আনন্দ তখন মানুষের জীবন-সংগ্রামের আর এক রূপ দেখছে। এতদিনের অবরুদ্ধ মন তার অন্যতর জীবন-সংগ্রামকে দেখতে পেয়েছে। সে রুদ্ধশ্বাস তন্ময়তার সঙ্গে নুলিয়াদের ডাঙায় আসার প্রতীক্ষা করছিল।

মাথায় অদ্ভুত টুপি, পরনে নেংটি, কালো দেহ, শক্ত-সামর্থ্যে গড়া নুলিয়ারা যখন তাদের শোলা লটকানো জাল টেনে তুলল বালির উপর, আনন্দ তখন শিশুর মত সেদিকে দৌড়ে গেল! জালের মধ্যে ছোট ছোট সাদা জীবন্ত মাছগুলো লাফাচ্ছিল। আনন্দ নিজেই ধরে ধরে ওদের বাঁশের তৈরি পাত্রে রাখতে লাগল। জাল ঝেড়ে নুলিয়ারা মুহূর্তে আবার ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের ছোট্ট ডিঙির অস্তিত্ব তখন আছে কি নেই, বুঝতে পারা যায় না। আর দূর থেকে ওদের মাথার উপর টুপির ছুঁচলো প্রান্ত একটা বিন্দুর মত ভাসছিল।

আমি আনন্দর কাঁধে হাত রাখলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বললাম, আনন্দ, সমুদ্রে নামবে? আনন্দ যেন একটু চমকে উঠল। বলল, পারব?

আমরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে এলাম। একটা বিরাট ঢেউ আসছিল। বললাম, আনন্দ, হুঁশিয়ার, আমরা ঢেউ-এর মুখোমুখি ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

বাঘ ও অজন্তা (বৈশাখ, ১৩৭৭) : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী। ২০৬, বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য পুস্তকে শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পতীর্থ 'বাঘ' ও 'অজন্তা' গুহা শ্রেণীর ভাস্কর্য ও শিল্প-সৌকর্যের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবন্ধ করেছেন।

মধ্য ভারতের মহু স্টেশন থেকে বাসে ধার শহর হয়ে যেতে হয় বাঘ গ্রামে। বাঘিনী নদীর তীরে খাড়া পাহাড়ের বুকে প্রায় ২,২৫০ ফুট লম্বা বাঘ গুহা-শ্রেণীতে এখনো পর্যন্ত ৯টি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। নির্মাণকাল পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ খৃস্টাব্দ। ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থটি আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। এর তুলনায় অজন্তা বহুআলোচিত। অজন্তা গুহাশ্রেণী অবস্থিত মহারাষ্ট্রের ঔরংগাবাদ শহর থেকে ৬৫ মাইল উত্তরে। আবিষ্কৃত গুহা সংখ্যা ৩০টি। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় পৌনে এক মাইল দীর্ঘ। খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এগুলি নির্মিত।

সাধারণ রম্যরচনা বা ভ্রমণকাহিনী [illegible]টি নয়। শিল্পীর সন্ধানী সজাগ দৃষ্টি [illegible]য়ে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ এবং [illegible] [illegible]রেছেন। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা, [illegible]পত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত [illegible]তে চান, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি [illegible] মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] গুহাশ্রেণীর [illegible] [illegible] আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও ইতিহাস সম্পর্কে সোমেশ্বরদেব, [illegible]নদেব, বুদ্ধঘোষ, ভরত মুনি, মুনীশ্বর, [illegible]জদেব, শ্রীকুমার প্রমুখ প্রাচীন শিল্প-[illegible]দের মতামত উল্লেখ করেছেন। পাশা-পাশি রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ, মুকুল দে, কুমারস্বামী ইত্যাদি একালের স্বনামখ্যাত শিল্পিবৃন্দের মতামত। অধ্যাপক তুচ্চি, ডঃ গ্রিফিথস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই সব অমর শিল্পকর্ম দেখে কি রকম অভিভূত হয়েছিলেন, তারও কিছু কিছু লেখক উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও ভিত্তিচিত্রগুলি ছড়িয়ে আছে।

বাঘ ও অজন্তার শিল্প উৎস থেকে একদিন গোটা পূর্ব এশিয়ার শিল্পধারা জীবনরস আহরণ করেছিল। লেখকের মতে, বাঘ ও অজন্তার চিত্রগুলি শিল্প-দক্ষতার বিচারে সমপর্যায়ভুক্ত। তবে, অজন্তার বেশির ভাগই ধর্মমূলক। জাতক ও বৌদ্ধ জীবনীকে ধরেই তার বিন্যাস। বাঘ কিন্তু মানবীয় আবেগে মূর্ত। সম-সাময়িক মানুষের দুঃখ, আনন্দ, জীবন ধর্মের অপূর্ব সম্মিলন ঘটেছে বাঘের অসাধারণ চিত্রগুলিতে।

গুহাগুলি একাধারে বিহার ও চৈত্য। বাঘ গুহার অবলোকিতেশ্বর-এর মূর্তি বিরাট বিরাট স্তম্ভের বন্ধনীর কারুকার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্ধনীতে খোদিত সিংহের এমন সরল রাজকীয় বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী ও উপস্থাপনা খুব কমই চোখে পড়ে। ভিত্তিচিত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও দক্ষ তুলির রেখায় জীবন্ত। বুদ্ধ এবং উপাসক, বোধিসত্ত্বগণ, শোক ও সান্ত্বনা, [illegible] [illegible] ইত্যাদি ভিত্তিচিত্রগুলি, [illegible], হংসমিথুন ইত্যাদি গুহার [illegible] [illegible] [illegible] স্পর্শ [illegible]। আর, অজন্তা [illegible] বাস্তবকেও [illegible] [illegible]। শিল্পী বলেছেন, 'বাঘগুহা আমাকে [illegible] করেছিল, অজন্তা [illegible] করেছে।' [illegible] অজন্তা গুহা-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কবাল [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্রে পরিণত হত। অজন্তা শিল্পের বৈশিষ্ট্য এর গতি-শীলতা। কী মূর্তি, কী চিত্র, এখানে সবই চলমান, [illegible]। ২০ সংখ্যক গুহার [illegible] [illegible] গতিবেগ, ১৭ সংখ্যক গুহার বিমানচারী গন্ধর্ববৃন্দ, অন্য গুহায় অঙ্কিত মৃগদম্পতি ইত্যাদি এই সাক্ষ্য বহন করে।

শিল্পী এখানকার অঙ্কন পদ্ধতির কয়-বুদ্ধির সার্থক প্রয়োগের দিকটি, পরি-প্রেক্ষিত চিত্রণের দিকটি সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন, মনোহারী রঙ-এর বৈচিত্র সুসমঞ্জস ব্যবহারের দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করেছেন, দেখিয়েছেন, ভিত্তিচিত্রাবলী 'ফ্রেস্কোসেকো', অর্থাৎ পূর্বনির্মিত শুষ্ক জমির ওপর বন্ধনী আঠামিশ্রিত (মাটি টেম্পারা) জলরঙ-এর দ্বারা রচিত। বিরাট শিল্পসৌধ গড়ে তোলার কায়দাও ছিল অভূতপূর্ব। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নীচ থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বমুখী গঠন-পদ্ধতি ব্যবহার না করে শিল্পীরা কাজ শুরু করেছিলেন ওপর থেকে। অন্ধকার গুহায় কিভাবে চিত্রাঙ্কন করেছিলেন? কিম্বদন্তী—ধাতুফলকের দর্পণে সূর্যরশ্মি প্রক্ষেপণ করে। আবার চিত্ররচনার ত্রুটির দিকটাও আলোচনা করেছেন, ছবিতে পাহাড় আঁকা, মেঘ আঁকতে পারা, বাতাস, ঝড়, উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্র আঁকাতে আংশিক-ভাবে অক্ষম ছিলেন সেকালের শিল্পিবৃন্দ।

অজন্তা শিল্পকলায় নিহিত আছে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ, সমসাময়িক সভ্যতার নিরিখও কিছু ইতিহাস। কিন্তু ধ্বংসের হাত এড়িয়ে এখনো যা ছিটে-ফোঁটা রয়েছে, তাই দেখে সাধারণ দর্শকও কম অভিভূত হন না। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি, গন্ধজাতক, নাগিনীবৃন্দ, রাহুল ও যশোধরা, সঙ্গিনী, সংগীত পরিক্রমা, বংশীবাদিকা, বৃন্দবাদ্যকার প্রভৃতি ভিত্তিচিত্রগুলি অপূর্ব।

গ্রন্থশেষে ২৯টি মূল্যবান চিত্র সন্নিবেশিত। অধিকাংশই শিল্পী অঙ্কিত। একটি মাত্র আলোকচিত্র আছে অজন্তা গুহাশ্রেণীর সামনের অলিন্দপথ-এর। প্রথম ছবি, 'ধার-এর এক ও বাস গুমটি'র ইতিহাস আছে। শিল্পী যখন বাসের টিকিট পাবেন না, এই ভেবে হতাশ হয়ে বসে ছবি আঁকছিলেন, তখন উনি শিল্পী তা জানতে পেরে স্থানীয় কলেজের ছাত্ররা তাঁকে টিকিট যোগাড় করে দেয়। কলা-কারকে কৃচ্ছ্রসাধন সহকারে এইসব শিল্প-তীর্থ পরিদর্শন করতে হয়েছে। কৌতুক-সহকারে 'লিট্টি' খেয়ে উদরপূর্তির কথা বলেছেন লেখক। শিল্পীর মর্যাদা এই পোড়া দেশে যদি কিছুমাত্রও বেড়ে থাকে, তাহলে তিনি সান্ত্বনা পাবেন। লেখার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেছেন। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীতে ৫৫-খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। যেসব ভ্রমণ-কারী 'বাঘ ও অজন্তা' যাবেন, তাঁরা এই গ্রন্থখানি পড়লে উপকৃত হবেন।

প্রাচীন ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য আলোচনার ক্ষেত্রে 'বাঘ ও অজন্তা' গ্রন্থটি একটি অমূল্য সংযোজন।

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ফাউস্ট–লেসিং-এর জীবিতকালে ফাউস্ট সম্বন্ধে তাঁর রচনার দু'টি দৃশ্য-মাত্র প্রকাশিত হয়—কিন্তু তাঁর লেখার ছোট ছোট অংশ এবং সে বিষয়ে যেসব প্রচলিত মতবাদ ও বর্ণনা তাঁর মৃত্যুর পর ছাপা হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় যে, তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে ফাউস্টের আত্মা শেষ পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই ধরনের একটি বর্ণনায় আছে যে, দেবদূতের কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হয়েছিল যে, মানুষকে যদি শেষ পর্যন্ত অনন্ত যন্ত্রণার রাজ্যেই নিক্ষেপ করা হবে, তাহলে তাকে ঈশ্বর মহৎ প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীব হিসাবে সৃষ্টি করতেন না।

জার্মান সাহিত্যের স্টার্ম এবং ড্রাঙ্গ পিরিয়ডে ফাউস্ট কাহিনীর আকর্ষণ যেন বেড়ে গেল। [Sturm and Drang মুভমেন্টটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার—এটি হচ্ছে ১৭৭০ সালের জার্মান সাহিত্যিক আন্দোলন। শেক্সপীয়ারের গুণাবলীর ব্যাখ্যা করে লেসিং-এর যে প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়, তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল এই আন্দোলন এবং এর নেতারা–যথা, হার্ডার, গায়টে এবং শিলার। এর নামকরণ হয় ফ্রিডারিশ ক্লিঙ্গার (১৭৫১—১৮৩১) রচিত Confusion or Storm and Stress নাটকটি থেকে। এ নাটক জার্মান নাট্য-সাহিত্যকে ফরাসী নিওক্ল্যাসিকাল রচনা-ভঙ্গীর অনুকরণ প্রয়াস এবং প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। In its strictest sense the period of Sturm Und Drang extends from Goethe's Gotz Von Berlichingen in 1773 to Schiller's The Robbers in 1781.]

গায়টে মুলার এবং ক্লাইঙ্গার নিজের নিজের বিশেষ ভঙ্গীতে এ কাহিনী নিয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। মুলার যেসব দৃশ্য লিখেছিলেন, তাকে বলা যেতে পারে আন্-রোম্যান্টিক রিয়্যালিজম—ফাউস্ট যেন অনন্ত আর্থিক দুর্গতিতে বাধ্য হয়ে শয়তানের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদনে উদ্যত।

ক্লাইঙ্গারের উপন্যাসে ফাউস্ট চেষ্টা করছে নিজের ক্ষমতার দ্বারা জগতের অন্যায়ের প্রতিকার করতে। কিন্তু ফল হচ্ছে উল্টো—যতটা অন্যায়ের সে প্রতিকার করছে, তার কাজের ফলে আরও অনেক অন্যায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিণতিতে সে নরকে পতিত হয়ে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে থাকে।

গায়টের ফাউস্ট দু'টি পর্বে রচিত—প্রথম পর্বের রচনা শুরু হয় ১৭৭৪ সালে এবং এই পর্ব প্রকাশিত হয় ১৮০৮ অর্থাৎ ১৮৩২ সালে ছাপা হয়।

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, "How could Goethe, the young Titan (যিনি ফাউস্টের প্রথম পর্ব রচনা করেছেন) and Goethe, the aged Olympian (যিনি ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব রচনা করেছেন), have worked to the same plan ? অর্থাৎ প্রশ্ন-কারীরা বোধ হয় বলতে চান যে, যৌবনে গ্যয়টের যে বিরাট কাব্যপ্রতিভা ছিল, বার্ধক্যে নিশ্চয় তা ক্ষয় পেয়েছে এবং সেই কারণেই ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত হতে পারে নি। কথাটা ঠিক নয়—সমালোচক হের্ জুলিয়াস ব্যাবের মতে— We have not here to do with a work of art begun and finished upon a clear plan. It is not, he insists, a 'created' work, but one which came into being and grew.
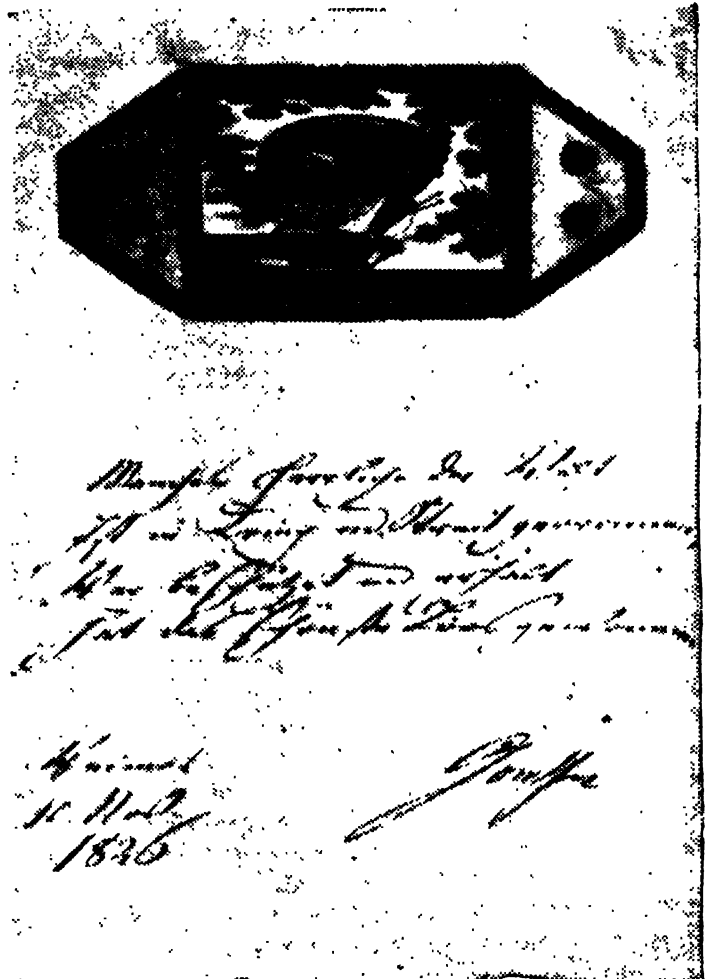
গ্যয়টের হস্তলিপি

"যেসব কবি বা শিল্পী মহৎ কাব্য বা মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের বয়স চল্লিশের কোঠায় পৌঁছয় নি"—এই ধরনের একটি প্রচলিত মতবাদ আছে। এই সব মতবাদীরা এমন কথাও বলেন যে, চল্লিশে পৌঁছবার আগেই অনেক বড় কবি এবং শিল্পী মারা গেছেন, অথবা তাঁদের বিচার-বুদ্ধি এবং সৃষ্টি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে শিল্পী অগস্টাস জনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—যদিও পেইণ্টিং সম্বন্ধেই তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছেন, কিন্তু তাঁর এ উক্তি সমভাবেই সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য—"But it must not be forgotten that good painters, like good wine, are apt to improve with age, and it is often the work of their later years which moves us most to admiration. Perhaps it is not till an artist is turned fifty that he can be unreservedly accepted. By that time, it is true, he will have shed the pleasant attributes of youth but will have preserved undimmed its inner vision and, with the experience of a lifetime, be on the way to grasp at last the long-sought magical formula by means of which he will be able to achieve that perfect fusion of his soul with external nature which is the touchstone of the greatest art. Doubtless he will have become in the process rather difficult to handle and may be almost impossible to understand, for he will necessarily have withdrawn himself somewhat apart from a world.

Where Charity is made a Trade
that men grow rich by,
And the Sandy Desert is
given to the Strong."

গায়টে পড়তে গেলে এবং বিশেষভাবে ফাউস্টের ক্ষেত্রে অগস্টাস জনের উপরি উক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

গায়টের ফাউস্ট শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্যই আকুল নন—সঙ্গে সঙ্গে তিনি চান বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। গ্রেট-খেনের (মার্গারেট) সঙ্গে ফাউস্টের অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারটাকে মেফিস্টোফিলিস কামের উত্তাপ দিয়ে বাড়িয়ে তোলেন। এই গ্রেটখেন অত্যন্ত পবিত্র স্বভাবের এবং মেয়েমানুষ—শিশুহত্যার অপরাধে তাকে মৃত্যুদণ্ডে প্রাণ হারাতে হয়—প্রথম পর্বের এইখানেই সমাপ্তি।

এরপর মেফিস্টোফিলিসের ধারণা হয় যে হতাশা এবং অনুশোচনায় ফাউস্ট কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু গায়েটের ফাউস্ট নরকের সঙ্গে আঁতাত করে না। সে শয়তানকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে, কারণ শয়তান তার মনের পূর্ণ সন্তোষবিধান করতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়।

ফাউস্ট এবার তার বিরাট শক্তি এবং কর্মক্ষমতাকে বিরাটত্বের দিকে বিস্তৃত করে—সমুদ্রকবলিত ভূমিকে নিজের আয়ত্তে এনে তাকে মানুষের কাজে এবং উপকারে লাগাতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়কার কাজের প্রেরণা মেফিস্টোফিলিসের কাছ থেকে আসে না—আসে নিজের অন্তরের উৎস থেকে। শেষ দৃশ্যে মৃত্যু সমাগত—ফাউস্ট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, সম্পূর্ণ আত্মসন্তোষের ভাব নিয়ে ধরা ত্যাগ করছে—কিন্তু একথাও বোঝা যায় এ আত্মসন্তোষের উপর শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ফলে তার আত্মার ওপর নরকের কোনও কর্তৃত্ব করবার অধিকার জন্মায় না এবং দেবদূতেরা তাকে স্বর্গের পথে বহন করে নিয়ে যায়।

গায়টের এই বিরাট নাট্যকাব্যের কাহিনীকে মৌলিকত্বের কৌলিন্যে অভিষিক্ত করা চলে না। মূল বক্তব্য আগে থেকেই প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ দৈহিক দুর্বলতা এবং অসাড়তাকে ছাপিয়ে ওঠবার জন্য মানুষের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জীবনের অর্থ, সৃষ্টিরহস্যের সমাধান বিষয়ক প্রশ্ন—এ সব তো শুধু গায়টের যুগেরই প্রশ্ন নয়—তার বহু আগে থেকেই এসব সমস্যা চিন্তাশীল মানুষের মনে দেখা দিয়েছে। গায়টের মহত্ত্ব তাঁর চিন্তাশক্তির ব্যাপ্তিতে, তাঁর মনোভাবের বিরাট কাব্যিক রূপায়ণে। শুধু সাল তারিখ দিয়ে ফাউস্টের রচনাকাল নির্ধারণ করা যায় না। ১৭৭১ সাল থেকে (অর্থাৎ উরফাউস্টের পাণ্ডুলিপি শেষ করা থেকে) ১৮৩১ সাল অবধি, অর্থাৎ যখন মহাকবি ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ করলেন—গায়টে তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় এই নাট্যকাব্যের রচনা, পরিশোধন এবং পরিমার্জনে ব্যস্ত থাকতেন।

ফাউস্টের পরিস্ফুটন এবং বিবর্তনের ভেতর দিয়েই গায়টের কবিমানসের পরিস্ফুটন এবং বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—reflecting a mind as it grasps and develops ideas, matures in its poetic concepts, and expresses the profound wisdom and considered philosophy of a creative genius.

যে মূল তত্ত্বের ওপর গায়েটে তাঁর ফাউস্ট কাব্যনাট্যের পরিকল্পনা করেছেন এবং ফাউস্টিয়ান স্পিরিটের অনুসন্ধিৎসার দিকটা, প্রথমেই সুন্দরভাবে পাওয়া যায় 'প্রোলোগ্ ইন হেভেন'-এ। এতে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকারী (দৈবশক্তি) এবং মেফিস্টোফিলিস অর্থাৎ নেতিবাদী (ধ্বংসকারী শক্তি) মানবাত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণে আলোচনা করছেন। ঈশ্বর বলছেন—মানুষ দেবতার দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং যতই সে ভুল করুক, যতই সে প্রলোভনের বশীভূত হোক, চিরদিন সে ভ্রান্তপথে বিচরণ করতে পারে না—কারণ he still has an "instinct of the one true way." গায়টের ফাউস্ট এক মহৎ এবং বিরাট কাব্যনাট্য—এর ছন্দমাধুর্য এবং ছন্দবৈচিত্র্য একে যে কত গভীরভাবে রসঘন করে তুলেছে তা নাটকটি না পড়ে বোঝা যায় না। এ নাটকের ঐক্যবন্ধনীর কাজ করেছে ফাউস্টের চরিত্র—অ্যাকসন এর ইউনিফাইং ফোর্স নয়। নিছক নাটক হিসাবে ফাউস্টের অনেক অংশই অভিনয়ের অনুপযোগী এবং অপ্রয়োজনীয়—but as a history of man's cultural, intellectual and spiritual development as he strives to burst the bounds of physical limitations, Faust is without peer. Faust stands for every man who is inspired to action by dreams of power—both physical and intellectual and who is prevented from becoming a victim of his desires by the very nature of his activity.

He who strives is never lost—that is Goethe's central message in this monumental work which represents the best thought of sixty years of his life. [Goethe began the drama about 1770 and did not complete it till just before his death in 1832.]

[ক্রমশ]

সিনেমা কর্মীদের প্রতীক ধর্মঘট

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা কর্মীদের মধ্যে আবার বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্র কর্মীরা [illegible] দিয়েছেন ১৭ই জুলাই তাঁরা প্রতীক ধর্মঘট করবেন। এই ধর্মঘটে [illegible] সমর্থন [illegible] দিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন [illegible]।

সিনেমা কর্মীরা ইতিপূর্বে কয়েকবার ধর্মঘট করেছেন। গতবারের ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের হস্তক্ষেপে সেই ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। মীমাংসার পর সকলে আশা করেছিলেন সম্ভবতঃ সিনেমা কর্মীদের দাবি-দাওয়া সিনেমা মালিকরা মেনে নিলেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি হলো। সিনেমা কর্মীদের ধর্মঘটে নাগরিক জীবন কিছুটা জড়িত হয়ে পড়ে। নাগরিক জীবনে চিত্তবিনোদনের সর্বাধিক সহজ মাধ্যম সিনেমা। সিনেমা বন্ধ থাকলে নাগরিক জীবন কিছুটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়। সিনেমা বন্ধ থাকার ফলে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি গুরুতর। এতে বাংলা ছবিগুলির ক্ষতি সর্বাধিক। ছবির মুক্তি বিলম্বিত হয়ে যাওয়ায় বাংলা ছবির মুক্তির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সরকারী ক্ষতিও কম হয় না। প্রমোদকর এবং আনুষংগিক কর থেকে সরকার বঞ্চিত হন।

এই ক্ষতির জন্য দায়ী কে? কর্মচারী ইউনিয়নের বক্তব্যে জানা যায়, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় মালিকরা যেসব দাবি মেনে নিয়েছিল সুযোগ বুঝে এখন তারা সে দাবি মানতে অস্বীকার করছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার সিনেমা কর্মীদের উন্নতির জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন তা নাকি কিছুই কার্যকরী করা হয় নি। এই অভিযোগগুলি সিনেমা কর্মীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। মালিকপক্ষের উত্তর আমরা জানি না। কারণ আজ পর্যন্ত মালিক পক্ষ কিছু বলে নি। তবে গতবারে ধর্মঘটের সময় মালিক পক্ষ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল, যার ফলে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। একথা সকলের জানা আছে যে, বর্তমানে সিনেমা শিল্পে বড় লাভের অংশটা সিনেমা মালিকরা পেয়ে থাকেন। এ-ক্ষেত্রে সিনেমা কর্মীদের প্রতি তাঁদের আরো মানবিক বিবেচনা করা উচিত, যাতে ধর্মঘটের পথে কর্মচারীরা যেতে বাধ্য না হন। সিনেমা কর্মচারীরা যেমন নিজেদের দাবির কথা বলেছেন সেই সংগে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, সি আর পি প্রত্যাহার ইত্যাদির দাবিও তুলেছেন। এই দাবিতেই বোঝা যাচ্ছে সিনেমা কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবির সংগ্রাম রাজনৈতিক চেতনায় পরিচালিত। স্বভাবতই দেশের মানুষ এই সংগ্রামকে সমর্থন করবেন। —সুজন।
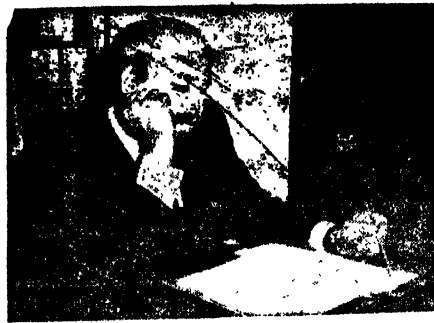
তরুণ অপেরার 'লেনিন' যাত্রাপালায় শান্তিগোপাল

আংকল টমস্ কেবিন

'আংকল টমস কেবিন' বইয়ের সংগে মোটামুটি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের পরিচয় আছে। অনেক বছর আগেই এদেশে অনুবাদ হয়েছে 'টম কাকার কুঠি'। এই বইটি প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বোধ হয় পৃথিবীতে এমন ভাষা কম আছে যে ভাষায় 'আংকল টমস কেবিন' অনূদিত হয় নি। বহু বছর আগে এই কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। তখন হলিউডে সুস্থ কাহিনী-চিত্রের যুগ ছিল। 'আংকল টমস কেবিন'-এর আকর্ষণ আজো আছে। এই কাহিনী থেকে শিক্ষা নেবার এবং আজকের আমেরিকা অতীতকে কতদূরে ছাড়িয়ে আসতে পেরেছে তা বোঝবার পক্ষে সহায়ক। পরিচালক জর্জ রয়েথার বর্তমানকে সামনে রেখেই ছবিটি করেছেন এবং আধুনিক কৌশল ও রঙের ব্যবহারে ছবিটিকে আকর্ষণীয় করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছবিটি হবে আকর্ষণীয়; ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে স্বচক্ষে তাঁরা দেখতে পাবেন।

'টম কাকার কুঠি'র মূল বক্তব্য দাস-প্রথার বিরুদ্ধে, মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। এককালে আমেরিকায় নিগ্রোদের ওপর শাদা প্রভুরা কিভাবে অত্যাচার করতো, তাদের নিয়ে নিলাম হতো, কথায় কথায় গুলী করে হত্যা করতো, জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করতো। এমন কি তাদের নারীত্বের কোন দাম ছিল না শাদাদের কাছে। ক্রমে এই অবস্থা

অসহনীয় হয়ে ওঠে—কালোরা মুখ বুজতে থাকে। পালিয়ে পরিত্রাণের কথা ভাবে। এই অসহনীয় অবস্থার নায়ক হৃদয়হীন সাইমন লেগ্রি, সে প্রভুশ্রেণীর প্রতীক এক দয়ামায়াহীন জানোয়ার। তারই বিপরীতে রয়েছে কালোদের প্রতীক টম-কাকা। ভদ্র, সাধারণ মানুষ। গানে, গল্পে প্রত্যেক মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, শিশুদের বন্ধু হয়ে পড়ে। এই টমকাকা সারাটা জীবন মানুষের উপকার করে গেল, [illegible] দাসদের জন্য মুক্তির সনদ স্বাক্ষরিত [illegible] সেদিন সে মৃত্যুপথযাত্রী। দাসত্বের [illegible] মুক্তি যে কত [illegible] কাম্য তার [illegible] দেখা গেল [illegible] এলিজার [illegible] মিসিসিপি [illegible] জমাট [illegible] ওপর দিয়ে সে [illegible] গেল [illegible]। দাস [illegible] পেটে গেল তবু দাসত্বকে মেনে নিল না। [illegible]দের [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] ধনী সিন-[illegible]। নিজের [illegible]সদের মুক্তি [illegible] জন্য তাকে আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারাতে হলো।

এই পরিস্থিতি যখন চরম আকার নিয়েছে, শাদা আর কালোয় সংঘর্ষ শুরু হয়েছে তখন আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা অবসানের সনদ [illegible] করলেন। আর তারই জন্য আততায়ীর গুলীতে তাঁকেও প্রাণ হারাতে হল। পরিচালক ছবির শুরুতে আজকের আমেরিকা, তার লিবার্টি মূর্তি দেখিয়ে তারপরে উপস্থিত করেছেন লিংকনের হত্যাকান্ড। তারপরে কাহিনী এগিয়েছে সিনক্লেয়ারের হত্যাকান্ড পর্যন্ত। পরের ঘটনা গৃহযুদ্ধের সূচনাপর্ব। কাহিনী উপস্থাপনার এই মুনশীয়ানায় দর্শকমনে উদয় হবে তুলনার কথা। মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তাদের প্রেসিডেন্ট হত্যা যেমন নতুন কথা নয়, যেমন সং-বিবেকবান লোকদের সেখানে প্রাণ দিতে হয়, তেমনি দাসত্বকে টিকিয়ে রাখা এবং অত্যাচারীর ভূমিকায়ও তারা অদ্বিতীয়। শতবর্ষ আগে শাদারা যেমন কালোদের ওপর অত্যাচার করেছে, আজো তাদের ওপর লিঞ্চ করছে, হোটেলে, বারে ঢুকতে দিচ্ছে না। সেদিন যেমন দাস প্রথা বজায় রাখার জন্য বন্দুক ধরেছিল, আজও ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়ায় তারা সেই ভূমিকা নিয়েছে।

এই ছবির আর একটি আকর্ষণীয় দিক সঙ্গীত। গানগুলি শুনতে শুনতে পল রবসনের গানের কথা মনে পড়ে যায়। এর মধ্যে নিগ্রো-গায়িকা আর্থা কিটের 'মিসিসিপি-মিসিসিপি' গানটি এক অনবদ্য সঙ্গীত সৃষ্টি। এই গায়িকা আর্থা কিট ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্যান্টাগন অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হিপি-দের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

'আংকল টমস কেবিন' ছবিটি এদেশে পরিবেশনা করছে ফিল্মস ইণ্টারন্যাশনাল। ছবিটি লাইট হাউস-এ মুক্তি লাভ করেছে।

দীনেশ চিত্রমের 'সোনা বৌদি' ছবিতে নিরঞ্জন রায় ও অনিল চ্যাটার্জী। ছবিটি পরিচালনা করছেন পীযূষ গাঙ্গুলী।

নাটকের কথা

চন্দ্রাবিন্দু

কালচারাল সোমনার গত ৬ই জুলাই বিশ্বরূপা মঞ্চে দুটি নাটক অভিনয় করেছে। প্রথম জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রবিন্দু', দ্বিতীয়টি সমর মুখো-পাধ্যায়ের 'মৃতদেহ'। নাটক দুটি সু-অভিনীত এবং সুপরিচালিত। দুটি নাটকই পরিচালনা করেছেন সমর মুখার্জি।

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পরিচিত নাট্যকার। তাঁর কয়েকটি নাটকই বহুবার অভিনয়-সার্থকতা লাভ করেছে। 'চন্দ্রবিন্দু' তাঁর সাম্প্রতিক নাটক। এই নাটকের বিষয়বস্তু সম-সাময়িককালের সামাজিক শোষণ, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যারা মানুষকে সত্যের পথে চালিত করতে পারে সেই লেখক-সাহিত্যিক-দের মেরুদণ্ডহীনতা, সব শেষে, সমাজকে পরিবর্তনের জন্য সংকল্প ঘোষণা।

নাটকের চরিত্রগুলি সমাজের জীবিত মানুষ নয়। একদা তারা জীবিত ছিল। কেউ মরেছে জমিতে নিজের অধিকার রাখতে গিয়ে, কেউ কারখানায় মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে, কেউ সমাজকে পাল্টাবার জন্য এগিয়ে এসে শহীদ হয়েছে, কেউ ইংরেজ আমলে জাতীয় আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে। তাদের সঙ্গে আছে নির্যাতিতা নারীদের প্রতীক চরিত্র। দেশ বিভাগের সর্বাধিক আঘাত যাদের সইতে হয়েছে। জীবনোত্তর এই চরিত্রগুলি অপেক্ষা করছিল এক নবাগতকে অভ্যর্থনা করতে। আগন্তুক একজন সাহিত্যিক। এসে তাকে জবাব দিতে হলো সমাজের এত অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে সে কি লিখেছে। অবশেষে সকলে তারা বিদ্রোহের সংকল্প নিয়ে নতুন জীবনে চলে গেল।

এককালে লোকোত্তর চরিত্র নিয়ে হাসি-তামাসার গল্প লেখা হতো। কিন্তু কালের পরিবর্তনে হাসি-তামাসা এখন গভীর বক্তব্যে এসে পৌঁচেছে। এ ধরনের বিষয় বস্তু নিয়ে বাংলার মঞ্চে উৎপল দত্তের 'দ্বীপ' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' অভিনীত হয়েছে। এবার তৃতীয় নাটক জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রবিন্দু' দেখলাম। নাটকটির বক্তব্য বলিষ্ঠ। কালের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা এতে রয়েছে'

তাই সঙ্গে রয়েছে সাহিত্যিক, নাট্যকারদের প্রতি জিজ্ঞাসা।

কাল্পনিক নাটকে সঙ্গতি-অসঙ্গতির প্রশ্ন তেমন ওঠে না। কাজেই এক্ষেত্রে দুর্বল সাহিত্যিকের 'নেতৃত্বের' ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই কাল্পনিক নাটকটিকে কথারূপ দিতে পরিচালকের কল্পনাশক্তি প্রশংসনীয়। চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি, এক্রোবেটিক্স এবং রিদম, তার সঙ্গে আলো-আঁধারী নাটকটিতে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি ও উপভোগ্য করতে সাহায্য করেছে।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন: জয়ন্ত দে, সলিল পাল, গোবিন্দ দে, সন্দীপ ঘোষ, মানস দে, দিলীপ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, সঞ্জীব ঘোষ ও পতুল চক্রবর্তী।

আবাদ

গত ২৪শে জুন রূপণ সংস্থা 'আবাদ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ করে।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস 'আবাদ' নাটকের মাধ্যমে অবহেলিত কৃষক-শ্রেণীর অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। রূপণ সংস্থার দলগত অভিনয় প্রশংসনীয়। প্রায় প্রতিটি শিল্পী তাঁদের চরিত্রগুলি সার্থকভাবে রূপায়িত করেন। তাঁদের মধ্যে [illegible] চিত্ত চট্টোপাধ্যায় অভিনয়ে অপূর্ব দক্ষতা দেখান। তাঁর অভিব্যক্তির তীব্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিকাশ ঘোষ ও দীপালী চক্রবর্তী সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া নন্দা বর্মণ, সুবোধ অধিকারী, হারাধন রায়, আনন্দ রায়, অশোক ব্যানার্জী, শেখর সেনগুপ্তও সুঅভিনয় করেন।

"খুঁজে বেড়াই" ছবির মহরৎ

গত রবিবার ৫ই জুলাই রথযাত্রার দিনে সকাল ৯টায় ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে গীতালি পিকচার্সের "খুঁজে বেড়াই" ছবির শুভমহরৎ উদ্‌যাপিত হয়েছে। শ্রীমতী গীতালি দত্ত নিবেদিত ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, রচনা ও পরিচালনা করেছেন সলিল দত্ত। সংগীতের দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও অমিয় মুখার্জী। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করছেন—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অপর্ণা সেন, অনিল চ্যাটার্জী ও বিকাশ রায়। "খুঁজে বেড়াই"-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ এই সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে।

এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

'সংসার' ছবির মহরৎ

গত রবিবার ৫ই জুলাই সকাল ৯টায় টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে নর্মদা পিকচার্সের 'সংসার' ছবির শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেন: সলিল সেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারাণী, [illegible] চৌধুরী, নন্দিনী মালিয়া, নির্মলকুমার, [illegible] চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, [illegible], [illegible] চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও [illegible]।

সুরসভার বর্ষামঙ্গল

গত ৫ই জুলাই সুরসভার শিল্পীবৃন্দ "বর্ষামঙ্গল" পরিবেশন করেন বিড়লা একাডেমী হলে। [illegible] সমৃদ্ধ এই [illegible] গানই সুগীত। [illegible] কী গান গাবো, [illegible] দিয়ে গাবো", [illegible] পরে" ও [illegible] কণ্ঠে "বাদল বাউল [illegible]" শ্রোতৃমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য শিল্পীদের [illegible] ঠাকুর, দীপ্তি রায়, [illegible] দে, [illegible] চক্রবর্তী, মণিদীপা [illegible] ও [illegible] মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্যে কাবেরী চট্টোপাধ্যায় [illegible] সেনগুপ্ত ও [illegible] সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নৃত্যগীতি-বিচিত্রাটি পরিচালনা করেন রঞ্জীন চৌধুরী। এই দিনের অনুষ্ঠানে বাংলার অন্যান্য প্রখ্যাত সুরকারদের বর্ষাসঙ্গীতও পরিবেশিত হয়। হিমাংশু দত্তের সুরকৃত "বরষার মেঘ নামে", "ফিরে এলো শ্রাবণধারে" ও "শ্রাবণ রজনী ধীরে", নজরুলের "রিম ঝিম রিম ঝিম" ও "রুমু ঝুমু রুমু ঝুমু" এবং অতুলপ্রসাদের

তপন সিংহের 'এখনই' ছবিতে মৃণাল ও মৌসুমী

"শুধু এমন যদিলে" বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। গানগুলি গেয়ে শুনিয়েছেন মমতা ঘোষ, উমা কর, তোড়া সরকার, সুস্মিতা রায়চৌধুরী, আরতি দত্ত ও শীলা সেনগুপ্ত। যন্ত্রসংগীতে ও সংগতে সহযোগিতা করেন স্বপন মুখোপাধ্যায়, উমা দে শীল, বেণু মুখোপাধ্যায়, কিশোর নন্দী ও দুলাল ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌর বসাক ও রথীন চৌধুরী।

ঋত্বিক ঘটকের 'আমার লেনিন'

ঋত্বিক ঘটকের দুই রীলের ছবি 'আমার লেনিন' তৈরি হয়ে গেছে। ছবিটিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। পুরনো দিনের গণনাট্য সংগীত ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটি এখনো সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায় নি। ছাড়পত্র না পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট মহলে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে।

সুরসভার 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবে নৃত্য পরিবেশনায় শান্তা রায়

পাবলিক লাইব্রেরী হলে হাওড়া পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক 'কালিদাসম্' নাটকে নৃত্যরতা কুমারী সুস্মিতা শেঠ (৫ বছর)। ফটোঃ রবীন্দ্রনাথ বসু।

মস্কোয় ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি মস্কোর ভ্যারাইটি থিয়েটারে সোভিয়েত সফররত ভারতীয় শিল্পীদের এক নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের উচ্চপ্রশংসা লাভ করেছে।

অনুষ্ঠানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করেন যথাক্রমে কুমকুম দাস ও শ্রীমতী কমলা।

মস্কোয় অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারতীয় নৃত্যশিল্পীরা রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শিল্পনগরী তামবভে তাঁদের অনুষ্ঠানে প্রশংসা পান। পরে তাঁরা লেনিনগ্রাদ ও তাসখন্দে অনুষ্ঠান করবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ বছরেই দিল্লীতে আসছে জনপ্রিয় সোভিয়েত নৃত্যগোষ্ঠী "বেরিওজকা"। আর একটি ভারতীয় শিল্পিদল এই শরতেই সোভিয়েত সফরে যাচ্ছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ ড্র হলো।

কিন্তু সেই অমীমাংসায় সম্মানজনক খুব একটা কিছু ছিল না। নিতান্তই সময়ের অভাবের জন্যেই ভারত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেল আর ইংলন্ডের অধিনায়ক ডি আর জার্ডিনের হাত থেকে ফসকে গেল আর একটি টেস্ট জয়ের সুযোগ।

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ইংলন্ডের দুই ফাস্ট বোলার ক্লার্ক আর নিকলস জবরদস্ত বোলিং করে ভারতীয় দলের ব্যাটিং-এর ভিত্ ভেঙে গুড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন সব থেকে বেশি করে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বিশেষভাবে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন যখন ক্লার্ক আর নিকলস বিশ্রীভাবে বল 'লিফ্‌ট' করাতে শুরু করলেন।

ভারতের অমর সিং আর নিসারের তুলনায় ক্লার্ক বা নিকলস কিছুই নন। কিন্তু অমর সিং কিংবা নিসার সম্মুখ সমরে, খেলার মতো খেলে ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইতেন। তাঁদের সে লড়াই ছিল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তির দাপট।

কিন্তু ক্লার্ক ও নিকলস দ্বিতীয় টেস্টে ফাস্ট বোলারদের স্বভাবলব্ধ আক্রমণ ধারার সাহায্যই নিতে চাইলেন সব থেকে বেশি করে। তাই তাঁদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো তীব্র গতিতে মাথ উঁচু করে ছুটে গেল ব্যাটসম্যানদের শরীর লক্ষ্য করে। সেই আক্রমণের হাত থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অনেকেই নিজেদের বাঁচাতে পারলেন না। আহত হলেন অনেকেই।

তবু তার সুযোগ নিয়ে ইংলন্ড জিততে পারলো না শুধুমাত্র সময়ের অভাবে।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের হিরো ছিলেন ভারতের উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হাসান। উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনিই প্রথম যিনি একটি টেস্ট ম্যাচের দু' ইনিংসেই অর্ধশত রান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন। প্রথম ইনিংসে তাঁর ৫৯ আর দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৭ রান চিরকাল মনে রাখার মতো। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দিলওয়ার হাসানের খেলায় যে সাবলীল ক্রীড়ানৈপুণ্যের মনোরম রূপ সেই খেলায় দর্শকরা দেখেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু সেই দিলওয়ার হাসান একবার প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেলেন। নিকলস-এর বলটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভীষণ জোরে আঘাত হানলো দিলওয়ারের ঘাড়ে। আঘাতটার এতো জোর ছিল যে, দিলওয়ারের প্যাভেলিয়নে ফিরে আসার মতো অবস্থা হলো। কিন্তু দিলওয়ারের জান বড় শক্ত। অন্য যে কোন খেলোয়াড় হলে হয়তো প্যাভেলিয়নে ফিরে এসে শুয়ে পড়তো। কিন্তু সেই প্রচাণ্ড আঘাত দিলওয়ার বেমালুম সামলে গেলেন।

তবে সেদিন যাঁরা মাঠে ছিলেন তাঁদের সকলেরই ধারণা যে, খেলতে নেমে অমন সাঙ্ঘাতিক একটা আঘাত না পেলে দিলওয়ার হাসান সেদিন আরো ভালো খেলতে পারতেন। বলা যায় না, সেঞ্চুরীও করতে পারতেন তিনি।

ইংলন্ডের বিরুদ্ধে কলকাতার টেস্ট ম্যাচটা ছিল মুস্তাক আলীর জীবনের প্রথম টেস্ট। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবে কি ব্যাটিং, কি বোলিং—কিছুতেই সুবিধে করতে পারলেন না মুস্তাক। মুস্তাক তখন ব্যাটসম্যান নন। স্লো বোলার হিসেবেই তখন তাঁর খ্যাতি। কিন্তু সেই টেস্টে তাঁর বরাতে জুটলো মাত্র একটা উইকেট। তবে সে উইকেটটি ছিল যথেষ্ট মূল্যবান। ডি আর জার্ডিনের উইকেটটি দখল করেছিলেন মুস্তাক আলী। আর রান? সে-কথা বোধহয় না বলাই ভালো। প্রথম ইনিংসে মুস্তাক করলেন ৯ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮ রানের বেশি করতে পারলেন না।

তবে কলকাতার দর্শকদের বোধহয় সব থেকে বেশি নিরাশ করেছিলেন লালা অমরনাথ। বম্বের প্রথম টেস্টেই প্রথম আবির্ভাবে শতরান করে অমরনাথ ভারতের প্রত্যেকটি ক্রিকেট অনুরাগীর হৃদয়ের নাথ হয়ে উঠেছিলেন। তাই তাঁর খেলা দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন বাংলা দেশের ক্রিকেট-রসিকরা।

বম্বের মাঠে তাঁর অদ্বিতীয় সেঞ্চুরী আর দু' ইনিংসেই সেই মনমাতান খেলার কথা তখন গল্প হয়ে ঘুরছিল লোকের মুখে মুখে। কিন্তু সেই গল্প-কথার নায়ক লালা অমরনাথ প্রথম ইনিংসে কোন রানই করতে পারলেন না আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৯-এর বেশি করতে পারলেন না।

তাই কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টের

পর লাভ-ক্ষতির খতিয়ানে আয়ব্যয়ের লাভের অঙ্ক একেবারে শূন্য না হলেও তার ঝোঁকটা ছিল শূন্যের দিকেই।

কিন্তু বাংলা দেশের দর্শকদের চোখে সব থেকে বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল দীর্ঘদেহী মহম্মদ নিসারের ব্যর্থতা। ব্যর্থতা বলা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ নিসার নামটির সঙ্গে ব্যর্থতা কথাটা ঠিক যেন খাটে না। শুধু ৩৪ ওভার বল করে ১১২ রান দিয়ে একটা মাত্র উইকেট পাওয়াকে আর যাই হোক ভালো এ্যাভারেজ বলা যায় না। বলা বোধহয় সংগতও নয়। কিন্তু মহম্মদ নিসারের অবিশ্বাস্য অসহায়তা ক্রিকেট-রসিকদের কাছে নিঃসন্দেহে বেদনার বিষয়।

তাই মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্ট দল থেকে বাদ পড়লেন নিসার। বাদ পড়লেন গোপালনও।

১৯৩৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে শুরু হবে ভারত বনাম ইংলণ্ডের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ। এই টেস্টে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হলো। নতুন মুখ দলে না থাকলেও, স্লো বোলার হিসেবে মুস্তাক আলী তৃতীয় টেস্টেও চান্স পেলেন।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণকারী মনোনীত খেলোয়াড়রা হলেন—দিল-ওয়ার হাসান, নিওমল জিওমল, ওয়াজির আলী, সি কে নাইডু, অমর-নাথ, বি মার্চেণ্ট, এইচ পালিয়া, নাজির আলী, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলী ও অমর সিং।

আমাদের সান্ত্বনা মুস্তাক আলী তৃতীয় টেস্টেও চান্স পেয়েছেন। ভাগ্যিস পেয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় টেস্টেও কি তিনি খুব একটা সুবিধে করতে পেরেছিলেন,—না পারেন নি। তবে সে কথা থাক। পরের কথা পরে। তবে মুস্তাকের তৃতীয় টেস্টে চান্স পাওয়াটাই যথেষ্ট। তা না হলে যাঁরা মুস্তাকের খেলা দেখেছেন, দেখেছেন মুস্তাক আলীর যৌবনদীপ্ত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের স্মরণীয় স্বাক্ষর—তাঁরা কি আর আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারতেন—

"মুস্তাককে যাঁরা দেখেন নি তাঁদের কাছে মুস্তাক একটা বিগত রোমান্স। তাঁকে কেন্দ্র করে যা কিছু স্মৃতি ও রচনা, যে সবই মুস্তাক তাঁর অসামান্য অবিস্মৃতির মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রথম বলেই রান, চার পা এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভ, অফের দিকে লেগে ঘোরানো, ফাঁকায় বল তুলে বাউণ্ডারী, বোলারের হাত থেকে বল ছাড়া পাবার আগেই ক্রীজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া, সেই সর্ট রানের ধোঁকাবাজি ও দৌড়ের বদলে গটমট করে হেঁটে রান নেওয়া, পার্টনারের চেয়ে বেশি সংখ্যায় স্ট্রাইক নেওয়া, মিস থ্রোর রান নিতে অবজ্ঞা এবং ক্যাচ তুলে দিয়ে অ্যাম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখে প্যাভেলিয়নের পথে পা বাড়ানো—সব কিছু। মুস্তাক সব কিছু দেখালেন, সব কিছু জানালেন নিজের সম্বন্ধে। আত্মপ্রত্যয়ে মুগ্ধ করলেন, সাহসে বিস্মিত করলেন, চমৎকৃত করলেন নৈপুণ্যে, নানা ভঙ্গিতে হাসালেন, মাতালেন মাতোয়ারা বাঙালীকে, খেলার শেষ রসটুকু শুষে নিয়ে যখন প্যাভেলিয়নের দিকে ফিরে চললেন, তখন নিজের ভূমিকায় তিনি সেরা অভিনয় করে গেছেন।

"এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মুস্তাক আলী; তিনি তাঁর শিল্পকে জানেন.....।"

এই মুস্তাক তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট কীর্তিতে মোটে সুবিধেই করতে পারলেন না। অবশ্য তিনি তখনো ধরেন নি তাঁর নিজ মূর্তি। মুস্তাক তখন বোলার। স্লো বোলার। ভারতে তখন দক্ষিণাবের ভালো স্লো বোলারের অভাব ছিল বড় বেশি। মুস্তাক সেই অভাবটাই পূরণ করে ভারতীয় দলের একজন হয়ে রইলেন।

[চলবে]

নটিংহামে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড ও বিশ্বের অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার তৃতীয় দিনে গ্যারি সোবার্স আণ্ডারউডের বলে ড্রাইভ মেরে বাউণ্ডারীতে বল পাঠিয়ে দেন। আণ্ডারউড বলটি থামাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন।

দেয়া-নেয়

কলকাতা ময়দানের দর্শকরা যে কটা জিনিস দেখতে খুবই অভ্যস্ত, তার একটি হলো পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির চক্ষুলজ্জাহীন প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা শুধুমাত্র লীগ তালিকার নীচের দিককার দলগুলোর প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকার জন্যে চলে তা নয়, পয়েন্ট সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ছোট দলগুলোর সংগে একইভাবে নাম লিখিয়ে থাকে বড় দলগুলোও। অর্থাৎ ধান্দা সবলেরই এক —[illegible] শুধু লক্ষ্যে। বড় দলগুলোর সামনে থাকে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের ট্রফিটি আর ছোট দলগুলোর লক্ষ্য থাকে যে-কোনভাবেই হোক, প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকা। এই দুদলের মাঝখানে আরও একটি দল আছে, যারা সাধারণত পয়েন্ট সংগ্রহের এই অপপ্রচেষ্টায় দাতাকর্ণর ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এই পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া এমনিই চলে? না কি এর পেছনে একটা 'কিছু' আছে? আর এই কিছুটা যে কি তা জানতে বাংলা দেশের ফুটবলরসিকদের বোধহয় মোটেই বাকী নেই। তবে বাংলা দেশের ফুটবল মরশুমটিতে খোলামকুচির মতো টাকা যেভাবে ছড়ানো হয় তাতে হয়তো এই পয়েন্ট দেওয়া নেওয়া কিংবা পয়েন্ট কেনা-বেচা যাই বলা হোক না কেন, একটা কিছু হয়। ইদানীং খেলার মাঠে এই 'কিছুটির' আধিক্য এতো বেশি হয়ে পড়েছে যে, শুধু ঐ 'ছি ছি' ছাড়া এই বিষয়ে আর কিছু লেখার প্রবৃত্তি বোধহয় কারোরই হয় না।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই ছেলেখেলা আর কতোদিন চলবে? এইভাবে খেলার নামে ছেলেখেলা করে ভারতবর্ষের ফুটবল জগতে বাংলার মানসম্মান নষ্ট করার অধিকার কলকাতার ক্লাবগুলোকে কে দিয়েছে? আজ জানতে ইচ্ছে করে যাঁরা গটআপ গেমের ব্যবস্থা করে পয়েন্ট সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন আর যাঁরা কোন একটা কিছুর বিনিময়ে সানন্দে পয়েন্ট প্রদান করেন—সেই তাঁরা সাত্যকারের ফুটবল প্রেমিক কি না? তাঁরা কি সত্যিই ফুটবল খেলাকে ভালোবাসেন? হাল-চাল দেখে তো সে কথা মনে হয় না। তবে এঁদের আজ আমরা একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে—দিন বদলে যাচ্ছে, বাংলা দেশের খেলার রাজা ফুটবলকে নিয়ে আর আমরা ছিনিমিনি খেলতে দেবো না। খেলোয়াড় কিম্বা ক্লাব-সমর্থকদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে আজ এগিয়ে আসতে হবে দর্শকদের, এগিয়ে আসতে হবে ক্লাব সমর্থকদের, এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের সকলকেই, যাঁরা ফুটবল খেলাকে ভালবাসেন। এখনো সময় আছে, এখনো যদি আমরা অবহেলা করি, এখনো যদি আমরা স্বার্থসর্বস্ব কর্তৃপক্ষের হাতে ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, তাহলে বাংলা দেশের ফুটবলরসিক হিসেবে তার চেয়ে বড় অপরাধ, তার চেয়ে বড় পাপ, তার চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছুই করা হবে না। তাই বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে, ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলা দেশকে আপন মহিমায় মহিমান্বিত করতে আমরা বাংলা দেশের আপামর ফুটবল উৎসাহী জনগণকে আহ্বান জানাই। —শান্তিপ্রিয়

॥ মার্গারেট কোর্ট ॥

আমেরিকা বিলি জেন কিং কে হারিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট কোর্ট এবার উইম্বলডন টেনিস খেলা বিভাগে চ্যাম্পিয়নশীপ লাভ করেছেন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর তিনি ১৪-১২ ও ১১-৯ সেটে জেতেন।

ফুটবল মাঠে

[illegible] যেকজন বাঙালী খেলোয়াড় এখন মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী জাতীয় দলে স্থান লাভ করার জন্যে বাংলার বাইরে গেছেন ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করতে।

এর জন্যে অবশ্য কলকাতার ফুটবলের আকর্ষণ একটুকুও কমে নি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে-না-হতে ফুটবলরসিকরা ছোটেন ময়দানে। তারপরই জমে ওঠে খেলা। ময়দানের ঘেরা মাঠ তিনটির মর্যাদাই এখন আলাদা।

কিন্তু সে মর্যাদা কলকাতা ময়দানের বড় দলগুলোর খেলোয়াড়রা কতোটা রাখতে পারছেন? কি মোহনবাগান, কি ইস্টবেঙ্গল, কি মহমেডান স্পোর্টিং কিম্বা ছোটবড় অন্য দলগুলোর খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যায় না আন্তরিকতার ছাপ. খেলা দেখে কখনো মনে হয় না যে, ফুটবল খেলাকে ভালোবেসেই ও'রা খেলছেন। ফলে খেলা কোন সময়ই ভালো হয় না। বড় দলগুলোর নাম করা খেলোয়াড়রা সবসময়ই ছোট কিম্বা মাঝারি দলগুলোর খেলোয়াড়দের ওপর প্রভাব বিস্তার করে খেলতে পারেন। তাই গোলও হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সত্যিকারের ভালো খেলা দেখার সৌভাগ্য আর হয় না দর্শকদের।

সে যাই হোক, কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল থেকে পাঁচজন পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় গেছেন ট্রেনিং ক্যাম্পে। তবু যাঁরা আছেন তাঁরাও তো কোন অংশে কম নন। তবু প্রথম বিভাগের নতুন দল ভ্রাতৃ সংঘের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল মোটে সুবিধেই করতে পারে নি। কোনমতে একটা গোল দিয়ে দুটো পয়েন্ট ঘরে তুলেছে, ঐ পর্যন্তই।

প্রথম বিভাগে এ বছর যে চারটি নতুন দল খেলছে (ভ্রাতৃ সংঘ, কুমারটুলী, ঐক্য সম্মিলনী এবং টালিগঞ্জ অগ্রগামী) তাদের মধ্যে এক সংঘের খেলাই দর্শকদের সব থেকে বেশি প্রশংসা লাভ করেছে। এ দলের খেলোয়াড়রা বয়সে প্রায় সকলেই তরুণ। তাদের মধ্যে উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে আর আছে ভালো খেলার আগ্রহ।

এই ক'টি জিনিস প্রত্যেকটি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে যদি থাকতো তাহলে বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান নিঃসন্দেহে উন্নত হতো। সবচেয়ে দুঃখের কথা, প্রথম বিভাগের অপর তিনটি নতুন দলের মধ্যে এই গুণগুলোর ছিটে-ফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। আর সব থেকে দুঃখের ব্যাপার হলো পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়ার 'গট আপ' খেলায় এরাও মেতে উঠেছে।

॥ জয়লাভের আনন্দে বিভোর নিউকাম্ব ॥

দেশের কেন রোজওয়েলকে ৫-৭, ৬-৩, ৬-২, ৩-৬ ও ৬-১ সেটে হারিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকাম্ব।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বৃহস্পতিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 23rd July, 1970

আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষ

শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। সর্বজনীন শিক্ষার সম্প্রসারণের দ্বারা সাত্যকারের জনহিত করা সম্ভব। আমাদের দেশ অনুন্নত, সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা হিমালয়প্রমাণ। এমন অজস্র পরিবার ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে, যে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা বংশপরম্পরায় কখনোই পুঁথিগত শিক্ষার সুযোগ পায় নি। পরাধীন ভারতে একদা তা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছর পরও গ্রামের গরীব মানুষেরা শিক্ষা লাভের তেমন সুযোগ লাভ করে নি। ফলে, সারা ভারতে বর্ধিত শিক্ষার হার গৌরবজনক নয়। আর তেলা মাথায় তেল দেওয়ার মতো—দেখা যায়, বংশপরম্পরায় যে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা সুযোগ পেয়ে আসছে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা অব্যাহতই থাকে। অবশ্য বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় ছাত্রছাত্রীই কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সুযোগ পায়। তবে পরীক্ষায় ভালো রকম ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে নামকরা বিদ্যালয় ও কলেজগুলির ওপর। তাছাড়া যে সব অভিভাবক ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভালোভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। এমন অবস্থার মধ্যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া স্বল্পআয়সম্পন্ন অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ একটি শ্রেণীই শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে, একথা বলাই বাহুল্য। তবু স্বাধীন ভারতে অন্তত নিরক্ষরতা দূরীকরণ মূল দাবি হওয়া উচিত এবং আমরা মনে করি, ১০০% লোক যদি সাক্ষর হন, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থ বিপ্লব সম্ভব হবে। বর্তমানে গ্রামে নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনোরূপ প্রচার নেই। প্রচেষ্টা নেই নিরক্ষরদের বিদ্যালয়ের গণ্ডিতে টেনে আনার। অধিকন্তু যত সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে, তা নিরক্ষরদের তুলনায় নগণ্য বলা যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরাও স্বল্পবেতনভুক। তাছাড়া সামান্য যে বেতন তাঁরা পান, তাও যথাসময়ে তাঁদের হাতে পৌঁছায় না। ঐ অবস্থার মধ্যে আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ শিক্ষকরাও মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা দিতে পারেন বলে মনে করা যায় না।

আমাদের দেশে আর একটি বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর অনীহা। তারা ব্যবস্থার প্রতি অনীহা জানাতে গিয়ে এখন শিক্ষার গোড়াসুদ্ধ উপড়ে তুলে ফেলতে চায়। এতে মন্দ ছাড়া ভালো হতে পারে না। কারণ, দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে যেটুকু সুযোগ পাচ্ছে, সেটুকুও লোপ পাবে। আর স্কুল-কলেজের গণ্ডিতে পা না মাড়িয়েও স্বচ্ছল অভিভাবকদের সন্তানসন্ততিগণ শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। তাই সকলের সামনে এখনো সুযোগ লাভের যে দরজা খোলা রয়েছে, তাও আত্মহননের রাজনীতিতে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে যে সময় প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে অহেতুক তাণ্ডব শুরু হয়েছে, সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ডাকে ভারতের মাটিতেই আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষ পালিত হচ্ছে। নয়াদিল্লীর মবলঙ্কর অডিটোরিয়ামে গত ১৮ই জুলাই আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি। আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষ পালনের লক্ষ্য হচ্ছে—পৃথিবীর দেশগুলিকে তাদের বর্তমান শিক্ষাগত পরিস্থিতি, শিক্ষা কাঠামোর শক্তি ও দুর্বলতা পর্যালোচনা করতে বলা এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যাপক কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হিসেবে কার্যকর করতে অনুরোধ করা।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের শিক্ষার হার শোচনীয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল চিত্র উদ্ঘাটিত হওয়াই উচিত। কারণ, অর্থাভাবের জন্য এদেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব হচ্ছে না, এটা নির্মম সত্য। সুতরাং, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ যদি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন, তাহলে এদেশে হয়তো বাস্তবভাবে সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হতে পারে। উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি বলেছেন, 'শিক্ষার বর্তমান ধারা এবং কাঠামোর প্রতি সারা বিশ্বের মোহমুক্তি ঘটেছে। এর একটা প্রমাণ বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত বিপ্লব।'

ঐ বিপ্লব আমাদের দেশে মুষ্টিমেয় এক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদেশের প্রতিটি নিরক্ষর যেদিন সাক্ষর হবেন, সেদিনই হবে যথার্থ বিপ্লব-সাধন। কিন্তু সেই বিপ্লবের চাবিকাঠি সরকারের হাতে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষে সরকার সেই মরচে-ধরা চাবিকাঠিটিকে কি কাজে লাগাতে পারবেন?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

জীবনের একটা দীর্ঘ অংশ বিদেশে কাটাবার পর দেশে ফিরলে মনোভাব কী হয়? বিদেশের স্বাচ্ছন্দ্য ও নানারকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার পর দারিদ্র্য-জর্জর ভারতভূমিতে ফিরে ক'দিনের মধ্যেই প্রাণ আইঢাই করা খুব অস্বাভাবিক নয়। এখানকার নানান সমস্যা ও অভাব দেখে চোখে জল এসে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। শ্রী এস কে ব্যানার্জি তেমনি প্রাচুর্যের মধ্যে দীর্ঘকাল দিনযাপনের পর দেশে ফিরলেন। বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাচ্য শাখার সেক্রেটারী হিসেবে কাজ যোগ দিলেন শ্রীব্যানার্জি। দেশে ফিরে তাঁর লাগছে কেমন, কে জানে? যতই প্রাচুর্যের বন্যা বহুক না কেন, বিদেশ তো বিভুঁই। কাজেই দেশে ফিরলে কার না ভালো লাগে!

জাপান থেকে ফিরলেন শ্রীব্যানার্জি। এখানে ভারতের রাষ্ট্রদূতের গুরুদায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি। এখানকার ওসাকা শহরে যে বর্তমানে এক্সপো-৭০ বা বিশ্ব-বাণিজ্য মেলা চলছে, তাতে ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা করার ভার নিতে হয়েছিল শ্রীব্যানার্জিকে। প্রদর্শনীতে ভারতের পণ্য-প্যাভিলিয়ন যদি সুনাম ও প্রশংসা লাভ করে, তবে তার কৃতিত্ব অনেকখানি শ্রীব্যানার্জিরই প্রাপ্য।

জাপান যাত্রার আগে শ্রী এস কে ব্যানার্জি ছিলেন বন্-এ। পশ্চিম জার্মানীতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়েও সেখানে ভারতের পণ্যের জন্য বাজার খুঁজে বার করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাজটা আদৌই সহজ ছিল না। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানী বিশ্বের প্রথম সারিতে। কাজেই সেখানে সূচ ফোটানো বা মাথা গলানো চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু তারই মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভারতের পণ্য পশ্চিম জার্মানী তথা ইয়োরোপে কাটতি হতে পারে, ভারতের শীর্ণ বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারে খানিকটা শক্তি সঞ্চার করা যেতে পারে। পশ্চিম জার্মানীতে তখন জনবলের স্বল্পতা থাকার দরুণ কিছু কিছু উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছিল, আর সেখানেই শ্রীব্যানার্জি ভারতীয় পণ্য চালু করে দিয়েছেন।

এস, কে, ব্যানার্জি

রাষ্ট্রদূত বা বৈদেশিক দপ্তরে শ্রীব্যানার্জির কার্যকাল নেহাৎ কম হলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই তিনি একটার-পর-একটা দায়িত্ব নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছেন, যদিও শুরু করেছিলেন সিঁড়ির তলা থেকেই। প্রথমে তিনি ফার্স্ট সেক্রেটারির পদ নিয়ে তেহরাণ যান—সেখানে সেবারই প্রথম ভারতের দূতাবাস খোলা হইয়াছিল। তার দু' বছর বাদে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হলো দেশে নয়, বিদেশে—যদিও ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে সেটা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, সেই পাকিস্তানের পুরনো রাজধানী লাহোরে—ডেপুটি হাইকমিশনার পদে।

কিন্তু এখানেও বেশিদিন থাকা হলো না, এর পরে তাঁকে যেতে হলো সুদূর মার্কিন মুল্লুকে—সানফ্রান্সিসকোর ভারতের কন্সাল-জেনারেল হিসেবে ১৯৫৪ সালে। অবশ্য সেও মাত্র দু' বছরের জন্যে। এর পরেই প্রমোশন পেয়ে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা নিয়ে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস উপনীত হলেন শ্রীব্যানার্জি সুয়েজ খাল জাতীয়করণের অব্যবহিত পরে। এশিয়ায় শ্রীব্যানার্জি সর্বশেষ রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব-পালন করেছেন সিঙ্গাপুরস্থ ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে।

শ্রী এস কে ব্যানার্জি বাঙালী হলেও বাংলাদেশের বাইরেই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে। দেরাদুন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখানে একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের আই-সি-এস প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান দখল করেছিলেন। এরপর বিলেতের অক্সফোর্ডে তিনি দু' বছর পড়েন।

আই-সি-এস হিসেবে শ্রীব্যানার্জির কর্মজীবনও শুরু হয় বাংলার বাইরে, সেদিনকার মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে। এখানে প্রথমে তাঁকে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও সাব-ডিভিশনাল অফিসারের পদ দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। তারপর আরো চারটি জেলার ডেপুটি কমিশনার হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর '৪৬ সালে তিনি রাজ্য সরকারের সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। দেশ স্বাধীন হলে তাঁকে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে নেওয়া হয়।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(২৩)

শেষ পর্যন্ত ক্রিপসের সঙ্গে বোঝাপড়া হতে পারে নি। ফলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে অগত্যা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব নিতে হয়েছিল। ৩১শে আগস্ট, ১৯৪২ তারিখে সুভাষচন্দ্র জার্মানী থেকে সাভারকর ও জিন্না প্রমুখ যাঁরা ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, আপনারা অনুভব করুন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দিন এই পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা যোগ দেবে, তাদেব জন্যই মাত্র সম্মানের স্থান থাকবে ভারতবর্ষে। তিনি বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত প্রগতিশীল অংশের কাছে, যাদের কিছু লোকের সঙ্গে তিনি ১৯৪০-এ কলকাতা কর্পোরেশনের ব্যাপারে সহযোগিতায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মজলিস ই-অহ্‌রর নামক জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলের কাছে, যাঁরা ১৯৩৯ সালে ভারতে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়েছিলেন, যখন পর্যন্ত অন্য কোনো দল ঐ আন্দোলনে এগিয়ে আসে নি। আবেদন জানিয়েছিলেন, বিশিষ্ট মুসলমান দেশপ্রেমিক নেতা মুফতি খিফায়ত উল্লা-পরিচালিত জমিয়ত-উল-উলেমা দলের কাছে, আজাদ মুসলিম লীগের কাছে, সেই সঙ্গে আকালি দলের কাছে এবং সর্বোপরি সুপরিচিত দেশহিতৈষীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলার মুসলমান প্রজা পার্টির কাছে।

ক্রিপস-প্রস্তাবের আরও তিন বছর পরে যখন ওয়াভেল-প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বিচলিত করে তুলেছিল, তখনো সুভাষচন্দ্র বারে বারে সতর্ক করে দিয়েছেন। আপোষমুখী নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সমর্থনে ভারতীয় সৈন্যদের ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লাগাবার জন্যই ওয়াভেল-প্রস্তাবের ধাপ্পা। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ না দেবার প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছে, '৪২-এর আগস্ট-প্রস্তাবে সে বলেছে, স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' তার মন্ত্র, এক্ষেত্রে কংগ্রেসেব পক্ষে আত্ম-মর্যাদা রেখে আপোষ করা চলে না—তাও বলেছিলেন। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বর্ণহিন্দু ও মুসলিম লীগের সদস্য-সমতায় মধ্যে ইংরেজের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বলবৎ রাখার কোন্ চক্রান্ত চলেছে, তাও খুলে ধরেছিলেন। সেই সঙ্গে কঠিনভাবে বলেছিলেন, কংগ্রেস যদি ওয়াভেলের ফাঁদে পা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সমর্থনে সৈন্য পাঠায়—সেই প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে অস্ত্র উঁচিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না। "If the Congress decides to accept Lord Wavell's offer and if, as an inevitable consequences of it, the Congress leaders come at the head of the Indian troops to fight Britain's imperialist war in the far East, then there will be no option for us but to fight with the Azad Hind Fauj against our own countrymen, who would then be allies of the British Imperialism."[১]

এই উদ্ধৃতিটি আর কিছু না হোক, সুভাষচন্দ্রের একটি চেহারা অন্তত খুলে ধরেছিল—প্রয়োজনে তিনি কংগ্রেস-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুত ছিলেন। যদি মনে করতেন যে, ঐ নেতৃত্ব জাতীয় উন্নতির এবং প্রগতির বিরোধী। অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ, দরকার হলে।

সুতরাং সুভাষচন্দ্র আব্রাহাম লিংকনও হতে পারতেন। যদি সম্ভব হত, তিনি নিশ্চয় দেশ বিভাগ-প্রশ্নে গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিতেন, কারণ দেশ বিভাগকে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার মৃত্যু-বিধান মনে করেছিলেন। দেশ ভাগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে তিনি ব্রহ্মদেশ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪-এ একটি বেতার বক্তৃতা করেছিলেন। ঐ কালে গান্ধী-জিন্নার যে আলোচনা চলছিল, তারই সূত্রে বক্তৃতাটি দেন। সূচনায় বলেন:

"বন্ধুগণ, দেশবাসিগণ! ...আপনারা জানেন বোম্বাইয়ে গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্না হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন এবং গান্ধীজী লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান—যদি প্রয়োজন হয়, লীগের

১ ১৯শে জুন, ১৯৪৫-এর বেতার ভাষণ থেকে।

পাকিস্তান-দাবি মেনে নিয়েও তা তিনি করবেন। লীগকে তুষ্ট করবার জন্য গান্ধীজীর এই প্রয়াসের বিষয়ে বাইরের ভারতবাসী আমরা কী ভাব তা জানতে আপনারা উৎসুক, সেকথা আমরা জানি।

"পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসী আমরা মুক্ত ও অখণ্ড ভারতবর্ষের জন্য এখন সংগ্রাম করে চলেছি। মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবে সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। সংগ্রাম যত দীর্ঘ এবং কঠিন হোক, আমরা বুঝেছি যে, পরিণতিতে সত্য ও ন্যায়ের জয় অনিবার্য, সফল হবে ভারতের মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম। সুতরাং আমরা কখনই বৃটেনের সঙ্গে আপোষের অংশীদার হতে পারি না। ইংরেজের সঙ্গে আপোষ—এই কথাটাই আমাদের কাছে ঘৃণ্য। আমরা খুব তীব্রভাবে অনুভব করি যে, ঐ আপোষের অর্থ দাসত্বকে দীর্ঘায়িত করা। অখণ্ড মুক্ত ভারত সৃষ্টি করার প্রতিজ্ঞা আমরা নিয়েছি বলে ভারতকে বিভক্ত করার, তাকে টুকরো টুকরো করার সকল প্রয়াসের বিরোধিতা আমরা করব। আয়ারল্যান্ড ও প্যালেস্টাইনের ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি। আমরা বুঝেছি যে, দেশকে বিভক্ত করার অর্থ তাকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করে ফেলা। আমেরিকা তার বর্তমান বিরাট রূপে পৌঁছতে পারত না, যদি আমেরিকান-পাকিস্তানীদের স্বেচ্ছামত কাজ করতে দেওয়া হত। বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হলেই আমরা সহজে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারব। সোভিয়েট ইউনিয়নকে দৃষ্টান্তরূপে আমাদের নেওয়া উচিত। ভারতের থেকেও বেশি সংখ্যক জাতির বাস সোভিয়েট ইউনিয়নে। কিন্তু তা হলেও তারা আজ ঐক্যবদ্ধ। কেন? যেহেতু তারা স্বাধীন এবং বিদেশী শক্তির কাছে তাদের মাথা নামিয়ে থাকতে হয় না।

"ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমার ও আমার দলের (ফরোয়ার্ড ব্লক) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; অতীতে লীগের সঙ্গে সহযোগিতায় আমরা কাজ করেছি। আমি মুসলিম লীগ এবং তার সুবিখ্যাত নেতার বিরোধী নই। কিন্তু আমি দেশকে বিভক্ত করার ঐ পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রচণ্ড বিরোধী।"

সুভাষচন্দ্র এই বক্তৃতায় যুদ্ধনীতি ও পৌরুষনীতির মোটা কথাটা কংগ্রেসী নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। "যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসরে ইংরাজ ও আমেরিকানরা একের পর এক যুদ্ধে পরাভূত হয়েছে, কিন্তু কদাপি শর্তাধীনে বা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের কথা ভাবে নি। তারা এই আশা রেখে লড়াই করে গেছে যে, শীঘ্র বা বিলম্বে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে; তাদের আশা সার্থক হয়েছে; তারা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছে; কিন্তু তাই বলে তারা যুদ্ধপ্রচেষ্টায় এতটুকু শিথিলতা দেখাচ্ছে না।" সুতরাং, সুভাষচন্দ্রের প্রশ্ন, কংগ্রেস কেন তা দেখাবে? যেহেতু ইঙ্গ-আমেরিকান পক্ষ কিছুটা জয়লাভ করছে?

আমরা বুঝতে পারি, নৈরাশ্যপীড়িত, সংগ্রামের ক্ষমতা বা ইচ্ছাহীন কংগ্রেসের বৃদ্ধ নেতৃত্বের কাছে সুভাষচন্দ্রের আবেদনের কোনো মূল্য ছিল না। ইংরেজের সঙ্গে আপোষ এবং পাকিস্তান স্বীকারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র এর পরে আরও যা বলেছেন, আমরা জানি, তার বিষয়েও উদাসীন থাকার মত প্রাজ্ঞ বধিরতা ভারতীয় নেতৃত্ব অর্জন করে ফেলেছিল। সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন, তা হয়ত আক্ষরিকভাবে সত্য হয় নি, কিন্তু সত্য হয়েছিল তাৎপর্যে, যা আরও মারাত্মক। বর্তমানে আমরা কি ভারতবর্ষ, নামক অতীতের "উপমহাদেশে" আমেরিকা, ইংলন্ড, রাশিয়া ও চীনের নিত্যলীলার সেবাদাসী হয়ে বিরাজ করছি না? সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল:

"লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে চুক্তি বৃটেনের সঙ্গে বোঝাপড়ার পূর্বভূমিকা হয়ে দাঁড়াবে। তা যদি হয়, তাহলে ভারত চিরদিন দাস হয়ে থাকবে। কংগ্রেস ও লীগ যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকবে, ততক্ষণ বৃটিশের সঙ্গে কোনো আপোষ হবে না। সেই জন্যই যেসব কংগ্রেসী বৃটেনের সঙ্গে আপোষ করতে চান, তাঁরা পাকিস্তানের তেতো বড়ি গিলতে রাজী হয়ে পড়েছেন। আমি কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ের নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দুই পক্ষের মধ্যে পাকিস্তান প্রশ্নে যদি কোনো আপোষও হয়, তবু ইংরেজ স্বাধীনতা দেবে না। সেকথা তারা কার্যত জানিয়ে দিয়েছে—সংখ্যালঘুদের এবং দেশীয় রাজাদের স্বার্থের রক্ষাকবচের কথা তুলে। যাঁরা মনে করেন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে প্রণোদিত হবে, তাঁরা আত্মপ্রতারণা করছেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি এ ব্যাপারে কংগ্রেস-লীগের বোঝাপড়ার হেতু বুঝতে পারছি না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পাকিস্তান মেনে নিলেও আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। লীগ কখনো আমাদের মত ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে না। তার একমাত্র ইচ্ছা, ভারতকে হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারত—এই দুই রাজ্যে ভাগ করে ফেলা। চারটি মুসলিম রাজ্য তার ফলে গঠিত হবে, যেগুলি বৃটিশ প্রভাবাধীন থাকবে। সুতরাং একটি ক্রীতদাস ভারতের পরিবর্তে আমরা চারটি ক্রীতদাস মুসলমান রাজ্য পাব, যারা বৃটেনের কুকর্মের সহায়ক ও প্ররোচক হবে। বৃটিশ যদি দেখে তার স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না, তাহলে কংগ্রেস-লীগ চুক্তিকে অগ্রাহ্য করবে। ভারতের উপর থেকে তারা হাত তুলে নেবে না। ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তরুণকে আমি প্রশ্ন করি: 'তোমরা কি মাতৃভূমিকে বিভক্ত করার কাজে যোগ দেবে? বিভক্ত ভারতে তোমাদের মর্যাদা কী দাঁড়াবে? সুতরাং বন্ধুগণ, যদি তোমরা স্বাধীনতা চাও, তার জন্য লড়াই করো, লাথি মেরে বৃটিশকে ভারত থেকে তাড়াও।' ইংরেজের সঙ্গে কোনো আপোষ চলবে না। আমাদের দিব্য মাতৃভূমিকে ছেদন করা চলবে না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।"[২]

[ক্রমশ]

২ সুভাষচন্দ্রের ইংরেজ জীবনীকার হিউ টোয় সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার বক্তৃতাদি একদম পছন্দ করেন নি।

সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। করাই স্বাভাবিক, তার দ্বারা তিনি নিজের ইংরেজ-স্বভাব দেখিয়ে দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র ইংরেজকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশও করেছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়, হিউ টোয়-এর স্বজাতিপ্রেম নিশ্চয় তাকে সানন্দে অনুমোদন করবে না। ১৯৪৪-এর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে এক পক্ষকাল ধরে বোম্বাইয়ে গান্ধী-জিন্নার মধ্যে যে-আলোচনা হয়েছিল, যার মধ্যে গান্ধীজী 'কার্যত' পাকিস্তান মেনে নিয়েছিলেন—তার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদ অবশ্যই হিউ টোয়-এর মতে গর্হিত ব্যাপার। আলোচনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল, কারণ জিন্না 'কার্যত' পাকিস্তানে সন্তুষ্ট ছিলেন না—তিনি ইংরেজের বাড়ানো হাতের তলায় অঞ্জলি পেতে অবিমিশ্র পাকিস্তান লাভ করতে চেয়েছিলেন।

উপরে আমরা গান্ধীজী কর্তৃক পাকিস্তান মেনে নেওয়ার সম্ভাবনায় সুভাষচন্দ্রের প্রচণ্ড প্রতিবাদের কথা উদ্ধৃত করেছি। গান্ধীজী ঠিক কতখানি মেনেছিলেন, তা জানতে পাঠকের কৌতূহল হতে পারে। স্যার রেজিন্যাল্ড কুপল্যাণ্ড গান্ধীজীর প্রস্তাবকে সারসংক্ষেপ করে যেভাবে উপস্থিত করেছেন (হিউ টোয়-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত) তাই তুলে ধরছিঃ

1. The Muslim League was to endorse the Indian demand for independence and to co-operate with the Congress in forming a provisional government for the 'transitional period.'

2. At the end of the war a Commission would demarcate those contigious areas in N.-W. and N.-E. India in which the Muslims are in an absolute majority, and in those areas a plebiscite of all the inhabitants would decide whether or not they should be separated from Hindustan.

3. In the event of separation, agreements would be made for defence, commerce, communications and other essential purposes.

4. 'These terms shall be binding only in case of transfer by Britain of full power and responsibility for the governance of India.'

হিউ টোয়-এর বক্তব্য, সুভাষচন্দ্র, গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে কোনরকম বোঝাপড়ার বিরোধিতা করেছিলেন এই জন্য যে, তা ঘটলে ভারতবর্ষে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা টলমলে হয়ে দাঁড়াবে এবং তিনি ভারতের 'মুক্তিদাতার ভঙ্গি' করতে পারবেন না। সুতরাং সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রচারসচিব শিবরামকে এই আপোষ-আলোচনার বিরুদ্ধে পুরোদমে প্রচারকার্য চালাতে নির্দেশ দিলেন। হিউ টোয় জানিয়েছেন, শিবরাম এই 'জঘন্য মতলবে' সায় দেওয়ার চেয়ে পদত্যাগ করাই সঙ্গত বিবেচনা করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের মতলব জাপানীদের সাহায্যে নিজেকে ভারতের ডিক্টেটর করে তোলা। তাঁর নীতি ভারতে অশান্তি ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবে—এও শিবরাম বুঝেছিলেন। হিউ টোয় অবশ্য এসব কথা জানাবার সময়ে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন, এইকালে যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপর্যয়ের সঙ্গে শিবরামের নবজাগ্রত গান্ধী-ভক্তির কতখানি যোগ ছিল।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হবার পরে লর্ড ওয়াভেল তাঁর প্রস্তাব হাজির করেন। ওয়াভেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'রাতের পর রাত' সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, যত প্রকারে পারেন ঐ প্রস্তাবের অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি উদ্ঘাটন করেছিলেন, সতর্ক করেছিলেন সুচতুর বৃটিশ রক্ষণশীল রাজনীতিকদের ধাপ্পাবাজি সম্বন্ধে। ভাইসরয় যে কাউন্সিল প্রবর্তন করবেন বলেছেন, সেখানে কংগ্রেস সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়াবে; তার ফলে যখন ভাইসরয় ও লীগ-সদস্যেরা ভারত বিভাগের প্রস্তাব ওঠাবেন, তখন তাঁকে বাধা দেবার শক্তি তাঁদের থাকবে না। সুভাষচন্দ্র তাই ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেনঃ এই ক্রান্তিকালে ভারতের ভাগ্য ভারতবাসীরই হাতে; সারা দেশজুড়ে আবার "ভারত ছাড়" আন্দোলন জাগুক যাতে কেউ আপোষ রফা করতে না পারে। [“At this critical hour the destiny of India lies in your hands. Now is your time for starting the 'Quit India' campaign all over the country, and thereby making it impossible for anyone to arrive at a compromise.”]

সুভাষচন্দ্র এও বলেছিলেন, ভারত যদি দরকষাকষি করতেই চায়, তাহলে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচনের পরে শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় এলে তা করা উচিত। চার্চিল সরকার আসন্ন নির্বাচনে টোরীদের পক্ষে ভোট কুড়োবার জন্যই ওয়াভেল-প্রস্তাব এনেছে।

ওয়াভেল-প্রস্তাবের উপর কোনো বোঝাপড়া সম্ভব হয় নি। হিউ টোয় বিদ্রূপ-তিক্ত স্বরে বলেছেন, “শেষবারের জন্য বোস নিজ ভোটে জিতে গেলেন।”

হিউ টোয়দের আনন্দবিধান করে বলাই বাহুল্য বোস জিততে পারেন নি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্গতি তারই ফলে হয়েছে। যে চার্চিল সরকারের আসল মতলবের কথা বসু বারে বারে খুলে বলেছেন, যার জন্য তিনি অতখানি ঘৃণাভাজন হয়েছেন, সেই সরকারের আসল মনোভাব কী ছিল, এক ঝলকে তা সদ্য দেখা গিয়েছে। ১৯৪২ সালে ক্রিপস মিশনের সময়ে ভারতীয়দের এবং তাদের নেতাদের সম্বন্ধে লর্ড লিনলিথগোর মনোভাব কি ধরনের ছিল,

তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখেছি ১১ই জুলাই, ১৯৭০-এর স্টেটসম্যান পত্রিকায়। বৃটিশ সরকার ঐ সময়কার সরকারী কাগজপত্র (Constitutional Relations Between Britain and India গ্রন্থে) প্রকাশ করাতেই ব্যাপারটা জানা গেছে। ঐকালে বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের নিয়ে শাসনপরিষদ গঠন করবেন বলেছিলেন। অবশ্য ভারতীয়দের হাতে আসল ক্ষমতা কিছুই দেওয়া হবে না, তাও জানানো হয়েছিল। লিনলিথগোর ইচ্ছা ছিল, নেহরু ও জিন্নার হাতে কোনো শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা না দিয়ে জনগণের মনের জোর বাড়াবার কাজে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে, কারণ ভয়কাতুরে কুলিগুলোর সঙ্গে বার্তাচিত করে বিশেষ কিছু ঘটাতে পারবেন, এমন ভরসা খাঁটি লর্ড শ্রীযুক্ত লিনলিথগোর ছিল না।

[In reply to Mr. Amery's telegram of April 7, 1942—seeking his views about what changes he was contemplating in the event of the Cripps Mission—Linlithgow had some revealing comments to make. His plan was to see whether Mr. Nehru or Mr. Jinnah would take office without Administrative portfolio so that they might remain free 'to tour the country to boister up morale'. (As you know I don't hope for much out of pep talks to terrified coolies)."]

সংগ্রামে অনিচ্ছা এবং আশু ক্ষমতাপ্রাপ্তির লোভ এই সময়ে অর্থাৎ ওয়াভেল-প্রস্তাব আলোচনার সময়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কিভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, তার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় মৌলানা আজাদের 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম' বই থেকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যে সংগ্রাম-স্পৃহা যদি কোথাও থাকে, তা ছিল একমাত্র গান্ধীজীর মধ্যে। গান্ধীজী ভিন্ন 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করত না। জওহরলাল, আজাদ ও রাজাগোপালাচারীর তখন গলাগলি ভাব—ফ্যাসিস্ট-ভীতির ছুতোয় তাঁরা 'গণতান্ত্রিক' ইংরেজের কোলে উঠে বসেছেন। দুর্ধর্ষ জওহরলাল কিছু লজ্জায় ইংরেজের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় নেতৃত্ব নিতে পারছেন না—সে দায় কংগ্রেস-সভাপতি আজাদের ঘাড়ে চলে গিয়েছে এবং তিনি অক্লেশ আনন্দে তা বহন করছেন। কিভাবে তা করেছেন, তা তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই দেখব। ১৯৪৫-এর ২৫শে জুন সিমলায় ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনাসভার আয়োজন করলেন। কংগ্রেস-সভাপতি আজাদ 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেস মিউজিয়ামে ফেলে রেখে সেই আলোচনায় যোগ দেবার জন্য ছুটে গেলেন। তারপর :

"পরদিন সকাল ১০টায় আমি ভাইসরয়ের (লর্ড ওয়াভেল) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং সংক্ষেপে জানালেন, বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কী প্রস্তাব তিনি এনেছেন। তিনি বললেন, যুদ্ধের মধ্যে কোনো সুদূরপ্রসারী শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটানো যাবে না, কিন্তু ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হবে এবং একটা রীতি দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হবে যে, ভাইসরয় সর্বদা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। সরকারকে বিশ্বাস করবার জন্য ভাইসরয় আমার কাছে আবেদন জানালেন। তাঁর ঐকান্তিক মনোবাসনা, যুদ্ধের পরে ভারতীয় সমস্যার সমাধান অবশ্যই করা দরকার। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। সুতরাং এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা যুদ্ধের বিজয়-সমাপ্তিতে অংশ নিলে ভারতেরই সুবিধা হবে। তারপর মুসলিম লীগের উল্লেখ করে তিনি বললেন, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

"আমি তাঁকে পরিষ্কার বললাম, লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া হওয়ার ব্যাপারটির কোনো স্থিরতা নেই। লীগের কর্তা-ব্যক্তিদের ধারণা, সরকার তাদের পক্ষে আছে; সুতরাং তারা ন্যায়সঙ্গত কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।

"ভাইসরয় জোর দিয়ে বললেন, সরকারের পক্ষে লীগকে সমর্থনের কোনো কথাই ওঠে না। মুসলিম লীগের নেতাদের তেমন কোনো ধারণা যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন, সরকার নিরপেক্ষ আছে এবং থাকবে।

"আমি তখন আহমদনগর দুর্গের কারাকক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে যে-পত্রালাপ করেছি, তার উল্লেখ করে বললাম, সেগুলি প্রকাশ করলে নিশ্চয় তাঁর আপত্তি হবে না।

"ভাইসরয় বললেন, যদি সেগুলি প্রকাশ করতে আমি ব্যগ্র হই, তাহলে তিনি আপত্তি করবেন না, কিন্তু তাঁর মতে ওগুলির প্রকাশ এখন দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হবে। তিনি বললেন, আমরা এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে চাইছি: আমাদের ইচ্ছা, জনগণ তিক্ত অতীতের স্মৃতি ভুলে যায়। এই সময়ে যদি সেই পুরনো স্মৃতি-গুলি জাগিয়ে তোলা হয়, তাহলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে যাবে, বন্ধুত্ব ও একাত্মবোধের মনোভাবের পরিবর্তে অবিশ্বাস ও ক্রোধের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তিনি আবেদন জানিয়ে বললেন, ঐ চিঠিপত্রগুলি প্রকাশ করার জন্য আমি যেন চাপ না দিই এবং যদি আমি তাঁর কথা রাখি, তাহলে তিনি আমার আচরণের যথেষ্ট তারিফ করবেন।

"আমি দেখলাম, ভাইসরয় খুবই আন্তরিক, যথার্থই তিনি আবহাওয়ার পরিবর্তন চান। আমি তাঁকে বললাম, নতুন আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে আমি তাঁর অভিপ্রায়ের অংশীদার; নতুন বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে আমাদের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এই পরিস্থিতিতে আমি এমন কিছু করব না, যাতে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং তাঁর কথা আমি মেনে নিলাম।

"ভাইসরয় দ্বিতীয়বার বললেন, আমার এই মনোভাবের জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

"ভাইসরয় তারপর তাঁর প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে জানালেন। প্রথমেই আমার মনে হল, ক্রিপস প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্রস্তাবের সারাংশে কোনো পার্থক্য নেই। তবে পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একটি বাস্তব পার্থক্য ঘটে গেছে। ক্রিপস প্রস্তাব করা হয়েছিল যখন ইংরেজের পক্ষে ভারতীয় সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর আজ ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মিত্রপক্ষ সেখানে হিটলারকে পরাভূত করেছে। তা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকার ভারতে নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য পুরনো প্রস্তাবের পুনরুত্থাপন করছেন।

"ভাইসরয়কে বললাম, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার প্রতিনিধিত্বের অধিকার আমাকে দিয়েছে সত্য কিন্তু তা হলেও সুনির্দিষ্ট উত্তর দেবার আগে আমি সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে চাই। তদনুযায়ী আমি প্রস্তাবের বিবেচনার জন্য সিমলায় ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডেকেছি। সেখানকার আলোচনার পরে আমি সম্মেলনের সামনে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করতে পারব। লর্ড ওয়াভেলকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, সমস্যার সমাধান করতেই আমি চাইব, ঝঞ্ঝাট বাধাব না।

"ভাইসরয় যখন তাঁর প্রস্তাব বর্ণনা করছিলেন তখন তাঁর খোলা মনোভাব এবং আন্তরিকতা দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমি দেখলাম, তাঁর মনোভাব রাজনীতিকের নয়, সৈনিকের; খোলাখুলি, সরাসরি তিনি কথাবার্তা বলেছিলেন, ধানাইপানাই না করে মূল কথায় চলে এসেছিলেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে তাঁর আচরণের পার্থক্য বেশ চোখে পড়ল। ক্রিপস তাঁর প্রস্তাব যতখানি মনোহর করে হাজির করা যায় তাই করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাল দিকটিকে বেশি উজ্জ্বল করে তুলে অসুবিধার অংশগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন যেন-তেনভাবে। লর্ড ওয়াভেল তেমন কোনো চেষ্টাই করেন নি এবং প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা থেকে সুনিশ্চিতভাবে বিরত ছিলেন। সোজা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, যুদ্ধ এখনো চলেছে এবং জাপান শক্ত শত্রু। এই অবস্থায় বৃটিশ সরকার কোনো দূরপ্রসারী পদক্ষেপে প্রস্তুত নয়। ও-ধরনের ব্যবস্থার জন্য যুদ্ধশেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে তাঁর মতে তার ভিত্তি এখনই স্থাপন করা যায়। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সম্পূর্ণ ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত হবে। তার ফলে সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থা ভারতীয়দের করায়ত্ত হয়ে যাবে। একবার তা হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যুদ্ধের পরে অধিকতর অগ্রগতির পথ পরিষ্কার হবে।

"লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমার ইন্টারভিউ সিমলায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। সেদিন রাত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। শুনলাম, আমার সম্বন্ধে তিনি খুব উচ্চ ভাষায় কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ থাকলেও ওঁরা ভদ্রলোক। ভাইসরয়ের এই মন্তব্য সারা সিমলায় ছড়িয়ে পড়ে সরকারী ও বেসরকারী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কংগ্রেস সম্বন্ধে যাঁরা অনেকেই শীতল মনোভাব দেখাচ্ছিলেন, আমাকে প্রায় চিনছিলেন না, হঠাৎ আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের হৃদয়ে অনুরাগের উত্তাপ দেখা গেল। তাঁরা অনেক উপহার এনে আমাকে দিলেন, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ভিতরে ভিতরে তাঁরা সর্বদা কংগ্রেসের পক্ষেই আছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন।

"সর্দার হরনাম সিংয়ের বাড়িতে গান্ধীজী উঠেছিলেন, সেখানে ২৪ তারিখে বিকালে ওয়ার্কিং কমিটির সভা বসল। ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বললাম, এই প্রস্তাব ক্রিপস-প্রস্তাবের সঙ্গে যদিও চেহারায় একই, তবু আমাদের একে গ্রহণ করা উচিত। আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি পরিবর্তিত অবস্থার কথা তুললাম। ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং জাপানেও বেশিদিন টিকতে পারবে না। যুদ্ধ যদি একবার শেষ হয়ে যায়, তাহলে ইংরেজের পক্ষে আমাদের সহযোগিতা চাইবার বিশেষ কারণ থাকবে না। সুতরাং আমাদের পক্ষে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না। শর্ত মনঃপূত হলে তাকে গ্রহণ করব—এই মনোভাব নিয়ে সম্মেলনে আমাদের যোগদান করা উচিত।

"ওয়ার্কিং কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। শেষে স্থির হল, সম্মেলনে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপরে জোর দেব:

"(১) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সঙ্গে ভাইসরয়ের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার বিবৃতি চাই। কাউন্সিল যদি কোনো বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে কি ভাইসরয় সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন, কিংবা তেমন ক্ষেত্রেও তাঁর ভেটো থাকবে?

"(২) সৈন্যবাহিনীর ব্যাপারটিও নির্ধারিত হওয়া দরকার। সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে বিভেদের রেখা টানা হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার, যাতে করে ভারতীয় নেতারা সৈন্যবাহিনীর সংস্পর্শে আসতে পারেন।

"(৩) বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর মতামত না নিয়েই ভারতকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছেন। কংগ্রেস এই অবস্থাকে মেনে নেয় নি। যদি কোনো বোঝাপড়া হয় এবং নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হয়, তাহলে যুদ্ধে পরবর্তী অংশগ্রহণের ব্যাপারটিকে লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সামনে উপস্থিত করার অধিকার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের থাকবে। ভারত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে বৃটিশ সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হয়ে নয়, তার নিজের প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

"গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সহমতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু তাঁর এ কথাটা তোলেন নি—যুদ্ধে অংশ নেওয়ার মানে কংগ্রেসের পক্ষে অহিংসা ত্যাগ করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তিনি কদাপি উত্থাপন করেন নি। এই প্রশ্নে যেসব ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য পূর্বে পদত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও অনুরূপভাবে নীরব ছিলেন।"

সিমলা সম্মেলন হয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস লর্ড ওয়াভেলের সব কথাই মেনে নিয়েছিল বলে কংগ্রেসের [illegible] কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু বাগড়া দিয়েছিলেন জিন্না। স্থির হয়েছিল, কংগ্রেস মনোনীত করবে পাঁচজন [illegible] ভাইসরয় মনোনীত করবেন চারজন সদস্য। লীগের পক্ষে জিন্না বললেন, মুসলমান সদস্য মনোনীত করবার অধিকার একমাত্র লীগেরই থাকবে। কংগ্রেস বলল, লীগ নিজের ভাগ সম্বন্ধে যা ইচ্ছে করুক, আমরা আমাদের পাঁচজনের মধ্যে দেব দু'জন হিন্দু এবং একজন করে মুসলমান, খৃস্টান ও পার্শী। ভাইসরয় মনোনীত করলেন দু'জন অনুন্নত, একজন মুসলমান এবংএকজন শিখকে। জিন্না কিন্তু লীগ মনোনীত করে নি, এমন দু'জন মুসলমান সদস্যকে কাউন্সিলে মেনে নিতে রাজী হলেন না। তার ফলে ১৪ জন সদস্যের কাউন্সিলে মুসলমান সদস্য যদিও সাতজনে দাঁড়াল, তবু জিন্না গোঁ ভরে আলোচনা ভেঙে দিলেন। মৌলানা আজাদ গভীর হৃদয়-বেদনার সঙ্গে লিখেছেন:

"কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে আলোচনা এতাবৎকাল রাজনৈতিক কারণেই ভেঙে গেছে। বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় নি এবং কংগ্রেসও ভারতীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নেই এমন কোনো সমাধান মেনে নিতে রাজী হয় নি। সুতরাং আলোচনা ভেঙেছে রাজনৈতিক কারণে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে নয়। সিমলা সম্মেলনের সময়ে আমি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে ওয়াভেল-প্রস্তাব মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। আর এখন ভারত ও বৃটেনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রশ্ন যখন মীমাংসার পথে, তখন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আলোচনা ভেঙে গেল। ...মিঃ জিন্না অদ্ভুত দাবি তুলেছিলেন, কংগ্রেস কেবল হিন্দু সদস্য মনোনীত করতে পারবে। সম্মেলনে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কংগ্রেস কাকে মনোনীত করবে, না করবে, তা নির্ধারণ করবার অধিকার মিঃ জিন্নার উপরে বর্তালো কিভাবে? ...লর্ড ওয়াভেলকে বলেছিলাম, তিনি পরিষ্কার বলুন, মুসলিম লীগের আচরণ যুক্তিসঙ্গত কি না? লর্ড ওয়াভেল উত্তরে বলেছিলেন, তিনি মুসলিম লীগের আচরণকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন এ ব্যাপারটা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেই ঠিক করে নিতে হবে; সরকার বা ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো দলের উপরেই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না।...

"কংগ্রেস যে-তালিকা দিয়েছিল তাতে মাত্র দু'জন হিন্দুর নাম ছিল।...সুতরাং জিন্নার বিরোধিতার ফলে সম্মেলন যদি ভেঙে না যেত, তাহলে ফল দাঁড়াত—যে-মুসলমানেরা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র, তারা ১৪ জনের কাউন্সিলে ৭ জন সদস্য পেত।"

সিমলা সম্মেলন ভেঙে যেতে আজাদের আর একটি বাসনা অচরিতার্থ থেকে যায়: "সিমলা সম্মেলন যদি সফল হত তাহলে জাপানের বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধ কেবল বৃটেনের যুদ্ধ থাকত না, ভারতের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াত।"

কংগ্রেসের সবচেয়ে দক্ষিণপন্থী একজন নেতার রচনা থেকে কংগ্রেসের আসল চেহারা দেখতে পেলাম। মৌলানা আজাদ কোনোকালেই বিরাট কিছু সংগ্রামী পুরুষ নন। তিনি বিবেচনাপূর্ণ দেশপ্রেমিক। জীবনের প্রথম পর্ব বাদ দিলে মডারেট দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মডারেট মনোভাব আরও ঘন হয়েছে এবং যেভাবে হোক একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হতে অধীর হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা হিসাবে কংগ্রেসে যে মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন, জিন্নার ক্রমবর্ধমান শক্তি তাকে সজোরে নাড়া দিচ্ছিল। চরম বিপর্যয়ের আগে তিনি একটা মোটামটি সম্মানজনক বোঝাপড়া করে নিতে চাইছিলেন। সুতরাং এইকালে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের কথা যাঁরা ভাবছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে এ'র বিরূপতার সীমা ছিল না। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের তাঁবেদার হয়ে (কিংবা হাইকম্যান্ডকে তাঁবেদার করে!!) তিনি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অত্যন্ত নীতিহীন আচরণ করেছিলেন, তার আলোচনা আমরা যথাসময়ে করব। আজাদের ইংরেজভক্তি এই সময়ে এত বেড়ে গিয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ ভিন্ন তাঁর মনে আর কিছু ছিল না। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের বেপরোয়া সাহসে অভিভূত হলে আজাদের অস্বস্তির সীমা ছিল না। নেতৃত্বের সংঘর্ষে সুবিধা বুঝে জওহরলালও আজাদের দিকে ঢলে পড়েছিলেন। এবং সকলে মিলে কংগ্রেসের মধ্যে যেটুকু সংগ্রামের ক্ষমতা ছিল নিঃশেষে মুছে দিয়েছিলেন। পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, একমাত্র যিনি লড়াই করতে পারতেন, শত দ্বিধা-সংকোচ সত্ত্বেও যিনি বারে বারে সংগ্রামের পথে দেশকে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সেই গান্ধীজী নিজের বার্ধক্য এবং নিজের শিষ্য ও সমর্থকগণের লোভের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন।

আজাদের লেখা দেখিয়ে দেয়, এইকালে কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শবাদের তলানিও ছিল না। কী অপূর্ব এই কংগ্রেস! ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি যে-প্রতিষ্ঠান 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব নিয়েছে, মাত্র তিন বছর পরে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার না করেও সে আলোচনায় বসে গেল; ক্রিপসের কাছ থেকে আসা যে-প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকেই মাথায় তুলে

নিল। আর সেই অদ্ভুত কাজের পক্ষে যুক্তি কী? না, এখন যুদ্ধে ইংরেজের অবস্থা ভাল। সুতরাং, হাতে মাত্র যা পাওয়া যায়, তাতে যদি স্বাধীনতার গন্ধও না থাকে, তাকেই পকেটস্থ কর। এই কংগ্রেস নাকি আদর্শবাদী, নীতিবাদী, সে নাকি বিরাট আদর্শে গর্ভবতী। শত্রুর ভাল-মন্দ অবস্থার সন্ধান সুভাষ বোসের মত রাজনীতিকরাই করে থাকেন—এমন কথাই তো কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের আদর্শবাদীরা এতদিন বলে এসেছেন।

আজাদের বর্ণনা অনুযায়ী গান্ধী ও তাঁর নৈষ্ঠিক অনুগামীদের চেহারাও অপূর্ব দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্বে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে অহিংসার সচ্চরিত্রতা বজায় থাকবে কি না তাই নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে কুলীন গান্ধীপন্থী ও ভণ্ড গান্ধীপন্থীদের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়ে গেছে। কয়েক বছর পরে সেই একই প্রশ্ন যখন উঠল, দেখা গেল, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা চরিত্র বজায় রেখেই হিংসার সহবাস করতে পারে, অন্তত আজাদ তাই বলতে চেয়েছেন।

আজাদের বিবরণ থেকে আরও দেখি, ইংরেজের রণছোড় সেনাপতি ওয়াভেল এবং কংগ্রেসের রণছোড় সেনাপতি আজাদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালই হয়েছিল। বড়সাহেবদের কাছ থেকে একটু ভাল ব্যবহার পেলে ভারতীয় বড় নেতারা কিভাবে গলে যান, আজাদ নিজের খরচে তারও বিবরণ দিয়েছেন। ওয়াভেল-ভক্ত আজাদ তাঁর একই গ্রন্থে নেহরুর উপরে লর্ড ও লেডী মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাব নিয়ে কটাক্ষ করেছেন।

সিমলা-আলোচনা ব্যর্থ হলে একটি বিষয়ে আজাদের (এবং জওহরলালের) মর্মপীড়ার সীমা ছিল না। বোঝাপড়াটা হয়ে গেলেই তিনি বা তাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্যালুট নিয়ে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে, বীরদর্পে দেশপ্রেমের কথা শোনাতে পারতেন—তারপরে সেই বাহিনী ভারতের এবং এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত—'অর্ডার অব দি ডে' আজাদই (বা নেহরু) লিখতেন (জাপানের পক্ষপুটাশ্রিত সুভাষ বোস নয়)—সে একটা বিরাট কাণ্ড। জিন্নার জেদের ফলে তা ঘটতে পারল না বলে আজাদের আফশোসের অবধি ছিল না। জিন্না—আহমেদাবাদ দুর্গ থেকে সসম্মানে মুক্ত বীর সেনানী আজাদের কল্পনা স্বর্গকে ভূপাতিত করে দিয়েছিলেন—জিন্নার অপরাধ অ-ক্ষমণীয়।

অন্য একদিক দিয়ে আজাদের প্রয়াসের বিবেচনা করা যায়। লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিকতায় আজাদের বড়ই বিশ্বাস হয়েছিল। ধরা যাক, লর্ড ওয়াভেল উত্তম মানুষ ছিলেন। কিন্তু আজাদ কি করে ধরে নিলেন, ওয়াভেল মানে বৃটিশ সরকার? আজাদ স্বয়ং লিখেছেন, জিন্না যখন সদস্য মনোনয়ন নিয়ে বিচিত্র দাবি তুললেন, তাকে অযৌক্তিক বলে মনে করেও ওয়াভেল বললেন, এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু নাচার—কারো উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। এমন জিনিস ঘটবে, এটুকু বুঝবার ক্ষমতা কি আজাদের ছিল না? ওয়াভেলের সরলতার মতই আজাদের সরলতাও ঐতিহাসিক।

আজাদ বলেছেন, এই প্রথম সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা রাজনৈতিক কারণে ভেঙে যায় নি। তা সত্য, কারণ এই প্রথম আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস তার সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের কাছে অকুণ্ঠে আত্মসমর্পণ করেছিল।

কংগ্রেসের 'ন্যাশন্যাল' স্বভাবের বহু গুণগান আজাদ করেছেন, কারণ কংগ্রেস ১৪ জনের কাউন্সিলে ৭ জন মুসলমান সদস্য মেনে নিতে রাজী ছিল। উদারতার বিস্ফোরণ বটে! কিন্তু চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। উদারতার অভিনয় মানেই উদারতা নয়। সুভাষচন্দ্র বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, যে-কোনো সংখ্যায় জাতীয়তাবাদী মুসলমান কাউন্সিলে আসুক, আপত্তি নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা যেন ক্ষমতা করায়ত্ত করে না নেয়। কংগ্রেস যেখানে লীগের পাঁচজন সাম্প্রদায়িক মুসলমান সদস্য মনোনীত করার অধিকার মেনে নিয়েছিল, তখনই অপরাপর সম্প্রদায়গুলির আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার মেনে নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য ছিল। তা ছাড়া ১৪ জনের কাউন্সিলে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা যেখানে সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন, সেখানে কি করে দেশহিতের কাজ চালাবেন, আজাদ তা কখনো স্পষ্ট করে বলেন নি। তা বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

আজাদ এবং নেহরু প্রভৃতির আসল ভয় ছিল, যা তাঁরা মুখে স্বীকার করেন নি—সুভাষ বোসের সৈন্যবাহিনী এসে পড়ে আমাদের হটিয়ে দেবার আগে যা হোক করে ইংরেজের সঙ্গে আপোষে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া দরকার। সিমলা-আলোচনা ব্যর্থ হলে সে আশায় ছাই পড়ে। কিন্তু একথা ইংরেজ-প্রভুরা পরিষ্কার বুঝে গিয়েছিলেন, ভারতবাসীর হাতে তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তর করুন বা না করুন, উল্লিখিত বিপদের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমের অংশ বৃটিশ সরকার পেয়ে যাবে।

ইতিহাসের বিচিত্র বিধানে, যে সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এত আতঙ্ক ও বিরূপতা, তাঁর কীর্তি ভাঙিয়েই পরবর্তীকালে আজাদ, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ ব্যক্তি ইংরেজের কাছ থেকে দেশবিভাগ সহ রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ইতিহাসের ঐশ্বর্য হয়ে আছে সমকালে সুভাষচন্দ্রের এই উদ্দীপ্ত ঘোষণা—মহাত্মা গান্ধী আপোষ করলেও আমরা লড়াই করে যাবঃ

"As long as there is no compromise between Mahatma Gandhi and the British Government we have no reason to feel anxious. In any case the war has to be faught and we will go on fighting even if Mahatma Gandhi makes a compromise."

(July 4, 1944)
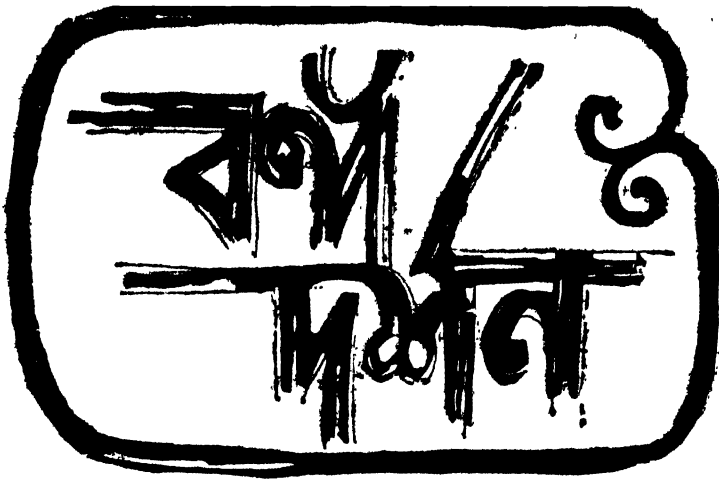
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা সতেরই জুলাই তারিখে একদিনের জন্য কলকাতায় এসে কতকগুলি স্পষ্ট ভাষণ দিয়ে গেছেন, যার ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অদূরভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবার কোন আশাই নেই। তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেছেন যে, ১৯৭২-এর আগে নির্বাচনের কথা ওঠে না। আপাতত রাজ্যপালের প্রশাসন চলছে ও চলবে, এবং পশ্চিমবঙ্গের আমলাতন্ত্রকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন রাষ্ট্রপতি শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে, এই ভেবেই কাজকর্ম চালিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীর স্বল্প অবস্থানকালে পশ্চিমবঙ্গের চারটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। এই চারটি দল হল ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস। প্রথম দুটি দল রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার ও মধ্যবর্তী নির্বাচন, এবং সি আর পি প্রত্যাহারের দাবি জানান। বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সাথে সম্ভাব্য সরকার গঠন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেন। বিধানসভা অদূরভবিষ্যতে ভেঙে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কোন স্পষ্ট কথা বলেন নি। ঐদিন রাত আটটায় একটি বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তবে একথা ঠিক যে, প্রধানমন্ত্রীর আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন যে অদূরভবিষ্যতে ঘটবে, তার কোন ইঙ্গিত নেই, থাকা সম্ভবও নয়। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলার অবনতির সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ বোধ করেছেন, কিন্তু কিভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন নি। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী তাঁর ভাষণে স্থান পেলেও সেগুলি সম্পর্কে কেন্দ্র সত্যই কি করতে চান, সে বিষয়েও তিনি কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি, আর তাছাড়া এই সমস্যাবলীর মূলে কোথায় সে বিষয়েও তিনি কোন চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হবার পর শ্রীমতী গান্ধীর এই প্রথম কলকাতায় আগমন।

অমার্জনীয়

ছাত্র বিক্ষোভের নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গত কয়েক বছরে অনেক কাণ্ডকারখানা ঘটেছে, কিন্তু গত ১১ই জুলাইয়ের ঘটনা অতীতের হাঙ্গামার সকল রেকর্ডকেই ছাপিয়ে গেছে। ঐদিন দ্বারভাঙ্গা হলের দোতলায় সিঁড়িতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বহু ঐতিহ্যসম্পন্ন আবক্ষ মূর্তির উপর পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ ছাত্রেরা আক্রমণ চালিয়েছে। আশুতোষের মর্মর মূর্তিটিকে বেদীচ্যুত করে সিঁড়ির উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং বিক্ষোভকারীদের হাতে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার প্রহৃত হয়েছেন। গণ্ডগোলের সূত্রপাত প্রি-মেডিকেল ছাত্রদের একটি দাবিকে কেন্দ্র করে। দাবি এই যে, তাদের বিনা পরীক্ষাতেই এম বি বি এস-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি করে নিতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে, এবারের প্রি-মেডিকেল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১১ই মে। কিন্তু পরীক্ষার হলে হাঙ্গামার ফলে দু'-দুবার সেই পরীক্ষা পণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর নতুন করে এই পরীক্ষার দিন ঠিক হয় ২০শে জুলাই। কিন্তু এখানেই আপত্তি। ছাত্রদের দাবি যে, পরীক্ষা ব্যতীতই তাদের এম বি বি এস কোর্সে ভর্তি করে নিতে হবে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরের সামনে এই দাবি নিয়ে ছাত্ররা জড়ো হলে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার ছাত্রদের জানান যে, তাদের দাবি বিবেচনা করার জন্য উপাচার্যের দাবি, যেমন একটির মতোই তাদের সব দাবি মানতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা একটা আপোষ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। বেলা দুটো নাগাদ বিক্ষোভকারীরা লঙ্কাকাণ্ড শুরু করে, সমস্ত কিছু ভেঙে তছনছ করে দেয়, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ বসু সহ কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী ও অধ্যাপককে দৈহিক আক্রমণ করে। এর পর তারা স্যার আশুতোষের মর্মর মূর্তিটি নষ্ট করে এবং বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পুলিশের আসার আগেই অন্তর্হিত হয়।

বলাই বাহুল্য যে, স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ছাত্র বিক্ষোভের নামে এই জাতীয় চ্যাংড়ামি ও গুণ্ডামি আজকাল গা সওয়া হয়ে গেছে। তবুও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং সারা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে যাঁর ঐতিহাসিক নাম বিজড়িত হয়ে আছে, সেই আশুতোষের মর্মর-মূর্তির ওপর এই বর্বর আক্রমণের সংবাদে যে কোন বিবেকবান মানুষই স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবেন। ছাত্রদের হাতে ছাত্রপ্রাণ আশুতোষের এই নিগ্রহ ঘটল এবং তা ঘটল তাঁরই কীর্তিক্ষেত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে! এই গুণ্ডামি যারা করেছে, তারা ছাত্র আন্দোলনের মুখেই চুনকালি লেপে দিয়েছে এবং এভাবেই ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে জনসাধারণের চোখে হেয় করে সেই সব প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সাহায্য করছে, যারা ছাত্র বা জনসাধারণের যে কোন অংশের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। নিজেদের দাবি প্রকাশের জন্য এবং যে দাবি মানতে গেলে ইউনিভার্সিটি রাখারই কোন সার্থকতা নেই, যে পথ এই প্রি-মেডিকেল ছাত্ররা নিয়েছে তার দ্বারা ছাত্র আন্দোলনকে কলঙ্কিত করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নি। সারা বছর যারা পড়াশোনার ধারেকাছে যাবে না, পরীক্ষা হলে গণ্ডগোল পাকিয়ে পরীক্ষা ভণ্ডুল করবে, এবং চোখ রাঙিয়ে হামলা করে বিনা পরীক্ষায় পাশ করাবার দাবি জানাবে, এরা ছাত্র হলেও আসলে সমাজ-বিরোধী এবং তার থেকে বেশি কোন মূল্য এরা পেতে পারে না। যে কর্ম এরা করেছে তা আন্দোলন নয়, সুনির্দিষ্ট আইনসঙ্গত অপরাধ, এবং সে হিসাবে এরা যদি বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যায়, তাহলে সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি চূড়ান্ত অন্যায় করা হবে, যারা সত্যই পড়াশোনা করে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কড়া মনোভাব নেবেন।

কি ফল মিলিল ?

সৌভাগ্যের বিষয়, ১৪ই জুলাইয়ের বাংলা বন্ধ-এ বিগত ১৭ই মার্চের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় নি, তবু কয়েকটি ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ঘটেছে, পুলিশকে গুলী চালাতে হয়েছে, দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন এবং ইতস্তত বিভিন্ন এলাকায় বোমা-বাজিও হয়েছে। অন্যান্যবার হরতালে যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকে, এবার সেই সমর্থন যে ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এ হরতালের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মোটেই স্পষ্ট নয়। কি জন্য এই হরতাল? রাজ্যপালের শাসনের বিরুদ্ধে? কিন্তু রাজ্যপালের শাসন ডেকে এনেছেন কারা? যে ছয় পার্টি ও আট পার্টি জোট রাজ্যপালের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য হরতাল ডেকেছিলেন তাঁরা তো নিজেরাই রাষ্ট্রপতির শাসন ডেকে এনেছেন। নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি, কলহ ও কুৎসা রটনা করে তাঁরাই তো যুক্তফ্রন্টকে ভেঙেছেন। কিন্তু তাঁদের এই অপকর্মের দায় জনগণ বহন করবে কেন? বস্তুতপক্ষে বামপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা প্রমাণ ছাড়া এই হরতালের দ্বারা আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি। এবারের হরতালের পক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি ছিল না বলেই সাধারণ মানুষের মনে এই হরতালের ডাক কোন সাড়া জাগায় নি। আশংকায় এবং নিরাপত্তাবোধের অভাবে মানুষ পথে বার হয় নি, কাজ-কারবার খোলে নি, অফিস-আদালতে যায় নি।

জমির লড়াই

গত পয়লা জুলাই থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জমি দখলের আন্দোলন শুরু করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, খোদ পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা ৭৫ হাজার বিঘা জমি দখল করেছেন। এই দাবি ঠিক কি ভুল, তা আমরা নির্ণয় করতে বসি নি, তবে এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জমি দখলের লড়াইয়ে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে, এবং তাতে বেশ কয়েকজন আহত ও নিহত হয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির দেখাদেখি অপরাপর বামপন্থী দলগুলিও শীঘ্র এই জাতীয় আন্দোলনে নামবেন আশা করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে তীব্র রেষারেষি এবং অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, তাতে এটা আশা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তখন বেনামী জমি কে দখল করবে সেই প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক খুনোখুনি বেধে যাবে। মাত্র কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে ঝাড়মাস গ্রামে এই ধরনের ন্যস্ত জমি দখল করার প্রশ্ন নিয়ে সি পি এম ও আর এস পি-র সমর্থকদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়েছে এবং তাতে বহু লোক নিহত এবং বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। বোধহয় এই কারণেই রাজ্যপাল বলেছেন যে, এই আন্দোলনে কারও উপকার হবে না, বরং ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দেশক আইনটি পাশ হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। কিন্তু সেই আইন প্রয়োগের পর দেখা গেল, যে পরিমাণ জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হবার কথা ছিল সেই পরিমাণ জমি সরকারের হস্তগত হয় নি। অর্থাৎ প্রাক্তন জমিদার এবং জোতদাররা সমস্ত উদ্বৃত্ত জমি বেনামা করে নিজেদের খাস দখলেই রেখে দিয়েছেন। কংগ্রেস সরকার জমিদার, জোতদারদের সেই বেআইনী কার্যের প্রতিরোধ করার কোন চেষ্টাই করেন নি, বরং নিষ্ক্রিয় থেকে ভূস্বামীদের সেই অপকর্মে সহায়তাই করেছেন। তার কারণ, নির্বাচনী যুদ্ধে এই ভূস্বামীরাই ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেসী সরকারের সেই অসাধু নিষ্ক্রিয়তার ফলে আইন যেমন মর্যাদা পায় নি, তেমনি ভূমি সংস্কারের নামে জনগণকে শুধু ভাঁওতাই দেওয়া হয়েছে। ভূমির উপর সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্ব বিলোপ করা যায় নি বলে দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। ভূস্বামীদের বেআইনী কাজের সংখ্যা এত বেশি এবং পরিধি এত ব্যাপক যে, দেশের আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করে সেই অন্যায়ের আশু প্রতিকার মোটেই সহজ নয়। কারণ মামলার পদ্ধতি দীর্ঘসূত্রী, কালহরক এবং ব্যয়বহুল। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই জমি দখলের আন্দোলন। বাস্তবে কার্যকর করতে না পারলে আইনের কোন অর্থ নেই, আর আইনসঙ্গতভাবে ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর করা অসম্ভব, শিবেরও অসাধ্য। তাই ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে বেনামা জমি দখলের আন্দোলন শুরু হয়, ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তা তীব্রতর হয়, এবং বেশ কয়েক লক্ষ বিঘা বেনামা জমি কৃষকেরা হস্তগত করে। এই জমি দখলের আন্দোলনই পশ্চিমবঙ্গে শরিকী সংঘর্ষের সূত্রপাত করে, এবং এটাই শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণ হয়।

যুক্তফ্রন্টের আমলে যা হয় নি, রাজ্যপালের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন তা করতে সক্ষম হবে এটা আশা করাই বাতুলতা। কোন দলীয় বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও এবং হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আমলাতন্ত্রনির্ভর শাসনব্যবস্থা কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব দেখানো তো দূরের কথা, প্রতি পদক্ষেপেই চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমলাতন্ত্রের দ্বারা বা রাজ্যপালের ঘোষণায় ভূমিসংস্কার সম্ভব একথা একমাত্র বাতুলালয়ের অধিবাসীরাই বিশ্বাস করতে পারে। ওদিকে অতএব মিথ্যা মোহের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভূমিসংস্কারের প্রয়োজন অসীম। একটিমাত্র উপায়ে তা করা সম্ভবপর। প্রথম দরকার একটি নির্বাচিত বামপন্থী সরকার, যার সকল শরিক দলই ভূমিসংস্কার সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আগ্রহী। দ্বিতীয় প্রয়োজন, সেই সরকারের শরিক দলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, অর্থাৎ ভূমি দখলের আন্দোলন যেন গতবারের শরিকী সংঘর্ষের রূপ না নেয়। তৃতীয় প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে গঠিত যুক্তফ্রন্ট কমিটি যা প্রতিটি গ্রামে গঠিত হবে। গতবারে যদি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি প্রতিটি গ্রামে মিলিতভাবে জমি দখলের আন্দোলনে নামতেন, তাহলে রক্তপাত ঘটত না এবং উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হত। এবং চতুর্থ প্রয়োজন, এই বিষয়ে যৌনিংপ্রাপ্ত সরকারী কিছু কর্মী, যারা উদ্ধারকৃত জমিগুলির ভিত্তিতে নতুনভাবে সেটেলমেন্ট করবে এবং যাদের হাতে নতুন জমি আসবে, তাদের সেই অধিকারকে আইনসঙ্গত করার কাজ করবে। অর্থাৎ চারিতের দিক থেকে বামপন্থী একটি নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষেই আন্তরিকভাবে ভূমিসংস্কারের কাজকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। নিছক সরকারী আদেশই এখানে সব নয়, নিছক ভাবাবেগই এখানে সব নয়, নিছক রাজনীতিই এর নিয়ন্তা নয়। সমস্যা জটিল, কিন্তু সমাধানের অতীত নয়। বামশক্তিগুলির ঐক্যই এই কাজ করতে পারে, আর সেই শক্তির মধ্যে বিভেদ হওয়ার অর্থই ভূমিসংস্কারকে পিছিয়ে দেওয়া।

মার্টিন রেল রাষ্ট্রায়ত্ত হোক

মার্টিন রেল বলতে স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হাওড়া-আমতা

[২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারতে মাদাম বিন

দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন গুয়েন থি বিন গত ১৮ই জুলাই রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে ভারতে পদার্পণ করেছেন। দিল্লীতে যাবার পথে তিনি দমদম বিমানঘাঁটিতে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেন। রাজ্যের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার জনসাধারণের উদ্দেশে এক বাণীতে তিনি বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কিভাবে সাহায্য করতে হয়, তা কলকাতার মানুষ খুব ভাল করেই জানেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভিয়েতনামের জয় অনিবার্য।"

কলকাতা থেকে দিল্লীতে পৌছেও মাদাম বিন বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কমিউনিস্ট দেশের কূটনীতিকরা মাদাম বিনকে বিমানঘাঁটিতে স্বাগত জানান। তবে জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির পক্ষ থেকে মাদাম বিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও প্রদর্শন করা হয়। মাদাম বিন ৯ দিনের জন্য ভারত সফরে এসেছেন।

মাদাম বিনের ভারত সফরকে কেন্দ্র করে এদেশের দক্ষিণপন্থী মহাজোট (সিন্ডিকেট-স্বতন্ত্র-জনসংঘ) যে নোংরামির পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই লজ্জাজনক। তাঁরা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন যে, মাদামকে আমন্ত্রণ করে ভারত গভর্নমেন্ট দেশের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মাদামের ভারত সফর বন্ধ করবার জন্য তাঁরা দু'-দুবার দিল্লী হাইকোর্টের স্বারস্থ হয়েছিলেন। হাইকোর্ট তাঁদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। মাদাম বিনের ভারতে পদার্পণের তিন দিন আগে আমাদের সায়গনস্থিত কন্সাল দু'জন দক্ষিণ ভিয়েতনামী "ভদ্র-

করেন। [illegible] দু'জন [illegible] রাজনীতি[illegible] ভিসা পাবার আগে এঁরা নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ভারতে [illegible] কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কর[illegible] না। কিন্তু দিল্লীতে পৌছেই এ[illegible] ভারত সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও এ[illegible] সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যানয় সর[illegible] এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থা[illegible] বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচা[illegible] আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের [illegible] সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলে[illegible] স্বতন্ত্র পার্টি। মাদাম বিনের ভার[illegible] সফর যাঁদের আপত্তির কারণ ঘটাে[illegible] তাঁরা ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ স্বাধী[illegible] পররাষ্ট্রনীতি পছন্দ করেন না। তাঁ[illegible] চান যে, ভারত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্য[illegible] বাদী জোটের লেজুড় হয়ে থাকুক দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফ্রন্ট মার্কি[illegible] সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়া[illegible] চালিয়ে ভিয়েতনামের স্বাধীন[illegible] অর্জনের চেষ্টা করছেন। কাজেই সে মুক্তিফ্রন্টের নেত্রী রাষ্ট্রীয় অতি[illegible] হিসাবে ভারত সফরে এলে আমেরি[illegible] বিব্রতবোধ করতে পারে। ভারতে দক্ষিণপন্থী মহাজোট আমেরিকার সে অস্বস্তি দেখে বেদনা অনুভব করছেন কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে, প্যারিসে শান্তি বৈঠকে আমেরিকার সরকার[illegible] প্রতিনিধি দিনের পর দিন মাদাম বিনে-[illegible] সঙ্গে এক টেবিলে বসে আলোচন[illegible] করতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে যদি[illegible] আমেরিকার কোন অপমান না হয়ে[illegible] থাকে, তাহলে মাদামের ভারত সফরেই ব[illegible]

দমদম বিমানঘাঁটিতে মাদাম বিনের সঙ্গে আলোচনারত প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তাদের এত গুরুত্বের কারণ কি, তা বোঝা যাচ্ছে না। একেই বলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। কিন্তু মাদামের ভারত সফরের ঠিক তিন দিন আগে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই ধুরন্ধর মতলববাজ 'পর্যটক' সেজে ভারতে ঢোকার সুযোগ পেল কি করে, সেটাই ঠিক আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

মাদাম এন গুয়েন থি বিন দু'বছর আগে প্যারিস শান্তি আলোচনায় ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধিত্ব করে বিশ্বের দরবারে প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তার আগে ভিয়েতনামের বাইরে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। গত দু'বছর তিনি বিশ্বের নানা দেশ সফর করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের অনুকূলে জনমত গঠনের প্রচেষ্টায় ব্রতী আছেন। তিনি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর এক বছরের মধ্যে ২৫টি রাষ্ট্রের সংগে সেই সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁরা সেই বিপ্লবী সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আরও ২৫টি দেশ অন্য নানাভাবে সেই সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৪৩ বৎসর বয়স্কা মাদাম বিন সায়গনের স্কুলে লেখাপড়া শেখবার সময় রাজনীতির পথে পদক্ষেপ করেন। তাঁর পিতা কান চু ত্রিন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একজন বীর সৈনিক হিসাবে যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, মাদাম বিন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সায়গনে মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করায় তৎকালীন ফরাসী ঔপনিবেশিক সরকার সর্বপ্রথম তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তির পর ফরাসীরা যখন ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যায়, তখন মাদাম বিন জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু বাইরের জীবনটা তখন আরও জটিল। ফরাসীরা দিয়েন-বিয়েন ফুর লড়াইয়ে ধরাশায়ী হয়ে সরে পড়ল বটে, তবে সেই সুযোগে সি আই-এর এজেন্ট এনগো দিন দায়েমের মাধ্যমে আমেরিকা স্বসৈন্যে ঢুকে পড়ল ভিয়েতনামে এবং দায়েমের বকলমে সে দেশে ব্যাপক অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব চালু করে দিল। মাদাম বিন আবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদ আর তার স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্যারিস বৈঠকে প্রতিনিধি নিযুক্ত হবার আগে তিনি [illegible] দক্ষিণ ভিয়েতনাম নারী মুক্তি ইউনিয়নের নেত্রী।

স্বর্গত প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় হ্যানয়ে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীনেশ সিং-এর সঙ্গে মাদাম বিনের সাক্ষাৎ হয়। দীনেশ সিং তখনই মাদাম বিনকে ভারত সফরে আমন্ত্রণ জানান।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের এক বছর

১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ভারতের ১৪টি বড় বড় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। এই সপ্তাহে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের এক বছর পূর্ণ হল। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কিং শিল্পের এক বছরের ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তি থেকে যে তথ্য জানা গেছে, তাতে নিরুৎসাহ বোধ করবার কিছু নেই। এই এক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলো সহস্রাধিক শাখা বিস্তার করে এমন সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে আগে আধুনিক ব্যাঙ্কিং-এর কোন কারবারই ছিল না। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের প্রধান কারবার দ্বিবিধ। প্রথমত আমানত সংগ্রহ করা, দ্বিতীয়ত সেই আমানত ফলপ্রসূ এবং উন্নয়নমূলক কাজে লগ্নী করে দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করা। যতদিন ব্যাঙ্কগুলো বড় বড় শিল্পপতিদের তত্ত্বাবধানে ছিল, ততদিন বড় বড় শহরের বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর কোথাও ব্যাঙ্কের টাকা বড় একটা লগ্নী করা হত না। তাতে ধনী শিল্পপতি এবং বাণিজ্যপতিরা ব্যাঙ্কের টাকায় ক্রমাগত নিজেদের বিষয়সম্পত্তি বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছোট ছোট শিল্প-বাণিজ্যপতিরা বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিলেন না। তা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে লগ্নীর দিকে ব্যাঙ্কের কোন নজরই ছিল না। ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ এখনও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। চাষের মরশুমে কৃষিক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নীর প্রয়োজন হয়। গরীব চাষীরা গ্রাম্য মহাজন, জোতদার এবং জমিদারদের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য চড়া সুদে এই টাকাটা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেই ঋণ শোধ করতে মাঠের পুরো ফসলটা আবার সেই উত্তমর্ণদের ঘরেই তুলে দিতে হয়। কাজেই গরীব চাষী সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতেই বাধ্য হন। তাই দেশের মানুষ দাবি তুলেছিল ব্যাঙ্কের টাকার একাংশ কৃষিক্ষেত্রে লগ্নী করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের সম্প্রসারণ সেই সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করবে বলে আশা করা হয়। অবশ্য কৃষিক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক যে একেবারে অর্থ লগ্নী করত না, তা নয়, কিন্তু তাদের ঝোঁক ছিল তেলা মাথায় তেল ঢালা। অর্থাৎ গ্রামের বৃহৎ জোতদার-মহাজন শ্রেণীকে অর্থ সাহায্য করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক সেই ঝোঁক ত্যাগ করে গরীব কৃষকদের ঋণদানের উদার ব্যবস্থা চালু না করতে পারলে, সেই ঋণদানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমরা যতদূর জানি, গরীব কৃষিজীবীরা এখনও ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিশেষ কোন সুবিধা পান নি। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের শাখা অফিস খুলে প্রথমেই সেই কাজে অগ্রণী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা হলে মুষ্টিমেয় জোতদার-মহাজন আর ক্ষেতের ফসল নিয়ে ফাটকাবাজী করতে পারবেন না।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে প্রতি মাসে ১২৭টি করে শাখা অফিস খোলা হয়েছে। আগের বছর শাখা বিস্তারের হার ছিল প্রতি মাসে ৪৮টি। ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তারের বর্তমান হার বজায় থাকলে ১৯শে জুলাইয়ের (১৯৭০) মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর শাখার সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৬৬০টি। রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার আগে তাদের শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল ৪১৬৮টি। নতুন শাখা অফিসের দুই-তৃতীয়াংশ স্থাপিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে।

গত বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর আমানতের পরিমাণ ৪৮৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিয়ে আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪০৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আগের বছর (রাষ্ট্রায়ত্ত হবার আগের বছর) ব্যাঙ্কের আমানত বেড়েছিল ৭৪১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সেই হিসাবে এ বছর আমানত বৃদ্ধির হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

১৯৭০ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে কৃষিজীবীরা মোট ৮০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন। এটা আগের বছরের তুলনায় ৪ গুণ বেশি। ছোট ছোট শিল্পগুলো আলোচ্য বছরে ঋণ পেয়েছে ১১৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। আগের বছর পেয়েছিল ১৪৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।

গভর্নমেন্ট একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির করেছেন যে, ভারতে ৩৩৫টি জেলার প্রত্যেকটির অর্থনৈতিক তদারকির ভার পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক ব্যাঙ্কের হাতে ছেড়ে

[২১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এডওয়ার্ড হিথ

বৃটেন :

এখন আর লুকোছাপার কিছু নেই। বৃটিশ সরকার নিশ্চিতভাবে স্থির করেছেন, তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক জিনিষ বিক্রি করবেন। এবং তাঁরা রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অমান্য করেই এই কাজ করবেন।

সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে রক্ষণশীল দল সরকার গঠনের পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথেরও পূর্ণ সমর্থন আছে। আসলে, অনেক আগের থেকেই এ ব্যাপারে কথাবার্তা চলছিল। হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক দলের সরকার অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করে দেয়ায় রক্ষণশীল দল খুশি ছিলেন না। তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে ভরসা দিয়েছিলেন, যদি তাঁরা সরকার গঠন করতে পারেন তাহলে আবার অস্ত্র বিক্রয় সুরু করা হবে।

তাই নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের জয়লাভের পর উল্লসিত হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ভোরস্টার তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুলারকে পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনে হিউম ও হিথের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য।

মুলার-দৌত্য সফল হয়েছে। বৃটিশ সরকার অস্ত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপারে তাঁরা পুরোনো সাইমনস্ টাউন চুক্তি মেনে চলবেন।

স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের যুক্তি হল : বৃটেন নিজের স্বার্থেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয় করছে। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েত য়ুনিয়নের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুয়েজ খাল খুললেও দেখা যাবে, এডেন সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই অবস্থায়, আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল ও বিশেষ করে এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে বৃটেনকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেপ্ ঘুরে যেতে হবে। সুতরাং, দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন।

[illegible] নীতির অবতারণা করে কমনওয়েল দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের কাছে একটি চিঠিও দিয়েছেন।

বিরোধী শ্রমিক দল অস্ত্র বিক্রয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘে বৃটেনের প্রাক্তন প্রতিনিধি ও লর্ড সভায় শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা লর্ড ক্যারাডন বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয় করলে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ বৃটেনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সর্বসম্মত প্রস্তাবের বিরোধিতা করার অর্থ হল, গত ছ' বছর ধরে বৃটেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে যে সব ভাল কাজ করেছে, তার সবটা নষ্ট করে ফেলা।

লর্ড ক্যারাডন লর্ড সভাতেও অস্ত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই, প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাঁটি লর্ড সভায় ৮৪-১৮৪ ভোটে ক্যারাডনের প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়েছে। রক্ষণশীল সরকারের প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন অস্ত্র বিক্রয়ের স্বপক্ষে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করেন লর্ড সভায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোন প্রকার সামরিক দ্রব্য বিক্রি না করার জন্য।

বৃটেন আজ নিরাপত্তা পরিষদের এই সর্বসম্মত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বৃটেনের নিরাপত্তা, সুয়েজের পূর্বে বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা, তেল আমদানির জন্য কেপের পথ ব্যবহার, এই সব কারণ কিছুটা থাকলেও (এবং, তার সবটাই কায়েমী স্বার্থের সুবিধার জন্য) আসল কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষীদের প্রতি বৃটিশ রক্ষণশীল দলের দরদ। এর জন্য তাঁরা বিশ্বজনমতকেও উপেক্ষা করতে পিছপা নন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ৪০টি আফ্রো-এশীয় দেশ বৃটেনের অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপার আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের প্রস্তাব করেছে। বৈঠক ডাকাও হয়েছে।

বৃটেনের এই অন্যায় ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ মহলে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ২৯টি কমনওয়েলথ দেশের মধ্যে ২০টি দেশ এই অস্ত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। এদের মধ্যে ভারতও আছে। এই আপত্তি সত্ত্বেও যদি হিথ সরকার অস্ত্র বিক্রয় করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য করেন (যা তাঁরা করবেন বলেই মনে হচ্ছে) তাহলে তাঁরা কমনওয়েলথে বড় রকমের বিপদ ডেকে

জানবেন। আগামী জানুয়ারী মাসে সিংগাপুরে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্মেলন ডাকা হয়েছে, সেই সম্মেলন হবে কি না, তাতেও সন্দেহ রয়েছে।

রুমানিয়া ঃ

সোভিয়েত য়ুনিয়ন ও রুমানিয়ার মধ্যে নতুন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত সপ্তাহে বুখারেস্টে এই চুক্তি হয়েছে।

১৯৪৮ সালে দুই দেশের মধ্যে বিশ বছরের যে মৈত্রী চুক্তি হয়, ১৯৬৮ সালে তার মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে মতভেদের দরুণ এতদিন নতুন চুক্তির বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

সোভিয়েত য়ুনিয়ন ও অন্যান্য ওয়ারশ' চুক্তিভুক্ত কমিউনিস্ট দেশ কর্তৃক ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল রুমানিয়া। অবশ্য পূর্ব থেকেই রুমানিয়ার সংগে সোভিয়েতের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। চীন-সোভিয়েত বিরোধে রুমানিয়া অন্য কমিউনিস্ট দেশের মত সোভিয়েত য়ুনিয়নকে সমর্থন করে নি। তারা অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চীনের সংগে সম্পর্ক বজায় রেখেছে রুমানিয়া। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন অর্থনীতি অনুসরণের চেষ্টা করছে রুমানিয়া। পশ্চিমী দেশগুলির সংগে রুমানিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি মস্কোতে যে আন্তর্জাতিক লগ্নী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে, পূর্ব য়ুরোপের অন্য সব কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তাতে যোগ দিলেন, রুমানিয়া যোগ দেয় নি।

গত বৎসর মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন সরকারীভাবে রুমানিয়া সফর করেছেন এবং তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। মোট কথা, নিকোলাই সোসেস্কুর নেতৃত্বে রুমানিয়া কমিউনিস্ট পার্টি নিজেদের স্বার্থ ও পছন্দমত স্বাধীন নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করছেন।

সোভিয়েত নেতারা এতে মোটেই খুশি নন। তাই নতুন মৈত্রী চুক্তিতে রুমানিয়াকে দিয়ে সোভিয়েত য়ুনিয়নের সামগ্রিক কর্তৃত্ব মানিয়ে নেবার চেষ্টা তাঁরা করেছেন। এতদিন ধরে সেই চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এতে তাঁরা বিশেষ সফল হন নি। নতুন চুক্তিতে কেবল এইটুকু বলা হয়েছে ঃ "কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী যদি কোন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করে," তবে তা প্রতিরোধ করা হবে, এ ব্যাপারে উভয়ে রাজী।

অনেকে বলছেন, চুক্তির এই শর্তের অর্থ হল, চীন যদি কখনও সোভিয়েত য়ুনিয়ন আক্রমণ করে, তবে রুমানিয়া চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত য়ুনিয়নকে সমর্থন করবে। কিন্তু আর এক দল বলছেন, না, রুমানিয়া ওয়ারশ' চুক্তির এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ, কেবল য়ুরোপের ব্যাপারেই, এই দায়িত্ব পালনে অংগীকারাবদ্ধ। অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

যাই হোক, রুমানিয়ার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিয়েই এই চুক্তি হয়েছে।

সোভিয়েত য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভের স্বয়ং বুখারেস্ট আসার কথা ছিল এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অসুস্থতার জন্য তিনি আসতে পারেন নি। তাঁর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন এসেছেন।

রুমানিয়ার নেতারা এতে ক্ষুব্ধ। তাঁদের ধারণা, ব্রেজনেভের অসুস্থতা একটা ছল মাত্র। তিনি এমন কিছু অসুস্থ হন নি। আসলে তিনি নিজে এসে রুমানিয়াকে মর্যাদা দিতে চান নি।

রুমানিয়াও তার জবাব দিয়েছে। রুমানিয়ার আসল নেতা নিকোলাই সোসেস্কু কোসিগিনকে সম্বর্ধনা জানাতে বিমানবন্দরে কিংবা অন্য কোথাও যান নি, কোসিগিনের সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায়, কোন সরকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন নি, এমন কি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও তিনি হাজির হন নি। কোসিগিনের সংগে যা কিছু করার করেছেন রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান মরের, দলগত মর্যাদা যাঁর অনেক কম। কেবলমাত্র একটি মধ্যাহ্নভোজে সোসেস্কু কোসিগিনের সংগে মিলিত হয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন।

বুখারেস্টে কোসিগিনকে বিশেষ কোন সম্বর্ধনাও জানানো হয় নি। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, নিকসনের আগমনের সময় বুখারেস্টের পথে যত লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিল, কোসিগিনের আগমনে তার দশ ভাগের এক ভাগও ছিল না।

ইতালী ঃ

প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রুমর রাষ্ট্রপতি সারাগাতের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

রুমরের নেতৃত্বে মধ্যপন্থী ও বামপন্থীদের এই কোয়ালিশন সরকারে ছিল ঃ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, য়ুনিটারিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি। ঠিক ১০০ দিন টিকে থাকার পর রুমরের মন্ত্রিসভার পতন হ'ল। এটা হ'ল রুমরের তৃতীয় মন্ত্রিসভা।

মন্ত্রিসভার পতনের আসল কারণ ইতালীর তীব্র অর্থনৈতিক সংকট। মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করেছে। শিল্পে বিনিয়োগ বন্ধ হয়েছে। কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে। বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংকট সমাধানে কোয়ালিশন সরকারের দলগুলি ঐকমত্য হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছেন না। বামপন্থী সোস্যালিস্টরা যা বলছেন, মধ্যপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট ও দক্ষিণপন্থী য়ুনিটারিয়ান সোস্যালিস্টরা তাতে রাজী হচ্ছেন না। ৭ই জুলাই থেকে দেশব্যাপী শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট সুরু হবার কথা। এই ধর্মঘটের ঠিক মুখে ৬ই জুলাই রুমর পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক সংকট ছাড়াও কোয়ালিশনের দলগুলির মধ্যে মতভেদের আর একটি বড় ও প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে।

সম্প্রতি ইতালীতে আঞ্চলিক সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমব্রিয়া, তাস্কানি ও এমিলিয়া রোমাগনা, এই তিনটি অঞ্চলে বামপন্থী সোস্যালিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সংগে একত্র সরকার গঠন করেছেন। এতে কেন্দ্রের কোয়ালিশন সরকারের দুই শরিক ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি ও য়ুনিটারিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি খুব চটেছেন। তাঁদের বক্তব্য ঃ "এ জিনিষ চলবে না। কেন্দ্রে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগে সরকার করবে, আর অঞ্চলে আমাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের নিয়ে সরকার করবে— এ হবে না। গাছেরও খাবে, আর তলারও কুড়োবে!"

এই নিয়ে মতভেদের পরিণতিতে কেন্দ্রের কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেল। (১৯. ৭. ৭০)

আমার চোখের সামনে রয়েছে সেই মর্মান্তিক ছবি। বাঙালী জাতি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, বাঙালী জাতির মুখে আলকাতরার কালো রং মাখানো হয়েছে। পুত্ররা পিতাদের, জন্মদাতাদের ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে, মুখে চুন-কালি মাখিয়ে দিয়েছে। পিতাদের অপরাধ—কেন তাদের জন্ম দিয়েছে; কেন চোখের ওপর থেকে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে নিয়ে তাদের আলোর রাজ্যে নিয়ে এসেছে। এমনি আরো অনেক গুরুতর অপরাধে অপরাধী এই পিতৃপুরুষ। "রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি"—এই কথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বাঙালী সন্তানরা আজ উঠে পড়ে লেগেছে। তাই তো আশুতোষকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আমরা প্রমাণ করি—আশুতোষ তুমি উচ্চশিক্ষায় বাঙালীকে প্রবেশের অধিকার দিয়ে, মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিয়ে মহা অপরাধ করেছ। কারণ আমরা মানুষ হই নি। স্বামী বিবেকানন্দের মুখে কালি লেবড়ে দিয়ে প্রমাণ করি- জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মানুষের সেবাকে সবচেয়ে বড় বলে, ভারতের প্রতিটি মানুষকে ভাই বলে, দরিদ্র চণ্ডাল ভারতবাসী, কামার, কুমোর, মুচিকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার কথা অথবা বিশ্বের দরবারে বাঙালী হয়ে দাঁড়িয়ে ভারতের অধ্যাত্মবাণী ভোগে নয়, ত্যাগে মুক্তি এই কথা বলে অপরাধ করেছ। সেই অপরাধের কারণে আজ তোমার মুখে কালা কালি দিলাম। আমরা মানুষ হতে চাই না—আমরা মানুষ হই নি। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, বিদ্যাসাগর, রামমোহন,

বিবর্তন।

সুভাষচন্দ্রকে মুছে ফেলে প্রমাণ করবো—আমরা মানুষ হই নি।

১২ই জুলাই রবিবার আর ১৪ই জুলাই মঙ্গলবার খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দুইখানি ছবি দেখছিলাম। প্রথম ছবি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিংসের দোতলায় বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষের মর্মর মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দ্বিতীয় ছবি হল কলকাতায় গোলপার্কে স্বামীজীর মর্মর মূর্তিটির মুখ কালিতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অনেক দিন যুক্ত আছি সংবাদপত্র জগতে। বহু দুর্লভ, দুঃসাহসিক, মর্মান্তিক ছবি দেখেছি—ফটোগ্রাফারকে দিয়ে তুলিয়েছি, ফটোগ্রাফারের ছবি তোলার সাক্ষী থেকেছি, কিন্তু এমন সময়োপযোগী প্রতীকধর্মী ছবি আমি কখনও দেখি নি। সেই দিন ১১ই জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে যে ফটোগ্রাফাররা এই ছবিখানি তুলেছেন, তাঁদের কাছে আমার অন্তরের অভিনন্দন আরো বেশি করে পৌঁছে দিতে চাই, কারণ এমনি একটা ছবির বড় বেশি প্রয়োজন ছিল। কারণ নতুন যুগের যে যাত্রা সুরু হয়েছে—সেই যাত্রাকালকে স্মরণীয় করে রাখতে এই ছবিটা একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। এই দিনের খবরটিও লেখা হয়েছিল অদ্ভুত প্রতীকধর্মী করে। কয়েকটা লাইন তুলে ধরছি সেই দিনের রিপোর্ট থেকে। রিপোর্টার লিখছেন—"সিঁড়ির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। কিন্তু যে সংবাদ আরো মর্মান্তিক, তা হলো তাঁরই প্রিয় ছাত্রদের হাতে স্যার আশুতোষের এই চূড়ান্ত নিগ্রহ ও অবমাননা। এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বেলা প্রায় দুটোর সময়—আশুতোষের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শতবর্ষের ইতিহাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যা- এমন ঘটনা আর কখ- প্রত্যক্ষ করে নি। একদল প্রি-মেডিক্যা ছাত্র দ্বারভাঙা বিল্ডিংসের দোত থেকে স্যার আশুতোষের মর্মর মূর্তি বেদী থেকে টেনে হিঁচড়ে নিচে ফে দিয়েছে।"

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাম চলছে অনেক দিন, পরীক্ষা ভণ্ডু হওয়া নিয়েও নানা গণ্ডগোল বহু সম ঘটে আসছে। আগুন দেওয়া, পোড়ানো ভাঙচুর করা প্রভৃতি অনেক বড় ঘট ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে সেই তুলন শনিবার বারবেলার ঘটনা হিসাবে ঘটেছে, সেটা নিতান্তই আটপৌরে ব যায়। কিন্তু এই ঘটনার দাম বাড়ি দিয়েছে ছাত্ররা স্যার আশুতোষে মাটিতে মুখ থুবড়ে ফেলে। স্যা আশুতোষকে কেন সেই দিন এইভা ফেলা ও ভাঙা হল, সেই সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা করে দুটো কারণ আমা মনোমত পেয়েছি। প্রথম কারণ, স্যা আশুতোষ বাঙালী ছিলেন, আর পুরু ছিলেন। আজকের যুগে আমাদে কাছে এই দুটোই অসহ্য। স্যা আশুতোষ গাড়ি করে ফিরছে সম্ভবত পাটনা থেকে, প্রথম শ্রেণী রেল কামরা তখন সাহেবদের কামরা। বাঙালী তথা ভারতীয়দের সে কামরায় ওঠা ও চলাফেরা সাহেবরা ভাল চোখে দেখতো না আর সকলে সাধ্য ও সাহসে কুলাতো না। এমনি এ সাহেবের সহযাত্রী হলেন স্যা আশুতোষ। সাহেব যাত্রী কোনরকমে

বংশধর

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

বিরক্তি প্রকাশ করে থেকে এক সময় সুযোগ বুঝে স্যার আশুতোষের জুতোজোড়া বাইরে ফেলে দিল। স্যার আশুতোষ ঠিক আবার সময় ও সুযোগ বুঝে সাহেবের কোটটা চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিলেন। পরে সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করলো—আমার কোট কোথায়? আশুতোষ বললেন, আমার জুতো খুঁজতে গেছে। সাহেবের কোটকে বাঙালীর জুতো খুঁজতে পাঠানো সে যুগে কেন, এই যুগেও অসম্ভব। এমনি যাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, তাঁর মত মানুষের মূর্তি আমাদের চোখের ওপর থাকা অনেক দিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

আর আজ আমরা সব "মিনি" হয়ে যাচ্ছি, চেহারায় স্যার আশুতোষের মত বাঙালী জন্মগ্রহণ করে না, এমনি করে গোঁফ রাখা কল্পনা করা যায় না, আমরা চেহারায় বেঁটে হচ্ছি, গোঁফ কামিয়ে ফেলছি অথবা বাটারফ্লাই রাখছি, পোষাকে সংক্ষিপ্ত হচ্ছি- আশুতোষের মত জমকালো চাপকান অথবা ধুতি, গলাবন্ধ কোট চিন্তা করা যায় না, আজ সকলের সঙ্গে, এমন কি পত্র-পত্রিকাও সব মিনি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এমন যে মিনির যুগ-সেখানে আশুতোষ ভয়ঙ্কর বেমানান হয়ে উঠেছিল—একেবারে যাকে বলে আসমান-জমিন ফারাক। তাই সেইদিন আশুতোষকে মুখ থুবড়ে ফেলে আমরা বাঙালী জাতিকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিলাম। ফেলেছিলাম আরো এই কারণে যে, আশুতোষ তুমি শেষ, বাঙালী তুমি শেষ! তবে হ্যাঁ আরো কিছুকাল এখনও বাকী আছে—সেটা হল রাম-মোহন রায়ের স্মৃতি লুপ্ত করতে হবে—আরও যদি কিছু বাকী থেকে থাকে, তবে বিদ্যাসাগর আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যে দুটো মূর্তি ঐ আশুতোষের মূর্তির কাছেই কলেজ স্কোয়ারে আছে—সে দুটোকে গোল দীঘির জলে ফেলে দিতে হবে। বেলুড় মঠ আর নিমতলা থেকে বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের সমাধি আর চিতা-ভূমি গঙ্গায় ফেলতে হবে। গোল-পার্কে স্বামীজীর মূর্তিতে যে কালি মাখানো হয়েছে—ওটা মোটেই যথেষ্ট নয়। কারণ বিকৃতি নয়—অবলুপ্তির জন্য কাজ করতে হবে। গোলপার্কের মূর্তিটি স্বামীজী শতবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আরও একটা কাজ বাকী থাকবে—সেটা হ'ল আর একজন বাঙালী পুরুষ জন্মেছিলেন, বর্তমান বাঙালী জাতির পক্ষে সেও কম কলঙ্কের নয়! তিনি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সেই সুভাষ-চন্দ্রেরও দুটো মূর্তি রয়েছে—একটা ঘোড়ায় চড়া আর একটা সামরিক পোষাক পরা। কি অপমান। আজকের এই মিনি যুগের বাঙালী পরেছে সামরিক পোষাক, বাঙালী চড়েছে ঘোড়ায়, বাঙালীর ঘরে জন্মে যোদ্ধা, সেনাপতি হয়েছে। মিনি সমাজ-কুলতিলকদের এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। অতএব নেতাজীর মূর্তি দুটিও ভাঙতে হবে!

সেইদিন স্যার আশুতোষের মুখ থোবড়ানো মূর্তির যাঁরা ছবি তুলেছেন, তাঁদের কৃতিত্বের সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক ত্রুটিও তাঁরা করেছেন। এই ত্রুটি চির-কাল আমাদের মনে অনুশোচনা সৃষ্টি করবে। সেটা হ'ল সেইদিন যে বীরেরা এই কাজ করেছে, তাদের কেন একটা ছবি তুলতে পারলেন না। কারণ সেই ছবিটাই যে হবে আমাদের আগামী দিনের মস্ত বড় এ্যাসেট। কারণ এই ছবি-গুলির মধ্যে দিয়েই আমরা চিনতে পারতাম এদের। এরা কারা, কি এদের পরিচয়? যেমন একটা তুষারমানবকে যদি হাতের কাছে পেয়েও তার ছবি না তোলা হয়, তাহলে সেটা মস্ত বড় বোকামী মনে হয় না কি? কতদিন ধরে তুষার-মানব নিয়ে কত কথা হয়ে আসছে, কত গবেষণা হয়ে আসছে, কিন্তু সেই তুষার-মানবকে যদি কোন ফটোগ্রাফার হাতের কাছে পেয়েও তার ছবি না তোলে, তাহলে সেই অক্ষমতার কোন সীমা থাকে না। একটি মাত্র প্রধান সমাস্যার সমাধান হ'ত এই ছবিতে—চেনা যেত এরা কারা?

অনেক নামে এদের পরিচয় দেওয়া হয়, কেউ বলে নকশাল, কেউ বলে সমাজ-বিরোধী, কেউ বলে আধারাজনীতি করনেওয়ালা, আধা সমাজবিরোধী, কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী।

এর কোন কথাটাই বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নকশালপন্থী হোক, সমাজ-বিরোধী হোক, রাজনৈতিক কর্মী হোক—সকলেরই কাজের একটা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-দর্শন থাকবার কথা। কিন্তু বর্তমানে যে কাজগুলি চলছে ও হচ্ছে, সেই কাজ-গুলির পিছনে কোন উদ্দেশ্য-লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় কি? দর্শনের কথা না বলাই ভাল। কোন্ দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী, এরা কার ভক্ত, কার চেলা, এরা কোন্ দেবতা, কোন্ ঠাকুরের ভক্ত—কাগজ পড়ে মনে হয় এরা সব নকশালপন্থী।

পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থী বলে যে শব্দ চালু হয়েছে, সেটা একটা ধাঁধা ছাড়া কিছু নয়। কে নকশালপন্থী, কারা নকশালপন্থী, কি তাদের কাজ, কি তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এর কোনটারই হদিস পাওয়া যাবে না এই সব কাজের মধ্য দিয়ে। কতকগুলি প্রাণহীণ প্রতিষ্ঠানে এরা হামলা চালায়—কতকগুলি নির্বিরোধী মানুষের ওপর এদের আক্রমণ চলে—কতকগুলি মৃত মানুষের ছবি এদের বিপ্লবের খোরাক হয়। এদের নকশাল-পন্থী বলতে আমি অন্তত রাজী নই। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে আজ আর একটা শিকড়ে বেঁচে থাকা কোন নকশালপন্থী নেই। কম করে ১৪টা দলে ও মতে এরা বিভক্ত। যদি ধরে নিই চারু মজুমদার নকশালপন্থীদের মূল নেতা বা তিনিই সকলের নেতা, তবে এই ছাত্র নামধারীরা যা করছে, সেটা তো চারুবাবুর কোন নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। নকশাল-পন্থীদের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও কর্ম-সূচী দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে চারু-বাবু কর্মীদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ-নামা দিয়ে থাকেন—যা দেশব্রতীতে প্রকাশিত হয়, তাও দেখেছি। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও এই জাতীয় কাজের নির্দেশ তো দেখি নি। অন্য কথা বলতে চাই না, শ্রীচারু মজুমদারকে আমি দেখেছি। এই দেখা চোখের দেখা নয়—হিল কার্ট রোডের বাড়িতে মুখোমুখি বসে বহুদিন ঘন্টার পর ঘন্টা কেটেছে, যতক্ষণ না "কালু ডাক্তার" তাড়া মেরে উঠিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগেকার কথা বলছি, তখনও আত্মগোপন করেন নি। কিন্তু সেই চারুবাবুর ঘরে দুই ব্যক্তির ছবি অতি সযত্নে রক্ষিত আছে। ঘর একখানা—সব কাজে ব্যবহৃত হয়, ঘরে ছবি একটি রবীন্দ্রনাথের, অপরটি মাও সে-তুং-এর। মাও সে-তুং অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছবিখানি বড়। হ্যাঁ, আর দেখেছি চারুবাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় মেয়েটি অত্যধিক ভাল ছাত্রী—ক্লাসে শীর্ষস্থান অধিকার করে, বাড়িতে যতদিন যতবার গেছি, তাকে সব সময় বারান্দা ঘিরে তৈরি ছোট্ট পড়ার ঘরে সর্বক্ষণ পড়তে দেখেছি। কাজেই চারু-বাবুর, পড়াশুনা করে ছেলেমেয়ে ভাল হোক, এর বিরোধী কখনও মনে হয় নি আর ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবিটাও ফেলে দেন নি। অন্য কোন কারণে না হোক, নাৎসী আন্দোলনের নেতা হিটলারের তাত্ত্বিক গুরু মুসোলিনী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়ে কি একটা সার্টিফিকেট আদায় করেছিলেন, এই অভিযোগ করেও তো রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন নি। কাজেই এরা আর যাই

হোক, চারুবাবুর নির্দিষ্ট আদর্শ রূপায়ণ করতে এই সব কাজ করেছে—এই কথা চারুবাবু না বলা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে মন চায় না।

এর পর প্রশ্ন আসে—এদের এই সব কাজে বিপ্লব কতদূর এগুচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বা তার আগে-পরে রাজ্যের তথাকথিত শোধনবাদী দলগুলির কাজে মোট প্রায় ৪ লক্ষ একর জমি রাজ্যের জোতদার-জমিদারদের হাত থেকে কৃষকের হাতে এসেছে। কিন্তু নকশালপন্থী পরিচয়ে যারা গ্রামে গ্রামে জোতদারদের মুন্ডু কাটছে, তাদের কাছে ক'জন কৃষক কত একর জমি পেয়েছে। কৃষকরা জমি পায় নি, পেয়েছে সি আর পি, যে সি আর পি বর্গী বাহিনীর মত গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে হয়রান করছে—নারীর মর্যাদা পর্যন্ত নষ্ট করছে। নকশালপন্থী বলে পরিচয়ে ছাত্রদের কাছে একটি মাত্র লাভই হয়েছে, সে হ'ল বিদ্যায়তনেও পুলিশ, সি আর পি ও আই-বি'দের অবাধ গতায়াত সম্ভব হচ্ছে। আর ক'দিন পরে স্কুল-কলেজে শিক্ষকের পাশে একখানা চেয়ারে একজন করে কনেস্টবল বসে থেকে শৈনি সহযোগে ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকের নিরাপত্তা রক্ষা করবে। হ্যাঁ, আরো উপকার হয়েছে, সেটা হল রাজ্যে যে পরিমাণ পুলিশ আজ নিয়োগ করা হয়েছে, তাতে হিসাব মত প্রতি পাঁচজন মানুষে একজন করে পুলিশ আছে। আগামী দিনে এই পুলিশকে হয়ত প্রতি পরিবারে ভাগ করে দেওয়া হবে। চারুবাবু তাঁর বিপ্লবের লক্ষ্যপূরণে এই কাজ করতে চেয়েছেন, এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না এই কারণে যে, এত ছোট কাজ করার জন্য একটি বিপ্লবী পার্টির সৃষ্টি সম্ভব নয়—প্রসারও সম্ভব নয়। অত্যাচার নিপীড়নের কাজকে আমন্ত্রণ জানায়, শোষণের ক্ষেত্রকে আরো শক্তিশালী ও ব্যাপক করে, প্রস্তুতিহীন জনগণকে বিপ্লবের নামে বধ্যভূমিতে টেনে নেবার পথ পরিষ্কার হয়—এমন কাজের জন্য মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। আর এই ভুল পথের নিশানা যারা চারুবাবুর পার্টির কাছ থেকে পেয়েছে বলে দাবি করে—তারা সত্য কথা বলে না। কিন্তু এই সঙ্গে একটা দুঃখের কথাও আছে, সেই কথা হ'ল চারুবাবু নিজে চুপ করে আছেন। চারুবাবুর আজ বলবার দিন এসেছে—হ্যাঁ, রাজ্যের সব কটা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বন্ধ হয়েছে, এই সঙ্গে আরো যত কলেজ আছে বন্ধ হোক আমি চাই, আমি চাই পুলিশ ও সি আর পি স্কুল-কলেজে প্রবেশের অজুহাত খুঁজে পাক, আমি চাই পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু একজন করে পুলিশ আসুক, আমি চাই নিরোধমূলক আটক আইন বা এই জাতীয় আরো কড়া আইন যত আছে সব চালু হোক, সব মিলিয়ে রাজ্য একটা কয়েদখানা তথা বন্দিশিবিরে পরিণত হোক। আশুতোষের মূর্তির মুখ ভেঙেছে, স্বামীজীর মুখে কালি পড়েছে, সে দেখেও আমরা চুপ করে থাকবো, কিন্তু চারুবাবুর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

॥ ভারতদর্শন ॥

[২০৭ পৃষ্ঠার পর]

দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি জেলার সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সমীক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক, সেই জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে।

গত ১৫ই জুলাই অর্থমন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারী উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অর্থমন্ত্রী চাবন বলেছেন যে, জাতীয় ঋণদান নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের কথা তিনি চিন্তা করছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কার্যপদ্ধতির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় বিভিন্ন সদস্য সেখানে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের আমানত বেড়েছে বটে, তবে তার হার আশানুরূপ না হওয়ায় অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যে আমানত বেড়েছে (২৮৬ কোটি ২০ লক্ষ), তার বেশির ভাগটাই সংগ্রহ করেছে স্টেট ব্যাঙ্ক (১৮৮ কোটি ৩০ লক্ষ)। কাজেই এই উদ্বেগ মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

॥ এক ॥

"একটা কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের গোঁড়া ভক্তের দল এজন্য এই প্রবন্ধ লেখকের ভিতরে "অর্বাচীনের আস্পর্ধা"র সন্ধান পাবেন বলে আশঙ্কা আছে। তথাপি এ কথা স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন যে, শংকরের মায়াবাদের প্রকৃত দার্শনিক চরিত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শংকর বেদান্তের বিবেকানন্দকৃত ব্যাখ্যার ভিতরে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাবল্য অনেক বেশি। মায়াবাদের তিনি কোথাও বিশেষ বিস্তৃত অর্থ করেন নি, অথচ বেদান্ত সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি অনেক বক্তব্যই উপস্থিত করেছেন।"

লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—"বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ" নামক প্রবন্ধে। আবাদ নামে মার্ক্সবাদী পত্রিকার ১৩৭৪ সালের শারদীয় বিশেষ সংকলন সংখ্যা দ্রষ্টব্য। উপরের উদ্ধৃতি বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে মনে হতে পারে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বুঝি স্বামী বিবেকানন্দের মনীষার প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাবান নন। আসলে কিন্ত তা মোটেই নয়। প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়লে এ কথা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, স্বামীজীর "মহতী প্রজ্ঞা"র প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তবে তাঁর মতে শঙ্কর-বেদান্ত এবং আধ্যাত্মিকতা শেষ পর্যন্ত স্বামীজীকে এক অলৌকিক অবাস্তব জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর বক্তব্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের গোঁড়া ভক্তদের কাছ থেকে নিন্দাবাদ লাভের যে অশঙ্কা তিনি প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে দু-একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আসল ভাবধারা—যাকে এক কথায় বলা চলে সমন্বয় আর গোঁড়ামি একসঙ্গে চলে না। ধর্মের গোঁড়ামি, মতবাদের গোঁড়ামি, আচার, বিচার, সমাজনীতির গোঁড়ামি, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধির গোঁড়ামি—সকল প্রকার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছিল এই বাংলার মাটিতে উনবিংশ শতাব্দীতে—এই মূর্ত প্রতিবাদেরই অপর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়েছিলেন "আমারটাই শুধু ঠিক এ বুদ্ধি করিস নে। ওটা মতুয়ার বুদ্ধি।" বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীব্র পাশ্চাত্যকিরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত তাহা মরণশীল—তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীর্যবান, বলপ্রদ তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?"

[উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদা বোস্টনের এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেখলেন সম্মুখের সারিতে এসে বসেছেন এমনি একদল নরনারী—যারা বেশভূষায়, হাবভাব-ভঙ্গীতে, আচরণে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার প্রতিমূর্তিবিশেষ। স্বামীজীর বুঝতে বাকী রইলো না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল বৈরাগ্যপূত আধ্যাত্মিক জীবনের কাহিনী এদের কাছে মূল্যহীন উপহাসের বস্তু ছাড়া আর কিছুই ন
সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হ
উঠলো। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আর ব
হয়ে উঠলো না। তার বদলে ভো
সর্বস্ব জীবনের ছলনা ও পঙ্কিলতা
কশাঘাত করে যে বক্তৃতা তিনি করলে
তার তীব্রতা সহ্য করতে না পে
অনেকেই বক্তৃতাগৃহ থেকে স
পড়লেন। পরদিন কিছু বির
সমালোচনা সহ স্বামীজীর সাহ
অকপটতা এবং সত্য ভাষণের দৃঢ়তা
প্রশংসা করে খবরের কাগজে সংব
বেরুল। কিন্তু স্বামীজীর হৃদ
সেদিন না ছিল শান্তি, না ছি
আনন্দ। সারাক্ষণ এই চিন্তা তাঁ
পীড়িত করতে লাগলো যে, জীব
যিনি কারুর দোষ দেখতে পেতেন
সকল মত, সকল ভাব, সকল ধারা
জীবনের মোহনায় মিলিত হয়ে
সকল বক্তব্যের সারবস্তু গ্রহণ ক
তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়াই য
বৈশিষ্ট্য,—তাঁর কথা বলতে গিয়ে তি
এ কী করলেন! লজ্জা এবং দুঃ
ম্রিয়মাণ হয়ে স্বামীজী সেদিন
বিমর্ষ দিনযাপন করলেন।
দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনদর্শনের প্রা
যাদের শ্রদ্ধা বা অনুরাগ আছে, তাঁ
অপরের সঙ্গে একমত না হতে পারে
কিন্তু অপরের বক্তব্যের মধ্যে আস্পর্ধ
সন্ধান করবেন এটা ভিত্তিহীন আশঙ্
বলেই মনে হয়।

আর, "শঙ্করের মায়াবাদের প্রকৃ
দার্শনিক চরিত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দে
স্পষ্ট ধারণা ছিল না"—বেদান্ত-কেশ
বলে পণ্ডিতজন যাকে অভিহি
করেছেন, সেই বিবেকানন্দ সম্পর্কে

এক অভিনব সংবাদ বটে। কিন্তু এর প্রমাণ?

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় তাই প্রমাণ-স্বরূপ স্বামীজীর যে কথাগুলি উদ্ধৃত করেছেন তা হল—

"জগৎটা ভ্রান্তি মাত্র, সব কিছু মায়া। তুমি নখ দিয়ে মাটি খুঁটেই খাবার খাও বা সোনার থালায় করেই খাও, তুমি প্রবল প্রতাপশালী রাজ-চক্রবর্তী হ'য়ে প্রাসাদেই বাস কর অথবা দীনতম ভিক্ষুকই হও, শেষ পরিণতি মৃত্যু, সব সমান সব মায়া। এই হল বিশ্বের প্রতি ভারতের Challenge"—

অতএব অধ্যাপক মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"মায়াবাদের স্বরূপ বুঝতে এ কথাগুলি বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। এ জাতীয় মায়াবাদের প্রচার হিন্দু-ঘরের দর্শনানভিজ্ঞ বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দলও দিনরাত করে থাকেন। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র মৃত্যুতে সব সমান; সংসার মিথ্যা মায়াময়—এর বেশি আর কিছুই বলা হল না।" শঙ্করের মায়াবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর অনভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ উপরোক্ত যে কথাগুলি অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন, সেটা কলকাতার স্টার থিয়েটার গৃহে সমাগত জনসাধারণের সামনে পাঁচ-মেশালী কথায় মেশানো এক বক্তৃতার অংশ।

আমরা এখানে স্বামীজীর উপরোক্ত কথাগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোন দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে চাই না। অথবা শঙ্কর-বেদান্তে স্বামীজীর অধিকার কতখানি তা পরিমাপ করে দেখিয়ে দেবার মত ধৃষ্ট দাবিও করছি না। আমরা এখানে এইটুকুই শুধু বলতে চাই যে, শঙ্করের মায়াবাদকে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় নিজে যে অর্থে বুঝেছেন, স্বামীজীর নিকট সে অর্থটুকু যে অনুদ্ঘাটিত ছিল না, এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নেই। নিচে আমরা অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মায়াবাদের ব্যাখ্যা এবং মায়াবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর অপর একটা ভাষণের একটু অংশ পর পর উদ্ধৃত করছি। আশা করি এর থেকেই ব্যাপারটা সম্যক পরিস্ফুট হবে।

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা—

"মায়াবাদের মূল কথা মায়া বা অবিদ্যার অবরূপতা এবং অনির্বচনীয়তা।...জগতের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব কোনটাই যুক্তি বা তর্কের দ্বারা, কোনো ন্যায়সঙ্গত ধারণার দ্বারা নিরূপণ করা যায় না; নির্বাচন করা যায় না। সুতরাং জগৎ অনির্বচনীয় অথচ একের অভাব বা শুদ্ধ Negation রূপেও কল্পনা করা যায় না। জগতের প্রতীতিটা অবরূপেই হ'য়ে থাকে। এই অর্থেই জগৎ মায়াময়।"

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণের একাংশ—"এই ভ্রমকে অবিদ্যা বা মায়া বলা যায়। ইহার-ই প্রভাবে পরম সত্যকে অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া আমরা মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অস্তিত্বহীন কিছু নয়। সৎও নয় অসৎও নয়—ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে একথাও বলা চলে না আবার নাই এ কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে সৎ বলা যাইতে পারে; সেদিক দিয়া দেখিলে মায়া অসৎ, মায়ার অস্তিত্ব নাই। আবার মায়া অসৎ একথাও বলা যায় না, কারণ তাহা যদি হইত তবে ইহা কখনও জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা বস্তু যাহা সৎ বা অসৎ কোনটি-ই নয়; এজন্য বেদান্ত দর্শনে ইহাকে অনির্বচনীয় অর্থাৎ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না বলা হইয়াছে।"

[পৃঃ ৪৪৭, ২য় খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।]

যাই হোক, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় একদিকে বলেছেন, শঙ্করের মায়াবাদ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না, অন্যদিকে আবার একথাও বলেছেন যে, শঙ্কর-বেদান্তের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং শুধু তাই নয়, শঙ্করকে তিনি [স্বামীজী] নিজের দার্শনিক গুরু বলে মনে করতেন। বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের যে তত্ত্বটি একটি প্রধান মৌলিক তত্ত্ব, যা না বুঝলে শঙ্কর-বেদান্তের প্রায় কিছুই বোঝা হয় না, সেটি না বুঝেই স্বামীজী শঙ্করকে নিজের দার্শনিক গুরু হিসাবে স্বীকার করে নিলেন!—তবে কি স্বামীজী সত্যই এতটা কাঁচা ছিলেন?

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় আরও একটু গভীরে গেলে দেখতে পেতেন তাঁর চিন্তার গোড়ায় গলদ রয়েছে। আসলে শঙ্করের প্রখর মনীষা এবং বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্ব স্বামীজীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করলেও তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন এক স্বতন্ত্র পথে—যে পথের পরে আলো প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছেন সর্বতত্ত্বের সমন্বয়মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী একদা নিজেই বলেছিলেন—

"শঙ্করাচার্যের মত বড় বড় ভাষ্যকারেরা নিজেদের মত সমর্থন করবার জন্য স্থানে স্থানে শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন, যাহা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।" [পৃঃ ২৪৬—৫ম খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা] অন্য এক সময়ে নিজের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"কেবল ড্রাই ইন্টেলেক্ট [শুষ্ক জ্ঞান বিচার]—তর্কের ভয়ে 'Mob-এর ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাতশুদ্ধ কেটে ফেললেন। এ সকল সম্বন্ধে লিখতে গেলে পুঁথি লিখতে হয়।"

[পৃঃ ৩১৩-৩১৫—৬ষ্ঠ খণ্ড বাণী ও রচনা]

কিন্তু হায়, টেবিলে বসে পুঁথি লেখার অবসর তাঁর আর হয় নি। তবে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তির পারম্পর্য অনুধাবন করলে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শঙ্করাচার্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধকদের পুরোভাগে স্থাপন করলেও তাঁর একান্ত অনুগামী তিনি ছিলেন না। কেন না তিনি শঙ্করাচার্যের ন্যায় জীবজগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করেন নি। জীব-জগৎকে তিনি ব্রহ্মভূত এবং ব্রহ্মের-ই প্রকাশিত রূপ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর বেদান্ত মত অদ্বৈত, দ্বৈত বিশিষ্টা-দ্বৈত মতের সমন্বয়সূত্র—যে সূত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর ব্রহ্ম কেবল নির্গুণ নন, কেবল সগুণও নন—নির্গুণ, সগুণ আবার সগুণ নির্গুণের।

অতীত—অনির্দেশ্য, অনির্বাচ্য। তিনিও বলেছিলেন, সূর্যালোকে গমনকারী কোনো পথিক মহাকাশে তার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থান থেকে যদি সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করে, তবে চিত্রগুলি একরূপ না হয়ে বিভিন্ন প্রকারের হবে, এমন কি বিরুদ্ধভাবেরও হতে পারে। তা হলেও সূর্য এক, চিত্রগুলি সেই একই সূর্যের, বিরুদ্ধ ভাবগুলিও সেই একই সূর্য সম্বন্ধে সমভাবে সত্য। সত্যকে হাজার রকম ভাবে প্রকাশ করা চলে এবং প্রতিটি ধারাই সত্য।

যাই হোক, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা। তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে মার্কসবাদের প্রধান কয়েকটি মূল তত্ত্বের ঐক্য ব্যাখ্যা করেছেন সুনিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

১—শ্রেণীস্বার্থ-সংঘর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুধাবন, ২ সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তারই সাহায্যে মানব সমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যা, ৩—বৈশ্যশাসনের নীরব অথচ নিষ্ঠুর শোষণ, ৪—প্রাক-শূদ্র বিপ্লবগুলিতে শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণীর হাতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংরক্ষণ, ৫—শোষণমূলক বৈশ্যশাসনের বিপ্লবাত্মক পরিণাম, ৬—বিপ্লবকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে শোষক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক-প্রতিভাকে দলে টানবার কৌশল এবং ৭—শূদ্র-বিপ্লবের অপরিহার্যতা—স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার এই মূল সূত্রগুলির সঙ্গে মার্ক্সীয় সমাজদর্শনের আশ্চর্য ঐক্য লক্ষ্য করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় স্বামীজীর মনীষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন, "শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের এই ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এই কথাই প্রমাণ করে যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার জন্য শূদ্র-জনসাধারণের প্রতি বিবেকানন্দের বহুশ্রুত উদাত্ত আহ্বানবাণী শুধু একটা উচ্ছল হৃদয়াবেগের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস মাত্রই ছিল না—এই আবেগের পিছনে ক্লান্তিহীন গবেষকের সাধনা মানবধর্মী বাস্তব চেতনা ও যুক্তিস্নাত ভাস্বর ভাবনা সমন্বিত সাফল্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নিপীড়িত মানুষের মর্মসন্ধানী ভাবনার দীপ্তিময় দৃষ্টান্ত হিসাবে এ জাতীয় অজস্র লেখা বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী থেকে তুলে ধরা যেতে পারে। এজন্য সমাজ-বিপ্লবে বিশ্বাসী ভারতবাসী মাত্রেই এই মহামনীষীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।"

কিন্তু প্রবন্ধটির দ্বিতীয় পর্যায় স্বামীজীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণে এবং তার পরিধি ও সীমারেখা নিরূপণে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় যে সব মন্তব্য করেছেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, দুঃখের বিষয়, আমরা তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য এবং আমাদের বক্তব্য যথাসম্ভব পর পর উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, শূদ্র-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা এবং শ্রমজীবীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেও "শূদ্র-চরিত্র সম্পর্কে একটা নিদারুণ বেদনাময় হতাশা", শূদ্র-বিপ্লবের আত্মিক প্রকৃতি সম্পর্কে এক "হতাশাক্লিষ্ট সংশয়" স্বামী বিবেকানন্দকে আধ্যাত্মিকতার পথে ঠেলে দিয়েছিল। "স্বচ্ছ দৃষ্টি, ক্ষুরধার বুদ্ধি, বিজ্ঞানীসুলভ বিশ্লেষণী শক্তি, নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ কামনায় এক দুরন্ত আবেগ—এ সব কিছু যেন কোনো এক অবসন্ন সন্ধ্যায় চূড়ান্ত অবসান খুঁজেছে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের পরম প্রশান্তির মধ্যে।" এর প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন ভগিনী হেলের কাছে লেখা স্বামীজীর একখানি চিঠির একাংশ—যাতে তিনি বলেছেন—

"সমাজের নীচেকার লোকটিও এই দুঃখময় পৃথিবীতে একটু সুদিনের মুখ দেখুক। এর ফলে তথাকথিত সুখাস্বাদের অভিজ্ঞতা পার হয়ে এরা সবাই এসে শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বরের শরণ নেবে। এই পৃথিবী তার গবর্ণমেন্ট আর তার যত সমস্যা সম্পর্কে এদের সকল মিথ্যা মায়ামোহ কেটে যাবে।"

অধ্যাপক মহাশয় আরো বলেছেন যে, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাময়িক বিফলতা, ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের গ্লানিময় পরিবেশ, বৃটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফলহীন প্রতিবাদ, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব, শ্রমজীবী মানুষের নৈতিক ও আত্মিক চরিত্রের সীমাহীন দুর্বলতা—"এ সব কিছু মিলিয়ে তাঁর হৃদয়ে মাঝে মাঝে হয়ত এমন এক হতাশার সৃষ্টি করত—যার ফলে মায়াবাদকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরার এক বিপরীত প্রেরণা অনুভব করতেন।"

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্যে "হয়ত" কথাটি লক্ষণীয়। মনে হয় তিনি নিজে তাঁর মতের সারবত্তা সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় ছিলেন না। নিমজ্জমান ব্যক্তি দিশেহারা হয়ে যেমন খড়কুটোকে আশ্রয় করে, তেমনি হতাশা-সাগরে নিমজ্জিত স্বামী বিবেকানন্দ মায়াবাদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন অথবা শূদ্র চরিত্র সম্পর্কে একটা নিদারুণ বেদনাময় হতাশায় কাতর হয়ে শেষ পর্যন্ত বেদান্তের শূন্য-মায়ার মধ্যে আত্মগোপন করে সকল সমস্যার চরম বিশ্রান্তি খুঁজেছিলেন—অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় নিজে যাঁকে "বীর সন্ন্যাসী" বলে আখ্যাত করেছেন, তাঁর জীবনের বাস্তব ইতিহাস অথবা তাঁর জীবনদর্শন কোনোটার সঙ্গে এই ব্যাখ্যা মেলে না। এ হেন ব্যাখ্যাকে আমরা ভুল বলে মনে করি।

দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল গোল বেধেছে "শূদ্রত্ব" শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে। তাঁর ধারণা, স্বামীজী শূদ্রত্ব বলতে মনুষ্যত্বহীন অবস্থাকে বুঝেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক মহাশয় স্বামীজীর "বর্তমান ভারত" থেকে নিম্নের বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন—

"স্মরণাতীত কাল থেকে অত্যাচারের চাপে বিচূর্ণিত এই শূদ্রশ্রেণী ন্যক্কারজনক দাসমনোবৃত্তি গ্রহণ করে কুকুরের মত উচ্চবর্ণের পদলেহন করে এসেছে। আর না হয় অমানুষ নিষ্ঠুর পশুতে পরিণত হয়েছে। তাদের আশা-ভরসা বার বার ধূলিসাৎ হয়েছে। লক্ষ্যানুসন্ধানের দৃঢ়তা ও কর্মক্ষেত্রে অবিচল অধ্যবসায় জগতে তাদের কিছু নেই।"—অর্থাৎ অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় ইঙ্গিতে বলতে চান শূদ্রত্ব বলতে স্বামীজী দাসত্ব, পশুত্ব এবং অধ্যবসায়হীন অকর্মণ্যত্বকেই বুঝেছেন। তাঁর যুক্তির ধারা এই যে, যেহেতু স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, দাসত্ব, পশুত্ব, অকর্মণ্যত্ব দিয়ে শূদ্র চরিত্র গঠিত, তাই সেই চরিত্রের উপরে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। তাই "শূদ্র-বিপ্লবের দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব যে দুর্বার পদক্ষেপে অগ্রগামী হবে, এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল না।" অতএব বৈদান্তিক মায়ার আশ্রয়!

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ব্যাখ্যা একেবারেই স্বকপোলকল্পিত। শূদ্রত্ব কথাটির এই ব্যাখ্যা এবং তা থেকে উদ্ভূত অনুসিদ্ধান্ত তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের ঘাড়ে অকারণ চাপিয়েছেন তা প্রমাণ করতে বেশি দূরে যেতে হয় না। শূদ্রত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত স্বামীজীর উপরোক্ত কথাগুলি শূদ্রত্বের সংজ্ঞা বা Definition নয়, পরন্ত শূদ্র-শ্রেণীর তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা। সৌভাগ্যের বিষয়, শূদ্রত্ব বলতে স্বামীজী যা বোঝাতে চেয়েছেন তা নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন। আমরা এখানে "বর্তমান ভারত" থেকে তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃত করছি।

"তথাপি এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।" অতএব

নিষ্ঠাবতী

অমিয়কুমার হাটি

বেদনাসম্ভরমানা, দুটি পায়ে কান্নার নূপুর,
একক বিরহ ধ্যানে স্পন্দিত হৃদয় ভরপুর।
রক্তে নাচে বকুলেরা। চেয়েছিল স্বপ্নে উত্তরণ,
স্নায়ুতে গোলাপরাশি বেঁধেছিল সহস্র তোরণ।

অশান্ত দয়িত তাকে স্পর্শও করেনি কোনদিন
জানেও না, ভালবাসে কিনা বাসে। শুধু দৃষ্টি মেলে
কী যেন সে খুঁজেছিল। বুঝি তার মেলেনি সন্ধান ;—
তারপর চলে গেছে কাছে থেকে দূরে—আরো দূরে।

কী অভাব আছে প্রেমে, কীভাবে সে শোধ করে ঋণ?
কান্না নিয়ে খেলে শুধু। নিষ্ঠাবতী ভাবে, দূত পেলে
মনের খবর নিতে। যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান
কেন যে বিফল হ'ল, কোন্ অভিশাপে গেল পুড়ে।

একালের প্রেমমেঘে বিচ্ছেদের ঝড়ের আভাস,
কে ধরে রেখেছে তার ব্যথাবীথি, কোন্ কালিদাস?

স্বামীজীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী শূদ্রত্ব সহিত কথাটির অর্থ শূদ্রধর্মকর্ম সহিত। অর্থাৎ শূদ্রত্বের অর্থ শূদ্রের ধর্মকর্ম। তাঁতি, জোলা, মুচি, মেথর, মজুর, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, মেহনতী মানুষ দিয়ে গঠিত যে বৃহৎ শূদ্রসমাজ—"শক্তির আধার সেই প্রজাপুঞ্জ"—তাদের ধর্মকর্মের আত্মিক প্রকৃতি এবং বলবীর্যের দ্বারা সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে—এই ত' স্বামীজীর কথার সাদা অর্থ। স্বামীজী যেখানে বলেছেন, "শূদ্রত্ব সহিত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীর্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে"—এই অংশটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন প্রাক-শূদ্র বিপ্লবকালে যখন কোনো শূদ্র নিজ বিদ্যাবুদ্ধি বা গুণগরিমাবলে কিছু প্রভাব বিস্তার করতেন, তখনই তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব অর্জন করে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হয়ে নিজ শ্রেণীস্বার্থ বিস্মৃত হতেন বা তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন। শ্রমিক-মজুর শ্রেণী থেকে উদ্ভূত প্রতিভাকে দলে টেনে নিয়ে উচ্চশ্রেণী তথা শোষকসমাজ শূদ্রবিপ্লবকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু শূদ্রবিপ্লবকালে শূদ্রকে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীত্ব লাভে আর প্রয়াসী হতে হবে না।

অর্থাৎ অগ্রগামী সমাজ-বিপ্লবের ধারায় প্রাধান্য অর্জনে শূদ্রকে আর শূদ্রত্ব [অর্থাৎ শূদ্রের ধর্মকর্ম] পরিহার করতে হবে না। স্বামীজী আরও বলেছিলেন, "শূদ্রজাতিমাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন কিন্তু আশা আছে।" শূদ্রশ্রেণীর দাসত্ব এবং হীনাবস্থা যে নৈসর্গিক নিয়মের ফল এবং সে নিয়ম যে পাল্টে যাবে নিয়মের-ই গতিতে, আশাবাদী সন্ন্যাসীর দৃষ্টিতে সে তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল কেমন করে, নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিই তার প্রমাণ—"এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জানে আপনাদিগকে প্রজাপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে—এ স্থানে এ শক্তির মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"
[Marx-এর Inhevent contradiction in capitalist system-এর তত্ত্ব এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়]

শূদ্রবিপ্লবের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের সমস্যা সমাধানে স্বামীজীর কোনো বিশ্বাস ছিল না—অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় এ তথ্য কোথায় পেলেন জানি না। অগ্রগামী সমাজ-বিপ্লবে শূদ্র-প্রাধান্য অপরিহার্য, স্বামীজীর এ বিশ্বাস যদি সত্য বলে মেনে নিতে হয়, তবে এও সত্য যে, বিপ্লবোত্তর যুগের মনুষ্যত্বের প্রতিও তাঁর বিশ্বাসের কিছু কমতি ছিল না। শূদ্রবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী জেনে এবং তার সমগ্র ফলাফল অনুধাবন করে যদি তিনি সত্যই হতাশ হতেন, যদি সত্যই বিষণ্ণতায় তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন হ'ত, তবে তিনি কি বলতে পারতেন—

"তাঁরা বলেন অজ্ঞ গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না এই তুমি, আমি, দশজন বড় জাত!!!

[স্বামীজীর পত্র সংখ্যা ৩৮৪, পৃঃ ২৪—৮ম খণ্ড, বাণী ও রচনা]

অতএব, ভবিষ্যৎ মানবসমাজের জন্য হতাশা নয়—আশা এবং বিশ্বাসই ছিল বিবেকানন্দের আসল কথা। তাঁর নিঃশ্বাস বায়ুতে এই বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হ'ত। ক্লীবতার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণে, বঞ্চিত শোষিত মানুষের মধ্যে অভীঃ মন্ত্র প্রচারে এবং তাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায় কেউ কখনো তাঁকে অবসন্ন বা ক্লান্ত হতে দেখে নি। বেদনার্ত হৃদয়ে তিনি যেমন শূদ্র শ্রেণী বা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর শোষিত অংশের দাসত্ব, পশুত্ব এবং অকর্মণ্যত্ব লক্ষ্য করেছেন, তেমনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সনাতন দুঃখ ভোগ করে "এরা পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন"। [পরিব্রাজক] এই অবহেলিত জনসমাজের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এমনই দৃঢ় যে, শেষ পর্যন্ত তা শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের যে দুয়ার উন্মোচন করে তিনি পরমপূজ্য লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীরবৃন্দকে অভ্যর্থনা করেছেন, সেই একই দুয়ার খুলে একই আসনে বসিয়ে সমধিক শ্রদ্ধায় শ্রমজীবীকেও অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। ওই যারা চাষাভূষা, তাঁতি-জোলা, নগণ্য মানুষ, শ্রমজীবী ছোট জাত, তাদের মধ্যে বিবেকানন্দ "অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নির্ভীক কার্যকারিতা"র এক উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালবর্তী সেই মহত্ত্ব তাঁকে যতখানি স্পর্শ করেছিল, পৃথিবীর আর কয়জন সমাজবিপ্লবী বা রাজনৈতিক নেতাকে তেমনটি করেছিল বা আদৌ করেছিল কিনা, ঐতিহাসিকেরা তা খতিয়ে দেখবেন। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিরপদদলিত শ্রমজীবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাসে এবং শ্রদ্ধায় এই সাধক সন্ন্যাসীর হৃদয় এমনি উদ্বেলিত যে, তাদের সামনে মাথা নত করে তিনি বলেছিলেন, "তোমরা ধন্য, তোমাদের প্রণাম করি।" [পরিব্রাজক]

[চলবে]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আঠারো ॥

বুড়োটার যেন আর কাজকর্ম নেই—খ্যাঁকশেয়ালের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করছে সমস্ত দিনটা। বাঁধানো দাঁত দিয়ে যে অমন করে খিঁচোনো যায়—আশ্চর্য! আসল দাঁতগুলো থাকলে কামড়েই দিত খুব সম্ভব।

এই বুড়োটার জন্যেই মনে হয়—দুত্তোর, দিই এই কচুপোড়ার চাকরি ছেড়ে। কিন্তু তা হলে দিদি আর আস্তো রাখবে না। আর মনীশদা এলেই তো খুব মেরেন্ডারী চালে পিঠ-ফিট চাপড়ে দেয়, আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, 'একটু মন দিয়ে কাজকর্ম কোরো হে, আমার প্রেস্টিজের কথাটা মনে রেখো।'

তাও সয়ে পড়া যেত, কিন্তু আর ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই যে মাইনেটা পাওয়া যাবে, সে-কথা ভোলা যাচ্ছে না। নিজে রোজগার করবার একটা আলাদা সুখ এখন নেশার মতো জড়াচ্ছে তাকে। তা ছাড়া কিছু কিছু বাড়তি পয়সাও আছে। এই হপ্তা তিনেকের ভেতরেই অনেক কিছু শিখেছে সে—শিখে নিতে হয়েছে। খুঁটিনাটি কাজে পয়সা মেলে, জমি-বাড়ী বিক্রীর ব্যাপারে পার্টিকে রেজিস্ট্রি অফিসে নিয়ে গেলে দুটো-একটা টাকা হাতে আসে। এখন নিজের ওপর একটা মর্যাদার বোধ আসছে ক্রমশ। আমি কেবল রকবাজ নই—আরো দশজন বেকার সন্তানের সঙ্গে হুল্লোড়বাজী করে বেড়াই না—যে-সব কাজের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে দশটা-পাঁচটায় অফিসের বাস ধরে, আমি তাদেরই একজন।

এ-সব ভালো, কিন্তু দুটো জিনিস। বুড়োটাই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। আর তা ছাড়া—তা ছাড়া কিছুতেই কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাচ্ছে না। অথচ লেখা-পড়াটা আরো একটু না শিখলে কিছুতেই স্বপ্নার কাছে—

সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে যন্ত্রণা উঠল একটা। মনে হল, কার্তিকের সেই শক্ত হাতটা এখনো যেন ফাঁসির মতো আটকে আছে। হঠাৎ এই কাগজপত্র-ঠাসা গুমোট ঘরটা যেন দম আটকে আনল তার।

বুড়োর কাছে সে বললে, 'মাখনদা, আমি একটু আসছি বাইরে থেকে চা খেয়ে।'

মাখনদা খানিকটা শর্টহ্যাণ্ডে লেখা থেকে টাইপ করছিল। ব্যস্ত ছিল, তাতেই দাঁত খিঁচোবার সময় পেলো না।

'সাহেব একটু পরেই আসবে হাইকোর্ট থেকে। অনেক কাজ আছে। আড্ডায় জমে যেয়ো না।'

'না-না, আমার দেরী হবে না।'

গাড়ীর সার, লোকের ভিড়। মাথার ওপর সূর্যের আগুন। গঙ্গা ছুঁয়ে—গড়ের মাঠ পেরিয়ে যে হাওয়া আসছে, তাতে পর্যন্ত গা জ্বালা করতে থাকে। এখানে মামলা-মোকদ্দমা, বিষয়-সম্পত্তি, স্বার্থ, আইনের কূট-কচাল। মানুষের মুখের চেহারা পর্যন্ত বদলে যায় এখানে এলে। যেন চারদিকে শিকার খুঁজে ফিরছে সব, চোখগুলো ধূর্ততায় ধারালো—এদের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই মাণিকের, ফণীর, কার্তিকের।

আবার কার্তিক! টুনু চোখ-কান বন্ধ করে এগিয়ে চলল। মোড়েই খাবারের বড়ো দোকানটা।

সব সময়েই জমাট, এখনো বিস্তর লোক। তবু বসবার জায়গা মিলল।

'দুটো সিঙাড়া, চা এক কাপ।'

খিদে পেয়েছে। সেই ন'টায় বেরুতে হয় বাড়ী থেকে। বাসের ঝাঁকুনিতেই কখন পেটের ভাত হজম হয়ে যায়।

সিঙাড়া এল। চামচে করে ভেঙে খেতে খেতে অন্যমনস্ক হল টুনু।

কার্তিক জামার কলারটা শক্ত হাতে টেনে ধরেছিল। পকেট থেকে ছোরাই বের করতে যাচ্ছিল হয়তো, মাণিক যেমন বলেছিল, হয়তো তক্ষুণি পেট ফাঁসিয়ে দিত। শালা—খুনে!

অথচ, সব মিথ্যে। সে কারো নামে চুকলি খায় নি। ওরা কসবার কোথায় বসে বোমা বানায়, তা-ও সে জানত না। একটু-আধটু ফাজলামো, এক-আধটু আজে-বাজে কথা, না-হয় হয়েই গেল কিছু হাতাহাতি। কিন্তু ও-সব বোমবাজী তার পোষায় না—সে মাথাও ঘামায় নি কোনোদিন।

গৌরবাবু দারোগাকে মুচলেকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সে বলে নি। পুলিশের টিকটিকি কোত্থেকে বোমার খবর পেলো, তারাই জানে। অথচ হারামীর বাচ্চাদের যত রাগ তারই ওপরে।

মাণিক নিশ্চয় কলকাতায় নেই। তার কানে মন্ত্র দিয়েছে ওই পলিটিক্সের দাদারা—কোথায় যেন কাদের হয়ে ধান কাটতে গেছে সে। তাকে ভরসা দিয়েছে, এ-সব কাজে নেমে পড়লে তার জীবনটাই অন্য রকম হয়ে যাবে, আর ওয়াগন ভাঙতে হবে না, একেবারে সুখের স্বর্গে গিয়ে চড়বে। হবে ঘোড়ার ডিম! পলিটিক্সের দাদারা তো কেবল লাল কাপড় দুলিয়ে দেশশুদ্ধ ষাঁড় খেপিয়ে তাদের লড়াই দেখছে—আর নিজেরা বেশ মৌজের সঙ্গে হাততালি বাজাচ্ছে।

ধুস্! সিঙাড়া থেকে এক টুকরো পচা আলু মুখে পড়তে আরো মেজাজ খারাপ হয়ে গেল টুনুর। মাণিকটা থাকলে তবু কার্তিকদের খানিক সামলে রাখতে পারত—তার মাথা একটু ঠাণ্ডা। এ ব্যাটারা তো খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে, আবার বাগে পেলে—

স্বপ্নাই বাঁচিয়ে দিলে এ যাত্রা। স্বপ্না!

টুলুর মাথাটা ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। সন্ধ্যাটা তখন কি রকম হয়ে গিয়েছিল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে কী সবুজ দেখাচ্ছিল সাদার্ণ অ্যাভেন্যুর ঘাসগুলো, কী হাওয়া দিয়েছিল, লেকের গাছগুলোতে কী ফুল ফুটেছিল, আর কতদিন পরে হাতটা চেপে ধরেছিল স্বপ্না। টুলুর মনে হচ্ছিল, আবার সে আগের দিনগুলোর মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে—এতদিন যা কিছু ঘটেছে, সব স্বপ্নের ভেতর, হঠাৎ স্বপ্না বলে বসবে, 'টুলুদা, এই অংকটা পারছি না, বুঝিয়ে দাও।' এমনি করে টুলু যখন আবার ভালো, আবার নতুন হয়ে যাচ্ছিল, তখন কার্তিকরা এল। সমস্ত কালো হয়ে গেল, পালিয়ে গেল সমস্ত।

স্বপ্না তাকে আর একবার বাঁচিয়ে দিলে। সেই স্কুলের টাকা ভেঙে কেলে-ঙ্কারীতে জড়িয়ে যাওয়ার পর নিজের গলার হার যেমন খুলে দিয়েছিল সেদিন। কার্তিক ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু আর সে দাঁড়াতে পারল না। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে চলন্ত বাস—এক লাফে উঠে পড়েছিল তাতে।

বাসটা কোন্ দিকে, কোথায় চলেছে সেটা বড়ো কথা নয়। কার্তিক তাকে ছোরা মারলেও হয়তো ভালো হত এর চাইতে। লজ্জায়, অপমানে সে যেন টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল তখন।

স্বপ্না বোধ হয় তাকে ডাকছিল। কিন্তু জোর করে পা-দানির ভীড় ঠেলে উঠে সে বোঝাই বাসের মধ্যে লুকিয়ে গেল। বাস কোথায় যাচ্ছে? সল্ট লেক? শিবপুর? যেখানে খুশি যাক।

দাঁতে দাঁত চাপল টুলু। নাঃ, বার বার এভাবে নীচু হওয়া যায় না। আমি ফিরেছি, আমি ফিরব। আমি চাকরি করব, আমি কোচিং ক্লাসে ভর্তি হবো, আমি মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে ধরব, তারপর গিয়ে দাঁড়াব স্বপ্নার কাছে। কার্তিক ব্যাটাচ্ছেলেরা কী করতে পারে আমার? এবার থেকে আমিও একটা ছোরা-টোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে। যদি মারতেই আসে, অন্তত একটাকে সাবাড় করে তবেই মরব।

আসলে আমি দল ছেড়েছি, তাতেই রাগ। আমি ভদ্রলোক হতে চেষ্টা করছি, তাইতেই জ্বালা ধরেছে শালাদের।

সেদিন বাসটায় চেপে ভবানীপুর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিল। তারপর বাড়ী ফিরে সমস্ত রাত তার মাথায় আগুন জ্বলেছে। দাদার ওপরেও তখন বিশ্রী একটা রাগ হচ্ছিল তার। কী দরকার ছিল মুরারি হালদারকে বলে সাত-তাড়াতাড়ি তাকে ছাড়িয়ে আনবার? না হয় আরো দুটো দিন ঠেঙিয়ে, কার্তিককে যেমন ছেড়েছে তেমনিভাবে তাকেও ছেড়ে দিত। মাঝখান থেকে—

'টুলু নাকি?'

টুলু একটা ঝাঁকুনি খেলো ভাবনার ভেতরে। চেয়ে দেখল, কালীঘাটের ভেটকি মিত্তির। ওদের দলেই ঘুর-ঘুর করত, তারপর কিছুকাল বে-পাত্তা। একটা ভালো নাম তার নিশ্চয় ছিল, কিন্তু ভেটকি নামেই সে বিখ্যাত। বড়োলোকের ছেলে চেহারাটা খুব চটকদার। জীবনে তার একটি মাত্র উদ্দেশ্য—মেয়ে শিকার করা। এ পর্যন্ত যত মেয়েকে কিভাবে সে মজিয়েছে, রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করতেই আনন্দ। নোংরা কথা তাদের দলে সবাই বলে থাকে, কিন্তু বড়োলোকের ছেলে বলেই তার মুখ সব চেয়ে বেশি খোলা—খিস্তি করবার সময় জিভ যেন তার লক লক করত, এমন কি ফণী পর্যন্ত বলে বসত: 'থাম্ মাইরি, আর তো বরদাস্ত হয় না—তুই আমাদের চরিত্তির খারাপ করে দিবি যে।'

'আহা, কী সব চরিত্তিরের ধ্বজা রে!'

এই ভেটকি মিত্তিরের কিছুদিন পাত্তা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এখানে—এই হাই-কোর্ট পাড়ায়?

ভেটকি মিত্তির কেবল দোকানে ঢুকে-ছিল মনে হল, এসে বসে গেল টুলুর পাশে।

'তুই এখানে কী করছিস টুলু?'

'চাকরি করি একটা। চা খেতে এসেছি। খাবি তুই?'

'বলে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কী—অ্যাঁ? তুই চাকরি করছিস?'

'কেন, দোষ আছে?'

'না—দোষ আর কী, ভালোই তো। তোর দাদার পাল্লায় পড়ে বুঝি?'

'কেন, নিজে থেকে আমি একটা চাকরি নিতে পারি না?'

'পারিস বই কি, আলবৎ পারিস। তা দল-টল কি ছেড়ে দিলি?'

টুলু এড়িয়ে গেল কথাটা। বললে, 'তুই এ-পাড়ায় যে?'

'ভবানীপুরের একটা বাড়ী বিক্রী করে দিতে হল মাইরি। দেনায় এমন জড়িয়ে গেলুম যে—' ভেটকি মিত্তিরের মুখটা ঝুলে পড়ল: 'খুব বাগিয়ে নিলে পাঞ্জাবী সর্দারজী—বুঝলি? কম্‌সে কম দেড় লাখের বাড়ী—ছাড়তে হল পঞ্চাশে।'

'ছাড়লি কেন?'

'আর বলিস্ নি। মানে একটা মেয়ে—'

'শুধু একটা বলছিস কেন? তুই তো মেয়েদের গায়ের এঁটুলি।'

ভেটকি মিত্তির মুখটাকে বিশ্রী করল: 'ধুৎ—মেয়েছেলেতে এবার অরুচি ধরে গেছে।'

'বটে!'

'আরে, এটা ইস্কুলের মেয়ে। দেখতে খাসা, বুঝেছিস? পটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম একটা খালি কুঠিতে। বরাতের ফের—হল পুলিশ রেড; ধরে হাজতে। বলে নাবালিকা—পাঁচাচ বচ্ছর ঘানি ঘোরাব তোমায়। সে ঝকমারি। মিটাতে—বুঝলি, স্রেফ বিশটি হাজার টাকা। বাবা বন্দুক নিয়ে এল, বললে, যা চলে দেশের বাড়ীতে, কলকাতায় আর একদিনও থাকবি তো ত্যজ্য পুত্তুর করব। কী করা যায় বল্। তা মাস ছয়েক তো বনবাসে কাটল। তারপর বাবা হঠাৎ স্ট্রোকে চোখ বুজলেন, ফিরে এসে সম্পত্তির প্রোবেট নিতে গিয়ে দেখি, কাকা তলায় তলায় সব ফাঁক করে রেখেছে। তার পরে ডেথ-ডিউটি, এটা-সেটা—যাঃ শালা, চোখে-কানে দেখি না। দিতে হল বাড়ীটা বেচে। ও ব্যাটার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ধার নিতুম, শেষে বাড়ীটা ওর পেটেই গেল। দুর—কিচ্ছু ভালো লাগছে না। নাঃ, মেয়ে-ছেলের মধ্যে আমি আর নেই। মা বিয়ে করতে বলছে, তাই করে ফেলব একটা।'

'মেয়েছেলের মধ্যে নেই তো বিয়ে করবি কাকে? বেটাছেলেকে?'

'বউ—বউ। তাকে কি মেয়েমানুষ বলে?'—চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভেটকি মিত্তির বললে, 'তারপর আর খবর-টবর কী? প্রমোদ, ফণী, কার্তিক—'

সামনের ঘড়িটায় তিনটে বাজল। চমকে উঠল টুলু। একটু পরেই হাইকোর্ট থেকে ফিরে আসবেন ঘোষ সাহেব।

'সব ভালো।'—টুলু দাঁড়িয়ে পড়ল: 'আমি চললুম। কাজ আছে। পরে দেখা হবে আবার।'

'আসিস না একদিন আমার বাড়ীতে। এখন বাবা তো নেই, ভাবনারও কিছু নেই। আমিই মালিক। দরজায় নেম-প্লেট বসিয়েছি, বুঝলি? পি· মিটার, ল্যান্ড লর্ড। চলে আসিস।'

'দেখা যাবে।'

চা আর খাবারের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে টুলু নেমে পড়ল। সেই ভীড়, গাড়ীর সার, সেই ধারালো রোদ, জ্বালা ধরানো হাওয়া, মানুষের ধূর্ত হিসেবী চোখ। মনটাকে আরও বিশ্রী করে দিয়েছে ভেটকি মিত্তির। জেল খাটলেই ভালো হত ওর।

যেতে যেতে, ভীড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, প্রায় চোখ বুজে টুলু নিজেকে বলতে লাগল: আমি বেঁচেছি, এদের খপ্পর থেকে আমি বেঁচেছি। কিছুই বলা যায় না—হয়তো ওর সঙ্গী হয়ে আমিও খালি কুঠিতে যেতুম—ও বেরিয়ে আসত টাকার জোরে আর আমাকে জেল খাটতে হত। আমি বেঁচেছি, আমি বাঁচব। কার্তিকদের ভয় করি না, দরকার হলে আমিও একটা ছোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে।

স্বপ্নার কাছে আমি ফিরে যাব মাথা উঁচু করে, বুক টান করে। যেতে যেতে

মেঘে ও আলোতে

জয়ন্তী সেন

এ সব পথের কথা পাথর হৃদয়
ইতিহাস মনে রাখে
আমি জানি শুধু ফিরে আসা।
অনেক আশ্চর্য রৌদ্রে অন্ধকারে
মেঘে ও আলোতে
যেতে যেতে অভিজ্ঞতা বোধে স্থির হলো
সেই নিজেকেই ফের ভালোবাসা,
গাঢ় অনুরাগ।
যে প্রকৃতি এত সুখী অপরের চোখে
সেও তো নিজেতে মগ্ন
শান্ত রুদ্র সব পরিবেশে।
তাইতো বেড়াতে যাই ; কে বলেছে
জীবনের মানে
সুদূরেই সুখজ্যোতি তার চেয়ে
বুকের ভিতরে
নিজের একান্ত কাছে বার বার
প্রীত আবর্তনে
যে রক্ত কমল ফোটে—সেই স্বর্গ
নীল অন্ধকারে।

বিসর্জনের ঢাক

রামমোহন মহান্ত

অন্তিম সাইরেন বাজে বহুবর্ণ ঝিঁঝির ডানায়
দার্জিলিং সানু থেকে সোনাপুর রায়না রাবাত
দক্ষিণ-সাগর থেকে ঘন নীল উত্তরে তরাই—
ঃ গভীর চক্রান্তে কাঁপে অশরীরী ঘোর কালো রাত!

আবিষ্ট জনতা মন, শহরে এসেছে উঠে গ্রাম
কেউ বলে, 'ভয় নেই, শত সূর্য দেবো উপহার!'
'এনেছি নতুন দিন!'—কেউ বলে, 'চলছে সংগ্রাম,
মেহনতী মানুষেরে এনে দেবো পূর্ণ অধিকার!'

আমরা বোবা ও কালা—হাতিয়ার এবং রসদ!
কেন না; আমরা সব গণবাদী প্রগত মানুষ,
আমরা কায়েম করি, ভাঙি-গড়ি পাকা মসনদ,
আমরা লড়াই করি, মরি-বাঁচি, বিবেক বেহুঁশ!
আমরা বিবেকবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী ভাই,
বিসর্জনেরও ঢাক প্রয়োজনে আমরা বাজাই!

মনে হল, সেই সন্ধ্যাটার মতো স্বপ্না তার হাত ধরে আছে।

অফিসে মজুমদার সাহেব ঘেরাও। সেন আর চ্যাটার্জী—আরো দু'জন কর্তা-ব্যক্তি—গোলমাল শুনে ব্যাপারটা জানতে এসেছিলেন, তাঁরাও আটকে পড়েছেন জালের ভেতর। এখন খাবি-খাওয়া মাছের মতন ছটফট করছেন তাঁরা।

পাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গরমে দর দর করে ঘামছেন সুখী ভদ্রলোকেরা। আর তাঁদের ঘিরে উঠছে শ্লোগানের পর শ্লোগান।

'দালালেরা ধ্বংস হোক।'

'—মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ!'

মজুমদার সাহেব যে খুব চমৎকার লোক তা নন। এক সময়ে সিংহবিক্রমে চলতেন, এখন জমানা বদলের ফলে মেষ-শাবক। যুক্তফ্রন্টের টলমল অবস্থা দেখে উৎসাহে একটু নড়ে বসেছিলেন, একটা চার্জ-শীট দিয়ে ফেলেছিলেন একজনকে, তার ফলে আজ এই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে।

একবার ক্ষীণ গলায় বলতে চাইলেন, 'দেখুন, উইদাউট নোটিশ দিনের পর দিন কামাই করলে—'

'শাট্ আপ্!'

'আপনারা যে-রকম গভর্নমেন্ট চেয়েছিলেন, তাই তো হয়েছে। এখন আপনারা সবাই সিন্সিয়ারলি—'

'শাট আপ—শাট আপ। ব্যাটা শয়তান; ধর্মকথা শোনাতে এসেছে প্যাঁচে পড়ে।'

তারপর চলল গালাগালি। ওঁর স্ত্রীর অচিরে বৈধব্য ঘটবে—এই কথাগুলো জানানো হতে লাগল বেশ পরিষ্কার স্থূল ভাষায়। দু-একটি অকথ্যও শোনা যাচ্ছিল ফাঁকে ফাঁকে। সেন আর চ্যাটার্জীও বাদ যাচ্ছিলেন না।

আসলে অনেক দিনের জ্বালা। মজুমদারের ওপর রাগ থাকতে পারে, থাকাই স্বাভাবিক। ঘেরাও করতেও কিছুমাত্র বাধা নেই। কিন্তু এইসব কুৎসিত গালাগাল? আলো-পাখা সব বন্ধ করে দিয়ে নিগ্রহ? এ-ও কি ঘেরাওয়ের নীতি? তা হলে ঘেরাওয়ের দরকার কী—টেনে এনে প্রচণ্ড প্রহার করলেই তো চুকে যায়।

প্রবীর দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। ঘেরাও হোক, কিন্তু এইটে ঠিক পছন্দ হয় না তার। বামপন্থী রাজনীতির পদ্ধতিটা কী? নীতি, না নৃশংসতা? সমরাঙ্গনেও নীতিও নিশ্চয় নির্মম হতে পারে, কিন্তু যে-কোনো উপলক্ষে আন্দোলনকে উন্মাদতায় পৌঁছে দিলে—

কে জানে, ঠিক বোঝা যায় না। আর ইউনিয়ন তো প্রবীরদের হাতে নয়, তারা মাইনরিটি। তাদের দালাল বলা হয়ে থাকে।

তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। কথা ছিল: যুক্তফ্রন্টের আমলে আমরা প্রমাণ করব, আগের দিন আর নেই—এখন দেশ আমাদের, ক্ষমতা জনগণের হাতে। জনগণের সরকারকে সব দিক থেকে দুর্নীতিমুক্ত করব আমরা—কাজ করব, পরিশ্রম করব, প্রশাসনের পথ মসৃণ করে তুলব। তবু কেন আমরা কাজে ঢিলে দিই, কামাই করি, মজুমদার সাহেবদের হাতে সুযোগ এনে দিই; আমরাই বিরোধী পক্ষের হাতিয়ার হয়ে উঠি?

পাশে এসে দাঁড়ালো মুকুল প্রামাণিক।

'চলো ব্যানার্জি—কী হবে দাঁড়িয়ে থেকে? এদের রেভোল্যুশ্যানের দৌড় তো দেখছ।'

প্রবীর আশ্চর্য হল। মুকুল এই পক্ষেরই একজন উৎসাহী সৈনিক বলে এতদিন ধারণা ছিল তার।

'তুমি হঠাৎ—'

মুকুল বললে, 'কিস্সু হবে না। আমার ডিসইলিউশান্ড। নকশালবাড়ীর লাল আগুন ছাড়া কোনো পথ নেই, কোনো পথই নেই। ও এক-আধটা মজুমদারকে টর্চার করে কী হবে—ঝাড়ে-মূলে সব জ্বালিয়ে দেওয়া দরকার। চলো, আমার সঙ্গে—'

'কোথায় যেতে হবে?'

'চলোই না।'

প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে চলল। একদিক থেকে নিষ্কৃতি। পেছনের ওই প্রবল চিৎকার তার খুব ভালো লাগছিল না—অন্তত আজকের মানসিকতায় তো নয়ই।

করিডোরে দুটি ছেলে কথা কইতে কইতে যাচ্ছিল: 'আমাদের যুক্তফ্রন্ট—'

মুকুল প্রামাণিক সংক্ষেপে বললে 'ও: রেভোল্যুশনারি জেন্ট্!'

—ক্রমশ

॥ বারো ॥

আমার গতবারের চিঠিতে লিখেছিলাম যে, জনাব নুরুল আমিন তার "নয়া লাড্ডু" পি, ডি, পিকে বাজারে ছাড়ার আগে আরও কয়েকটি অভিনব আবিষ্কারে পাকিস্তানীদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিল। যেমন, প্রথমে "এন-ডি-এফ", তারপর "পি-ডি-এম", তারপর "ডাক"। সম্প্রতি সে যে জিনিসটি বানাতে ব্যস্ত তার নাম "ইসলামপসন্দ্ পার্টি!" নামটা পড়ে ঘাবড়ে যাবেন না যেন, কেন না ঠিক এমনটি না হলে আমরা পাকিস্তানীরা কিন্তু অবাক হয়ে যেতাম! নুরুল আমিন বেঁচে থাকতে নয়া নয়া পার্টি গজিয়ে উঠবে না, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি শ্লোগানে কানে তালা লাগবে না, এমন কখনো হয় নাকি? কাজেই "পি-ডি-পি"র লাড্ডু যদি কড়াই থেকে নামাতে না নামাতেই বাসি হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে "ইসলামপসন্দে"র আমদানী হবে না কেন? একশ' বার হবে! অন্ততপক্ষে আমিন সাহাব যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তো নিশ্চয়ই! তাই গত মাসের চব্বিশ তারিখ লাহোরে "জামাতে ইসলাম", "মরকজাই জামাতে-উল-ইসলাম", "জামাইতে আহলে হাদিস", এই তিন বাঘা ইসলামী দলের সাথে হাত মিলিয়ে জনাব আমিনের পি-ডি-পি "ইসলাম-পসন্দ্" নামক নবতম লাড্ডুটির মশলা পিষে এল। আশা করছি, আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এটা আমাদের পাতে পরিবেশন করবেন! আমিন সাহাবের ভক্তবৃন্দ অবশ্য এই লাড্ডু তৈরির ব্যাপারে পি-ডি-পি'র সক্রিয় ভূমিকাকে চেপে যেতে চাইছে, কিন্তু কড়াই থেকে মাঝে মধ্যে যে খুশবু বার হচ্ছে তা' নাকে টেনে আমরা দিব্যি বুঝতে পারছি এটা কোন উড়ের তৈরি। কাজেই, আমিন সাহাব, রাঁধতে বসে লজ্জা কেন?

বাহাত্তরে নুরুল আমিন এবং তার ইয়ার বক্সীরা অর্থাৎ ফরিদ আহমেদ, মুয়েজ্জা, মাহমুদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লা (সম্প্রতি নবাবপুঙ্গব ও নুরুল সাহাবের মধ্যে মতভেদের কোন্দল চলছে, তবে আমরা আশা করছি যে, খুব শিগ্গিরই এই কোন্দল থেমে যাবে এবং দু'জনে এক সাথে গোশল করে এক সানকীতে ছালন-ভাত খাবে) প্রভৃতি স্বনামধন্য লীডাররা কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য বার বার দল নিয়ে ভাঙা-গড়া খেলেছে। তাদের এই নোংরা অতীতের সামান্যতম পরিচয় পেলেই পি-ডি-পি এবং ইসলামপসন্দ্ সৃষ্টির রহস্যটা আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। কাজেই এই চিঠিতে নুরুল সাহাবদের অতীত-কীর্তির কথাই লেখা হোল।

পাকিস্তানের প্রথম জঙ্গীশাসক আয়ুব খাঁ যখন পিণ্ডির-শাহীতখ্তে চড়ে বসল, তখন তার ধারণা হয়েছিল যে, তামাম পূর্ব-পশ্চিমের অধিবাসীই বুঝি ভয়ে ভয়ে গর্তে ঢুকে গেছে। কিন্তু তাকে এই আত্মতৃপ্তি বেশিদিন পেতে না দিয়ে বেলুচিস্থান আর গ্রামবাংলার যত্রতত্র আগুন জ্বলে উঠল। খাঁ বাহাদুর তার মার্কিনী দাদাদের নকল করে বেলুচিস্থানে বোমা ফেলে গাঁ এর পর গাঁ নিশ্চিহ্ন করে দিল আর পূর্ব-বাংলার জন্য পাঠাল তার তোয়াক্কের খাসী, পাঞ্জাবী সৈন্যদের। কিন্তু গুলীবারুদ, লাঠি, টিয়ার গ্যাস ইত্যাদিতেও যখন কোনও কাজ হোল না তখন সে এক নয়া চাল দিল, সামরিক শাসনের অবসান ঘোষিত হোল পাকিস্তানে। ভাবখানা এই যে, বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্বর্ণযুগের শুভসূচনা হোল দেশে। প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসনের সব কিছুই বহাল তবিয়তে রইল, কেবল নামটা বদলে গেল। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনের শক্তি যে কোনও স্বৈরাচারী বা জংগী শাসনযন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি এবং আয়ুবের জালিম সরকারের জুলুমবাজীর মোকাবিলা করার জন্য এই হোল একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

জনাব নুরুল আমিন ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা উনিশশ' আটান্ন থেকে বাষট্টি, এই চার বছর সুবোধ বালকের মত নিরাপদ দূরত্বে বসে আত্মরক্ষা করছিল আর দিন গুণছিল কবে আবার নোতুন করে নেতৃত্বের সাজতে পারবে। সামরিক শাসনের অবসান ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে তারা খা ঝাড়া দিয়ে উঠল। আমরা অর্থাৎ হতভাগ্য এবং অপদার্থ ছাত্র সম্প্রদায়, যারা আয়ুবের ঢাকা সফরকে বানচাল করে দিয়েছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনী উৎসবে তাকে ডিম, জুতা ও কালো পতাকা উপহার দিয়েছিলাম, তারা সকালে উঠে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটি পড়েই চমকে উঠলাম, কেন না আমিন সাহাব, হামিদুল হকচৌধুরী প্রভৃতি নয় নেতা (মতান্তরে পাকিস্তানী আওয়ামগণের নয়-দুশমন) এক "নূতন যুক্তফ্রন্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন"। খুব স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষের মনে এই নয়া যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হোল। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার ও দলের পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল নুরুল আমিন নিজেই। আজ যে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পি-ডি-পি'র জনসভায় তাকে গরম, গরম বুলি ছাড়তে শোনা যায়, সেই আঞ্চলিক বৈষম্যের সূত্রপাত হয়েছিল তারই আমলে। তারই যোগসাজসে গোলাম মুহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রভৃতি পশ্চিমা শয়তান শোষণের জাল পেতেছিল বাংলাদেশ জুড়ে। আর উনিশশ' বাহান্ন সালের সেই আগুনঝরা দিনে, যে দিনের স্মৃতি পাকিস্তানের মেহনতী আওয়ামের রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে সেই একুশে ফেব্রুয়ারি অসংখ্য ছাত্রের বুকের রক্ত ঝরাবার জন্য মুখ্যত দায়ী ছিল এই নুরুল আমিন। যখন মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুড়ছিল ঠিক সেই সময়ে ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে বিধানসভায় আমিন সাহাব তার মিনিস্টারী চালে লম্বা লেকচার ঝাড়তে ব্যস্ত। বিরোধীপক্ষের সদস্যরা তাকে ব্যাপারটা জানালে নেহাৎ নির্লিপ্তের মত সে উত্তর দিয়েছিল যে, এই বিষয়ে তার কিছুই করার নেই! উনিশশ' চুয়ান্ন থেকে বাষট্টি, এই দীর্ঘ আট বছর নুরুল আমিন বা তার পূর্ববঙ্গীয় শিষ্য-পোষ্যবর্গের কোনও পাত্তাই ছিল না। কেন্দ্রে মুসলিম লীগ যদিও বা ভাঙা মাজারের উপর টিম্‌টিম করে জ্বলা চেরাগের মত কোনও মতে টিকেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং আমিন সাহাব এই ক'টা বছর দেশসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে মনের দুঃখে হারেম, গোশলখানা আর তাসের আড্ডা ইত্যাদি "নেহাৎ বিরক্তিকর, অসাধু সংসর্গে" সময় কাটাচ্ছিল। অতঃপর বাষট্টিতে ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় এবং মেহনতী শ্রমিক, কৃষক যখন মাথার উপরে উদ্যত খড়্গকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং আয়ুব খাঁ

জড়কে গিয়ে মার্শাল ল' তুলে নিল তখন নির্ধিরাম নূরুল তার দলবল সহ 'হামলোগ আভীতক জিন্দা হ্যায়' হুঙ্কার দিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। তাদের ধারণা ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী জনসাধারণ তাদের মদত দেবে এবং লীডার বানিয়ে মাথায় তুলে নাচবে। কিন্তু বিপ্লবী নূরুল বিপ্লব করার আগেই সরাসরি হাজতে চালান হয়ে যেতে বসেছিল, কারণ ধুরন্ধর আয়ুব খাঁ পাকিস্তানে তার একনায়কত্ব কায়েম করার জন্য এক মোক্ষম অর্ডিন্যান্স ঝেড়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম সঙ্কুচিত করে রেখেছিল। এই অর্ডিন্যান্সের ভাষ্য অনুযায়ী, নয়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করার বিবৃতি দিয়ে নূরুল আমিন আইনভঙ্গের অপরাধে অপরাধী এবং তার কারাদণ্ড একরকম নিশ্চিত। কার্যত হয়ত তাই হোত। কিন্তু শহীদ সুরাবর্দী ঠিক সময় মত আবির্ভূত হয়ে নূরুল-বাহিনীকে রক্ষা করল। এই কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, শহীদ সুরাবর্দী একজন আদর্শ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ্ ছিল। বুর্জোয়া রাজনীতির আস্তাকুড় ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহের দক্ষতায় স্বয়ং জিন্না সাহাবও তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি এবং তখতে বসেও যার ভয়ে আয়ুব খাঁ নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না সে এই একমেবাদ্বিতীয়ম সুরাবর্দী সাহাব। যাই হোক সুরাবর্দী নূরুল আমিন প্রভৃতির নতুন দল গঠন করার অসুবিধাটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিল, বুঝিয়ে দিল যে, গোঁয়ার্তুমি না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যাওয়াই উচিত, কেন না সবুরে মেওয়া ফলে। সুচতুর সুরাবর্দী বুঝতে পেরেছিল যে, আয়ুব খাঁ নিজেই নিজের ফাঁদে ধরা পড়বে। খাঁ বাহাদুর যখন বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করেছে, তখন নিশ্চয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও কাজকর্ম তাকে অচিরেই স্বীকার করে নিতে হবে এবং সবচেয়ে মজার কথা, যে রাজনৈতিক দলাদলির বিরুদ্ধে সে লম্বা চওড়া ভাষণ ও বিবৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদেরই কোনও একটিকে তার আশ্রয় করতে হবে, নতুবা বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচনে তার পক্ষে দালালি করবে কে? এরপর আর রাজনৈতিক কাজকর্ম-বিরোধী অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় আয়ুবের সামনে থাকবে না। তবে যতদিন তা' না হচ্ছে ততদিন সামলে চলাই শ্রেয়! সুরাবর্দী তাই উপদেশ দিল যে, সরাসরি দল গঠন না করে বর্তমানে একটা সাধারণ রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করা যাক। যুক্তফ্রন্টের পরিবর্তে হোক "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" বা "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট", সংক্ষেপে "এন-ডি-এফ"। উনিশশ' চৌষট্টি সালের চৌঠা অক্টোবর করাচীর এক জমকালো হোটেলে সুরাবর্দী এন-ডি-এফের সূত্রপাত করল এবং এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিল যে, "পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্থৈর্য বজায় রাখার জন্য এবং আওয়ামের স্বার্থে যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য জনগণের মনের মত একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন, এন-ডি-এফ এই আদর্শ গণতন্ত্র কায়েম করার দায়িত্ব নিল।"

এন-ডি-এফ চালু হোল বটে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচী, লক্ষ্য ও আভ্যন্তরীণ ঐক্য না থাকার দরুণ শুরুতেই তার কাজকর্মে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। আরও একটা অসুবিধার কারণ অসুস্থতার জন্য সুরাবর্দীর বিদেশ যাত্রা। সুতরাং এন-ডি-এফকে দেখে কে? নিরুপায় নূরুল আমিন মৌলানা ভাসানীর স্বারস্থ হোল এবং এই ব্যাপারে ভাসানীকে হাত করার উপায় স্বরূপ বর্তমানের অন্যতম পি-ডি-পি ওয়ালা এবং তখনকার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মামুদ আলীকে দলে টেনে নিল। ভাসানীর কাছে নূরুলের সাহায্য চাওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, যদিও তখন আয়ুবের আর্ডন্যান্স অনুযায়ী কোনও নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজকর্ম শুরু করা বেআইনী ও দণ্ডনীয় ছিল তা' হলেও একমাত্র ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই কর্মী সদস্য এবং সমর্থকের সংখ্যানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারত এবং তখন এই দলকেই সবাই প্রগতিশীল মনে করত। সত্যি কথা বলতে আমরাও কমিউনিজমের শিক্ষানুযায়ী প্রগতিশীল দল হিসাবে ন্যাপকে (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) মদত দিতাম এবং মৌলানা ভাসানীর কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টের কাজকর্মে সক্রিয় ভূমিকা নিতাম। বলা বাহুল্য যে, সুরাবর্দীর পরিবর্তে ভাসানীকে গুরু বানিয়ে নূরুল আমিন যথেষ্ট চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিল। ন্যাপ এবং তার নেতা ভাসানীকে হাত করার মানেই হোল গোটা পূর্ব বাঙলাকে পাশে পাওয়া। কাজেই ভাসানীকে সামনে খাড়া করে নূরুল আমিন নানারকম রাজনৈতিক ভেল্কিবাজী দেখিয়ে একই সঙ্গে আয়ুব

আর আওয়ামকে অবাক করে দেওয়ার দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল! কিন্তু তার এই সাধে বাদ সাধলো মৌলানা সাহাব স্বয়ং। আজকের নয়া শোধনবাদী মৌলানা ভাসানীর সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সেদিন কিন্তু তাঁকে তাঁর মতামতের জন্য আমরা আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলাম। কেন না সেদিন তাঁর মাথায় আজকের মত ইসলামের ভূত এত বেশি লাফালাফি করত না এবং তাঁর কথাবার্তা বা কাজের মধ্যে কোনও সুবিধাবাদ বা দলীয় স্বার্থের গন্ধ ছিল না। মৌলানা ভাসানী এন-ডি-এফ-এ যোগ দিয়ে আয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে নুরুল আমিনকে স্পষ্টাস্পষ্টি তাঁর যে শর্তটি জানিয়ে দিলেন, তা হোল এই যে ন্যাপকে পুনর্গঠন না করলেও ন্যাপের লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে এন-ডি-এফ-এর লক্ষ্য ও কর্মসূচী হিসাবে মেনে নিতে হবে। নুরুল আমিন এবং এন-ডি-এফ-এর অন্যান্য কর্তা ব্যক্তিদের পক্ষে ভাসানীর ঐ শর্ত মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কারণ আওয়ামের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের দুঃখ সুখে লড়াই করার মনোভাব নিয়ে আমিনের দল রাজনীতিতে নামে নি, নেমেছে বক্তৃতা ও বিবৃতি দিয়ে খবরের কাগজে ছবি ওঠাবার জন্যে, সহজ, সরল মানুষগুলোর সামনে বড় বড় বাক্য কপচে লীডার বনার জন্যে এবং বাঁ হাতের খেল দেখিয়ে পকেট ভরার জন্যে। নুরুলের আরও একটা অসুবিধা হোল আওয়ামী লীগকে নিয়ে। আওয়ামী লীগ ও তার চোঙধারী শেখ মুজিবর আজকের মত সেদিনও পুরোপুরি একটি অভিনব বাঙালী হিটলার ছিল এবং ন্যাপের মত আওয়ামী লীগকেও এন-ডি-এফ-এ ঢোকাতে গিয়ে নুরুল সাহাব একটা বিশ্রী ফ্যাসাদে পড়ল, কেন না ন্যাপের জন্ম হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সাপ-নেউলের লড়াই বাধিয়ে দিল। ঐ লড়াই আজও চলেছে এবং যতদিন না আমরা অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লা পার্টি, শোধনবাদী এবং নয়া শোধনবাদীদের সাথে আওয়ামী-দের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি, ততদিন এই রেষারেষি চলবেই। আমাদের সঙ্গে আওয়ামীদের শত্রুতার কারণ আমরা মূলত ভাসানীর ন্যাপ থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু আওয়ামীদের আমরা এই কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ভাসানীর ন্যাপ অপেক্ষা অনেক—অনেক বেশি মারাত্মক এবং যাবতীয় বুর্জোয়া কর্মসূচী ও লক্ষ্য পিছনে ফেলে রেখে আমরা মেহনতী মানুষের পাশাপাশি জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ছুটে চলেছি। তোমরা আওয়ামীরা এমনিতেই মরবে।

কাজেই দুটো দিন যদি বেশি বেঁচে যেতে চাও তা' হলে সাধ করে মাথাটা বাড়িয়ে দিও না। যাই হোক, নুরুলের ধারণা ছিল যে, তার এন-ডি-এফ-এ পাকিস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি মাথা মুড়িয়ে ঢুকবে এবং কালক্রমে ভাসানী ইত্যাদি নেতাদের সরিয়ে দিয়ে সে একা মধ্যাহ্নের সূর্যের মত পাক-রাজনীতিতে জ্বল জ্বল করবে। কিন্তু একদিকে ভাসানীর অনমনীয় মনোভাব, অপরদিকে আওয়ামী লীগ বনাম ন্যাপের রেষারেষি, এই উভয় সঙ্কটের মাঝখানে পড়ে তার প্রায় শিকে ফোঁকার অবস্থা হয়ে এল। এই অবস্থায় নুরুল আমিনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মামুদ আলী। একদিন এই মামুদ আলীর জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লাঞ্ছিত মানুষের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। যে ঘোরতর বিপদ মাথায় নিয়ে মামুদ আলী প্রথমে "ইয়োথ লীগ" ও পরে "গণতন্ত্রী দল" গঠন করেছিল তা পাকিস্তানের বৈপ্লবিক ইতিহাসের এক অমর অধ্যায় এবং তার সেইদিনের সেই অমূল্য অবদান আমরা আজও বিস্মৃত হই নি। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাও বলব যে, মামুদ একটি আদর্শ বুর্জোয়া রাজনীতি-ব্যবসায়ী। আগে না থাকলেও পরে সে ঠিক এইরকমই হয়েছে। বুর্জোয়া বা পাতি বুর্জোয়া হলেই যে জনগণের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করা যায় না তা' নয়। জন্ম একটা দুর্ঘটনা মাত্র। চেয়ার-ম্যান মাও ঠিকই বলেছেন যে, কোনও মানুষকে তার জন্ম বা শ্রেণী দিয়ে বিচার করলে চলবে না, তাকে বিচার করতে হবে তার চিন্তা দিয়ে, চেতনা দিয়ে এবং তার কাজ দিয়ে। মামুদ আলীর ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি খাটে। বুর্জোয়া স্বভাবজাত অ্যাডভেঞ্চারিজমের পিছনে ধাওয়া করে সে ন্যাপ পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু তারপরই শয়তান নুরুলের হাতে জানবুকের ফল খেয়ে তার চেতনা ফিরে এল। সে বুঝল, "তাই তো কেন বৃথা মেঠো রাজনীতি করি, আরও বড় নেতা বনার অনেক সহজ পথ তো পড়েই আছে এবং সে পথে সেথোর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়!" এই মামুদ আলীকে পটিয়ে নুরুল আমিন তেষট্টি সালের শেষাশেষি ভাসানীকে প্রায় হাত করে ফেলল। মামুদ ভাসানীকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, এন-ডি-এফ-এর প্রকৃত ক্ষমতা তাঁকেই দেওয়া হবে এবং তার পরিবর্তে তিনি ধীরে ধীরে বিভিন্ন দল ও এন-ডি-এফ-এর সমন্বয়ে "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি" তৈরি করবেন। আমাদের বরাত খুব ভালই ছিল বলতে হবে, কেন না ভাসানী সাহাব নুরুলের ফাঁদে পা বাড়াতে গিয়েও পিছু হটে এলেন। এন-ডি-এফ-এর কর্মসূচীর মধ্যে তিনি তাঁর ইচ্ছার কোনও প্রতিফলনই দেখতে পেলেন না। দ্বিতীয়ত শেখ মুজিবর রহমান, তাজউদ্দিন ইত্যাদি আওয়ামীওয়ালারা ইতিমধ্যে নুরুলকে তাদের নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে বড় কথা, এন-ডি-এফ-এর মধ্যে সাদা, কালো, লাল, নীল কোনও দলই বাদ ছিল না। চার পাশের নালা নর্দমার নোংরা জল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এটা একটা আন্তর্জাতিক এঁদো ডোবা হয়ে পড়েছিল। মৌলানা ভাসানী সরে আসায় নুরুলের বড় আশায় ছাই পড়ল ঠিকই, কিন্তু পুনরায় বর্ষণের ভরসায় সে ও তার একান্ত বিশ্বস্ত অনুচরেরা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, কর্দমাক্ত ডোবায় গা ডুবিয়ে ভেক-কীর্তন চালিয়ে যেতে লাগল।

'যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব' প্রসঙ্গে

৪ঠা জুলাই-এর সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ আকারে একটি প্রতিবাদ পড়লাম, যা আমার ৩০শে এপ্রিলের একটি পত্রের জবাবে লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধের জবাব হিসাবে আমি এই চিঠি লিখছি না। কেন না, যেভাবে বাদানুবাদ চলেছে, তাতে প্রতিবাদের সঙ্গে যে লেখার প্রতিবাদ সেই লেখাটা মিলিয়ে না দেখলে পাঠকের পক্ষে বোঝা মুস্কিল, কতটা উল্লিখিত পয়েন্টের জবাব হয়েছে, কতটা উল্লিখিত পয়েন্টের বাইরে অন্য পয়েন্ট তুলে আক্রমণ করা হয়েছে। অথচ প্রতিবাদের পাশে লেখাটা থাকে না। আর দুটি এর মধ্যে সময়ের ব্যবধানও এত বেশি যে, অধিকাংশের পক্ষে পয়েন্টগুলো মনে রাখাও সম্ভব নয়। বর্তমান প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পড়ে আমার মনে হল, আমার পত্রের মূল বক্তব্যটা প্রতিবাদকারকরা ধরতে পারেন নি। আমি বিভিন্ন দলের শ্রেণী-বিশ্লেষণ করি নি, আমি সংক্ষেপে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরেছিলাম যুক্তফ্রন্টের চরিত্র সম্বন্ধে ডিমিট্রভের বক্তব্যের দুটো দিক—একটা কমিউনিস্ট ও সোঃ ডেমোক্র্যাসির যুক্তফ্রন্টের বাস্তব ভিত্তি রচনা করার কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি, আর একটা সোঃ ডেমোক্র্যাসির মধ্যে ভাগ হওয়ার প্রকৃত অর্থ। কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব পালন করার সময় কোন্ ভুলটি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, সে সম্বন্ধে ডিমিট্রভের হুঁশিয়ারীর দিকে আমি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলাম। আমি উক্ত পত্রে প্রথমেই বলেছিলাম যে, বিশদ জবাব প্রবন্ধে ছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়, সংক্ষেপে কতকগুলো কথা জানাচ্ছি। বর্তমান প্রতিবাদ-প্রবন্ধে আমার এই সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট আকারের বক্তব্যে বিশদ ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমার রাজনীতি সম্বন্ধে কতকগুলো বিশেষণ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গত, কঃ পার্টির leading role আর under the leadership of Com Party—দুটো একার্থবোধক নয়। Leading role-এর অর্থ একটু ব্যাপক, প্রধান ভূমিকার অর্থে। Under the leadership of C. P. আরও সুনির্দিষ্ট অর্থে, যেটা একটা বিশেষ শ্রেণী-বিন্যাসের স্তরে এসে পড়ে। কঃ পার্টি একটাই হওয়া ইতিহাসসম্মত। কিন্তু তাই বলে কোনো অবস্থায় কোথাও কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাগ হয়ে গেলেই কোনো একটা বিশেষ পার্টিকে কঃ পার্টি বলা হবে, আর অন্যটিকে অ-কমিউনিস্ট বলা হবে—এটা ইতিহাসসম্মত নয়।

যাই হোক, এই পত্র আলোচনার জন্য নয়। নিকট ভবিষ্যতে একটা প্রবন্ধে যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত উপস্থাপিত প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল। বলা বাহুল্য, সে প্রবন্ধ আমি লিখব আলোচনারই জন্য, বাদানুবাদের জন্য নয়।

—তুষার চট্টোপাধ্যায়

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

'সমাজবিরোধীদের কবলে' শীর্ষক আপনার সুচিন্তিত সম্পাদকীয়টি (৯ই জুলাই) পড়লাম। সমাজবিরোধী দমনে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার যে চিত্র বর্তমান সম্পাদকীয়র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োচিত সন্দেহ নেই। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একস্থানে আপনি লিখেছেন,......"যুক্তফ্রন্টের আমলে সংবাদপত্রগুলি একযোগে তারস্বরে চীৎকার সুরু (?) করেছিল সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তায় পশ্চিমবঙ্গ গেল, গেল, গোল্লায় গেল। এখন ঐ সব সংবাদপত্র নীরব ও নিশ্চিন্ত।"...... যে-কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার এই মন্তব্যের সংগে একমত হবেন। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যুক্তফ্রন্টের আমলে যে-সব সংবাদপত্র (সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিকে এ থেকে বাদ দেওয়া যায় কি?) সমাজবিরোধীদের দৌরাত্ম্যে পশ্চিমবংগ 'গেল গেল' রব তুলেছিল, তাদের দলে কি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'ও যোগ দেয় নি? এ-ব্যাপারে কৃত্তিবাস ওঝার অনেক কীর্তি-কাহিনী কয়েক মাস পূর্বের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র যে-কোন সংখ্যা খুললেই কি দেখতে পাওয়া যাবে না? তা ছাড়া, "সাপ্তাহিক বসুমতী"র ২রা এপ্রিলের সেই সম্পাদকীয়ের ('রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘস্থায়ী হোক') কথা দেশবাসী এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারেন না। সুতরাং আপনার মুখে সংবাদপত্রের বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা বেমানান লাগে। যা হোক, এতদ্ সত্ত্বেও আপনাদের বর্তমান (জনমতের চাপে পরিবর্তিত) 'লাইন অফ্ অ্যাকশন' এবং "সমাজবিরোধীদের কবলে" শীর্ষক ৯ই জুলাইয়ের সম্পাদকীয়র জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

—অজিতকুমার দাস
৮।২।১৩, লালবিহারী বোস লেন,
হাওড়া—৬।

[illegible]

[২০৫ পৃষ্ঠার পর]

এবং হাওড়া-শিয়াখালা এই লাইন দুটি বোঝায়। এ ছাড়াও বিহারে অবস্থিত আরা-সাসারাম লাইট রেল, ফতুয়া-ইসলামপুর লাইট রেল এবং উত্তরপ্রদেশের সাহদরা-সাহারাণপুর লাইট রেল একই পরিচালন ব্যবস্থায় একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত। এই রেলপথগুলির যাত্রীসাধারণ এবং কর্মচারিবৃন্দ দীর্ঘকাল ধরে এগুলির জাতীয়করণ দাবি করে আসছেন। পশ্চিমবংগে অবস্থিত রেলপথ দুটি হুগলী ও হাওড়ার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের সংগে হাওড়া ও কলকাতার যোগাযোগ রক্ষায় জীবনরেখার মতই কাজ করছে। হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সামগ্রী এই রেলপথগুলির মারফত প্রত্যহ যাওয়া-আসা করছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ রেলপথগুলির উন্নতিসাধনে উদাসীন। মান্ধাতার আমলের রেলপথ, প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প গাড়ি, সময়ানুবর্তিতার অভাব, সব কিছু মিলিয়ে মার্টিন রেল যেন এক চরম অব্যবস্থার নিদর্শন। কর্তৃপক্ষের নীতি সুস্পষ্টভাবেই অ্যান্টি-পিপল, অ্যান্টি-প্যাসেঞ্জার। যতদিন এই রেলপথ দুটি লাভের কড়ি যুগিয়েছে মালিকপক্ষ তাতে ভাণ্ডার বোঝাই করেছেন, কিন্তু রেলপথগুলির উন্নতির কোন ব্যবস্থা করেন নি। সত্য বলতে কি, লাভের কড়ির হিসাব গুণতে গুণতে কর্তৃপক্ষ সমস্ত রেলপথকেই জীর্ণদশায় উপস্থিত করেছেন, আর আজ হুমকি দিচ্ছেন লোকসানের অজুহাতে রেলপথগুলি বন্ধ করে দেবার। এভাবে কর্তৃপক্ষ শুধু জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না, মার্টিন রেলের চার হাজার কর্মচারীকেও আতঙ্কিত করে তুলেছেন। এই রেলপথগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যও ক্ষমার অযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বহু পূর্বেই আরও বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত ছিল। রেল কর্তৃপক্ষকে মুনাফা লোটার অবারিত সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন এবং সেই সংগে রেলপথগুলিকে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে দেখেও তাঁদের কর্তব্যবোধ জাগে নি। জনসাধারণের কাছে যা অপরিহার্য তা রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই রেলপথগুলি মোটেই অলাভজনক নয়। বরং প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা করলে এবং ব্যক্তিগত মুনাফা শিকারীদের কুক্ষি থেকে বের করে নিলে এই রেলপথগুলি জনসাধারণ এবং সরকারের কাছে যথার্থই লাভজনক হয়ে উঠবে। আমরা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ঝাঁকিকিনি

দেশী নাম ঝরণা কলম। অবশ্য ঐ নামে কেউ তার উল্লেখ করে না। হুংকারবাহিত দিশী কলমের এ নামটাই কিন্তু বাস্তবিক সার্থক। কালি একেবারে পাগলা ঝোরার মতো সাদা কাগজের বুক ভাসিয়ে দেয়। অপটু খুনী-হাতে যেমন রক্ত, এ কলম হাতে নিলে তেমনি লেখকের পরিচয় আর গোপন থাকে না। এর মধ্যে আবার অধিকাংশের কালিই বিপথগামিনী। নিবের মুখে না-ঝরে ধারাস্রোতে চুপসে দেয় তর্জনী, মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ। কোনোটা আবার ক্রেতার টেবিলে শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরোনো মনিবের বিরহে শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। নির্বাক, বেবাক নির্বাক। সাত ঝাঁকানিতেও রা' কাড়ে না। তাদের অসহযোগই সব চেয়ে অসহ্য। বিরহিণীর ক্রোধদীপ্তে কোনোও উত্তেজিত মুহূর্তে আছড়ে ভাঙতে হয় এদের হাড়গোড়। এ যেন-সেই বিদ্রোহিনী রাজপুতানী। নবাব হারেমে জান দেবে, তবু শাহেন শা-এর হাতে মান খোয়াবে না। মানিনীর ত্যাঁদড়ামি ভাঙতে না পেরে শেষে অবসন্ন আমি এমন কয়েকটিকে একটা চটা-ওঠা কাণা-ভাঙা গ্লাওয়ার জলে চিরদিনের জন্য চালান করে দিয়েছি। পরিত্যক্তরা [illegible] শুকিয়ে মরছে। যে-দিনের [illegible] সেখানে [illegible] হয়েছে। [illegible]-ঠুকি করে মরছে। তবু আমার হাতে বাজেনি কেউ।

জানি, সস্তার তিন অবস্থা। দেশী মাল বেগড়বাঁই করেই। তবু পথে-ঘাটে ঝরণা কলম দেখলে না-থেমেও পারি না। দুঃখের বিষয় মনের মতোটি জুটছে না। ফলত কলম ডিস্‌পেপসিয়ার ভোগান্তি তিরিক্ষি মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। ক্রমেই রোগটা ক্রনিকে দাঁড়াচ্ছে। নতুন কলমের লোভ সামলাতেও পারি না, আবার যথার্থ হজমও হয় না। না ভোগে যায়, না ওগরায়।

সেদিন শিয়ালদার মোড়ে সাক্ষাৎ এক ধন্বন্তরীর সঙ্গে দৈবাৎ মোলাকাৎ হয়ে গেল। হোয়াট-নট ফুটপাথে স্যাণ্ডুইচড্ অবস্থা। তবু লোকটা নজর আকর্ষণ করল। ফুটপাথ থেকে সরে একটা সিমেণ্টের চাতালে দোকান পেতেছে। আধা অন্ধকারে কাঁচের বাক্স কোলের গোড়ায় নিয়ে নিরুত্তেজিতভাবে বসে আছে। খরিদ্দার আকর্ষণে আদৌ কোনো ব্যস্ততা নেই।

এই ব্যতিক্রমটুকুই আকর্ষণ করল আমায়। সামনের জলচৌকিতে বসে পড়ে বললাম : একটা কলম দিতে পারেন!

মধ্যবয়স্ক লোকটা আমাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করল। দুচোখে অবিশ্বাসী দৃষ্টি। সম্ভবত এমন [illegible] ক্রেতা-সে ইতিপূর্বে [illegible] মনে হল। বললে : একটা কেন, একগাদা দিতে পারি, যদি শেষ পর্যন্ত নেন।

মেজাজটা এমনিই বিগড়েছিল, এবার সেটা বিটকেল হয়ে উঠছে। ভেংচি কেটেই বললাম যেন : কেন শেষ পর্যন্ত কেউ আর নেয় না বুঝি?

: অনেকেই নাড়েন, ঘষেন, হাত বোলান। ব্যস, তার পর আর কেউ কাশেন না। ঐ পাশের দোকানগুলো, বড় বাতির আলোয় যেখানে জলসাঘর বসেছে, মাছির মতো সবাই ঐখানে গিয়ে জালে ধরা পড়েন।...লোকটা তার ময়লা দাঁত বার করে হাসল : যত চেকনাই, তত চোরাই। নয়ত পেন বেচে অমন পরিপাটি এসট্যাবলিশমেণ্ট চলে নাকি মশায়?

লোকটাকে সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য মনে না করার আর কোনও হেতু রইল না। বাস্তবিক হক কথা বলেছে। শুধু পেন বেচেই লটারী বিক্রেতার মতো লপচপানি চলছে কি করে, ব্যাপারটা যদি পুরো ভাঁওতাবাজিই না হয়। লোকটা মনের কথা টের পায় হয়ত। সোৎসাহে পুনশ্চ শুরু করল : বিজলী বাতির তলায় টয়লেট—টং-টং মেয়েমানুষ দেখে অনেকেই পকেটের রেস্ত নামিয়ে আসেন; কিন্তু কাছে গিয়ে মোড়ক খুলুন। ভানুমতীর খেল, বিলকুল ফক্কা। ঝুলঝুলে, জবজবে, ল্যাটপ্যাটে এ্যাকোটা লাস।...

তাড়াতাড়ি তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললাম : কলম আমার চাই। তবে ঠিক মনের মতোটি।

: তাই বলুন! তা আপনার বাসনাটি নিবেদন করুন।

ঢোক গিলে বললাম : মানে, দামে সস্তা।

কর গোণার মুদ্রা সাজিয়ে লোকটা আপন মনে আবৃত্তি করল : দামে সস্তা।

: হুঁ' আর বেশ মোটাসোটা, যাতে একবার ফিল করলে এক দিস্তে অক্ষর সাজানো যায়।

: মোটাসোটা। দিস্তে-পারানি।

: তার মানে?

: না। মানে, যে কলম দিস্তে পার করতে পারে।...লোকটা কড়ে আঙুলের তিন নম্বর দাগে বুড়ো আঙুল চেপে সিরিয়াসভাবেই উত্তর দিল।

আমারও তখন কেমন একটা নেশা ধরে গেছে। সোৎসাহে বললাম : ঠিক তাই। আর কোনো টিউব-ফিউব চলবে না।

: মাথা খারাপ, দিচ্ছে কে!... লোকটা তার সাঁড়াশির মতো আঙুলে আলতো করে একটা পেটমোটা মুক্ত-কাঠের সঙ্গে কলম [illegible] করল।

[পূর্বানুবৃত্ত]

অমূল্যকুমার বিশ্বাস কলকাতার একজন ইঞ্জিনীয়ার, একদিন এলেন শান্তিনিকেতনে ছেলেকে নিয়ে। ইচ্ছে ছেলেকে পাঠভবনে ভর্তি করবেন, কলকাতায় নাকি লেখাপড়া কিছু হচ্ছে না। জীবনে অনেক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই রকম একজন প্রতিভাশালী ও দক্ষ ব্যক্তি বড়ো একটা চোখে পড়ে নি। শান্তিনিকেতনে তখন ভয়ানক জলকষ্ট, মে মাসের প্রথম দিকেই কুয়োর জল খুবই কমে যায়, বিশ্বভারতীর সব বিভাগে তখন গ্রীষ্মাবকাশের ঘোষণা করে ছেলেমেয়েদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়। 'টিউবওয়েল' তৈরি করে জলাভাবের কষ্ট লাঘব করার জন্য দু'-একবার চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি; মাটির অনেক নিচে পাইপ নামিয়েও পর্যাপ্ত জলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। শুনেছি খুব নামজাদা এক সাহেব কোম্পানী গুরুদেবকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তাঁদের উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে গভীর নলকূপ খনন করে জলের সমস্যার নিশ্চিত সমাধান করে দেবেন, অন্যথায় তাঁরা এক পয়সাও নেবেন না। পাইপ কয়েকশো ফুট নিচে যাবার পর 'কাটার' (Cutter) এসে ঠেকলো কঠিন অভেদ্য এক পাথরের স্তরে, আর এগোনো হলো না তাঁদের। সেই অবস্থায় কিছু পাইপ ও সাজ-সরঞ্জাম ফেলে রেখে কোম্পানী তাঁর নামের মর্যাদা রক্ষা করতে বিফল হয়ে ঐ কাজ পরিত্যাগ করলেন। অমূল্যবাবু এই বিবরণ শুনে বললেন, এখানে জলের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ তাঁর পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞরা একটা ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। শান্তিনিকেতনের জমি অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু, আশে-পাশে বোলপুর, সুরুল, গোয়ালপাড়া। এসব জায়গা থেকে শান্তিনিকেতন বেশ খানিকটা উঁচু। তাই মনে হয় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটির নিচের জলবাহী স্তর তার স্বাভাবিক অবস্থিতি থেকে সরে গেছে। এক্ষেত্রে মনে হয় অনেক উপরে উঠে এসেছে। উত্তরায়ণে রথিবাবুর কাছে রক্ষিত শান্তিনিকেতনের আভ্যন্তরিক ভূস্তরের সমীক্ষা (Subsoil Survey) রিপোর্ট দেখে অমূল্যবাবু হঠাৎ খুব উদ্দীপ্ত হয়ে রথিবাবুকে বললেন—ইউরেকা, ৬০।৬৫ ফুট নিচেই এখানে জল পাওয়া যাবে, তার পরিষ্কার চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি। সাতদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে সরঞ্জাম এনে কাজ শুরু করব, দশ-পনের দিনের মধ্যেই আপনারা প্রচুর জল পাবেন। পর পর কয়েকবার বিফলতায় আস্থা হারিয়েছেন, তাই রথিবাবু ওঁর দিকে তাকিয়ে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। সেটা লক্ষ্য করে অমূল্যবাবু বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই হাসছেন, আবার কয়েকদিন পরে সাফল্যের হাসি হাসবেন, তারপরে অবিশ্বাস করেছেন বলে আরো একবার হাসতে হবে। এসেছিলাম ছেলে ভর্তি করাতে, এখন দেখছি নিজেকেই এখানে কাজে ভর্তি করে নিতে হবে। অমূল্যবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যেই মাত্র ৬৪ ফুট নিচে তিনি জলের উৎস খুঁজে বের করলেন, পাম্পের টানে প্রবল ধারায় পাইপ বেয়ে জল এসে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে ফেললো। উপস্থিত সবারই মুখে আনন্দের হাসি, শান্তিনিকেতনে জলাভাব এবার বুঝি ঘুচলো। রথিবাবু তো অমূল্যবাবুকে জড়িয়ে ধরে সেই জলধারার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর চোখের ভাষায় প্রকাশ পেল একটা পরম পরিতৃপ্তি। অমূল্যবাবু গুরুপল্লীর একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে থেকেই এই কাজ পরিচালনা করেছেন। বাড়ির গেটে একটা কাঠের ফলকে বড়ো বড়ো অক্ষরে তাঁর নাম লেখা ছিল "A. K. Biswas". কয়েকদিন পরে তাঁর চোখে পড়লো ঐ ফলকের গায়ে তাঁর নামের পরেই খড়ি দিয়ে কাঁচা হাতের বাংলায় লেখা একটি শব্দ "করিও না", সবটা একত্রে পড়লে দাঁড়ায় "A. K. Biswas করিও না"। (এ কে বিশ্বাস করিও না) লেখাটা দেখে তিনি মহা খুশি, শান্তিনিকেতনের

শুকানো ছাত্রের রসজ্ঞান দেখে, যদিও **লেখা**টার অর্থ তাঁর অখ্যাতিরই পরিচায়ক। **এই গল্প তিনি** এখানে প্রায় **সকলের কাছেই করেছেন**, এমন কি গুরুদেবের **কাছেও**। গুরুদেব ও'কে বলেছিলেন—রসের অমৃতটুকুই **তুমি** গ্রহণ করলে, এতে **তোমার** রসবোধ ও উদারতাই প্রকাশ পেলো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি রসিকতা নিজের সম্বন্ধে হলে অনেকেই **তা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন** না।

কথাটা খুবই সত্য। শান্তিনিকেতনের কর্মিমণ্ডলীতে একজন ছিলেন, তিনি প্রায় সবাইকে নিয়েই ব্যক্তিগত রসিকতা করতেন, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু রসিকতা করলেই বেশ গম্ভীর হয়ে যেতেন। কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ছিলেন বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন ও লোকশিক্ষা সংস্থার অধিকর্তা। তিনি ছিলেন উদার চরিত্রের, অমায়িক ও আদর্শবাদী। খুব নির্বিরোধী মানুষ, তাই ও'কে নিয়ে ঐ ভদ্রলোক অনেক রসিকতা করেছেন। একদিন কালীমোহনবাবু ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে কি একটা রসিকতা করায় তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন। এর পর কালীমোহনবাবুকে জব্দ করার জন্য তিনি ও'কে নিয়ে একটা নিচুস্তরের রসিকতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন **গ্রামোন্নয়নের কাজে, সাঁওতালদের যাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হয়**, তার **জন্য কালীমোহনবাবু** ওদের অনেক **উপদেশ দিতেন; ওরা যাতে মদ না খায়** সেজন্য **মদের কুফল** সম্বন্ধে ওদের নাকি তিনি সর্বদা সজাগ রাখতেন। একদিন **এক বৃদ্ধ** সাঁওতাল নাকি কালীমোহনবাবুর উপদেশ ও আবেদন শুনে বলেছিল — তুই তো আমাদের খালি বলিস মদ খাবি না, তোদের গুরুদেব যে গান লিখেছে 'মদের শান্তিনিকেতন' (অর্থাৎ মোদের শান্তিনিকেতন)।" শুনেছি রসিকতা **শুনেই কালীমোহনবাবু** ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্তিনিকেতন **ও গুরুদেবের নাম নিয়ে এ ধরনের মনোবৃত্তিকে কর্মিমণ্ডলীর** অনেকেই **নিন্দা করেন**।

এই **প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে** গেল—বাংলাদেশের একটা বিশেষ জেলার লোকদের রসিকতাবোধ সম্বন্ধে বিশেষ **অখ্যাতি আছে। মাঝে মাঝে তাঁরা** রসিকতা **যে না করেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে আর রক্ষা নেই! অধিকন্তু কোনো প্রশ্নও তাঁরা বরদাস্ত করেন না—যেমন, কাঁধে গামছা** নিয়ে তেল **মেখে পুকুরের দিকে যাচ্ছেন কেউ, তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় "স্নানে যাচ্ছেন নাকি?" সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে "দেখ না (দেখ না) কই যাই।" বাজার থেকে ইলিশ মাছ** হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন কেউ, **তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করেন "ইলিশ মাছ** কিনলেন বুঝি?" **সঙ্গে সঙ্গেই জবাব** "না, পুঁটিমাছ।" **বাঙালদের** নিয়ে রসিকতা পশ্চিমবঙ্গে তখনকার দিনে খুব প্রচলিত। 'পরশুরামের' লেখা চিকিৎসা-**সংকট** কিছুদিন আগে বের হয়েছে, **কবিরাজ** 'তারিণী স্যানের' কথাবার্তা **তখন** অনেকেরই মুখে মুখে, 'খুলুনের উকিল যতিনবাবুরে চেনো', 'বাম অয়?' 'না', 'অয়, Zানতি পার না', **ইত্যাদি**। **শৈলজারঞ্জন** দত্তমজুমদার **ছিলেন** তখন শান্তিনিকেতনে **রসায়নের অধ্যাপক, এদিকে** গান-বাজনায় **খুব দক্ষ ছিলেন** বলে **সঙ্গীতভবনের সঙ্গেও যুক্ত** ছিলেন। **ভদ্রলোক ভারি** রসিক। একদিন কয়েকজন মাঠে বসে নানা গল্প-গুজব করছি, কথায় কথায় পূর্ববঙ্গের ভাষা নিয়ে কেউ কেউ রসিকতা করলেন। শৈলজাবাবু বললেন—এক বাঙালের কলকাতায় ৭।৮ বছর থেকে **কলকাতার ভাষা** কন্ত করার **ফলে কী অবস্থা হয়েছিল সেই কথা শুনুন। "চন্দ্র**প্রকাশ দত্ত কলকাতায় থেকে **কণ্ট্রাক্টরী** করতেন, একদিন তাঁর বাল্যবন্ধু অসীম চন্দ দেশ থেকে এলেন তাঁর বাড়িতে। বহুদিন **পর দুই বন্ধুর** দেখা—অসীমবাবু এসেই চন্দ্রপ্রকাশবাবুকে বললেন, **"এই যে ছুন্দ্রুফ্রকাস্, এখন খচ্ খী** (এই যে চন্দ্রপ্রকাশ, এখন করছ কি)।" চন্দ্র**প্রকাশ বললেন**—"খন্টাক্‌টরী **খরছি, এখনও** লাইসন্সাস্ **হইতে** পারি নাই (**কন্ট্রাক্টরী করছি, এখনও লাইসেন্সিয়েট** (**Licentiate**) হতে পারি নি)।" অসীম **বললেন**—"তোমার **খথাবার্থা** বেশ **সাফা সাফা** বোধ অচ্চে (তোমার কথাবার্তা বেশ **পরিষ্কার** বলে মনে **হচ্ছে**)।" **চন্দ্রপ্রকাশ বললেন**, "তা অবে না, আজ আৎ বছর **খলখাতায় রইলুম খাশী, খাণ্চী, মথুরা**, ফশ্চিমবঙ্গের **এই সব শহরে থাখতে** থাখ্‌তে **আমার খতাবার্থা এখেবারে খল**খাতিয়া **দরনের অয়ে গেছে। আমার যাইন ফরিবার আমার খথা বুঝতে তারও রীতি**মতো **খষ্ট অয় (তা হবে না, আজ আট** বছর কলকাতায় রইলুম, কাশী, কাঞ্চী, মথুরা, **পশ্চিমবঙ্গের এইসব শহরে থাকতে** থাকতে আমার **কথাবার্তা একেবারে কলকাতার ধরনের হয়ে গেছে। আমার যিনি** পরিবার, আমার **কথা বুঝতে তারও** রীতিমতো কষ্ট হয়।)

আরো **একটা গল্প শৈলজাবাবু বল**লেন—**স্কুলের একজন শিক্ষক ছেলেদের** একটা কবিতা **পড়িয়ে বোঝাচ্ছেন—"খবি বলেছ্যান, আন্দারে ফথ চলুম কাম্বায়, আমি খইলাম অন্দার তো আর নাই, আতে আমার ফ্রদীপ রইছেন (কবি বলে**ছেন, **আঁধারে পথ চলব কী করে, আমি** বললাম আঁধার **তো আর নেই, হাতে আমার প্রদীপ রয়েছে।" শৈলজাবাবু হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলেন** তিনি নি **বাঙাল দেশের ময়মনসিংহ জেলার** লো**ক হয়ে এই রসিকতা করলেন**—তিনি বললে **যে, শ্বশুরবাড়ির দেশ সম্বন্ধে** রসিকতা **করা শাস্ত্রে** বিধান আছে, **এতে** কোনো দোষ **হয় না**। এভাবে অনেকেই অনেক রসিকতা করলেন, **সময়** বেশ কাটছিল তারপর সবাই মিলে ধরলেন ঐ 'বিশেষ জেলার' লোকের সম্বন্ধে কিছু বলতে, **অঞ্চলের** ভাষায় নাকি আমার কিছু দখল **আছে**। রাজী **হলাম**, তবে একটা শর্তে—**ঐ জেলায় বাড়ি** এক বন্ধু সেখানে **উপস্থিত** ছিলেন, পাশেই বসেছিলেন—তিনি **যদি** অভয় দেন যে, রসিকতা শুনে তিনি **মারধোর** করবেন না, তা হলেই বলতে **পারি**। তাঁর অভয় পেয়ে শুরু করলাম—ঐ জেলার বেশির ভাগ সঙ্গতি**পন্ন পরিবারের কর্তাব্যক্তিরা** বাইরে বাইরেই **কাজকর্ম করেন**, পরিবারের আর সবাই **থাকেন** গ্রামে-বাড়িতে। এ'দের প্রায় **প্রত্যেকের বাড়িতেই দুর্গাপুজো** হয়, তাই **বছরে অন্তত একবার সবাই** গ্রামে পদার্পণ করতেন, পুজোর যাবতীয় জিনিসপত্র মায় বলির পাঁঠাটি পর্যন্ত কিনে নৌকো বোঝাই করে। পাঁঠার স্বভাব হলো চ্যাঁচানো, তারপর নৌকায় বেঁধে আনা অবস্থায় জল দেখে সেই জীবগুলি তারস্বরে চ্যাঁচাতে শুরু করতো। ছেলেমেয়েরা পুজোর আগে বাবা বাড়ি আসছেন খবর পেয়ে খালের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো কখন তাদের বাবা আসেন। দূর থেকে নৌকোর মধ্যে পাঁঠার চীৎকার শুনেই তারা দৌড়ে গিয়ে তাদের মাকে খবর দিত, "মা, বাবা আসছেন।" কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই 'বিশেষ জেলার' বন্ধুটি তাঁর হাতের জ্বলন্ত সিগারেট বিদ্যুৎবেগে আমার বুকের উপর চেপে ধরে গর্জন করে উঠলেন, "আমরা সব পাড়া (পাঁঠা), এবার পাড়ার গুতা সামলাও।" উপস্থিত সবাই ও'র ব্যবহারে বিমূঢ় হয়ে রইলেন, অভয় দিয়ে তারপর এরূপ ব্যবহার তাঁর কাছে কেউ প্রত্যাশা করে নি। বন্ধুবর দুঃখিত হয়েছেন এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না, বললেন, "মারধোর করা তো দূরের কথা, গায়ে হাতও দিই নি, শুধু সিগারেটটা দূর থেকে চেপে ধরেছি, কথার খেলাপ তো করি নি।" সিগারেটের পোড়া ঘা শুকোতে প্রায় ২০।২৫ দিন লেগেছিল, কিন্তু তার দাগটা আজ ৩৫ বছরেও মিলিয়ে যায় নি। অরসিকে রস নিবেদন করতে গেলে অপঘাত ঘটা অসম্ভব নয়!

এই 'বিশেষ' জেলার লোকের সঙ্গে কাইজারের আমলের জার্মানীর কিছু লোকের শুনেছি অনেক মিল আছে। তাঁরা রসিকতা করেন না, কেউ করলে তা মোটে

একটা সহ্যও করেন না। একটা গল্প শুনেছি—প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করার পর ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে করমর্দন করেন, কেউ কেউ পরস্পরকে আলিঙ্গনও করেন। আলিঙ্গন-বদ্ধ অবস্থায় একজন ইংরেজ সৈনিক জার্মান সৈনিককে কি একটা রসিকতা করতেই আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সৈনিক তাকে 'বেয়নেট' দিয়ে ফুটো করে দিল। বরাত ভালো যে, আমার সহকর্মীর হাতে কোনো মারাত্মক অস্ত্র ছিল না, তাহলে হয়তো সেদিনই ভবলীলা সাঙ্গ হোত। উইল-হেলম কাইজার নাকি এর ব্যতিক্রম। শোনা যায়, মাঝে মাঝে দু'-একটি রসিকতা তিনি করতেন। তাঁর একটা প্রিয় রসিকতা ছিল—জার্মানীর এক বিত্তশালী অভিজাত পরিবারের কর্তা তাঁর বয়স্ক ছেলেকে ডেকে বললেন যে, পরিণত বয়স না হওয়া পর্যন্ত সে যেন মদ্যপান শুরু না করে, কখন কিভাবে মদ খাওয়া আরম্ভ করতে হবে সে বিষয়ে তিনিই তাকে দীক্ষা দেবেন। ছেলে পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য করে বিদায় নিল। কিছুদিন পর বিকেলে

বাপ ছেলেকে ডেকে নিয়ে বাগানে গিয়ে বসলেন। দুজনে দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসলেন, মাঝে একটা টেবিলের উপর মদের বোতল ও ছোটো ছোটো দুটি গ্লাস। বাপ দুটো গ্লাসে কিছু মদ ঢেলে ছেলের হাতে একটা তুলে দিয়ে আরেকটা নিলেন নিজে। বললেন, "এবার খেতে শুরু কর, প্রথমে অল্প পরিমাণ দিয়ে আরম্ভ করতে হয়, পরে ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়াতে পার, একবারে বেশি খেলে কিন্তু মাতাল হয়ে পড়বে।" এইভাবে বাপ-ব্যাটায় কিছুক্ষণ মদ্যপান করার পর ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো, "Father, how do I know I am drunk (বাবা, কী করে বুঝব আমি মাতাল হয়েছি)। বাপ সামনে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "Yonder you see a couple of trees, when you see they are quadrupled you know you are drunk (ঐ যে দুটি গাছ দেখতে পাচ্ছ, যখন দেখবে ওদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, তখনই বুঝবে তুমি মাতাল হয়েছ)।" ছেলে নির্বিকার চিত্তে বললো, "Father I see only one (বাবা, আমি তো মাত্র একটা গাছ দেখছি)।" আরো একটা রসিকতা কাইজারের নাকি খুব প্রিয় ছিল - জার্মানীর একজন সৈন্যাধিনায়ক যখন ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হয়ে সেনানীমণ্ডলীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন, তাঁর ইচ্ছে হলো তাঁর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পরিদর্শন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে জানালে তাঁরা এই মাননীয় অতিথিকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করার ব্যবস্থা করলেন। এই ফিল্ড মার্শালের একটা মুদ্রাদোষ ছিল, কিছু একটা দেখলেই বলতেন, "The same old." এমন কি বাপ, মা, ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা হলেও বলতেন, "The same old father, The same old mother, the same old brothers and sisters ইত্যাদি।" নির্ধারিত সময়ে ফিল্ড মার্শাল এলেন য়ুনিভার্সিটি পরিদর্শনে, যা-কিছু দেখেন পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়, আর বলেন, "The same old lecture theatre, The same old library, The same old laboratory. তারপর এলেন ছাত্রাবাসে, এসেই বললেন, "The same old hostel, The same old block where I put up." ধীরে ধীরে একটি ঘরের কাছে গিয়ে ঘরের নম্বর দেখেই মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, "The same old Room No. 13." দরজা বন্ধ, একটু 'নক্' করলেন, দু'-এক মিনিট পরে দরজা খুলে গেল, ভিতরে একটি যুবক। ফিল্ড মার্শাল য়ুনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ার-টেবিল দেখিয়ে বললেন, "The same old chair, The same old table." তারপর দেয়াল-আলমারীর হাতল ধরে "The same old Almirah" বলে তার পাটটা টেনে খুলেই দু' পা পিছিয়ে এলেন—দেখা গেল আলমারীর মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে আছে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে। মেয়েটিকে এ অবস্থায় দেখে ফিল্ড মার্শাল আরো একটু পিছিয়ে আসতেই ছেলেটি বলে উঠলো, "My Cousin, Sir!" মুচকি হেসে ফিল্ড-মার্শাল বললেন, "The same old story." এই ব্যাপার দেখে য়ুনিভারসিটির রেক্টর একেবারে অগ্নিমূর্তি; কঠিন কণ্ঠে ছেলেটিকে বললেন যে, সে জানে ছেলেদের হস্টেলে মেয়েদের নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এই নিয়মভঙ্গ করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। জেনে-শুনে সে এই অপরাধ করেছে, তাই তিনি তাকে য়ুনিভারসিটি থেকে বহিষ্কৃত করলেন। শুনেই ফিল্ড মার্শাল বলে উঠলেন, "The same old punishment".

উচ্চারণ নিয়ে অনেক পরিহাসের কথা শোনা যায়। এক বাঙাল অধ্যাপকের একবার ভারি ইচ্ছে হলো গুরুদেবের লেখা নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। নিজের কথা নিজে বলতে সংকোচ, তাই শরণাপন্ন হলেন আর একজনের—যাতে তিনি তাঁর স্বপক্ষে গুরুদেবের কাছে আর্জি পেশ করেন। গুরুদেব শুনেই চমকে উঠলেন, তারপর বললেন—ঠিক আছে, তবে ছোটো একটা পার্ট ওকে দেবার চেষ্টা করব, অবশ্য যদি রিহার্শেলে উৎরে যায়। পার্টের শুরু হলো "আকাশে ঘন মেঘ......", রিহার্শেল আরম্ভ হলো, ঐ ভদ্রলোকের ডাক পড়লো, তিনি এসেই বললেন, "আখাশে গন ম্যাগ..."। এটুকু বলতেই গুরুদেব হাত তুলে বললেন, "ওরে থাম থাম, ওসব ম্যাগ্‌টাগ্‌ চলবে না। দাঁড়া, মেঘ শব্দটা বদলে 'কুয়াশা না হয় করে দিচ্ছি"। এবার বল্‌তো দেখি। ভদ্রলোক এবার সগর্ব পদক্ষেপে এগিয়ে এসে বেশ একটু feeling যোগ করে বললেন, "আখাশে গন খোয়াসা"। গুরুদেব প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন, "অচল, অচল"।

শান্তিনিকেতনে 'বাঙাল সভার' আয়োজন করেছিলেন কয়েকজন অত্যুৎসাহী অধ্যাপক ও কর্মী। অনেকে অনেক গল্প বললেন, সব বিবৃত করা সম্ভব নয়, দু-একটি নমুনা তুলে দিলাম—

(১) ঢাকায় এক ভদ্রলোক বাজারে গিয়ে এক মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছেন মাছ তাজা কিনা, সঙ্গে সঙ্গে মাছওয়ালা একটা মাছ হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের কাছে এনে মাছটাকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, "কঃ, কঃ, বাবুর সঙ্গে কথা কঃ ("কও, বাবুর সঙ্গে কথা কও")।

(২) ঢাকা স্টেশনের কাছে অনেক ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি থাকে। ট্রেন থেকে যাত্রী নামলেই গাড়োয়ানের দল এক সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে থাকে "আহেন আহেন মহারাজ, পংখীরাজ গোড়া আমার উড়াইয়া লইয়া যাইব (আসুন মহারাজ পক্ষীরাজ ঘোড়া আমার একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে)"। একদিন এক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে বললেন, গেন্ডারীয়া যাবেন, এক গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাড়া কত; গাড়োয়ান বললো, "তিন মাইল রাস্তা, আট আনা লাগব"। ভদ্রলোক বললেন, "দু' আনা"। সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান ছুটে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরে বললো, "চুপ, চুপ, গোড়ায় হুনবো (চুপ ঘোড়া শুনবে!)", অর্থাৎ এই অসম্ভব প্রস্তাব ঘোড়ার কানে গেলে সে গাড়ি টানতেই রাজী হবে না।

(৩) ঢাকায় এক দশাসই চেহারার ভদ্রলোক ৩½ গজ কাপড় কিনে এক দর্জির কাছে গিয়ে বললেন, ঐ কাপড় দিয়ে তিনি পাঞ্জাবী তৈরি করাতে চান। দর্জি যখন তাঁর গায়ের মাপ নিচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কাপড় দিয়ে দুটো পাঞ্জাবী হয় কি না। দর্জি নির্বিকার চিত্তে বললো, "অয় (হয়)"। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনটা পাঞ্জাবী হয় কিনা। দর্জি অম্লান বদনে জবাব দিল, "তা বি অয় (তাও হয়)"। ভদ্রলোক মহাখুশি হয়ে তিনটা পাঞ্জাবীর অর্ডার দিয়ে আর কোন্ তারিখে পাওয়া যাবে তা জেনে নিয়ে চলে গেলেন। নির্ধারিত দিনে পাঞ্জাবী আনতে গেলে দর্জি ছোটো ছোটো তিনটা পাঞ্জাবী এনে হাজির করলো, দেখেই তো ভদ্রলোকের চক্ষু স্থির। ক্ষেপে গিয়ে বললেন, "ইয়ার্কি পেয়েছ, এতো ছোটো পাঞ্জাবী গায়ে লাগবে কী করে?" দর্জি অবিচলিত, বললো, "হোনো মিঞা, গতরটা তো করছ মইষের মতোন, কাপড় কিনছ মোটে হাড়ে তিন গজ, ফরমাইস দিলা তিনটা পাঞ্জাবী বানাইবার। আবার কও গায়ে লাগব কী কইর‍্যা, লজ্জা করে না এই কথা কইতে। যাও, বাড়ি গিয়া দরজার ভিতরে ঝুলাইয়া রাখ, আইতে যাইতে গায় লাগব অখন (শোনো বাবু, দেহখানা তো করেছ মোষের মতো, কাপড় কিনেছ মাত্র সাড়ে তিন গজ, আর অর্ডার দিলে তিনটে পাঞ্জাবী তৈরি করার। আবার বলছ গায়ে লাগবে কী করে, লজ্জা করে না এই কথা বলতে। যাও, বাড়ি গিয়ে দরজার ভিতর ঝুলিয়ে রাখ, আসতে-যেতে গায়ে লাগবে এখন।)

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

লড্ওয়ার শিবিরে আমি আমার বন্দী জীবনের সব থেকে ভাল সংগঠন তৈরি করতে পেরেছিলাম। রবিনসন মোয়ানগি শিবিরের দলপতি নির্বাচিত হয় এবং জোসেফ কিবিরা হয় কার্য-নির্বাহক সমিতির সভাপতি। প্রত্যেক কুঁড়েঘর থেকে আমরা একজন করে দলপতি নির্বাচন করেছিলাম, তারা সবাই জোসেফের সভাপতিত্বে সমিতির সদস্যরূপে কাজ করতো। এই সমিতিতে আমার কাজ ছিল শিক্ষাদীক্ষা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সাহায্য করা। আমাদের অধিবেশন হ'ত সাধারণত সপ্তাহে একবার করে, যদিচ বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন সময়ই কর্মাধ্যক্ষকে এবং দলপতিকে তলব দিয়ে অসাধারণ অধিবেশনও চালু করা যেত। মাইনা মুহিকি আমাদের কর্মাধ্যক্ষের কাজ খুব নিষ্ঠাভরে পালন করতো, সে এখন নাইরোবিতে এক আন্তর্জাতিক নির্মাণ সংস্থার সম্পাদক। আমাদের সমস্ত অধিবেশনের লিখিত কার্যবিবরণী রাখা হ'ত এবং লড্ওয়ার ছেড়ে চলে আসার সময় [illegible] নষ্ট করে ফেলা হয়। শিবিরের দলপতি হিসেবে রবিনসন [illegible] কার্যনির্বাহক এবং কেউই কখনো তার কার্যধারার বিরুদ্ধে কিছু বলে নি। কিয়ানাবু অঞ্চলের জন্ গিয়াথি রবিনসনের সহায়কের কাজ করতো, সে এখন ইস্ট আফ্রিকান ব্রুয়ারীর সংস্থায় বেশ ভাল কাজ করে। আমি নিরক্ষর বন্দীদের লেখাপড়া শেখান এবং নালিশপত্র চিঠি ইত্যাদি লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। প্রত্যেক কুঁড়েঘর থেকে একজনকে পাচক হিসেবে কাজ করতে হ'ত এবং এই কাজের কতকগুলি বিশেষ সুবিধাদি থাকার জন্য পাচক পেতে আমাদের কোন অসুবিধাই হ'ত না; অবশ্য আমরা সব সময় একজন যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে এই কাজে বহাল করতে চেষ্টা করতাম। আমাদের অর্থাৎ ১৩ নম্বর ঘর থেকে ওয়ামবুগু ওয়াচিরা পাচকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল এবং কোনদিনই সে আমাদের নির্বাচন ক্ষমতাকে সন্দেহ করবার অবকাশ দেয় নি।

লড্ওয়ার বন্দিশিবিরে কেনিয়া সরকারের সমাজ উন্নয়ন সচিবালয় একটি পুস্তকাগারের বন্দোবস্ত করেছিলেন, [illegible] সেখানে কোন বই-এমন পাবার আগে [illegible] বিবর্জিত হত [illegible] কার্যাবলীর [illegible] এবং রাজনীতি সংক্রান্ত একটি বইও [illegible] [illegible] [illegible] হোক, [illegible] [illegible] এই বোধে যে সমস্ত বই আমরা পেতাম তাই [illegible] পড়তাম, এবং একটি ইতিহাসের বইতে ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে অনেক আলোচনা ও তার বিরুদ্ধে প্রচারকদের বিবরণও পড়েছিলাম। পুস্তকগুলো আমাদের ঘরে রাখা হত এবং ওয়াচিরা কারিগা, যে আমাদের গ্রন্থাগারিকের কাজ করতো, বিভিন্ন বন্দীদের জন্য তাদের উপযুক্ত বই বাছাই করতে সাহায্য করতো। রাজনীতি সম্পর্কিত বই না থাকায় বিশেষ করে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, কিন্তু এই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে, সব বন্দীরাই তো আর আজীবন ধরে রাজনীতি করবে না, [illegible] ওদের এসব বই এখন না পড়লেও চলবে।

আমরা লড্ওয়ারে বন্দীদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য প্রথম থেকে নবম শ্রেণী অবধি [illegible] বন্দোবস্ত করেছিলাম, যাতে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তিও কিছু লেখাপড়া শিখতে পারার সুযোগ পায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়াবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষকের অভাববোধে আমরা ঠিক করেছিলাম যে, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা পালা করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াবে, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াবে। আমি সর্বোচ্চ দুইটি অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে পড়াতাম। আমাদের প্রায় সব ছাত্ররাই খুব ভালভাবে পড়াশুনা করতো এবং বর্তমানে আমাদের অনেক "ছাত্র"ই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষাদান করছেন। এই সূত্রে [illegible] ওয়াচুকু [illegible] এক সত্তর বছরের বৃদ্ধের লেখাপড়া শেখার অদম্য স্পৃহা আমার এখনো মনে পড়ে, সে রোজ প্রথম শ্রেণীর ক্লাসে এসে বসতো শিখতে এবং পড়তে শেখার জন্য, এবং তার অধ্যবসায়ের ফলে কিছুদিনের ভেতরই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। মাঝে মাঝে [illegible] আমরা সবাই [illegible] কাছে [illegible] যেতাম এবং সেখানে মুখে মুখে আমাদের কেনিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার ইতিহাস বলতো। তার কাছ থেকে আমরা ইউরোপীয়দের এদেশে আগমন এবং তারপর তারা কিভাবে আমাদের উপর রাজত্ব করতে আরম্ভ করে, কি কি ভুল করে, এসব বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। লড্ওয়ারে থাকাকালীন [illegible] কয়েকজন বন্দিজীবনে প্রথম আমাদের ক্লাসে যোগ দিয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং তাদের অনেকেই এখনো নিয়মিতভাবে স্কুল কলেজে যাচ্ছে। [illegible] বলা যেতে পারে [illegible], লড্ওয়ারে অনুষ্ঠিত আমাদের এই [illegible] পূর্ব আফ্রিকার সর্বপ্রথম [illegible] বেতনে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা।

বন্দীশিবিরের পরিচালক সমিতি আমাদের আচার-ব্যবহারের মান নির্দেশ করার জন্য নিম্নলিখিত নিয়মাবলীর প্রবর্তন করে, এবং সরকারী নির্দেশের থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে সেগুলি আমাদের ওপর বলবতী ছিল।

(১) কোন বন্দীই কখনো অন্য কোন বন্দীর সঙ্গে শিবিরের ভেতরে বা বাইরে মারামারি ঝগড়াঝাঁটি করবে না।

(২) কোন বন্দীই কাছাকাছি গ্রামের তরুণী নারীদের বা শিবিরের কর্মচারীদের স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সহবাস করবে না।

(৩) কোন বন্দীই অন্য কাউকে ভয় দেখাবে না বা ঘৃণা করবে না বা অন্য কোনরকমে জোর-জুলুম করবে না।

(৪) কোন বন্দীই শিবিরের ভেতর যেখানে-সেখানে থুথু ফেলবে না বা প্রস্রাব করবে না বা অন্য কোন রকমে শিবিরকে ময়লা করবে না।

(৫) কোন বন্দীই শিবিরের ভেতরে বা বাইরে কখনো গাঁজা-ভাঙ খাবে না বা মদ্যপান করবে না।

(৬) কোন বন্দীই অন্য কোন বন্দী বা কর্মচারীদের কোন জিনিস চুরি করবে না বা পাঠাগারের কোন বই চিরকালের জন্য নিজের কাছে রেখে দেবে না।

(৭) কোন বন্দীই তার তাঁবু থেকে ময়লার বালতি পরিষ্কার করার জন্য দেওয়া দলপতির নির্দেশ অমান্য করবে না—তা সে রবিবারই হউক বা অন্য কোন ছুটির দিনই হউক না কেন।

(৮) কোন বন্দীই নিজের ইচ্ছামত কোন হাল্কা কাজ বেছে নিতে পারবে না। কে কি কাজ করবে তা সর্বসম্মতিক্রমেই ঠিক করা হবে।

(৯) আর সবাই যখন কাজ করছে সে সময় কোন বন্দীই কাজে ফাঁকি দেবে না।

(১০) কেউই শিবিরের কর্মকর্তার সঙ্গে বা বাইরে থেকে আগত কোন পরিদর্শকের সঙ্গে অযথা কটু কথা কইবে না বা দুর্ব্যবহার করবে না। এই-রকম আচরণ করার কোন সঙ্গত কারণ থাকলেও এ বিষয়ে প্রথমে দলপতির নির্দেশ গ্রহণ করবে।

(১১) কেউই কারুর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলবে না।

(১২) কেউই খাবার নেবার সময় তার আগের লোককে ছলে-বলে-কৌশলে ডিঙিয়ে যাবে না।

উপরোক্ত নিয়মাবলী সমস্ত বন্দীদের একত্রিত করে একটি সাধারণ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। কেউ এর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে পর শিবিরের বিচারালয়ে তার যথারীতি বিচার করা হ'ত এবং দোষীর সাজা নির্ণয় হ'ত। বিচারকের কাজ করতেন কিয়ামবু অঞ্চলের ওয়াকামোরে নামক এক বন্দী এবং তাঁকে সাহায্য করতেন পাঁচজন বয়োবৃদ্ধ নিয়ে গঠিত এক নির্ণায়ক সভা। এই পাঁচজনের চারজনকে মধ্য-প্রদেশের (central province) চারটি জেলার মুখপাত্র হিসেবে নেওয়া হয়েছিল এবং পঞ্চম জন ছিলেন নায়্যাঞ্জা প্রদেশের লোক। আমাদের লড্ওয়ার বন্দিজীবনের সমাজে ফৌজদারী মকদ্দমার সরকারী উকিল ছিলেন পল মুচেমি, এর বাবা জন কুনিহা নেয়েরী অঞ্চলের সরকারী ডিভিশনাল বিচারালয়ের সভাপতি ছিলেন। পলের ফৌজদারী মামলা চালাবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত এবং তার পরিচালিত কোন কেস্ই আমাদের বিচারালয়ে ফেঁসে গিয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। কার্যনির্বাহক সমিতি শিবিরের আরক্ষাবাহিনীর কাজ নুগুরু নডিরাংগুকে দেয়, তার প্রধান কাজ ছিল সকলকার উপর নজর রাখা এবং বন্দীদের সব অসদাচরণ দলপতির নজরে আনা। নুগুরু নির্ভীকভাবে এবং সমতার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করেছিল; সে এখন তার গ্রামে চাষবাসের কাজ করে এবং স্থানীয় কে. এ. ন্যা. ইউর সে দলপতি। আমাদের নিয়মাবলী এবং বিচার-পদ্ধতির উপর সকলেরই আস্থা ছিল এবং সবাই মোটামুটিভাবে এর নির্দেশ মতো চলতো। বিচারালয়ের দেয় সাজা সঙ্গে সঙ্গেই দোষীর উপর আরোপ করা হ'ত, যদিচ এর বিরুদ্ধে আপীল করবার অধিকার ছিল সকলকারই। আপীল শোনবার জন্য অন্য পাঁচজন বয়োবৃদ্ধকে নিয়ে আর একটি সভা গঠিত হয়; এতে এম্বু, ফোর্ট হল, কিয়াম্বু এবং নেয়েরী অঞ্চল থেকে চারজন এবং নায়্যাঞ্জা প্রদেশ থেকে একজন কাজ করতেন। খুব কম সংখ্যক বিচারের বিরুদ্ধেই আপীল করত দোষীরা। বিচারালয়ের অধিবেশন সাধারণত বিকেলবেলা কোন একটি কুঁড়েঘরে বসতো। যে কোন বন্দীই এর অধিবেশনে যোগ দিতে পারতো, কিন্তু কুঁড়েঘরগুলিতে স্থানাভাবের ফলে এবং সাধারণত সবাই সে সময় কাজে ব্যস্ত থাকায় খুব কম সংখ্যক বন্দীই সেখানে দর্শক হিসেবে আসতো। প্রত্যেক নিয়মের বিরুদ্ধা-চরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম সর্বাধিক সাজা দেওয়া হ'ত, যার ফিরিস্তি নিচে দেওয়া গেল :

১ ও ২ নম্বর নিয়মঃ কুঁড়েঘর-গুলির জলের চৌবাচ্চা ভর্তি করার জন্য বত্রিশ বালতি জল তোলা বা সমাজচ্যুত হওয়া। (লড্ওয়ারে কেবলমাত্র একবারই এম্বু অঞ্চলের এক যুবককে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল, সে একজন জেলরক্ষকের প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমালাপ চালিয়েছিল বলে)।

৩ নম্বর নিয়ম : দুদিনের জন্য রান্না-ঘরের জলের চৌবাচ্চা ভর্তি করা (খুবই কঠিন সাজা)।

৪ ও ৭ নম্বর নিয়ম : চারদিনের জন্য পায়খানার বালতি খালি করা ও পরিষ্কার করা।

৫ ও ৬ নম্বর নিয়ম : ছাব্বিশ বালতি জল ভরা।

৮ নম্বর নিয়ম : আটাশ বালতি জল ভরা এবং হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে একটি কুঁড়েঘরকে আটবার প্রদক্ষিণ করা (খুবই কষ্টজনক কাজ)।

৯ নম্বর নিয়ম : হাঁটুর ভরে দশবার কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করা ও তৎক্ষণাৎ অন্য কাজ আরম্ভ করা। শরীর খারাপের দোহাইতে শুধুমাত্র বিচারালয় বিশেষ অনুমতি দিলে তবেই তৎক্ষণাৎ কাজ আরম্ভ করা থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

১০ নম্বর নিয়ম : হাঁটুর ভরে দশ-বার কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করা ও আটাশ বালতি জল তোলা বা সমাজচ্যুত হওয়া।

১১ নম্বর নিয়ম : বারো বালতি জল তোলা এবং আটবার হাঁটুর ভরে কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করা।

১২ নম্বর নিয়ম : রান্নাঘরের অধি-নায়ক নিজেই এর সাজা দিতেন যে অন্য সমস্ত বন্দীর খাওয়া শেষ হওয়া অবধি দোষীকে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিচারালয়ের এক বিশেষ অধিবেশনের ফলে এই সাজার বদলে চোদ্দ বালতি জল তোলা ও দশবার হাঁটুর ভরে কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করার সাজাও দেওয়া চলতো। রান্নাঘরের অধিনায়ক শিবির পরিচালক সমিতির দ্বারা নির্বাচিত হতেন; তিনি এই সমিতির সভ্য না হলেও বিশেষ বিশেষ কারণে তাঁকে কখনো কখনো এর অধি-বেশনে যোগদান করতে বলা হ'ত।

পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে, বত্রিশ বালতি জল তোলা কিছু এমন কঠিন সাজা নয়। এ কাজের জন্য নির্ধারিত সময় ছিল শুধুমাত্র বিকেল চারটে থেকে ছটা, কারণ চারটের পর রৌদ্রের তাপ কিছুটা সহ্য করা যেত। জলের ট্যাঙ্ক ছিল শিবির থেকে প্রায় চারশো গজ দূরে, তাতে নিকটস্থ টার্কওয়েল নদী থেকে পাইপ করে জল আসতো।

[illegible] জলের জন্য ছিল খুবই অল্প এবং দু'ঘণ্টার ভেতর চার বালতি জলও সেখান থেকে ভরে আনতে পারলে "দোষী" নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো। একদিন আমি এক খুব করুণ দৃশ্য দেখেছিলাম ঐ ট্যাঙ্কের কাছে। এক বেচারা "দোষী" বহু কষ্টে দুই বালতি জল ভরবার পর পা পিছলে পড়ে গিয়ে এক বালতি জল উল্টে ফেলে, এবং সেটা বাঁচাতে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অন্যটির ওপর ও ফলে তারও সব জল মাটিতে পড়ে যায়। বেচারার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হয়েছিল সেদিন। জলভরা বালতি যথাস্থানে এনে পৌঁছে দিলে তবেই তা গোণা হ'ত, মাঝপথে নষ্ট হয়ে গেলে তার কোন দামই পেত না "দোষী"রা।

দোষীদের সাজা প্রত্যেক কুঁড়েঘরেই সন্ধ্যেবেলায় প্রচার করা হ'ত, এবং সেই সঙ্গে সবাই এও জানতে পারতো যে, কে কিজন্য কতটা সাজা পেয়েছে। পারত-পক্ষে খুব বেশি কেস আসতো না আমাদের বিচারালয়ে, কারণ সাধারণত সব বন্দীই আমাদের নিয়মকানুনগুলি মেনে চলতো।

সরকারী প্রচারে অনেকবার বলা হয়েছে যে, শিবিরের ভেতরও মাউ-মাউ বন্দীরা শয়তানের পূজো করতো, এবং জনসাধারণের, বিশেষ করে কারাগারের কর্মচারীদের এর দ্বারা অনিষ্ট করবার চেষ্টা করতো। এ বিষয়ে সবাইকে যথাযথ ওয়াকিবহাল করা প্রয়োজন, এবং যেহেতু লড্‌ওয়ারে থাকাকালীন আমি প্রত্যহ সকালে কুঁড়েঘরে প্রার্থনার সময় আচার্যের কাজ করতাম, সেহেতু এর বিশদ বর্ণনা আমি দিতে সক্ষম। সাধারণত আমরা সবাই বসে বসে প্রার্থনা করতাম, যদিচ বিশেষ বিশেষ দিনে (যেমন ২০শে অক্টোবর, যেদিন জোমো কেনিয়াট্টাকে কেনিয়ার ব্রিটিশ সরকার আটক করেন বা যখন কোন রাজনৈতিক নেতার বিচার চালু থাকতো সরকারী বিচারালয়ে) আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতাম। বন্দীদের ভেতর শুধু কিছু সংখ্যক লোকই খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল, কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করতাম। আমরা মাউন্ট কেনিয়া পাহাড়ের চূড়ার দিকে মুখ করে নিজেদের হাতের তালুতে থুতু ফেলতাম। (আমাদের সামাজিক নিয়মাবলীর মতে কাউকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা দেখাতে হলে আমরা এভাবে নিজেদের হাতে থুতু ফেলি।) তার পর আমরা দু'হাত একসঙ্গে খোলা অবস্থায় মাথার উপর তুলে ধরতাম এবং আমাদের প্রার্থনা পরিচালক বলতেন :

১। হে ভগবান, সকল মানুষের সৃষ্টি ও
বিনষ্টকরণের কর্তা;
হে ভগবান, আমাদের এই
আফ্রিকার সৃষ্টিকর্তা;
আমরা যারা তোমার কাছে অপরাধ
করেছি তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করি
ও প্রার্থনা করি যে,
তুমি আমাদের এই বিনম্র
আবেদন শুনবে :
আমরা যখন এই নিষ্ঠুর রৌদ্রতাপে
পুড়ে ঝলসে মরছি,
যাদের তুমি এই সুন্দর
কিরিনয়্যাগার (মাউন্ট কেনিয়া)
জমি দান করেছ,
যে জমি এখন সাদা মানুষেরা
এসে জোরদখল করেছে
ও আমাদের উপর অত্যাচার করছে।

২। হে ভগবান, তোমার কাছে আমরা
প্রার্থনা করি যে,
যে জমি তুমি আমাদের দিয়েছ
তা যেন কোন বিদেশী
ভোগ না করতে পারে;
তোমার শক্তির উপর আমরা পুরো
আস্থা রাখি যে
তুমি কখনোই এমন হতে দেবে না।
তুমিই তো সাদা লোকেদের
ইউরোপের বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ
দিয়েছ ভোগ করার জন্য,
এবং আমাদের আলাদা আলাদা
রাখবার জন্যই তুমি
আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে এক
বিরাট সমুদ্রের সৃষ্টি করেছ;
আমরা তো তাদের জমির উপর
নজর দিই না,
তেমনি তুমি আমাদেরও ক্ষমতা দাও
যাতে আমরা নির্বিচারে
নিজেদের জমি ভোগদখল
করতে পারি।

৩। হে ভগবান, তুমি আমাদের নেতা,
কেনিয়াট্টা ও আরও সবাইকে
সাহায্য করো,
যারা আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল
থেকে মুক্ত করার জন্য
চেষ্টা করছে, উত্তরে ও দক্ষিণে,
পূর্বে ও পশ্চিমে।
হে ভগবান, যারা আহত হয়ে
জঙ্গলে লুকিয়ে আছে বা
হাসপাতালে পড়ে আছে,
তাদের তুমি নিরাময় করে দাও,
আর যারা ওষুধপত্রের অভাবে ভুগছে
তাদের তুমি সাহায্য করো,
যারা বিধবা বা যারা নিঃসম্বল,
তাদের সবাইকে তুমি সাহায্য করো।

৪। হে ভগবান এই দেশের বুক চিরে
বয়ে যাওয়া রক্তাক্ত নদীর
তুমি শেষ করো,
এবং পুনর্বার এখানে তুমি শান্তির
প্রলেপ দিয়ে দাও।
হে ভগবান, আমরা যেন সর্বদা
তোমার উপর ভরসা করতে পারি
এবং তোমায় স্মরণ করি,
তুমি আমাদের সবাইকে এক
আত্মাসম করে দাও,
যাতে আমরা সবাই পৃথিবীর সব
লোকদের কাছে একজোটে
কথা বলতে পারি,
আর আমাদের সমাজাত্মার ভেতরের
এই দারুণ ক্ষত
তুমি নিরাময় করে দাও।

৫। হে ভগবান, তুমি আমাদের সব
শত্রুদের মন ভাল করে দাও,
যাতে তারা আমাদের স্বজন
হতে পারে,
এবং সম্পূর্ণ আফ্রিকাকে আবার
স্বাধীন করে দাও,
যাতে আমরা পরাধীনতার জ্বালা
ভুলতে পারি।

৬। হে ভগবান, আমরা তোমাকে
এ সবের জন্য জোরজুলুম
করছি না,
শুধু এজন্য তোমার কাছে
প্রার্থনা করছি,
তুমি সর্বশক্তিমান, মহান, ক্ষমাময়,
তুমিই চিরকাল আছ
এবং থাকবে,
তোমার কাছে আমরা আমাদের
পূর্বপুরুষের নামে প্রার্থনা করছি,
গিকুয়ু ও মুম্বি, যাদের তুমিই এই
কিরিনয়্যাগার জমিতে
এনে বসিয়েছিলে,
এই উর্বর জমি ভোগদখল
করার জন্য।
আমরা তোমার উপর বিশ্বাস ও
ভরসা করি,
তুমি সর্বশক্তিমান, মহান, ক্ষমাময়,
তোমার জয় হউক,
তোমার জয় হউক,
তোমার জয় হউক।

লড্‌ওয়ারে থাকাকালীন আমরা জন খাটার সময় সেখানকার হাসপাতাল তৈরির জন্য পাথর ভাঙতাম, আর কিছু সংখ্যক বন্দী জলবিভাগের লোকেদের জন্য নিকটবর্তী জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতো; তাঁরা সেখানে জলের খোঁজ করছিলেন। যদিচ আমাদের সে সময় এই পাথর ভাঙার কাজ খুবই কষ্টকর ও পরিশ্রমের মনে হ'ত, কিন্তু পরে ঐ হাসপাতালেই আমাদের নেতা জোমো

চব্বিশ পরগণার মন্দির—অসীম মুখোপাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : ছয় টাকা।

বাংলা দেশের বুকে ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন মন্দির—প্রায় সব মন্দিরেরই এক অবস্থা—তারা ধ্বংসপ্রায়।

বাংলা দেশের মন্দিরশিল্পের বিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্রটিকে সঠিক পেতে হলে যাওয়া দরকার বাঁকুড়া এবং বীরভূমে। শ্রীযুক্ত অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল দে ঐ দুই জেলার মন্দিরশিল্পের সামগ্রিক বিবরণী প্রকাশ করে ইতিমধ্যে অসাধ্যসাধন করেছেন। চব্বিশ পরগণার মন্দির সম্বন্ধে ইতস্তত আলোচনার অভাব না থাকলেও অধুনা সে অঞ্চলে মন্দিরগুলির অবস্থা কী হয়েছে তার আলোচনা করেছেন শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়। সংগে সংগে তিনি শতকের পর শতকের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন মন্দিরগুলির এবং পূর্বে অনালোচিত নতুন মন্দিরের সন্ধান দিয়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। অথচ আমরা জেনেছি যে, শ্রীমুখোপাধ্যায় বয়সে তরুণ, প্রায়-বিত্তহীন। কিন্তু মন্দির রক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় হলেও মন্দিরগুলি ধ্বংস হতে চলেছে। শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় চব্বিশ পরগণার মন্দিরের কথা লিখে প্রমাণ করেছেন যে, সরকার ও জনসাধারণ উদাসীন হলেও এখনো পর্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, অনুসন্ধানী তরুণ গবেষক স্বীয় প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের প্রাচীনকালের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

'চব্বিশ পরগণার মন্দির' গ্রন্থটি'র রচনাব বিন্যাসেও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের চিন্তা-ভাবনা প্রশংসনীয়। তিনি মন্দিরের বর্ণনাকালে শিল্পীদের শিল্প দক্ষতা ও শিল্পকর্ম তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে মন্দিরশিল্পের ধারা আলোচনাকালে তিনি ডেভিড ম্যাকাচ্চিয়নের মতো পণ্ডিতের মতামত ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন।

মন্দিরশিল্পের যে চারটি রীতি প্রচলিত আছে, তার ওপর ভিত্তি করেই অসীমবাবু চব্বিশ পরগণার মন্দিরগুলির আলোচনা করেছেন এবং ঐ ধারানুসরণে যে বৈচিত্র্য দেখা গেছে, কার্যকারণ সহ তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। মন্দিরগুলির ধ্বংসের কারণগুলিকে তিনি যেমন সুস্পষ্ট অভিমত সহ ব্যক্ত করেছেন, তেমনি তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টি নিয়ে ধনীদের মন্দির তৈরির পশ্চাৎ কাহিনী বিবৃত করেছেন। তা ছাড়া এমন দৃষ্টান্তও তিনি দেখিয়েছেন যে, মুসলমান রাজার আমলে একই ধনী হিন্দু জমিদার মুসলিম আমলে এবং বৃটিশ আমলে য়ুরোপীয় শিল্পের অন্ধ অনুকরণের ফলে রীতি বদলাতে বদলাতে কিভাবে এ দেশীয় শিল্পচর্চার ক্ষতিসাধন করেছেন (পৃঃ ৮৩)।

মন্দিরশিল্পের ধারাবাহিক কাহিনী, ঐ শিল্পের রীতি ও প্রণালী বিশ্লেষণের পর চব্বিশ পরগণার মন্দিরগুলির সংগে শ্রীমুখোপাধ্যায় আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ঐ পরিচয় প্রসংগে এসেছে মন্দির নির্মাণের সাল-তারিখ, কোন্ রীতিতে কোন্ মন্দিরটি গঠিত এবং কোন্ স্থানে কোন্ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। জটার দেউল আবিষ্কৃত হয় বন কেটে বসতি গড়ার সময়। তাহলে অবশ্যই একদা সেখানে বসতি ছিল। সেই ইতিহাস জানার এক প্রচণ্ড কৌতূহল শ্রীমুখোপাধ্যায় আমাদের মনে জাগিয়েছেন। স্বভাবতই মনে হয় আরো মন্দির আবিষ্কৃত হলে, তার শিল্পরীতি জানাই প্রধান বিষয় হবে না, তদঞ্চলের ইতিহাসও হয়তো বের হয়ে পড়বে। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে।

অসীমবাবু সমগ্র ২৪ পরগণার পূর্বে আবিষ্কৃত মন্দিরগুলির নতুন তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন এবং নিজেও পূর্বে অনাবিষ্কৃত মন্দিব চত্বরে গিয়ে পা বাড়িয়েছেন। এও এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে যথার্থ গুণগ্রাহীরা এর প্রশংসা করলেও আমাদের সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পণ্ডিতদের মতে হয়তো তা বেগার খাটা! মন্দিরশিল্প ছাড়া লেখক উপসংহারে ২৪ পরগণার অন্যান্য শিল্পের (যেমন পট, কাঠ, শোলা প্রভৃতি) কথাও ব্যক্ত করেছেন। ৩২টি ফটো চিত্র, ২৪ পরগণার একটি ম্যাপ ও মন্দিরশিল্প গঠনরীতির বহুসংখ্যক স্কেচে গ্রন্থটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান বিবেচিত হবে এবং প্রামাণ্য গ্রন্থের যোগ্য মর্যাদা লাভ করবে বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

কেতকী (আষাঢ়, ১৩৭৭)—সম্পাদক মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। শিয়ালডাঙা, পোঃ মনিহারা, পুরুলিয়া। দাম—এক টাকা।

খরা-কবলিত পুরুলিয়া জেলা থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র 'কেতকী'। বাঙালীর প্রাণরসধারা অতি দুঃখেও যে শুকিয়ে যায় না, এ তারই প্রমাণ। গ্রাম-বাংলার কণ্ঠস্বর 'কেতকী'র মুখ্য উপজীব্য। আধুনিক কবিতা যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা বেয়ে চলেছে, তার প্রতিফলন আছে 'কেতকী'তে। হয়তো ভবিষ্যতে নতুন কবির জন্ম দেবে। দক্ষিণারঞ্জন বসু, দুর্গাদাস সরকার, মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী, অমিয়কুমার হাটি, সুবিমল জানা, শাজাহান, বিষ্ণুপদ সামন্ত, উমাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা উল্লেখযোগ্য। মূলত মফস্বলের পত্র-পত্রিকার বিবরণসম্বলিত 'সাহিত্য পরিক্রমা' করেছেন ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'কবি জীবনানন্দ' একটি স্বাদু রচনা। সম্পাদকীয়তে যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও আদর্শ ঘোষিত হয়েছে, তা অনুসরণ করলে 'কেতকী' প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করবে।

সপ্তদ্বীপা (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৭০), সম্পাদনায়— রবীন দত্ত ও জীবনময় দত্ত। এ১২৪, কংকরবাগ কলোনী, পাটনা-১। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা সাহিত্য এখন আর শুধু সখের ব্যাপার হয়ে থাকছে না। পাটনা থেকে প্রকাশিত 'সপ্তদ্বীপা' তার প্রমাণ দেবে। বিহারের প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সপ্তদ্বীপা'য় আছে নিষ্ঠার স্বাক্ষর। লেখাগুলি ভাবনা ও চিন্তা উদ্রেককারী। সুশীলকুমার বিশ্বাসের 'পথ ও ভালবাসা' গল্পটি মমতা-মাখা। শ্যামলী সরকার-এর কবিতা উল্লেখ্য। পুস্তক সমালোচনা বিভাগে জীবানন্দ মুন্সীর লেখায় কলকাতার বাইরের কতকগুলি পত্র-পত্রিকার বিবরণ জানা গেল।

নরনাথ ফিরে আসেন। অন্ধকার ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাস্তার আলো জানলার মধ্যে দিয়ে এসে পড়ে ঘরে। টেবিলের ওপরের রুপোর দোয়াত চিক চিক করে আলোয়। দেয়ালে গান্ধীজীর ছবি অস্পষ্ট। ঘরের অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠতে পারে নি। একটা পাতলা আলোর হাল্কা আভাস চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে।

তিনি আলো জ্বালেন না। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসেন। সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায়। বার বার চমকে চমকে ওঠে হেড লাইটের আলো। বাস থামে, লোক নামে, কন্ডাক্টর ঘণ্টা দেয়, আবার বাস চলে। রাস্তার লোক চলে গল্প করতে করতে। তাদের কথার টুকরো শোনা যায়। রাস্তার ও-ফুটে বঙ্কুর চায়ের দোকানে খদ্দের জমে। কত রকম লোকের জটলা। চা খায়, সিগারেট ফোঁকে। ক'টা ছেলে তর্ক করে জোর গলায়। ওদের গলার আওয়াজ ঘরে ভেসে আসে: এদেশের ছবিতে চুম্বন চলতে পারে কি না।

হঠাৎ নিজেকে তাঁর ভয়ানক একলা মনে হয়। বিরাট আকাশে সন্ধ্যাতারার মত নিঃসঙ্গ। বাইরে আলোর চলতা স্রোত, মানুষের জীবন্ত জীবনের মিছিল, উত্তেজিত প্রাণের সরব প্রকাশ আর তাঁর ঘরে ইতিহাসের স্তব্ধ নীরবতা। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে তিনি একক দর্শক—সকলের থেকে দূরে সরে থাকা খারিজ-হওয়া একটা মানুষ।

তিনি চমকে ওঠেন। ফিকে অন্ধকারের মাঝ দিয়ে নির্জন চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন অজানা ভয়ে। চার-পাশে কেউ নেই—এ চিন্তা করা যায় না। ভাবতে গেলে মাথার রক্তের মধ্যে প্রলয় জাগে; তারপর ঝিম লাগে সারা শরীরে। দেহটার কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। চোখের সামনে শুধু পুরনো জগৎটার ছবি ভেসে ওঠে।

সারাদিনই প্রায় কোন কাজ থাকে না। সময় ভার হয়ে চেপে ধরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এক-একটা মিনিট যে এতো দীর্ঘ, জানা ছিল না। ক' মাস আগে নিশ্বাস ফেলবার সময় পেতেন না। ঘড়ির কাঁটা এতো জোরে চলত, তাঁর মনে হত, জ্যাটপেকও ওর নাগাল পাবে না। কাজ, কাজ, কাজ। সকালে চোখ মেলবার আগেই কাজের অশেষ লাইন দাঁড়িয়ে থাকত দরজার সামনে।

বাসনা অনুযোগ করতেন—দিন-রাত কাজ-কাজ করে শরীরের কি হাল হয়েছে দেখেছ। এতো কাজ না করলে ক্ষতি কি ?

নরনাথ হাসতেন। মাপা—ওজন করা হাসি। সেটা স্বতস্ফূর্ত না স্বেচ্ছাকৃত, নিজেই জানতেন না। চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে তোয়ালে দিয়ে আলতো ভাবে ঠোঁট মুছে বলতেন—লাভ-ক্ষতি বুঝি না। পাঁচটা লোক ভালবাসে, নানান অভাব-অভিযোগ নিয়ে আসে, যতটা পারি সাহায্য করি।

—ভালবাসে, না ছাই। সব স্বার্থপরের দল। যতদিন ওদের হয়ে করতে পারবে, ওরা তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। যেদিন পারবে না, ওরা তোমার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না।

—এটা তোমার রাগের কথা। তুমি জান না, ওরা আমাকে কত ভালবাসে, আমার জন্যে ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

—যে লোক নির্বোধের স্বর্গে বাস করে তাকে কিছু বলতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। যদি চাকা কোন-দিন ঘোরে, সেদিন ওদের ভালবাসা যাচাই হবে।

তিনি হাসতে হাসতে নেমে আসতেন নিচে। বাসনার কথাগুলো ক'বার শূন্যে পাক মেরে মিলিয়ে যেত। এ ঘরে এলে লোকেদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন জাগত। নিজের ছায়া দেখতে পেতেন প্রত্যেকের চোখের তারায়। নীরব মুখের সারি তাঁকে

...আরাম দিত। এত ত্যাগ, এত প্রশান্তি তিনি অনুভব করতেন যার মধ্যে কোন সন্দেহ উঁকি মারত না। তাঁর মনে হ'ত, বাসনা তাঁর জীবনের আদর্শ বুঝতে পারেন নি। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আজ এ অন্ধকারে বসে স্বীকার করেন, বাসনাকে সেদিন যোগ্য সহধর্মিণী মনে করতে দ্বিধা বোধ করতেন। বাসনার সঙ্কীর্ণ মন তাঁকে পীড়িত করত। বার বার তাঁর মনে হত, তাঁর বাইরের বিপুল খ্যাতি বাসনার মনে ঈর্ষা জাগাত। হয়ত বাসনা মনে মনে তাঁর খ্যাতিকে সহ্য করতে পারতেন না।

আজ এ সন্ধ্যের পর বাড়িটা তাঁর ভীষণ নির্জন মনে হয়। কোথাও কোন সাড়া নেই। নিস্তব্ধতার নির্জন চরে তিনি জেগে আছেন একা। জমাট-বাঁধা পাথুরে স্তব্ধতাকে স্পর্শ করা যায় হাত দিয়ে কিংবা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তুলে নেওয়া যায়। অথচ বাইরে বয়ে চলেছে প্রাণের প্রবল বন্যা। বঙ্কুর চায়ের দোকানের রেডিওতে চড়া সুরে গান হয়। ওপাশে মিত্তিরদের বাড়ির সামনে দুটো ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। কি বলে শোনা যায় না। মেয়েটা হাসে—চোখের তারায় তেরছা আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

পুরনো পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডের ওপর ঘুরে চলে। কোথাও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। বাসনার সেদিনের কথাগুলো নির্মম সত্যের রূপ নিয়ে নরনাথকে বেঁধে। আজ মনের দিক থেকে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। বাসনার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তাঁর বাপের হৃৎস্পন্দন চালায় পাঁজরে।

—সতীশ! —বাসনার স্বর।

—কি বলছেন, মা?

—বাবু এখনো ফেরে নি?

—না, মা।

—কি আশ্চর্য! আটটা বাজে, কোথা গেলেন!

বাসনার গলার সুরে নরনাথ তীব্র অস্বস্তি বোধ করেন। ঠিক এ মুহূর্তে কি যে করবেন, ভেবে পান না। একটা পায়ের শব্দ কাছে এগিয়ে আসে। তিনি উঠতে যান, চেয়ার সরে যায়। কর্কশ শব্দ হয়। পরক্ষণে ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। হঠাৎ আলোর ঝাপটায় তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

—তুমি এখানে! —একটা বিস্ময় ফাঁকায় ওঠে।

বাসনাকে সামনে দেখে নরনাথ বিপন্ন-বোধ করেন। নিজেকে অসহায় মনে হয়। কি জবাব দেবেন, ভেবে পান না; চুপ করে বসে থাকেন। বাসনা এগিয়ে আসেন এক বুক ভয় ও বিস্ময় নিয়ে। নরনাথ দেখেন, আলোর বন্যের নিচে বাসনার ঘুমো-বসানো সাকহাবি কেঁপে কেঁপে ওঠে। বুক ওঠা-নামা করে ঘন ঘন। ডাগর-দীঘল চোখে একটা কালো-ছায়ার পাখি ছটফট করে ডানা ঝাপটায়।

—তোমার কি হয়েছে?

—কিছু না।

—তবে এমন করে অন্ধকারে বসে আছ কেন? কখন বেড়িয়ে ফিরলে? আমাদের ডাক নি কেন?

—এমনি।

ছোট্ট জবাবে বাসনা খুশি হন না। নরনাথকে এরকম একান্ত অসহায়ের চেহারায় তিনি কোনদিন দেখেন নি। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে নরনাথের মুখের মাপা-হাসি কোনদিন মুছে যায় নি। তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলেও বাসনা এত সহজে স্থির হতে পারেন না। সেদিনের পরাজয়ের পর নরনাথ নিভে গেছেন। নিজের অটল বিশ্বাসের প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়েছে মাটির ধুলোয়। নড়ে-চড়ে বেড়ান ঠিক, তবু বাসনার মনে হয়, নরনাথ কায়া ছেড়ে কোন ছায়ার রাজ্যে চলে গেছেন। একটা দীর্ঘ ছায়া চলাফেরা করে নিঃশব্দে, নীরবে। তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ জাগে, ভয় হয়, শঙ্কা নেচে নেচে বেড়ায় চারধারে।

—তোমার শরীর ভালো আছে?

—হ্যাঁ।

—ওপরে যাবে?

—না, এখানে একটু বসি।

—কফি পাঠিয়ে দোব?

—দাও।

বাসনা দু' পা এগিয়ে যান। থমকে দাঁড়ান। তাঁর পিছন দিকে আলো পড়ে। নরনাথ দেখেন বাসনার ঘাড়ের কাছে ... চুল কানের ওপর ছোপ টেনে দিয়েছে। বাসনার বয়স বেড়েছে। কতদিন, না কত বছর, বাসনার দিকে একবার করে তাকান নি। বাসনা পা বাড়ান। ঘাড় ফিরিয়ে বলেন—তোমার কাছে খবর একটু।

চমকে ওঠেন নরনাথ। অনেক দূর থেকে, অনেককালো ... কবরখানা মাড়িয়ে কটা শব্দ তাঁর মনের ... কথা নাড়া দিয়ে যায়। একটা বিরাট আলোড়নের ঘূর্ণাবর্তে ... কি যেন হাতড়ে ফেরেন। ... তনুকা একবার হাতছানি দিয়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

—থাক।

—একা বসে থাকবে?

—একটু পড়াশোনা করব।

বাসনা চলে যান। ... একটা বই টেনে নেন। ... বাসনার ... প্রতিধ্বনি একটা ... মত্ত ঘরের বাতাসে উড়ে বেড়ায়—একা বসে থাকবে? আজ তিনি একা। এ নির্মম সত্যকে না মেনে উপায় নেই। জানলার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, সে ছেলেমেয়ে দুটো মিত্তিরদের বাড়ির সামনে নেই। বঙ্কুর দোকানে লোকজন থই থই করে। বাচ্চা ছেলেটা কাচের গেলাসে ও ভাঁড়ে করে চা দিয়ে যায়। দোকানের ভেতরটা ধোঁয়ায় ঢাকা—ক'টা অবয়ব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

সতীশ কফি দিয়ে যায়। নরনাথ কফিতে চুমুক দিয়ে আরাম বোধ করেন। ক'টা মাস আগে এ ঘরে লোক ধরতো না। কথা-হাসি-টীকা-টিপ্পনীর বন্যা বয়ে যেত। বাইরে মটরের হর্ন বেজে উঠত সবাইকে সচকিত করে। একটু পরে দেখা দিত আগরওয়ালা, মুনিম খাঁ কিংবা যদু মুখুজ্জে। লোক ঘরে ধরত না, বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে যেত।

যদু মুখুজ্জে তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যেত। তিনি বুঝতে পারতেন, কোন গোপন আর্জি আছে তার। যদুর সম্বন্ধে নানা কথা তাঁর কানে আসত। কিন্তু তাকে হাতে রাখতে হ'ত, কারণ বিশেষ এক নির্বিঘ্ন এলাকার ভোট থাকত তার পকেটে। খুব অমায়িক লোক। এত ভদ্রলোক সচরাচর চোখে পড়ে না।

যদু মুখুজ্জে বলত—দাদা, ছোটভাই আবার আপনার শরণাপন্ন হয়েছে।

—কি ব্যাপার?

—আর কেন বলেন? আপনার কাছে বলতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে, কিন্তু না বলেও উপায় নেই। আমার হয়েছে শাঁখের করাত।

—কি হয়েছে?

ছেলেটাকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। আজ আবার ছোরাছুরি চালিয়েছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। আপনি একবার এস-পি'কে ফোন করুন।

—দিনকাল খারাপ। গুণ্ডার জন্যে...

—সব বুঝি, দাদা, খোকা তো নই।

কি করব, সামনে আবার ইলেকসন। লেটো না থাকলে...বোঝেন তো...

না বোঝবার কিছু নেই। নরনাথ সব বোঝেন। বিবেকের দংশন যাকে বলে, আজকাল তার বিশেষ অনুভব করেন না। যদু মুখুজ্জের মত অনেকের অনেক অন্যায় আব্দার সহ্য করতে হয়। না করে উপায় নেই। হয়ত অন্যায়, তবু নিজের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সব করতে হয়। এমন একটা জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন যার মধ্যে থেকে পালাবার কোন ফাঁক নেই।

বাসনা মাঝে মাঝে বলতেন—এসব তো দুর্নীতি।

—দুর্নীতি বলে কিছু নেই। যে পুজোর যে মন্ত্র—এ লাইনে থাকতে গেলে এসব করতে হয়, না করলে টিকতে পারবে না।

—লোকে গালাগাল দেয়।

—সূর্যের দিকে তাকিয়ে থুতু ছুঁড়লে তা সূর্যের গায়ে লাগে না, যে ছোঁড়ে তার মাথায় এসে পড়ে।

—উপমাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। নিজেকে সূর্য ভাবা খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল—মাথা হেঁট করে স্বীকার করেন নরনাথ। চলার হার্ডল রেসে যখন সাফল্য আসে, তখন কোনদিকে তাকাবার চোখ থাকে না। একটা বন্য আদিম চলার নেশা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। একবারও মনে আসে না, পতনের খাদ রয়েছে সামনে। যে-কোন সময়ে, যে-কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারেন গভীর অতলে।

যদু মুখুজ্জে, আগরওয়ালা, মুনিম খাঁ, লেটো, আরো কত লোক, যাদের নাম আজ আর মনে পড়ে না, মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। এতগুলো লোক এভাবে নিপাত্তা হয়ে যেতে পারে, বিশ্বাস করা যায় না। এ ঘরের সীমানায় আর কেউ আসে না। আসার আর প্রয়োজন নেই। সেদিনের বৃষস্কন্ধ নরনাথ আজ বামন হয়ে গেছেন। লোকের নজরের পাল্লার মধ্যে আর তিনি পড়েন না।

যদু মুখুজ্জে আশ্বাস দিত—দাদা কি ঘাবড়ে যাচ্ছেন ?

—না না, ঘাবড়াবার কি আছে। তবু কথাটা কি, এবারে ওরা জোট বেঁধে [illegible] কিনা। [illegible] হাওয়াও বেশ সুবিধের মনে হচ্ছে না।

—আপনি [illegible] সরষের তেল দিয়ে ঘুম লাগান। আমি যতক্ষণ আছি ঐ ইয়ে [illegible] একটা ভোটও মনসা মিত্তিরের [illegible] না। আপনার জন্য আমরা জান লড়িয়ে দেব। লেটো তার দলবল নিয়ে [illegible] পড়েছে, আপনার কোন ভয়-ভীত নেই।

—তোমাদের পাঁচজনের শুভেচ্ছা নিয়ে নাবছি, দেখা যাক্‌ কি হয়।

—কী আবার হবে! মনসা মিত্তিরে হয়ে কে খাটবে? টাকার চার ফেলে সব ক'টাকে গেঁথে তুলব। তাছাড়া ঐ ইয়েরাও আপনার জন্যে খাটছে। মনসার ক'টা পান্ডাকে একবার কিরণবালার ঘরে তুলতে পারলে হয়। আপনি শুধু পুলিশের হামলাটা সামলান।

—পুলিশের হামলা হবে কেন?

—কিরণবালার হাতে ক'টা মেয়ে এসেছে নতুন...বোঝেন তো সব। আপনার কাছ থেকে অভয় পেলে সবদিক সামাল দিই।

—দেখি কি করতে পারি।

যদু মুখুজ্জে যতক্ষণ সামনে থাকে নরনাথ অস্বস্তি বোধ করেন। লোকটাকে সহ্য করতে পারেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ পচা ইঁদুরের ফুলো দেহের ওপর পা পড়লে যেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করে, লোকটাকে দেখলে ঠিক তেমনি অসহ্য বিবমিষায় গা গুলিয়ে ওঠে। তবু কিছু করার নেই। একে হাতে রাখতে হবে; কথা কইতে হবে হেসে হেসে। ওর অনুরোধগুলো পালন করতে হবে অমোঘ আদেশের মত।

যখন একা থাকতেন, যদিও তা সচরাচর ঘটত না, মনে পড়ত ন্যায়-নীতি-আদর্শের কথা। নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হ'ত। ওসব থেকে সরে এসেছেন অনেক দূরে। ও শব্দগুলো মনে পড়লে ভয় পেয়ে চমকে উঠতেন। বেলসাজারের কাহিনী মনে পড়ত। নির্জন একটা হাত কি যেন লিখে যেত দেয়ালের গায়ে। ঘরের নির্জনতা একটা বিরাট ভয় হয়ে লাফিয়ে পড়তে চাইত তাঁর ওপর।

নিজেকে শক্ত করতে চাইতেন। বিরাট কিছু করতে গেলে ছোটখাট ভুলত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। দেশের স্বার্থে, দশের স্বার্থে কিছু করতে গেলে সবদিকে নজর দেওয়া যায় না। সম্ভব নয়। ক্ষেতকে ঘাস-মুক্ত করব বললেও দু-চারটে থেকে-যাবেই। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, আদর্শ আছে বলেই দেশের লোক তাদের চায়। চাষীর ঘরে পাকা ধান উঠে আসবেই চোখ-এড়িয়ে-যাওয়া ঘাসের মত লেটো-যদু মুখুজ্জে থাকা সত্ত্বেও।

বড় আনন্দ অনুভব করতেন। গর্বে বুকের ছাতি বিঘৎখানেক বেড়ে যেত। বাইশ বছরে দেশের অনেক কাজ করেছেন। লোকে সমালোচনা করে; গালাগাল দেয়। ওদের আমল দিলে চলে না—ভাবতেন নরনাথ। কাজ করতে গেলে ভুল হয়; সমালোচনা হয়, কিন্তু তার ফলে কাজ বন্ধ করা যায় না। দেশের প্রগতি তাঁদের আয়ু তাঁদের লক্ষ্য।

বাসনা বলতেন—তোমরা উটপাখির মত হয়ে গেছ।

—কি রকম?

—উটপাখি বালিতে মাথা গুঁজে দিয়ে ভাবে ঝড় আসে নি।

—এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

—তোমরা স্তাবকদের কথায় ভুলে আছ। ভাবছ, কোথাও কোন গোলমাল হয় নি, সব আগের মত চলেছে। কিন্তু তোমাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে—সাধারণ লোক তোমাদের চায় না।

নরনাথের মুখের ওপর খেলে যেত মাপা-হাসির চাপা ঢেউ। করুণা জাগত বাসনার ওপর। যীশুর বাণী মনে পড়ত : প্রভু, এঁদের আলোয় নিয়ে এস। ভাবতেন, অবলা জীব চিরটা কাল ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে কাটাল, বাইরের হাল-চাল বুঝবে কি করে? নরনাথ পালের সভার কি পরিমাণ লোক হয়, কেমন করে জানবেন বাসনা? ওরা তাঁকে চায়—চায় তাঁর দলকে। তাঁরা জনসাধারণের জন্য ভাবেন, কাজ করেন। মনসা মিত্তির তো শুধু লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ায়। কাগজের জেলাওয়ারী হিসেব তাঁদের অনুকূলে। উটপাখী নরনাথ নন—মনসা মিত্তির। জনতার ক্রোধের টাইফুনে ওদের ঝান্ডা উড়ে যাবে তেপান্তরের মাঠে:

হিসেবের কড়ি বাঘে খেয়ে গিয়েছিল। সে সন্ধ্যের কথা নরনাথ ভুলতে পারেন না। যদু মুখুজ্জে আশ্বাস দিয়েছিল—আপনার জয় অনিবার্য। খবরের কাগজ খুলতে সাহস করতেন না: রেডিওর ধারে-কাছে যেতেন না। মহীরুহদের পতনের খবর কানে আসত। মনে হত, কালা হয়ে যাওয়া বোধ হয় ভাল ছিল। তবু মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা জাগত।

এলো সে সন্ধ্যে। মনসা মিত্তির ক' হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল। রাস্তার আলো সব লাল। পথে পথে জনতার উল্লাস। মনসা মিত্তিরের বিজয়-মিছিল থেমেছিল বাড়ির সামনে। পটকা ফাটল, নিউগল বাজল, চিৎকারে যেন বাড়ির ভিত কেঁপে উঠল। বাড়ির বাইরের দিকের সব জানলা-দরজা বন্ধ। ঘন ঘন পটকার শব্দে কাঁপছিল বাড়ির সকলে। ম্যামথ যুগের টেরাডাকটিল আতঙ্কের কালো ডানা ছড়িয়ে দিয়েছিল বাড়িটার ওপর।

অন্ধকার ঘরে বাসনা সামনে বসেছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল না। বাসনা তাঁর একটা হাত ধরে ছিলেন। পটকার শব্দে চমকে চমকে উঠছিলেন। নরনাথ বুঝতে পারেন নি কে চমকে উঠেছিলেন—তিনি না বাসনা। [illegible]

দেশ ও দশের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতেন না। তখন বাস করতেন মানুষের কাছাকাছি। সাধারণ লোকের উত্তপ্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না—ছিল না স্বার্থের স্পর্শ। তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেল। মাটি থেকে উঠে এলেন জনসাধারণের মাথার ওপর—নরনাথ পাল জননেতা, গণসেবক।

রোজ বিকেলে যখন আকাশের আলো মরে আসে, তখন তিনি বেরিয়ে পড়েন বাইরে। কোনদিন বা যান গঙ্গার ধারে; কোনদিন বা বসে থাকেন পার্কে; কোনদিন বা হেঁটে বেড়ান এদিক-ওদিক। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলা করে। অকারণে উজ্জ্বল হাসির ফোয়ারা ছুঁড়ে দেয় আকাশের বুকে। ক'টা ছেলে-মেয়ে তাঁকে দাদু বলে ডাকে। একেবারে তাঁর কোলের মধ্যে ধরা দেয়। একরাশ কনকচাঁপা ফুটে ওঠে তাঁর চারপাশে।

দু'টো যুবক এসে তাঁর পাশে বসে। দু'জনে সিগারেট টানে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ছোট ছেলেরা ফিরে গেছে। পার্কে আলো জ্বলে ওঠে। লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকে এদিক-সেদিকে।

—কি রে, চাকরি পেলি?

—না।

—মিউনিসিপ্যালিটিতে লোক নিল, দরখাস্ত করিস নি?

—করেছিলুম; কিন্তু ইন্টারভিউ দেবার আগে শুনলুম লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

—তাহলে ইন্টারভিউ করে কি লাভ?

—আরে ওটা শুধু আই-ওয়াশের ব্যাপার। এস. ওয়াজেদ আলির লেখা মনে পড়ে: সেই ট্র্যাডিসন আজো চলিতেছে। আমি শালা বি. এ. পাশ করে ফ্যা ফ্যা করছি আর পার্টির লোক স্কুল ফাইন্যাল, চাকরি পেয়ে গেল। গদি বদলেছে, কিন্তু স্বজন-পোষণ চলেছে আগের মত। দু'দিন আগে এঁরা গালাগাল দিত। জন-সাধারণ-জনসাধারণ মুখে বলে, ওটা ব্লাফ্ ছাড়া কিছু নয়।

—প্রতিবাদ কর।

—তা হলেই চীৎকার শুরু করবে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নি। এরাও যে-যার ঘর গোছাতে ব্যস্ত। পার্টির লোক না হলে কিছু হবে না। আমরা যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই আছি। তবে জানবি, এ কল্পনার একদিন শেষ হবে, আমাদের একদিন আসবে।

সে সন্ধ্যের আবছা আলো, আবছা অন্ধকারে নরনাথ ওদের মুখ দেখতে পান না ভালো করে। সাধারণ চেহারার দুটো ছেলে—জনতার মাঝে সহজেই হারিয়ে যাবে। কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই ওদের কাঠামোয়। শুধু গলার স্বরে ব্যর্থতার মধ্যে একটা গভীর প্রত্যয় বেজে ওঠে। শুনে চমক লাগে, চমকায় মিইয়ে-পড়া মনটা।

এরা আগেও অবহেলিত, আজো ব্রাত্য। এদের জন্যে তাঁরাও চিন্তা করেন নি। এরাই মাটির কাছাকাছি সাধারণ মানুষ। এ চিন্তা আগে কোনদিন করেন নি। রাজ-নীতির ক্ষমতার যে উঁচু মঞ্চে বসেছিলেন, সেখানে এদের কথা বলার কেউ ছিল না। তাঁর মনে হয়, পরিবর্তনের মধ্যে এদের সুর বেসুরো বাজলেও, কোথা একটা সত্য লুকিয়ে আছে।

তাঁর মনে পড়ে সেই চালওয়ালীর কথা। থানা থেকে দুলো গজের মধ্যে বসে চাল বিক্রি করে। তাঁর অনভ্যস্ত চোখে কেমন অস্বাভাবিক লেগেছিল। থানার এত কাছে খোলা জায়গায় চালের কালোবাজারী চলে—পুলিশ কিছু বলে না কেন? চালওয়ালী বলেছিল—বাবু, ঘুষ নেওয়া কি বন্ধ হয়েছে? আগেও ঘুষ চলত, আজো চলে।

তিনি বলেছিলেন—কিন্তু সরকার তো বদল হয়েছে?

—তাতে কি হয়েছে। ক'টা মন্ত্রী পাল্টে কি হবে বাবু? সেপাই তো সেই আগের আমলের। ঘুষ পেলে এরা চোখ বুজে থাকবে।

—চেক পোস্টে ধরে না?

—বাবু, আপনি কিছু বোঝেন না। চেক পোস্টের পুলিশও তো আগেকার। ঘুষ পেলে ওরা চাল বয়ে দিয়ে যাবে কাঁধে করে। বাবু, সবই চলছে, কিছু বন্ধ হয় নি। এখানে যত রেস্টুরেন্ট আছে, ওখানে সন্ধ্যের পর চোলাই বিক্রি হয়। থানার বাবুরো মোটা খায়, তাই কিছু বলে না।

নরনাথের কেমন সব গোলমাল লাগে। রামরাজ্য তাঁরা গড়তে পারেন নি এবং চেষ্টা করলেও গড়া সম্ভব নয়! লোকে বলত, দেশের মাটির মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। তখন মনে হ'ত, এসব অপপ্রচার, তাঁদের হেনস্থা করবার একটা ফিকির মাত্র। কেবলমাত্র রটনা, ঘটনার স্পর্শ নেই এর মধ্যে। এখন চিন্তার দিগন্তে নতুন আলো দেখতে পান।

থানার পাশ দিয়ে আসবার সময় নজরে পড়ে, থানা থেকে বেরিয়ে আসছে মনসা মিত্তির। পিছনে যদু মুখুজ্জে। তীব্রভাবে তিনি চমকে ওঠেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। মনসা মিত্তিরের সঙ্গে যদু মুখুজ্জের আঁতাত হয় কি করে? অঙ্কের হিসেব মেলে না। দুই আর দু'য়ে কিছুতেই চার হয় না।

যদু মুখুজ্জে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়, পারে না। চোখাচোখি হয়ে যায়। থেমে পড়ে। নরনাথের দিকে এগিয়ে আসে। বলে—ভালো আছেন, দাদা?

—তুমি এখানে কি করছ?

—কাজ-কারবার থাকলে থানা-পুলিশের সঙ্গে দোস্তী রাখতেই হবে।

—মনসা মিত্তিরের সঙ্গে দোস্তী আছে নাকি?

—দাদা, সব সময়ে আমরা সরকার পক্ষে।

—তোমাকে ওরা আমল দেয়?

—কেন দেবে না? লেটো আর তার দলবলকে কে না চায়? দাদা, সব পার্টিই চাইছে শক্তি বাড়াতে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আমাকে কেউ চটাতে সাহস করে না। আপনিও আমার হয়ে তদ্বির করে-ছেন, এরাও করে। জনসাধারণ ইত্যাদি বললেও সব নেতাই দেখে নিজের আর পার্টির স্বার্থ। দেখছেন না সকলে কি রকম খেয়োখেয়ি করছে। এর মধ্যে পড়ে পাবলিক মরে ভূত হয়ে গেছে। আচ্ছা, দাদা, চলি, পরে আবার দেখা করব।

বঙ্কুর চায়ের দোকানে খদ্দের কমে আসে। রেডিও চীৎকার করে। বাস থামে। ঘণ্টা বাজে। আবার বাস চলে। সব ঠিক আছে, কোথাও ছন্দ-পতন নেই। একান্ত সহজভাবে মসৃণ পথে জীবনযাত্রা গড়িয়ে চলে।

মনসা মিত্তির ও যদু মুখুজ্জে—উত্তর-দক্ষিণ মেরুর মিলন। অশুভ মিলন। লেটোর প্রয়োজন আজো ফুরোয় নি। আগরওয়ালা-মুনিম খাঁ হয়তো অন্য কোন ঘাটে নৌকো বেঁধেছে। সব ঠিক চলছে।

বাসনার কথা তাঁর মনে পড়ে, উট-পাখি। তিনি বুঝতে পারেন, যদু মুখুজ্জে আগরওয়ালা-মুনিম খাঁ-লেটো চোখের সামনে ঝুলিয়ে দেয় মোটা পর্দা। চোখে আলো পড়ে না, অন্ধকারের মধ্যে বাস করে মনে হয়, সব ঠিক চলছে। বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমি যে চোরাবালির চর—বুঝতে পারা যায় না।

পার্কের সে-ছেলেটার কণ্ঠের প্রত্যয় ধ্বনিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পান ওর মধ্যে। উটপাখি বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। পেছনে যে দুর্বার ঝড়-ঝড় তীব্রবেগে ছুটে আসে, তা সে বুঝতে চায় না। তবু ঝড় আসে।

লোকসংগীতের একাল না আকাল ?

মুরশিদ

মুরশিদের মোকামে ইদানীং হামলা দিয়েছে হনলুলুর হাওয়া আর ক্যালিফোর্ণিয়ার বাউলী। সানফ্রান্সিস্কো শহর থেকে এক বাউল ভাই-এর চিঠি পেলাম—'পূজনীয় দাদা,...প্রথমে ব্যাঙ্কক, তারপর হনলুলু, পরে হংকং, তারপর টোকিও ঘুরে এলাম সানফ্রান্সিস্কো। শহরের তুলনা হয় না। সে আর আপনাকে কি লিখব। আসার পর বেতারে, টেলিভিশনে, রেকর্ডে গান করলাম।... আমার সাথে আলী আকবর ও শঙ্কর ঘোষ আছেন। এক সাথে জলসায় গান-বাজনা করি...।" এর পরের চিঠিটাতে তাঁর সাফল্য, আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর ফটো সহ পাবলিসিটী, কতো রকমারি খবর। এই নব্য বাউল ভাইটি হলেন শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। কিছুদিন পরে সেখান থেকেই আরেকজনের চিঠি পেলাম —তিনি মুরশিদের অতি পিয়ারের দোতারা বাদক। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ দু' ধরনের দোতারাতেই তাঁর দখল চমৎকার। কোলকাতার অলিতে গলিতে সেতারী পাবেন—কিন্তু দোতারা বাদক পাবেন না। লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারও তাঁর মন্দ নয়। সানফ্রান্সিস্কো থেকে তিনিও চিঠি দেন। চিঠিতে প্রথমে তাঁর আকাশী ভ্রমণের এক মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়ে পরে লেখেন,

"হংকং এবং টোকিওতে 'এয়ার লাইনস্' আমাকে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছিল। হংকং-এ যে হোটেলে উঠি ছোঁরা আমার হাতে দোতারা দেখে জিজ্ঞেস করে, এটা কি যন্ত্র? পরে তারা আমার রুমে যায় এবং তাদের আমি দোতারা বাজিয়ে শুনাই। চাং-হুয়া বলে একটি ছেলে আমার সঙ্গে 'বঙ্গো' বাজিয়েছিল। আমি যখন খেমটা তালে দোতারা বাজাতে থাকি, তখন লু-ফিং নামে একটি মহিলা নাচতে সুরু করেন।...হংকং এয়ার পোর্ট-এ ট্যাক্স দিতে হয় ১০ হংকং ডলার। কিন্তু আমি তা জানতাম না। আমার কাছে কিছুই ছিল না। পরে হোটেলে যারা আমার বাজনা শুনেছিল—তারা নিজেদের থেকে ঐ ট্যাক্স দিয়ে দেয়।...... আমি এখানে (সানফ্রান্সিস্কোতে) খুব ভাল আছি, আমার ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো। আমার ঘরে টেলিফোন, রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন সব কিছু আছে।"......

মনে পড়ে গেল টেপু মিঞার কথা। বহুদিন আগে কোচবিহারের চিরস্মরণীয় এই গ্রাম্য গায়কটি দোতারা বাজিয়ে আমাকে তাঁর গান শুনিয়েছিলেন—

> ওরে কাঁঠল কাঠের দোতারা
> তুই আমারে করিলি বাউরিয়া!

গরীব গ্রাম্য দোতারা বাদকের জীবনের দারিদ্র্য ও সমাজের অবহেলা সমস্ত যেন সেই গানটিতে দোতারার তারে তারে গুঞ্জন করে উঠেছিল। কিন্তু সানফ্রানসিস্কোর এই দোতারা বাদকের জন্য এ গান তো অচল, তাই ভাবি তার জন্য একটা গান লিখে পাঠাই :

> সাধের দোতারা রে, তুই আমার বন্ধু,
> তুই আমার সখা
> তোরই দৌলতে আমি
> আইলাম আমেরিকা।

যা হোক, কোলকাতার এই দোতারা বাদকটি হলেন শ্রীপরিতোষ রায়। তিনি এবং প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী তাঁরা দুজন এখন সেখানকার "বেঙ্গল ফোক ব্যান্ডের" সভ্য। সেই বেঙ্গল ফোক ব্যান্ড হলো সান্‌ফ্রানসিস্কোর "লোকধর্ম মহাশ্রমের" অন্তর্গত। বিরাট জায়গা জুড়ে নাকি এই মহাশ্রমটি স্থাপিত। তাঁদেরই পরিচালিত Hindu School of Transcendental Music..সেখানে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ওদেরি ভারতীয় 'মটিফে' সুচিত্রিত, সুমুদ্রিত প্রচারপত্রটি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেখানে শেখানো হয় "Ancient Traditional Mantrams, Devotional Spiritual, Folk and classical songs and the playing of instruments like Harmonium, Tabla, Tanbura, Ananda-Lahri, Sri Khole.. Mandira, Ektara, Dotara and Sitar." সেখানে ভারতীয় নৃত্যের ক্লাসও হয়।

যা হোক, এখানে 'বেঙ্গল ফোক ব্যান্ডই' হলো মুরশিদের আলোচনার এক্তিয়ারে। অনেকদিন আগে আমি লিখেছিলাম, লোকসঙ্গীতের আদার ব্যাপারীকেও এ যুগে জাহাজের নয়—উড়োজাহাজের খবর রাখতে হয়। কারণ মার্কিন মুলুক এখন থমকের গবগবি আর লাউয়ার গুনগুনিতে গুলজার।

এদিকে আবার আমাদের দেশে বঙ্গো, কঙ্গো আর মারাকাজের মারামারিতে পপ্ মার্কা বাংলা গীতের ছড়াছড়ি। মনে হলো ডি এল রায়ের গান—

> হলো কিরে, হলো কি
> এ তো বড়ো আশ্চর্য্যি
> বিলাত ফেরৎ টানছে হুক্কা
> সিগ্রেট খাচ্ছে ভটচার্য্যি।

যা হোক, এদেশে ভদ্রসমাজ থেকে একতারা, দোতারা নির্বাসিত হয়ে যদি সাগরপারে মার্কিন মুলুকে আদর আর কদর পায়, তাতে মুরশিদের কেন, সকলেরই খুশির কথা। আজকাল লোকসঙ্গীতের আসরে পর্যন্ত একতারা-দোতারা কল্কে পায় না—যদি বিদেশে সসম্মানে মারিজুয়ানার ধোঁয়া পায়, তাতে অখুশির কি থাকতে পারে!

অন্য কথায় যাবার আগে এই উলটপুরানের প্রচ্ছদপটটা একবার এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ইদানীং 'ব্রেনড্রেন' বলে একটা আওয়াজ উঠেছে। দেশের সুপ্রতিভারা সব বিদেশে চলে যাচ্ছে। কেউ এদেশের মাটিতে আর ডাল মেলতে পারছে না। খোয়ানা, নারলেকর আমাদের গর্ব, আমাদের লজ্জা। কিন্তু কৃতিত্ব আমাদের ছোটো-বড়ো শিল্পীদের।

রূপান্তরিত হলো। শিল্পীদের কাছে আমরা সে গানটি অসীম আগ্রহে শিখেছিলাম। আমরা পেয়েছি আজকের আমেরিকার আর এক ছবি। ভিয়েৎনাম ও কম্বোডিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ক্যাণ্টের ছাত্র-শহীদদের রক্তে আঁকা সেই ছবি। কাজেই আমাদের লোকসঙ্গীত শিল্পীরা আমেরিকায় গেছেন বলেই সমালোচনা করবো না। মুরশিদ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাঙ্গীতিক বিনিময়ে বিশ্বাসী, বিশেষত লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যের মধ্যে পৃথিবীর সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের একটি অখণ্ড ছবি পাওয়া যায়। খাঁটি লোকসঙ্গীতে 'ডিভিনিটি' নয়, আছে 'হিউম্যানিটি'।

আমেরিকায় "বেঙ্গল হিন্দু ফোক ব্যাণ্ড" কি সেই উদ্দেশ্য সাধন করছে? 'গুরু' শ্রীঅশোক ফকিরের কথায় 'ভারতের আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়বাদ প্রচার করছে।' একদিন এই 'আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়' ভাব প্রচারের জন্যই সেদেশে গেছলেন বাংলার বাউল শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস। কিন্তু তারও আগে আমেরিকার বীট্‌নিক কবি গিনস্‌বার্গ বাংলাদেশে এসে বাউলদের গঞ্জিকাজাত তুরীয়মার্গে বিচরণ করেছিলেন এবং "কৃষ্ণচৈতন্যে" মুগ্ধ হয়ে আমেরিকায় গিয়ে প্রথম গঞ্জিকার সাথে 'কৃষ্ণ কনসাস্‌নেস্‌' প্রচার করেন। (এই 'কৃষ্ণচৈতন্যের' সঙ্গে বাউলদর্শনের কোন সম্পর্ক নেই)। যা হোক, হিপি ও বাউলের সমন্বয়ের পথে সেদেশ প্রথম পরিদর্শন করেন বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস। তখন দৈনিক স্টেটসম্যানের প্রতিনিধি যে রিপোর্ট পাঠান, তাতে তিনি লেখেন যে, বাউলের গানে আমেরিকানরা নাকি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় মাতাল হয়ে যান। শুধু গানে নয়, বাউলের গেরুয়া আলখাল্লা, রুদ্রাক্ষের মালা, খালি পা, লম্বা চুল, কপালে তিলক ইত্যাদির সাথে গুবগুবি, মন্দিরা ও একতারার মত ভারতীয় 'উদ্ভট' যন্ত্রের মোহমন্ত্রে নাকি ফিলাডেলফিয়া ডুবডুবু, বার্কলে ভেসে যায়। সেই রিপোর্টেই জানতে পেরেছিলাম বার্কলেতে 'প্রভো পার্কে' পূর্ণ দাসের গান আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে দল বেঁধে আমেরিকানরা "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" এমনভাবে গাইতে সুরু করে যে, বাউল নিজেই নাকি বেসামাল হয়ে যান। বাউল নবনী দাস বিশ্ব-বাউল রবীন্দ্রনাথের আসন্ন স্থান পেয়েছিলেন। আমেরিকায় কৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারক নবনী দাসের সুযোগ্য পুত্র বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস কেনেডির লাঞ্চের টেবিলে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। একি আমাদের কম গৌরবের কথা!

'বেঙ্গল ফোক ব্যাণ্ডের' মুদ্রিত প্রচারপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় সিলেটের একটি প্রচলিত ধামাইল গানের (আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া) ইংরাজী অনুবাদ ছাপানো হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণকে Lord Krishna বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'Lord Krishna is the God of great beauty and eternal youth.'

কিন্তু আমরা জানি সামন্ততন্ত্রের বাধা-নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে গৃহবন্দী গ্রাম্য পুরনারীর মুক্তির আকুতি রাধাকৃষ্ণের প্রতীক অবলম্বনে ব্যক্ত হয়েছে। এই কৃষ্ণ ভাগবতের কৃষ্ণ নয়। এ গাঁয়ের ছেলে।

'রাধা গেল জল আনিতে
কানাই লাগিল পাছ
হাতের বাঁশী ভূমে থুইয়া
কানাই মারে মাছ।'

এ হলো মাছ-মারা কানাই। কিংবা—

'আজকে যদি থাকতো আমার শ্যাম
আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিতো ঘাম।'

এ হলো গৃহকর্মরত রাধার ঘাম মুছিয়ে দেয়া শ্যাম। আমেরিকায় তিনি 'ডিভাইন' কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণচৈতন্যের' কৃষ্ণ। তাই তাঁকে করা হয়েছে "লর্ড কৃষ্ণ"।

"লোকধর্ম মহাশ্রমের" এই সঙ্গীত শাখাটি 'লোক নয় অলৌকিক ধর্মপ্রচারে' সেখানে ব্রতী। আমেরিকায় ভারত হলো বাঘ, সাপ, ম্যাজিক, সাধু ও অলৌকিকতার দেশ। কাজেই সেই ব্যাপার না হলে জমবে কেন? পি এল—৪৮০-এর গম খেয়ে, আগম-নিগমের যৌগিক সাধনায় মগ্ন ভারতের ছবিই শুধু আমেরিকার বাজারে ডলার অর্জন করতে পারে। কোনো পাঠক আমার এই বর্ণনাকে অত্যুক্তি যাতে মনে না করেন, সেজন্য সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত গত ৭ই মার্চ "ওয়াশিংটনের চিঠি" থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সহৃদয় পাঠকরা মন দিয়ে পাঠ করুন... "এই প্রেল্যাণ্ডের কনসার্ট হলে এক সন্ধ্যায় হিন্দু লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে হাজির হলুম। সেদিন ওখানেই রক মিউজিক এবং নানারকম আনকনভেনশনাল নাচ-গানেরও বন্দোবস্ত ছিল। হলের ভিতর খুব ভিড়। গাঁজার ধোঁয়া, চরসের সুগন্ধ এসবেরও প্রাবল্য ছিল। প্রমত্ত যুগল নৃত্য, একক আন্দোলন, তৎসহ সুরের সংস্পর্শ-শূন্য বিচিত্র চড়া পর্দার আওয়াজ ও ড্রামের 'গুরু গুরু, দুরো দুরো সুরভীরু দুরুহ দুরুহ' এসব অনেক পর যখন থিতিয়ে এল, তখন মাস্টার অব্‌ দি সেরিমনি মাইকে ঘোষণা করলেন: বন্ধুগণ, এবারে মঞ্চে আসছেন হিন্দু লোকসঙ্গীতের শিল্পীরা। দুলতে দুলতে টলতে টলতে শ্রোতা দর্শক অনুষ্ঠাতারা কেউ কেউ বাইরে চলে গেল। অনেকে জমিয়ে বসল। বসার ব্যবস্থা মাটির ওপরে। গান আরম্ভ হল: 'বাঁশি মুখচাঁদে ঠেকিয়াছি ফান্দে.. সজনী গো কী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া...।' খমকের খচমচ আর ঘুঙুরের রুনঝুনে সব মিলে গোটা আসরের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা নিবিড় পল্লীজন পরিবেশ আনন্দমান হয়ে উঠল। আনন্দলহরী বাজিয়ে হেলে দুলে ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে বাংলার যে সুদর্শন তরুণ বাউল সেদিন মঞ্চ মাতিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী।'

সেই চিঠিতে আরো অমূল্য তথ্য থাকলেও এ পর্যন্ত উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। পত্রপ্রেরক মহাশয় এর মধ্যেও 'পল্লীজন পরিবেশ" আবিষ্কার করেছেন সেটাই সানফ্রানসিস্কোর পল্লীজন পরিবেশ। আর সেই পরিবেশেই "বেঙ্গল ফোক ব্যাণ্ড" বাংলার লোকসঙ্গীতের "কৃষ্ণচৈতন্য" হিপিজন হিতার্থে বিতরণ করছেন। তারপর মুরশিদ আর কি বলতে পারেন? "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" শুনলাম আমেরিকান গীত এই গানের রেকর্ডটি ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে।
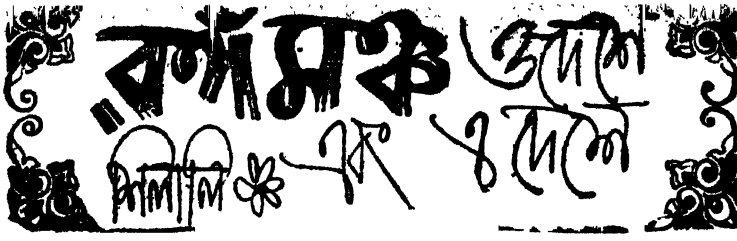
জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

লাইপজিগে অয়ারবাখস কেলার : ১৯৬৮ সালে এই জায়গাটি আমি দেখতে গেছিলাম। এটি ১৫৩০—৩৮-এ প্রতিষ্ঠিত একটি পানীয় ও খাদ্যের রেস্তোরাঁ গোছের। এখানে গায়টে এসে পানাহার করতেন এবং গল্পগুজবে সময় কাটাতেন—বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে এই পান্থশালায়—প্রত্যেকটি ঘরের দেওয়ালে ফাউস্টের বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি আঁকা আছে। ফাউস্টের প্রথম পর্বের পঞ্চম দৃশ্যটি এই অয়ারবাখস কেলার সম্বন্ধে।

This famous wine-room in Leipzig still attracts many visitors by virtue of its association with the early Faust legend, with the academic years of the young Goethe, and with this scene (Sc. V., Part I.) of Faust, which is founded in the legend and in experience.

অয়ারবাখস কেলারে ফাউস্টের বিভিন্ন দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম। মনে পড়ে গেল গর্ডন ক্রেগ, ইসাডোরা ডাঙ্কানকে নিয়ে এ দৃশ্যগুলো দেখতে লাইপজিগে এসেছিলেন এবং মুগ্ধচিত্ত ইসাডোরাকে ফাউস্ট থেকে কোরাস মিস্টিকাস আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

Pussy Cat !

"All things transitory
But as symbols are sent:
Earth's insufficiency
Here grows to Event:
The Indescribable,
Here it is done:
The Woman-soul leadeth us
Upward and on !"

বেয়ার্ড টেলর এই কোরাস মিস্টিকাস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন :

Chorus Mysticus: These lines, famous in the original through the whole world of poetry, mystically express the relation between the earthly and heavenly spheres. On the last two lines Taylor has the following excellent comment :

"Love is the all-uplifting and all-redeeming power on Earth and in Heaven; and to man it is revealed in its most pure and perfect form through Woman."

১৯৬৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী আমি ভাইমারে ছিলাম। এই শহরকে বলা হয় দি টাউন অভ গায়টে এ্যান্ড শিলার। এখানে উঠেছিলাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হোটেল এলিফান্টাতে।

বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান তাঁর 'লট্ ইন ভাইমার' নভেলে এই হোটেলটি সম্বন্ধে অতি সুন্দর এবং বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

The first letter of concession signed personally on February 17th 1696 by Wilhelm Ernst, by the Grace of God Duke of Saxony, Lilich, Cleves and Bergk—permission dictated to Christian Andreas Brittig and to his heirs and successors. Brittig was the tenant of the Black Beer, the oldest inn in Weimer.

ব্ল্যাক বিয়ার পান্থশালাটি ছিল আমাদের হোটেলের পরেই—এখানে আমি প্রত্যহ সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় আহার-পর্ব সমাধা করতাম।

গায়টে ভাইমারে আসবার পর থেকেই এলিফান্টাতে ম্যাডিরা পান করতে আসতেন। সে সময়কার নামজাদা অস্ট্রিয়ান কবি ফ্রান্জ্ গিলপার্জার ১৮২৬ সালে গায়টের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ভাইমারে—এই এলিফান্টা হোটেল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"The Elephant inn, famous throughout Germany, at the same time the ante-chamber to Weimer's living Valhalla.."

বার্লিন স্টিপ্টং আকাডেমীর কম্পোজার ছিলেন গায়টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি তাঁর বার বছর বয়সের শিষ্য ফেলিক্স মেন্ডেলসন বারথল্ডিকে নিয়ে ভাইমারে এসে উঠেছিলেন এই হোটেলে। এখানে আসবার উদ্দেশ্য ছিল গায়টের সঙ্গে দেখা করা। জুলাই মাসের তিন তারিখে ১৯২৬ সালে এবং ঐ বছরেই ২০শে অক্টোবরে হিটলার এই হোটেলে এসে ওঠেন। লেখা লিখেছিলেন লেখক এবং জার্নালিস্ট।

ভাইমারে গ্যয়টে এবং শিলারের বন্ধুত্ব হয় এবং সে বন্ধুত্ব এমন ঘনিষ্ঠতায় পর্যায়ে যায়—যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। এই দুই বিরাট প্রতিভার সংযুক্ত প্রভাবে জার্মানীর জাতীয় কৃষ্টির অগ্রগতি অব্যাহত রেখে স্ফুরণের চরম শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল।

গ্যয়টে প্রায় তিরিশ বছর ধরে ভাইমার থিয়েটারের পরিচালক এবং সর্বময় কর্তা ছিলেন। শিলারের সহযোগে তিনি চেষ্টা করেছিলেন to create a German Drama—an ideal Drama which was to represent the loftiest forms of Art.

এ'দের মধ্যে কে বড় কবি? এ প্রশ্ন নিয়ে জার্মানদের মধ্যে তখন দুটি দল হয়ে গিয়েছিল। আজকের দিনেও এ বিষয়ে মতানৈক্য একেবারে অপসৃত হয়নি। রোমেও এক সময় শিল্পীদের ভেতর মতবিভেদ দেখা যেত মাইকেল এঞ্জেলো এবং র‍্যাফায়েলের ভেতর তুলনা করে কে শ্রেষ্ঠ একথা প্রমাণ করতে গিয়ে। এ বিষয় গ্যয়টে বলেছেন—এ'দের যে-কোন একজনের শিল্পসৃষ্টির মাহাত্ম্য বুঝতে গিয়েই সারা জীবন কেটে যায়—এক সঙ্গে দুজনের প্রতিভার বিশ্লেষণ করবার জন্য অতিমানবিক শক্তির দরকার। তাই লোকে নিজেদের কাজকে সহজ করবার জন্য এক এক দলে গিয়ে যোগ দেয়।

নিজের এবং শিলারের কাব্য-প্রতিভার তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮২৫ সালে গায়টে একারম্যানকে বলেছিলেন : বিগত কুড়ি বছর ধরে জনসাধারণের মধ্যে বিতণ্ডা হয়েছে যে, আমার এবং শিলারের মধ্যে কে বেশি বড় কবি। জনসাধারণের এই ভেবেই পরিতুষ্ট থাকা উচিত যে, এ-জাতীয় তুলনা চলতে পারে—এমন দুজন ব্যক্তিকে তারা একই সময়ে তাদের মাঝে পেয়েছে।

ইওহান ক্রিশ্চিয়ান ফ্রিডরিশ শিলার (১৭৫৯—১৮০৫): শিলার হচ্ছেন প্রথম জার্মান নাটাকার—যাঁর খ্যাতি সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধুমাত্র ইংরাজীতেই তাঁর স্বরচিত নাটকের দৃশ্যের ওপর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৭৯২ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে শুধু উচ্চাঙ্গ নাটকের লেখক

শিলারকেই তাঁর জাতীয় জীবনের পথে দি—মধ্যবিত্ত সমাজের দিক ছিলেন সব থেকে প্রিয় কবি।

তাঁর জনপ্রিয়তার তিনটি বিশেষ কারণ ছিল :

(১) চিন্তাধারার সত্তীর আকর্ষণ।

(২) রচনাভঙ্গির বিষাদাত্মক ব্যঞ্জনা।

(৩) সমস্ত রচনায় মুক্তিবাদের প্রচার।

শিলার বড় ক্রাফটস্ম্যান ছিলেন—এ বিষয়ে তিনি শিক্ষানবিশী করেছিলেন মানহাইম এবং ভাইমার থিয়েটারে। হাই স্ট্রাং চরিত্র বলতে যা বোঝায় শিলার ছিলেন তাই। নিজের ভেতরকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চাপা উত্তেজনা তাঁকে তাঁর রচনায় অনুপ্রেরণা দিত। তাঁর রচিত ন'টি নাটকেই পাকা শিল্পীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম নাটক 'দি রবার্স' (১৭৮১) ভাষা এবং গঠনের দিক দিয়ে স্টার্ম এ্যাণ্ড ড্রাঙ্গ মুভমেন্টের চরম রূপায়ণের পরিচায়ক। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্বন্ধে একটিমাত্র ট্র্যাজেডী—'লাভ এ্যাণ্ড ইনট্রিগ' (১৭৮৪) লিখেছিলেন শিলার। এটিও স্টর্ম এ্যাণ্ড স্ট্রেস আন্দোলনের চিন্তাধারার বাহক।

এর পর 'ডন কারলোস' (১৭৮৭), 'ওয়ালেনস্টাইন' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন।

সমস্ত জীবনটাই তাঁর দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কেটেছে। জীবনের শেষ পাঁচ বছর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে শিলার মারা যান। জীবনের শেষ দশ বছর গ্যয়টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় শিলারের—একদিকে দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু—আবার লেখার ক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভেতর কোন নীচতা বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। দুজনেরই সৃষ্টি হোত অনবদ্য এবং জার্মান সাহিত্যের সমৃদ্ধি উন্নতির চরম শীর্ষে গিয়ে উঠেছিল।

'ডন কারলোসের' পর শিলার যে সব নাটক লেখেন তার সবই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এর আগেকার নাটকগুলোতে তিনি গদ্য ব্যবহার করেছেন।

১৮০১ সালে তাঁর 'ম্যারী স্টুয়ার্ট' প্রকাশিত হয়। এ নাটকের ট্র্যাজেডীকে ছাপিয়ে উঠেছে ম্যারীর আধ্যাত্মিক মুক্তির অনুভূতির দিকটা। তাঁর রোমান্টিক ট্র্যাজেডী—'দি মেইড অভ অরলিয়েন্সে' শিলার জোন অভ আর্ককে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক চরিত্র হিসাবে এবং সেইন্টরূপে। শেক্সপীয়ার 'হেনরী দি সিক্সথ' নাটকে জোনকে ডাইনী হিসাবে দেখিয়েছেন—ভল্টেয়ার তাঁর La Pucelle-এ জোনকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু শিলার এই সব মতবাদকে অগ্রাহ্য করে জোনকে জাতীয় জীবনে আবার আগের সম্মানিত জায়গায় ফিরিয়ে এনেছেন।

শিলারেরই রচনা থেকে সুইসরা তাঁদের ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল প্লে 'উইলিয়াম টেইল (১৪০৫)' নাটকটি পেয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 'ডন্ কারলোস' এবং 'উইলিয়াম টেইল' হচ্ছে শিলারের রাজনৈতিক অবদান।

শুধু নাটক এবং কাব্য রচনাতেই নয়, প্রবন্ধ এবং গ্যয়টের সঙ্গে লেখা চিঠিপত্রগুলোও শিলারকে জগৎসাহিত্যে অমর করে রাখবে।

আগেই লিখেছি ডিউক কার্ল অগাস্ট ভাইমারকে জার্মানীর ইন্টালেক্চুয়াল ক্যাপিটাল তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং এই ইচ্ছাকে কার্যকরী করবার জন্য প্রথমে গ্যয়টে এবং পরে হার্ডার ও শিলারকে ভাইমারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন।

হার্ডারের সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা দরকার। কারণ তদানীন্তন জার্মান সাহিত্যিকদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইয়োহান গট্‌ফ্রায়েড হার্ডার (১৭৪৪—১৮০৩) ছিলেন জার্মান লোকসাহিত্যিক, সমালোচক এবং অনুবাদক। পেশাতে তিনি ছিলেন লুথারিয়ান ধর্মপ্রচারক এবং শিক্ষক, কিন্তু তাঁর নেশা ছিল সাহিত্যচর্চা। কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই তিনি প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রুশোর 'প্রকৃতির বুকে ফিরে যাও' আন্দোলনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। বুদ্ধি-বিরোধী এক ধরনের রহস্যাবৃত নতুন দর্শন, যার সার বক্তব্য হল—প্রকৃতি নিজেকে মূর্ত করে

শিলার

অনুভূতি এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে— হার্ডারকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আদিম সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হওয়াতে, লোকসাহিত্য, ম্যাকফারসনের ওসিয়ানিক কাব্য প্রভৃতির প্রতি হার্ডারের একটা আন্তরিক আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে। লোক কাহিনী এবং গাথা সংগ্রহ করা এবং তার অনুবাদে যথেষ্ট সময় দিতেন হার্ডার। তাঁর নিজের রচনার মূল্যায়নের দ্বারা হার্ডারকে একটা খুব উঁচু জায়গা দেওয়া যায় না। কিন্তু অন্যদের ওপর তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মতামতের ছাপ এবং প্রভাব পড়েছিল বিশেষভাবে। তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাস বিবর্তনের পথ ধরে চলে—যুক্তিতর্কের থেকে অনুভূতির দিকটা বড়। স্বাধীন স্বাভাবিক পরিস্ফুটনই সাহিত্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে— নিয়মকানুন এবং আদর্শবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করলেই তা শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে উঠতে পারে না। হার্ডারের সব থেকে বড় অবদান হল জার্মান সাহিত্যকে নিও ক্লাসিকাল রচনারীতির কঠোর অনুশাসনের কবলমুক্ত করে স্বাভাবিক স্বচ্ছ গতিতে প্রবাহিত করা।

Herder directed the young Writers to the wellsprings of their own native traditions. He thus exercised an incalculable influence on Goethe and other German rebels of the Sturm and Drang movement.

ভাইমারে আর একটি দেখবার মত জিনিস হচ্ছে সংগীতজ্ঞ লিসটের বাড়ি। শিশুবয়স থেকেই এই হাংগেরিয়ান ছেলেটির ভেতর বিরাট প্রতিভার স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল। বার বছর বয়সে তাঁর পিয়ানো বাজানো শুনে বেটোফেন এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য পরিহার করে ছেলেটিকে দু' হাতে তুলে ধরে চুম্বন করেন। চোদ্দ বছর বয়সের সময় লিসট্ সাফল্যের সংগে একটি অতি সুন্দর ওপ্‌রেটা রচনা করেন —এটি প্যারিসে মঞ্চস্থ হয়।

লিস্‌টের জীবনী শিল্পগৌরব এবং শিল্পযশে ভরা। কনসার্ট পিয়ানিস্ট হিসাবে আজও কেউ বোধ হয় তাঁকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। পিয়ানো-সঙ্গীত, অর্কেস্ট্রা-মিউজিক, অর্গানের জন্য গান, কণ্ঠসংগীত সব কিছুই তিনি রচনা করেছেন—এবং এই সব সঙ্গীতের মান অতি উচ্চস্তরের। সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবেও লিসটের প্রচুর নামডাক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু যশস্বী সংগীতজ্ঞ ছিলেন লিসটের শিষ্য। ভাইমারের গ্র্যান্ড ডিউকের অনুরোধে তিনি ওখানকার মিউজিক ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৬১ সালে অবসর নিয়ে তিনি রোমে চলে যান এবং সেখানে ফ্র্যানসিসক্যান ধর্মযাজকদের দলের সংগে যুক্ত হন। ব্যাভারিয়ার বেরুথে তিনি মারা যান— এখানে ভাগনারের অনেকগুলো ওপেরার প্রডাকসন তাঁর পরিচালনায় সম্পন্ন হয়েছিল। লিসটের বাড়িতে বেটোফেনের ডেথ মাস্কটি সমস্ত আগন্তুকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাগনারকে যখন কেউ জানতো না, সেই সময়ে লিসট তাঁর তিনটি ওপেরা ভাইমারে মঞ্চস্থ করে ওখানকার সংগীতরসিকদের বিস্ময়াভিভূত করে দিয়েছিলেন।

আমার দোভাষী মিসেস মায়া বোস বললেন—ভাগনার পরে ফ্রানজ্ লিসটের মেয়ে কোজিমা ফন বিউলোকে বিয়ে করেন। কোজিমা অবশ্য ভাগনারের থেকে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন।

[ক্রমশ]

পূর্বের মত ঘনিষ্ঠতাও কমে এসেছিল। তা সত্ত্বেও নাটক এবং নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর মতামত ও বিশ্লেষণের বিষয়ে অনেকেই আগ্রহী ছিলেন। ডঃ ভট্টাচার্যের অকাল বিয়োগে বাংলার নাট্য আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বাংলায় নাটকের বিকাশের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নির্ভীক পর্যালোচকের প্রয়োজন, ডঃ ভট্টাচার্য পঞ্চাশ দশকে সে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রয়োজন এখন আরো বেশি অনুভূত হবে।

—অনুজ।

'শর্মিলা' নাটকের ৪০০তম অভিনয়ের স্মারক অনুষ্ঠান

আগামী ২৫শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারের 'শর্মিলা' নাটকের ৪০০তম অভিনয়ের স্মারক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র মহাশয় সভাপতি ও বিশিষ্ট নাট্যরসিক শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। এতদুপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় নাট্যকার-পরিচালক, শিল্পী ও মঞ্চের অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছেন।

ফিল্ম কার জন্য?

প্রশ্নোত্তরে ঋত্বিক ঘটক

[সম্প্রতি নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির পক্ষ থেকে চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেই প্রশ্নোত্তর উক্ত সংস্থার মুখপত্র 'চিত্রভাষ'-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বাংলা ছবির জগতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নোত্তরের গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রীঘটকের বক্তব্য আমরা পুনঃ প্রকাশ করছি।]

প্রশ্ন : আপনি কি উদ্দেশ্যে ফিল্ম করেন?

উত্তর : মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। সর্ব শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই মানুষকে ধরবার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন : সব ক্রিয়েটিভ আর্টস যেমন জীবনানুকরণ, আপনার মতে ফিল্মও কি সেরূপ জীবনের প্রতিচ্ছবি?

উত্তর : ফিল্ম একটা নতুন কিছু না। সব শিল্পে যেমন, তেমনি ফিল্মেও কতগুলো গভীরতম ঘটনা খুঁজে বের করতে হয়। আমি মনে করি ছবি একটা শিল্প। এবং যখন শিল্প, তাকে দায়ী হতে হবেই। দায়িত্ব মানুষের প্রতি। এ-কথাটা ভুললে চলবে না।

প্রশ্ন : যদি জীবনানুকরণ—তবে সে কোন্ জীবন? সমাজজীবন অথবা ব্যক্তিজীবন?

উত্তর : বর্তমানে ব্যক্তিজীবন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এখন সমাজজীবনটা অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। কাজেই, শিল্পের অনুরূপ থাকা উচিত মানবজীবনের সঙ্গে—সমাজজীবনের সঙ্গে। একটা ভাল লাগার প্রশ্ন আছে, যেটা না থাকলে শিল্পী হারিয়ে যায়। আমার মনে হয় সেটা শিল্পে বিকৃত একটা রূপ। এই কথাটা মনে রাখলে আমার আগেকার কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আর পাঁচটা ফরম্ অব আর্ট থেকে (যেমন সাহিত্য, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি) ফিল্ম ফরমের কি কোন পৃথক গুণ আছে?

উত্তর : কোন পৃথক গুণ নেই। মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং তাকে বিমোহিত করার যে ঘটনা, সেটা সব শিল্পেই সমান। এটা ফিল্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে কোন মূল্য দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। মানুষ মানুষই। তাদের স্নেহ একই ধারায় বর্ষিত হয় সর্ব শিল্পে। এখানে ফিল্মকে বড় করে ধরার কোন মানে আমি বুঝতে পারি না। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মেরও কি ফরম্ এবং কনটেন্টে পরিবর্তন ঘটে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : কনটেন্ট প্রথমে আসে। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলে গিয়েছিলেন যে, আগে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তার পরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ। কথাগুলোর মানে আপনারা ভাল করে বুঝে দেখবেন। ফরম্‌টা কিছু না, ওটা আকারমাত্র। যেমন তুলনা করতে পারি আন্দ্রে ভাইদা অনেক কষ্ট পেয়ে যে-সব ছবি তুলেছে সেগুলি অভ্রান্ত। মানবজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার একটা প্রশ্ন আছে। তার থেকে কনটেন্ট রূপ গ্রহণ করে এবং ফরম্ তার নিজস্ব গতি গ্রহণ করে। সেইটে আজকাল খুব কম পাওয়া যায়। লুই বুনুয়েলের পর মিজো-গুচি আজ নেই, ওজু আজ নেই, খালি কুরাসাওয়া করে খাচ্ছে। ফেলিনী বিক্রী হয়ে গেছে। এন্টনিওনী—সমস্ত ব্যাপারটার গভীরে ঢোকার মত মানসিকতা তার নেই। বার্গম্যান একটা জোচ্চোর। কেচিও-য়ালিনি কিছু ভাল চেষ্টা করেছিল ইতালীয় জাতীয় ছবিতে, কিন্তু সেও হারিয়ে গেল। ফরাসী নুভাল ভাগ এবং তার অনুকরণে পোলিশ

'বিষয়' ছবিতে পরিচালক ও নায়ক উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

'প্রথম কদম ফুল' ছবিতে সৌমিত্র ও তনুজা
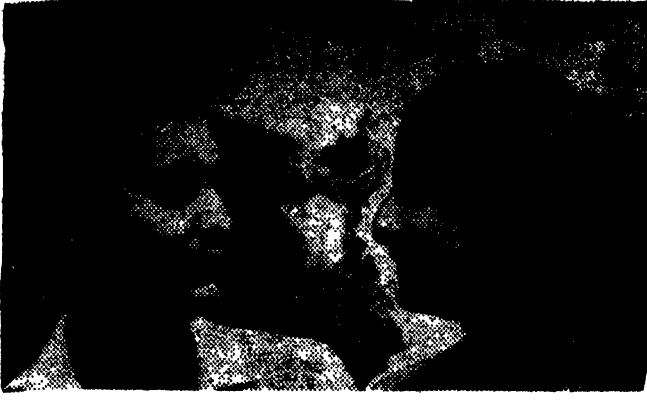
চেকোশ্লোভাক নুভাল ভাগ আমাকে পীড়িত করে। জাঁ পল সার্ত্রে ও আলবেয়ার কামুর চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছিল, সেগুলো অত্যন্ত শিশুসুলভ। এর মধ্যে কোন গভীরতা নেই। ছবির জগতে জালিয়াতি শার্লি ক্লার্কও করেছে তার কনেকশন ছবিতে, লিন্ডসে এন্ডারসন করেছে, কিন্তু এরা কোন গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি।

সমস্ত শিল্প ধ্রুব শিল্প। কিন্তু যদি সত্য হয় তাহলে আইজেনস্টাইন, পুডোভকিন, গ্রিফিথ, চার্লি চ্যাপলিন (প্রথমদিকের যুগ) এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সত্যিকার প্রচণ্ড শক্তির রূপ গ্রহণ করে। সেখানে আজকালকার বাদিরামী আমার কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। অবশ্যি ফেলিনীর 'দোলচা ভিটা' বুনুয়েলের সমস্ত কাজ বাদে। এ সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিককালের ইউরোপীয় চলচ্চিত্রগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের ফিল্মের ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের ফিল্মগুলির মধ্যে ফরম্ এবং কনটেন্টের কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

উত্তর : আমার মনে হয়—না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ফরাসী চালিয়াতীর অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছে। এটাকে আমি গভীরভাবে ঘৃণা করি। তাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই সব ছবির কোন মিল নেই। রাশিয়ান ছবিগুলো, দুই-একজন ডিরেক্টর ছাড়া, সম্পূর্ণ গাধার মত। সেগুলো নিয়ে কোন গভীর আলোচনার অবকাশ নেই। ভিয়েতনামের, কিউবার, চীনের ছবি আমি দেখি নি—সুতরাং এই সব দেশের ছবি সম্পর্কে কোন কথা বলার আমার অধিকার নেই। তারা যদি ভদ্রলোকের মত ছবি করে থাকে তো হলে ধন্যবাদ। আমি ও-বিষয়ে কোন কথা বলার অধিকারী নই।

প্রশ্ন : জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী কি কোন সিদ্ধান্তে আমাদের পৌঁছে দেয়?

উত্তর : শিল্পী খুঁজে ফেরেন। কখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, হয়ত কখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না। কিন্তু দুটোই ঠিক। শিল্পীর চেষ্টা থাকে, যে চেষ্টার অবসান একবার হয়। কিন্তু ঐ যে প্রশ্ন তুললো সেটাই মানুষকে আকর্ষণ করে, নাড়া দেয়, মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। সেইখানেই শিল্পীর সার্থকতা।

'মঞ্জুরী অপেরা' ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস।

জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এ'দের "মূল্যবান সহযোগিতা বিনা" তাঁর সাম্প্রতিকতম ছবি "মেরা নাম জোকার" তোলা সম্ভব হত না। মস্কো থেকে এ খবর দিয়েছে এ· পি· এন·

রাজকাপুরের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ক্যামেরাম্যান রাধু কর্মকার ও বোলশয় থিয়েটারের ব্যালেরিনা ক্সেনিয়া রিয়াবিনকিনা। রিয়াবিনকিনা "মেরা নাম জোকার" ছবিতে অভিনয় করে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এই "অভিজ্ঞতা তিনি কোনদিন ভুলবেন না।"

রাজকাপুর তাঁর ছবি তোলার ব্যাপারে সোভিয়েত সহযোগিতার জন্য সোভিয়েত সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী একাতারিনা ফুর্তসেভার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

তাশখন্দে আসন্ন আন্তর্জাতিক আফ্রিশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে রাজকাপুর তাঁর "মেরা নাম জোকার" ছবিটি প্রদর্শন করতে মনস্থ করেছেন।

মস্কোয় ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি মস্কোর ভ্যারাইটি থিয়েটারে সোভিয়েত সফররত ভারতীয় শিল্পীদের এক নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। এ খবর দিয়েছে তাশ-এ এ· পি· এন·

অনুষ্ঠানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করেন যথাক্রমে কুমকুম দাস ও কমলা।

মস্কোয় অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারতীয় নৃত্যশিল্পীরা রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শিল্পনগরী তামবভে তাঁদের অনুষ্ঠানে প্রশংসা পান। পরে তাঁরা লেনিনগ্রাদ ও তাশখন্দে অনুষ্ঠান করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ বছরেই দিল্লীতে আসছে জনপ্রিয় সোভিয়েত নৃত্যগোষ্ঠী "বেরিওজকা"। আর একটি ভারতীয় শিল্পীদল এই শরতেই সোভিয়েত সফরে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ

আগামী ৮ই আগস্ট শনিবার বৈতানিক এর প্রতিষ্ঠা দিবস। বৈতানিকের শিল্পীরা ঐ দিন রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ নামে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আলোচনা সহযোগে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৩৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে আরম্ভ হলো ভারতের সংগে ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ।

বোম্বাই-এ প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড জিতেছিল। কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। রাবার জয়ের সব কিছুই তাই নির্ভর করছিল মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের ফলাফলের ওপর। তবে দলগত শক্তির দিক দিয়ে ইংলণ্ড ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। ইংলণ্ডের শক্তির কাছে ভারত কিছুই নয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় কোন টেস্টেই ভারত ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারে নি। দ্বিতীয় টেস্টে ভারত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল শুধুমাত্র সময়ের অভাবের জন্যেই।

তাই ভারতের অতি বড় সমর্থকও আশা করতে পারেন নি যে, মাদ্রাজ টেস্টে ভারত সাংঘাতিক কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো 'রাবার' অমীমাংসিত রাখতে পারবে।

খেলাধূলায় সাধারণত কোন দলকে কিম্বা ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে কখন ছোট ভাবতে নেই অর্থাৎ আণ্ডার এস্টিমেট করতে নেই। জার্ডিনের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দলের সেই দিকে ছিল তীক্ষ্ন নজর। তাঁদের খেয়াল ছিল ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড ভ্রমণের সময় ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা।

প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা তাই রান তোলার দিকে নজর রেখে খেলতে লাগলেন সতর্কভাবে। কারণ অমর সিং-এর বোলিং ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের প্রতি মুহূর্তেই আক্রমণের তীব্রতা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

তবে ইংলণ্ডের সূচনাকারী ব্যাটসম্যানদ্বয়—বেকওয়েল আর ওয়ালটারস প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলেন। প্রথম উইকেটে তাঁরা যোগ করলেন ১১১ রান। মাত্র ১৫ রানের জন্যে বেকওয়েল শতরান করতে পারলেন না। ওয়ালটারস আউট হলেন ৫৯ রান করার পর।

এঁরা দুজন ছাড়া ব্যাটিং-এ নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন জার্ডিন (৬৫) আর শেষের দিককার খেলোয়াড় স্পিন বোলার ভেরিটি (৪২)। ইংলণ্ডের আর কোন ব্যাটসম্যানই অমর সিং-এর দুরন্ত বোলিং-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন নি।

॥ অমর সিং ॥

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে একমাত্র অমর সিং-ই দিয়েছিলেন অভাবনীয় নৈপুণ্যের পরিচয়।

প্রথম ইনিংসে অমর সিং-এর অসাধারণ বোলিং-এর কথা ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা চিরকাল মনে রাখবেন। অমর সিং-এর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য করে এসে সাপের মতো ছোবল দিতে চাইছিল।

তাই ৩৩৫ রানের মাথায় যখন ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল তখন দেখা গেল যে, মাত্র ৮৬ রান দিয়ে অমর সিং দখল করেছেন ৭টি উইকেট।

ভারত তার ইনিংস শুরু করলো ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। কলকাতা টেস্টের হিরো উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হাসান আর নিওমল জিওময় নামলেন ভারতীয় দলের ইনিংসে সূচনা করতে।

কিন্তু মাত্র ৫ রান করার পর আহত হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন নিওমল জিওমল। ওয়াজির আলী আউট হলেন ২ রান করে। দিলওয়ার হাসানও সুবিধে করতে পারলেন না। ভেরিটির বলে বারনেটের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়নে। তখন তিনি করেছেন মাত্র ১৩ রান।

ইংলণ্ডের ন্যাটা স্পিন বোলার ভেরিটির মারাত্মক বোলিং-এর বিরুদ্ধে কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারছিলেন না ভারতের ব্যাটসম্যানরা।

পর পর পড়ছিল উইকেট। সি· কে· নাইডু ২০ রান করে, অমরনাথ ১২ রানের মাথায়, মারচেণ্ট ২৬ রানে আর পাতিয়ালার মহারাজা ২৪ রান করে আউট হয়ে গেলেন। মাত্র ৪৯ রানের বিনিময়ে ভেরিটি পেলেন ৭টি উইকেট।

ফলে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে প্রথম ইনিংসে ভারত কিছুতেই পারলো না ১৪৫ রানের বেশি করতে। প্রথম ইনিংসেই রান সংখ্যার হিসেবে ইংলণ্ড তখন ভারতের চেয়ে ১৯০ রানে এগিয়ে।

তবু জার্ডিন ফলো-অন করালেন না ভারতকে। ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদেরই পাঠালেন তাড়াতাড়ি রান তোলার জন্যে।

সেই দিক দিয়ে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করলেন ওয়ালটারস। ওয়ালটারস-এর বেপরোয়া ব্যাটিং ইংলণ্ডকে তাড়াতাড়ি রান তুলতে খুব সাহায্য করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়ালটারস ছাড়া আর কেউ খুব একটা ভালো খেলতে পারেন নি। ওয়ালটারস-এর ১০২ রান দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডকে ত্বরান্বিতর রান তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

কারণ বেকওয়েল (৪), মিচেল (২৮), জার্ডিন (অপরাজিত ৩৫ রান), ল্যাংগারিজ (৪৬) আর নিকলস (২৬)—কেউই খুব একটা সুবিধে করতে পারেন নি। তবু তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ডের রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো সাত উইকেটে ২৬১তে। আর ঐ রানেই জার্ডিন ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

খেলার তখন আর মাত্র একদিন বাকী। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে ভারত যখন ব্যাট করতে নামলো তখন পিচের অবস্থা শোচনীয়। আর জয়লাভ করতে হলে ভারতকে তখন করতে হবে ৪৫২ রান। সে আশা একেবারেই ছিল না। তবে সময় কাটিয়ে দিনটাকে যদি পার করে দেওয়া যায় তাহলে অন্তত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পায় ভারত।

কিন্তু খেলার শুরুতেই বোঝা গেল যে, সে সম্ভাবনাও নেই। কোন রান করার আগেই আউট হয়ে গেলেন নিওমল জিওমল। দিলওয়ার হাসান আর ওয়াজির আলী হাল ধরতে চেষ্টা করলেন। কিছুটা সফল তাঁরা হয়েও-ছিলেন। কিন্তু ২১ রান করে ওয়াজির আলী আউট হয়ে যাবার পর সি· কে· নাইডুও ফিরে গেলেন মাত্র ২ রান করে।

ভারত তখন নির্ঘাৎ পরাজয়ের মুখোমুখি। ভাঙা পিচের সাহায্য নিয়ে ইংলণ্ডের দুই স্পিন বোলার ভেরিটি আর ল্যাংগারিজ লাটুর মতো বল ঘোরাতে শুরু করেছেন। সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানরা অসহায় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের যেন বিশেষ কিছু করারই ছিল না।

তবু শেষ চেষ্টা করে লালা অমর-নাথ মাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। বিজয় মার্চেণ্ট ঠিক মতো তাল দিতে গিয়েও পারলেন না। রানও যেমন উঠতে লাগলো তাড়াতাড়ি, তেমনি উইকেটও পড়তে লাগলো ঝটপট। মার্চেণ্ট আউট হয়ে গেলেন ২৮ রান করার পর।

পাতিয়ালার মহারাজা খুব তাড়া-তাড়ি রান তুলতে লাগলেন। ভাঙা উইকেটে স্পিন বোলারদের তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি ঠিকভাবেই খেলছিলেন। কিন্তু ৬০ রান করার পর ল্যাংগারিজের বলে ইলিয়টের হাতে ক্যাচ দিয়ে যখন আউট হয়ে গেলেন তখন বোঝা গেল যে, ভারতের ইনিংস প্রায় শেষ হয়ে এলো।

অমরনাথ তখনো ঠুকঠাক করে খেলছেন। কিন্তু পাতিয়ালার মহারাজার (তখন ছিলেন যুবরাজ) আউট হয়ে যাবার পর নাজির আলী ৮, সি· এস· নাইডু ০, আর মুস্তাক আলী আউট হয়ে গেলেন মাত্র ৮ রান করে। শেষ উইকেটে অমরনাথের সংগে খেলতে নামলেন অমর সিং।

দপ করে নিভে যাবার আগে প্রদীপটা যেন একবার জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ভরিয়ে তুললো। অমরনাথ নিজের দিককার উইকেটটি বাঁচিয়ে রাখলেন আর অপর প্রান্তে অমর সিং তখন শুরু করলেন তুলকালাম কাণ্ড।

রানের পর রান, বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী। খেলার চেহারাই তখন গেল পাল্টে। কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্যে নয়। ৪৮ রান করবার পর ল্যাংগারিজের বলে বারনেটের হাতে ক্যাচ দিয়ে অমর সিং আউট হয়ে গেলেন। সংগে সংগে ২৪৯ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। ২৬ রান করে অপরাজিত রইলেন অমরনাথ।

তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ভারত পরাজিত হলো ২০২ রানে। ২-০ খেলায় ভারতকে হারিয়ে রাবার লাভ করলো ইংলণ্ড।

[চলবে]

বিচিত্র এই দেশ

বিশ্ব কাপের আসর শেষ হতে না হতেই সমস্ত বিশ্বকে মাতিয়ে তুলেছিল উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্মৃতি ম্লান হয়ে যাবার আগেই শুরু হয়ে গেলো কমনওয়েল্থ ক্রীড়ানুষ্ঠান, আর তারপরই কুয়ালালামপুরে বসবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর। বিশ্ব কাপে আমরা ছিলাম না, উইম্বেলেডন টেনিসের গোড়ার দিকেই আমাদের খেলোয়াড়রা হেরে গেলেন। সামনে এখন কমনওয়েল্থ ক্রীড়ানুষ্ঠান আর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা। কমন-ওয়েল্থ গেমস-এর কোন কোন বিভাগে ভারত নাকি ভালো ফল দেখাবে, ভারতের কয়েকজনের ভাগ্যে নাকি সোনার মেডেল জুটে যাবার সম্ভাবনাও আছে। এই সম্ভাবনা যদি বাস্তবে রূপ নেয় তাহলে তার চেয়ে সুখের বিষয় আমাদের কাছে আর কি হতে পারে! আমরা তো তাই চাই, প্রতি মুহূর্তে সেই সাফল্যই আমরা কামনা করি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কমনওয়েল্থ গেমস-এ আমাদের প্রতিনিধিরা কি করেন! তবে এই লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে, ততোদিনে কমনওয়েল্থ গেমস শুধু জমেই উঠবে না—এগিয়েও যাবে অনেকদূর। আর বোধহয় তারপরই শুরু হবে কুয়ালালামপুরের মারডেকা ফুটবল প্রতি-যোগিতা। এখানেও ভারত প্রতিদ্বন্দ্বী। জানিনে এবারও ভারত দেশের মানসম্মান ডুবোতে, লোক হাসাতে ওদেশে যাচ্ছে কিনা! গত বছর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী আটটি দলের মধ্যে ভারতের স্থানটি ছিল অষ্টম। এ কথা আমরা ভুলি নি। সহজে ভোলা বোধহয় সম্ভবও নয়।

সুতরাং আর যাই হোক, আমরা অন্তত আশাবাদী নই। খেলাধুলোকে কেন্দ্র করে মিথ্যে আশার ছলনায় আর আমরা ভুলি না। আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের সংগে আমাদের দেশের খেলার মানের তফাৎটা আমরা আজ ভালোভাবেই জানি। আটটি দলের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করার কৃতিত্বের জ্বালা সইতে সইতে আমরা আজ অনেক পোক্ত। আশা আমরা করি না বটে, সাফল্যের স্বপ্নে আমরা বিভোরও হই না, কিন্তু দিনের পর দিন এইভাবে পিছিয়ে পড়াকেও তো ঠিক স্বাভাবিকভাবে আমরা নিতে পারি না। কেন ভারতের আজ এই হাল—সব থেকে প্রয়োজনীয় এই প্রশ্নটি নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামান না। খেলোয়াড়রা যেজন্যে খেলেন তা ঠিক মত পেয়ে যান, ক্লাব পায় ট্রফি, অন্ধ সমর্থকরা তাতেই খুশি—কিন্তু যাঁরা খেলা-ধুলোর মান আরো উন্নত দেখতে চান, যাঁরা চান ভারতের খেলাধুলা আরো উন্নত হোক—তাঁরা তো আজ কোন মতেই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। ফুটবল খেলায় ভারতের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা শুধু অন্ধকারই দেখছেন। তবে ভারতীয় ফুটবল জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা যে আলোতেই আছেন, তাতে আজ আর কারো সন্দেহ নেই। সত্যি, বড় বিচিত্র আমাদের এই দেশ......! শান্তিপ্রিয়।

ফুটবল মাঠে

ইস্টবেঙ্গল আগেই একটা পয়েন্ট নষ্ট করে বসেছিল। এখন পর্যন্ত মহামেডান স্পোর্টিং নষ্ট করেছে তিন পয়েন্ট। বাকী ছিল মোহনবাগান। সম্প্রতি টালীগঞ্জ অগ্রগামীর সঙ্গে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ করায় মোহনবাগানও হারিয়েছে একটি পয়েন্ট। মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের হারানো পয়েন্ট সংখ্যা এখন সমান সমান। তবে দু' দলের কেউই এখনো পরাজয় স্বীকার করে নি।

কলকাতা ময়দানে খেলার মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সংগে তাল দিয়ে যে খেলা পরিচালনা করার মানও নেমে যাবে এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। নামকরা সব রেফারী বিভিন্ন খেলায় যেভাবে খেলা পরিচালনা [illegible] অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। আর এর জন্যে সব থেকে বেশি খেসারত দিতে হচ্ছে ছোট ছোট দলগুলোকে।

আমরা আশা করবো নিজেদের সুনাম বজায় রাখতে সি· আর এ· কর্তৃপক্ষ আরো বেশি সচেতন হবে। বাংলা দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের মতো রেফারীরাও ছিলেন ভারতে সর্বসেরা। শুধু তাই নয়—এঁদের কয়েকজনের ভাগ্যে জুটেছে আন্তর্জাতিক সম্মানও।

কিন্তু এবার কলকাতা ময়দানে তাঁদের খেলা পরিচালনা করার যে ধারা আমরা বার বার দেখছি তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু কেন এই অবনতি?

ও কথা থাক। কলকাতা ময়দানে খেলার [illegible] এবার খুব একটা ভালো নয়। সুপার লীগে কোন্ কোন্ দল উঠবে, এই নিয়ে এখন আরম্ভ হয়ে গেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং অবশ্য এই টাগ-অফ-ওয়ারের বাইরে আছে। মনে হয় এই তিনটি দলের প্রত্যেকটিই সুপার লীগে খেলবে। বাকী দু'টি দল নিয়ে যেমন লীগ তালিকার কিছুটা ওপর মহলে চলেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তেমনি দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যাবার আশঙ্কায় লীগ তালিকার তলার দিককার দলগুলোর মধ্যে চলেছে প্রথম বিভাগে টিকে থাকার [illegible] প্রচেষ্টা।

তাই সব মিলিয়ে কলকাতার ফুটবল মরশুম এখন বেশ জমে উঠেছে। তবে বড় দলগুলোর নামী খেলোয়াড়দের অনেকেই এখন মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে অনুশীলন শিবিরে চলে যাওয়ায় বড় দলগুলো কোন কোন সময়ে একটু-আধটু বিপাকে যে পড়ছেই, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন।

সমাচার দর্পণ

আগামী ৩০শে জুলাই থেকে কুয়ালালামপুরে ১৩তম মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হচ্ছে। এবারের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ১২টি দেশকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ভারতের স্থান 'এ' গ্রুপে। ভারত ছাড়া 'এ' গ্রুপের অন্য দলগুলো হলো—মালয়েশিয়া, বার্মা, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, সাউথ ভিয়েতনাম, ও তাওয়ান। গ্রুপ 'বি'-তে আছে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সাউথ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং ও সিঙ্গাপুর।

নিচে খেলার সম্পূর্ণ সূচী দেওয়া হলো :

৩০শে জুলাই

মালয়েশিয়া : সাউথ ভিয়েতনাম
ভারত : তাওয়ান

৩১শে জুলাই

হংকং : সিঙ্গাপুর
সাঃ কোরিয়া : থাইল্যান্ড

১লা আগস্ট

বার্মা : ওঃ অস্ট্রেলিয়া
ইন্দোনেশিয়া : জাপান
তাওয়ান : সাঃ ভিয়েতনাম
মালয়েশিয়া : ভারত

২রা আগস্ট

থাইল্যান্ড : হংকং
সাঃ কোরিয়া : সিঙ্গাপুর

৩রা আগস্ট

ওঃ অস্ট্রেলিয়া : সাঃ ভিয়েতনাম
বার্মা : ভারত

৪ঠা আগস্ট

থাইল্যান্ড : সিঙ্গাপুর
মালয়েশিয়া : তাওয়ান

৫ই আগস্ট

ওঃ অস্ট্রেলিয়া : ভারত
বার্মা : সাঃ ভিয়েতনাম

৬ই আগস্ট

জাপান : হংকং
ইন্দোনেশিয়া : সিঙ্গাপুর

৭ই আগস্ট

বার্মা : তাওয়ান
মালয়েশিয়া : ওঃ অস্ট্রেলিয়া

৮ই আগস্ট

জাপান : থাইল্যান্ড
ইন্দোনেশিয়া : সিঙ্গাপুর

৯ই আগস্ট

সাঃ কোরিয়া : হংকং
মালয়েশিয়া : বার্মা
ওঃ অস্ট্রেলিয়া : তাওয়ান
ভারত : সাঃ ভিয়েতনাম

১০ই আগস্ট

জাপান : সিঙ্গাপুর
ইন্দোনেশিয়া : থাইল্যান্ড

১২ই আগস্ট

সেমিফাইন্যাল

গ্রুপ 'এ' বিজয়ী : গ্রুপ 'বি' রানার্স এবং ৯ম ও ১০ম স্থানের জন্যে খেলা

১৩ই আগস্ট

সেমিফাইন্যাল

গ্রুপ 'বি' বিজয়ী : গ্রুপ 'এ' রানার্স এবং ১১শ ও ১২শ স্থানের জন্যে খেলা

১৫ই আগস্ট

৩য় ও ৪র্থ এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থানের জন্যে খেলা

১৬ই আগস্ট

ফাইন্যাল খেলা

এবং ৭ম ও ৮ম স্থানের জন্যে খেলা

১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইংলণ্ড দলের নেতা ববি মূর সতীর্থ জনকয়েক খেলোয়াড়ের সংগে তখন সিনেমা হলে ছবি দেখছেন। এমন সময় একদল পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি ছশো স্টার্লিং দামের একটি ব্রেস-লেট চুরি করেছেন।

রেডিও ও খবরের কাগজ মারফৎ সমগ্র বিশ্বের লোক জেনে গেলো এ ঘটনা। বিশ্ববাসী হতবাক। ইংলণ্ডের জনগণ বিস্মিত। তবে তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, ববি এ কাজ করতে পারে না। সুদর্শন, প্রভূত অর্থের অধিকারী ববি মূরকে যাঁরা চেনেন তাঁরা দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ববির দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। খবর শুনে ববির স্ত্রী শ্রীমতী মূরও সাংবাদিকদের কাছে এর সামান্যতম সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল? কলম্বিয়া ও ইক্যুয়েডোর স্বল্প সফর শেষে বোগোটায় এক জুয়েলারী দোকানে মূর ও কয়েকজন সহ-খেলোয়াড় কিছু কেনা-কেটা করতে ঢোকেন। এখানে ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে অনেক সস্তায় স্বর্ণালংকার পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ বাদে কোন কিছু কেনা-কাটা না করেই তিনি যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন কয়েকজন পুলিশ তাঁকে আটকায়। তাঁর বিরুদ্ধে জিনিষ সরানোর অভিযোগ শুনে তিনি তক্ষুনি তাঁর দেহ সার্চের অনুমতি দেন। কিন্তু পুলিশ অফিসার জানান যে, দোকানের কর্মচারীর ধারণা যে, তা করে লাভ হব না, কারণ তিনি সেটা এতক্ষণে পাচার করে দিয়েছেন। দোকানের মালিক তখন দোকানে ছিলেন না।

যাই হোক, এ ব্যাপারটা এখানেই ধামাচামা পড়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, একেবারে শেষ মুহূর্তে মেক্সিকো যাওয়ার পূর্বাহ্নে আদালতের পরোয়ানা বলে মূরকে আটক করা হয়।

আদালতে মামলা ওঠে। প্রধান-মন্ত্রী উইলসন এ ব্যাপারে মূরের স্বপক্ষে ব্যবস্থা নিতে ওই দেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্র-দূতকে নির্দেশ দেন।

দলনায়ক ছাড়াই ইংলণ্ড দল মেক্সিকো রওনা হয়ে যায়। ববিকে নজরবন্দী করে রাখা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কুমারী ক্লারা নামে যে তরুণীটি মূরের বিপক্ষে প্রধান সাক্ষী ছিলেন তিনি শেষ মুহূর্তে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলার দরুন মামলা প্রায় ফেঁসে যায়। বাধ্য হয়ে ববিকে ছেড়ে দিতে হয়। যদিও তা শর্ত-সাপেক্ষে।

বাগোটায় এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। সেখানে বিদেশী অতিথিদের এভাবে অপদস্থ করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত এঁটে দোকানদাররা বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে নেয়। অনর্থক পুলিশী ঝামেলা ও মিথ্যে অপবাদের ভয়ে অধি-কাংশ মানুষকেই কিছু আক্কেল সেলামী দিয়ে রেহাই পেতে চায়।

ইতিপূর্বে গহনা চুরির দায়ে [illegible] করা হলে তিনি উক্ত দোকানদারকে নগদ যাট পাউণ্ড গাঁটগচ্চা দিয়ে রেহাই পান।

একজন আমেরিকান ট্যুরিস্টকেও এভাবে নেকলেশ চুরির দায়ে নাইট ক্লাব থেকে ধরা হয়। তিনি কোনরূপ আপোষে সম্মত না হওয়ায় বিচারে তাঁর দুশো পাউণ্ড জরিমানা হয়।

ইতিপূর্বে উরুগুয়ে এবং ব্রেজিল ফুটবল দলকেও এভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলে জানা গেছে।

মেক্সিকোতে জনৈক মার্কিনী ব্যব-সায়ী এ সম্বন্ধে বলেন যে, ছমাস পূর্বে তিনি উক্ত শহরে একটি দোকানে গেলে একজন পুলিশ তাঁকে ঐ দোকানের আংটি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করলে তাঁকে পুলিশ অফিসার আটচল্লিশ ঘণ্টা আটক রাখার হুমকি দেন। তখন দোকানদার তাঁকে একশো ডলার আপোষে দিয়ে দেবার পরামর্শ দেয়। তিনি নিতান্ত বাধ্য হয়ে একশো ডলার জরিমানা দেন।

এই ঘটনার পর আমেরিকান অ্যাম-বাসী থেকে এই বলে মতামত জানানো হয় যে, তাঁরা আশ্চর্য হচ্ছেন, কোন ব্রিটিশ হাই কমিশন ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে আগে সতর্ক করে দেন নি।

সে যাই হোক, এ ঘটনা যে ববি মূরের জীবনের সবচেয়ে কলংকিত অধ্যায়, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। এর পর ববি মূর বিশ্ব কাপে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেলেও এ ঘটনা যে তাঁকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে, এ কথা না বললেও চলে। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা ইংলণ্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটবল খেলোয়াড় ববি মূর চিরকালই দেশ-বাসীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে থাকবেন। বোগোটায় ব্রেশলেট চুরির অভিযোগ তাঁর সুনামে আঘাত হানতে পারবে না।

বিশ্ব কাপে এবারের ইংলণ্ডের পরাজয়ের অনেক কারণের মধ্যে যেমন ব্যাঙ্কসের না খেলা একটি কারণ, তেমনি এ ঘটনাও অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে বলে অনেকের অভিমত।

সম্পাদিকা—[illegible] সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

প্রেতের সঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা • জয়ন্তী সেন

বৃহস্পতিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 30th July, 1970

আই-এম-এ আহূত ধর্মঘট অযৌক্তিক ও অমানবিক

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-নেতৃত্ব চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি, চিকিৎসকদের ওপর দলবদ্ধ হামলা ও গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে সারা পশ্চিমবঙ্গে আগামী পয়লা আগস্ট কর্মবিরতির (ধর্মঘট) ডাক দিয়েছেন।

এসোসিয়েশনের স্টেট কাউন্সিলের পঁচিশ জন সদস্য প্রস্তাবিত কর্মবিরতিকে জন-বিরোধী আখ্যা দিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ঐ সদস্যদের অভিমতে (১) চিকিৎসক-ধর্মঘট জনগণের সঙ্গে ডাক্তারদের তিক্ততাই বৃদ্ধি করবে, (২) চিকিৎসক ধর্মঘট অমানবিক ব্যাপার, (৩) চিকিৎসক ও চিকিৎসা কেন্দ্রে যে অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তা নিরসনের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের সঙ্গে চিকিৎসকদের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

এতদ্ব্যতীত এসোসিয়েশন এ-যাবৎকাল যা করেছেন তা খুব সুখের নয়, এমন অভিযোগও এসোসিয়েশনের ধর্মঘট-বিরোধী পঁচিশ জন স্টেট কাউন্সিল সদস্য তাঁদের বিবৃতিতে উত্থাপন করেছেন।

আমরা একথা সরল এবং অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলতে চাই যে, ডাক্তারদের ওপর যে-কোনো রকম হামলা ও গুণ্ডামী অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার, কিন্তু তার বদলা হিসেবে আই-এম-এ কর্তৃক কর্মবিরতির আহ্বান অমানবিক ও অযৌক্তিক। তাই ঐ ধর্মঘট কোনো মতেই সমর্থনীয় নয়। একথা সকলেই জানেন যে, যুদ্ধের সময়ও চিকিৎসক ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে শত্রু-পক্ষ নিধন ও ধ্বংস করে না। একমাত্র মানবিক কারণেই তা করে না। আর এই অনগ্রসর দেশে যখন চিকিৎসার অভাবে জনসাধারণ চরম দুর্ভোগ ভোগ করেছেন, তখন ডাক্তাররা সেবার মনোভাব না নিয়ে নিজেদের স্বার্থ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিভাবে কথা, সব চিকিৎসকই প্রস্তাবিত ধর্মঘটের পক্ষে নন।

যে এসোসিয়েশন ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে, তা কি পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ-সংখ্যক চিকিৎসকদের প্রতিনিধিত্ব করে? সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মাত্র শতকরা পঁচিশ জন চিকিৎসক এসোসিয়েশনের সদস্য এবং অন্যান্য প্রদেশের সদস্য সংখ্যা আরো কম। অথচ ঐ এসোসিয়েশন ধর্মঘটের ডাক দিতে দ্বিধা বোধ করে নি।

আমরা আগেই বলেছি চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে যে-কোনো রকম হাঙ্গামা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। কিন্তু ঐ কারণে প্রস্তাবিত ধর্মঘট ও প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে? তা কি সরকারের বিরুদ্ধে? বর্তমান সরকার তো সি-আর-পি আমদানী করা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। ডাক্তাররা কি চান তাঁদের পিছু পিছু সি-আর-পি বন্দুক ঘাড়ে করে যাক আর ঐভাবে ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে থাকুন? নিশ্চয়ই এভাবে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে জন-সাধারণের দুর্গতিই বাড়বে। এই নৈতিক দায়িত্বের কথা স্বীকার করে প্রস্তাবিত ধর্মঘট তুলে নেওয়া উচিত এবং চিকিৎসকরা যেমন জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমনি চিকিৎসকদের নিরাপদ-বোধের জন্য জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য অনিবার্য—এই জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির দ্বারাই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (আই-এম-এ) ইতিপূর্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত নানা অব্যবস্থা ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারে নি এবং জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পক্ষে সমিতির আগ্রহ দেখা যায় নি।

উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবীতে নাকি ধর্মঘট? আমরা এই প্রসঙ্গে আই-এম-

কলকাতার সরকারী হাসপাতালগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার (এঁদের মধ্যে সার্জেন, গাইনিকলজিস্টের সংখ্যাই বেশি) হাসপাতালে রোগীদের নম্বর দেখে প্রাইভেট চেম্বারে যেতে বাধ্য করেন, তাঁদের কাছ থেকে ৩২/৬৪ টাকা ফি আদায় করেন এবং প্রয়োজনে আরো অর্থের বিনিময়ে হতভাগ্য রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির সুপারিশ করেন—এ ধরনের নিত্য-অনুষ্ঠিত দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আই-এম-এ আজ পর্যন্তও কি কিছু করেছে? হাসপাতালে দিনের পর দিন দুঃস্থ রোগীরা যায়, কিন্তু সুচিকিৎসা পায় না। প্রবীণ চিকিৎসকদের বিশেষ করে বড় বড় ডাক্তারের মুখ দেখতে পাওয়াও পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে হয়। অবশ্য এমন ডাক্তারও রয়েছেন, যাঁদের ব্যবহারে, সদয় সৌহার্দ্যে ও সাহায্যে রোগীরা আশ্বস্ত হয়।

বছরের পর বছর ধরে হাসপাতালের অপ্রতুলতা, শয্যার অভাব, ঔষধের অভাব, রোগীর খাদ্যের নিম্নমান, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকদের ও ঔষধপত্রের অভাব সম্পর্কে এসোসিয়েশন এতোকাল কি করেছে এ প্রশ্ন করাও নিশ্চয়ই অন্যায় নয়?

বর্তমানে এসোসিয়েশন জনসাধারণ ও চিকিৎসকদের মিলিত আন্দোলনের পথে উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবি করেছেন। নিশ্চয়ই সে দাবি কর্মবিরতির মাধ্যমে জন-সাধারণের অসুবিধা ঘটিয়ে পূরণ হতে পারে না। একমাত্র অধিকতর জন-সৌহার্দ্য লাভেই জনগণকে সঙ্গে লাভ করা যায়। আমরা মনে করি, সেকথা বিবেচনা করে আই-এম-এ নেতৃত্ব প্রস্তাবিত কর্মবিরতি থেকে বিরত থাকবেন।

আজকের মানুষ

রূপকথার কাহিনীতেই কেবল নয়, বাস্তব ঘটনার ক্ষেত্রেও জাতির জীবনেতিহাসে এমন এক-এক মহূর্ত আসে, যখন ঘুটে-কুড়ানির ছেলেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। আচার্য কৃপালনী অবশ্য সে-অর্থে ঘুটে-কুড়ানির সন্তান নন, বরং বোম্বাই-এর এক অভিজাত পরিবারেই তাঁর জন্ম। কিন্তু স্বতন্ত্র আর সিন্ডিকেট কংগ্রেসের মধ্যে তাঁকে মধ্যস্থের ভূমিকায় দেখে আমাদের ওই তুলনাই মনে এসে গেল। ভারতের চঞ্চল ও গতিশীল রাজনৈতিক জীবন থেকে আচার্য কৃপালনী ছিলেন কার্যত বিচ্যুত, বিচ্ছিন্ন। আর সেই বিস্মৃতপ্রায় হারিয়ে-যাওয়া অথর্বকে দেখা গেল আজ যবোচিত প্রাণ-চাঞ্চল্য নিয়ে মোড়লী করতে, নতুন ম্যিরোরী হাজির করতে। কৃপালনীজীর বয়স হলো কত? তা বিরাশি-তিরাশি তো হবে। সেই ১৮৮৮ সালে না তাঁর জন্ম?

মোড়লী করার হক্ একদিন আচার্যের অবশ্যই ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে ছিলেন তিনি, তাঁর অঙ্গুলি হেলনে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকার গাছপালা পর্যন্ত আন্দোলিত হতো! কিন্তু সে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তো কৃপালনীজী নিজেই মলিন করেছেন। তাঁকে জরায় পেয়েছে, ফেলে-আসা ইতিহাসের পাতাও যেন আজ জীর্ণ। জাতির ইতিহাসের পাতায়-পাতায় আচার্য কৃপালনীর বহুল উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে-ইতিহাসের সংগ্রামের অধ্যায়ের শেষে যখন শান্তি বা সংগঠনের পালা এলো, তখনই যেন তিনি আর টাল সামলাতে পারলেন না। ছিটকে পড়লেন তিনি দূরে, গেলেন সহযোদ্ধাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে।

দীর্ঘকাল বাদে আজ যেন তিনি সেই পুরোনো সাথীদের চিনতে পেরেছেন অবলুপ্ত সংযোগ-সেতু খুঁজে পেয়েছেন। সেই রাজাগোপালাচারী, সেই মোরারজী দেশাই। আজ জাতির জীবনে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে একদিকে দেশ আজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে; আর অন্যদিকে শ্রীমতী গান্ধীর "স্বৈরাচার, একচেটিয়া ক্ষমতাপ্রিয়তা"র বিরুদ্ধে এক-জোট্টা হতে চাইছে "জাতীয় গণতান্ত্রিক" সম্মেলন। সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের এ-আই-সি-সি [illegible] প্রস্তাবের মাধ্যমে টোপ ফেলা হয়েছে। ভগবানকে নিক্ষিপ্ত সে-টোপ মাটি স্পর্শ করার আগেই লুফে নিয়েছেন স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ইত্যাদি রাজনৈতিক দলনেতারা। কিন্তু দুনিয়ার হালচাল আজকাল এমনই, নিচুতলার কর্মীরা আজ এমনই বেয়াড়া হয়ে উঠেছে যে, পরমশ্রদ্ধেয় নেতারা যা উদ্গিরণ করেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাই গলাধঃকরণে তারা রাজী হয় না। কথা বা প্রস্তাবের ভাল-মন্দ বিচার করতে চায় সাধারণ র‍্যাংক এ্যান্ড ফাইল কর্মীরা। তাছাড়া সংগঠনপন্থী কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘের মহামিলনে যে গ্র্যান্ড এ্যালায়েন্স বা মহান ঐক্যের কথা প্রচার করা হচ্ছে তা

আচার্য কৃপালনী

শেষ পর্যন্ত কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, তার খুঁটিনাটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নেতারাও এখনো একমত হতে পারেন নি। মতানৈক্য রয়েছে। আর সেই মতের বিভিন্নতার সুযোগ নিয়েই অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য কৃপালনী আসরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, দু' পক্ষের—সিন্ডিকেট কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র—হাত মেলাবেন বলে।

বোম্বাই এবং পুণায় পড়াশোনা করার পর ১৯১২ সালে কৃপালনী অধ্যাপনার কাজ নেন। মজঃফরপুরের কলেজে অধ্যাপনার সময়েই তিনি রাজনীতির গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অবশ্য তখন ছিল দস্তুরমতো নাটকীয়। গান্ধীজী ১৯১৭ সালে চম্পারণে নীল [illegible] শুরু করলেন। কৃপালনী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে পারলেন না, ছুটি নিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] নিজেকে নিয়োগ করলেন। সেই থেকে কৃপালনী সেবক।

চম্পারণে গান্ধীজীর কী আশীর্বাদ পেয়েছিলেন জানি না, কৃপালনীর কিন্তু পদোন্নতি ঘটলো। পুরো সময়ের জন্যে রাজনীতি করার ঝুঁকি নিতে তখনো তিনি সাহসী হন নি, অধ্যাপনায় ফিরে গেলেন, তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবার। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৮ সনে। এখানে দু' বছর কাজ করার পর আবার ডাক এলো—কর্তব্যের আহবান। শুরু হলো ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন '২০ সালে—কৃপালনী তাতে সৈনিকের সামান্য ভূমিকায় অংশ নিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খাদি ও গ্রামোন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হলেন তিনি। গান্ধী-আশ্রমও গড়ে তুললেন। বছরখানেক বাদে আবার শিক্ষকতায় ফিরে গেলেন, যদিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ বা আচার্যের পদ নিলেন, সেই থেকে কৃপালনীজী আচার্য।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, জ্বালাময়ী বাগ্মিতা ইত্যাদি গুণের কারণে আচার্য কৃপালনীর পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভে বেশি দেরি হয় নি। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ থেকে জেনারেল সেক্রেটারী; এ পদে ১৯৩৪—৪৬ সন পর্যন্ত থাকার পর কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের গৌরবমণ্ডিত পদ পেলেন '৪৬ সালে। কৃপালনীজী গণপরিষদের সদস্য ছিলেন (১৯৪৬—৫১) কংগ্রেস দলভুক্ত হিসেবেই, কিন্তু '৫১ সনে কংগ্রেস ছাড়লেন।

তার পরবর্তী ইতিহাস শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসার করুণ কাহিনী। প্রথমে তিনি কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির পত্তন করলেন ১৯৫১ সালে। সে দল সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবার পর পি-এস-পি'র নেতৃত্ব দিলেন। এ দলের চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করলেন '৫৪ সনে, কিন্তু '৬০ সাল পর্যন্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েই রইলেন। সম্পর্ক ত্যাগ করে কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থনে নির্দল সদস্য হিসেবে পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন, রেকর্ড ভোটের ব্যবধানে শ্রীকৃষ্ণ মেননের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। তবে, ১৯৫৭ ও '৬২ সালে অবশ্য কৃপালনীজী আবার জয়যুক্ত হয়েছেন এবং পার্লামেন্টের সদস্য রয়েছেন। পার্লামেন্টে কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন জোরাল বক্তা হিসাবে আচার্য কৃপালনীর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে, যদিও তাঁর সদাপরিবর্তনশীল মত ও নীতির কারণে তিনি যে কী চান বা কী চান না, তা বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র

সুভাষ-জিন্না প্রসঙ্গের উপসংহারে কামাল আতাতুর্কের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে যাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতা-কামীদের সামনে প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে সাম্প্রদায়িকতা ব্যাপারটি এসে গিয়েছিল। কিভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে লড়াই করবেন—তা সুভাষচন্দ্রকে ভাবতে হয়েছিল। আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু স্পষ্টই জানতেন, তার দ্বারা সর্বাঙ্গীণ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র চিরদিনই ইতিবাচক আদর্শে বিশ্বাস করেছেন এবং সংগ্রামের চেয়ে অধিক ইতিবাচক আর কিছু জানেন নি। সেই সংগ্রাম নানা পর্যায়ে নানাভাবে হতে পারে। কখনো তা মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন, যা তিনি বারে বারে করেছেন নানা স্থানে বক্তৃতাকালে বা ঘরোয়া সভায় আলোচনার সময়ে। পূর্ববঙ্গে, পাঞ্জাবে এবং লখনৌয়ে এইকালে সফরের সময়ে প্রায় প্রতিটি জনসভায় মুসলমানদের কাছে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান একথা সত্য নয়; যদি মনে হয় কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান, তাহলে তার সে চরিত্র মুসলমানেরা দূর করতে পারে কংগ্রেসে বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়ে, তার নেতৃত্ব অধিকার করে। কিন্তু কেন মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দেবে? উত্তরে একটি অকাট্য যুক্তি তুলে ধরেছিলেন—কংগ্রেসই ভারতবর্ষে একমাত্র প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করছে।

স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আইনসভার মুসলমান সদস্যদের সঙ্গে কোয়ালিশন করে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি নষ্ট করার প্রয়াসও তিনি করেছেন। বাংলার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে তিনি সফল হতে পারেন নি, সফল হয়েছিলেন আসামে, পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাপারটির আলোচনা করব। খাকসারদের সঙ্গেও স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন—পরবর্তীকালে কলকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস-লীগ প্যাক্ট এবং হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণ-আন্দোলনে সর্বশ্রেণীর মুসলমানকে আকর্ষণ চেষ্টার মধ্যে তাঁর সেই প্রয়াসের রূপ লক্ষ্য করব।

এই সঙ্গে তিনি ভারতবাসীর সামনে একজন সংকীর্ণতাহীন, আধুনিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন বিখ্যাত
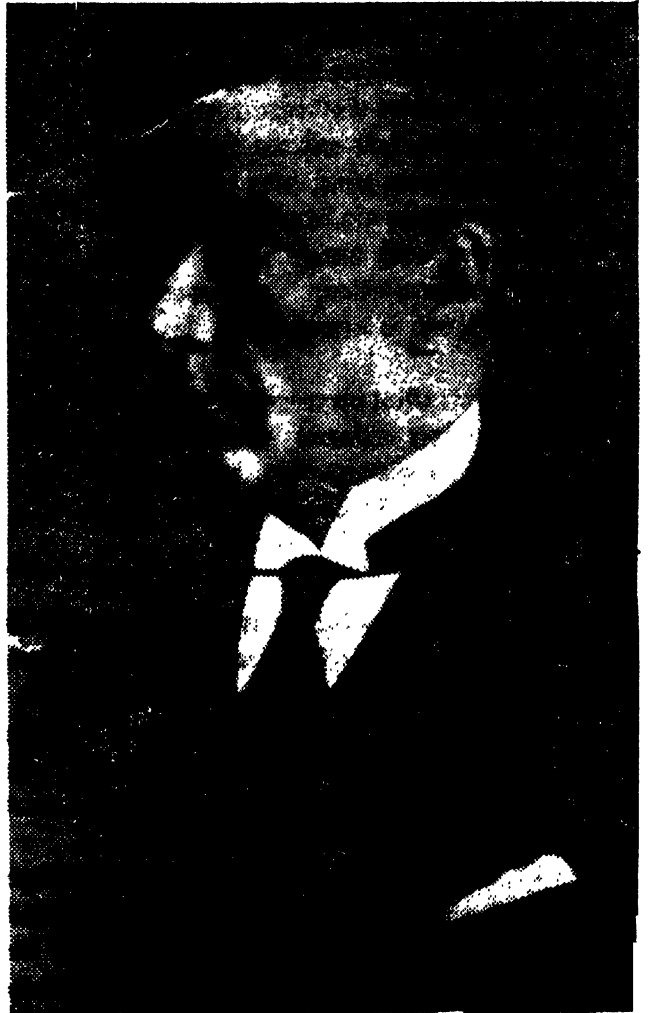
কামাল আতাতুর্ক

মুসলমান নেতার জীবনরূপ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন—তাঁর নাম মুস্তাফা কামাল পাশা—প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালে নবীন তুরস্কের পারত্রাতারূপে যাঁর নাম ইতিহাসে অবিনাশী হয়ে আছে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে কামাল পাশার বিশেষ প্রভাব স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতবাসীর উপরে পড়েছিল, বিশেষত যাঁরা অহিংসায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কামাল পাশা যেহেতু মুসলমান ছিলেন, মুসলমান তরুণদের উপরে তাঁর সাধারণ একটা প্রভাব ছিলই—হিন্দুদের উপরেও প্রভাব কম ছিল না, হয়ত বেশি, কারণ কামাল স্বদেশে মোল্লাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিলেন এবং ইউরোপের অসুস্থ অঙ্গ তুরস্ককে সবল সুস্থ করে তুলেছিলেন কঠিন হাতের পরিচর্যায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে তখন স্বাধীনতার পথে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা একটা প্রধান সমস্যা। কামাল পাশার আধুনিকতা এবং সামরিকতা নজরুলে ইসলামের একটি শ্রেষ্ঠ উদ্দীপক কবিতার জন্মদাতা।

রবীন্দ্রনাথও কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। কামালের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে 'মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু অন্ধ কুসংস্কারের' উৎপীড়নের বিরুদ্ধে 'অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন যিনি' তাঁকে কবি নমস্কার জানিয়েছিলেন। কামালের চরিত্র সামনে রেখে, হিন্দু দেশবাসীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের সমাজ অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতার চাপের তলায় গোঙাচ্ছে। যদি তোমরা আচার-সংস্কারকে বলি দিয়ে নব যুগের আহ্বানকে স্বীকার করতে না পারো তাহলে সর্বনাশই তোমাদের নিয়তি।' সমালোচনা-অসহিষ্ণু মুসলমান-দেশবাসীর উদ্দেশে কবি তুরস্ক ও পারস্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন।[১]

সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনে কামাল পাশার বিপুল প্রভাবের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। কামাল পাশার মৃত্যু হয় ১৯৩০-এর ১০ নভেম্বরে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভারতবর্ষ উক্ত লোকান্তরিত মহান্ নেতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। এইকালে সুভাষচন্দ্রের দু'টি বক্তব্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। কামালের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ১১ নভেম্বর তারিখে তিনি এক বিবৃতি দেন যার মধ্যে ১৯ নভেম্বর তারিখে কামাল-দিবস পালনের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৭ নভেম্বর তারিখে কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্র কামাল পাশা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন, তার কিছু বিবরণও সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। বিবৃতি এবং বক্তৃতার প্রকাশিত অংশ আমি অনুবাদ করে এর পরে উপস্থিত করব; তার আগে দু'-একটি কথা বলে নেওয়া যায়। কামাল পাশা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য আমাদের কিছু বিস্মিত করেছে। আতাতুর্কের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা আমরা জানি, তাঁর রচনাবলীতে ইতস্ততঃ সে বিষয়ে উল্লেখও দেখেছি; জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আতাতুর্কের অনুসরণীয় আদর্শের কথা তিনি বলেছেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঐ দুই প্রকাশিত বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে বোঝা সম্ভব ছিল না আতাতুর্কের প্রেরণা কত গভীর ছিল তাঁর জীবনে। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, মেঘনাদ সাহার 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকায় সুভাষচন্দ্র যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে রোমান লিপির উপযোগিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি আতাতুর্কের স্মরণীয় প্রয়াসের উল্লেখ করেছিলেন। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের মধ্যে কয়েক বার আতাতুর্কের কথা আছে; সেখানে বিশেষভাবে বলেছিলেন—তুরস্কের খিলাফতকে উঠিয়ে দিয়ে আতাতুর্ক ভারতের খিলাফত-আন্দোলনকে সমূলে নষ্ট করেছিলেন। আতাতুর্কের সামরিক সাফল্যের উল্লেখও তিনি করেন।[২] ভিয়েনা থেকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন (১৯৩৫-এর ১৫ মার্চ, ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত) তার মধ্যে একটি বিষয়ে খুব পরিষ্কারভাবে কামালের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রধান কথা সেখানে আছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধে যে-দল জয়লাভ ক'রে ক্ষমতা করায়ত্ত করবে, শাসনতন্ত্র সেই তৈরি করবে—প্রভু-জাতির কাছ থেকে পরোয়ানা

---

১ রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু প্রতিবাদ করেছেন। কবি-কথিত তুরস্কের ধর্মবিষয়ক উদারতার কথা মেনে নিলেও পারস্যে অনুরূপ উদারতা ছিল প্রভাতকুমার মানতে পারেন নি: "কবি তুর্কী ও পারস্যের ধর্মবিষয়ক যে-উদারতার কথা বলিলেন তাহা তুর্কীর ক্ষেত্রে সত্য হইতেও পারে—পারস্যের ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নহে। পারস্যের শিয়া মুসলমান মোল্লাদের গোঁড়ামির কথা কবি ভালরূপে জানিতে পারেন নাই; তাহাদের ধর্মান্ধতার ফলে বাহাই-রা কিভাবে নির্যাতিত হইয়াছিল তাহা কবি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন; কবি বাহাইদের সম্বন্ধে ভালো করিয়াই জানিতেন এবং আবদুল বাহা সম্বন্ধে নিউইয়র্কে ভাষণ দান করেন।" (রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ)

২ "Before the end of 1922, Mustapha Kemal Pasha had succeeded in driving the Greeks out of Anatolia. Before the end of 1923 he succeeded in driving the Allied troops out of Constantinople. And by March 1924, he felt sufficiently strong to abolish the Khilafate altogether and bring into existence a new and powerful Turkey." (ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল)

gramme of post-war reconstruction. There can be no question of giving up political power after the battle is won, there can be no question of dissolving the Congress after the Congress is victorious. *Just as Ghazi Mustafa Kemal Pasha (Kemal Ataturk as he is now called) and his party won freedom for Turkey and thereafter remained in power in order to put Turkey on her feet and put into practice their programme of national reconstruction so also must we do in India. 'Dictatorship of the Party both before and after Swaraj is won'—that must be our slogan for the future.*" (বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে)]

এসব সত্ত্বেও বলতে হবে, আতাতুর্কের মৃত্যুর পরে সুভাষচন্দ্র যেরকম আবেগের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তার নিদর্শন পূর্ববর্তী উল্লেখগুলির মধ্যে ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি ও বক্তৃতার বিবরণ—দুটিই অনুবাদ করে দিচ্ছি। কিছু পুনরুক্তি আছে পাঠক দেখবেন, কিন্তু তাহলেও নূতন কথাও মিলবে। বিবৃতির তুলনায় ভাষণে সুভাষচন্দ্রের প্রাণোত্তাপ স্বতঃই বেশি ছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর তুরস্ক-ভ্রমণের কিছু স্মৃতিকথাও ছিল:

সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি:

"(প্রথম) মহাযুদ্ধ যে-সকল রোমান্টিক চরিত্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল, মুস্তাফা কামাল পাশা নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম চমকপ্রদ চরিত্র। যশ ও জনপ্রিয়তার শিখরে তাঁর মত দ্রুত উত্থান ইতিহাসে সত্যই বিরল। কিন্তু কামাল পাশা নিছক রোমান্টিক চরিত্র বা বিজয়ী বীর নন—তিনি একই সঙ্গে ধুরন্ধর সমরবিদ্, কুশলী কূটনৈতিক। জীবনে তিনি যে-অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন, তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের গুণাবলীর অপূর্ব সমন্বয় ভিন্ন সম্ভবপর হত না।

"কামাল পাশা আনাতোলিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেই মাত্র বিপ্লবী ছিলেন না, জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তা ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন ও তাতে জয়ী হয়েছেন, তাঁরাই যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে সফল করবেন—এই নীতির অসাধারণ দৃষ্টান্ত কামাল পাশার জীবন। সেনাপতি হিসাবে বিরাট, কূটনীতিবিদ হিসাবে বিরাট, সমাজসংস্কারক হিসাবে বিরাট, রাজনীতিবিদ্ হিসাবে বিরাট, সংগ্রামী হিসাবে বিরাট, সংগঠক হিসাবে বিরাট—কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্ক নিঃসন্দেহে এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ। ইউরোপীয় শক্তিসমূহের চোয়াল থেকে নিজ দেশকে বাঁচিয়ে আনার এবং পূর্বতন অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপের উপরে পুনর্জীবিত তুরস্ককে স্থাপন করার কৃতিত্ব তাঁরই। ইউরোপীয় শক্তি যদি আবার এশিয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তাহলে কামালের তুরস্ক আমাদের মহাদেশের পশ্চিম পার্শ্বে প্রহরী হয়ে থাকবে। এহেন একজন অনন্যসাধারণ মানুষের মৃত্যু অভিভূত করবে সারা পৃথিবীকে, বিশেষত আমাদের মত উৎপীড়িত ও শোষিত দেশগুলিকে। স্বাধীনতা ও মানবতার এই পরম প্রেমিকের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধানিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।" (অনূদিত; অমৃতবাজার, ১১ নভেম্বর, ১৯৩৮)

কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা:

"তুরস্কের ঐ মহান্ সন্তানের জীবনী আমাকে যতখানি প্রেরণা দিয়েছে, খুব কম জীবনী থেকেই তা আমি পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, সমগ্র সভ্য জগতে এমন একজন নারী বা পুরুষের সাক্ষাৎ মিলবে না যিনি এই বিরাট পুরুষের স্মৃতির সামনে মাথা নামিয়ে না দেবেন।

"চার বছর আগে তীর্থযাত্রীর মনোভাব নিয়েই আমি বুখারেস্ট থেকে ইস্তাম্বুলে উড়ে গিয়েছিলাম—তুরস্কের এবং মানবসভ্যতার জন্য তিনি যা করেছেন তারই কিছু স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলাম। ইস্তাম্বুলের গম্বুজ, মিনার প্রভৃতি কিংবা সহাস্য বস্ফোরাসের সৌন্দর্য আমাকে যতখানি না আকৃষ্ট করেছিল তার থেকে বেশি আকর্ষণ করেছিল ইস্তাম্বুলের পথে পথে মুক্ত নরনারীর বিচরণের দৃশ্য।

"বিমান থেকে অবতরণের পরে প্রথম যে-জিনিসটি আমাকে নাড়া দিয়েছিল তা হল—সেখানে যেসব নরনারীকে দেখলাম তারা বুখারেস্ট, সোফিয়া বা ভিয়েনার নরনারীদের মতই। তুরস্কের নারীদের বিষয়ে একথা বলতে পারি—তাঁরা যেরকম সহজ সুন্দর ছন্দে ঘোরাফেরা করছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল বহু শতাব্দী ধরে তাঁরা এই জাতীয় স্বাধীনতায় অভ্যস্ত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমরা জানি, (প্রথম) মহাযুদ্ধের পরেই মাত্র তুরস্কের নারী-মুক্তি ঘটেছে।

"পুরাতন পারসী লিপির ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে সেখানে রোমান লিপি প্রবর্তিত হয়েছিল। সেজন্য বহিরাগতের পক্ষে ইস্তাম্বুলের পথের নাম বা তার দুধারের সাইনবোর্ড পড়তে অসুবিধা হয় না। আমি স্বীকার করছি, এই সব বাস্তব উপযোগিতার কথা বিবেচনা করেই ভারতের ভাবী জাতীয় লিপি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। এশিয়ার একটি দেশে সর্বজনীন একটি লিপির প্রচলন ও তার সুবিধার রূপ দেখে আমার ধারণা হয়েছে—ঐ একই লিপি আমাদের দেশেও প্রবর্তন করলে অপরিসীম উপকার হবে।

"আর একটি ব্যাপার। সেখানকার নরনারী কেবল ইউরোপীয় পোষাকেই সজ্জিত নয়, যুদ্ধপূর্ব তুরস্কের বিশিষ্ট শিরোভূষণ ফেজ একেবারে অদৃশ্য। তার সঙ্গে বিদায় নিয়েছে মোল্লা-পুরুতদের নিজস্ব পোষাক। ধর্মীয় কাজ করবার সময়েই মাত্র মোল্লারা বিশেষ ধরনের শিরোভূষণ ব্যবহার করবার অধিকারী। তুরস্কের মাটিতে পা দিলেই এই ধরনের কতকগুলি বহিরঙ্গ লক্ষণ দেখা যায়। এর থেকে বহিরাগত মানুষ পর্যন্ত বুঝতে পারে, তুরস্কের অচিন্তনীয় বিপুল পরিবর্তন হয়েছে।

"কামাল আতাতুর্কের মহিমার কথা আমরা সবাই কিছু কিছু জানি। আমরা জানি যে, তিনি তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে নয়, এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন। ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্র হিসাবে এই শোকপ্রহরে তাঁর গুণাবলীর কোনো কোনো দিক বিশ্লেষণের চেষ্টা আমাদের করা উচিত। মনে হয় সকলেই একথা মেনে নেবেন, ইউরোপীয় শক্তিসমূহের কবল থেকে তুরস্ককে উদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা তুরস্কের যে কোনো সন্তানের চেয়ে বৃহৎ। দ্বিতীয়ত তিনিই সামন্ততান্ত্রিক রাজা ও মোল্লাশাসিত সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। সামন্ততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তুরস্ককে নিয়ে যাবার কীর্তি তিনি নিতান্ত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব করেছিলেন। এই কাজ, আমার বিশ্বাস, আধুনিক ইতিহাসের অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

"তৃতীয়ত, তিনি বিরাট বিপ্লবী ছিলেন, গ্যালিপলি বা আনাতোলিয়ার সমরাঙ্গনেই নয়, জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও। শেষতঃ, একটিমাত্র পার্টির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসের জন্য তিনি চিরদিন স্মরণে থাকবেন। এক পার্টির শাসনে দেশ চালাবার প্রয়াস ইদানীং ইউরোপে একটা সাধারণ ব্যাপার। এ জিনিস এখন মহান রাশিয়ায় দেখি, নাজী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইটালিতে দেখি। কিন্তু একথা আমরা সর্বদা মনে রাখি না যে, এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরীক্ষা কামাল আতাতুর্ক স্বদেশে চালিয়েছিলেন। একনায়কতন্ত্রের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মন্দের দিক মনে রেখেও বলতে হবে, ফলের বিচারে তার দ্বারা তুরস্কের অসম্ভবরকম উন্নতি হয়েছে।"

(অনূদিত ; অমৃতবাজার, ১৮ নভেম্বর, ১৯৩৮)

এই বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র কামাল আতাতুর্কের সর্বাত্মক সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে তুরস্কের সঙ্গীত-রীতি এবং ভাষার উন্নয়নে তাঁর প্রয়াসের উল্লেখ করেছিলেন। সবশেষে বলেছিলেন, তাঁর প্রেরণা কেবল তাঁর স্বদেশেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, তা রয়েছে সমগ্র মানবের জন্য। এশিয়ার মানুষের পক্ষে তাঁর জীবন খুবই শিক্ষাপ্রদ। সুভাষচন্দ্র সব শেষে বলেন, সাম্প্রদায়িক মানুষদের উচিত, তুরস্ক দেখে আসা।

সুতরাং দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন, আতাতুর্কের জীবনী তাঁকে যত প্রেরণা দিয়েছে, খুব কম জীবনী থেকেই তিনি তা পেয়েছেন। বিস্ময়ের কথা, দৃষ্টিভঙ্গিতে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে যোজন-তফাতে যিনি ছিলেন, সেই জিন্নাকেও আতাতুর্কের জীবনী নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। জিন্নার জীবনীকার লিখেছেন:

"১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসের এক সকালে মহম্মদ আলী জিন্না টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে এইচ সি আর্মস্ট্রং-এর লেখা 'ধূসর নেকড়ে' নামক গ্রন্থের (*Grey Wolf, An Intimate Study of a Dictator*) সমালোচনা পড়লেন। প্রাতরাশের পরে... তিনি বইটি কিনে আনলেন। দু'দিন ধরে জিন্না কামাল আতাতুর্কের জীবনীতে মগ্ন রইলেন। বইটি শেষ করবার পরে সেটি তাঁর ১৮ বছরের কন্যার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'সোনামণি, বইটি পড়ো। খুবই ভাল বই।'

"তারপরে বেশ কিছু দিন জিন্নার মুখে আতাতুর্কের কথা লেগে রইল। এত বোশ সে কথা বলতে লাগলেন যে, তাঁর কন্যা ঠাট্টা করে তাঁকে 'ধূসর নেকড়ে' বলে ডাকতে শুরু করল। কন্যা তখন বিলেতী স্কুল থেকে ছুটিতে ঘরে ফিরেছে।...বাবাকে তাগিদ দিত, 'ও ধূসর নেকড়ে, শুনছো, আমাকে মূকাভিনয় দেখতে নিয়ে চলো, মনে রেখো, আমি ছুটিতে বাড়ি এসেছি।'

"কামাল আতাতুর্কের কাহিনী পাঠ করে দেখে ভাবতে ইচ্ছা হয়, মহম্মদ আলী জিন্নার মনের উপরে বইটি কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'ধূসর নেকড়ের' মতই জিন্নাও বিভ্রান্ত মুসলমান জনসংঘের মধ্য থেকে একটি নেশন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।"

কামাল আতাতুর্ক বিদেশীর প্রভাবশূন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন তুরস্ক চেয়েছিলেন। মুসলিম রাষ্ট্রগোষ্ঠী-কল্পনার তিনি বিরোধী ছিলেন; তিনি জাতীয়তাবাদী এবং রাষ্ট্র-ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি বলেছিলেন

"I am neither a believer in a League of all the nations of Islam, nor even in a League of the Turkish peoples. Each of us has the right to hold to its ideals, but the Government must be stable, with a fixed policy grounded on facts and with one view and one view alone— to safeguard the life and the independence of the nation within its national frontiers ... Neither sentiment nor illusion must influence our policy. Away with dreams and shadows! They have cost us dear in the past."

আতাতুর্কের সঙ্গে জিন্নার কোনো দিক দিয়েই মিল ছিল না। সে কথা স্বীকার করেও জিন্নার জীবনীকার উভয়ের তুলনার প্রলোভন দমন করতে পারেন নি। 'নেকড়ে' বিশেষণটি জিন্না বোধ হয় পছন্দ করেছিলেন এবং আতাতুর্ক মুসলমান ছিলেন—কদাপি ভুলতে চান নি। সমস্ত ভারত-বর্ষ ও পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ যখন ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ী বীররূপে আতাতুর্কের উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন করছিল—ঠিক তখনই আতাতুর্কের মৃত্যুর পরে জিন্না বলেছিলেন:

"আধুনিক ইসলাম-জগতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমার স্থির বিশ্বাস, সমস্ত মুসলিম জগৎ তাঁর বিদায়ে গভীর শোকবোধ করবে।"

(অমৃতবাজার, ১১ নভেম্বর, ১৯৩৮)

এবং জিন্নাই ঐ কথা বলতে পারতেন।

[ক্রমশ

প্রাণতোষদা

দুর্গাদাস সরকার

প্রাণতোষ ঘটক অর্থাৎ আমাদের মতো অনুজদের প্রাণতোষদা চিরবিদায় নিলেন। চিরবিদায়ের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু প্রাণতোষদা চলে গেলেন খুবই অকালে। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে।

২১শে জুলাই টেলিফোনে সেই এক প্রশ্ন—প্রাণতোষবাবু কেমন আছেন, প্রাণতোষ কেমন আছে?

উত্তর দিয়েছিলাম। বেশি কথা বলার কিছুই ছিল না সেদিন। খবর যা পেয়েছিলাম, তাতে নতুন আশার কথা শোনাতে পারি নি। তবু সাহিত্যিকরা সেদিনের খবর শুনে কি ভেবেছিলেন, নিদারুণ শোকাবহ ঘটনার জন্য আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি।

উদ্বিগ্ন ও বেদনাহত অনুজ সাহিত্যিকরা। প্রাণতোষদার অকাল-মৃত্যুতে কেউ বা গভীর সততায় স্বীকার করেছেন কৃতজ্ঞতাবশে প্রাণতোষ ঘটকের কাছে তাঁর ঋণ।

প্রাণতোষ ঘটকের কাছে সর্বাধিক ঋণ বোধহয় বাংলা দেশে তাঁর অনুজ লেখকদের।

প্রাণতোষ ঘটক যে সময় 'মাসিক বসুমতী' সম্পাদনার ভার নেন, তখনো বাংলা দেশে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'পরিচয়' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠকমহলে সমাদৃত। প্রাণতোষ ঘটক মাসিক বসুমতীর ভার নিয়ে তাকে শুধু সমাদৃতই করলেন না। এতোকাল পত্র-পত্রিকাগুলি শহরে বা আধা-শহরেই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রচারিত। মাসিক বসুমতী শহর থেকে দূরে পল্লীতেই পাঠকদের চিত্ত জয় করল।

আর সেই সুবাদেই মাসিক বসুমতীর সংগে অজ পাড়াগাঁয়ে বসেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল।

কলকাতায় পা দিতেই আর একটি পত্রিকা দেখে আমরা চমকে উঠলাম। একেবারে নতুন রীতি নিয়ে হাজির। পত্রিকাটির নাম 'নববাণী'। সম্পাদক : প্রাণতোষ ঘটক। পত্রিকাটির আবির্ভাব নতুন রীতিতে, সুতরাং সেকালে বাজার-চল হয় নি। বেশ কয়েকটি সংখ্যা বেরবার পর পত্রিকাটির অপমৃত্যু ঘটল। এমন এমন সব ফিচার ঐ পত্রিকায় থাকত যা রীতিমতো চাঞ্চল্য জাগাত। সাক্ষাৎকারের বিবরণীর মাধ্যমে আমরা ঐ পত্রিকাতেই তখন পেতাম বড় বড় লেখকদের সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি কথা, আবার ঐ পত্রিকার মাধ্যমেই পরিচয় ঘটল বেশ কিছু শক্তিশালী নতুন লেখকের সংগে। পত্রিকায় ছাপা হত, কারা কারা পত্রিকাটিতে নিয়মিত লিখবেন। সেই সব নামের আকর্ষণে সেকালে আমাদের মনে নেশা ধরত। আমরা তখন লেখা সবে সুরু করেছি। এমন কি লেখার মাত্রাজ্ঞান তখনো সড়গড় হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এতো সব আকর্ষণের মধ্যেও সে সময় সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিলেন সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক। শুনেছিলাম তিনি বড়ঘরে মানুষ। না জানি, ব্যবহারই বা কেমন। মনে ছিল যেমন কৌতূহল, তেমনি ভয়। ইতিমধ্যে মাসিক বসুমতীতে একটা লেখা পাঠিয়ে দিলাম। আশ্চর্য, অচেনা অজানা একটি ছেলের লেখা ছাপা হয়ে গেল।

প্রাণতোষ ঘটক

লেখা প্রকাশিত হবার পর, মনে হল, এবার বোধ হয় সম্পাদকের দরবারে যাবার প্রবেশপত্র পেয়ে গেছি। কলকাতায় জীবিকার কারণে থাকলেও গ্রাম্য খোলসটা আচার-আচরণে সম্পূর্ণভাবে আছে। তবু ভয়-ভাবনা যা থাকুক মনে, একদিন দুপুরবেলায় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে গিয়ে হাজির। সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকও উপস্থিত। তাঁকে না দেখে যতো ভয় মনে মনে পেয়েছিলাম, দেখার পর তার একবিন্দুও থাকল না। যদিও প্রথমে তিনি চুপচাপ ছিলেন, আমার পরিচয় দিতেই, তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এবং যা আমার পেলাম। অর্থাৎ আমার লেখার জন্য পারিশ্রমিক। এবং পরবর্তী লেখার জন্য আমন্ত্রণ।

বাংলা দেশের তরুণ লেখকদের দরদী সমর্থক হিসেবে প্রাণতোষ ঘটকের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি যে-মত বা যে-পথের অনুসরণ করেন, তাঁর পত্রিকার লেখকরাও সেই মত ও সেই পথ অনুসরণ করবেন, তেমন কথা তিনি কখনো ভাবেন নি। তার প্রমাণ, মাসিক বসুমতীতে তিনি অগ্রজ বা অনুজ যে সব লেখকের লেখা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা নানা মতের মানুষ, নানা পথের পথিক। মাসিক বসুমতীর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর হয়তো উক্ত কারণেই তিনি ঐ পত্রিকাকে দলমত-নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে পেরেছিলেন। সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের কাছে কৃতজ্ঞ তাই বাংলা দেশের সকল লেখকেরা। ঐ কারণে বাঙালী পাঠকরাও উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু পাঠক হিসেবে প্রত্যেকেই প্রাণতোষ ঘটকের কাছে ঋণী হয়ে থাকবেন তাঁর লেখা প্রায় বিশখানি বই-এর জন্য। এবং প্রাণতোষবাবুর অকাল-বিয়োগ হলেও তাঁর গল্প এবং উপন্যাসগুলিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। অবশ্য প্রসঙ্গত এ কথাও আজ স্মরণীয়, সম্পাদনার কাজের মতো গুরুদায়িত্বভার পালন করেও যিনি আটচল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে অতোগুলি গ্রন্থ উপহার দিতে পেরেছেন, তিনি অনন্যমন হয়ে যদি একমাত্র সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত থাকতে পারতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারতেন।

প্রাণতোষ ঘটকের লেখা ছিল নেশা, সম্পাদনা ছিল পেশা। কিন্তু আর যা ছিল, তা হচ্ছে চিত্রশিল্পের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা। অনেক সময় দেখা গেছে, তিনি তাঁর টেবিলে যখন বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত নন, তখন আপন খেয়ালে টুকরো কাগজে শিল্প-রচনায় ব্যস্ত। যদিও সেই সব শিল্প লোক-হাটে বেসাতির জন্য নয়, কিন্তু সেগুলি দেখে বোঝা যেত তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধ এবং ঐ বোধের কারণে তিনি শিল্পীদেরও আপনজন করে নিতে পেরেছিলেন।

তাই, সম্পাদক - সাহিত্যিক - শিল্প-রসিক প্রাণতোষ ঘটকের মৃত্যুর শোক শুধু তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আজ সীমিত নয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনিই তাঁর সংস্পর্শে একবার এসেছেন, তিনিই গভীর বেদনায় বিহ্বল বোধ করবেন।
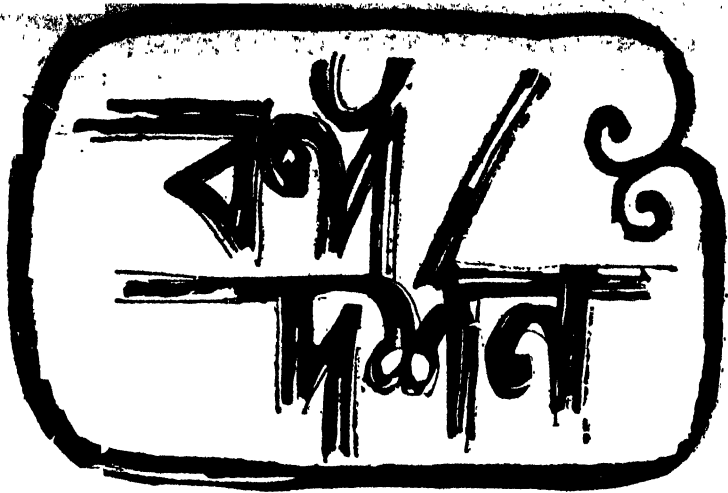
পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুকাল ধরে যে অরাজক অবস্থা চলছে, সে বিষয়ে কেউ গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন বলে মনে হয় না। দিনের পর দিন একদল ব্যক্তি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর হামলা চালাচ্ছে, ল্যাবোরেটারীর যন্ত্রপাতি ও চেয়ার-টেবিল ভেঙে তছনছ করছে, বোমা-পটকা ছুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, কিন্তু তা বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। এই স্কুল-কলেজগুলির উপর হামলাবাজির পিছনে দুটি শক্তি একত্রিত হয়েছে, একটি শক্তি যারা উগ্রপন্থী রাজনীতির কথা বলে এবং অপর একটি শক্তি, যারা কিছু মার্কামারা ছাত্র, স্কুলে-কলেজে যারা কোনদিন পড়াশোনা করে না। উগ্রপন্থী রাজনীতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শেষোক্ত শক্তি অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়েছে, নেই কাজ তো খই ভাজ, নিজেরাও পড়াশোনা করব না এবং যারা পড়াশোনা করতে চায় তাদেরও করতে দেবো না।

বিষয়টিকে ঠিক আইন-শৃংখলার সমস্যা হিসাবে ধরলে ভুল করা হবে এবং সেই ভুলই করা হচ্ছে বলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই আবহাওয়া পরিবর্তন করা তো দূরের কথা, উল্টে আরও সমস্যা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। আসলে যে সব উগ্রপন্থী স্কুল-কলেজগুলির পিছনে উঠে-পড়ে লেগেছে, তাদেরও একটা বক্তব্য আছে—যে দিকটায় দৃষ্টি না দিলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়। তারা বলে যে, এই বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যহীন, কেন না এ শিক্ষা আমায় বাঁচায় না, তিলে তিলে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়। যে শিক্ষা আমাকে করে খাবার সুযোগ দেবে না, চাকরি দেবে না, একটা অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ছাড়া যা আমায় কিছুই দিতে পারে না, সে শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আমি ধ্বংস করার ব্রত নিই, কোন্ যুক্তিতে আমি অপরাধী? চাকরি-বাকরি পাওয়া তো বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভরশীল, বড়ঘরের ছেলে, পয়সাকড়ি আছে, পাঁচ জায়গায় আত্মীয়তা ও অন্যান্য যে কোন সূত্রে যোগাযোগ আছে, তাদের তো চাকরি পাওয়া আটকায় না। এ কথাটাকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? তাহলে উগ্রপন্থীদের যদি কোন ভুল থাকে, সেটা সিদ্ধান্তে, হেতুবাক্যে নয়।

সিদ্ধান্তে ভুল যদি থাকে, অনেকের সঙ্গে আমরাও মনে করি তা আছে, তাহলে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, ভুলটা কোথায়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ব্যবস্থা চিরকালই শিক্ষাসংকোচনের পক্ষপাতী, সব দেশেই। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যারা চালক তাদের ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পাক, সকল বড় বড় পদগুলি দখল করে বসুক, সমাজের মস্তিষ্কটাকে একচেটে করে রাখুক, পক্ষান্তরে নিম্ন আর্থিক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা 'শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' নিয়েই টিকে থাকুক, সকল ধনতান্ত্রিক সমাজের এইটাই একমাত্র লক্ষ্য। এখন জিজ্ঞাসা, উগ্রপন্থীরা যে স্কুল-কলেজে সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালাচ্ছে এবং যাদের ভিতর থেকে মদত দিচ্ছে কিছু ফাঁকিবাজ, পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছাত্র, তার দ্বারা কি ধনতান্ত্রিক শিক্ষানীতির এই মূল উদ্দেশ্যটা বানচাল করে দেওয়া সম্ভবপর হবে? আমাদের বিশ্বাস তা হবে না, কেন না ধনীর সন্তানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য সকলের অগোচরেই তারা ঠিক কাজ চালিয়ে যাবে, এখানকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে, তারা অন্যত্র যাবে, কলকাতা না হোক দিল্লী-বোম্বাই-দেরাদুন, এমন কি বিলেত-আমেরিকা পর্যন্ত।

কাজেই তাদের যখন ঠেকানো যাবে না তখন দরিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের পক্ষে যেটুকু শিক্ষার সুযোগ আছে, তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে কোন্ যুক্তিতে? প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাই তো মানুষকে কিছুটা আত্মসচেতন করেছে। উগ্রপন্থী রাজনীতি করতে গেলেও তো বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়; দূরেও যেতে ওঠা কিছু লোককে দিয়ে নিশ্চয়ই বিপ্লব হয় না। চারু মজুমদারও তো বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থার ফল। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নিম্নবর্গের মানুষকে যেটুকু দেয়, সেটা এই কারণেই গ্রহণ করা দরকার: যতদূর সম্ভব রুশ বিপ্লবের পূর্বে লেনিন বুর্জোয়া শিক্ষা গ্রহণে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের বাধা দেন নি এবং শ্রমিকদেরও যতদূর সম্ভব শিক্ষাদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষাই মানুষকে তার সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, কাজেই স্কুল-কলেজ লাটে না তুলে, যাতে সেগুলি আরও বাড়ে সেজন্য আন্দোলন করা প্রয়োজন। সাচ্চা বিপ্লবী গড়তে গেলে সাচ্চা ছেলে দরকার, অর্থাৎ তাদের শিক্ষায় যেন ফাঁকি না থাকে। টুকে পাশ করাই যে ছেলের মূলমন্ত্র, সে যখন লালঝাণ্ডা কাঁধে নেবে, সেখানেও কিন্তু ওই ফাঁকির মনোবৃত্তি থাকবে। যে বিবেকানন্দের মূর্তির মুখে এঁরা কালি লেপন করেছেন, তিনিই বলেছিলেন যে, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কর্ম হয় না। এ ক্ষেত্রে মাও সেতুংও কোন বিপরীত কথা বলেন না।

যে কথাটা বলা হল তা আসলে একটা আউটলাইন, যাকে নির্দিষ্ট একটি চিন্তার আকারে রূপ দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার, যাতে উগ্রপন্থীরা কোনরকম হঠকারিতামূলক ও বিপজ্জনক কাজ করার আগে তার পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা করে এবং এই ব্যাপারে সংবাদপত্রের বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিন্তু বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলি সে দায়িত্ব পালন করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে অভিনব সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহী এবং প্রতিটি সম্পাদকীয়ই 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'র মত করে লেখা। উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রভাবে বর্তমান শিক্ষায়তনগুলির যে অচল অবস্থা তার জন্য একদিকে উগ্রপন্থীদের কিছু দোষারোপ এবং অপর দিকে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ ছাড়া বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় থেকে আর কিছুই আমরা দেখি নি। কিন্তু আমরা আগে যা দেখিয়েছি, স্কুল-কলেজগুলিতে হামলার পিছনে একটা ফিলজফি ক্রিয়াশীল রয়েছে, যাকে যুক্তি দিয়ে নস্যাৎ করতে না পারলে এই হামলাবাজিকে রোধ করা সম্ভবপর হবে না, তা পুলিশ, মিলিটারী গভর্নমেন্ট যতই আনুন না কেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি, দেশের দুর্দশার কথা ভেবে যাদের

ভূমিকা গ্রহণ করে নি। নকশালে-সি· পি· এম-এ খুনোখুনি হচ্ছে, সাড়ম্বরে এই সংবাদ প্রকাশ ও তার উপর কিঞ্চিৎ রসসিক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ, সংবাদপত্রের দায়িত্ব এখানেই শেষ।

অনুরূপভাবে বিশিষ্ট ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে যাঁরা প্রসিদ্ধ, যাঁরা কথায় কথায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নিরাপদ দূরত্বে থেকে নির্বিকারে এঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রয়েছেন—যাঁরা প্রতিনিয়ত বিলাপ করেন স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দেশটার হবে কি, তাঁরাও কিন্তু তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। সকলেই কাপুরুষের মত রণে ভঙ্গ দিয়েছেন। কয়েকজনকে অনুরোধ করেছিলাম, তাঁরা যদি সত্যই বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার-অভাব প্রান্ত সিদ্ধান্তের [illegible] তাহলে কেন তাঁরা তা ছাত্রদের সামনে বলেন না, কেন [illegible] নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখেন না? সকল ক্ষেত্রে একটাই উত্তর আছে যা হচ্ছে প্রাণের ভয়। তার চেয়ে উটের মত বালিতে মুখ গুঁজে থাকা ভাল, কপালে যা আছে তা হবে। দৃঢ়ভাবে অবস্থার মুখোমুখি হতে সকলেই নারাজ, সকলেই মনের দিক

[illegible] নয়। কোন [illegible] শিক্ষক কি কোন কলেজের অধ্যক্ষ, এককভাবে কি শিক্ষকগণের সংগে সম্মিলিতভাবে হামলার মুখোমুখি হয়েছেন? উগ্রপন্থী ছাত্রদের যে পন্থা ঠিক নয় তা কি তাদের সামনে (যারা তাঁদেরই ছাত্র) যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন? এক স্কুলে বা এক কলেজে তো প্রত্যহই হামলা হয় না। ক্লাসে তাঁরা কি ছাত্রদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এ পথ ঠিক পথ নয়? আমাদের মনে হয় তাঁরা একেবারেই তা করেন নি। হামলা হয়ে গেলে পুলিশকে ফোনে জানিয়েছেন, সংবাদপত্রে খবরটি বেরিয়েছে, তার পর সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজটিকে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক বা অধ্যাপকেরা খুশি, কেন না ক্লাস নিতে হচ্ছে না, ছুটি। কথাটা হয়ত তিক্ত, কিন্তু সত্য।

এর পর আসে রাজনৈতিক দলগুলির কথা। সত্য বলতে কি, সি· পি· এম ছাড়া অন্য দলগুলির কাছে, এমন কি দুই কংগ্রেসের কাছেও উগ্রপন্থীরা আশীর্বাদস্বরূপ। উগ্রপন্থীদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের লিপ-সার্ভিস আছে, কিন্তু মনে মনে তাঁরা এতোই খুশি যে, এর দ্বারা সি· পি· এম-কে কোণঠাসা করা যাবে। উগ্রপন্থীদের নিয়ে সি· পি· এম-এর কিছুটা মাথাব্যথার কারণ আছে. তার কারণ, বিশেষ করে অদূরে ভবিষ্যতে মধ্যবর্তী নির্বাচন না ঘটলে সি· পি· এম-এর ক্যাডাররা ক্রমশই উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকবে। কাজেই আপাতত উগ্রপন্থীদের সংগে তত্বগত লড়াইয়ের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে মুখোমুখি লড়াই দরকার হয়ে পড়েছে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতেই তা অনুমান করা যায়। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন, সরকার সরে যাক, সি· আর· পি উঠে যাক, আমরাই দেখে নেবো। দলছুটদের তাঁরা চেনেন এবং নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর একাংশের মধ্যে তাঁদের কিছুটা প্রভাবও আছে এবং সেই ভরসায় তাঁরা একবার মুখোমুখি লড়তে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই পুরাতন সমস্যাটাই আবার এসে পড়ছে, শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু. সি· পি· এম-বিরোধী দলগুলি তো মুখিয়ে আছে। এক্ষেত্রেও উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঠিক সচল নয়।

সব শেষে সরকার। সরকার কথাটির অর্থ একটি অপদার্থ আমলাতন্ত্র, জনগণের সমস্যার চেয়ে নিজেদের চাকরি বজায়, পদোন্নতি ও এক্সটেনসনের সমস্যাই যাদের কাছে বেশি। সরকারের সঙ্গে, মুষ্টিমেয় কিছু সম্পর্ক আহি-নকুলের। উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন দমন করা যায় না, কিন্তু সরকার, আমলাতন্ত্র ও পুলিশ এতকাল ধরে যে মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছে, সেখানে জনসাধারণের কোন মাথাব্যথা নেই সরকারকে সাহায্য করার এবং সরকারও তা বোঝেন· সি· আর· পি, পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের ভূমিকায় কোন কার্যকারিতার স্পর্শ থাকতেই পারে না। দিল্লীতে সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ। প্রায় প্রত্যহই সরকারী উদ্যোগে কিছু স্টান্ট দেওয়া খবর বেরোয় এবং পরদিন তা ভুল প্রমাণিত হয়। এ ট্রাডিশন আপাতত বদলাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

অতএব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চলছে, চলবে, পথে-ঘাটে বোমাবাজি হচ্ছে, হবে। সকলেই নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে চলছেন—ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-অধ্যাপক-অভিভাবক, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সরকার। ফল সহজেই অনুমেয়।

তিস্তায় প্লাবন

জলপাইগুড়িতে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছে, তিস্তার বাঁধ আবার ভেঙেছে, জলপাইগুড়ি শহরের একাংশ জলপ্লাবিত। মাত্র দু বছর আগে তিস্তায় প্রচণ্ড জলস্ফীতি এবং বাঁধ ভেঙে যাবার ফলে যে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে যে কত মানুষ নিহত হয়েছিলেন তার প্রকৃত সংখ্যা আজও নির্ণীত হয় নি। সেবারে বিপদের সংকেত আগে থেকে পেয়েও কর্তৃপক্ষের কর্তব্য পালনে গাফিলতির জন্য জলপাইগুড়ির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। এবারেও গত ক'দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তায় বান ডেকেছে। মণ্ডলঘাটে যে ১৫০ ফুট দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, তা তিস্তার জলের দুরন্ত তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে এবং হু হু করে শহরে জল ঢুকছে। বহু মানুষ ইতিমধ্যেই জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। বাঁধ ভেঙে যাবার দরুণ মণ্ডলঘাট এবং করলা নদীর মধ্য দিয়ে শহরে জল প্রবেশ করছে। তবে আশার কথা, ১৯৬৮ সালে তিস্তা যে ভয়ংকরী মূর্তি ধারণ করেছিল, এবার এখনো সেই উগ্র রূপ দেখা যায় নি। মণ্ডলঘাটের বাঁধটি মেরামতির জন্য সামরিক বাহিনীর এবং পি-ডব্লিউ-ডি'র অসামরিক বাহিনীর লোকেরা কাঁধ কাঁধ দিয়ে কাজ করছেন। স্থানীয় অধিবাসীরা ১৯৬৮-র ঘটনা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানের সন্ধান করছেন এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। হলেও বিপদ ঘটাবার শক্তি তাদের প্রচণ্ড, বিশেষত তিস্তা নদীর তো কথাই নেই। কিন্তু বন্যা ও প্লাবন প্রতিরোধের জন্য যদি কোন স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তাতে সমূহ ক্ষতি হবার আশংকাই বরাবরের মত থেকে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিষয়টি নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনো হয় নি। উত্তরবঙ্গের নদী শাসনের জন্য সরকারী স্তরে অনেক পরিকল্পনা এ পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগই আলমারীতে ফাইল-বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। এ সকল বিষয়ের দায়িত্ব শুধু রাজ্য সরকারের একার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক কিছু করণীয় আছে। ১৯৬৮-র বন্যার পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অনেক আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, তিস্তার বন্যা পাকাপাকি রোধ এবং জলপাইগুড়ি শহরের পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হাতে সাহায্য করবেন। একটি প্রতিনিধিদলও কেন্দ্রীয় সরকার পাঠিয়েছিলেন এবং অনেক দরকষাকষির পর তাঁরা এই ব্যাপারে কিছু অর্থপ্রদানের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তারপর কি হয়েছে, তা কিন্তু অজানাই থেকে গেছে। সেই স্টাডি টীমের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রের যা দেবার কথা ছিল, কেন্দ্র তা দিয়েছে বলে আমরা জানি না। ব্যাপারটি বোধ হয় কোন রহস্যের আবরণে ঢাকা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আমলাতন্ত্র কি নিজেদের চাকরির ভবিষ্যতের কথা একটু কম ভেবে এদিকে নজর দেবেন?

সি আর পি'র অত্যাচার

আমরা ইতিপূর্বে বহুবার পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে সি-আর-পি'র উদ্দেশ্যবিহীন, ফলবিহীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং জাতিবিদ্বেষী আচরণ ও অত্যাচারের কিছু কিছু বিবরণ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পুলিশবাহিনী বেপরোয়া আচরণের যে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেশিদিন যে তা বরদাস্ত করবে না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, কেন না, মুখ বুজে মার খাবার দিন বহুকালই চলে গেছে। কাজের ক্ষেত্রে এই বাহিনীর অপদার্থতার নিদর্শন নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর অহেতুক পীড়নে এরা অদ্বিতীয়। আমরা একটি মফস্বল শহরের ঘটনা উল্লেখ করছি। কলকাতা থেকে মাইল তিরিশ দূরে চুঁচুড়া শহরে মাত্র কয়েকদিন আগে সি-আর-পি বাহিনী নকশাল দমনের অজুহাতে দোকানে ঢুকে

[২৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

হিমালয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়

গত সপ্তাহে অলকানন্দায় আকস্মিক বন্যার ফলে বদ্রীনাথ তীর্থযাত্রীরা দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাতে তীর্থযাত্রীবাহী ১৩ খানি বাস, ৫ খানি মোটর গাড়ী এবং ৬টি ট্রাক ভেসে যায়। ঐ সময় চামোলি এবং বদ্রীনাথের মধ্যে ৮০০ যাত্রীবাহী ২৩খানি বাস এবং অন্যান্য কয়েকটি যানবাহন চলছিল। সেগুলো হয় বদ্রীনাথের দিকে যাচ্ছিল, না হয় বদ্রীনাথ থেকে ফিরছিল। গোড়ায় যদিও অনুমান করা হচ্ছিল যে, এই দুর্ঘটনায় সহস্রাধিক লোক মারা পড়েছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত নিহতের সংখ্যা তত বেশি হয় নি। আকস্মিক বন্যায় অলকানন্দা এবং সারদা উপত্যকায় মৃত্যুর সংখ্যা দু' শ'-আড়াই শ' হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সঙ্গে মন্দাকিনী নদীর বন্যায় একই এলাকায় দুটি গ্রাম ভেসে গেছে। অলকানন্দা উপত্যকায় এ পর্যন্ত (২৫।৭।৭০) ৬৭টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আরও ৬০।৬৫টি মৃতদেহ পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সারদা উপত্যকায় ৭১টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তবে সংখ্যাটা একশ'য় পৌঁছাতে পারে। উত্তরপ্রদেশ সরকার যে তথ্য পেয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তীর্থযাত্রীবাহী বাসের অধিকাংশ যাত্রী বন্যার আবির্ভাব দেখে বাস থেকে নেমে হাঁটাপথে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তাই বন্যার করাল গ্রাস থেকে তাঁরা বেঁচে গেছেন।

যোশী মঠের কাছে ঝাড়খণ্ডায় এক জমি ধসে ৭খানি গৃহ কবরস্থ হয়। সেখানেই মারা গেছেন ১৫ জন। যোশী মঠ এলাকায় মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশের মত হবে। দ্বিতীয় ধস নামে সারদা উপত্যকার পিথোরাগড় এলাকায়। তাতেও ১০।১৫ জন মারা গেছেন।

অলকানন্দায় অকস্মাৎ যে বন্যা দেখা দেয় তার উচ্চতা ছিল ৪০ ফুট।

ক্ষয়-ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও নির্ণয় করা যায় নি। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেটা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা এখনও আমরা অর্জন করতে পারি নি। তবে প্রকৃতির এই রুদ্র রোষের কারণ অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। প্রতি বছর সারা ভারতের হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ঐ পথে বদ্রীনাথে তীর্থ করতে যান। কাজেই তাঁদের যাত্রাপথ যতদূর সম্ভব নিরাপদ করা দরকার। যাঁরা এবারের দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার তাঁদের রিলিফ দেবার জন্য এগিয়ে গেছেন জেনে সকলেই স্বস্তি বোধ করবেন।

মহাজোটের মহা বিপত্তি

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই স্বতন্ত্র, জনসংঘ, এস-এস-পি, মুসলিম লীগ এবং সিণ্ডিকেটকে এক 'মহাজোটে' আবদ্ধ করে ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টকে উল্টে দেবার যে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করেছিলেন, তাতে স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ মহা আনন্দে সাড়া দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাদ সাধছে সিণ্ডিকেটের গুজরাট শাখা। মোরারজীর তল্পিবাহক বলে এতকাল পরিচিত গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (সিণ্ডিকেটী) এক সাধারণ সভায় গত ২২শে জুলাই এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, সিণ্ডিকেট যে আদর্শের উপর নিজেকে দাঁড় করিয়েছে, তার সঙ্গে কোন পর্যায়েই স্বতন্ত্র, জনসংঘ, মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি-গুলোর জোট গঠনের প্রস্তাব খাপ খায় না। কাজেই সেই প্রস্তাব আদৌ গ্রহণ-কংগ্রেসের আদর্শ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র।

গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (সিণ্ডিকেটী) এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন মাত্র একজন। মোরারজী দেশাই তাঁর মহাজোটের পক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেও গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেসকে (সিণ্ডিকেটী) নিজের দলে টানতে পারেন নি।

ভারতে সিণ্ডিকেটের প্রভাব-প্রতিপত্তি শুধু গুজরাট আর মহীশূরে সীমাবদ্ধ। কারণ এই দুই রাজ্যে তাঁদের দল ক্ষমতায় আসীন। সেই গুজরাট মোরারজীর সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যখন "মহাজোটে"র বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, তখন মোরারজীর দক্ষিণপন্থী মহাজোটের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত ধূলিসাৎ হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। আর মহীশূরের অবস্থাও সিণ্ডিকেটের পক্ষে খুব সুবিধাজনক নয়। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই রাজ্য সফর করতে গিয়ে যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন, তাতে সিণ্ডিকেটের অনেক নেতারই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। গুজব রটেছে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিল সদলবলে কংগ্রেসে (ইন্দিরা-পন্থী) যোগ দেবার কথা চিন্তা করছেন।

ওদিকে দক্ষিণপন্থী মহাজোটের প্রশ্ন নিয়ে পার্লামেণ্টে সিণ্ডিকেট দলের নেতা ডঃ রামসুভগ সিং-এর সঙ্গে মোরারজীর নাকি আদৌ বনিবনা হচ্ছে না। ডঃ রামসুভগ সিং নাকি দক্ষিণ-পন্থী মহাজোট গঠনের একেবারে বিরোধী। তিনি নাকি মোরারজী এবং নিজলিঙ্গাপ্পাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, নীতি বিসর্জন দিয়ে স্বতন্ত্র জনসংঘের সঙ্গে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একেবারেই অবাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেন। তাতে মিত্রতাপন্থীরা প্রকাশ্যেই ডঃ রামসুভগ সিং-এর বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করছেন। তাতে দু' পক্ষের তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ডঃ রামসুভগ নাকি পদত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন।

সিণ্ডিকেট দলের মধ্যেও মোরারজী দেশাইয়ের প্রাধান্য নাকি অনেক হ্রাস পেয়েছে। যাঁরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত মোরারজীর একান্ত ভক্ত ছিলেন তাঁরাও অনেকে এখন প্রকাশ্যে বলতে সুরু করেছেন যে, মোরারজী প্রধানমন্ত্রী হবার লোভে এমন সব দলের সঙ্গে ভিড়তে চাইছেন, যাদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্কই থাকা উচিত নয়।

গত বছর কংগ্রেস যখন দুভাগ হয় তখন মোরারজী দেশাইকে সিণ্ডিকেটের পার্লামেন্টারী নেতা করতে অশোক মেটার ঘোর আপত্তি ছিল। সিণ্ডিকেটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জে বি কৃপালনীর মধ্যস্থতায় তখন স্থির হয়েছিল যে, ডঃ রামসুভগ সিং হবেন সিণ্ডিকেটের লোকসভার নেতা এবং শ্রী এস এন মিশ্র হবেন রাজ্যসভার নেতা। কিন্তু এখন নাকি মেটার সঙ্গে ডঃ রামসুভগের আগে বনিবনা হচ্ছে না। মেটা নাকি এখন রামসুভগকে নেতৃপদ থেকে হটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। বর্তমানে দলের মধ্যে মোরারজীর প্রধান সমর্থক নাকি অশোক মেটা।

সিণ্ডিকেট আশা করেছিল, দক্ষিণ-পন্থী মহাজোট গঠিত হলে ইন্দিরা গান্ধীর দল থেকে বহু সদস্য এসে তাঁদের দলে যোগ দেবেন। তখন মোরারজী দেশাই তাঁদের সবাইকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে গিয়ে বসে পড়বেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ফলটা দাঁড়াবে উল্টো। মহাজোটের প্রশ্নে সিণ্ডিকেট দলের মধ্যেই মতভেদ এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে মহাজোট গঠন নিয়ে মোরারজী-নিজলিংগাপ্পা বেশি বাড়াবাড়ি করলে সিণ্ডিকেটের অন্তত জনা দুই সদস্য ইন্দিরা গান্ধীর দলে গিয়ে যোগ দেবেন।

অবস্থা দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, মোরারজীর মহাজোট শেষ পর্যন্ত মহাশূন্যতায় বিলীন হয়ে সিণ্ডিকেটের ভরাডুবির পথই প্রশস্ত করবে।

বাদল মন্ত্রিসভা টিকে গেল

পাঞ্জাবের বাদল (আকালী) মন্ত্রিসভা শক্তিপরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। গত ২৪শে জুলাই সেই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটা অনাস্থা প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল কিন্তু ২৯ জন সদস্যের সমর্থন লাভ করতে না পারায় সেই প্রস্তাব আলোচনার জন্যই গ্রহণ করা হয় নি। দেখা গেল বিধানসভার মাত্র ১৯ জন সদস্য প্রস্তাবটি আলোচনার পক্ষপাতী। বাকি সবাই নীরব। পাঞ্জাব বিধানসভায় সদস্যের সংখ্যা ১০৪ জন। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার পক্ষে ছিলেন জনসংঘ (৭), গুরনামের বিদ্রোহী আকালী দল (৭), সি-পি-আই (৪) এবং এস-এস-পি (১)।

ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দল (২৮) দুদিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁরা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন। অর্থাৎ বাদল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দেবেন না। তাঁরা সেই ঘোষণায় অটুট ছিলেন।

পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী চালে ভুল করেছেন। মন্ত্রিসভার পতন যখন

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় প্রমথনাথ সেনগুপ্তের 'আনন্দদ্রুপম্', মিত্রেন-এর 'শহর কলকাতা', পুলকেশ দে সরকারের 'দৃষ্টি পরিক্রমা' ও নিশানির 'কলকাতা—অক্ষরেশ এবং এক্ষেশে' প্রকাশ করা গেল না। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যায় রচনাগুলি যথারীতি প্রকাশিত হবে। —সম্পাদক

অনিবার্য ছিল না তখন অনাস্থা প্রস্তাব তুলতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত। অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার পরে যদি সেটা ভোটে অগ্রাহ্য হত তাহলে কেউ আর এ কথা বলবার সুযোগ পেত না যে, তিনি একটা সংখ্যালঘু সরকারের কর্ণধার। বাদলের দলে সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৪৯ জন। কাজেই তিনি যে সংখ্যালঘু দলের সরকার পরিচালনা করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আকালী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের (ইন্দিরাপন্থী) সমঝোতার কথাবার্তা যথারীতি চালু আছে। দুই পক্ষ সমঝোতার দিকে অনেকখানি এগিয়েছেন বলেই মনে হয়। নইলে কংগ্রেস দল নিশ্চয়ই অনাস্থা প্রস্তাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেন না।

গুরনাম সিংকে আবার আকালী দলে ভেড়াবার জন্য কংগ্রেস দল যে চেষ্টা করছিলেন, সেটা নাকি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

গুরনাম সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সন্ত ফতে সিং-এর সঙ্গে তিনি কোন আলোচনায় আসতে রাজী নন। পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী সমঝোতার পথে গুরনাম সিং কিছুটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কারণ সন্ত ফতে সিং গুরনাম সিংকে দেখতে পারেন না, অথচ গুরনাম সিংকে বাদ দিয়ে আকালী-কংগ্রেস মিত্রতায় কংগ্রেস দলের বিবেকে বাধছে।

২৫।৭।৭০

সিংহল :

এ দেশের ইতিহাস নতুন করে লেখা হচ্ছে। দেশের নামই পাল্টে গেল, আরো পরিবর্তন, আরো নতুন করে তাকে সাজানো তো হবেই। সিংহল কথা আজ অচল, শ্রীলংকা বললে তবেই ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের এই ছোট্ট দ্বীপটিকে বোঝাবে। অবশ্য প্রাচীন ইতিহাসকে আশ্রয় করেই সিংহলের পুরাতাত্ত্বিক নাম শ্রীলংকা রাখা হলো।

শ্রীলংকায় আজ যে নবীন প্রাণের জোয়ার দেখা দিয়েছে তার প্রধান উৎসই হলো প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক বা যুক্তফ্রন্ট। গত মে মাসে অনুষ্ঠিত দেশের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে এখানে নতুন সরকার গঠন করেছেন। এ জয়লাভই যুক্তফ্রন্টভুক্ত দলগুলোকে উদ্বুদ্ধ করেছে নতুন করে দেশ গঠনে। ছোটখাট পরিবর্তনের কথা ছেড়ে দিয়ে —যদিও তাদের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়—একটা বড় পরিবর্তনের উল্লেখ এখানে করবো যে-ঘটনা ঐতিহাসিক মর্যাদালাভ করবে এবং যার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী।

শ্রীলংকায় একটা গণপরিষদ গঠিত হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করা যার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে শেষ সম্পর্কটুকু পর্যন্ত ছিন্ন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের আহবানে ১৫০০ বিশিষ্ট সিংহলী নাগরিক সাড়া দিয়ে নবরঙ্গ থিয়েটার হল-এ মিলিত হয়েছিলেন। যোগদানকারীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু, খৃস্টান বিশপ, আইনবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজনেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো দেশের নতুন সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয়তা বিরোধী দলগুলিও অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই পার্লামেণ্টের মোট ১৫৭ জন সদস্যই এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ছিল শাসক পক্ষভুক্ত শ্রীমতী বন্দরনায়কের শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি, ট্রটস্কিপন্থী লংকা সমসমাজ পার্টি, মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিরোধীপক্ষের ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি, ফেডারেল পার্টি এবং তামিল কংগ্রেস।

গণপরিষদের উদ্দেশ্য সংবিধান রচনার মাধ্যমে ১৭৫ বছরের ব্রিটিশ প্রভুত্বের চির অবসান ঘটানো এবং দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করা। যদিও ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সিংহল ত্যাগ করে যান এবং সিংহল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে, তবুও কার্যত আইন ও সাংবিধানিক দিক থেকে সিংহল এখনো ব্রিটিশ শেকলে বাঁধা রয়েছে। এখনো বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলই সিংহলের শেষ আপীল আদালত। প্রিভি কাউন্সিলের এমন রুলিং জারী করা রয়েছে যার দ্বারা সিংহলের পার্লামেণ্ট সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেও সংবিধানের কয়েকটি ধারার কোনো পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। অর্থাৎ সিংহল নামেই স্বাধীন, আসলে তার সার্বভৌমত্ব নেই, সে ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল, অধীন।

এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সিংহলকে পুরোপুরি সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই নতুন সংবিধান রচনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমান সংবিধানটি রচিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে এবং এর জনক ছিলেন লর্ড সোলবেরি যিনি পরে সিংহলের গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক বলেছেন যে এমন সংবিধান চাই যার দ্বারা সিংহলের বহু জাতিক বহু ধর্মীয় নাগরিকরা একত্ব বোধ করতে পারেন। এই সংবিধান দেশবাসীর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করবে। নতুন সংবিধান দেশের স্বাধীনতা এবং জাতীয় নীতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে।

বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এখানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, এখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া স্বভাবতই ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। স্থির রয়েছে যে, আগামী ৫ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় আইনসভা বা জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে এবং ২২শে অক্টোবর হবে প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন। সরকারীভাবে যদিও এ দিনগুলি স্থির হয়েছে, তবুও এ-সম্পর্কে পাকিস্তানের পূর্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষের পুরনো ইতিহাস স্মরণে রেখে কোনো কোনো রাজনৈতিক মহল থেকে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছেঃ নির্বাচন আদৌ হবে কি না। এ সংশয় উদ্ভবের একটা প্রধান কারণ ঘটেছে এখানে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘু বিতাড়ন এবং সরকারের নির্বাচনী প্রস্তুতিতে শিথিলতা।

জনাব এম এ এইচ ইস্পাহানি পাকিস্তানের একজন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা, যিনি পাকিস্তানের জনক কায়েদ-এ-আজম জিন্নার সহযোগী ছিলেন। সম্প্রতি জনাব ইস্পাহানি দাবি জানিয়েছেন যে, অবাধ, স্টুটিমুক্ত এবং ন্যায়পূর্ণ নির্বাচনের খাতিরে ইয়াহিয়া খান সরকারের উচিত পদত্যাগ করা। অক্টোবরের দুমাস আগে সরকারের পদত্যাগের দাবি করে সীমান্ত মুশ্লিম লীগ পরিষদ নেতা খান গোলাম মহম্মদ খানও বিবৃতি দিয়েছেন।

পাকিস্তানের গোঁড়া, দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান সামরিক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলেই নাকি তাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা সম্ভব হবে। যদিও বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছিল, তথাপি পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর জানিয়েছেন যে, সাধারণ নির্বাচনের সময় পরিস্থিতির সামাল দেবার জন্য অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখা হবে।

রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান যে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক ঐতিহ্যের যে উত্তরাধিকার সে পেয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের ততখানি গর্ব করার মতো কী আছে? পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের বিমাতৃসুলভ আচরণের কারণেও পূর্ব বাংলার মানুষ ক্ষুব্ধ। সম্প্রতি চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীর কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে এক অভিযোগ করা হয়েছে যে, পশ্চিম

পাকিস্তানের [illegible] [illegible] [illegible] ষড়যন্ত্রের জনোই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রচিত হয়েছে। গত ২২ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দুই শতাংশ আঞ্চলিক উৎপাদন পণ্য এবং নয় শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

নির্বাচন যেমন দ্রুতে এগিয়ে আসছে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতাও বেড়ে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ, এখানকার পাঁচটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল এক নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সে দলগুলি হল; নুরুল আমিনের পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক দল, মিঞা মমতাজ দৌলতানার কাউন্সিল মুসলিম লীগ, মাকার্জি জমিয়ত-উল-উলেমা-এ-ইসলাম, জমিয়ত-উল-উলেমা পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় জমিয়ত আহিলে হাডিথ।

দক্ষিণপন্থীদের এই জোট বাঁধায় প্রতিক্রিয়া হয়েছে এই যে, অন্য দলগুলোও নির্বাচনী জোট বাঁধার জরুরী তাগিদ অনুভব করছে। ইতিমধ্যেই শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ এবং খান ওয়ালি খানের মস্কোপন্থী জাতীয় আওয়ামী লীগের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। আবার পিকিংপন্থী মৌলানা ভাসানীর জাতীয় আওয়ামী দলের সঙ্গে আয়ুবপন্থী কনভেনশন মুসলিম লীগের নির্বাচনী ঐক্যের কথা হয়েছে। অন্যদিকে আয়ুব-বিরোধী আবদুল কোয়ায়ুম খাঁর কনভেনশন মুসলিম লীগ নাকি আবার মৌলানা ভাসানীর কাছে সহযোগিতার হস্ত প্রসার করেছিল, কিন্তু ওদিক থেকে হাত এগিয়ে আসে নি।

তবে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকর ভুট্টোর পিপলস পার্টি কোনো দলের সঙ্গে সুবিধাবাদী জোট গঠনের বিরোধী বলে জানিয়ে দিয়েছেন। নির্বাচনের এখনো ঢের দেরি, এখনো মনোনয়নপত্র ইত্যাদি দাখিলের তারিখই ঘোষিত হয় নি। ততদিনে রাজনৈতিক আসর যে আরো জমে উঠবে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

॥ বঙ্গদর্শন ॥

[২৬৯ পৃষ্ঠার পর]

ছেলেমেয়েকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং থানায় তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন হয়। এদের অপরাধ, একটি স্বাধীন দেশে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে কেউ বাজারে যাচ্ছিল, কেউ খেলতে যাচ্ছিল, কেউ হাসপাতালে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত গুণ্ডোর পড়ে থানা কর্তৃপক্ষ বাপ বাপ বলে তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ তো একটিমাত্র ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রতিদিন এরকম ঘটনা যে কতখানি [illegible] [illegible] নেই। গ্রামাঞ্চলে এই বর্বরের দল সুযোগ-সুবিধামত মেয়েদের উপরেও অত্যাচার করেছে, এরকম কয়েকটি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে, যা আমরা পূর্বে বঙ্গদর্শনে উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি শিয়ালদহ রেল স্টেশনে জনৈক সি-আর-পি কর্তৃক একটি মহিলার শ্লীলতাহানির সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

গত ২৪শে জুলাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সি-আর-পি'র বেপরোয়া অত্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে যে-কোন মানুষই স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সি-আর-পি'র পিকেট, কিছু সি-আর-পি আন্ডারওয়ার পরিহিত অবস্থায় তাস খেলছিল। হঠাৎ রটে যায় যে, বাইরে থেকে কে বা কারা যেন বোমা ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তান্ডব। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণের ভয়ে কোনরকমে ক্যান্টিন হলে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু সি-আর-পি বাহিনী ওই ক্যান্টিনের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের আর্ত চীৎকার এবং সি-আর-পি-দের উন্মত্ত উল্লাসধ্বনির মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এদের হাত থেকে অধ্যাপক ছাত্র, কর্মচারী, কেউই রেহাই পান নি। কয়েক রাউন্ড গুলিও চলে, আহতের সংখ্যা আড়াইশোর বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনের তিনতলা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘরের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। নিচে ক্যান্টিনের সমস্ত খাবার লুণ্ঠন করা হয়। এই আক্রমণের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পথচারী মহিলা, শিশু, রোগীও বাদ যান নি।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবনতিকে সামাল দেবার জন্য সি-আর-পি আমদানী করা হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে, তারা নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবিরোধীদের দিয়ে সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করা যায় না, এটাই তার প্রমাণ। আশা করি, দিল্লী থেকে আমদানী করা এই সমাজবিরোধীগুলি শেষ পর্যন্ত পাব পাবে না।

যাত্রিসঙ্ঘের দাবী

'পশ্চিমবঙ্গ যাত্রিসঙ্ঘ' নামক সংস্থা কয়েকদিন পূর্বে একটি বিশেষ অধিবেশনে রেল-যাত্রীদের স্বার্থে দাবি করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে রেলপথ উন্নয়নের জন্য চতুর্থ যোজনায় ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত। শুধু তাই নয়, দমদম-প্রিন্সেপ ঘাট অর্ধচক্র রেল লাইন স্থাপন, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ সেতু নির্মাণ, ছোট [illegible] ক্ষেত্রে [illegible] করা, যেখানে সিঙ্গল লাইন আছে, সেখানে অবিলম্বে ডবল লাইন চালু করা এবং রাজ্যের যেসব রেল লাইনে এখনও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু হয় নি, সেখানে অবিলম্বে বৈদ্যুতিকরণ ব্যবস্থা চালু করার দাবি করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, অর্ধচক্র রেল এবং ভূগর্ভ রেলের মধ্যে কোন বিরোধ তৈরি করা উচিত নয়, বরং কলকাতার পক্ষে আগে অর্ধচক্র রেল এবং তার তিন বছরের মধ্যে ভূগর্ভ রেল নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি প্রস্তাবই যুক্তিপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মত জনবহুল এবং শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যের রেল পরিবহণকে এখনো আরও উন্নত, নিখুঁত এবং আধুনিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা ছাড়াও রেলওয়ের উন্নয়নমূলক কাজ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হওয়া দরকার এই জন্য যে, রেল পরিবহণের আরও উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটলে সমস্যাসঙ্কুল এই রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার এবং যাত্রীদের যাতায়াতের সুখ-সুবিধার অনেক সুযোগ ঘটবে। রেল দপ্তরের আরও মনে রাখা উচিত যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাল বহন এবং যাত্রী পরিবহণ বাবদ তাঁরা প্রতি বছর এক বিরাট অঙ্কের টাকা মুনাফা হিসাবে অর্জন করছেন। অতএব পশ্চিমবঙ্গে রেলপথের শ্রীবৃদ্ধি এবং যাত্রীদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ মেটানোর কাজটিকে একটি নৈতিক কর্তব্য হিসাবেই গণ্য করা উচিত। তা ছাড়া চতুর্থ যোজনায় পশ্চিমবঙ্গে যদি আরও ১২৫ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়, সেটা আসলে একটা লগ্নীই হবে, তা রেলওয়ের আয় বাড়াতেও সাহায্য করবে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ যে কত উদাসীন, সেটা যে-কোন একটা রেলের বগী দেখলেই বোঝা যায়। বসবার আসন নেই, জিনিসপত্র রাখার জন্য উপরের লোহার তাকগুলি নেই, পাখা নেই। বলা বাহুল্য, যাত্রিসাধারণ এগুলি চুরি করেন না, বিশেষ লোকেই চুরি করে এবং তা রেলরক্ষী বাহিনীর জ্ঞাতসারেই এবং রীতিমত প্রশ্রয়ে। ইলেকট্রিক ট্রেনের একটা কোচে বাহান্নজনের বসবার ও কুড়িজনের দাঁড়াবার জায়গা আছে। কিন্তু প্রতিটি কামরা এর তিন গুণ লোক বহন করে এবং তাদের কাছ থেকে রেলওয়ে টিকিটের দামও পেয়ে থাকেন, অথচ যে যাত্রীরা রেলের লক্ষ্মী, তাদের প্রতিই এই বিরামহীন পীড়ন। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রেও কোন নিয়মানুবর্তিতা নেই। কাজেই যাত্রিসাধারণের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ভিন্ন কোন উপায় নেই।

ঘুঁটে পুড়ছে, গোবর হাসছে। আমরা সকলেই গোবর হাসছি—আমরা জানি না আজ বাদে কাল গোবর ঘুঁটে হবে. শুকিয়ে ঘুঁটে হবে, তখন এই ঘুঁটেও পুড়বে। এই কথা আমরা জানি না, বুঝি না তা নয়. তবু আমরা গোবর হয়ে ঘুঁটের দুর্গতি দেখে হাসি। রাজ্যব্যাপী নিত্যদিনের হানাহানি, রক্তারক্তি, অগ্নিকাণ্ড, মৃত্যু, বোমবাজি সব মিলিয়ে যে অবক্ষয় চলছে এবং যার ফলে রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ আজ ডুবতে বসেছে, তা দেখে আমরাকেউ-না-কেউ হাসছি। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে খিদিরপুর ডক পর্যন্ত সারা কলকাতা ঘুরে যদি দেখা যায়, তবে দেখা যাবে একদিকে সব পুড়ছে, জ্বলছে, বন্ধ হচ্ছে, আর একদিকে মানুষ হাসছে।

শিয়ালদহ স্টেশনে একটু দাঁড়ান, তাকিয়ে দেখুন, ঝিলের নাগালে পাওয়া যায় যতগুলো ঘড়ি আছে, সবগুলি অচল হয়ে গেছে, সব ঘড়ি ভাঙা। লক্ষ লক্ষ যাত্রী শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে ঘড়ি দেখে যাত্রা শুরু করে অথবা ঘড়ি দেখে ট্রেন ধরতে ছোটে, তাদের সামনে আজ আর সেই সময়-নির্দেশের সচল ঘড়ি নেই। অচল ঘড়িগুলি পড়ে আছে। এই ঘড়িগুলিই বুঝি পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, জনজীবন অচল হয়ে গেছে। কে ভেঙেছে এই ঘড়িগুলো, কারা ভেঙেছে এই ঘড়ি, কি স্বার্থসিদ্ধি হয়েছে এই ঘড়িগুলি ভেঙে—তার একটিমাত্র জবাব পাওয়া যাবে। সেই জবাব হল বিপ্লব আসছে, বিপ্লব চলছে, তাই ঘড়ির কাঁটা অচল। অচল কলেজ স্ট্রীট।

কলেজ স্ট্রীট হল শুধু বাংলাদেশ নয়, ভারতবর্ষের শিক্ষা, প্রগতি ও নবজাগরণের পীঠস্থান, ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁর সূতিকাগার। ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার, মাইকেল, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ওটেনের মুখে সুভাষচন্দ্রের চপেটাঘাত পর্যন্ত যে শিক্ষা-সংস্কৃতি, বিপ্লব-বিদ্রোহের স্রোতোধারা সারা ভারতের বন্ধ্যা জমিকে উর্বর করেছে, তার উৎসমুখ এই কলেজ স্ট্রীট পাড়া। সেই কলেজ স্ট্রীট পাড়া আজ অচল—কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কেউ আর বেশি জীবনবীমা না থাকলে আসে না। সারা ভারতের ভাল ছেলেরা একদিন ছুটে আসত এই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় শিক্ষা গ্রহণ করতে, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় শিক্ষা না পেলে কোন শিক্ষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ হত না। আজ সেই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় সারা ভারতের ভাল ছেলেরা ছুটে আসে না, ছুটে আসে সারা বিশ্বের বাঘা সাংবাদিকরা—জাপান, আমেরিকা, বৃটেন, ইটালি থেকে। দেখতে আসে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় বিপ্লব চলছে, নয়া কেতার বিপ্লব—যে বিপ্লবের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ নয়, সামন্তবাদ নয়, পুঁজিবাদ নয়, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন নয়। এই বিপ্লবের লক্ষ্য হল শিক্ষাব্যবস্থাকে বুর্জোয়া বলে চিহ্নিত করে তাকে উড়িয়ে দেওয়া। কলেজ স্ট্রীট আজ আর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর কলতানে মুখরিত নয়, মুখরিত বোমা-টিয়ার গ্যাসের সেলে, বন্দুকের আওয়াজে, পুলিশ-সি আর পি'র ভ্যানের আনাগোনায়। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানের গবেষণাগার—যেখানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা, রমন সাধনা করে গেছেন, সেই বাড়িতে আজ আর বিজ্ঞানের সাধনায় নবতর কোন আবিষ্কার ঘটে না, আবিষ্কার ঘটে পুলিশের তল্লাসীতে তাজা বোমা। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের যত প্রতিভাবান মানুষ ভারতবর্ষ ও বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, তার মধ্যে শতকরা আশিজন কোন-না-কোনভাবে এই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এসে কিছু না কিছু তালিম নিয়ে গেছেন। কিন্তু আজ কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় মুর্শিদাবাদ-মতিহারি-শ্রীকাকুলাম থেকে অনেকে আসে বোমবাজির তালিম নিতে। একদা ভারতের সমস্ত ভাল ছেলে ছুটতো কলেজ স্ট্রীট লক্ষ্য করে। কলেজ স্ট্রীটে এসে শিক্ষাগ্রহণ না করলে কোন শিক্ষাই যেন মর্যাদার হত না। বহির্ভারতেই এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেই চিনতো সকলে। আজ অচল সেই কলেজ স্ট্রীট। শিক্ষা নয়, ছাত্র নয়, গবেষণা নয়, বালির বাঁধ আর তার পর সদা-প্রস্তুত বন্দুক হল সত্য। জীবনের জয়যাত্রা নয়, জীবনের সাধনা নয়—প্রাণের বিনাশ, জীবন নাশ হল সত্য। আজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শুধু প্রেসিডেন্সী কলেজ নয়—নামেও আজ যাদবপুর, কল্যাণী, [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়, [illegible]

চিকিৎসাবিদ্যায়ও বাংলাদেশ তথা কলকাতার স্থান ছিল বিশ্বজোড়া, ভারতবর্ষের কোন বড় ডাক্তারই বোধ হয় এক সময় ছিলেন না—যিনি কলকাতায় এসে চিকিৎসাশাস্ত্রে তালিম নিয়ে না গেছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র চিকিৎসাশাস্ত্রে কঠিন প্রশ্ন উঠলেই ডাক পড়ত কলকাতার ডাক্তারদের। যে কোন কঠিন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে নিয়ে আসবার চেষ্টা হত কলকাতায়। ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ প্রতাপ মজুমদার থেকে শুরু করে আজকের ডাঃ নলিনী সেনগুপ্ত, ডাঃ নীহার মুন্সী, ডাঃ মুরারি মুখার্জী পর্যন্ত হাজার হাজার ডাক্তার—সে এ্যালোপ্যাথিক হোক, হোমিওপ্যাথিক হোক আর কবিরাজী হোক, চোখের হোক, আর প্লাস্টিক সার্জারীর হোক—চিকিৎসাশাস্ত্রে কলকাতা ছিল সবার ওপরে, সবার আগে। হাঁ, সেই চিকিৎসাবিদ্যা চর্চাও কলকাতা থেকে বিদায় নিল। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য আর কেউ কলকাতা আসে না, ভবিষ্যতেও আসবে না। মেডিক্যাল কলেজসমূহের গবেষণাগার আর ছাত্রাবাসগুলিও আজ বোমাবাজির কবলে পড়েছে। এই বছর প্রি-মেডিক্যাল পরীক্ষা ভণ্ডুল করে এক বৎসরের জন্য কলেজে ভর্তির পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

কারিগরী তথা ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষায়ও কলকাতা তথা বাংলাদেশের শিক্ষার মান ছিল সবচেয়ে উঁচুতে। শিবপুর, যাদবপুর, খড়্গপুর উপহার দিয়েছে সারা ভারতকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনীয়ার। এই সব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়বার জন্যও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র থেকে ছেলেরা ছুটে আসত—আজ সেই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিও বন্ধ হয়ে গেছে, যাচ্ছে। এই কলেজগুলিও আজ উন্নত ধরনের কারিগরী বিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র নয়, উন্নত ধরনের বোমা তৈয়ারির কারখানায় পরিণত হয়েছে।

কলকাতার বন্দর ছিল ভারতের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। বিশ্বের নানা স্থান থেকে পণ্যবাহী জাহাজ কলকাতা বন্দরে এসে নোঙর ফেলত। আজ সকলেই পথ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে কাণ্ডলা-ভিজাগাপত্তম। অচল হয়েছে কলকাতা বন্দর।

কলকাতার সংবাদপত্রের মানও ছিল খুব উঁচুতে। কলকাতার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের মান-খ্যাতির ছিল ভারতের সর্বত্র। বিশ্বের সব সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও তার সাংবাদিকরা কলকাতায় থেকে কাজ করতেন, কিন্তু

কার নেমে এসেছে। সাংবাদিকরা আজ আর মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে কোন স্থানে ছুটে যান না, আর সাংবাদিকদেরও সর্ব অবস্থায় আক্রমণের ঊর্ধ্বে রেখে চলা হয় না। সংবাদপত্রের গাড়িও সংবাদপত্র নিয়ে যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে দূর-দূরান্তে সংবাদপত্র পৌঁছে দিতে পারে না। বোমা আর আগুনের কবলে পড়তে হয়েছে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকে।

তাই বলছিলাম—সব অচল। শিয়ালদহ স্টেশনের ঘড়ি থেকে জনজীবনের সব উন্নতিমুখী দিকগুলি অচল করে দেওয়া হয়েছে। সচল শুধু বোমা, সচল পুলিশের গাড়ি-ভ্যান, গুলী-টিয়ার গ্যাস। কে এর জন্য দায়ী, আর কে পারে জাতিকে ফিরিয়ে আনতে—এই সর্বনাশা পথ থেকে? এই প্রশ্ন সততই ওঠে, তাই তার জবাবও দরকার। এই জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবে একটা জবাব দেওয়া যেতে পারে, সেটা হল, যেদিন আমরা বুঝব আমরা গোবর, আগামীকাল ঘুঁটে হয়ে পুড়তে হবে, সেইদিন আমরা বাঁচবার চেষ্টা করব এবং তখনই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

শুধু একটা নজীর দিচ্ছি। বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গা এলাকায় সি পি এম-ফরোয়ার্ড ব্লক দল গত আট মাস একনাগাড়ে একে অপরকে খুন ও আক্রমণ করে চলেছে। কত মৃত্যু হয়েছে, কত মানুষ আহত হয়েছে, কত বোমা ফেটেছে, কত গুলী চলেছে, টিয়ার গ্যাস ছোড়া হয়েছে—তার হিসেব নেই। হিসেব নেই পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি আর তৎপরতার, কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নি। কেন না ঐ ঘুঁটে পুড়েছে, গোবর হেসেছে। বেলেঘাটার এই বোমা—এই সঙ্ঘর্ষ সংক্রমিত হয়েছে সারা দেশে। এক বেলেঘাটা সহস্র হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীঅশোক ঘোষ যদি বেলেঘাটায় ঘুঁটে পোড়া দেখে গোবরের হাসি না হাসতেন, তবে কি পারতেন না থামাতে বেলেঘাটাকে? আজ পুলিশ ক্যাম্প বসিয়ে বেলেঘাটা শান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু পুলিশ নয়, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীঅশোক ঘোষ ক্যাম্প করলে শান্ত হবে বেলেঘাটা। প্রমোদবাবু হাত ধরুন শ্রীঅশোক ঘোষের অথবা অশোকবাবু প্রমোদবাবুর সঙ্গে পদযাত্রা শুরু করুন বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গায়, বলুন, কি ফরোয়ার্ড ব্লক, কি সি পি এম আমাদের বোমায় না মেরে, আমাদের গুলী না করে পারবে না আর একটা বোমা ছুড়তে—যে বোমায় বস্তিবাসী মরে, সাধারণ মানুষ মরে, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। বেলেঘাটায় একদিন গান্ধীজী ক্যাম্প করে ছিলেন ১৯৪৬-এর দাঙ্গা থামাতে। গান্ধীজীর চেষ্টা শুরু হয়েছিল বেলেঘাটা থেকেই। নিভেছিল নোয়াখালি-বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন।

প্রমোদবাবু-অশোকবাবুকে গান্ধীবাদী হতে বলছি না, তাঁরা শুধু হাত ধরে দাঁড়িয়ে বলুন—শরিকী বিবাদ আমরা মিটাবো বহুবাজার আর আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে বসে, কিন্তু তোমাদের আর বোমা ছুড়তে দেব না। দেখুন, বেলেঘাটা শান্ত হবে, নতুন নজীরে সারা দেশের বোমাবাজির পথে বাধা পড়বে। এই সর্বনাশা যাত্রাপথে একটা বাধা রচনা করতে পারবেন প্রমোদবাবু-অশোকবাবু।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ দুই ॥

স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের আর একটি বক্তব্য—

"বিবেকানন্দ যে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন, সে স্বপ্ন যে বাস্তবে রূপায়িত হবে এমন ভরসা তাঁর ছিল না। ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের সংগঠনী প্রতিভা ও শূদ্রের সাম্যনীতির সমন্বিত রূপই ছিল তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। কিন্তু এই বলিষ্ঠ কল্পনাকে তিনি একটি সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে সমাপ্ত করলেন—'কিন্তু সে কি সম্ভব?' তাঁর জীবনে এ জিজ্ঞাসার উত্তর মেলে নি। দ্বিধাকণ্টকিত সমাজে জীবনের এই নিরুত্তর জিজ্ঞাসা, পীড়িত আবেগের এই আশাহীন ব্যাকুলতা বোধ হয় তাঁকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পথে সকল সমস্যার চরম নিষ্পত্তি খুঁজতে বাধ্য করেছে।"

কিন্তু স্বামীজীর জীবনের বাস্তব ইতিহাস এবং তাঁর চিন্তাধারা এই বক্তব্যের উল্টো সাক্ষ্যই বহন করে। তিনি সংসার-জ্বালা সহনে অক্ষম হতাশা-তাড়িত বৈরাগী ছিলেন না। সমাজচিন্তারও অনেক আগে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাঁর জীবনে উদিত হয়েছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ছিল তাঁর কৈশোরের কৌতূহল, যৌবনের গবেষণা এবং জীবনব্যাপী সাধনা। কিন্তু সে কথা যাক। প্রশ্নটি হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র নিয়ে। স্বামীজী চেয়েছিলেন এমন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, যেখানে প্রজ্ঞা, শক্তি, সংগঠনী প্রতিভা এবং সাম্যনীতির সমন্বয় ঘটবে অথচ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র শাসনের দোষগুলো তাতে থাকবে না। শূদ্র বা শ্রমিক-মজুরপ্রধান রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও কিছু কিছু কুফল দেখা দেবে, স্বামীজী এরূপ মত পোষণ করতেন। কিন্তু সেই কুফলকে পরিহার করে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব কিনা বা কিরূপে সম্ভব, সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসু গবেষক হিসাবেই এ প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন নিজের কাছে এবং সমাজতত্ত্ববিদদের কাছেও। ১৮৯৬ সালে ভগিনী হেলের কাছে লেখা স্বামীজীর চিঠি, যার উপর ভিত্তি করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন—তার থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত করছি, তাহলে কথাটি আরও পরিষ্কার হবে।

"যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায় যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সবগুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষ-গুলি থাকবে না, তাহলে তা একটা আদর্শ রাষ্ট্র হবে, কিন্তু এ কি সম্ভব?"

"অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না" —কথাগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় আদর্শ রাষ্ট্র রূপায়ণে মানুষের অক্ষমতার প্রতি অবিশ্বাসবশতঃ নয়, পরন্তু সেই আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে সম্ভাব্য সকল দোষকে পরি-হারের উপায়-চিন্তাই স্বামীজীকে এই প্রশ্ন উত্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রশ্নটি যে কতখানি বাস্তবসম্মত এবং সঙ্গত তা আর এক দিক দিয়ে বিচার করা যেতে পারে। সার্বজনীন কল্যাণের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করতে গিয়ে মার্কসও Socialist State বা শ্রমজীবীপ্রধান রাষ্ট্রকে শেষ কথা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

Socialist State-এ অত্যাচার ও উৎপীড়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অতএব মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানে শ্রমিক-মজুর শ্রেণী কর্তৃক যে রাষ্ট্র স্থাপিত তা পূর্ণাঙ্গ নয়—অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত। তাই বৈশ্যশাসন যুগে বা ধনিকশ্রেণীর আধিপত্যের সময়ে যা আদর্শ হিসাবে অনুসরণীয়, কালান্তরে তা দোষদুষ্ট বলে পরিত্যাজ্য। সর্বমানবের কল্যাণের আদর্শে মার্কস তাই এমন একটি অবস্থার কল্পনা করেছেন [যা অগ্রগামী ইতিহাসের ইঙ্গিত] যা প্রকৃত শ্রেণীসংঘাতহীন শান্তিপূর্ণ অবস্থা, যে অবস্থায় এক মানুষকে অপরের প্রভুত্ব স্বীকার করতে হবে না, যে অবস্থা সর্বপ্রকার শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত। অতএব স্বামীজীর যে প্রশ্নকে "সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসা" নাম দিয়ে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় চরম হতাশার ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছেন—এমন কি মার্কসবাদের পরিপ্রেক্ষিতেও তা একটি সুসংগত প্রশ্ন এবং আধুনিক সমাজ পরিকল্পনায় অগ্রগামী চিন্তার পরিচায়ক।

এই অধ্যাত্মবাদী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সন্ন্যাসী বস্তুজগতে মানুষের সমাজ বিবর্তনের গতিপথ নির্ণয়ে এবং তার সমস্যা সমাধানে কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন অর্থাৎ তাঁর সমাজ-ভাবনার সীমারেখা ও পরিধি কতখানি বিস্তৃত আর তাঁর চিন্তার ভিত্তি কত গভীরে প্রোথিত, তা আরও একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে।

অগ্রগামী ইতিহাসের গতিপথ ধরে ভাবী রাষ্ট্রের রূপরেখা নির্ণয়ে মার্কসের চিন্তাধারার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার কেমন সাদৃশ্য রয়েছে তা আমরা আগেই দেখেছি। মার্কস যে দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন, তিনি নিজেই

তার নামকরণ করেছেন [illegible] ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ—Historical and Dialectical Materialism." ঐতিহাসিক শক্তির অমোঘ নীতি অনুযায়ী দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চলেছে জড়জগতের বিবর্তন। দ্বন্দ্বের সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক বৈশিষ্ট্য। দ্বন্দ্বের ধারণাটি মার্কস হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব থেকে নিয়েছিলেন। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ এবং মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হেগেলের কাছে এই দ্বন্দ্বের নিয়ন্তা হল ভাব, চিন্তা বা চেতনা কিন্তু মার্কসের কাছে তা হল জড়ধর্মী বস্তুজগৎ। এই দ্বন্দ্বের প্রভাবে মানব সমাজে যত বৈষম্য, শ্রেণীচেতনা আর শ্রেণীসংগ্রাম এবং তার ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবলম্বন করে সমাজ বিবর্তন।

শ্রেণীবৈষম্য এবং শ্রেণীস্বার্থ সংঘর্ষের গভীর মূলদেশে যে সমাজ-প্রকৃতির এই অপ্রতিরোধ্য কর্মশক্তি ক্রিয়াশীল, সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের সন্ধানী দৃষ্টিতেও সে সত্যটি ধরা পড়েছিল যথাযথরূপে। তাই দেখা যায়, হেগেল-মার্কসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই মোল প্রত্যয়টি স্বামীজীর বেদান্তবাদী সমাজ-দর্শনেরও একটি মূলকথা। স্বামীজীর চিন্তায় এর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি রয়েছে। লণ্ডনে তাঁর প্রদত্ত একটি বক্তৃতার যে অনুলিপি রক্ষিত আছে তাতে দেখা যায় স্বামীজী বলছেন—

"সমগ্র প্রকৃতিতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া করিতেছে বলিয়া মনে হয়। একটি সর্বদাই এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পৃথক করিতেছে, অপরটি প্রতিমুহূর্তে বস্তুগুলিকে সর্বদা একসূত্রে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথমটি উত্তরোত্তর পৃথক পৃথক সত্তা সৃষ্টি করিতেছে: অন্যটি যেন সত্তাগুলিকে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করিতেছে এবং এই সব পরিদৃশ্যমান পৃথকত্বের মধ্যে ঐক্য ও সাম্য আনিতেছে। মনে হয় এই দুইটি শক্তির ক্রিয়া প্রকৃতি এবং মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিদ্যমান। বাহ্যজগতে বা ভৌতিকজগতে এই দুইটি শক্তি অতি স্পষ্টভাবে সক্রিয়—আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই।...মানুষের সামাজিক জীবনেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজজীবন গড়িয়া ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি ঐক্যস্থাপন করিতেছে: একটি বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি উহা ভাঙিতেছে। সমগ্র বিশ্ব এই দুই শক্তির কর্মক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। ...জগতে এই নিত্যক্রিয়াশীল বৈষম্য উৎপাদিকা শক্তি যখন রুদ্ধ হইয়া যাইবে তখন জগৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারণ।" [পৃঃ ৩৪৯—৩য় খণ্ড বাণী ও রচনা]

দ্বন্দ্ব সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত এই শ্রেণী-সংঘর্ষ সমাজে অধিকার রক্ষা এবং অধিকার বিলোপের সংগ্রামে পরিণতি লাভ করে। স্বামীজীর সমাজ-চিন্তায় এই সত্য অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল যে, জগতের প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক দেশের সমাজ-জীবন এই অধিকার বিলোপের সংগ্রামে লিপ্ত। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা স্বভাবতই বেশি বুদ্ধিমান, ইহা মানব-সমাজের সমস্যা নয়, অথবা এক শ্রেণীর মানুষ স্বভাবসিদ্ধ প্রবণতাবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশি ধন সঞ্চয়ে সক্ষম—ইহাও তাদের সমস্যা নয়। প্রকৃত সমস্যা হ'ল একশ্রেণী তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য হেতু অপরের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত কেড়ে নেবে কিনা বা অপরের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে উৎপীড়ন চালিয়ে যাবে কিনা। "এই অধিকারবাদের ধ্বংস সাধনই প্রকৃত কাজ।"

[পৃঃ ৩৪৯—৩য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

সামাজিক নিয়মের গতিতে অগ্রসরমান মানবসমাজ—এই সমাজে ব্যক্তিগত অধিকার বা বিশেষ শ্রেণীগত অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যুগান্তরের শেষে এক নতুন ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজের অভ্যুদয় ঘটবে। সেই নব অভ্যুদয়ে সকলেই এক—সকলেই ব্রাহ্মণ। স্বামীজী প্রজ্ঞানেত্রে সেই নব অভ্যুদয়ের সূচনা দর্শন করেছিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর ঘোষণা ধ্বনিত হয়েছে—

"আবার যখন যুগচক্র ঘুরিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগচক্র ঘুরিয়া সত্যযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।"

অতএব সেই নবযুগের নতুন ঐক্যবদ্ধ সমাজের প্রত্যেক মানুষকে স্বামীজী ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছেন। কিরূপ এই ব্রাহ্মণের চরিত্র আর সেই ঐক্যবদ্ধ মানব-গোষ্ঠীর সামাজিক রূপটি বা কিরূপ?

স্বামীজী বলেছেন—

"তোমরা কি শোনো নাই যে শাস্ত্রে লিখিত আছে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোনো বিধি-নিষেধ নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন, তাঁহার বধদণ্ড নাই? এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বার্থপর অজ্ঞ ব্যক্তিগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে, অবশ্য সেভাবে বুঝিও না। প্রকৃত মৌলিক বৈদান্তিকভাবে বুঝিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায়, যিনি স্বার্থপরতা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন, যাঁহার জীবন জ্ঞান ও প্রেম লাভ করিতে এবং উহা বিস্তার করিতেই নিযুক্ত—কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণ ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে দেশ অধ্যুষিত, সে জাতি, সে দেশ যে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে এ আর আশ্চর্য কি? এবংবিধ জনগণের শাসনের জন্য আর সৈন্যসামন্ত পুলিস প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাহাদিগকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাহাদের কোনোপ্রকার শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?"

[পৃঃ ৮৬-৮৭—৫ম খণ্ড, বাণী ও রচনা]

মানবসমাজ বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যায় স্বামীজীর উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে যে আশা ও বলিষ্ঠ চিন্তার বিকাশ দেখা যায়, যে কোনো মার্কসবাদী সমাজ-তত্ত্ববিদ তাকে সাগ্রহে অভিনন্দিত করবেন। কেন না কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ভাবী সমাজ-স্বরূপের যে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে স্বামীজী-বর্ণিত সমাজ চিত্রের কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই। মানবসমাজ সম্পর্কে স্বামীজীর ওই কথাগুলিই মার্কসবাদী সমাজকল্পনার শেষ কথা।

অতএব মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলেও আদর্শ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রহীন সমাজের রূপ পরিকল্পনায় স্বামীজীর এবং কার্ল মার্কসের চিন্তা প্রায় সমান্তরাল। সমাজবিপ্লবের অপরিহার্যতা, তার গতি-প্রকৃতি, তার যৌক্তিকতা, তার আদর্শের রূপায়ণ এবং অনাগত ভবিষ্যতে তার অন্তিম পরিণতি—সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সব তত্ত্ববিচারে বৈদান্তিক বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তগুলি বস্তুবাদী মার্কস-এঙ্গেলসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বহন করছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা নিশ্চয়ই স্মরণীয়। কথাটি এই যে, দীর্ঘদিনের অনলস শ্রমসাধনা দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস আধুনিক সমাজতন্ত্রের যেমন একটা সুসংবদ্ধ কাঠামো গড়ে তুলেছেন, স্বামীজীর লেখায় সে রকমটি আমরা পাই না। তাঁর চিন্তাগুলি নানা স্তরের নানা বক্তৃতা ও লেখায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বিশেষত কোন পথে, কি কি উপায় অবলম্বনে এই সমাজ-বিপ্লব সংগঠিত হবে বা হওয়া উচিত অর্থাৎ বিপ্লব সংগঠনের ব্যবহারিক কার্যক্রম বা কর্মপ্রকল্প কি—স্বামীজীর লেখায় তার বিস্তারিত বা সুসংহত কোনো পরিচয় এখনো অনাবিষ্কৃত। আছে কিনা জানি না—হয়ত নেই। তার কারণও সহজেই অনুধাবনীয়। স্বামীজীর জীবনের মুখ্য ভূমিকা সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূমিকা নয়—ধর্মবিজ্ঞানীর ভূমিকা। ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সমাজতত্ত্বও ওতপ্রোত জড়িয়ে। তাই মানুষকে ধর্মের তত্ত্ব শোনাতে গিয়ে তিনি সমাজ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। খালি পেটে ধর্ম হয় না—শ্রীরামকৃষ্ণের এই মোক্ষম বাণী এবং বাস্তব জীবনে তার

সারা রাত্রি সারা দিন

শ্যামলেন্দু রায়

সারা রাত্রি মনসা গরজায়
বন্ধ বুকের ছিদ্র দিয়ে
কার লেলিহান জিহ্বা নাচে
রক্তে যে অবাক হিজল
চক্ষে নামে কৃষ্ণ সাপ।

সারা রাত্রি ঘুম ভাঙানো
সারাটি দিন মিছিল শহরেতে
চায়ের কাপে গরম ধোঁয়া
পিচ গলে যায় ক্লান্ত দুপুরে।

কোথায় কারা যেন
দিশেহারা
কেবল ছোটে এবং ছোটে
এবং ছোটে।

যথার্থতার উপলব্ধি তাঁকে সমাজচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

তিনি সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন, সেই সমস্যা সমাধানে যে মৌলিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে হবে তার কথা বলেছেন, কিন্তু চিন্তাকে কার্যে রূপায়ণের জন্য বাস্তব পন্থা উদ্ভাবনের দায়িত্ব রেখে গেছেন অনাগত যুগের সমাজকর্মীদের ওপর। সমাজ-সংসারত্যাগী ধর্মপথের নিস্পৃহ পথিক সমাজবিপ্লব সংগঠনের বাস্তব পন্থা আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ-প্রকল্পে মেতে উঠবেন—এতটা আশা করাই বোধ হয় অবাস্তব। আর তা ছাড়া ঊনচল্লিশ বছরের স্বল্প-পরিসর জীবনে তাঁর অবসরই ছিল বা কতটুকু! এজন্য তাঁর সমাজচিন্তায় তত্ত্বের দিকটাই প্রধান—প্রযুক্তিবিদ্যার দিকটি গৌণ। তিনি ছিলেন এই বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষক—Technician নন। তবু তাঁর লেখা ও বক্তৃতার নানাস্থানে এমন সব চিন্তার বীজ ছড়িয়ে আছে যা পরিস্ফুরিত হলে এর ব্যবহারিক দিকের রূপরেখাটিও ফুটে উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্প্রসারণশীল শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের আত্মশক্তি ও অধিকারবোধ জাগ্রত করে তোলার নীতিকে তিনি বিপ্লব সংগঠনের একটা পন্থা বলে নির্দেশ করেছেন।

যাই হোক, মানুষের সমাজ-সমস্যার গতিপ্রকৃতি ও তার মূলগত তত্ত্বনিরূপণে মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদের আশ্চর্য ঐক্য থাকলেও যে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে মার্কস মানুষ এবং তার সমাজকে লক্ষ্য করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দের ভিত্তি তা থেকে একেবারে পৃথক। মার্কসবাদীদের মতে, জড় বস্তু প্রকৃতিই মানুষ, তার জীবন ও জগতের নিয়ামক। মানুষের আত্মা বা মন শেষ পর্যন্ত জড়প্রকৃতির এক বিবর্তিত জটিল পরিণতি মাত্র; ধর্ম বা আধ্যাত্মিক চেতনা শোষণ প্রয়াসী পুঁজিবাদী বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক উদ্ভাবিত এক মাদক দ্রব্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অভিজ্ঞতাই একমাত্র অভিজ্ঞতা যা real বা সত্য বলে অভিনন্দিত হওয়ার যোগ্য। এই বস্তুতান্ত্রিক জড়বাদ মার্কসীয় দর্শনে মূল ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হলেও স্বামী বিবেকানন্দ একে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর ভিত্তি হল এক নতুন সমন্বয়ী বেদান্তবাদ, যার মধ্যে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ পরস্পরের পরিপূরক। সমাজতত্ত্বের দিক দিয়ে স্বামীজীর মতবাদের নামকরণ করা যেতে পারে বৈদান্তিক বিপ্লববাদ। দার্শনিক দিক দিয়ে একে বলা যায় ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদ যার উপর ভিত্তি করে মূল মার্কসীয় প্রত্যয় গঠিত হয় তা পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে এমন পর্যায়ে এসেছে যে, জড়বাদীদের পরিকল্পিত মূল জড়বস্তু প্রকৃতি আসলে যে কি বস্তু তা এখন তাদের নিকটও অজ্ঞাত। বাস্তব সত্য বলে যা দাবী করা হয় আসলে কিন্তু তা যে কতখানি বাস্তব তা তাঁরা জানেন না। শুধু বলতে হয়, একটা কিছু আছে। অর্থাৎ নিরেট বস্তুর খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকু ঐ মনের ভাব মাত্র। আবার অপর পক্ষে ভাববাদীরা নাক চোখ কান বুজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে নিছক একটা ভাব বলে উড়িয়ে দেওয়ার পর আকাশের বিদ্যুৎ নামক ভাবটা যখন বজ্র হয়ে মাথায় এসে পড়ে, তখন কম্পিত-বক্ষে বলতে হয়—

"না, হে—ভাবের প্রকাশ বলে একটা বস্তুও ত' আছে।" ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী বিবেকানন্দ সত্যের এই দুই দিককে দুই হাতে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর মতে, জড় ও চেতন, দেহ ও মন এক অখণ্ড অনির্বাচ্য সামগ্রিক সত্তার বিভিন্ন পরিণাম—ক্রমবিকাশধারায় প্রকাশমান এই সামগ্রিক সত্তার নামই ব্রহ্ম। তিনি বলেছিলেন—

"আমার মতে, বাহ্যজগতের অবশ্যই একটা সত্তা আছে। আমাদের মনের চিন্তার বাইরেও উহার একটা অস্তিত্ব আছে। সমগ্র প্রপঞ্চ চৈতন্যের ক্রমবিকাশরূপ মহান বিধানের বশবর্তী হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক। জড়ের ক্রমবিকাশ চৈতন্যের ক্রমবিকাশের প্রতীক-স্বরূপ কিন্তু ঐ প্রণালীর ব্যাখ্যা হইতে পারে না।"

[পৃঃ ৪৯১—৯ম খণ্ড, বাণী ও রচনা]

জড়বাদীর ভূমিকায় নেমে এসে তিনি বলেছিলেন—"সমগ্র বিশ্ব একটা জড়সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই জড়-সমুদ্রে তুমি আমি যেন ছোট ছোট ঘূর্ণি। খানিকটা জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘূর্ণির স্থানে আসিয়া ঘূর্ণির আকার লইতেছে, আবার জড়পদার্থরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমার শরীরে যে জড়পদার্থ আছে, কয়েক বৎসর পূর্বে হয়তো তোমার শরীরে ছিল বা সূর্যে ছিল বা হয়ত অন্য কোনো গ্রহে বা অন্য কোথায়ও ছিল—অবিরাম গতি-শীল অবস্থায় ছিল। আমার দেহ, তোমার দেহ একথার অর্থ কি? সব দেহই এক। চিন্তার বেলায়ও তাই। চিন্তার একটি অসীমপ্রসারী সমুদ্র রহিয়াছে। তোমার মন, আমার মন সেই সমুদ্রের ভিতর দুটি ঘূর্ণিবিশেষ। উহার ফল কি এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছ না? তোমার চিন্তা আমার মনে এবং আমার চিন্তা তোমার মনে প্রবেশ করিতেছে কি করিয়া? আমাদের সমস্ত জীবনই এক, 'আমরা এক, এমন কি চিন্তার দিক দিয়াও এক।"

[পৃঃ ১৩৮-১৩৯—৩য় খণ্ড, বাণী ও রচনা]

আবার অধ্যাত্মবাদীর ভূমিকায় আরোহণ করে তিনি বলেছেন—

"জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য, বা অন্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ। আমরা তাঁকে 'পরম প্রভু' বলিয়া অভিহিত করিব। যাহা কিছু দেখ, শোন বা অনুভব কর সবই তাঁর সৃষ্টি—ঠিকভাবে বলিতে গেলে তাঁহারই পরিণাম—আরো ঠিকভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় তিনি স্বয়ং।...তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রম-বিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন—ইহাই জগতের রহস্য।"

[চলবে]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ঊনিশ ॥

নীলাঞ্জনের ঘর থেকে পড়বার শব্দ আসছে। গুনগুন করে কিছু একটা মুখস্থ করছে মনে হয়।

বারান্দায় নিজের ইজি-চেয়ারটায় বসে শিবপ্রসাদ তাকিয়ে ছিলেন সামনের গন্ধ-রাজ গাছটার দিকে। সকালের রোদ ঝিক-মিক করছে ঘন সবুজ পাতাগুলির ওপর, খুশি হয়ে একটা টুনটুনি নাচানাচি করছে সেখানে। শিবপ্রসাদ জানেন, এবারেও কুঁড়িগুলো থাকবে না, সেই ছোট ছোট ছেলেরা আবার আসবে. জীবনে কোথাও যাদের রঙ নেই. স্বপ্ন নেই. আশা নেই—তারা জন্মগত বিদ্বেষে ভালো করে ফোট-বার আগেই কুঁড়িগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে. তারপর রাস্তায় কিংবা নর্দমার জলে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেবে তাদের।

কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পথের পাশে দু-তিনটি প্রায়-শিশুর খেলা দেখেছিলেন তিনি। তাদের এক-আধটা কথার টুকরো কানে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল একবার.

একজন বাখারির একটা ছোট্ট ফালি দেখিয়ে বলছিলঃ 'আমি মাস্তান, বুঝলি আমি মাস্তান। বেশি চালাকি করবি তো. ছুরি মেরে দেব।'

আর একজন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে জবাব দিচ্ছিলঃ 'আমার হাতে বম্ দেখছিস না? একবার দুম করে ঝেড়ে দিই তো—'

কাছেই একটি ছোট্ট মেয়ে ঘাগরা ঘুরিয়ে নাচের ভঙ্গি করছিল একটা। ঘাগরা তার ছিল না, ছেঁড়া ফ্রকের একটা কোণা ধরে সে মহড়া দিচ্ছিল, 'তুম্‌সে পিয়ার হো গয়া'—গোছের একটি গানের কলি শোনা যাচ্ছিল তার মুখে।

এই এদের খেলা—বাংলা দেশের এইসব ছেলেমেয়ের খেলা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-হীন, নৈরাজ্যের শিকার এই শিশুরা কোন্ বাংলা দেশ, কোন্ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচনা করছে?

সারা জীবনের আদর্শ, দেশসেবা, স্কুলের মাস্টারী। নিজে কী পেলেন, কী দিলেন দেশকে? নীলু হয়তো বস্তির এইসব ছেলেমেয়েদের চেয়ে একধাপ ওপরে বাস করছে, কিন্তু আজ সকালে. এই সুন্দর রোদ আর হাওয়ায়, তাঁর ছোট্ট বাগানটির এই স্নিগ্ধতার মধ্যে, ওই টুন-টুনিটার খুশির ভেতরে—শিবপ্রসাদ সুখী হতে পারছিলেন না। নীলু বস্তির ছেলে-দের চাইতে একটু ওপরে। কিন্তু কত-দিন? হাওয়ায় যেখানে মড়ক ছড়ায়, সেখানে কতক্ষণ নীলুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন তিনি! আজ যারা অন্ধ-হিংসায় গন্ধরাজের পাপড়ি ছিঁড়ছে, সেইখানেই থেমে দাঁড়াবে তারা? ইতিহাসের প্রতি-শোধ নেই একটা?

অথচ সেই রাত। সেই পনেরোই অগাস্ট। স্বাধীনতা।

স্বা ধী ন তা!

সারা ভারতবর্ষের কথা ভাবতে শিব-প্রসাদের উৎসাহ হয় না। হয়তো সুখ আর সমৃদ্ধির মাত্রা দিনের পর দিন উজ্জ্বলে উঠছে দিকে দিকে। কিন্তু বাংলা দেশকে এতবড়ো বঞ্চনা কেউ করে নি—কখনো না।

স্বপ্না এসে বলল, 'বাবা. তোমার চা।' পাশের ছোট টিপয়টি টেনে চা রাখল।

শিবপ্রসাদ একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। বিষণ্ণ. শান্ত চেহারা। দুই ছেলে. বড়ো ছেলের বউ. এ বাড়ির এদের সকলের চেয়ে মেয়েটি আলাদা। কোনো-দিন রাজনীতির কথা ভাবে নি. মা-বাবাকে ভালোবেসেছে. লেখাপড়া করতে চেয়েছে, বি-এটা পাস করে চাকরি জুটিয়েছে একটা, এখন প্রাইভেটে এম-এ দেবার চেষ্টা করছে। স্ত্রী তো আনন্দ চলে যাওয়ার পরেই ভেঙে পড়েছিলেন, তারপর সুজাতা চলে যেতে এখন আদৌ স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন কি না বোঝা যায় না। অকারণে চীৎকার করে ওঠেন, অহেতুক ধৈর্য হারান, একা-একাই বসে কাঁদেন কখনো কখনো। স্বরাজের সঙ্গে কথা বলতেই ভরসা হয় না তাঁর। শুধু এই

মেয়েটিই এর ভেতরে স্থির হয়ে আছে যথাসাধ্য, শুধু ওর কাছেই শিবপ্রসাদ যেন মনের আশ্রয় পান খানিকটা।

স্বপ্না বললে, 'খাবার আনি?'

'অখন না। এট্টু পরে।'

স্বপ্না চলে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ তাকে ডাকলেন।

'বস্। একটা কথা আছে।'

স্বপ্না একটা মোড়া নিয়ে বসে গেল বাবার পাশে।

'পড়াশুনা কেমন চল্‌তাছে?'

'একরকম। তবে খালি নোট পইড়্যা তো কিছু হয় না।' —স্বপ্না নিশ্বাস ফেলল: 'দুই-একদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস অ্যাটেন্ড করলে ভালো হইত। কিন্তু যামু কখন? ইস্কুলে এত কাজের প্রেসার।'

'ইংরাজি হইলে আমি অল্প-স্বল্প হেল্‌প করতে পারতাম। কিন্তু ফিলসফি তো পড়ছি পাসকোর্সে, কিছুই জানি না।'

স্বপ্না বললে, 'দেখি, কী করন যায়। পুজোর পরে না হয় দুই-চাইর দিন ছুটি নিয়া ইউনিভার্সিটিতে যামু।'

একটু চুপ। তারপর একবারের জন্যে কান খাড়া করলেন শিবপ্রসাদ। তেমনি গুনগুন করে পড়ে যাচ্ছে নীলু।

প্রায় নিঃশব্দ গলায় শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন: 'নীলুরে কেমন বোঝতাছস অখন?'

স্বপ্নার মুখে-চোখে ছায়া ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'রাত্তিরে আর কান্দে?'

'না।' —আবার নিশ্বাস ফেলল স্বপ্না: 'আমারে জড়াইয়া ধইরা থাকে সমস্ত রাত্তির। এট্টু পাশ-ফিরনেরও জো নাই। কয়, পিসি, কই যাও?'

ভয়। মা চলে গেছে, পাছে পিসিও চলে যায় সেই ভয়। শিবপ্রসাদ একবার নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। তারপর বললেন, 'অর মায় আর আইলো না—না?'

'আইবো ঠিক-ই। কদ্দিন পোলাডারে ফালাইয়া থাকতে পারবো, বাবা?'

সান্ত্বনা। শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করে না, স্বপ্নাও কি করে?

'কিছুই কওন যায় না—' স্বগত-ভাষণের মতো শিবপ্রসাদ বললেন, 'অখন সমস্তই অন্য রকম হইয়া গেছে। আমাদের সময়ও ঘরের বৌ-ঝিরা যে পলিটিক্‌স্ করত না, তা তো না। তখন ইংরাজ আছিল সকলের শত্রু। দল আছিল ঠিকই, কিন্ত অ্যাকটা লক্ষ্যও মোটামুটি সকলের আছিল। অখন অনেক লক্ষ্য হইয়া গেছে—অখন স্বামী-স্ত্রীর পথও আলাদা হইয়া গেছে, অখন ঘরে ঘরে আমরা এ ওর শত্রু হইয়া উঠছি।'

স্বপ্না আনন্দ নয়, স্বরাজও নয়, এ-সব চিন্তার উত্তর তার জানা নেই। আবার নৈঃশব্দ ঘনিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আবার সান্ত্বনার জেরটাই টেনে আনল স্বপ্না।

'ক্যান্ এই সমস্ত ভাব্‌তাছ বাবা? বৌদি আসবো—ঠিক ফিরা আসবো।'

'হুঁ।'

কপালে ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল, শিবপ্রসাদ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সামনের দিকে। আকাশটা নিবিড় নীল। কয়েকটা নারকেল গাছ দুলছে হাওয়ায়। ডানা-মেলা নিশ্চিন্ত চিলের বিন্দু। কিছুই দরকার ছিল না, কিছুই না। সারাজীবনের টানা পরিশ্রম, দেশের কাজ, হেড মাস্টারী—সব কিছু মিটিয়ে, এখন—দুই যোগ্য ছেলের হাতে সংসারের দায় তুলে দিয়ে আকাশের নীলে দু' চোখ ডুবিয়ে বসে থাকতে পারতেন শিবপ্রসাদ। কিন্তু—

কিন্তু স্বাধীনতা। নইলে কেন এমন শূন্যতায় তলাবে স্বরাজ, কেন চলে যাবে সুজাতা, কেন এমন করে ঝড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে আনন্দ?

পনেরোই অগস্টের ঋণ শোধ করতে হবে। অনেক—অনেক ঋণ।

সুজাতার কথায় আর একটা জিনিস মনে এল শিবপ্রসাদের। বিভ্রান্ত হয়ে প্রবীরের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। আবার ফিরে চাইলেন স্বপ্নার দিকে।

'এর মধ্যে প্রবীর আসছিল নাকি রে?'

'ভুলুদা? কই, না তো।'

'আমি তো বাইর-টাইর হইয়া যাই, আসে নাই ভুলু?'

'না, দেখি নাই।'

—'ও।'

তার মানে কোনো খবর নেই। কিছুই করতে পারে নি। নিজেকে ভারী ছোট মনে হল। ও-ভাবে প্রবীরের কাছে সেদিন ছুটে না গেলেই ভালো করতেন, কিন্তু নীলুর ভাবনায় মাথাটা যেন কেমন গোল-মাল হয়ে গিয়েছিল।

'প্রবীরদার কথা কইতাছ ক্যান?'

'এমনেই। এ্যাকদিন গেছিলাম অদের ওইদিক। কইছিল, আইবো।'

'আসে নাই বাবা।'

প্রসঙ্গটা বদলে দেওয়া ভালো। স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ছিল অতিরিক্ত।

'বাবা, তোমার অর্ধেক চা জুইড়্যা জল হইয়া গেল।'

'ভুইল্যা গেছিলাম।'

'আর এক কাপ কইরা আনি?'

'অখন থাউক।' —শিবপ্রসাদ একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর যা হওয়ার হোক, এই মেয়েটাকে এখান থেকে মুক্তি দিতে পারলে হয়। এ সংসার থেকে অন্তত একজন নিষ্কৃতি পাক, বেঁচে যাক সে।

'এ্যাট্টা কথা কই। রাগ করবি না মা।'

'কী কইতে আছো বাবা? রাগ করুম ক্যান?' —স্বপ্না চকিত হল।

'বসন্ত চাটুজ্যার মাইজ্যা পোলা এম-এসসি পাশ কইর‍্যা কোন্ ফার্মে কেমিস্ট হইছে। পোলাডা ভালো। তর লগে মানাইবো। পাকে-প্রকারে চাটুজ্যা কাইল কথাডা কইতাছিল। আমি গা করি নাই, অখন ভাবতাছি—'

সাপের ছোবল পড়ার মতো চমকে উঠল স্বপ্না। শিবপ্রসাদ থেমে গেলেন।

'না বাবা, ওই সবে কাম নাই অখন।'

'কিন্তু বিয়া তো তর একটা দেওন লাগবো মা।'

'অখন থাউক বাবা।' —স্বপ্নার মুখে রক্তের কণা জমতে লাগল, মাটিতে চোখ নামালো সে: 'এই সব নিয়া তুমি অখন কিছু ভাববা না। এই সমস্ত অশান্তির মধ্যে—'

'অশান্তি আছে, অশান্তি থাকবো। কিন্তু তর জীবনডা তো আমারে দেখতে হইবো।'

'আমার বিয়ায় কাম নাই বাবা। আমি খুব ভালোই আছি।'

সেই টুলু? শিবপ্রসাদের মাথার ভেতর দিয়ে যেন খানিকটা যন্ত্রণা ছুটে গেল: এখনো কি তার কথা ভুলতে পারে নি মেয়েটা? এতদিন বাদে? এত কাণ্ডের পরেও? অথচ শুধু শিবপ্রসাদ কেন, এ বাড়ির প্রত্যেকে জানে, টুলু সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, কতগুলো শয়তান ছেলের দলে ভিড়েছে, তার বদনামে কান পাতা যায় না, তার বাবার যাকে নিয়ে এত আশা ছিল, চূড়ান্ত অধঃপাতে নেমে গেছে সে।

স্বপ্না এখনো তার কথা ভাবে? এখনো?

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু আর একটা উত্তর এল স্বপ্নার কাছ থেকে।

'অখন ওই সব ভাইবো না বাবা। তাইলে মা আর বাচবো না, নীলু মইর‍্যা যাইবো।'

নীলু! তার মা-ই তার কথা ভাবল না, অথচ—। শিবপ্রসাদ কিছু একটা বলতে চাইছিলেন, এমন সময় ভেতর থেকে চটির আওয়াজ এগিয়ে এল। স্বরাজ।

বিনা ভূমিকায় স্বরাজ বললে, 'বাবা, তোমারে এট্টা কথা কই নাই।'

শুকনো, নীরস গলার স্বর। বাপ আর মেয়ের চোখ চকিতে ঘুরে গেল তার দিকে।

স্বরাজ দরজার একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল শক্ত হয়ে। তেমনি নীরস ভঙ্গিতে বললে, 'আমারে ট্রান্সফার করছে কইলকাতা থিকা।'

ট্রান্সফার?' —এক সঙ্গেই এই দু'জনের চমক লাগল।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'তর পোস্ট তো ট্রান্সফারেব্‌ল্‌ না।'

'অপ্‌শান দেওন যায়।'

'তুই ইচ্ছা কইর‍্যা ট্রান্সফার নিতে আছস?'

স্বরাজ বললে, 'হ। কইলকাতায় আর কেন যায় না। আর কিছুদিন এইখানে থাকলে আমার মাথাটা খারাপ হইয়া যাইবো।'

বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'যাইতাছস্‌ কই?'

'কানপুরে।'

'কানপুরে?'

স্বরাজ খানিকটা তিক্ত হাসি হাসল: যাইতে পারে সকলেরই হইবো। এইখানে যা চলতাছে, অরা হেড্‌ অফিসও আর রাখব না—ফ্যাক্টরী তিনটারও ক্লোজার হইবো। আগে-ভাগে যাওনই ভালো।'

চমৎকার সম্ভাবনা। আনন্দ নেই, স্বরাজও চলল। তার মানে এখন সংসারের সব ভার বইবেন শিবপ্রসাদ, হাট-বাজার করবেন, অসুস্থ-উন্মাদপ্রায় স্ত্রীর মনোযন্ত্রণায় প্রতি মুহূর্তে একটু একটু করে জ্বলতে থাকবেন! রিটায়ার করবার পরে, নীল আকাশের শান্তিতে ডুবে থাকবার কী অপূর্ব অবসর!

স্বপ্নার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'আর মায়-বাবারে দেখবো কে?'

'ছুটি-ছাটায় তো আসুমুই। আর তুই তো আছসই।'

একটা চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল স্বপ্নার: অপদার্থ, স্বার্থপর, কাওয়ার্ড। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে। ধ্যানী বুদ্ধের মতো নিঃশব্দে বসে রইলেন শিবপ্রসাদ, আর স্বপ্নার চোখ জ্বলতে লাগল।

স্বপ্না বললে, 'আর নীলুর কী হইবো? তার দায় কে নিবো?'

স্বরাজের চোখেও এবার ছুরির শাণ পড়ল: 'ভয় নাই, সে আমি ঠিক কইর‍্যা ফ্যালাইছি। তার জন্য তোমাদের অসুবিধায় পড়তে হইবো না। আমি তারে লইয়া যামু।'

শিবপ্রসাদ বলে ফেললেন: 'তুই?'

'হ। আমার পোলার রেসপনসিবিলিটি আমারেই তো নিতে হইবো বাবা। তোমারে ক্যান্‌ ট্যাক্‌স্‌ করুম?'

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। স্বপ্না বললে, 'তুমি তারে নিয়া রাখবা কই?'

'যে কোনো একটা বোর্ডিংয়ে।'

স্বপ্না এবারে প্রায় চীৎকার করে উঠল: 'তোমার মাথা সত্যিই খারাপ হইয়া গেছে বড়দা। ওইটুকু বাচ্চা থাকতে পারবো বোর্ডিংয়ে?'

'পারবো।' —স্বরাজ ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'অর থিক্যা ছোট বাচ্চাও থাকে। কষ্ট হইবো প্রথম প্রথম, তারপর ঠিক হইয়া যাবো। এই বাংলা দেশে অরে আমি রাখুম না। এইখানে সব ডিটারিওরেটেড হইয়া গেছে।'

স্বপ্না আবার তীক্ষ্ণস্বরে কী বলতে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ বাধা দিলেন। আশ্চর্য শান্তস্বরে বললেন, 'সেই ভালো। আমার পোলা দুইডারে আমি তো মানুষ করতে পারি নাই, তর পোলার ভার তুই-ই নে। লইয়া যা নীলুরে।'

স্বপ্না বললে, 'বাবা!'

শিবপ্রসাদ আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজলেন। আবার বললেন, 'হ, তুই-ই লইয়া যা।'

পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল নীলু।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্দিশালার প্রধান অধিনায়ক লাইল নামক একজন ইউরোপীয়ান, কয়েকদিন পরে আমাদের শিবির পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি কেনিয়া সরকারের নতুন নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করেন আমাদের কাছে, যার ফলে এখানে আমরা শ্রম খাটতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নাদি করি এবং তিনি আরও বলেন যে, আমরা চাই বা না চাই, আমাদের প্রত্যেকের শ্রম খাটার পরিমাণের হিসেব রাখা হবে এবং বন্দিজীবন থেকে মুক্তিলাভের সময় যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে আমাদের। আমরা কিন্তু তাঁকে এ কথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিই যে, পারিশ্রমিক আমরা নেব না। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই শিবিরের অধিনায়ক বাকস্টন ছুটিতে চলে যান এবং তাঁর জায়গায় যিনি আসেন তাঁর চরিত্র ছিল একেবারে ভিন্ন প্রকারের। তিনি এসেই কড়া আদেশ জারি করলেন যে, [illegible] অক্ষম-সক্ষম সবাইকে শ্রম খাটতেই হবে। তিনি প্রায়ই নিজে আমাদের থাকবার জুড়ে [illegible] পরিদর্শন [illegible] আসতেন, যদিচ বাকস্টন কোনদিন আমাদের ঘরের ভেতরে পা দেন নি। তা ছাড়া আমাদের নতুন অধিনায়ক কখনই আমাদের সাথে কথা বলতেন না তাঁর মুখে থাকতো অসন্তোষের ছাপ; মুখ্য ব্যতিরেকে বোধ হয় তিনি কথা বলতেই জানতেন না। আমরা সবাই তাঁর ব্যবহার এতো বেশি অপছন্দ করতাম যে, তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে ওপরওয়ালার কাছে একটা গুপ্ত চিঠি পাঠানর মনস্থ করি; এ রকম ব্যবহার আমরা বাকস্টনের বিরুদ্ধে কখনোই করতাম না। এই চিঠি পাঠানর কথা তিনি জানতে পারেন ঘটনাক্রমে তাঁর ওপরওয়ালার কাছ থেকে এবং ফলে তাঁর ব্যবহার আরও খারাপই হয়ে যায়, ঘৃণার রেশ ছড়িয়ে পড়ে আরও অধিক পরিমাণে। শিবিরের আবহাওয়া ফলে খুবই অসন্তোষজনক হয়ে পড়ে ততদিন অবধি, যতদিন পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের (Red Cross) এক কমিটি জেনেভা থেকে আমাদের শিবির পরিদর্শনে আসেন। এর সভাপতি ছিলেন ফিলিপ জুনোদ বলে এক ইউরোপীয়ান। বন্দীশিবিরের তরফ থেকে পাঁচজন বন্দীকে নিয়ে এক প্রতিনিধিবর্গ তৈরি করা হয় তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য। আমি ছিলাম এদের মুখপাত্র এবং আমাদের সমস্ত অসুবিধা, অসন্তোষ ও নালিশ তাঁদের কাছে জ্ঞাপন করার পর আমি অনেকটা শান্তিলাভ করি নিজের মনে। জুনোদ খুব বুদ্ধিমান ও প্রতিভাপন্ন লোক ছিলেন, তিনি আমাদের সমস্ত বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন। আমরা সবাই তাঁকে কিকুয়ু ভাষায় "মুথুরী য়্যা ইতাথি" নাম দি। এই নামের পেছনে আছে কিকুয়ু জাতির গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবেশ; এর মালিক একজন বুদ্ধিমান শ্রদ্ধেয় বয়োবৃদ্ধ বিচারক, যিনি বাদী-বিবাদীর কোন পক্ষেরই অন্যায় সমর্থন না করে প্রত্যেক অভিযোগের ন্যায়বিচার মাত্র করেন। মুথুরী শব্দের অর্থ বয়োবৃদ্ধ; ইতাথি একটি গাছের নাম, যার পাতা বয়োবৃদ্ধরা একজোট করে মাছি তাড়াবার জন্য ব্যবহার করেন, আবার এই গাছের ডালই গো-পালকেরা গরু মাঠ থেকে তাড়িয়ে ঘরে আনবার সময় ব্যবহার করে। জুনোদ সত্য-সত্যই খাঁটি লোক ছিলেন। তাঁর শিবির পরিদর্শনের পর আমাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হল এবং প্রায় তিন মাস অবধি সেগুলি বলবৎ থাকে। প্রত্যেকবারই আমি দেখেছি যে, কোন রকম সরকারী খোঁজখবর বা পরিদর্শন হবার পরই আমাদের অবস্থার উন্নতি হতো অনেক, কিন্তু কয়েক মাসের ভেতরেই আবার ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত; সেই অসন্তোষ, সেই অন্যায়, সেই অসাধুতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। হয়তো বা একটা চিরস্থায়ী পরিদর্শক সমিতি প্রত্যেক বন্দিশিবিরের জন্য থাকলে কাজ হত; হয়তো তাতেও হত না, কারণ কেনিয়ার তখনকার দূষিত আবহাওয়ায় এই চিরস্থায়ী সমিতিরও হয়তো মনোভাব বদলে যেত শিবিরের পরিশাসকমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে।

লড্ওয়ার শিবিরের অবস্থার আবার দ্রুত খারাপ হওয়ার মূল কারণ ছিল হয়তো ম্যানস্ফিল্ড নামক একজন ইউরোপীয়ান সহকারী অধিনায়কের আগমনে। ম্যানস্ফিল্ড ও তার ওপরওয়ালা ছিলেন প্রায় এক গোয়ালের গোরু এবং খারাপ হামানদিস্তা ও তার খারাপ ডাঁটি দিয়ে কোন জিনিস পিষলে যে তার স্বাদও খারাপ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ম্যানস্ফিল্ডের আমরা নাম দিয়েছিলাম 'কামাও', যার অর্থ হলো জেলখানায় বন্দীদের জন্য ব্যবহৃত খুব ছোট আকারের একটি মগ বা জলপাত্র। তিনি উচ্চতায় ছিলেন [illegible] মাত্র পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি এবং [illegible] ছিলেন প্রায় হাতীর মতো। আমাদের সঙ্গে অহেতুক খারাপ ব্যবহার করতেন তিনি, ঠিকমতো কাজ করলেও

মারধোর করতেন এবং নিজমতেই আমাদের খাবারের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজে-কাজেই একদিন আমরা সবাই জন খাটতে যেতে অস্বীকার করে ধর্মঘট করি এবং দাবী করি যে, আমাদের উপর মার-ধোর বন্ধ করা হউক এবং খাবারের পরিমাণ পূর্ববৎ করা হউক। আমাদের ধর্মঘটের কথা জানতে পেরে ম্যানস্‌ফিল্ড রেগে আগুন হয়ে ওঠেন এবং আমাদের ডেকে হুমকি দেন : "ঠিক পাঁচ মিনিটের ভেতর তোমরা সবাই যে যার নিজের কাজে যাও, না হলে আমি পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহরীদের ডাকবো এবং তাদের দ্বারায় জোর করে তোমাদের বার করবো"। তিন মিনিট পার হয়ে যাবার পর তিনি আরও এগিয়ে এসে বলেন : "আর মাত্র দুই (অপেক্ষা করে) মিনিট (অপেক্ষা করে) থাকি।" কেউ তাঁর কথার কোন ভ্রূক্ষেপ করছে না দেখে তাঁর মুখের ভাব অত্যন্ত বিষাদময় হয়ে উঠেছিল; আমি সেদিন তাঁকে মনে মনে করুণা না করে পারিনি। কে আর চায় হুমকি ঝেড়ে তারপর ঐভাবে অপদস্ত হতে? আমাদের ভেতর একজন বলে উঠলো : "আমরা আর এক মুহূর্তেও অপেক্ষা করতে চাই না। তোমার যা করবার এখনি করো।"

তিনি নির্বিকারচিত্তে আরও পাকা-পোক্ত দুই মিনিট অপেক্ষা করলেন, তারপর দৌড়ে গিয়ে পাগলা ঘণ্টার দড়িতে একটা টান দিলেন, আমাদের দিকে ঘৃণাপূর্ণভাবে তাকিয়ে আবার টান দিলেন, আবার একবার আমাদের দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে তৃতীয়বার দড়িতে টান দিলেন। প্রহরীরা দৌড়ে এগিয়ে আসতে তিনি হুকুম দিলেন : "হতভাগাগুলোকে মেরে টেনে বের করো বাইরে।" কিন্তু সেদিন ম্যানস্‌ফিল্ডের কপালে অনেক হতাশা ছিল, কারণ প্রহরীরা তাঁর আদেশ পালন করবার কোন চেষ্টাই দেখাল না। তাদের অধিনায়ক, একজন জালুয়ো উপজাতীয় লোক বরং সব প্রহরীদের সতর্ক করে দিল যে, তারা যেন ভেবে-চিন্তে সাবধানে কাজ করে, কারণ একদিন বন্দীরা সব ছাড়া পাবে এবং তাদের উপর কে কি অত্যাচার করেছে, তা তাদের মনে থাকতে পারে। এই সাবধানবাণী ব্যতিরেকেও অবশ্য প্রহরীরা ম্যানস্‌ফিল্ডের অন্যায় আদেশ পালন করতে দ্বিধা বোধ করছিল, কারণ গত কয়েক মাস ধরে তারা এবং আমরা নির্ঝঞ্ঝাটে এক সঙ্গে বাস করছিলাম রক্ষাকর্তা এবং রক্ষিত হিসাবে। তাদের ভেতর অনেকেই আবার আমার ছাত্র ছিল; আমি তাদের অবসর সময় পড়াতাম, ভুল শুধরে দিতাম ও নতুন প্রশ্নমালা লিখে দিতাম। তাদের অধিনায়ককেও আমি তার ঘরে আলাদা করে পড়াতাম এবং আমাদের দুজনের ভেতর বন্ধুত্বের স্থাপনা হয়েছিল অনেকদিন থেকেই। আমি সত্যসত্যই তাকে সাহায্য করতাম, কিন্তু তা ছাড়া আমার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল এই কাজের পেছনে। তার ঘরের রেডিও শোনবার ভয়ানক প্রয়োজন ছিল আমার, যাতে কি পৃথিবীর সমস্ত খবরাখবর আমি অন্যান্য বন্দীদের কাছে বলতে পারি; ফলে রেডিওতে সংবাদ প্রচারের সময়ই ঘটনাচক্রে আমার তাকে পড়াবার সব থেকে বেশি সুবিধা হত। প্রহরীদের ভেতর বেশির ভাগই ছিল ভাল লোক, তারাও আমাদের মতোই আশা-ভরসা-পূর্ণ মানুষ ছিল, তাদেরও মন কাঁদিতো দেশের জন্য, যদিচ পেটের দায়ে তারা বিদেশী শাসকের হুকুমের তাঁবেদারি করতো। আসলে কিন্তু তারা ও আমরা ছিলাম একই গোয়ালের গরু।

ম্যানস্‌ফিল্ড ও আমাদের ভেতর এই অচল অবস্থার মীমাংসা করতে শেষ অবধি সেদিন শিবিরের অধি-নায়ককে ডাকতে হল। তিনি ম্যানস্‌-ফিল্ডকে আমাদের সামনে কিছুই বললেন না, কিন্তু আমাদের খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে পূর্ববৎ করা হবে ও মারধোর করা বন্ধ হবে বলে আশ্বাস দিলেন। কাজে কাজেই আমরাও তখন বেরিয়ে সেদিনের কাজ আরম্ভ করতে রাজী হলাম। এর আরও এক মাস পরে আমরা শুনলাম যে, আমাদের জন খাটার পরিমাণ স্থানীয় জেলা শাসকের মনোমতো হয় নি। এও শুন-লাম যে, তিনি নাকি বলেছেন, পাথর ভাঙার জায়গা থেকে দু' মাইল দূরে অবস্থিত হাসপাতাল বাড়ির জন্য পাথর মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে আমাদের আরও কম সময় লাগা উচিত। এই কষ্টকর কাজের জন্য কেনিয়া সরকার নাকি সে সময় কোন লরী বন্দোবস্ত করতে পারে নি। আসল কথা এই যে, সরকারের মতে যখন এতগুলো লোক খাচ্ছে দাচ্ছে, আছে সেখানে, তখন তারাই নিয়ে যাক পাথর মাথায় করে দু' মাইল দূরে, দারুণ রোদের ভেতর, তার জন্য আবার লরী কেন? আমাদের স্থানীয় সংবাদ সংসদের নাম ছিল মুকোমা টাইমস্‌। তাকে প্রায় কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা রটনাই এড়িয়ে যেতে পারতো না। একদিন এর মারফৎ খবর পাওয়া গেল যে, আমরা নাকি বহুদিন পূর্বের ইহুদী সন্তানদের মতো, দুর্দম মিশরের রাজা ফারাওর ক্রীতদাস হয়ে তাঁর জন্য সেখানকার পিরামিড তৈরি করছি। যখন বন্দীরা জেলা শাসকের নামে প্রচারিত নিয়মের কথা প্রথম শোনে, তারা সবাই অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ওঠে ও বলে যে, তারা সকলে এক সঙ্গে সব রকম কাজ করা একেবারে বন্ধ করে দেবে, তার ফল যাই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ভেতর এক-জন বন্দীর প্রাণনাশ হয়। আমি সেদিন তাদের বুঝিয়েছিলাম, এভাবে আদেশ অমান্য করে একজনের প্রাণ নষ্ট করে কি লাভ হবে আমাদের? বিশেষ করে যদি তারপর আমরা আবার সেই আগে-কার অন্যায় নির্দেশই মেনে নি? ঐ একজনের অকালমৃত্যুতে কি কোন সুবিধা হবে আমাদের? হয় আমরা সবাই মিলে একজোটে এর প্রতিরোধ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সবাই প্রাণ দি, আর যদি আমরা এতো শক্ত পণ না করতে পারি, তাহলে না হয় কোন কিছুর প্রতিবাদ না করেই সরকারের এ অন্যায় নির্দেশও মেনে নেব। কিন্তু আমার মতে, এ ছাড়া একটা তৃতীয় রাস্তাও খোলা আছে আমাদের সামনে। আমরা সবাই আমাদের সব থেকে হাল্কা কাপড়-জামা পরে কাজ করতে যাব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়াতে দৌড়াতে পাথরের বোঝা মাথায় নিয়ে দু' মাইল রাস্তা পার করে দেব। যদি এরকম বেগে কাজ করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কয়েকবার এরকম পর পর করতে পারলেই তার ভাল ফল দেখতে পাবে তোমরা। আমাদের সঙ্গে যে প্রহরীরা যায় তাদের পায়ে থাকে ভারি বুটজুতো ও মোটা ফেটি, গায়ে থাকে মোটা খাঁকি কাপড়ের কড়া করে মাড় দেওয়া শার্ট ও প্যান্ট, হাতে থাকে লম্বা বেটন-লাগান রাইফেল, শুধু তারই ওজন নয় পাউণ্ড (চার কিলোর বেশি)। ঐ রকম অবস্থায় আমাদের সঙ্গে তাল রেখে প্রহরীরা চলতেই পারবে না।

[ক্রমশ]

সামরিক আদালতের বিচার। জমজমাট ভাব; গুরুগম্ভীর পরিবেশ। সুরক্ষিত আদালতকক্ষে চেনা-চেনা বাছাই করা ক'টি মানুষকে মাত্র প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। একটা সুগভীর নিস্তব্ধতা চারিদিকে। সরকারী উকিলের উঁচু পর্দার কণ্ঠস্বর চার-দিকের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি করছে। পাহাড়-পাহাড় অভিযোগ আকাশ-প্রমাণ অপরাধের প্রাচীর তৈরি করছে।

—মিঃ গর্ডন! আসামীর নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে সরকারী উকিলের কণ্ঠস্বর যেন ফেটে পড়ে।

—ওঃ আচ্ছা বলুন। ঠিক তেমনি নির্লিপ্ত নিরাসক্ত তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর সামনে কি ঘটে যাচ্ছে তিনি কিছুই জানতেন না। কার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি যেন এইমাত্র পৃথিবীর মাটিতে নেমে এলেন। এবার একটু নড়েচড়ে তিনি সম্মুখপানে তাকালেন তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারা কথাগুলো শুনবার জন্যে।

—আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, আপনি নুগুয়েন বিন্ থিনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। সরকারী উকিল তাঁর চার নম্বর অভি-যোগের পুনরাবৃত্তি করলেন।

—নুগুয়েন বিন্ থিন্!—মিঃ গর্ডনের দুটো চোখে যেন কিসের ছায়া পড়লো; নিভাঁজ কপালের চামড়া মুহূর্তের জন্যে কুঁচকে উঠলো।

—দেশদ্রোহিতার জন্যে সরকার যাকে শাস্তি দেন তার প্রতি সহানুভূতি দেখানো দেশদ্রোহিতারই সামিল নয় কি?—প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন সরকারী উকিল মিঃ কিটিংস।

—দেশদ্রোহিতা!—ব্যঙ্গের হাসিতে দুটো ঠোঁট নড়ে উঠলো খানিকটা।

নুয়ে সেন্ট্রাল জেলের এগারো নম্বর সেলের তিনশো চার নম্বর কয়েদী নগুয়েন বিন থিন। কি অমানুষিক অত্যাচার চলেছে তাঁর উপর দিনের পর দিন! তাঁর অপরাধ তিনি একজন ভিয়েতকঙ। সুতরাং তাঁকে ভিয়েত-কঙদের গোপন ঘাঁটির সমস্ত খবরাখবর ফাঁস করে দিতে হবে।

নুগুয়েন বিন্ থিন্ নীরব। ওপর থেকে নির্দেশ এলো চাবুকের আঘাতে পেটের সমস্ত খবর বের করা চাই।

চাবুক চললো পিঠের উপর। সমস্ত গায়ে; দিনের পর দিন। সমস্ত দেহ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়লো। দগদগে ঘায়ে ছেয়ে গেল সমস্ত শরীর। কয়েদী তবু মুখ খোলে না। জেল কর্তৃপক্ষ হতাশ হয়ে পড়লেন।

উপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ এলো, যে কোনো উপায়েই হোক গোপন তথ্য বের করতেই হবে। কিন্তু হ্যাঁ, যাতে মরে না যায়। কারণ ওরা মরতে ভয় পায় না। কারণ ওদের বাঁচিয়ে রেখেই প্রমাণ করতে হবে, বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা।

'বাবু যত বলে পারিষদ দলে
বলে তার শতগুণ'

চললো অত্যাচার। এইটুকু একটা নারীদেহের উপর অত্যাচারের নজীর পৃথিবীর যে কোনো অমানুষিক নির্যাতনের দৃষ্টান্তকে ছাড়িয়ে গেল। হাত-পা বেঁধে দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গে বৈদ্যুতিক চার্জ করা হলো। ক্ষণেকের মধ্যেই জ্ঞান হারালো কয়েদী। জ্ঞান ফিরে এলে সৈন্যদের দিয়ে তাঁকে এবার 'রেপ' করানো হলো। তারপর আবার চললো চাবুক। চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হলো সমস্ত দেহ। এবার বিশ্রাম। সময় দেওয়া হলো একদিন, দুদিন। নির্যাতনের দৈহিক ফলশ্রুতিগুলি এরই মধ্যে খানিকটা সেরে উঠুক। নয়ত আবার একটানা অমানুষিক নির্যাতনের ফলে মরেই যাবে। তাহলে ত সবই ভেস্তে যাবে। এরই মধ্যে তাঁকে বোঝানো হয় তাঁর এই অনমনীয় মনোভাবের জন্যে নির্মম পরিণতির কথা।

আসামী একটুখানি ম্লান হাসলো। সে হাসিতে উপেক্ষার ছাপ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে কে এভাবে উপেক্ষা করতে পারে?

আবার শুরু। অত্যাচারের নতুন পদ্ধতি বের করতে হবে এবার। হলোও তাই। সাবান গোলা জল পিচকারি দিয়ে নাসারন্ধ্রের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এরই ফাঁকে ফাঁকে চললো চাবুকের বেদম প্রহার। জেল-হাসপাতালের ডাক্তার এসে আশংকা প্রকাশ করলেন। এঁরা যেন প্রতিজ্ঞা করে-ছেন এঁরা ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। কর্তৃপক্ষ আবার মিষ্টি কথায় ভোলাতে চেষ্টা করেন; জীবনের নির্মম পরি-ণতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভিয়েতকঙদের গোপন ঘাঁটির তথ্য আদায়ের চেষ্টা করেন।

আবার সেই উপেক্ষার হাসি।

দেখে কর্তৃপক্ষ রেগে যান। হুকুম হয়—একটু সেরে উঠলেই নির্যাতন পুরোমাত্রায় চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কয়েদীকে নতি স্বীকার করানো যায়।

দেখে মার্কিন সৈনিক মিঃ গর্ডনের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র রিচার্ড গর্ডন। দর্শনের ছাত্র হলেও সাহিত্যই গর্ডনের প্রিয় বিষয়। ক্লাসের পড়ার ফাঁকে ফাঁকেই গর্ডন উপন্যাস পড়তো রাশি রাশি; কবিতা লিখতো লুকিয়ে লুকিয়ে। হুইটম্যানের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সে খাবার কথাই ভুলে যেতো। আর্থার মিলারের নাটক হাতে নিয়ে কত বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে। মা বলেন, পাগল ছেলে। বৌদি বলেন, কবি।

গর্ডন শুধু হাসে; ছকঝলক মিষ্টি হাসি। তার ঐ হাসির জন্যে সে বন্ধুবান্ধব, চেনা পরিচিত সবার নিকটই খুবই প্রিয়। কিন্তু তার সব চাইতে আপনজন হলো বই। তার লাইব্রেরীতে বই যতই বাড়তে থাকে সে ততই বন্ধুবান্ধবদের নিকট ডুমুরের ফুল হয়ে ওঠে। ডুবে থাকে বইয়ের সাগরের মধ্যে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—সব কিছুই তার প্রিয় বিষয়। যেন এক ধ্যানমগ্ন ঋষি।

কিন্তু একদিন বইয়ের লাইব্রেরী থেকে ডাক পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে। সেটি ঊনিশশো পঁয়ষট্টি সালের সেপ্টেম্বর মাস।

সৈন্য চাই, প্রচুর সৈন্য। আরো কাতারে কাতারে সৈন্য পাঠাতে হবে ভিয়েতনামে। নয়তো সমস্ত ভিয়েতনাম এক্ষুণি আমেরিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দেশবাসীর প্রতি মার্কিন সরকারের উদাত্ত আহ্বান,—আপনারা দেশের স্বার্থে দলে দলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ভিয়েতনামকে কম্যুনিস্টদের কবল থেকে রক্ষা করুন।

কিন্তু দেশপ্রেমের সে আহ্বান মাঠে মারা পড়লো। কেউ আর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো না।

কোত্থেকেই বা আসবে? এরই মধ্যে আড়াই লক্ষেরও বেশি মার্কিন সৈন্যকে ভিয়েতনামে পাঠানো হয়েছে। দেশবাসী, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের মনে এরই মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সার্থকতা সম্বন্ধে। কেনই বা আমেরিকান মানুষ প্রাণ দিতে যাবে দূরপ্রাচ্যে?

পেন্টাগনের পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে আমেরিকার সৈনিক প্রাণ হারাচ্ছে ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে। টুকরো টুকরো ভিয়েতনামের মাটি থেকে মার্কিন সৈনিকরা পিছু হটে আসছে। মৃত আহতের পরিধি যতই বাড়তে থাকে মার্কিন সরকার ততই চঞ্চল হয়ে ওঠে। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যাণ্ড খবর পাঠান, সৈন্য চাই, আরো সৈন্য। নইলে ভিয়েতনাম এক্ষুণি মার্কিন সরকারের হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর ভিয়েতনাম থেকে চলে আসা মানেই সমস্ত এশিয়া থেকেই মার্কিন প্রভুত্বের অবসান। কিন্তু সরকারের সমস্ত আবেদন ব্যর্থ। দেশপ্রেমের ডাকে দেশবাসীরা আর সাড়াই দিলে না।

অগত্যা সরকারকেও অন্য পথের সন্ধান করতে হলো। পেন্টাগনের কড়া নির্দেশ বেরুলো, আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত অবিবাহিত যুবকদের অবিলম্বে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে।

সাজ সাজ রবে সরকার সমস্ত দেশকে চমকে দিলো। যুদ্ধ! দেশের যুবসম্প্রদায়ের চোখে ঘুম নেই। ঘুম টুটে গেল সমস্ত মার্কিন মায়েদেরও, ছেলে হারাবার ভয়ে। শুধু শুধু ছেলে প্রাণ দিতে যাবে ঐ দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধ করবার জন্যে? না—এ হতেই পারে না। মায়ের অশ্রু যেন বাঁধ মানে না।

কিন্তু সরকার।

সরকারের এ আদেশ অমান্য করলে কঠোর সাজা পেতে হবে।

তাহলে?—সবার মনে একই প্রশ্ন, একই ভীতি, একই শংকা।

সবাই যেন হঠাৎ একটা পথ খুঁজে পেলো। সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার হাত থেকে বাঁচতে হলে এই পথেরই আশ্রয় নিতে হবে সবাইকে।

কি সে পথ?—সবারই উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা।

—বিয়ে। —পরস্পর পরস্পরের কানে যেন বাঁচার পথ বাতলে দিলে।

কিন্তু বিয়ে তো চাট্টিখানি কথা নয়। আর এক মুহূর্তের মধ্যে বিয়ে হয়েও যায় না। তার জন্যে মন দেয়া-নেয়ার পালা আছে; আরো কত কি।

চুলোয় যাক ওসব। আপাতত প্রাণ বাঁচাতে হবে; অপমৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। তার জন্যে বিয়ে করা এক্ষুণি দরকার। প্রয়োজন হলে পরে ডিভোর্স করে নেয়া যাবে।

যুবসম্প্রদায়কে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে মেয়েরাও এগিয়ে এলো।

দিকে দিকে বিয়ের হিড়িক লেগে

গেল। পার্কে, মাঠে, ময়দানে, লোকে—সব জায়গাতেই বিয়ের চুক্তি হতে লাগলো। অবিবাহিত যুবকরাই মেয়ে দেখলেই হাত তুলে বলে, ভিয়েতনাম।

মেয়েরাও বুঝতে পারে ভিয়েতনামে যাবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ছেলেটি তার পাণিপ্রার্থী। ভাবালু ছেলেটিকে নিয়ে গর্ডনের মায়ের চিন্তার শেষ নেই। চোখের জলে তিনি ছেলেকে অনুরোধ করেন, বাবা, তুই এবার একটা বিয়ে কর।

—তাই তো! গর্ডনও বেশ খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

ওয়েবস্টার পার্কে একদিন 'হাততোলা বিয়ের' চুক্তিতে সই করে সে মেরীকে ঘরে নিয়ে এলো।

মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। গর্ডনও নিশ্চিন্ত হলো। সে আবার বইয়ের সাগরে ডুব দিলে।

সে হুইটম্যান আবৃত্তি করে মেরীকে শোনায়; মেরী প্রশংসা করে।

গর্ডন লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে; মেরীকে পড়ে শোনায়। মেরী মনোযোগ দিয়ে শোনে, আর আবেগের আতিশয্যে তাকে জড়িয়ে ধরে; জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয় সমস্ত মুখখানা।

গর্ডনের মধ্যে মেরী একজন মিষ্টি মানুষের সন্ধান পায়; মেরীর মধ্যে গর্ডন পায় একজন প্রেমিকার।

দিন যায়: মাসও যায়।

উড়োজাহাজ ভর্তি আমেরিকান সৈনিক চালান যায় এশিয়া ভূখণ্ডে; ভিয়েতনামের মাটিতে।

কিন্তু এতেও জেনারেল ওয়েস্ট-মোরল্যাণ্ডের ক্ষুধা মেটে না। তিনি খবর পাঠান, সৈন্য চাই; আরও সৈন্য। যে হারে সৈন্য আসছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। এদিকে ভিয়েতকঙ্গরা সায়গনের দরজায় এসে ঠোকা দিচ্ছে। সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ড থেকে আমেরিকার প্রভুত্ব গেল বলে। এখানে পা শক্ত করে দাঁড়াতে হলে আরো সৈন্য চাই; প্রচুর সৈন্য।

কিন্তু সরকারই বা এত সৈন্য কোথায় পাবে? আইন করেও সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। সেনাবাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। অথচ ভিয়েতনামের মার্কিন জেনারেলের চাহিদা বেড়েই চলেছে।

সরকার বিব্রত। কি করা যায় এখন তাহলে? প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রী সরকারী আমলারাই বুদ্ধি ফাঁদলে, নোটিশ দেবার পর যারা বিয়ে করেছে সেটা নিতান্তই কর্তব্য এড়ানোর ছলমাত্র। সে বিয়েকে সরকার স্বীকার করবে না। ভিয়েত-নামে তাদের যেতেই হবে।

তাহলে?

বাজ পড়লো নব-বিবাহিতা অনেক তরুণীর মাথায়; অনেক মায়ের চোখের জল বাঁধ মানলে না।

চোখের জলে গর্ডনকে বিদায় দেয় মেরী; গর্ডন মেরীকে দেয় তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত উপহার, যা তার শরীরের অভ্যন্তরে প্রতি রক্তবিন্দুর বিনিময়ে বেড়ে ওঠে।

মাস গড়িয়ে যায়; বছরও।

যুদ্ধ থামবার কোনো লক্ষণ তো দূরের কথা যুদ্ধক্ষেত্র আরো প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। ভিয়েতনামে আমেরি-কার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। খোদ আমেরিকার যুবসম্প্রদায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে সরকারের ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে।

দিন দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রিচার্ড গর্ডন।

আর্মি ক্যাম্পে শুয়ে শুয়ে গর্ডন চিঠির ক'টি লাইন বার বার পড়ছিল।

"......এডওয়ার্ড ভীষণ দুষ্টু হয়েছে। ওকে এতটুকু ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই; অমনি ভীষণ কাঁদতে শুরু করে দেবে। আর কোলে নিলেই সামনের নতুন গজিয়ে ওঠা ক'টি দাঁত বার করে এত সুন্দর হাসতে পারে! সে এখন 'ড্যাডি' বলতে শিখেছে।

রিচার্ড, তুমি কবে দেশে ফিরে আসবে? আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। তুমি আমার অন্তহীন ভালবাসা জেনো।"

তোমারই একান্ত প্রিয় মেরী।

রিচার্ড সমস্ত ঘরময় পায়-চারী করে। একটা আনন্দের অনু-ভূতি তার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দেয়। এডওয়ার্ড 'ড্যাডি' বলতে শিখেছে। সে মেরীকে এত ভালবাসে যে, এক মুহূর্তের জন্যে দূরেও যেতে দেয় না; অমনি কাঁদতে আরম্ভ করে।

সমস্ত ক্যাম্পে হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনা; নিদারুণ ব্যস্ততার সংকেত। চারিদিকে সাজ-সাজ রব।

ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে এই মুহূর্তেই সমস্ত ব্যাটেলিয়নকে রওনা দিতে হবে।

কোথায়, কেন?—মিলিটারী নিয়মা-নুবর্তিতায় এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

নিঝুম রাত। অমাবস্যার কোনো একটা তিথি হয়তো হবে। নিকষ কালো অন্ধকারের গাঢ় যবনিকায় ঢাকা পড়ে আছে সমস্ত পৃথিবীটা; পাশের লোকটিকেও চেনা যায় না। সুদূর আকাশের গায় দু-একটি তারা যেন লজ্জায় ম্রিয়মাণ এ হেন অন্ধকারকে হেডলাইটের দাম্ভিক আলোকে চিরে দু'ভাগ করে পুরো এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য বোঝাই করে চলেছে মিলিটারী ভ্যান। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। পিচঢালা পথে অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ গাড়ি এসে থামলো। আর তো গাড়ি যাবে না! এবার পায়ে হাঁটার পালা। গ্রামের পথে পথে ওরা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চললো। পূর্বদিকের আকাশটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তাপ নেই; শুধু মুঠো মুঠো আলো ছড়াচ্ছে প্রথম ভোরের সূর্য।

মি—লাই।

দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই একটি গ্রামের নাম। গ্রামবাসীরা সবে ঘুমজড়ানো চোখে ঘুমের আবেশ ভাঙছিল। চাষীরা মাঠে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

সমস্ত ব্যাটেলিয়ন ঝাঁপিয়ে পড়ল এই গ্রামটার ওপর। ব্যাটেলিয়ন কমা-ণ্ডার লেঃ কঃ বার্নহার্ডের কড়া নির্দেশ, —ধ্বংস করে দাও সমস্ত গ্রামখানাকে। মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে দেশের অন্যান্য প্রান্তরের লোকেদের যাতে চেতনা ফিরে আসে; যাতে ওরা নতি স্বীকার করে।

সমস্ত গ্রামের লোকেরাই ভিয়েত-কঙদের ভক্ত। ভিয়েতকঙরা দিনরাত এখানে ঘোরাফেরা করে। এখান থেকে ওদের জন্যে পাহাড়ে-জঙ্গলে খাবার, অস্ত্রশস্ত্র চালান যায়। অথচ মার্কিন সেনাবিভাগ ও গোয়েন্দাবিভাগ তার কোনো হদিশই পায় না।

লেঃ কঃ বার্নহার্ড দাঁত কড়মড় করেন, এ গ্রামবাসীদেরই কারসাজী। পুড়িয়ে ফেল সমস্ত গ্রামখানাকে; একজন গ্রামবাসীও যেন রেহাই না পায়। এই হবে তাদের চরম শাস্তি।

সামরিক নির্দেশ। জাঁদরেল সামরিক অফিসার লেঃ কঃ বার্নহার্ডের

প্রাণ; [illegible] বাঁচার উপায় নেই। শুরু হলো অপারেশন সানরাইজ।

শুরু হলো ধ্বংসযজ্ঞ। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো সমস্ত গ্রাম-খানাতে। লেলিহান অগ্নিশিখা দাবা-নলের মত ছড়িয়ে পড়লো দিগ্বিদিকে।

মেয়েদের উৎরোল ক্রন্দন আর শিশু-দের আর্ত চীৎকারে দিগন্ত কেঁপে উঠলো।

ঘর ছেড়ে উঠোন; উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় পালাবার হিড়িক লেগে গেল।

কিন্তু পালাতে পারলো না। মেশিনগান আর রাইফেল গর্জে উঠলো চারিদিক থেকে। শত শত নারী, পুরুষ আর শিশু ধরাশায়ী হলো বুলেটের আঘাতে। ওদের অপরাধ, ওরা নিজের দেশকে ভালবাসে; নিজের দেশের মুক্তির জন্যে যারা লড়াই করছে তাদের ধরিয়ে দেয় নি।

লাস; চারিদিকে লাসের ছড়াছড়ি। ঘরের দরজায়, উঠোনে আর রাস্তায় মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তনাদ। বাধা দেবার মত আর লোক বেঁচে নেই। এবার শুরু; নারীদেহ নিয়ে লোফালুফি [illegible] হয়ে গেছে ও [illegible]।

গর্ডন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। এ কি যুদ্ধ? রাইফেলের ডগায় নিরীহ গ্রামবাসীদের দুভাগ করা; নারী, বৃদ্ধ আর শিশুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা; নারীদেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা? আবেগে আর উত্তেজনায় সমস্ত দেহ তার থর থর করে কাঁপছে?

একি?

একজন সৈনিক এক তরুণীকে টেনে-হিঁচড়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? মেয়েটির আর্তনাদ বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের সাথে মিশে গিয়ে এক পাপের স্বপ্ন তৈরি করেছে। ছোট্ট একটি শিশু তার মায়ের এই দুর্দশা দেখে অঝোরে কাঁদছে, আর মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

গর্ডনের মনে পড়লো, এডওয়ার্ড বড় হয়েছে; সে মেরীকে ছেড়ে এক মুহূর্তেও থাকতে পারে না; অমনি কাঁদতে আরম্ভ করে।

সে ছুটে গেল। ছুটে গিয়ে সৈনিকের কবল থেকে ছাড়িয়ে দিল তরুণীকে।

সরকারী উকিল মিঃ কিটিংস অভিযোগের বয়ান দীর্ঘতর করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের এ হেন আচরণ নিজের কর্তব্যের প্রতি অবহেলার চূড়ান্ত নিদর্শন। শুধু তাই নয়, নিজের [illegible] সৈনিককে তার কর্তব্য পালনে বাধা দিয়ে মার্কিন সরকারের প্রতি চরম অসৌজন্য প্রকাশ করেছেন এবং নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

—মি লর্ড,—মিঃ কিটিং তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন,—দেশে পাঠানো তাঁর স্ত্রীর নিকট লেখা যে চিঠি মহামান্য সরকার সেন্সর করতে গিয়ে হস্তগত করেছেন তা থেকেই আমার অভিযোগের সত্যতা আরো দৃঢ়ভাবেই প্রমাণিত হবে।

এই বলেই মিঃ কিটিংস তাঁর পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া বাছাই করা ক'টি লাইন পড়তে আরম্ভ করলেন।

"......আজ তিন বছরেরও বেশি হয়ে গেল আমি এখানে এসেছি। ভিয়েতনামে আমেরিকান সৈন্যের সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশি। অথচ আমরা এখানে কেন যে লড়াই করছি তার কোনো হদিশই আজো পর্যন্ত পেলাম না। প্রতিদিন অসংখ্য আমেরিকান সৈন্য মরছে। অথচ এই প্রাণদানের পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে কি?

মেরী, আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়ছি, সেই ভিয়েতকঙ্‌রা, সংক্ষেপে যাদের বলে ভি· সি·—তাদের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম আমাকে মুগ্ধ করে দেয়। ওরা লড়ছে দেশের জন্যে। কিন্তু আমরা?

এই প্রশ্নের উত্তর অতি কুৎসিত। আর সেজন্যেই একদিন ইতিহাসের ডাস্টবিনেই আমাদের স্থান হবে। আমরা অর্থাৎ আমেরিকানরা সভ্যতার বড়াই করি। অথচ উপনিবেশ স্থাপন করার জন্যে যুদ্ধ; যুদ্ধ করতে গিয়ে লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ আর শিশুহত্যা—এ কোন্ ধরনের সভ্যতা?

ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একদিন আমাদের জাতিকেও ন্যায়ের যুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ করতে হয়েছিল। অথচ আজ কত সহজেই না আমরা সে কথা ভুলে গেছি: কোন্ মানবাধিকারের জন্যে আব্রাহাম লিঙ্কন সংগ্রাম করেছিলেন? জানো মেরী, রাতের অন্ধকারে এই দশ হাজার মাইল দূরে বসেও হোয়াইট হাউসের টাওয়ার থেকে ডি· সি· ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিঙ্কনের ভৌতিক কণ্ঠস্বর যেন আমি শুনতে পাই, এভিন্যু, এভিন্যু, এভিন্যু। বিদায়, বিদায়, বিদায়। আমি তো ভাবি এই বিদায় [illegible] [illegible] বিদায় কি নয়?

মি-লাই—এটা একটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

"এ ধরনের ঘটনা গত ক'বছরে অসংখ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। এ জন্যে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।......"

—তোমার একান্তই প্রিয় রিচার্ড।

বিচারকক্ষে সুগভীর নিস্তব্ধতা। মিঃ কিটিংসের কণ্ঠস্বর চার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে, তাহলেই দেখুন, মি লর্ড, মহানুভব সরকারের প্রতি একজন সৈনিকের এই মনোভাব সরকারের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। শুধু তাই নয়, এই ধরনের চিঠি লেখাটাও একটা জঘন্য অপরাধ। কারণ, যারাই এই চিঠি পড়বে তাদের মনে সরকারের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এ প্রকাশ্য দেশদ্রোহিতারই সামিল।

মিঃ কিটিংস প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন আসামীর দিকে,—এ কথা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন, মিঃ গর্ডন?

ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেশ টেনে মিঃ গর্ডন বললেন, নিশ্চয়ই।

এবার বিচারক মুখ খুললেন, নিজেকে ডিফেন্ড করার জন্যে আসামীর কোনো বক্তব্য আছে?

—মহামান্য বিচারক,—আ সা মী নিজের পক্ষ সমর্থন করে বললেন,—অসংখ্য কথা বুকের ভেতর জমে আছে। সে সব কথা উজাড় করে দিয়েও কোনো লাভ হবে কি? কারণ আমার শাস্তি বিচারের আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এ তো বিচারের প্রহসন মাত্র। তবু বলছি, আমার স্ত্রীকে লেখা চিঠির যে ক'টি লাইন মিঃ কিটিংস আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার জন্যে পড়ে শোনালেন তাই হলো আমার বক্তব্যের মর্মার্থ। আমার জবানবন্দী।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পো-রেশনের ঋণ

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার মুখপত্র চিত্র বাক্পেতে'র এক সংবাদে প্রকাশ, গত দেড় বছরে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ২০টি ছবিকে ঋণ দিয়েছে। এই ঋণের অংক এক একটি ছবির ক্ষেত্রে আড়াই লক্ষের বেশি নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম চেতন আনন্দের "হীর রানঝা"; ছবি-টির জন্য ৫ লক্ষ টাকা আগ্রম ঋণ দেওয়া হয়েছে। এ যাবৎ ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ৮২টি ছবিকে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ঋণ দিয়েছে। এর মধ্যে বারোটি ছবির ১২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা ঋণ অনাদায়ী থেকে গেছে। এই আর্থিক ক্ষতির জন্য কর্পোরেশন সম্প্রতি মাঝারি বাজেটের ঋণ দানের সিদ্ধান্ত করেছে।

ঋণ দানের এই নীতি অনুযায়ী 'ভুবন সোম'-কে দেওয়া হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা, বাসু ভট্টাচার্যের 'অনুভব' (হিন্দী) কে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, গুজরাটি ছবি 'বহুরূপী'-কে দেড় লক্ষ টাকা, রাজিন্দার সিং বেদীর 'দস্তক'-কে ২ লক্ষ টাকা, কান্তিলাল রাঠোরের গুজরাটি ছবি 'কাঙ্কু'-কে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, মারাঠি ছবি 'অলিয়া তুফান দরওয়ালা'-কে ৭৫ হাজার টাকা, ওড়িয়া ছবি 'আদিনা মেঘ'-কে দেড় লক্ষ টাকা, বাসু চ্যাটার্জীর 'সারা আকাশ'-কে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, মণি কাউলের 'উসকি রোটি'-কে আড়াই লক্ষ টাকা, 'তালাশ'-কে আড়াই লক্ষ টাকা, মৃণাল সেনের হিন্দী ছবি 'গোত্রান্তর'-কে ২ লক্ষ টাকা, প্রেম কাপুরের 'বদনাম'-কে ২ লক্ষ টাকা, চিদানন্দ দাশগুপ্তের বাংলা ছবি 'ঝংকার'-কে ২ লক্ষ টাকা, মালয়ালম ছবি 'ত্রিসন্ধ্যা' কে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেও কয়েকটি ছবিকে ঋণ দান করা হয়েছে। রেকর্ডিং যন্ত্রপাতি কেনার জন্যও কর্পো-রেশন একটি প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করেছে।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের ঋণ-দানের ক্ষেত্রে মাঝারি বাজেট এবং ছোট বাজেটের ছবি অগ্রাধিকার পাবার নীতি অনুসরণ করা উচিত। এই নীতি অনুসরণ করলে নতুন প্রযোজক-পরি-চালকদের উৎসাহ দেওয়া হবে এবং এতে ছবির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে।

—সুজন।

প্রথম কদম ফুল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসের চিত্ররূপ "প্রথম কদম ফুল" কলকাতা ও শহরতলীর সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটির পরিচালনা করেছেন ইন্দর সেন। চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি নবাগত। নতুন হাতের মিঠা মেজাজে এই কাহিনীচিত্রটি উপভোগ্য। প্রথম থেকে রোমান্টিকতা এবং সাসপেন্সে ছবিটি দর্শকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে রাখে। চলচ্চিত্র বাংলা বা হিন্দী যেরূপ গতানুগতিক-তার চোরাগলি ধরে চলেছে, তার মধ্যে এই ছবিতে কিছুটা বাস্তববোধের পরি-চয় পাওয়া যাবে।

সুশান্ত আর কেতকী দুই সহপাঠীর মনে প্রেমের রঙ দেখা দিল। তারা ভালবেসে বিয়ে করল। বিয়েতে কেতকীর বাবার ভয়ানক আপত্তি, কারণ সুশান্তদের

'পরদেশী' ছবিতে মমতাজ

তুলনায় আর্থিক দিক থেকে ওরা উপরে; সমসংগোত্র রোজগারে ছেলেকে বিয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কেতকীকে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। অনাড়ম্বরে সুশান্তর সংগে কেতকীর বিয়ে হল এবং সে একান্নবর্তী সংসারের বৌ হয়ে এল।

সুশান্ত রিসার্চ করছে জলপানি পেয়ে। তার মার কাছে টাকাটাই আসল কথা, কাজেই বৌয়ের জন্য চাকরির কথা বলতে তিনি ইতস্তত করলেন না। যদিও চাকরি করতে কেতকীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুশান্ত থেকে পরিবারের সকলের মনের অবস্থা দেখে সে সুশান্তর বন্ধুর দেওয়া চাকরি নিল। এবার পরিবারের, সকলের চোখে সে বদলে গেল, সকলেই তাকে খাতির করে, সমীহ করে। সুশান্তর কাছেও তার মর্যাদা বেড়ে গেছে। মধ্যবিত্তের সংসারে টাকাটা মান-সম্মানের মাপকাঠি।

কিন্তু সুশান্তর মনে শান্তি ছিল না, যতই আধুনিক যুবক হোক, নারীর ওপর 'প্রভু মানসিকতা' প্রায় সকলের মধ্যেই রয়েছে। কেতকীর আর্থিক

অব্যক্তভাবে সুশান্তর মনের কোণে কোথায় যেন মেঘ জমে উঠেছে। একদিন তা ফেটে পড়ল, যখন তার মা এসে শোনালো যে, সুশান্তর বন্ধু আর কেতকীকে নিয়ে নানা কথা রটনা হচ্ছে। কথাটা তার বিশ্বাস হলো, কারণ বন্ধুর বাড়িতে একটা বইয়ের মধ্যে সে কেতকীর ছবি দেখেছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, ঈর্ষা ও ঘৃণায় সুশান্তর মন ভরে উঠলো। অপমানিতা হয়ে কেতকী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

এ পর্যন্ত কাহিনীতে পরিচালক মধ্যবিত্ত সংসারে নারীর স্থান এবং আর্থিক সমস্যায় নারীকে চাকরির ক্ষেত্রে পাঠিয়েও যে রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ মানসিকতার শিকার কিভাবে হয় তা চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। আধুনিকতার বড়াই করলেও নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ চরম রক্ষণশীল। যে কেতকী বিয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে দ্বিধা করলো না, সেই কেতকীর কাছে সুশান্ত দাবি করলো তার মতামতের ওপর কেতকীকে চলতে হবে, বাড়ির সকলের মন জুগিয়ে লক্ষ্মী বৌটি হয়ে। এ রক্ষণশীল মানসিকতার প্রতি পরিচালক কশাঘাত করেছেন। এ পর্যন্ত ছবিটি দেখতে বেশ ভাল লাগে।

শেষ পর্যন্ত সুশান্ত তার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলো ওর কাছে কেতকীর ছবি থাকার রহস্য। এখানেই কাহিনীর শেষ। কিন্তু পরিচালক পুরুষের প্রভু মানসিকতার শিকার সুশান্তকে দিয়ে মর্মান্তিক বিচ্ছেদের অবসান ঘটাবার পরিবর্তে ভাসুরের ছেলে হারাবার ঘটনা উপস্থিত করে কাহিনীর মূল সুরে ভাঙন ধরিয়েছেন। এতক্ষণ যে মানসিকতাকে বিদ্রূপ করেছেন, পরিচালক নিজেই সেই মানসিকতার শিকার হলেন হারানো শিশুর হাত ধরে কেতকীর প্রত্যাবর্তনে। অসম্মান ও অবিশ্বাসের পরিপূরণ করা হলো মমতা দিয়ে।

ছবিতে প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র ও তনুজা। মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশে সৌমিত্র দক্ষতা দেখিয়েছেন। তনুজা দর্শকদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছেন। বন্ধুর ভূমিকায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় কেতকীকে ভাললাগার প্রচ্ছন্ন প্রকাশে চমৎকার অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রশংসনীয় সুব্রতা চ্যাটার্জী, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, অনুভা দেবী, শৈলেন মুখার্জী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী, সীমন্তিনী রায়, শমিত ভঞ্জ ও শিশু অভিনেতাটি।

'দুটি মন' ছবিতে উত্তমকুমার ও কণিকা

ছবিতে সঙ্গীতের কাজ ছবির মেজাজ অনুরূপ বলতে পারি না। যে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীত এবং গঙ্গাতীরে দেশীয় যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার উপযুক্ত রস সৃষ্টি করতে পারত, সেক্ষেত্রে আধুনিক গান ও বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার আমার কাছে রসহীন মনে হয়েছে। ফিল্মী কায়দায় সৌমিত্রের মুখে গান জুড়বার কোন দরকার ছিল না। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

ছবির ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়। গঙ্গাতীরের কয়েকটি দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে, সৌন্দর্যবোধের সহায়ক হয়েছে।

নাটকের কথা

মৌচোর

গত ৮ই জুলাই সন্ধ্যায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিসারিজ ডাইরেকটরেট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সপ্তম বার্ষিক প্রীতি সম্মেলনে শ্রীসলিল সেনের 'মৌচোর' নাটকটি সফলতার সাথে অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি ডাইরেকটর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীশেখর চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে বর্তমান বাংলা নাটকের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শ্রীসুকমল সেন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন। নাটকের আগে শ্রীসুজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়।

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের গহীন অরণ্যে বাঘ-সাপ আর হিংস্র আরণ্যক প্রাণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে জীবনে বেঁচে থাকার দুর্জয় সংগ্রাম, আমলাতন্ত্র আর মহাজনী শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হবার প্রত্যয় ঘোষণা নাটক 'মৌচোর'। সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক হিসাবে এটি একটি সফল নাট্য প্রযোজনা—একথা আগেই বলেছি। অভিনয়ে বংশী বাউল চরিত্রে দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, ধর্মদাস চরিত্রে রমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সনাতন মন্ডল চরিত্রে সুশীল আচার্য ও ময়না চরিত্রে প্রতিমা পালের অভিনয় মুগ্ধ হবার মতো। তা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে সফলতার সাথে রূপদান করেছেন অভয় মিত্র, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ ঘোষ প্রমুখ। নাটকের নায়ক রতন-চরিত্রে হিমাংশুদের অভিনয় কিছুটা নিষ্প্রভ। দৃশ্যপরিকল্পনায় কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও সামগ্রিক নাট্যানুষ্ঠান বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়।

যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়

আগামী ১লা আগস্ট 'উদয়নের' উদ্যোগে কলামন্দিরে ভারতীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত একক মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন। আলো ও মঞ্চ পরিচালনা করবেন তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত, আবহসংগীত হিমাংশু বিশ্বাস, রূপসজ্জায় অনন্ত দাশ, পোষাকে খালেদ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনায় রাম গুপ্ত। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত এবার কয়েকটি নতুন মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন।

আসন্ন দ্বিতীয় তাসখন্দ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

সোভিয়েত উজবেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাসখন্দে আসন্ন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আফ্রোএশীয় দেশগুলির চলচ্চিত্র-প্রদর্শনী পুরোদমে কাজ করে চলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রি-পরিষদের চলচ্চিত্রশিল্প কমিটির প্রথম সহ-সভাপতি ও উৎসবের সংগঠনী কমিটির সহ-সভাপতি ভ্লাদিমির বাসকাকোভ নভোস্তির প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য এবং এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলির নবজাগ্রত চলচ্চিত্রে শিল্পে তার প্রভাব সম্পর্কে মিঃ বাসকাকোভ বলেন যে, ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব ছিল আফ্রোএশীয় দেশগুলির চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক। এই উৎসবে আফ্রোএশীয় দেশের ১০০টি ফিল্ম প্রদর্শিত হয় ও ৪১টি আফ্রোএশীয় দেশের ৩০০ প্রতিনিধি উৎসবে যোগ দেন। তা ছাড়া জাতিসংঘ ও ইউনেস্কোর প্রতিনিধিও উৎসবে ছিলেন। এই উৎসব ছিল বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্মেলন। ভারতের তথ্য ও বেতার দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী উৎসবকে স্বাগত জানান। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীমতী মাগদা কামাল বলেন, মৈত্রী ও শান্তির জন্য সোভিয়েত জনগণের অকৃত্রিম আগ্রহের প্রকাশ এ উৎসব।

উৎসবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তার আন্তর্জাতিক "আলোচনা চক্র" চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের সমস্যাগুলি তাতে আলোচিত হয়। প্রথম তাসখন্দ উৎসবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে কয়েক শত বাণিজ্য-চুক্তি হয় এবং ফিল্মের কেনা-বেচা ও আদান-প্রদান চলে। আসন্ন দ্বিতীয় উৎসবটি আরও প্রতিনিধিত্বমূলক ও আফ্রোএশীয় দেশগুলির চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও প্রযোজকদের কাছে আরও ফলপ্রসূ হবে বলে তিনি মনে করেন।

তাসখন্দ উৎসব সংগঠনী কমিটি বর্তমানে অসংখ্য বিদেশী চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও প্রযোজকদের কাছ থেকে যোগদানের আবেদনপত্র পাচ্ছে। দেশে দেশে আসন্ন উৎসবের জনপ্রিয়তার এ এক উদাহরণ। উৎসবের আদর্শ হল : "শান্তি, সমাজ প্রগতি ও জাতিসমূহের স্বাধীনতার জন্য।"

উপসংহারে মিঃ বাসকাকোভ বলেন, তাসখন্দ উৎসব সংগঠনী কমিটি এখন সর্বতোভাবে প্রস্তুতি কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, যাতে এই উৎসবের আদর্শ ও মানবতাবাদী ঐতিহ্য ... ও আফ্রোএশীয় দেশগুলির চলচ্চিত্রশিল্প আরও ঘনিষ্ঠ মৈত্রীসূত্রে ... পারে এবং আসন্ন উৎসবটি চলচ্চিত্র-শিল্পের এক আন্তর্জাতিক সমারোহে পরিণত হয়।

'ত্রিনয়নী মা' ছবিতে বিজু ভাওয়াল

সোভিয়েত ইয়ং ব্যালের একটি নাচ। তরুণ-তরুণীদের নিয়ে এই ব্যালের দল

সাজঘরের যুগপূর্তি উৎসব

আগামী ৩১শে জুলাই মুক্ত অঙ্গনে জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা সাজঘরের যুগপূর্তি উৎসবে খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক ও নাট্যকার সলিল সেন পরিচালিত ও আলো দাশগুপ্ত রচিত "সুখের পায়রা" নাটকখানি অভিনীত হবে। এই উপলক্ষে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে যথাক্রমে নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ও রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন।

অভিনেত্রী লীলাবতীর জীবনাবসান

মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী লীলাবতী (করালী) গত ১৫ই জুলাই পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। লীলাবতীর অভিনয় জীবনের সূচনা মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে আট বছর বয়সে 'বামনাবতার' নাটকে। তার পর থেকে মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। বিশেষভাবে কয়েকটি টাইপ চরিত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ বিশেষ বিশেষ রচনায় ফুটবল ॥

বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়েরা খেলা থেকে বছরে কে কত টাকা পান

বিশ্ব ফুটবলের নামী-দামী খেলোয়াড়েরা শুধুমাত্র খেলার থেকে যে টাকা পান তার হিসেব নিয়ে দেখা গেছে—ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় ৩৩ জন খেলোয়াড় পান বছরে ১০,০০০ পাউণ্ড করে। এবং ১৫ জন খেলোয়াড় পান বছরে ১৫,০০০ পাউণ্ড করে। আর ইংল্যাণ্ডের প্রায় ১২ জন খেলোয়াড় পান ২০,০০০ পাউণ্ড করে।

ইতালীর কাগলিয়ারি ক্লাবের খেলোয়াড় লুইস রিভা এখন বিশ্ব ফুটবলের সব চাইতে দামী ছেলে, ওঁর উপার্জন কেবলমাত্র খেলা থেকে হচ্ছে—প্রায় ৬৬,০০০ পাউণ্ড।

এর পরেই হলেন ব্রেজিলের পেলে—শুধুমাত্র খেলা থেকে উনি পান—৬০,০০০ পাউণ্ড।

ইতালীর জনাদশেক খেলোয়াড় পান ২৫,০০০ থেকে ৩০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। এর মধ্যে আছেন হলার (জুভেন্টাস), রিভেরা (এ. সি. মিলান) ফেকেটি ও মাজোলা (ইন্টারন্যাশনাল)।

ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ববি মুর পান প্রায় ২৫,০০০ পাউণ্ড। ববি চার্লটন (ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড) পান ২০,০০০ পাউণ্ড। পর্তুগালের ইউসেবিওর বাৎসরিক আয় হচ্ছে—২০,০০০ পাউণ্ড এবং আর্জেন্টিনার পারনেরা পান ১৭,০০০ পাউণ্ড।
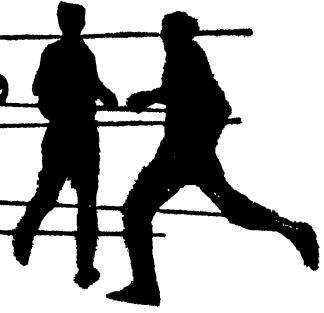
যতো দিন যাচ্ছে, কলকাতার ফুটবলের চেহারা ও চরিত্র দেখে চমকে উঠছি। যেমন তার বাইরের রূপ, তেমনি ভেতরটাও। বাইরে হাঁকডাক, অবুঝের সোচ্চার কলকণ্ঠ, ভেতরটা মস্ত অন্তঃসারশূন্য। নিশ্চিত জানি, কলকাতার ফুটবল নামক বস্তুটিকে সুস্থ নেত্রে চেনবার চেষ্টা করলে অনেকেই আমার মতো চমকে উঠবেন।

দর্শক, খেলোয়াড় ও সাংবাদিক হিসেবে কলকাতার ফুটবলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেক দিনের পুরোনো এবং নিবিড়। এই ফুটবলকে ইংরাজ আমলে দেখেছি, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের স্বর্ণযুগে খুব কাছ থেকেই সমস্ত সত্তা দিয়েই স্পর্শ করতে পেরেছি। তার পরের কালে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ওই ফুটবলের আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণের সুযোগও পেয়েছি। কালের বিচারে বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু কোনো কালের অভিজ্ঞতা একালের অভিজ্ঞতার মতো বিস্বাদ, বিবর্ণ নয়। এই কালের প্রতারণা থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই!

প্রতারণা? হ্যাঁ, বেছে বেছে ওই শব্দটিই আমি ব্যবহার করছি। কারণ, কলকাতার লীগ ফুটবলের নামে যে খেলার আয়োজন ঘটানো হয়, তা স্রেফ ফাঁকিবাজী ছাড়া আর কি-ই বা! খেলার নামে ছেলে-খেলা, প্রতিযোগিতার নামে পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া। নেওয়া-দেওয়ার এই কারবারে অভিনয় করার অবকাশে দর্শকদের চোখে ধুলো দেবার অপচেষ্টা। সব মিলিয়ে [illegible] জঞ্জালের পাহাড় জমে উঠছে, পচা জলের স্রোত বয়ে চলেছে কলকাতার ক্রীড়াকেন্দ্র গড়ের মাঠে।

এ [illegible] সার্কাস, ম্যাজিকের চেয়েও অধম। সার্কাসে, ম্যাজিকে ওপরে আড়াল থাকে। লীগ ফুটবলে তাও নেই। হাত সাফাইয়ের কাজ বড় খোলামেলা যেন!

এই অন্যায় অনুষ্ঠানের সাক্ষী আমি, আপনি এবং সবাই। [illegible] সবাই [illegible] করছি। তবে আপনি, আমি [illegible] টিকিট [illegible], উচ্চকণ্ঠে [illegible] করি, [illegible] শ্রোতা [illegible] কি? [illegible]

কিন্তু অন্য সবাই কি আপনার-আমার মতো অমন রুদ্ধকণ্ঠে [illegible], না, বেয়াদবী কাণ্ডকারখানাকে [illegible] করাতে চাইছেন?

অন্য সবাই মানে ক্লাব ও [illegible] ফুটবলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। তাঁরা কি কেউ কোনোদিন লীগ ফুটবলে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির বিরুদ্ধে [illegible]কণ্ঠে রা কেড়েছেন? না, এমন বন্দোবস্তের খেলার পাট বন্ধে সভা-সমিতিতে একটি প্রস্তাব এনেছেন? না, তাঁরা কিছুই করেন নি। কি করাই বা তা করেন! লীগে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির গোপন কারবারে তাঁরা সবাই তো আর অসম্পৃক্ত নন। কাজেই চোখ বুজে অমন বিদঘুটে ব্যাপারটিকে তাঁদের মেনে নিতে হয়।

তাঁরা মানছেন, দর্শকেরাও [illegible] মানতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে যেন [illegible] জন্যে একদল [illegible] জমায়েত ঘটছে গড়ের মাঠে ও তার আনাচে-কানাচে। এই জমায়েতকেই পরিভাষায় বলে 'পারমিসিভ সোসাইটি'—এই সমাজ টিকে থাকলে একদিন হয়তো মাঠের [illegible], অনাচার দেখেও আর কেউ চমকে উঠবে না। এখনও নীতিবোধের [illegible] [illegible] রয়েছে। চক্ষুলজ্জাও টিমটিম করছে। কিন্তু এই 'পারমিসিভ সোসাইটি'র প্রভাবে নীতিবোধ, চক্ষুলজ্জা উবে যেতে কতোক্ষণই বা লাগবে! মাঠের বাইরে যে বৃহত্তর জীবন, সেখানেও রাজনীতির নামে ধীরে ধীরে অনেক কিছু সইয়ে নেওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে—দলীয় সংঘর্ষ, লাঠি, বোমাবাজী, ছুরি-গুলী, কতো কি! সেখানেও এক 'পারমিসিভ সোসাইটি'র শিকার বৃহত্তর জনজীবন। দেখে মনে হয়, সবাইকে সবকিছু সইয়ে নেওয়াবার জন্যেই বুঝি এ যুগে [illegible] শুরু হয়ে গিয়েছে।

ইংরাজ আমলে কলকাতার ফুটবলে কালা-[illegible] রেফারিদের নামে [illegible] [illegible]-বিভ্রাট ঘটতো। সাহেব রেফারীরা সাহেব দলের পক্ষে [illegible] টানতেন না, এমন নয়। [illegible] বাংলাদেশের [illegible] [illegible] হতো, [illegible]

সইতে হয়েছে কলকাতার গড়ের মাঠকে। সেই গড়ের মাঠকে আজও পক্ষপাতদুষ্ট রেফারিংয়ের এবং দলসমর্থকদের দাপাদাপি সইতে হচ্ছে। সেদিনে ও আজকে তফাৎ কোথায়? বরং অবক্ষয়ের কাল আজ আরও পূর্ণ হয়েছে। যেহেতু সেকালে লীগে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি করা হোতো না। আজ হচ্ছে। বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে অন্য কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, কলকাতার ক্রীড়াজীবন যে সুশিক্ষিত হতে পারে নি এবং সেই জীবনের ওপর প্রগতির প্রতিফলন ঘটে নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সং শিক্ষার [illegible] পেলে খেলার মাঠে নিজেকে ঠকানোর বিষ-বীজটিকে আমরা আমাদের ক্রীড়াজীবন থেকে উৎখাত করার প্রেরণা পেতাম নিশ্চয়ই।

নিজেকে ঠকাচ্ছি? তা ছাড়া আর কি! পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া করে ক্ষতি করছি কার? আমার নিজের, নয় কি? নিজের কাছে নিজেই চোর [illegible]। [illegible] দর্শকদের দৃষ্টিকেও আড়াল করতে পারছি না। সব মিলিয়ে চরিত্র-হননের এ এক রাজসূয় যজ্ঞ যেন। আমরাই এই যজ্ঞের হোতা। আর [illegible] সেই যজ্ঞের শিকার। অবস্থাটা সত্যিই ভাববার মতো! শুধু ভাল না খেলতে পারলে আফশোষ করতাম না। কিন্তু যে আয়োজনে খেলতে পারছি না এবং চরিত্র-বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছি, সেই আয়োজনে নিজেদের বলি দিয়ে আমরা লাভ করছি কি!

মাঠে যাঁরা যান, ব্যাপারটা তাঁদের অগোচরে নেই। তবে আত্মপ্রবঞ্চনা সম্পর্কে তাঁরা সবাই কিন্তু তেমন সচেতন নন। তাই তাঁরা এখনও বড় বড় কটি দলের ভালমন্দের সঙ্গে নিজেদের জীবনকেও জড়িয়ে রাখতে চাইছেন। [illegible] জিতলে আজও তাঁরা [illegible] ফাটান, [illegible] কাটিয়ে দেবার [illegible] [illegible] হাতে তুলে নেন। দলের হার-জিতের [illegible] করে একদিন যিনি [illegible] [illegible] অন্যদিন [illegible] তিনিই [illegible],

[[illegible] পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কলকাতা ফুটবল নিয়ে পাগলামি দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, আর ফুটবল খেলার মান নামতে নামতে শূন্যের কোঠায় পড়ো-পড়ো। কিন্তু এর মধ্যেও স্বপ্ন দেখার অন্ত নেই। রসিকতার ছলে কিংবা ফুটবল ধাঁধা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হলেও ১৯৭৮ সালে ভারতকে ওয়ার্ল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানের অধিকারী বলে যাঁরা কল্পনা করতে পারেন তাঁদের আশাবাদের প্রশংসা করি। কিন্তু যখন ১৯৭০ সালে ওয়ার্ল্ড কাপের খেলার বিবরণ পড়েছি আর দেখেছি কলকাতা মাঠের খেলা তখন উচ্চকণ্ঠে বুদ্ধদেব বসুর বন্দীর বন্দনা কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করতে ইচ্ছা হয়েছে :

বিধাতা জানোনা তুমি কী অপার
বাসনা আমার অমৃতের তরে
হয়তো ডুবিয়া আছি কৃমিঘন
পঙ্কিল সায়রে।

কলকাতা ফুটবল বর্তমানে সত্যিই কৃমিঘন পঙ্কিল সায়র আর সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলও।

মোহনবাগান কোনমতে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে এক গোলে হারিয়ে কিংবা ইস্টবেঙ্গল কেঁদে ককিয়ে খিদিরপুরের বিরুদ্ধে একগোলে জেতে, আর সমর্থক জনতা বিপুল আনন্দে পটকা ফাটিয়ে ও বিউগল বাজিয়ে ফেরে। শুধু এক গোলে জেতার বেলায়ই বা কেন। ইস্টবেঙ্গল হাওড়া ইউনিয়নকে ৬—০ গোলে হারিয়েছে তাও কেঁদে ককিয়ে। প্রথমার্ধের শেষ ১৫ মিনিটে তিন গোল ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দশ মিনিটে আরও তিন গোল দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মোট খেলা ৭০ মিনিটের মধ্যে মাত্র ২৫ মিনিটকাল ইস্টবেঙ্গলের হীরে-জহরৎ দিয়ে গড়া টিম হাওড়া ইউনিয়নের রক্ষণবিভাগকে ভেদ করতে পেরেছে। আর বাকি ৪৫ মিনিটকাল হাওড়া দলের রক্ষণব্যূহের কাজে ব্যর্থ হতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। তার পূর্ণকৃতিত্ব হাওড়া ইউনিয়ন রক্ষণ বিভাগের নয়, ইস্টবেঙ্গল দলের অকৃতিত্বেই তা সম্ভব হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল আক্রমণই করে এসে যখন দেখেছে হাওড়া দলের গোল দুর্গ প্রায় অরক্ষিত, তখন কিন্তু গোলকীপারকে একা পেয়ে দুর্গভেদ প্রয়াসে তৎপর হয় নি ওরা। বল নিয়ে পাঁয়তারা কষে কষে ব্যাক, হাফব্যাকদের গোলের সামনে এসে জড়ো হবার প্রচুর সময় দিয়েছে। যখন গোলমুখী শট মেরেছে তাও টিপ করে মেরেছে বিপক্ষ কোন খেলোয়াড়ের গায়ে। জানি না, এর পিছনে বিপক্ষকে দুর্গ রক্ষার জন্য জমায়েত হতে দেবার ক্ষাত্র মনোভাব কাজ করেছিল কি না। বল কাড়াকাড়ির দ্বৈরথ সমরে হাওড়ার খেলোয়াড়দের সঙ্গে অধিকাংশ সময়ই এঁটে উঠতে পারে নি ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা। বল পাস কে কখন কাকে করছে, আর কেইবা ধরছে, কে কোন্ দিকে শট মারছে, আর কাদা মাঠে আলতো গড়ানে পাস আধপথে বারে বারে আটকে যাচ্ছে দেখেও সেই রীতি চলেছে—দেখতে দেখতে আমার ফুটবলের ধ্যান-ধারণা বিদ্রোহ করে উঠেছে। তবু ইস্টবেঙ্গল**দের উল্লাসে ফেটে** পড়া কি কিছু **অন্যায়। বুড়ো** বেরসিকের দল যাই **ভাবুক ও বলুক না কেন।**

এই বছরে সদ্য প্রথম বিভাগে ওঠা **টালিগঞ্জ অগ্রগামী যে চ্যাম্পিয়ান** এবং **দশটি খেলায় ৩৬টি গোল** দেওয়া **মোহনবাগানকে একটিও গোল** দিতে **দেয় নি, তাদের সর্বধ্বংসী জয়যাত্রা** রুখে দিয়ে বছরের প্রথম পয়েন্ট হারাতে বাধ্য করেছে, তাতে অগ্রগামী দলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ওই খেলায় তার চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল মোহনবাগান দলের অকৃতিত্ব। দলের প্রতিটি খেলোয়াড় যেভাবে আগাগোড়া ভুল পাস করে গেল, সারাক্ষণ গোলে একটাও শটের মত শট মারতে পারলো না, তা দেখে মনে হয়েছে যে, তৃতীয় বিভাগের কোন দলকে মোহনবাগানের জামা পরিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওই দুটি খেলার স্মৃতি এই মুহূর্তে উজ্জ্বল বলেই তার উল্লেখ করলাম। কিন্তু মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং তিন প্রধানেরই অধিকাংশ বড় জয়ের মধ্যেও ওই ধরনের ফুটবলের ধ্যান-ধারণা ভুলিয়ে ও ঘুলিয়ে দেওয়া খেলাই দেখেছি।

আর প্রধানদের বিপক্ষ দলগুলি যেখানে একান্তই ফুটবল-নাবালক কিংবা ফুটবল নিঃস্ব সেখানে বড় দলগুলির বড় জয় সহজসাধ্য করে দিয়ে আই এফ এ বড় ক্লাবভক্তদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন নিঃসন্দেহ। শুধু চারটি দলকে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তোলাই নয়, মোট কুড়িটি দলের অসহ্য ভিড় প্রথম বিভাগ খেলায়। যেখানে কুড়ি খেলোয়াড়ের সংখ্যা দিয়ে দশটি দল ভালো করে গড়া চলে না, সেখানে বিশটা দলে খেলোয়াড় সরবরাহ আসবে কোথা থেকে? অতএব তিনটি বিগ্ ক্যাপিটাল টিম, দুটি ভারত সরকারের টিম, একটি আধা-সরকারী বিরাট প্রতিষ্ঠানের টিম এবং একটি ভারতের প্রধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের টিম—এই সাতটি টিম বাদ দিয়ে বাকি তেরটি টিম একান্তই দুর্বল, কোনমতে ঠেকা দিয়ে চলছে।

তা বলে এই সব চ্যাং-ব্যাং টিম যদি বড় টিমকে হারাবার বা ড্র খেলবার চেষ্টা করে, তবে ভক্ত সাধারণ তাদের মাথা ভেঙে দেবে তার প্রমাণ তারা দিয়েছে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে, সাময়িকভাবে সামান্য তিন মিনিটের জন্য হলেও, ২—১ গোলে এগিয়ে থাকার অপরাধে এরিয়ান্সকে ইষ্টক বৃষ্টিতে নাজেহাল করে, তাদের অধিনায়কের

মাথা কাটিয়েছে। আর যে রেফারীর মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেনাল্টিটি দেয় তার গায়ে থুতু দিয়ে তার মুখে-মাথায়-ঘাড়ে কিল-চড় কষিয়ে। সবটুকু উচ্ছৃঙ্খলতা অসদস্য দর্শকদের উপর চাপালে তাতে সত্যের অপলাপ হবে।

এর পরও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কেন ফুটবলের মান নেমে যাচ্ছে তাদের কিছু বলার নেই।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহ- [illegible] স্পোর্টিং-এর ফুটবল খরচ বছরে দু' লাখ থেকে এক লাখ টাকা। সে টাকা কিভাবে খরচ হয় ও কে পায়, [illegible] করবেন না। সবাই সব কিছু [illegible] এবং [illegible] সব সময় [illegible] হয় না। কিন্তু ব্যাপার [illegible] স্পষ্ট করে বলা চলে না, কারণ তাতে [illegible] দায়িত্ব এসে যায়। আর [illegible] কাজ প্রমাণ রেখে করবে এমন [illegible] ক্রীড়াবিদদের নেতৃত্বে চালিত [illegible] নয়।

[illegible] দল ইস্টার্ন [illegible] এবং আর। সেখানে উচ্চ- [illegible] ও সবগুণান্বিত দায়িত্বজ্ঞান- [illegible] সম্যক করে [illegible] এবং [illegible] সব দল [illegible], [illegible] লাখ [illegible] চাকরি পাচ্ছে শুধু [illegible] জন্য, [illegible] কাজের দায়িত্ব পালনের কোন বাধ্যবাধকতা না নিয়ে। তারা চাকরি পেয়ে যে খেলা খেলছে, তা দেখেও অনেক সময় আমাদের ফুটবলের ধ্যান-ধারণা জলাঞ্জলি দিতে হয়। এই খেলুক ওরা, জনসাধারণের অর্থে লালিত-পালিত ওই টিম দুটিরও আর্থিক সংগতি অপরিসীম। পোর্ট দল ও বাটা দলেরও সংগতি কম নয়। এদের সংগে অন্য প্রথম বিভাগ ক্লাবগুলির তুলনা করুন, তাদের কারও ক্লাবের বার্ষিক সদস্য চাঁদা আদায় হাজার টাকা পেরোয় কি না সন্দেহ। এই সব দলের সংগে আগের দলগুলির প্রতিযোগিতা যদি সমানে সমানে হয়, তবে টাটা-বিড়লার সংগে আরবি-র ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও সমানে সমানে গণ্য হতে পারে।

এককালে মোহনবাগান যখন আমাদের প্রাণের ঠাকুর ছিল, তখন তাদের লড়াই ছিল সব বাঘ-সিংহ মার্কা দলের সংগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হার স্বীকার করতে হত মোহনবাগানকে। তবে বাঘ-সিংহের সংগে লড়াই করে দু'-একটা আঘাত না দিয়ে কাবু হত না ওরা। সংগ্রামী মনোভাবের জন্যেই ছিল সার্থকতা। আর আজ যাঁরা রথীরা আই. এফ. এ, রেফারী, দলের খেলোয়াড় ও সমর্থক দর্শক এই চতুরঙ্গ বাহিনীতে সজ্জিত হয়ে খরগোশ শিকারে বার হচ্ছে, ব্যাগ বোঝাই করে আনছেন, বীরদের সার্থকতার উল্লাসে ফেটে পড়ছে ভক্তরা। ওদের মধ্যে কেউ [illegible] জ্ঞান করছে পেলে, কাউকে বা [illegible], কাউকে [illegible], কাউকে [illegible] এবং সেই বাতুল স্বপ্নে উৎকর্ষণ [illegible] লোকের অভাব হচ্ছে না।

কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে আই. এফ. এ দিনকে দিন প্রথম বিভাগ লীগে দল সংখ্যা বাড়াচ্ছে, তা নিয়ে দুষ্টজনে যাই বলুক, প্রকৃত মতলবটা আমি ঠাওরে উঠতে আজও পারি নি। এবং যে আই. এফ. এ সভাপতি তাঁর অধীন আই. এফ. এ-র সার্থকতার স্বীকৃতি দাবি করেন সব সময়, তাঁর কাছ থেকেও এ সম্পর্কে কোন ইংগিত পাওয়া যায় নি। আর সব কাঠের পুতুলের পিছনে যিনি দড়ি টেনে নাচাচ্ছেন, তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগই মেলে না। শুধু তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব আছে আরবি-র। আজকের এই শ্রেণীহীন সমাজ [illegible] প্রবল [illegible] দলগুলির মধ্যে শ্রেণীবিভাগ নিশ্চয়ই যুগচেতনা-বিরোধী। তাই এখন যা কর্তব্য, তা হল কলকাতা ফুটবল লীগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বিভাগ আর নয়। সবই প্রথম বিভাগ—তা আই. এফ. এ-র অন্তর্ভুক্ত ক্লাবসংখ্যা যতই হোক না কেন।

বর্তমানের কুড়িটি টিম নিয়ে গঠিত প্রথম বিভাগ লীগে আর একটি পুনর্গঠন প্রস্তাব আমার মনে ধরেছে। তা হল অর্থবলে বলীয়ান সাতটি টিম এক গ্রুপ বাকি সাতটি অপর গ্রুপ। প্রয়োজনমত ডাব্‌ল্ লেগ বা প্রতি দলের সংগে প্রতি দলের দু'বার করে খেলা এবং তার পর নকআউট ব্যবস্থায় চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ান নির্ধারণ। আর যদি রুশ পদ্ধতিতে প্রতি জেলার লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাও প্রবর্তন করা যেতে পারে, তবে বাংলা দেশের কলকাতা কেন্দ্রিক সভ্যতার মাথা কাটা যাবার মত ওই ব্যবস্থা আই. এফ. এ করবে না।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় যা গলদ্, ফুটবলেরও তাই। ফুটবলের দল-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে খেলোয়াড়ের চাহিদা বেড়েছে তার সরবরাহ ব্যবস্থা কিছু নেই। খালিপায়ের ফুটবলের যুগে মাঠ-ঘাট, গাঁ-গলি থেকে স্বভাব-নৈপুণ্যযুক্ত খেলোয়াড় তবু খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু বুটবলের স্বভাব-নৈপুণ্য দিয়ে কিছু হবে না, চাই সুশিক্ষণ ব্যবস্থা। সেটি কোথায়? এমন কি, মেওয়ালাল কর্তৃক স্কুল এবং ফুটবলের ৭০।৮০টি ছেলের সবাই পূর্ণ শিক্ষা পেলেও চাহিদার সামান্য এক অংশও তাতে মিটবে না। দেশে কোথাও ফুটবলের পাঠশালা-স্কুল নেই। একমাত্র কলকাতা ফুটবলের কাছে ও প্রথম বিভাগ লীগের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ-সেখানকার উপযুক্ত খেলোয়াড় আসবে কোথা থেকে?

আমরা সারা ভারত সেঁচে অজস্র মুদ্রা ব্যয়ে। এককালে [illegible] খুঁজেপেতে আনার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতো রাজস্থান। বাইরের খেলোয়াড়

জেনে খেলাবার বদনামের অধিকারী হত তারা। আর পরের বছর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ভালোমানুষের মত স্থানীয় খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করতো তাদের ভাঙিয়ে এনে। রাজস্থান ক্লাব পরিচালকের বুদ্ধি খুলে গেছে। তারা এখন নেহাৎ কলকাতার ছেলেদেরই নিয়ে দল গড়ছে। খুঁজেপেতে আনছে সব চেয়ে বেশি মহমেডান স্পোর্টিং। আর আনবেই বা কোথা থেকে? কলকাতা ফুটবলের দৈন্যের প্রভাবে আজ সারা ভারতজোড়া দৈন্য। তাই মহাবীর প্রসাদ, চন্দন গুপ্ত, শ্যাম থাপাই কলকাতায় আমদানি করা হয়।

কলকাতা ফুটবলের অবনতির প্রধান কারণ, অবনতির জন্য কারো মনে গ্লানি নেই। যতদিন সরকারী বাতিকে টিঙ্কু আব্দুর রহমানের মারডেকা প্রতিযোগিতায় দল পাঠানো চলবে, ততদিন ইণ্ডিয়া কালার নিয়ে খেলোয়াড়দের গ্লামার পাওয়ার সুযোগ থাকবে, কর্তাব্যক্তিদের বিদেশ সফর এবং তার আনুষঙ্গিক সুবিধাগুলি লাভের অন্তরায় ঘটবে না।

আর কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার কয়েক লক্ষ ফুটবল পাগল তারা ফুটবলের ধারও ধারে না। শুধু মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল আর সম্প্রদায় বিশেষের স্পোর্টিং। এরা যদি লীগ, শীল্ড, ডুরাণ্ড, রোভার্স প্রভৃতি জেতে থাকে এবং ওদের অগণিত অতি-উৎসাহী সমর্থকদের মতে তাতেই ভারতীয় ফুটবল মহীয়ান। তাই মোহনবাগানের পূর্ব আফ্রিকা সফরে সংবাদপত্রগুলি টেস্ট ম্যাচের উল্লেখ

করেছিল। দুর্বল বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে খেলে খেলে ভোঁতামেরে যাওয়া মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়, সে খেলায় যে হঠাৎ চমক জেগে উঠতে পারে না, তা জেনে এবং বুঝেও সেই খেলা দেখার জন্য অগণিত বুদ্ধিমান লোক—যারা এমনিতে ক্লাব-পাগল বা ফুটবল-পাগল নয়—তারাও ক্ষেপে যায়। আর এই দুটি দলের সমর্থকবৃন্দের প্রেরণা যে পূর্ব-বঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ মনোভাব, আজকের দিনে সেই অস্বাস্থ্যকর চেতনা অবলুপ্তির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিরাও এই উপলক্ষে সেই চেতনাতেই উদ্বুদ্ধ হন।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের স্থানীয় চেতনা এবং মহমেডান স্পোর্টিং-এর পিছনকার সাম্প্রদায়িক চেতনা কলকাতা ফুটবলের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। আর যেখানে সারা ভারতের সর্বক্ষেত্রে অস্তি-নাস্তি বৈষম্য বিদূরণের প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভূত, সেখানে কলকাতা ফুটবলে অস্তি-নাস্তি বিরোধ দিন দিন বাড়ছেই শুধু নয়, বাড়বার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া হচ্ছে—চেতন, অচেতন ও অবচেতনভাবে।

আজকের বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজ যারা টাটা বিড়লা ধ্বংস হোক, সর্বহারার রাজ চাই, মজুতদারি চলবে না, বড়লোকের চামড়া দিয়ে গরীবলোকে জুতো পরবে প্রভৃতি স্লোগান দেয়, হয়তো মনে-প্রাণে সে দাবি সমর্থনও করে, তারাও কিন্তু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যে ফুটবলে সবগ্রাসী টাটা-বিড়লা তা উপলব্ধি করে না এবং ওই দুদল যখন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি খেলোয়াড় সংগ্রহ করে বসিয়ে রাখে, তাকেও মজুতদারি বলে ধিক্কার না দিয়ে বরং মনের খুশি-ই প্রকাশ করে।

কলকাতা ফুটবলের আসল গলদ এই সামন্ততান্ত্রিক দল দুটিকে উঁচুতে ধরে রাখার একটা বিস্ময়কর হৃদয়াবেগ। যা। কাজে কর্মসংস্থানমূলক দল, যথা দুটি রেল দল, পোর্ট দল, বাটা পর্যন্ত মাথা তুলতে পারছে না। আর এখানকার ফুটবল পরিচালন সংস্থার এ্যাভারি ব্রাণ্ডেজী মনোভাব এবং অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনকে তোয়াজ করার প্রয়াস। অর্থাৎ লীগে কর্মসংস্থানমূলক ক্লাব যারা খেলবে, তাদের বলতে হবে ওপেন ক্লাব। রেল, বাটা, পোর্ট সব ওপেন ক্লাব। এই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রয়াসে ফুটবল গাছের ফলও পাচ্ছে না, তলারটাও হারাচ্ছে।

সব দিকের [illegible]চেতনাবিরোধী ব্যবস্থায় কলকাতা ফুটবল মরছে, আর সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলেরও নাভিশ্বাস উঠছে এবং এদের মৃত্যু ত্বরান্বিত করছে সেবকদেরই নিজ নিজ স্বার্থে প্রণোদিত ফলসেবা, আর ফুটবল ভক্ত জনগণের চেতনা ও চিন্তাধারার গোঁজামিল।

তা মরছে মরুক। হু কেয়ার্স? দ্য শো ইজ্ গোয়িং অন অ্যাণ্ড এ্যার্ট, বিগ্ প্রফিট্স্। উত্তেজনাপাগল শহুরে মানুষও তার উত্তেজনার খোরাক পেয়ে বিচার-বুদ্ধি হারিয়ে বসে আছে।

কিন্তু ফুটবলের সমস্যাকে যদি ফুটবলে সীমাবদ্ধ মনে করে নিশ্চিন্ত থাকি, ভাবি সাধারণ মানুষের মনের স্বাভাবিক উত্তাপ উদ্গিরণ করে আসার জায়গা ফুটবল মাঠ, যার ফলে আবাস পাড়াগুলি কিছুটা নিরাপদ, তাহলে মারাত্মক ভুল করবো।

বড় ফুটবল ম্যাচ সামলাতে যে পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করতে হয়, তাতে হয় পাড়াকে পাড়া অরক্ষিত পড়ে থাকে, নয়তো বা ফুটবলের প্রয়োজনে পুলিশের বাস-বরাদ্দ বাড়াতে হয়। কোনটাই সমাজের পক্ষে উদাসীন থাকার প্রসঙ্গ নয়। ফুটবল নেশার প্রসার যেভাবে বাড়ছে, কিশোর ও বালাবিলা সমাজে প্রতিদিন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে যে সব মোহনবাগান বা ইস্ট-বেঙ্গলের বড় খেলায় গতবার পর্যন্ত আসন সংখ্যা ভর্তি হয় নি, এবার তাতে টিকেট না পেয়ে লোক ফিরে যাচ্ছে। ক' বছরের মধ্যে ইডেন গার্ডেনস-এও স্থান সংকুলান না হবার আশংকা। মাঠের উত্তেজনা সামান্যেই ফেটে পড়ে এবং অনেকদূর পর্যন্ত সংক্রামিত হয়ে পড়ে। লাইনে মানুষ মরা টেস্ট ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন মনে করারও কারণ নেই। এ যুগের পুলিশ কঠোর হতে পারে না। রাজিও হয় না, পুলিশী ডাণ্ডাকে ভয়ও করে না এ যুগে কেউ, পুলিশই বরং জনতাকে ভয় করে।

সব মিলিয়ে নিত্য খারাপ হওয়া আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় ফুটবল অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। ফুটবল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েও কোন্ সমাজসচেতন ব্যক্তি ফুটবলের প্রভাবকে অবজ্ঞা করতে পারেন?
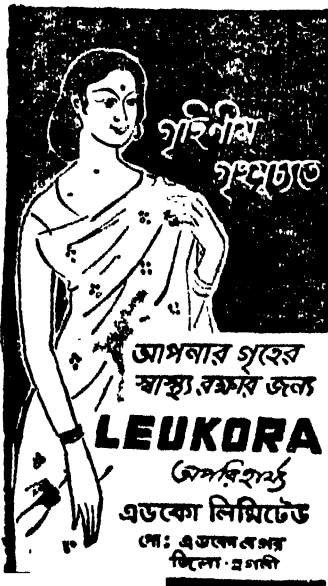
আজ একটা প্রশ্ন একই সঙ্গে অনেকের মনে ঘোরাফেরা করছে। চায়ের টেবিলে, খেলার মাঠে কিম্বা যে কোন আলোচনা সভায় এই প্রশ্নটা উঠেছে। বিষয়টা জটিল না হলেও এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেন সোজাসুজি, কেউ দেন ঘুরিয়ে, কেউ বা আবার নাক বেড় দিয়ে কান ধরেন।

মেক্সিকোর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর এবারের মতো শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গেই ফুরোল জুলে-রিমে কাপের আয়ু। বিশ্বকাপের আসরে জুলে-রিমেকে আর দেখা যাবে না। বিশ্বকাপের নিয়ম ছিল যদি কোন দেশ তিন বার বিশ্ববিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারে, তাহলে জুলে-রিমে কাপটা তারা পেয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।

এবারের বিশ্বকাপের ফাইন্যালে যখন ব্রেজিল আর ইটালী উঠলো তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, জুলে-রিমের আয়ু এতোদিনে ফুরোল। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত—এই দীর্ঘ ৪০ বছরের শিরোনামায় থাকা সোনার পরী এতোদিন পরে সত্যি সত্যিই উড়ে গেল।

উড়ে গিয়ে চিরদিনের মতো আশ্রয় গ্রহণ করলো ব্রেজিলে। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার জুলে-রিমে কাপটির কাহিনী স্থানলাভ করলো ইতিহাসের পাতায়।

জুলে-রিমে কাপ সম্বন্ধে আমরা যেমন জানতে চাই, তেমনি জানতে চাই খেলেন যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধেও। আর তারপরই সেই প্রশ্নটি মনে আসে। মনে হয় ওদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে কি এমন যাদু আছে, কি এমন মহা ঐশ্বর্য আছে যার জন্যে ওঁরা অমন অবিশ্বাস্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী? আর সব শেষে শুধু জানতে ইচ্ছে করবে, কেন ওঁদের মতো বড় হতে, ওঁদের মতো নিপুণ হতে পারেন না আমাদের খেলোয়াড়রা? ওঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ—তাহলে কেন আমরা পারি না ওঁদের মতো হতে? আসল পার্থক্যটা কোথায়?

অত্যন্ত সহজ, সরল লাগলেও বিষয়টা কিম্বা প্রশ্নটা কিন্তু বেশ জটিল। এই জটিলতার জট ছাড়াতে আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা এক একজনে এক এক কথা বলেন। কেউ বলেন, ঐ সব দেশের খেলোয়াড়দের মতো আমাদের শারীরিক পটুতা নেই, তাই। আবার কারো মতে, ওসব দেশের খেলোয়াড়রা যে সব সুযোগ-সুবিধে পান আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা তা কল্পনাও করতে পারেন না। সুতরাং...। আর একদলের মতে, বিদেশে উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ দেবার যে ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে তা নেই। এ ছাড়া কেউ তোলেন আবহাওয়ার প্রশ্ন, কেউ তোলেন খাদ্য এবং পুষ্টি-অপুষ্টির বিষয়ে প্রশ্ন।

এর সবগুলো না হলেও বেশির ভাগই সত্যি। কিন্তু এগুলোই কি সব? চিন্তাভাবনার আর কি কিছু নেই? নাকি আমরা কোনদিন কোনদিক দিয়ে ওঁদের মতো হতে পারবো না এই সান্ত্বনা নিয়ে বসে থাকলেই চলবে? দিন-কাল বদলে গেছে, সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে আমরা ঠিকমতো চলতে পারছি কই?

কিন্তু এভাবেও তো আর বসে থাকা চলে না। আজ তাই সময় এসেছে চিন্তা করার। নতুনভাবে সব কিছু ভেবে দেখার সময় এসেছে। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সব-আঙ্গিককে আজ যা করার—তাই করতে হবে।

ওঁদের মতো আমরা কোন দিন হতে পারবো না—এই ধারণা নিয়ে বসে থাকার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? হতে পারবো না তো পারবো না; কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি?

কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে, সেই চেষ্টা করবে কে? নতুনভাবে, নতুন আঙ্গিকে চিন্তাই বা করবে কে?

অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হলো, যাঁদের ওপরে আমাদের দেশের খেলাধুলোর ভার, যাঁরা আমাদের দেশের ক্রীড়াজগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতা তাঁদের এই সব বিষয় ভাববার, চিন্তা করার কিম্বা সত্যি সত্যিই নতুন কিছু করার মতো সময় কই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, এঁরা খেলাধুলোকে আদৌ ভালোবাসেন কিনা?

তা না হলে ভাবতে অবাক লাগে, যে সমস্ত দেশ ভারতের অনেকগুলি রাজ্যের চেয়ে ছোট, আর লোকসংখ্যাও ভারতের রাজ্যগুলোর চেয়ে কম—তাঁরাও কি করে ফুটবল খেলায় এতো উন্নতি করে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং সেই দেশের খেলোয়াড়রা তাঁদের খেলার চকিত চমকে সকলকে চমৎকৃত করে দেন?

বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। মাত্র ক'বছর আগে বার্মা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশগুলোকে আমরা খেলায় হারাতাম। কিন্তু আজ তাদের হাতে আমাদের গো-হারা হারতে হয়। অর্থাৎ ফুটবল খেলায় এবং খেলাধুলার অন্যান্য বিষয়ে যখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ উন্নতি করছে তখন আমরা দিনের পর দিন শুধু পিছিয়েই পড়ছি।

সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো, পিছিয়ে যে আমরা পড়ছি সে কথা জানা থাক; সত্ত্বেও আমরা তার জন্যে এতোটুকুও লজ্জিত নই। আমাদের ক্রীড়াজগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা কেমন বুক ফুলিয়ে হাঁটেন, খেলোয়াড়রা খেলা ভালোভাবে শেখার আগেই জামার কলার তুলে হিরো বনে যান।

ফলে আসলে যা দরকার সেই খেলা শেখাটা আর হয়ে ওঠে না। ভালো খেলোয়াড় হতে হলে যে আন্তরিকতা দরকার, যে পরিশ্রম প্রয়োজন, আজ কি তা আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে বা তার পরিচয় পাওয়া যায়?

একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, পেলে একদিনে পেলে হন নি, ইউসেবিও, রিভা, ববি মুর, মুলার কিম্বা অন্য কেউ আজকের এই শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে আসতে প্রচুর পরিশ্রমে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন দিনের পর দিন ধরে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁরা পুরোদমে চালিয়েছেন

অনুশীলন। প্রচণ্ড পরিশ্রমের সঙ্গে হাসি-মুখে মেনে নিয়েছেন সব দুঃখ, সব কষ্ট —করেছেন প্রয়োজনীয় সমস্ত ত্যাগ স্বীকার।

আমাদের দেশের কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে কি এই পরিশ্রম, কিম্বা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়? শুধু তাই নয়— ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে আজ প্রত্যেককে ভালো জিমন্যাস্টও হতে হবে। জিমন্যাস্টিক ছাড়া এ যুগে কিছুতেই ভালো ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের খেলোয়াড়রা তাই এইদিকে নজর দেন। কিন্তু আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা......?

পরিশেষে আর একটা কথা বলার প্রয়োজন। ফুটবল খেলা কিম্বা খেলা-ধুলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে আজ সবার আগে এগিয়ে আসার দরকার সরকারের।

স্কুল থেকে বাছাই করে তাদের গড়ে-পিঠে তৈরি করাতে হবে সরকারী দায়িত্বে। আমাদের মনে হয়, দেরাদুনের সৈনিক-স্কুলের মতো [illegible] খোলা দরকার আজ সব থেকে বেশি। তারপর সমস্ত ভারত থেকে বেছে ছাত্র এনে সৈনিকস্কুলের মতো লেখাপড়ার সঙ্গে প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা বিভাগের খেলাধুলার কোচিং করাতে হবে। ভালো খেলোয়াড় তাহলে সহজেই তৈরি হবে। তবে তাদের চাকরী-বাকরী থেকে সব কিছুর দায়িত্বই নিতে হবে সরকারকে।

আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে খেলাধুলার উন্নতির জন্যে খেলাধুলাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয় এবং খেলোয়াড়দের সব দায়িত্ব নেন সে দেশের সরকারই। তাই মনে হয়, আজ এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের মান বাড়াতে এবং ভারতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শুধু স্পোর্টস কাউন্সিল আর পাতিয়ালার কোচিং ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থা করে যে কিছু হবে না, সে কথা আজ আমরা সকলেই বুঝে গেছি। তাই আমরা চাই, এখনি এমন একটা কিছু করা হোক যা সত্যি সত্যিই একটা কিছু কাজের জিনিস হয়।

যদি সৈনিকস্কুলের মতো কড়া নিয়মশৃঙ্খলার [illegible] হয়তো [illegible] প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনায় নানা দিকের নানা [illegible] হয়ে যাবে।

তারপর বলা যায় না, হয় তো একদিন ভারত ও বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঐতিহাসিক সাফল্যের নজিরে ভারতীয় তথা বিশ্ব ফুট-বলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচনা করে বসবে!

কিন্তু সে দিন কি সত্যিই কোনদিন আসবে............!!

হাতে নকল নাড়ু......
[২৯৩ পৃষ্ঠার পর]

শোকে জীবন্মৃতপ্রায়! কিন্তু তিনি কি ভেবে দেখেন কোন্ সাচ্চা বস্তুর প্রত্যাশায় তিনি মাঠে-ঘাটে তাঁর বার্ধক্য জীবনশক্তিকে উজাড় করে দিচ্ছেন?

যে লীগের অনেকখানিই ঝোঁক সেই লীগের জন্যেই তাঁদের দরদ উথলে পড়ছে! যে যে দলের জন্যে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত, প্রায় সেই সেই দলের সঙ্গতি বিরাট। পয়সা অঢেল। অপেশাদারী ফুটবলেও সেই পয়সা গোপনে ছড়িয়ে হিল্লি-দিল্লী থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে সেই সব দল শক্তি সঞ্চয় করে। তারা হারাবে কাদের? অথবা কাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে তারা লীগ বা শীল্ড পায়? যারা অশক্ত, অক্ষম —ক্রীড়াগত দক্ষতা এবং আর্থিক মূলধন, কোনো কিছুর সঙ্গতিই যাদের নেই খেলা তো তাদেরই সঙ্গে। এই অসম প্রতি-যোগিতায় জয়ের মূল্যই বা কতোটুকু? জয়ের যথার্থতা যে কি, সবাই যদি শুধু সেইটুকুই উপলব্ধি করতে পারতো তাহলে সামান্যকে অসামান্য জ্ঞান করার লজ্জা থেকে কলকাতার ফুটবলের মুক্তি মিলতো অনেকদিন।

এক এক পক্ষ দল ভাঙিয়ে নিজেদের দল গড়তে লক্ষ বা লক্ষাধিক টাকা খরচ করছে। বাকীদের সে মুরোদ নেই। তার ওপর এবার আবার বিশটি প্রতি-যোগীর মধ্যে সিনিয়র বিভাগের খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরোয়া মানের পরি-প্রেক্ষিতেও সিনিয়র বিভাগে খেলার যোগ্যতা দশটি দলের আছে কি না? নেই। কোনো সন্দেহই নেই। অথচ সেই অধিকার কুড়িটি দলের জন্যে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। মুড়ি ও মিছরিকে একনজরে দেখার এই যে আয়োজন, তাতে কি আর খেলার মান ওপরে ওঠে? ওঠে না, উঠতে যে পারে না তা সবাই জানে। তবু মাঝে মাঝে সভা-সমিতি, কর্মকর্তাদের বৈঠকে, প্রশিক্ষকদের আলোচনা সভায় মানের কান্না কাঁদা হয়। হায়! কান্না ছাড়া আমাদের আর পুঁজিই বা আছে কি

বৈঠকী আড্ডায় স্টেডিয়ামের অভাবের জন্যে, আর্থিক অনটনের জন্যে গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না বলে আক্ষেপ করা হয়। কিন্তু কেউ কি বলে যে প্রকৃত ঘাটতি কোথায়? ঘাটতি তো প্রশাসনিক চেতনায়। প্রশাসন আঁটোসাঁটো হলে, তথিরে বিগলিতচিত্ত না হয়ে প্রশাসকেরা যদি লীগ ফুটবলের অবলুপ্তি ঘটাতে এবং প্রতিযোগী-সংখ্যা সীমিত করে দিতে পারেন, তাহলে সাচ্চা প্রতিযোগিতার কল্যাণে খেলার মানোন্নয়ন ঘটতে বাধ্য। উপরতলায় মাঠে সিনিয়র মহলে অযোগ্য-দের ঠাঁই হবে না—এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার ফুটবলের প্রশাসকেরা যদি ওই মহলের প্রতিযোগীর সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সিনিয়রদের ক্রীড়া-কেন্দ্রে আগাছার উৎপাত কমে। এই তথ্যের নাড়ির খবর জানতে তীক্ষ্ণ, শাণিত বুদ্ধিরও দরকার পড়ে না। চেনা প্রশাসকের ঘটে যেটুকু বুদ্ধি রয়েছে, তাতেই কাজ হতে পারে। কিন্তু......

হ্যাঁ, ওই কিন্তুই বাদ সেধেছে যে! অনেক প্রশাসকের নিজের দল রয়েছে। সেই সব দলের যোগ্যতা, দক্ষতা না থাকলেও তাঁরা হেন মুরুব্বি থাকতে নেমে যাওয়া চলে কি করে! নামলে প্রশাসকদেরই 'প্রেস্টিজ' ঢিলে হয়ে যায় না কি! অতএব প্রশাসকগোষ্ঠীতে ও'রা থাকতে ও'দের বা ও'দেরই ভাই-বেরাদারদের দলগুলিকে নিচের মহলে নামিয়ে দেওয়া যায় না। যাচ্ছেও না। কাজেই সিনিয়ার মহলের দলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বিশে এসে দাঁড়িয়েছে। বছর কয়েকের মধ্যে বিশ চল্লিশে ছাড়িয়ে পড়তে চাইলেই বা রুখবে কে?

লীগ ফুটবল বন্ধ করার প্রস্তাব আগেই তুলেছি। শুনে কেউ যদি বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে প্রস্তাবটির দিকে তাকান, তাহলেও বলি, ফাঁক-ফাঁকির রাস্তা আলগা রাখলেই কি চিরদিন সকলকে বোকা বানানো যাবে? কলকাতার ফুটবল লীগ যে সাচ্চা প্রতিযোগিতা নয়, তা জেনেও একটি নকল অনুষ্ঠানের গায়ে সাচ্চা প্রতিযোগিতার নামাবলী চড়াবার দরকার কি? আবার বলি, নকল নাড়ু হাতে নিয়ে কে কাকে ঠকাচ্ছে? নিজেকে নয় তো!

তবে ঠকতেই যাঁদের আনন্দ, লোক ঠকানো যাঁদের নেশা ও পেশা, তাঁরাই আজ কলকাতার ফুটবল মাঠ ছেয়ে ফেলে-ছেন এবং তাঁদেরই অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের অন্যান্য খেলার আসরেও প্রসারিত হচ্ছে। অতএব, যে কালের মধ্যে আমরা মাথা গুঁজে রইলাম এবং যে যুগকে আমরা গড়লাম নিজেদের হাতে, সেই যুগ সম্পর্কে আমাদের গর্ব করার কিছুই নেই। উত্তরকালের জিজ্ঞাসুদের জবাব দেওয়ার কৈফিয়তও আমাদের হাতে নেই।

আমাদের ভাগ্যকে আমরা নিজেরাই হিংসা করতে পারি না! পারি কি?

এক নজরে বিশ্বকাপের ফলাফল • • •

গ্রুপ ১ (মেক্সিকো সিটি)

মে ৩১—মেক্সিকো (০) রাশিয়া (০)
জুন ৩—বেলজিয়াম (৩) এল সাালভাডোর (০)
ভানসোয়র ২, ল্যাম্বার্ট (পেনাল্টি)
জুন ৬—রাশিয়া (৪) বেলজিয়াম (১)
বাইশোভেটস ২, —ল্যাম্বার্ট
আসাটিয়ানি ও খেমলেনিটিস্কি
জুন ৭—মেক্সিকো (৪) এল স্যালভাডোর (০)
ভ্যালভেডিয়া ২, ফ্রাগোসা ও বাস্তুওয়েন
জুন ১০—রাশিয়া (২) এল স্যালভাডোর (০)
বাইশোভেটস ও মুনতিয়ান
জুন ১১—মেক্সিকো (১) বেলজিয়াম (০)
পেনা (পেনাল্টি)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
রাশিয়া	৩	২	১	০	৬	১	৫
মেক্সিকো	৩	২	১	০	৫	০	৫
বেলজিয়াম	৩	১	০	২	৪	৫	২
এল স্যালভাডোর	৩	০	০	৩	০	৯	০

টসে রাশিয়ার প্রথম স্থান লাভ

গ্রুপ ২ (পুয়েব্লাও টোলোকা)

জুন ২—উরুগুয়ে (২) ইজরায়েল (০)
ম্যানেরিও, মুজিকা
জুন ৩—ইতালী (১) সুইডেন (০)
দোমিংঘিনি
জুন ৬ উরুগুয়ে (০) ইতালী (০)
ইজরায়েল (১) সুইডেন (১)
স্পিগলার তারেসন
জুন ১০—সুইডেন (১) উরুগুয়ে (০)
গ্রান
জুন ১১—ইতালী (০) ইজরায়েল (০)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
ইতালী	৩	১	২	০	১	০	৪
উরুগুয়ে	৩	১	১	১	২	১	৩
সুইডেন	৩	১	১	১	২	২	৩
ইজরায়েল	৩	০	২	১	১	৩	২

গ্রুপ ৩ (গুয়াদালাজারা)

জুন ২—ইংলণ্ড (১) রুমানিয়া (০)
হার্স্ট
জুন ৩—ব্রাজিল (৪) চেকোশ্লাভাকিয়া (১)
রিভালিনো, পেলে, পেত্রাস
জিয়ানজিনহো ২
জুন ৬—রুমানিয়া (২) চেকোশ্লাভাকিয়া (১)
নেস্তু ডুমিত্রাসে পেত্রাস
জুন ৭—ব্রাজিল (১) ইংলণ্ড (০)
জেয়ারজিনহো
জুন ১০—ব্রাজিল (৩) রুমানিয়া (২)
পেলে ২, জেয়ারজিনহো ডুমিত্রাসে ও এমারিগ
জুন ১১—ইংলণ্ড (১) চেকোশ্লাভাকিয়া
ক্লার্ক (পেনাল্টি)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
ব্রাজিল	৩	৩	০	০	৮	৩	৬
ইংলণ্ড	৩	২	০	১	২	১	৪
রুমানিয়া	৩	১	০	২	৪	৫	২
চেকোশ্লাভাকিয়া	৩	০	০	৩	২	৭	০

গ্রুপ ৪ (লিওন)

জুন ২—পেরু (৩) বুলগেরিয়া (২)
গ্যালর্ডো, চুম্পিটেড ডারমেণ্ড
ও কুবিলাস জিবেভ ও বনেভ
জুন ৩—পশ্চিম জার্মানী (২) মরক্কো (১)
সিলার, মুলার মঃ হডিমন
জুন ৬—পেরু (৩) মরক্কো (০)
কুবিলাস ২, চালে
জুন ৭—পশ্চিম জার্মানী (৫) বুলগেরিয়া (২)
লিবুডা, মুলার ৩ ও নিকলভ ও
সিলার কোলেভ
জুন ১০—পশ্চিম জার্মানী (৩) পেরু (১)
মুলার ৩ কুবিলাস
জুন ১১—মরক্কো (১) বুলগেরিয়া (১)

	খে	জ	ড্র	প	স্ব	বি	প
পঃ জার্মানী	৩	৩	০	০	১০	৪	৬
পেরু	৩	২	০	১	৭	৫	৪
বুলগেরিয়া	৩	০	১	২	৫	৯	১
মরক্কো	৩	০	১	২	২	৬	১

কোয়ার্টার ফাইনাল, জুন ১৪

(মেক্সিকো সিটি)
রাশিয়া (০) উরুগুয়ে (১)
এসপারাগো
অতিরিক্ত সময়ে

(টোলোকা)
ইতালী (৪) মেক্সিকো (১)
জেসিংঘিনি, গঞ্জালেস
রিভা ২,
রিভেরা

(গুয়াদালাজারা)
ব্রাজিল (৪) পেরু (২)
রিভালিনো, গ্যালর্ডো,
টোসটাও ২, কুবিলাস
জিয়ারজিনহো

(লিওন)
পশ্চিম জার্মানী (৩) ইংলণ্ড (২)
বেকেনবেয়ার, মুলারি,
সিলার, পিটার্স
মুলার
অতিরিক্ত সময়ে

সেমি-ফাইনাল, জুন ১৭

(গুয়াদালাজারা)
ব্রাজিল (৪) উরুগুয়ে (১)
ক্লোডোয়ালডো, কিউবিলা
জিয়ারজিনহো, রিভেলিনো

(মেক্সিকো সিটি)
ইতালী (৪) পশ্চিম জার্মানী (৩)
বনিমসেগনা, বর্গালিচ, শেলিঞ্জার,
রিভা, রিভেরা মুলার ২ ওভার্থ

ফাইনাল, জুন ২১

(মেক্সিকো সিটি)
ব্রাজিল (৪) ইতালী (১)
পেলে, গ্যারসন, বেনিনসেগনা
জিয়ারজিনহো, আলবার্টো

তৃতীয় স্থান, জুন ২০

(মেক্সিকো সিটি)
পশ্চিম জার্মানী (১) উরুগুয়ে (০)
ওভার্থ

সেরা গোলদাতা

মুলার (পঃ জার্মানী)---	১০
জিয়ারজিনহো (ব্রাজিল)---	৭
কুবিলাস (পেরু)---	৫
বাইশোভেটস্ (রাশিয়া)---	৪
পেলে (ব্রাজিল)---	৪
রিভালিনো (ইতালী)---	৩
সিলার (পঃ জার্মানী)---	৩
রিভা (ইতালী) ---	৩

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বেলজিয়ামের গোলরক্ষককে রাশিয়ার জনৈক খেলোয়াড়ের মাথার উপর দিয়ে বলটিকে বিপন্মুক্ত করতে দেখা যাচ্ছে। এই ম্যাচে রাশিয়া ৪-১ গোলে জয়লাভ করে।
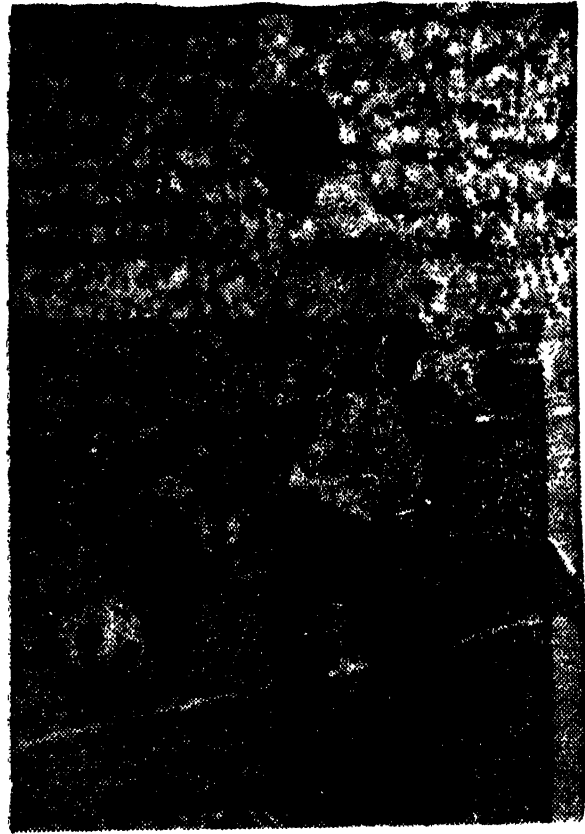
বিশ্ব ফুটবলের মহানায়ক ফুটবলের মহা অঙ্গন থেকে সোনায় মোড়া "জুলে রিমে" কাপ হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন—এ এক মস্ত সংবাদ। এডসন এ্যারান্টেসদু ন্যাসিমেণ্টো বিশ্ব ফুটবল অঙ্গনে যিনি পেলে বা 'মানগড' অথবা ব্ল্যাক পার্ল কিংবা ব্ল্যাক মীজার নামে পরিচিত, তিনিই হলেন এই ভাগ্যবান মহানায়ক।

১৯৫৮, '৬২ এবং '৭০—এই তিনবার 'জুলে রিমে' জয়ের দৌলতে ব্রাজিল চিরকালের জন্য ঐ সোনায় মোড়া বিশ্বকাপটি ঘরে নিয়ে গেল। সেই সাথে বিশ্বকাপের নামও গেল বদলে—"জুলে রিমে" থেকে "ফিফা কাপ"। এই ফিফাই হ'ল বিশ্ব-ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিচালক এবং বিশ্বের প্রাচীনতম সংগঠন।

সেই ফিফার নেতৃত্বেই মেক্সিকোতে বসেছিল দীর্ঘ একমাস দিনের বিশ্ব-ফুটবল মেলা। গোটা বিশ্বের আগ্রহানুকূল ক্রীড়ানুরাগী সন্ধানী দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করছিল এবারের আসরে ফলাফলের জন্য। নিঃসন্দেহে এবারের হট ফেভারিট ছিল গতবারের বিজয়ী স্যর আলফ র‍্যামসের নেতৃত্বে গঠিত ইংল্যান্ড দল। কিন্তু বিশ্বকাপের খেলা শুরুর সাথে সাথেই ইংল্যান্ড তার সমর্থকদের চিন্তায় ফেলেছিল। বলতে বাধা নেই মেক্সিকোর খেলা অঙ্গিনায় ইংল্যান্ড এমন কোন ভূমিকা নেয় নি, যাতে ওদের এবারের বিশ্বকাপের সম্ভাব্য বিজয়ী বলে ঐ মুহূর্তে ধরা যেত। কোনক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ের গণ্ডী পেরিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও এখান থেকেই বিদায় নিয়ে তাকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ২—০ গোলে পেছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ৩—২ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফিরে এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, 'মেক্সিকো ওয়েম্বলী নয়'। অনেকে তো একথাও বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের কোয়ার্টার

একটি ঘোষণা

ভারত ডিঠি' ভার্কবজকৌ দরুণ বিলম্বে এসে পৌঁছান এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

ফাইনালে ওঠাও উচিত হয় নি। ইংল্যান্ড হেরে যাওয়াতে ওদের কথা হ'ল—"কলঙ্কিত নায়কের বিদায়িত নয়।" ইংল্যান্ড ছাড়া আর যারা সেখানেটি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল বিশ্বকাপ জয়ের পথে, তারা হ'ল—পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, রাশিয়া, উরুগুয়ে, পেরু, মেক্সিকো এবং ব্রাজিল। এদের মধ্যে 'মেক্সিকো' অভিযানের আসরে তেমন কোন অবদান ঘটাতে পারে নি। পেরুকে যোগ্য দল ব্রাজিলের কাছে হেরে গিয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে, তবুও ওদের ক্রীড়াশৈলীর যে নিদর্শন মেক্সিকোর দর্শকরা দেখেছে, তা বহুদিন ওদের মনে থাকবে। রাশিয়ার দুর্ভাগ্য—এক বিতর্কিত গোলে হেরে গিয়ে হঠে আসতে হয়েছে। হঠে আসতে হয়েছে উরুগুয়েকেও ব্রাজিলের হাতে হেরে। তবে জার্মানীর পরাজয় রীতিমত বিস্ময়কর এবং দুর্ভাগ্যজনক। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় জার্মানী ৪—৩ গোলে হেরে গেছে ইতালীর কাছে। সেলিঙ্গার, শিলার, বেকেনবাওয়ার এবং জার্ড মুলারকে নিয়ে যে শক্ত বনেদ গড়েছিল জার্মানী, তা শেষ মুহূর্তে ধরে রাখতে না পারার দরুণ বিশ্বকাপ জয়ের আশা হারাতে হ'ল। তবে এবারে বিশ্বকাপে এই ইতালী-পশ্চিম জার্মানীর খেলাই নাকি অভিজ্ঞ সমালোচকদের মতে শ্রেষ্ঠ খেলা।

তবে পেলে ও তাঁর সতীর্থরা—জাইরজিনহো, টোসটাও, রিভালিনো এবং দলপতি এ্যালবার্টো আজটেক স্টেডিয়ামের লাখো লোকের সামনে দ্বিজ-বিজেতীর ইতালীকে বিশ্বকাপ জয়ের মুখ থেকে ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্ব-ফুটবলের যে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন—তা হ'ল তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের দুর্লভ সম্মান।

গত বিশ্বকাপে গায়ের জোরে খেলার দরুণ ব্রাজিল প্রাথমিক পর্যায়ের গণ্ডী পেরোতে পারে নি। সাত রাজার ধন কালো মাণিক 'পেলে'-কে মেরে অকেজো করে দিয়েছিল ও-আসরে। মেক্সিকোর নির্বিঘ্ন ভূমে ব্রাজিলের ট্রেসকোরাকোম সন্তান—রোজে মেরীর স্বামী পেলে এবার তার উপযুক্ত বদলা নিয়েছেন, সেই সাথে একথাও প্রমাণ করেছেন, যে, ফুটবল যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন থেকে সৌন্দর্যকে ধরে রাখবে, ততক্ষণ পেলে ও ব্রাজিল বিশ্বসেরা। বিজ্ঞানভিত্তিক ফুটবলে 'পাওয়ার' শব্দটার অপপ্রয়োগেই ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ ব্রাজিলের হাতছাড়া হয়েছিল।

তিন-তিনটে জুলে রিমের আসর মাৎ করে সেই সাথে হাজার গোলের মুকুট চড়িয়ে বিশ্ব-ফুটবলের কালো সম্রাট বিশ্বকাপ আসর থেকে বিদায় নিচ্ছেন—মেক্সিকোর এটাই হ'ল সবচাইতে দুঃসংবাদ তবে আনন্দ এইখানেই যে, বিশ্ব-ফুটবল সম্রাট ১৪ বছর ফুটবল সৈনিক জীবনের শেষ অনুষ্ঠানে সোনায় মোড়া জুলে রিমে হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন—সাবাস্ পেলে!

[illegible]পে সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলদাতা জার্মানীর মুলারকে কোয়ার্টার ফাইন্যালের খেলায় ইংলণ্ডের বিপক্ষে শেষ [illegible] জয়সূচক গোলটি করতে দেখা যাচ্ছে। এই খেলায় জার্মানী ৩—২ গোলে জয়লাভ করে।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করায় জুলে রিমে কাপটি ব্রেজিল পেয়ে গেল চিরদিনের জন্যে। ফাইনাল খেলা শেষ হবার পর ব্রেজিলের অধিনায়ককে জুলে রিমে কাপটি উঁচু করে ধরে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বকাপ জয়ের পরে ব্রেজিলের সমর্থকরা তাঁদের হিরো পেলেকে মাথায় তুলে নাচছেন। পেলের মাথায় [illegible] টুপি।

ব্রাজিল ইতালিকে ৪—১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করার পর এবারকার অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নবম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। খেলার পরিসমাপ্তি ঘটলেও বিশ্বজয়ের আনন্দের রেশ এখনও মুছে যায় নি। হয়ত এখনও ব্রাজিলবাসী আনন্দে আত্মহারা। এককথায় সোনার পরী যেন আকাশের চাঁদ। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ব্রাজিল এবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল। আর সেই কারণেই তারা পেয়েছে বিশ্বজয়ের দুর্লভ সম্মান। ব্রাজিলের নাম বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। কেন না, নিয়মানুযায়ী তারা তিনবার বিশ্ব-কাপ জয়ের সূত্রে চিরতরে ঘরে তুলেছে সুদৃশ্য জুলে রিমে কাপটি।

বিশ্বকাপে যোগদানকারী দলগুলির কথা ভাবলে আমাদের বিস্ময় বোধ হয়। মনে হয়, সেই সব দলের খেলোয়াড়েরা হয়ত দেবতা। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তাদের সাফল্যের মূলে আছে প্রবল নিষ্ঠা। বিশ্বকাপে যোগদানকারী দলগুলির মত বিশ্ব একাদশের প্রতিও আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই। স্বভাবত আমরা অজানাকে জানতে আগ্রহী। তাই আমরা বিশ্ব একাদশের কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখি যে, তাঁরা আমাদেরই মত মানুষ, না দেবতা?

পেলে

(ব্রাজিল)

বিশ্ব একাদশ দলের সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য নাম ব্রাজিল তথা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ফুটবল সম্রাট পেলে। পেলেকে আজ নতুনভাবে পরিচয় করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কেন না, পেলে আজ পূর্ণিমার চাঁদ। ফুটবলের রাজা পেলেকে হয়ত আমরা আর দেখতে পাবো না, বিশ্ব-কাপের আসরে। একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে তিনবার বিশ্বকাপের আসরে যোগদান করে নিজের সুনাম অনুযায়ী খেলা এবং দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেমন কষ্টকর, তেমনি অভাবনীয়। যে পেলেকে ফুটবল মাঠে আমরা চীৎকার করে বলতে শুনেছি, যাকে বিশ্বকাপের আসর থেকে অবৈধভাবে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল, সেই শিল্পী সেই ফুটবলের যাদুকর পেলেকে নিয়ে আজ সারা দেশ গর্বিত। তারা হয়ত ভুল বুঝতে পেরে অনুশোচনায় ব্যস্ত। কেন না, আগুন কখনও ছাই চাপা থাকে না। এর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই হয়ত গত বিশ্বকাপে আহত পেলেকে নিতে হয়েছিল হারানো রূপ।

১৯৪০ সালের ২৩শে অক্টোবর যে শিশু প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিল, সেই আজ বিশ্বপ্রিয় ফুটবলের রাজা পেলে। পুরো নামটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। কেন না এডসন এ্যারান্টেস দো ন্যাসিমেণ্টো নামটার চেয়ে, পেলে নামেই তিনি অধিক পরিচিত। ১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপের আসরে পেলের দেওয়া গোলেই ব্রাজিল [illegible] থেকেই পেলেকে [illegible] ব্ল্যাকপার্ল', দানগত ইত্যাদি। পেলে খেলার মাঠে যেন আসন্ন ঝড়ের প্রতীক। অনেক শক্ত প্রাচীরও ভেঙে গিয়েছে এই ঝড়ের মুখে পড়ে। সাপুড়ের সাপ খেলানোর মত, পেলেও খেলতেন তাঁর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের। পেলের খেলার পদ্ধতি-গুলিও যেন নতুন আবিষ্কার। এক কথায় পেলের সাথে যেন বলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা, ঠিক যেন ছবি। লেফট ইনের খেলোয়াড় হলেও তাঁর দু পায়ের সটেই বুলেটের গতিবেগ। যে কোন অবস্থায়, যখন খুশি গোল করা পেলের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি সর্ব-প্রথম বিশ্বকাপের আসরে যোগদান করে-ছিলেন। এত কম বয়সে বিশ্ব-কাপের আসরে খেলার সুযোগ বোধ হয় আর কোন খেলো-য়াড়েরই ভাগ্যে জোটে নি। প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলায় পেলে সর্বমোট ১০২৮টি গোলের অধিকারী। গোলসংখ্যা বা অর্থের বিনিময়ে পেলেকে বিচার করা যায় না, কেন না, পেলে অসাধারণ, অদ্বিতীয়। পেলের খেলোয়াড়ী জীবনের ঘটনা লিখে শেষ করা যাবে না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ফুটবলের এক নিপুণ শিল্পী পেলে চিরবিস্ময়।

॥ টোস্টাও ॥
(ব্রাজিল)

রিভা
(ইতালী)

এবারকার বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাম লুইগি রিভা। প্রতিভা যে কোনদিন চাপা থাকে না, এরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো ইতালীর রিভা। একদিন যে ছিল মোটর গ্যারেজের কর্মী, আজ সে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রিয়। তার মূল্য আজ দুই কোটি টাকা। এ কথাটা যতটা অবিশ্বাস্য, ততটা অকল্পনীয়। কিন্তু রিভার দুর্ভাগ্য যে, সে তার দলকে এনে দিতে পারে নি বিজয়ীর সম্মান। অবশ্য ফুটবল একার খেলা নয়। তবু রিভাকে এবার খেলতে দেওয়া হয় নি। তার ক্রীড়া-চাতুর্যের কাছে পরাজিত হয়ে, অন্যায়ভাবে তারা আটকে রেখেছে। যে কথা একদিন পেলেকেও আফশোষ করে বলতে শোনা

॥ শেস্তারনেভ ॥
(রাশিয়া—অধিনায়ক)

গেছে, আজ সেই কথাই রিভার মুখ থেকেও শোনা গেল। ১৯৪৫ সালে রিভার জন্ম। ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। রিভা তখন উত্তর ইতালীর লেগনানো ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। তারপর ২১ হাজার ৩৫০ পাউন্ড মূল্যে কার্গালিয়ারী ক্লাবের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন রিভা। ইতালীয় লীগে যে বছর কার্গালিয়ারী ক্লাব প্রথম চ্যাম্পিয়ান, সে বছর রিভার দানই ছিল সর্বাধিক। মেক্সিকোতে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ইতালী দলের ১০টি গোলের মধ্যে ৭টি গোলই রিভার অবদান। রিভা যে একজন সুচতুর এবং সুযোগসন্ধানী খেলোয়াড়

॥ গর্ডন ব্যাঙ্কস ও ববি চার্লটন ॥
(ইংলণ্ড)

এর প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি। পর পর তিনবার ইতালীয় লীগে তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেছিলেন। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ রিভা এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বয়সে তরুণ বলেই তাঁকে এখনও বিশ্বকাপের আসরে নামতে হবে। দেখাতে হবে তাঁর আত্মরূপ। যা দেখে সারা বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে। এক কথায় ইতালীর লুইগি রিভা এখন বিশ্বের বিস্ময়। আগামী বিশ্বকাপের আসর বসবে ১৯৭৪ মিউনিকে। এই দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে রিভা নিজের দোষ-ত্রুটি শুধরে নিতে পারবেন বলেই ক্রীড়ামোদীদের বিশ্বাস। তাই সবার লক্ষ্য আজ মিউনিকে।

মুলার
(পশ্চিম জার্মানী)

১৯৭০ সালে বিশ্বকাপের আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে? এ প্রশ্ন করলে প্রতিটি ক্রীড়ামোদীই কোনরকম চিন্তা না করেই চট করে উত্তর দেবে, পশ্চিম জার্মানীর সেণ্টার ফরোয়ার্ড গেয়ার্ড মুলার। গোলের পরিসংখ্যান দিয়ে কোন খেলোয়াড়ের ক্রীড়ামানকে বিচার করা যায় না, বিচার করতে হলে সর্বাগ্রে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। গোল দিতে যে ভালোবাসে, তাকে গোলপিপাসুই বলা যেতে পারে। বিশ্বকাপের আসরে ৪টি খেলার মধ্যে ১০টি গোল করেছেন মুলার। প্রতিটি ক্রীড়ামোদীই হয়ত আশা করেছিল মুলার জুস্ট ফন্টেনের দেওয়া ১৩টি গোলের রেকর্ডকে ভেঙে ফেলে গড়ে তুলবেন নতুন রেকর্ড। কিন্তু সেই আশা পূরণ করে তুলতে সক্ষম হন নি। মুলার, তবে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ৯টি গোল সমেত ১৯টি গোলের অধিকারী মুলার। আর সেই কারণেই গোলদাতার তালিকায় ওঁর শীর্ষস্থান। সাইপ্রাস দলের সাথে প্রথম খেলায় মুলারের দেওয়া গোলেই পশ্চিম জার্মানীর জয়। দ্বিতীয় খেলায় ১২টি গোলের মধ্যে মুলারের দখলে ৪টি। স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে ফিরতি খেলায় জয়সূচক গোলটিও করেছিলেন মুলার। তাঁর খেলার পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, তিনি তখন গোল করতে খুব ভালোবাসেন। গ্রুপ লীগের খেলায় মরক্কো দলের সাথে যখন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হতে চলেছে,

॥ মুলার ॥
(ওয়েস্ট জার্মানী)

ঠিক সেই মুহূর্তে জয়সূচক গোল করেছিলেন মুলার। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান দলের ৫—০ গোলে জয়লাভ করার পেছনেও মুলারের দানই সর্বাধিক। বিশ্বকাপের আসরে পেরুর বিরুদ্ধে হ্যাট্‌ট্রিকের কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য। ভাবলেও আশ্চর্য বোধ হয়, যে খেলোয়াড় ৬৬-তে বিশ্বকাপে ৪০ জনের মধ্যে স্থান পান নি, সেই খেলোয়াড়ই গত তিন বছরে ১৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেছেন ১৭টি। সেমি-ফাইনালে ইতালীর কাছে পরাজিত হওয়ায় ফাইনালে খেলার সৌভাগ্য হয় নি পশ্চিম জার্মানীর। মুলারের তীব্র গতি-

বেগের কাছে বার বার পরাজিত হয়েছে বিপক্ষ রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা। আমরা সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি, যেদিন দেখব বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার নামের পাশে মুলারের নাম।

গর্ডন ব্যাঙ্কস

(ইংল্যান্ড)

অধ্যবসায় সিদ্ধিলাভ হয়। এ কথাটা যে ধ্রুব সত্য, তারই উদাহরণ হলো গর্ডন ব্যাঙ্কস। ভোর হওয়ার সাথে সাথে মাঠে উপস্থিত হয়ে সারাদিন গোল পোস্টের সামনে বল আটকে, সর্বশেষ বিদায় নেবার সময় ঘরে ফিরতেন ইংলণ্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কস। আজ ব্যাঙ্কস নামে সারা বিশ্ববাসী গর্বিত। কিন্তু এমন একদিন এসেছিল যেদিন তাঁকে খাদ্যের সন্ধানে যেতে হয়েছিল রাজমিস্ত্রীর কাজে। তবুও ফুটবলের প্রতি ছিল তাঁর প্রাণের সংযোগ। একদিকে চাকরি, আর একদিকে খেলা। লিস্টার সিটি দলে যোগ দেওয়ার পর তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। সামরিক বাহিনীর ডাকেও সাড়া দিয়েছিলেন ব্যাঙ্কস। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা সত্ত্বেও মাঠের কচি কচি ঘাসগুলির ডাকে তাঁর মনপ্রাণ কেঁদে উঠত। আর এই কারণেই ব্যাঙ্কস আবার ফিরে এসেছিলেন ফুটবল জগতে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলেছিলেন ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। ১৯৬৬-তে বিশ্বকাপের আসরে প্রথম যোগদান করেছিলেন ব্যাঙ্কস। আর তাই থেকেই শুরু বল আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্যাঙ্কসকে যে কত তীব্র সটের মোকাবিলা করতে হয়েছে, তা হয়ত গুণে শেষ করা যাবে না। ব্যাঙ্কসকে এখন বিশ্বের পয়লা নম্বর গোলরক্ষক বলা যেতে পারে। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিনের ক্রীড়াচাতুর্যও হার মানবে ব্যাঙ্কসের কাছে।

জেয়ারজিনহো

(ব্রাজিল)

বিশ্ব একাদশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ব্রাজিলের রাইট আউট জেয়ারজিনহো। জেয়ারজিনহোর পুরো নাম জেয়ারভেনচুরা ফিলহো। প্রতিটি ফুটবল অনুরাগীর ধারণা, জেয়ারজিনহো হলো গ্যারিঞ্চার দ্বিতীয় সংস্করণ। জেয়ারজিনহোর আছে অফুরন্ত দম, যে সব খেলোয়াড় একটি দলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে, পারে তার সতীর্থদের সময়মত গোলের উপযোগী বল উপহার দিতে, সে যে নিঃসন্দেহে একজন ভালো খেলোয়াড় এটা বলা বাহুল্য। আমাদের প্রত্যেকেই অবগত যে, প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় জেয়ারজিনহো গোল করেছিলেন মাত্র ৭টি। ব্রাজিলের বিশ্বজয়ের পেছনে জেয়ারজিনহোর অবদানও যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে জেয়ারজিনহো একজন সুদক্ষ রাইট আউট। একজন ভালো রাইট আউটের যে সব গুণ থাকা উচিত, সেই যোগ্যতার অধিকারী জেয়ারজিনহো। পায়ে প্রচণ্ড সট। অদ্ভুত ড্রিবলিং। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর গতি। কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুর বিরুদ্ধে, সেমিফাইনালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর দেওয়া গোলে ব্রাজিল বিজয়ী হয়। এ থেকেই সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, বিশ্বকাপের আসরে জেয়ারজিনহো একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়। বিশ্বকাপ জয়ে জেয়ারজিনহোর অবদান কম নয়। আর এই কারণেই জেয়ারজিনহোর উপর ব্রাজিল দল অনেকখানি নির্ভরশীল।

ববি মুর

(ইংল্যান্ড)

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানী। ঠিক যেন সেয়ানে সেয়ানে লড়াই। গোল আর গোল শোধ। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইংল্যান্ড দল পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করেছিল ৪—২ গোলের ব্যবধানে। ১০৭ বছরের ফুটবল ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় ১৯৬৬ আগস্ট মাস। সেদিন সোনার পরী জয় করে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা চীৎকার করে বলেছিল, জিতে আমরা সমর্থকদের ঋণ শোধ করলাম। সেই প্রথম ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়। আর এই কারণে ইংল্যান্ডের গৌরবে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন ববি মুর। কেন না, এই বিশ্বজয়ের সম্মান তাঁরই নেতৃত্বে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫। ছোটবেলা থেকেই মুরের ফুটবলের প্রতি নেশা ছিল বেশি। আর তখন থেকেই দলনায়ক হবার সাধ ছিল প্রবল। স্কুল জীবনে মুর ছিলেন একজন দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড়। এমন কি তিনি ইংল্যান্ড স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হবার সম্মানও অর্জন করেছিলেন—একদিকে ক্রিকেটের ডাক অন্যদিকে ফুটবলের আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট হ্যাম দলের ডাকে ফুটবল খেলায় মুর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে মুর ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুর যে একজন সেরা হাফব্যাক, এর সত্যতা প্রমাণ করবে ইংল্যান্ড দলের ম্যানেজার আলফ রামসের নির্বাচন। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত

বিজয়ী ব্রাজিল দলের খেলোয়াড় পেলে জুলে রিমে কাপ হাতে আনন্দে নৃত্য করছেন।
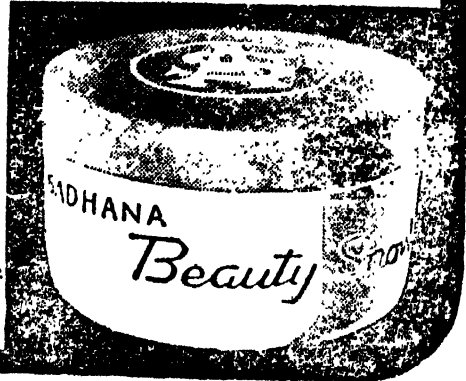
বড় বড় জায়গাতেই মুরের বুটের আঁচড় পড়েছে।

ওয়েস্ট হ্যামের ম্যানেজার রন গ্রীনউড বলেছেন—"বাবির সাফল্যের মূলে রয়েছে তার সারল্য। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তার মন নেই, তাই সে এত দ্রুত সাফল্যের সোপানে উঠতে পেরেছে"।

১৯৫০ সালে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডে দু' বছর কোচিং নেবার পর থেকেই মুর প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় এবং পেশাদার। ১৯৭০-এ বিশ্বকাপের আসরে মুর পরাজিত হয়েছেন, পরাজিত হয়েছে তাঁর দল। তবে এই পরাজয়ের মূলে ছিল, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস।

মুরের প্রতি সপ্তাহে আয় একশো পাউন্ড। মুরের বাড়িটিও যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দরী তাঁর স্ত্রী। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ সুন্দর বাবির সুন্দরী স্ত্রী। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যাঁরা খেলোয়াড় বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন, দুহাতে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন, ফুটবল অনুরাগীদের ঠোঁটের ডগায় যাঁদের নাম, স্পষ্টতঃ তাঁদের আদর্শ-স্থানীয় হচ্ছেন ববি মুর। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক।

গুস্তাভ পেনা

(মেক্সিকো)

১৯৬৬ সাল' খেলা চলেছে ইংল্যান্ড এবং মেক্সিকোর মধ্যে। তুমুল লড়াই। বার বার বল নিয়ে ছুটে আসছে ইংল্যান্ডের দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় জিমি গ্রীভস। গ্রীভসকে কিভাবে বাধা দেওয়া যায়, সে সব পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নেমেছিল মেক্সিকো দল। আর সে গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করার ভার পড়েছিল মেক্সিকোর সেন্টার ব্যাক গুস্তাভ পেনার ওপর। ঠিক যেন পেনা আর গ্রীভসের শক্তি পরীক্ষা। পরীক্ষায় বিজয়ী হওয়ায় পেনা তখন থেকেই সংবাদ-পত্রে এসে হাজির হয়েছিলেন। ইংল্যান্ড দলের সমর্থকদের কাছে ববি মুর যেমন একটি প্রিয় নাম ঠিক তেমনি মেক্সিকো-বাসীদের কাছে পেনাও একজন ববি মুর। মেক্সিকোর 'ববি মুর' নামেই পেনা বেশি পরিচিত। মাত্র ২৬ বছর বয়সেই পেনা বিশ্ব একাদশের নির্বাচিত খেলোয়াড়। এবারের বিশ্বকাপে পেনার দলের প্রতি ছিল অগাধ আশা। দল সম্পর্কে অতি-মাত্রায় সচেতন ছিলেন তিনি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকো ইতালীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় পেনার সব আশাই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এর জন্য এতটুকু মনো-বল হারান নি পেনা। আবার দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে নতুনভাবে দল গঠন করে বিশ্বকাপের আসরে চমক সৃষ্টি করতে পারবেন এই তাঁর বিশ্বাস। পেনাও যখন খেলার মাঠে, তখন মনে হয় কোন এক দম-দেওয়া যন্ত্র। অনলস পরিশ্রমী পেনা। পুরো দলকে কিভাবে পরিচালনা করতে হবে, সেই সব কৌশলই জানা আছে পেনার। আর এই কারণেই পেনা একজন কৃতী খেলোয়াড়—মেক্সিকোর ভরসা।

টোস্টাও

(ব্রাজিল)

এ পৃথিবীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। একজন চলে যায়, আর একজন আসে তার উত্তরসূরী হিসাবে। টোস্টাও ঠিক তাই। প্রায় সব কিছু একই রকম। গোল করার ক্ষেত্রে দুজনেই সিদ্ধহস্ত। আমি যার সাথে তুলনা করছিলাম, সে হল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং ফুটবল সম্রাট পেলে। এমন এক সময় এসেছিল যখন টোস্টাও-সমর্থকেরা পেলেকে সরিয়ে টোস্টাওকে সুযোগ দেবার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পেলেকে বাদ দিয়ে ব্রাজিল দল ঠিক যেন নুনহীন ব্যঞ্জন। বিশ্ব-কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় টোস্টাও খেলেছিলেন পেলের পাশে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে টোস্টাও প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ১০টি গোল করেছিলেন। এক সময় ব্রাজিলের কোচ জাগালোকে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল টোস্টাও'কে দলে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে। পেলেকে যেমন বলা হয় ব্ল্যাক পার্ল, তেমনি টোস্টাওকে বলা হয় হোয়াইট পেলে। চিলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক খেলায় জাগালো পেলেকে দলে রেখেছিলেন আর বাদ পড়েছিলেন টোস্টাও। তবে বিশ্বকাপের আসরে টোস্টাও একদিন চমক সৃষ্টি করবে বলে সমর্থকদের আশা। আর আমরাও দেখব, হোয়াইট পেলে পেলের যোগ্য উত্তরসূরী কিনা?

ফ্যাচিতি

(ইতালী)

কথায় আছে, তরুণের জয় সর্বত্রই। আর এই কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই হয়ত ফ্যাচীতির জন্ম। সু[illegible] অভাবে এমন অনেক খেলোয়াড় যাঁরা আজ অবহেলিত। অবশ্য অনস্বীকার্য যে, প্রতিভা কোনদি[illegible] থাকে না। ১৯৬৪-তে যে ফ্যা[illegible] একেবারে আমল দেওয়া হয় নি, হয় নি খেলার সুযোগ, আজ সে একাদশের অন্যতম খেলোয়াড়। এ[illegible] ১৯৬৪-তে তিনি ইউরোপীয়ান ফু[illegible] কাপ না ইয়র নির্বাচনে দ্বিতীয় [illegible] পেয়েছিলেন। আজ এমন অনেক খেল[illegible] আছেন, যাঁরা সুযোগের অভাবে প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারছেন [illegible] ফ্যাচীতি মূলত ফুল ব্যাক হলেও খেলায় পরিধি ভিন্ন। ফুল ব্যাক হ[illegible] তিনি এগিয়ে গিয়ে গোল করেছেন। এই কারণেই তিনি বিশ্বের সেরা ফুটব[illegible] দের অন্যতম। যাঁরা একদিন ফ্যাচী[illegible] নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন, ত[illegible] আজ ফ্যাচীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ১৯[illegible] এর ১৮ই জুলাই ইতালীর ফ্লোভিগলি[illegible] তাঁর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খে[illegible] শুরু করেন স্থানীয় ক্লাবে। ইন্টার মি[illegible] দলের হয়ে তিনি খেলেছেন কয়েক ব[illegible] ইন্টার মিলান দল সেবার ইতাল[illegible] চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই বছর ফ্যাচী[illegible] দানই ছিল সর্বাধিক। অনেক আন্তর্জা[illegible] খেলায় ফ্যাচীতি গোল দিয়েছেন। ফ্যাচি[illegible] ঠিক সময়মত এগিয়ে যান, আবার পিছি[illegible] আসেন নিজের জায়গায়। এটাই [illegible] বৈশিষ্ট্য। আজকাল যে জিনিসটি [illegible] অবলুপ্তির পথে, সেটি হলো হেডের সাহা[illegible] বল পাশ করা। হেডের সাহায্যে যে [illegible] নিখুঁতভাবে বল দেওয়া যায়, তারই উ[illegible] হরণ হলো ফ্যাচীতির হেডিং, তাঁর হে[illegible] অতি নিখুঁত। সতীর্থর ঠিকানা অনুযা[illegible] তিনি বল পাঠিয়ে দেন হেডের সাহায্যে। যেবার ইতালী স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে গ্র[illegible] চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল, সেবার ফ্যাচীতি[illegible] দেওয়া গোলটি ছিল দর্শনীয়। আর সে[illegible] গোলের জন্য ইতালী অর্জন করেছি[illegible] বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেল[illegible] যোগ্যতা। ফ্যাচীতিকে আউট-ডজ ক[illegible] বল নিয়ে যাওয়া রীতিমত দুঃসাধ[illegible] ইতালীর এবারের ফাইনালে ওঠা[illegible] পেছনেও ফ্যাচীতির দান যথেষ্ট। আর এই কারণেই ফ্যাচেতি[illegible] ওপর বিশ্বের সমস্ত ক্রীড়ামোদী[illegible] অনেক আশা। সবাই দেখতে চা[illegible] ফ্যাচেতির নবরূপে।

কলকাতার ফুটবলের এখন দৈন্যদশা। কলকাতার ফুটবল মানেই ভারতের ফুটবল। আজ তাই ফুটবলেও ভারতের দুর্দশা। মেলবোর্ণ অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী ও দুবারের এশিয়ান চাম্পিয়ান ভারতের স্থান এখন কোথায়? গত-বার মারডেকায় ভারতের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। কাজেই এই ফলাফলের দিকে নজর রেখে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ভারতীয় ফুটবলের মান অনেক নীচে নেমে গেছে। গত কয়েক বছর ধরেই প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে আমরা ক্রমাগত হারছি। অথচ এককালে বার্মা, ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়াকে ভারত অনায়াসে হারিয়েছে। ব্যাপারটা ভাবলে সত্যিই কষ্ট হয়। কিন্তু ভারতের এই অধঃপতন কেন? শুধু সরকারী ঔদাসীন্যের অভিযোগ বা বিদেশের তুলনায় অপর্যাপ্ত সুযোগের অভাব—কারণ কি একটাই? এ সব অভিযোগ মেনে নিয়েও বলা যায় যে, ভারতের খেলোয়াড়দের উপযুক্ত ক্রীড়াদক্ষতার অভাবও এই অধঃপতনের অন্যতম কারণ। পি.কে, চুনী, বলরাম, জার্নাল, অরুণ ঘোষ-এর পর তাঁদের অভাব পুষিয়ে দেবার মতো তরুণ খেলোয়াড়রা কোথায়? গত পাঁচ বছরে একটিও চুনী, বলরাম বা পি কে তৈরি হয় নি। কিছুটা বিকল্প হিসাবে কাজল বা পি দে'র নাম করা গেলেও, তারা সম্পূর্ণ পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তারপর আর কারো নাম চোখে পড়ে না। নঈম বা প্রসাদ কেউই জার্নাল-অরুণের সমকক্ষ নয়। অথচ ফুটবলে ভারতকে হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করতে গেলে পি কে, চুনী, বলরাম বা জার্নাল-অরুণের যোগ্য উত্তরসাধক খুঁজে বার করতেই হবে। অথচ তেমন সম্ভাবনার আশাও দেখা যাচ্ছে না। তা বলে কলকাতার ফুটবল থেমে নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে হলেও খেলা ঠিকই চলছে। ওরই মধ্যে কয়েকজনের খেলা বিক্ষিপ্তভাবে নজর কাড়ছে। সেই সব তরুণদের যদি একত্র করে দীর্ঘমেয়াদী কোচিং বা প্রশিক্ষণ চালু করা হয় তবে ভালো ফলাফল না হয়ে পারে না। তবে তার জন্য সরকারী তৎপরতার সাথে চাই খেলোয়াড়দেরও আন্তরিক আগ্রহ। সে যাই হোক, আজকের এই লেখায় কয়েকজন সম্ভাবনাময় উঠতি ও নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

সুধীর কর্মকার

(ইস্টবেঙ্গল)

ছোটখাটো শান্ত স্বভাবের সুধীরকে দেখলে চট করে বিশ্বাস করা শক্ত যে, ওই চেহারা নিয়ে সে মাঠে অত দাপটে খেলে, বিশেষত ব্যাকে। '৬৭ সালে বালী প্রতিভার হয়ে খেলা শুরু করে '৬৮-তে এরিয়ান ঘুরে মাত্র গত বছরই সুধীর ইস্টবেঙ্গলে এসেছে। ধীর, স্থির সুধীর অবিচলচিত্তে একের পর এক ভালো খেলে গতবারই সবার নজর কেড়েছে। প্রথম বছরেই ক্রীড়া সাংবাদিক সংঘের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও তার ভাগ্যে জুটেছে। ঝানু সাংবাদিক-দের পাকা জহুরীর চোখ যে খাঁটি সোনা চিনতে ভুল করে নি, তার প্রমাণ—[illegible] সুধীর ভালো খেলছে। [illegible] সুধীর আরও [illegible]। [illegible] হিসাবে ইস্টবেঙ্গলের [illegible] [illegible]।
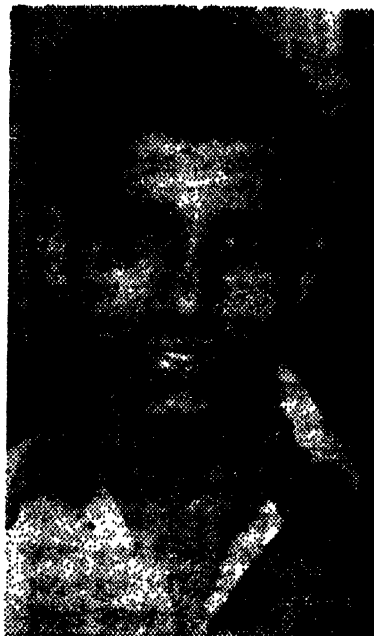
● সুধীর কর্মকার ●

স্বমহিমায় উজ্জ্বল সুধীরের পাশে শান্ত, নঈমের মতো তারকারাও দ্যুতিহীন।

সুধীরের বড় গুণ ও কখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। ঠাণ্ডা মাথায় বিপক্ষের ক্রমাগত আক্রমণ রোখার সাথে সাথে সমানতালে উঠে গিয়ে স্বপক্ষের ফরোয়ার্ডদের পাশে বাড়তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের উজ্জীবিত করে তুলতে সার্থক ভূমিকা নেয়। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সুধীরের এই বাড়তি প্রয়াস দলের অনেক কাজে লাগে সন্দেহ নেই। হেডিং-ট্যাকলিং-পাসিং-এ সুধীরের জুড়ি নেই।

সেই সঙ্গে প্রশংসনীয় খেলার মাঠ ও তার বাইরে সুধীরের আচরণ। মাঠের ভেতরে যেমন শারীরিক আস্ফালনে ওর প্রবল অনীহা তেমনি মাঠের বাইরেও সুধীরের শান্ত, সংযত ব্যবহার সবার মন কেড়েছে।

মাত্র বাইশ বছরের তরুণ, [illegible] [illegible] সুধীর কর্মকার বড় হবার [illegible]

প্রেরণায় নিজের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়গুণে আজ সবার প্রিয়পাত্র। সাম্প্রতিককালে খেলাধুলার নিরিখে একমাত্র সুধীরকেই সেরা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না। কারণ অধিকাংশ নামী ও দামীরা যখন নিষ্প্রভ, আর উঠতি তরুণেরা যখন হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে তখন সুধীরই একমাত্র খেলার মান ধরে রেখেছে। ব্যাপারটা সুধীরের কাছে তো বটেই, আমাদের কাছেও কম উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।

হুগলী জেলার ছেলে সুধীর কর্মকার জোর কদমে এগিয়ে এসে আজ কলকাতার অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। ইতি-মধ্যে ফুরিয়ে না গেলে সুধীর আমাদের অনেক কিছু দিতে পারে। ধাপে ধাপে সুধীর খ্যাতির চূড়োয় আরোহণ করুক আমাদেরও এই কামনা।

শ্যামসুন্দর মান্না

(মোহনবাগান)

চাঁপাডাঙ্গা গ্রামের সেই ছেলেটি কোনদিন কলকাতা ময়দানে খেলে নাম করবে, এ কথা কেউ ভাবতে পেরেছিল! আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতোই শ্যামসুন্দরের শৈশব কেটেছে নিতান্ত দুরবস্থার মধ্যে। একজোড়া বুট কেনার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। স্কুলের প্রধানশিক্ষক বুট কিনে দিলেন শ্যামসুন্দরকে। মরে গেলেও কোনদিন এ সব কথা ভুলতে পারবে কি শ্যামসুন্দর!

কালো, শক্ত-সামর্থ্য চেহারার শ্যাম-সুন্দর কলকাতা ময়দানে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছে '৬৭ সালে খিদিরপুরের হয়ে। '৬৭ ৬৮ দু'বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। '৬৯-তে নওগাঁয় সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের খেলোয়াড় শ্যাম-সুন্দর মান্না এ বছর খিদিরপুর ছেড়ে মোহনবাগানে যোগ দিয়েছে।

শ্যামসুন্দরের বড় গুণ, সে খাটতে জানে। ৪-২-৪ পদ্ধতিতে হাফে খেলার যে কঠিন দায়িত্ব তা অনেকাংশেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে। বিপক্ষের আক্রমণ রোখার ফাঁকে এগিয়ে গিয়ে এ পর্যন্ত চার-চারটে গোলও দিয়েছে শ্যামসুন্দর।

অমায়িক, নিরীহ স্বভাবের শ্যাম-সুন্দর মাঠে কিন্তু লড়িয়ে মেজাজের ছেলে। অক্লান্ত মেহনতে নিজের সবটুকু সামর্থ্য উজাড় করে শ্যামসুন্দর দলের জন্য জান-প্রাণ দিয়ে লড়ে।

বয়স অল্প, শেখার আগ্রহ আছে এবং খেলার সামর্থ্য আছে; কাজেই সেরকম সুযোগ পেলে যে, শ্যামসুন্দর উন্নতি করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সদা হাস্যময় শ্যামসুন্দরও সুধীরের মতো 'খেলোয়াড়সুলভ আদর্শে' বিশ্বাসী। ফলে, বল ছেড়ে মানুষ মারার দিকে ওর ঝোঁক একেবারেই নেই।

মোহনবাগানের মতো ভারতবিখ্যাত দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হয়েও শ্যাম-সুন্দরের মনে এতটুকু অহংকার নেই। শ্যামসুন্দর এখনও সেই আগের মতো সহজ, সরল, অমায়িক। মনটা এখনও সেই চাঁপাডাঙ্গা গ্রামের শিশুর মতো।

ও যা কিছু শিখেছে তা একমাত্র কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জীর দৌলতে—এ কথা স্বীকার করতে ওর কুণ্ঠা নেই। শারীরিক দক্ষতা ও দম এই দু'টি গুণই শ্যামসুন্দরের পুরোদমে আছে। আর নিষ্ঠা বা অধ্যবসায়ে যে ঘাটতি নেই, তা না বললেও বোধ করি চলে। যা নেই, তা হচ্ছে ওর অভিজ্ঞতা। ফলে ভালো খেলেও শ্যামসুন্দর অনেক সময় ফিনি-সিং দিতে পারছে না। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে শ্যামসুন্দর এ সব দোষ-ত্রুটি শুধরে নেবে।

শ্যামসুন্দর যে শুধু খেলাধুলায় ভালো তা নয়, পড়াশুনায় কমতি নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্সের সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র শ্যামসুন্দর মান্নার সাবজেক্ট হচ্ছে পলিটি-ক্যাল সায়েন্স।

স্বপন সেনগুপ্ত

(ইস্টবেঙ্গল)

জোর খেলা হচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী-ইস্টবেঙ্গল আর বি এন আর। অশোক চ্যাটার্জীর দেওয়া গোলে যদিও ইস্ট-বেঙ্গল এক গোলে এগিয়ে আছে, তবু যে কোন মুহূর্তে গোল শোধ হয়ে যেতে পারে। দু'দিকের গোলের সামনেই বল ঘোরাফেরা করছে। হঠাৎ ইস্ট-বেঙ্গলের তরুণ রাইট উইং বল নিয়ে তীব্রবেগে বি এন আরের তিনজন ব্যাক মায় অরুণ ঘোষ সহ গোলরক্ষককে কাটিয়ে গোলে বল ঠেলে দিলো। অকস্মাৎ খেলার মোড় ফিরে গেলো। শেষ মুহূর্তে আরও একটি গোল দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ঐ খেলায় তিন গোলে জিতে গেলো।

এর পর সবার নজরে পড়ে গেলো সেই তরুণ রাইট উইংটি। নাম স্বপন সেনগুপ্ত। খিদিরপুর ছেড়ে স্বপন এবারই ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছে। স্বপন মস্তবড় খেলোয়াড় না হলেও যথেষ্ট প্রতিভাদ্যুতিমান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্টবেঙ্গলের নামী দামী ফরো-য়ার্ডরা যখন গোলের কাছে মাথাখুঁড়ে দিশেহারা হয় তখন স্বপন লম্বা লম্বা সেন্টার করে সতীর্থদের অনেক বল উপহার দিচ্ছে। কখনও বা একক প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎবেগে বল নিয়ে গোল দিয়েও আসছে।

হ্যাঁ, স্বপনের বড় ভরসা ওই বার কাঁপানো সট ও বিদ্যুৎ বেগ।

কুড়ি বছরের তরুণ স্বপন কলকাতায় প্রথম খেলেছে '৬৬ সালে বালী প্রতিভার হয়ে। '৬৭-তে খিদিরপুরে এসে পরের বছর জুনিয়র বাংলা দলে স্বপনের ঠাঁই মেলে।

মেদিনীপুরের ছেলে স্বপন সেন-গুপ্ত, শ্যামসুন্দরের মতো কোনদিন ভাবতে পারে নি সে ইস্টবেঙ্গল কিংবা মোহনবাগানে খেলবে। সে সুযোগ সে পেয়েছে। কিন্তু কলকাতার মাঠে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে গেলে তাকে এখনও অনেক বড় হতে হবে।

স্বপনের পায়ের কাজ আছে, দমেও ঘাটতি নেই। আশা করি, আন্তরিকতায় বা নিষ্ঠায় ফাঁকি থাকবে না। কাজেই স্বপন যদি ধাপে ধাপে আরও উন্নতি করে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! তবে, কাগজের সাময়িক প্রশংসা বা অনুরক্ত ভক্তদের প্রশস্তিতে ভুলে স্বপন যদি নিজেকে একটা বিরাট কিছু ভাবে, তবে ......স্বপনের এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি—মোদ্দা কথাটা, স্বপনকে ভুললে চলবে না।

প্রবীর মজুমদার

(মোহনবাগান)

'৬৫ থেকে '৬৯ টানা ক'টি বছর ইঃ রেলে ইনসাইড ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলে নাম করেছে প্রবীর। এ বছর মোহন-বাগানে এসে হাফে খেলছে। মাঝে ব্যাকেও খেলতে হয়েছে।

ব্যাক থেকে ফরোয়ার্ড যে কোন স্থানে খেলতে নেমে মানিয়ে নেওয়াটা যে কোন খেলোয়াড়ের কাছেই গর্বের কথা এবং এজন্য প্রবীর একটু-আধটু গর্বও করতে পারে।

বেশি দিন ধরে প্রবীর কলকাতা মাঠে খেলছে না। ওরই ফাঁকে '৬৫-তে জুনিয়ার বাংলা ও '৬৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জুনিয়ার ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে প্রবীর।

কর্মা, সুদর্শন প্রবীর মজুমদার

[illegible] ঐ প্রদীপদার পাশে থেকে নিজেকে তৈরি করে নেবার চেষ্টা করেছে। বয়েতে গেলে, যতটুকু শিখেছে, তা ঐ ওঁদের দৌলতেই।

খেলতে নেমে প্রবীর ফাঁকি দেয় না। লিংকম্যানের কঠিন দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ও সারা মাঠ চষে বেড়ায়। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে প্রবীর সতীর্থ ফরোয়ার্ডদের সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত-লয়ে ছুটে গুটিকয়েক গোলও করেছে এর মধ্যে। ব্যাপারটা প্রবীরের কাছে যে উদ্দীপক ঘটনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শান্ত ও সুদর্শন প্রবীর মজুমদার এখনও খ্যাতির তুঙ্গে আরোহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে নি, তবে ঠিকমতো খেললে আগামী দিনের উজ্জ্বল রত্ন হয়ে উঠতে পারাটা অসম্ভব নয়।

প্রবীরের দোষ লিংকম্যান হিসেবে ও একটু স্লো। অনেক সময় দেখা গেছে যে ফরোয়ার্ডদের বাড়তি সাহায্য দিতে গিয়েও সময়মত নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারে নি। তা ছাড়া, প্রবীরের পায়ের কাজে তারিফ পাবার মতো বাহাদুরী নেই। আর অভিজ্ঞতার অভাব তো আছেই।

প্রবীর যদি এ সব দোষ-ত্রুটি শুধরে নিয়ে নিজেকে ভালো খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে ও একদিন নিশ্চয়ই সফল হবে। ইঃ রেলের কর্মী প্রবীর বাবা-মা ও দাদার কাছ থেকে সব সময় বড় হবার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

নিত্য নানা মাঠে হরেক রকম খেলোয়াড়ের খেলা দেখে বেড়ানো প্রবীরের নেশা। খেলা দেখেও অনেক কিছু শেখা যায় বা শুধু খেলা নয় খেলা দেখাও প্রতিটি খেলোয়াড়ের অবশ্য কর্তব্য—এ কথাটা প্রবীর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

অমিয় ভট্টাচার্য

(রাজস্থান)

কোন বিগ টিমের প্লেয়ার না হয়েও অমিয় ভট্টাচার্য বারোটি গোল দেওয়ার সূত্রে এখন পর্যন্ত লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতা। রাজস্থানের দীর্ঘদেহী ফরোয়ার্ড অমিয় ভট্টাচার্য এখন পর্যন্ত যে-কটি গোল করেছে তার মধ্যে সেরা কোনটি? নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দেওয়া গোলটি। ইস্টবেঙ্গলের শক্ত, সামর্থ্য ডিপ-ডিফেন্সের ফোকর দিয়ে গোলে আসা সতীর্থের একটি থ্রু পাশ পেয়ে অমিয় ঠাণ্ডা মাথায় থঙ্গরাজকে গোল ছেড়ে বাইরে আসিয়ে কাটিয়ে জালে ঠেলে দেয়। প্রথম গোল দিয়েও রাজস্থান ম্যাচ দখলে রাখতে পারে নি। দোষ অমিয়র নয়। যাঁরা খেলা দেখেছেন তাঁরা অমিয়র দেওয়া গোলের তারিফ করবেনই।

অমিয়র যেমন অফুরন্ত দম আছে, তেমনি আছে দু'পায়ের জোরালো সট। অমিয়র দূরপাল্লার সট দর্শনীয়। সেই সংগে তীব্র গতিবেগ ওর প্রধান সহায়। রাজস্থানের আক্রমণের প্রধান উৎস অমিয় এবার একাই একশো। অমিয় না থাকলে রাজস্থানের স্কোর করবে কে?

গতবার ইস্টার্ন রেলে থেকে অমিয় সুবিধে করতে পারে নি। এবার তাই আবার ছোট ক্লাবে নাম লিখিয়েছে। ভুল সে করে নি, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

নিরহংকার অমিয় ভট্টাচার্য কোন রকম ব্যাকিং না থাকা সত্ত্বেও এবার নিজগুণে মারডেকা ট্রায়ালে আমন্ত্রিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অমিয় বড় দলের জার্সি না পরেও ভারতীয় দলে ঠাঁই পাবে কিনা জানি না, না পেলেও নিরাশ হবার কিছু নেই। অদূর ভবিষ্যতে অমিয় ভারতের সেরা ফরোয়ার্ডের স্বীকৃতি পাবার আশা রাখে।

সত্যিকথা বলতে কি, অমিয়র পাশে এবার খ্যাত-অখ্যাত অনেক ফরোয়ার্ডকেই নিতান্ত নিষ্প্রভ ঠেকেছে। আশার কথা সন্দেহ নেই। কারণ—নতুনরাই তো ভরসা। আর অমিয়কে বড় হতে দেখলে আমরাও কম খুশি হবো না। তবে, অমিয়কে মনে রাখতে হবে, বড় হবার পথ সহজ বা মসৃণ নয়। বন্ধুর পথে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তবে খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করা যায়। তার জন্য অমিয়কেও অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

গোবিন্দ গুহঠাকুরতা

(মোহনবাগান)

ড্রেস করে রোজ একটি ছেলে মাঠে নামে। কিন্তু খেলার সুযোগ পায় না। পাবে কি করে, সে যেখানে খেলে সেখানে যে ভারতের সেরা গোলরক্ষক বলাই দে খেলে। স্বভাবতই বলাই দে'কে রোজ খেলানো হয়। খেলার শেষে ছেলেটি হাসিমুখে আবার পরের দিনের প্রতীক্ষায় থাকে। পরের দিনও হয়তো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ছেলেটির কিন্তু ক্লান্তি নেই। ক্ষোভ বা অভিযোগও নেই কারও বিরুদ্ধে। একদিন বড় হবেই—এ বিশ্বাস নিয়ে সে দিন কাটায়।

হ্যাঁ, এই ছেলেটিই গোবিন্দ গুহঠাকুরতা। নিঃসন্দেহে সবার প্রিয় গোবিন্দ গুহঠাকুরতা বালী প্রতিভার হয়ে '৬৪ সালে প্রথম ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ পায়। '৬৬-৬৭ সালে উয়াড়ীতে ও '৬৮-তে কালীঘাটে। শেষের দু'বছর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জুনিয়ার বাংলা দলের গোলরক্ষার দায়িত্ব বহন করেছে গোবিন্দ। '৬৮-তে ভালো খেলে সবার নজর কাড়লো গোবিন্দ। আর তাই '৬৯-এ ডাক এলো মোহনবাগান থেকে। সেই থেকে মোহনবাগানে খেলছে গোবিন্দ।

যে কটা খেলায় গোবিন্দ খেলেছে তাতে মোটের ওপর মন্দ খেলে নি। কিন্তু হলে কি হবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকলে কোন কিছুই করা যায় না।

গোবিন্দর 'গ্রীপ' করা ভালো। সাহস করে ড্রাইভ দিতে পারে। তবু ওকে নিয়মিত খেলানো হয় না। আর না খেললে খেলা ভালো হবে কি করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গোবিন্দর নিষ্ঠা আছে। খেলা শেখার আন্তরিক আগ্রহ থাকলে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কাজেই সাময়িক অসময়কে নিয়ে তার মন খারাপ না করাই উচিত।

তবে গোবিন্দকে বড় হতে গেলে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে।

সুযোগ-সুবিধা ও আন্তরিক চেষ্টা থাকলে কিছুই অসাধ্য নয়।

নম্র, বিনয়ী ও আত্মপ্রচারবিমুখ গোবিন্দ গুহঠাকুরতার মধ্যে আগামী দিনের অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে সম্ভাবনা যেন অংকুরে বিনষ্ট না হয়, তাকে সার্থক করে তোলা দরকার।

দিলীপ পাল

(মোহনবাগান)

ছেলেবেলা থেকে উত্তরপাড়ার দিলীপ পাল স্বপ্ন দেখে এসেছে কলকাতা ময়দানের নামকরা খেলোয়াড় হবে। খেলতো ফরোয়ার্ডে। চোখের সামনে আদর্শ খেলোয়াড় ছিল চুনী-বলরাম।

'৬৩-তে বালী প্রতিভার জার্সি চাপিয়ে ঘেরা মাঠে প্রথম খেলার সুযোগ পেল দিলীপ। সেখানে তিন বছর কাটিয়ে '৬৬-তে এরিয়ানে যোগ দেয়। আস্তে আস্তে ভালো খেলে নাম করতে লাগলো। '৬৭ তে এরিয়ানে থাকতেই জুনিয়ার ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হয়ে ব্যাঙ্কক যাবার সুযোগ হয়েছিল। কোচ হোসেন দিলীপকে পরামর্শ দিলেন হাফে খেলতে। তখন থেকেই দিলীপ পাকাপাকিভাবে হাফে খেলা শুরু করলো।

'৬৮-তে বিগ টিম ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিলেও তাকে তেমন খেলানো হলো না। ফলে পরের বছরেই দল পাল্টে মোহনবাগানে আসে। কিন্তু আজও দিলীপ তথাকথিত বড় খেলোয়াড় হতে পারল না। দুঃখের কথা, এখনও দিলীপকে খেলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

তেইশ বছরের তরুণ দিলীপের মনে ক্ষোভ থাকলেও কোন অভিযোগ নেই, তাই আজও হাসিমুখে ড্রেস করে দৈনিক মাঠের ধারে বসে থাকে।

চেক, রাশিয়া ও বর্মা দলের বিরুদ্ধে খেলায় অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা দিলীপের আছে। দিলীপের প্রিয় কোচ ল্যাংচা মিত্র।

খেলা দেখাতে দিলীপ দারুণ ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে যাঁর অনুপ্রেরণা পেয়ে দিলীপ বড় হতে চেয়েছে সেই অরুণাভ মজুমদারের অভাব দিলীপ প্রতি পদে অনুভব করে।

সুকুমার সেন

(মহমেডান)

কর্মী, সুদর্শন মহমেডানের নিয়মিত নির্ভরশীল ব্যাক সুকুমার সেন কলকাতা ময়দানে খেলা শুরু করে '৬০ সাল থেকে। এক বছর স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলে পরের দু'বছর '৬১-৬২ হাওড়া ইউনিয়নে সুকুমার সেন যোগ দেয়। '৬৩ থেকে '৬৬ সে খেলে এরিয়ানে। তখন থেকেই নামডাক শুরু। '৬৭ থেকে মহমেডানের অপরিহার্য খেলোয়াড়। মাঝে '৬৮-তে চাকরির জন্য বি এন আরে খেলতে হয়েছিল।

সুকুমার সেন ভালো খেলেও জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় নি। কোন বড় দলের হয়ে না খেললে অনেক সময় সে রকম সুযোগ আসে না।

ছাব্বিশ বছর বয়সী সুকুমার সেনের বড় হবার মূলে বাড়ির দাদা ও অন্যান্যদের প্রেরণাই বেশি। পরে বলাই চ্যাটার্জীর নামও এর কাছে স্মরণীয়।

বলরাম আর অরুণ ঘোষ হচ্ছে সুকুমার সেনের প্রিয় খেলোয়াড়। এ ছাড়া শৈলেন মান্নার খেলা তো আছেই।

সুকুমার সেনের স্মরণীয় খেলা হচ্ছে, ১৯৬৭-র মহমেডান-ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাটি। এক গোলে পিছিয়ে থেকেও দশজনে খেলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে সেবার মহমেডান লীগ বিজয়ী হয়। ওই খেলার কথা সুকুমার সেন কোনদিনই ভুলবে না।

কলকাতার দর্শকদের দুর্দশা সুকুমার সেনকে কষ্ট দেয়। এরা খেলা কত ভালোবাসে। অথচ খেলা দেখার অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। অথচ পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমন নজীর নেই।

সুকুমার সেন রাতে খেলার পক্ষপাতী। লাইটে খেললে স্ট্যামিনা বাড়ে বলে তার বিশ্বাস। রোভার্সে খেলে তার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর দর্শকদেরও অনেক সুবিধে। রোদে পুড়ে তাদের এখনকার মতো এত কষ্ট করতে হবে না। তা ছাড়া খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়েই বাড়তি সুবিধা পায়।

সমরেশ চৌধুরী

(ইস্টবেঙ্গল)

অশোক নগরের ছেলে সমরেশ চৌধুরী ওরফে পিন্টু এখন ইস্টবেঙ্গলে নিয়মিত হাফে খেলছে। বয়স অল্প, মাত্রই '৬৭-তে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় চলে আসে।

'৬৭-তে উয়াড়ীতে খেলার সুযোগ পায় সমরেশ। '৬৮-তে জুনিয়ার বাংলা দলের খেলোয়াড় হিসেবে নিজের স্থান করে নেয়। '৬৯ [illegible] উয়াড়ীতে [illegible] এবছর অনেক আশা নিয়ে ইস্টবেঙ্গ[ল] যোগ দিয়েছে।

যদিও কাজল বা প্রশান্তর তুল[নায়] সমরেশ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তবু [তার] আন্তরিক নিষ্ঠা আছে। খেলা [শে]খার অদম্য প্রেরণাই সমরেশকে বড় হবার [পথে] এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পা[রুক] আর না পারুক, সমরেশ সারা মাঠময় ছু[টে] বেড়ায়। ওর দূরে থেকে নেওয়া শ[ট] অনেক সময় দর্শনীয় হয়ে গোলে [ঢোকে]।

সমরেশ চৌধুরীর প্রিয় খেলো[য়াড়] কাজল মুখার্জি। ছেলেবেলা থে[কে] সমরেশ যাকে আদর্শ খেলোয়াড় হিসে[বে] প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজ সৌভাগ্যক্রমে সে কাজল মুখার্জির পাশে পাশে খেল[ার] সুযোগ পাচ্ছে।

অশোকনগরের ছেলে সমরেশ চৌধুরী[র] স্বপ্ন একটাই। বড় খেলোয়াড় হিসে[বে] নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিমান লাহিড়ী

(মহমেডান)

মারডেকা ট্রায়ালে আমন্ত্রিত মহ[মে]ডানের একমাত্র খেলোয়াড় বিম[ান] লাহিড়ী কলকাতা ময়দানের একটি সুপরি[চি]ত নাম। বিমান লাহিড়ী বড় খেলোয়া[ড়] হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে[?] অবিস্মরণীয় শিবদাস ভাদুড়ী ও বিজয়দা[স] ভাদুড়ী তার দিদিমার আপন কাকা[।] কাজেই বিমানের রক্তে আছে জাত খেলো[য়া]ড়ের রক্ত।

কলকাতা ময়দানে বিমান প্রথম খেলে '৬৩-তে হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে। '৬৪ '৬৫ স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলে '৬৬-[তে] বিমান যোগ দেয় এরিয়ানে। '৬৭-[তে] অনেক আশা নিয়ে মোহনবাগানে আসে[।] সে বছরই সুনীল ভট্টাচার্যের নেতৃ[ত্বে] ব্যাঙ্ককগামী জুনিয়ার ভারতীয় দলে[র] সদস্য। মোহনবাগানে গিয়ে আশানুরূ[প] ভালো খেলতে পারল না বিমান। '৬৮-[তে] আবার এরিয়ানে প্রত্যাবর্তন। '৬৯-[এ] মহমেডানে চলে আসে। সেই থেকে মহমেডান তো বটেই, বাংলা দলের[ও] নিয়মিত খেলোয়াড়। ১৯৬৬, ৬৮ ও ৬৯-[এ] বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে বিমা[ন] খেলে। গতবার সন্তোষ ট্রফি বিজয[়ী] বাংলা দলের অন্যতম খেলোয়াড় বিমা[ন] মণ্ডগাঁর মাঠে গোল দিয়েছে পাঁচটি।

কোচ রমণী সরকার, শচীন হালদা[র] ও শৈলেন মান্নার কাছ থেকে তালিম পাওয়[া] বিমান যে কোন দলের আক্রমণের প্রধা[ন] উৎস। বিপক্ষের রক্ষণভাগকে তছন[ছ] করতে ওর জুড়ি নেই। সুন্দর প্র[...]

জোরালো ভলি, নিখুঁত পেনাল্টি আর মনোরম ভঙ্গীতে বিমান যখন সতীর্থদের সাথে আক্রমণ হানে, তখন তা চেয়ে দেখার মতো।

হুগলী জেলার প্রাক্তন অধিনায়ক বিমান লাহিড়ী নিজগুণেই কলকাতা মাঠের সবার প্রিয়। ভালো খেলে বিমান আরও উন্নতি করবে, এমন আশা করা মোটেই অনুচিত নয়।

সুনীল ভট্টাচার্য

(ইস্টবেঙ্গল)

জাত খেলোয়াড় হয়েও সুনীল ভট্টাচার্য ভাগ্যের বিরূপতায় ঠিকমতো খেলতে পারছে না। খালি আঘাত আর আঘাত। ১৯৬৭ সালে ভারতীয় যুব ফুটবলের অধিনায়ক হয়ে বিদেশে গিয়ে প্রথম পায়ে আঘাত পায় সুনীল। ফলে সে বছর লীগে খেলতে সক্ষম হয় নি। '৬৮-তে এশিয়ার একটি দলের বিরুদ্ধে দিল্লীতে এক প্রদর্শনী ম্যাচে খেলতে গিয়ে আবার আহত হলো সুনীল। আঘাত গুরুতর। এর পরে খেলা স্থগিত থাকার পর '৬৯-এ কালীঘাটের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে একই জায়গায় আবার চোট। আবার বেশ কয়েক মাস মাঠে নামা বন্ধ। গতবার শেষের দিকে খেলায় অনবদ্য খেলা। ফলস্বরূপ তেহরাণগামী বাংলা দলের খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণ। '৭০-এর শুরুতে অনেক আশা নিয়ে সুনীল মাঠে নামে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়ে আবার আঘাত। ফলে লীগের শুরুতে আর মাঠে নামা হলো না। পরে আঘাত একটু কমে যাওয়ায় সুনীল তার পরে মাঠে নামে। কিন্তু বড় খেলায় মহমেডানের বিপক্ষে আবার পায়ে চোট লাগে। তারপর বেশ ক'টি ম্যাচ বাদ দিয়ে খিদিরপুরের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে আবার জখম ও মাঠত্যাগ।

অথচ সুনীলের মধ্যে কত সম্ভাবনা ছিল। সুনীল '৬৪-তে কালীঘাটের হয়ে লীগে প্রথম খেলতে নামে। '৬৬-তে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেয়। এর ফাঁকে বেশ কয়েকবার জুনিয়ার বাংলা ও জুনিয়ার ভারতীয় দলের নেতৃত্বভার নিয়ে ঘরে ও বাইরে অসংখ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বার্মা, থাইল্যাণ্ড, জাপান সহ বহু দেশের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা তার আছে।

শান্ত স্বভাবের সুনীল ধীরস্থিরভাবে এতো সুন্দর খেলে যে, তার তারিফ না করে পারা যায় না। ম্যাচে খেললেও এতটুকু পায়ের জোর কমায় না। সুনীল মাঠে থাকলে যে কোন দলেরই রক্ষণভাগ বাড়তি শক্তি পায়।

সর্বজনপ্রিয় এই খেলোয়াড়টির খেলোয়াড়ী জীবন বড়ই দুঃখের। এত আঘাতের পরও কারও পক্ষে মাঠে নামা কল্পনার অতীত। তবু সুনীল খেলবার ইচ্ছা রাখে।

অশোক ব্যানার্জী

(খিদিরপুর)

অশোক ব্যানার্জী ফুটবল খেলোয়াড় না হয়ে ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ও হতে পারতো। '৬২-তে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় অশোক বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। কিন্তু বরাবরই ফুটবলের প্রতি অশোকের ঝোঁক। ফলে র‍্যাকেট ছেড়ে বল নিয়েই মেতে রইলো।

তেইশ বছরের যুবক অশোক ব্যানার্জীর শ্যামনগরে বাড়ি। অগ্রজ পান্নালাল ব্যানার্জীর কাছেই ফুটবলের হাতে-খড়ি। পরে প্রাক্তন ভারতীয় খেলোয়াড় কৃষ্ণচন্দ্র পাল ওকে বড় হতে সাহায্য করেছেন।

প্রথমে গ্রীয়ার পরে বালী প্রতিভায় খেলে বড় হবার প্রেরণায় অশোক '৬৮-তে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য অশোকের সহায় হয় নি, তাই '৬৯-এ খিদিরপুরে নাম লিখিয়ে আবার ছোট ক্লাবে ফিরে আসে। '৬৪, '৬৫-তে আন্তঃ জেলা প্রতিযোগিতা ও '৬৭, '৬৮ সালে জুনিয়ার বাংলা দলের হয়ে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেছে অশোক। '৬৯-এ সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড় অশোক সে বছরই তেহরাণ সফরে গিয়েছে।

অশোক ব্যানার্জীর প্রিয় খেলোয়াড় অরুণ ঘোষ। অরুণ ঘোষের আদর্শ সামনে রেখে অরুণ ঘোষের শূন্যস্থান পূরণের জন্য যে ক'জন উঠতি তরুণ জোর কদমে এগিয়ে আসছে, অশোক ব্যানার্জী তাদের অন্যতম। মারডেকা ট্রায়ালে আমন্ত্রিত অশোকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এস জোহা

(মহমেডান)

এলাহাবাদের ছেলে জোহা খেলাধুলায় প্রথম নাম করে জামসেদপুরে স্পোর্টিং দলে খেলে। জামসেদপুর ছেড়ে টিসকোয় এসে নামডাক একটু বাড়ে। সেই সঙ্গে ফুটবলের তীর্থক্ষেত্র কলকাতায় খেলার ইচ্ছেটাও বাড়তে থাকে। '৬৭-তে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং থেকে ডাক আসামাত্রই একবাক্যে জোহা টিসকো ছেড়ে কলকাতায় চলে এলো। কিন্তু মহমেডানে তখন মুস্তাফা নির্ভরশীল গোলরক্ষক। ফলে সে বছর দু' নং গোলরক্ষক হয়েই জোহাকে খুশি থাকতে হলো।

মাঝে এমন দিন গেছে যে, মুস্তাফার বদলে জোহা মাঠে নামলে দলের সমর্থকরা চটে যেতো। আর এখন জোহা না নামলেই তারা চটে যায়।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জোহা যাঁদের কাছ থেকে খেলা শিখেছে তাঁরা হচ্ছেন কোচ রহিম কুদরুস প্রমুখ।

১৯৬৭ থেকে '৭০ পর্যন্ত মহমেডানে খেলার ফাঁকে জোহা রোভার্স, ডুরাণ্ড ছাড়াও সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছে। গত বার সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের নিয়মিত গোলরক্ষক জোহা একেবারে অন্তিমপর্বে মাতৃবিয়োগের সংবাদ শুনে নওগাঁও মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে ফাইনালে খেলার সুযোগ আর তার হয় নি।

জোহার প্রিয় খেলোয়াড়দের মধ্যে থঙ্গরাজের নাম সর্বাগ্রে। জোহা যদি থঙ্গরাজের আদর্শকে সামনে রেখে খেলে যায়, তার উন্নতি না হবার কোন কারণ নেই।

ফুটবলের মক্কানগরী কলকাতায় খেলার জন্য সারা ভারতের অনেক খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন নিয়েই জোহা কলকাতায় এসেছে। বলা বাহুল্য, জোহা সুনামও পেয়েছে। কিন্তু জোহার কাছে এসব কিছুই নয়। সে আরও ভালো খেলে আরও বড় খেলোয়াড় হতে চায়। মহমেডানের অধিনায়ক জোহা তাই নিয়মিত কোচ মমতাজ হোসেনের পরামর্শ অনুযায়ী গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয় নিয়ে অনুশীলন করে চলেছে।

মেক্সিকো সিটির আজটেক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের (জুলে রিমে ট্রফির) চূড়ান্ত খেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ফুটবলের রূপকথার রাজকুমার 'ব্ল্যাকপার্ল' পেলে আবার শুধু অনন্যসুলভ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের জন্যই নয়, একটা নতুন রেকর্ড স্থাপনের গৌরবের সূত্রে সংবাদের শিরোনামায় এসেছেন। আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে খবর বেরিয়েছে যে বিশ্বকাপের চল্লিশ বছরের ইতিহাসে 'পেলেই' নাকি একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি তিনটি ফাইন্যালে অংশ গ্রহণের সূত্রে তিনবার বিজয়ীর পদক লাভ করেছেন। কিন্তু এই সংবাদের সূত্র যে কি, তা সংবাদদাতারা উল্লেখ করেন নি। জানি না, বিদেশী কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এই সংবাদের সূত্র কিনা। তবে রেকর্ড বুকের পাতা ঘেঁটে বিশ্ববন্দিত পেলের তিনবার বিশ্বকাপ ফাইন্যালে অংশ গ্রহণের কোন নজীর পাওয়া যাচ্ছে না।

১৯৫৮ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে 'ওয়ান্ডার বয়' পেলে ইনসাইড লেফ্‌ট্‌ হিসেবে, ব্রেজিলের প্রথম বিশ্বজয়ী দলে খেলবার সুযোগ পান। ১৯৫৮ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের মূল পর্যায়ের খেলায় চতুর্থ পুলের প্রতিযোগী ছিল ব্রেজিল। পুল লীগের প্রথম খেলায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় খেলায় ইংলন্ডের বিরুদ্ধে 'দলের শিশু' পেলেকে সুযোগ দেওয়া হয় নি। পেলে প্রথম খেলবার সুযোগ পেলেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে পুল লীগের শেষ খেলায়. সেই খেলায় কোচ ফিওলা ব্রেজিলের আক্রমণভাগে শুধু নতুন তারকা পেলেকেই খেলবার সুযোগ দিলেন তাই নয়, দলের খেলোয়াড়দের অনুরোধে "ক্ষুদে পাখী" গ্যারিঞ্চাও দলভুক্ত হলেন দক্ষিণ প্রান্তিক খেলোয়াড় হিসেবে। ফিওলা সেন্টার ফরোয়ার্ড 'ম্যাজোলাকে' বসিয়ে দিয়ে ভাভাকে দিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব। পেলের যাদু, গ্যারিঞ্চার সম্মোহন, আর ভাভার লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতায় ব্রেজিল দলের পুনর্জন্ম হল। ১৯৫৮ সালে গোটেবার্গের আসরে পেলে গ্যারিঞ্চা বিশ্ব ফুটবলের আসরে পদক্ষেপ করলেন। কোয়ার্টার ফাইন্যাল, সেমিফাইন্যাল এবং ফাইন্যালের 'ক্ষুদে পাখী' আর 'কালো মুক্তো' শুধু অংশ গ্রহণ করলেন-ই না, এই দুজনের শাণিত আক্রমণে এবং ক্রীড়াকুশলতায় ব্রেজিল প্রথমবার বিশ্ব ফুটবলের শিখরাসীন হল সোনার পরীওয়ালা জুলে রিমে কাপ জয় করে। পেলে কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওয়েলশের বিরুদ্ধে করা একমাত্র গোলটি করে এবং সেমি-ফাইন্যালে ফ্রান্সের বিপক্ষে করা পাঁচটির মধ্যে দুটি গোল করে বিশ্ব ফুটবলের আঙিনায় তাঁর আবির্ভাবকে স্বর্ণলিপিতে চিহ্নিত করলেন।

১৯৬২ সালের বিশ্ব কাপের আসরে পেলের আবির্ভাব মধ্য গগনের ভাস্করের মতো ভাস্বর হতে পারলো না শুধু পায়ের মাংসপেশীর আঘাতের জন্যেই। চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াগোতে অনুষ্ঠিত এই আসরে পেলে গ্রুপ লীগের দুটি মাত্র খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম খেলায় ভিনা-ডেল-মারের সমুদ্র তীরবর্তী মনো-গোলের মধ্যে একটি করলেও পরবর্তী খেলায় পেলে একেবারে বসে গেলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে পুল লীগের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবার সময় প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটের সময় গোলপোস্টের পাদদেশে বাঁ পায়ে প্রচণ্ড সট করে গুরুতরভাবে মাংসপেশী সংকোচনে আক্রান্ত হলেন। আর চিলির বিশ্বকাপের আসরে এইটিই হল তাঁর সেবারের মতো শেষ খেলা।

আহত পেলের শূন্যস্থান কেবলে পূরণ করলেন আমারিল্ডো। শুধু তাই নয়, গ্রুপ লীগে ১ গোলে পিছিয়ে থেকেও স্পেনের বিরুদ্ধে আমারিল্ডোর দু' গোলেই ব্রেজিল জয়লাভ করলো। পেলের পরিবর্ত খেলোয়াড় আমারিল্ডোর ক্রীড়া-দক্ষতা ব্রেজিলকে ঐ বছরের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলায় ৩—১ গোলে ইংল্যান্ডকে, সেমি-ফাইন্যালে ৪—২ গোলে চিলিকে এবং ফাইন্যালে ৩—১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারাবার ব্যাপারে মস্ত এক ভূমিকা নিয়েছিল। ঐ ছাড়া ফাইন্যালে আমারিল্ডোর গোলেই ০—১ গোলে পিছিয়ে থাকা ব্রেজিল দল সমতা ফিরিয়ে এনে শেষ অবধি ৩—১ গোলে জয়ের সূত্রে পর পর দু বার বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের আখ্যা লাভ করেছিল।

চিলিতে পুল লীগের শেষ খেলা থেকে ফাইন্যাল অবধি বিভিন্ন খেলায় যাঁরা ব্রেজিল দলে খেলেছেন, তাঁদের নামের তালিকা নিচে দেওয়া হলঃ—

ব্রেজিল বনাম স্পেন—

ব্রেজিলঃ—গিলমার, ডি স্যান্টোস, মউরো, জোজিয়ো, এল স্যান্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, অ্যামারিল্ডো, জাগালো।

কোয়ার্টার ফাইন্যালঃ—ব্রেজিল বনাম ইংল্যান্ডঃ—

ব্রেজিলঃ—গিলমার, ডি স্যান্টোস, মউরো, জোজিমো, এল স্যান্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, অ্যামারিল্ডো, জাগালো।

সেমি-ফাইন্যালঃ ব্রেজিল বনাম চিলি—

ব্রেজিলঃ—গিলমার, ডি স্যান্টোস, মউরো, জোজিমো, এল স্যান্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, অ্যামারিল্ডো, জাগালো।

ফাইনাল: ব্রেজিল বনাম চেকো-শ্লোভাকিয়া—

ব্রেজিল—গিলমার, ডি স্যান্টোস, মউরো, জোজিমো, এল স্যান্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাবা, অ্যামারিল্ডো, জাগালো।

দেখা যাচ্ছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে পুল লীগ ম্যাচ খেলবার পর থেকে ব্রেজিল ফাইন্যাল অবধি একই টিম মাঠে নামিয়েছে। তা ছাড়া সে সময়ে বিশ্বকাপে, শুধু বিশ্বকাপে কেন, কোন খেলাতেই বদলী খেলোয়াড় নামাবার বিধান ছিল না। তাই ব্রেজিলের ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ফাইন্যাল সমেত শেষ খেলাতেও পেলে যে অংশ নেন নি, এটা একটা তথ্যনির্ভর সত্য। ১৯৬৬ সালের লণ্ডনের আসরে পেলের টীম ব্রেজিল কোয়ার্টার ফাইন্যালেই পৌঁছয় নি। তাই সে বছর পেলের ফাইন্যালে খেলার প্রশ্নই ওঠে না। তবে এবারে (১৯৭০) পেলে ক্রীড়া-জীবনের অপরাহ্নবেলায় মধ্যগগনের সূর্যের মতোই দীপ্ত তেজে খেলে শুধু দলকে ফাইন্যালেই তোলেন নি, ফাইন্যালে তাঁর উপস্থিতিকে জয়ের সাথে সাথে প্রথম গোল করার সূত্রে চিরন্তন করে রেখেছেন।

তা হলে? পেলে ফাইন্যালে অংশ নিয়েছেন ১৯৫৮-তে গোটেবার্গে এবং ১৯৭০-এ মেক্সিকো সিটির আজটেক স্টেডিয়ামে। তবে ১৯৬২-তে বিজয়ী দলের খেলোয়াড় হিসেবে ফাইন্যালের বিজয়ীর পদক লাভ করে থাকবেন। কিন্তু এ থেকে কি প্রমাণিত হয় যে, পেলে তিনবার বিশ্বকাপ ফাইন্যালে খেলেছেন? না, বিশ্বকাপের ইতিহাসও তা বলে না।

॥ পেলে ॥

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার তিনটি ফাইন্যালে পেলে খেলেন নি

অলিম্পিক ফুটবল বিজয়ীদের তালিকা

বর্ষ	বিজয়ী	বর্ষ	বিজয়ী
১৯০৮	গ্রেট বৃটেন	১৯৩৬	ইতালী
১২	ঐ	৪৮	সুইডেন
২০	বেলজিয়াম	৫২	হাঙ্গেরী
২৪ ও ২৮	উরুগুয়ে	৫৬	রাশিয়া
		৬০	যুগোশ্লাভিয়া
৩২	প্রতিযোগিতা হয়নি	৬৪	হাঙ্গেরী
		৬৮	হাঙ্গেরী

ভারতের অলিম্পিক ফুটবল অধিনায়কগণ

বর্ষ	স্থান	অধিনায়ক
১৯৪৮	লণ্ডন	টি, আও
৫২	হেলসিংকি	শৈলেন মান্না
৫৬	মেলবোর্ণ	সমর ব্যানার্জী
৬০	রোম	প্রদীপ ব্যানার্জী
৬৪	প্রাথমিক পর্বেই ভারত ইরাণের কাছে পরাজিত হয়, চুনী গোস্বামী অধিনায়ক ছিলেন।	

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফলাফল

বর্ষ	বিজয়ী	অনুষ্ঠান ক্ষেত্র
১৯৪১	বাংলা	কলকাতা
৪২	খেলা হয় নি	
৪৪	দিল্লী	দিল্লী
৪৫	বাংলা	বোম্বাই
৪৬	মহীশূর	বাঙ্গালোর
৪৭	বাংলা	কলকাতা
৪৮	খেলা হয় নি	
৪৯-৫০	বাংলা	কলকাতা
৫১	বাংলা	বোম্বাই
৫২	মহীশূর	বাঙ্গালোর
৫৩	বাংলা	কলকাতা
৫৪	বোম্বাই	মাদ্রাজ
৫৫	বাংলা	এর্ণাকুলাম
৫৬	হায়দ্রাবাদ	ত্রিবান্দ্রম
৫৭	হায়দ্রাবাদ	হায়দ্রাবাদ
৫৮	বাংলা	মাদ্রাজ
৫৯	বাংলা	মডগাঁ
৬০	সার্ভিসেস	কোজিকোড়
৬১	রেলওয়ে	বোম্বাই
৬২	বাংলা	বাঙ্গালোর
৬৩	বোম্বাই	মাদ্রাজ
৬৪	রেলওয়ে	গৌহাটি
[illegible]	অন্ধ্র	কুইলন
৬৬	রেলওয়ে	ব্যাঙ্গালোর
[illegible]	মহীশূর	কটক
[illegible]	মহীশূর	বাঙ্গালোর
৬৯	বাংলা	গৌহাটি

॥ চুনী গোস্বামী ॥
শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় ফুটবলে [illegible] চুনী গোস্বামী নিজে [illegible] [illegible] [illegible]। চুনীর মতে [illegible] [illegible] কি [illegible] কোনদিন [illegible] [illegible] যা?

॥ পি· কে· ব্যানার্জী ॥
খেলোয়াড় পি· কে· ব্যানার্জি নতুন রূপে আমরা এখন পাচ্ছি [illegible] [illegible] [illegible]।

বিজয়ী	বিজয়ী
৪২ ইস্টবেঙ্গল	৪৩-৪৪ মোহনবাগান
৪৫-৪৬ ইস্টবেঙ্গল	৪৭ ফুটবল লীগ বন্ধ
৪৮ মহ: স্পোর্টিং	৪৯-৫০ ইস্টবেঙ্গল
৫১ মোহনবাগান	৫২ ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৩ ফুটবল লীগ মাঝপথে পরিত্যক্ত	১৯৫৪-৫৬ মোহনবাগান
	১৯৫৭ মহ: স্পোর্টিং
৫৮ ইস্টার্ন রেল	৫৯-৬০ মোহনবাগান
৬১ ইস্টবেঙ্গল	৬২-৬৫ মোহনবাগান
৬৬ ইস্টবেঙ্গল	৬৭ মহমেডান স্পোর্টিং
৬৮ পরিত্যক্ত	৬৯ মোহনবাগান

ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তালিকা

১৮৮৮ রয়্যাল স্কচ্ ফুজিলার্স	৮৯-৯০ এইচ এল আই
৯১-৯২ স্কটিশ বর্ডারার্স	৯৩-৯৫ এইচ এল আই
৯৬ এস এল আই	৯৭-৯৯ ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯০০-০১ এস ডবলিউ বর্ডারার্স	০২ হ্যাম্পশায়ার রেজি:
০৩ রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস	০৪ নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার
০৫ রয়্যাল ড্রাগনস	০৬-০৭ ক্যামেরোনিয়ান্স
০৮-০৯ লেন ফুজিলার্স	১০ রয়্যাল স্কটস
১৩ লেন ফুজিলার্স	১৪-১৯ খেলা হয় নি
২০ ব্ল্যাক ওয়াচ	২১ থার্ড উরশেস্টার্স
২২ লেন ফুজিলার্স	২৩ চেশায়ার রেজিমেণ্ট
২৪ ফাস্ট উরস্টের্স	২৫ শেরউড ফরেস্টার্স
২৬ ডারহাম এল আই	২৭ ইয়র্ক এণ্ড ল্যাংকাশায়ার রেজি:
২৮ শেরউড ফরেস্টার্স	২৯-৩০ ইয়র্ক এণ্ড ল্যাংকাশায়ার রেজি:
৩১ ডেভনশায়ার রেজি:	৩২-৩৩ কিংস এ্রফশায়ার এল আই
৩৪ বি, কোর, সিগন্যালস	
৩৫ বর্ডার রেজি:	৩৬ এ এণ্ড এস হাইল্যাণ্ডার্স
৩৭ বর্ডার রেজি:	৩৮ এস ডবলিউ বর্ডারার্স
৪০ মহমেডান স্পোর্টিং	৪১-৪৯ প্রতিযোগিতা বন্ধ
৫০ হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিশ	৫১-৫২ ইস্টবেঙ্গল
৫৩ মোহনবাগান	৫৪ হায়দ্রাবাদ পুলিশ
৫৫ মাদ্রাজ রেজি: সেণ্টার	৫৬ ইস্টবেঙ্গল
৫৭ হায়দ্রাবাদ পুলিশ	৫৮ মাদ্রাজ রেজি: সেণ্টার
৫৯ মোহনবাগান	৬০ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল (যুগ্ম বিজয়ী)
৬১ হায়দ্রাবাদ পুলিশ	
৬২ প্রতিযোগিতা বন্ধ	৬৩-৬৫ মোহনবাগান
৬৬ গুর্খা ব্রিগেড	৬৭ ইস্টবেঙ্গল
৬৮ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স	৬৯ গুর্খা ব্রিগেড

রোভার্স কাপ বিজয়ীদের তালিকা

১৮৯১-৯২ উরসেস্টার্স	১৮৯৩ ফুজিলার্স
৯৪-৯৫ রয়্যাল স্কচ ফুজিলার্স	৯৬ ডারহাম লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি
৯৭ মিডলসেক্স রেজিমেণ্ট	৯৮ এইচ এল আই
৯৯ রয়্যাল আইরিশ রেজি:	১৯০০-৪২ রয়্যাল হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০১ রয়্যাল আইরিশ রেজি:	০২-০৪ চেশায়ার রেজি:
০৫ সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স	০৬ রয়্যাল স্কচ্
০৭ ইস্ট ল্যাংকাশায়ার	০৮ উরশেস্টার্স
০৯-১০ ল্যাংকাশায়ার রেজি:	১১ রয়্যাল ওয়ার্কশায়ার রেজি:
১২ উরশেস্টার্স রেজিমেণ্ট	১৩ রয়্যাল স্কটিশ ফুজিলার্স
১৪-২০ প্রতিযোগিতা বন্ধ	২১ ডি সি এল আই
২২-২৩ ডারহাম লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি	২৪-২৬ মিডলসেক্স রেজি:
২৭ চেশায়ার রেজি:	২৮ ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ান ওয়ার্কশায়ার রেজি:
২৯ সেকেণ্ড ব্যাটেলিয়ান ওয়ার্কশায়ার রেজি:	
৩০ কে ও এস বি	৩১ রয়্যাল ওয়েস্ট কেণ্ট
৩২ রয়্যাল আইরিশ ফুজিলার্স	৩৩ কিংস লিভারপুল রেজি:
৩৪ শেরউড ফরেস্টার্স	৩৫-৩৬ ঐ

॥ অরুণ ঘোষ ॥

অরুণ ঘোষ আজো খেলছেন—কিন্তু তাঁর সেই আগেকার মনমাতান খেলা আর আমরা দেখতে পাই না।

॥ শান্ত মিত্র ॥

শান্ত মিত্র সেন আর আগের মত খেলতে পারছেন না।

॥ থঙ্গরাজ ॥

ভারতের সেরা গোলরক্ষক থঙ্গরাজের খেলা এখন শেষ প্রান্তে।

৩৭-৩৮	ব্যাঙ্গালোর মুসলিম	৩৯	ফিল্ড ব্রিগেড
৪০	মহমেডান স্পোর্টিং	৪১	ওয়েলস রেজিঃ
৪২	বাটা স্পোর্টস ক্লাব	৪৩	আর এ এফ
৪৪	ব্রিটিশ বেস রি-এনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্প	৪৫	মিলিটারী পুলিশ
৪৬	ব্রিটিশ বেস রি-এনফোর্সমেণ্ট ক্যাম্প	৪৭	খেলা হয় নি
৪৮	ব্যাঙ্গালোর মুসলি	৪৯	ইস্টবেঙ্গল
৫০-৫৪	হায়দ্রাবাদ পুলিশ	৫৫	মোহনবাগান
৫৬	মহমেডান স্পোর্টিং	৫৭	হায়দ্রাবাদ পুলিশ
৫৮	ক্যালটেক্স	৫৯	মহমেডান স্পোর্টিং
৬০	অন্ধ্র পুলিশ	৬১	ই এম ই সেণ্টার
৬২	ইস্টবেঙ্গল ও অন্ধ্র পুলিশ (যুগ্ম বিজয়ী)	৬৩	অন্ধ্র পুলিশ
৬৪	বি এন আর	৬৫	মফতলাল
৬৬	মোহনবাগান	৬৭	ইস্টবেঙ্গল
৬৮	মোহনবাগান	৬৯	ইস্টবেঙ্গল

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সাক্ষাৎকারের ফলাফল

১৯২৫	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
২৬	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	১
	ঐ	০	ঐ	০
২৭	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
২৮	মোহনবাগান	২	ঐ	১
	ঐ	০	ঐ	০
৩২	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ঐ	৩	ঐ	২
৩৩	ইস্টবেঙ্গল	২	ঐ	২
	ঐ	১	ঐ	১
৩৪	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
	ঐ	১	ঐ	১
৩৫	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	ঐ	১	ঐ	১
৩৬	ঐ	৪	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
৩৭	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
৩৮	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	১
৩৯	মোহনবাগান	২	ঐ	১
৪০	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	,,	০	,,	০
৪১	,,	২	মোহনবাগান	০
	,,	২	,,	০
৪২	,,	২	মোহনবাগান	২
	,,	১	,,	০
৪৩	,,	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
৪৪	মোহনবাগান	১	,,	০
	,,	২	,,	০
৪৫	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
৪৬	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০

॥ অশোক চ্যাটার্জী ॥
অশোকের খেলার ভঙ্গী এখনো চকিত-চমকে সকলকে চমৎকৃত করে।

॥ বিদ্যুৎ মজুমদার ॥
ভাবতে অবাক লাগে, বিদ্যুৎ মজুমদারকে এখনো খেলতে দেখা যায়।
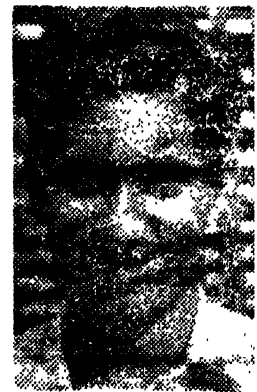
॥ পি সিংহ ॥
প্রশান্তর খেলা এখনো দর্শকদের অবাক বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়।

সাল	দল	গোল	দল	গোল
৪৮	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	৩	ইস্টবেঙ্গল	০
৪৯	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
	"	২	"	১
৫০	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	২
৫১	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	০
৫২	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	"	১	মোহনবাগান	০
৫৩	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৫৪	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	১
৫৫	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
৫৬	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
	"	০		০
৫৭	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৫৮	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	১
৫৯	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৬০	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
৬১	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৬২	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
প্লে-অফ্ ম্যাচ	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
৬৩	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	০
৬৪	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	১
৬৫	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
৬৬	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৬৭	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
৬৮	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল (সুপার লীগ)	০
৬৯	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান (সুপার লীগ)	০

॥ সি প্রসাদ ॥
মোহনবাগানের রক্ষণভাগের প্রধান স্তম্ভ এখনো সি প্রসাদই।

॥ মানস ব্যানার্জী ॥
কালীঘাটের অধিনায়ক মানস চিরকাল মাঝারি-আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেসে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৃহস্পতিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
৭৫ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 6th August, 1970

বিধানসভা বাতিলের পর

গত ৩০শে জুলাই রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এক বিশেষ হুকুমনামা বলে বাতিল করে দিয়েছেন। গত ১৬ই মার্চ শরিকী দ্বন্দ্বে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর চার মাসের ওপর বিধানসভাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। ঐভাবে বাঁচিয়ে রাখার পর নেপথ্যে চলছিল পুনর্নির্বাচন এড়িয়ে একটি জনপ্রিয় সরকার গঠনের প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে সেই নেপথ্য কাহিনী এখন আর অজানা নয়। আট পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের যুক্ত মোর্চায় এবং নব কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে আর একটি সরকার গঠন হয়তো অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের সতর্ক দৃষ্টির জন্য শেষ পর্যন্ত সরকার গঠনে আগ্রহী দলগুলির সাধ মিটল না, আশাও মিটল না। কংগ্রেসের কোনো রকম সমর্থনে ফরওয়ার্ড ব্লক সরকার গঠনে অস্বীকৃত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে আর একটি মন্ত্রিসভা গঠনের আশা বিলুপ্ত হয়। হয়তো সেই কারণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে রাজ্যপালকে না জানিয়ে উপায় ছিল না যে, পশ্চিমবঙ্গে আর একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে যে, ছয় পার্টির সঙ্গে অন্য একটি দলের গোপন শলা-পরামর্শের ফলে আর একটি সরকার গঠনের সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে নাটকীয় দ্রুততার মধ্যে যদি বিধানসভা বাতিল করা হয়, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। এতো দ্রুত বিধানসভা বাতিল করার কথা কেন্দ্রীয় সরকারও ভাবেন নি। ৯ ঘণ্টার ঝটিকা সফরে কলকাতায় এসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃংখলা ও কলকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি অধিকতর মনোযোগী। বিধানসভা ভেঙে দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্নটা নির্ভর করছে রাজ্যপালের ওপর। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কয়েকদিন আগে রাজ্যপাল নয়াদিল্লী থেকে ফেরার পথে দমদম বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কথা তিনি ভাবছেন না, যদি একটা জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই দিকেই তিনি চেষ্টা করছেন।

সেই চেষ্টা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, শ্রেণীগত স্বার্থ ও বিক্ষুব্ধ জনগণের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই সচেতন রাজনৈতিক দলগুলি জনপ্রিয় সরকার গঠনে আগ্রহী দলগুলিকে নিরাশ করেছে, ব্যর্থ হয়েছেন স্বয়ং রাজ্যপালও।

এদিকে গত ১৪ই জুলাই সারা পশ্চিমবঙ্গে ছ'পার্টি ও আট পার্টি কর্তৃক আহূত সফল হরতাল দিল্লীর মন বিগলিত করতে না পারলেও, ছ'পার্টির প্রথম দাবি ছিল বিধানসভা ভেঙে দিয়ে সত্বর অন্তর্বর্তী পুনর্নির্বাচনের, আট পার্টিও দাবি করেছিল পুনর্নির্বাচনের।

বিধানসভা বাতিল হওয়ায় তা পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় সব দলগুলি কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। কবে পুনর্নির্বাচন হবে, সেই প্রশ্নটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

ছ' পার্টি আগামী নভেম্বরেই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, আগামী নির্বাচনে তাঁদের পার্টি সংখ্যাধিক্যে জয়ী হবে, তাঁদের পার্টি ২৮০টি আসনেই প্রার্থী দেবে, তবে বিচার-বিবেচনার পর কোনো কোনো আসনে প্রার্থী না দিতেও পারে। ছ'পার্টির এভাবে এগিয়ে আসার পর আট পার্টির পক্ষে দুঃসংবাদ এই যে, যে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বিধানসভা বাতিল হয়, সেদিন রাত্রে বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় আট পার্টির ফ্রন্টে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য আট পার্টির অন্তর্ভুক্ত দলগুলির সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বাংলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কথা বলতে রাজী হয়েছেন। আট পার্টির অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ঐ পার্টির কোনো কোনো নেতা বলতে সুরু করেছেন—বাংলা কংগ্রেস ও আর-এস-পি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা আগামী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবেন। ঐ দুই পার্টি যোগ না দিলে তাঁদের অবস্থা কি হবে সে ব্যাপারে তাঁরা কোনো মন্তব্য করেন নি। এইরূপ পরিস্থিতিতে আট পার্টির পক্ষে আশু নির্বাচনের দাবি করা সম্ভব নয়। সেদিক থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী পুনর্নির্বাচনের দাবি নস্যাৎ করেছিলেন। কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের দাবি, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন হোক। যদিও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আইন-শৃংখলার অবনতির কারণ নিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন এবং বর্তমানে আইন-শৃংখলার চরম অবনতি ঘটেছে, তবু শ্রীমুখোপাধ্যায় বুঝেছেন যে, আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই মনে হয়, পুনর্নির্বাচন যতো তাড়াতাড়ি হয়, ততোই মংগল। অনেক ঘটনার পর জনসাধারণই এবার বিচার করুন, কে তাদের মংগল করবে, কেই বা করবে না।

আজকের মানুষ

বোম্বাই সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা দিল্লী পুলিশের সংগে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতেন, তবে গান্ধীহত্যা হয়তো রোধ করা সম্ভব হতো। কাপুর কমিশন গান্ধী হত্যা সম্পর্কে যে-রিপোর্ট দিয়েছেন তার নির্গলিতার্থ বোধ হয় এই। কমিশন আরো বলেছেন যে, বোম্বাইয়ের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি জি খেরকে গোপন খবর দেওয়া হয়েছিল যে, গান্ধী হত্যার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। সে খবর শ্রীখের তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে দেন। খবরটি যথারীতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বিড়লা ভবনে বা তাঁর প্রার্থনা সভায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় নি। এ-গাফিলতির জন্য কমিশন বোম্বাই সরকার, দিল্লী পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কাপুর কমিশনের ১৩০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সুদীর্ঘ রিপোর্টে আজ গান্ধী-হত্যার যতই ময়না তদন্ত করা হোক না কেন, নিহত নেতাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। কর্তব্যপালনে যাদের গাফিলতি ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদেরও এতদিন বাদে শাস্তি দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এমন কি সেদিন যে ভুল-ত্রুটির জন্য 'জাতির জনক'কে হারাতে হয়েছে তাও শোধরানো হবে কিনা বা তার আর কখনো পুনরাবৃত্তি হবে না—এ-গ্যারান্টী দেওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

সুদীর্ঘ রিপোর্ট, কঠিন দায়িত্ব। কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী জে এল কাপুরকে একক হস্তেই সব কিছু সারতে হয়েছে। কাদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে, কী কী নথিপত্র ঘাটা হবে, কোন্ কোন্ ঘটনা-স্থলে যেতে হবে—এ সমস্ত একা শ্রীকাপুরকেই ঠিক করতে হয়েছে এবং রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে। কমিশনটাই তো ছিল একজন সদস্যবিশিষ্ট কমিশন। তা সে দায়িত্ব শ্রীকাপুর কৃতিত্বের সঙ্গেই

জে, এল, কাপুর

পালন করেছেন বলতে হবে। অবশ্য তাঁর অতীত অভিজ্ঞতাই কাপুর সাহেবকে এ-ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছে।

কারণ কমিশন পরিচালনার কাজ তিনি এ পর্যন্ত তো কম চালালেন না! ১৯৬৩ সালে গঠিত ডিলিমিটেশন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীকাপুর। তারও আগে খোদ ল' কমিশনেরই চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেছিলেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমনের কারণ সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালাবার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারত সেবক সমাজের বিষয়ে তদন্তকার্য চালাচ্ছেন শ্রীকাপুর।

১৮৯৭ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রী জে এল কাপুরের জন্ম। ডেরা ইসমাইল খাঁর স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে গ্র্যাজুয়েট হন লাহোর সরকারী কলেজ থেকে। কেম্ব্রিজ থেকে আইন পাশ করে আসার পর তিনি ১৯২০ সালে লাহোর হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করেন দেশ বিভাগ হবার সময় পর্যন্ত তিনি লাহোরেই ছিলেন, তারপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতের মাটিতে। এখানে তিনি গোড়াতেই বড় দায়িত্ব পেয়ে গেলেন —ফেডারেল সার্ভিস কমিশনের সদস্যপদ-পরে যেটা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রূপান্তরিত হলো। ১৯৪৯ সালে তিনি পাঞ্জাব হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৭ সালে তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে উন্নীত হন।

যৌবনে শ্রীকাপুর সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। লাহোরে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি ছিলেন একজন বামপন্থী সমাজকর্মী ও নেতা। পরে তিনি কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের অপরাধে শ্রীকাপুরকে কারাবরণও করতে হয়েছিল।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসামে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্রের জন্যই তা সম্ভবপর হয়েছিল। মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পরে আসামের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী বরদলৈ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করে-ছিলেন। একই কথা বলেছিলেন কিন্তু বিদ্বেষের সঙ্গে আসামের ইউরোপীয় দল। কোনো সন্দেহ না রেখেই বলা যায়, আসামের জন্য সুভাষচন্দ্র যা করেছিলেন, খুব কম মানুষই তা করেছেন এবং মুসলিম লীগের কবল থেকে আসামকে বাঁচাবার সবল চেষ্টা যদি তিনি ঐকালে না করতেন, তাহলে আসামের ভাগ্য কোন্ পথে যেত বলা শক্ত।*

পূর্ব অধ্যায়ে বলে এসেছি, মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের লড়াইয়ের একটি রূপ আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টার মধ্যে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের সাফল্যের ফলে দেখা গেল—এগারোটি প্রদেশের ৮টিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বর্তমান। বাকী তিনটি প্রদেশের মধ্যে সিন্ধুতে কংগ্রেসের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। বাংলা ও পঞ্জাবেই কেবল কংগ্রেসের কোনো প্রভাব মন্ত্রিসভায় নেই। শেষোক্ত প্রদেশ দুটিতে ইউরোপীয় সমর্থন লীগ মন্ত্রিসভাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে লীগের প্রভাবক্ষেত্র সঙ্কুচিত করতে পেরেছিলেন এবং একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তিনি কংগ্রেস সভাপতি না থাকলে আসামে ঐ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারত না। সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি পদমর্যাদার ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা দেশে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হতে না দিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতারা যে সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন, তার বেদনা সুভাষচন্দ্রকে আসামের ক্ষেত্রে ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে দৃঢ় করে তুলেছিল।

আসাম মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে একটা পুরো নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল যার মধ্যে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন, রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া, তীব্র শিহরণ, উত্তেজনা, গোপন চক্রান্ত, প্রকাশ্য সংঘর্ষ—সব কিছু ছিল। এই নাটকে একপক্ষে নেপথ্য নায়ক গভর্নর, অন্য পক্ষে সুভাষচন্দ্র। সাক্ষাৎ অভিনেতা

*গত মার্চ মাসে গৌহাটিতে আমি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। ১৯৩৮ সালে শ্রীযুক্ত মেধী আসাম কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন, আসামে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের মূলে অবশ্যই সুভাষচন্দ্র। আমি তাঁকে এই কথাগুলি লিখে দিতে বললে তিনি কিন্তু অস্বীকার করেন।

শ্রীযুক্ত মেধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শ্রীযুক্ত মেধী সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন—একথা শুনেছিলাম। "সুভাষবাবু অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না"—সুভাষচন্দ্রের পক্ষ ত্যাগের কারণ হিসেবে শ্রীযুক্ত মেধী জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র, যিনি আসামের জন্য অতকিছু করেছিলেন, তাঁকে অহিংসার জন্য ভাসিয়ে দেওয়া ব্যাপারটিকে অদ্ভুত মনে হয়েছিল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আপনি অহিংসায় বিশ্বাস করেন?' উত্তর হয়েছিল—'হাঁ।' 'আপনার সে বিশ্বাস আদর্শ হিসাবে, না পলিসি হিসাবে?' উত্তর পেয়েছিলাম—আদর্শ হিসাবেই অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস। আমি আর কথা বাড়াই নি। এবং আমি এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছিলাম—১৯৬২ সালে চীনা বাহিনী আসামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং দুর্ভাগা আসামবাসীর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু যখন তাঁর মহান হৃদয়ের বেদনাকে বেতারে কাঁপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয় তাতে অন্যান্য আসামবাসীর মত বিক্ষুব্ধ না হয়ে শ্রীযুক্ত মেধী অহিংস পন্থায় চীনাদের ঠেকাবার কথা চিন্তা করেছিলেন!!

শরৎচন্দ্র বসুর কাছে আসামের ঋণের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা শ্রীযুক্ত মেধী বলেছিলেন।

গোপীনাথ বরদলৈ, মহম্মদ সাদুল্লা, বসন্তকুমার দাস প্রমুখ। সেই সঙ্গে কখনো মঙ্গ, কখনো রাজকর কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তি। মৌলনা আজাদ রঙ্গভূমিতে মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকি দিয়েছিলেন।

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে সংবাদপত্রের প্রভাতী চাঞ্চল্যঃ সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে—নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন গোপীনাথ বরদলৈ।

ASSAM CABINET RESIGNS
CONGRESS TO STEP IN

Premier Springs a Surprise

Announces Resignation on Eve of No-Confidence

Invitation to Opposition Leader

Mr. Bardoloi Agrees to form Ministry, but Wants a Day's Time

মহম্মদ সাদুল্লা মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন ১লা এপ্রিল, ১৯৩৮। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের জীবন এই পর্যায়ে দশ মাস। এর মধ্যে এগারোবার নানা ছোটখাট ব্যাপারে মন্ত্রিসভার পরাজয় হয়েছে আইনসভায়। বহু ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে মন্ত্রিসভাকে বজায় রাখা হয়েছিল। স্যার সাদুল্লা একবার মন্ত্রিসভা ভেঙে পুনর্গঠনও করেছিলেন।

আসাম আইনসভায় ১০৮ জন সদস্যের ৩২ জন কংগ্রেসী। কংগ্রেসই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। পরবর্তী বড় দল ইউরোপীয়ানদের। আসাম ও বাংলার ইউরোপীয় বাণিজ্যস্বার্থের প্রয়োজনে ইউরোপীয় সদস্যসংখ্যা ফাঁপিয়ে রাখা হয়েছিল। ইউরোপীয়রা সর্বদা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত দিত। আসাম আইনসভায় মুসলিম লীগ সমেত আরও অনেকগুলি দল ছিল, যাদের সদস্যসংখ্যা পাঁচ থেকে পনের।

এক্ষেত্রে বোঝাই যায়, মন্ত্রিসভা গঠনে অন্য দলের সঙ্গে কোয়ালিশন কংগ্রেসেরই করার কথা। কিন্তু কংগ্রেসের বিচিত্র আত্মঘাতী নীতির জন্য তা করা সম্ভব হয় নি। অপর দিকে আসামে মুসলিম লীগের পক্ষেও স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব ছিল না। তা গঠিত হয়েছিল কিন্তু সর্বদাই টলমল করছিল। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের উদ্ভট নীতিকে কিছুটা বদলাতে পেরেছিলেন। ১৯৩৮-এর মার্চ মাসে কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি অপরাপর প্রগতিশীল দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাবকে অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিলেন।*

যাই হোক, আইনসভায় পরাজয়ের জন্য কিন্তু সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতন হয় নি—পরাজয় এড়াবার জন্যই তিন পদত্যাগ করেছিলেন। তিনজন উপজাতি সদস্য দলত্যাগ করেন; পদত্যাগ না করলে আইনসভায় অতি অবশ্য সাদুল্লার পরাজয় ঘটত।

পদত্যাগ করে, খুবই গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখিয়ে স্যার সাদুল্লা বলেছিলেন—সরকার পক্ষে সমর্থন ক্রমক্ষীয়মাণ, সুতরাং পদত্যাগই শ্রেয়। তিনি স্বীকার করেছিলেন, তাঁর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

গোপীনাথ বরদলৈ স্যার সাদুল্লার গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রশংসা করলেন এবং গণতন্ত্রের রীতি রক্ষার জন্য গভর্নর যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁকে লাটভবনে আহ্বান করলেন, সেখানে গেলেন, গভর্নরকে বললেন, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী আছি, তবে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চারদিন সময় চাই।

"গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে শ্রীযুক্ত বরদলৈ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু এবং মৌলনা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা বলেন। কংগ্রেস সভাপতি এবং মৌলনা আজাদ উভয়েই আগামীকাল (১৫ই সেপ্টেম্বর) কলকাতা থেকে শিলং যাত্রা করবেন।"

সশরীরে আসামে উপস্থিত হবার আগেই সুভাষচন্দ্রের অভিনন্দন গোপীনাথ বরদলৈ-এর কাছে পৌঁছে গেল—'Heartiest congratulations.' অভিনন্দন জানাবার জন্য সুভাষচন্দ্র এতটুকু অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না—আসামের কংগ্রেস মহল থেকে খবর আসার আগেই অ্যাসোসিয়েট প্রেসের কাছে খবর জেনে সুভাষচন্দ্র অভিনন্দন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু হাত এবং মুখের মধ্যে অনেক ব্যবধান। মন্ত্রিত্বের অমৃতফল বরদলৈ অবিলম্বে মুখে তুলতে পারলেন না। গভর্নর তখনি সাদুল্লার পদত্যাগপত্র নিলেন না। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় যিনি ভরসা হারিয়েছিলেন তিনি পদত্যাগ করার পরে আশা ফিরে পেলেন! দেখলেন, আসাম কব্জাতে পূর্ণ। কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা আসামে এসে পড়লেন, তাঁরা আসামের উভয় উপত্যকার মুসলমান সদস্যদের মিলিয়ে দেবার প্রবল চেষ্টা চালালেন, যাতে নাকি সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪।

সাদুল্লা এবং তাঁর বন্ধুগণ ভাবতে লাগলেন, তাহলে আবার সাদুল্লা মন্ত্রিসভা নয় কেন?

* "After the Calcutta session of the Congress Working Committee in March last ... Mr. G. N. Bardoloi, leader of the Congress Assembly Party was authorised to form a Congress Ministry in coalition with other progressive parties." (A.B.P., Sep. 14, 1938).

স্মৃতির মধ্যে স্রোতস্বিনী

[illegible]

অজানা কোনো বিকেলে স্টীমারের গন্ধ ভেসে আসে;

নদীর কথা মনে পড়লেই স্মৃতির মধ্যে স্রোতস্বিনী
মধুমতী দুলিয়ে ভুলিয়ে সকাল বিকেল তার আসা যাওয়া,
দূরে বহুদূরে অন্য মানচিত্রে
হয়তো তার জল কেটে জল কেটে
চলা ফেরা;
এক এক বিকেলে বৃষ্টির প্রহরে কদম শাখা
দমকা হাওয়ায় দুলে উঠলে
বুকের মধ্যে যখন ছলাৎ ছলাৎ
ভেজা বিকেলে ফুল তুলতে গেলে
নদীর বুকে ভোঁ ভোঁ ধ্বনি,—রূপকথার মতো [illegible]
প্রতিদিন অজস্র যাত্রী পাড়ি দেয়
কোথায় কোথায় কেন

সব কিছুর অর্থ এখন অস্পষ্ট; জীবনের প্রেমের অপ্রেমের
বৃত্ত থেকে ঘুরে ঘুরে যাওয়া, দূরে দূরে যাওয়া;
শুধু বৃষ্টি পড়লে মাঝে মাঝে স্মৃতির মধ্যে স্রোতস্বিনী;
কে যেন
স্মৃতির মধ্যে বিগত দিনের ধূসর পতাকা তুলে
নাম ধরে ডাকে
কেন জানি না ভিজে বিকেলে মাঝে মাঝে
অন্যমনে স্মৃতির হাওয়ায় স্টীমারের গন্ধ ভেসে ভেসে
আসে॥

ওধারে কংগ্রেস পক্ষও চুপ করে বসে নেই। একটা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ব্যাপারে ছুটে আসছেন কংগ্রেসের সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টারী বোর্ডের এক প্রভাবশালী সদস্য। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে গোপীনাথ বরদলৈ বললেন, "কলকাতা থেকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং মৌলনা আবুল কালাম আজাদ আসছেন—তাঁদের আসার প্রতীক্ষায় আমরা আছি। তাঁদের নির্দেশেই আমরা চলব।"

তাঁরা এলেন। তাঁরা কিছু করলেন। তার ফলে একটি শুভ সংবাদ ফেটে পড়ল সংবাদপত্রে:

ASSAM ANNEXED BY CONGRESS

Coalition Cabinet

5 Hindus and 3 Muslims to form Ministry

Sj. Subhas Chandra Bose's Statement

Muslim Members Not Yet Selected

Response Awaited From Those Who Will Accept Congress Policy

বোঝা গেল, আসাম লীগ-শাসন থেকে মুক্তি পাচ্ছে। বোঝা গেল, ৪৭ বৎসর বয়স্ক গোপীনাথ বরদলৈ, যিনি গৌহাটি আদালতের অ্যাডভোকেট এবং গৌহাটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান—তিনি মহম্মদ সাদুল্লার পরবর্তী আসামের প্রধানমন্ত্রী।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের সদস্য মৌলনা আবুল কালাম আজাদ সানন্দে বিবৃতিযোগে জানালেন:

"আসাম কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করার পরে স্থির হয়েছে—আটজন সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, তার পাঁচজন হবেন হিন্দু এবং তিনজন মুসলমান।

"আরও স্থির হয়েছে যে, অবিলম্বে হিন্দু সদস্যগণকে মনোনীত করা হবে কিন্তু মুসলমান সদস্য-নির্বাচন স্থগিত রাখা হবে। এমন করার হেতু, যেসব মুসলমান দল কংগ্রেস কোয়ালিশন পার্টিতে যোগ দেয় নি, তারা যাতে কংগ্রেসের নীতি, কর্মপন্থা এবং শৃঙ্খলাকে স্বীকার করে কংগ্রেস কোয়ালিশন পার্টিতে যোগ দিতে পারে, তার সুযোগ করে দেওয়া। ঐ সকল মুসলমান দল কিভাবে সাড়া দেয়, তা দেখার পরেই মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যদের নাম নিশ্চিতভাবে স্থিরীকৃত হবে।

"আসাম কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ আজ সন্ধ্যায়, সাড়ে পাঁচটার সময়ে মাননীয় গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মন্ত্রিসভার পাঁচজন হিন্দু সদস্যের নাম দাখিল করেছেন। তাঁরা হলেন:

(১) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ, প্রধানমন্ত্রী
(২) " কামিনীকুমার সেন
(৩) " রূপনাথ ব্রহ্ম
(৪) " অক্ষয়কুমার দাস
(৫) " রামনাথ দাস

"আমাদের এই আশা এবং বিশ্বাস, এই নবগঠিত মন্ত্রিসভা আসাম আইনসভার সদস্যদের, সেই সঙ্গে আসামের জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন পাবে এবং নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাঁদের জনসেবামূলক কার্যের দ্বারা তাঁদের মনোনয়নের সার্থকতা প্রমাণ করবেন, যার ফলে কংগ্রেসের নীতি ও কার্যসূচীর সম্প্রসারণ ঘটবে এবং কংগ্রেসের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।"

কংগ্রেস সমর্থক জাতীয়তাবাদী মহলে বিশেষ আনন্দের সঞ্চার হল। বাংলা কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ত' গভীর উল্লাস জানালেন।

সে উল্লাস মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য। [ক্রমশ]

গত সপ্তাহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সি-আর-পি'র তান্ডবের একটা সাদামাটা বিবরণমাত্র দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ ঘটে নি, কেন না, দুঃসংবাদটি এসেছিল বঙ্গদর্শন প্রেসে যাবার মুখে। বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে সেদিনের সি-আর-পি'দের নাটকীয় তান্ডবের ভয়াবহ কাহিনী নতুন করে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। এ বিষয়ে আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে, যেগুলি উত্থাপন করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। মূল প্রশ্নটি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-পি আনা হয়েছে কেন? উদ্দেশ্য সমাজবিরোধীদের দমন। সেই দায়িত্ব যাদের ওপর, তারা যদি সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারে এবং তা না করে তারা যদি নিরীহ জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করে, তবে তাদের কেন সমাজবিরোধিতার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হবে না? শুধুমাত্র সি-আর-পি বলেই তারা অহেতুক নরহত্যার মত অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে? এই প্রশ্নটা একটা মৌলিক জিজ্ঞাসা। বিনা প্ররোচনায় তাদের লাঠিবাজির পরিচয় তো প্রধানমন্ত্রী স্বচক্ষেই পুরুলিয়ায় দেখেছেন। সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে, সি-আর-পি বহু স্থানে ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়েছে। উত্তরবঙ্গের একটি গ্রামে দলবদ্ধভাবে তারা নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে। এগুলি কি অপরাধ নয়? এক অপরাধ দিয়ে সরকারের অপর এক অপরাধের প্রতিকার করার চেষ্টা করছেন, এর ফলাফলটা শেষ পর্যন্ত যে অনিবার্যভাবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই পুলিশবাহিনী সুশিক্ষিত, ভারতেও গত কয়েক বছরে পুলিশবাহিনীগুলিতে শিক্ষিত মানুষেরা আসতে শুরু করেছেন, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ, অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের পুলিশের চেয়ে উন্নত এবং দক্ষ। এই কারণেই বোধ হয় শিক্ষিত পুলিশবাহিনীকে কেন্দ্রের এত ভয়, কেন না, শিক্ষা মানুষমাত্রকেই যুক্তিশীল করে তোলে, নির্বিচারে নিপীড়ন করতে তাদের বিবেকে বাধে। মনে হয়, সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোক ভিন্ন সি-আর-পি'তে কোন ভদ্রঘরের ছেলেকে নেওয়া হয় না। তারপর দীর্ঘদিনের সুনিপুণ শিক্ষায় তাদের পরিপূর্ণ এক-একটি বর্বর করে তোলা হয়, যাতে অকারণে রক্তগঙ্গা বহাতে তাদের হাত না কাঁপে। সুনিপুণ শিক্ষায় তাদের রুচিকে বিকৃত করে তোলা হয়। কাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য কাদের স্বার্থে এই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সৃষ্টি।

যতই গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন, গত বাইশ বছরে নয়াদিল্লীতে শাসক-শ্রেণীর একটি প্রভাবশালী অংশের মধ্যে ফ্যাসীবাদী মনোভাব সযত্নে প্রতিপালিত হয়েছে এবং তদনুরূপ সংগঠন রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রস্তুত করে রাখা আছে। এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, পশ্চিম-বঙ্গে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা সি-আর-পি'র নেই। এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-বিরোধীদের দমন করার ক্ষমতা সি-আর-পি'র নেই। কেন না, একদল সমাজ-বিরোধী দিয়ে আর একদল সমাজ-বিরোধীকে উৎখাত করা যায় না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-পি রাখার অর্থ কি? যে কথাটা আপনার-আমার মত গোলা লোকের মাথায় ঢোকে তা কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্যপাল ও তাঁর উপদেষ্টাদের মাথায় যে ঢোকে না, সে আমরা বিশ্বাস করতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-পি

আতঙ্কগ্রস্ত করা। যাদবপুরের ঘটনা এটাই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হ ওরা কেন সেদিন এই তান্ডব চালালো ওদের পিকেটিং-এর ওপর হঠাৎ বো পড়ায় ওদের একজন গুরুতর আহ হয়েছে। এটা ঘটনা কি রটনা বলা য না। কেন না, ভিন্ন একটি সূত্র থে জানা গেছে যে, তাদের একটি দ আন্ডারওয়্যার পরিহিত অবস্থায় ত খেলছিল, এমন সময় রটে যায় বোমা পড়েছে। তর্কচ্ছলে ধরেই নেও গেল যে, তাদের পিকেটের ওপর কে বোমা ফেলেছে। এরকম অবস্থা মোকাবিলা করার জন্যই তো তাদে পশ্চিমবঙ্গে আগমন। কে বা কারা বো ফেলেছে তাদের খুঁজে বার করা ও কোর চালান দেওয়াই তো তাদের স্বাভাবি কর্তব্য। কিন্তু বোমা পড়েছে এই অভি যোগের ওপর ভিত্তি করে যাকেই সাম পাব তাকেই লাঠিপেটা করব, বেয়নে খোঁচা দেব, এ তো বিশুদ্ধ পাগলা কুকুরে প্রশাসন নীতি। এবং এই নীতি অবলম্ব করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার যে চেষ্ হচ্ছে, যদি লজিক বলে শাস্ত্র থাকে ত অনিবার্য সিদ্ধান্তই যে, কেন্দ্রীয় সরক তথা রাজ্যপালের প্রশাসন সম্পূর্ণ কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলে উন্মত্ততার নীতি গ্রহ করেছেন।

বিধানসভা বাতিল

শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভ বাতিল হল ৩০শে জুলাই তারিখে বিধানসভা বাতিল হওয়াই ছিল অবশ্য ম্ভাবী, কিন্তু যে মুহূর্তে এই সংবাদটি ঘোষণা করা হল সেটি একেবারে অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত। কেন না, কয়েকদি আগেই রাজ্যপাল নয়াদিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দমদম বিমানবন্দরে বলেছিলেন যে, বিধানসভা ভেঙে দেবা কথা তিনি ভাবছেন না, যদি এক জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই দিকে তিনি চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী কয়েক দিন আগে কলকাতা সফরে এসে বলে ছিলেন যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া দেওয়ার প্রশ্নটা রাজ্যপালের ওপর নির্ভর করছে। দু-একটি দল ছাড়া অধিকাং দলই বিধানসভা ভেঙে দেবার পক্ষপাত ছিল। গত মে মাস থেকে রাজ্যপা শ্রীধাওয়ান অধুনালুপ্ত ফ্রন্টের প্রায় সক দলের নেতার সঙ্গে নানা বৈঠকে মিলি হয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নি আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ে সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে রাজ্যপা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এক

আর জনপ্রিয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই। একমাত্র বিকল্প হল বিধানসভা বাতিল করে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই বিধানসভা বাতিলের সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, এটা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিন ধার্যের দাবি জানিয়েছেন। এ ছাড়া ফরোয়ার্ড ব্লকের শ্রীহেমন্ত বসু, শাসক কংগ্রেসের শ্রীবিজয়সিং নাহার, সি-পি-আই-এর শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী, আর-এস-পি'র শ্রীত্রিদিব চৌধুরী প্রমুখ নেতা এই ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নয়াদিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেবার সংগে সংগে ওই রাজ্যে দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য হয়ে উঠল। মধ্যবর্তী নির্বাচন সংক্রান্ত কোন সংবাদ আপাতত নেই।

রাজ্য-রাজনীতি সংবাদ

গত ৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টি জোটে যোগ দেবে না এবং আট পার্টির সংগে প্রস্তাবিত ২রা আগস্টের বৈঠকও হবে না। এই রকম যে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সে কথা আমরা আগেই লিখেছিলাম, কেন না, বাংলা কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, শুধুমাত্র সি-পি-এম বিদ্বেষকে মূলধন করে এই দুই শক্তির চিরস্থায়ী, এমন কি দীর্ঘস্থায়ী আঁতাতও সম্ভবপর নয়। শ্রীসুশীল ধাড়া সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জমি দখল, গণ-আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা নেই, আবার আট পার্টি শরিকদের ওই সব প্রোগ্রাম বাদ দিলেও চলে না। অথচ বাংলা কংগ্রেসকে সংগে না পেলেও আট পার্টির পক্ষে নিজেদের শক্তিতে সি-পি-এম'এর মত একটি প্রবল শত্রুর সংগে লড়াই করতে কিছু অসুবিধা হবে। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত রাজ্য-রাজনীতিতে গভীর তাৎপর্য ও দ্রুত তৎপরতার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আট পার্টির কোন কোন নেতার কাছে এটা বিস্ময়ের কারণ হয়েছে যে, মাত্র কয়েকদিন আগে রাজ্যপাল বিধানসভা বাতিল করা হবে না বলা সত্ত্বেও অকস্মাৎ বাতিলের সংবাদ ঘোষিত হল কেন? তাঁদের মতে, নেপথ্যে নাকি গত দু'দিন রাজভবনে রাজ্যপালের সংগে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়েছে এবং এমন সম্ভাবনা নাকি এসে গিয়েছিল যে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সরকার গঠন করতে না পারলে অন্য কেউ তা চেষ্টা করবে—এমন প্রচার জোর হয়ে উঠেছিল। তাই শ্রীমুখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে শেষ কথা বলেছিলেন, বিধানসভা বাতিল হওয়া শ্রেয়। এই সংগে আরও একটা প্রচার আছে, যা হল, একজন প্রতিনিধি দিল্লী ও কলকাতায় ঘুরে বলে বেড়িয়েছেন বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার হতে পারে ও হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। একইভাবে বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। কারণ বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের একদিন আগেও যাঁরা অজয়বাবুর সংগে দেখা করেছেন, তাঁরা জেনেছেন বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছে, কিন্তু শেষ সংবাদ হল বাংলা কংগ্রেস যোগদান করে নি। অনেকের মতে, এটা হল বাংলা কংগ্রেসের শেষ চাপ সৃষ্টি, যাতে বাংলা কংগ্রেসের সর্ত মেনে নিতে আট পার্টি কোন কিন্তু না করে। যাই হোক, বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে আর একটা কূটনৈতিক যোগবিয়োগের খেলার সম্ভাবনা খুলে গেল। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের মধ্যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রাইটার্স বিল্ডিংস, সমাচার

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী এল পি সিং থেকে শুরু করে প্রায় সকল ঊর্ধ্বতন অফিসার কলকাতা ঘুরে গেলেন। জানা গেল, সিং সাহেব আরও চারজন অফিসার নিয়ে রাজ্য প্রশাসনে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার কলকাতায় আসছেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে অনেক রাঘববোয়াল আছে। এরই সংগে রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরকে জোরদার করার জন্য একটি অতিরিক্ত হোম সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ। আগামী দিনে যে পরিবর্তন আসছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা চলছে। প্রশাসনকে সুদৃঢ় করার নামে এই পরিবর্তনের পিছনে অনেক প্ল্যান আছে বলে প্রকাশ। বর্তমান চীফ সেক্রেটারী শ্রীসুকুমার মল্লিককে যদি অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন নজীর সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ তিন মাসে তিনবার চীফ সেক্রেটারী বদল। এই প্রস্তাবিত ট্রান্সফারে আমলা মহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে বলছেন যে, বর্তমান চীফ সেক্রেটারী অবস্থার বলি হয়েছেন। রাজ্যপালের সংগে তাঁর বিরোধ এমন স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে একজনকে ছাড়তেই হয়। এদিকে রাজ্যপালের সংগে তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছে বলে প্রকাশ। কয়েকজন উপদেষ্টা চান রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধানই থাকুন, মন্ত্রীদের মত উপদেষ্টাদের হাতে নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে সকল ক্ষমতা দেওয়া হোক। মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ নাকি এই সব প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্যপাল যেভাবে ফাইলপত্র দেখছেন, তাতে প্রশাসনিক কার্যে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি হচ্ছে বলে কোন কোন উপদেষ্টা মনে করছেন। এদিকে মহাকরণে উচ্চপর্যায়ের একটা রদবদল আসন্ন। নয়াদিল্লী থেকে সবুজ সংকেত পেলেই তা কার্যকর হবে বলে জানা গেল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরী), যা সারা ভারতেরই গর্বস্বরূপ, গোল্লায় যেতে বসেছে।

১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয় এবং এটিকে প্রকৃতই একটি জাতীয় গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তিনি হলেন তদানীন্তন লাইব্রেরীয়ান বি. এস. কেশবন। ১৯৬৩ সালে কেশবন অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর জায়গায় ওয়াই. এম. মূলে লাইব্রেরীয়ান হয়ে আসেন। অসুস্থতার কারণে এঁর প্রায়ই অনুপস্থিত থাকার দরুণ দুজন অফিসার লাইব্রেরী পরিচালন ব্যবস্থায় সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন এবং তখন থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্পর্কে নানা অভিযোগ শোনা যেতে থাকে। স্বজনপোষণ ও মূল্যবান গ্রন্থসমূহ এদিক-ওদিক চলে যাওয়ার অভিযোগ তখন থেকেই সুরু হয়।

১৯৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর ডি. আর. কালিয়া লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদে তাঁর নিয়োগ নিয়ে দিল্লীতে লোকসভায় বিতর্ক উঠেছিল। বিশেষ একটি মহলের তদ্বিরের ফলে তাঁকে নাকি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়, এমন অভিযোগও উঠেছিল।

বিভিন্ন মহল থেকে লাইব্রেরী পরি-চালনার ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগ উঠতে থাকায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৬৯ সালের ৩১শে অক্টোবর এক-সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারপতি শ্রীখোসলার উপর। তাঁকে এক মাসের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটির তদন্তের বিষয় ছিল—(১) সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ও তার কারণ অনুসন্ধান করা ও (২) যাতে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চলে, সে সম্পর্কে কার্যকর প্রস্তাব রাখা।

তদন্তের হেড কোয়ার্টার হয় দিল্লী, যদিও ব্যাপারটি কলকাতার। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মীসংখ্যা ৫২১ জন, পুস্তকের সংখ্যা ১৩ (তেরো) লক্ষের বেশি। এত লোককে জেরা করা, বইপত্রের হিসাব নেওয়া, অসংখ্য অভিযোগ শ্রবণ করা—এগুলির জন্য বেশ সময় প্রয়োজন। কিন্তু কি আশ্চর্য, খোসলা সাহেব কলকাতায় রইলেন মাত্র চারদিন. এতেই তদন্তকার্য মিটে গেল?

লাইব্রেরীয়ান সম্পর্কেও তদন্ত করার কথা। কিন্তু তিনিই যেন কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তিনিই কাগজপত্র ও রিপোর্ট সরবরাহ করেন কমিটিকে। যে সময়ে তদন্ত চলছিল, সেই সময় তাঁকে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করতে দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে যে, যদিও তিনি রিভিয়ুয়িং কমিটির সম্পাদক ছিলেন, তৎসত্ত্বেও তাঁকে ঐ কমিটির রিপোর্ট ড্রাফট করতে দেওয়া হয় নি।

অন্য কর্মচারীরা যখন তদন্ত কমিটির কাছে বিবৃতি দিচ্ছিলেন, তখন লাইব্রেরীয়ানকে সেখানে নাকি উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কমিটির চেয়ারম্যান কলকাতায় থাকাকালীন লাইব্রেরীয়ান সঙ্গেই ছিলেন। কাজেই এটা খোলাখুলি ও নিরপেক্ষ তদন্ত নয়, যা এখানকার এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন দাবি করেছিলেন এবং যা রিভিয়ুয়িং কমিটিও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লাইব্রেরীয়ান শ্রীখোসলার সঙ্গে দু'বার নাকি কলকাতা থেকে দিল্লীও গিয়েছিলেন। দুক্ষেত্রেই অবশ্য সামান্য সরকারী কাজের ছুতো নিয়ে।

ইউ এন আই খোসলা কমিটির রিপোর্টের যে সারাংশ প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায় যে, লাইব্রেরীয়ান যে সব তথ্য দিয়েছিলেন, তারই উপর ভিত্তি করে এটা রচিত। কোনো যাদের সম্পর্কে, [illegible] করে যাচাই করা হয় নি। কর্মীদের মধ্যে প্রধান যে যে কারণে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে: বহু মূল্যবান বই চুরি গেছে, স্বজন-পোষণ করা হয়েছে এবং কোন কোন অফিসার অবৈধভাবে অর্থ আদান-প্রদান করেছেন—এসব ব্যাপারে রিপোর্টে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি, হলে রিপোর্টের সারাংশে কিছু উল্লেখ থাকতো।

সারাংশ থেকে দেখা যায় যে, কমিটি এক ব্যক্তির জন্যেই অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন. সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভাল করার কথায় গুরুত্ব দেন নি। কমিটি লাইব্রেরীয়ানের কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট—কেমন করে এই সিদ্ধান্তে এলেন? শ্রীখোসলা লাইব্রেরীর কাজ-কর্ম পরীক্ষা করেন নি, একমাত্র একজনকে ছাড়া নাকি অন্যান্য কর্মীদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। রিভ্যুয়িং কমিটি, (যার মধ্যে একজন ছিলেন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ) লাইব্রেরীর কাজকর্ম পরীক্ষা করেছিলেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন, আর দেখেছিলেন যে, বর্তমান লাইব্রেরীয়ানের আমলে কাজ-কর্ম মোটেই সন্তোষজনক নয়। তিনি লাইব্রেরীর এতদিনের সুগ্রথিত প্রশাসনকে বহুভাগে ভাগ করেছেন—২০টি অর্ডার সেকশন, ২০টি কপিরাইট সেকশন ও ২০টি সাময়িক পত্রিকা সেকশন। পৃথিবীর আর কোনো লাইব্রেরীতে এই ধরনের বিভাগ নেই। এর ফলে গণ্ডগোল বেড়েছে, সময় ও অর্থের অপচয় হয়েছে।

ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশনগুলিতে যাঁরা ভাষা জানতেন তাঁরাই ইনচার্জ ছিলেন। তাঁদের বদলি করে ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশনে এমন কিছু লোককে ইনচার্জ করেছেন, যাঁরা ঐ সব ভাষার বর্ণমালাও জানেন না। এর ফলে কোন কোন বিভাগে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর ইংরাজী মনোগ্রাফ সেকশন পুনর্বিন্যাস করা এতই ভণ্ডুল হয়েছে যে, লাইব্রেরী এর জন্য এক বছরে প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত। বর্তমান পুনর্বিন্যাসের কুফলস্বরূপ প্রায় সব বিভাগেরই কাজকর্ম কমে আসছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীখোসলা কিভাবে বর্তমান কাজ-কর্মকে সমর্থন করেছেন, তা কারুরই বোধগম্য হবার নয়।

লাইব্রেরীয়ানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রিপোর্টে অনুচিত আগ্রহ দেখান হয়েছে। তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে পারলে তদন্তের কি দরকার ছিল? লাইব্রেরীর হাতাহাতে তিনিই প্রথম পুলিশ ডেকে এনে ছিলেন কি তাঁর সহকর্মীদের শিক্ষা দেবার জন্যে? তাঁরই সময়ে লাইব্রেরীর সবরকম কাজকর্মই নিদারুণভাবে ভা পড়েছে। তিনি তাঁর পদে এত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে, শিক্ষামন্ত্রক তাঁ পদে তাঁকে ৩০ মাস চাকরি করার পর স্থায়ী করে নি! ভারত সরকা নিয়মানুযায়ী অস্থায়ী সরকা চাকুরিয়াদের কার্যকাল এক মাসে নোটিশে চলে যেতে পা (C.S.R., Vol. II, Appendix 30

এটা আশ্চর্যের যে, এই স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কমিটি সুপারি করেছেন তাঁকে কলকাতার বাইরে তাঁ বর্তমান পদের সমতুল্য একটি পরি চাকুরি দেওয়ার। কেউ কখনো শোনে যে, যদি এক ব্যক্তি একটি পদে ব্যর্থতা পরিচয় দেন, তাহলে তিনি সমতুল একটি চাকুরি পাবেন তার বিনিময়ে এমন কি তাঁর চাকুরিকাল যখ অস্থায়ী, সেই সময়ে। কমিটি নিশ্চ জানেন যে, এই রকম লাইব্রেরী ভারত একটিই—আর ভারত সরকারের অধীন সমবেতন ও সমান মর্যাদাসম্পন্ন অন কোন লাইব্রেরীয়ানের পদ নেই। কমি একজনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এত উদ্বিগ্ন যে, এই জাতীয় প্রস্তাব দি এতটুকু ইতস্তত করে নি, যার সম্ভ হচ্ছে এই যে, ভারত সরকারের উচি তাঁকে পদস্থ করতে নতুন পদ তৈরি করা। এইরকম সুপারিশ করা কমিটি বিচার্য বিষয় ছিল না।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্কেপ গোট করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচ এখানে নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর যে মূল্য কত এবং তিনি যে কিভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের সেবা করে আসছেন, সে কাহিনী সুধীসমাজ ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের অজানা নয়।

আমরা এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট প্রেরিত একটি পত্রের অনুলিপি প্রকাশ করছি।

Calcutta, Dt. the 1st July,'70

Dear Dr. Rao,

We feel compelled to write to you on a matter of vital importance to the scholastic world.

Some of the signatories you know personally; some others, we hope, you know by reputation. All of us have one thing in common, namely our deep love for the National Library where most of us have been regular readers for a long time past for the purpose of study and research. Those whose visits to the Library have been less frequent are also equally deeply interested in, and in touch with its proper functioning as a unique centre of study and research and an invaluable instrument for the advancement of knowledge. It is in the interest of this National Library that we are addressing you.

We are dismayed to read in the papers a very brief summary of the findings of the one-man Khosla Commission, recommending, among other things, the compulsory and premature retirement of Sri Chittaranjan Banerjee, Deputy Librarian, apparently as a punishment for the tension between the present Librarian and the staff.

We have no desire to take sides in this controversy though we are far from convinced that Sri Banerjee is at all responsible for the tension. What we are concerned with is the fatal blow that will be struck to scholarship and research within the Library if Sri Banerjee is removed from here. The break with the great tradition set by such giants of old as Macfarlane, Harinath De and Chapman will then be complete.

Those of us who have regularly used the National Library and known Sri Banerjee for years have found in him a rare combination of scholarship and unrivalled knowledge of books and other materials within this Library which has been of very great help to scholars and investigators in a wide variety of subjects. He is, by all accounts, a sort of living bibliography whose wide knowledge is always at the service of every would be research-worker. We feel that the removal of Sri Banerjee, long before he reaches the normal age of retirement at fifty-eight, will be a great loss and we fervently hope that no action will be taken by you which will deprive us of his services. He should be allowed to carry on the good work he is doing and also train up a number of promising Assistants, able to take his place when his normal retirement falls due.

To
Dr. V. K. R. V. Rao,
Minister of Education &
Youth Services,
Govt. of India,
New Delhi.

Yours very sincerely,
Sd/-

Dr. Tarashankar Banerjee
Dr. S. N. Sen
Vice-Chancellor,
Calcutta University.
Mr. Justice B. K. Guha,
I.C.S. (Retd.)
Ex-Vice-Chancellor,
Burdwan University.
Dr. R. C. Majumder
Ex-President, Asiatic
Society, Calcutta.
Dr. Sunity Kumar Chatterjee
National Professor and
Ex-President, Asiatic
Society, Calcutta.
Prof. Satyen Bose
National Professor and
Ex-President, Asiatic
Society, Calcutta.
Sri P. B. Chakraborty
Ex-Chief Justice
Calcutta High Court.
Dr. Bhabatosh Dutta
Director of Public Instruction & Education Secretary,
(Retired) Govt. of West
Bengal.
Dr. Amalesh Tripathy
Professor of History,
Presidency College,
Calcutta.
Prof. Lotika Ghosh
Principal, Sarojini Naidu
College (Retired), Calcutta.
Prof. Nirmal Ch.
Bhattacherjee
Dr. Mahadev Shah
C/o. Asiatic Society,
Calcutta.
Sri Kalicharan Ghosh
Author & Journalist.
Sri Benoy Ghosh
Author & Journalist.
Prof. P. Lal
Department of English
Calcutta University.
Dr. Parimal Ray
Retired Director of Public
Instruction, West Bengal.
Dr. Roma Chaudhuri,
Vice-Chancellor, Rabindra
Bharati University,
Calcutta.
Sri Hiranmoy Banerjee
I.C.S. (Retired),
Ex-Vice-Chancellor, Rabindra
Bharati University, Calcutta.
Sri J. N. Talukdar,
I.C.S. (Retired)
Dr. N. K. Sinha
Professor and Head of the
Department of History,
Calcutta University.
Dr. Amalendu Bose
Professor and Head of the
Department of English &
Dean of the Faculty of
Library Science, Calcutta
University.
Dr. Pratul Gupta
Professor and Head of the
Department of History &
Acting Vice-Chancellor,
Jadavpur University,
Calcutta

তদন্ত কমিটি শ্রীকালিয়ান কাজে সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।' তবু তাঁর বদলির সুপারিশ করা হয়েছে কলকাতার

[৩৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অনাস্থা প্রস্তাব ধোপে টিকল না

পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলবার হিড়িক পড়ে যায়। দক্ষিণ-পন্থী "মহাজোট"-ই (স্বতন্ত্র-জনসংঘ-সিণ্ডিকেট) এই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা। তার সঙ্গে এবার যোগ দিয়েছিলেন "শয়তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্দিরা গভর্নমেণ্টকে ওল্টাবার" ধনুর্ভঙ্গ পণে আবদ্ধ এস-এস-পি এবং সি-পি-এম। তার মধ্যে মধু লিমায়ের (এস-এস-পি) অনাস্থা প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য লোকসভায় গৃহীত হয় এবং ২৮শে জুলাই সেই প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক সুরু হয়ে ২৯শে জুলাই শেষ হয়। প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণের পর মোট ২৪৩—১৩৭ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন সিণ্ডিকেট—৪৬ (৬৩), স্বতন্ত্র—২৮ (৩৬), জনসংঘ—২৭ (৩৩), সি-পি-এম —১৮ (১৯), এস-এস-পি—১২ (১৭), নির্দলীয়—১ এবং দলবহির্ভূত—৫। অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন: কংগ্রেস—১৮৯ (২২২), ডি-এম-কে—৮ (২৫), সি-পি-আই—২১ (২৪), নির্দলীয়—১০, দলবহির্ভূত—১৩ (২৮) এবং বি-কে-ডি—২ (৯)।

ভোটদানের সময় অনুপস্থিত ছিলেন পি-এস-পি—১১ (১৬), সিণ্ডিকেট—১।

লিমায়ের অনাস্থা প্রস্তাবে সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল: (১) কেন্দ্রীয় সরকার কেরালার ভোটার তালিকায় কারচুপি করে সেখানে নির্বাচনে জালিয়াতির সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং বিধানসভার আস্থা বিবর্জিত একটি সংখ্যালঘু গভর্নমেণ্টকে জিইয়ে রেখে গণতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতায় উস্কানী দিচ্ছেন। (২) প্রধানমন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। (৩) শাসনযন্ত্রের ওপর মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণের নীতি বর্জন করে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এই অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে চরম দক্ষিণপন্থী এবং চরম বামপন্থী দলের অপূর্ব মিলন দেখে ভারতের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা তুতুরমত হকচকিয়ে গেছেন। প্রস্তাবের আলোচনাকালে দেখা যায়, সি-পি-এম এবং এস-এস-পি দল কেরালার আসন্ন নির্বাচনকেই তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থির করেছেন। কিন্তু দক্ষিণ-পন্থী দলগুলো প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রচারে এবং সোভিয়েট-ভারত মৈত্রীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গারেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী অনাস্থা প্রস্তাবে বর্ণিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করে বলেন যে, ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সূত্রপাত স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে। তখন ওদিতে কারও আপত্তি হয় নি। এখন ওটাকে "ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত" করার একটা যন্ত্র বলে অভিযোগ করবার কি কারণ থাকতে পারে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসনকার্য আগেও যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল, এখনও সেইভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত মধু লিমায়ে আর অশোক মেটা অভিযোগ করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নীতির ফলে ভারত সোভিয়েটের তল্পীবাহকে পরিণত হয়েছে। অপর দিকে সি-পি-এম অভিযোগ করেছেন যে, ভারত আমেরিকার তল্পী বহন করে চলেছে। আমেরিকা এবং সোভিয়েটের তল্পী একসঙ্গে বহন করা যে ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রধানমন্ত্রীও সেই কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধেও ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীরা অভিযোগ তুলেছিলেন যে, তিনি সোভিয়েটের রাজনীতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার কোন ব্যতিক্রম এখনও হয় নি। কেরালায় ভোটার তালিকা কারচুপির অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনারের। তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতির অধীন। তাঁর এক্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার গভর্নমেন্টের নেই। কাজেই ভোটার তালিকার অভিযোগ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

কেরালায় ভোটার তালিকায় কারচুপির যে অভিযোগ লিমায়ে তুলেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, তিন বছর আগে কেরালায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষ। নতুন তালিকায় নাকি সেই পুরাতন তালিকার ১৭ লক্ষ ভোটারের নাম নেই, কিন্তু ৩০ লক্ষ নতুন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে। এটা লিমায়ে এবং গোপালনের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এর জবাবে এস এস ডাঙ্গে (সি-পি-আই) বলেছেন কেরালায় ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ২·৭ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২·০৮ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে ২·১২ শতাংশ। সুতরাং এর মধ্যে ডাঙ্গে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পান নি।

মহাজোট ভেস্তে গেল

সিণ্ডিকেটের মোরারজী-নিজলিঙ্গাপ্পা এণ্ড কোং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেণ্টকে উল্টে দেবার জন্য স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে নিয়ে তথাকথিত মহাজোট গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত শূন্যে সৌধ নির্মাণে দাঁড়িয়ে গেল। সিণ্ডিকেটের মধ্যেই মহাজোটের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিল তাতে প্রস্তাবটা ধামাচাপা দেওয়া ছাড়া মোরারজী-নিজলিঙ্গাপ্পার আর কোন উপায় রইল না। লোকসভায় সিণ্ডিকেটী নেতা ডঃ রামসুভগ সিংকে সরিয়ে সেই জায়গায় অশোক মেটাকে বসাবার একটা চেষ্টা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছিল। মেটা মহাজোটের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। রামসুভগ সিং যখন সেটা টের পেয়ে গেলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, মহাজোট গঠিত হলে তিনি গদিচ্যুত হতে পারেন। তাই তিনি মহাজোটের বিরোধিতা ঘোষণা করেন এবং পদত্যাগের হুমকী দেন। অপরদিকে মানুভাই শা' ঘোষণা করেন যে, মহাজোট গঠিত হলে তিনি সদলবলে সিণ্ডিকেট ত্যাগ করবেন। অতুল্য ঘোষ, কামরাজ, সঞ্জীব রেড্ডিও নাকি মহাজোটের বিরুদ্ধে। মহাজোটের

[illegible] ছিলেন [illegible], অশোক সেন, সুচেতা কৃপালনী, তারকেশ্বরী সিংহ প্রমুখ। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সিন্ডিকেটে মহাজোটের বিরুদ্ধবাদীরাই দলে ভারী। তাই মোরারজী-নিজলিঙ্গাপ্পা এন্ড কোং হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। দেখা যাচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধীর গভর্নমেন্টকে ১৯৭২ সালের আগে উল্টে দেওয়া তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এবার সিন্ডিকেটে ভাঙন সুরু হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

কেরালায় নির্বাচন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস পি সেনবর্মা ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর কেরালায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে বিধানসভার ১৩৩ আসনের সঙ্গে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী গোবিন্দ মেননের (স্বর্গত) শূন্য পার্লামেন্টারী আসনেও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ধার্য হয়েছে ২৪শে আগস্ট, মনোনয়নপত্র পরীক্ষা হবে ২৫শে আগস্ট, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ২৭শে আগস্ট এবং নির্বাচন ১৭ই সেপ্টেম্বর। ভোট গণনা ১৮ই সেপ্টেম্বর।

কেরালায় নাম্বুদ্রিপাদের (সি-পি-এম) নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অচ্যুত মেননের (সি-পি-আই) নেতৃত্বাধীন মিনিফ্রন্ট সরকার কায়েম হবার পর থেকে সি-পি-এম সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল, কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আশু নির্বাচনের তীব্র বিরোধিতা করতে সুরু করেছে। এ ব্যাপারে এস-এস-পি'ও তাদের অংশীদার। তাদের অভিযোগ, ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কেরালায় খসড়া ভোটার তালিকা ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সেই তালিকা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে এই বছর জানুয়ারী মাসে। তার ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি উপনির্বাচনও হয়ে গেছে। তখন কেউ ভোটার তালিকা সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন নি। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া মাত্র সেই ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠছে। সি-পি-এম এই ভোটার তালিকার বিরুদ্ধে দিল্লীর হাই-কোর্টে একটি মামলা দায়ের করে নির্বাচন স্থগিত রাখার চেষ্টা করছেন। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই মামলার শুনানী সুরু হবে।

[illegible] নিয়ে সি-পি-এমকে আদালতের শরণাপন্ন হতে দেখে বামপন্থী রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে। বছর দেড়েক আগে কেরালার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ (সি-পি-এম) এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, "মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ বিচারশালাকে উৎপীড়নের যন্ত্র বলে মনে করতেন। বিচারকরা শ্রেণীস্বার্থ শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা এবং শ্রেণীবিদ্বেষের দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত হন। যখন কোন দামী সাজপোষাক সরা মোটাসোটা গোলগাল চেহারার বড় লোকের সঙ্গে জরাজীর্ণ বসনে ভূষিত গরীব অশিক্ষিত লোকের মামলা হয় তখন সাক্ষ্যপ্রমাণ যাই থাক্ না কেন, অনিবার্যভাবে বড়লোকের অনুকূলেই রায় প্রদান করেন। তাঁর পার্টি (সি-পি-এম) বরাবরই মনে করেন যে, বিচারশালা শাসক শ্রেণীর শ্রেণী শাসনের একটি অঙ্গ। বিচারশালা শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং আইন ও বিচারশালা মূলত শোষক শ্রেণীরই সেবা করে থাকে। যেখানে বিচারশালাকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়েছে, সেখানেও প্রশাসকরা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে চাপ সৃষ্টি করেন। বিচারকরা ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খেয়ালখুশিমত রায় দেন। শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণীবিদ্বেষ এবং শ্রেণীগত কুসংস্কারই তাদের প্রধান চালিকাশক্তি।"

কেরালার হাইকোর্ট নাম্বুদ্রিপাদের এই বক্তব্যকে আদালত অবমাননার সামিল মনে করে তাঁর ওপর হাজার টাকার জরিমানার আদেশ জারী করেছিলেন। নাম্বুদ্রিপাদ সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছিলেন। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি বেঞ্চ গত ৩১শে জুলাই নাম্বুদ্রিপাদের সেই আপীল অগ্রাহ্য করে দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছেন। তবে জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে ৫০ টাকা ধার্য করেছেন।

বিচারশালা সম্বন্ধে নাম্বুদ্রিপাদ এবং তাঁর দল যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন, তাতে বিচারশালা সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও ভোটার তালিকার অভিযোগ নিয়ে তাঁরা যে সেই বিচারশালায় বিচারপ্রার্থী হয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে বিচারশালার ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাঁরা একেবারে আস্থাহীন নন।

[illegible] বন্ধে।

গত ২৭শে জুলাই সর্বদলীয় ইস্পাত কারখানা সংগ্রাম সমিতির আহবানে ওড়িশায় দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানার দাবীতে ওড়িশা বন্ধ প্রতিপালিত হয়। সেদিন সমগ্র ওড়িশার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারী, দোকান-বাজার যানবাহন সবই ছিল বন্ধ। এমন কি ওড়িশার মধ্য দিয়ে গমনাগমনকারী ট্রেনগুলোকেও ওড়িশার সীমানার বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। কটক বেতার কেন্দ্রেও সেদিন কোন প্রোগ্রাম চালু থাকে নি। এ কথা কারও অজানা নেই যে, ভারতবর্ষ আকরিক লৌহে অতিশয় সমৃদ্ধ দেশ। ওড়িশা সেই আকরিক সম্পদের একটা প্রধান উৎস। ইস্পাত উৎপাদনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও (কয়লা, চুন, জল ইত্যাদি) কোন অভাব ওড়িশায় নেই। কাজেই সেখানে একটি দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানার দাবী ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ইংরাজ আমলে ওড়িশা বরাবরই ছিল অবহেলিত রাজ্য। তাই সেখানকার শিল্প বাণিজ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে নি। দেশ স্বাধীন হবার পর ওড়িশায় একটি ইস্পাত কারখানা সহ একাধিক বৃহৎ শিল্পের পত্তন হয়েছে এবং একটি সামুদ্রিক বন্দরও নির্মিত হয়েছে, কিন্তু তাতে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নি। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় সেটা একেবারেই নগণ্য। ওড়িশার মাথাপিছু আয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখনও অনেক কম। একটি ইস্পাত কারখানা নির্মিত হলে তাকে কেন্দ্র করে আশপাশে আরও বহু শিল্প-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। তাই ওড়িশাবাসীর মনে হয়ত এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আর একটা ইস্পাত কারখানা তৈরি হলে তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবেন।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইস্পাত কারখানা নির্মাণ করতে প্রচুর মূলধন এবং কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রচুর লোকের দরকার হয়। আর সেই মূলধনের মুনাফা আসতে যথেষ্ট সময় লাগে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি ইস্পাত কারখানা ক্রমাগত লোকসান খাচ্ছে। ব্যবস্থাপনার ত্রুটিই তার জন্য মূলত দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন। তার ওপর ওড়িশায় একটি

[৩৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]
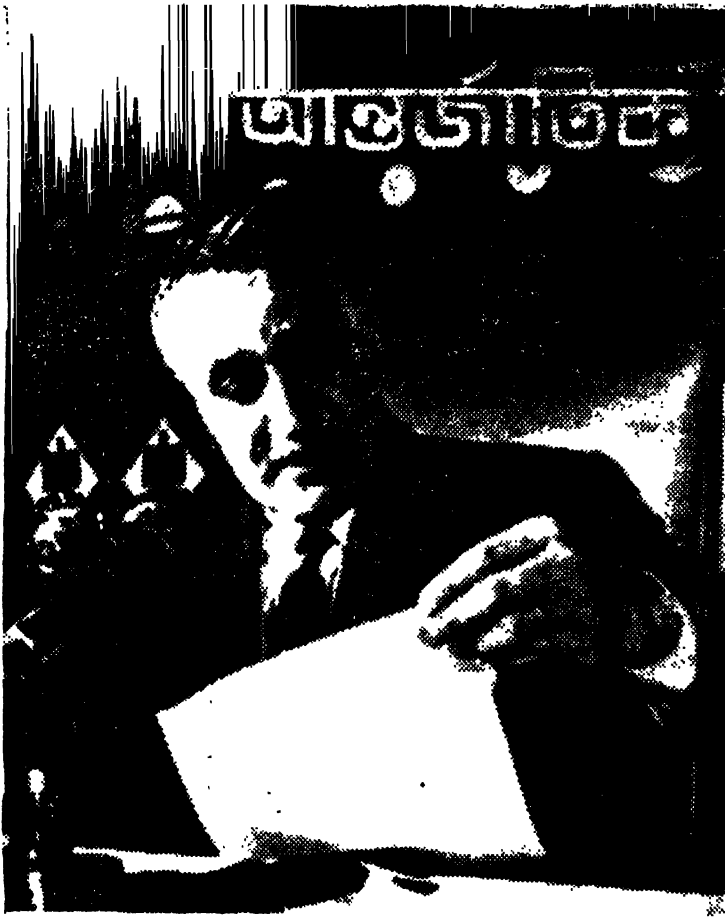
পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার 'সুযোগ গ্রহণ করার জন্য' নাসের রজার্স-প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছেন।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

পশ্চিম এশিয়ার শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইজরায়েল তা গ্রহণ করেছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ছাড়া জর্ডানও এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। কুয়াইত, সুদান, লেবানন ও লিবিয়াও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও জর্ডানের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে।

১৯শে জুন উইলিয়াম রজার্স তাঁর প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, জর্ডান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রসংঘ নি রা প ত্তা পরিষদের ১২ই নভেম্বর ১৯৬৭ তারিখের প্রস্তাবে (২৪২ নং প্রস্তাব) ভিত্তিতে রচিত রজার্স শান্তি পরিকল্পনার মূল কথা হ'ল ঃ (১) আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে লিপ্ত উভয়পক্ষ অবিলম্বে অন্ততপক্ষে ৯০ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবে; (২) যুদ্ধবিরতি কার্যকরী হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিদূত ডঃ গানার জারিং উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা সুরু করবেন; এবং (৩) আরব-ইজরায়েল বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে যে-কোন আলোচনার ভিত্তি হবে—অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইজরায়েলের অপসারণ, আরব রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক ইজরায়েলের সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং আরব উদ্বাস্তু সমস্যার ন্যায্য সমাধান।

রজার্স শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রথম দিকে আরব মহলে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও আরব জগতের প্রধান নেতা আবদুল গামেল নাসের বলেছিলেন, "এই প্রস্তাবে নতুন কিছু নেই।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাসের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ফারুক শাসন উচ্ছেদের অষ্টাদশ বার্ষিকীতে কায়রোর এক জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে নাসের বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার "সুযোগ গ্রহণ করার জন্য" তিনি এই প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছেন। তবে, আরব জাতিকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোন পরিস্থিতির জন্য।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র- [illegible] "বিভাগের" প্রধান ও কায়রোর প্রধান মার্কিন কূটনীতিক ডোনাল্ড বার্গাসের কাছে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন,' তাঁরা রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন।

নাসেরের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে সোভিয়েত য়ুনিয়নের প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে। শান্তি প্রস্তাব ঘোষণার ঠিক আগে নাসের ১৯ দিন সোভিয়েত য়ুনিয়নে ছিলেন। এই সময় সর্বোচ্চ সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রাথমিক আপত্তি কাটিয়ে নাসের যে মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হয়েছেন, তার জন্য সোভিয়েত নেতাদের চাপ ছিল। অনর্থক দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সোভিয়েত নেতারা মোটেই ইচ্ছুক নন। তাই, যে-কোন আক্রমণে আরব রাষ্ট্রগুলিকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত য়ুনিয়ন আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের অবসান চায়। আর, এর জন্য, ইজরায়েল সম্পর্কে আরব নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। কখনও কোন অবস্থাতেই ইজরায়েলকে স্বীকার করব না, এই নীতি পাল্টাতে হবে। ইজরায়েলকেও যেমন দখল করা আরব ভূমি ছাড়তে হবে, তেমনি আরবদেরও ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়ে আলোচনা সুরু করতে রাজী হবার অর্থ, নাসের মোটামুটি সোভিয়েত যুক্তি মেনে নিয়েছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছতে তিনি প্রস্তুত। সোভিয়েত য়ুনিয়ন আরবদের প্রধান বন্ধু। সোভিয়েতের পরামর্শ নাসেরের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

নাসের অবশ্য বলেছেন, কেবল দখল করা এলাকা ছেড়ে দিলেই চলবে না, ১৯৪৮ ও ১৯৬৭ সালে যে বিশ লক্ষ আরব ইজরায়েল থেকে উৎখাত হয়ে বর্তমানে উদ্বাস্তু জীবনযাপন করছে, এদের সবাইকে ইজরায়েলে ফিরিয়ে নিতে হবে। এতে ইজরায়েলের ঘোরতর আপত্তি।

ইজরায়েলের পক্ষে রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করা আরও কঠিন মনে হয়েছিল। প্রথমত, তারা বরাবর বলে এসেছে যে-কোন মীমাংসার জন্য তারা সরাসরি আরবদের সঙ্গে কথা বলবে। গানার জারিং-এর মারফৎ পরোক্ষ আলোচনায় তাদের মত নেই। সরাসরি প্রত্যক্ষ আলোচনার দ্বারা তারা বোঝাতে পারবে, আরবরা তাদের মেনে নিতে বাধ্য

হয়েছে। আরবরাও ঠিক এই কারণে প্রত্যক্ষ আলোচনার বিরোধী। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের ভয়, সাময়িক যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র নতুন করে সোভিয়েত সামরিক অস্ত্রশস্ত্র আনবে ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবে।

ইজরায়েলী মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টে রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নে তীব্র মতভেদ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারের কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম অংশীদার গ.হাল পার্টি হুমকী দিয়েছে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তারা সরকার থেকে বেরিয়ে যাবে। তবু শেষ পর্যন্ত মার্কিন চাপে ইজরায়েল রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ৩১শে জুলাই সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এখন রাষ্ট্রসংঘ পর্যায়ে শান্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট ইতিমধ্যেই প্রধান প্রধান শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। নিউ ইয়র্কে এই ব্যাপারে চতুঃশক্তি বৈঠক বসছে। গানার জারিং চিঠি লিখছেন বিবদমান সকল পক্ষকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গোলমাল আছে। অনেকগুলি আরব রাষ্ট্র রজার্স প্রস্তাবের ভিত্তিতে শান্তি প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হলেও সিরিয়া ও ইরাক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। দামাস্কাস ও বাগদাদের পথে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। নাসের এই প্রস্তাব মেনে নেয়ায় নাসেরের বিরুদ্ধেও তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বামপন্থী আরবদের সমর্থন নাসের হারাবেন, এমন আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। প্যালেস্টাইন গেরিলা বাহিনীর নেতারাও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বলেছেন, তাঁরা কোন যুদ্ধবিরতি মানবেন না।

আর, এই সুযোগে, ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে চীন। ৩০শে জুলাই পিকিং রেডিও থেকে রজার্স প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে একে পশ্চিম এশিয়ার মিউনিক চক্রান্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর দ্বারা আরব স্বার্থকে বলি দেয়া হচ্ছে। আরব-বিরোধী এই মার্কিন চক্রান্তে যোগ দিতে আরব রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করার জন্য, নামোল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে, সোভিয়েত য়ুনিয়নের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে পিকিং রেডিও থেকে।

সোভিয়েত য়ুনিয়ন :

২৭শে জুলাই থেকে মস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সুরু হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াল্টার শিল্ ও সোভিয়েত য়ুনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর মধ্যে।

সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ক্রিশ্চিয়ান-ডেমোক্রাটদের হারিয়ে সোস্যাল ডেমোক্রাট ও ফ্রি ডেমোক্রাটদের কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর থেকেই পশ্চিম জার্মানীর নতুন চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড পূর্ব য়ুরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে আসছেন। পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। চেষ্টা করছেন সোভিয়েত য়ুনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য।

মে মাসে উইলি ব্র্যান্ডের একান্ত বিশ্বাসভাজন ইগন বার মস্কো গিয়ে আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে প্রাথমিক কথা-বার্তা বলে এসেছেন। তারই ভিত্তিতে এবার শিল্-গ্রোমিকো বৈঠক হচ্ছে।

সোভিয়েত য়ুনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার কথা আছে, তাতে উভয় পক্ষ 'বলপ্রয়োগ' পরিহারের কথা বলবেন, যে কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার ওপর জোর দেবেন এবং য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বর্তমান সীমানা মেনে নেবেন।

য়ুরোপের বর্তমান মানচিত্র মেনে নেবার অর্থ পূর্ব জার্মানীর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং দুই জার্মানীর ঐক্যের সম্ভাবনাকে নষ্ট করা, এই যুক্তিতে বিরোধী ক্রিশ্চিয়ান-ডেমোক্রাটরা ব্র্যান্ড-শিল্ নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও মস্কো বৈঠকে দর্শকরূপে কাউকে পাঠান নি। এই সমালোচনা সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানী সরকার সোভিয়েত য়ুনিয়নের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরে অগ্রসর হয়েছেন।

এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত সরকারিভাবে শিল্-গ্রোমিকো আলোচনার ফলাফল জানা যায় নি। কয়েকটি প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে মতভেদের কথা প্রচারিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম :

দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম বিনকে ভারতে আমন্ত্রণ করায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার খুব চটেছে। তারা সরকারিভাবে ভারতের কাছে তাদের আপত্তি জানিয়েছে।

স্পষ্টতই, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের উস্কানিতে গত ২৭শে জুলাই প্রায় একশ'র মত দক্ষিণ ভিয়েতনামী যুবক ও প্রাক্তন সৈনিক সায়গনে তু দো স্ট্রীটে ভারতের কনসাল-জেনারেলের অফিস আক্রমণ করে এবং ভারতের জাতীয় পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ও তারপর তা পোড়ায়।

ভারতের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, ভারতের কনসাল-জেনারেল শ্রীশ্যামসুন্দর নাথ এই ঘটনার প্রতিবাদে যে পত্র পাঠান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। যদিও পরে তারা ঘটনাকে দুঃখজনক বলে ক্ষমা চেয়েছে।

৩১শে জুলাই আবার একদল প্রাক্তন সৈনিক সায়গনে ভারতের কনসাল-জেনারেলের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

সায়গনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দোকান ও অফিসে গিয়ে হুমকী দেখানো হচ্ছে এবং তাদের অবিলম্বে ভারতে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। ২-৭-৭০

আকস্মিক ও চমকপ্রদ কিছু ঘটলেই আমার মির্জা গালিব-এর কথা মনে পড়ে যায়। গালিবের উর্দু বয়াতটা মনে নেই। কিন্তু বাংলা তর্জমাটা মনে আছে। সেটা হল—প্রিয়তম, কাল তুমি বলছিলে তোমার বিছানার ওপর উঠে বসবার শক্তি নেই, কিন্তু আজ তুমি এত শক্তি কোথায় পেলে যে, বিছানা নয়—ঘর নয়—বিশ্ব সংসার ছেড়ে চলে যেতে পারলে। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে ঠিক একই চমক, একই বিস্ময়। কাল যে কথা সত্য ছিল, কাল যে কথা নিশ্চিত ছিল, কাল যে ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, আজ দেখা যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। তাই গালিবের প্রিয়তমার মত বিস্ময়ে বলতে হচ্ছে—কাল তুমি এত শক্তিহীন ছিলে, কিন্তু এক রাত্রি না যেতে এত শক্তি তোমায় কোথা থেকে এল।

বৃহস্পতিবার ৩০শে জুলাই সন্ধ্যা-বেলায় দুটো চমক-লাগানো খবর রাজ্য-রাজনীতির সাম্প্রতিককালের সব-চেয়ে বড় খবর ছিল। একদিন আগে কলকাতায় ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ভূমিকম্প হঠাৎ ও আকস্মিকভাবে হয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। যদিও ২৯শে জুলাই কলকাতায় যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা লণ্ডভণ্ড করতে পারে নি। কিন্তু ৩০শে জুলাই রাতে সামান্য সময়ের ব্যবধানে রাজ্যপালের বিধানসভা বাতি-লের সিদ্ধান্ত আর বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত

কলকাতায় ভূমিকম্প।

রাজ্য-রাজনীতিতে সব চিন্তা-ভাবনার ওলটপালট করে দিয়ে গেছে।

ক'দিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কলকাতায় রাজভবনে এসে ন' ঘণ্টা ছিলেন। রাজভবন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে কয়েক মিনিটের জন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। লেখক স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন—মহাশয়া, দয়া করে বলুন, পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার ভবিষ্যৎ কি এবং বিধানসভা বাতিল হবার কি হচ্ছে? শ্রীমতী গান্ধীর মুখখানা এখনো মনে পড়ছে—গ্রীবা বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন—আমি জানি না। প্রশ্নের জবাবে আমি জানি না কথা এমনভাবে বলেছিলেন যে, আমার প্রশ্নটা বুঝি ছিল আহম্মক ও বাল-খিল্লের মত। সত্য কথা বলতে কি শ্রীমতী গান্ধীর 'আমি জানি না' বলবার পর দ্বিতীয় কোন সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন তাঁকে আমি করতে পারি নি, বলতে পারি নি—আপনি জানেন না, তবে কে জানে, আপনি প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই প্রশ্ন তখন ওঠে নি। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান মাত্র দুদিন আগে দিল্লী থেকে ফিরলেন কলকাতায়। বিমান-বন্দরে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো বিধানসভা কি বাতিল হচ্ছে? প্রায় প্রধানমন্ত্রীর মত একই মেজাজে শ্রীধাওয়ান বলেছিলেন—না, বিধানসভা বাতিল হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালের এমন দৃঢ়তাপূর্ণ মনোভাব কোথায় গেল, ৩০শে জুলাই রাত্রে যখন ঘোষণা করা হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বাতিল হল!

একই বিস্ময় বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তে। জুলাই মাসেরই প্রথম দিকে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আগেও বাংলা কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আট পার্টির নেতাদের অনেক আলাপ-আলোচনা,

[illegible] বৈঠকের পরিণতি ঘটেছিল বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্টির বৈঠক। আট পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠকের পর শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী প্রশ্ন করে-ছিলেন—বৈঠক তো হল, এবার খবরের কাগজকে কি বলা হবে? বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান নিশ্চিত ভেবে শ্রীবিশ্বনাথ মুখো-পাধ্যায় বলেছিলেন—কেন? বলা হবে যে আমাদের কথা শুনে বাংলা কংগ্রেস খুশি হয়েছে, পরে বাংলা কংগ্রেস বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। খুশি কথা-টায় আপত্তি করেছিলেন শ্রীসুশীল ধাড়া। বলেছিলেন—খুশি বলার দরকার কি? বলুন আমরা শুনেছি। তার পর সাংবাদিকদের কাছে আট পার্টির নেতারা বারে বারে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়ার সঙ্গে আলোচনা করে বলেছেন, আট পার্টিতে বাংলা কংগ্রেসের যোগদানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে, বাংলা কংগ্রেস বলেছে আমরা মনের অনেক কাছাকাছি এসেছি।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিক-কালে অনেকবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন আর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথার মধ্যে যে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা হল পশ্চিমবঙ্গে সরকার হবে কি না সেটা ঠিক হবে বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় আলোচনার পর—আট পার্টিতে যোগদান ও আলোচনা

ডাক এলো, ডাক এলো না.

হবে সেই একই কর্মপরিষদের সভায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় এমন কথাও বলেছিলেন যে, হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে আট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেস এক হলে সরকারও করতে পারে? তার পর ৩০শে বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভার আগে কয়েকদিন ধরে সি পি আই, পি এস পি দলের নেতারা বারে বারে দেখা করেছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর ধাঁশিমনে ফিরে এসেছেন ধরে নিয়ে যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছেই। সি পি আই দলের যাঁরা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৩০শে জুলাই-এর আগে দেখা করেছিলেন, তার মধ্যে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ছিলেন।

শ্রীলাহিড়ীর চোখ দুটো খুবই খারাপ হয়ে গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রীলাহিড়ীর মত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নৈতিক নেতা পশ্চিমবঙ্গে আর দ্বিতীয়টি নেই। এই কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। শ্রীলাহিড়ীর মূল্য-বিদা আর বিশ্লেষণ কখনও কারো কাছে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় না। এই শ্রীলাহিড়ীও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং প্রায় নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, বাংলা কংগ্রেস

আট পার্টিতে যোগদান করছেই। কিন্তু কোথায় গেল বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির মনের কাছাকাছি আসা? কোথায় গেল আট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের এক হয়ে সরকার গঠনের সম্ভাবনা?

৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেস ঘোষণা করলো—না, তারা আট পার্টিতে যোগদান করছে না।

একটা প্রশ্ন তাই স্বভাবতই ওঠে। কেন এমন নিশ্চিত সম্ভাবনা, দৃঢ় ঘোষণা উল্টো হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে—বাংলা কংগ্রেস যেদিন রাত্রে সিদ্ধান্ত নিল তারা আট পার্টিতে যোগদান করবে না, সেইদিন সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সামান্য আগেই রাজ্যপাল যে বিধানসভা বাতিল হবে না ঘোষণা করেন—তার মধ্যে কি কোন যোগসূত্র আছে? তা যদি না থাকবে—তবে রাজভবন আর বসন্ত বসু রোড থেকে দুটো ভূমিকম্প সৃষ্টিকারী সংবাদ একই দিনে একই সময়ে ঘোষণা হয় কি করে? এই সঙ্গে আরো একটা ঘটনা কিন্তু সবার অজ্ঞাতে এই দিন অর্থাৎ ৩০শে জুলাই রাত্রে ঘটে—যার সংবাদ একমাত্র বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংবাদ হল বাংলা কংগ্রেসের সভা যখন চলছে, তখন অর্থাৎ ৩০শে জুলাই রাত ৭টায় সি পি আই দপ্তরে আট পার্টির চারজন নেতা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ৩০শে দুপুরবেলায় এস ইউ সি দলের শ্রীনীহার মুখোপাধ্যায় জরুরী-ভাবে খবর দেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে এই বলে যে, জরুরী দরকার, সন্ধ্যা সাতটায় বসতে হবে। ফরোয়ার্ড ব্লকের কেউ কলকাতা ছিলেন না, তাই তাঁদের খবর দেওয়া হয় নি। বেলা পাঁচটা নাগাদ শ্রীঅশোক ঘোষ বিমানে করে কলকাতা আসেন এবং এসেই ছটা নাগাদ শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়কে ফোন করেন সর্বশেষ অবস্থা জানবার জন্য। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন—জরুরী দরকার, সাতটায় সি পি আই অফিসে চলে এস। ঐ সন্ধ্যা সাতটায় সি পি আই অফিসে বসেছিলেন শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী, শ্রীনীহার মুখার্জী, শিশিরদাস বসু। প্রশ্ন করা যায়—কি জরুরী প্রয়োজনে তাঁরা বসেছিলেন, কি সংবাদ তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন অথবা কোন ভবিষ্যৎ সংবাদের সম্ভাবনায় তাঁরা কর্মসূচী নিচ্ছিলেন।

জানি ৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত কেন হল—এর জবাব সন্তোষজনকভাবে পাওয়া যাবে না। জানি, ৩০শে জুলাই রাত্রে রাজ্যপাল কেন সব পূর্বমত বদল করে বিধান-সভা বাতিলের সংবাদ ঘোষণা করলেন তার জবাব পাওয়া যাবে না—আবার ৩০শে জুলাই রাত্রে সি পি আই দপ্তরে কোন্ জরুরী আলোচনায় চার দলের নেতারা বসেছিলেন তার জবাব পাওয়া যাবে না। জবাব পাওয়া না গেলেও জবাবের হদিস করার চেষ্টা নিশ্চয়ই হবে.—সেই ক্ষেত্রে হয়ত কিছু আন্দাজ বা কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হতে পারে, হয়তো কিছু লোকমুখে শোনা কথা প্রভাব বিস্তার করতে পারে—কিন্তু তাই বলে গবেষণার অন্ত থাকে না। এমন কিছু গবেষণার সংবাদ এই একই সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গবেষণার সূত্র যদি বলতে হয়, তবে দুটো সংবাদ প্রথম রটে। সেটা হল ছয় পার্টির জনৈক নেতা সম্প্রতি বলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন চাইছেন না—খুব ভাল কথা, আমরাও দেখি ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত যাতে নির্বাচন না হয়, তার ব্যবস্থা করতে পারি কি না? কিভাবে এই নির্বাচন বন্ধ হতে পারে, তার এক-মাত্র জবাব হল—সরকার গঠন করে। তবে ছয় পার্টি কি আন্দোলনের কর্ম-সূচীকে হুমকি হিসাবে সামনে রেখে সরকার গঠনের নতুন উদ্যোগ নিয়েছিলেন? সেই সঙ্গে আরো একটা খবর—সেটা হল ছয় পার্টির কোন এক বড় শরিক দলের কোন প্রতিনিধি কি প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে গিয়েছিলেন যে, নকশালদের যদি শায়েস্তা করতে হয়, তবে সে কাজ সি· আর· পি দিয়ে আর বুড়ো অথর্ব কয়েকটি আমলা দিয়ে হবে না, সেই কাজ হতে পারে একমাত্র কাঁটা দিয়ে যারা কাঁটা তুলতে পারে তাদের দ্বারা। আমরা সরকার করলেই নকশাল দমন হবে। এই উদ্যোগ আর আলোচনার সংবাদ কি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জেনেছিলেন, তাই ১লা আগস্ট তাঁর রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকের নির্দিষ্ট দিন থাকা সত্ত্বেও ৩০শে জুলাইয়ের আগে দুই দিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে-ছিলেন? কোন একটা সংবাদপত্রে এই সরকার গঠনের সংবাদ বেরিয়েও পড়েছিল। এই কথাও শোনা যায়, ৩০শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাকি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে জেনে নিয়েছিলেন আট পার্টিতে বাংলা কংগ্রেস যোগদান করছে কি না? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার পর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কি প্রায় নিশ্চিত হয়েছিলেন, তাঁকে বাদ দিয়ে রাজ্যে একটি সরকার করার চেষ্টা আবার থেকে [illegible] এই পরিস্থিতিতেই [illegible] শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে বলে-ছিলেন—না, পশ্চিমবঙ্গে সরকার হবার সম্ভাবনা নেই। অতএব বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক। তার পরই রাজ্যপাল দিল্লীকে বললেন—না, রাজ্যে সরকার হবার সম্ভাবনা নেই, অতএব বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক। তাই বিধানসভা ভেঙে দেবার ঘোষণাও ৩০শে প্রকাশ করা হল। আর বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছে না এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার দু ঘণ্টা আগে বিধানসভা ভেঙে দেবার ঘোষণা কেন করা হল—এর সৎ যুক্তি পাওয়া যাবে না। বিধানসভাকে এই ভয়েই ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছে না—এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর আট পার্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে কিছু দল আর বাংলা কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে না থেকে সি পি এম-এর দিকে মুখ ফেরাবে। সি পি এম-এর দিকে মুখ ফেরাবার অর্থই হল বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করা। আর এর জন্যই কি শ্রীনীহার মুখার্জী জরুরীভাবে ৩০শে জুলাই আট পার্টির চার পার্টিকে এক ঘরে এনে বসিয়েছিলেন?

এর পরের প্রশ্ন হল—এত বলার পর ও এত কথা হবার পরও বাংলা কংগ্রেস কেন আট পার্টিতে যোগদান করলো না? এর কি কারণ এই যে, বাংলা কংগ্রেস যখন বুঝলো যে, আট পার্টিতে যোগদান করলেও ওরা সরকার করবে না, তখন কেন আট পার্টিতে যোগদান করবো? অথবা কারণ কি এই যে, আট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত না করে আট পার্টিকে একটা অনাথ অবস্থায় ফেলে তাদের ওপর আরো চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ঘেরাও, আইন-শৃঙ্খলা, জমি দখল প্রভৃতি প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেসের নীতির কাছে আট পার্টি বশ্যতা স্বীকার করে। অথবা আট পার্টিতে যোগদান না করে বাংলা কংগ্রেস কি নব কংগ্রেসকে প্রলুব্ধ করতে চায় এবং একই সঙ্গে আট পার্টিকে জানাতে চায়, তোমরা আমাদের নীতি ও পথ মেনে না নিলে আমরা নব কংগ্রেসের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধবো। এই সব কথাই হল তর্ক ও যুক্তির খাতিরের কথা, বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটা সেটা এখনও কারো জানা নেই। তবে গালিবের প্রিয়তমার বিস্ময় যতক্ষণ আছে, প্রশ্নও ততক্ষণ থাকবে। সেই প্রশ্ন কারো মনোগত হবে, পছন্দমত হবে এমন কথা সব সময় বলা যায় না।

—৩১শে জুলাই, ১৯৭০

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ কুড়ি ॥

টানতে টানতে প্রায় নিয়ে চলল মুকুল।

'ঘেরাওয়ের ফার্স—যুক্তফ্রন্ট! আর কেন হে ব্যানার্জি! এবার চলো এখান থেকে।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার কী—রাস্তায়। এর মধ্যেও অফিস করবার কথা ভাবছ নাকি?'

'না—অফিস আর কোথায়।'

প্রায় লক্ষ্যহীনভাবে চলা খানিকক্ষণ। ডালহাউসি পেরিয়ে, এস্প্ল্যানেডের দিকে। রোদ জ্বলছে মাথার ওপর। কিন্তু ধার নেই এখন। হাল্কা-হাল্কা মেঘ ছায়া ফেলছে তার ওপর। মধ্যে মধ্যে যেন পথ ভুলেই আসছে উত্তরের হাওয়া, শীতের ছোঁয়াচ নেই তাতে—বাংলা দেশের অনিশ্চিত রাজনীতির ওপর বিষণ্ণ বসন্ত ছড়িয়ে পড়ছে।

চলতে চলতে মুকুল বললে, 'ভাবছি, চাকরি ছেড়ে দেব।'

'কোনো একটা স্টেট লটারীর টাকা পেয়ে গেছ নাকি?'

মুকুলের গলার স্বর গাঢ় হলঃ 'না, ঠাট্টা নয়। চাকরী ছাড়ব।'

'ব্যবসা করবার ইচ্ছে হয়েছে?'

'ব্যানার্জি, বী সিরীয়স। এখন আর এভাবে বসে থাকবার সময় নেই। নাউ টু অ্যাক্শন। বিপ্লব এসে গেছে—আর দেরি করা চলবে না।'

প্রবীর আবার নতুন করে সজাগ হল।

'মুকুল, তুমি তা হলে—'

'হাঁ, তোমরা যাকে বলো নক্শালাইট।'

'কিন্তু দু'দিন আগে পর্যন্ত সি-পি-'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুকুল বললে, 'আই-এম-এল এখন।'

'হঠাৎ এই দল-বদল কেন?'

মুকুল বললে, 'সহ্য করা যাচ্ছে না বলে। আসলে দেখতে পাচ্ছি সবটাই এক চক্রাবর্ত—একটা ভিশস্ সার্কল। একটা রুলিং পার্টি যাবে, আর একটা আসবে। আসলে সব ব্যুরোক্র্যাসির এক চেহারা। কোনোটা চড়া লাল, কোনোটা ফিকে লাল। সব একসুরে বাঁধা—রঙ যেমনই হোক, চামড়ার তলায় সব সমান। নইলে ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজ করেই প্রোগ্রেসিভ হলেন তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার আর জগজীবন রাম? একেবারে বিপ্লবী?'—মুকুলের ঠোঁট বিদ্রূপের হাসিতে ভরে গেলঃ 'তোমাদের অভিনন্দনের ঘটা দেখে মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যাবিনেটে একেবারে ডিক্টেটরশীপ অব প্রোলেটারিয়াট চালু হয়ে গেল!'

তর্ক করা যেত, বলবার ছিল। কিন্তু আজ তিন মাস ধরে তর্ক করে করে এখন ক্লান্তি এসে গেছে। এখন সময়টাই আলাদা। তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে কাউকে কিছুই আর বোঝাবার নেই। সহিষ্ণুতা থাকলেই নিজের কথা অন্যকে বোঝানো চলে, শোনবার উৎসাহ থাকলেই বলা যায়। কিন্তু এখন কেউ কারো কথা শুনতে চায় না, অন্যের যুক্তি শোনবার মতো ধৈর্য কারো নেই। এখন প্রত্যেক মানুষ নিজের বিশ্বাসের একটা দুর্ভেদ্য বৃত্তে স্থির হয়েছে—সব শোনা, সব বোঝা শেষ হয়ে গেছে সকলের। এখন রাজনীতি ধর্মের গোঁড়ামিকেও ছাড়িয়ে গেছে, যে তর্ক করে সে অবাঞ্ছিত, শুধু বিশ্বাসের পায়ে চোখ বুজে বসে থাকা ছাড়া কিছুই আর করবার নেই।

এই জন্যই প্রবীর তর্ক করল না। কিন্তু একটা কৌতূহল জাগল। এই পরম বিশ্বাস, একান্ত আনুগত্যের যুগেও মুকুল হঠাৎ দল-বদল করল কেন? কলেজের ছাত্রদের না হয় বোঝা যায়, কিন্তু মুকুল তো তা নয়—সেই ছাত্র ফেডারেশনের সময় থেকে তো সে রাজনীতি করে আসছে।

'খুব অবাক লাগছে তোমার এই পরিবর্তন দেখে।'

মুকুল পকেট থেকে রেড বুক বের করল একটা।

'পড়েছ এইটে?'

'পড়েছি বই কি?' —প্রবীর হাসলঃ 'এই আন্দোলনটাকে আমি ঠিক মানতে পারি না, তাই বলে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী-সংগ্রহ পড়ব না? তাঁর কথাগুলো তো কোনো দলের এক-একচেটে নয়। বরং যে-কোনো বিপ্লবীরই এ থেকে অনেক কিছু নেবার আছে। আমাদের আপত্তিটা প্রয়োগের প্রশ্নে।'

মুকুল বইটা আবার পকেটে পুরে ফেললঃ 'ব্যানার্জি, ওই প্রয়োগের প্রশ্নটাই আসল। ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার রাস্তাই ওইটে। এখন সময় নয়, দেশকাল অনুকূল নেই, আমাদের প্রোবলেমের চেহারা আলাদা—এসব কথা বলবার একটাই অর্থ আছে। আমাদের পেটি-বুর্জোয়া লীডারশীপ আগুনের আঁচ বাঁচিয়ে বিপ্লব করতেই জানে, তাই তেলেঙ্গানা থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারল না, নিতে পারল না হাজং বিদ্রোহীদের কাছ থেকে, কলকাতায় এতগুলো আন্দোলনে এত রক্ত ঝরতে দেখে। মানে, বিপ্লবের আঁচে আগুন পোয়াতে চাই, কিন্তু নিজের ঘরের চালাটা ঠিক রাখতে

এ স্বপ্ন যারা দেখছে, তাদের ঘুম ভাঙতে তার বেশি দেরি হবে না। আমরা অপেক্ষা করব না, কারণ লড়াই শুরু না করলে লড়াই শেষ করা যায় না।'

প্রবীর একটু চুপ করে থাকল। তার আনন্দকে মনে পড়ছিল। হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। কোথায় আছে এখন আনন্দ, কিভাবে আছে? তার রিভলভারটা পড়ে রয়েছে প্রবীরের ড্রয়ারের ভেতর। কবে আসবে ফিরিয়ে নিতে?

মুকুল বললে, 'ভাবছ কী?'

'না—বিশেষ কিছু না।'

'কাম্ উইথ্ আস।'

প্রবীর বিষণ্নভাবে বললে, 'এখন থাক। যদি সময় হয় দেখা যাবে।'

'সময়ের প্রশ্ন নেই। হয় আমাদের সঙ্গে আসবে, নইলে ঝড়ের মুখে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। শ্রীকাকুলামের কিছু জানো?'

'কাগজে খবর পড়ি। আর সাউথ ইস্টার্ন রেলে যেতে ওড়িশা পেরিয়েই মাঝারি একটা স্টেশন যেন দেখেছিলুম—শ্রীকাকুলাম রোড।'

'ঠিক। শ্রীকাকুলাম রোড। সারা ভারতবর্ষে ওই একটি রাস্তাই আছে। বিপ্লবের পথ।'

'বুঝেছি। কিন্তু চাকরি ছাড়বে কেন?'

'হোল টাইম ডিভোট করতে হবে।'

'এতই জরুরি?'

'নিশ্চয় জরুরি। নন্ কো-অপারেশানের সেই ফার্স মনে আছে? দেশের লোকের মেরুদণ্ডটাকে দু-ভাঁজ করে দেবার, অহিংসার আফিং খাওয়ানোর সেই আশ্চর্য আন্দোলনটি? অথচ তাতেও দ্যাখো দেশ কিভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, স্কুল-কলেজ ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছিল ছাত্রেরা, হাজার হাজার মানুষ চাকরি ছেড়েছিল, জেলে গিয়েছিল, লাঠি খেয়েছিল? আজ আমি চাকরি ছাড়তে চাইছি শুনে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন? নিছক মক-ফাইটের জন্যে দেশ যদি এত বড়ো দাম দিতে পেরে থাকে, সত্যিকারের বিপ্লবের জন্যে এটুকু আমি পারব না?'

অকাট্য যুক্তি। কিছু বলবার নেই।

'কী করবে?'

'পার্টি থেকে যেমন নির্দেশ আসে।'

'যদি গ্রামে যেতে বলে?'

'তাই যেতে হবে। আর কাজ তো এখন গ্রাম দিয়েই। বিপ্লবী কৃষকই শহর দখল করবে। কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লী-মাদ্রাজ-কানপুর—ক্যাপিটালিস্টরা তাদের শেষ দুর্গে ধ্বংস হয়ে যাবে।'

পারলে ভালোই, প্রবীর ভাবল। কিন্তু চলতে চলতে দুজনে কখন এসপ্ল্যানেড ইস্ট পার হয়ে ধর্মতলার মোড়ের দিকটায় এসে পড়েছিল। ট্রাফিক স্তব্ধ। নিশ্চল ট্রাম-বাস-মোটরের সার। একটা শোভাযাত্রা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যু পার হয়ে এসপ্ল্যানেড গুমটির দিকে ঢুকছিল। শহীদ মিনারের নিচে সভা আছে একটা।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ—'

'—পার্টি জিন্দাবাদ—'

'যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে কারা?'

'— — —!'

ওদের ঠিক পাশ ঘেঁষেই যাচ্ছিল দলটা। মুকুল প্রামাণিক হঠাৎ বলে ফেলল: 'তোমরাই ভাঙছ, আবার কে?'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি ছেলে ফিরে দাঁড়াল।

'কী বললেন?'

পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ! সঙ্গে সঙ্গে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মুকুলকে তিন হাত সরিয়ে নিলে প্রবীর। বেশি কিছু দরকার নেই, পাইকারী হারে কয়েকটি ঘুষি পড়লেই যথেষ্ট; কিংবা কয়েকটি ফেস্টুনের লাঠি নেমে এলেই একেবারে ছাতু করে দেবে। মুকুলকে আড়াল করে প্রবীর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কিছু না—কিছু না দাদারা, আপনারা যান।'

'কিছুই বললেন না আপনারা?'

'না—না, আমরা নই।'

'কী হয়েছে—কী হয়েছে রে?'—আরো কয়েকজন এসে দাঁড়ালো।

মুকুল বোধ হয় এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রাণপণে প্রবীর ঠেলে রাখল তাকে। মুকুল না হয় এখন অকুতোভয় সৈনিক, কিন্তু এ-ভাবে জনতার হাতে শহীদ হতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না প্রবীরের।

'আপনারা এগিয়ে যান—ভুল শুনেছেন।'

পেছন থেকে শোভাযাত্রার চাপ পড়ছিল, ছেলেরা আর দাঁড়ালো না। তবু যেতে যেতে একজন বলে গেল: 'মুখ সামলে কথা কইবেন, নইলে মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

'ব্যাটারা—র দালাল—' আর একটি মন্তব্য।

ফাঁড়া কাটল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে, মুকুলকে টানতে টানতে আরো খানিকটা সরিয়ে আনল প্রবীর।

'মাথা খারাপ নাকি তোমার? কাণ্ডজ্ঞান নেই একটা?'

'নির্ভীক সত্যি কথা বলেছি।'

'সব সত্যিই সব সময়ে কিন্তু নিরাপদ নয়।'

'মানছি। কিন্তু তোমরাই প্রামাণিক, ধীরস্থির দলকে জুটিয়ে কোথায়। দেখতে পাচ্ছ, তিনদিক থেকে প্রোসেশ্যান আসছে এখন? গায়ে হাত তোলবারও দরকার নেই, ব্রেক স্ট্যাম্পীড্ হলেই আমরা ধুলোয় মিলিয়ে যাব।'

মুকুল দাঁতে দাঁতে ঘষল।

'একদিন ওদের সঙ্গেই আমাদের ফয়সালা করে নিতে হবে।'

'তা নিয়ো। কিন্তু ময়দানে ব্যাপারটা কি রকম হবে আন্দাজ করতে পারছ কি? বরং চলো এখান থেকে।'

'চলো।'—মেঘে-ঢাকা মুখে মুকুল বললে, 'কিছু খাওয়া যাক্।'

'সামনেই তো কে সি দাশ।'

'না—না, মিষ্টিফিষ্টি নয়। মেট্রোর গলির ওদিকে চেনা পাঞ্জাবী দোকান আছে। ভালো তন্দুরী রুটি আর কাবাব করে। খরচ কম, পেটও ভরবে।'

'বেশ, তাই খাওয়া যাক্।'

তখনো রাস্তা বন্ধ—আর একটা শোভাযাত্রা ঢুকছে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে। রাস্তা পার হয়ে—শোভাযাত্রাটার দিকে চোখ পড়তেই প্রবীর থমকে দাঁড়ালো।

প্রসেশ্যানের মুখে যে মেয়েরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে কে ও? চলার ভঙ্গি ক্লান্ত, শেয়ালদা থেকে তো হেঁটেই আসছে। ওই বিবর্ণ মুখ, ওই পাতলা ফ্রেমের চশমা, সুজাতা বৌদি! অথচ ডাক্তার বলেছিল—

রবিবারে সাবিত্রী বারাসাত যাবে কথা ছিল। গিয়েছিল কিনা সে জানে না, দেখা করবার সময় পায় নি। এখন মনে হল, যাওয়ার কোনো দরকার নেই, গেলেও কোনো লাভ নেই।

এগিয়ে যাওয়া শোভাযাত্রা আর উতরোল স্লোগানের ভেতরে কোথায় হারিয়ে গেল সুজাতা। স্বরাজ ঠিকই বুঝেছিল, পথ আলাদা হয়ে গেছে আর মিলবে না কোনোদিন।

বিরক্ত মুকুল বললে, 'কী দাঁড়িয়ে গেলে কেন?'

প্রবীরের নিশ্বাস পড়ল।

'না, দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই। এই সময় কাউকে দাঁড়াতে দেবে না।'

শহীদ মিনারের দিকটা পতাকায় লালে লাল। সেদিনও এই রঙ দেখলে বুকের মধ্যে সমুদ্র দুলত। কিন্তু এখন চোখ দুটো জ্বালা করছিল।

এই লালে এখন আর এক রঙ মিশেছে। আত্মীয়-বিদ্বেষের রঙ।

[ক্রমশ]

পড়ি কি ভূতলে শশী।

"পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি,
ধূলায়!"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আপন মনে কোনও যুবক মধুসূদন আবৃত্তি করছেন শুনলে আপনিও চমকেই উঠবেন, আর আমি সঞ্জয়কে সেই অবস্থায় চাক্ষুষ করলাম। যতদূর জানি, সঞ্জয় কাব্য-প্রেমিক নয়। চিরকাল সায়ান্স ঘেঁটেছে। আজ জীবিকার জন্য ব্যাগ হাতে ওষুধ বেচে বেড়ায় কেমিস্ট-ড্রাগিস্ট শপে। সেলস্‌ম্যানের চাকরিটা জুটেছে এম-এসসি ডিগ্রীর সঙ্গে সুপুরুষ চেহারা আর চটপটে স্মার্টনেস ফেরি করে।

সুতরাং দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি তাকে ভালো করে এবং কিছুটা সশঙ্ক-ভাবেই পরীক্ষা করে নিয়ে তার ঘরে ঢুকলাম। বলা কি যায়, যা দিনকাল, যে-কোনো মানুষের মাথা যখন-তখন বিগড়োতে পারে। তার ওপর সঞ্জয় চাকরি করে অবাঙালী ফার্মে। শুনছি এমন ঢের ফার্ম নাকি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে আর বাণিজ্য অফিস রাখতে চাইছেন না (কাগজে সংবাদ)। দু-দুটো যুক্তফ্রন্ট নাকি এমনই সর্বনেশে সরকার গড়েছিল যে, কলকাতা থেকে বাণিজ্যপাতি গড়-গড়িয়ে ভিনদেশে চালান হয়ে যাবে। তা আমাদের সঞ্জয়ের চাকরিটাও শেষকালে...

সঞ্জয় এই সময় মুখ তুলে আমাকে দেখেই বললেঃ আরে মিত্তির? আয় আয়।

বললামঃ বাঁচালি। প্রিয়জন সম্পর্কে কুসং চিন্তাই মনে জাগে প্রথমে। ভেবে-ছিলাম, তুই হয়ত হঠাৎ বেকার বনে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিস।

সঞ্জয় গলা ছেড়ে হেসে বললেঃ আর আপনজনের অসৎ চিন্তাই তার মঙ্গল করে এবং শুনে খুশি হবি, আমার প্রমোশন হয়েছে।

ঃ তাই নাকি? কিন্তু তার জন্য কাঠ-কয়লা-লাঞ্ছিতা শশিকলাকে ভূতলায়িত করার হঠাৎ আবেগ অনুভূত হ'ল কেন এই কাঠফাটা রোদে?

ঃ আঃ! তাই বল্‌। 'পড়ি কি ভূতলে শশী?' তা সে তো এক নয়, একাধিক গড়া গড়া গড়াগড়ি যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষ মায় রবি ঠাকুর। আজকের কাগজটা দেখেছিস?

ঃ ও তো হামেশার ব্যাপার। কোনো নিউজই নয়। স্যর আশুতোষের স্ট্যাচু? য়ুনিভার্সিটিতে?

ঃ হ্যাঁ, স্ট্যাচুটাকে গড়িয়ে ফেলে দেওয়ার সংবাদ পড়লাম। আবার কিছু শিষ্ট ছাত্র তাঁকে যথাস্থানস্থ করেছে। তাই হঠাৎ ছত্রটা মনে পড়ল, আবৃত্তি কর-ছিলাম। পূর্বাপর সবটুকু জানি না। ব্যাখ্যা আসত পরীক্ষায়। ছত্রটা মনে আছে তাই। সেদিন ব্যাখ্যা লিখতে পেরেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে মনে হচ্ছে, আজও ও'র ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।

বসে পড়ে সিগারেট জ্বাললাম। বল-লামঃ বেশ, বেশ। তাহলে তোর মতো ভদ্রলোক ফেরিওয়ালাও নোট মেকার হওয়ার বাসনা রাখে। বল্‌ তোর ব্যাখ্যা। শুনি। সটীক ব্যাখ্যা থাকলেও, সঠিক ব্যাখ্যা ক'টাই বা পাওয়া যায়।

মনে গেল এই কথায়। বললেঃ একটা মানুষ বস্তুতই শশিকলার মতো বাড়ছিল সেদিন, আর বাড়াতে চেয়েছিল কলকাতার সবচেয়ে বড় সম্পদ ক্যালকাটা য়ুনি-ভার্সিটিকে। হিন্দু কলেজ, অর্থাৎ আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ দুটোই কি বৃটিশ ভারতে বাঙালীর পজিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান শক্তির যোগান দেয় নি? আজ আমরা কিন্তু ও দুটোকেই খতম করতে কোমর বেঁধেছি।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম সঞ্জয় হাত তুলে আমাকে থামিয়ে বললেঃ ওয়েট! আমি পলিটিক্স বুঝি না। ও লাইনে কথাও বলছি না। নো পলিটিক্স মিত্তির। আমি শুধু সেই মানুষটির কথাই ভাবছিলাম, যিনি ঐ 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়'-কে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা-সম্পন্ন জ্ঞানপীঠ বানাবার জন্য তরুণ বয়স থেকে এক ধ্যান, এক জ্ঞান ছিলেন। ঐ য়ুনিভার্সিটির জন্য তাঁর সেদিনের হিমালয়ান স্যাক্রিফাইস, একটু আগেই ভাবছিলাম, হয়ত তাঁর হিমালয়ান ব্লান্ডার হয়ে গেছল। কিন্তু না মিত্তির, ইতিহাস তো মুছে ফেলা যায় না। তুমি যতই পোড়াও, যতই ঘোচাও। বরং ইতিহাসকে স্বীকার করে সেই প্রদীপে আলো জ্বালিয়ে নাও। আজ তুমি এতো পথ হেঁটে এসেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস খুঁড়ে খুঁড়ে নিজের উৎপত্তি জানতে চাইছ। মাত্র এক শতকের ইতিহাস তুমি কোন মাটির তলায় চাপা দেবে? সিস্টেম অপছন্দ, নতুন সিস্টেম কর। স্যর আশুতোষ পুরনো সিস্টেম পাল্টে নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রয়োজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করেন। তারপর থেকে সেদিনের প্রয়োজনে, সেকালের আবহাওয়ায় তিনি নিত্য-নবীন সংস্কারের আর সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য ভি-সি পদে আটটি স্বর্ণ-ময় বছর একান্ত পরিশ্রমের মধ্যে অতি-বাহিত করেছিলেন। আচ্ছা, মিত্তির, তিনি এগিয়েছিলেন, না পিছিয়েছিলেন?

সঞ্জয় একটু থেমে আপন আবেগে ফের আরম্ভ করলঃ ভেবে দেখো, মানুষটি শিক্ষা সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন যৌবন সমাগমের সন্ধিযুগ থেকেই। ইচ্ছে করলে অন্যতর অপেক্ষাকৃত ক্ষমতা-শালী পদে নিজেকে তিনি অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। সরকারী তরফে তেমন আহ্বান এসেওছিল একাধিক-বার। তিনি স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছেন সেসব অফার। তাতে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, বিত্ত সব কিছুই হতে পারত। তাঁর সময় তাঁর মত জুয়েল ভূভারতে ক'জন ছিলেন? কিন্তু তিনি সে লাইনেই গেলেন না। এমন

[illegible] বখন [illegible] হিসেবে তাঁর মাসিক আয় দশ হাজার (আর ভেবে দেখো সেটা ১৯০৪ সালে[illegible] [illegible] এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তা করার সময় পাবেন এই লোভে [illegible] ছেড়ে তিনি নিলেন বাঁধা মাইনের জজিয়তি। ভাবতে পার, হোয়াট এ হিউজ [illegible] সারিফাইস! কতবড় একটা আর্থিক ত্যাগ? কেন না, অনেক কাঠ-খড়, কেরোসিন জেবলে তিনি তখন শুধুমাত্র সেনেটের একজন নির্বাচিত সভ্য। কায়-মনোবাক্যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার সময় পাবেন, এজন্য চালু বাণিজ্যের লাইন বিলকুল ত্যাগ করলেন। অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়, মহৎ এক বাসনা পূরণের জন্য কিছুটা অবসরমাত্র কাম্য ছিল তাঁর। স্যর আশুতোষের সেই মহান্ ভ্রান্তির খেসারত আজ তাঁর আবক্ষ মূর্তিকে গুনে দিতে হ'ল। হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টু-ডে, স্যর আশুতোষ কুড নট থিঙ্ক ইয়েসটারডে। যদি অতটাই দূরদৃষ্টি থাকবে, তাহলে যেদিন উপাচার্য ইলবার্ট সাহেব তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করে-ছিলেনঃ মুখার্জী, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু? কী করতে পারি টোমার জন্য, মুখার্জী? তখন তিনি বৃটিশ প্রশাসনের একটা শীর্ষপদ চেয়ে নিতে পারতেন এবং সেই ১৮৮৬ খৃঃ ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির সাহেব ভাইস চ্যান্সেলর সুপারিশ করলে হ'ত না এমন কাজই বা ছিল কি। তাছাড়া আশুতোষ তখন অসাধারণ আলোকিত এক তরুণ। তাঁর জন্য সব পদই ছিল উপযুক্ত। কিন্তু আশুতোষের স্কন্ধে দুষ্টু সরস্বতী ভর করেছিলেন। আশুতোষ চাইলেন, এক অতি ক্ষুদ্র 'বর'। বললেনঃ আমাকে তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মেম্বার কর। ইলবার্ট বললেনঃ আমি তোমাকে 'ফেলো' বানাব। আশুতোষ মহা সন্তুষ্ট। হলই বা অবৈতনিক। য়ুনিভার্সিটির স্পর্শ লাগবে গায়ে। সেদিন তিনি কতবড় ভুল করেছিলেন? জ্ঞানের আলোটির সুইচ টিপে নিজেই আজ সেই আলোকিত গঙ্গবাসীর দোরগোড়ায় প্রচণ্ড গলাধাক্কা খেয়ে প্রস্তরীভূত শরীর নিয়ে পড়ে পড়লেন তাঁরই হাতেগড়া য়ুনি-ভার্সিটির পাথুরে মেঝের ওপর। সেদিনের তরুণ আশুতোষ অবশ্য বিশ্বাস করতেন, জননী জন্মভূমির যেটুকু ভালো, তা অপরিহার্য। যেটুকু কালো অন্ধকার। সেখানে আলোর রোশনাই জেবলে দেওয়াই হবে সবচেয়ে বড় মাতৃমুক্তি পণ, সব বাড়া মাতৃপুজো। সেদিন অবুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার এমন দাপট ছিল না। তিনি তৎকালের প্রয়োজনে বলিষ্ঠ কাজই করেছেন।

এজন্য [illegible] তৈরিও করেছিলেন। ফাঁকি দিয়ে নাম কেনার বাসনা ছিল না। [illegible] [illegible] হতে [illegible] পরিশ্রম বাড়াতে চান নি। ফাঁকি দিয়ে খাজিনাৎ করার [illegible] সেদিন মানুষের শ্রদ্ধা কাড়তে পারতও না।

আমি সঞ্জয়কে থামাতে চাইলাম। কিন্তু সে থামবার লক্ষণ প্রকাশ করল না। চায়ের কাপে চা গেল জুড়িয়ে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের মুখে জমে উঠল তামাকপোড়া, কাগজপোড়া ছাই। উত্তেজিতভাবে বলে চলল সঞ্জয়ঃ ঐ য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশের জন্য রাত্রিদিন তাঁর কী কঠোর তপশ্চর্যা! ভাবতে পারিস, কাকা রাধিকাপ্রসাদ যখন সেনেটের সভ্য, তখন, সেই ১৮৮২ খৃস্টাব্দে তাঁর কাছে সেনেটের নীরস মিনিটস আর ক্যালেন্ডারগুলো আসত। এক-নিষ্ঠ পাঠক আশুতোষই তখন সেগুলি আদ্যপান্ত পড়তেন। সেই সেদিন থেকেই তৈরি হচ্ছিলেন। লক্ষ্য একটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় মহা জ্ঞানপীঠ-রূপে প্রতিষ্ঠা করা।

পড়াশুনোকে ভালবেসেই ভদ্রলোক আর সব ভুলেছিলেন। যে আমরা পাঠ্য-পুস্তকও চাপে পড়ে পাঠ করি না, পাঠ্য-বহির্ভূত কেতাব তো দূরের কথা, সেই আমাদের ভাবতে নিশ্চয় অবাক লাগবে যে, স্যর আশুতোষের নিজস্ব গ্রন্থ-সংগ্রহ-শালার তৎকালীন মূল্য ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। বাংলা দেশের অসীম সৌভাগ্য যে, এমন জ্ঞানান্বেষীই হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি অকৃত্রিম এবং অদ্বিতীয় আরকিটেক্ট।

ঃ তুই তো জানিস মিত্তির? সঞ্জয় তাকাল আমার দিকেঃ প্রথম বাঙালী ভি-সি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করেন যে, সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন ভারতীয় ভাষামাত্রই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং আশুতোষই সে চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেন তাঁর অনস্বীকার্য ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের জোরে। তাঁর পরিকল্পনা সার্থক করার পথে কোনও [illegible] বাধা পথ আগলে দাঁড়াতে পারে নি। আজ আমরা হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের তলায় সর্বং-সহ মহাদেবের মতো চিৎ হয়ে পড়ে আছি। আর সেদিন মাতৃভাষার মর্যাদা আদায় করে নেওয়া কতবড় একটা কাজ ছিল। যাই বলিস, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে মানুষকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে না পারলে নয়া ইতিহাস রচনার পথে শৃঙ্খলার অভাব হয় বলে আমার বিশ্বাস।

মানুষটা য়ুনিভার্সিটির মধ্যেই বাঁচতে চেয়েছিলেন, য়ুনিভার্সিটির মাধ্যমেই বাঁচাতে চেয়েছিলেন একটা মেরুদণ্ডহীন পরাধীন অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে। এ তোমার কোন্ জাতের বুর্জোয়া অপরাধ, বুঝতে পারি না মিত্তির, সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

দেখ, অনেকে বলে, আশুতোষ? এক নম্বরের নেপোটিজমের রাজা। নিজে ছিলেন তোষামোদপ্রিয়, আর তাই নিশ্চয় বৃটিশের তাঁবেদারিও ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। —লক্ষ্য করলাম কথাগুলি উচ্চারণের সময় সঞ্জয়ের মুখটা কেমন করুণ বেদনায় নীল হয়ে উঠছিল। সে বললেঃ সেদিন প্রদীপের সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক আমার। মিত্তির, আমাদের অরাজ-নৈতিক ফ্রাসট্রেশনের অন্যতম কারণ হয়ত এই যে, আমরা বড় সহজে অকৃতজ্ঞ হতে পারি। কৃতজ্ঞতা পাছে কোনো কর্তব্য করায়, এজন্য অকৃতজ্ঞতার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে চাই। গালি দেওয়া স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কাকে না গাল দিই আমরা। গাল দেওয়ার কিছু না পেলে রবি ঠাকুরকে নিয়ে বই লিখে প্রমাণ দেখাতে চাই যে, আসলে তিনি বিদেশী রোমান্টিক কবিদের ছত্র আর ভাব চুরি করেছেন। তাঁর কবিতা কিছু না হোক, কালিদাস আর বৈষ্ণব মহাজনের কাব্য গারেব করা নতুন বোতলে পুরনো মদ। আমাদের সমালোচকদের মধ্যেও এক ধারণা, পাণ্ডিত্যী সমালোচনা করতে হ'লে দুনিয়ার কাব্যসাহিত্য থেকে বাছাই করে লাইন তুলে আনতে হবে। সাদৃশ্য দেখিয়ে বলতে হবে ওমুকের দ্বারা অমুক প্রভাবিত ছিলেন এবং দেশী কবি-সাহিত্যিক অবশ্যই বিদেশী প্রভাবের আওতায় বিকশিত। অর্থাৎ তাঁবেদারি আমাদেরই মজ্জাগত, তাই তাঁবেদার খুঁজে বেড়ানো মহা বাহাদুরী বলেই গণ্য করি আমরা।

কিন্তু আশুতোষ সম্পর্কে তাঁবেদারির অভিযোগটা কেমন করে চালু হ'ল, আশ্চর্য লাগে। যে লোকটি শিক্ষাজগতের

অবহাওয়ার জীবন অতিবাহিত করবেন বলে স্থিরসংকল্প, তিনি কত সহজেই তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফট সাহেবের প্রস্তাব নিতান্ত অবহেলায় ত্যাগ করেছিলেন। আজ বিদেশী এম্বাসীর প্রসাদভোজী ও প্রসাদলোভী আমরা। সেদিন বিদেশী রাজ, বিদেশী প্রশাসক ডেকে বললেন: তুমি প্রেসিডেন্সীর ছাত্র, এখানেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দাও মুখার্জী! কিন্তু আশুতোষ বললেন, ইংরেজ অধ্যাপকদের সমানানুপাতিক 'গ্রেড' না পেলে তিনি প্রতিষ্ঠান পারম্পর্যতার গ্লানি অনুভব করে সরকারী চাকরি করতে পারবেন না। ক্রফটের স্নেহভাজন হলেন ক্রফটের বিরাগভাজন। তা একেই কি তাঁবেদারি বলবে না কি?

সঞ্জয় মুখ তুলে তাকাল।

: অথচ মাত্র দু' শ' টাকা বেতনে সেই আশুতোষই বেছে গিয়ে চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান কলেজে। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের বিকাশই আশুতোষের জীবনেতিহাস।

: শিক্ষাজগতের সেই তেজী পুরুষকে শশী বলব না? অবাক ব্যথিত হব না সেই শশিশেখরের ভূতল শয়নে। আর এ শয্যা পেতে দিলাম স্বহস্তে! অথচ তাঁর উত্তরাধিকার এমনই এক সম্পত্তি, যা দলিল করে দান প্রত্যাখ্যানও করা যায় না। তাই অকৃতজ্ঞ ১৯৭০ আমি, তাঁর কৃতিত্বকে লাঞ্ছিত করছি। আসলে নিজেই নিজের কপালে আঁকছি লাঞ্ছনার টীকা।

আমি বলতে চাইলাম, কিন্তু উত্তেজনার কালে মানুষ এমন অনেক কিছুই করে, যা হয়ত বস্তুত তার অভিপ্রেত নয়। সেদিন উত্তেজিত ছাত্ররা হয়ত আসলে ঐ স্ট্যাচুটা তাদের বিক্ষোভ প্রকাশের 'লক্ষ্য' করেন নি। তুমি মিছে এতোটা বিচলিত হচ্ছ! এমনও তো হতে পারে......

সঞ্জয় চাপা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করে বললে: হবে হয়ত তাই। তবে তুমিই তো বললে ফুটবলের মতো শশিকুল গড়াগড়ির ঘটনা আজ এমনি চানাচুর যে, তার নিউজ হওয়ার মর্যাদাটুকুও গেছে। আমি কিছু বুঝি না মিত্তির, শুধু মনে হয়, আত্মবিস্মৃতি হয়ত সুস্থতার লক্ষণ নয়। ইতিহাস-বিস্মৃতি এক অসম্ভব ব্যাপার। আমরা কেউ স্বয়ম্ভূ নই। আমার সামন্ততান্ত্রিক ঠাকুরদার ছবিটা ভেঙে ফেললে যদি আমি আদর্শ এক কলকাতার নাগরিক হতে পারতাম, এক্ষুণি ভেঙে দিতাম ওটা। উনি তো ও'র তৎকালীন বিশ্বাসমত কাজ করে গত হয়েছেন। আর কেন? কিন্তু মিত্তির, তাতে তো এই কলকাতার চেহারা পাল্টাবে না। কিছু লোকের পা কাটবে মাত্র।

আমি কোনো জবাব দিতে পারি নি সঞ্জয়কে। শুধু অনুভব করেছি কলকাতার সাধারণ নাগরিকের মতো সঞ্জয়ও আজ সরল জিজ্ঞাসু এবং তার সেই সরলতম প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নেই।

আমরা হয়ত অনেক পিছিয়ে আছি। অনেক। আমাদের চিন্তা হয়ত আমাদের পিতৃদেবের নিভন্ত চিতার পাশেই জ্বলছে। ইতিহাস এমনি করেই চিতা সাজায় সন্দেহ নেই।

কিন্তু সঞ্জয়ের প্রশ্ন: আমরা পুড়েছি, কিন্তু ইতিহাস কি পোড়ে? আমাদের ব্যক্তিদেহ ছাই হয়। কিন্তু কর্মদেহ, প্রতি ব্যক্তির কর্মদেহের পিরামিডে তৈরি যুগেতিহাস, তা যে অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয়। যুগপুরুষেরা তাঁদের কর্মের মধ্যেই সঞ্জীবিত। কি জানি, কেমন করে তাঁদের প্রতিকৃতি গুঁড়িয়ে তুমি সে ইতিহাস মুছে ফেলবে। আমরা কোথাও ভুল করছি না তো, মিত্তির?

আমি নিরুত্তর। জবাব জানা নেই।

॥ তের ॥

বুর্জোয়া আঁতেলেকচুয়ালদের রঙিন-মার্কা নেতৃত্ব গণ-আন্দোলনের যে ক্ষতি করে, তা প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেও অকল্পনীয়। কেন না, শাসকগোষ্ঠীর বিরোধিতা মূলত বহিরাক্রমণ। বহিরাগত আঘাতকে প্রতিহত করা যায়, কিন্তু গণ-আন্দোলনের ভিতরেই যদি অন্তর্ঘাতী কাজকর্ম চলে, আঘাত যদি কেউ ভিতরে বসেই হানে, তাহলে সেই আঘাত হয় মারাত্মক, তার মোকাবিলা করা যায় না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যতবার যত বিপ্লবের অপমৃত্যু ঘটেছে, তার জন্য দায়ী এই বুর্জোয়া নেতৃত্ব। বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতের আধুনিকতম দৃষ্টান্ত হোল মহান চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

শয়তান লিউ-শাও-চি এবং তার শিষ্য-সেবকরা সভাপতি মাওয়ের স্বপ্নকে চুরমার করে দিতে চেয়েছিল। তারা যে পথে যাত্রা শুরু করেছিল, সে পথের শেষে আছে এক গভীর গাড্ডা, এই গাড্ডায় পড়ে রাশিয়া আর উঠতে পারছে না। তার সর্বাঙ্গে লেপ্টে গেছে শোধনবাদের বিষ্ঠা। চীনের পরিণতিও তাই হোত। কিন্তু সভাপতি মাও সময়মত শক্ত হাতে বুর্জোয়া বজ্জাতগুলির কান পাকড়ে ধরায় চীন তথা সারা দুনিয়ার মেহনতী আওয়াম এক অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে গেছে।

পাকিস্তানের গণ-আন্দোলন সম্পর্কে এই একই কথা বলা যেতে পারে। উনিশ শ' চুয়ান্ন সাল থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শোষিত, মেহনতী আওয়াম যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করেছে, তা বার বার প্রতিহত হয়েছে, বিপথগামী হয়েছে, লক্ষ্যের কাছাকাছি গিয়েও পিছু হঠে এসেছে মূলত বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য। বুর্জোয়া নেতারা তাদের দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা নিয়ে, তাদের অস্থি, মজ্জা ও শোণিতের মধ্যে নিহিত চাকর মনোবৃত্তি নিয়ে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পাকিস্তানেও একই কাজ বার বার করে গেছে এবং যাচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে চুপি চুপি সংগ্রামরত আওয়ামের পিঠে ছুরি বসিয়ে, তার রক্তে তারা হোলি খেলছে। অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত কম্যুনিস্ট জন্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমার আগের চিঠিতে আমি লিখেছিলাম যে, চেয়ারম্যান মাও বিশ্বাস করেন, প্রকৃত বিপ্লবীর পরিচয় তার চিন্তা ও কর্ম, তার বংশ বা শ্রেণী নয়। কাজেই বুর্জোয়া শ্রেণীতে জন্মেও যদি কেউ নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রামী আওয়ামের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে, তবে সে আর বুর্জোয়া থাকে না, সে তখন বিপ্লবী হিসাবেই চিহ্নিত হয়। কাজেই আমার পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন লিউ-শাও-চির সাথে মাও সে-তুং-এর কিংবা নুরুল আমিন, মিয়া দৌলতানা, মৌলানা ভাসানী, মুজিবর রহমান, মোজাফফর আমেদ প্রমুখ অপদার্থ, কট্টর বুর্জোয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের বিপ্লবী জনতা ও তাদের মুখপাত্র "পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টি—মার্কসবাদী, লেনিনবাদী"র তুলনা না করেন। যাই হোক, আবার মূল বক্তব্যে ফিরে আসছি। পাকিস্তানে প্রকৃত জনতার রাজ কায়েম হোতে পারত যদি নেতৃত্ব শ্রমিক, কৃষক এবং বুর্জোয়া শ্রেণী আভিজাত্যের প্রতি মোহশূন্য দেশসেবকের হাতে থাকত, কিন্তু কার্যত তা হয় নি! যখন মৌলানা ভাসানী পাপাত্মা নুরুল আমিনের ডাকে সাড়া না দিয়ে পিছিয়ে আসেন এবং আমিন সাহাবের সাধের "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি"-র আঁতুড়েই দাফন হয়, তখন আমরা মৌলানাকে আন্তরিক সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। আমাদের মহান নেতা কমরেড মোহাম্মদ তোয়াহা সেদিন মৌলানা সাহাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। নুরুল আমিনের ফাঁদে পা দিলে ন্যাপের অপমৃত্যু ঘটত। কেন না, তার লক্ষ্য ছিল "রাজনীতি" করে টু পাইস এবং হাততালি অর্জন করা। প্রকৃত আন্দোলন করা তার উদ্দেশ্য হোলে সে কখনও নতুন দল গঠন করার আয়োজনে মেতে উঠত না, সরাসরি আমাদের সাথেই হাত মেলাতে পারত।

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গড়ে খাওয়ার সুযোগ নষ্ট হওয়ায় নুরুল ও তার বশংবদ অনুচররা সাময়িকভাবে মুষড়ে পড়লেও একেবারে হাল ছাড়ল না। তারা অপেক্ষায় রইল, কবে আবার নতুন সুযোগ আসে। সুযোগ এল বছর কয়েক বাদে, সাতষট্টি সালে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে একটি মস্তবড় ঠাট্টার ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, তা হোল পঁয়ষট্টির নির্বাচন। মিলিটারী প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁর বুনিয়াদী গণতন্ত্র এবং সংবিধান অনুযায়ী পঁয়ষট্টি সালে যে নির্বাচনের "আজান" দেকেছিল, তাতে নুরুল আমিনের সাথে হাত মিলিয়ে ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ইত্যাদি চারটি দল হাজির হয়েছিল। এই পাঁচটি রাজনৈতিক দলের মিলিত নাম হয় "সম্মিলিত বিরোধী দল" বা "কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিস"। এই ধরনের নির্বাচনে যে জয়লাভ করা যায় না, তা সবাই জানত। "সম্মিলিত" দলের নেতারাও জানতেন। কেন না, পরমেশ্বর আয়ুব খাঁ সমস্ত বুনিয়াদী গণতন্ত্রীকে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছিল, যে কারণে পাকিস্তানীরা বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের "আয়ুবের খাটালের গরু" বলে উপহাস করত। কাজেই আয়ুবের একান্ত অনুগত বিডিরা আয়ুবের বিপক্ষে "বিরোধী-পক্ষের নেত্রী ফাতিমা জিন্নাকে ভোট দেবে কিংবা "কনভেনশনিস্ট মুসলিম লীগে"র প্রার্থীদের হতাশ করে "বিরোধী"দের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত করবে, এমন অলীক কল্পনা কেউ করত না। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও মৌলানা ভাসানীর মত নেতা, যিনি "শ্রমিক, কৃষক ও খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি" হিসাবে নিজেকে জাহির করেন, তিনিও বুর্জোয়া আন্দোলনের গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আয়ুবের চেয়ারের তলায় বসে তার উচ্ছিষ্টের জন্য কোঁদল করা নুরুল আমিনকে মানায়, কিন্তু ভাসানীকে নয়। ভাসানীর বোঝা উচিত ছিল যে, প্রতিক্রিয়াশীলরা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, একমাত্র জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই তাদের খতম করা যায়। আয়ুব আবির্ভূত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বালুচিস্থানে এবং পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র আগুন জ্বলে উঠেছিল। জনগণকে সর্বশক্তি দিয়ে সে আগুন প্রজ্বলিত রাখার জন্য উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের নির্বাচনের কানাগলিতে টেনে এনে ভাসানী মস্তবড় ভুল করেছিলেন। যে বিরাট গণশক্তি সেইদিন তাঁর পিছনে দাঁড়িয়েছিল, তাকে তিনি কাজে লাগাতে পারলেন না। আমরা বিশ্বাস করি যে, ভাসানী তাঁর বুর্জোয়া চারিত্রিক দুর্বলতার জন্যই এই মারাত্মক ভুল করেছিলেন।

তিনি ফাঁদে পা দিয়েছিলেন, যে ফাঁদ পেতেছিল আয়ুব খাঁ আর দালাল নুরুল আমিন প্রমুখেরা সাহায্যে। ধুরন্ধর আজিজ আয়ুব খাঁ সারা দুনিয়ায় গলা ফুলিয়ে প্রচার করেছিল যে, "নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানে গণতন্ত্র কায়েম করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থেই আবার নির্বাচন হচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল-গুলোকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তারা যদি পারে তো জয়ী হয়ে সরকার গঠন করুক।" আয়ুব খাঁর এই নির্বাচনী গাজনে পাকিস্তানের মানুষকে মাতিয়ে তোলার জন্য এন-ডি-এফ নেতা নুরুল নিশ্চয় বেশ মোটা রকমের বখশিশ পেয়েছিল এবং এই দালালির কাজে সে যে কত পারদর্শী, তা প্রমাণ করে দিয়েছিল ভাসানীকে টেনে এনে। নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায়ে "সম্মিলিত বিরোধী দল" পরাজিত হোল, ভাসানী সাহাবেরও সাময়িক মোহমুক্তি ঘটল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যখন নুরুল চাচা তার দুই নম্বর ভেল্কীবাজী অর্থাৎ পি-ডি-এম দেখাতে চাইলেন, তখন ভাসানী মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং উনসত্তরের প্রস্তাবিত নির্বাচনে যে ন্যাপ কোনও অংশ নেবে না, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আজ আবার ভাসানী সাহাব তাঁর খুলেকাটা, পোকায়-খাওয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে নির্বাচনের ডামা-ডোলে নামিয়ে দিয়েছেন। যেখানে নুরুলের পি-ডি-পি নির্বাচন করছে, সেখানে ন্যাপ থাকবে তা ভাবাই যায় না। কিন্তু তাই তো হয়েছে। যে বুর্জোয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নুরুল আমিনকে বিচার করা যায়, তা দিয়ে ভাসানীকেও চেনা যাচ্ছে। প্রকৃত গণ-আন্দোলনের অংশীদার তিনি আর কোনও দিনও হতে পারলেন না।

যাই হোক, ঊনিশ শ' পঁয়ষট্টির মারাত্মক ভুলের জন্য কেবলমাত্র নুরুল আমিন ও তার এন-ডি-এফকে দায়ী করা চলে না। কেন না, সেদিন আয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলনের দুর্বার স্রোতকে নির্বা-চনের বাঁধ দিয়ে প্রতিহত করায় ভাসানী, মুজিবর রহমান প্রমুখেরও একটা অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। নুরুল আমিন আয়ুবের পক্ষে দালালি করেছিল, আর ভাসানী সাহাব এবং আজকের পূর্ব বাংলার "চ্যাম্পিয়ন বাঘ" মুজিবর হাবাছেলের মত এই দালালির শিকার হয়েছিলেন। এই কারণে ঊনিশ শ' পঁয়ষট্টির নির্বাচনকে সরাসরি নুরুল আমিনের একক এ্যাড-ভেঞ্চার বলা যায় না, এটা হোল তার যৌথ এ্যাডভেঞ্চার।

যে দ্বিতীয় মৌলিক সৃষ্টির জন্য আমরা নুরুল মিয়াকে সাধুবাদ জানাই তা "পি, ডি, এম" বা "পাকিস্তান ডেমক্রেটিক মুভমেন্ট"। [illegible] অন্তঃসার-শূন্য কতকগুলো বকুনি, [illegible] ধ্যান সহ কয়েকটা মন্ত্র ও [illegible] এবং কাছাখোলা উবাহু [illegible] মত কিছু [illegible] দেখানো আস্ফালন,—ব্যস। এই নিয়ে "পি, ডি, এমে"র জন্ম এবং এই নিয়েই তার প্রস্থান। "মৃত্যু" শব্দটি ব্যবহার করলাম না, কেন না নুরুল যখন দেখল, তার হাতিয়ারটি তেমন কোনও কাজে লাগছে না, তখন সে শোষণবাদী মস্টার মোজাফ্ফর আমেদের ন্যাপ, খাণ্ডলার খাটাস-বাঘ শেখ মুজিবরের আওয়ামী লীগ এবং গান্ধী-মার্কা ইসলামী পার্টি জমিয়াত-উল-উলেমায়ে—এই তিন দলকে পটিয়ে-পাটিয়ে "পি, ডি, এমে"র সাথে মিশিয়ে নিল। ফলে জন্ম নিল "ডাক" বা "ডেমক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি"। "পি, ডি, এমে" ছিল পাঁচ দল, তাই সেটা পাঁচ-ফোড়ন, আর "ডাকে" ঢুকল আট পার্টি, সুতরাং এটাকে বলা যেতে পারে আট-ফোড়ন। যাই হোক, খানদানী বাবুর্চি নুরুলের আট ফোড়ন তৈরির কাহিনীটা পড়ে জানাব, আপাতত তার পাঁচফোড়নের কথায় ফিরে আসছি।

ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বা "এন, ডি, পি" গঠন করতে ব্যর্থ হয়ে নুরুল আমিন বসে বসে তার হাত-পা কামড়াচ্ছিল এবং আমাদের পুরোনো দল ন্যাপ ও তার নেতা ভাসানী সাহাব সম্পর্কে কুৎসা ছড়াচ্ছিল। আমাদের অপরাধ, আমরা তার ফাঁদে পা দেই নি এবং ভাসানী সাহাবকে সময়মত সামলে দিয়েছি! কিন্তু পঁয়ষট্টির নির্বাচনে অন্যান্য বড় দলগুলির মত ন্যাপ নিজেও যখন আয়ুব খাঁর টোপ গিলল অর্থাৎ "বুনিয়াদী গণতন্ত্রে"র নির্বাচনে অংশ নিল, তখন নুরুলের চুপসে-যাওয়া বুকের ছাতিতে খানিকটা বাতাস ঢুকল। সে বুঝল যে, কায়দা করে টোপ ফেললে রাঘববোয়ালরা সেটা গিলবেই। সুতরাং নতুন উৎসাহে খসে-যাওয়া লুঙ্গীটাকে কোমরে জড়িয়ে আমিন ও তার দলবল পি, ডি, এমের টোপ নিয়ে পাকিস্তানের বুর্জোয়া রাজনীতির এদো ডোবার পারে গিয়ে বসল। ছেষট্টি সালের ঊনিশে জুলাই ঢাকায় বসে নুরুল এক বিবৃতি দিয়েছিল। তার মতে, "পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো একটি দলহীন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা। কারণ, দেশে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেবল অশান্তই নয়, অদ্ভুতও বটে। এই পরিস্থিতিতে একা চলার মনোভাব পরি-ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।" যে [illegible] সোহরাওয়ার্দী [illegible] আওয়ামী [illegible] লীগের [illegible] পর যে সোহরাওয়ার্দী তার [illegible] দ্বিতীয় [illegible] রূপান্তরিত হয়েছিল, তাকেই [illegible] রেখে নুরুল [illegible]—"জনাব সোহরাওয়ার্দী নিজেও রাজনৈতিক [illegible] পুনরুত্থানের বিরোধিতা করেছেন। কেন না, তা বিপজ্জনক।"

নুরুলের ঐ বিবৃতির মধ্যে যথেষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। কেন না, মুখে দলহীন আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা সত্ত্বেও নয়া দল গঠন করে লীডার বনার ইচ্ছে তার বরাবরই ছিল এবং এখনও আছে। "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট" যা সোহরাবর্দী একটা দলহীন রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে শুরু করেছিল, তাকে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে রূপান্তরিত করার জন্য নুরুলের চেষ্টার অন্ত ছিল না। আপনাদের নিশ্চয় মনে পড়ছে যে, নুরুল ভাসানীকে মামুদ আলী মারফৎ নিজের দিকে টেনে আনতে চেয়েছিল কিন্তু ভাসানী বা আমরা ন্যাপকে তার ফাঁদে পড়তে না দেওয়ায় তার সব পরিকল্পনা তখনকার মত বানচাল হয়ে যায়। তা' হলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, নুরুল দলহীন রাজনৈতিক আন্দোলন গঠনের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও আসলে তার লক্ষ্য ছিল একটি নয়া দল গঠন করা। কিন্তু কোন্ বিশেষ কারণে সে এই মতলব ফেঁদেছিল? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দলগুলিকে একত্র করে তাদের শিং, নোখ, দাঁত উপড়ে ফেলে পুরোপুরি নিজের অধীন করা। ফলে ভবিষ্যতে বুর্জোয়া রাজনীতির এঁদো ডোবার পচা কাদায় সে একেশ্বর হয়ে যত খুশি গড়াগড়ি দিতে পারবে। তার এই মহৎ পরিকল্পনা কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। ন্যাপের যে ক্ষুদ্র অংশটা মামুদ আলীর ল্যাজ ধরে বেরিয়ে গেছে বা আওয়ামী লীগের যারা নবাব-জাদা নছরুল্লার হুঁকা কাঁধে নিয়ে তার সাথে সরে পড়েছে, আজ তাদের নিজস্ব বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা আজ মার্কামারা "পি, ডি, পি-ওয়ালা", নুরুল আমিনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে তারা আজ নির্বাচনের মাধ্যমে সাংঘাতিক এক বিপ্লব ঘটাতে ব্যস্ত এবং এই ব্যাপারে তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের পশ্চাদ্দেশে [illegible] সদাই [illegible]।

সাতষট্টির শুরুতেই নুরুল আমিন একটা বিশেষ মওকা পেয়ে গেল। যাট

সালে মার্শাল ল' বা সামরিক শাসনের আমলে আয়ুব খাঁ তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের খারেজ করার জন্য "ইলেকটিভ বডিজ ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার" নামে এক চোখা ব্রহ্মাস্ত্র ছেড়েছিল। এই আইন অনুযায়ী বেশ কিছু সংখ্যক বাঘা বুর্জোয়া নেতাকে ছয় বছরের জন্য রাজনীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে হয়। এদের মধ্যে একজন ছিল প্রাক্তন প্রাদেশিক শাসনকর্তা, পাঁচজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, আঠারজন প্রাদেশিক মন্ত্রী, দুইজন রাষ্ট্রদূত এবং দুইজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী (সুরাবর্দী সহ)। বন্দুক ভাজলে কি হবে, আয়ুব খাঁর মাথায় জমিদার বাড়ির নায়েব গোমস্তার মত বদবুদ্ধি যথেষ্টই ছিল। কেন না, তার বাপ নিজেও গোমস্তাগিরি এবং জমিদারি, দুইরকম কাজই করে গেছে। গদীতে এসেই আয়ুব বুঝল যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা অধিকাংশই বুড়ো হয়ে গেছে, কয়েক বছরের মধ্যেই তারা হয় মরবে, নয় পঙ্গু হয়ে যাবে। কাজেই গদীটা পোক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক'টা বছর যদি ওদের আটকে রাখা যায়, তা হলেই "রাস্তা পরিষ্কার"। আয়ুবের পাঁচ সার্থক! কেন না ছয় বছরের মধ্যে সাত বুড়ো মরল, এরা ছিল—সুরাবর্দী, আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, ফজলুর রহমান, মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, মমতাজ হাসান কিজিলবাস, আল্লা নাওয়াজ খাঁ এবং সি, ই, গিবন। আরও বারজন রাজনীতি ছেড়েই দিল, বোধ হয় আয়ুবের পাকানো গোঁফ আর ড্যাবড্যাবে চোখ দেখেই তারা ভড়কে গিয়েছিল। মালিক ফিরোজ খাঁ নুন, মিয়া জাফর শাহ এবং সর্দার আবদুল রসিদও এদের মধ্যে ছিল।

যাই হোক, বাদ বাকী যারা সাতষট্টি সালের পয়লা জানুয়ারী "এবডো রাহু"র কাটা গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, তারা যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, এই ভয়ে নূরুল আমিন তাড়াতাড়ি করে তাদের কাছে চর পাঠাতে লাগল। আমরা ঢাকায় বসেই এই সব লম্ফঝম্পের খবর পাচ্ছিলাম।

বঙ্গদর্শন

[৩৩১ পৃষ্ঠার পর]

বাইরে। কমিটি এই বদলির ব্যাখ্যা করতে কষ্ট স্বীকার করেছেন, বলেছেন, এই বদলি শাস্তিস্বরূপ নয়, কলকাতাই (কলকাতার অবস্থাই?) এই বদলির জন্যে দায়ী। কলকাতার আবহাওয়ায় তাঁর প্রতিভাপুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে পারছে না, এই দুর্বিত্ত শহরের (?) বাইরে তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করবেন। কিন্তু লাইব্রেরীর ইতিহাসে (৭০ বছর) লাইব্রেরীয়ানের পদে একজন মাত্র বাঙালী কাজ করেছেন ১৯০৭-১১ সালে—তিনি হরিনাথ দে। বর্তমান লাইব্রেরীয়ানের আগে যেসব অবাঙালী লাইব্রেরীয়ান এসেছেন, তাঁরা কখনও অভিযোগ করেন নি যে, স্থানীয় লোকেরা তাঁদের কর্তব্যে বাধাদান করছে। কমিটি লাইব্রেরীয়ানকে স্বস্তি দেবার জন্যে কলকাতা থেকে লাইব্রেরী অপসারণের কথা সুপারিশ করেছেন কি না, রিপোর্টের সারাংশ থেকে তা অনুমান করা যাচ্ছে না।

খোসলা কমিটির রিপোর্ট বাতিল করা উচিত এবং নতুন করে খোলাখুলি নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা লাইব্রেরীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রসঙ্গ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চাই—

১। কোন অফিসার নাকি তাঁর ডাক্তার বন্ধুর নিজস্ব লাইব্রেরীর বই ক্যাটালগ করার জন্য দিনের পর দিন জাতীয় গ্রন্থাগারের কয়েকজন কর্মীকে আপিস টাইমে বন্ধুর বাড়ি কাজ করতে বাধ্য করেছেন?

২। কোন কোন অফিসার নাকি ভাই, শালা, শালী, সহপাঠী, প্রতিবেশী, কন্যা, গ্রামবাসী প্রভৃতিকে চাকরি দিয়ে স্বার্থচক্রের সৃষ্টি করে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিবেশ পঙ্কিল করেছেন?

৩। সরকারী অফিসে নাকি নাবালকের চাকরি হয় না। কোন অফিসার নাকি নিজের ভাইকে সাড়ে ষোল বছর বয়সেই চাকরি দিয়েছেন? শুধু তাই নয়, কিছুদিনের মধ্যেই অনেক পুরানো কর্মীকে ডিঙিয়ে নাকি তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে? বহু সিনিয়র কর্মীর দাবি উপেক্ষা করে—ভ্রাতাকে নাকি কোয়ার্টার দেওয়া হয়েছে—এখন দু'ভাই পাশাপাশি দু'টি কোয়ার্টার দখল করে বেলভেডিয়ারে নাকি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন?

৪। বেলভেডিয়ার কোয়ার্টারে অবস্থানকারী কোন অসহায়া উদ্বাস্তু তরুণী কর্মী নাকি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। সুখলাল কারনানি হাসপাতালে নাকি এর প্রমাণ আছে। অন্যায়ভাবে তাঁকে কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার আদেশই কি এর কারণ? আর একটা কারণ নাকি উপরোক্ত অফিসারের ভ্রাতার দুর্ব্যবহার?

৫। এই অফিসার নাকি খিদিরপুরের একটি স্কুলের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকাকালে যাতায়াত ভাড়া হিসাবে প্রতি মাসে টাকা নিতেন। এর জন্য সরকারী অনুমতি এবং ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছিল কি?

৬। কলকাতা এলাকায় বাড়ি থাকা সত্ত্বেও কোন কোন অফিসার বেলভেডিয়ারে কোয়ার্টার পেয়েছেন কি?

৭। কোন কোন অফিসার অফিসের মধ্যে টাকা-পয়সার অবৈধ লেনদেন করেন কি? চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের ভয় দেখিয়ে কো-অপারেটিভ থেকে ঋণ করিয়ে সেই টাকা নিজেদের কাজে লাগান কি?

৮। স্টাফ কার কি নিউ সেক্রেটারিয়েটে বা এ-জি'র আপিসে আড্ডা দিতে যাবার জন্যে? মেয়ের বিয়ের বাজার বা তত্ত্ব পাঠাবার জন্য গাড়ি ব্যবহার বেআইনী নয় কি?

৯। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাতায়াতের ভাড়া এবং প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা নেবার জন্য টাকা পেয়েও কোন অফিসার নাকি একে অফিসের কাজ বলে দেখান এবং ছুটি নেন না?

১০। লেনডিং ও রীডিং সেকশনের সঙ্গেই পাঠকদের যোগাযোগ। জাতীয় গ্রন্থাগারের যা কিছু সুযোগ, এই দু'টি সেকশনের মাধ্যমেই পাওয়া যায়। অথচ ১৯৬৮ সাল থেকে এ দু'টি সেকশনে কোনও অফিসার নেই। একজন অফিসার কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে যান মাত্র। পাঠকরা এমন কাউকে পান না, যাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় কিম্বা অভিযোগ জানানো যায়। পাঠকদের কথা উপেক্ষা করে এই পদগুলি কেন খালি রাখা হয়েছে?

১১। লোকসভায় প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছেন, কোন দুষ্প্রাপ্য বই হারায় নি। বহু হারিয়ে যাওয়া দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নাম জানানো কি দরকার? তা ছাড়া বই চুরি গেলে যথার্থভাবে কে দায়ী তা নাকি সাব্যস্ত করা যায় না? এটাও কি বিশ্বাস্য? বই রক্ষার ভার লাইব্রেরীর কোনো অফিসারের ওপর নেই—এ কি কল্পনা করা যায়?

জনসাধারণ চান লাইব্রেরীর সুষ্ঠু পরিচালনা। কিন্তু বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হলে লাইব্রেরীর কাজ ভাল হতে পারে না। সেই বাসা ভেঙে ফেলার জন্য খোসলা কমিটি বোধ হয় তার ধারে-পাশেই যান নি। এরকম হাস্যকর তদন্ত সমর্থনের অযোগ্য।

আগস্ট বিপ্লব

নির্মল বসু

৯ই আগস্ট।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা এই দিনটি আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণে শিহরণ জাগায়। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট শুরু হয়েছিল দেশব্যাপী আগস্ট বিপ্লব। আসমুদ্র হিমাচল কম্পিত হয়েছিল একটি ধ্বনিতে: 'ইংরেজ, ভারত ছাড়ো'। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা-সৈনিক উচ্চারণ করেছিল একটি মন্ত্র: 'করব, না হয় মরব' (করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে)।

বোম্বাই শহরে গোয়ালিয়র পার্কে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ অধিক রাত্রিতে প্রস্তাব গৃহীত হল: ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে হবে। না হলে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হবে। গান্ধীজীর নির্দেশে সেদিন এ-আই-সি-সি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণ শেষ হতে না হতেই, রাত্রি শেষ হবার পূর্বেই, গান্ধীজী থেকে শুরু করে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত অনন্যা বামপন্থী দলের (কমিউনিস্ট পার্টি বাদে) ছোট বড় সকল নেতাকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে। ৯ই আগস্ট সকালে এই সংবাদ জানার পর সমগ্র দেশ ক্রোধে ফেটে পড়ে এবং ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতারা সংগ্রামের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান নি। সময় পান নি। বোধ হয় সে সম্পর্কে ভাবেনও নি। কারণ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের অনেকেরই ধারণা ছিল, শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। এ-আই-সি-সি'র প্রস্তাব নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেই একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। অনিচ্ছুক নেতারা অনেকটা বাধ্য হয়েই এই প্রস্তাব নিয়েছিলেন। কারণ, তখন দেশবাসীর মনে আপোষহীন সংগ্রামের প্রবণতা তীব্র হয়েছে। নেতৃবৃন্দের পক্ষে এই চাপ অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তবু জওহরলাল নেহরু থেকে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার আপত্তি ছিল, তখন যুদ্ধে বিব্রত, ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বড় রকমের কোন সংগ্রাম শুরু করার ব্যাপারে। কিন্তু সব হিসাবে গোলমাল হয়ে গেল নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে। নেতৃবৃন্দের নির্দেশ ও কর্মপন্থা ছাড়াই, সাধারণ কর্মীরা নিজেরা কর্মসূচী প্রস্তুত করে আন্দোলনে এগিয়ে গেলেন।

সারা দেশে সুরু হল সে এক বিরাট সংগ্রাম। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে এত বড় গণঅভ্যুত্থান, এত বড় গ্রহের পথে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় নি। সংগ্রামী জনতা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদকল্পে রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, পোস্ট অফিস ও থানা জ্বালিয়ে দিয়েছে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কেটেছে। আন্দোলনের এ এক নতুন পথ। বহু জায়গায় ইংরেজ শাসনকর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে বিদ্রোহী জনতা পাল্টা স্বাধীন সরকার গঠন করেছে। সাতারা, বালিয়া, তমলুক প্রভৃতি স্থানে এইরূপ স্বাধীন সরকার দীর্ঘদিন কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এই সব স্বাধীন সরকার নিজেদের আদালত, পুলিশ এমন কি কোথাও কোথাও মুদ্রার প্রচলন পর্যন্ত করেছে।

আগস্ট বিপ্লবে ভারতের সকল প্রান্তের মানুষ অংশ গ্রহণ করেছে। আবালবৃদ্ধ-বনিতা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। ইংরেজ সরকারের চরম নির্যাতন, পুলিশ ও সৈন্যের জুলুম এঁদের পিছু হঠাতে পারে নি। তমলুকে ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার বীরত্ব কাহিনী আজ ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পুলিশের গুলীতে এই বৃদ্ধার দুই হাত রক্তে ভেসে গেছে, তবু তিনি হাত থেকে জাতীয় পতাকা ফেলে দেন নি, অসীম সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে পতাকা উচ্চে তুলে ধরে এগিয়ে গিয়েছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন। আগস্ট বিপ্লবের প্রথম শহীদ সিন্ধু প্রদেশের ছাত্র হিমু কালানির আত্মত্যাগই কি কম গৌরবের? এ রকম কতজন প্রাণ দিয়েছেন। তদানীন্তন ভারত সরকার এক হিসাবে বলেছিলেন, প্রথম তিন মাসে আগস্ট বিপ্লবে এক হাজার জন মারা গিয়েছেন। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের হিসাবমত পঞ্চাশ হাজারের ওপর শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন আগস্ট বিপ্লবে।

আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শহরের ছাত্র ও যুবকদের পাশাপাশি এই আন্দোলনে গ্রামের চাষী ও কারখানার মজুররা ব্যাপকভাবে এতে অংশ গ্রহণ করেন। বোম্বাই, সোলাপুর, আহমেদাবাদ, মাদ্রাজ, কানপুর, কলকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পনগরীতে শ্রমিকরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকা সত্ত্বেও (কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল) এই সব ধর্মঘট হয়েছিল।

সেদিন আগস্ট বিপ্লব দমনের জন্য হিংস্র ইংরেজ সরকার যে বর্বর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, ইতিহাসে তার [illegible] পুলিশ নির্বিশেষে অত্যাচার চালিয়েছে, মেয়েদের সতীত্ব নষ্ট করেছে, এমন কি আন্দোলন দমনের জন্য বিমান থেকে গুলীবর্ষণ পর্যন্ত করেছে। এত নির্যাতন সত্ত্বেও তারা বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙতে পারে নি।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সৈন্য আগস্ট বিপ্লব 'দমনে' সক্ষম হয়। স্বাধীন পাল্টা সরকারের অবসান ঘটে।

কিন্তু আগস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হয় নি। আগস্ট বিপ্লবের ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান দেখে ইংরেজ আঁতকে উঠেছিল। তারপর যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ শুরু হ'ল, তখন ইংরেজ বুঝল, এবার তাদের ভারত ছাড়তে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ভারতের সর্বত্র যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরু হয়েছিল, তার মূলে ছিল আগস্ট বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব। বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহ, জব্বলপুরের পুলিশ বিদ্রোহ, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট, শ্রমিকদের আন্দোলন, কৃষকের সংগ্রাম এবং ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, এসবে বিচলিত হয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়েছে। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীত কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও, এখনও আগস্ট বিপ্লবের আদর্শ সফল হয় নি। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "চাষীর হাতে জমি দিতে হবে, শ্রমিকের হাতে কারখানা দিতে হবে।" এই প্রস্তাব আজও কার্যকরী হয় নি। আগস্ট বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ তাই আজ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার অপেক্ষায় আছে। দেশের সকল মানুষের জন্য অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত, ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আগস্ট বিপ্লবের অর্ধ লক্ষ শহীদের স্বপ্ন সফল হবে না।

আগস্ট বিপ্লবের জয়ন্তী দিবসে আজ এই প্রশ্ন উঠবে: ইংরেজ কি সত্যি ভারত ছেড়েছে? আজও ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে রয়েছে, যে কমনওয়েলথের প্রধান বৃটেন এবং যে বৃটেন চরম শ্বেত বর্ণ বিদ্বেষে পরিচালিত হয়ে বৃটেন থেকে তাদের কৃষ্ণাঙ্গ বিতাড়নে বদ্ধপরিকর এবং রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অমান্য করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয়ের শপথ রাখে। আজও ভারতে ইংরেজ পুঁজি অবাধে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই 'ভারত ছাড়ো' তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন ভারত কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে এবং ভারত থেকে ইংরেজ পুঁজির শোষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হবে।

'ভারত ছাড়ো' ধ্বনি কেবল ভারতে

ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সময় বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের অবসান কামনা করেছে। আজ তাই আগস্ট বিপ্লবের ঐতিহ্য আমাদের নতুন করে বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রেরণা যোগাবে।

সেদিন আগস্ট বিপ্লবীরা যে সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আজ দেশের ছাত্র ও যুবকদের সেইভাবে সকল অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে।

আগস্ট বিপ্লব আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে, জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত অগ্রাহ্য করে কোন সংগ্রামের কর্মসূচী হতে পারে না। সেদিন যাঁরা 'জনযুদ্ধের' কথা বলেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত ছিল, ভারতের অবস্থার যথার্থ মূল্যায়ন না করে তাঁরা অন্য দেশের প্রশ্নকে বড় করে তুলেছিলেন। আজ তাই মনে রাখতে হবে, ভারতের যে-কোন সংগ্রামের কর্মসূচী প্রণয়নে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে জাতীয় পরিস্থিতি।

ভারতদর্শন

[৩৩৩ পৃষ্ঠার পর]

দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা খোলা একটু কঠিন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব করেছেন যে, ওড়িশায় দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পরিবর্তে তাঁরা রূঢ়কেল্লা ইস্পাত কারখানার উৎপাদনী ক্ষমতা তিন গুণ বাড়াবার কথা চিন্তা করছেন। কারণ তাতে অনেক কম মূলধন ব্যয় করে, বেশি ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রের এই প্রস্তাবটি অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে এখন ইস্পাতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। আর ভারতবর্ষ ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদে যে রকম সম্পদশালী তাতে আরও ১০।২০টি ইস্পাত কারখানা এদেশে অনায়াসেই নির্মিত হতে পারে। বর্তমানে আমরা লক্ষ লক্ষ টন আকরিক লৌহ অত্যন্ত সস্তা দরে জাপান এবং অন্যান্য দেশের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছি। তাই দিয়ে আমরা যদি ইস্পাত উৎপাদন করতে পারতাম, তাহলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারত। কিন্তু নানা বাস্তব অসুবিধা আমাদের সেই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই অসুবিধা দূরীকরণের পথে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। সেটা তাঁদের মস্ত অক্ষমতা।

ওড়িশার অবিলম্বে একটি দ্বিতীয় ইস্পাত কারখানা গঠন করা সম্ভব হোক বা না হোক, সেই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের অর্থনৈতিক মান যতদিন না সমান সমান হচ্ছে, ততদিন দেশের বিভিন্ন অংশে অশান্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করা অস্বাভাবিক নয়। সেটা দেশের সঠিক অগ্রগতি ব্যাহত না করে পারে না।

পাঞ্জাবের একটি কলেজের কাহিনী

কয়েকদিন আগে রাত ১০টার সময় পাঞ্জাব ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের (চণ্ডীগড়) এক হোস্টেল থেকে গান-বাজনা, হৈ-হুল্লোড়ের আওয়াজ উঠতে থাকে। সেই আমোদ-ফূর্তির কর্ণবিদারী চিৎকারে পাড়াপড়শী সচকিত হয়ে ওঠেন। প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অফিসাররা ভাবলেন, হোস্টেলে র‍্যাগিং হচ্ছে। সেটা প্রতিরোধ করবার জন্য তিনি ছুটতে ছুটতে হোস্টেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। খবরটা হোস্টেলে পৌঁছে যেতেই ছাত্ররা তাড়াহুড়ো করে গা ঢাকা দিল। প্রিন্সিপাল সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সেখানে ১৫টি শূন্য মদের বোতল আর একটা রেকর্ড প্লেয়ার পড়ে আছে। তিনি শুনলেন বাইরের কয়েকজন লোক নিয়ে হোস্টেলের ২০ জন পানোন্মত্ত ছাত্র অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় টুইস্ট আর ভাঙড়া নাচ নাচছিল।

প্রিন্সিপাল সংশ্লিষ্ট ৪জন ছাত্রকে এক বছরের জন্য রাস্টিকেট করেছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট নাকি প্রিন্সিপালকে আরও নরম মনোভাব অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রিন্সিপাল সরকারের সেই নির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

দেশের ছাত্রসমাজের একাংশ কোন্ পথে চলেছে, এই ঘটনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

—১।৮।৭০

॥ এক ॥

"নয়াদিল্লী, ২৬ মে (ইউ এন আই)ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। টোকিওর স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের মূল্য দারুণ হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু আজ কিছুটা তেজীভাব দেখা দেয়। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের শেয়ারের বাজারে দারুণ মন্দাভাব দেখা দিয়েছে।......লণ্ডন, প্যারিস, মিলান এবং অন্যান্য শেয়ার বাজারে ব্যাপক মন্দা দেখা দিয়েছে।... নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ার জন্যেই বিশ্বের অন্যান্য শেয়ার বাজারে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলে বি-বি-সি জানিয়েছে।"

—বসুমতী ২৭-৫-৭০

"নিউ ইয়র্ক, ২৭ মে (পি টি আই)ঃ গতকাল নিউ ইয়র্কের শেয়ারের বাজার আবার হোঁচট খেয়েছে এবং মাঝখানে দর কিছুটা আত্মস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলেও তার পরেই সমস্তরকম শেয়ারের দর আবার নেমে যায়। ......১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শেয়ারের বাজারে মূল্যের নিম্নগতি সুরু হয়। ঐ সময় থেকে কাগজে-কলমে শেয়ারের দর ৩৫ শতাংশ হারে নেমে গেছে।"

—যুগান্তর ২৮-৫-৭০

"ওয়াশিংটন, ১৭ জুন (এ-পি ও এ-এফ-পি) ঃ প্রেসিডেন্ট নিক্সন আজ ঘোষণা করেছেন যে, মুদ্রাস্ফীতি ও অতি উত্তপ্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের এক 'মুদ্রাস্ফীতি সতর্কীকরণ' ব্যবস্থা প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছেন। মজুরী ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধের ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে তিনি ব্যবসায়ী ও শ্রমিক মহলের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান।"

—বসুমতী ১৯-৬-৭০

লণ্ডনের অবস্থা—

"Unemployment went down this month ... there were 561,000 people out of work, excluding school teachers .... last month. The fact remains that this is the highest May figure since 1940.... Stocks which were run down last year ... etc. etc."

—The Economist, 23–29 May, 1970

বিশ্বের শেয়ার বাজারে এই ধরনের সংকট প্রাক্-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থার কথা কি স্মরণ করিয়ে দেয় না? বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, সর্বোপরি সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার বাজার মন্দা এবং তার পরিণতিস্বরূপ শেয়ার বাজারে দারুণ হোঁচট—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে ত্রিশ দশকে এই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, বা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল ১৯২৯ সালে। এ-বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠেঃ তা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন?

॥ দুই ॥

রুশ কমুনিস্ট পার্টির উনবিংশতিতম কংগ্রেস উপলক্ষে প্রকাশিত 'রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী' পুস্তিকায় স্তালিন দুটি মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে যে বিরোধ, তার চাইতে ধনতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্বিরোধ সেখানেই বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে—যে কারণেই হোক—অবস্থাটা ঠিক উল্টো। অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে যে বিরোধ, তার চাইতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্বিরোধ অনেক বেশি প্রকট: এবং এটাই হচ্ছে সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি।

কমুনিস্ট থিওরিতে অর্থনীতি হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি, রাজনীতি তার বহিঃকাঠামো। এই বহিঃকাঠামো মূল ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল ও তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু অবস্থাবিশেষ এই মূল ভিত্তি আবার বহিঃকাঠামোকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে পাল্টে দিতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি প্রথমোক্ত পর্যায়ভুক্ত। আর সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। তার মানে হচ্ছে বাজার নিয়ে (মূল ভিত্তি, অর্থনৈতিক) ধনতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যন্তরে যে বিরোধ হওয়ার কথা, সে-বিরোধের চেয়ে রাজনীতি (বহিঃকাঠামো) নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্বিরোধ অধিকতর প্রকট।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া ধনতান্ত্রিক শিবিরের এই অন্তর্বিরোধকে কাজে লাগিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে বৃটেন ও আমেরিকাকে নিয়ে ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্ট করেছিল। আর সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধনতান্ত্রিক শিবির, তেমনিভাবে, কমুনিস্ট শিবিরের অন্তর্বিরোধকে কাজে লাগাবে, তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এবং এইটেই সম্ভবত কমুনিস্ট দুনিয়ার চরম ট্রাজেডি হবে।

॥ তিন ॥

গত ২৪ এপ্রিল চীন সাফল্যের সঙ্গে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করেছে। চীনের আর আলাদাভাবে প্রমাণ করতে হবে না যে, তার বহু-পর্যায় রকেট আছে (বহু-পর্যায় রকেট ছাড়া ঐ ধরনের স্পুটনিক উৎক্ষেপ অসম্ভব, আর বহু-পর্যায় রকেট মানেই হচ্ছে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা আই-সি-বি-এম)। পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে বহু-পর্যায় রকেট অপেক্ষাও কৃত্রিম উপগ্রহ অনেক বেশি মারাত্মক। স্পুটনিকে বসান পারমাণবিক বোমাকে ভূপৃষ্ঠস্থিত নিয়ন্ত্রণাগার থেকে বোতাম টিপে যে-কোন স্থানে

গুলি নির্দেশ করেছেন, তা বুঝতে বোধ হয় অসুবিধা হবে না।)

[এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এ-সব ঘটনার ঠিক পূর্বে ক্রেমলিনে স্তালিনপন্থীদের একটা 'ক্যুপ'-এর চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এক শ্রেণীর রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে, সে 'ক্যুপ' সফল হলে সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্বরূপ-প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাল্টে যেত। এমন কি, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেত।]

পরের দিন ২১ মে রুশ সরকারের মুখপত্র 'প্রাভদা' মাও'র এই বিবৃতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ ক'রে বলে : "মাও সে-তুং চীনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টিকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। ......চীন রণোন্মাদনার চরম শিখরে উঠে বসে আছে। যুদ্ধ এবং পেটের খিদে মেটানর প্রস্তুতির ডাক ছাড়া মাও'র অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ নেই। ......সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রাকে এবং সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত শিল্প বিনিয়োগকে চীন সামরিক সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে।"

তারপর ২৬ মে'তে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (বলা বাহুল্য, রাশিয়া এখন পর্যন্ত 'বুর্জোয়া' প্রেসের এ-সংবাদের কোন প্রতিবাদ করেনি)।—

"নিউ ইয়র্ক, ২৫ মে (এ পি) : চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের লড়াই বাধলে রুমানিয়াকে রুশপক্ষে নেবার জন্যে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ এক চরমপত্র দিয়েছেন। ......গত সপ্তাহে রুমানিয়ার নেতা নিকোলাই সিয়েসকুর কাছে ঐ পত্র দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট ঐ পত্রে যে ক'টি কথা বলেছে, তার মধ্যে অনুরোধের কোন বালাই নেই—সবই অবশ্যপালনীয় বলে নির্দেশ রয়েছে।"

॥ চার ॥

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তুতিকাল থেকে "চীন আক্রান্ত হতে পারে", একাধিকবার চীন এ-কথা বলে থাকলেও বিশ্বযুদ্ধের কথা ইতিপূর্বে (স্পুটনিক ছাড়ার আগে) সে এত জোর দিয়ে কোন দিন বলে নি। স্বভাবতই তার দিক থেকে এখন চেষ্টা চলবে কাকে কাকে সে দলে নিতে পারে এবং যাদের দলে নিতে পারছে না, তাদের কাকে কাকে অন্তত নিরপেক্ষ করে রাখতে পারে। সেদিক থেকে তার কূটনৈতিক চালচলনের ভেতর এবং সীমান্তবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্ভব।

সম্প্রতি চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের পর চীনা কূটনীতিতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্ত কংগ্রেসের পর পিকিংস্থ ভারতীয় দূতাবাসের কয়েকটি অনুষ্ঠানে চীনারা যোগ দিয়েছেন এবং ভারতীয়দের সঙ্গে ভদ্রতা বিনিময় করেছেন। নেপালের যুবরাজের বিয়ের সময় সেখানে উপস্থিত চীনের ভাইস-চেয়ারম্যান খ্যাতনামা সাহিত্যিক কু মো জো যে ভারতীয়দের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, তা সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন। এর চাইতে আরো চমকপ্রদ ঘটনা : পিকিং-এ মে-দিবসের অনুষ্ঠানে স্বয়ং মাও সে-তুং ভারতীয় চার্জ-দ্য-অ্যাফেয়ার্স শ্রী বি সি মিশ্রের করমর্দন করার সময় বলেছেন, "ভারত মহান দেশ, এ দু'টি দেশের মধ্যে পুরাতন বন্ধুত্বের সম্পর্কই থাকা উচিত।'

ইন্দিরাজীর তরফ থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনের সঙ্গে একটা আপস-রফার ইচ্ছাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না (এবং সিংহলে সিরিমাভো বন্দরনায়ক আবার ক্ষমতায় আসায় তাঁর দৌত্যে দু'পক্ষের এই সদিচ্ছা যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহের সম্ভাবনায় সিঞ্চিত, তা বলাই বাহুল্য)। কারণ, সিণ্ডিকেট কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী দল ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোকে রোধ করার জন্যে ইন্দিরাজীর কম্যুনিস্টদের সমর্থন প্রয়োজন। রুশপন্থী কম্যুনিস্টরা ইতিমধ্যেই তাঁর হাতে রয়েছেন। এখন চীনের সঙ্গে একটা আপস-রফা হলে চীনপন্থী বা চীনঘেঁষা কম্যুনিস্টরা তাঁর হাতে সম্পূর্ণ না এলেও বর্তমানের তুলনায় তাঁদের কাছ থেকে অনেক বেশি সমর্থন পাওয়া যাবে—ইন্দিরাজীর পক্ষে এটা চিন্তা করা অবাস্তব বা অযৌক্তিক কিছু নয়।

ঘটনার এই গতিপ্রকৃতিতে সি পি এম ও নকশালপন্থীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ও সুচতুর ভূমিকা যে নিতে হবে—এটা বোধ হয় সবাইর চাইতে তাঁরাই ভাল বুঝবেন।

সি পি আই-এর এদিক থেকে কোন সমস্যাই নেই—রুশ নীতির অনুসরণ তার পরিষ্কার লাইন। সবচাইতে বেশি সমস্যার সম্মুখীন সি পি এম। কারণ, সি পি এম প্রথম চীনপন্থী থেকে পরে নিরপেক্ষ থাকার নীতি নিলেও তার সদস্য ও সমর্থকদের সহানুভূতি চীনের প্রতি। সি পি আই ভেঙে সি পি এম'এর জন্মলাভের মধ্যে চীনপ্রীতি রয়েছে, এটা স্বীকার না-করাটা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম'এর তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' সত্তা বিপন্ন সি পি এম নেতারা এ-জিনিষটি বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলেই এ-সমস্যার হাত থেকে 'আপাতত' রেহাই পাওয়ার জন্যে উঃ কোরিয়া, উঃ ভিয়েতনাম ও কিউবার ন্যায় নিরপেক্ষ কম্যুনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ, শ্রীসুন্দরায়া ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সাম্প্রতিক উঃ কোরিয়া সফর যে এই অবস্থারই পটভূমিকায়, তা বোধ হয় পরিষ্কার করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

উঃ কোরিয়া, উঃ ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি কম্যুনিস্ট দেশগুলো মিলে আপাতত একটি তৃতীয় নিরপেক্ষ কম্যুনিস্ট ব্লক হলেও বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই নিরপেক্ষ জোট আর নিরপেক্ষ থাকবে না কিম্বা থাকতে পারবে না। হয় এই জোটকে চীন কিম্বা রাশিয়া, কোন একটি জোটভুক্ত হতে হবে, নয়ত এই প্রশ্নেই নিরপেক্ষ জোট ভেঙে যাবে এবং এই জোটভুক্ত দেশগুলোকে স্বাধীনভাবে রুশ কিম্বা চীন কোন-না-কোন পক্ষে যোগ দিতে হবে।

উঃ ভিয়েতনাম, উঃ কোরিয়ার পরিস্থিতি আর ভারতের পরিস্থিতি এক নয়। কাজেই সি পি এম'এর পক্ষে এ-পথ অবলম্বন গোঁজামিলের পথ ছাড়া আর কী হতে পারে!

সি পি এম'এর দ্বিতীয় সমস্যা : ভারত ও চীনের মধ্যে একটা আপস-রফা হয়ে গেলে তখন ইন্দিরা সরকার সম্পর্কে তাদের মনোভাব কী হবে?

নকশালপন্থীদের সমস্যাও কম নয়। তাঁরা যদি সত্যি চীনপন্থী হন, তা হলে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে মাও'র যে সতর্কবাণী, সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁদের মনে কোন দ্বিধা নেই। স্বভাবতই সেই অবস্থায় প্রথম পর্যায়ে অন্যান্য চীনপন্থী ও চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল দলগুলোকে নিয়ে একটা ফ্রণ্ট করার এক গুরুদায়িত্ব কি তাঁদের ওপর এসে বর্তায় না? দ্বিতীয় সমস্যা : ভারত ও চীনের মধ্যে একটা আপস-রফা হয়ে গেলে ইন্দিরা সরকার সম্পর্কে তাঁদের নীতি কী হবে, তা স্থির করা (এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে সি পি এম অপেক্ষা তাঁরা অধিক সংকটের সম্মুখীন)।

আরো অনেক বিষয়, অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল—যা নিয়ে এই স্বল্পপরিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এখানেই ইতি করার ইচ্ছে নেই। সে-সব প্রশ্নের আলোচনা পরবর্তী লেখার অপেক্ষায়।

বিতর্কের আরও খানিকটা

যাঁকে কেন্দ্র করে কোন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান অথবা পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, বিতর্ক তো তাকে নিয়ে এবং তার কর্মকীর্তি নিয়েই হবে। মানুষের ভেতরে যেমন আনুগত্যের, তেমনি জিজ্ঞাসার বিপরীত সমাবেশ থাকে। এই ডায়লেকটিক্যাল ভাবধারাই মানুষকে র‍্যাশানাল করে রাখে। সুতরাং, যাঁকে নিয়ে, যার কর্মকীর্তি নিয়ে বিতর্ক সেটা তাঁর গৌরব, একই সঙ্গে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি, তাই থেকেই সমন্বয়।

কৈ, বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে তো বিতর্ক ওঠে না। উঠেছিল যখন তাঁর অন্যান্য যোনাচ্ছন্ন সাহিত্যকীর্তির মধ্যে প্রথম এবং ওরা অনেকে বাজারে এসেছিল। কিন্তু সে তো সুনীতি সঙ্ঘের একপেশে তাৎকালিক বিবাদ মাত্র এবং পরিণামও কীর্তিমান লেখকের পরিজ্ঞাত। আবার বার্ধক্যকালের 'রাতভরে বৃষ্টির ফয়সালা হচ্ছে আদালতে। তেমনি বিতর্ক ঘটেছে সমরেশ বসুর গঙ্গার বিবর প্রবেশ নিয়েও। এবং এও তাৎক্ষণিক মাত্র। এ সব বিতর্কের জাতই আলাদা। এগুলো বারে বারে বিতর্ক ওঠবার কিছু নয়। বহু সযত্ন আয়োজনের নেমন্তন্নবাড়ির আবর্জনা যেমন পরদিনই ধাপার মাঠে বাহিত ও বুলডজারিত হয়, এ বিতর্কের জাতও তেমনি। নতুবা মানদার আগডারতও বিতর্কে অক্ষয় হয়ে থাকতে পারত এবং অবধূতও চিরঞ্জীব হয়ে থাকতেন।

কিন্তু রামমোহনকে, বিদ্যাসাগরকে, বঙ্কিমকে, শরৎচন্দ্রকে এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিতর্ক হয় তা অভিজাত; চিরন্তনী কালপ্রবাহে সঞ্চারিত। সাহিত্যের ভেতরে ও বাইরে বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, আশুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন বসুকে নিয়ে যদি বিতর্ক ওঠে, তার আভিজাত্যও ভিন্ন। যাঁর পরিমণ্ডল যত বেশি ব্যাপ্ত তাঁকে নিয়ে বিতর্কের অবকাশও তত বেশি।

রামমোহন যেমন একটি ব্যক্তিমাত্র নন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র যেমন এক-একটি ব্যক্তিমাত্র নন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ব্যষ্টিতে সীমায়িত নন, যেমন নন বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ প্রমুখেরা। যে ছাত্রনামধেয় গুণ্ডারা আশুতোষের মর্মরমূর্তিকে সিঁড়িতে গড়িয়ে দিয়ে হাততালি দেয় অথবা বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে যে বিদেশী রাষ্ট্রের বেতনভুক চরেরা আলকাতরার প্রলেপ দেয় তাদের কোন আত্মপরিচয়ই নেই। এরা যদি কোন বিতর্ক তোলার সাহস দেখাত, বাহাদুর বলতাম। চোরের মত গোপন অভিসারে মূর্তিতে কলঙ্কলেপন যে করে, চৌর্যবৃত্তিই তার সর্বস্ব, আর সর্ববিষয়ে সে নিঃস্ব, দূরে থেকে বোমা মেরে যে পালিয়ে যায় সে শৌর্যের দাবীদার হতে পারে না, তার মতো ভীরু দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই। যাঁদের নিষ্প্রাণ মর্মরমূর্তিকে ওরা ভাঙে বা কলঙ্কিত করে তাঁদের সজীব প্রাণের লেশমাত্র খবর রাখবার এক কণা বিদ্যে বা জ্ঞানও তাদের নেই; রাজনৈতিক বুকনিতে যতই কেন না তারা প্রাচীর মসীলিপ্ত করুক, ওরা বিদেশী রাষ্ট্রস্বার্থের বিভীষণ কুইসলিংয়ের নির্বোধ উত্তরাধিকার মাত্র। আমি যীশুখৃস্ট নই, আমি আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে পারব না, হে পিতঃ, ওরা জানে না ওরা কি করছে, ওদের ক্ষমা কর। ওরা ক্ষমার অযোগ্য। বন্দুকের নলের ভাষা ছাড়া এই নব বন্য হেড হান্টাররা অন্য কোন ভাষা বোঝে না, এরা স্বভাবতঃই বিতর্ককে ভয় পায়।

অতএব থাক এসব ক্ষণকালীন মৃগীরোগীর বিক্ষেপ। আজ কে খবর রাখেন একদা এক অম্বিকাচরণ গুপ্ত ছোটগল্প লিখেছিলেন? গজপাত রায় নামে একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন? চামেলীবালা মজুমদার লিখেছিলেন 'শুকতারা', কে খোঁজ করেন আজ 'দলিত কুসুম', 'দামিনীলতা'র? প্রসন্নময়ী দেবীর 'অশোকা'? 'কনকনলিনী'র ব্রজনাথ ভট্টাচার্য, 'মডেল ভগিনী' ও 'মডেল কাকার' যথাক্রমে মথুরানাথ তর্করত্ন, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, 'সুখচক্রে'র যদুনাথ ভট্টাচার্য, 'সুতপা'র রামনারায়ণ করকে নিয়ে কে তর্ক করেন? 'ভীষণ' লিখেছেন শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, 'সর্বনাশী' শ্যামলাল মজুমদার, 'তচনচ' অবিনাশ ঘোষাল, 'বিজলী' অবিনাশ দত্ত, 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক' অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'ভণ্ড পাদরী' উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অথবা উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'মুখ', উমাচরণ চক্রবর্তীর 'বসন্তকুমারী', উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুকের সোনা', ঊর্মিলা দেবীর 'পুষ্পহার', এন সি মজুমদারের 'সুলোচনা', ওসমান আলির 'হাফেজ সাহেব', কমলাকান্ত ঘোষের 'সরিৎকুমার', কালীময় ঘটকের 'শর্বানী', কালীকিংকর চক্রবর্তীর 'অপূর্ব সহবাস' খুঁজে খুঁজে কে বা কারা পড়েন? কৈ এ সব লেখকের ব্যক্তি ও সাহিত্যকীর্তি অথবা অন্য কোন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক? কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'নীরা', কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবানীঠাকুর', কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গমের সঙ্গিনী', কান্তিচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'সুশীলা চন্দ্রকেতু', কালীমোহন ভট্টাচার্যের 'যদু রায়', কালীচরণ মিত্রের 'যূথিকা', কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডুর 'পাষাণী', কৃষ্ণকালী গুহের 'শৈলকণ্ঠ', কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'অনিন্দ্যা', কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা', কৃষ্ণপ্রসাদ বসুর 'মেহের আকজান হরণ' নিঃসন্দেহে একদা কোন লাইব্রেরীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে।

কিন্তু আজ? হ্যাঁ আজও। অন্ততঃ এই সাধারণ [illegible] চক্রবর্তীর 'যৌবনের', কৃষ্ণানন্দ শর্মার 'হীরামালিনী', কেদারেশ্বর সেনের 'স্মৃতিমন্দির', কৈলাশচন্দ্র রায়ের 'ভাইভগ্নি', ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'দীপালি', ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্তীর 'মধুযামিনী', ক্ষেত্রগোপাল রায়ের 'ইন্দ্রকুমারী', গোবিন্দ ঘোষের 'চিত্ত-বিনোদিনী', গোপাল বন্দ্যোর 'হেমাঙ্গিনী', গোলাম মোস্তাফার 'ভাঙা বুকও'। আলমারীতে বিন্যস্ত আছে 'অমায় বালক', 'অযোধ্যার বেগম', 'অদর্শনা', 'সতুর মা', 'শোভা', 'মায়া', 'তারাসুন্দরী', 'ফোকলা দিগম্বর', 'পিশাচ', 'অসতী সন্ন্যাসিনী', 'পদ্মরাণী', 'শীলাদেবী', 'উন্মাদিনী', 'অপরিচিত', 'চিরলাঞ্ছনা', 'মধুমতী', 'আরতি', 'নবীমা জননী', 'প্রতিমা', 'সুরবালা', 'অভয়া', 'পুষ্পরাণী', 'কাকীমা', 'সরলা', 'রণোন্মাদিনী', 'অনুগামিনী', 'এলোকেশী', 'নিগৃহীতা', 'শান্তা', 'চারুশীলা', 'অপরিণীতা', 'লক্ষ্মী বৌ', 'পতিপ্রাণা'।

তর্ক নেই, বিতর্ক নেই, কিন্তু এরাই তিলোত্তমা বঙ্গসাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। সঠিক সমালোচনার ধারা নেই আমাদের সাহিত্যে, তাই অসংখ্য বইয়ের পরিচয় [illegible] অজ্ঞাত। কেন না, আমাদের সাহিত্যের দুর্ভাগ্য ভাল-মন্দ বইয়ের সার্টিফিকেট দেন অধিকাংশ অর্ধ, স্বল্প অথবা অ-শিক্ষিত প্রকাশকেরা। কোন্ বই সুখপাঠ্য, পাঠ্য অথবা অপাঠ্য, স্বল্পায়ু, পোকিওগ্রস্ত অথবা রসোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ তার সার্টি-ফিকেট নিতে হয় যাঁরা বই ছেপে লেখককে ধন্য করবেন তাঁদের কাছ থেকে।

প্রভাবতী সরস্বতী অনেক বই লিখেছেন, সম্ভবত কম-সে-কম অর্ধশত; সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের সংখ্যা এর চাইতে কিছু কম হবে না। এঁরা সাহিত্যে ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছেন, কিন্তু আজও কিছু স্থান আছে—যেমন আছে বহু গল্পকার প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের স্থান। সেকালে অনেকে বহুসংখ্যায় বই লিখেছেন খানিকটা লেখার তাগিদে, বেশিরভাগ জীবিকা নির্বাহের তাগিদে। কি অসামান্য নামমাত্র দামে তাঁরা বই বেচেছেন একেবারে বা সংস্করণপিছু (যার দ্বিতীয় সংস্করণ কখনো হয় নি) তা উল্লেখ করতেও লজ্জা পাই। আজও এই শ্রেণীর দরিদ্র লেখক কিছু আছেন যাঁদের প্রকাশকেরা [illegible] শোষণ করে; [illegible] লেখক [illegible] [illegible] তাগিদে; যদি লেখবার কিছু থাকে তবে পোকামাকড়ের এককালের [illegible] [illegible] [illegible] পাঁচ [illegible] [illegible] [illegible] থেকে পঞ্চাশ হতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কণ্কালে মেদ ও শিরিছিতে বাড়ি, চলনে গাড়ি ও সত্তরে বালক হতে পারে।

তবু সেকালে এক-একখানা বই নিয়ে হুলস্থুল হয়েছে, কিন্তু আজ প্রকাশকদের কাছে, কে জানে, হয়তো বা পাঠকদের কাছে তা অচল হয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম', 'সেই মুখখানি', 'এখানে আসিলে সবাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ম্যাট্রিকে (১[illegible]), [illegible] যেমন সিলেকসান ছিল না, [illegible] স্কুলের ইচ্ছাধীন ছিল, তাই, আমরা যেমন শরৎচন্দ্রের অরক্ষণীয়া পড়েছি, চন্দ্র-শেখরের শ্মশান পড়েছি [illegible] যেমন প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ঘুরে বেড়াবার পর সুবোধ চক্রবর্তী 'রম্যানি বীক্ষ্য' করে চলেছেন, সেকালে নায়িকা ছাড়াই জলধর সেনের হিমাদ্রি বা হিমালয়ও তেমনি এক চমকের সৃষ্টি করেছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতাও এমনি একখানি বই। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের আরও বই আছে, কিন্তু পালামৌর কাছে সব পরাস্ত। এবং এ থেকেও আমাদের পাঠ্য নির্বাচন হয়েছে। অনুরূপা দেবীর মা এমনি একখানি বই, গর্কির মা, গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দার মা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছে নানা কারণে, অনুরূপার মা কিছু সামান্য নয়। দিলীপ রায় আজ সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপস্থিতপ্রায়, কিন্তু তাঁর কিছু বই কিছু চমক সৃষ্টি করেছিল অন্নদাশঙ্কর রায়ের দেশে-বিদেশে এবং নবগোপাল দাসের সাগর দোলায় ঢেউয়ের মত। নিরুপমা দেবীর অন্নপূর্ণার মন্দিরেও পাঠক ঝুঁকে পড়েছিল। কেশবচন্দ্র গুপ্তের বইয়ের সংখ্যাও কিছু কম নয়। এককালে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় পাঠকদের বেশ মাতিয়েছেন। মানিক ভট্টাচার্য অনেক গল্প লিখেছেন, ভাল গল্পও, কিন্তু কজন তাঁর নাম করেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বকীয়তায় আজও বেঁচে আছেন সত্যি, কিন্তু তাঁরও স্থান স্থির হয়ে গেছে গ্রন্থাবলীতে। তাঁর কবিতা নিয়ে তাঁর পূর্ণ জীবন সন্ধানের চেষ্টা হলেও অত্যন্ত দ্রুত অন্তরালায়িত হতে চলেছেন। অথচ তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের একজন অবিস্মরণীয় লেখক।

কিন্তু [illegible] [illegible] বিস্মরণ, ডঃ নরেশ-চন্দ্র সেনগুপ্ত [illegible] যে একটি রাজা গড়েছিলেন তার বিস্মৃতি। অজস্র সাহিত্যের লেখক, [illegible] [illegible] তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আত্মযোগ করা যায় কি, তাঁকে নিয়ে কিছু বিতর্কও হয়েছে; আজ হয় না। আজ পাঠকেরা অন্য জাতীয় ক্রাইম দেখছেন বা তাই তাঁদের কাছে পরিবেশণ করা হচ্ছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের কথা ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা ঐতিহাসিক দাগ কেটেছিলেন বাংলাসাহিত্যে। আজ [illegible] [illegible] হয়েছে প্রকাশকের [illegible] [illegible], [illegible] মৈত্রেয় [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible]লনের অন্যও হঠাৎ যদি কখনো শুনি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক হচ্ছে, চমকে যাই। অনেক নাটক লিখেছেন তিনি এবং আজও লোকে তাঁর —'সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ' অথবা 'বাহবা নন্দলালের' কথা প্রবাদ বাক্যের মত বলে শুনে শুনে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল আজ অতীত; যেমন অতীত মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শচীন সেন, অপরেশ মুখোপাধ্যায়, জলধর চট্টো-পাধ্যায়। মন্মথ রায় বেঁচে আছেন বলেই তিনি এখনও কিকিং! নাটক গবেষণায় ডক্টরেট প্রার্থীরা অবশ্যই পড়তে বাধ্য হন, কিন্তু সাধারণ পাঠক-দর্শকের কাছে তাঁরা বিস্মৃতি বা অজ্ঞতারাজ্যে বিলীয়মান।

একটা কালে বাংলা সাহিত্যে সোনার ফসল ফলেছিল। বিশেষ করে কথা-সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায়ই মানিক-বিভূতি-তারা-শঙ্করের অভ্যুদয়ই যে ঘটেছে, তাই নয়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখো-পাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নব নব সৃষ্টির আনন্দ দিয়েছেন বাঙালী পাঠককে। মোটামুটি তাঁদেরই অনুসরণ করে স্বর্ণ-কমল ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, নরেন মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, হরিনারায়ণ চট্টো-পাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সতীনাথ ভাদুড়ী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ সার্থক লেখকরা বাংলাসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে ফসলে ভরে দিয়েছেন। তবে তালিকা করতে যাওয়ার বিপদ এই যে, ঠিক লেখবার মুহূর্তে অমার্জনীয় বিস্মরণ ঘটতে পারে। উল্লেখযোগ্য নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রতি মুহূর্তে। তা ছাড়া, যিনি তালিকা করবেন তাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পেয়েছেন, সেটিও সমস্যা নয়। সংস্কার-বদ্ধ আমি মানুষটা যেখানে শরীরে শুধু নয়, মনেও সীমাবদ্ধ, সেখানে তালিকা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। আর সত্যি করে আমি এখানে তালিকা-রচনাও করছি নে। আমি বলতে চেয়েছি, এককালে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে, কথা-সাহিত্যে সোনার ফসল ফলেছে। কিন্তু সবারই সব বই সমান চমক দিতে পেরেছে যা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এ-কথা ঠিক নয়। সুন্দর ঢেউ খেলানো সবুজ ধানক্ষেতেও অনেক গাছ থাকে সতেজ, কোনটা পোকায় বিনষ্ট, কোনটায় চিটে ধরে। মানিক বন্দ্যোর পদ্মানদীর মাঝিতে যে চমক, চোর বা প্রাগৈতিহাসিক গল্পে যে বিস্ময়, পুতুল-নাচের ইতিকথা বা সহরতলী দ্বিতীয় খণ্ডে যা বিস্তারিত, তা সবটাতে নেই। এজন্য খেদের কোন কারণ নেই। মানিকবাবুকে নিয়ে বেশ কিছুকাল কথা উঠবে, ওঁর সচেতন লেখার সঙ্গে অন্যান্য অচেতন অথচ রসোত্তীর্ণ লেখার নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। বিভূতি-ভূষণের পথের পাঁচালী বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র হয়েছে বলে নয়, অপরাজিতের উপসংহারে এমন মৌলিক ইঙ্গিত আছে যা বিভূতিভূষণের মনটাকে দর্পণের মতো
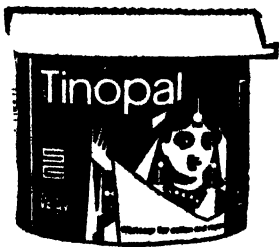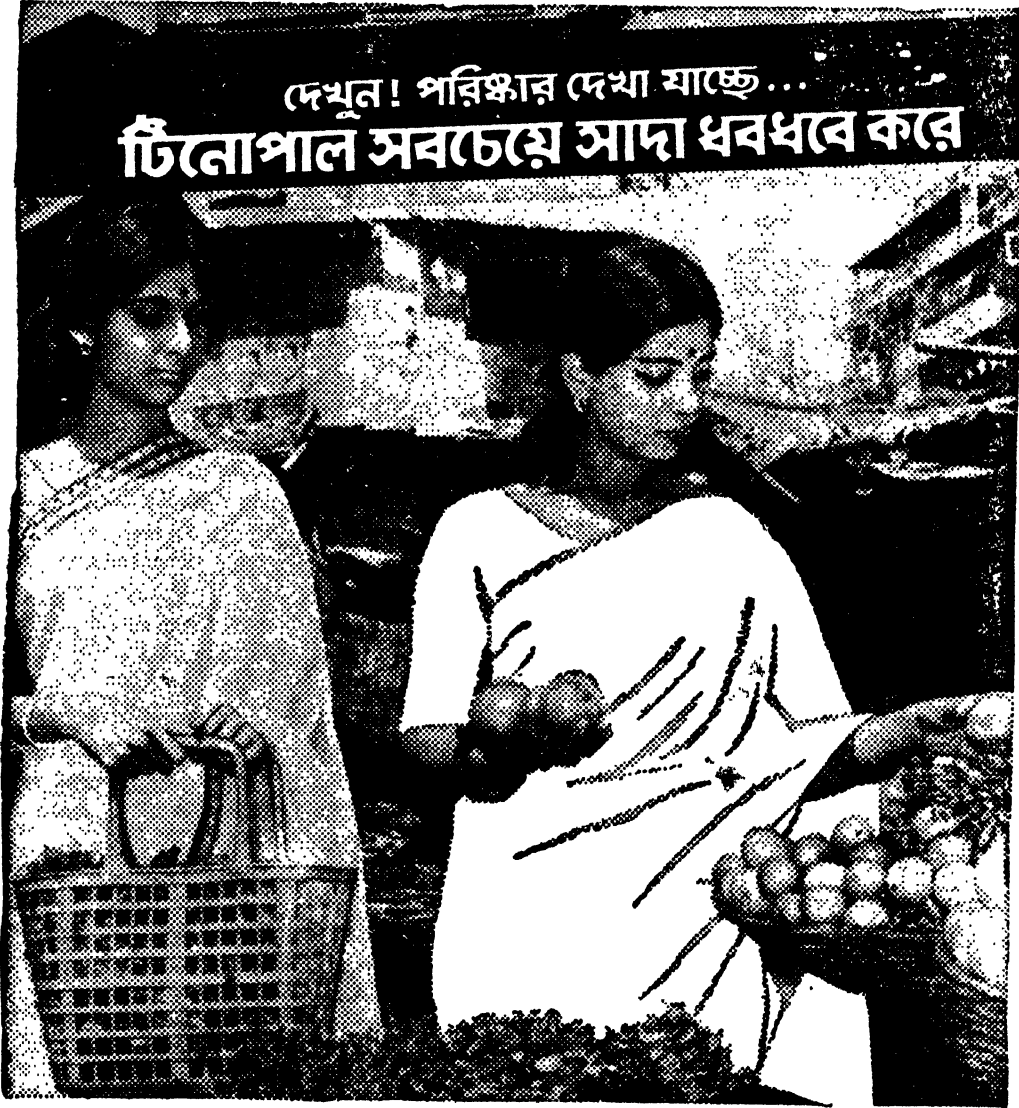
স্বচ্ছ হয়ে গেল। জানি, তারাশঙ্করের নিজস্ব মত কিছু পৃথক, কিন্তু ঐতিহাসিক এস্টিমেট ও রিয়াল এস্টিমেটে তাঁর কালিন্দী-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকৃতির মধ্যে অতুলনীয়। এঁদের তিনজনই সাহিত্যশিল্পকর্মের একটা মানরক্ষা করেছেন বলে ওঁদের গ্রন্থাবলীর খোঁজ হবে দীর্ঘকাল। শৈলজানন্দেরও একটা বলিষ্ঠ মান আছে, কিন্তু তাঁর প্রথম আবিষ্কার ঘটল কয়লাকুঠীতে—কথা-সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তারে আজ তিনি ক্লান্ত। ভাষা ও দুঃসাহসিকতায় প্রবোধ সান্যালের ওপর আলোকচ্ছটা পড়েছিল এবং প্রত্যাশাও জেগেছিল পাঠকদের মনে। এঁদের অধিকাংশই আমাদেরই মত নিম্ন-মধ্যবিত্তের মানসিকতা ও পরিবেশে পরিবর্ধিত, আজ হয়তো তাঁরা অর্থবিত্তে তা উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সংস্কার বাল্যজীবন থেকেই দৃঢ়মূল হয়ে যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন মিত্র, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যাঁর যাঁর বৃত্তের স্বকীয়তা রক্ষা করে এসেছেন। সম্প্রতি পত্রান্তর মারফৎ জানা গেল, এঁরা নাকি অনেকেই লেখার বৈষয়িক সঙ্কটে পড়েছেন, কি বিষয় নিয়ে লিখবেন, সহসা স্থির করতে পারছেন না। অথবা এ-কথাই বা তাঁরা স্বীকার করছেন না কেন, তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির যে দৃষ্টি ও কর্মক্ষমতা ছিল তা ক্ষীণতর হয়েছে? চারচক্ষু মেলে দেখবার, বোঝবার, আত্মস্থ বা আত্মসাৎ করবার ক্ষমতা গেছে কমে বা শেষ হয়ে? স্বর্ণকমল পরলোকগত, কিন্তু তাঁর 'অন্ত্যেষ্টি' বইটিও বিস্মৃতিধামে। সতীনাথ মৃত হয়েও বোধ হয় বেঁচে আছেন জাগরীতে এবং তাঁর দু-একখানা বই আজও প্রকাশকেরা বেচতে রাজী আছেন। সুবোধ ঘোষের ফসিল নিয়ে হুলুস্থূল পড়েছিল, পড়বার কারণও ছিল, অবাস্তিকের সঙ্গে কথা-সাহিত্যের ভার্জিন সয়েল আপটার্নড হয়েছিল। তাঁরও একটা মান আছে, কিন্তু পুজোর তাগিদে বেশী লেখার দোষ চুকতে বাধ্য। তবু তিনি বলাই-চাঁদ, প্রেমেনের মতই সাবধানী সতর্ক লেখক।

শুধুমাত্র চিত্তবিনোদন নয়, এঁরা মানুষের অনাবিষ্কৃত বহু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অতলান্ত মহাসাগর থেকে কিছু কিছু রত্ন আহরণ করেছেন, অথবা তার নমুনা উদ্ঘাটন করেছেন, হয়তো কিছু ক্লেদ কিছু অবাঞ্ছিত বস্তুও ঘুলিয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই ওঁরা পাঠকের চিত্তকে আলোড়িত-উদ্বেলিত করেছেন। তবু এ-কথা জোর করে বলা মুস্কিল ওঁরা চিরপ্রদীপ্ত থাকবেন। এঁদের অনেকেই অম্বিকা গুপ্ত প্রমথের মতই বিস্মৃতির গহ্বরে প্রক্ষিপ্ত হবেন,—যদি না, প্রকাশকেরা নতুন বইয়ের অভাবে এঁদেরকেই নব নব সাজে বা কৌশল করে বাজারে আনেন। এর কারণ এই নয় যে, তাঁরা হয়তো এমন কিছু দেন নি, যা বারে বারে মানুষের মনে প্রশ্ন তুলতে পারে; তাঁরা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, কিন্তু সে ঔজ্জ্বল্যের পরিমণ্ডল দীর্ঘায়ত নয় অথবা তাঁদের কেন্দ্র করে কোন ইনস্টিটিউসান, একটা ঐতিহ্য, একটা স্কুল, একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা, পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বিতর্ক বিষয় হতে পারেন নি। সবাই হন না। যাঁরা হন, তাঁদের অমরত্ব ঐখানেই।

লক্ষ্য করার বিষয়, স্বল্পায়ু কথা-সাহিত্য বা কথা-সাহিত্যিক অথবা নাটক বা নাট্যকারের তুলনায় প্রবন্ধকার, গবেষক বা ইতিহাসবিদেরা অনেক বেশি দীর্ঘায়ু। একটা সময় ছিল যখন দীনেন্দ্র রায়ের গোয়েন্দা কাহিনী, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প লাইব্রেরী বা বইয়ের দোকানে টানাটানি। প্রবন্ধের বই, গবেষণার বই, তত্ত্বের বই, (টেকস্ট্ না হলে) সাধারণ ইতিহাস। এমন কি, স্বদেশের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচনার বইয়ের পাঠক কম, খুবই কম; তবু এই স্বল্প পাঠকের মধ্যে তাঁরা দীর্ঘজীবী এই কারণে যে, মানুষের মনে যে যে প্রশ্ন জাগে, জেগেছে বা জাগতে পারে, তার কিছু কিছু সূত্র এ সব বইয়ের মধ্যেই আছে। ইতিহাস-প্রণেতাদের কাছে যেমন পূর্বসূরীদের উল্লেখ অনিবার্য হয়ে ওঠে (যদি আত্মসাতের মতলব না থাকে), কোন বিষয়ে বিতর্ক তুলতে গেলেও তেমনি পূর্বসূরী প্রবন্ধকারদের স্মরণ করতেই হয়। অতুল গুপ্ত কার্যত একখানা বই—কাব্য জিজ্ঞাসা লিখেই জীবদ্দশায় সাহিত্য সভা-সমিতিতে সমাদৃত হয়েছেন, মরণোত্তরকালেও কোন-না-কোন সূত্রে, খুব ব্যবধানে হলেও স্মরণযোগ্য হতে পারেন। লোকে এখনও যেমন বীরবল-সবুজপত্রের কথা বলে। পণ্ডিচেরীতে আড়াল না হয়ে গেলে নলিনী গুপ্ত জীবদ্দশায় সম্মান পেতেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা সত্ত্বেও তাঁদের প্রবন্ধ তাঁদের বেশি করে জাগিয়ে রাখবে। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার বা নারায়ণ চৌধুরী প্রবন্ধকার বলে তাঁদের নিয়ে হৈ-চৈ নেই, কিন্তু আলোচনা-সমালোচনাকালে তাঁদের নাম ওঠার সম্ভাবনা আছে—যেমন আছে পরলোকগত ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ রায়ের এবং জীবিত ডঃ অজিত ঘোষের নামোচ্চারণ। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন কবে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস লিখে গেছেন, ময়মনসিংহ গীতিকা ইত্যাদি লিখেছেন। তারপর ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ ভূদেব চৌধুরী, ডঃ অসিত বন্দ্যো-পাধ্যায় এসেছেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এসেছেন, কিন্তু দীনেশ সেন বেঁচে আছেন এঁদের মধ্যে বা এঁদের বাইরেও।

কিন্তু যিনি শিশুসাহিত্যে, কাব্যে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে এবং সর্বোপরি ব্রহ্মচর্যাশ্রম শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় পরিব্যাপ্ত, তিনি বিতর্কের এখনও (আজ হতে শতবর্ষ পরে—বস্তুত ১০১ বছর পড়েও) বিষয় ও দীর্ঘায়ু (বা চিরায়ু) হবেন না কেন? কথা-সাহিত্যে যেমন, প্রবন্ধ-সাহিত্যেও তেমনি কারও মূল্যায়নে তাঁর যদি একাধিক শিল্পকর্ম থাকে তবে তা থেকে মাত্র একটি বা ভগ্নাংশ বেছে নিয়ে তাঁর মূল্যায়ন কখনো সার্থক বা নির্ভরযোগ্য হতে পারে না; তাতে হয় সমালোচকের শ্রমশৈথিল্য নতুবা সঙ্কীর্ণ জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। কোন লেখকেরই সব বই ভাল হয় না, কোন লেখকেরই সব বই খারাপ হয় না; আবার এমনও দেখা যায়, কোন লেখকের একটি মাত্র বই বিস্ময়কর, আর সব না লিখলেই ভাল হত; কোন লেখকের একাধিক বই ভাল, অনেক অপাঠ্য। তবু বলতে হবে, কোন লেখক সম্পর্কে ব্যক্তিগত জীবনবৃত্ত, সম্পূর্ণ না জেনে, তাঁর ভাল-মন্দ সব বই না পড়ে কোন রায় দেওয়া বাচালতার পর্যায়েও পড়তে পারে। বিশেষ যাঁরা বেঁচে আছেন। অচিন্ত্যবাবুর প্রাচীর ও প্রান্তর ধসে পড়বে কিন্তু শ্রীম-কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃতের ঐতিহ্যানুসারী 'পরমপুরুষ' দীর্ঘায়ু হবেই।

এই সেদিন অক্ষয়কুমার দত্তের দেড়শ বছর পূর্তিপালন করা হল এবং উঠল তাঁর সমগ্র জীবনের সঙ্গে চারুপাঠের কথা। তাঁর যিনি তাঁর চাইতেও পরিব্যাপ্ত তাঁর কথা কয়েক শতাব্দী ধরে চলবে অবধারিত। নজরুলের কাব্য ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিঃসন্দেহে দীর্ঘকালব্যাপী, কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন পরিব্যাপ্ত নন বলে তাঁরা কোন স্থায়ী ইন্সটিটিউসন বা (সিকিউলার অর্থে) 'আশ্রম', কি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন নি, তাঁদের নিয়ে বিতর্কও তাই কমলে ও বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু যাঁদের পরিমণ্ডল বৃহত্তর, সৌরজগতের মত, তাঁদের নিয়ে বিতর্ক উঠবে বারে বারে, মূল্যায়ন হবে বারে বারে—হয়তো এইভাবেই, এই এক্সপ্লোডিং ইউনিভার্সের মতো আরও সৌরমণ্ডল মানুষের, পাঠকের, বাংলা-সাহিত্যের দৃষ্টিগোচর ও আয়ত্তে আসবে। আজ এখনও বিজ্ঞানে এবং বাংলাসাহিত্যে রবির সৌরজগতেই কক্ষ-পরিক্রমা করে চলেছি—কয়েকটা পা চাঁদে ফেলেও।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তিন ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী বিবেকানন্দের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—

"তাঁর বিচারবুদ্ধি ছিল বিজ্ঞানধর্মী ও মানবধর্মী। সমাজবাস্তবের বিশ্লেষণে তাই তিনি আধুনিক সত্য দৃষ্টির পথে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন কিন্তু হৃদয়টি ছিল দ্বিখণ্ডিত।...বিবেকানন্দের মানবধর্মও তাই অধ্যাত্মবাদের কুয়াশা থেকে মুক্ত হতে পারে নি।"

বিবেকানন্দের হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, একথা আমরাও স্বীকার করি। সেই সঙ্গে আমরা একথাও বলতে চাই যে সত্যদৃষ্টির পথে তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই তাঁর হৃদয় দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং হৃদয়কে দ্বিখণ্ডিত করে বস্তুবাদের সত্য এবং অধ্যাত্মবাদের সত্য—এই দুই সত্যকে এক করে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন তিনি এক সমন্বয়ের মধ্যে। সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ তাঁর হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল নানা বর্ণে। আর অধ্যাত্মবাদের কুয়াশা? কুয়াশা কোথায় নেই? বিজ্ঞান অনুসন্ধানে যতই মানুষ এগুচ্ছে, আমাদের চারপাশের ইন্দ্রিয়জগৎ ততই কুয়াশায় ভরে উঠছে। ইন্দ্রিয়জগতে বসে আমরা সকলেই খাচ্ছি-দাচ্ছি, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য বা পলিটিক্স করছি, বাহ্যজগতের হাজার রকম ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—এই পরম-বিশ্বাসে যে, নিত্যকার দেখা আমাদের এই জগৎ, আমাদের চারিদিকের এই বাহির্বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতায় কোথাও কোনো ভুল নেই। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর গর্ব কে না করে? আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর দ্বারা পরিশুদ্ধ এই দাবি-ই বা কে ছাড়তে চায়? আমাদের মত ও পথ সবই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নির্ধারিত—এ বিশ্বাস আমাদের কতই না দৃঢ়! কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্ যখন তাঁর লেবোরেটরীতে বসেন, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করুন—

"কি ব্যাপার? এই বিশ্বজগৎ বাইরে যেমনটা দেখছি, শুনছি, বুঝছি—সব ঠিক ত'? পরীক্ষা করে কি বুঝছেন?"

"তাই তো, হে—আগেকার সেই Materialism যেন একেবারে শেষ কথা নয়!"

"কেন?"

"এই তো দেখো, Matter, photon, light quanta সব পরীক্ষা করে দেখলুম। Particles আর Wave নিয়ে নানা অবস্থার বিচার হোলো. কিন্তু কি জানো—কণিকাগুলোর সঠিক অবস্থান জানাই আর সম্ভব হচ্ছে না। Elements of radiationগুলোও কেমন যেন—কোনো জায়গায় ঠিক থাকছে না। আবার এই দ্যাখো না—এদের অবস্থান যদি ঠিক ঠিক জানা যেতও তবু পরে কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলা একেবারেই অসম্ভব।

"চেতনাহীন এই জগৎটার কথা যদি বলো, তবে দেশ আর কালের তলায় ফুটে উঠছে তার Substratum-এর ছবি। ওর মধ্যেই ত' জাগতিক ঘটনার সব উৎস লুকিয়ে আছে। হয়ত অনাগত ভবিতব্য ওর মধ্যে সুপ্ত—অনিবার্য পরিণাম প্রকাশের জন্য সে অপেক্ষমাণ।"

"ওটা আপনার Hypothesis."

"কি বলছো? ওটা Hypothesis মাত্র? —তা বলো। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের সত্য যা কিছু জানা গেছে, এখন দেখা যাচ্ছে তার মিল শুধু Hypothesis-এরই সঙ্গে। যতই দেশ-কালে আবদ্ধ এই ওপরকার জগৎ থেকে Substratum-এর জগতে প্রবেশ করতে যাই, মনে হয় যেন কেমন তরো—যেন বস্তুর জগৎ থেকে মনের জগতে ঢুকছি।"

কিছুদিন আগে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে আমাদের চারিদিকে Space বা দেশ ছিল কঠিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিরেট কণিকাপুঞ্জে দ্বারা পরিপূর্ণ—যেগুলি পরস্পর পরস্পরের ওপর বৈদ্যুৎ চুম্বক বা মাধ্যাকর্ষণীয় শক্তি প্রয়োগ করতো। এই শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হোতো। কণিকাপুঞ্জের গতি আর এর ফলেই ছুটতো জগৎজোড়া কর্মপ্রবাহ। কিন্তু আজ বিংশ শতাব্দীতে Physical theory of relativity বলছে বৈদ্যুৎ এবং চৌম্বক শক্তিক্রিয়া আসলে আমাদেরই "Mental constructs" বা "মনের ছাঁচ"। জড় কণিকারাশির গতি বুঝবার চেষ্টা থেকেই এই "ছাঁচ"গুলির উদ্ভব। আবার Energy বা শক্তি, Momentum বা ভরবেগ বা অন্যান্য যেসব 'Concepts' বা ধারণা গঠিত হয়েছে এই বিশ্বের ক্রিয়া-কলাপকে বুঝবার জন্য সেগুলি সবই "মনের ছাঁচ"।

Dialectics-এর ব্যাখ্যায় মার্ক্স বলেছিলেন—"With me, on the contrary, the ideal is nothing else than the material world reflected by the human mind and translated into forms of

thought"—ঠিক কথা, কিন্তু যে জোরটা উনি বাইরের Material World-এর ওপর দিয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞান ততখানি জোর আর দিতে পারছে না। একটা ঘরোয়া উদাহরণ দেওয়া যাক। কানাই-এর বন্ধু—ধরুন তার নাম বলাই। বলাই কানাই-এর কাছে মনোবেদনা জানিয়ে যখন বলে, জানিস, ভাই কানাই,

"স্বয়ং প্রিয়া বলেন 'তোমার গলা
বড়ই রুক্ষ
এই মোর বড় দুঃখ,—কানাই রে
এই মোর বড় দুঃখ—"

[রবীন্দ্রনাথ]

তখন প্রাত্যহিক জীবনের বস্তুবাদী অভিজ্ঞতা কানাইকে যতদূর নিয়ে যেতে পারে তার ওপর ভিত্তি করে সে বলে, "ভাই তো ভাই, তোমার গলার সুর ত' আমিও কত শুনেছি। সে কি এতই রুক্ষ? কই, আমার ত' তেমনটা মনে হয় না। কি জানি বাপু, নারীর মন!"

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বলছে রুক্ষতা বা কোমলতা ত' দূরের কথা, আসলে বন্ধুর গলা থেকে সুর বা বেসুর কিছুই বেরোয় না।—যা বেরোয় তা নিছক জড় বা শক্তি-কণিকার কম্পন-জনিত কিছু তরঙ্গ। প্রিয়ার মনের উপর প্রতিফলিত সেই তরঙ্গ যে তরঙ্গ-বোধে রূপান্তরিত না হয়ে বেসুর রূপে জেগে ওঠে এবং বিরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, ওটা প্রিয়ার মনের সৃষ্টি। প্রিয়ার মনটি যদি একটু অন্য ধরনের হত, তবে বিরস বেদনার বিরূপতায় নিপতিত হয়ে বলাইকে আর অমন কষ্ট পেতে হত না।

শুধু ধ্বনি নয়, বর্ণ স্পর্শ স্বাদ গন্ধ যা নিয়ে আমাদের এত কারবার, এত হাসি-কান্না, দুঃখ বেদনা, এত আকর্ষণ বিকর্ষণ, বন্ধুত্ব এবং রেষারেষি বহির্জগতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। মনুষ্যেতর বা মননিরপেক্ষ বস্তু জগৎ সে শব্দস্পর্শ-স্বাদগন্ধহীন এক কিম্ভূতকিমাকার সত্তা মাত্র। একজন প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের ভাষায়—"অণু পরমাণু ও আদিম জড়-কণিকাসমূহের সূক্ষ্মতম রাজ্যে জরীপ করে বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতের মোটেই কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্ব-জগতের সর্বত্র জুড়ে—জড়ে জীবে উদ্ভিদে গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকায় ও মহাশূন্যে প্রচণ্ড-বেগে অনবরত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে শুধু অগণিত আদিম জড় কণিকা ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও ফোটনের দল। শক্তিকণিকারূপী ফোটন হিসাবে গণ্য করা হল এখানে। কোথাও এরা দলে ভারী, কোথাও হাল্কা। কোথাও এদের বিদ্যুৎগতি, কোথাও বা তা একে অল্প বেশী কম। এই ছুটোছুটির ফলে এরা সব সময়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায় এসে আঘাত করে। এ সব আঘাতের ধাক্কা বহন করে নিয়ে যায় আমাদের দেহের বহুসংখ্যক স্নায়ুসূত্র আমাদের মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থলে। এখন মস্তিষ্ক কেন্দ্রের আদিম জড়কণিকার মধ্যে যে কি আন্দোলন ঘটে তা জানবার উপায় নেই, যা থেকে আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠে বর্ণে গন্ধে রসে ছন্দে স্পর্শে ভরপুর বিচিত্র এ বিশ্বজগৎ। বহির্জগতের পদার্থ হতে আসে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে শুধু আদিম জড়কণিকা বা শক্তি-কণিকার নৃত্যতরঙ্গের ধাক্কা। জাদুকরের দণ্ডের মত এরা আমাদের সুপ্ত চেতনায় জাগিয়ে তোলে বিচিত্র রকমের অনুভূতি। অগত্যা মানতে হয় এ হল শুধু আমাদের মনেরই কারসাজি। আমাদের মায়াবী মনই তার আপন মাধুরী মিশায়ে বিচিত্র বিশ্বজগৎ রচনা করে সুখ দুঃখের সংমিশ্রণে আপন উপভোগের জন্য। পাখীর গানে, ফুলের গন্ধে, চাঁদের আলোয় বা সূর্যাস্তের শোভায় কোনো বাস্তব ছন্দ গন্ধ রূপের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই। আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বহির্জগৎ হচ্ছে অরূপমরসমগন্ধমস্পর্শম-শব্দম্। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির প্রত্যক্ষ জগৎ—যাকে বলা যায় নাম-রূপের জগৎ—তা হচ্ছে আমাদের মনের গড়া জগৎ। স্বপ্নের মতই অনিত্য এবং অলীক। একে বলা যায় বিজ্ঞানের মায়াবাদ। বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে এর বিশেষ প্রভেদ নেই।"

অতএব মায়া বা অতীন্দ্রিয় কথাটি শুনে আর আঁৎকে উঠলে চলবে না। আমাদের মত সাধারণ মানুষ স্বীয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যাকে একান্ত অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়, যারা তলিয়ে দেখতে চায় তাদের অভিজ্ঞতায় সেই অবাস্তবই একান্ত বাস্তব হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে আমরা আমাদেরই অজ্ঞাতসারে অহরহ অতীন্দ্রিয় ভূমিকায় আরোহণ করি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অংকে—তখনও Quantum theory অথবা Physical theory of relativity জগতে প্রচারিত হয় নি—সেই সময়ে জড়-বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সীমারেখার মধ্যে কাল্পনিক ভেদকে ঘুচিয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন—

"জড়বিজ্ঞানের বিপরীত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বে এক মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের ঐহিক জীবন ও পরিদৃশ্যমান জগৎকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমার বাহিরে সকল ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আজ দ্রুত একটি ফ্যাসানে পরিণত হইতেছে।... আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যতক্ষণ স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন, ততক্ষণ আমাদের সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য পথপ্রদর্শক এবং সেগুলি যে সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, সে সংবাদ মানবীয় জ্ঞানসৌধের ভিত্তি—এ কথা কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু কেহ যদি মনে করে মানুষের সমগ্র জ্ঞান শুধু ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি—আর কিছুই নয়, তবে আমরা উহা অস্বীকার করিব। যদি প্রাকৃতিক জ্ঞান বলিতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই বুঝায়—তার বেশি আর কিছুই নয় তবে আমরা বলিব এরূপ বিজ্ঞান কোনোদিন ছিল না, কোনোদিন হইবেও না। উপরন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো জ্ঞান কখনো বিজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইতে পারিবে না।

অবশ্য ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের উপাদান সংগ্রহ করে এবং তাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুসন্ধান করে কিন্তু ঐখানে উহাদের থামিতে হয়।

প্রথমতঃ বাইরের তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারও অন্তরের কতকগুলি ভাব ও ধারণা যথা দেশ, কাল-এর উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ মানসপটভূমিকায় কিছুটা বিমূর্ত ভাব ব্যতীত তথ্যগুলির বর্গীকরণ বা সামান্যীকরণ অসম্ভব। সামান্যীকরণ যত উচ্চ ধরনের হইবে বিমূর্ত পট-ভূমিকাও তত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে থাকিবে। সেইখানেই অসংলগ্ন তথ্যগুলি সাজানো হয়। এখন জড়, শক্তি, মন, নিয়ম, কারণ, দেশ, কাল প্রভৃতি ভাবগুলি অতি উচ্চ বিমূর্তনের ফল—কেহই কোনোদিন এগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে নাই—অথবা বলা যায় এগুলি অতি প্রাকৃতিক বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। অথচ এগুলি ছাড়া কোনো প্রাকৃতিক তথ্য বোঝা যায় না।"

[পৃঃ ৩০৬, ৩য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন—

"আমাদের বাইরে এমন একটা কিছু আছে যাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ইহাকে বলা যাক 'ক'। আমাদের ভিতরে আরও এমন একটা কিছু আছে যাহা আমাদের নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়,—ইহাকে বলা যাক 'খ'। জ্ঞেয়বস্তুমাত্রেই এই 'ক' এবং 'খ'-এর সমষ্টি। আমরা যে সকল বস্তু জানি তার প্রত্যেকটিরই দুইটি অংশ অবশ্যই থাকিবে। 'ক' বহির্ভাগ এবং 'খ' অন্তর্ভাগ এবং ক ও খ-এর সমষ্টিলব্ধ বস্তুকেই আমরা জানিতে সমর্থ হই। অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তু

আংশিকভাবে আমাদের সৃষ্টি এবং উভয়ের অপর অংশটি বাহ্য। এমন কোনো বলেন এই 'ক' ও 'খ' এক অখণ্ড সত্তা।"

[পৃঃ ৩৩১—৫ম খণ্ড—বাণী ও রচনা]

তাই স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদ বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি কুয়াশামণ্ডিত কোনো অলৌকিক মিথ্যা জগতের কাহিনী নয়। অলৌকিক ঘটনা বলে তিনি কিছু মানতেন না। ইন্দ্রিয়ের জগতে অনুস্যূত হয়ে এবং তাকে অতিক্রম করে রয়েছে যে অতীন্দ্রিয়ের জগৎ সেও মানুষের অভিজ্ঞতা এক স্বতন্ত্র জগৎ। সেই জগদতীত সত্তার অনুসন্ধান না করে আমাদের অব্যাহতির জো নেই। এই বর্তমান ব্যক্ত জগৎ সেই অব্যক্তের এক অংশ মাত্র। এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ যেন সেই অনন্ত অধ্যাত্ম-লোকের একটি ক্ষুদ্র অংশ—আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে এসে পড়েছে। অতীন্দ্রিয় বোধ আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেও কুয়াশাবৃত প্রহেলিকা-জগতের ধূম্রমায়ায় আচ্ছন্ন কোন অলৌকিক মিথ্যা ব্যাপার নয়। স্বামীজী তাই বলেছিলেন—

"সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটি শক্তির বীজ [সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি, অতীন্দ্রিয়বোধ] অল্প-বিস্তর পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও অবশ্যই মানবমনে থাকা চাই। ইহাও স্মরণযোগ্য যে, একটি শক্তি অপরটির বিকশিত অবস্থা মাত্র। সুতরাং তাহারা পরস্পর বিরোধী নয়। বিচারশক্তিই পরিস্ফুট হইয়া অতীন্দ্রিয়বোধে পরিণত হয়। সুতরাং অতীন্দ্রিয়বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নহে—পরন্তু তাহার পরিপূরক। যে সকল স্থলে বিচারশক্তি পৌঁছিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় বোধ তাহাদিগকে উদ্ভাসিত করে। তাহারা বুদ্ধির বিরোধী হয় না। বার্ধক্য বালকত্বের বিরোধী নয়, পরন্তু তাহার পরিণতি।"

[পৃঃ ১৬৫-১৬৬—৩য় খণ্ড, বাণী ও রচনা]

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করতে অনুরোধ করি। বুদ্ধি বিচারের সীমায় রেখে যার ব্যাখ্যা হয় না, ইন্দ্রিয়ভূমির চৌহদ্দিতে সাধারণ বোধের মাপে যা খাপ খায় না এমন এক নিজস্ব অনুভূতির কথা লিখে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে।

"এক মুহূর্তে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটা অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।......বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গরু আর একটা গরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে—ইহাদের মধ্যে যে একটা অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিস্ময়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।"

কবির সেই সর্বব্যাপী পুলক-বিস্ময়-বেদনামিশ্রিত ভাবরাশি কবিতায় নিঃসারিত হইল—

"হৃদয় আজিকে মোর কেমনে
গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে
কোলাকুলি।"

জানি না কবির এই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতিকে কেউ কবিকল্পনা বলে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবেন কি না। কিন্তু কবি লিখেছেন—"ইহা কবিকল্পনার অত্যুক্তি নহে। বস্তুতঃ যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।"

[পৃঃ ১০০-১০১, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী—১০ম খণ্ড]

[চলবে]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(৯)

তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্‌পেক্টর অফ কলেজেস্‌' ছিলেন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি (পরে স্বাধীন ভারতে যিনি পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ছিলেন)। প্রফেসর নিবারণচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে উনি এলেন শান্তিনিকেতনে শিক্ষাভবন পরিদর্শনে। ওঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল গেস্ট হাউসে. দেখাশোনার ভার ছিল আমাদের উপর। বিজ্ঞানে আই-এস্‌সি মান পর্যন্ত 'প্রভিশনাল এ্যাফিলিয়েশন' এসেছে, ইনস্‌পেক্টর মহাশয়ের ভালো রিপোর্ট পেলে এবারের জন্য পাকা এ্যাফিলিয়েশন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীগুলি (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বটানি), বিশেষ করে ফিজিক্স ল্যাবরেটরীটা দেখবেন প্রফেসর রায় (তিনি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক)। ডঃ মুখার্জি পরিহাস করে বললেন. "আমি আপনাদের আদর-যত্নে. বিশেষ করে গড়গড়ায় সুগন্ধ তামাক পরিবেশন করার ব্যবস্থায়. অত্যন্ত পরিতৃপ্ত। এদিককার রিপোর্ট আমার প্রায় তৈরি হয়ে আছে. ইংরেজীর অধ্যাপক. বিজ্ঞানে দখল নেই, তাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিবারণবাবুর রিপোর্ট পেলেই তা সই করে একেবারে কবিগুরুর হাতে দিয়ে আসব। নিবারণবাবু হলেন আধুনিক যুগের বিশ্বামিত্র, ওঁর ভয়ে সবাই তটস্থ, একটু তফাৎ এই যে, খোসামুদে উনি তুষ্ট হন না। ওঁর পরীক্ষা করার কিছু নিজস্ব পদ্ধতি আছে, সেগুলি যিনি ধরতে পারেন, তিনি তাঁর উপর সুপ্রসন্ন, তা তিনি ছাত্রই হোন বা অধ্যাপকই হোন।" ডক্টর মুখার্জি ও প্রফেসর রায় এলেন ল্যাবরেটরীতে, প্রথম দেখলেন কেমিস্ট্রি, তারপর বটানি ও সব শেষে এলেন ফিজিক্স ল্যাবরেটরীতে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন যন্ত্রপাতি সব আছে কিনা, হঠাৎ নজর পড়লো ছোট্ট দোরবিনের মতো একটা যন্ত্রের উপর, বললেন. "এটা কি?" বলা হলো—'ডিরেক্ট ভিসন স্পেক্ট্রোস্কোপ', রাজশেখর বসু মহাশয় দিয়েছেন। "দেখি, দেখি" বলে প্রফেসর রায় হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা নিলেন, তার এক প্রান্তে চোখ ঠেকিয়ে সূর্যের আলোর বর্ণালিতে কালো-রেখা দেখার চেষ্টা করে বললেন, "এসব 'ডামি' যন্ত্র রেখে কী হবে?" আশ্চর্য হলাম ওটা তো ডামি নয়. তাকিয়ে দেখি তাড়াতাড়িতে ভুলে প্রফেসর রায় 'আই-পীস্‌'-এ চোখ না রেখে 'স্লিট'-এর দিকে চোখ ঠেকিয়েছেন। কথাটা বলতেই তিনি ভ্রূকুটি করে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখের ইঙ্গিতে ডঃ মুখার্জি আমাকে চুপ থাকতে বললেন. বুঝলাম দেবতা বেশ রুষ্ট। তার পরেই ঘটলো এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সেদিন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা হচ্ছিল। সেখানে গিয়েই একটি ছেলের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন, সে তখন 'ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার' নিয়ে কাজ করছিল। তাকে প্রফেসর রায় জিজ্ঞেস করলেন "দেখি কি 'রিডিং' নিয়েছ।" 'রিডিং'টা দেখেই ছেলেটিকে আবার 'রিডিং' নিয়ে দেখাতে বললেন। ছেলেটি আবার 'রিডিং' নিতে গিয়ে দেখে 'গ্যালভানোমিটার'-এর কাঁটা পূর্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। প্রফেসর রায় যেই ঝুঁকে পড়ে 'রিডিং'টা দেখতে গেলেন কাঁটাটি আরো খানিকটা সরে গেল। ছেলেটি ছিল বেশ বুদ্ধিমান, কাঁটার এই আকস্মিক স্থান পরিবর্তনে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "স্যার, এখন আর কোনো নির্দিষ্ট 'রিডিং' পাওয়া যাবে না, তার কারণ হঠাৎ এখানে একটা নূতন চোম্বক ক্ষেত্রের আবির্ভাব হয়েছে।" প্রফেসর রায়ের মুখের ভাব মুহূর্তে বদলে গেল, খুশি হয়ে বললেন, "তা কি করে হবে, হঠাৎ কোনো চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি হলো নাকি!" ছেলেটি বললো, "হ্যাঁ স্যার, আপনি একটু নড়লেই কাঁটাটা নড়ে যায়, আপনার দেহটাই হয়তো একটা চুম্বক, না হয় তো আপনার সঙ্গে চুম্বক রয়েছে।" প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরে উঠল, পকেট থেকে চুম্বকটি বের করে ছেলেটির হাতে দিয়ে প্রফেসর রায় তাকে দু'হাতে কাছে টেনে এনে বললেন, "ঠিক ধরেছ বাবা, তোমার পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বুদ্ধি দেখে ভারি খুশি হলুম।" ডঃ মুখার্জি বললেন,

শনিবারণবাদ্ধ এতোকাল কলকাতার ছেলে-দের চোখে ধুলো দিয়ে আজ এখানে ধরা পড়ে গেলেন।" প্রফেসর রায় বললেন, "হরেন্দ্রদা, এই ধরা পড়ার জন্যেই যে শিক্ষক আমি উন্মুখ হয়ে থাকি, আপনার এই দীর্ঘ জীবনে এর আগে আর দু'বার মাত্র ধরা পড়েছি।" ডঃ মুখার্জি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাভৈঃ রুষ্ট ঋষি এবার তুষ্ট।" তারপর ওঁরা দুজনে ডক্টর সেনের সঙ্গে গেলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। ডঃ মুখার্জি শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন দেখে এতো আনন্দ পেয়েছেন যে, গুরু-দেবকে বললেন, "ইচ্ছে হয় আপনার এখানে শিক্ষার্থী হয়ে আসি।" প্রসন্ন-মুখে গুরুদেব বললেন, "আসুন না এখানে, আপনার কাছে থেকে ইংরেজী সাহিত্যের অমৃতরসধারায় সিঞ্চিত হয়ে উঠুক এখানকার চিত্তক্ষেত্র।" তারপর ঘন্টাখানেক দুজনের আলোচনা চললো ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে। এই দুটি ক্ষেত্রে আমি অব্যবসায়ী, তাই এই আলোচনার কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করা হবে অনধিকার চর্চা। বিদায় নেবার আগে ডঃ মুখার্জি বললেন, "এমন উদার-উন্মুক্ত আকাশ এখানে, অর্থের সঙ্গতি হলে একটা দূরবীনের ব্যবস্থা করবেন ছেলে-মেয়েরা যাতে গ্রহ-উপগ্রহ চোখে দেখতে পায় ও বিশ্বপ্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্যের খানিকটা আভাস পায়। আকাশ যেখানে উদার, মনের প্রসারতাও সেখানে বাড়ে।" গুরুদেব বললেন, "অনেকদিন থেকে আমারও ইচ্ছে একটা ভালো দূরবীন এখানে নিয়ে আসি, ছেলেমেয়েরা উপরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখুক।"

কিছুদিন পরেই একটা দূরবীন কেনা হলো। বেশ শক্তিশালী, সৌরমণ্ডলের শনিগ্রহ ও তার বেষ্টনী সহ বেশির ভাগ উপগ্রহই চোখে ধরা পড়ে। চাঁদের গায়ে পাহাড়-পর্বত, গহ্বর, এমন কি সূর্যের আলোতে চাঁদের পাহাড়ের যে-ছায়া তার উপরে পড়েছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছেলেমেয়েদের চাঁদ ও গ্রহ-উপগ্রহ দেখিয়ে তাদের আয়তন, দূরত্ব, গতিবেগ, সূর্য প্রদক্ষিণের সময় ও অবস্থা সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য পরিবেশন করতাম। কী অসীম আগ্রহ, উৎসাহ ও মনোযোগ দিয়ে তারা দূরবীনে এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে দেখতো! একদিন সন্ধ্যার পর ল্যাবরেটরীর পূর্বদিকের মাঠে দূরবীন এনে ছেলেমেয়েদের গ্রহ-উপগ্রহ দেখিয়ে দূরবীনটা স্ট্যাণ্ড থেকে খোলার ব্যবস্থা করছি, এমনি সময় পিছন দিক থেকে ভেসে এলো গুরু-দেবের কণ্ঠস্বর, "আমিও দেখব বলে বসে আছি যে।" দূরবীনে তখন শনিগ্রহ তার বেষ্টনী সহ ধরা রয়েছে, গুরুদেব আগে শনির দশাটা দেখতে চাইলেন। একটা চেয়ার এনে গুরুদেবের বসবার ব্যবস্থা করা হোল, তারপর শনিকে দূরবীনের দৃষ্টিক্ষেত্রে এনে গুরুদেবের হাতে 'কণ্ট্রোল'টা দেওয়া হলো। তিনি দূরবীনটাকে নানা রকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাটা সহজ করে শনি, তার বেষ্টনী ও উপগ্রহমণ্ডলী দেখে যাচ্ছেন আর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, সূর্য তো পৃথিবী থেকে ন' কোটি মাইল দূরে, শনির ব্যবধান কতো? সূর্য-প্রদক্ষিণ এর সময় লাগে কতো? কক্ষপথে গতিবেগ কতো, আয়তন কতো, মেরুদণ্ডে আবর্তনের গতিবেগ কতো, এর উপগ্রহ কয়টি? এর বেষ্টনী একটা অপূর্ব জিনিস, গ্রহলোকে এর তুলনা নেই, এটা কী, আর সৃষ্টি হলোই বা কী করে? যতটা জানা ছিল এক এক করে প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলাম: 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থের গ্রহলোক অধ্যায় লেখা কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে, তাই অধিকাংশ খবরই দেওয়া সম্ভব হলো—সূর্য থেকে এর ব্যবধান প্রায় ৮৮ কোটি মাইল, সূর্য-প্রদক্ষিণের সময় ২৯ বছরের বেশি, কক্ষপথে গতিবেগ ঠিক মনে নেই, হয়তো সেকেণ্ডে ৮।১০ মাইল, তবে পৃথিবীর চেয়ে কম, পৃথিবীর হলো সেকেণ্ডে প্রায় ১৯ মাইল; আয়তন—ব্যাস পৃথিবীর প্রায় ন'গুণ, ৭০,০০০ মাইলেরও বেশি, আর আবর্তনের বেগ ১১ ঘন্টা। উপগ্রহের সংখ্যা হলো ৯; তবে এই দূরবীনে ৪।৫টির বেশি খুঁজে পাওয়া যায়নি, সবচেয়ে বড়ো বলে যাকে দেখায় সে আয়তনে বুধগ্রহের চেয়েও বড়ো আর শনি থেকে প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থেকে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। বেষ্টনীটা কী এবং সৃষ্টি হলো কী করে? বেষ্টনী নিরেট চাকা নয়, পরীক্ষায় জানা গেছে বেষ্টনীর যে অংশ শনির কাছাকাছি, তাদের গতিবেগ বাইরের দূরবর্তী অংশের চেয়ে বেশি। বেষ্টনী যদি অখণ্ড চাকার মতো হতো তাহলে ঘূর্ণিচাকার নিয়মানু-সারে বেগটা বেশি হোত বাইরের দিকে। লক্ষ লক্ষ খণ্ড টুকরো দল বেঁধে প্রচণ্ড বেগে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে বলে অখণ্ড চাকার মতো দূর থেকে মনে হয়। বিচ্ছিন্ন টুকরো বলেই, যারা শনির কাছে, টানের জোরটা তাদের উপরই বেশি এবং তারাই ঘুরবে বেশি বেগে। কী করে এই বেষ্টনীর সৃষ্টি হলো, সে সম্বন্ধে মতের মিল নেই, তবে যেটা বেশি প্রচলিত তা হলো—গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই একেবারে গোলাকার থাকতে পারে না, অনেকটা ডিমের মতো চেহারা হয়। তারপর এমন এক মুহূর্ত আসে যখন এই টানের বেগ সহ্য করতে না পেরে উপগ্রহ ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। এই টুকরো দুটি আবার ভাঙতে থাকে, এমনি করেই পর্যায়ক্রমে ভাঙতে ভাঙতে একটি উপগ্রহ ভেঙে লক্ষ লক্ষ টুকরো বের হওয়া অসম্ভব নয়। অনেকের মতে, প্রত্যেক উপগ্রহকে ঘিরে আছে এক অদৃশ্যমণ্ডলী, যাকে বলা যায় 'বিপদের গণ্ডী'। কোনো উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এই গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়লেই তার দেহটা ডিমের আকারের মতো হয়ে যায়, তারপরই ভাঙতে শুরু করে। আমাদের চাঁদেরও একদিন এই দশা হবে বলে আশংকা, তবে তার এখনও দেরী আছে: কারণ পৃথিবীর 'বিপদ-গণ্ডীর' অনেকটা বাইরে আছে সে। বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহ এই বিপদ-গণ্ডীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিছুদিন পরে সেখানে ঢুকলেই হয়তো খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়বে। শনির মতো বৃহস্পতিকে ঘিরে তখন শোভা পাবে একটি উজ্জ্বল বেষ্টনী। অনেকে মনে করেন, বহুকাল আগে শনির একটি উপগ্রহ তার বিপদ-গণ্ডীর ভিতরে গিয়ে পড়ে-ছিল, তাতেই ঘটলো এক অপঘাত, উপগ্রহটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে শনির চারদিকেই চক্রপথে অবিরাম ঘুরছে, তাতেই সৃষ্টি হয়েছে এই বেষ্টনীর। আবার কেউ কেউ বলেন চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে, কাজেই এভাবে বেষ্টনী সৃষ্টির ব্যাখ্যা চলবে না।

গুরুদেব বললেন, "চাঁদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পৃথিবীর যখন শনির দশা হবে, তখন তো অমাবস্যা, পূর্ণিমা বলে কিছুই থাকবে না। দিনরাত একটানা আলো আসবে তার বেষ্টনী থেকে, কবি-দের জগতে হাহাকার পড়ে যাবে যে! সমুদ্রে জোয়ার-ভাটাও বন্ধ। শুনেছি মানুষের জ্বরজারি, বাতের ব্যথা এই চাঁদের টানেই জেগে ওঠে, বাতের রোগী ভয় করে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশীকে; তারা তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। ভেবেছিলাম চাঁদকেও আজ দূরবীনের নতুন চোখ দিয়ে দেখব, কিন্তু চাঁদ তো দেখছি পলাতক। যাক আর এক সন্ধ্যায় ওকে ধরব।" ছেলেমেয়েদের বললেন, "জানো, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মনে করতেন বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিচলিত, সূর্য, চন্দ্র ও জ্যোতিষ্কের দল দিনে রাত্রে তাকে প্রদক্ষিণ করে মানুষের পরিচর্যায় নিযুক্ত। মনে যে করেছিলেন সে জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। সহজ-দেখা চোখে তাঁরা দেখেছিলেন পৃথিবী স্থির, আর তাকেই পরিবেষ্টন করে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পূব থেকে পশ্চিমে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী

সি. আর. পি

এখন ঠ্যাঙারেদের রাজত্ব ;
মানুষ বলতে কেউ নেই যে রুখে দাঁড়াবে।
রাজনীতির জুয়াড়ুরা এখন
অনেক রকম পাশা খেলায় ব্যস্ত ;
সময় কই যে বর্গিদের খেদিয়ে তাড়াবে॥

......অনুরাগী

তিনি ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ওস্তাদ ;
তাতে মোষ অথবা মানুষ যে-ই জবাই হোক।
এবং তাঁকে আরো বাহবা দিতে হয় ;
জবাই হবার আগে পশু আর মানুষ
একই সংগে তাঁর পা চেটে দেয়॥

কিরীশঙ্করেষু ঃ একটি ঘরোয়া সভা

আজ সব কিছু কিমার হুকুমে চলবে
খোদ রাজ্যপাল থেকে আগ্রো-বংগীয় কন্‌ফারেন্স।
আর যিনিই এর প্রতিবাদ করবেন,
তিনি এই মাহূর্তে সভা ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

যে স্থির নয়, তারই পশ্চিম থেকে পূবে আবর্তনের ফলেই যে জ্যোতিষ্কের চলা সম্বন্ধে এই বিভ্রম জন্মাচ্ছে, একথা তাঁরা বুঝতেই পারেন নি। দূরবীন তৈরির সংগে সংগে তাঁদের দৃষ্টির সীমানাও বেড়ে গেছে. আজ তাঁরা বিশ্ব-দেখা চোখ বানিয়েছেন। জানতে পেরেছেন বিশ্বে পৃথিবীর আসন অবিচলিত নয়, তাকে দৌড়াতে হয় সূর্যের চারদিকে এক চক্রাকার পথে, পথটা সুদীর্ঘ, সময় কম লাগে না, ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। যে-ছায়াপথকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে স্বর্গলোকের কতো বিচিত্র কাহিনী রচিত হয়েছে, দূরবীনের চোখে মুহূর্তে তার অবসান ঘটলো। জানা গেল পৃথিবী-দেখা চোখে যাকে আলোক-পথ বলে মনে হয়েছে তার ভিতর রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র মহাশূন্যে দুষ্পরিমেয় বিপুল দূরত্বমাত্রা নিয়ে এদের অবস্থিতি। বিরাট দূরত্ব এদের আলোকে করেছে ম্লান, সন্নিবেশকে করেছে নিবিড়, তাই একটা নিরবচ্ছিন্ন আলোক-পথ বলেই আমাদের সহজবোধে ধরা দেয়। দূরবীনের শক্তি বাড়তে বাড়তে বিশ্বলোকে বেড়ে চলেছে মানুষের দৃষ্টির পরিধি, আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে বিশ্বের রূপ। একটা জিনিস দেখতে পাই, বিশ্বপ্রকৃতি তার চেহারাটাকে এমন নিপুণভাবে সাজিয়ে রেখেছে যাতে তাকে আমাদের সহজবোধের কাঠামোয় মোটাই ধরতে পারি। অতি বড়োকে দূরে সরিয়ে তাকে করেছে ছোটো, আর অতি ছোটকে করেছে অদৃশ্য। যা চিন্তা করতেও মন অভিভূত হয়ে যায়, এতো বড়ো বড়ো জ্যোতিষ্কের দিক-সীমানার কথা আমাদের মাথার উপরকার আকাশের মধ্যে ধরা হয়েছে। দেখ দেখি, আমাদের কীরকম ভুলিয়ে রাখা হয়েছে; আর না ভোলালেই বা বাঁচতুম কী করে! এই সূর্য আপন বিরাট দেহ ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যদি আমাদের অনুভূতির আরো কাছে আসতো তাহলে মুহূর্তে পৃথিবীসুদ্ধ আমরা লোপ পেয়ে যেতুম।" দূরবীনে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী দেখাবার সময় এই কথাটা মনে রেখো, আর বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের মনে করিয়ে দিও—"এই বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে মানুষের অবস্থিতি, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, অথচ এই বিরাট বিশ্বের অতি-বড়ো ও অতিছোটদের হিসেব সে রাখছে, এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা জগতে আর কিছুই নেই॥"

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সেদিন আমার কথামতই বন্দীরা সবাই কাজ করেছিল এবং তার ফলও আমার আশানুরূপই হয়েছিল। লড্‌-ওয়ার খুবই গরম জায়গা এবং যদিও মাথায় পাথর নিয়ে হাসপাতালের দিকে যাবার সময় আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল তাড়াতাড়ি চলতে, কিন্তু ফেরবার সময় খালি হাতে আমরা দৌড়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। বেচারা প্রহরীরা নাজেহাল হয়ে পড়েছিল, নিয়মকানুন ভুলে গিয়ে রাইফেল কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। গায়ের ঘামে পায়ের ফেটি ভিজে ফুলে ওঠাতে তাদের চলতে আরও কষ্ট হচ্ছিল এবং প্রায় সকলকারই পায়ে ফোস্কা দেখা দিয়েছিল অল্পক্ষণ পরেই। বেচারারা হাঁপিয়ে প্রথমে জামার বোতাম খুলে ফেলে, তারপর আমাদের অনুরোধ করে আরও আস্তে চলতে। উত্তরে আমরা শুধু বলেছিলাম, কি করবো ভাই, জেলা শাসকের হুকুম তাড়াতাড়ি কাজ করার, তাই মানতেই হবে। সেদিন সন্ধ্যায় শিবিরের হাসপাতালের সামনে ক্ষতবিক্ষত প্রহরীদের ভিড় জমে গিয়েছিল। পরদিন সকালে তাদের অধিনায়ক শিবিরের অধিনায়ককে সোজা জানিয়ে দেয় যে, এভাবে তারা কেউই কাজ করতে পারবে না; সে নিজে আমাদের আগেকার গতিতে চলতে নির্দেশ দেয় এবং আরও বলে যে, প্রয়োজন হলে জেলা শাসকের কাছেও সে আমাদের পক্ষই সমর্থন করবে। কিকুয়ু ভাষায় আমাদের একটি প্রবাদ আছে: "ন্‌গেন্‌ডা থি ন্‌ডিয়াগাগা মুটেগি", অর্থাৎ মাটির ভেতর গর্ত খুঁড়ে যে সব জন্তু-জানোয়ার চলাফেরা করে, তাদেরও ফাঁদ পেতে ধরা যায়। মহাশক্তিমান জেলা শাসককেও বুদ্ধির লড়াই-এ হারিয়ে দেওয়া সম্ভব।

লড্‌ওয়ারে দিনের কাজ শেষ হতো বেলা একটার সময় এবং তারপর খাওয়া-দাওয়ার কাজ সেরে প্রখর রৌদ্রের তেজ এড়াতে আমরা সবাই যে-যার নিজের কুঁড়েঘরের ছায়ায় আশ্রয় নিতাম লেখা-পড়া করার জন্য। বিকেল পাঁচটার পর অতি উৎসাহীরা ফুটবল বা ঐরকম কোন খেলা খেলতো, বাদবাকি সবাই দাবা বা পাশার টেবিলে এসে জমা হত। আমি ফুটবল খেলায় সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলতাম এবং আমাদের দলের নায়কের কাজ করতাম। প্রহরীদের নির্বাচিত দলকে হারাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নি কোনদিনই।

একজন প্রহরীর হাতে আমরা লুকিয়ে জোমো কেনিয়াটাকে এবং লোকিটাউং বন্দীশিবিরের অন্যান্য বন্দীদের কিছু উপহার পাঠিয়েছিলাম। সে যখন ফিরে এসে খবর দিল যে, কেনিয়াটা পায়ের কষ্টে ভীষণ ভুগছেন, তখন আমরা সবাই খুব বিমর্ষ হয়ে পড়ি। পরিচালক সমিতি প্রত্যেক বন্দীকে তাঁর দ্রুত আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করে এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি ভাল হয়ে গেছেন জানতে পেরে আমরা অত্যন্ত সুখানুভব করি। আমরা আরও জানতে পারি যে, তিনি সেখানকার সমস্ত নিরক্ষর বন্দীদের লেখাপড়া শেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন। ওয়ারুহিউ ইটোটে, যাকে আমরা "সেনাপতি চায়না" বলে ডাকতাম, কেনিয়াটার কাছে ঐ সময় লেখাপড়া শেখে এবং বহুদিন পরে তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় শিক্ষক হিসেবে কেনিয়াটার ধৈর্য ও চেষ্টার সে যথেষ্ট গুণগান করে।

একদিন সকালে আমরা যখন সবাই সেদিনের জন্য জন খাটতে বেরুচ্ছিলাম, সে সময় শিবিরের অধিনায়ক আমাদের সকলকে ডেকে পাঠান। খুব হাসি-খুশিভাবে তিনি প্রচার করলেন: "তোমাদের বিখ্যাত যোদ্ধা, ফিল্ড মার-শাল স্যার (বিদ্রূপাত্মক; ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত সম্মানের নকলে) দিদান কিমাথি গতকাল নেয়েরী শহরের কাছে উপজাতীয় আরক্ষা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে ও প্রচুর চোটও খেয়েছে। ঠিক এইভাবেই তোমাদের আর সমস্ত তথা-কথিত জেনারেলদের এক এক করে ধরা হবে পিষে মারবার জন্য। আশা করি, তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, কেনিয়া সরকারেরই শেষ অবধি জয়লাভ হবে। আচ্ছা, তোমরা এবার যে-যার কাজে যেতে পার।" (এখানে বলা যেতে পারে যে, ১৯৫৭ সালে কেনিয়া সরকার তাঁকে ফাঁসি দেন এবং ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতা-লাভের পর রাজধানী নাইরোবির এক বিখ্যাত রাজপথ তাঁর নাম বহন করছে সগৌরবে।)

এই দুঃসংবাদ শোনবার পর আমরা সবাই অধীর হয়ে উঠেছিলাম। প্রথমে আমরা অধিনায়কের কথা বিশ্বাস করতে চাই নি, কিন্তু খানিক পরেই রেডিওতেও আমি ঐ খবরই শুনি। সেদিন আর আমাদের কাজ করতে ভাল লাগছিল না এবং প্রহরীরাও এ বিষয়ে কোন জোরজুলুম করে নি। তাদের চোখের নীরব ভাষা কেবল দুঃখ ও সমবেদনাই প্রকাশ করেছিল। সেদিন আমরা কোন লেখাপড়ার ক্লাস বসাই নি, ফুটবল খেলা স্থগিত ছিল এবং কেউই কোনরকম ভাল খাবারদাবার খায় নি। বিকেলে আমাদের বিচারা-

ন্যয়ের কাজও মুলতবি রাখা হয়েছিল। সমস্ত বন্দীই নিঃশব্দে শোক প্রকাশ করেছিল এবং যারা যারা কালো কাপড়ের খোঁজ পেয়েছিল, তারা শোকের চিহ্নস্বরূপ তা হাতে বেঁধে রেখেছিল। সন্ধ্যেবেলা আমরা সবাই আমাদের কুঁড়েঘরে বসে প্রার্থনা করি এবং কিমাথির উদ্দেশে তৈরি করা গানটি গাই। এই গান কেনিয়ার জংগলে লুক্কায়িত কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী রচনা করে এবং সব বন্দীই এর কথাগুলি জানতো। কথাগুলির তর্জমা নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

'কিমাথির গান'

১। আমাদের কিমাথি যখন একা পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছায় তখন সে ভগবানের কাছে সাদা মানুষদের পরাস্ত করবার জন্য শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করে।

২। সে আমাদের সবাইকে তার পথ অনুসরণ করতে, তার উদ্দেশ্যের সংগে পা ফেলে চলতে এবং তার মতো একনিষ্ঠ হতে উপদেশ দেয়।

৩। সে বলে যেঃ "এসো, শক্তির অমৃত পান কর, যা আমি করেছি এবং যে অমৃতে আছে শুধু দেশসেবার দুঃখ, অশ্রু ও মৃত্যু।

৪। "মনে রেখ যে আমরা শুধু কালো বলেই আজ সাদাদের কাছ থেকে পেয়েছি অবমাননা ও দুর্ব্যবহার; কিন্তু ভগবানই আমাদের শক্তি দেবেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য।

৫। "যদি তোমাদের নির্বাসন হয় বা বন্দিশিবিরে কালাতিপাত করতে হয় বা সর্বস্ব খোয়া যায় তাহলেও মনে রেখো যে ভগবান আমাদের সহায়।

৬। "অতি বড় দুর্দিনেও আমাদের নেতা জোমো কেনিয়াট্টা সাহায্য করবেন আমাদের; যখন কাপেন গুরিয়ায় তাঁর বিচারের প্রহসন হয়েছিল সেদিনও ভগবান তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন।

৭। "তোমরা সবাই তাঁর মতো ধৈর্যশীল হও, সাহসী হও; মৃত্যুকে, কষ্টকে হাসিমুখে বরণ করে নাও, শুধু মনে রেখো যে, তোমরা সবাই আমাদের পূর্বপুরুষ গিকুয়ু ও মুম্বির সন্তান।

৮। "ভগবান, তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে, সাদা লোকেরা যেন তাদের দেশে ফিরে গিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকে; যেমন বাগানেই ফুল ও ফল শোভা পায় নিজ নিজ গাছে, তেমনি তারাও যেন নিজেদের স্বস্থানে ফিরে যায়।"

দিদান কিমাথি সাহসী পুরুষ ছিলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠা করেন নি তিনি। জংগলে লুক্কায়িত সংগ্রামীদের নেতারূপে অসীম ধৈর্য ও বীর্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। যুদ্ধবিদ্যা শেখবার সুযোগ তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময় পান মিত্রশক্তির পক্ষে থেকে। যুদ্ধের পর কিছুদিন তিনি নেয়েরী শহরের 'টেটু দুগ্ধ সরবরাহ সমিতি'তে ও পরে টমসনস্ ফলস্ শহরে 'শেল' তেল কোম্পানীর কাছে চাকরি করেন। তাঁর এক ছাত্রের মুখে আমি শুনেছি যে, সে সময় কিমাথি খুব ভদ্র, নম্র ও দয়ালু প্রকৃতির লোক বলে সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীকালে জংগলে লুক্কায়িত থেকে সংগ্রাম করবার সময় তাঁর সাহস ও বীর্যের কথা পৌরাণিক কাহিনীর মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, লোকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে, তিনি অলৌকিক গুণের অধিকারী। কিকুয়ু সম্প্রদায়ের লোকেরা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ নাইরোবি শহরে তাঁর এক প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করার প্রস্তাব করেছে। তাদের অনেকেই এখনো বিশ্বাস করে না যে, তৎকালীন কেনিয়া সরকার সত্য-সত্যই দিদান কিমাথিকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিলেন। তারা মনে করে যে, তিনি অজর, অমর, কাজেই এখনো বেঁচে আছেন। কিমাথি ধরা পড়ে মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী, মুকামি এবং তাঁর বাচ্চারা নেয়েরীতে অত্যন্ত কষ্টভোগ করেছিল। বন্দিজীবন থেকে ছাড়া পাবার পর আমি যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করেছি। আমাদের নতুন কেনিয়া সরকারের উচিত ঐরকম নিঃসহায় লোকেদের যথাসম্ভব সাহায্য করা।

১৯৫৭ সালের ৩রা জুন ঘানা (পশ্চিম আফ্রিকার পূর্ববর্তী গোল্ড-কোস্ট) স্বাধীনতা লাভ করায় আমাদের সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। আমরা বন্দিশিবিরেই বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছিলাম, তার ভেতর ছিল কিকুয়ুদের ঐতিহ্যগত নাচগান এবং কাম্বা সম্প্রদায়ের বিখ্যাত 'ওয়াথি' নাচ (এই নাচে তারা অনেক উঁচু অবধি লাফালাফি করে)। আমাদের উৎসবে যোগদান করতে অনেক প্রহরীও এসেছিল তাদের স্ত্রী ও প্রেমিকাদের নিয়ে। তারা সবাই যখন জানতে বা বুঝতে পারে যে কি জন্য আমরা এই উৎসব করছি, তখন তারাও মহানন্দে নাচ ও গানে যোগ দেয়। নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করি সে-রাত্রে যে আমাদের পশ্চিম আফ্রিকার কালো ভাইবোনেরা সুখে-শান্তিতে থাকুক, তাদের শ্রীবৃদ্ধি হউক, তারা আফ্রিকার অন্যান্য পরাধীন দেশগুলিকেও স্বাধীন করে তুলতে সাহায্য করুক। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কিমানা ওয়াচুকু সেদিন আমাদের প্রার্থনায় আচার্যের কাজ করেছিল, লড্‌ওয়ারে সে সময় সেই ছিল সব থেকে প্রাচীন বন্দী। সে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে বহুদিন আগে থেকেই এবং আমরা, যুবকেরা, যেন সাময়িক ক্ষয়-ক্ষতির ভারে নুয়ে না পড়ি বা আমাদের মহান আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট না হই। কিমানা আরও বলে যে, খুব শীঘ্রই তাদের সময়কার লোকেরা দেশের সমস্ত ভার যুবকদের হাতে তুলে দেবে এবং হয়তো তাদের জীবদ্দশায় আর কেনিয়া স্বাধীন হয়ে উঠবে না। তাদের অবর্তমানে কার্যভার তুলে নেবার আগে আমরা যেন নিজেদের যথাসম্ভব শিক্ষিত করে নিতে সচেষ্ট হই, কারণ অশিক্ষিত, অজ্ঞান, বুদ্ধিহীন লোকেদের দ্বারা রাষ্ট্রের সুপরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। জোসেফ কিরিরা এবং আমি ঐদিনের স্মরণে একটি গান রচনা করি, তার নাম দিয়েছিলাম আমরা 'আফ্রিকার গান' :—

১। ভগবান আফ্রিকার কালো লোকেদের এই বিরাট স্থলভূমি দিয়েছেন থাকবার জন্যে, তাঁর এই দানের জন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

২। সকলে এককণ্ঠে ঃ
আমরা সবাই চিরকাল ভগবানকে তাঁর এই দানের জন্য ধন্যবাদ দেব, পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে।

৩। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করার পর আফ্রিকার উত্তরে মিশর দেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং পদানত জীবনের দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচোয়া পায়।

৪। সকলে এককণ্ঠে ঃ
আবিসিনিয়ার লোকেরাও তাদের উত্তরাকাশে স্বাধীনতার বিদ্যুৎশিখা দেখতে পায় এবং বহু দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে নিজেদের পুনর্জীবিত করে তোলে স্বাধীনতার মুক্ত-বায়ুতে।

৫। এখন আমরা ঘানায় স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা চিরকালের জন্য সেখান থেকে নেমে এসেছে বলে।

৬। সকলে এককণ্ঠে ঃ

কেনিয়ার চারিদিকে তাকিয়ে তুমি দেখবে শুধুই রক্ত ; আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্যই হ'ল স্বাধীনতা অর্জন।

৭। সকলে এককণ্ঠে ঃ

আরও দক্ষিণে চেয়ে দেখ আমাদের কালো ভাইদের দিকে দক্ষিণ আফ্রিকায়. সেখানে ইউরোপের "বোর" সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে।

৮। উপসংহার—

সমস্ত আফ্রিকার সব কালো লোকেরা যেদিন একসঙ্গে স্বাধীনতার হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারবে সেদিনই হবে আমাদের সংগ্রামের শেষ : সেদিন আমরা সবাই মিলে গড়ব এক বিরাট শক্তিশালী সংযুক্ত আফ্রিকা।

যখনই কোন বন্দীশিবির কিছুদিন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে স্বাভাবিকভাবে চলতো তখনি কেনিয়া সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতেন. পাঠাতেন সেখানে কাউকে আমাদের 'পুনর্বাসন' করার উদ্দেশ্যে, যদিচ তাঁদের আসল লক্ষ্য হতো আমাদের ছত্রভঙ্গ করা। লড্ওয়ারে আমরা তখন রক্ষক ও রক্ষিতের ভেতর বেশ চলনসই এক সমঝোতা চালু করে নিয়েছিলাম, যার ফলে কেউই কাউকে বিশেষ ঘাটাত না। কোনরকম ঝগড়াঝাটি বা কলরবের কথা শিবির থেকে পাঠান সরকারী রিপোর্টে ধীরে ধীরে কমে এসেছিল এবং সেইজন্যই বোধ হয় ওপরওয়ালা পাঠালেন সেখানে একজন নতুন ইউরোপীয়ান কর্মচারীকে তার দুইজন আফ্রিকান সহকর্মীর সঙ্গে। এ দুটি নন্দী-ভৃঙ্গির নাম ছিল জেমস্ এবং ওয়ালটার। পরিচালনা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সেদিন আমরা লড্ওয়ারের তের নম্বর নিয়মের প্রবর্তন করি ঃ 'আমাদের ভেতর কেউই জেমস্ বা ওয়ালটারের সঙ্গে কথা বলবে না।' বেশ কয়েকদিন ধরে কুঁড়েঘরের ভেতর এসে আমাদের সঙ্গে মেশার বা কথা বলার নিষ্ফল চেষ্টা করার পর তারা বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দেয় এবং তারপর এক নতুন পন্থা অবলম্বন করে। ১৯৫৭ সালের আগস্ট মাসে তারা আমাদের দলে দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে খোলা জায়গায় আলাদা আলাদাভাবে জমা হতে নির্দেশ দেয় এবং সেখানে আমাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে জেরা করতে আরম্ভ করে। জেরার ফলে তাদের ইচ্ছামত আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হই। অবশ্য এই সময় আমরাও অনেক প্রশ্ন তাদের করেছিলাম, যার কোন সদুত্তরই তারা দিতে পারে নি। ফলে আমাদের তরফ থেকে আমরা তাদের দুজনকেই বিশ্বাসঘাতকের পর্যায়ে ফেলি।

লড্ওয়ারে প্রহরীদের ভেতর আমাদের বেশ কয়েকটি বন্ধু থাকায় আমরা নিয়মমত সংবাদপত্রাদি পেতাম, আর বন্দিশালার বাইরের জগতের হাল-সমাচার পেতাম। নায়্যাঞ্জা জেলা থেকে নির্বাচিত সদস্য ওগিংগা ওডিংগা যখন বিধানসভায় প্রথমবার বলেন যে, জোমো কেনিয়াট্টা আমাদের জাতীয় নেতা তখন আমরা তাঁকে প্রশংসা না করে থাকতে পারি নি ; অবশ্য এ খবরও আমরা পেয়েছিলাম যে, অন্য কয়েকজন রাজনীতিবিদ্ সেখানে এই কথা শুনে নাক সিঁটকেছিলেন। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে এক বিবৃতিতে কেনিয়াট্টা লড্ওয়ারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেন ঃ 'উহুরু না ভুম্বি' অর্থাৎ ধূলিধূসর স্বাধীনতা। তাঁর এই বক্তব্যের অনেক রকম অর্থ অনেকে করেছেন, কিন্তু তিনি সাধারণভাবেই বলেছিলেন কথাটা। লড্ওয়ারে আপাতদৃষ্টিতে মানুষের স্বাধীনতার কোন বাধা নেই এবং চারদিকই সব সময় ধূলিসমাচ্ছন্ন। বছরের কোন কোন সময় সেখানে এতো ধূলার ঝড় ওঠে যে, সমস্ত জিনিষপত্র, মানুষ, সব কিছুই ধূলায় ঢাকা পড়ে যায়। তার ওপর আবার সেখানকার প্রখর রৌদ্রতাপ জীবনকে সত্যই দুর্বিষহ করে তোলে। বেন গাচাচি এবং আরও একজন বন্দী তো পাগল হয়ে গিয়েছিল লড্ওয়ারের রোদ আর ধূলো সহ্য করতে না পেরে। সৌভাগ্যক্রমে সময়মতো তাদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্য বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়ায় ও রীতিমত চিকিৎসা করানতে তারা আবার সহজ ও সুস্থ হয়ে উঠে।

লড্ওয়ারে থাকাকালীন আমরা স্থানীয় তুর্কানা উপজাতীয় লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করতে পেরেছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার পরিবর্তে কতটা খাবার পুরস্কারস্বরূপ পাওয়া যেতে পারে ঠিক সে কথা আর ভাবতো না। তারা যে দুরবস্থার ভেতর সেখানে জীবনপাত করতো তা দেখে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলাম যে, কেনিয়া সরকারের উচিত তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য তৎপর হওয়া, যদি তাতে আমাদের কিকুয়ু বা নায়্যাঞ্জা ইত্যাদি জেলার উন্নতির হার কমে যায় তা সত্ত্বেও। আমরা তাদের ভাষায় কয়েকটি কথা বলতে শিখেছিলাম এবং প্রায়ই তাদের খাবার-দাবার দিতাম। আমরা শিবির থেকে যে র‍্যাশন পেতাম তা অনুপাতে ছিল যথেষ্ট, যদিচ তার গুণাগুণের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা যায়। সেই একঘেয়ে ভুট্টার লপ্সি (পরিজ্) আর কতো খেতে পারে মানুষ দিনের পর দিন, তাই প্রায়ই আমাদের কিছু খাবার উদ্বৃত্ত হতো। শিবিরের পরিচালক সমিতি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কোন বাড়তি খাবারই ফেলা হবে না এবং সুযোগ-সুবিধা মতো তার সবটাই তুর্কানাদের ভেতর বিলিয়ে দেওয়া হবে।

১৯৫৭ সালের ২৫শে অক্টোবর আমরা জানতে পারি যে, লড্ওয়ার থেকে ষাটজন বন্দীকে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে কেনিয়া সরকার নাইরোবির কাছে 'আথি-রিভার' নামক শিবিরে বদলি করবেন। সেখানকার আসল অবস্থা ও পরিচালকদের ব্যবহার সম্বন্ধে এর ভেতর অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছিলাম। জেমস্ এবং ওয়ালটার অনেকবার বলেছিল যে, বন্দীরা সেখানে সত্যি-মিথ্যে যা হোক কতকগুলো "স্বীকারোক্তি" দিলেই কেনিয়া সরকার বন্দিজীবনের অনেক দুঃখকষ্ট দূর করে দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁরাও এতো হাজার হাজার "বন্দী"কে আর পুষতে চাইছিলেন না অনির্দিষ্টকালের জন্য। ষাটজনের ভেতর আমার নামও ছিল এবং একদিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সরকারী লরীতে চেপে বসি, যারা পেছনে পড়ে রইল তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় সম্ভাষণ করি এবং দক্ষিণমুখো হয়ে প্রথমত কিটালে শহরের দিকে রওনা হয়ে পড়ি। আমাদের পেছনে পড়ে রইল কিছু হতভাগ্য বন্দী, ধূলা, গরম এবং একটি নবনির্মিত হাসপাতাল, যার প্রত্যেকটি পাথর আমরা দুমাইল দূরের খাদ থেকে ভেঙে মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। [ক্রমশ]

কুয়াশার মধ্যেও বাড়িটাকে চিনতে কোন অসুবিধে হয় নি হানিফের। দূর থেকে প্রথম নজরে পড়তে বুকের ভেতরে ধক্ করে উঠেছিল। কাছে এসে দেখল তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি। ধাড়ি মুরগি একটা গণ্ডাকয়েক বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়ে পিটুলিতলার সার গাদায় কোঁক কোঁক আওয়াজ করে করে মাটি

খোঁটাখুঁটি করছে। মনে হল মুরগীটা তার বিলক্ষণ চেনা এবং তারও কোন পরিবর্তন হয় নি।

একটু দমে গেল হানিফ। কিন্তু আপাতত সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা—কাকে ডাকবে এবং কী বলে? ডাকা চলে সামাদকেই, এ বাড়িতে পুরুষ বলতে সে-ই। তবে সামাদের নাম ধরে ডাকাটা কি ঠিক হবে? কেমন যেন বাধছে। দলিজের লাগোয়া সদর দরজা বন্ধ। এক উপায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা। একটু-আধটু গলা খাঁকারি দেওয়া। সেটুকুরই উদ্যোগ-আয়োজন করতে গিয়ে হঠাৎ সে ডেকে উঠল, সামাদভাই আছ বাড়িতে? আশ্চর্য! ডাকাডাকি সমস্যার এমন নিখুঁত সমাধান কোথায় লুকিয়ে ছিল তার গলার ভিতরপানে? আরও পরিষ্কার গলায় সে ডাকল, সামাদভাই!

—কে?

এ-গলা তার একেবারে চেনা, যেন গতকাল পর্যন্ত শুনেছে। তবুও হানিফ চেনা লোকের মত চট্‌-পট্‌ প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। মনে হল, কিছু বলতে গেলে এ-সময় গলা দিয়ে বড়জোড় মুরগিটার অর্থহীন কোঁক-কোঁকানির মত বিতিকিচ্ছিরী একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসবে। ভারি লজ্জার ব্যাপার! দরজা খুলে গেল। ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল জয়নাবের মুখ।

—কে রে? ও মাবা, হানিফ! বিস্ময়ে এবং দারুণ খুশিতে জয়নাবের স্বর কলকলিয়ে উঠল। এক কদম সে এগিয়ে আসতেই যেন পিছনের কোন ধাক্কায় হানিফ ধুবড়ে বসে পড়ল। বসে সালাম করল। মনে হল যেন সে এখন শূন্যে ভাসছে। শরীরের ভার বলতে নেই। কিংবা সে রেলের গাড়ির কামরায় বা তার কলিন স্ট্রীটের বিড়ির দোকানে বা কলকাতার কোন একটা পার্কের ঘাসের ওপর শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে! কিছু যেন বলছে জয়নাব, কানে ঢুকছে না। তবে হ্যাঁ, মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার যা মনে হল, জয়নাবের অবয়বে বা আচরণে দারিদ্র্যের চিহ্নমাত্র নেই। সে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জয়নাব আপ্লুত স্বরে বলল, আয় বাপ। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

হানিফ দেখছিল মুরগিটা আর তার বাচ্চাগুলো খুশিতে তুড়ুক্ তুড়ুক্ লাফালাফি করছে। কুয়াশা বোধ হয় এবারে কেটে যাবে।

চৌকাঠ ডিঙোতে গিয়ে তার মনে হল বুকের খুন বুঝি চলকে পড়ে যাবে। পড়ে গিয়ে পায়ের মাটিকে পিচ্ছিল করে দেবে। যতদূর চোখ যায়, দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই। অথচ তার বদ্ধমূল ধারণা, আকলিমা আছেই আশেপাশে কোথাও-না-কোথাও, একটুও চিড় খেল না। এগনে ও উসারা সদ্য ঝাটানো-পাটানো। দুটো ঘরেরই দরজা খোলা। কুয়াশার জন্যে ভেতরের সর্বত্র আবছা আবছা। হয়তো আকলিমা ওখানেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখ সে তুলতে পারল না।

—কই গো আকলি, আগো দ্যাখ এসে, কে এয়েছে। আমাদের হানিফ। জয়নাবের স্বর একেত্রেও নিখাদ প্রসন্ন। চোখ তুলে তাকালো হানিফ। চোখ নামিয়ে নিল। এত বড় হয়ে গেছে আকলিমা, এত সুন্দরী! ধীর-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উসারার খুঁটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো আকলিমা। দৃষ্টি পায়ের কাছে মাটিতে বিছিয়ে রেখে হানিফ মনে করার চেষ্টা করল, দৃশ্যটা যেন পরিচিত, কোথায় যেন দেখেছে কতবার। খুব হালাহালি নয়—গাড়ির কামরায় বা কলিন স্ট্রীটের ভিড়ে জমজমাট বিড়ির দোকানের চাটে বা কলকাতার কোন ঘেয়ো কুকুরের চামড়ার মত খাপছাড়া ঘাসে-ঢাকা পার্কেটার্কে নয়। অবশ্য এভাবে তার বেকুবের মত দাঁড়িয়ে থাকাটা যাচ্ছেতাই। একটু হাসার চেষ্টা করে আকলিমার ওপর দিয়ে চোখের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হানিফ জিজ্ঞেস করল, সামাদভাই কোথায়? ঘরে নেই?

মনে পড়ে গেছে! খাঁয়েদের বাগানের এক কোণের সেই ঝাঁকড়া মেওয়া ফলের গাছটা, একটা হাড্ডিসার তালগাছের বুকতক দু'-এক প্যাঁচ জড়িয়ে ধরে সুমুখপানে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকত। ভারি অদ্ভুত। সামাদ আর আকলিমা দুজনেরই ছিল মেওয়া ফলের জন্য। চোত-বোশেখের ঝিম-মারা দুপুরে কতদিন যে গাছটায় চড়েছে মেওয়া ফল পাড়তে। আকলিমা যেরকম সপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জবাবটা তারই কাছে আশা করেছিল হানিফ। কিন্তু জয়নাব বলল, সামেদ? তুমি তাকে ইস্টিশানে দেখতে পাও নি? ইস্টিশান বাজারেই তো তার দোকান।

দোকান? হানিফ কপাল কুঁচকালো।

—কাপড়ের দোকান! এই তুমি আসবার একটুখানি আগে বেরিয়ে গেছে বাপ। কলি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কদ্দিন পরে এল ছেলেটা। বসতে দিবি তো।

জয়নাব তেমনই আছে। তেমনই সহজ স্নেহ-সৌজন্যময়ী। গভীর অস্বস্তিতে নিজের সহজ ভাবটাকে ফিরে পেতে চাইল হানিফ। আপাতত এটাই বাঞ্ছনীয়।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এত ব্যস্ত হবার কি আছে! সে বলতে যাচ্ছিল, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, যেভাবে সে আগে বলত। কিন্তু পাক্কা আট বছর পরে 'হচ্ছ'-র বদলে 'হচ্ছেন' বলাই ঠিক হবে কি না তা ঠিক করতে তার অসুবিধে হল। সামাদ তাহলে একটা কাপড়ের দোকান করেছে! আসবার সময় স্টেশন রোডের কোনদিকে সে অবশ্য ভাল করে তাকায় নি। এমন কি কোথাও বসে এক কাপ চা-ও খায় নি। কোন মানে হয় এত দৌড়োদৌড়ি করার! একটু হাসি পেল তার।

—কই না, লক্ষ্য করে দেখি নি তো, অন্যমনস্কভাবে সে জয়নাবের কথার জবাব দিল।

—হ্যাঁ বাপ, ঐ সামান্য একটুখানি দোকান, ওকেই নেড়েচেড়ে খাচ্ছে। বোসো, বোসো, দাঁড়িয়ে থেকো নি।

আকলিমা একটা চাটাই এনে বিছিয়ে দিয়েছে। খুব আস্তে করে যেন একবার বলল, বোস। ধাঁধার মত লাগল হানিফের। আকলিমা ঠিক বলল কি কথাটা! যেন পাতায় লুকোনো একথোকা মেওয়া ফল, নিচে থেকে তাক করে তাক করে গাছের ডালে চড়ে যার আর হদিশ পাচ্ছে না। খাঁয়েদের মেওয়া ফলের গাছে এমন কাণ্ড কতবার ঘটেছে। একটা ভারী নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে চাটাই-এ বসে পড়ল।

জয়নাব কুশল প্রশ্নের কিছু বাকি রাখে নি। কোথা থেকে কী যে একটা রোখ চড়ে গেল হানিফের, উত্তরগুলো নির্ভেজাল সত্যি করে দিতে পারল না। আকলিমা জয়নাবের নির্দেশে এক গ্লাস সরবত এনে দিতে সেই রোখ ... টেনে বলল, সরবৎ? থাক্ থাক্, আমি তো এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি।

কথাটা আকাট মিথ্যে। তবু জয়নাব বোধ হয় এটাকেই মেনে নিতে যাচ্ছিল। আকলিমা মুখ খুলল।

—চা? চা তো কখন খেয়েছো। এবার সরবৎ খেতে পার।

ভারি আশ্চর্য! চা সে খেয়েছে বাউড়ে স্টেশনে, অন্তত ঘণ্টা দেড়েক আগে। এটা জানার কথা নয় আকলিমার। সে চোখ নিচু করে হাত বাড়িয়ে সরবতের গ্লাসটাকে ধরে নিল। আকলিমা কি মনের ভেতরটা দেখতে পায়!

সরবৎ যেন তার গলায় আটকে আটকে যাচ্ছিল। গ্লাস নামিয়ে রেখে একবার সে গলা ঝাড়ল। পকেটে হাত ঢোকালো রুমালের সন্ধানে। কিন্তু হাত বের করতে দ্বিধা হল। রুমাল তো বটেই, আরও যেটা অস্বস্তিকর—আসবার সময় চৌপাট করা রুমালে একটু সেন্ট ছড়িয়ে নিয়েছিল। রুমালের ভাঁজে হাতের আঙুল কটা নাড়াচাড়া করতে করতে তার বুকটা টনটনিয়ে উঠল। শুকনো একটু হেসে তাকালো আকলিমার মুখের

দিকে। আকলিমা মুখ নামিয়ে গ্লাসটা হাতে করে আস্তে আস্তে উঠে গেল ঘরের দিকে।

সব কিছুই তার কাছে অবাক লাগছে! যে মেয়ের অনাহারে শুকিয়ে শুকিয়ে মরে যাওয়ার কথা, কেমন আশ্চর্য এক রূপসী হয়ে সে বেঁচে আছে! যে জয়নাবের শুকনো লাউমাচার মত স্মৃতি-সর্বস্ব সর্বহারা হয়ে টিকে থাকার কথা বড়জোর, সে এবং তার সংসার দিব্যি জীবন্ত, লাবণ্যময়, পরিপাটি হয়ে সকালের কুয়াশাকাটা রোদে ঝলমল করছে: এবং সামাদ একটা কাপড়ের দোকানের মালিক, যে সামাদ বছর আস্টেক আগে তাকে ভারি একটা গোপন কথা বলেছিল, আল্লার কসম খাইয়ে।

—এই, একটা কাজ করবি?

—কী?

—কাউকে বলবি নি বল?

—না।

—কসম!

—কসম।

—আল্লার কসম!

—আল্লার কসম।

—চালের কারবার করবি?

—চালের কারবার!

—হুঁ। দুজনে মিলে দুখেপ করে কোলাঘাটে যাব। চাল আনব।

—ধ্যেৎ! তা-ও আবার হয়! পুলিশ আছে না! ঘোর সংশয়ে শঙ্কায় হানিফ জবাব দিয়েছিল।

—আছে তো কি হবে? কত লোকে করছে না? বেশ মজবুত ভঙ্গীতে বলেছিল সামাদ।

—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে আমরা পারব কেন? ভারি ঝামেলার কাজ।

—তবে কী করতে পারব বলতে পারিস? কান্নার মত হিলহিলিয়ে উঠেছিল সামাদের কথা। আবদুস সাত্তার কেরানী সাহেবের ভয়ঙ্কর আদরের দুলাল, কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত কড়মড় করে গর্জন

ছেড়েছিল, ঠিক আছে। যা পালিস কর গে তোরা। আমি পালিয়ে যাব, যেদিকে দু চোখ যায়, চলে যাব। আমার আর সহ্য হয় না।

কারই বা সহ্য হয়? অতি দুষমনেরও না। তবু অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল সামাদকে। বাপের কথা বলতে হয়েছিল, বংশের কথা বলতে হয়েছিল। বিপদে ধৈর্য ধরার কথা বলতে হয়েছিল। এবং আপনমনে একটা শপথ নিতে হয়েছিল। আবদুস সাত্তারের মহা ঋণ শোধ করার শপথ। শুধুমাত্র সেই শপথটাকে পুঁজি করেই তাকে একদিন এ সংসার ছেড়ে সকলের অগোচরে সরে পড়তে হয়েছিল।

আশ্চর্য! কবে তার বাপ মরল, কবে তার মা মরল, কিছুই তার আর মনে নেই। নিজেকে পুরোদস্তুর ছ্যাঁওড় বলেই তার মনে পড়ে। মনে পড়ে, সে তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। লোকের কাছে পয়সা চাইত। দাঁত খিঁছুনি শুনত। গালাগালি শুনত। পয়সা চাইত, ঝাঁ-ঝাঁ রোদ নিয়ে গ্রীষ্ম নামত। ঝম ঝম বৃষ্টি নিয়ে বর্ষা নামত। পয়সা চাইত। যা জুটত তাতেই পেট ভরিয়ে ইস্টিশানের প্লাটফর্মে শরীর কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়ত। সূর্যোদয়ে সে ছ্যাঁওড়। সূর্যাস্তে সে ছ্যাঁওড়। দিন দুপুরে ছ্যাঁওড়। রাত দুপুরে ছ্যাঁওড়। অনুগ্রহ-প্রার্থী, বিমুখ, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, জীবনের কোন্ এক অন্ধকার হিমমণ্ডলে নির্বাসিত। ভীত, ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ, একাকী।

প্লাটফর্মেই কনকনে শীতের রাতে সে সাত্তারকে পাকড়াও করেছিল। মাথায় মাফলার, গায়ে চাদর, হাতে বাজারভর্তি ব্যাগ। কেন যে সেটুকুও পরিষ্কার মনে আছে। অভ্যেসমত হাত বাড়িয়েছিল পয়সার জন্যে। আপাদমস্তক পরিতৃপ্ত মানুষটি প্রথমে আমল দেয় নি। ঘ্যান্ ঘ্যান্ করতে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল, থাকবি আমাদের বাড়িতে, এ্যাঁ? এক ঝলক উষ্ণতা যেন কোথা থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল। মুখে কিছু না বলে জানাল থাকবে। কথার কথা নয়। খুশি খুশি মানুষটা হেসে জানতে চাইল, পারবি বইতে এই ব্যাগটা? পরক্ষণেই আবার ভুরু কুঁচকে বলেছিল, না থাক, তোর দ্বারা হবে না। এমনি চ'। রাস্তায় শুধিয়েছিল, কে আছে তোর? কেউ নেই! তা থাকবি তো, না পালাবি? আবার একমুঠো উষ্ণতা। আঁধারে মাথা নাড়ার মানে হয় না। মুখে বলতে হয়েছিল, হ্যাঁ, থাকব। মনে মনে বলেছিল, আপনারা তাড়িয়ে না দিলে চিরকাল থাকব বাবু।

—থাকিস্। আমাদের কাজকাম তেমন একটা নেই। ঘরের ছেলের মত

থাকবি, এটা-সেটা টুকিটাকি কাজ ফরমাশ খাটাব, বুঝলি? পথের কথা শেষ।

ভেবেছিল হিন্দু, বাড়িতে এসে ভুল ভাঙলো। কেন যেন জয়নাবের কথায় একটু আপত্তির সুর ছিল। সেটা ধোপে টিকল না। সকালে জয়নাব তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নিয়ে বলল, আহা রে কার ছ্যাঁওড় বাছুর! ঠিক আছে। কি কাজ আর করবি তুই বাপ। ঘরের ছেলের মতন থাকবি। নিজেদের মনে করে যা পারবি করবি। আল্লা মালিক। জয়নাবের দীর্ঘশ্বাস এখনও যেন কানে বাজে। অগাধ উষ্ণতা, যার মধ্যে নিজেকে সে সম্পূর্ণ ঢেকে নিয়েছিল। সে উষ্ণতা আজও সত্যি হয়ে নেই না কি!

আড়চোখে তাকিয়ে দেখল হানিফ। আকলিমা কাছাকাছি নেই। জয়নাব ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এসে পিঁড়ে পেতে বসল তার কাছে।

এবারে আর কুশল প্রশ্ন নয়, আত্ম-কথন। ভূমিকা সুপরিজ্ঞাত। একেই বলে বুঝি আল্লার গজব। মানুষটা অফিস থেকে ফিরল। ছেলেকে, মেয়েকে নিয়ে মাতামাতি করল। স্বভাবগত উদারতায় কবুল করল, কচি, তুই ম্যাট্রিক পাশ করলে হানিফকে পড়াব। কিরে ব্যাটা, তুই পড়বি তো? কচি তোকে পড়াবে। আর কলি? তোর, তোর ততদিনে বিয়ে দিয়ে দোব। না কি বল্? কি বল কলি? উঃ মাথাটা কেন ধরছে বল দিকি? ভাত তৈরি কর। খেয়ে নিই সবর-সবর। শুয়ে পড়ব।

খেয়েদেয়ে শুয়েই পড়ল লোকটা। ঐ যে পড়ল আর উঠল না। ভয়ঙ্কর জ্বরের ঘোরে আওয়াজ বলতে শুধু বিকার। তিনদিন পরে সেটুকুও বন্ধ হয়ে যেতে, সব ফুরিয়ে গেল। সেও শীতকাল। সে শীত যেন আর নড়তে চায় না এ সংসার থেকে। ফল ঝরে পড়ল, ফুল ঝরে পড়ল, পাতা ঝরে পড়ল, লতা শুকিয়ে গেল। যেন একটা শুকনো কঙ্কিসার লাউমাচা। সামাদের বয়স তখন চোদ্দ। আকলিমার নয়। বছর না ঘুরতেই সাত্তারের আদরের কলি শুকিয়ে গেল, কচি হয়ে দাঁড়ালো পোড়া কাঠ যেন।

নিজের জীবনে উষ্ণমণ্ডল কবে ছেড়ে এসেছে তা আর মনে পড়ে না হানিফের। এদের এখানে সেটুকু ফিরে পেয়েছিল সাকুল্যে বছর পাঁচেকের মত। কনকনে ঠাণ্ডায় এদের সঙ্গেই ঠকঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে কখনও তার আপনা থেকে মনে হয় নি জীবনে উষ্ণমণ্ডলের তার একার আর কোন প্রয়োজন আছে। কার জন্যে কার বুক ফাটে, কেন ফাটে, এও সে খতিয়ে দেখতে চায় নি। শেষের দিকে কেবলই মনে হত, কিছু একটা তার করা উচিত। কেন না, তার মত আর কেউ তো
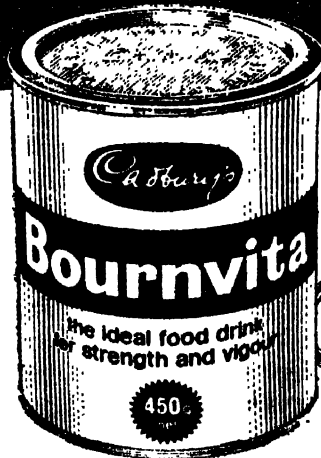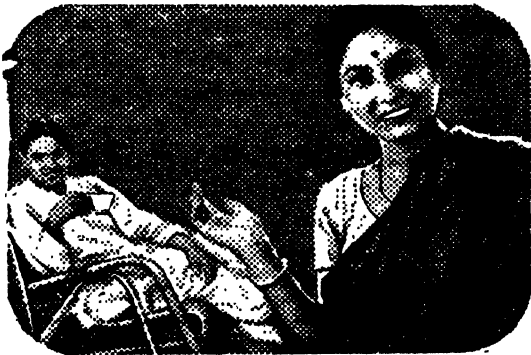
"সত্যি ভাই, সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমই-না করতে হয় ওঁকে। তারপর ট্রাম-বাসের দারুন ভিড়, তার ধকলতো আছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ কর্মক্ষম রাখার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর। ভাগ্যিস বোর্নভিটা ছিল, তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। এক কাপ বোর্নভিটায় সব ক্লান্তি দূর হয়, নিমেষে ওরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রাণের দীপ্তি ঝলমল করে ওদের চোখে-মুখে। বোর্নভিটার চমৎকার স্বাদ আমাদের সকলের খুব ভালো লাগে, বাচ্চাদেরতো কথাই নেই। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে-পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

ঋণী নয় এই পরিবারের কাছে। সে ঋণ শোধ করার নয় তো আর একেবারেই।

জয়নাব বলে চলে, তুই চলে গেলি বাপ, কাঁচ আমার কত জায়গায় যে তোর তাল্লাস করলে! কী করে ভুলে থাকলি, হ্যাঁ রে। কি পাষাণ রে তুই।

তা বটে! হানিফের হাসি পেল জয়নাবের কথার ধরনে। কাঁচ ওরফে সামাদ যে তাকে খুঁজে খুঁজে হন্দ হয়ে গেছে এ কথা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। সে আর আমাদ দু'জনে দু'জনের সাথী, সাত্তার স্কুলের পড়ুয়া ছেলেকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিত না। সামাদের কোন সহপাঠী ছিল না, যেহেতু স্কুলে ছেলে পাঠানোর আর কারও মাথা ব্যথা ছিল না। লোকে উল্টে সাত্তারের উদ্দেশে বলত, হুজুরের ব্যাটা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে আর আপিসে কেরানীর চাকরি করে ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করছে। কেউ এমন ট্যারাবাঁকা টিপ্পনী কাটত, কেউ কেউ সাত্তার কেরানীকে একটু সমীহও করত। সাত্তার মাথা ঘামাতো না। জয়নাবকে শোনাত, দর্জির ব্যাটা কেরানী হয়েছে, কেরানীর ব্যাটা হাকিম হবে। রং-এর ডিবে হাতে ঝুলিয়ে তো মাচায় মাচায় ঘুরবে না। সাত্তারের বিচারে ছেলের সঙ্গী হিসাবে বাড়ির চাকর বরং ঢের ভাল। মাথা বিগড়ে দেবে না অন্তত। সামাদের গুলি খেলার সাথী হানিফ, গুলতি নিয়ে পাখি শিকার করার সাথী হানিফ, চোত-বোশেখের ঝনঝনে দুপুরে মেওয়া ফল পাড়তে যাওয়ার সাথী হানিফ। পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়তে ঝুড়তে পাড়ের গাবগাছ থেকে হলুদবরণ পাকা গাব পাড়ার সাথী হানিফ, মিশকালো থোকা থোকা রাখাল-ফল পাড়ার সাথী হানিফ।

সামাদ তাকে ভুলে যাবে বা তার খোঁজ-খবর না করে চুপচাপ বসে থাকবে, এ হতেই পারে না। কিন্তু এ বাড়িতে আসা অবধি এখনও সামাদের সঙ্গে দেখা হয় নি। দেখা হয়েছে জয়নাবের সঙ্গে, আকলিমার সঙ্গে। এরা কতখানি মনে রেখেছিল তাকে তার পরিমাপ ক্লেশকর মনে হচ্ছে। এতই ক্লেশকর যে, তার এখানে বসে থাকতেও কেমন ভাল লাগছে না। বাইরে গিয়ে একটা বিড়ি খেয়ে এলে হত, কিংবা নিরিবিলিতে শুধুই একাকী ভেবে দেখলে হত। জয়নাব আপনমনে তার মনোযোগের তোয়াক্কা না করে স্মৃতি-কথনে মগ্ন। বেশ খুশি খুশি পরিতৃপ্ত। সন্দেহের অবকাশ নেই, আর নজর পাবে সে ফিরে আসায় ভারি আনন্দিত। কথার পর কথা, কলকল কথা। এ সময়ে কান মনে পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। অথচ মুশকিল, কেন যেন হানিফের এসব একেবারে অসহ্য লাগছে। উঠে গিয়ে বরং মাথাটাকে সাফ করে আসাই ভাল, জল আনাতে আরাম।

—তা, ফিরে আসী করলি কেন বাপ? জয়নাব হঠাৎ তার আত্মকথনে মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে।

ওঠা হল না। শরীরের রক্তস্রোত যেন একবার থেমে গেল, কী উদ্দেশ্য জয়নাবের? শুধুমাত্র কৌতূহল, না আর কিছু? খোঁচা-খাওয়া জন্তুর মত মাথা তুলল হানিফ। ঘরের চৌকাঠে ভর রেখে আকলিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, পরিপূর্ণ রূপসী। যা সে এতকাল ভেবে এসেছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। দুঃখ বেদনায় সে ঘাড় হেঁট করল।

—ছেলেপুলে হয়েছে? ক'টি? জয়নাব নিরীহভাবে শুধোয়।

এই অবান্তর প্রশ্নের কোন মানে হয়, সে হাত মুঠো করল। জয়নাবের বকবকানি কি কোনমতে বন্ধ করা যায় না!

গোঁড়ি-গুগলি সাঁটানো হাঁসের মত পরিতৃপ্ত ভঙ্গীতে জয়নাব বলল, এই মাসেই কাঁচের বে। বলেই খাপছাড়াভাবে ফোঁস করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, ইচ্ছে ছিল, কলির বেটাই আগে দোব। দেখছ তো কত ডাগর হয়ে গেছে। কিন্তু কাঁচের বে না দিলেই নয় কিনা।

আরও অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে হানিফ। কী বলতে চায় জয়নাব?

—মইনানের শহর কাজীর নাম শুনেছ? আর মনে নেই হয় তো। মোড় পুকুরের হাটে বড় মুদিখানার দোকান। খুব মানী পয়সাওলা লোক। নিজে এসে সম্বন্ধ করে গেছে। কাঁচকে ভারি পছন্দ। তোর কাছে লুকিয়ে কি লাভ বাপ, হাজার দুয়েক টাকা নগদ দেবে আর মেয়েকে গা-সাজানো গয়না। দেখি, তারপর যদি কলির ব্যবস্থাটা করতে পারি। আল্লা মালিক।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়নাব। আপনমনে বলে চলল, ঐ তো সামান্য কাপড়ের দোকান। আল্লার মেহেরে চালু আছে, তাই সংসার চলে যাচ্ছে কোনরকমে। ও থেকে কি আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়, মা কি বল?

প্রশ্নটা তারই উদ্দেশে। হানিফ একটু চমকে উঠে সায় দিল, তা তো বটেই।

—তুমি আপনার লোক, তুমি ঠিক বুঝে ফেলবে। বারো পুরিয়ে বিয়ে হতো কলে মেয়েকে ঘাড় থেকে নেমে ভাগাচ্ছে। বললে তো সব মানছে? কই, কোন শালার বিয়ে দেওয়া তো দিল মাথা রাখার বেলায় নেই! তুই তো পালালি, মানে চলে গেলি বাপ— কি মুসিবতে সে যাবল আমার দুঃখের বক্ষা দুটোর ওপর। তাই বলি মালিককে ঠিক গুনাহ করেছি তোমার দরবারে। সা আল্লা আল্ তোমারই করুক। কিন্তু ছেলে, তো মানুষ করতে হয় একেই। লেখা-পড়ায় ভাল ছিল, কী মনে আছে? কবে যেন একটা ইস্কুলের মাস্টার সাথে গেছে এই হাত দিয়ে। গা-গতর ঘামিয়ে ঘামিয়ে সেই টাকা ক'টা জমা করে আনতে তবে হিসেব দেনেওলার রহমতে হিসেব হল, সেই টাকাতেই কাঁচের দোকান, আর সেই দোকানেই আমাদের ভাত-ভিত্।

কথা শেষ করে জয়নাব হাঁপাতে থাকে, এবারে জিজ্ঞেস করা উচিত আকলিমার বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ হয়েছে কিনা। কিন্তু সে জন্যে যে সাহসটুকু দরকার কিছু, সে তার হদিশ পেল না। কুয়াশা কেটে গিয়ে প্রায় গোটা এগানেটা টাটকা রোদে ঝকমক করছে। সে দিকেই সে আনমনে তাকিয়ে থাকল। এ বাড়ির কেমন কিছুতেই সে যেন কোন আগ্রহ বোধ করছে না। অথচ ভোরে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে চেপে বসার সময়, তাই বা কেন, সারা পথটুকুতে, এমন কি এ বাড়ির দলিজ-গোড়ায় এসে পৌঁছনো পর্যন্ত সে ছিল যেন অন্য এক মানুষ বা মানুষই নয়, কোন ফেরেস্তা। যেন কিছু একটা গুরুভার বস্তু সে বয়ে নিয়ে এসেছে হাওয়ায় উড়ে উড়ে। এ বাড়ির মাটিতে পা রেখেই আবার সে মানুষ হয়ে গেছে। ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ, উদাসীন, অভাগা।

জয়নাব দু-একটা ঢেকুর তুলল। বোধ হয় এর পর কোন যুৎসই প্রসঙ্গ খুঁজছে। আকলিমা ধীর পদক্ষেপে তাদের সুমুখ দিয়ে খিড়কির দিকে বেরিয়ে গেল। হানিফ লক্ষ্য না করে পারল না, আকলিমার চলনে কি সুন্দর একটা ছন্দ এসেছে মনে হয়, যৌবনের কলস এমনই ভরা কানায় কানায় যে, প্রতি পদক্ষেপে বুঝি ছলকে পড়ে যাবে। এটা কোন কথাই নয় যে, এ বাড়িতে পা দিয়েই সে মানুষ হয়ে গেছে। মানুষই সে ছিল, মানুষই সে আছে। গত আট বছরে অবস্থাটা একই রকমর।

নিজেকে তার বেশ মজবুতে লাগল এতক্ষণে। এ বাড়ির জন্য কোন এক উজ্জ্বল-অন্ডলের খোঁজে সে বেরিয়ে গেছল একদিন সকলের অগোচরে। তারপর কিছু করতে আর বাকি রাখে নি এই আট বছরে। তার নিজের জনো যেখানে শুধু ফাইফরমাশ খাটলে বা মোট বইলেই চলত, সেখানে সে ফাইফরমাশ খেটেও রাতে বিড়ি বাঁধা শিখেছে। বিড়ির কারিগর হলেই তার চালিয়ে যেত, অথচ তিল তিল করে সঙ্গতি সঞ্চয় করে বিড়ির দোকান ফেঁদেছে। সেই দোকানকে মাথা ঘামিয়ে মাথা ঘামিয়ে শতেকের এক করে দাঁড় করিয়েছে। তল্লাটে এমনটি পাবার না। মেহনতির পরাকাষ্ঠা, কারবারি। এবং এই সুবাদে, আজিও ঘটনাচক্রে

প্রথা বাছে ঐ বাড়িতে হাওয়াখো শীত ঋতুর অবসানে বসন্ত এসে গেছে, সে সাহসের সঙ্গে কেনই বা বলবে না, সরাসরি কথাটা পাড়া আপাতত যদিও কঠিন, আকলিমাকে, আপনাদের কলিকে, আমার তিল তিল স্বপ্নে গড়া স্বপ্নাতীত তিলোত্তমাকে আপনারা আমার হাতেই তুলে দিতে পারেন। সামাদ, তুমিও কথাটা ভেবে দ্যাখ—আমার কেউ নেই, কেউ ছিল না, তোমরাই আমার, আমি তোমাদের। ভীষণ ঝড় আমরা একসাথে সয়েছি, দারুণ জ্বালায় আমরা একভাবে জ্বলেছি। আমি খাটিয়ে গিয়ে যা কিছু করেছি তা এই সংসারটারই জন্যে, তুমি ঘরে থেকে যা করেছ, এই সংসারের জন্যেই। হ্যাঁ, এটাও তুমি বুঝি দেখতে পার, তোমার দোকানটার মাসিক আয় কত আমার জানা নেই, আমার দোকানের পাঁচজন কারিগরের মজুরি মিটিয়ে, সবরকম খরচ-খরচা বাদটাদ দিয়ে মাসিক আয় এখনই শ' পাঁচেক টাকা, যা আরও বাড়বে ভবিষ্যতে, কেন না আমি বাড়াতে চাই। সুতরাং তুমি, তোমার মা, তোমরা সকলে বিচার করে বল আমি কি আকলিমার অনুপযুক্ত? আকলিমা কি আমার কাছে কষ্ট পাবে? যে আকলিমার—

—যাই বল হানিফ, তুই একটু বদলে গেছিস বাবা! জয়নাবের কথার শব্দ যেন তার ভাবনাকে ধাক্কা মেরে রুখে দিল।

—তুই আগের চেয়ে অনেক শেয়ান-ঙ্গে হয়ে গেছিস্। কচির চেয়েও। আগের সেই বোকা বোকা ভালমানুষি ভাবটা তাকে যেন পেয়ে বসছে। হানিফ অধৈর্য বোধ করল। জয়নাবের দিকে না তাকিয়ে মাথা হেঁট করে বলল, বলির বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ হয়েছে না কি?

- কথায় বলে না, বয়ির গাছ থাকলে ঢেলা দু-চারটে পড়েই। ঐ রকমের আর কি। এসেছে তো কত জায়গা থেকেই। তবে হ্যাঁ, একটা যেন, সম্বন্ধর মত সম্বন্ধ বলে মনে লাগছে। আমাদের তো এক-রকম মতই হয়ে গেছে ওখেনটায়। ছেলে বি এ পড়ছে, এবারে পাশ দিবে। বাপের মত হল এখুনেই হয়ে যাক! ছেলে পয়বান্তী। বলে, পাশ না করলে বে করবে নি।

বেশ গুছিয়ে গুছিয়ে কথাগুলো বলে গেল জয়নাব। শুনতে শুনতে হানিফের মনে হতে লাগল, বুক যেন তার যন্ত্রণায় 'ঝনঝন' করছে—হাওড়া পোলের ওপর দিয়ে ছুটন্ত ট্রাম গাড়ির শব্দের মত। কপালের দুই পাশে, কানের গোড়ায় আগুন ছুটছে। তেমন সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছে না।

—ধান্তাধান্তা করবে নি হানিফ-ভায়ের জন্যে? আকলিমা জানতে চাইল জয়নাবের কাছে। কখন এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে আগের মত খুঁটিতে ভর দিয়ে। জয়নাব তার কথায় কান দিল না। নিজের কথার জের টেনে বলল, ঘর-বর আমারও পছন্দ। তবে হাজার হলেও শিক্ষিত ছেলে, টাকার খাঁই একটু হবেই। তাই বলি, কচির বে'টা আগে হয়ে যাক্, তারপর ইনসাল্লা—। উপসংহারে জয়নাব এক দফা আবিষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভয়ংকর ক্লান্ত দৃষ্টিতে হানিফ একবার তাকালো আকলিমার দিকে। আকলিমা ছোট্ট করে হেসে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, বড় ভাই-এর বিয়েতে আসবে তো হানিফ ভাই?

—উঁ!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবে বৈকি! ও কি আমাদের পর গা? আপনার জনই এক-রকম। দ্যাখ্ না, এখনও কি ভুলতে পেরেছে আমাদিকে? এ্যাদ্দিন পরেও ছুটে এসেছে বেচারী, জয়নাব গদগদ-স্বরে বলল।

কে জানে আকলিমা কি ভাবছে! আবার ওর মুখের দিকে তাকালো হানিফ। তেমন কোন গদগদ ভাব নেই। তবে হাসিটুকুও মিলিয়ে গেছে। কি এখন ভাবছে ও! এমন কিছু কি, যা এই মুহূর্তে সকল কান্না, সকল হতাশাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে কুয়াশা-কাটা রোদ হয়ে তাকে আলোয় আলোয় আলোময় করে তুলবে?

—মা, দাদা বলছিল না, আকলিমা তার মাথার ওপর দিয়ে জয়নাবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর দোকানে একটা লোক রাখবে এবাবে?

তার মানে? কী বলতে চায় আকলিমা? সোজা হয়ে বসল হানিফ। ভয়ংকর শক্ত হয়ে।

জয়নাব ভাবিত ভঙ্গীতে বলল, বলছিল তো। তো কী করে এখন।

—না, বলছিলুম কি, একটু থামল আকলিমা, যেন ঢোক গিলল। বলল, হানিফ ভাইকেই তো রাখলে পারে। চেনা-জানা লোক, সেটাই ভাল হবে না কি?

উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল হানিফ। এক মুহূর্তও আর দেরি করা যায় না। একটা কান্না প্রবল বেগে তাকে গ্রাস করবে বলে ছুটে আসছে। যত শক্ত হয়েই দাঁড়াক সে, হয়তো তার রেহাই নেই।

ব্যাপারটা আকস্মিক। জয়নাব খুব অবাক হয়ে গিয়ে বলল, সে কি, উঠে পড়লে কেন বাপ?

আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সে জবাব দিল এবং তরতর করে বাইরে বেরিয়ে এল। আনমনে কয়েক পা এগিয়ে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে সে মাটিতে দু-একবার থুতু ফেলল।

লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা সংবাদ-সাহিত্য—অবিনাশ দাশগুপ্ত। ক্যালকাটা বুক হাউস। মূল্যঃ চার টাকা।

লেনিন শতবার্ষিকী বছরে বাঙালী পাঠকদের হাতে বর্তমান গ্রন্থটি তুলে দেবার জন্য লেখক শ্রীঅবিনাশ দাশগুপ্তকে ধন্যবাদ। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের সাফল্য পৃথিবীজোড়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল এবং ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশেও সেই চাঞ্চল্যের কম্পন রীতিমত অনুভূত হয়েছিল। রুশ বিপ্লবের নায়ক হিসাবেই লেনিনের নাম প্রথমে বাংলাদেশে পরিচিতি লাভ করে, যদিও ইংরাজ সরকার লেনিন ও রুশ বিপ্লবের সম্পর্কে কোন সত্য সংবাদ যাতে আমাদের দেশে প্রচারিত না হতে পারে, তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। শুধু বৃটিশ সরকারই নয়, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে লেনিন সম্পর্কে অপপ্রচারের অন্ত ছিল না। তাঁকে রক্তলোভী দানব, শয়তান, ঘাতক, দস্যু, তস্কর এমন কোন বিশেষণ নেই, যা বলে অভিহিত করা হয় নি। দিনের পর দিন, লেনিন ও সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হয়েছে। লেনিন জার্মান স্পাই, বলশেভিকরা ডাকাত, সে দেশে ধর্ম লাঞ্ছিত, সমাজে যৌন নৈরাজ্য চলছে, এমন কোন অপপ্রচার নেই, যা করা হয় নি। লেনিনের মৃত্যু সংবাদ নিয়েও অনেক গুজব ছড়ানো হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক বাংলা সংবাদ-সাহিত্যে রুশ মহাবিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে যে সব সংবাদ ও রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি বর্ণনামূলক ক্যাটালগ তৈরি করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাঁর এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অনুরূপ একটি প্রয়াস সর্বভারতীয় পরিসরে করেছেন পূরণচাঁদ যোশী, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্র কৌশিক তিনজনে মিলে, তবে সদ্যপ্রকাশিত ইংরাজীতে রচিত গ্রন্থটি এখনো হাতে পাবার সুযোগ হয় নি। পুরাতন যুগের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং অবিনাশবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি সাফল্যের সঙ্গেই একক প্রচেষ্টায় তা সম্ভবপর করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠক-পাঠিকার যে অনুভূতিটি সর্বপ্রথম উদ্রিক্ত হবে, তা হচ্ছে এই যে, বাংলা সংবাদপত্রসমূহ কোনদিনই রুশ মহাবিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয় নি। বিদেশের প্রেস ও সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সংবাদের নামে অজস্র গুজব ও মিথ্যা গালগল্প প্রচার করেছে, কিন্তু বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকাগুলি প্রথম চোটেই তাদের মতলব বুঝে ফেলতে সমর্থ হয়।

বাংলা পত্র-পত্রিকায় লেনিনচর্চার প্রকৃত সূত্রপাত ১৯২১ সাল থেকে। রুশ বিপ্লবের সাফল্যের মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দৈনিক বসুমতীতে এ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে বাংলা পত্র-পত্রিকাসমূহ দীর্ঘকাল ধরে লেনিন ও রুশ বিপ্লবের সমর্থনে নানা ধরনের রচনা প্রকাশ করেছে। বাংলা পত্র-পত্রিকাসমূহ লেনিন ও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কি ধরনের সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রচার করেছিল, এই প্রশ্নটিই লেখককে বর্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহে আগ্রহী করেছে। ভূমিকায় লেখক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন, যেগুলিতে রুশ বিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে সহানুভূতিশীল বক্তব্য রাখা হয়েছিল। এই তালিকায় তিনি শুধু বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলিরই উল্লেখ করেন নি, ইংরাজী, মারাঠী এবং হিন্দী পত্র-পত্রিকার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। বাংলা হিতবাদী, আত্মশক্তি, দৈনিক বাঙ্গলা প্রভৃতি পত্রিকা থেকে তিনি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া দূরে থাক, তারা নির্ভয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করে নি। যেমন ২রা জুন, ১৯২২-এ হিতবাদী লিখেছিলেন, "বলশেভিক বিপ্লবে আতঙ্কগ্রস্ত ইংরেজ [illegible], তাদের বলশেভিকদের চিত্রিত করেছে [illegible]রূপে; কিন্তু রাশিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মনেপ্রাণে খুশি যে, এতদিনে স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসান হল।"

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্যগুলিকে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে লেনিন-জীবনী, যেখানে সৎসঙ্গী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত লেনিন-জীবনের অংশবিশেষ, ফণিভূষণ ঘোষের লেনিন নাম পুস্তিকার অংশবিশেষ, এ ছাড়া বিজলী, শঙ্খ, আত্মশক্তি, আনন্দবাজার, সংহতি, প্রবাসী, গণবাণী, লাঙল, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'চরিত্রঃ প্রতিতুলনা'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শুধু লেনিনের জীবনী বা কীর্তিকলাপের কথাই প্রকাশ করেন নি, জীবনীমূলক রচনাগুলির মধ্যে লেনিনের চরিত্র বিশ্লেষণেরও চেষ্টা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে অপরাপর নেতাদের তুলনা করেছে এবং সেগুলির অংশবিশেষ লেখক উদ্ধৃত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে লেনিনের রাজনৈতিক মতবাদ ও জীবনাদর্শ স্থান পেয়েছে। সে যুগের বাংলা পত্র-পত্রিকায় লেনিনের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত কোন রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না, যা দু'-চারটি পাওয়া গেছে, লেখক সেগুলির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম 'উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে' লেনিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলে, সে বিষয়ে বাংলা পত্র-পত্রিকায় বহু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, লেখক যেগুলিকে প্রয়োজনীয় অংশ সংকলন করেছেন। শুধু রাজনৈতিক সংবাদ বা প্রবন্ধই নয়, লেনিন সম্পর্কে বাংলা পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলি ষষ্ঠ অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। অরণি পত্রিকার ১৩৪৯ সনের বৈশাখ সংখ্যায় একটি অনুবাদ-নাটিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যার অংশবিশেষ সপ্তম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। অষ্টম অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে লেনিনের অসুস্থতা ও মৃত্যুসংবাদ স্থান পেয়েছে। লেনিনের অসুস্থতা ও মৃত্যুবিষয়ক সংবাদাদি, বাংলা পত্র-পত্রিকায় সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়েছে। এ বিষয়ে লেখক সবচেয়ে বেশি তথ্য সংগ্রহ করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে। এ ছাড়া আত্মশক্তি, বিজলী, যুগান্তর, শঙ্খ, অরণি, বাঙলার কথা প্রভৃতি পত্রিকা থেকেও লেখক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই আটটি অধ্যায় ছাড়া দুটি পরিশিষ্ট আছে, একটির নাম 'রুশ মহাবিপ্লব ও সাম্রাজ্যিক আত্মশক্তি'। লেনিন ও রুশ বিপ্লবকে বাংলাদেশে

[illegible] এই পত্রিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় পরিশিষ্টের বিষয় হচ্ছে 'লেনিন সম্পর্কে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থপঞ্জী।'

তবে বর্তমান গ্রন্থটির কয়েকটি অভাবের দিকও আছে। প্রথমত, লেখক উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলি ছাড়াও লেনিন ও রুশ বিপ্লব আরও কোন কোন পত্রিকায় উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে, অবশ্য এ জাতীয় 'ওমিশন' থাকবেই। দ্বিতীয় ত্রুটি, লেখক কোন সুনির্দিষ্ট কালানুক্রম অনুসরণ করেন নি, ঠিক কোন্ সাল থেকে কোন্ সাল পর্যন্ত পত্র-পত্রিকা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন সেটা স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন ছিল, কেন না গ্রন্থটির যা নাম তাতে ১৯৭০ সাল পর্যন্তই বোঝায়। তৃতীয়ত, একটি নির্ঘণ্টের প্রয়োজন ছিল এই জাতীয় গ্রন্থের জন্য, হয় লেখক সেদিকে উদাসীন, অথবা প্রকাশক। বাংলাদেশের প্রকাশকেরা সচরাচর যা হয়ে থাকেন, চার-পাঁচটি বেশি পৃষ্ঠার দায় বহন করতে অনিচ্ছুক হয়েছেন। 'রাশিআ' বানানটি অতিশয় দৃষ্টিকটু। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই রচনার বিষয়বস্তুর উপযোগী হয় নি। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই সকল বিষয়ে আর একটু সচেতন হবেন।

—ডঃ নরেন ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-সৃষ্টি বিচিত্রা : শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্ত : আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য : ৭ টাকা।

লেখক রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, খেয়া, শ্যামলী, আকাশপ্রদীপ, আরোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির এবং নৌকাডুবি উপন্যাসটি সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথের এই সব গ্রন্থ সম্পর্কে যে সব সত্য মৌলিকভাবে স্বীকৃত এবং কবির যেসব নিজস্ব উক্তি এবং পত্রাবলী এই সব সত্যের অনুকূল, তাদেরই তিনি নিষ্ঠাভরে তাঁর বইতে আহরণ করে দিয়েছেন। সাধারণভাবে যাঁরা আলোচিত গ্রন্থগুলির বিষয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে চান, প্রদ্যোতের বইটি থেকে তাঁরা উপকৃত হবেন। প্রধানভাবে বইখানি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সহায়ক হবে মনে হয়।"

কড়ি ও কোমলের পার্থিব স্তর থেকে মানসীর আধ্যাত্মিক স্তরে উত্তরণের সম্পর্কে লেখকের সমীক্ষা প্রশংসনীয়। সোনার তরী সম্পর্কে আলোচনা করবার সময় তিনি দেখিয়েছেন যে কাব্যটি রচনার যুগে প্রকৃতি এবং মানবজীবনের নিবিড় সান্নিধ্য কবিকে কেমন করে এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিল। চিত্রা কাব্যের জীবনদেবতা শীর্ষক কবিতাগুলির মূল্যায়ন এবং কল্পনায় কবির সৌন্দর্য চেতনার সম্পর্কিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। লেখক বলেছেন 'খেয়া' কাব্যের দুঃখবাদ অবিমিশ্র দুঃখের গান নয়, এই দুঃখ আনন্দময় এবং পুরাতন জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করে কবির নবজীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার আভাস এ কাব্যে সূচিত হয়েছে। কবির শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলির সমালোচনায় যে আন্তরিকতার ভাবটি রয়েছে তা আমাদের ভাল লেগেছে। নৌকাডুবির সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যের ভিতর দিয়ে তার ইতিহাস সচেতন মনের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

স্বপ্নদীপ : নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পৃঃ ৯৮। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য : চার টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা নীরদবরণ কেবল কবিই নন, তিনি যোগীও। সাধারণত মনোময় পুরুষের যুক্তি-বুদ্ধির আলোকে কাব্য রচিত হয়। কিন্তু মানুষের পরমবৃত্তি মন নয়, শেষ ধাপও নয়। মনের ওপারে আছে অন্য সমর্থ চেতনার স্তরাবলী। মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে, বসবাস করতে পারে, তাদের নামিয়ে আনতে পারে এই মর্ত্য জীবনাধারে। তাদের স্বরূপেই একে গড়ে তুলতে পারে। এই স্তরাবলীর শীর্ষে যা তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন ঋতচিৎ বা অতিমানস। এই জ্যোতির্ময়ী পরাশক্তির দিকেই সৃষ্টি-প্রবাহ চলেছে। কবি নীরদবরণ এই পথেরই পথিক।

এ জনাই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কবিরা যে কাব্য রচনা করেছেন, মনে হয়, এ এক নতন ধরনের কাব্যের নবদিগন্তের ইসারা। এই পুস্তকের ভূমিকায় কবি লিখছেন : "তখন আশ্রমের শিল্পবৃন্দ......খ্যাত ও অখ্যাতনামা অনেকে যোগের অঙ্গ হিসাবে সাহিত্যের, গানের, শিল্পের আরাধনায় তৎপর।" তাই যোগ সাধনার ফসল বলে এই সকল কবিতা কেবল মানস কুসুম নয়, অতি মানস কুসুম। এদের বাক্‌ধারাও পৃথক। সূর্যকিরণের মতই এই সকল কাব্য অন্তরের অনুভূতিতে, সত্যের চারুতম শিবতম প্রকাশ সমুজ্জ্বল।

এজন্য প্রথম পাঠে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট বলে প্রতিভাত হলেও যে ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্পের সাহায্যে গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতির আলোকে কবি প্রতিটি কবিতার বক্তব্যকে পরিস্ফুট করে তুলেছেন, তা বার বার আবৃত্তিতে পাঠকের চিত্তকে দোলা দেয়, মনে আনন্দ সঞ্চার করে।

শ্রীঅরবিন্দ এ সকল কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, "নীরদের কবিতা আসছে স্বপ্ন-চেতনা থেকে—আমি তাকে সুর-রিয়ালিস্ট নাম দিয়েছি......। স্বপ্ন কবিতা সাধারণত ছবি, ভাবদৃষ্টি, প্রতীকে ঠাসাঠাসি, কেন না তাদের লক্ষ্য হল এমন এক গভীর সত্যকে প্রকাশ করা, যা সাধারণ ভাষার পক্ষে সম্ভব নয়। এতে পারম্পর্য, ধারাবাহিকতা, পরিকল্পনা আছে। কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধির কঠোর নিয়মসম্মত নয় বলে মন সন্তুষ্ট হয় না। বুদ্ধিগত ব্যাখ্যায় অর্থ খর্ব হয়। অর্থ হল দেখার ও অনুভবের জিনিস, মননের নয়। চিন্তাপ্রসূত যে ব্যাখ্যা, তাতে একটা তৃপ্তি ও মানসিক যৌক্তিকতার ভান থাকে। কিন্তু গভীর অর্থ ও সংগতি ভিতরের অনুভূতি-সাপেক্ষ।"

প্রত্যক্ষ বাস্তবের পেছনে যে গভীরতর সত্য রয়েছে, তারই সন্ধান দেয় এই সকল কবিতা। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গ্রন্থ অভিনব। কাব্যামোদীরা এই কাব্য পাঠে তা বিশেষ রসাস্বাদন করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকটি কবিতা হীরার টুকরার মত কঠিন, কিন্তু তাদের দীপ্তি ও আলোকচ্ছটা চিত্তহরণ করে।

—[illegible]

চলার পথে (বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০)। সম্পাদিকা কমলা মুখোপাধ্যায়। ১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পঃ।

পত্রিকাটির এই বিশেষ সংখ্যার কয়েকটি রচনা তথ্যসমৃদ্ধ। মাদাম কামা'র কথা লিখেছেন মঞ্জুলা সেন। মাদাম কুরীর অপ্রকাশিত ডায়েরীর অনুবাদ করেছেন বেলা দত্তগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ ও আদিবাসী মেয়েরা (মুক্তি মিত্র) লেনিনের দেশের মেয়েরা (অরুণা হালদার) পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েরা (জাহানারা বেগম) প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। 'পর্বতারোহণে ভারতীয় মেয়েদের ভূমিকা' (ভক্তি বিশ্বাস) একটি মূল্যবান রচনা। লেখিকাগোষ্ঠীতে আরো আছেন পারুল ঘোষ, ঊষা দেবী, মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, গীতা মুখার্জী, ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার, সুভদ্রাকুমারী চৌহান, বীণা গুহ, গার্গী রায়, অঞ্জলি রায়, ঊষা সেহানবীশ, রাণী দাশগুপ্তা ও বেলা লাহিড়ী।

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ বিকেলে গ্যয়টের গার্ডেন হাউস দেখতে গেলাম। তারপর গেলাম গ্যয়টে এবং শিলারের রেরিয়্যাল প্লেস দেখতে—কফিন দুটি একটি ঘরে পাশাপাশি রাখা হয়েছে জার্মানীতে দেখলাম ঘরের ওপরেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের কফিন সাজানো থাকে—অবশ্য সাধারণ লোকেদের কফিন মাটির তলাতেই রাখা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী গ্যয়টে হাউসে গেলাম—কার্লাইলের, স্যার ওয়াল্টার স্কট এবং লর্ড বায়রণের স্বহস্তে গ্যয়টেকে লেখা চিঠি দেখলাম। তাছাড়া গ্যয়টের বহু কাব্য নাটকের পাণ্ডুলিপির অংশও এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

গ্যয়টের বেডরুমে তাঁর শেষ শয্যা এখনও অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লর্ড বায়রণ এবং নেপোলিয়নের দুটি অতি সুন্দর ছবি ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। তাছাড়া গ্যয়টের নিজের আঁকা বহু ছবিও এই বাড়িতে দেখলাম।

ভাইমারে একদিন সকালে রোলাণ্ড বিয়ার এসে হাজির হল। এই যুবকটির সঙ্গে কয়েকদিন আগে বার্লিনে ব্রেশট-ডায়লগের সময় আলাপ হয়েছিল 'মান ইস্ট মান' নাটকটি দেখতে গিয়ে। প্রথম বিরতির সময় থিয়েটারের রেস্তোরাঁতে খাবার খাচ্ছি—আমার হাতে বিয়ারের গ্লাস। হঠাৎ ছোটখাট চেহারার একটি যুবক এসে আমাকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করলো—আপনার নাম কি মিস্টার অশোক সেন?

বললাম—হ্যাঁ।

সে নিজের পরিচয় দিল—নাম রোলাণ্ড বিয়ার, হেসে বললো—আমার নাম মনে রাখতে আপনার কষ্ট হবে না—আপনার হাতের পানীয়ের সঙ্গে আমার নামের মিল রয়েছে।

রোলাণ্ড বিয়ার জেনাতে ফ্রাইডরিশ শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে—সংস্কৃত নাটক এবং ব্রেশটের নাটকের উপর তুলনামূলক আলোচনা করে থিসিস লিখছে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য। আমার নাম এবং পরিচয় পেয়েছে কাগজে—বক্তৃতা শুনেছে ব্রেশট-ডায়লগে। বিয়ার জেনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্রেশট-ডায়লগে যোগ দিতে এসেছে। যদি আমার অসুবিধা না হয়, তাহলে আমার সঙ্গে তার ডক্টরেটের থিসিস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়। সেদিন রাতে থিয়েটারের পর সে আমার সঙ্গে আমার হোটেলে এসেছিল এবং অনেকক্ষণ গল্প করে গেল। পরের দিন সকালে ব্রেশট-ডায়ালগ ভাঙবার পর বিয়ার আমাকে বার্লিনার আসেম্বলের কাছে একটি রেস্তোরাঁতে খেতে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে বললে, আপনার ভাল লাগবে এমন খাবার সার্ভ করতে বলেছি। খাবার এলে দেখলাম মাংসের ঝোল ও ভাত—নাম হাঙ্গেরিয়ান গুলাস ও রাইস। বহুদিন বাদে ভাতটা সত্যিই খুব মুখরোচক লেগেছিল। এর পরদিন সকালে বিয়ার এসে জানালো—আজ কিছুক্ষণ বসে সে চলে যাবে জেনাতে—তার কর্মস্থল থেকে তাগিদ এসেছে ফিরে যাবার জন্য। আমি যখন ভাইমারে যাব, তখন যেন তাকে চিঠি দিই—চিঠি পেলেই সে জেনা থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ও-দুটি জায়গার ভেতর তেমন দূরত্ব নেই।

বিয়ারের সঙ্গে আলাপের সময় বলেছিলাম যে, ব্রেশ্ট নতুন ফর্মের ইউরোপীয়ান ড্রামার স্রষ্টা। কিন্তু এই ফর্মের নাটকের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের যাত্রার অনেক মিল দেখা যায়। যাত্রা হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব জিনিস—প্রায় সাড়ে ছ'শো বছর ধরে যাত্রা বাংলাদেশে প্রচলিত। পিকচার ফ্রেম স্টেজটা আমরা বৃটিশদের থেকে ধার করেছি। ব্রেশট-ড্রামার মতন যাত্রাতেও ন্যারেটিভ ফর্মের প্রাধান্য। যাত্রার অডিটোরিয়ামের সঙ্গে বর্তমান ইউরোপের 'থিয়েটার ইন দি রাউণ্ড' এবং 'এরিনা থিয়েটারের' যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যাত্রাভিনয়ে দর্শকদের মনে কোন সম্মোহন সৃষ্টির প্রয়াস করা হয় না।

সাধারণত পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই যাত্রার নাটকের দিকটা রচিত হোত। নীতিগত শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, নানা ধরনের আদর্শের প্রচার—এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রার প্রচলন হয়েছিল। সমাজের সব শ্রেণীর লোকেরাই যাত্রা দেখে আনন্দ উপভোগ করতো। বিদেশীদের কাছ থেকে ধার করা থিয়েটারকে আমাদের দেশের কৃষক, মজদুর, শ্রমিক শ্রেণীর পারে নি। প্রথমত থিয়েটারের দর্শনী দেবার মত পয়সা দেবার সামর্থ্য তাদের ছিল না এবং নেই—দ্বিতীয়ত থিয়েটারে যে একটা সফিসটিকেশনের চাকচিক্য আছে মেহনতী মানুষ তার থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। তৃতীয়ত, বৃটিশ আমলে আমাদের দেশের শতকরা ৫/৬ জন লোককে শিক্ষিত বলা হোত—বাকী লোকেদের পক্ষে থিয়েটারের তুলনায় যাত্রাকে অনেক সহজবোধ্য বলে মনে হোত।

যাত্রায় একটা ব্যাপারে কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি ছিল। কোনরকম দৃশ্যসজ্জার ব্যবহার হোত না। সেট্‌সিনের ব্যাপারে সবটাই দর্শক এবং শ্রোতাদের ভেবে নিতে হোত। এর ফলে তাদের কল্পনাশক্তির ওপর একটু বেশি চাপ পড়তো বলেই আমার মনে হয়। এদিক থেকে তুলনা করলে ব্রেশ্‌ট-থিয়েটার উন্নত ভঙ্গীর প্রয়োগরীতির প্রবর্তন করবার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

ব্রেশ্‌টিয়ান প্রডাকশনে দৃশ্যসজ্জার বাহুল্যে নাটকের গতি ব্যাহত হয় না—আবার যাত্রার মত দৃশ্যসজ্জাহীন রঙ্গভূমিতে অভিনয় করে দর্শকের কল্পনাশক্তিকে পীড়িত করবার দরকার করে না। ব্রেশ্‌টের প্রয়োগপদ্ধতি হল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের—সাঙ্কেতিক এবং রিয়ালিস্টিক এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নাটকের এক অভিনব ভঙ্গীর প্রকাশরীতি। ফলে দর্শক বুদ্ধি এবং অন্তরকে সজাগ রেখে ধীরে ধীরে নাটকের প্রস্ফুটন সজাগ মনে এবং বিচারকের দৃষ্টিতে দেখতে পারে।

সেদিন কিছু বাদেই বিয়ারকে তার কর্মস্থলে চলে যেতে হয়েছিল। ভাইমারে গিয়ে হঠাৎ তার কথা মনে হোল। আমার দোভাষী মিসেস মায়ারোমকে অনুরোধ করলাম ফ্রাইডরিশ শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন করে রোলাণ্ড বিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ফোনে তাকে না পাওয়াতে মেসেজ দিয়ে আমার ফোন নাম্বার রেখে দেওয়া হল। ঘণ্টাখানেক বাদেই বিয়ারের ফোন পেলাম- ঠিক হল, পরের দিন সকালে সে ভাইমারে আসবে এবং বেলা তিনটে নাগাদ জেনাতে ফিরে যাবে।

পরদিন যথাসময়ে এসে বিয়ার আমাকে শিলারের বাড়ি, গ্যয়টের বাগানবাড়ি প্রভৃতি দেখিয়ে আনলো—তার সঙ্গে সময়টা ভারি ভাল কেটেছিল। যাবার আগে বিয়ার তার থিসিসের অংশবিশেষের ইংরাজী অনুবাদের টাইপ করা একটি কপি আমাকে দিয়ে গেল। সেদিন রাতে তার এই প্রবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এই লেখাটির কিছু অংশ এখানে অনুবাদ সহ তুলে দিচ্ছি:

[illegible] ইংরাজ [illegible] উইলিয়াম জোন্স মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার সংগে ইউরোপের পরিচয় ঘটিয়ে দেন।

[এম্‌· উইনটারনিট্‌জ্‌ তাঁর 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' বইতে যেভাবে উইলিয়াম জোনসের পরিচয় দিয়েছেন, তা এখানে তুলে দেওয়াটা অপ্রাসংগিক হবে না—লেখক। William Jones (born 1746, died 1794) went to India in the year 1783 in order to take up the post of Chief Justice at Fort William ... In the year 1789 he published his English translation of the celebrated drama 'Sakuntala' by Kalidasa. This English translation was translated into German in the year 1791 by George Forster, and awakened in the highest degree the enthusiasm of men like Herder and Goethe.]

"তারপর থেকেই ইউরোপীয়ান সায়েনটিস্টের দল (জার্মানরা শিল্পের ক্ষেত্রের রিসার্চারদেরও সায়েনটিস্ট নামেই সম্বোধন করেন।), অনুবাদকেরা এবং থিয়েটার বিশেষজ্ঞরা ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছেন পশ্চিমের কাছে শকুন্তলার এবং অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে এবং সুষ্ঠুভাবে এগুলিকে মঞ্চস্থ করতে।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ এবং অনুবাদকদের আপ্রাণ চেষ্টায় সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু অনুবাদ বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে- কিন্তু মঞ্চরূপায়ণের বেলায় উল্টো ফল দেখা গেছে—ইউরোপীয়ান থিয়েটারে সংস্কৃত নাটক সাফল্যজনকভাবে প্রডিউসড্‌ হতে পারে নি।

এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, আমাদের ইউরোপীয়ান থিয়েটারের ট্র্যাডিশন এবং অভিনয়-পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল তার মাধ্যমে সংস্কৃত নাটকের স্পেসিফিক-লিটি অফ দি পোয়েটিক্‌ স্ট্রাকচার ফুটিয়ে তোলা ছিল অসম্ভব।

পুরনো ভারতীয় নাট্যশিল্প এক বিশেষ ভঙ্গীর রচনা, বিশেষ ধরনের কাব্যিক এবং নাট্যিক নিয়মের ওপর নির্ভর করেই এর সৃষ্টি—এর সুষ্ঠু মঞ্চরূপায়ণের জন্য প্রাচীন প্রচলিত ভারতীয় নৃত্য এবং মূকাভিনয়কে এর সংগে প্রকৃষ্টভাবে যুক্ত করতে হয়। যেসব পুরনো ভারতীয় নাটকের পাণ্ডুলিপি আমরা পেয়েছি, তার সংলাপের অংশবিশেষ সংস্কৃতে লেখা এবং বাকী অংশ প্রাকৃতে রচিত। নাটকের মাঝে মাঝে দৃশ্যের বিশ্লেষণ এবং অভিনয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে। নাটকে গদ্যের সংগে মিলিতভাবে পদ্যের ব্যবহার করা হয়েছে—পদ্য অংশে নানা ধরনের ছন্দ দেখা যায়। নাটকের পদ্য অংশটাই প্রধান এবং অনেক উন্নত স্তরের।

এই গাঠনিক দিকটাই পুরনো ভারতীয় নাটক এবং পুরনো গ্রীক ও শেক্সপীরিয়ান নাটকের মধ্যে বিরাট প্রভেদের সৃষ্টি করেছে।

ইউরোপীয় ইণ্ডলজিস্টরা পুরনো ভারতীয় নাটকের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন সাহিত্যের ঐতিহাসিক দিক থেকে। এর ছাঁচ এবং সাদৃশ্য খুঁজেছেন ভারতীয় কাব্যে। কিন্তু পদ্য-স্তবকগুলোর নাটকীয় কার্যকারিতার ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন নি। মাত্র কয়েকজন বিদগ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ (যেমন ফ্রাঙ্কেনস্টিন রুকার্ট) এই সব স্তবকে সংস্কৃত নাটকের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন।

ক্ল্যাসিক সংস্কৃত কাব্য অত্যন্ত সংক্ষ্যিপ্তভাবে গঠিত। গদ্য থেকে কঠিন ছন্দোবদ্ধ কাব্যের আশ্রয় নেওয়াটা নিশ্চয়ই নাটকীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং কার্যকারিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করাটা খুবই দরকার।

[ক্রমশ]

সেন্সার বোর্ডের আর এক কীর্তি

ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের বিরুদ্ধে এমন অনেক কথা শোনা যায়, যা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও সত্যি। খোসলা কমিটির তদন্তের সময় এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় শ্রীখোসলা এবং তাঁর কমিটির সদস্যদের কাছে কয়েকজন বক্তা এমন তথ্য উপস্থিত করেছিলেন যা শুনে আমাদের পেটে খিল ধরার উপক্রম হয়েছিল। অথচ সেন্সার বোর্ডে যাঁরা আছেন, তাঁরাও সবাই সমাজের উচ্চশিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী বলেই জানি! একজন বক্তা বলেছিলেন—এক কালোবাজারীর মাথায় গান্ধীটুপি থাকার জন্য নাকি সেন্সার বোর্ড আপত্তি করেছিল; আর একজন বললেন, একটা ছবিতে গৃহভৃত্যদের সমিতি অফিসে 'স্বাধীনতা' দৈনিক পত্রিকা দেখানোয় নাকি আপত্তি উঠেছিল: লাল পতাকা নিয়ে মিছিল দেখে নাকি জনৈকা সদস্যার ব্লাড প্রেসার বেড়ে গিয়েছিল—এমন আরো কত কথা শুনেছিলাম। অথচ যে সেন্সার বোর্ডের এমন শুচিবাই, সেই সেন্সার বোর্ডের মুক্তিপত্র পেতে সেক্স ছবি ও মার্কিন গোয়েন্দা এসেন্সীর প্রচারমূলক ছবির পক্ষে কোন অসুবিধে হয় না। এসব ক্ষেত্রে সেন্সার বোর্ডের নীতির অভিভাবকদের নীতিজ্ঞান কোথায় থাকে?

সম্প্রতি সেন্সার বোর্ডের একটা নতুন কীর্তির কথা শুনলাম। লেনিন জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে ঋত্বিক ঘটক দু-রীলের একটি ছবি করেছেন। ছবির নাম 'আমার লেনিন'। ছবিটিতে নাকি একজন কৃষকের চোখে লেনিন শতবর্ষ উদযাপন উৎসব দেখিয়ে লেনিনের শিক্ষায় সেই কৃষকের জমির সংগ্রামে অংশগ্রহণের দৃশ্য দেখান হয়েছে। এই ছবিটি নাকি সেন্সার বোর্ডের সভায় যে সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অনুমোদন করেছেন। এই অনুমোদনে প্রযোজক ছবিটি দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী এবং আরো অনেককে দেখিয়েছেন। কিন্তু তার পরে কয়েক মাসের মধ্যেও এই ছবির ছাড়-পত্র বোম্বাই থেকে আসছে না। স্বভাবতই এতে প্রযোজক অস্থির হয়ে উঠেছেন এবং খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সেন্সার বোর্ডের সদস্যরাও কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছেন, তাঁদের অনুমোদনের পরেও ছবিটি ছাড়-পত্র পাবে না কেন?

প্রকাশ যে, সেন্সার বোর্ডের সদস্যরা অনুমোদন করলেও কলকাতায় ভারপ্রাপ্ত সেন্সার অফিসার নাকি জানিয়েছেন তাঁর আপত্তির কারণ—ছবিতে জোরপূর্বক জমিদখলের দৃশ্য আছে। প্রকাশ যে, তিনি নাকি খোলাখুলি বলেছেন, জমিতে কৃষি-বিপ্লবের প্রেরণা যোগান হয়েছে। চমৎকার! এ না হলে তিনি আর আমলা-তন্ত্রের একজন হলেন কি করে! একদিকে সরকার বামপন্থীদের ওপর টেক্কা দেবার জন্য জমির ব্যাপারে কত কথাই বলেছেন, আর একদিকে সেই সরকারের আমলা কৃষি-বিপ্লবের গন্ধে ভিরমি খাচ্ছে। এক-দিকে সরকার লেনিনের জন্ম-শতবর্ষে ডাক টিকেট বার করেছেন, রাজ্যপাল লেনিনের প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন, আর একদিকে লেনিনের শিক্ষা গ্রহণ করছে, তা দেখাতে আপত্তি জানাচ্ছে। শ্যাম ও কুল রাখার চমৎকার নজির!

অথচ ফিল্ম ডিভিশনের একটি সংবাদ-চিত্রে দেখান হয়েছে জমিদখলের অভি-যানের ঘটনা। কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের পক্ষে তা যদি আপত্তিকর না হয়, কলকাতার ফিল্ম সেন্সার অফিসারের কাছে আপত্তিকর হবে কেন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কয়েকটি তথ্য ও সংবাদচিত্র তৈরি এবং প্রদর্শিত হয়েছে—যাতে বেনামী জমি-দখলের ব্যাপার দেখান হয়েছে। গ্রামের জীবনে এটা যখন একটা বড় ঘটনা, তখন তাকে অস্বীকার করা যাবে কি করে!

কিন্তু সরকারী আমলের অতি উৎসাহে 'আমার লেনিন' ছবিটি আজ সেন্সার সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। এই ঘটনা গণ-তন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। —সুজন।

'পথ উপকথা' ছবিতে আরতি ভট্টাচার্য

গুড বাই, মিঃ চিপস্

'গুড বাই, মিঃ চিপস্' আবার চলচ্চিত্র রূপ লাভ করেছে। এই ছবিটি মেট্রো সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে।

ইংল্যান্ডের জেমস হিলটন রচিত বড় গল্প 'গুড বাই, মিঃ চিপস্' জনপ্রিয় প্রণয় উপাখ্যান। যে গল্পের ২২টি সংস্করণ আজ পর্যন্ত বার হয়েছে এবং ২০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই গল্পটি সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে লন্ডনে নাট্যরূপ লাভ করেছিল। দু' বছর পরে মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়ে ছিল। সেই ছবিতে মিঃ চিপসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবার্ট ডোনাট এবং ক্যাথারিনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গ্রীয়ার গার্সন। ত্রিশ বছর পরে আবার এই কাহিনী রঙিন চিত্ররূপে লাভ করেছে এই চিত্ররূপ ১২টি গানে উপভোগ্য।

আজকাল আমরা সিনেমায় যে ধরনের প্রেমকাহিনীচিত্র দেখি, তার সঙ্গে 'মিঃ চিপস্' কাহিনী এক নয়। সমাজবোধের সঙ্গে প্রেমের মাধুর্য এবং সেই প্রেমের সৌরভ বিকশিত হয়েছে। সত্যিকার প্রেম কেবল যৌন-নির্ভর হয় না, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যবোধে তা প্রদীপ্ত মিঃ চিপস্ একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক, শিক্ষকতাকে তিনি ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মিউজিক হলের সুন্দরী গায়িকা ক্যাথারিন নিজের বিলাসের জীবন ছেড়ে দিল এই স্কুল শিক্ষকের স্ত্রী হবার জন্য। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পম্পেই দেখতে গিয়ে মিঃ চিপসের সঙ্গে ক্যাথারিনের প্রণয় গড়ে উঠেছিল। সেই অব্যক্ত প্রেম মধু

হয়ে উঠলেন। জীবন ইতালীর বনভোজনবাদের সুন্দর গ্রামে। বিয়ের পর নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, শোকের মধ্যেও মিঃ চিপস্ নিজের কর্তব্যকর্মে অটল, স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ তাঁকে বিচলিত করে না, জীবনকে তিনি বিকশিত করে তুলেছেন শিক্ষাব্রতী হিসাবে, ছাত্রদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে। একদিনের মঞ্চ-গায়িকা ক্যাথারিনের জীবনেও ঘটেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন।

এই কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক মিঃ চিপসের চরিত্রে পিটার ও'টুল যে অভিনয় করেছেন চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে তা পরম সার্থকতা লাভ করেছে। এক প্রবীণ শিক্ষক চরিত্রের রূপদানে পিটার ও'টুল বিস্ময়কর অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সম্ভবত তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে 'মিঃ চিপস্' শ্রেষ্ঠ। ক্যাথারিনের চরিত্রে পেটুলা ক্লার্ক সমান দক্ষতায় গ্ল্যামার গার্ল থেকে সাদাসিধে শিক্ষক-পত্নীতে পরিণত হবার সময়কার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি সংগীতশিল্পী, গায়িকা হিসাবে সারা ইউরোপ-আমেরিকায় তাঁর নাম আছে। এই ছবিতে তাঁর কণ্ঠের গানগুলি ভাল লাগবে।

পম্পেই, দক্ষিণ ইতালীর গ্রাম এবং ইংল্যান্ডের ডোরসেটে সেরবোর্ন স্কুলে দৃশ্যগুলি তোলা হয়েছে। কাহিনীর মাধুর্য, অভিনয়, গান ও দৃশ্য-সৌন্দর্যে ছবিটি উপভোগ্য। এই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন টেরেন্স রেটিগান; পরিচালনা করেছেন হার্বার্ট রস।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের 'শ্যামা'য় কোটালের ভূমিকায় শ্যামল বসু।

'প্রথম কদম ফুল' ছবিতে শুভেন্দু ও সৌমিত্র

নাটকের কথা

শর্মিলা'র চার' শ' রজনী স্মারক উৎসব

গত ২৫শে জুলাই স্টার থিয়েটারের নাটক 'শর্মিলা' চার' শ' রজনী অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন সাহিত্যিক বিমল মিত্র এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক শ্রীঅজিত ঘোষ। স্মারক রজনী উপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীসলিল মিত্র শিল্পী ও কর্মীদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরস্কারগুলি শিল্পীদের হাতে দিলেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। এই অনুষ্ঠান শেষে 'শর্মিলা' নাটক অভিনয় হয়। শর্মিলা'র নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত।

স্টুডিও খবর

রাজকুমারী

লোকনাথ চিত্রমন্দিরের 'রাজকুমারী' ছবির কাজ শেষ হয়েছে। শেষ চিত্রগ্রহণ ছিল হেলেনের নৃত্য দৃশ্য। ছবিটি আগামী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বসুশ্রী, বীণা, মিত্রা চিত্রগৃহে মুক্তিলাভের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, তনুজা, দীপ্তি রায়, ছায়া দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, তরুণকুমার, জহর রায়, ভানু ব্যানার্জী, অজয় গাঙ্গুলী প্রমুখ। রাহুল দেববর্মণ ছবিতে সুরারোপ করেছেন। বাংলা ছবিতে এই তিনি প্রথম কাজ করলেন। সলিল সেন ছবিটি পরিচালনা করছেন। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

সঙ্গীতকথা

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ ৪ঠা জুলাই থেকে সাতদিনের জন্য রবীন্দ্র-সদনে মায়ার খেলা, ভানুসিংহের পদাবলী, তাসের দেশ, বাল্মীকি প্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা মঞ্চস্থ করেন। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সমাগম দেখেই বোঝা যায় এঁদের জনপ্রিয়তা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। মায়ার খেলার মত গীতি ওপেরাকে এমন সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক।

গানে সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন মুগ্ধ করে রেখেছিলেন বিভিন্ন নাটকে। সঙ্ঘের ব্যালেরিনা পূর্ণিমা ঘোষ প্রতিটি শোতে যেন ইন্সপায়ারড্ হয়ে নেচেছেন। চন্দ্রোদয় ঘোষের তাসের দেশের রাজপুত্র এবং শ্যামার উত্তীয়রূপী নৃত্য প্রশংসনীয়। শ্যামল বোসের কোটাল এক কথায় অনবদ্য।

স্টেজ ডেকর এবং সাজসজ্জাও অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ—তবে আলোকসম্পাত সব সময় আশাপ্রদ হয় নি।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আশ্রমিক সঙ্ঘ চণ্ডালিকা এবং নটীর পূজারও মঞ্চরূপায়ণের ব্যবস্থা করবেন।

'গুডবাই, মিঃ চিপস্' ছবিতে পেটুলা ক্লার্ক ও পিটার ও'টুল

শ্রাবণ-সন্ধ্যা

গত ২৬শে জুলাই রবীন্দ্র সদনে শহরের সংগীতরসিকরা এক মনোরম সংগীত-সন্ধ্যা উপভোগ করেছেন। রবীন্দ্র সদন কমিটি এই প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। 'শ্রাবণ-সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সংগীত শিল্পীরা বরষার সংগীত পরিবেশন করলেন তাঁদের দরদী কণ্ঠে। নীলাকাশে মেঘভরা বর্ষার প্রতীকময় সুন্দর মঞ্চে একে একে শিল্পীরা এসে তাঁদের কণ্ঠের সেরা গানগুলি শোনালেন। প্রথমেই এসেছিলেন বাণী ঠাকুর। তাঁর কণ্ঠে 'আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার' এবং 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে' শ্রোতাদের মনে সুরের মাদকতা জাগিয়ে দিয়ে যায়। সাগর সেনের ভারী গলায় 'হে নিরুপমা' আর 'আমার প্রিয়ার ছায়া আকাশে ভাসে' বর্ষার ভারী হাওয়ায় যেন ভেসে আসে সুদূর থেকে। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন—'মাটির বুকের মাঝে', 'শ্রাবণ মেঘে', 'ঝরে যায় উড়ে যায়' অপূর্ব এক সুরের মায়ায়। সুরের সে মায়ালোককে ভরিয়ে তুললেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন এবং আরো শিল্পীরা। রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত এই সুরসভায় শ্রোতারা মুগ্ধ-বিস্ময়ে রবীন্দ্র-সংগীত উপভোগ করলেন।

রবীন্দ্র সদনের এই উদ্যোগ সার্থক হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁরা এক নজরুল সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁদের কাছে এরকম আরো সংগীতানুষ্ঠানের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ডাবিং

সম্প্রতি ভারতীয় ছবি "অনুপমা"র ডাবিং-এর কাজ চলেছে মস্কোর অন্যতম বৃহৎ স্টুডিও—গর্কি ফিল্ম স্টুডিওতে। বিদেশী ছবির ডাবিং-এর কাজ খুব বেশি এখানে হয়।

বিগত কিছুকালের মধ্যে সোভিয়েত দর্শকরা যেসব ভারতীয় ছবি দেখেছেন তার মধ্যে আছে "জাগতে রহো", "স্নেহের ঔর স্বপ্না", "ধুল কা ফুল" ও "অনুরাধা"।

সোভিয়েত দর্শকরা ভারতীয় ছবির বিশেষ কদর করেন। চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্য-আচরণ ও জীবনযাত্রার সংগে পরিচিত হন।

গর্কি ফিল্ম স্টুডিও, এখন যেখানে "অনুপমা" ছবিটির ডাবিং হচ্ছে সেটি একটি বহুতলা বাড়ি, বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইনের নামাঙ্কিত রাস্তায় এই স্টুডিও অবস্থিত। বছরে প্রায় ৮০টি ছবি এখানে তোলা হয়।

"অনুপমা" ছবির ডাবিং-এর কাজ এখন এখানে দ্রুত হচ্ছে। এই কাজ বেশ কঠিন। মূল ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিব্যক্তির উপযোগী কণ্ঠস্বর খুঁজে বার করা বেশি জটিল ব্যাপার। "অনুপমা"র ক্ষেত্রে অভিনেত্রী শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুরের ডাবিং-এর উপযোগী কণ্ঠ খুঁজে নেওয়া সমস্যা হয়। অভিনেত্রী শ্রীমতী শশিকলার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। বিশিষ্টা সোভিয়েত অভিনেত্রী শ্রীমতী নাদেজদা রুমিয়ানৎসেভা পরে এই ডাবিং-এ কণ্ঠ দেন।

ভারতে প্রদর্শনের জন্য নতুন সোভিয়েত চলচ্চিত্র

সোভিয়েত চলচ্চিত্র রপ্তানিসংস্থা "সোভেক্সপোর্তফিল্ম"-এর স্থায়ী

প্রতিনিধি ভারত সহ বিশ্বের ১০০-এরও বেশি দেশে রয়েছে।

সংস্থার এশীয় বিভাগের অধিকর্তা লেভ পোলিয়াকভ জানান যে, ভারতে প্রদর্শনের জন্য সম্প্রতি ৯টি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের ফিচার ছবি মস্কো থেকে প্রেরিত হয়েছে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর ও ভারতের অন্যান্য শহরে ছবিগুলি দেখান হবে।

এই নতুন ফিল্মগুলির মধ্যে রয়েছে "ডেড সিজন" ছবিটি। মিনস্কে অনুষ্ঠিত চতুর্থ সারা সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পুরস্কার লাভ করে। ১৮ মাস আগে ছবিটির মুক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৯ কোটি দর্শক ছবিটি দেখেছে। নয়া-ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এক কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তোলা।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় তোলা দুখানা ছবি ভারতীয় দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। একটি হল তাসখন্দের উজবেক ফিল্ম স্টুডিওতে তোলা "ফারহাদ'স ফীট" এবং তাজিক ফিল্ম স্টুডিওতে তোলা "হোয়াইট গ্র্যান্ড পিয়ানো"। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কাহিনী নিয়ে ছবি দুটি তোলা।

আরও দুটি ছবি "ফার ইন দি ওয়েস্ট" এবং "ওয়ান চান্স আউট অব এ থাউসেন্ড"-এর কাহিনীও ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিগত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হয় লিও তলস্তয়ের "আনা কারেনিনা"র চিত্ররূপ। এখন সেটি সাধারণ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হবে।

'প্রতিবাদ' ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মৌসুমী

দিল্লী চলচ্চিত্র উৎসবের আন্তর্জাতিক জুরিতে ছিলেন সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক আলেকজান্দর যার্কি। ইনিই "কারেনিনা" ছবির পরিচালক।

বর্তমানে প্রেরিত নতুন সোভিয়েত ছবির মধ্যে রয়েছে তলস্তয়ের "ওয়ার এ্যান্ড পীস"-এর তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড। ভারতীয় দর্শকরা এবারে তা প্রথম দেখতে পাবেন। ফিওদোর দস্তয়েভস্কির "ব্রাদার্স কারামাজোভ"-এর চিত্ররূপও দেখান হবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা পরিচালক আইভান পীরীয়েভ।

রবিতীর্থের "বিদায়-অভিশাপ"

আগামী ৯ই ও ১৬ই আগস্ট রবীন্দ্র সদনে রবিতীর্থের শিল্পিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের "বিদায়-অভিশাপ" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরী। নৃত্য পরিকল্পনায় আছেন রামগোপাল ভট্টাচার্য। আবহ সঙ্গীতে ও আলোকসম্পাতে আছেন যথাক্রমে দীনেশ চন্দ ও তাপস সেন।

ইউথ্ পাপেট্ থিয়েটার, ইন্ডিয়া

অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও ছোটদের বাৎসরিক অঙ্কন, আবৃত্তি, কণ্ঠসঙ্গীত ও রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন 'ইউথ্ পপেট্ থিয়েটার' আগামী ২২শে ও ২৩শে আগস্ট সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে। এই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন বয়ঃক্রমে তিনটি বিভাগে যথাক্রমে আট, বারো, যোল বছর অনূর্ধ্ব ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও সংস্কৃতিতে সমানভাবে উৎসাহিত করার জন্যে গত কয়েক বৎসর ধরে এই প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত। এ সম্পর্কে খবরা-খবর পাওয়া যাবে ১৩৮, শরৎ বোস রোডস্থিত (কলিকাতা-২৯) ট্রেনিং সেন্টারে সন্ধ্যা ৬টা ও ৯টার মধ্যে।

'পবিত্র পাপী' হিন্দী ছবিতে তনুজা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৩২ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংলণ্ড সফরের সময় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতের ক্রিকেট উৎসাহীরা, যে আশার আলোর সন্ধান তাঁরা পেয়েছিলেন ঐ সময়ে—১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড দলের ভারত ভ্রমণের সময় তা যেন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল।

মিটলো না আমাদের কোন আশা। ব্যাট-বলের লড়াই-এ বড়াই করার মতো আমাদের কিছুই থাকলো না। বম্বে, কলকাতা আর মাদ্রাজ—এই তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে হেরে গেল ভারত, আর শুধু সময়ের অভাবেই কলকাতা টেস্টে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেল ভারত।

ভারত ভালো খেলতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু একটি শিশু দলের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও ছিল একটু যেন বেশিই।

তবু ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড দলের ভারত ভ্রমণকে কেন্দ্র করে পাই নি-পাই নি করেও আমরা পেয়েছিলাম যা, তাও খুব একটা কম নয়। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেবারের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার লালা অমরনাথ আর বিজয় মারচেন্ট। স্লো বোলার হিসেবে মুস্তাক আলী কিম্বা সি· এস· নাইডু কোন অংশেই কম ছিলেন না।

লাভ-ক্ষতির হিসেবের দিকে তাকালে লাভের অঙ্ক শূন্য হলেও অমরনাথ, মারচেন্ট, মুস্তাক কিম্বা সি· এস· নাইডু যে মস্ত বড় পাওনা, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

বম্বের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার পর অমরনাথ তখনো খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তবু অমরনাথের খেলার ধারা, ব্যাটিং-এর নৈপুণ্য তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলের মনে এনে দিয়েছিল আস্থার ভাব।

খুব একটা বেশি রান না করলেও মারচেন্ট প্রত্যেকটি খেলায় শুধুমাত্র সুন্দরভাবে ব্যাটিং-ই করেন নি—দর্শক এবং কর্তৃপক্ষকেও পেরেছিলেন সন্তুষ্ট করতে। বিজয় মারচেন্ট যে হবেন ক্রিকেটজগতে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিদর্শন তা তখন তাঁর খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছিল।

মুস্তাক আলী সেই সময় ভারতের অন্যতম সেরা স্লো বোলার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসেবে মুস্তাকের পরিচয় তখনো পাওয়া যায় নি। সি· এস· নাইডু কোন দিক দিয়ে সি· কে'র সমকক্ষ না হলেও ব্যাটিং এবং বোলিং-এ তিনি তখনই দেখিয়েছিলেন অভাবনীয় নৈপুণ্য।

এই ছিল ভারতের লাভের অঙ্কের সবচেয়ে বড় পাওনা। কিন্তু এ ছিল প্রত্যক্ষ পাওয়া, পরোক্ষে আরো বড় পাওয়া যে আমরা তখনই পেয়ে গেছি, তার পরিচয় ঠিক তখনই পাওয়া যায় নি। ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড দলের ভারত সফরে সেইটাই ছিল ভারতের কাছে সবচেয়ে বেশি লাভের বিষয়।

সেবার ইংলণ্ড তিনটি টেস্ট ম্যাচ সহ অংশগ্রহণ করেছিল মোট ৩৪টি খেলায়। আর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ায় রাতারাতি ক্রিকেট খেলা ভারতের জনসাধারণের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

রাজা-রাজরাদের খেলা তখন ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে, নিজের কাছে টানতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষকে। মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা তখন আরম্ভ করেছেন ক্রিকেট খেলতে। তবে এ ব্যাপারে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি।

এর মধ্যে জামনগরের জামসাহেব, পাতৌদির নবাব, পাতিয়ালা, বরোদার মহারাজা, ভিজিয়ানাগ্রামের রাজকুমার, পোরবন্দরের মহারাজা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা নিজেরা যেমন খেলেছেন, তেমনি খেলার জন্যে ব্যয় করেছেন অজস্র অর্থ, তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁদের খেলার সব রকম সুযোগ সুবিধে। আর অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা এঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁদের প্রাপ্য সম্মান।

ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তাই সেকালের রাজা-রাজরাদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সত্যি কথা বলতে কি ভারতীয় ক্রিকেটকে তাঁরাই নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্ব-ক্রিকেটের দরবারে। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, ১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড ভ্রমণের কথা বললেই বোঝা যাবে যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলাকেই ভালোবাসতেন না—তাঁরা জানতেন

গুণীর আদর করতেও। ১৯৩২ সালের ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন পোরবন্দরের মহারাজা। তিনি জানতেন সি· কে· নাইডু তাঁর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য খেলোয়াড়। তাই ভারত যখন লর্ডস মাঠে প্রথম টেস্ট খেলায় অংশগ্রহণ করলো, তখন তিনি নিজে না খেলে সি· কে· নাইডুর ওপরই দিলেন ভারতীয় দল পরিচালনার ভার। শুধু তাই নয়, পোরবন্দরের মহারাজার জন্যেই ভারতের প্রথম টেস্ট খেলার অধিনায়কের সম্মান লাভ করার সুযোগ পেলেন সি· কে· নাইডু। অথচ পোরবন্দরের মহারাজা ইচ্ছে করলেই ঐ ঐতিহাসিক সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন।

যাই হোক, ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড দলের ভারত ভ্রমণের পর ইংলণ্ড যে ২—১ টেস্টে জিতে রাবার নিয়ে গেল, তার জন্যে কারো এতোটুকুও দুঃখ নেই। কারণ জার্ডিনের শক্তিশালী দলের খেলা দেখে এবং ভারতীয় খেলোয়াড়দের লড়াই করার শক্তির পরিচয় পেয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাছে ক্রিকেট খেলা নিজের স্থানটি তখন পাকা করে নিয়েছে।

কিন্তু তখনো ছিল আসল কাজটুকুই বাকী। ক্রিকেট খেলাকে সর্ব-ভারতীয় ঐক্যে একটি সংস্থার মাধ্যমে তখনো কাছাকাছি টেনে আনা হয় নি। কিন্তু তার প্রয়োজন যে কতো তা বুঝতে তখন আর কারো বাকী ছিল না। ভারতের শিশু-ক্রিকেটকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাবার চিন্তায় তাই তখন মেতে উঠলেন ক'জন সত্যিকারের ক্রিকেট-উৎসাহী। তাঁদের উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সে কাজও একদিন সারা হলো। কিন্তু তার আগে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। সেই ঘটনাগুলো ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে গেল আরো অনেকখানি। সেই কথাই বলতে হবে সবার আগে।

[চলবে]

ম্যাচের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচের স্কোর-বোর্ড নিম্নে দেওয়া হল :—

ইংলণ্ড

১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
এ এইচ বেকওয়েল ক সি এস নাইডু ব অমরনাথ---	৮৫	---ক পাতিয়ালার মহারাজা ব অমর সিং	৪
ওয়ালটারস এল বি ডবলিউ ব অমর সিং---	৫৯	---ক সাবষ্টিটিউট ব অমরনাথ	১০২
মিচেল এল বি ডবলিউ ব অমরনাথ---	২৫	---ক ও ব অমরনাথ	২৮
ল্যাঙ্গরিজ এল বি ডবলিউ ব অমর সিং---	১	---ক দিলওয়ার হাসান ব নাজির আলী	৪৬
জার্ডিন ক ওয়াজির আলী ব অমর সিং---	৬৫	---অপরাজিত	৩৫
বারনেট ক পাতিয়ালার মহারাজা ব অমর সিং---	৪	---ক মুস্তাক আলী ব নাজির আলী	২৬
নিকলস ব অমর সিং---	১	---ক দিলওয়ার হাসান ব নাজির আলী	৮
টাউনসেণ্ড ব অমর সিং---	১০	---ক সি কে নাইডু ব নাজির আলী	৮
ভেরিটি এল বি ডবলিউ ব মুস্তাক আলী---	৪২		
ইলিয়ট ক মুস্তাক আলী ব অমর সিং---	১৪		
ক্লার্ক অপরাজিত---	৪		
অতিরিক্ত (বা ২২, লে বা ২, নো ১)	২৫	(বা ১, লে বা ১)	৪
	৩৩৫	(৭ উইকেটে)	২৬১

বোলিং

	১ম ইনিংস		২য় ইনিংস
অমর সিং	৪৪·৪ - ১৩ - ৮৬ - ৭	------	২৩ - ৬ - ৫৫ - ১
সি কে নাইডু	১১ - ১ - ৩২ - ০	------	৯ - ০ - ৩৮ - ০
অমরনাথ	৩১ - ১৪ - ৬৯ - ২	------	১১·৫ - ৩ - ৩২ - ২
মুস্তাক আলী	২৫ - ৩ - ৬৪ - ১	------	৪ - ০ - ১৬ - ০
সি এস নাইডু	১৩ - ১ - ৪৩ - ০	------	২ - ০ - ১৭ - ০
জিওমল	৬ - ০ - ১৬ - ০	------	------------
ওয়াজির আলী	১ - ১ - ০ - ০	------	৩ - ০ - ৩৬ - ০
নাজির আলী	------------	------	২৩ - ০ - ৮৩ - ৪

ভারত

১ম ইনিংস			২য় ইনিংস	
দিলওয়ার হাসান	ক বারনেট ব ভেরিটি	১৩	--- ব ল্যাঙ্গরিজ	৬০
নিওমল জিওমল	আহত হয়ে অপসৃত	৫	--- ব্যাট করেন নি	৩
ওয়াজির আলী	ব নিকলস	২	--- ষ্টাঃ ক মিচেল ব ভেরিটি	২১
সি কে নাইডু	ব ভেরিটি	২০	--- ষ্টাঃ ইলিয়ট ব ভেরিটি	২
অমরনাথ	ক ইলিয়ট ব ল্যাঙ্গরিজ	১২	--- নট আউট	২৬
মারচেণ্ট	ব ভেরিটি	২৬	--- ক ও ব ভেরিটি	২৮
পতিয়ালার মহারাজা	ব ভেরিটি	২৪	--- ক ইলিয়ট ব ল্যাঙ্করিজ	৬০
নাজির আলী	ক মিচেল ব ভেরিটি	৩	--- ক নিকলস ব ল্যাঙ্গরিজ	৮
সি এস নাইডু	ক নিকলস ব ভেরিটি	১১	--- ষ্টাঃ ইলিয়ট ব ভেরিটি	০
মুস্তাক আলী	নট আউট	৭	--- ক মিচেল ব ভেরিটি	৮
অমর সিং	ক বারনেট ব ভেরিটি	১৬	--- ক বারনেট ব ল্যাঙ্গরিজ	৪৮
অতিরিক্ত (বা ১, লে বা ৩, নো ২)		৬	--- (বা ১০, লে-বা ১, নো ১)	১২
		১৪৫		২৪৯

বোলিং

	১ম ইনিংস		২য় ইনিংস
ক্লার্ক	১৫ - ৪ - ৩৭ - ০	------	৮ - ২ - ২৭ - ০
নিকলস	১২ - ৩ - ৩০ - ১	------	৬ - ১ - ২৩ - ০
ভেরিটি	২৩·৫ - ১০ - ৪৯ - ৭	------	২৭·২ - ৬ - ১০৪ - ৪
ল্যাঙ্গরিজ	৬ - ১ - ৯ - ১	------	২৫ - ৫ - ৬৩ - ৫
টাউনসেণ্ড	৩ - ০ - ১৪ - ০	------	৩ - ০ - ১৯ - ০
বারনেট	------------	------	১ - ০ - ১ - ০

অন্তিম মুহূর্তে কলকাতার ফুটবল

দিন দিন যে পরিস্থিতির মুখোমুখি কলকাতার ফুটবলকে হতে হচ্ছে তা শুধুমাত্র হতাশাব্যঞ্জকই নয়, অত্যন্ত অসহনীয়ও বটে। সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতার ফুটবল আজ সেই অসহনীয় অবস্থার মধ্যেই এসে পড়েছে। খেলা আজ খেলা নয়, ফুটবল খেলার উৎকর্ষ কিম্বা খেলা দেখার নির্মল আনন্দলাভ করার আশা নিয়ে আজ বোধ হয় আর কেউই মাঠে যান না। খেলা যেমনই হোক না কেন, বড় দলদের সব সময় জিততেই হবে। প্রতিপক্ষ দল যদি ভালোও খেলে, তা হলেও কোন কথা নেই—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহমেডান স্পোর্টিং পয়েণ্ট নষ্ট করবে—আর তাই কিনা মেনে নেবেন দর্শকরা! আর তাঁরা তা' সত্যিই নিচ্ছেন না—তাই খেলাও আজ আর খেলা নেই। ফুটবল খেলার নামে চলেছে অদ্ভুত একটা জেদাজেদির লড়াই। এই লড়াই-এর হাওয়ায় গা মিলিয়ে কলকাতা ময়দানের মেজো, সেজো, ছোট কয়েকটি দল যখনই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন না, তখনই বাধে গোলমাল। শেষ পর্যন্ত হয়তো তার ফলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়, পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস কিছুই বাদ যায় না। এই বছর যেন এই সব ব্যাপার-স্যাপার অন্য বছরের তুলনায় বেশ বেশিই হচ্ছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান স্পোর্টিং—কেউই এর আওতার বাইরে নয়। সত্যি কথা বলতে কি—এই তিনটি দলের সমর্থকরা খেলা দেখতে যান না—তাঁরা মাঠে যান যে-করে হোক নিজের-নিজের দলের জন্যে দু'টি করে পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে। এই পয়েণ্ট সংগ্রহে একটু বাধা পড়লেই খেলার মাঠে বেধে যায় তুলকালাম কাণ্ড।

যা সেদিন বাধলো ইস্টবেঙ্গল বনাম পোর্ট কমিশনারস দলের খেলার সময়। খেলা শেষ হবার বারো মিনিট আগে পর্যন্ত গোল দিতে পারে নি ইস্টবেঙ্গল—এই অপরাধে মাঠে পড়তে লাগলো ঢিলের পর ঢিল। সে ঢিলের লক্ষ্য ছিল খেলোয়াড় আর লাইনসম্যানরা। শেষ পর্যন্ত খেলা তো বন্ধ হলোই, আর মধ্যে পড়ে পুলিশের হাতে নাকাল হলেন নিরীহ দর্শকরা। সেদিন খেলার মাঠে পুলিশ যে ভূমিকা নিয়েছিল তার জন্যে শুধু জবাবদিহিই নয়, পুলিশের উচিত আহতদের ক্ষতিপূরণ করা। এরিয়ান্স ক্লাবের সভ্যদের আসনে আর এক টাকার দৈনিক টিকিটের স্ট্যাণ্ডে পুলিশ কেন অমন নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করলো? কে হুকুম দিয়েছিলেন ঐ জঘন্য কাজের? মেম্বাররা খেলা দেখতে গিয়ে মার খেলেন, দর্শকরা টিকিট কেটে মার খেয়ে এলেন। আর যারা সত্যিকারের গোলমাল করে ছিল, তারা বিনা বাধায় সরে পড়লো—ভাবতেও খারাপ লাগে। আর ঠিক তখনই এই একটা কথাই মনে হয় যে, এই যদি পরিস্থিতি হয়, এই যদি অবস্থা দাঁড়ায়, তাহলে অন্তত এক বছরের জন্যে কলকাতার ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেওয়া হোক। আর যাই হোক, খেলার নামে ছেলেখেলা বছরের পর বছর আর বুঝি সহ্য করা যায় না। বড় ক্লাব আর দর্শকরা যদি এর প্রতিকারে এগিয়ে না আসেন, তাহলে আজ না হোক, কাল কলকাতার ফুটবল খেলা বন্ধ হবেই হবে। কারণ কলকাতার ফুটবল এখন অন্তিম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

কমনওয়েলথ গেমস

এবারের কমনওয়েলথ গেমস-এর আসর শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি পদক পেয়ে অস্ট্রেলিয়া লাভ করেছে প্রথম স্থানটি। দ্বিতীয় স্থান গ্রেট-ব্রিটেনের। ভারতের স্থান পঞ্চম। ভারতীয় কুস্তিগীরদের কল্যাণে ভারতের ভাগ্যে জুটেছে পাঁচটি স্বর্ণপদক। সত্যি কথা বলতে কি, কমনওয়েলথ গেমস-এ ওঁরাই ভারতের মান রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় যে, ভারোত্তোলন বিভাগে প্রতিযোগী নির্বাচন যদি আরো সতর্ক-ভাবে ও আন্তরিকতার সংগে করা হতো তাহলে ভারতের ভাগ্যে আরো কয়েকটি পদক হয়তো বা জুটলেও জুটতে পারতো।

ও কথা থাক। ভারতের ১৪ বছর বয়স্ক কুস্তিগীর বেদপ্রকাশ প্রথম স্বর্ণপদকটি পেয়ে ভারতের কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। অল্প বয়সের জন্যে এবারকার প্রতি-যোগিতায় দিল্লীর একটি স্কুলের ছাত্র বেদপ্রকাশের যোগদানের বিষয়টি বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। ভারতের ভাগ্য ভালো যে, শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয় নি।

যাই হোক, এবারকার প্রতিযোগিতায় পদকলাভকারী ভারতীয় দলের প্রতি-নিধিদের নাম দেওয়া হলো—

কুস্তি—

লাইট ফ্লাই ওয়েট : বেদপ্রকাশ (প্রথম)
ফ্লাই ওয়েট : সুদেশকুমার (প্রথম)
ফেদার ওয়েট : হরিশচন্দ্র (প্রথম)
ওয়েল্টার ওয়েট : মুখতিয়ার সিং (প্রথম)
লাইট ওয়েট : উদয়চাঁদ (প্রথম)
মিডল ওয়েট : রণধাওয়া সিং (তৃতীয়)
লাইট হেভি ওয়েট : মারুতি মানে (দ্বিতীয়)
লাইট হেভি ওয়েট : সজ্জন সিং (দ্বিতীয়)
হেভি ওয়েট : বিশ্বনাথ সিং (দ্বিতীয়)

ভারোত্তোলন—

ফেদার ওয়েট : এ্যান্টনি নেভিস (তৃতীয়)

ট্রিপল জাম্প—

: মহীন্দার সিং (তৃতীয়)

বক্সিং—

ওয়েল্টার ওয়েট : শিবাজী ভোঁসলে (সেমি-ফাইন্যাল)

গল্প হলেও সত্যি

ওয়েস্ট ইন্ডিজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক যাদুকর ক্রিকেটার যাঁর নাম লিয়ারি কনস্ট্যানটাইন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ব্যাটিং এবং বোলিং-এর পরি-সংখ্যান হলো ১৮টি টেস্টে ৬৪১ রান এবং ৫৮টি উইকেট। পরিসংখ্যান দেখে খেলা মন্দ হলেও লিয়ারির খেলা দেখে তাঁকে যাদুকর বলতে একটুও বাধে না। ১৯২৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ড সফরে আসে। মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে খেলার আগে হ্যামস্ট্রিং পেশীর টান ধরার জন্য ডাক্তার লিয়ারিকে খেলতে নিষেধ করেন। কিন্তু ডাক্তারের মানা অমান্য করেই খেলতে নামেন। কারণ তখন দলের রান ছিল ৫ উইকেটে ৭৯। এমন অবস্থায় ব্যাট করে এক ঘণ্টায় সংগ্রহ করেছিলেন ৮৬ রান।

মিডলসেক্সের দ্বিতীয় ইনিংসে বল করে ১১ রানের বিনিময়ে লাভ করেন ৬টি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার তাদের বিপর্যয়। কিন্তু লিয়ারি একাই যেন একটি দল। আবার ব্যাট করে করলেন শতরান, সময় মাত্র এক ঘণ্টা। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ উইকেটে জিতে গেলো।

—পরিতোষ দাস
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি

॥ বিজয়-সম্বর্ধনা ॥
পাঁচটি স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় কুস্তিগীর দল দিল্লীতে ফিরে এলে আর্থিক পুরস্কার প্রদান সম্বর্ধনায় তাঁরা সম্বর্ধিত হন। ছবিতে ১৪ বছরের বালকবীর বেদপ্রকাশ ও সুদেশকুমারকে কাঁধে চাপিয়ে জনগণ আনন্দে মেতে উঠেছেন।

প্রশ্ন-উত্তর

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় (ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১)

প্রশ্ন : ৯ই জুলাই সংখ্যায় যে লিখেছেন, মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলাটা অনুষ্ঠিত হতে না পারার দরুণ যে টাকা রয়ে গেছে সে টাকাগুলো দিয়ে দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হোক—এই প্রস্তাব আমি মনে-প্রাণে সমর্থন করি। আমাদের পাড়া থেকে যাঁরা খেলা দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও ঐ একই কথা।

উত্তর : ধন্যবাদ। এবার আপনারা এগিয়ে এসে দলগতভাবে এই সাহায্য ভাণ্ডার খোলার জন্যে চাপ দিন। কারণ আমরা যতোই লিখি না কেন, আপনারা এগিয়ে না এলে কিছু হবে না।

শুকদেব সরকার (ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং দলের কে কোন্ দলের বিরুদ্ধে কত পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে?

উত্তর : আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অশোককুমার মল্লিক (বেলদা, মেদিনীপুর)

উত্তর : তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ভাই এভাবে অনুশীলন করে যাও। আন্তরিকতা আর ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ করবে।

সুব্রতা দে (ফকিরচাঁদ ঘোষ লেন, হাওড়া—৩)

উত্তর : এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমরা তো সাধারণত দিই না। আপনি যদি খেলাধুলোর ওপর প্রশ্ন পাঠান তাহলে ভালো হয়।

ভারতীয় ফুটবল দল আবার গেছে কুয়ালালামপুর—মারডেকা টুর্নামেণ্টে খেলতে। একজন ভারতীয় হিসেবে যথেষ্ট আশা করা উচিত ভারতীয় দলের সাফল্য সম্পর্কে। কিন্তু তা কি সত্যিই করা সম্ভব? সত্যিই কি আশা করবার কিছু আছে? ১৯৬৪ সালের পর থেকে আশা করবার মত কিছু কি ভারতীয় ফুটবল দল দেখাতে পেরেছে দেশে কিম্বা বিদেশের মাটিতে? না, পারে নি। কিন্তু কেন পারে নি তা নিয়ে বোধ হয় আমাদের কর্মকর্তাদের কেউ কোনোদিন অনুসন্ধানও করেন নি। আর সেইজন্যই
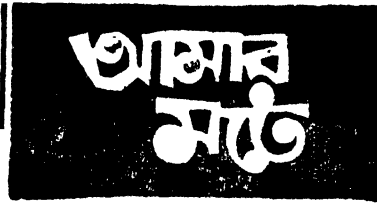
বোধ হয় ভারতীয় ফুটবলের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা অন্যবারের মত এবারও দায়সারাগোছের মত করে একটি টিম ওখানে পাঠিয়েই খালাস। আশ্চর্য! প্রতিবাদ করবার মত একটি লোকও কি নেই ওই কমিটিতে?

প্রদীপ, চুনী, বলরাম, অরুণ, জার্নেল, থঙ্গরাজ প্রমুখের পর সত্যিকারের স্কিলড ফুটবলার আমরা আর পাই নি। কিন্তু যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রতিই কি সুবিচার করা হয় সব সময়ে! এবারের কথাই ধরা যাক! বোম্বাইতে ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলা থেকে যাঁরা চান্স পেয়েছেন, তাঁদের অনেকের থেকেই যোগ্যতর খেলোয়াড় সুযোগ পান নি। এঁরা যে কোন্ অগ্রাধিকার বিচারে সুযোগ পেলেন না, বুঝতে পারলাম না।

প্রশিক্ষক হিসেবে মহঃ বাগা এবং প্রদীপ ব্যানার্জীর নির্বাচনকে এতটুকুও হেয় না করেও বলতে চাই যে, বাংলা তথা ভারতের আরেক স্বনামধন্য কোচ—শ্রীঅমল দত্ত দারুণভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন। কারণ কি জানি না। ভালো ফলাফল দেখাতে গেলে টিম-স্পিরিট সব থেকে আগে দরকার। এক্ষেত্রে অমল দত্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। যে টিমই তৈরি হোক, আর যিনিই প্রশিক্ষকরূপে যান, ম্যানেজারের গুরু-দায়িত্বটা কিন্তু প্রধান প্রশিক্ষকের ওপরই দেওয়া উচিত। আই. এফ. এ একাদশের বিগত তেহরান সফরের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলতে হচ্ছে। ব্রাজিল, ইংল্যাণ্ড, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দলের যিনি প্রধান প্রশিক্ষক, তিনিই ম্যানেজার। ভিন্ন ব্যক্তি হলে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ খেলোয়াড়দেরই করে বিভ্রান্ত।

এ. আই. এফ. এফ কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন একটু ভেবে-চিন্তে যা করার তাই করেন। আর যাই হোক, দেশের মান-সম্মান নিয়ে ছেলেখেলার অধিকার তাঁদের কেউ দেয় নি।

রজত চ্যাটার্জী

অরুণকুমার কীর্তন্যা (রঘুনাথপুর, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং—এই তিনটি দল কে কতোবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর এর আগে বেশ কয়েকবার দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, আমাদের ফুটবল বিশেষ সংখ্যায় আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

কিশু সেনগুপ্ত (জামসেদপুর)

উত্তর : আশা করি—কেন আমরা ঐ বিশেষ প্রশ্নের উত্তরটি ঐভাবে দিয়েছিলাম তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন।

সাপ্তাহিক বসুমতীর 'খেলাধুলো' বিভাগটা আপনার কেমন লাগছে এবং আর কি কি হলে বিভাগটা আরো ভালো হয়—সেই সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে পারলে খুশি হবো।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

—সূচীপত্র—

২-রা অক্টোবর থেকে দেখান হবে

জেমিনীর

সমাজ কো বদল ডালো

ইস্টম্যানকলার-জেমিনী

গতকাল, আজ এবং আগামীকালের ভাবনা সম্বলিত কাহিনী

প্রেতের সঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা • জয়ন্তী সেন

বৃহস্পতিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
৭৫ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 13th August, 1970

অমরলোকে মহারাজ

বীর বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানায়ক, ভারতেতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল মহাপুরুষ মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী শহীদ-দিবসের স্মরণ মুহূর্তের প্রাক্কালে ৮২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ইহা ঠিকই যে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু লোকচিত্তে মহারাজের সিংহাসন যুগ যুগ ধরে সুগভীর শ্রদ্ধা ও পরম সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে বিস্ময়কর কর্মোন্মাদনা. অতুলনীয় ত্যাগ, আশ্চর্য দেশপ্রেম, সুদৃঢ় সবল চরিত্র, নিবিড় মানবপ্রেম এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানব মৈত্রীর জীবন্ত প্রতীকরূপে অশীতিপর বয়সেও তিনি আমাদের ঘুম ভাঙাবার প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর জীবনের আকস্মিক ছেদ ঘটায় দেশ ও দশের পক্ষে তা কতোটা বেদনাদায়ক—সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য এই বিরাট উপমহাদেশের, দুর্ভাগ্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যথাবিক্ষুব্ধ মানুষের। আমরা যে সময় নেতাদের শূন্যগর্ভ বক্তৃতায় নিস্পৃহ হয়ে উঠছিলাম এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমশ শঙ্কিত হচ্ছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের আশার আলো দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন একালের একমাত্র একজনই—আর তিনি স্বয়ং মহারাজ চক্রবর্তী। এবং তা বক্তৃতার ঝড়ে নয়, শুধু অপরিমেয় ভালোবাসার তাড়নায়। আশা করা গিয়েছিল, দেশের যুবশক্তিকে আবার তিনি পথ দেখাবেন, তাদের চরিত্র গঠনের তিনি হবেন পূজ্য সহায়ক। সেই আশা অপূর্ণই থেকে গেল। তবু মহারাজের প্রতি সাধারণ মানুষের, মতনির্বিশেষে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শবোধ আজো সঞ্চারিত হয় বলেই তাঁর মহাযাত্রায় হাজার হাজার অগণিত মানুষ জানিয়েছে তাদের অকপট শ্রদ্ধা।

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ ভারতে আসেন গত ২৪শে জুন চিকিৎসা উপলক্ষে। একালের মানুষ যে মহারাজকে একেবারে ভুলে যায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহারাজকে নিকটে লাভ করে তাদের চিত্ত কিভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে! এই আলোড়নের আগেকার ইতিহাসটুকুও আজ আমাদের ব্যথাতুর স্মৃতিতে বার বার জেগে উঠছে।

বছর দুয়েক আগে মহারাজ যখন ময়মনসিংহের স্বগ্রামে থেকে পূর্ব বাংলার সমগ্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কাজ করে চলেছেন এবং ভারতের কাগজগুলিতে তাঁর সম্পর্কিত সংবাদ যখন কদাচিৎ প্রকাশিত হয়, তখন আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে জানলাম যে, মহারাজ আমাদের পত্রিকার শুধু গুণগ্রাহীই নন, পরম হিতৈষী। ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীর একটি সংখ্যা শুধু তাঁর সগর্ব অভিনন্দনই লাভ করে নি, তিনি পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেককেই ডেকে দেখিয়ে বলেছিলেন, তিনি যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চান, তা গ্রহণ এবং প্রচার করার মতো পরিশীলিত মনের অভাব আজো নেই। সেদিন ঐ কথা শুনে আমাদের গর্ব ও বাঁধনহারা হলে, আমরা তাঁকে তাঁর স্বলিখিত জীবনকাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার জন্য 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে দিতে অনুরোধ জানাই। তিনি আমাদের অত বড় প্রার্থনা রাখবেন—তা ভাবাও ছিল অসম্ভব। কিন্তু তিনি আমাদের নিরাশ করা তো দূরের কথা, তাঁর জীবন-কথা বরং আশাতীতভাবে দ্রুততার সঙ্গেই আমাদের দিয়েছিলেন। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পাঠকদের কাছে সেই অমূল্য জীবন-কথা অজানা নয়—যা শতবার পড়লেও প্রতিবারই রোমাঞ্চ জাগে। তবু ঘটনাটি নিবেদন করলাম এই কারণে যে, মহারাজের বিরাটত্বের মধ্যেও ছিল কী গভীর সৌজন্যবোধ। আর ঘটনার পূর্বাপর প্রসঙ্গ স্মরণ করে আমরা আমাদের ঋণ স্বীকার করছি মহারাজের কাছে—যে ঋণ সমস্ত দেশ ও জাতি চিরকাল ধরে বহন করে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের পথে।

ওড়িশার রাজনীতি বলতে একদিন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে বোঝাতো। সারা রাজ্যের রাজনীতি যেন তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, আজও তাঁর একটি ঘোষণায় ওড়িশার রাজনীতি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। ডঃ মহতাব জন কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ওড়িশা বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগের সংকল্পও তিনি ঘোষণা করেছেন। জন কংগ্রেস থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন বিধানসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন করতে। মজার কথা এই যে, জন কংগ্রেস ওড়িশা বিধানসভার সরকার-বিরোধী দল নয়; কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরিক জন কংগ্রেস। তার অপর সহযোগী হলো স্বতন্ত্র দল এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সিংদেও স্বতন্ত্র দলেরই নেতা। কিন্তু প্রবীণ রাজনীতিকের এ-হুমকি অপেক্ষাকৃত তরুণ মুখ্যমন্ত্রী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। বিধানসভা তো ভাঙছেনই না, মধ্যবর্তী নির্বাচনেরও কোনো আশা নেই এখানে। এমন কি, জন কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও বিধানসভা বাতিল করার প্রশ্নে গুরুতর মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ যে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তিনি একদিন ছিলেন, তার সে-ধার যেন আজ খানিকটা ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

ওড়িশায় জন কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার কৃতিত্ব ডঃ মহতাব অবশ্যই দাবি করতে পারেন। কিন্তু আজ কেন তিনি তাঁর হাতে গড়া সংসার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চাইছেন? জন কংগ্রেস-স্বতন্ত্র বিরোধ অবশ্য মাস কয়েক আগেও একবার দেখা দিয়েছিল এবং তখনও জন কংগ্রেস কোয়ালিশন ত্যাগের হুমকি দিয়েছিল বলে সরকারের সামনে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল এবং সেবার যেমন সিংদেও'র মাথার ওপর দিয়ে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, এবারও তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের জীবনে

ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব

দলত্যাগের অতীত নজীরও রয়েছে অবশ্য। ১৯৬৫ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়েছিলেন, যে-কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় তিন দশকের। শুধু ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেসেরই তিনি প্রধান ছিলেন না, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতাদেরও তিনি ছিলেন অন্যতম। দেশ স্বাধীন হবার আগে তিনি একাদিক্রমে আট বছর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন—সে গৌরব খুব কম নেতার কপালেই জুটেছে।

১৯২৪ সাল থেকেই ডঃ মহতাব ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেসের একজন প্রথম সারির নেতা। সেই থেকে কংগ্রেসের বহু দায়িত্বশীল পদে তাঁকে দেখা গেছে। দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যেমন তাঁর কর্মতৎপরতা দেখা গিয়েছে, তেমনি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পদ ডঃ মহতাব অলংকৃত করেছিলেন। বস্তুত ১৯৪৭-৫০ পর্যন্ত একবার মুখ্যমন্ত্রিত্ব করার পর ১৯৫৭ সালে তাঁরই ডাক পড়ে সরকার গঠনের দায়িত্ব নেবার। এ-পদে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিলেন দ্বিতীয় দফায়। এর পর তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে কিছুকাল বোম্বাই রাজ্যের গভর্নরের দায়িত্বও ডঃ মহতাবকে পালন করতে হয়েছিল।

ওড়িশায় কংগ্রেস দলকে যেমন তিনি সংগঠিত করেছিলেন, তেমনি তার ভাঙনের দায়ও কি তিনি সরাসরি অস্বীকার করতে পারবেন? নতুন চিন্তাধারা ও কর্মোদ্যোগ নিয়ে যখন ওড়িশা রাজনীতিতে তথা কংগ্রেসে তরুণ নায়ক বিজু পট্টনায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল, তখন সে-তারুণ্যকে কি তিনি স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন? বাস্তবপক্ষে বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে মতদ্বৈধতার কারণেই ডঃ মহতাব ১৯৬৫ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে জন কংগ্রেসের পত্তন করেন। চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি সেকেলে, পুরনো রক্ষণশীল চিন্তাধারারই বাহক।

৭১ বছরের বৃদ্ধ রাজনীতিক আজ আবার জন কংগ্রেস ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হলেন কেন? বিজু পট্টনায়ক এখন শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে নেই। সে-সুযোগে কি ডঃ মহতাব শাসক কংগ্রেসে ফিরে যেতে চাইছেন? তাঁর সম্পর্কে নাকি মুধোলকর রিপোর্ট দুর্নীতির তদন্তের সুপারিশ করেছে। তাই তিনি শাসক কংগ্রেসে ভিড়ে গিয়ে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হন নি তো? কে জানে, রাজনীতিতে অসম্ভব কিছুই নেই।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(২)

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, বিশেষ গেজেটে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে, দুপুরে সাড়ে বারটার সময়ে শপথ গ্রহণ করবে মন্ত্রিসভা, এমন সময়ে সরকারী ভবন থেকে সংবাদ এল—গভর্নর মহোদয় শ্রীযুক্ত বরদলৈ-র সঙ্গে বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করতে চান।

"গভর্নরের নাটকীয় আহ্বান বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য সকলে উৎসুকভাবে প্রতীক্ষারত রইল।

"গভর্নরের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বরদলৈর কী কথাবার্তা হল তা জানা যায় নি, কারণ সেগুলির বিষয়ে খুবই গোপনীয়তা রাখা হয়েছে।

"ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বরদলৈর অনুরোধে আসাম আইন-সভার অধিবেশন বসেছিল, যেখানে তিনি কোয়ালিশন সরকার গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেছেন। তারপরে স্পীকার (বসন্তকুমার দাস) ১২-১৫ মিনিটে অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ করে দেন।

"তার আগে বিরোধীপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে চেয়েছিল (মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবার আগেই), কিন্তু স্পীকার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

"আসাম আইনসভার মাননীয় স্পীকার আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) রাত্রি ৯টার সময়ে গভর্নর বাহাদুরের অনুরোধে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এক ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে একান্তে আলোচনা করেন।

"সাক্ষাৎকারের ফল গোপন রাখা হয়েছে।

"শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে রাষ্ট্রপতি বসুর কাছে ঘটনার রূপ ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রপতি বসুর শ্রীহট্ট হয়ে কলিকাতা যাত্রার কথা ছিল। বরদলৈ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে সহসা থামিয়ে দিয়ে যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই গুরুতর পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি বসু তার যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। তিনি মৌলানা আজাদের সঙ্গে টেলিফোনে পরামর্শ করেছেন।

"আসামের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত। জোর গুজবঃ আইনসভাকে বাতিল করে দেওয়া হবে। অবশ্য গুজবটি সমর্থিত হয় নি।

"গভর্নর সিমলার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।...

"রাষ্ট্রপতি বসু টেলিফোনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

"শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতায় ফিরবার জন্য স্বীয় বাসস্থান থেকে গৌহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন—অল্প দূর গিয়েই মন্ত্রিসভার গণ্ডগোলের সংবাদ পান এবং অবিলম্বে শিলঙে ফিরে আসেন।...

"কংগ্রেস সভাপতি টেলিফোনে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এবং সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন।...জানা গেছে, শ্রীযুক্ত দেশাই কংগ্রেস সভাপতিকে বলেছেন যে, স্পীকার অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনসভা বন্ধ করে সঙ্গত কাজই করেছেন।[১]

কংগ্রেস-পক্ষে এবং সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গোটা ব্যাপারটা তীরে এসে তরী ডোবার মত। অপরপক্ষে কংগ্রেসী মন্ত্রি-সভা হওয়া মানে ইউরোপীয়দের স্বার্থনাশ সম্ভাবনা। সুতরাং ইউরোপীয় দল যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, ঠিকভাবে বলতে গেলে চক্রান্ত করেছিল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের বিরুদ্ধে। ১৯ সেপ্টেম্বরের এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র ইউরোপীয় দল ও মুসলিম দলগুলির মধ্যে গোপন চুক্তির কথা বললেন, কিভাবে তারা অবিরত গভর্নরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপারটা পাকিয়ে তুলেছিল সে কথাও জানালেন। গভর্নরের বিরুদ্ধে সরাসরি না হলেও পরোক্ষ অভিযোগ তুললেন। সবশেষে, গভর্নরের বিচিত্র আচরণ কী ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংকট ঘনিয়ে তুলেছে তা পরিষ্কার করে দিলেনঃ "বিশেষ গেজেটের ঘোষণা অনুযায়ী সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গভর্নর গ্রহণ করেছেন এবং সেই জায়গায় পাঁচজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। শেষোক্ত মন্ত্রীরা যেহেতু এখনো শপথ নেন নি, সেই কারণে বিশেষ গেজেটের প্রকাশের পরে সরকার ছাড়াই আসাম চলেছে বলতে হবে। আমি তাই বলতে চাই, আসামে বর্তমানে আমরা যে নৈরাজ্যের মধ্যে বাস করছি, তার জন্য দায়ী মাননীয় গভর্নর মহোদয়।[২]

---

১ অমৃতবাজার, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল। ২১ সেপ্টেম্বর, দুপুর আড়াইটের সময়ে যখন উক্ত মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল—সুভাষচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিজয়ের মত ব্যাপারটি। ঐদিন সন্ধ্যায় জেল রোড ময়দানে এক সভায় সুভাষচন্দ্র মন্ত্রীদের সঙ্গে জনগণের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাঁচজন মন্ত্রীই সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। পরদিন সকালে তিনি শিলঙ ত্যাগ করলেন। ১৩ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর—এই সাত দিনের নাটক শেষ হল।

২১ সেপ্টেম্বর, যেদিন মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছিল, সেদিনই সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে কঠোর ভাষায় ইউরোপীয়দের আচরণের সমালোচনা করেছিলেন। সেই বিবৃতি নিম্নের শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল:

AN UNPROVOKED ATTACK
WAR ON CONGRESS
President Bose's Stern Warning to European Planters
Assam Ministerial Affairs
Congress Prepared to Take Up Challenge and 'Give a right Royal Battle.'

সুভাষচন্দ্র অন্যান্য কথার সঙ্গে বলেছিলেন:

"সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি এবং সবচেয়ে বেদনা পেয়েছি ইউরোপীয়দের আচরণে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার গঠন গোড়াতেই বানচাল করে দেওয়ার জন্য তাদের চেষ্টা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধঘোষণা ভিন্ন আর কিছু নয়। ভারতবর্ষের আর কোথাও ইউরোপীয় দল এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করে নি। আসাম আইনসভার ইউরোপীয় দল তাঁদের এই আচরণের অর্থ কী তা কি ভেবে দেখেছেন? কংগ্রেস দল এখন আসামে শাসনাধিকার পেয়েছে। সকল সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউরোপীয় চা-বাগানের মালিকদের সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কংগ্রেস দল আইনসভায় সকল দলের উদ্দেশেই বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছে। এই রকম মনোভাব দেখানোর পরেও যদি আসামের ইউরোপিয়গণ বিনা প্ররোচনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়ে—তার ফলাফলের দায়িত্ব তাদেরই। কংগ্রেসের পক্ষে বলতে পারি, বন্ধুত্বের আহ্বান যদি এমন অশালীনভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে কংগ্রেস জানে কি করে উপযুক্ত উত্তর দিতে হয়। কংগ্রেস সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে এবং দেখিয়ে দেবে লড়াই কাকে বলে। আসামের চা-বাগান সমিতি কী চায়? তাদের একটু ধীরসুস্থে ভেবে দেখতে বলছি। সারা ভারতের ইউরোপীয়দেরও একই কথা ভেবে দেখতে বলি।"

আসাম-সংকটে জড়িয়ে পড়ে সুভাষচন্দ্রের দিল্লী যাত্রায় দেরি হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ছিল। কলকাতায় বৃহস্পতিবার রাত্রে ফিরেই পরদিন দিল্লী ছুটলেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে দিল্লীর জন্য উড়লেন। শিলঙে দেরি হওয়ার জন্য প্লেনে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সর্বশেষ সংযোজন 'জিপসি মেজর' বিমান বিশেষভাবে ভাড়া করা হয়েছিল'; বিমানটি চালাবেন ফ্লাইং ক্লাবের পাইলট-ইনস্ট্রাক্টর মিঃ চিদাম্বরম। দমদম থেকে বিকেল ৫টায় ছেড়ে পরদিন বিকেল ৩টে-৪টের মধ্যে বিমানটির দিল্লী পৌঁছবার কথা। দিল্লী যাবার আগে সুভাষচন্দ্র সাংবাদিকদের কাছে নিজের আশার কথা জানিয়ে গেলেন—চক্রান্ত সত্ত্বেও বরদলৈ মন্ত্রিসভা স্থায়ী হবে এবং ভাল কাজ দেখাবে।

সুভাষচন্দ্রের শুভেচ্ছা সত্ত্বেও গোটা ব্যাপারটি সাধারণের কাছে খুবই জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল! একথা সত্য, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন মনে করে সাদুল্লা পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সুর্মা উপত্যকার যে ১১ জন মুসলমান সদস্য লিখিতভাবে সাদুল্লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেবার কথা জানিয়েছিলেন, তাঁরা পরে মত বদলান, যার জন্য গভর্নর যখন গোপনভাবে বরদলৈকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বরদলৈ তাঁকে বলেছিলেন—সেই মুহূর্তে তিনি কংগ্রেস পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারবেন না। গভর্নর তা হলেও বরদলৈকে সেই পর্যায়ে মন্ত্রিসভা তৈরী করতে বলেছিলেন, কারণ ইউরোপীয় সদস্যেরা নিরপেক্ষ থাকবে, এই ছিল তাঁর ধারণা।

এর পরেই কিন্তু গভর্নর নিজ ভূমিকা বদল করেন, ইউরোপীয়দের নিরপেক্ষতার মুখোস খসে পড়ে, নানা জোর-জবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সাদুল্লার পক্ষে ১০৭ জনের আইনসভায় ৫৬ জনের সমর্থন জোগাড় করা হয়, কিন্তু বরদলৈ, না সাদুল্লা কোন্ পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তা নির্ধারিত হবার সুযোগ থাকে নি, যেহেতু স্পীকার আইনসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবি করে দিয়েছিলেন। স্পীকারের কাজ কতখানি নীতিসঙ্গত হয়েছিল, তাও বহুভাবে আলোচনার বস্তু হয়। সুভাষচন্দ্র দিল্লীতে পৌঁছে ২৭ ডিসেম্বর তারিখের এক বিবৃতিতে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছিলেন। তার আগে শিলঙে ২০ সেপ্টেম্বর এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি ভিতরের সকল কথা খুলে বলেছিলেন, সেটি পড়লেই পাঠক ঠিক কী হয়েছিল, তা বুঝতে পারবেন:

"সাদুল্লা মন্ত্রিসভা ১০ তারিখে পদত্যাগ করে। সেই দিন সন্ধ্যাতেই কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা গোপীনাথ বরদলৈ মাননীয় গভর্নর বাহাদুরের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। গভর্নর শ্রীযুক্ত বরদলৈকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ রাজি হন কিন্তু কিছু সময় চান, বিশেষত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সাব-কমিটির সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে চাইলেন। ১৭ তারিখে বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ে শ্রীযুক্ত বরদলৈ গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে মন্ত্রিসভায় ৫ জন সদস্যের নাম পেশ করেন। গভর্নর নামগুলি গ্রহণ করেন এবং জানান যে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে সোমবার, ১৯ তারিখে, সকালে কিংবা বিকালে।

"১৭ তারিখে সন্ধ্যায় মৌলানা আজাদ ও আমার একটি যৌথ বিবৃতিতে সেই অবধি সময়ের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

করা হয়। এই যৌথ বিবৃতিটি এবং সেই সঙ্গে আমার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মুদ্রিত করে পরদিন অর্থাৎ ১৮ তারিখ রবিবারে শিলঙে বিতরণ করা হয়। আমার উক্ত বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম, শ্রীযুক্ত বরদলৈ যেসব মন্ত্রীর নাম দাখিল করেছেন সেগুলি গভর্নর বাহাদুর গ্রহণ করেছেন এবং সোমবার ১৯ তারিখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আমি এই ঘোষণা করেছিলাম, কারণ শহরে প্রবল গুজব ছড়িয়েছিল—শ্রীযুক্ত বরদলৈর দেওয়া মন্ত্রীদের নামের তালিকা গভর্নর গ্রহণ করেন নি এবং শপথ অনুষ্ঠান হবে না। বস্তুতপক্ষে শিলঙে পৌঁছবার পর থেকেই শুনেছি, কংগ্রেসের বিপক্ষদল ক্রমাগত গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছিল—কংগ্রেস দল মন্ত্রিত্ব পাবে না, সাদুল্লা মন্ত্রিসভাকেই আবার এনে বসানো হবে।

"কংগ্রেস-কোয়ালিশনে যোগদান করতে ইচ্ছুক এমন বেশ কিছু এম এল এ-কে কড়া পাহারায় আটকে রাখা হয়েছিল এবং তাঁদের ভয় দেখানোও হয়েছিল। গত কয়েকদিনে দেখা গেছে, শিলঙে বহুসংখ্যক বাইরের লোক আমদানী করা হয়েছে কংগ্রেস-কোয়ালিশনে যোগদানেচ্ছু এম এল এ-দের ভয় দেখাবার জন্য। এই সব বহিরাগতদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্পীকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

"গতকাল বিকালে কিছু মুসলমান এম এল এ-র স্বাক্ষরিত একটি পুস্তিকা শিলঙে বিতরণ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত বরদলৈ কর্তৃক দাখিল-করা মন্ত্রীদের নামগুলি গভর্নর গ্রহণ করেছেন এবং সোমবার ১৯ তারিখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে—এই সংবাদগুলিকে উক্ত পুস্তিকায় চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এই মুদ্রিত পুস্তিকাটি দেখে শ্রীযুক্ত বরদলৈ তার একটি কপি গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে এক পত্রে জানান—গত ১৭ তারিখে গভর্নর বাহাদুর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম গ্রহণ করেছেন এবং ১৯ তারিখে সোমবারে শপথ অনুষ্ঠান হবে বলেছেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ এ ব্যাপারে গভর্নরের স্বীকৃতিমূলক সমর্থন চেয়ে পাঠান।

"গভর্নরের কাছ থেকে কোনো উত্তর কিন্তু আসে নি। আজ (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে গভর্নর বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদলৈকে ডেকে পাঠান। গভর্নর বাহাদুর জানান, মন্ত্রীদের প্রদত্ত নামগুলি তিনি মেনে নিয়েছেন এবং দুপুর সাড়ে বারটার সময়ে শপথ অনুষ্ঠান হবে।

"আজ এগারোটার সময়ে স্পীকার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সভাপতিত্বে অ্যাসেমব্লির অধিবেশন বসে। অধিবেশন বসার আগে ৩৯৮৯ জি এস সংখ্যক একটি এক্সট্রা-অর্ডিনারী গেজেট বেরোয় যার মধ্যে মাননীয় গভর্নর বাহাদুর পুরাতন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রহণ এবং নতুন মন্ত্রিসভার গঠনের কথা জানান। সেইসঙ্গে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানের রীতির বিষয়ে বলা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনেক ভদ্রলোককে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

"আজ এগারোটার সময়ে অ্যাসেমব্লির অধিবেশন বসলে মাননীয় স্পীকার মহোদয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত বরদলৈর কাছ থেকে পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে চান। শ্রীযুক্ত বরদলৈ অবস্থার বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, নতুন সরকার পুরাতন সরকারের নানা নীতি সমর্থন করে না; নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে আইনসভার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হতে কিছু সময় লাগবে; তাই তিনি চান, আইনসভা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত থাক। তারপরে আলোচনা চলে। আলোচনার শেষে স্পীকার বলেন, তিনি আইনসভার অধিকারের রক্ষক। তাঁর পক্ষে এখন শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখা। ছুটির পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে কার্যপরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য গভর্নর মহোদয় যদি আইনসভা বাতিল করে দিতে চান তাহলে বর্তমান কার্যাবলী বন্ধ হয়ে যাবে। কী করবেন, গভর্নরই স্থির করবেন।

"সভা মুলতবি হবার পরেই নতুন মন্ত্রীরা শপথ নেবার জন্য কনস্টিটিউশন হলের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা শুনলেন, গভর্নরের আসতে মিনিট কুড়ি দেরি হবে। কয়েক মিনিট কাটবার পরে চীফ সেক্রেটারী জানালেন, গভর্নর শপথ অনুষ্ঠান স্থগিত রেখেছেন এবং তিনি শ্রীযুক্ত বরদলৈকে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ তদনুযায়ী গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনসভা বন্ধ করে দিয়ে স্পীকার যে-কাজ করেছেন তার বিষয়ে গভর্নর কথাবার্তার মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ তাঁকে জানান ও-ব্যাপারটা স্পীকারেরই সিদ্ধান্তের বিষয়। গভর্নর বাহাদুর আরও জানান, স্পীকারের সিদ্ধান্তের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি শপথ অনুষ্ঠানের সময় স্থির করার আগে শাসনতান্ত্রিক অবস্থাটা পর্যালোচনা করে নিতে চান। মন্ত্রীদের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত বরদলৈ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সব কিছু বিবেচনা করার পরেই গভর্নর বাহাদুরের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আইনসভা মুলতবি রাখার সঙ্গে শপথ অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্কই নেই।

"এর মধ্যে খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে, শপথ অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়া মাত্র সরকারী আমলাদের মধ্যে এক্সট্রাঅর্ডিনারী গেজেটের সকল সংখ্যা,—যার মধ্যে পূর্ব মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রহণ এবং পাঁচজন নতুন মন্ত্রীর নিয়োগের কথা ছিল—হস্তগত করবার জন্য আঁকুপাঁকু চেষ্টার অন্ত থাকে না। সেই সঙ্গে যে নোটিসে মন্ত্রীদের কর্মভার গ্রহণ অনুষ্ঠানের বিবৃতি ছিল তারও কপি সংগ্রহের তাড়াহুড়া পড়ে যায়।

"এই সকল চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীর ভিতর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার গঠন বানচাল করবার জন্য ইউরোপীয় দল ও মুসলিম দলের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। গতকাল এই দলগুলি একটি সভা করে। আজ মুসলিম ও ইউরোপীয় এম এল এ-রা মিলিত হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পাঠান, যাকে স্পীকার বিধিবহির্ভূত বলে বাতিল করে দেন, কারণ মন্ত্রীরা তখনো শপথ নেন নি। ইউরোপীয় ও মুসলিম এম এল এ-রা গত কয়েকদিন অবিরত গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই যাচ্ছেন। [ক্রমশ]
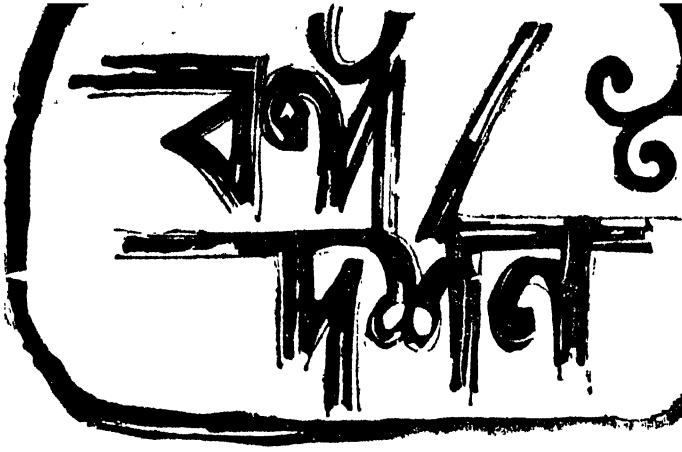
স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে

এই সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতী পনেরই আগস্টের দু'দিন পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার চতুর্বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করতে চলেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সঠিক অবস্থাটি এই সুযোগে একটু পর্যালোচনা করাই শ্রেয়। এখানে হতাশার একটা বছর শেষ হয়ে আর একটা বছরের সূত্রপাত হল, এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলা যায় না। স্বাধীনতা দিবসের কোন মূল্যই পশ্চিমবঙ্গে নেই, কেন না, জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ এখানে স্বাধীনতার স্বাদ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। গত তেইশ বছরে, ধীরগতিতে হলেও, ভারতের অপরাপর রাজ্যগুলি অনেকটা এগিয়েছে, পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর তো রীতিমত উন্নতি হয়েছে, বাকি রাজ্যগুলির উন্নতির গতি এত দ্রুত না হলেও সেগুলি উন্নতির দিকে চলেছে। সে সকল স্থানেও দারিদ্র্য আছে, জীবিকার সংস্থানের ক্ষেত্রে অসুবিধাও আছে, কিন্তু তা হলেও পশ্চিমবঙ্গের মত শোচনীয় অবস্থা কোথাও নেই। এই সকল রাজ্যের উন্নতি এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অবনতির পিছনে কয়েকটি বাস্তব কারণ রয়েছে, তার প্রথমটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং এই নীতি সুস্পষ্টই বৈষম্যমূলক নয় কি? প্রশাসন মোটামুটিভাবে পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও মহারাষ্ট্রীয়দের করতলগত, আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় চিরদিন উত্তরপ্রদেশীয়দের প্রাধান্য। কাজেই এই রাজ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের দাক্ষিণ্য পেয়েছে। আর দিল্লীর প্রশাসন পৃথক হলেও ভৌগোলিকভাবে তা পাঞ্জাবেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই কারণেই সরকারী দপ্তরগুলিতে পাঞ্জাবীদেরই প্রাধান্য। এটাই ব্যাখ্যা করে যে, কেন পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র এত তৎপর ছিল এবং কেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল হ'ল। অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যা নীতি, পশ্চিমবঙ্গ তার শিকার,—নীতিটা কি? যে সকল রাজ্য অনুন্নত, তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বেশি হবে, এই আপাতনির্দোষ নীতির ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গ মার খাচ্ছে এবং উত্তরপ্রদেশের উন্নতি হচ্ছে—কেন না, কাগজে-কলমে

মহাপ্রয়াণে ত্রৈলোক্য মহারাজ

বিপ্লবী মহানায়ক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী আর নেই। মহারাজ অবিভক্ত ভারতে বৃটিশ শাসকদের মহাশত্রু। খণ্ডিত এই মহাদেশে পাকিস্তানের নাগরিক — ভারত-পাকিস্তানের আর হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীতে বিশ্বাসী। মহানায়কের শেষ ইচ্ছা ছিল ভারতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। সে আশা পূরণ হোল না।

'মহারাজ' জনতার মহারাজ। দিল্লী আর কলকাতা—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক দিকের দুই শক্ত ঘাঁটি আজ বিদেশী শাসনমুক্ত। এই দুই মহানগরীর জনতা এদিন উদ্বেল। শোকমগ্ন দিল্লীর পথে হাজার হাজার মানুষ আর কলকাতার রাজপথে লক্ষ লক্ষ। লোকচক্ষুর আড়ালে প্রচারের ঢক্কানিনাদকে এড়িয়ে যে বিপ্লবীরা নিজেদের লক্ষ্যের জন্য সাধনা করে গেছেন, তাঁদের কারো শোকযাত্রায় স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতায় আর এ দৃশ্য দেখা যায় নি। জনতার মহারাজ—প্রকৃত মহারাজের শ্রদ্ধা পেলেন কলকাতার মানুষের কাছে।

বহু মিছিলের সাক্ষী মহানগরী কলকাতা। সাম্প্রতিককালের কলকাতায় এক নতুন দৃশ্য। শৃংখলাহীনতার অভিযোগে দুষ্ট কলকাতায় এদিন নতুন রূপ। দমদম বিমানবন্দরে এত সুশৃংখল জনতার দৃশ্য পুরানো দিনের কলকাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের মিছিল দমদম থেকে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছতে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যায়।

বৃটিশ শাসকের ত্রাস, অনুশীলন সমিতির অন্যতম নায়ক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দলের শ্রেষ্ঠতম নেতা, পাকিস্তানকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার অক্লান্ত যোদ্ধা, বার্ধক্যেও চিরনবীন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী অশক্ত দেহে কিন্তু শক্ত মনে ২৪শে জুন তারিখে ভারতে পা দিলেন। সেদিন থেকে তিনি অভিনন্দন পেয়ে এসেছেন ভারতবাসীর। অভিনন্দন পেয়েছেন মহানগরী দিল্লীতে। রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী থেকে সুরু করে মহানগরীর দীনতম মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ৯ই আগস্ট তাঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা ছিল। জীবিত মহারাজ আর কলকাতায় ফিরে এলেন না। ফিরে এল তাঁর নশ্বর মরদেহ সামরিক বিমানে বীরের মর্যাদায়। ৯ই আগস্টের প্রভাতে দিল্লীতে ডঃ ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। ডঃ সেন আর মহারাজের বিপ্লবী জীবনের কনিষ্ঠ অনুজদের অন্যতম ত্রিদিবকুমার চৌধুরী আর ভূপেশ গুপ্ত বয়ে নিয়ে এলেন তাঁর মরদেহ কলকাতায়।

—('দৈনিক বসুমতী' থেকে।)

এবং অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য, উত্তরপ্রদেশ তা নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সকল রাজ্যের ক্ষেত্রে এক অভিনব সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে মার খাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। সে নীতিটা কি? প্রাকৃতিক সম্পদের কোটা সকল রাজ্যেই সমান। অর্থাৎ আকরিক লোহ পশ্চিমবঙ্গ যা পাবে, উত্তরপ্রদেশও তা-ই পাবে। পশ্চিমবঙ্গে উত্তরপ্রদেশের চেয়ে বিশ গুণ বেশি কারখানা থাকলেও কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভাগ উভয় রাজ্যেরই সমান, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে কারখানার তুলনায় কাঁচামাল বেশি বলে উৎপাদনের বাড়বাড়ন্ত, আর কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি কারখানার উৎপাদন বন্ধ। অর্ডার দেবার ক্ষেত্রেও ঐ আজব সাম্যনীতি। উত্তরপ্রদেশের দশটি ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প যে অর্ডার পাবে, পশ্চিমবঙ্গের পাঁচশোটি কারখানা ঐ একই অর্ডার পাবে, যার ফল ওদের বাড়বাড়ন্ত, আর আমাদের কারখানাগুলির অর্ডার প্রাপ্তির অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া।

ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে আজ ভারতব্যাপী জোয়ারের লক্ষণ দেখা গেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণটা উপরেই উল্লেখ করেছি। কাঁচামাল নেই, অর্ডার নেই। উত্তরপ্রদেশের কলকারখানা বাড়ুক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তাদের কলকারখানার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের সমান হোক এটাও কাম্য। কিন্তু এই সমান করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচশোটি কারখানাকে লাটে তুলে দশটিতে নামিয়ে এনে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে সমান করার আজব সাম্যনীতির যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

যেটা সবচেয়ে দুঃখের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্যাবলী, যা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেরই নিজস্ব এবং যেগুলির অনুরূপ সমস্যা অন্য কোন রাজ্যে নেই, সেগুলির প্রতি দিল্লীর চরম ঔদাসীন্য। অথচ দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা আছে। যেগুলি কেন্দ্র বিশেষভাবে দেখবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কোনদিনই হয় নি। সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে নাকি ত্রাসের রাজত্ব, আর বাঙালীমাত্রেই কমিউনিস্ট। নয়াদিল্লীতে কলেজে বাঙালী ছেলেমেয়ে ভর্তি করা নিষিদ্ধ হয়েছে। দিনের পর দিন সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিদেশী অপসংস্কৃতির ভাবধারায় পুষ্ট নয়াদিল্লীর প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন অধিবাসীদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ তার সংস্কৃতি, তার গণ-আন্দোলন, আর বামপন্থী ভাবধারা—সমস্ত কিছুই আভিজাত্যের বিষয়। তাদের কথাবার্তায় জাতিবিদ্বেষের গন্ধকে তারা আজ চেপে রাখার প্রয়োজনবোধ করে না। হেন কোন অপবাদ নেই, যা এই অপসংস্কৃতির বাহকরা পশ্চিমবঙ্গ ও তার অধিবাসীদের ওপর চাপায় নি। স্বাধীনতার চতুর্বিংশতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের এই হাল হয়েছে। অতঃপর আমরা বিষয় ধরে আলোচনা করব।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আইন ও শৃঙ্খলা

একটি স্থায়ী প্রগতিশীল সরকার এবং পরিচ্ছন্ন প্রশাসনব্যবস্থা যা পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় অবস্থার কিছুটা প্রতিকার করতে পারে, তা বর্তমান বর্ষে একান্তই অনুপস্থিত। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার অকর্মণ্য ছিল না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকাই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু সকলেই জানেন, বিভিন্ন শরিক দলের পারস্পরিক কলহ, দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের উদগ্র প্রবণতা এবং এর জন্য দলীয় নেতাদের প্রচণ্ড নেপথ্য প্রয়াস, সব কিছু মিলে সে সরকার টেকে নি। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরেও যুক্তফ্রন্টকে চাঙ্গা করে তোলা যেত, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি পারস্পরিক আপোষে নারাজ হবার ফলে তা হল না। রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছে; কিন্তু এ তো নিছক যান্ত্রিক শাসন, কোনগতিকে প্রশাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে দেওয়া। দীর্ঘমেয়াদী কোন আর্থিক পরিকল্পনা নেবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসনে করা সম্ভবপর নয়, উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজে প্রয়োজনীয় ব্যয়বরাদ্দের পথেও বাধা আছে। ফলে অপরাপর রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হয়েছে, নয়াদিল্লীর যান্ত্রিক নির্দেশ ও সি-আর-পি দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি, হতেও পারে না। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের কথাই চিন্তা করছে, কিন্তু সেটা কবে হবে তা জানা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, উগ্রপন্থীদের ক্রিয়া-কলাপ, এগুলি একটি গভীরতর সামাজিক চাহিদা থেকে গড়ে উঠেছে, এবং সেই চাহিদাকে পূরণ না করলে, রোগের আসল কারণটি দূর না করলে রাষ্ট্রপতি শাসনে অধিকতর দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার সি-আর-পি পাঠাতে যত আগ্রহী, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলীর গভীরে যেতে ঠিক ততটা অনাগ্রহী।

বেকার সমস্যা, শিক্ষা ব্যবস্থা ও উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ

পশ্চিমবঙ্গের আসল সমস্যা বেকার সমস্যা এবং যাবতীয় সামাজিক অশান্তির এটাই মূল কারণ। পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পূর্ব-পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ লোক উদ্বাস্তু-পরি পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করছেন, এ ছাড়া অপরাপর রাজ্য থেকেও বহু লোক পশ্চিমবঙ্গে এসে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য অবাঙালী কবলিত, এখানে বাঙালী ছেলেদের চাকরি পাবার কোন উপায় নেই। এ ছাড়া সরকারী চাকরির ক্ষেত্রও খুব সীমাবদ্ধ। আর কোন ক্ষেত্রেই খুঁটির জোর না থাকলে কিছুই হয় না। গৃহগুলি বসবাসের অনুপযোগী। শান্তিতে দুদণ্ড স্থির হয়ে বসে চিন্তা করারও কোন স্থান নেই। শিক্ষা পদ্ধতি শুধু অবৈজ্ঞানিকই নয়, এক কথায় অপরাধমূলক। সর্বোচ্চ ডিগ্রি পেয়েও চাকরি মেলে না। আমরা বিগত একটি সংখ্যায় ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, কেন উগ্রপন্থীরা এই বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থার বিনাশ চায়। সমাজের উপরতলা দুর্নীতি ও ব্যভিচারে পরিপূর্ণ। কাজেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটি মূল্যবোধের প্রতিই মানুষের বিতৃষ্ণা এসে গেছে। প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতারা পথ দেখাতে অক্ষম। তাঁরা প্রত্যেকেই গদীর লড়াই-এ মত্ত। এ হেন পরিবেশে উগ্রপন্থী ক্রিয়া-কলাপ খুবই স্বাভাবিক, এবং সেটাকে পুলিশ, সি-আর-পি দিয়ে ঠেকানো কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যায়তন কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। আর হবে নাই বা কেন? লেখাপড়া শিখে কি লাভ? কেন না তা যখন করে খেতে সাহায্য করবে না, বরং বেকার জীবনের যন্ত্রণায় সকল অধীত বিদ্যাই ভুলে যেতে হবে, তখন এমন কি মাথাব্যথা পড়েছে যে, এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হবে? এই মূল জিজ্ঞাসাটাকে এড়িয়ে গালভরা বুলি আর সি-আর-পি দিয়ে, আর প্রশাসনশীর্ষে কিছু জরদ্গব আমলাকে বসিয়ে রেখে কার্যত উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে অধিকতর স্বাগত জানানো হচ্ছে। কাজেই বেকার সমস্যা সমাধানের উপরই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

শিল্প-বাণিজ্য, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা

কাজেই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ দরকার।

আমরা আগেই বলেছি যে, অবাঙালী শিল্পপতিরা বাংলার ছেলেদের কাজেকর্মে নেবে না, এবং তারা এখানে নতুন আরও কল-কারখানা খুললেও সেখানে স্থানীয় লোকেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কমই থাকবে। কাজেই বেকার বাঙালী ছেলেরা যাতে নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে ওঠে, সরকারের সেই চেষ্টা করা উচিত। গত তেইশ বছরে সত্যই কিন্তু এই জাতীয় প্রচেষ্টা হয় নি। এতদিনেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয় নি, অথচ এই বিদ্যুৎই পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, গ্রামের থেকে শহরে লোক আসা বন্ধ করার জন্য কোন পরিকল্পনামাফিক শিল্পোদ্যোগ ঘটে নি। প্রতিটি গ্রামেরই কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, যেগুলিকে অবলম্বন করে প্রচুর ছোটখাট শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় প্রতিটি গ্রামের আছে। এ ছাড়া গ্রামে পরিকল্পনামাফিক স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি খোলারও প্রয়োজন ছিল, সেগুলিতেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হত। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আরও দু একটি শহর সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা উচিত ছিল. উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে একাধিক বড় শহর থাকায় চাপটা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কিছুই কলকাতা-মুখী হওয়ায় বিপদ আরও বেড়েছে।

শ্রমবিরোধ, ভূমিসংস্কার

পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের পথে আরও একটি বড় বাধা হল শিল্পপতিদের একটি অদ্ভুত যুক্তি যে, এখানে শ্রমবিরোধ অত্যন্ত বেশি। শ্রমিকেরা কথায় কথায় ধর্মঘট করে, আন্দোলন করে, আর যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে ঘেরাও বলে একটা ব্যাপার তাঁদের বড়ই পীড়িত করছে। এই কারণেই তাঁরা বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের প্রসারের পরিবর্তে তাঁরা তা গুটিয়ে নিতে পারলে বাঁচেন। এই নগ্ন মিথ্যাটির প্রতিবাদ দায়িত্বশীল মহল থেকে ওঠে নি। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকের মজুরি ভারতের অন্যান্য যে কোন রাজ্যের চেয়ে কম। বিগত দশ বছরে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, মজুরী সে হারে বাড়ে নি, কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ বাড়ে নি। যেখানে শিল্প আছে সেখানেই শ্রমবিরোধ আছে, ইংলণ্ড-আমেরিকাও ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনদিন মালিকদের প্রতি দৃঢ় হন নি। শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে মালিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আরও শক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল, এবং তা কার্যকরী করারও দরকার ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সমস্ত কিছুই হয় নি। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ভারত জুড়েই তার কদর্থ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার যে নীতি নিয়েছিলেন সে ক্ষেত্রেও অপপ্রচার চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে খেলো করা হচ্ছে। ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা মুখে স্বীকার করলেও কার্যক্ষেত্রে তাকে রূপায়িত করার যে সাহস যুক্তফ্রন্ট সরকার দেখিয়েছিলেন তা বর্তমান শাসকদের দ্বারা হবে না। ও কাজটা অহিংস উপায়ে হয় না। বলাই বাহুল্য, এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটা দুর্যোগ আসন্ন এবং ভারতবর্ষের অপরাপর রাজ্যেও তার প্রভাব পড়বে। উগ্রপন্থী আন্দোলনের এটাও একটা মস্ত বড় কারণ, এবং এ ক্ষেত্রেও ভূমি সংস্কার ব্যতিরেকে উগ্রপন্থা দমন করা যাবে না। ভূমির ক্ষেত্রে অনাচারের অবসান বিগত তেইশ বছরে হয় নি, যেটা সর্বাগ্রে হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৮ই আগস্ট, ১৯৭০

এম. ডি পরীক্ষা সম্পর্কে

এম. ডি পরীক্ষার পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয় পোষণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অবাধ প্রয়োগের অভিযোগ করে কয়েকজন এম. ডি পরীক্ষার্থী এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেছেন এবং ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের উচ্চপদস্থ কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দিয়ে তাঁদের অভিযোগসমূহ তদন্ত করার দাবী জানিয়েছেন।

পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এম. ডি পরীক্ষার বিষয়ে তদন্তের দাবী আজ নতুন নয়। অতীতে এই পরীক্ষা সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার্থীর বহু সুনির্দিষ্ট অভিযোগ মাসের পর মাস আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, বহুবার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীও জানানো হয়েছিল। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের দাবী জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয় নি। গতবারের সঙ্গে এবারের দাবীর পার্থক্য এই যে, গতবার পরীক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে লিখিত দাবী পেশ করেন নি, এবার করেছেন।

কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেছেন যে, এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ক্ষমতাবান ব্যক্তি পরীক্ষক হতে না পারলেও তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পত্র মারফৎ নাকি প্রিয়জনদের রোল নম্বরের তালিকা পাঠান কোন কোন পরীক্ষকের কাছে এবং তাঁদের পাশ করাবার সুপারিশ করেন। কিন্তু পরীক্ষকেরা সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে যোগ্যতা অনুযায়ী পাশ করান।

শোনা যাচ্ছে গত ৭ই আগস্ট কর্তৃপক্ষ নাকি পরীক্ষার্থীদের স্মারকলিপি বিবেচনা করেন এবং এবারের পরীক্ষার ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য তিন জনকে নিয়ে একটা কমিটি নিযুক্ত করেছেন। যে কর্তৃপক্ষ এত লেখালেখিতেও অতীতে নীরব ছিলেন, এবার তাঁরা এত তৎপর কেন? ছাত্রদের দাবী অনুযায়ী ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের সেই "উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তিও" কি অনুসন্ধানের জন্য মনোনীত হয়েছেন?

কিন্তু পরীক্ষার্থী মনে করেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজান এবং এটা জনৈক ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিজেকে পরীক্ষক হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অথবা নিজের অনুচরদের পরীক্ষক করে নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা? পরীক্ষকরা প্রশ্ন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি এই প্রচেষ্টার সহায়ক হবেন?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন—তাঁরা যদি সত্যই এম. ডি পরীক্ষার দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে চান, তবে তাঁরা যেন কোন যথার্থ নিরপেক্ষ, জনসাধারণ ও ছাত্রদের আস্থাভাজন কোন তদন্ত কমিটির দ্বারা গত দশ বছরের এম. ডি পরীক্ষার ব্যাপার ভালভাবে অনুসন্ধান করেন এবং ভবিষ্যতে এই পরীক্ষায় দুর্নীতিরোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গত দশ বছরে যাঁরা পরীক্ষক হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা বা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা তদন্ত করে জনসাধারণ বা ছাত্রদের আশ্বস্ত করা যায় না।

ভারত-পূর্ব জার্মানী সম্পর্ক

ভারত এবং পূর্ব জার্মান গভর্নমেন্ট স্থির করেছেন যে, অতঃপর দুই দেশের (ভারত-পূর্ব জার্মানী) মধ্যে কনস্যুলেট-জেনারেল পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। অর্থাৎ ভারত বার্লিনে একজন ভারতীয় কনসাল-জেনারেল নিয়োগ করবে এবং পূর্ব জার্মানী দিল্লীতে একজন কনসাল-জেনারেল নিয়োগ করবে। এতদিন দুই দেশের মধ্যে ট্রেড কমিশনার পর্যায়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল গত ৩রা আগস্ট পার্লামেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই জার্মানী দেশটা দু ভাগ হয়ে আছে। পশ্চিম অংশের নাম ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী, আর পূর্ব অংশের নাম জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক। যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির নায়করা পটস্ডামে বসে জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যুদ্ধের পর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তাগিদে ইংগ-মার্কিন-ফরাসী জোট সেই চুক্তি কার্যত বাতিল করে দেন এবং তাঁদের অধিকৃত পশ্চিম জার্মানীতে একটি গভর্নমেন্ট গঠন করে সেটাকেই সমগ্র জার্মানীর গভর্নমেন্ট বলে চালাতে চেষ্টা করেন। তখন সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব জার্মানীতেও একটা আলাদা গভর্নমেন্ট গড়ে ওঠে। ফলে গোটা জার্মানী দুটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকদিন আগেই। কিন্তু পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল ট্রেড কমিশনার বিনিময়ের পর্যায়ে। এতদিনে সেটা কনসালেট-জেনারেল বিনিময়ের পর্যায়ে উন্নীত হতে চলেছে। এতদিন পশ্চিম জার্মানী জিদ ধরে বসেছিল যে, যে সব দেশ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, তাদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। কিছুকাল আগে পশ্চিম জার্মানীর নতুন গভর্নমেন্ট সেই শর্ত প্রত্যাহার করেছেন। তাঁরা নিজেরাই এখন পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। এ অবস্থায় ভারত যে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের সম্পর্ক গড়তে কেন ইতস্তত করছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কনস্যুলেট-জেনারেল বিনিময়ের পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতি বিনিময় ক্রমবর্ধমান। কাজেই দুই দেশের মধ্যে কনসুলার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পার্লামেন্টে সব দলের সদস্যরাই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, তবে স্বতন্ত্র এবং এস-এস-পি দলের সদস্যরা এই সঙ্গে ইসরায়েল এবং তাইওয়ানকেও স্বীকৃতি দেবার দাবী তোলেন। স্বরণ সিং বলেন যে, তাইওয়ান নিজেকে চীন বলে পরিচয় দিতে চাইছে। ভারতের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর ইসরায়েলকে ভারত স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করলেও সেই দেশের সঙ্গে কনসুলার বা রাষ্ট্রদূতীয় সম্পর্ক স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না।

মানচিত্রে গলদ

সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রেট এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রকাশিত (বিশ্বকোষ) বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের নেফা অঞ্চল এবং আকসাই চীনকে চীন দেশের সীমানার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ বছর ধরে নাকি মানচিত্রটা এইভাবেই চালু আছে। বিষয়টা নিয়ে গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে তুমুল হট্টগোল হয়ে গেছে এবং প্রতিবাদে স্বতন্ত্র, জনসংঘ, পি-[illegible]ছেন। এ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং বলেন যে, সংশ্লিষ্ট মানচিত্রটি ভারতের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমাগত এই ভুল মানচিত্র প্রকাশ করে যাচ্ছে দেখে ভারত অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। অতীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, এই মানচিত্রের কোন রাজনৈতিক তাৎপর্য নেই এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা সম্বন্ধে কোন সংশয় পোষণ করে না। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের মানচিত্রে ক্রমাগত একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে কেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নেফা এবং আকসাই চীনকে তারা কোন্ দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, সেটা তাদের স্পষ্ট করে ঘোষণা করা উচিত।

শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন নয়, আমেরিকা এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানচিত্রেও ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বহু গলদ ধরা পড়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রপাল সিং জানিয়েছেন যে, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র "ইউনাইটেড নেশন্স্ এ্যাট টোয়েন্টি" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তাতে ভারতের এলাকা ৩০ লক্ষ ৪৬ হাজার ২৩২ বর্গমাইল বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় এলাকা থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় এলাকার পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০ বর্গমাইল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুকেও নাকি ভারতীয় এলাকা সম্পর্কে এই ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ভারত সম্পর্কে এই ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়া যে দেশের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক, সেকথা বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত ভুল সংশোধনের জন্য ভারত সরকারের অবিলম্বে তৎপর হওয়া উচিত।

ওড়িশার রাজনীতি

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে গত সাড়ে তিন বছর যাবৎ ওড়িশায় স্বতন্ত্র-জন কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট চালু আছে। জন কংগ্রেস পুরোনো কংগ্রেসেরই একটা ভাঙা দল। বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে বনিবনা হয় নি বলে পবিত্রমোহন প্রধানের নেতৃত্বে একদল পুরোনো কংগ্রেস কর্মী জন কংগ্রেস গঠন করেন এবং [illegible] প্রভাব তাঁদের প্রচণ্ড, কিন্ত-

[illegible] ওড়িশায় স্বতন্ত্র পার্টি প্রাক্তন দেশীয় নৃপতিদের নিয়ে গঠিত। স্বতন্ত্র-জন কংগ্রেস কোয়ালিশন ওড়িশায় বেশ নির্বিবাদেই শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ বিরোধী দলের অবস্থা মোটেই তেজী নয়। কিন্তু গত বছর কংগ্রেস দল দুভাগে ভাগ হবার পর জন কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের (ইন্দিরা-পন্থী) মিটমাটের কথা হচ্ছিল। তাতে জন কংগ্রেসের ভিতরে দলাদলি হয় এবং কয়েকজন সদস্য দলত্যাগ করে আলাদা ব্লক গঠন করেন। কিন্তু তাতে মন্ত্রিসভা বিপন্ন হয় নি এবং দলত্যাগী সদস্যরা কেউ কেউ আবার স্বদলে ফিরে গিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে জন কংগ্রেসের রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ওড়িশায় অবিলম্বে নতুন নির্বাচনের দাবী তুলেছেন। জন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেন শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও জন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। জন কংগ্রেসের এই নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের ভার দেওয়া হয়েছে পবিত্রমোহন প্রধান, সুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক এবং রবীন্দ্রনাথ পট্টনায়ককে নিয়ে গঠিত এক কমিটির উপর। কোয়ালিশনের মুখ্যমন্ত্রী আর এন সিংদেও জন কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, স্বতন্ত্র পার্টি মধ্যবর্তী নির্বাচনের পক্ষপাতী নয়। অপরদিকে জন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেই যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। দলের প্রেসিডেন্ট পবিত্রমোহন প্রধান বলেছেন যে, তাঁদের প্রস্তাব বাধ্যতামূলক (ম্যান্ডেটরী) নয়। ওদিকে হরেকৃষ্ণ মহতাব শুধু পার্টি থেকেই পদত্যাগ করেন নি, রাজ্য আইনসভা থেকেও পদত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে জন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কোন সম্পর্ক নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ভারতের তথা ওড়িশার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিবর্তনই তাঁকে পদত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে"। তার আসল মর্মটা যে কি, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে জন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের পর ওড়িশার বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পরমায়ু যে কমে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ওড়িশার সকল দলের নেতাদের মধ্যে জোর শলাপরামর্শ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী সিংদেও বিষয়টা নিয়ে বিজু পট্টনায়কের স্বাধীন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট গঙ্গাধর মহাপাত্র এবং হরেকৃষ্ণ মহতাবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে, জন কংগ্রেস কোয়ালিশন ত্যাগ করলে বিজু পট্টনায়কেব দল কোয়ালিশনে ঢুকে মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। ওড়িশা আইনসভায় সদস্যের সংখ্যা ১৪০ জন। তার মধ্যে বিজুর দলের সদস্য আছেন ১৫ জন। ওড়িশার রাজনীতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে আরও দুই একদিন না গেলে পরিষ্কার কোন চিত্র ফুটে উঠবে না। তবে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান কোয়ালিশনের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

ব্যাঘ্র বিনাশ

ভারতবর্ষ বাঘের দেশ হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতেও যেমন অপরূপ, বলবিক্রমেও তেমনি অপরাজেয়। মানুষ খেতেই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তবু সুন্দরবনের অসংখ্য মানুষ সেই বাঘের সঙ্গেই সহ-অবস্থান করছেন। বাঘ তাঁরা ভালবাসেন এবং ব্যাঘ্র দেবতার পূজা করেন। তবে নিতান্ত দায়ে না পড়লে বাঘের ধারে-কাছে তাঁরা বড় একটা ঘেঁষতে চান না।

বাঘ হচ্ছে ভারতের একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা—ব্যাঘ্রশিকারীদের বাঘ বিনাশের ঠেলায় বাঘের সংখ্যা দেশে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৩০ সালে ভাবতেব বিভিন্ন জঙ্গলে প্রায ৪০ হাজাব বাঘ বসবাস করত। সেই বাঘের সংখ্যা বর্তমানে আড়াই হাজারে নেমে এসেছে। শিকার এবং জঙ্গলউচ্ছেদই তার প্রধান কারণ। ভারতীয় ব্যাঘ্র বংশকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হিমাচল, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কেরল, তামিলনাড়ু, মহীশূর এবং রাজস্থানে ব্যাঘ্র শিকার নিষিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত কেন যে নেন নি, তা বোঝা যাচ্ছে না। সুন্দরবনের বাঘ এখনও দুই বাঙলার আত্মিক ঐক্যের প্রতীক। সেখানকার বাঘ নাকি রাজনৈতিক সীমানা অগ্রাহ্য করে অবাধে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যাতায়াত করে। পাসপোর্ট, ভিসার ধার কখনও ধারে না। বাইরের পৃথিবীতেও তার বেঙ্গল টাইগার নামেই (ওয়েস্ট বেঙ্গল অথবা ইস্ট-বেঙ্গল টাইগার নয়) পরিচিতি। সুন্দরবনের বাঘ ঐক্যবদ্ধ বাঙালী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাদের বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের বংশবৃদ্ধির সুব্যবস্থা করা উভয় দেশের রাজ্য সরকারেরই দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে তাঁদের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।
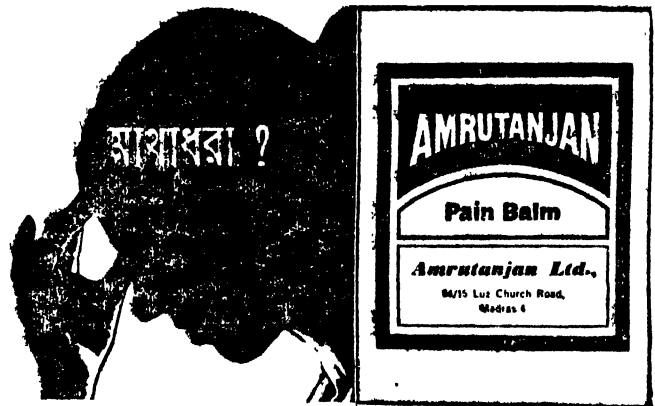
—৮-৮-৭০

পশ্চিম এশিয়া:

৭ই আগস্ট থেকে পশ্চিম এশিয়ার আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী হয়েছে। দু' পক্ষ থেকেই কোন প্রকার গুলীবর্ষণ, বোমাবর্ষণ বা আক্রমণ করা হয় নি।

পশ্চিম এশিয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘের শান্তিদূত ডঃ গানার জারিংকে তাঁর সুইডেনের বাড়ি থেকে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ডেকে এনেছেন। গানার জারিং এখন রাষ্ট্রসংঘে সংশিলষ্ট সকলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছেন, কিভাবে তিনি এখন দু'পক্ষের মধ্যে আপোষ-আলোচনা চালাবেন। নিউ ইয়র্ক বা নিকোসিয়ার নাম শোনা যাচ্ছে আলোচনার স্থান হিসাবে।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, জর্ডান ও ইজরায়েল 'রজার্স' শান্তি প্রস্তাব' গ্রহণ করেছে, এই সংবাদে খুশি হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন উইলিয়াম রজার্সকে সঙ্গে নিয়ে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেন, সেখানে তিনি বলেন "এটা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এখনও অনেক অসুবিধা আছে।"

সত্যি, অসুবিধা এখনও অনেক। ৭ই আগস্ট যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে, তার ফলে ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র,

জর্ডানের পক্ষ থেকে গুলীবর্ষণ হয় নি এমন কি, যে সিরিয়া ও ইরাক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাও কোন-রূপ আক্রমণ করে নি। কিন্তু, প্যালেস্টাইন গেরিলারা যুদ্ধবিরতিকে মানে নি। যুদ্ধবিরতির পরেও জর্ডানের ভেতর থেকে তারা ইজরায়েলীদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছে।

প্যালেস্টাইন গেরিলাদের নেতারা আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধ-বিরতি মানবেন না। আম্মানে তিন হাজার গেরিলা বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেছে রজার্স প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এই মিছিল থেকে "বিশ্বাসঘাতক নাসেরের" বিরুদ্ধে নানা প্রকার ধ্বনি দেওয়া হয়েছে। রজার্স প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য আম্মানে পঁচিশ হাজার মানুষের এক বিরাট সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে প্রধান গেরিলা সংস্থা 'আল্ ফাতা'র নেতা ইয়াসের আরাফাত ঘোষণা করেন, তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। নাসেরের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, বিপ্লব কোন একজনের হুকুমমত চলবে না। প্যালেস্টাইন থেকে শত্রুদের সমূলে উৎখাত না করা পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রাম থামবে না, এই কথা বলেন আরাফাত। আর এই সংগ্রামে কোন আপোষ নেই।

জর্ডানের রাজা হুসেন 'রজার্স প্রস্তাবের' একজন উৎসাহী সমর্থক। তবে তিনি আগেভাগেই বলে রেখেছেন, প্যালেস্টাইন গেরিলারা যদি কিছু করে বসে, তবে তার দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

সুতরাং, গেরিলাদের আক্রমণ চলবে—এটা মেনে নিয়েই যুদ্ধবিরতিকে গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী আলোচনা ইত্যাদি চালিয়ে যেতে হবে। মনে হয়, ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র তো বটেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নও এই অবস্থা বুঝেছে এবং সেই-মত তারা অগ্রসর হচ্ছে।

রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নে আরব জগৎ স্পষ্টতই আজ দ্বিধাবিভক্ত। ৩রা আগস্ট থেকে লিবিয়ার রাজধানীতে যে আরব শীর্ষ সম্মেলন হবার কথা ছিল, তা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি কর্নেল মুয়াম্মর গাদাফি চেষ্টা করেছিলেন বিরোধ মেটাবার জন্য, কিন্তু তিনি পারেন নি।

ইরাক ও সিরিয়া রজার্স প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। আলজিরিয়াও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। তবে ইরাক ও সিরিয়াতেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বেশি। নাসেরের বিরুদ্ধে রাগও তাদেরই বেশি। বাগদাদ ও দামাস্কাসে নাসের-বিরোধী অনেকগুলি মিছিল হয়েছে।

ইরাকের রাষ্ট্রপতি আহ্‌মেদ হাসান আল্ বকর নাসেরের কাছে যে চিঠি দিয়েছেন, তাতে তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, জুন মাসে ত্রিপলিতে ৭টি আরব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, রজার্স পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়ে নাসের তার বিরুদ্ধে গিয়েছেন।

নাসের ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের বিরোধিতায় নাসের খুবই ক্ষুব্ধ। আহ্‌মেদ হাসান আল্ বকরের চিঠির যে জবাব তিনি দিয়েছেন, তা সরকারীভাবে কায়রোয় প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তরের প্রতি ছত্রে নাসেরের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

নাসেরও স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, ইরাকী সরকারের সমর্থন ছাড়া সে দেশে নাসের ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ সম্ভব নয়।

নাসের দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন: তিনি ত্রিপলি সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন কাজ করেন নি। সংগ্রাম তাঁরা অবশ্যই করবেন। তবে ন্যায্য শান্তির সুযোগও গ্রহণ করবেন। তিনি ব্যঙ্গভরে ইরাকের রাষ্ট্রপ্রধানকে জিজ্ঞাসা করেন: কেন সীমান্তে ইরাকী সৈন্য ইজরায়েলী শত্রুর বিরুদ্ধে গুলীবর্ষণ করে না? ইরাকী বিমান থেকে কেন শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয় না? ইজরায়েলী সৈন্যরাই বা কেন ইরাকের ওপর আক্রমণ করে না? ইজরায়েলী বিমান ইরাকের অভ্যন্তরে কেন বোমাবর্ষণ করে না?

ইজরায়েলী আক্রমণের প্রায় সবটাই পড়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ওপর। আর তার জন্য তাঁরা 'গর্বিত'।

বিরোধ কেবল আরবদের ভেতর নয়, রজার্স প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ইজরায়েলীদের মধ্যেও তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণপন্থী গাহাল পার্টির ৬ জন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছেন এই প্রস্তাব গ্রহণের প্রতিবাদে। ইজরায়েলী

পার্লামেন্ট 'নেসেট'-ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব এসেছিল, তবে তা ভোটে পাশ হয় নি।

আসল কথা, আপত্তি দু' দিকেই। আর দু' দিকেই যাঁরা রাজি হয়েছেন, তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাজি হয়েছেন।

ইজরায়েল শেষ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 'রজার্স প্রস্তাব' সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাখ্যা চায়। ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েই তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আসলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কিছু প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল। তা তারা পেয়েছে। নাসেরও মস্কো থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে এনেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই এখন পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের অবসান চায়। অবশ্য উভয়ের ক্ষেত্রে কারণ ভিন্ন। তাই আশা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত একটা মীমাংসা হবে। অনেক অসুবিধা থাকলেও কিছু আশা আছেই।

আর যদি পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে কোন মীমাংসা সম্ভব হয়, তবে তা ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামাতেও নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। পশ্চিম এশিয়ার পক্ষে যদি মস্কো-ওয়াশিংটন বোঝাপড়া সম্ভব হয়, তবে ভিয়েতনামের ব্যাপারেই বা হবে না কেন?

মাসকাট ও ওমান

মাসকাট ও ওমানের ষাট বৎসর বয়সের সুলতান সৈয়দ বিন তৈমুর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন।

ক্ষমতাচ্যুত সুলতান আহত অবস্থায় এখন বৃটেনে। তিনি সেখানে চিকিৎসা ও আশ্রয়প্রার্থী। প্রাসাদরক্ষীরা যখন সুলতানকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করে, তখন সংঘর্ষে সুলতানের পায়ে পাঁচ জায়গায় বন্দুকের গুলী লেগেছে। আঘাত খুব গুরুতর নয়। তিনি বেঁচে যাবেন।

সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে হাত ছিল সুলতানেরই নিজের ছেলে শেখ কাবাস বিন সৈয়দের। আটাশ বৎসর বয়স্ক কাবাস মাসকাটও ওমানের নতুন সুলতান হয়েছেন।

আরব বদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মাসকাট ও ওমানের লোকসংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষের মত। একেবারে মধ্যযুগীয় বলা যায় এই দেশকে। সৈয়দ বিন তৈমুরের হুকুমে এখানকার লোকেরা মোটর গাড়ি চড়তে পারে না, সিনেমা দেখতে পারে না, প্রকাশ্যে ধূমপান করতে পারে না, ফুটবল খেলতে পারে না, জুতো, ট্রাউজার, চশমা ব্যবহার করতে পারে না, বিদেশের ওষুধ খেতে পারে না। সমগ্র দেশে মাত্র দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুলতানের বক্তব্য, লেখাপড়া শেখার কোন প্রয়োজন নেই।

১৯৬৪ সালে এখানে প্রচুর তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৭ থেকে তেল তোলা হচ্ছে। বছরে ৭৫ মিলিয়ন ডলার রাজস্ব পান সুলতান তেল থেকে। তেল তোলার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করে আছেন। দেশের কোন লোককে এ কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করেন নি। তেলের টাকা দেশের উন্নয়নের জন্যও ব্যবহার করেন নি।

এহেন সুলতান কেন তাঁর ছেলেকে বৃটেনে স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারী অ্যাকাডেমীতে পড়াতে পাঠালেন, তা সত্যি বিস্ময়ের বিষয়! আর তাঁর কালও হল তিনি এর জন্যই।

সুলতান পুত্র কাবাস পিতার আচার-আচরণ একেবারেই পছন্দ করেন না। সুলতানও বুঝেছেন সে কথা। তাই, স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর পুত্রকে সালালা প্রাসাদে নজরবন্দী করে রাখা হল। পিতার অনুমতি ছাড়া কারও সংগে তাঁর সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ।

কিন্তু বেশি দিন এভাবে কাবাসকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না। গোপনে ক্ষমতা দখলের সব ব্যবস্থা হল।

কাবাস সুলতান হয়েই ঘোষণা করেছেন, তেলের অর্থ তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করবেন। মাসকাট ও ওমানকে তিনি আধুনিক করে গড়ে তুলবেন।

মাসকাটে এসেই তিনি ১৯ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন।

(৯-৮-৭০)
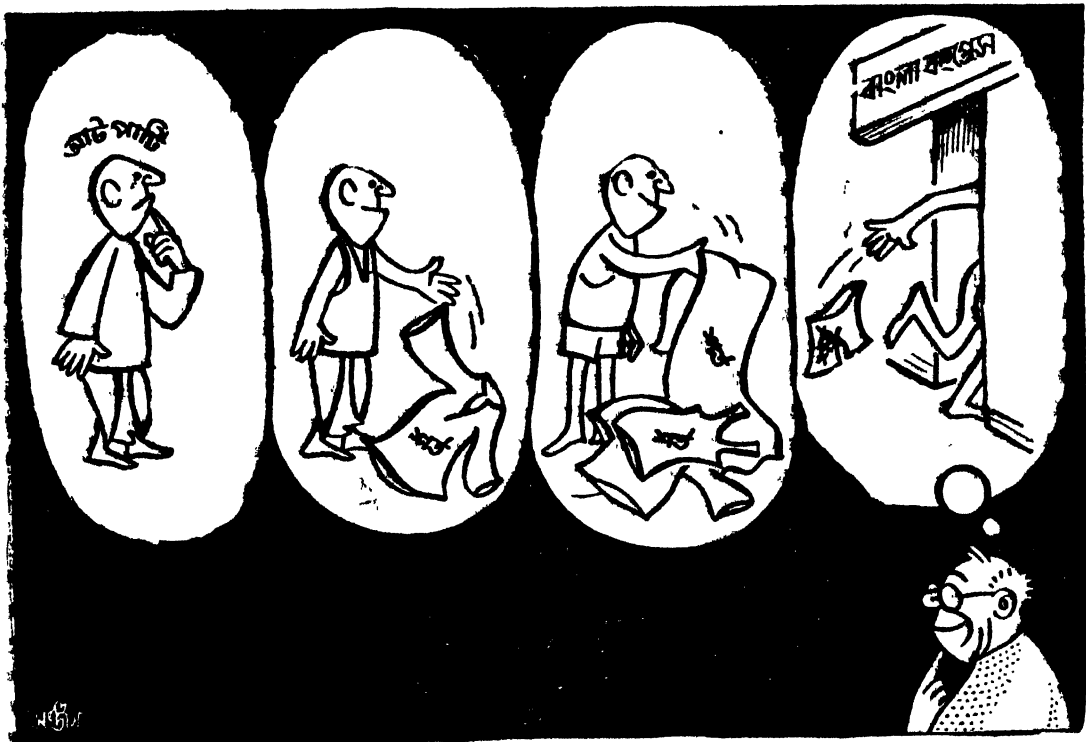
বাংলার সে চিত্র আজ আর নেই। যখন বাঙালীর জীবনে আর যা-ই থাক না কেন—জীবন-যন্ত্রণা ছিলো না। অন্তত আজকের মতো এমন উৎকট হয়ে দেখা দেয় নি। অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচনায় সে-কালের বাংলার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে প্রত্যেক বাঙালীরই সেই অতীত বাংলার প্রতি একটা তীব্র মোহ জেগে ওঠে। শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে সেকালে খুবই অসুবিধা ছিলো সত্য, তথাপি এ কথাও সত্য জীবনে তখন অস্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না, অশিক্ষা এবং সংযোগহীনতা বা বিচ্ছিন্নতা ব্যবহারিক জীবন এবং আদর্শগত জীবনের মধ্যে কোনো দুস্তর ব্যবধানের সৃষ্টি করে নি। অথচ অক্ষয়কুমার মৈত্র যে যুগের বাংলাদেশের চিত্র অংকন করেছেন, তার অনেক আগে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের উপর বার বার বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে গেছে। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালীর অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; সমাজের উপর পড়েছে তারই নিদারুণ প্রতিক্রিয়া। এই কারণেই বিশ্ববিখ্যাত জার্মান-দার্শনিক কার্ল মার্ক্সের একটি চিঠিতে দেখতে পাই:

"Hindustan is an Italy of Asiatic dimensions, the Himalayas for the Alps, the plains of Bengal for the Plains of Lombardy, the Deccan for the Appenines, and the Isle of Ceylon for the Isle of Sicily... Just as Italy has from time to time been compressed by the conqueror's sword into different national masses, so do we find Hindustan, ... Yet from a social point of view Hindustan is not Italy, but the Ireland of the East. And this strange combination of Italy and Ireland, of a world of voluptuousness and a world of woes, is anticipated in the ancient traditions of Hindustan. That religion is at once a religion of sensualist exuberance and a religion of self-torturing ascetism....."

(এঙ্গেলসকে লেখা চিঠি থেকে ১০ই জুন, ১৮৫৩)

ইতালীর সংগে ভারতের বহিরঙ্গ সাদৃশ্য, আয়ার্ল্যান্ডের সংগে সামাজিক সাদৃশ্য এবং ইতালী ও আয়ার্ল্যান্ডের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যের সংগে ভারতের সাদৃশ্য সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স যা বলেছেন তা শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। অক্ষয়কুমারের বাংলার চিত্র দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, বার বার বৈদেশিক আক্রমণের পরেও বাঙালী তার সেই স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বজায় রেখেছিলো কিভাবে? এর উত্তর সম্ভবত এই যে তখন মানুষের জীবন বহির্মুখী উন্মত্ততার শিকার হয় নি। তাহলে কি তখন ওই sensualist exuberance এবং self-torturing ascetism-ই এর পেছনে কাজ করেছে? হয়তো তাই। একদিকে যেমন এই exuberance এবং অন্যদিকে ascetism-এর অস্তিত্ব ছিল, সেই সংগে আর একটি বস্তু ছিলো—যাকে বলা যায়, জীবন সম্পর্কে একটি নির্মোহ দৃষ্টি-ভঙ্গি।

বৃটিশ যুগের আগে

বৃটিশপূর্ব যুগে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা ছিলো গ্রামভিত্তিক। অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল ছিলো কৃষির উপর। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ unit-এর মতো করে গঠিত গ্রামাঞ্চলে অশান্তি এবং অনটনের বিভীষিকা ছিলো না। খাদ্য-সংস্থানের জন্য তখন অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো না। খেলাধুলা, শরীরচর্চা, লোকগীতি ও শাস্ত্রালোচনা নিয়ে স্বচ্ছন্দে মানুষের জীবন নির্বাহ হতো। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সাধারণত জমিদারী প্রচেষ্টায় হতো। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন—যাঁরা সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটু প্রগতিবাদী, অন্তত প্রচলিতের বন্ধনে বন্দী ছিলেন না—পুরনোকেই ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতেন না—তাঁরাই সাধারণত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অচলায়তন ভাঙতে সচেষ্ট থাকতেন। এঁরা সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। বিভিন্ন অব্যবস্থা এবং অত্যাচারের প্রতি এঁরাই জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, প্রয়োজন হলে প্রতিবাদও জানাতেন। এই নিস্তরঙ্গ সমাজেও আন্দোলন ছিলো না, একথা বলা যায় না। তবে একথা বলা যায়, সেই সব আন্দোলন প্রায়শ রাজনীতি-নির্ভর ছিলো না—প্রধানত সেগুলি ছিলো সমাজ ও সংস্কৃতিনির্ভর। হাজার বছরের বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন অথবা বলা যেতে পারে ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কৃতির উত্থান ঘটেছে বার বার। ভুললে চলবে না যে, সে যুগে ধর্ম ছিলো মানুষের সকল সামাজিক স্তম্ভগুলির মধ্যে বৃহত্তম স্তম্ভ। পাল বংশীয় শাসনকালের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ, তাও যেমন ধর্ম-বহির্ভূত ছিলো না, তেমনি মোগল যুগের নবজাগরণ, এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের জোয়ারও ধর্মবহির্ভূত ছিলো না। এ ব্যাপারে বৃটিশযুগের আন্দোলনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে গড়ে উঠে-ছিলো। সে কথা পরে বলছি। তার আগে যে কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার তা হলো—(১) বৃটিশপূর্ব বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ সমাজেও আন্দোলন হতো, (২) সে আন্দোলন প্রধানত সাংস্কৃতিক হলেও ধর্মবহির্ভূত ছিলো না, (৩) সমাজের প্রগতিশীল অংশ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সকল আন্দোলনে মুখ্য অংশ গ্রহণ করতেন।

বৃটিশ যুগে

বলেছি, বৃটিশ যুগের আন্দোলনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় প্রভাব অতিক্রম করে-ছিলো। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তারের সংগে সংগে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের সামাজিক জীবন তরঙ্গিত হতে থাকলো। ইউরোপীয়

Humanism এসে আঘাত করতে লাগলো আমাদের Devinism-এর উপর। একদিকে যেমন সমাজে নবীন চিন্তা পুরাতন সংস্কারকে পর্যুদস্ত করতে লাগলো—অন্যদিকে বণিকের নিত্য নতুন রাজস্বনীতি পল্লীসমাজের অভিজাতশ্রেণীর বিপর্যয় ডেকে আনতে লাগলো। তাদের বিপর্যস্ত করে ইংরেজ এক শ্রেণীর পেটোয়া ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি করলো, যাদের সঙ্গে গ্রামবাংলার প্রত্যক্ষ কোনো পরিচয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমাজবিদ্ শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। শ্রীঘোষ বলছেন, "ইংরেজের নতুন নতুন পরীক্ষা-মূলক রাজস্বনীতি বা revenue policy-র ফলে সেকালের গ্রামসমাজের যে অভিজাতশ্রেণী ছিল, তারা দ্রুত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল, কারণ তারা নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের চিরদিনের অভ্যাস ও ধারণাগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। তাদের ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করে, চিরস্থায়ী রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করে নতুন এক শ্রেণীর অভিজাত জমিদার গ্রামসমাজে সৃষ্টি করা হল—যাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক নয়—যাঁরা টাকার জোরে জমিদারী নিলেমে কিনে ঠিক ব্যবসায়ীর মতো নতুন জমিদার হয়ে উঠলেন। সুতরাং, যেমন নতুন নগরকেন্দ্রে, তেমনি গ্রামাঞ্চলেও যে new rural aristocracy গড়ে উঠল তাঁরা হলেন নতুন শাসক ইংরেজদের অনুগ্রহজীবী এক শ্রেণীর হঠাৎ অভিজাত বা upstart. এরপর যখন মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের উদ্ভব হল—তখন পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার প্রভৃতিদের নিয়ে বেশ বড় একটা মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি হল গ্রাম্য-সমাজে—যা পূর্বে কখনো কোনদিন ছিল না। নতুন rural aristocracy এবং নতুন rural middle-class - দুইটি গ্রামসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা উদাসীন বিত্তলোভী শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠলো।... এঁরা অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করা পর্যন্ত ত্যাগ করলেন—absentee জমিদার পত্তনিদার হয়ে উঠলেন। নগরের aristo-cracy-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে এঁরা নতুন নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠালোভী হলেন। ফলে হতাদরে ও নিষ্ঠুর ঔদাস্যে গ্রাম্য-সমাজ দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করলো একে-বারে ধ্বংস হয়ে গেল।" একদিকে ইউ-রোপীয় সমাজের মুক্ত প্রাণের আবেগ এসে পড়তে লাগলো সমাজের উপর, অন্যদিকে ইংরেজের বিচিত্র অর্থনীতি এবং সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গ্রামবাংলা ভাঙতে লাগলো ধীরে ধীরে। একই সঙ্গে এই দুই বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে লাগলো। এরই ফলে হয়তো গোটা অষ্টা-দশ শতাব্দী জুড়ে কেবল ভাঙনেরই পালা চললো; পুরনো গ্রামসমাজ ধ্বংস হলো, কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপে কোনো নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠলো না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা গেলো পরিবর্তনের সূচনা। ইউরোপের মুক্ত জীবনবাদ সজোরে আঘাত হানলো এতকালের সংস্কারের রুদ্ধদ্বারে, ধর্মে, সাহিত্যে, সমাজে, ব্যক্তিত্বে। তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটলো রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনে, ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারে ও ব্যক্তিত্বে, মধুসূদনের জীবনে ও সাহিত্যে, ডি রোজিও এবং তাঁর আদর্শবাহী ইয়ং বেঙ্গলদের আচারে-আচরণে, বিভিন্ন সাময়িকপত্রে। এক কথায় গোটা রেনে-শাঁসের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। সে কথা বিস্তারিত বলতে গেলে একটা বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। আমি কেবল বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে শুধু-মাত্র ধারাবাহিকতাটুকু সম্পর্কে পাঠককে সজাগ রাখবার জন্য এগুলির উল্লেখ করে যাব মাত্র। রামমোহন সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। সেদিক থেকে রামমোহন এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি কতটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং কতটা সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা একথা বলতে পারি, শ্রেণীগত বিন্যাসের দিক থেকে রামমোহন ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীরই মানুষ। তথাপি তখন-কার বাংলার সেই revolutionary

আন্দোলনের মধ্যে তিনি অমন করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কেন? ১৮১৫ সাল থেকেই তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। সমসাময়িক ধনচান্দের মতো অঢেল সম্পদ না থাকলেও আভিজাত্য দেখাবার মতো সম্পদ তাঁর যথেষ্টই ছিলো। তথাপি বুর্জোয়াদের মতো তিনি আরো বেশি ধনোপার্জনের দিকে না ঝুঁকে সেই জীবনপণ সমাজ-সংস্কারের দিকে ঝুঁকেছিলেন কেন? এর উত্তর শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের ভাষাতেই দেওয়া যায়—"তিনি বুঝেছিলেন যে নতুন বিত্তের মানদণ্ড সামাজিক ভাঙনের ভিতর দিয়ে যে সচলতা সৃষ্টি করেছে—সেই সচলতা মেকী সচলতা—সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে spurious mobility বলেন, সেও তাই। এই স্থূল সচলতা সাময়িক—এর ফলে কোনো মানসিক ও আদর্শগত সচলতা দেশবাসীর জীবনে আসবে না এবং তা না এলে সমাজ আবার অচল অনড় হয়ে বিষিয়ে উঠবে। নতুন বিদ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকস্পর্শেই এই মানসিক সচলতা আসতে পারে। তাই তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধর্মের গভীর অনুশীলনে মনোনিবেশ করলেন। এমন একটি নতুন আলোকের সন্ধানে, যে আলোক জ্বালিয়ে দিতে পারলে আমাদের দীর্ঘকালের প্রাণহীন অচল আচরণ অভ্যাস অনুষ্ঠান, অজ্ঞানপ্রসূত ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি পরিবর্তিত হতে পারে। তাহলে দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা হলো নতুন বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। এই অনুশীলনের পথ ধরেই এদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জীবনদর্শন, রীতিনীতি সব একে একে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সংঘাতও আরম্ভ হয়েছে। নতুন agents of westernisation এবং পুরাতন forces of tradition—এই দুয়ের সংঘাতের ভিতর দিয়ে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছে এবং সেই জাগরণের প্রবাহেরও উত্থান-পতন হয়েছে। নতুন বিত্তবানশ্রেণী নয় শুধু, তার সঙ্গে নব্যশিক্ষার প্রসারের ফলে নতুন বিদ্যাজীবী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরও বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে ধীরে ধীরে। এই নতুন বিদ্যাবুদ্ধিজীবী শ্রেণীই নবজাগরণের আদর্শের ধারক ও বাহক হয়েছেন। এই নতুন বিদ্যাবুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশই সেকালের মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাঁরা গোটা উনবিংশ শতাব্দীকে এক বাঁধনছেঁড়া বিপ্লবের মন্ত্রে উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন। এই বাঁধনছেঁড়া উত্তাল প্রাণচাঞ্চল্যের গর্ভ থেকেই একদিন জন্ম নিলো নবীন ভারত—সত্য হলো রামমোহনেরই কথা—"Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful."

চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও সে-তুং মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে 'ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিনিধি' এবং 'জাতীয় বুর্জোয়া' বলে চিহ্নিত করে বলেছেন যে, দেশ যখন বিদেশী পুঁজি কিংবা যুদ্ধবাজ নেতাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, তখন এই শ্রেণী বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সাম্রাজ্যবাদ বা যুদ্ধবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামে সহায়তা করে। বৃটিশ ভারতে এই সত্যকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বহারার আন্দোলন ছিলো না। নেতৃত্ব যাঁদের হাতেই থাক—এ আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলো প্রধানত শিক্ষিত বিত্তবান মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ ও সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল এদের হাতে।

পেটি বুর্জোয়া বলতে মাও সে-তুং মালিকশ্রেণীর কৃষক, দক্ষ কারিগর, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসমাজ, শিক্ষকসমাজ, কেরাণী, ছোট আইনজীবী ও ছোট ব্যবসায়ীদের নির্দেশ করেছেন। দেশের মধ্যে যখন বিপ্লবী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে, তখন এরাও সেই সর্বহারার বিপ্লবে সামিল হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতীয় বুর্জোয়া এবং পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। (অবশ্য এই বিপ্লব সর্বহারা শ্রেণীর ছিল না বলেই আন্দোলন সুসংবদ্ধ ও সুসংগঠিত হতে পারে নি)।

প্রাক্-স্বাধীনতাকালে ১৯৩৮-৩৯ সালেই সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি বামপন্থী শক্তি সংহত হয়েছিল। বাংলাদেশ ছিল সেই শক্তির হৃদ্‌পিণ্ড। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি রূপ গঠিত হয়েছিল গান্ধীজীর হাতে, অন্যটি সুভাষচন্দ্রের হাতে—একটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোষধর্মী, অন্যটি আপোষহীন। ১৯২১ সালে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মত্যাগ করবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে যে সুভাষচন্দ্র বিলাত থেকে আই-সি-এস-'এর লোভনীয় চাকরি ছেড়ে ভারতে এসে সর্বপ্রথম ভারতের মুক্তিসংগ্রামের নেতা গান্ধীজীর সঙ্গে বোম্বাইতে দেখা করেছিলেন, দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যের জন্য সেই সুভাষচন্দ্রই পরবর্তীকালে গান্ধীজী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "Gandhiji should now be regarded as an old, useless piece of furniture." যে মুহূর্তে জাতীয় কংগ্রেস নেতারা বিপ্লব এ[...] মুহূর্তে আপসকামী বৃটিশ সরকারে[র] সঙ্গে একাধারে আলাপ-আলোচনা চালি[য়ে] চলেছেন, তখনই সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠে শো[না] গেছে "No real change in histo[ry] has ever been achieved by di[s]cussion." "India can well affo[rd] to bring a blood sacrifice f[or] her liberation." দীর্ঘকাল কংগ্রে[সের] মধ্যে থেকে গান্ধী-নেতৃত্বের গতি-প্রকৃ[তি] দেখে সেই সুভাষচন্দ্রই দুঃখ করেছে[ন] "The entire intellect of t[he] Congress has been mortgage[d] to one man."

১৯৩৮-৩৯ সালে হরিপুরা এ[বং] ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঘটনাবলী[তে] স্পষ্টই দেখা গেল সুভাষচন্দ্রকে কে[ন্দ্র] করে একটি বামপন্থী শক্তি সংহ[ত] হয়েছে। গান্ধীজী প্রমুখ রক্ষণশী[ল] নেতারা সুভাষচন্দ্রের তৎকালীন জ[ন]প্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে উঠেছিলে[ন]। জওহরলাল নেহরু স্বয়ং সুভা[ষ]নেতৃত্বের প্রতি কটাক্ষ করে এক চিঠিতে লিখলেন "আমি জানি [না] তুমি কাকে বামপন্থী এবং কাকেই দক্ষিণপন্থী বলে বিবেচনা কর। তো[মার] তোমার নির্বাচনী লিপিসমূহ পাঠ ক[রে] আমার মনে হয়েছে, গান্ধীজী ও ওয়া[র্কিং] কমিটিতে তাঁর অনুগামীদের তু[মি] দক্ষিণপন্থী বলে মনে কর এবং তাঁদে[র] যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের তু[মি] বল বামপন্থী। আমার বিবেচনায় তো[মার] এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কঠিন ভা[ষা] প্রয়োগ করে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃ[ত্বের] সমালোচনা করা এবং তাকে আক্র[মণ] করাই কি রাজনীতিতে Leftism-[এর] পরিচায়ক?" এর পরের ঘটনা দ্রু[ত] এগিয়ে গেল। এবং দেখা গেল ১৯[৩৯] সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় নি[খিল] ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈ[ঠক] বসলো, সুভাষচন্দ্র সেখানে রাষ্ট্রপ[তি]পদ ত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রি[ক] পদ্ধতিতে নির্বাচিত সভাপতি অ[প]সারণের জন্য গান্ধীজী সেদিন [যে] অসহযোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন ক[রে]ছিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে সে [ছিল] এক অভূতপূর্ব কলংকিত ঘটনা। চ[ল্লিশ] বছর পরে বাঙ্গালোর অধিবেশনের প[র] প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী[র] সংগে সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এ[বং] কংগ্রেস-সিণ্ডিকেটের ঘনীভূত আক্রম[ণ] সেদিনের কথাই মনে করিয়ে দে[য়।] ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনো কখ[নো] সত্যই ঘটে।

সুভাষচন্দ্র সেদিন কংগ্রেস থে[কে] বেরিয়ে গিয়ে চুপ করে থাকেন নি[।]

বামপন্থী শক্তি সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন নতুন রাজনৈতিক দল—ফরোয়ার্ড ব্লক—দলের মুখপত্র হলো 'ফরোয়ার্ড'। সেদিন ভারতবর্ষের সমস্ত বামপন্থী শক্তি যদি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানাতো তাহলে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। তার অনেক আগেই (১৯২৯ সালে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে। তখনো কমিউনিস্টদের শক্তি কোন উল্লেখযোগ্য আকৃতি নেয় নি। তবু ভারতবর্ষের সেই রাজনৈতিক সংকটমুহূর্তে কমিউনিস্টরা ফ্যাসিজমের ভয়ে এই বিপ্লবী শক্তির পেছনে দাঁড়াতে চাইলেন না। তবু হরিপুরা এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী দেশের অগণিত মানুষের সামনে বামপন্থী শক্তি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট করে তুলেছিল। আমি বলেছি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি রূপ গঠিত হয়েছিল গান্ধীজীর হাতে, অন্যটি সুভাষচন্দ্রের হাতে—একটি নরমপন্থী, অন্যটি চরমপন্থী। দুটি পথেই সর্বস্তরের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল—দুটি পথেই ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এক সময় রাশিয়া থেকে জার সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটানোর অদম্য সাহসে উন্মুক্ত বন্দুকের সামনে প্রসারিত বুক নিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়াতো সমাজের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। হাজার হাজার মৃত্যুর বিনিময়ে একদিন রাশিয়া জারশাসনমুক্ত হয়েছিল। ভারতবর্ষেও আমরা দেখেছি শিক্ষিত তরুণ বা শিক্ষকের এতটুকু ভয় নেই ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে কিংবা অগ্নিগোলার সামনে বুকের আবরণ উন্মুক্ত করে দিতে। আজকে নুয়েন ভ্যান ত্রয়ীর কাহিনী পড়তে পড়তে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতের মাটিতে এমন কত ত্রয়ীর তাজা রক্তে বৃটিশ বন্দুকের তৃষ্ণা মিটেছে, ইতিহাস কি তার নির্ভুল হিসাব দেবে কোনদিন? শিক্ষিত যুবক কিংবা বুদ্ধিজীবী শিক্ষকের কাছে সেই মরণখেলা ছিল যেন একটা প্লেজার, যাতে মুখের হাসি বিনষ্ট হয় না (স্বদেশী যুবকদের কথা স্মরণীয়)। যাই হোক, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং বৃটিশ সরকারের সকল চক্রান্ত ভেদ করে সুভাষচন্দ্রকে একদিন বিদেশে পাড়ি দিতে হলো। কিন্তু যে বিপ্লবাত্মক শক্তির (Spirit) মুক্তি ঘটিয়ে গেলেন, কোনমতেই আর তার মাত্রাগত হ্রাস হলো না।

একদিন ভারত স্বাধীনতা পেলো। সে স্বাধীনতালাভের দ্রুততায় সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী নেতৃত্বের অবদান আজ কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো। তৈরি হলো নতুন সংবিধান। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় যাঁরা এলেন তাঁরা শুধু ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য এত ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে, আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেরী হলো না। এবং এই বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে দেশের বামপন্থী শক্তি দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠলো।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসের প্রশাসনিক দুর্বলতা, ধনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, তত্ত্ব ও কর্মের মধ্যে বৈষম্যের সুযোগে বামপন্থী শক্তি দ্রুত সংহত হয়ে উঠতে লাগলো। কমিউনিস্ট পার্টি হলো এই শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বয়সের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগুতে পারে নি। এর কতকগুলি বড় কারণও ছিল। প্রথমত ভারতের উপর অ্যাংলো-আমেরিকান প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এখনো কমিউনিস্টদের ভাষায় বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এবং এরই সম্ভাব্য ফল হল দলের মধ্যে অন্তর্কলহ। যে কলহের চরম রূপ দেখা গেল গত ১৯৬৪ সালে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের বত্রিশজন সদস্য সেদিন দল থেকে বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘকাল ধরেই পার্টির অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েটের নীতিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই উত্তাপেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ওই বছরেই ৭ই মার্চ তারিখের 'কারেন্ট' পত্রিকার একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠলো চেয়ারম্যান শ্রী এস, এ, ডাঙ্গের বিরুদ্ধে—যার পরিণতি দাঁড়ালো দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে অন্ধ্র, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরের যে ৩২ জন সদস্য বেরিয়ে এসেছিলেন—তার মধ্যে জাজকের নাগি রেড্ডিও ছিলেন, যিনি চতুর্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে খবরে প্রকাশ।

যা হোক, কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দু'-টুকরো হলো ১৯৬৪ সালে। পার্টির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবার অবকাশ আর রইলো না। অথচ এটাই ছিল স্বাভাবিকভাবে কাম্য। কোন রাজনৈতিক দল বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুর্নীতি কিংবা পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কোন নজীর নিয়ে কোনক্রমেই কাউকে বরদাস্ত করা হয় না। এই সেদিনও আমরা রাশিয়ার রাজনীতি থেকে ক্রুশ্চেভকে সরে যেতে দেখেছি—চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ডুবচেককে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে হলো নতুন ঘটনা। পার্টির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, সে অভিযোগ প্রমাণিত হবার আগে পার্টিটাই গেল ভেঙে জাতীয় পরিষদের সদস্যরা কার্যত পিছিয়ে নিয়ে গেলেন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। দু' নম্বর কমিউনিস্ট পার্টির নাম হলো কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী)। যদিও অ-মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। এই দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব নিলেন কেরলের এ, কে, গোপালন, অন্ধ্রের পি, সুন্দরাইয়া ও তামিলনাড়ুর পি, রামমূর্তি প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক হলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। কলকাতায় ত্যাগরাজ হলে চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর ছবি স্থাপন করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশন বসলো—আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম হলো ভারতের দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টির।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো ১৯৬৯ সালে। আর একটি কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হলো। নকশালবাড়ী বলে কথিত অতিবাম কমিউনিস্টরা কলকাতায় মনুমেন্ট ময়দানে অধিবেশন বসিয়ে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক জন্ম ঘোষণা করলেন। এখানেও ছবি ছিল মাও সে-তুং-এর; বরং কিছু বেশি ছিল যা তা হলো মাও সে-তুং-এর প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য। এঁরা পার্টির নাম দিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)। আবার সঙ্কট সৃষ্টি হলো পরিমল দাশগুপ্ত এবং নাগি রেড্ডীকে নিয়ে। শ্রীরেড্ডী নতুন আর একটি কমিউনিস্ট দল গঠন করতে উদ্যোগী হলেন। জানি না এ দলের চরিত্রগত বন্ধনীর মধ্যে 'মাওবাদী' কিংবা 'চে-গুয়েভারাবাদী' থাকবে কি না! কিছুই বিচিত্র নয়। অন্তত ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনীতিতে বোধ-হয় সবই সম্ভব। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের অর্থ বোঝা যায়—কেন সে ভাঙন তাও বোঝা যায়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান ভগ্নাংশের ব্যাখ্যা যুক্তিতে হয় না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বিরোধের তাৎপর্য সম্ভবত এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা

ও উত্তর ভিয়েতনামের সম্প্রতি প্রয়াত কমরেড হো চি মিনও অনুধাবন করতে পারেন নি। মৃত্যুর পরে তাঁর যে উইলের কথা প্রকাশিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "ভ্রাতৃপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলিতে মতানৈক্য দেখে আমি ব্যথিত। আমি কামনা করি, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারিয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। আমি নিশ্চিত যে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলি পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হবে।" উইলের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্ট হো চি মিন সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট, তরুণ সম্প্রদায় এবং শিশুর প্রতি তাঁর 'সৌভ্রাতৃত্বমূলক' অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন।

কমরেড হো-র অন্তিম বাসনা হয়তো একদিন সার্থক হবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কেন এই আত্মকলহ? প্রতিবিপ্লব যদি এই আত্মকলহেরই প্রতিক্রিয়া বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে কি তা নিছক একটি কল্পনাবিলাস বলে পরিগণিত হবে? ভারতের কথাই ধরা যাক। এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন কি অনিবার্য ছিল? অন্তত নিবারণ করবার কতটা চেষ্টা হয়েছিল? আর হলোই যদি তবে সে কিসের ভিত্তিতে? কোন্ নীতিগত পার্থক্য? কি সে পার্থক্য? পার্থক্যই যদি থাকবে তবে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি হলো কেন? সারা ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের (মাঃ) কর্মসূচীর পার্থক্য কোথায়? সে কি শুধু জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেই নয়? কিন্তু এই পার্থক্য কষ্টকল্পিত নয় কি? জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে রাজ্যে রাজ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) তো খুব সচেষ্ট বলে মনে হয় না। ১৯৬৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর কোচিনে অনুষ্ঠিত পার্টির ৮ম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবেও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছেন—"The Communist Party of India (Marxist) which is vitally interested in building the united front of different democratic parties and groups including the S.S.P., P.S.P. and others, cannot but take this development into serious account. Prompted by the desire to consolidate the existing UF with them in states where it has materialised, and eager to extend it to other states and areas.—"

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পাটনা কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের অংশবিশেষ আমি সামনে রাখছিঃ "কমিউনিস্ট পার্টি আবারও জোরের সহিত ঘোষণা করিতেছে যে, এই সঙ্কটমুহূর্তে বামপন্থী পার্টিগুলির দায়িত্ব হইতেছে অপরিসীম এবং চূড়ান্ত। অবিলম্বে তাহাদের এমন সব জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের ঐক্য এবং ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের একতা সংগ্রামক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারণের মান রক্ষার জন্য তাহাদের ভারতব্যাপী এক নিরবচ্ছিন্ন গণ-আন্দোলন শুরু করিতে হইবে। নতুন এলাকাতেও তাহাদের প্রবেশ করিতে হইবে এবং একটি সাধারণ গণতান্ত্রিক মঞ্চের উপর এমন এক ন্যূনতম রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ গণ-আন্দোলনকে নতুন নীতিসমূহের স্বপক্ষে দেশব্যাপী এক জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে উন্নীত করা যায়। অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও মধ্যপন্থায় অবস্থিত পার্টি ও গ্রুপগুলিকে এবং কংগ্রেসের মধ্যকার ও কংগ্রেস অনুসরণকারী জনগণের গণতান্ত্রিক অংশকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পথ প্রস্তুত করিতে রাজনৈতিক কর্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ বামপন্থী ঐক্যই সমর্থ। কমিউনিস্টদের ভিতরকার ভেদাভেদ দূর করিয়া আন্দোলনে ও গণ-সংগঠনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই হইতেছে অন্য দেশের মত ভারতেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আরও সংগ্রাম পরিচালনার অন্যতম প্রধান উপাদান।"

অনুরূপভাবে আরো অনেক বামপন্থী সোস্যালিস্ট দলের রাজনৈতিক প্রস্তাব উদ্ধার করে দেখানো যায় যে, প্রত্যেকেই একটি সংযুক্ত বামপন্থী আন্দোলন ও একটি বামপন্থী শক্তি ঐক্যের কথা বলেছেন। গত বছর লন্ডন টাইমস্ পত্রিকার জন্য একটি ইংরেজী প্রবন্ধে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু লিখেছিলেন, "বিশেষ বিশেষ স্থানিক ঘটনার বিচার করে এক সাধারণ শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট শক্তি-সমাবেশে যদি আমরা দেখিয়ে দিতে পারি যে, এই স্থানিক ভেদগুলির ভূমিকা গৌণ, তাহলে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলা কঠিন বলে আমার মনে হয় না"......

"......কংগ্রেসকে এমন সঙ্কটের সম্মুখীন দেখা যাচ্ছে, যা কালে কালে আরো তীব্র হবে; তার সঙ্গে বাড়বে কংগ্রেসের ভিতরকার উপদলীয় রেষারেষি। নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আদর্শগত ও কার্যক্রমগত মতদ্বৈধ প্রকট হয়ে উঠেছে, যার সম্পর্কে জনগণ পূর্বের যে-কোন সময়ের চেয়ে আজ বেশি সচেতন। বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ও শক্তি সঞ্চয়ের পক্ষে এ যে কতবড়ো সুযোগ দেবে, তা বলাই বাহুল্য। কমিউনিস্ট পার্টি দুটোর তত্ত্বগত প্রভেদ এবং কার্যক্রমগত বিস্তর পার্থক্য বর্তমানে যা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এদের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা দেখছি না। কিন্তু এমন সুযোগ আছে, যেখানে শুধু এই দুটো পার্টিই নয়, বরং বামপন্থী ও গণতন্ত্রী সবগুলি দলই যুক্তভাবে কাজ করতে পারে। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পন্থার নির্ভুলতা এবং কমিউনিস্ট পদ্ধতির প্রতিযোগ ক্ষমতা আরো সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে।"

তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা-ই থাক না কেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের অন্য কথা বলে। ভাঙনের পর্বটা যত দ্রুত সম্পন্ন হয়, মিলনের বা পারস্পরিক বোঝাপড়ার পর্ব তত দ্রুত কোনদিনই হয় না। বামপন্থী রাজনৈতিক দল যতই শক্তি-সমন্বয়ের কথা বলুন না কেন, কমিউনিস্টরা যতই তাঁদের প্রতিযোগ ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকুন না কেন, বস্তুত অনেকক্ষেত্রেই তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়। যার জন্য ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি তাদের প্রধান শত্রু (যে কথা তাঁরা নিজেরা প্রায়শই বলে থাকেন) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট হতে পারেন নি। যে সি-পি-এম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এস-এস-পি, পি-এস-পি প্রভৃতি দল নিয়ে যুক্ত মোর্চা গঠন করতে সচেষ্ট বলে রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন, সেই সি-পি-এম বাংলা কংগ্রেসকে সহ্য করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, বাংলা কংগ্রেস নিয়ে গঠিত পাঁচ পার্টির বামপন্থী ফ্রন্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক এক সাত পার্টির ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে কার্যত বামপন্থীরা পারস্পরিক বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যে সি-পি-এম কংগ্রেসের উপদলীয় কলহকে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে চান, যাঁরা রাজনৈতিক পোলারাইজেশনে বিশ্বাস করেন, তাঁরাই আবার কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি দেখতে পান নি। তাঁরাই কিন্তু আবার কংগ্রেস

থেকে অজয় মুখার্জী বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন (১৯৬৯, মধ্যবর্তী নির্বাচন), তাঁরাই পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বপক্ষে ভোট দেন, আবার তাঁরাই জনসংঘ-স্বতন্ত্র এবং সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের সংগে একজোট হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেন। বাংলা দেশে তাঁরাই আবার বাংলা কংগ্রেসকে সহ্য করতে না পেরে চরম ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেন—কার্যত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙনের মুখে নিক্ষেপ করেন এবং বামপন্থী শক্তিসমূহের জোট যুক্তফ্রন্টের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আত্ম-কলহ এবং শরিকী সংঘর্ষের ফলেই মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল। সরকার ভেঙে যাবার পর বাংলাদেশে বামপন্থীরা আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেন।

যে বাংলা কংগ্রেস সি-পি-এম'এর মহাভারত অশুদ্ধ করেছে, বারবার সেই বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে-যাওয়া আর এক ক্ষুদ্র পার্টি বিদ্রোহী বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে সি-পি-এম একটি ছয়-পার্টির ফ্রন্ট গঠন করলো। কমিউনিস্টদের ছাত্র-সংগঠন আগেই ভেঙেছিলো। সম্প্রতি তাদের শিক্ষক সংগঠন, মহিলা সংগঠন এবং সর্বোপরি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও ভেঙে গেল। এইসব ভাঙাচোরা আন্দোলন এবং বৈপরীত্যের মধ্যেই বর্তমান বামপন্থী আন্দোলনের ধারাটির অনুসন্ধান করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সারা দেশে বামপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এ এক সংকটময় কাল, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দল-গুলির ক্রিয়াকলাপের এ এক কলঙ্কজনক সময়। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি আগেই বলেছি, প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজ চিরকাল একটি গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। তবুও মার্ক্সীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই মধ্যবিত্ত সমাজকে সাম্য-বাদের এক বিরাট অন্তরায় হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সে তত্ত্বের কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। যদিও কমিউনিস্টরা বলেন, "উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের প্রধান উপকরণগুলির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার সমগ্র সমাজের দখলে আনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের রাষ্ট্র গঠন—এই হলো 'সমাজতন্ত্রের মূল শর্ত'।'

বর্তমান সময়ে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ ভাঙছে। একদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থ-নৈতিক সঙ্কট এবং অসাম্য, অন্যদিকে জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মধ্যবিত্ত সমাজ তার নিজস্ব অক্ষরেখার উপর আর তাকে ধরে রাখতে পারছে না। এই ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন নতুন কিছু গঠন করবার অদম্য উৎসাহ, অন্যদিকে প্রাচীনত্বের বন্ধন থেকে বিদায় গ্রহণের দুঃখ বেদনাবোধ এদেরকে নাড়া দিচ্ছে—বিচলিত করছে। কেন না, সমাজের এই অংশটি যেমন চিরকাল একটু শান্তিপ্রিয়, সৎ এবং সুস্থ নাগরিকবোধ-সম্পন্ন, তেমনি আবার সামাজিক অচলায়-তনের বেড়া ভাঙবার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ-কারী সৈনিক। এই দ্বৈত-চরিত্রই মধ্যবিত্ত সমাজকে সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে পৃথক করবার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ই হোক, আর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়ই হোক, সমাজের যারা উঁচুতলার মানুষ তারা বরাবরই শোষকের ভূমিকা পালন করেছে। শোষণ করেছে নিচুতলার শ্রমজীবী মানুষকে। শোষণের বিরুদ্ধে যদিও ওই সর্বহারা শোষিতশ্রেণীর প্রতিবাদে ফেটে পড়ার কথা—তবুও বহু শতাব্দী ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রতিপালিত এবং নানাপ্রকার অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সর্বহারা শ্রেণী তা পারে নি। এক্ষেত্রে পথনির্দেশক শক্তি হিসেবে মধ্যবিত্তশ্রেণীই বরাবর এগিয়ে এসেছে সামাজিক অচলায়তনের বেড়া ভাঙবার আন্দোলনের পুরোভাগে, সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে। তারাই শ্রমিক-শ্রেণীকে সংহত করেছে—তাদের বঞ্চনার দিকগুলি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেছে। বঞ্চনার পুঞ্জীভূত অভিমানই সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রমিক ও সর্বহারাশ্রেণীর এই ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য তথা বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিসম্পন্ন করবার জন্য বহু ছাত্রকে রক্ত দিতে হয়েছে, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে, বহু শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীকে বারবার শাসকশ্রেণীর অন্ধকার কারাগারে দিন কাটাতে হয়েছে। এই ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীরা প্রধানত বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। আজকের বামপন্থী আন্দোলনের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, তার নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এই মধ্যবিত্ত সমাজ। সূক্ষ্ম শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে মাও সে-তুং এদেরই বলেছেন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী। কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকেরা এদেরই বলেছেন opportunist বা সুবিধাবাদী। এরা বিপ্লবের অক্ষশক্তির মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে। অবশ্য বর্তমান বাংলাদেশ তথা ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই তত্ত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে মেনে নেওয়া যায় কি না, সেটা একটা বিতর্কের ব্যাপার। মেনে নিলে একথা অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন আজও পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কুক্ষিগত। কেন না, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম হয়ে গেছে একথা কেউই বলবেন না। অন্যদিকে নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদমূলক বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া সেন্টিমেন্টের ব্যাপক অস্তিত্ব লক্ষ্য করার মতো। তথাকথিত সাচ্চা কমিউনিস্টরাই এই রোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত। যার ফলে বামপন্থী রাজ-নৈতিক শিবিরে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশু কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে মার্ক্সীয় তত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাসে এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজকে ফেলবার সাহস সম্ভবত কারোই নেই। তাই কমিউনিস্ট ও অতি-অ-কমিউনিস্ট সকলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে 'শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের' সামাজিক-রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করবার কথা বলা হয়ে থাকে। বস্তুত একথা সত্য যে, আজকের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত সমাজের অবদানের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অবমূল্যায়ন করারও প্রশ্ন ওঠে না এই কারণে যে, তাঁদের বাদ দিয়ে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা কেউ ভাবতেও পারেন না।

তবু বলবো, পূর্বোল্লিখিত দ্বৈত-চরিত্র এবং নেতৃত্বে মোহাবিষ্টতাই বাম-পন্থী শক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনের পরি-পন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইজন্য দুটো কাজ অবশ্য করণীয় বলে মনে হয়ঃ

(১) বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বরাবরকার অভিযুক্ত অভিমানী মধ্যবিত্ত সমাজের অবদান ও ত্যাগের সুষ্ঠু মূল্যায়ন'

(২) পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার দ্রুত ধ্বংসসাধনের জন্য বামপন্থী শক্তি সমন্বয়।

আমি আগেই বলেছি, সারা দেশে বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এ এক সংকটময় কাল। দ্বিতীয় কর্তব্যটিতে ব্যর্থ হলে দেশের বামপন্থী আন্দোলন দারুণভাবে জখম হবে বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মত পোষণ করেন এবং এর ফলে দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনাও হতে পারে বলে আশংকা। ১৯৬৯ সালে বাংলা দেশে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শরিকী সংঘর্ষের মধ্যে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীজ্যোতি বসু কমিউনিস্টদের যে প্রতিযোগ ক্ষমতার কথা লণ্ডন টাইমসে বলেছিলেন—এর মধ্যে আর যাই থাক, সেই প্রতিযোগ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিউনিস্ট পদ্ধতি ছিল না। সকল প্রকার স্পর্শ-কাতরতা থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদী প্রতি-পক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি সমাবেশ করতে না পারলে এই প্রতিযোগ ক্ষমতাই কেবল অসার বলে প্রতিপন্ন হবে না—সারা দেশে বামপন্থী রাজনীতি এক চূড়ান্ত সঙ্কটের সম্মুখীন হবে।

যে আশায় বসে জামাই মেয়ের গায়ে জ্বর—এই গ্রাম্য কথাটা আমার গত সপ্তাহে বারে বারে মনে পড়েছে। বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তের পর বাংলা কংগ্রেস নেতাদের কাছে আট পার্টির নেতাদের বিরতিহীন ধরনার চিত্র দেখে যেমন মনে পড়ছে আট পার্টির নাছোড়বান্দা রূপ, তেমন বাংলা কংগ্রেস নেতাদের চালচলন দেখে মনে পড়ছে জামাইয়ের বসে থাকা বৃথা, কারণ মেয়ের গায়ে জ্বর, এই কথা সত্য। বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আট পার্টির শরিক দল যে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, সেখান থেকে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মাইনাস হয়ে গেলে খুবই বিপদ হবে আট পার্টির শরিক দলগুলির। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবার পর বিগত কয়েক মাস শ্রীমুখোপাধ্যায়কেই কল্পনায় সম্ভাব্য ফ্রন্টের নেতা ভেবে যত দূর এগিয়ে গেছে আট পার্টি, সেখান থেকে ফিরে আসা খুবই মুসকিল। তাই আট পার্টির এত ধরনা, এত আনাগোনা, এত সতর্কবাণী।

কত বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা ঘটলো বিগত কয়েক দিনে তার ইয়ত্তা নেই। ভাবতেও অবাক লাগে বাজোর সি-পি-আই দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর প্রায় সব সদস্যই দুবার হাজিরা দিলেন বাংলা কংগ্রেসের দরজায়। একবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি—একবার বাংলা কংগ্রেসের দপ্তরে। দুবারই সঙ্গে ছিলেন শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্ত, যাঁর কলম দিয়ে কয়েকদিন আগেও শ্রীসুশীল ধাড়ার রাজনীতির পোস্টমর্টেম করে দেখানো হয়েছে—শ্রীধাড়ার রাজনীতি কত খারাপ। অনেক মজার দৃশ্যই চোখে পড়লো, কানে এল, গত সপ্তাহের রাজনীতির নেপথ্য চিত্রে।

পয়লা আগস্ট শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, বেরিয়ে এসে কয়েকটা কথা বললেন অতি স্পষ্ট ভাষায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন—আট পার্টিতে যোগদানের প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেসের "না" শেষ কথা নয়। শেষ কথা যদি হবে, তবে আবার অন্য দলের সঙ্গে আলোচনার অবকাশ রাখা হয়েছে কেন? নির্বাচন সম্পর্কে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের বর্তমান অশান্ত অবস্থার যদি দেখা যায় কোন উন্নতি হচ্ছে না, বরং আরো অবনতি হচ্ছে, তখন নির্বাচন চাইতে হবে—কারণ তাহলে বোঝা যাবে বর্তমান সরকার শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তার জন্য নির্বাচিত সরকার চাই। আর যদি দেখা যায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে, তখন ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচনের কোন মাথাই থাকবে না। ৫ই আগস্ট বাংলা

কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর সভার পর শ্রীসুশীল ধাড়া যে কথাগুলি বললেন, তাতে বোঝা গেল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেও সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়ে দিয়েছেন, "মেয়ের গায়ে জ্বর"। শ্রীসুশীল ধাড়া বললেন, আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত ও বহাল আছে, সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অধিকার থাকলে একমাত্র কর্মপরিষদের আছে। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, সংবাদপত্রে অজয়দার নামে 'বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়' বলে যা বেরিয়েছে, অজয়দা তা অস্বীকার করেছেন। এর পর শ্রীধাড়া বললেন—নির্বাচন সম্পর্কেও অজয়দার নামে যা বেরিয়েছে, সেটাও সত্য নয়। আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় অজয়দাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন—না, ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হতে পারে বলে যা বেরিয়েছে, সেই কথা সত্য নয়। শ্রীধাড়া যখন কথা বলছিলেন, তখন রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সি-পি-আই দলের নেতাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করছিলেন।

যে বন্ধ দরজার দিকে দেখে মনে পড়ছিল সেই অনেকদিন আগে একদিন কংগ্রেস ভবনে একটা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের কথা, সেই রুদ্ধদ্বার বৈঠক দেখে আমার সাংবাদিক বন্ধু ডঃ মুখার্জী বলেছিল—

দ্বার রুদ্ধ করি মিথ্যারে রুখি
সত্য বলে তবে আমি কোথা
দিয়ে ঢুকি।

সত্যি কথা বলতে কি, সেটাই ছিল রাজ্য কংগ্রেস ভাগ হবার আগে শেষ যুক্ত সভা, তার পর রাজ্য কংগ্রেস দুই ভাগ হয়—আরো পরে আদি ও নব কংগ্রেসে রূপান্তরিত হয়। এইখানেও সেই কথা—দ্বার রুদ্ধ করে হয়ত মিথ্যা সংবাদ বেরিয়ে

অজয় ঘোষ [illegible] সেই সঙ্গে সত্যেরও যে প্রবেশ নিষেধ হয়ে যাবে সে কথা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? অজয় ব্যাঙ্ক ভাঙিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে অনেকেই পার হবার বাসনা রাখেন—সেখানে ঘরের লোক যদি সেই কাজটা একটু বেশি করে, তবে বাইরের কারো আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু শ্রীধাড়া সেইদিন সাংবাদিকদের কাছে যখন একটার পর একটা বলছিলেন—অজয়দা এই কথা বলেন নি, অজয়দা ঐ কথা বলেন নি, আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এই কথা জেনেছি। এই কথা শুনে সাংবাদিকরা শুধু বুঝেছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় পরিস্থিতিটা কেমন বিয়োগান্ত হয়েছিল, যখন শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজের বিশ্বাসমত বলা কথাগুলি সভায় বসে ফেরত নিয়েছিলেন।

বাংলা কংগ্রেস ভবনে ভিতরের ঘরে বসে যখন সি-পি-আই নেতাদের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের আপোষ-আলোচনা চলছিল, তখন বাইরের ঘরে বসে শ্রীসুশীল ধাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটা বিবৃতি সাংবাদিকদের হাতে দিলেন শ্রীধাড়া। যে বিবৃতির মূল কথা হল সি-পি-আই জমি দখল আন্দোলনের মাধ্যমে পার্টি ফাণ্ডে টাকা সংগ্রহ করছে। সেই সঙ্গে শ্রীধাড়া বললেন, বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান সম্পর্কে "না" হল পাকা কথা—সেই কথা ফেরত হতে পারে এমন সম্ভাবনা বা প্রশ্ন নেই। কারণ এই সিদ্ধান্ত হল বাংলা কংগ্রেস কর্মপরিষদের। অর্থাৎ শ্রীধাড়া প্রায় এক কথায় বলে দিলেন—আট পার্টি অথবা সি-পি-আই জামাই যে আশায় বসে থাকুক, মেয়ের গায়ে জ্বর, অর্থাৎ বধূ নিয়ে জামাতার ফেরত যাবার সম্ভাবনা নেই, জামাতাকে খালি হাতে ফিরতে হবে। অবশ্য মেয়ের গায়ের জ্বর শুধু সি-পি-আই আর আট পার্টির ক্ষেত্রে নয়, শ্রীধাড়ার ক্ষেত্রেও কি তা প্রযোজ্য হয় নি? সি-পি-আই আর বাংলা কংগ্রেস বৈঠকে বসে একটা শান্তি প্রস্তাব রচনা করা হল—যে শান্তি প্রস্তাব রচনা করলেন স্বয়ং শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, নিজে হাতে কাগজে শান্তি প্রস্তাব লিখে কাগজখানি দিলেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ছোড়দার হাতের লেখা কাগজখানি সযত্নে নিজের নোটবুকের মধ্যে রেখেছিলেন। অর্থাৎ শ্রীসুশীল ধাড়াকেও মেয়ের গায়ে জ্বর দেখতে হল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা শান্তি চুক্তিতে। মেয়ের গায়ে জ্বর দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রীঅশোক ঘোষ অতি সংক্ষিপ্ত কথার মধ্য দিয়ে গত সপ্তাহে। অবশ্য শ্রীঘোষের বলা কথাটা

ঠিকমত কাগজে না বেরুনোতে পরদিন সকালে শ্রীঅশোক ঘোষই ফোন করে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন—দেখুন, কাগজে কিন্তু ভুল খবর বেরিয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেছিলেন—ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই, ভুল খবর তোমার নামে বের হয়েছে, আমার নামেও বের হয়। শ্রীঘোষ আট পার্টির শরিক দলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যখন নিশ্চিত হলেন যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে না এলেও কোন পার্টি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে যাবে না, তখন একদিন বললেন—বাংলা কংগ্রেসের সামনে দুটো পথ খোলা—আমাদের সঙ্গে থাকলে সে মাথায় মুকুট পরবে আর কংগ্রেসের সঙ্গে গেলে তাকে কবরের পথে যেতে হবে। কারণ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহ্য গড়ে উঠছে কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্য দিয়ে—সেই ঐতিহ্য নষ্ট হলে অজয় মুখোপাধ্যায়ের কি থাকবে?

এই যে সব কথাবার্তা, এই যে সব আলোচনা—এর মধ্যে প্রকৃত অবস্থাটা কি? প্রকৃত অবস্থা হল আমি অনেক আগেই বলেছি, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে আসবার আগে এবার অনেক কিছু সর্ত কবুল করিয়ে নেবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কংগ্রেসের একটা অংশের কাছে সি-পি-আই ও এস-ইউ-সি, ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু কিছু কাজ সি-পি-এম'এর কাজের সঙ্গে কোন তফাৎ বলে মনে হয় না।

মেদিনীপুরে সি-পি-আই জমি দখল নিয়ে যা করছে বা এস-ইউ-সি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যা করছে—তার সংগে সি-পি-এম'এর কাজের তফাৎ বাংলা কংগ্রেস খুঁজে পায় না। তাই বাংলা কংগ্রেস মনে করে আবার ফ্রন্ট করে, আবার সরকার করে যদি সি-পি-আই, এস-ইউ-সি, ফরোয়ার্ড ব্লকের আচরণে সরকার ভাঙতে হয়, তাহলে কি হবে? অজয়বাবু কি বাকী জীবনে শুধু ফ্রন্ট গড়বেন, সরকার গড়বেন আর ভাঙবেন? এই সংগে আরো একটা প্রশ্নও আছে, সেটা হল বাংলা কংগ্রেসের একটা অংশ কি ইতিমধ্যে শাসক কংগ্রেসের সংগে কোন পাকা কথায় বদ্ধ হয়ে গেছে? আট পার্টি এই ভাবনা থেকেও মুক্ত নয়।

বাংলা কংগ্রেস যে আট পার্টিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, তার তিনটে কারণ হতে পারে। এক কারণ হল—দলের মধ্যে আট পার্টি আর নব কংগ্রেসে যাওয়া নিয়ে নিশ্চয়ই দুটো মত আছে, কাজেই দুই মত এক না হওয়া পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেস কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আর এক কারণ হতে পারে—বাংলা কংগ্রেসের নব কংগ্রেসে যাওয়া পাকা হয়ে গেছে, এখন শুধু চেষ্টা কর; আট পার্টি থেকে কোন কোন দলকে নিজেদের দিকে টেনে আনা যায় কিনা।

তৃতীয় কারণ হতে পারে বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতেই যোগদান করবে, তবে এবার বিড়াল পরলা রাতেই বিড়াল মারতে চায়। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনের পর বাংলা কংগ্রেস আসন সংখ্যা যাই পাক না কেন, মুখ্যমন্ত্রিত্ব সহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পাবে; মুখ্যমন্ত্রীর থাকবে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার; মুখ্যমন্ত্রী হবেন মন্ত্রিসভার যে কোন আদেশ জারি ও বাতিলের মালিক—সেই সংগে ঘেরাও, জোর করে জমি দখল চলবে না, হিংসার পথ ত্যাগ করতে হবে, সব রকম জোর-জবরদস্তিমূলক পথ পরিহার করতে হবে—এই সর্তগুলি কবুল করিয়ে নিতে চায়।

একটা চলতি কথা আছে—চাচি যতদিনে লায়েক হবে, চাচা ততদিন গোরে যাবে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা কংগ্রেস-আট পার্টির অবস্থা হল তাই—এই দুই পক্ষ যতদিনে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পৌঁছবেন, ততদিনে দেখবেন চাচার গোরে যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও আট পার্টি রাজ্যে যে বিকল্প একটা রাজনৈতিক লাইন দিতে

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রাজনৈতিক উপন্যাস 'স্রোতের সংগে' প্রকাশ করা গেল না।

—সম্পাদিকা

যাচ্ছে, সেই লাইন ভোঁতা হয়ে যাবে। আট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের লাইন ছিল—কংগ্রেস নয়, আবার মার দাঙ্গার পার্টি সি-পি-এম নয়, মাঝের পথই হল বাঁচার পথ। এই লাইনটা দুইপক্ষের কচলাকচলিতে ক্রমেই তেতো হয়ে যাচ্ছে ও গেছে। **ফলে আট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের ভবিষ্যতে যদি জোটও হয়, তাহলে সেই জোট একটা সুবিধাবাদী জোটের বেশি মর্যাদা পাবে না। অবশ্য এর মধ্যে যদি কোন পক্ষের এমন মতলব না থাকে যে—ভিতরে থেকে এই জোটের মর্যাদা নষ্ট করে নিজের অভীষ্ট স্থানে চলে যাবার, সেটাও খুব অসম্ভব ঘটনা নয়।**

আট পার্টি জোটের মধ্যেও এমন কেউ থাকতে পারেন, যাঁদের লক্ষ্য হল—এই দিকে জট পাকিয়ে যথাসময়ে সি-পি-এম'এর সঙ্গে হাত মেলানো অথবা ডামাডোল লাগিয়ে নব কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া। কিন্তু সত্যি কি আজ বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্টি ছাড়াছাড়ি হতে পারবে? সত্যিই কি এই দুই-পক্ষ একে অপরকে ছেড়ে চলতে পারবে? **এই প্রশ্নের জবাব সহজ নয়,** তবে একটা নমুনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যেতে পারে। এই অবস্থা হল এইরকম। যথা এক অন্ধ আর এক খোঁড়া মিতালি করে রাস্তা চলে আর উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্ধের কাঁধে বসে থাকে খোঁড়া। অন্ধ তার সবল পায়ে পথ চলে। খোঁড়া তার চোখ দিয়ে অন্ধকে পথের নিশানা বলে দেয়। কিন্তু একদিন অন্ধের মনে সন্দেহ এল আমার কাঁধে চেপে খোঁড়া ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে, নিশ্চয়ই ও আমার অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে বেশি খাচ্ছে, অতএব ওকে আর বইব না। এইভাবে একদিন অন্ধ খোঁড়াকে পথে নামিয়ে বলল, আমি আর তোমাকে বইতে পারবো না—তুমি তোমার পথ দেখ। খোঁড়া বলে—সে কি, আমার পা নেই, আমি যাবো কিভাবে, বাবা অন্ধ তুমি সর্ত দাও, আমি মেনে নিচ্ছি, আমায় কাঁধ থেকে নামিও না। অন্ধ অনেক দর কষাকষি করে বলে—হ্যাঁ একটা সর্ত আছে, তোমার শরীরের ওজন কমাতে হবে, তবে আমি তোমায় বইবো। খোঁড়া বলে, এ কি সর্ত বাবা, শরীরের মাংস কেটে তো ওজন কমানো যায় না, এই সর্ত মানবো কি করে? অন্ধ বলে, না মানো ভাল কথা, পড়ে থাকো এই মাঝপথে। আমি চললাম। খোঁড়া ককিয়ে ওঠে, অন্ধ তোমার সর্ত মানবো কিভাবে বল, কি করে আমার ওজন কমাই বলে দাও।

অন্ধ বলে, কেন, তুমি খাওয়া ছেড়ে দাও। একেবারে ছাড়তে হবে না, তবে কমিয়ে দাও, ওজন কমে যাবে। খোঁড়া বলে, তাই হবে বাবা, কাল থেকে আমি খাওয়া ছেড়ে দেব, ওজন কমাবো, তুমি আমায় কাঁধে তোল।

কিন্তু খোঁড়া নিজের 'পর আস্থা হারিয়ে একবারও ভাবলো না—আচ্ছা আমায় ফেলে অন্ধ যাবে কোথায়? ও তো একটু এগুলেই খানা-খন্দ-গর্তে, কাঁটাবনে পড়বে।

হ্যাঁ, বাংলা কংগ্রেস আজ আট পার্টিকে যে সর্ত দিতে চায়, সে হল ঐ ওজন কমাবার সর্ত—না খেয়ে থাকার সর্ত। শ্রীঅশোক ঘোষ শ্রীসুশীল ধাড়াকে শেষ কথা বলে এসেছেন—আপনি বলুন, কি কি সর্তে বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করতে পারে। শ্রীঘোষ আগামী ১৬ই আগস্টের মধ্যে এই সর্তের তালিকা পেতে চেয়েছেন এবং সেই জন্য অপেক্ষা করছেন।

—১০ই আগস্ট, '৭০

॥ এক ॥
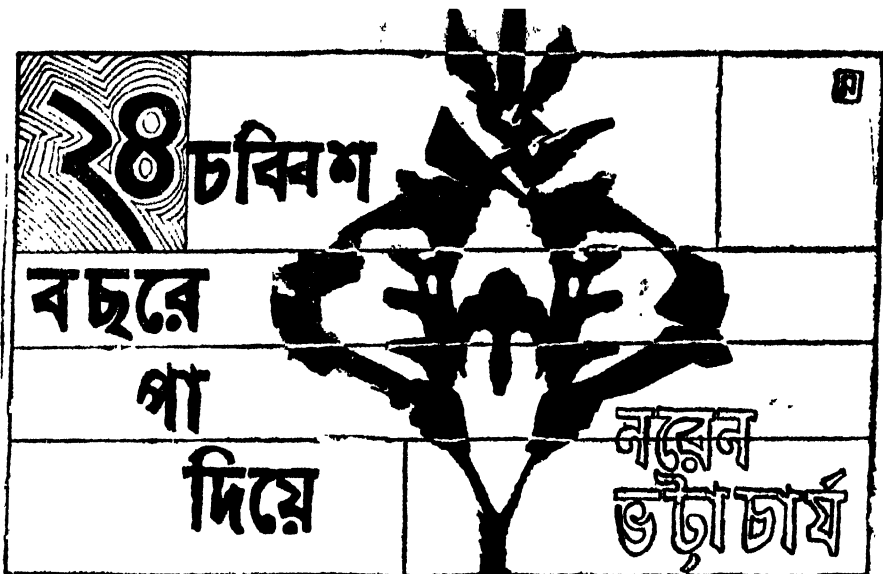
প্রতি বছরেই সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি করে প্রবন্ধ আমাকে লিখতেই হয় এবং বলাই বাহুল্য, এই বাৎসরিক কর্মে আমি খুব প্রীতিবোধ করি না। সমগ্র ব্যাপারটাই আমার কাছে নিছক আনুষ্ঠানিক বলে মনে হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে পনেরই আগস্টের মত স্মরণীয় দিনটি তার সমস্ত গুরুত্বই হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের কাছে এই দিনটি কোন আশার বাণী বহন করে আনে না। সকল উন্নত দেশেই স্বাধীনতা দিবস জনগণের নিকট একটি উৎসবের দিন। এখানে সে সবের বিন্দুমাত্র নেই। গৃহশীর্ষে এই দিনে পতাকা উত্তোলিত হয় না, সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে আলোকসজ্জার কথা কল্পনা করা যায় না। সরকারী ভবনগুলিতে অবশ্য পতাকা ওঠে, সেও তো আনুষ্ঠানিক, সেখানেও কোন প্রাণের স্পর্শ নেই। রুটিনমাফিক কুচকাওয়াজ হয়, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সংবাদপত্রে ছাপা হয়। সাধারণ মানুষ ঐ একদিনের ছুটিকেই যথা লাভ বলে মনে করে। এ অবস্থা কেন ঘটল, সেটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। জনসাধারণের সর্বাংশিক অংশ সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করেন যে, সত্যকারের স্বাধীনতা তাঁরা পান নি। মুষ্টিমেয় কিছু লোক গত তেইশ বছরে অবৈধ উপায়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এবং সরকার ও সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা তাদেরই সেবায় নিয়োজিত। জনসাধারণের কোন মঙ্গল বিগত তেইশ বছরে হয় নি। গাল-ভরা বুলি ভিন্ন জনসাধারণ শাসকদের কাছ থেকে আর কিছুই পায় নি। সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক শাসক-শাসিতের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

॥ দুই ॥

একজন ঐতিহাসিক হিসাবে এর জন্য আমি নিশ্চয়ই আজকের ও বিগত দিনের নেতা ও শাসকদের দায়ী করব। একটা কথায় অনেকেই অস্বস্তিবোধ করবেন, কিন্তু তাহলেও কথাটি মোটামুটিভাবে সত্য যে, এদেশে যে-কোন আত্মবিশ্বাস মানুষের পক্ষে নেতা হওয়া সম্ভব ছিল এবং তা আজও সম্ভব এবং তার জন্য কোনদিনই খুব বেশি মূল্য দেবার প্রয়োজন হয় না। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে কোন ব্যক্তি যদি তাঁর ব্যক্তিগত পেশায় সাফল্য-লাভ করতে পারতেন, যদি তিনি রাজনীতি করতে চাইতেন, তাহলে তাঁর জন্য নেতার আসন আপনিই তৈরি হয়ে যেত। অতীত আমলের যাঁরা খুব বিখ্যাত নেতা বলে পরিচিত, তাঁরা এইভাবে নেতৃত্বে এসেছেন। কিন্তু জনজীবনের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই ছিল না। বড় ব্যারিস্টার বা বড় ডাক্তার বা বড়দরের চাকরে নাম-ধাম-প্রতিপত্তির জন্যই রাজনীতিতে নামতেন, সহজেই নেতা বনতেন সে আমলের কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের ব্যবহার ছিল অননুকরণীয় ভদ্রতার। পৃথিবীর আর কোন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী নেতারা বড়লাটের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে সংগ্রাম করেন নি। উৎপীড়ন বলতে কিছুই ছিল না, শুধু মাঝে মাঝে জেলে যাওয়া, সেটায় লাভ বৈ লোকসান ছিল না, সে আমলে জেলে যাওয়া মানেই বিরাট পাবলিসিটি পাওয়া। অনেকেই মনে মনে জেলে যাওয়াটাকে স্বাগত জানাতেন! অবশ্য সাধারণ কর্মীরা উৎপীড়িত হতেন, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মোদ্দা কথা সাদা শাসকেরা তৎকালীন কংগ্রেস নেতা-দের সঙ্গে বাদামী শাসকের মত ব্যবহার করতেন, পুরুর সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের ব্যবহারের মত।

মোহটা আজকে ভাঙিয়ে দেবার সত্যিই বড় প্রয়োজন দেখা গেছে। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে, মানুষ হিসাবে এঁরা সকলেই ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর। দেশপ্রেম ও সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী কারোর ছিল না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের কল্যাণে কংগ্রেস তৎকালীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল এবং এই ক্ষমতার লোভকে বৃটিশ সরকার ক্রমাগত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল, লিওনার্ড মোজলের ভাষায়, যেমন লোকে গরুর সামনে গাজর ঝুলিয়ে দেয়। দূরদৃষ্টিহীন, ক্ষমতালোভী এই তৃতীয় শ্রেণীর আদর্শহীন, নীতিভ্রষ্ট মানুষগুলি অতি সহজেই ভারত বিভাগে রাজী হয়েছিল, জিন্না আর মুসলিম লীগকে দোষ দিয়ে কি হবে! ভারত বিভাগ করে ক্ষমতালাভের স্বপ্ন কংগ্রেস বহুকাল ধরেই দেখে এসেছে। রাজাগোপালাচারী ফর্মুলার কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

দেশ স্বাধীন হবার পর নেতৃত্বের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটল না। বরং তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের নেতৃত্বের পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর মানুষদের হাতেই নেতৃত্ব এল। আগেকার দিনে নেতৃত্ব পেতে হলে নিজের ব্যক্তিগত পেশায় সাফল্যের প্রয়োজন ছিল এবং পরবর্তীকালে নিছক টাকাই নেতৃত্ব লাভের একমাত্র যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হল। রাজ্যের চোর-বদমায়েস, গুণ্ডা, লম্পট, কালোবাজারীরা স্রেফ টাকার জোরে নেতা বনে গেল। স্বাধীনতার পরবর্তী বাইশ বছরের রাজ-নীতি ইলেকশান-নির্ভর। ভোটে জিততে গেলে টাকা লাগে, হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা। সৎ কর্মীদের ট্যাঁকের অবস্থা এমন নয় যে, নির্বাচনের ওই বিপুল ব্যয়ভার বহন করবেন। কাজেই দল কেন তাঁদের মনোনয়ন দেবে? সব টাকাওয়ালারা ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছেন, আর

তিন ভুবন জুড়ে এখন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পিছনে হাঁটার সময় এখন নয়। এখন মানুষের মুখের ওপর ভিয়েতনামের আলো, বুকের মধ্যে প্যারির তোলপাড় আর কালো আগুনের গর্জন—যে আগুন পুড়িয়ে দিতে চায় হার্লেমের সমস্ত অপমান আর গ্লানি, যে আগুন ধিকি ধিকি জ্বলে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর রোডেশিয়ায়, কঙ্গোয়, এমন কি এই লাখো লাখো বেকারের ভিক্ষুকের উলঙ্গের দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষে। পেছনে হাঁটার সময় এখন নয়।

এখন দেয়ালে দেয়ালে ইস্তেহার আর কবিতা লেখার সময়; এখন তিন ভুবন জুড়ে রক্তে ভাসা মানুষগুলোর মাথা তুলে দাঁড়ানোর সময়। এখন প্রতিটি মানুষের হাতের মুঠোয় একটি ক'রে লাল নিশান; কোনটি ছোট কোনটি বড় তাতে কিছু আসে যায় না—কাঁধে রাইফেল; গাদা বন্দুক হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু পেছনে হাঁটা এখন অসম্ভব।

এখন একাকার জেলখানায় সারা রাত ঘুমুতে না পারা হো চি মিনের আর বাইরে ভেজা ঘাসের ওপর সারারাত জেগে থাকা চে গেভারার কণ্ঠস্বর। এখন হার্লেমের দেয়ালে আর প্যারির রাস্তায় একটিই কবিতা, শিকল ভাঙার শব্দ, কেবল শিকল ভাঙার শব্দ, আর রাইফেলের শব্দ......

এমন কি এই লাখো লাখো কাপুরুষের, ভিক্ষুকের, ক্রীতদাসের ভারতবর্ষ; শতাব্দীর পর শতাব্দী যে শুধু খুঁড়িয়েই হাঁটতে শিখেছে; যার কবিরা বোবা, শ্রমিক আর কৃষাণেরা বধির—সে-ও এগিয়ে চলেছে। বুকগুলি সরু সরু; কঙ্কালের মত চেহারা; একটি দুটি তিনটি, বড়জোর চারটি কি পাঁচটি মানুষ এখানে, ওখানে—হাতের নিশানগুলি এত ছোট যে ভাল ক'রে দেখা যায় না! কিন্তু কিছু আসে যায় না। একটা গাদা বন্দুক দিয়েও অসাধ্য সাধন করা যায়, যদি কেউ আগুন ছুঁয়ে শপথ করে।

টাকার জোরে তারা সহজেই মনোনয়ন বাগিয়ে নিতে পেরেছিল। ভারতের এতগুলি বিধানসভা, লোকসভা, শুধু তাই নয়, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রয়োজন থাকে, সর্বত্রই এই টাকার কুমীরদের আধিপত্য। কালো টাকাকে সাদা টাকায় পরিণত করার একটা ভাল ক্ষেত্র নির্বাচন, হিসাববহির্ভূত অর্থ প্রাণ খুলে ব্যয় করার এমন মওকা বড় একটা মেলে না। পুঁজিপতিরাও তাদের ইয়েস-ম্যানদের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে লাগল। তাদের কালো টাকা সাদা হবার এটা একটা ভাল ক্ষেত্র, আর যেসব লোক এদের টাকার জোরে ক্ষমতায় যাবে, তারা এদেরই স্বার্থ দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর এতগুলি বছরে এইসব ব্যক্তিদের কপালেই স্বর্গসুখ জুটেছে, জনসাধারণের কিছু হয় নি।

॥ তিন ॥

এরপর বামপন্থী নেতৃত্বের কথায় আসা যাক। বামপন্থী নেতৃত্ব বলতে আমি মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী দলগুলির কথাই বলছি। পি-এস-পি, এস-এস-পি এবং অপরাপর কংগ্রেস-বিরোধী দলের কথা বলছি না, কারণ আমার বিশ্বাস, এগুলি কংগ্রেসেরই চারা, কংগ্রেসে পাত্তা না পেয়ে কিছু নেতা এইসব দল খুলেছেন। আর রাম-শ্যাম-যদু-মধু এদেশে ইচ্ছা করলেই দল গঠন করতে পারে।

এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির বয়স বড় কম নয়, প্রায় অর্ধশতাব্দী এবং সেই তুলনায় তার অ্যাচিভমেন্ট এমন একটা কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অন্যান্য রাজ্যে নগণ্য। অন্ধ্রে একদা প্রভাব ছিল, কিন্তু এখন তা নেই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এত বছরের জীবনে কমিউনিস্টদের প্রভাব এত কম কেন? বিশেষ করে এমন একটা সময় ছিল, যখন সবচেয়ে ডিসিপ্লিনড্ এবং রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীর গর্ব অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারত। কিন্তু যে দলের একটি জোরালো রাজনৈতিক তত্ত্ব ছিল এবং যে দলের কর্মীরাও এফিসিয়েন্ট ছিল, সে দলের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এত পুয়োর শো কেন? এখানেও সেই নেতৃত্বের প্রশ্ন। কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক-শ্রমিকদের পার্টি হলেও সেখানে কৃষক-শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই পার্টির নেতৃত্ব সর্বতোভাবেই মধ্যবিত্ত-নির্ভর, মূলত এর প্রভাব শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যারা মূলত বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করেই পেট চালায়। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষকদের উপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব নামমাত্র, শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অর্ধেকও কমিউনিস্ট পার্টির আওতায় নেই, পুলিশ ও সামরিক বিভাগে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ যৎসামান্য। একমাত্র ছাত্র-শিক্ষক-করণিক এবং নিম্ন আয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই এর প্রভাব। তাও সর্বভারতীয় পরিসরে নয়, উত্তর ভারতের ছাত্ররা মূলত দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শিবিরভুক্ত, দক্ষিণ ভারতেও এমন কিছু অনুকূল অবস্থা নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস যত্ন করে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, বরাবরই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। আজকের কমিউনিস্ট পার্টি যে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তা ওই বহুকালসঞ্চিত নেপথ্য দ্বন্দ্বের ফল। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন তেমন যে সাফল্যলাভ করতে পারে নি, তার কারণ কমিউনিস্ট পার্টির খুব কম সমর্থকই নিজেদের অভিজ্ঞতায় কমিউনিস্ট হয়েছেন। বেশির ভাগ কমিউনিস্টেরই সৃষ্টি বই পড়ে এবং প্রচারে। আমার নিজের হিসাব অনুযায়ী, কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে একেবারে গোড়ার দিকের কমিউনিস্ট, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যাঁরা বিলেতে পড়াশোনা করতে গিয়ে কমিউনিস্ট বনেছিলেন, তৃতীয়টি হচ্ছে যাঁরা আগে সন্ত্রাসবাদী ছিলেন পরে কমিউনিস্ট হয়েছেন এবং চতুর্থটি হচ্ছে যাঁরা আগে কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, কৃষক-সভা ইত্যাদি করতেন, পরে তিরিশের দশকে নিজ কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় কমিউনিস্ট হয়েছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীটিই নির্ভরশীল, কেন না বই পড়ার চেয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এ'দের বেশি কাজ দিয়েছে এবং জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রকৃতপক্ষে এ'রাই রেখেছেন। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত শ্রেণীটি পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব পায় নি বলেই আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন অভিজ্ঞতা-নির্ভর হয়ে ওঠে নি এবং তারই ফলে এদেশে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং বা হো চি মিনের মত প্রকৃত কোন পীপল্স্-ম্যান কমিউনিস্টদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠেন নি। গান্ধীজীর রাজনীতির আদর্শ এবং রাজনীতিতে আমার আস্থা নেই, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বকে কোনদিন অস্বীকার করা যাবে না যে একটি অনুন্নত, অশিক্ষিত, অচেতন, অন্ধ এবং বহুধা-বিশিষ্ট জাতির সর্বস্তরে তিনি স্বাধীনতালাভের আবেগটিকে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ঠিক এই রকম একজন জনতার মানুষ সৃষ্টি হয় নি, যিনি সারা দেশে কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহ সার্বিকভাবে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী অপরাপর ছোটখাট পার্টিগুলিকে আমরা বর্তমান আলোচনায় টানছি না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বর্তমানে গরিলাযুদ্ধ সম্বন্ধে পত্র-পত্রিকায় নানা কথা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতি ইতিহাসের পাতায় নতুন নয়। শিবাজীর বীরত্ব কাহিনী এই যুদ্ধ-পদ্ধতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। আমেরিকার রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় বিপ্লবী-বীর ফ্রানসিস মেরিয়নের বীরত্ব কাহিনী, তাও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। (ক) ১৮০৮-১৮১৩ সালে নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে সামনাসামনি প্রতিরোধ শক্তি যথাযথভাবে সন্নিবেশ করতে অসমর্থ হয়ে স্পেনবাসীরা যে যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেটিও ছিল এই গরিলা-পদ্ধতিরই সমতুল্য। এর কয়েক বছর পরে রুশের কসাক সৈন্য ও চাষীরা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেটিকেও এক গরিলা ধরনের যুদ্ধ-কৌশলই বলা চলে। আবার অল্প-কিছুর এক শতাব্দী অতীত হওয়ার আগেই হিটলার সাহেবের প্রবল শক্তি রুশের কাছে যখন বিপর্যস্ত হয়, সেখানেও অবলম্বিত হয়েছিল এই গরিলা-কৌশলই। সর্বশেষ মাও সে-তুং (খ) দিয়েছিলেন এই পদ্ধতিকে একটি ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। অবশ্য এই সম্পর্কে একথা ভুললে চলবে না যে, পূর্বোক্ত গরিলাযুদ্ধের কৌশল সকল ক্ষেত্রেই অবলম্বিত হয়েছিল বহিঃ-শত্রুর বিরুদ্ধে আর মাও-কে তাঁর গরিলা কৌশল প্রয়োগ করতে হয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহ-শত্রুর বিরুদ্ধে। সেখানে একদিকে ছিল ধনী, পুঁজিপতি ইত্যাদির প্রভাবে সংগঠিত, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রশক্তি আর অপর পক্ষে ছিল নানাভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত অন্তর্বেদনায় জর্জরিত গরীবের আর্তনাদ।

যখন কোন দেশে রাষ্ট্র তার অধিকাংশ নাগরিকের জীবনধারণের সন্তোষজনক মান বজায় রাখার কাজে সাহায্য করতে অসমর্থ হয়, তখন সেখানে স্বভাবতই একটা প্রচ্ছন্ন বৈপ্লবিক ভাব বিরাজ করে। আবার সেই বৈপ্লবিক ভাবধারাকে সুদৃঢ় করার জন্যে তারই ভিতরে যদি কোন সুবিন্যস্ত সংগঠন গড়ে ওঠে, তা হলে আর কথাই নেই। তখন বাকি উপাদানের যা অভাব থাকে, সেটি হচ্ছে একটি প্রচণ্ড বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা। (গ) স্যামুয়েল বি গ্রিফিত এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ১৯৬১ সালে—মাও সে-তুং-এর গরিলা যুদ্ধ-কৌশল পর্যবেক্ষণ করে।

কিন্তু এই পদ্ধতিকে কোন একটা সাময়িক বিস্ফোরণের ব্যাপার বলে মনে করলে সত্যই ভুল করা হবে। চীনে এই

(ক) দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে লালিতপালিত হয়ে সামান্য বিদ্যাশিক্ষার পরে মেরিয়ন কিছুকাল কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ৭২ বছর বয়সে, ১৭৫৯ সালে তিনি চেরোকিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে সংগঠিত এক সৈন্যদলে যোগ দেন। অতঃপর রাষ্ট্রের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে, কিছুজনা লোকের সাহায্যে একটি সামান্য সৈন্যদল তথা কোম্পানি গঠন করে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশদের উপর উপর্যুপরি আঘাত হানেন, বিশেষত কর্নওয়ালিসের চরম অগ্রগমনে বিঘ্ন ঘটান।

(খ) মধ্য চীনের হুনান প্রদেশে এক অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারে মাও জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ সেকেণ্ডারী স্কুলে শেষ করে ১৯১৭ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। ইতিমধ্যে চীন ও অন্যান্য দেশের দর্শনশাস্ত্র, কবিতা, ইতিহাস ইত্যাদি পড়া কিছুই তাঁর বাকি ছিল না। অতঃপর পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। এই স্থানে তিনি লি তা চো (Li Ta-Chao) এবং চেন-তু-সিনের (Chen-Tu-Hsin) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সিজম-পাঠচক্রে যোগ দেন এবং মার্ক্স ও এঙ্গেলসের লেখা পড়তে শুরু করেন। এইভাবে তিনি ক্রমে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে নিজের জীবন-ব্রত নির্ধারণ করে নেন এবং মার্ক্স ও লেনিনের ভাবাদর্শে নব-চীন প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প নেন। তবে চীনের জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করার কথা তিনি কখনও ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। কৃষ্টি ও সংস্কৃতির দিক থেকে চীন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকে চীন কিন্তু তখন বিশৃঙ্খলার চরমে অবস্থান করছিল। আর কৃষিজীবীদের অবস্থা ছিল অতি হীন। ফ্রান্স, বৃটিশ, জারমান, রুশ প্রভৃতি দেশ সেই সুযোগে চীনে প্রবেশ করে নিজেদের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্যে শুরু করেছিল একটা বিশেষ প্রতিযোগিতা। তাই মাও চেয়েছিলেন সেই পরাশক্তির সমাপ্তি ঘটিয়ে সাধারণ চীনবাসীর বাঁচার মত বাঁচার ব্যবস্থা করতে।

(গ) "A potential revolutionary situation exists in any country where Government consistently fails in its obligation to ensure at least a minimally decent standard of life for the great majority of its citizens. If there also exists even the nucleus of a revolutionary party able to supply doctrine and organisation, only one ingredient is needed : the instrument of violent revolutionary action.* (* Guerrilla Warfare by Mao Tse-Tung & Che Guevara with a Foreword by Capt. B. H. Liddell Hart :] P.—3).

কৌশলের প্রথম ব্যাপক প্রকাশ পেয়েছিল বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে, জাপানীদের দ্বারা চীন আক্রান্ত হওয়ার সময়ে— একথা মনে রাখা দরকার হবে। চীন ছিল সেদিন যুদ্ধবাজদের তীর্থক্ষেত্র, আর বাইরের আক্রমণের পক্ষে একটি উর্বর ক্ষেত্র। একদের দুরবস্থা পৌঁছেছিল সেখানে চরম শিখরে। জেনারেল চিয়াং কাই-সেক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাইঃশত্রুর আক্রমণ মোটামুটি প্রতিহত করার পরে, তাঁর ন্যাশানাল রেভোলিউশনারী আর্মিকে কমিউনিস্টদের প্রভাবমুক্ত করার জন্যে যখন উদ্যোগী হলেন, সেই সময় চীনে আবার আভ্যন্তরীণ ঝড় প্রবাহিত হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে চীনে যখন তাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে আবার প্রশ্ন ওঠে, তখন কিন্তু ন্যাশানালিস্ট ও কমিউনিস্ট শক্তি পুনরায় এক হয়ে জাপানীদের প্রতিরোধ করেন সাফল্যের সঙ্গে। (ঘ) চীনের কমিউনিস্ট অবশ্য এই সুযোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের দলীয় প্রচার চালাতে ভুল করেন নি। এইভাবে চীনের ন্যাশনালিস্ট ও কমিউনিস্ট দল একত্রে জাপানীদের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করার পর মাও সে-তুং-এর দল ও তাঁর আদর্শ অল্প কয়েক বছরের ভিতরে চীনের মধ্যে যথেষ্ট প্রসারলাভ করে। আর সেই সুযোগে চিয়াং-এর সাহায্যার্থে প্রেরিত আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্রের অধিকাংশই তাঁদের হস্তগত হয়।

যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারায় বিপর্যস্ত চিয়াং-সরকার সেদিন নিজেদের দেশের জনসাধারণকে তাঁদের জীবনের হার বজায় রাখার জন্যে (standard of living) নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে বার বার অসমর্থ হতে থাকেন। স্বভাবতই দেশের চতুর্দিকে নানারূপ বিশৃঙ্খলার হাওয়া প্রবহমান হয়ে ওঠে। মাও সে-তুং পরিচালিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন পূর্ণমাত্রায়, নিজেদের সংগঠনকে সবল করে তোলার কাজে। অপরদিকে পুঁজিপতি রাষ্ট্রের মত চীনের অধিবাসীরাও সেদিন স্পষ্ট দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক—ধনী, অপর—অতি দরিদ্র। অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—যথা ব্যবসায়ী, ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদির মধ্যে সবল নেতৃত্বের অভাব ছিল। পরিবর্তে ছিল—হিংসা, দ্বেষ, সাম্প্রদায়িক দলাদলি, আর বাস্তব রাজনৈতিক অকর্মণ্যতা। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদী সম্প্রদায় বা উদার পার্লামেন্টারি ডিমক্রেসির ভাবযুক্ত দল ছিল, সেগুলি এক-একটি অভিশপ্ত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথা মনে পড়ে।

অতঃপর চীনে সেদিন ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ঐ উৎকট বৈষম্য দূর করার জন্যে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল, তার একদিকে ছিল বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত চিয়াং কাই-সেকের সৈন্যশ্রেণী, আর অপর দিকে ছিল বৈপ্লবিকভাবে প্রভাবিত সুসংগঠিত গণশক্তি। আর সেই গণশক্তির যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে অবলম্বিত কৌশল হয়েছিল গরিলা পদ্ধতি। সেই আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে। তবে এই গরিলা কায়দায় যুদ্ধ-পদ্ধতিই কেবল একটা রাজনৈতিক শক্তি দখল করার পক্ষে যে সকল কিছু, এই কথা মনে করা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ, অপরাপর গরিলা কায়দায় যুদ্ধ পরি-

(ঘ) প্রসংগত, আলোচ্য সময়ে জাপানীদের আক্রমণ পদ্ধতি এবং চিয়াং-এর তা প্রতিহত করার কৌশল একটু জানা প্রয়োজন। জাপানী আক্রমণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল, চীনের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করা।

"One of the earliest and most malicious atrocities committed by the Japanese War machine since the out-break of the Lubouchiao maident in July, 1937, was the complete destruction of the costly & beautiful Nanki University, one of the leading institutions of higher Learning." * (* 'Chinese Education in the War' by Hurbert Treyn: pp. 14-15) এটি হচ্ছে এইরূপ বহুর মধ্যে একটি উদ্ধৃতি মাত্র।

চলকদের পক্ষে তাঁদের পারিপার্শ্বিক সমকালীন অবস্থার কথা বাদ দিয়েও স্বনামধন্য মাও সে-তুংও এই কথা কখনই অস্বীকার করেন নি। মাও-এর মতেই এই জাতীয় যুদ্ধকৌশল একটি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পক্ষে চেষ্টার শেষ পরিণতি মাত্র। আর এই পরিণত অবস্থায় পৌঁছাবার আগে আরো কতকগুলি অপরিহার্য ধাপ থাকে, যে ধাপগুলি যথাযোগ্যভাবে অতিক্রম করার ব্যবস্থা না থাকলে উক্ত কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক।

যথা—(১) নির্দোষ সংগঠন প্রচেষ্টা—যে কাজ যথেষ্ট ধৈর্য ও সময়সাপেক্ষ।

(২) সর্বদল একত্রীকরণের কাজ (Consolidation)—মত ও পথ এক হলেও প্রকৃতভাবে চলার ধাপ যদি না মেলে, সংগঠনের কাজ বাস্তবে রূপান্তরিত করার পক্ষে বহু বাধার উদ্রেক স্বাভাবিক।(ঙ)

(৩) বিচ্ছিন্ন-দুর্গম ও গুপ্ত অঞ্চলের সংরক্ষণ—যে সকল স্থানে স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষার মাধ্যমে বিশিষ্ট ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং যে সকল স্থান হতে আন্দোলনকারী ও প্রচারকদের গ্রামান্তরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়, গ্রামবাসীদের দেশে প্রচলিত পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে দলীয় সভ্যতালিকাভুক্ত করার জন্যে।(চ) এই সকল কাজে ধৈর্য ও কর্মনিষ্ঠার যথেষ্ট প্রয়োজন থাকে। কারণ এইভাবে এমন এক-একটি সংরক্ষিত বেষ্টনী গড়ে তোলবার প্রয়োজন হয়, যে সকল স্থান হতে সক্রিয় কর্মীদের জন্যে খাদ্য সরবরাহ ইত্যাদি চলতে পারে সুশৃংখলে, স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্তির কাজে চলে ধীর ও স্থির গতিতে এবং খবরাখবরের আদান-প্রদান হয় সহজ ভঙ্গিতে। তাইতো ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল স্যামুয়েল বি গ্রিফিতের উক্তি—"গরিলা পদ্ধতিতে কাজ করার জন্যে প্ল্যান তথা মতলব স্থির করার জন্যে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিই হচ্ছে চূড়ান্ত উৎপাদক।"

—"Intelligence is the decisive factor in planning guerrilla operation."*
(* Mao Tse-Tung & Che-Guevera, p.—19)—1.

গরিলা যুদ্ধকৌশলের আধুনিক কর্মপদ্ধতির কথা ভাবলে সমস্ত ধাঁচ ও ধাপগুলিকে একত্রে একটি চক্রান্তমূলক ব্যাপার বলা চলতে পারে। এই পদ্ধতির যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ বাহ্যত রহস্যময় বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে সেগুলির সমস্তই সুনিশ্চিত এবং ক্রমবর্ধমান। তবে শেষ পরিণতি তথা যুদ্ধপদ্ধতির কৌশল হয় বিক্ষিপ্ত ধাঁচের। কিন্তু যাবতীয় কায়দা-কৌশলের অন্তরালে ধৈর্য, বুদ্ধি, কর্মনিষ্ঠা ইত্যাদির সংমিশ্রণ না থাকলে সাফল্যের পথ হয় সুদূরপরাহত।(ছ) এই কৌশল অবলম্বন করার পূর্বে বৃদ্ধ-যুবক, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, মেষপালক-গাড়োয়ান-চাষী-শ্রমিক, বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, গৃহের পুরোহিত, নৌকার মাঝি ইত্যাদি সকল স্তরের মানুষের মধ্যে প্রচার, সংগঠন ও প্রত্যেকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহানুভূতি লাভের ব্যবস্থা করা চাই ধীরস্থির বুদ্ধির মাধ্যমে।(জ) তাই সকল ক্ষেত্রেই মূলে থাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, স্ব স্ব পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করার ব্যবস্থা, আর দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা। এখানে ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দলীয় চাঁদা আদায় ইত্যাদির স্থান বোধ হয় অল্প। যাবতীয় অন্যায়ের সম্ভাব্য প্রতিরোধ করে সমগ্র দেশের অত্যাচারিত মানুষের হৃদয় জয় করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে কর্মের মূল সূত্র। তাই একটি বৈপ্লবিক গরিলা আন্দোলন গড়ে তোলা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ।
—"A revolutionary guerrilla movement is organised and then begins."

প্রকাশ, আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু কিছু বৈপ্লবিক কাজকর্ম নাকি গরিলা পদ্ধতিতে সংঘটিত হয় বা হয়ে থাকে। সত্য-মিথ্যা বোঝা কঠিন। তবে বৈপ্লবিক আখ্যাযুক্ত যে সকল কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হয়, সেইগুলিকে যদি মহামানব মাও সে-তুং-এর সর্বশেষ সংশোধিত বৈজ্ঞানিক গরিলা পন্থার আখ্যা দেওয়া হয়, তা হলে হয়তো একটা বিশেষ ভুল করা হতে পারে। এর প্রত্যাশিত ফলাফল বিচারের স্থান এখানে অল্প।

অবশ্য এটা সুবিদিত যে, স্বাধীনতা লাভের পরে আজ পর্যন্ত দুই দশক অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে শিক্ষার কোন বৈপ্লবিক পরিকল্পনা এখনও সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করা হয় নি। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে উগ্রপন্থার মাধ্যমে আক্রমণ ইত্যাদি কতখানি যুক্তিসংগত, সে কথা বোঝা কঠিন। মাও সে-তুং-এর মতেও —"It is necessary to have universities"—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে।* (* Peking Review, 2nd August, 1968)। তবে শিক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদির মধ্যেও যে একটা বৈপ্লবিক হাওয়া প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন, সেটা

(ঙ) উদাহরণস্বরূপ এদেশে সাম্প্রতিক ইউনাইটেড ফ্রন্টের ভাঙনের কথা মনে পড়ে।

(চ) উপরন্তু—অন্যত্র আলোচিত স্বামী বিবেকানন্দের ইঙ্গিত—"তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া.........সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস" ইত্যাদি।* (* সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭০, পৃঃ ২৬৬৫ দ্রষ্টব্য)।

(ছ) মাও সে-তুং-এর উক্তি—"these leaders must be models for the people"—এই সকল অধিনায়কদের গণসমাজে আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই।* (* পূর্বে উল্লিখিত পুস্তক Guerrilla Warfare—পৃঃ ৩৩)।

(জ) মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইঙ্গিত—"ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।......বল—মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ......।" এই সকল উক্তি নিছক ধর্মসংক্রান্ত বলে ভাবলে হয়তো ভুল করা হবে। তার কারণ অন্যত্র আলোচিত রাওলাট সাহেবের কনফিডেনশ্যাল রিপোর্টে বাংলার বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে স্বামীজীর পরোক্ষ অবদানের উল্লেখের কথা ছাড়াও ছয়/সাত বছর আগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সোভিয়েট দেশ অফিসে ডঃ এ এল লেভকোভেস্কি ও এ আই চিচেরোভের দ্বারায় এক কনফারেন্সে প্রকাশিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেছিলেন—"পাশ্চাত্যে ভ্রমণের সময়, বর্তমান শতকের প্রারম্ভে, প্যারিস এক্জিবিশন কনফারেন্সে, বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী ও রাজনীতিক চিন্তানায়ক প্রিন্স ক্রপোটকিনের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ মিলিত হয়েছিলেন।" এই মিলনের উদ্দেশ্য বা কারণ নিশ্চয়ই কোন তথাকথিত ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য ছিল না।

অনস্বীকার্য। যেমন, যেখানে কেবল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার বিচারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অনুচিত—বিশেষত যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত শিল্পশিক্ষা ইত্যাদিতে, যেখানে হাতে-কলমে পারদর্শিতার স্থান অগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে, অফিস-স্কুল, কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি সর্বস্তরেই ঐ একই তথ্য রহস্যময় অবস্থায় বিদ্যমান।(ঝ)

তাই আমাদের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা না বাড়িয়ে, দেশের বর্তমান বৈপ্লবিক কার্যতালিকায় যদি প্রথম স্থান দেওয়া যায়—দেশের মধ্যে অনাচার-অবিচার, কালোবাজার, খাদ্য ও ঔষধপত্রে ভেজাল, কোর্ট-কাছারি—পৌরপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নানা স্তরে, নানাভাবে ঘুষের লেন-দেন থেকে আরম্ভ করে, উপঢৌকন গ্রহণ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অফিসারদের স্বজন-পোষণ নীতি ইত্যাদির মূল উৎপাটনের প্রচেষ্টা, তা হলে বোধ হয় 'পাবলিক ওপিনিয়ন' তথা সাধারণের মন জয় করার কাজ সহজসাধ্য হতে পারে। আর এই জাতীয় কাজে অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছা-সেবকেরও প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক শক্তি দখলের আগে একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের কর্ম-পদ্ধতির ওপর সর্বসাধারণের সহানুভূতি লাভেরও বিশেষ প্রয়োজন থাকে।(ঞ) আর এই জাতীয় কাজে প্রয়োজন কবিগুরুর বর্ণিত কয়েকটি 'রঞ্জনের' চরিত্র, মৃত্যুর মধ্যেও যার অপরাজিত কণ্ঠস্বর 'নন্দিনী' শুনতে পাবেন।* (*রক্তকরবী, পৃঃ ৯৮)।

(ঝ) নিছক বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি ডিগ্রী থাকার জন্যে অথবা অনুরূপ কারণে এক শ্রেণীর মানুষকে যদি উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হয় অপর এক শ্রেণীর ওপরে কেবল রক্তচক্ষু দেখিয়ে অথবা অপর কোন উপায়ে কাজ আদায় করে তাতে স্বাক্ষর করা অথবা প্রয়োজন বোধে তাদের শাস্তি দেবার জন্যে—অপরদিকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কর্মপটুতা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষকে যদি অফিস-স্কুল, মাঠঘাট, কল-কারখানা ইত্যাদি সকল স্থানেই স্বল্প বেতন বা প্রতিদানে কেবল খেটেই খেতে হয় কবিগুরু বর্ণিত সর্দারদের সন্তুষ্ট করার জন্যে, তা হলে চতুর্দিকে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে মনে পড়ে কবিগুরুর ইঙ্গিত—"মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।"* (*রক্তকরবী, পৃঃ-৭৬)। প্রতিকার? প্রতিকার হচ্ছে, সকল স্তরেই নন্দিনীর আবাহন। তাই তো সর্দারের প্রতি নন্দিনীর সতর্কবাণী—"আমি নারী বলে আমাকে ভয় করো না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।" (পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ-৭৪)।

(ঞ) "To overthrow a political power, it is always necessary first of all to creat public openion, to do work in the ideological sphere." * (* Comrade Mao Tse-Tung at the Tenth Plenary Session of the Eighth Central Committee of the Party.)- অবশ্য এই সত্য কোন বৈপ্লবিক দল ও তার বিরুদ্ধ গোষ্ঠী—উভয়ের পক্ষেই সম প্রযোজ্য।

পনেরই আগস্টের স্মৃতি-বিস্মৃতি

সেই প্রথম ট্রামে-বাসে ঝুলন্ত ভিড় দেখেছিলাম। ঝরঝরে দোতলা বাসের না-ঢাকা অর্ধচন্দ্র সিঁড়ি পর্যন্ত স্বাধীন সিটিজেনস্ বোঝাই। কণ্ডাক্টরের স্থান হয়েছে এঞ্জিনের সামনে মাডর্-গার্ডে। তখন তো প্রাইভেট বই স্টেট ট্রান্সপোর্টের অস্তিত্ব নেই। গাড়ি মানেই দাড়ি। ড্রাইভার মানেই শিখ, যারা গলায় গামছা দিয়ে এক পয়সা-দু' পয়সার আদায় নিত যাত্রীদের কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন তারাও উৎসবমগ্ন। কলকাতার লোককে প্রাণ খুলে গাড়ি চড়িয়েছে। জোর-জুলুম নেই।

মহানগরী সাজবে, তাই মফস্বল গড়ের মাঠ ক'রে গড়ের মাঠেও লোক জমায়েত। যার যেমন খুশি চল। যার যত কথা আছে কলকলিয়ে বল। কিছু-দিন আগেই হিন্দু-মোছলমান কলকাতার পথে পথে ছুরি খেয়ে পড়ে ছিল ব্রিজ, সাঁকোর আওতায় মৃত মানুষের শব ঝুলছিল। ভাসমান মড়ার ভেলায় মহানন্দ কাক আর শকুনের দখলদারি নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়েছিল। সেদিন কিন্তু সে বিভীষিকা ভুলে গেছে শহর কল-কাতা। দিকে দিকে একটি মাত্র মন্ত্রোচ্চারণ 'বন্দে মাতরম'। ছেলেবেলার স্মৃতি জুড়ানো কত রোমাঞ্চিত দিবস-রজনী প্রকম্পিত একটি মাত্র মহান অর্থবহ শব্দ 'বন্দে মাতরম্'। আজ যে শব্দের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের মানুষের কোনও মানসিক আবেগও বিজড়িত নেই, আমাদের জীবনে সে শব্দই কিন্তু একই সূত্রে বেঁধে রেখেছিল আসমুদ্র-হিমাচল। অমন যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি, যার সঙ্গে আমাদের ছিল নাড়ীর যোগ, আজ সে ধ্বনি আর উচ্চারিত হয় না। উচ্চারিত হলেও তার মধ্যে সেদিনের সে স্পিরিটের উত্তেজক রোম-হর্ষক গন্ধ নেই। রাজনৈতিক ফাটকা-বাজির শেয়ার বাজারের 'কিতনা ভাও' ডাক বলে মনে হয়।

সেদিন সেই এক ধ্বনিতেই কলকাতা ফেটে পড়েছিল। মাতৃবন্দনার ঐ মন্ত্রও ছেড়েছি, মাকেও ভুলে বসেছি—এ কথা কেন জানি না বার বার মনে হয় আমার। কী ক্ষতি ছিল বন্দে মাতরমের স্তোত্র-টুকু ধরে রাখলে। ঐ একই মন্ত্রে ঘাটের মড়াও বুক চিতিয়ে চিতার ওপর উঠে বসত। আজ জনগণমনের কী বাহার! দাঁত ছরকুটে আছে চতুর্দিক। এ ফোঁস করে তো ও ঘোঁৎ করে লাফিয়ে আসে নেকড়ের মতো। পথ চলতে সব সময় বুক দুরুদুরু। মনে হয় ঠ্যাঙাড়ে কলকাতা ওৎ পেতে আছে গলি-ঘুঁজি, বড় রাস্তায়। যে কোনো মুহূর্তে অজ্ঞাত আততায়ীর কবলস্থ হওয়ার আশংকা।

কিন্তু সেদিন, সেই প্রথম ১৫ই আগস্ট? ভারতের ইতিহাসে তার অক্ষয়প্রাণ মঙ্গলচণ্ডীর বরঃপুত। আগুনে পোড়ে না, জলে ভেজে না, ছিঁড়লে হারায় না, 'পেটো'য় ফেটে শিমুল ফুলের মতো ফুস করে উড়ে যায় না। যা একবারই এসেছিল, আর-বার একইভাবে আসতে পারে না। কারণ তার পরও ভাগীরথীতে অনেক ঘোলাজল গড়িয়ে গেছে।

তবু মুছে যাওয়া সেদিনের স্মৃতি রয়েছে অক্ষয় হয়ে। আমাদের এজ গ্রুপের জেনেরেশনটা খতম হ'লে তাও আর থাকবে না। পরের যুগের ছেলেরা স্বাধীন যুগের ছেলে। পত্র-পত্রিকার পাতা ঘেঁটে হয়ত কেউ কেউ ধ্যানে চিত্র সাজাতে চেষ্টা করবে, যদি কেউ তা আদৌ করতে চেষ্টিত হয়।

সেদিন মনে হয় নি, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। আংরেজ পল্টন মুরদাবাদ তো সি আর পি খাড়া হ্যায়। আংরেজ সাব গদ্দি ছোড়া তো ইণ্ডিয়ান সাব কা নেকটাই লটপটাতা হ্যায়। আংরেজ কা লাঞ্চ, ডীনার, গান-বাজনা, ওয়াইন, ওম্যান—বিলকুল হট গিয়া তো ইণ্ডিয়ান বলড্যান্স আউর ক্রেসমাস ইভ হ্যায়। রান্নাঘরকো 'কিচেন' আউর 'দালান'কো ডাইনিং প্লেস বোলা যাতা হ্যায়। মাইজী হো গয়ী মেমসাব আউর মাতা-পিতা, ড্যাডি-মাম্মি।

অর্থাৎ ১৫ই আগস্টকে যদি একটি প্রাণময় সত্তা বলে কল্পনা করি তো বর্তমানকে বলব, ১৫ই আগস্টের 'শাঁস'। জয়ের 'শাঁস' হয়েছেন সমগ্র ভারতের ববড্ হেয়ার মার্মানিকুল।

এই পরিবর্তমান কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার ছবির এ্যালবাম-টিকে খুলে ধরলে অস্পষ্ট সেদিন চোখ জুড়িয়ে দেয়।

যা বলছিলাম। ইংরেজের ভাঙা ট্রামে, যে ট্রাম দু'পাশে টাল খেয়ে চলত, সেই প্রথম সে ট্রামে বাদুড়ঝোলা মানুষ দেখেছিলাম। দিল্লী দূর অস্ত। কিন্তু ডালহৌসীর লাট ভবনের গেট খোলা। বহুকালের শোষণে সাজানো সে প্রাসাদ কেমনতর? কলকাতা উপচে পড়ে দেখতে গেছে সেই জু-প্যালেস। আমি সাংঘাতিক বীরত্ব করেছিলাম, মনে আছে, ট্রামের চাকায় যে বাড়তি অংশে পা রেখে আজকের দুধের খোকা থেকে ঘাটের বুধ পর্যন্ত আকছার আসা-যাওয়া করছে, কয়েকটি বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সেই সাংঘাতিক এ্যাড-ভেঞ্চারের স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম সেদিন। মস্তবড় এক পরীক্ষা পাশের আনন্দে শহর কলকাতার ধমনীতে তীব্র রক্তস্রোত টগবগিয়ে ফুটছে সেদিন। যায় যাবে যাক প্রাণ, কৈ পরোয়া নেই। স্বাধীনতা নামক অজ্ঞাত চীজ যে শহরের হাতের মুঠোয়, সে জানে না দ্বিতীয় কোনো এ্যাক্সিডেন্ট।

সবাই হর্ষোৎফুল্ল। ট্রাম কণ্ডাক্টররা সেকালে স্বল্পবয়সী দেখলেই মাকড়-সার মতো বড় পায়ে এগিয়ে আসত, যেন জালে পড়া মাছি মারবে। ইংরেজ কোম্পানীর পয়সা মেরে কুঁচো কল-কাতা ট্রামে চাপবে, এই ভয়ঙ্কর অন্যায়ের মোকাবিলায় বিহারী কণ্ডাক্টররা ভারি তৎপর ছিল। তখনও 'তোম' 'তুমি'-কারির যুগ। ছোটরাও বয়স্ক কণ্ডাক্টর, দোকানদারদের সমীহ করে কথা বলত না। সুতরাং 'খাপচুরিয়াস' অগ্নিশর্মা হ'য়ে থাকত তারাও। বাগে পেলেই শাস্তি। সেদিন কিন্তু ওরা শূন্য ব্যাগই দিনের শেষে ডিপোয় গিয়ে জমা দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে রটে গেছল, চল্ বেড়িয়ে আসি। আজ ট্রাম ফ্রি।

আমাদের স্বাধীনতা কি ছিল ঐটুকুই? এক পয়সার স্বাধীনতা। কে জানে, আর তো কিছু মনে পড়ে না। ভারি একটা উৎসব! যেন শহর জুড়ে মস্ত ফ্যান্তা বা ফিয়েস্তা।

গান্ধী টুপী আর অশোক চক্র-শোভিত তেরঙ্গা পতাকার হট কেক সেল। পথে পথে ক্যাজ পরিয়ে টাকায় টাকা লাভ। বাড়ি বাড়ি ফ্ল্যাগ তোলার প্রতিযোগিতা। প্রভাতে প্রভাতফেরী, রাতে বাজী মাঠে-ময়দানে।

শুনলাম, সব নাকি পাল্টে যাবে। স্কুলে-কলেজে পাঠ্যবিষয় পাল্টাবে।

মাতৃভাষায় মুখ উঁচু করে কথা বলবে আনুষজন। শুনলাম, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পাতলা হবে। বাপের দেওয়া মোটা চাল থালায় থালায় হাসবে। ঘরের ছেলে আর পরের চাকরি করবে না। দেশের ছেলের কাজ জুটবে, দেশের মায়ের দুঃখ ঘুচবে। আর পুলিশ? সেদিন লাল-মুখ অবশিষ্ট সার্জেন্টরাও বাপের সুপুত্তুরের মতো কত ছেলেকে যে রাস্তা পার করে দিয়েছিল!

তা সে রাত কাটল কি কাটল না, পরে আর বুঝতেও পারি নি। শুধু বুঝলাম, একটা মস্ত কাণ্ড ঘটে গেছে। লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করতে গিয়েই মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন, এ স্বাধীনতা গোটা ভারতের ম্যাপটাকেই ব্লেড দিয়ে চিরেছে। ব্লেডের ধার বুঝি 'সিল্কেন', প্রথম টান তুলির টানের মতো কাটে তবু লাগে না। এ-ও সেই দশা। লাগল যখন, জ্বালায় জ্বলুনিতে কলকাতার সমাজজীবন পুরোপুরি লাট খেলো, তখন আর উপায় নেই। শিয়ালদা স্টেশন লোকে লোকারণ্য। স্বাধীনতার জন্য মূল্য গুণে দিয়ে এসেছে এক দল মানুষ। চালানি ছাগের মতো তাদের এনে ফেলা হচ্ছে শিয়ালদহে। লরি লরি সেই সব জীবন্ত মাল চালান হয়ে যাচ্ছে যত্রতত্র। অনেক পরিবার ক্যাম্পের কনসেনট্রেশন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দিগ্বিদিকে নিজের রিস্কে ছড়িয়ে পড়েছেন। ওঁদের নিয়ে লেখা হচ্ছে নাটক, গল্প, সুরু হচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসা। আমার পাড়ায় একজন ফেমাস হয়ে গেলেন বাস্তুহারার ওপর নাটক লিখে। কয়েকটি পরিবার মুরুব্বীর জোরে ত্রাণ দপ্তরে পুনর্বাসনে উমেদারি ক'রে কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ি হাঁকিয়ে বসলেন। কেউ-ই বাস্তুহারা নন। জন্মে অবধি বাবা, দাদার সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখেছিলাম। তাঁরা কোন্ যাদুবলে সর্বহারা দলে নাম লিখিয়ে বাড়ি, নিজে হাঁকিয়ে বসলেন। কত লোকের যে সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে বলে ডিক্লারেশন পড়ল এবং কত মানুষ যে বত্রিশ থেকে বাইশ বছর গাপিয়ে নিলেন, কত পোদ্দার উপাধ্যায় হলেন, কত দাসের দন্ত 'স' তালব্য 'শ' হয়ে গেল, তার আর লেখাজোখা রইল না। যে কলকাতা ছিল উত্তরে শ্যাম-বাজার, দক্ষিণে টালীগঞ্জ, বালীগঞ্জ ট্রাম ডিপো, পূবে সার্কুলার রোড এবং পশ্চিমে হুগলী নদীর ঘাটা আঘাটা: জনবসতি ঘনবসতি এবং বন কেটে বসতকারীর কল্যাণে তা বেড়ে বেড়ে হ'ল বিরাট। জমি দখল, বাড়ি দখলের বাহাদুরীর আজ যে পার্টিই নিক, পাইওনীয়ার হলেন এই পথে ঐ নতুন ইহুদীরাই। তাঁদের পরিশ্রমে তৈরি হ'ল গ্রেটার ক্যালকাটা। গ্রেটার—১৫ই আগস্টের দুঃস্বপ্নময়ী বন্য রাত্রির শিহরিত দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তার চেয়ে 'বেটার' কিছু আর হ'ল না।

আমি সেই গ্রেটার ক্যালকাটার কাসুন্দী-ফেরীওয়ালা; আজও ১৫ই আগস্টের নিয়ম রক্ষা করে দু'পাতা লেখার আকাঙ্ক্ষাজীবী।

১৫ই আগস্টের পরে প্রাপ্ত কলকাতা অবশ্যই পূর্ববর্তিনীর চাইতে মেদে-বিলাসে বর্ধিতা, তবে ১৫ই আগস্টের পর তার স্নায়ুকেন্দ্রের ওপর ধর্ষণ-উৎপীড়নও কম হয় নি।

কী পিটুনি বাপস-রে বাপস, তার পর থেকেই। '৪২-এর কলকাতাকে মনে আছে। মানুষে-পুলিশে সম্মুখ সমর, সময় বুঝে গেরিলা ফাইট। কিন্তু তার পরও মনে আছে ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, কর্ম-চারী আন্দোলন আর ছাত্র আন্দোলন তো আছেই।

প্যারেড গ্রাউন্ডটা পণ্ডিত জওহর-লালজীর বক্তৃতাভূমি থেকে ক্রমেই আন্দোলনের ময়দানে পরিণত হ'ল। সেই অবধি ক্রমেই ১৫ই আগস্টের দ্যুতি ম্লান থেকে ম্লানতর। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারায় ক্ষ্যাপা কলকাতার গর্ভস্থ জলনিষ্কাশনী ব্যবস্থা মজে যেতে লাগল। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মেরে রাজপথ জনপথে একচ্ছত্র আধিপত্য আর টিকিয়ে রাখা গেল না। ১৫ই আগস্টের আশীর্বাদে তৈরি 'বারলো হাউজের পেছনের বাড়িটা' আজ গায়ে আলোক-সজ্জা পরতেও 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে। তেরঙা পতাকাশোভিত সে বাড়ির সে ইজ্জৎ আর নেই।

কেন না ১৫ই আগস্টের পর কলকাতা যেন দ্বিতীয়বার এক স্বাধীনতার মানসিকতার মুক্তি প্রত্যক্ষ করেছিল পথে পথে। আবার বাজি, আবার উৎসব, আবার আলোকসজ্জা। সেই সঙ্গে কাঁদি কাঁদি কাঁচকলা।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দ্বিতীয়-বার স্বাধীন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে কলকাতা লাল আলোয় নগর সাজিয়ে। ফের হতাশ হয়েছে।

তবু এবারও ময়দানেই ১৫ই আগস্টের আয়োজন। ভাঙা কংগ্রেসের এক পক্ষ সভা ডাকছেন। অন্য পক্ষ ডাক ছাড়বেন শহীদ মিনারের পাদদেশে।

কলকাতা ভেঙে ভেঙে তছনছ। মুরুব্বীয়ানার সার্টিফিকেট-দাবিদাররা তাকে নিয়ে নেট প্র্যাকটিশ করছেন।

শহরওয়ালীর একমাত্র কান্না—

রেতে মশা, দিনে মাছি,
বোমার পেটোতে আছি।
মারিছে টহল সি আর পি,
কলিকাতা শহরে নাই কী?
ফিফটিনথ আগস্ট ঘুরে আসে,
কলিকাতা বেঁচে আছে
দিব্যি হাড়ে মাসে।

তা বেঁচে আছে ঠিক কথা। শহর তো আর নশ্বর নয়। জন্মিলেই মরিতে হবে এমন মুচলেকা দেওয়া নেই কোথাও, তবে এ বাঁচন একরকম মরণ-সমান প্রায়।

বুড়ো হাড়ের মরণ, খুব আশার মরণ, তরুণ কাঁচা মনের মরণ, ফুটপাথে হাজার হাজার শিশু কলকাতার মরণ। তা ছাড়া কোঁদলে কাঁকিয়ে আছে কলকাতা।

প্রফুল্ল সেন, বিজয়সিং, অজয় মুখার্জী, প্রফুল্ল ঘোষ বাংলা দেশের ছকে চার কোণায় বাঘবন্দী খেলেছেন। জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, আর আর 'এবং-সেবং-রা' হারে রে রে রে রব তুলে তেলো বাঁশের লাঠি বনবন ঘোরাচ্ছেন। এখন আমলার কলকাতা এক নয়া বস্তু।

কলকাতা?

জব চার্নকের আমলে এ শহরের একটি কল্পচিত্র তৈরি হয়েছিল বিদেশীর মনে। ১৫ই আগস্টের ফ্ল্যাগ দিল্লীতে উড়লে কলকাতার ঘাড়ে চাপল আর্থ-সামাজিক সমস্যা। বি বি ডি বাগে ছায়া ফেলে যে লালবাড়ি, সেটি আস্বাধীনতা ঠুঁটো জগন্নাথ। পথের মিছিলে বসুধৈব কুটুম্বালিঙ্গনের আওয়াজ। ১৫ই আগস্ট তাই কার বাড়ি কেক কাটা হল, শহর কলকাতার তাই নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা নেই। মিস্ত্রীর যেমন কোঠাবাড়ি বানিয়ে ছুটি। এর পর সে গৃহে তার প্রবেশাধি-কার পর্যন্ত নেই: কলকাতার তেমনি প্রথম ১৫ই আগস্টের ফ্ল্যাগ তুলেই ছুটি, স্বাধীন মেওয়ার অংশভাগে তার শেয়ার নেই। ভারতের যেখানে যাও, সাজানো শহর গড়ে উঠছে, চোখে পড়বে। কলকাতা এসো, মহান্ অবনতির চিহ্ন চতুর্দিশী।

কিন্তু পনেরই আগস্ট বার বার ফিরে আসেই। কলকাতার কাছে ফিরে আসে এক বিশেষ দিনের স্মৃতি হয়ে। কিন্তু তাও আর ক'দিন? আমরা যারা চল্লিশের চৌকাঠে পা পাততে যাচ্ছি, তারাও চোখ বুজলেই টাটকা স্মৃতি ইতিহাসের পাতা। গল্প করার লোক পর্যন্ত থাকবে না।

—হিরেন

বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে

গত ১৫ই মে সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে "বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ" স্তম্ভে বঙ্গদর্শনকার সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সহজ সরল ভাষায় যে সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন, পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক এবং ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রতি এবং তাঁর বক্তব্যের প্রতি অভিনন্দন ও সমর্থনে আমি পত্রিকার পাঠকমনে দু'-চার কথা বলতে চাই।

অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা—জীবনধারণের প্রতিটি অলিতে-গলিতে আজ শোষণ-অবিচার, সুবিধাবাদ, অন্ধ অনুকরণ-বেলেল্লাপনা, ধর্ম নিয়ে, জাতি নিয়ে নোংরা হানাহানি, দুর্নীতি-বিজ্ঞানবিমুখতা বেনোজলের মত হু হু করে ঢুকে সাধারণ মানুষকে কোন্ সর্বনাশের অতল বিবরে নিয়ে চলেছে—তার খবর কে রাখে?

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ এই ভারতবর্ষে যখন তথাকথিত অভিজাত, শান্তিপ্রিয় ও ভদ্রলোকেরা দেশব্যাপী এই অশান্তিকে, তরুণদের ফ্রাস্ট্রেশন সমাজ-বিরোধীদের অ্যান্টিসোশ্যাল ক্রাইম প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে আসল কারণকে নেপথ্যে রাখার জন্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন, তখন বহু অভিজ্ঞ, বহু সংগ্রামে পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের সুবিধাবাদী রাজনীতির নোংরা খেলায় কৃষকে-কৃষকে, শ্রমিকে-শ্রমিকে দাঙ্গা লাগিয়ে প্রকৃত শত্রুর 'ঢাল' তৈরিতে রসদ জোগাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে কয়েকটা গ্রাম উজাড় করে খেটে-খাওয়া মানুষদের শহরের আলোঝলমলে, পিচবাঁধানো রাস্তা দিয়ে ময়দানী সংগ্রামে নিয়ে গিয়ে মশালের লাল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে, তাদের রুটি-গুড়ে তৃপ্ত করে হাত-পা ছুড়ে আগামী ভোটযুদ্ধের মহাভারত শোনাচ্ছেন।

এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ছাত্রদের। অধ্যয়ন তপস্যা —কিন্তু খালি পেটে? সব ছাত্রেরই পিতৃ-পুরুষের শতাব্দী-সঞ্চিত কোষাগার ভেঙে পড়ায় চালানোর ক্ষমতা নেই। সংখ্যায় তারা মুষ্টিমেয় এবং কেবল ব্যতিক্রমই। আসল স্বাভাবিক ঘটনা হল অধিকাংশ ছাত্রই দৈনন্দিন অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় প্রপীড়িত পিতা বা অভিভাবকের মাসান্তিক কষ্টার্জিত উপার্জনের একাংশ দিয়েই শিক্ষার অর্থভার বহন করেন। সেই সব ছাত্র যখন শিক্ষান্তে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পেয়ে নিত্যবর্ধমান সাংসারিক দারিদ্র্য আংশিক লাঘবের সদিচ্ছায় উপার্জনের ফটক খোঁজেন, তখন দেখেন সব ফটকেই তালা-বন্ধ। কোনোটা ভিতর, কোনোটা বাইরে থেকে।
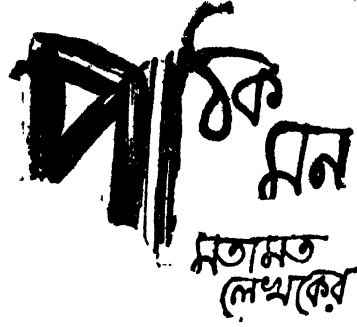
ইঞ্জিনীয়াররা আজ ওভার প্রোডাকশনের বলি (শিক্ষায়তনগুলি যেখানে নিছকই বিদ্বান তৈরির কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে)। কথায় কথায় ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্লোজার, ডিসচার্জ-নোটিশ।

চাকুরী বা জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে শিক্ষার কানাকড়িও মূল্য নেই, সেই শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা ঔৎসুক্য আসবে কোথা থেকে? আর এর প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধে, ধিক্কারে, নৈরাশ্যে, ঘৃণায় যখন তাঁরা ক্ষিপ্ত হন, জবাব চান, প্রতিকার চান, পথ চান—তখনই তার গালভরা সরস নামকরণ হয় রাজনীতির নোংরামী, হঠকারিতা, বিশৃঙ্খলা, ছেলে-মানুষী ইত্যাদি আরো কত কি। আর টোটকা হিসাবে আসে বুদ্ধিজীবী-মস্তিষ্কজাত উপদেশামৃত সহ কিঞ্চিৎ শান্তিবারি সেচন, শান্তিরক্ষক পুলিশ; সমস্যার সাধারণ উৎসমুখ আবিষ্কারে লেগে যায় কমিটির শোভাযাত্রা।

সাঁওতালী ভূমিহীন কৃষক যখন তার ছ' মাসের শিশুসন্তানকে খেতে দেওয়ার অক্ষমতায় তাকে ঘুম পাড়িয়ে ভোলানোর জন্য তার মুখে "হাড়িয়া"র প্রলেপ দিচ্ছে, সুবিধাবাদী রাজনীতির নোংরা খেলায় নিঃস্ব শ্রমিক যখন বাঁচবার একমাত্র পথ হিসাবে চোখের সামনে দেখছে কড়িকাঠ আর কয়েকগাছি দড়ি, তখন ছাত্ররা যদি বলে—যে শিক্ষায় আমার বাঁচার রাস্তা নেই, সে ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলে আমি বিবেকের কাছে অপরাধী হব না; তখন ছাত্রদের প্রতি দরদে অহরহ আঁখি বর্ষণ-কারী মানবতাবাদীরা তাকে কি বলবেন?

আত্মহননের রাস্তা ওটা? বেশ, তবে অনুগ্রহ করে সেই সব মানবতাবাদীরা যদি পথভ্রষ্ট ছাত্রদের সামনে মুক্তমেলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ দেখাতে পারেন, বলুন।

শৈবালকুমার শীল
রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা

ভ্রম সংশোধন

১৬-৭-৭০ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর "আন্তর্জাতিক" বিভাগে পাকিস্তান সম্পর্কে যে খবর বেরিয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলার আছে।

(১) লেখক মোহাম্মদ "তোয়াহা"র পরিবর্তে "তোফা" লিখেছেন। প্রকৃত পদবী হোল তোয়াহা। তোয়াহা বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে কম্যুনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট) গঠন করেছেন।

(২) লেখক লিখেছেন যে, তোয়াহার মত মুজিবরের দলের বিদ্রোহী নেতৃস্থানীয় লোকও নির্বাচনকে প্রহসন মনে করেন এবং মুজিবর নির্বাচনে অংশ নেবেন জেনে কিছু লোক "ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগে" যোগ দিয়েছেন।

এই বক্তব্য সঠিক নয়, কারণ, (ক) এন-পি-এল বা ন্যাশনাল প্রঃ লীগ স্রষ্টা আতাউর রহমান মূলত ব্যক্তিগত বিরোধের জন্যই আওয়ামী লীগ ছেড়েছেন। সম্ভবত লেখক জানেন না যে, কম করেও ১৯৫৭ সাল থেকেই মুজিবর ও আতাউরের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে একটা ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। আওয়ামী লীগ থেকেও মুজিবরের তুলনায় নিজের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রধানত এই দুশ্চিন্তা এবং ঈর্ষায় আতাউর রহমান [illegible] লীগ ছেড়েছেন। তবে [illegible] আওয়ামী লীগ-নেতা, [illegible] মসরুল্লা, আবদুস সালাম ইত্যাদির পার্থক্য এই যে, তাঁদের মত তিনি সরাসরি সুবিধা-বাদের রাজনীতিতে গা ভাসান নি। (খ) এন-পি-এলও নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে। তাদের নির্বাচনী প্রচার বেশ জোরকমই চলছে। লেখকের লেখা পড়ে মনে হচ্ছিল বুঝি নির্বাচন-বিরোধী আঃ লীগ-নেতারা এন-পি-এল এ যোগ দিয়েছেন নির্বাচন বয়কট করার জন্য! তা মোটেই নয়, এন-পি-এলও নির্বাচনে নেমেছে।

(৩) জামাতের নেতৃত্বে যে প্রতিক্রিয়া-শীল মোর্চা গড়ে উঠেছে, তার নাম "ইসলাম পসন্দ্ পার্টি"। নামেও যেমনি পিলে চমকানো, কামেও তাই। "ইসলাম পসনদিরা" কোরান, আল্লা, মোহাদ আর কাফের—এই ছাড়া আর কোনও শব্দের অর্থ সম্ভবত জানে না।

—আবদুল খালেক,
রমনা, ঢাকা

'পরবাস' প্রসঙ্গে

জীবন সরকারের গল্প 'পরবাস' প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ জানবেন। নিরীক্ষার নামে বাংলা গল্প থেকে যখন গল্পকেই বাদ দেবার চেষ্টা চলেছে, সে সময়ে 'পরবাসে'র মত গল্প নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ধরলার শব্দ, হরিলালের নৌকো বাওয়া, নতুন ধানের গন্ধ এবং নিপুণভাবে পূর্ববঙ্গের ভাষার ব্যবহার —সব মিলিয়ে নস্টালজিয়ার বাতাবরণ বার বার একদা জন্মভূমির স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। লেখককে ধন্যবাদ।

অনুরাধা গুহ
মালিগাঁ, গৌহাটি-১১।

॥ চোপ ॥

সাতষট্টি সালের পনেরই এপ্রিল রাওয়ালপিণ্ডিতে বসে নূরুল আমিন সাংবাদিকদের জানাল যে, "অল্প কিছু-দিনের মধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঢাকাতে মিলিত হবে। একটি ঐক্যবদ্ধ নিখিল পাকিস্তানী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে আর দেরী নেই। তা' ছাড়া ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নজরুলপন্থী আওয়ামী লীগ এবং জমাতে ইসলাম একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য জোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে, আসন্ন ঢাকা অধি-বেশনে তারা নিশ্চয়ই সাফল্য অর্জন করবে", ইত্যাদি। পেশাদার খবর ও গুজব ব্যবসায়ীরা নূরুলের এই "সাংবাদিক বৈঠক" সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছিল তা' ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এটা ঠিকই বোঝা গিয়েছিল যে, আয়ুব খাঁর দালালের ভূমিকায় নূরুলের অভিনয়ে মুগ্ধ হোয়ে তারা বার বার "শোভেনাল্লা" বলে লাফিয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির গতিবিধি এত বিচিত্র যে, সাধারণ মানুষের চোখে তাদের নীতি সেরেফ গোলকধাঁধার মতই জটিল মনে হয়। প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শিল্পপতি, সামন্তপ্রভু এবং অত্যাচারী শাসকদের বন্ধু অনুরূপ বুর্জোয়া শ্রেণী উদ্ভূত এই সব মার্কামারা কাগজওয়ালারা তাদের পোঁ-ধরা কিছু সংখ্যক মোসাহেবকে রাতারাতি "অপজিসন লীডার" বানিয়ে জনতার মধ্যে ছেড়ে দেয় এবং এমনভাবে ঐসব লীডারদের প্রচারিত করতে থাকে যে, ভালমানুষ দেশবাসীর চোখে তারা খুব তাড়াতাড়ি 'হিরো' হয়ে যায়। অতঃপর এই হিরোর দল জনতার মারমুখী মনো-ভাবকে নানা কায়দায় জমিয়ে দিয়ে বুর্জোয়াদের বস্তাপচা শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন আমদানী করে। ফলে জনগণের আজাদীর স্বপ্ন প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে যায় আর কায়েমী স্বার্থের নিবন্ধ অনাথবাড়িতে বাড়তে থাকে। নূরুল আমিনের বেলায় এই একই ধরনের পুনরাবৃত্তি ঘটল। তার সিদ্ধে নিযুক্ত বিশ্ববিপ্লবের অনাদ্দেগার এমন সুকৌশলে বুর্জোয়া কাগজগুলির সম্পাদকীয় কলমে পরিবেশিত হোল যে, সাধারণ মানুষের কাছে জনাব আমিন বিপ্লবের পয়গম্বর হিসাবে প্রতিভাত হোলেন। প্রমাদ গুণলাম আমরা, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকরা। কেন না আমাদের পুরোন অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য শাসকচক্র আর একটা নতুন ফন্দি এঁটেছে। প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটতে যাচ্ছিল। যতবার পাকিস্তানে প্রতি-ক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থ শোষণকারী শাসকদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনতা একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে, ততবার তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য ঐ শাসকচক্র একদল টাউটকে নেতা বানিয়ে মাঠে, ঘাটে, রাস্তায় রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে এবং ঐসব টাউট জনতাকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সুকৌশলে টেনে এনে নিরস্ত্র করে শাসকচক্রের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর মেশিনগানের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। যদিও আমরা নির্বাচন-বিরোধী এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী তা' হোলেও চুয়ান্ন সালের লীগ-বিরোধী নির্বাচন ও আন্দোলনকে আমরা আজও অভি-নন্দন জানাই। চুয়ান্নর ঐ দুর্বার আন্দোলনকে যারা পথে বসিয়েছিল, তারাই আজ এই সত্তরে নতুন ফন্দি এঁটে নতুন শয়তানী চাল দিতে চেষ্টা করছে। বাষট্টি, তেষট্টি সালে আয়ুবের গদি পোক্ত হতে না হতেই আবার যখন আগুন জ্বলে উঠল তখনই সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হোল নূরুল আমিনের। সে তার এন, ডি, এফ-এর ছাই দিয়ে ঐ আগুন চাপা দিতে চাইল, কাজও হোল কিছুটা, কেন না সংগ্রামী জনতা—যারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঠিক শিক্ষা পায় নি তাদের কিছু অংশ নূরুলের বক্তৃতার মারপ্যাঁচে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সাতষট্টিতেও দালালবাহিনী সমান সক্রিয় ছিল। আয়ুব তার সেপাই-সামন্ত নিয়ে অত্যাচারের চূড়ান্ত করলেও আমরা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এক অপ্রতিরোধ্য গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। ঠিক সেই সময়ই নতুন করে বিভেদের বীজ নিয়ে হাজির হল "বঙ্গেশ্বর" মুজিবর রহমান, যে ইউসুফ হারুনের কাছ থেকে মাসোহারা নেবে। এল নূরুল আমিনও। তবে আওয়ামী লীগ এবং ডি, এফ আর, পি, ডি, এম বা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভ-মেন্ট নিয়ে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হোয়ে গিয়েছিল। তিল তিল করে বিক্ষোভের যে সমুদ্র তৈরি হয়ে-ছিল এবং অপদার্থ আয়ুব নিজের হাতে, নিজের অজান্তে যার বাঁধ কেটে দিয়েছিল (মার্কস ঠিকই বলেছেন যে, অত্যাচারী নিজেই প্রতি-শোধ নেওয়ার অস্ত্র অত্যাচারিতের হাতে তুলে দেয়), সেই আন্দোলনের, সেই বিক্ষোভের মহাসমুদ্রকে প্রত্যাঘাত করার ক্ষমতা মুজিবর বা নূরুলের ছিল না। তারা তাই আরও বড় এক আয়োজন করল, যার নাম-ডাক বা ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি। শোধন-বাদী মোজাফ্ফর, ওয়ালী খান ও মাহমুদুল হকদের ন্যাপও এই আয়ো-জনের অংশীদার হোল। ভাসানী বাইরেই থাকলেন। আর এইবার এই সত্তরে, যে সত্তর মুক্তির দশক, সেই সত্তরের প্রথম বছরেই আমরা দেখছি আরও অনেক, অনেক বড় এক বিপ্লব-বিরোধী আয়োজন। শুধু তাই নয়, একই সাথে এ কথাও বুঝতে পারছি যে, বিপ্লব যত আসন্ন হচ্ছে, মানুষ যত মারমুখী হচ্ছে, ততই তথাকথিত বিপ্লবীদের মুখোশ খুলে যাচ্ছে। তাই আজ মৌলানা ভাসানীও সংসদীয় গণতন্ত্রের ছেঁড়া ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে মুজিবর, মোজাফ্ফর, নূরুল, কাইয়ুম ফকা চৌধুরী প্রমুখ দালালের সাথে গলা মিলিয়ে তারস্বরে চিৎকার করছে।

যাই হোক, আমরা যখন নূরুলের নতুন চক্রান্তের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন খবর পাওয়া গেল যে, এপ্রিলের শেষে বা মে'র প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় নূরুল ও তার সহচরবৃন্দ একটা বৈঠকে বসবে। যথাসময়ে, অর্থাৎ সাতষট্টির পয়লা মে ঢাকায় নূরুলের মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। এন, ডি, এফ-এর পক্ষ থেকে এল নূরুল স্বয়ং, তা' ছাড়া হামিদুল হক চৌধুরী এবং আতাউর রহমান খান। কাউন্সিল মুসলিম লীগ থেকে এল মিয়া মমতাজ দৌলতানা, খাজা খয়েরুদ্দিন এবং তোফাজ্জল আলী, জমাতের পক্ষ থেকে যোগ দিল তুফাইল মোহাম্মদ, মহম্মদ আবদুর রহিম এবং গুলাম আজম। আওয়ামী লীগের যে অংশটা ইতি-মধ্যেই দল ছেড়েছিল তারাও এল, তাদের সঙ্গে ছিল নওয়াবজাদা নসরুল্লা, আবদুস সালাম খান এবং গোলাম মোহাম্মদ খান—প্রমুখ আওয়ামী। নিজামে ইসলামের পক্ষে [illegible]

মোহাম্মদ আলী, ফরিদ আমেদ এবং এম আর খান। পি, ডি, এম-এর এই বৈঠকে একটা আটদফা কর্মসূচী তৈরি করা হোল। দফাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি : (১) পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত সংসদীয় সদস্যারা দেশের যাবতীয় নীতি নির্ধারণ করবে। স্বাধীন বিচারবিভাগ, স্বাধীন সংবাদপত্র এবং সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার—এই তিন অবশ্য প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিতে হবে। (২) প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, ফেডারেল অর্থনীতি, মুদ্রা এবং আন্তঃ-আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করবে। (৩) পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই। (৪) আগামী দশ বছরের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্য দূর করতে হবে। এই ক'বছর পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা তার প্রতিরক্ষা এবং উন্নতির জন্য ব্যয় করা হবে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান এই মুদ্রার অংশ দাবী করতে পারবে না। (৫) উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কোনও একটি সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রা, দেশীয় মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আন্তঃ-

আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। (৬) দশ বছরের মধ্যে চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে। (৭) প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সব বিষয়েই সমতা সৃষ্টি করতে হবে। নৌ-বাহিনীর প্রধান কর্মস্থল হবে পূর্ব পাকিস্তান। উভয় অঞ্চলের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ। (৮) নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ উনিশ শ' ছাপ্পান্ন সালের সংবিধানের দুই থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত যাবতীয় সূত্রগুলি গ্রহণ করবে এবং নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় তাদের ব্যবহার করবে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তান সমস্ত দেশের সাথেই প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখবে। ইসলামী ও আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলির প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে পি, ডি, এম-এর এই আটদফা কর্মসূচীকে বেশ প্রগতিশীল বলে মনে হতে পারে, অন্তত সেদিন অনেক পূর্ব পাকিস্তানীর তাই মনে হয়েছিল। কেন না, স্বায়ত্তশাসন, আর্থিক সাম্য, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বড় বড় দাবী-দাওয়ার কোনটাই পি, ডি, এম তার দফার লিস্টিতে ঢুকিয়ে দিতে ভোলেনি। পয়লা মে'র বৈঠকে যাঁরা যাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের কষ্টার্জিত পুণ্যের বলে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এবং "মহাশয় ব্যক্তি"দের ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনেছিলেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, দফাগুলির মৌলিকত্ব সম্পর্কে শ্রোতাদের সন্দিহান করার জন্য সানুচর নূরুল কি পরিমাণ বক্ বক্ করেছিলেন! নূরুলের এই "জনদরদী" সাজার প্রকৃত উদ্দেশ্য আগেই ব্যক্ত করা হয়েছে. আশা করছি, আপনারাও তা' মনে রেখেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই দফাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে আমার বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করতে পারবেন। আয়ুব গদিতে বসার পর থেকেই আঞ্চলিক বৈষম্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে,—সেই সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবীও দ্রুতগতিতে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে শুরু করে। নূরুল সুকৌশলে স্বায়ত্তশাসনের বিভিন্ন শ্লোগানগুলি চুরি করে নিজের আট-দফায় ঢুকিয়ে দিল। ক্ষমতার সিংহাসন দখল করতে তার জুড়ি মেলা ভার। সে বুঝতে পারল যে, গণ-আন্দোলনকে ভিতর থেকে নষ্ট করতে হবে। কাজেই আন্দোলনকারীর ছদ্মবেশ ধরে আন্দোলনে নেমে পড়তে পারলে "তাকে কে আর পায়"! এই কারণেই তার প্রকাশিত আট দফায়, ছত্রে ছত্রে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ ছুটেছিল। কিন্তু শেষরক্ষা আর হোল না। দালালের ভূমিকায় আগাগোড়া চমৎকার অভিনয় করে গেলেও মাঝে মাঝে নূরুল বেশ কচি খোকার মত কাজ করে বসে। আট দফার ক্ষেত্রেও সে এই রকম কাঁচা কাজ করেছিল। দুই নম্বর দফায় কেন্দ্রের হাতে মুদ্রা, অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে, তিন নম্বর দফায় পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হোয়েছে! এটা কেবল অসম্ভবই নয়, ভণ্ডামীও বটে। পাঞ্জাবী আমলা দিয়ে ঠাসা কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলির পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী চক্রান্তের কথা আজ আর অজানা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যোগাযোগ, বৈদেশিক মুদ্রা এবং অর্থনীতি থাকলে পশ্চিমী তথা পাঞ্জাবী শিল্পপতিরা পাঞ্জাবী আমলাদের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়মিত বুড়ো আঙুল দেখাতে পারবে। আর্থিক ক্ষেত্রে পরাধীন থেকে আমরা কিভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করব? ঠিক একই কারণে চার নম্বর ও ছয় নম্বর দফা দুটিও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আঞ্চলিক বৈষম্য দূর হবে কি করে, কোন্ ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তান তার নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা নিজের স্বার্থে ব্যয় করতে পারবে, কি করেই বা পূর্ব পাকিস্তানীরা চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সাথে সমান সুযোগ পাবে, যদি অর্থনীতি পুরোপুরি কেন্দ্রের অধীনে থাকে? আট নম্বর দফাটিতে নূরুল তার প্রচণ্ড বোকামির পরিচয় দিল। সে বলল যে, পাকিস্তান গাছেরও খাবে, তলারও কুড়োবে, কেন না "যে কোনও দেশের সাথেই সম্ভাব রাখা হবে পাকিস্তানের মূল বৈদেশিক নীতি"। চমৎকার! তা' হোলে মার্কিন, রুশ, চীন সবাই পাকিস্তানকে নিয়ে একপাতে বসে গোস্ত খাবে নাকি?

বলা বাহুল্য যে, নূরুল আমিনের এই নয়া দালালির মোকাবিলা করার জন্য আমরা যাবতীয় বন্দোবস্ত, সবই করেছিলাম। কেবল ঢাকা বা পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলা কেন, সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানেও ন্যাপের পক্ষ থেকে নিয়মিত সভা, শোভাযাত্রা, আলোচনা এবং গ্রাম প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আমরা জনসাধারণকে পি, ডি, এম-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেছি। মজার ব্যাপার এই যে, পি, ডি, এম-ওয়ালারা নিজেরাই মাঝে মাঝে এক-একটা আহাম্মকী করে আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছিল। যেমন, পি, ডি, এম হবার তিনদিন বাদেই অর্থাৎ চৌঠা মে আবদুস সালাম খান সংবাদিকদের কাছে স্বীকার করল যে, পি, ডি, এম কোনও দল নয়, একটা সংগঠন মাত্র। তার কোনও নির্দিষ্ট এবং নিজস্ব গঠনতন্ত্র নেই, অংশীদার দলগুলির নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও তার নেই। এই দলগুলি নিজস্ব কর্মসূচী ও অর্থনীতি সহ স্বাধীনভাবে নির্বাচনে নামবে। কেবল একটি বিষয়ে তারা একমত যে, দেশের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; অতএব জনসাধারণের স্বার্থে গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য তারা মিলিতভাবে চেষ্টা করে যাবে। আতবড় মূর্খও বোধ হয় এই ধরনের বিবৃতি দিতে লজ্জাবোধ করত! আপনারা যাঁরা নিয়মিত আমার চিঠি পড়ছেন এবং ভারতে বসেই পাকিস্তানের আগামী নির্বাচনের টুকিটাকি খবর পাচ্ছেন তাঁরা জানেন যে, আজও পাকিস্তানের তথাকথিত প্রগতিশীল দলগুলি জনতার স্বার্থে এক কাতারে আসতে পারে নি। যেখানেই একটা বোঝাপড়া হয়েছে, সেখানেই কিছু না কিছু ভাগ-বাটোয়ারার কথা পাকা হয়ে গেছে এবং এই ধরনের বোঝাপড়া অত্যন্ত সাময়িক, কেন না এরা প্রত্যেকেই দালালি করছে এবং নিজের ব্যবসাটাকে একচেটিয়া করতে চাইছে। সেদিনও তাই হয়েছিল। জামাতের এক মত, নিজামের আর এক মত, এন, ডি, এফ-এর এক পথ, কাউন্সিল মুসলিম লীগের আর এক পথ। এই সব মত এবং সব পথ একই আঁস্তাকুড়ের দিকে গেছে, হয়ত সেইখানে গিয়ে হাঁটু আর কনুই ঠোকাঠুকি করে ওরা ময়লা খুঁটে খেত, কিন্তু জনতার জন্য জনতার স্বার্থে কখনও এক হতে পারত না। কাজেই নূরুল বা আবদুস সালামের আশ্বাস সম্পূর্ণ ধাপ্পা!

দ্বিতীয়ত এটা অর্থাৎ পি, ডি, এম কি ধরনের সংগঠন—যেখানে প্রত্যেকেই স্বাধীন! যেখানে প্রতি দলই তার নিজস্ব নীতি নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার রাখে! আট দফায় যে সব দাবীদাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তার সামান্যতম সাফল্যের জন্যেও একটা সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। আবদুস সালামের কথা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, সেই বোঝাপড়ার লেশমাত্র পি, ডি, এম-এ নেই।

কাজেই আমাদের সুবিধা হোল। পি, ডি, এম-এর ঘোড়ার গলদ জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে আমরা তেমন কোনও বেগ পেলাম না।

পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(১০)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেবছর গুরুদেবকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের সমাবর্তন উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার জন্য। গুরুদেব সানন্দে সম্মতি জানালেন, আর একথাও লিখে দিলেন যে, বাংলার এই প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ তিনি বাংলাতেই দেবেন। প্রতি বছর সমাবর্তন-ভাষণ দেওয়া হয় ইংরেজি ভাষায়; আর তখন আচার্য ছিলেন বাংলার গভর্নর এক বিদেশী ভদ্রলোক, তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যতিক্রমের প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন। গুরুদেবকে তাঁরা লিখে দিলেন ইংরেজিতেই তিনি যেন তাঁর ভাষণ দেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবও বিশ্ববিদ্যালয়কে জবাব দিলেন তাঁর ভাষণ তিনি বাংলা ভাষাতেই দেবেন বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন, এ বিষয়ে য়ুনিভার্সিটির কোনো অসুবিধা থাকলে তাঁরা যেন তাঁকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেন। গুরুদেবের এই অসম্মত জ্ঞাপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ খুব বিচলিত হলেন, বিশেষ করে আচার্য। ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করে তাঁরা স্থির করলেন বাংলার বুকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি যখন বাংলা ভাষায় সমাবর্তন-ভাষণ দেবার প্রস্তাব করেছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া। শুনেছি চ্যান্সেলার নিজে গুরুদেবকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলা ভাষাতেই সমাবর্তন-ভাষণ দেবার জন্য। গুরুদেব সম্মত হন—এই উপলক্ষে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তা অমর হয়ে আছে। এই ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করলাম—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। ...আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হলো। দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এদেশে অনেককাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। ......বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন সার্বজনিক ভাষায় স্বদেশে সঞ্চয়নের আত্মীয়তাসম্বন্ধের গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশাধিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয় নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তারপর কিশোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমতো একদিন সসংকোচে প্রবেশ করেছিলুম বহিরঙ্গ ছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে। সেই একদিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে-প্রকারে সমস্ত ক্লাশের সঙ্গে আমার এমন কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল, যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলাম এবং আর যে কোনোদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারী-বর্গের একপাশে স্থান পাব, এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনাপুণ্যেই সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।......

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গমঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি (ডক্টর) দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এলো নবপল্লবের উৎসব।"......

তরুণ ছাত্রসমাজকে ডাক দিয়ে তিনি বললেন, "তোমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে

অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গৌরবদিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামীকালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।...... সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠলো; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি। ......অনশন ও দুঃখ-দারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনশক্তিকে জীর্ণ-জর্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সেকথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে—অশিক্ষিত কল্পনা দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ করে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয়, তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাদ্ধদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।......

অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, মূঢ়তা, কদর্যতা সবকিছুকে অত্যুক্তিবর্জিত করে জেনে দৃঢ়সংকল্পের সংগে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে একথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ করে বাঁধর শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি, তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন বলে ওঠেঃ 'তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়'।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দী-নির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তারপরে পরের শক্তির সংগে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে আড়ষ্টের প্যাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও তাদের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে, সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে-আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে-আশ্রয়ের ভিত্তি।

"হে বিধাতা,........................ ...

....

দূর কর চিত্তের দাসত্ব বন্ধন,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত
লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে'।"

গুরুদেবের এই দীক্ষান্ত-ভাষণ আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে 'রীলে' (relay) করার ব্যবস্থা হয়। বিশ্বভারতীর অধ্যাপকমণ্ডলী, ছাত্রমণ্ডলী, কর্মিমণ্ডলী সবাই সেদিন বিকেলে উত্তরায়ণে সমবেত হয়ে অসীম আগ্রহে রেডিওতে গুরুদেবের কণ্ঠে তাঁর এই প্রদীপ্ত ভাষণ শুনেছিলেন। এই ভাষণ দেবার কিছুদিন আগে তিনি শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ সম্বন্ধে New Education Society-এর জন্য যে-উদ্বোধনী ভাষণ রচনা করেছিলেন, তা অধ্যাপকমণ্ডলীকে আহ্বান করে শুনিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—"বাঙালীর ছেলে ইংরেজি-বিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করার জন্য তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় (আশুতোষ) বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলচ্ছক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরো এগোত।...... বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে-মূর্তি কারখানাঘরে তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয় হয়ে। তার বালক-মূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন অধিকারের প্রথম টিকা। ......মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে-বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনই সুস্থপ্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব প্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি, তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষা দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশংকা থাকে। ......আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষা-স্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনীধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যা বিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।"

তিনি একাধিকবার একথা বলেছেন যে, পাশ্চাত্য-ছাঁচে গড়া আমাদের দেশের শিক্ষাবিধান পরভাষায় ভারাক্রান্ত হয়ে এমনি অস্বাভাবিক হয়েছে ও তার আয়োজন এতো অকিঞ্চিৎকর যে, দেশের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে শিক্ষার ক্ষীণ আলোক পড়েছে, তার বৃহত্তম অংশ শিক্ষা-বিহীন হয়ে মূঢ়তা ও অপবিশ্বাসের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বহুদিন ধরে এদেশে শিক্ষার চর্চা হয়ে আসছে একান্তভাবে বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়ে, অনভ্যস্ত এই ভাষায় সে-শিক্ষা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে নি, দেশের দৃষ্টিকে সে দান করেছে অতি সামান্য। তাই দেশের শিক্ষা ও তার বৃহৎ মন আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, দেশের প্রাণের ধারার সংগে এই শিক্ষার যোগ খুব সংকীর্ণ। অনেকদিন ধরে এই অসংগতির অভ্যাস মজ্জাগত হয়ে জাতির চিন্তাশক্তিতে এনেছে এক সর্বনেশে জড়তা। এই জড়তার সাংঘাতিক নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই গুরুদেব সেই ভগীরথকে আহ্বান জানিয়েছেন—যিনি বাংলাভাষায় দেশের শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার মহাসাগর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তার সঞ্জীবনী ধারায় অভিশাপমুক্ত করুন সহস্র সহস্র প্রাণহীন মনকে।

এই *New Education Society*-র উদ্বোধন দিবসে একটা ঘটনা ঘটে গেল। উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন গুরুদেব, বাংলার তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ছিলেন সভাপতি (যতদূর মনে পড়ে), এক বিদেশী ভদ্রলোক। বাংলাদেশের ও বাইরের অনেক
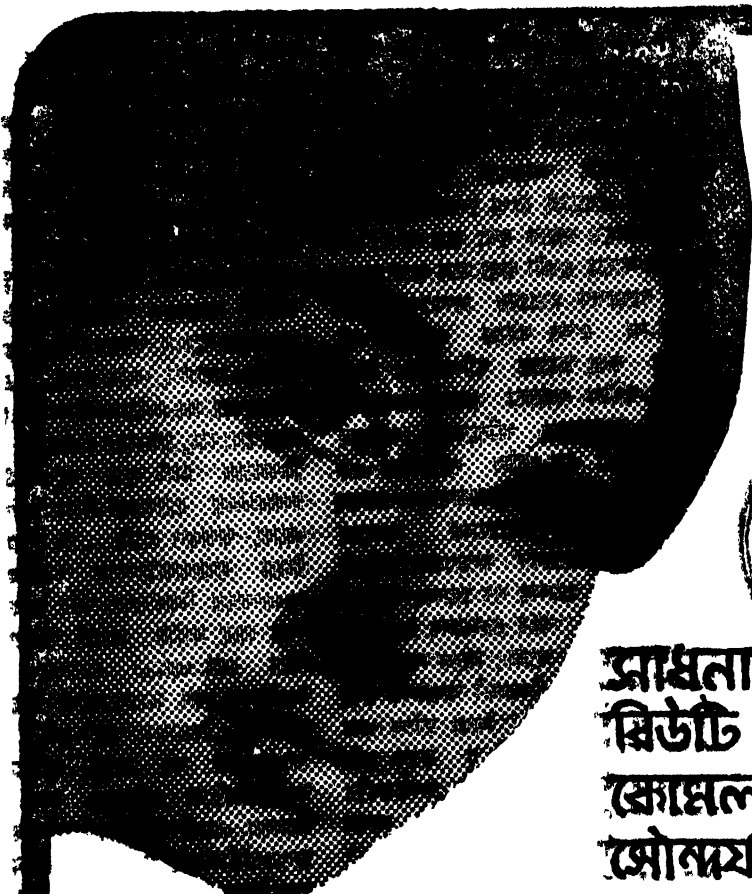
অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী ঐ সভায় সেদিন উপস্থিত। শিক্ষা-অধিকর্তা তাঁর ভাষণে শিক্ষার মানের যে কী অবনতি ঘটেছে, তার উদাহরণস্বরূপ বললেন যে, কিছুদিন আগে একটি শূন্যপদে যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগের জন্য যেসব স্নাতক প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, তাঁদের সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে যে কয়টি সহজ প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের কোনো সদুত্তর পান নি বলে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন—ছেলেদের লেখাপড়ায় আর তেমন মন নেই, নানা বাজে কাজে তাঁদের মন বিক্ষিপ্ত। তিনি বললেন, তাঁর একটা খুব সহজ প্রশ্ন ছিল "What is the exact height of the Mount Everest?" (মাউণ্ট এভারেস্ট শৃঙ্গের নির্ভুল উচ্চতা কত?)। একজন স্নাতক যদি এই সহজ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারেন তাহলে স্নাতক হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই, আর যে-বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যায়তনের ছাত্র তিনি তার শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন—কোনো একটি বিশেষ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারাটা স্নাতকের সামগ্রিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা নির্ণয় করে না, আর কোনো শিক্ষায়তনের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করাও সাজে না তার কোনো এক স্নাতকের কোনো একটি বিশেষ প্রশ্নের ত্রুটিপূর্ণ জবাবকে ভিত্তি করে। তারপর শিক্ষা-অধিকর্তাকে উদ্দেশ করে অধ্যাপক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—"Sir, may I know what is the exact height of the Mount Everest! Frankly speaking, I myself do not know the answer." (মহাশয়, মাউণ্ট এভারেস্টের নির্ভুল উচ্চতা কত তা একটু বলে দেবেন! সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেই এই প্রশ্নের জবাব জানি না)। শিক্ষা-অধিকর্তা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—"It's so simple!—29002 ft. (খুবই সহজ—২৯০০২ ফুট)। অধ্যাপক তখন তাঁকে চেপে ধরলেন, "How do you know? How do you measure the *exact* height? What you can measure is only the approximate height and that also is subject to so many corrections" (কী করে জানলেন? কী করে নির্ভুল উচ্চতা পরিমাপ করা হলো? যা নির্ণয় করা সম্ভব তা হলো স্থূল উচ্চতা, তাও আবার অনেক শুদ্ধি প্রক্রিয়া আরোপ করার পর)। শিক্ষা-অধিকর্তা ভাবতেই পারেন নি এভাবে বিব্রত হবেন ছেলেদের সম্বন্ধে ঐ মন্তব্য করতে গিয়ে, তবে বুঝলেন তাঁর নিজের প্রশ্ন করার ভুলটা ও তাঁর অসংগত সিদ্ধান্তের। আর এটুকুও বুঝলেন যে, স্নাতকের পক্ষ নিয়ে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁকে বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আর বেশি-দূর ঘাঁটানো খুব নিরাপদ নয়। কারণ, বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তিনি স্বনামধন্য। গুরুদেব অবস্থাটা উপলব্ধি করে আলোচনার ধারাটা অন্যপথে চালিত করে ব্যাপারটা এখানেই চাপা দিলেন। না হলে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াত বলা যায় না! এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল—এই অধ্যাপক ছাত্রদের সম্বন্ধে কোনো নিন্দা বা শ্লেষ সইতে পারতেন না, বিশেষ করে তাদের বুদ্ধিবত্তার উপর কোনো কটাক্ষ করলে। সেবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন মাদ্রাজে হচ্ছে। সদ্য এম-এসসি পাশ-করা এক তরুণ গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ ফল রচনার আকারে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে এমন জর্জরিত করে ফেললেন যে, সেই বেচারার কণ্ঠরোধ হলো; সঙ্গে সঙ্গে এই বিশিষ্ট স্বনামধন্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক সেই তরুণ যুবকের কাছে গিয়ে তাঁকে এক হাতে বেষ্টন করে অপর হাতে তাঁর রচনাটি নিয়ে সেই সপ্তরথীর প্রশ্নাবলীর যথাযথ জবাব দিয়ে বললেন, তিনি যেসব কথা আলোচনা করলেন, এই তরুণ বিজ্ঞানসাধকও ঠিক সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর বক্তব্য সম্যক উপলব্ধি না করে সপ্তরথীর দল অন্যায়ভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছেন। এই মনোভাবের তিনি প্রশংসা করতে পারেন না; তরুণ যাঁরা, তাঁদের কাজে উৎসাহ দিতে হবে, উপদেশ দিয়ে তাঁদের কাজে অনুপ্রেরণা দিতে হবে, থাক না তাঁদের কাজের কিছু ত্রুটি। তা না করে, সবাই মিলে কঠোর ও নিষ্ঠুর সমালোচনা করলে তাঁর প্রতিভার বিকাশের ঘোরতর অন্তরায় হবে।

এই বিশিষ্ট অধ্যাপক যে কী রকম ছাত্রদরদী তা বোঝাতে আর দু'-একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বি-এসসি পাশকোর্সের প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষার সময় ৮।১০টি ছাত্রের বর্ণালিবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্র নিয়ে বর্ণালি বিশ্লেষণের কাজ পড়েছে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তি করে বিফল হওয়ার পর তারা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে স্থানীয় পরীক্ষকের কাছে একযোগে জানালো যে, একটা যন্ত্রও ঠিক নেই, কোনো কাজই এদের দিয়ে করা যাচ্ছে না। পরীক্ষক তাদের ধমকে বিদায় করে দিলেন, বললেন—যন্ত্র সব ঠিক আছে, adjustment যা দরকার তা নিজেদেরই করে নিতে হবে, অন্যথায় ফেল করবে। তারা অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল ল্যাবরেটরীতে, বারান্দায় ঐ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হতে তিনি তাদের চোখে-মুখে একটা উত্তেজিত ও অস্বাভাবিক ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন তাদের কী হয়েছে। তারা সব কথা ওঁকে খুলে বললো। তিনি ছেলেদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে তাদের ল্যাবরেটরীতে ফিরে যেতে বললেন, আশ্বাস দিলেন, অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অধ্যাপক পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যে-দুজন গবেষক কাজ করছিলেন, তাঁদের বললেন,—মনে হচ্ছে......স্পেকট্রোমিটার-এর সব adjustments গোলমাল করে রেখেছে, তোমরা এক্ষুণি যন্ত্রগুলি ঠিকমতো set করে দু'-একটা করে reading ছেলেদের নিতে দেখিয়ে চলে এসো, ততক্ষণ আমি......কে আমার ঘরে নিয়ে কথাবার্তা বলে আটকে রাখি। অধ্যাপকের নির্দেশমত তাঁর গবেষক ছাত্রদ্বয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আদেশ পালন করে চলে এলো। ছেলেরাও তাদের পরীক্ষায় বেশ ভালোভাবেই অগ্রসর হয়ে চললো। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় পরীক্ষক অধ্যাপকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ল্যাবরেটরীতে ছেলেদের কাজ দেখতে এলেন। এসেই তাঁর চক্ষুস্থির, দেখেন সব স্পেকট্রোমিটারই প্রায় নিখুঁতভাবে set করা, আর প্রত্যেকটি ছেলেই তার পরীক্ষা প্রায় শেষ করে ফেলেছে, results যা পেয়েছে তা চমৎকার। "আচ্ছা দেখছি" বলে অগ্নিমূর্তি হয়ে তিনি সবেগে ঢুকলেন গবেষকদ্বয়ের ঘরে। বললেন—তোমরা নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ছেলেদের স্পেকট্রোমিটার set করে দিয়েছ, এমন কি কিছু reading নিয়ে তাদের দেখিয়ে এসেছ। আমি জানতে চাই এই অন্যায় কাজ তোমরা কেন করেছ? এই অসদুপায় অবলম্বন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছেলেদের এবং এই কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য তোমাদের শাস্তি নিতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে অধ্যাপক ঘরে ঢুকেই বললেন—"আমিই এই কাজ করাবার ব্যবস্থা করেছি। প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে এই পরীক্ষা সম্পাদন কর; এর অর্থ এই যে, এমন যন্ত্র ছেলেদের দিতে হবে যার মধ্যে খুঁত নেই, আর arrangements আগাগোড়া ওলট-পালট করার তো কোনো কথা ছিল না। ছেলেদের শেখাবার জনাই শিক্ষক, ঠকাবার জন্য নয়; তোমার এই মনোবৃত্তি

গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে আমাকেও কঠোর হতে হবে।"

কিন্তু এতদিন অনুশীলনের ফলে এটা যাঁর স্বভাবে মজ্জাগত হয়ে গেছে তাঁকে সংশোধন করা এতো সহজ নয়। কেন নয় তাই বলছি, তার পরের বছরই এম-এসসি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় এই স্থানীয় পরীক্ষককে নিয়ে এক অপঘাত ঘটলো। একটি ভালো ছেলে, যার প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা সম্বন্ধে অধ্যাপক নিশ্চিত, প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় তার "এক্সপেরিমেণ্ট" নির্ধারিত হলো 'কন্‌স্টেণ্ট ডিভিয়েশন স্পেকট্রোগ্রাফ' দিয়ে অজানা একটি পদার্থের বর্ণালি পরীক্ষা করে তার পরিচয় নির্ণয় করা। এই পরীক্ষায় বহির্পরীক্ষক (External Examiner) হিসেবে এসেছিলেন বাংলা-দেশের বাইরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক-জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক। তত্ত্ব-বিষয়ক (Theoretical) পরীক্ষায় ছেলেটি সব প্রশ্নপত্রেই (Paper) প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে, এখন এই প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেই তার এম-এসসি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা সুনিশ্চিত। বহির্পরীক্ষক এই অধ্যাপকের সঙ্গে এলেন ল্যাবরেটরীতে ঐ ছেলেটি 'এক্সপেরিমেণ্ট' কী রকম করছে তা দেখতে ও তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। ঘরে ঢুকেই তাঁরা দেখলেন ছেলেটি ঘর্মাক্তকলেবরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রটাকে ঠিকমতো set করার জন্য, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে আলো কিছুতেই ক্যামেরার ঘষা কাঁচে এসে পড়ছে না। ছেলেটির এই দুরবস্থা দেখে বহিরাগত পরীক্ষক একটু শ্লেষ করেই বললেন—"এই তোমাদের 'ব্রিলিয়াণ্ট' ছাত্র, যে 'কনস্টেণ্ট ডিভিয়েশন স্পেক্ট্রোগ্রাফের' ভিতর দিয়ে দু' ঘণ্টার চেষ্টায় আলোর সন্ধান পেল না!!" অধ্যাপক ছেলেটির দিকে তাকিয়ে তার দুঃসহ অবস্থাটা উপলব্ধি করে কোমল কণ্ঠে বললেন—"কী হে......, ব্যাপার কী বলতো?" ছেলেটি প্রায় কেঁদে ফেললো, "স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না, মনে হয় যন্ত্রটাই খারাপ।" বলতেই বহির্পরীক্ষক ধমকে উঠলেন—"যন্ত্রের দোষ দিও না, ওটা set করতে জানো না বলেই আলো আসছে না, যন্ত্রের উপর দোষারোপ করাটা আজকাল ছেলেদের স্বভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।" ছেলেটি আবার বললো—"স্যার, এই ধরনের যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি এতো সহজ যে না-জানার প্রশ্নই ওঠে না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই যন্ত্রটার ভিতরে নিশ্চিত কোথাও কিছু গোলযোগ রয়েছে"। বহির্পরীক্ষক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না, যন্ত্র ঠিকই আছে।" ছেলেটির এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, "বেশ তো স্যার, তবে তাই; এই যন্ত্র দিয়ে তাহলে আপনিই আলো এনে দিন।" তিনি সহাস্যে বললেন, "দিচ্ছি, কিন্তু তাহলে এই পরীক্ষায় তোমার অর্ধেক নম্বর কাটা যাবে।" ছেলেটি বললো, "তাই হোক স্যার, এবার আমি পরীক্ষা দেব না।" বহির্পরীক্ষক তখন একটু স্মিতহাস্যে যন্ত্রটার কলকব্জা নেড়েচেড়ে দেখলেন আলো আসছে না, তিনিও ঘর্মাক্তকলেবর হয়ে উঠলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে অধ্যাপক তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন,—"বন্ধু হেরে গেলে, মনে হয় বাক্সে বন্ধ 'কনস্টেণ্ট ডিভিয়েশন প্রিজম'-এর ব্যবস্থানটা কোনো রকমে পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু এই প্রিজমে হাত দেওয়া নিষেধ, বাক্সটা খুলে দেখা যাক।" দুজনে মিলে তখনই স্ক্রুড্রাইভার আনিয়ে বাক্স খুলেই দেখেন যে প্রিজমটা কেউ উলটে রেখেছে। একে স্বস্থানে বসিয়ে বাক্সটা আবার বন্ধ করে দিতেই ক্যামেরার প্লেটে আলো এসে পড়লো। বহির্পরীক্ষক তখন ছেলেটির পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আমি খুবই দুঃখিত, আমাদের ত্রুটিতেই তোমার এই অসুবিধা ঘটলো, তুমি এখন কাজ করে যাও, যে-সময়টা তোমার নষ্ট হয়েছে তা তোমাকে পুষিয়ে দেব।" দুই অধ্যাপক বন্ধু তখনই ডেকে পাঠালেন সেই অন্ত-পরীক্ষককে—যিনি এই পরীক্ষাটি সাজিয়ে রেখেছেন। তিনি আসতেই অধ্যাপক তাঁকে বললেন, "এই 'প্রিজম বাক্সটা' খুলে প্রিজমের ব্যবস্থানটা কেন তুমি পরিবর্তন করে রেখেছ। ছেলেদের 'প্রিজম বক্স' খোলা নিষেধ তা জেনেও তাদের এভাবে হয়রান করতে তোমার বিবেক-বুদ্ধিতে একটুও বাধলো না। আজ থেকে কোনো পরীক্ষাতেই তোমাকে যাতে পরীক্ষক নিযুক্ত করা না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। এর আগেই তোমাকে একবার সাবধান করেছি, দেখছি তুমি তা উপেক্ষা করেছ, তোমার হাতে ছেলেদের শিক্ষার ভার দেওয়া দেখছি বিপজ্জনক।"

গুরুদেবও ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কোনো অভিযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন না, তবে শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তনের শৃংখলা ভঙ্গ করার প্রশ্নে তিনি খুব কঠিন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতেন। একবার মহাত্মা গান্ধী আশ্রমে এসে কয়েকদিন থেকে যান, সেই সময় অধ্যাপক-মণ্ডলীর সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন উত্তরায়ণে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা করবেন বলে। গুরুদেবও সেখানে উপস্থিত। প্রথমেই মহাত্মাজী জানতে চাইলেন শিক্ষকতার

[illegible] কার কী ধরনের অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে [illegible]। একজন [illegible] অধ্যাপক বললেন, "আজকাল ছেলেমেয়েরা খুব অমনোযোগী, লেখাপড়ায় মন নেই, দুষ্টুমি করে বেড়ায়, আর ক্লাশে গণ্ডগোল করে।" গান্ধীজী তাঁকে বললেন, "ক্ষেত্র-নির্বাচনে আপনার ভুল হয়েছে। ছেলেরা অমনোযোগী, পড়াশুনো করে না, গোলমাল করে বলে যে-শিক্ষক অভিযোগ করেন তিনি যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিদায় নেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল, শিক্ষার্থীদের পক্ষে তো বটেই।" এর পর তিনি এক নতুন শিক্ষাপরিকল্পনার কথা বিশদভাবে আলোচনা করলেন, পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনাই 'বেসিক এডুকেশন' নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো—একবার কর্মসচিব রথীন্দ্রনাথ, শ্রীভবনের প্রণেত্রী ও নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় মিলে শ্রীভবনের মেয়েদের উপর প্রযোজ্য হবে এমন কতকগুলি কঠোর নিয়ম রচনা করে গুরুদেবের সামনে উপস্থাপিত করলেন তাঁর অনুমোদনের জন্য। গুরুদেব অধ্যক্ষদের সব ডেকে পাঠিয়ে ঐ নিয়মাবলী তাঁদের পড়ে শুনালেন। তারপর বললেন, "কর্মসচিব, প্রণেত্রী ও নেপালবাবু এই ত্রিশক্তি মিলে এই নিয়মাবলী রচনা করেছেন, আপনাদের অভিমত জানতে চাই।' গুরুদেব রথীন্দ্রনাথকে 'রথি' বলেই ডাকতেন, কিন্তু প্রশাসনিক কোনো ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হলে 'কর্মসচিব' বলেই সম্ভাষণ করতেন। সবাই নির্বাক, গুরুদেব তখন বলতে শুরু করলেন, "শুদ্ধ সরল অন্তঃকরণে আনন্দের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা মেলামেশা করে, সেটাই হলো তাদের সুস্থ জীবনযাত্রার লক্ষণ। প্রতিপদে সন্দেহ করে এই নিয়মাবলীর কদর্য নাগপাশে তাদের বেঁধে দিলে শান্তিনিকেতনের উদার উন্মুক্ত আকাশ সন্দেহের বিষবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠবে। এই শান্তিনিকেতন আমি গড়তে চাই নি, চাইও না। অন্তঃকরণের শুচিতাই যেখানে নষ্ট হয়েছে বলে আশংকা সেখানে শুধু কতকগুলি শুষ্ক কঠোর নিয়ম প্রতিনিয়ত বাধানিষেধের গণ্ডী টেনে দিয়ে তরুণ রক্ষা করতে পারে না। বুদ্ধদেবের সান্নিধ্যের কাছে আমরা তুচ্ছ—'আনন্দ' যখন মঠে ভিক্ষুণীদের গ্রহণ করেছিলেন তখন এ দৃঢ়-বিশ্বাস সকলের মনেই ছিল, যে-কঠোর ও অবশ্যপালনীয় নিয়মাবলী তিনি বেঁধে দিয়েছেন তাদের অতিক্রম করে কোনো বিপদ বা অপঘাতের আশংকা নেই। বৌদ্ধধর্ম একদিন মুক্তির পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম; সংযম ও তাপসের কঠোরতা ছিল অপরিসীম। এই ধর্ম করুণাকে আদর করেছে কিন্তু ভক্তিকে স্বীকার করে নি। সেই ভক্তিই একদিন এসে তার অসম্মাননার প্রতিশোধ নিয়েছে, সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করেছে। কিন্তু যেখানে [illegible] প্রেম ও [illegible] নিহিত সত্যের অবজ্ঞা করার প্রশ্ন যেখানেই অনাকে হেয়মান করার ভক্তিকে অপমান করতে বাধে সংযমও। অনুশাসনের লৌহ কঠিন অবলম্বন তখন অনেক অনিবার্য পতনের পথ রোধ করতে পারে না। এই ধরনের শুষ্ক অনুশাসনের কোনো আমি কখনও অনুমোদন করতে পারি না।"

কে কী ধরনের কাজের যোগ্য তা নিয়ে একদিন গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন কয়েকজন। গুরুদেব বললেন, "এই ধরা যাক, 'অমুক' তাঁর ঐ বিশাল বর্তুলাকার নৃত্যের ছন্দের পরিপন্থী বপুখানি নিয়ে নৃত্যের অনুশীলন করতে গেলে আনন্দের বদলে বিড়ম্বনাই সার হবে, তাঁর তাণ্ডবে ও অস্বাভাবিক ওজনের ভারে পদস্খলন হয়ে বা স্টেজ ভেঙে অপঘাত ঘটাও বিচিত্র নয়। 'সুরেন' (সুরেন্দ্রনাথ কর, কলাভবনের সহ-অধ্যক্ষ) নেপথ্যে এই ইঙ্গিত করেছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। যার কণ্ঠে সুর নেই তার সঙ্গীত চর্চার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, না পাবে নিজে আনন্দ, না দিতে পারবে অন্যকে আনন্দ। যার মধ্যে ছন্দ নেই, মিল নেই তার কবিতা লেখার প্রয়াসে পদে পদে ঘটবে বিড়ম্বনা।" এসব আলোচনা হচ্ছে তখন একটা ব্যাপারে গুরুদেবের আদেশের জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "এই যে কাঠখোট্টা বৈজ্ঞানিক, আমি ওকে যতদূর বুঝেছি ওর মধ্যে সুর নেই ছন্দ নেই রাজনীতি নেই, তাই সঙ্গীত কবিতা ও প্রকাশ্য বক্তৃতা এই তিনটি কাজের কোনোটিই ওকে দিয়ে হবে না। অনুশীলনের চেষ্টা করলে অপঘাত অনিবার্য।" কেউ কেউ বললেন, "আপনার কবিতা-রচনার খেলায় যোগ দিলে হয়তো বা সেদিকে কিছু সাফল্য আসতে পারে।" গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "অসম্ভব"। —এই খেলাটা কি জানো; কয়েকজন মিলে বসে এই খেলা—একজন কবিতার একটি লাইন বলবেন, তাঁর পাশের লোকটি পাদপূরণ করবেন। একবার এরকম খেলায় একজন বললেন, "কৃষ্ণপ্রেমে সবাই হাবুডুবু, রাই শুধু কলংকিনী।" আমি ছিলুম তাঁর পাশে তাই পাদপূরণের দায়িত্ব এসে পড়লো আমার উপর। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "সবাই কলম ধার নিয়ে যায় আমি খালি কলম কিনি।" এবার ও'দের বললেন, "ওকে দেখলেই কেন জানি না আমার অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলেন জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু, ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ। বাংলা অনেক উদ্ভট গান তাঁর মুখস্থ ছিল, সে-গান [illegible] একেবারে [illegible] ছিল না একবার [illegible] আরও [illegible]। [illegible] তাঁর [illegible] পড়তো না। গাইতেন কিছুতেই থামতো না। বিশেষ বয়স বেহাগ রাগিণী ছিল তাঁর খুব প্রিয়; চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনতো তাদের মুখের ভাব দেখতে পেতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখবার ব্যাপারেও কোনো বাধা তাঁর ছিল না; টেবিল, বই, বৈধ অবৈধ আওয়াজওয়ালা যা কিছু হয়তো কাছে পেতেন অকেই অজস্র পটাপট শব্দ ধ্বনিত করে বাঁয়া-তবলার কাজ করে নিয়ে আসর সরগরম করে তুলতেন। তবে তেমন মানুষ, আনন্দ উপভোগ করার শক্তি ছিল খুবই উদার।" আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কি হে, তোমার গুণপনা সম্বন্ধে যা বিশ্লেষণ করলাম ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে তো।" বললাম—কখনও কখনও গানের দু-একটি কলিতে টান দিলে সঙ্গে সঙ্গে জোরালো প্রতিবাদ ওঠে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ মহল থেকে; সব গানই 'একসুরে' গাইতে আমি নাকি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সেই গান শুনলে শ্রোতার মাথায় খুন চেপে যাওয়া অসম্ভব নয়। শুভানুধ্যায়ীরা বলেন, আমার কণ্ঠ-নিঃসৃত বেসুরে মানুষ ক্ষিপ্ত হলে আমার নাকি অব্যাহতি নেই, অপঘাত অনিবার্য। গুরুদেব বললেন—"সত্যিই গান বিকৃত করে গাইলে বা গানের তাল কেটে দিলে রাগও হয়, দুঃখও হয়। সেদিন দেখলে তো সিংহ-সদনে মাইহারের ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁর ছেলে আলী আকবর তাল কেটেছিল বলে প্রকাশ্য আসরে কীভাবে তাকে শাস্তি দিলেন। ওঁরা গুণীর জাত, সঙ্গীতের নিখুঁত গতিপথ থেকে বিচ্যুতি বা এতটুকু স্খলন সহ্য করতে পারেন না। ধীরেন যখন ছোটো ছিল একদিন অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে গান গেয়ে চলেছে, এত তন্ময় যে আমার আসাটা টেরই পায় নি। আমি পিছন থেকে ওর চোখ টিপে ধরলুম, ও ভাবলে কোনো সতীর্থের কাজ, বললো, 'ছেড়ে দে বলছি'। চোখ ছেড়ে দিতেই আমাকে দেখতে পেয়ে খুব লজ্জা পেলো। বললুম, "গানই যদি গাইবি তবে বেসুরো কেন, আর সুর ঠিক করে দিচ্ছি।" বেসুরো গান উনি একেবারেই সইতে পারতেন না। [illegible] একবার [illegible] মহলানবীশ মশায় [illegible] রবীন্দ্রসংগীত কয়েকজন শিল্পীকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে গুরুদেবের অনু-মোদনের জন্য এলেন। সুর ঠিক হয় নি বলে গুরুদেব সবকটি রেকর্ডই বাতিল করে দিলেন, বুলাবাবু ও গ্রামোফোন কোম্পানির তো অবস্থা শোচনীয়। সুর ঠিক করে আবার রেকর্ড করাতে হলো সেবারা।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ অষ্টম অধ্যায় ॥

পাইপ লাইন, "পুনর্বাসন" এবং বাড়ি

বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে ও নতুন নতুন দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, কাজেই লডওয়ার থেকে কিটালে যাওয়ার পথে বিস্তীর্ণ বালুভূমি, মাঝে মাঝে ছড়িয়ে থাকা বাবলা কাঁটার ঝোপ এবং জমির ওপর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কালো পাথরের ঢিবিগুলি দেখে আমার মন খুশি হয়ে উঠেছিল। "রয়েল' নামে এক পাহাড়ের শ্রেণীকে পার করতে রাস্তা তার গা বেয়ে এঁকে-বেঁকে ওপরে উঠে গেছে, সেখান থেকে নিচের দিকে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে। এই বিপদসংকুল রাস্তা নিরাপদে পার না হওয়া অবধি কেউই কোন কথা বলে নি। সেদিন রাত্রে আমরা কিটালের বন্দিশালায় ঘুমাই এবং পরের দিন সকালে ট্রেনে চেপে নাইরোবি থেকে আঠারো মাইল দূরে "আথিরিভার" বন্দিশিবির অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করি। মোট দুইশত সত্তর মাইল পথ ট্রেনে যেতে আমাদের লেগেছিল দু' দিন এবং আমার প্রথমবার গ্রেফতার হবার ঠিক চার বছর পর ১৯৫৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আমরা গন্তব্যস্থলে পেঁছাই।

আথিরিভারে অনেকদিন পরে আবার আমাদের কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। এর মধ্যে ছিল লড্ওয়ার ক্যাম্পের বাকস্টন ও ম্যানস্ফিল্ড, যাকে আমরা "টিনের মগ" নাম দিয়েছিলাম। বাকস্টন লডওয়ারে আমাদের সঙ্গে মোটামুটি বেশ ভালই ব্যবহার করেছিল, কিন্তু ম্যানস্ফিল্ডের সঙ্গে আমাদের যে মোকাবিলা হয়েছিল কিছুদিন আগে তা সে এখনও পর্যন্ত ভুলতে পারে নি। আথিরিভার ক্যাম্পকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক ভাগে তিন-শত বন্দীর থাকবার বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু আমরা যখন পেঁছেছিলাম সেখানে তখন এক-একটি ভাগে মোটে ১৫০ থেকে ২০০ জন করেই থাকত। লড্ওয়ার থেকে আগত আমাদের ষাট জনকে ছয় ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক বিভাগেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাকে ষষ্ঠ বিভাগে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে মানিয়ানির কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হয়েছিলাম। রবিনসন মোয়ানাগি, গাদু কামাউ, জোসেফ কিবিরা এবং ডেভিড অবশ্য লড্ওয়ারেই রয়ে গিয়েছিল এবং ওদের সঙ্গে আবার আমার দেখা হয় ১৯৬০ সালে ছাড়া পাবার পর।

কেনিয়ার 'সঙ্কট অবস্থা' জারি হবার সময় আথিরিভার বন্দিশিবির সম্পূর্ণ তৈরি হয় নি, কিন্তু এখানকার নির্মাণকার্য শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাসাই অঞ্চলের কাজিয়াডো শিবির থেকে অন্তরীণদের এখানে চালান করেন সরকার। এই সমস্ত লোককে রাজ-প্রধানের আদেশানুযায়ী 'আটক করা হয়েছিল এবং এর সরকারী নাম ছিল "জক্ স্কট অপারেশান"। এই দলের ভেতর অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকও ছিল। প্রথমদিকে প্রত্যেকটি লোককে আটক করার জন্য রাজ্যপ্রধানের নিজস্ব স্বাক্ষর ও সম্মতির প্রয়োজন হত, কিন্তু সঙ্কট বৃদ্ধির সংগে সঙ্গেই ধর-পাকড়ের বহরও বাড়তে থাকে এবং স্বাক্ষর করার ক্ষমতা রাজ্যপ্রধান থেকে নেমে প্রথমে প্রাদেশিক ও পরে জেলা মহাধ্যক্ষের হাতে বর্তায়। আমাদের ভেতর বেশির ভাগ অন্তরীণকেই এই-ভাবে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ কর্ম-চারীদের হুকুমে ও খেয়াল-খুশিতে বন্দিজীবন যাপন করতে হয়েছিল। সরকারী প্রচারে বলা হয়েছিল যে, সঙ্কট বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রাজ্য-প্রধানের পক্ষে আর প্রত্যেকটি 'পরিস্থিতি'

জোমো কেনিয়াটা

ভাড় শা [illegible] ক ও জেলা মহাধ্যক্ষদের এ বিষয় আরও বেশি ওয়াকিবহাল হবার [illegible] ছিল। কার্য-ক্ষেত্রে অবশ্য 'পরিদর্শন'গুলি তৈরি হচ্ছিল আরও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ইচ্ছানুযায়ী এবং মহাধ্যক্ষরাও বেপরোয়া-ভাবে হুকুমনামায় সই করে যাচ্ছিলেন আফ্রিকানদের "শায়েস্তা" করার জন্য ঃ কারণ রাজ্যপ্রধানের চেয়েও জেলা মহাধ্যক্ষের সই পাওয়া ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ।

কেনিয়া সরকার যখন এই সব অন্তরীণের পুনর্বাসনের কথা ভাবতে আরম্ভ করেন, তখন গোড়ার দিকেই আথিরিভার ক্যাম্পটিকে তুলে দেন মরাল রিআরমামেণ্ট (M.R.A.) সংস্থার হাতে। জোসেফ কিরিরা এই সময় আথিরিভার বন্দিশিবিরে ছিল; সে আমাকে বলে যে, প্রথমের দিকে এদের বন্দোবস্ত ছিল খুবই ভাল, জীবনযাত্রাও যথেষ্ট পরিমাণে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছু-দিন পরেই দেখা দিল "স্বীকারোক্তির" ভূত। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা স্বীকা-রোক্তি আদায় করার জন্য মারধোরের দিক দিয়েই যায় নি। তাঁদের কর্ম-পন্থা ছিল আরও জটিল। প্রথমত খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয় ঃ ফলে যারা অপেক্ষাকৃত কমজোর তারা সহজেই আত্মসমর্পণ করে। তার পর আসে একদল বেশ্যা, যারা অন্তরীণ-দের সামনে জামা-কাপড় খুলে বা অনাবৃত পায়ের খেলা দেখিয়ে ও হাসি-ঠাট্টার ভেতরেই অনেককে বুঝিয়ে দেয় যে, 'স্বীকারোক্তি' না করে তারা নিজেদের জীবনকে কত মধুরস থেকে বঞ্চিত করছে। অন্তরীণদের কেউই বেশ্যাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পাবে নি, শুধু তাদের লীলাখেলা দেখেই নিজে-দের অন্তরে ঝড়ের বেগ অনুভব করেছিল এবং তা মেটাতে কয়েকজন 'স্বীকারোক্তির' জন্যও বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। অবশ্য আমাদের ভেতর যারা খাঁটি জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত ছিল তারা কেউই এই ফাঁদে পা দেয় নি। আমরা প্রায়ই বলতাম যে, দেশ-মাতৃকার ভালবাসার চেয়ে মোহিনী নারীর রূপজ ভালবাসা কখনই বড় হতে পারে না ঃ যারা এই মহান দেশ-প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের সামান্য বেশ্যা মজাবে কি করে? এই সব উপায় অবলম্বন করেও যখন কেনিয়া সরকার বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে নি তখন চরমপন্থীদের বেছে বেছে তারা পাচার করেন মাণ্ডা নামক এক অস্বাস্থ্যকর দ্বীপে এবং ভয়াবহ আর [illegible]ভাবের কার্যভার [illegible] সরকার নিজের হাতে তুলে নেন। মাণ্ডা দ্বীপের কষ্টময় জীবন সহ্য করতে না পেরে আরও কয়েকজন বন্দী স্বীকারোক্তি করে এবং তাদের সরকার ফেরৎ পাঠান আবার আথি-রিভারে "বাছাইকার" হিসাবে। কেনিয়া সরকারও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাণ্ডা দ্বীপের স্বীকারোক্তি করা অন্তরীণরা নেহাৎ দায়ে পড়ে সরকার পক্ষে যোগদান করেছে, তাই তাদের বলা হয় "তোমরা এবার আথিরিভারে ফিরে যাও এবং সেখানে তোমাদের সাধু উদ্দেশ্যের প্রমাণ দাও সেখানকার অন্তরীণদের স্বীকারোক্তি যোগাড় করে। যে যতো বেশি স্বীকারোক্তি যোগাড় করতে পারবে তার পুনর্বাসন ততই তাড়াতাড়ি হবে। যারা অন্যদের নিজের দলে টানতে সরকারী হিসেবে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে নি, তাদের আবার ফেরৎ পাঠান হয় কেনিয়ার পূর্ব উপকূলে সমুদ্রের তীরে জমিজমা চাষবাস করার জন্য। সেখানে তারা থাকবার বাড়িও পায় এবং ধীরে ধীরে প্রায় সবাই ঘরে ফিরে আসে।

১৯৫৭ সালে রুচেস্টার নামক একজন ইউরোপীয়ান সৈনিক সেনা-বিভাগ থেকে অবসরগ্রহণ করার পর বন্দীদের পুনর্বাসন কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী। কেনিয়া সরকার এই কথাটাই মেনে নিয়েছিলেন কালে সবাই স্বীকারোক্তি দেবে, কেউ আগে আর কেউ পরে। কাজেই যারা এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাচ্ছিল না তারা শুধুমাত্র সরকারী পয়সা ধ্বংস করছিল। 'স্বীকারোক্তি' 'আদায়' করার জন্য দৈহিক বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাও সরকার মেনে নিয়েছিলেন, যদিও বুদ্ধিমানের মত কাগজে-কলমে এ বিষয় কিছু লেখা হয় নি। আথিরিভারে পৌঁছাবার পরদিনই জন্ গিয়াথিও আমাকে ডেকে পাঠায় তার দপ্তরে। সেখানে সে সোজাসুজি আমাদের জানায় যে, যদি আমরা এখানেও চরম-পন্থা অবলম্বন করি তাহলে শুধু শুধু নিজেদের কষ্টই বাড়াবো, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে আমাদের। পুনর্বাসনের কাজকে সরকার একটি পাইপ-লাইনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং বাকস্টন বলে যে, এই পাইপের ভেতর দিয়ে বেয়ে যেতে হলে আমাদের নরম হতে হবে, আর তা না হলে শুধু শুধু আমাদের [illegible]দের ভেতর [illegible] যে আমাদের যেতেই হবে এ বিষয় বাকস্টনের কোন সন্দেহই ছিল না এবং আমরা অপর ধার দিয়ে না বেরোলে বাকি সব লোক-দের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, কাজেই যেভাবেই হোক না কেন টেনে বারও করা হবে আমাদের। এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেবার পর বাকস্টন জিজ্ঞাসা করল, "কি বল, রাজী তোমরা সহ-যোগিতা করতে?" আমরা উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।" এর পর বাকস্টন জনকে পাঠায় তার দপ্তরে বসে বন্দীদের জন-মজুরী খাটার পারিশ্রমিকের হিসাব-নিকাশ দেখতে এবং আমার ওপর যুবক দলকে ফুটবল খেলা শেখাবার ও ব্যায়ামচর্চা করাবার ভার পড়ে। এই-রকম কাজ করতে আমাদের কোন আপত্তি হয় নি, কারণ লড্ওয়ারে তৈরি আমাদের নিয়মে ছিল যে, ন্যায়-সঙ্গত কোন নির্দেশই আমরা অমান্য করবো না।

দুদিন পরে রুচেস্টার আমাকে ডেকে ক্যাম্পের "আথিরিরি" নামক সংবাদপত্রের ভার নিতে বলেন। এর সম্পাদক তখন ছিল বেঞ্জামিন নামে এক বন্দী, সে ছাড়া পাবার পর তার নিজের সংবাদপত্র ও ছাপাখানার ব্যবসায় ফিরে যায় আবার। আমার প্রথম কাজ ছিল আথিরিরিকে কিকুয়ু থেকে ইংরাজীতে তর্জমা করা। এ ভার নেবার আগে আমি রুচেস্টারকে পরি-ষ্কার বুঝিয়ে দিই যে, শুধুমাত্র তার নির্দেশেই আমি এ কাজ করছি, স্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বলেই। আমি আরও বলি যে, কোন রকম অদলবদল আমি করব না কিছুতেই—এমন কি যদি পাঁচ আর পাঁচ-এ দশের জায়গায় থাকে কুড়ি, কিকয়ুতে তাহলে আমিও ঠিক তাই লিখব। রুচেস্টার আমার কথা মেনে নেন্। এই কাজে আমাকে সাহায্য করে লিনাস্ মুগি, জাকারিয়া কিনজা কিবাচিয়া এবং ম্যালু কিমানি নামক তিনজন বন্দী।

বেঞ্জামিন খুব চালাক ও চট্পটে লোক ছিল এবং কিকুয়ু ভাষায় খুব হৃদয়গ্রাহী করে লিখতে পারতো। সে সরকার পক্ষে কাজ করছিল আথি-রিভারে, কিন্তু তার কর্মপন্থা ছিল অতি সূক্ষ্ম। আর সে কোনদিন কাউকে মারধোরও করে নি বরং প্রত্যেক অন্তরীণ ও বন্দীর সঙ্গে সে খুব ভাল ব্যবহার করত। "স্বীকারোক্তি"র ওপর সে কিকুয়ু ভাষায় একটি চটি বই লিখেছিল, যার একটি করে কপি আমরা প্রত্যেকে পেয়েছিলাম আথিরিভারে

[illegible] ছাড়া সে করেকটি ছোট ছোট একাঙ্ক নাটিকাও তৈরি করেছিল এবং তার প্রত্যেকটিতে যারা স্বীকারোক্তি দিয়েছে তারা অন্যদের (অর্থাৎ যারা দেয় নি) থেকে ভাল অবস্থায় আছে বা জীবনে বেশি উন্নতি করতে পেরেছে সেই ভাবই ফুটিয়ে তুলেছিল। ক্যাম্পের প্রহরীরা এবং আমাদের ভেতর নরমপন্থীরা সবাই এই লেখাগুলি খুবই পছন্দ করত। আমরা এগুলিকে "ওয়ামারের নাটক" বলে উপেক্ষা করতাম অর্থাৎ গর্ভশূন্য বাক্যসমষ্টি।

অল্প কয়েকদিনের ভেতরই রচেস্টার ও বাকস্টন নিঃসন্দেহ হয়ে ওঠে যে, আমি স্ব-ইচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেব না; তা ছাড়া তারা আরও বুঝেছিল যে, আমি ক্যাম্পের ভেতর আরও অনেক অন্তরীণকে এ বিষয় একমত করতে সক্ষম হয়েছি যা নাকি তাদের কাছে আরও ভয়াবহ। কাজেই তারা আমার ওপর তাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করতে মনস্থ করে যা হচ্ছে জোর-জুলুম। একদিন তারা আমাকে ডেকে

বলে যে, আমার স্বীকারোক্তি তারা চায়। আমি সোজাসুজি তাতে অস্বীকৃত হই এবং এও বলি যে, তারা শুধু এমন লোকেদের কাছেই স্বীকারোক্তি পাবে যারা যে কোনভাবেই হোক না কেন পুনর্বাসনের জন্য ব্যস্ত। আর জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করলে তার কোন ফলই হবে না। সঙ্গে সঙ্গে রচেস্টারের একটি সবল ঘুসি আমার মুখের ওপর এসে পড়ে এবং আমি কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখি।

ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হই। তখন আমাকে ঐ দপ্তর থেকে ভাঁড়ারের কাছে আর একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবার জন্য আরও তিনজনের ডাক পড়ে। তারা ছিল নেয়েরী অঞ্চল থেকে আগত জো নাহ ও ইলাইজ নামে দুজন কর্মচারী এবং কিয়ামবু অঞ্চল থেকে আগত একজন কেরানী। এ ছাড়া সেখানে আরও চারজন ইউরোপীয়ান কর্মচারীর সঙ্গে ছিল রচেস্টার, বাকসটন এবং দুজন প্রহরী। তারা আমাকে জানায় যে, স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেবার এই আমার শেষ সুযোগ। আমি আগেকার মতই তা দিতে অস্বীকার করলে তাদের দৈহিক অত্যাচার আরম্ভ হয় আমার ওপর মাপজোখ করে। শুধু ইউরোপীয়ানরাই এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আর আফ্রিকানরা ছিল দর্শক মাত্র। পরে আমি জানতে পারি যে, ইউরোপীয়ানদের মতে শুধু তারাই ঠিকমত শায়েস্তা করতে পারতো আমাকে মারধোরের দ্বারা, কারণ আফ্রিকানরা হয়তো নিজেদের সামলাতে না পেরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে ফেলতো যার ফলে আমার প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। নিকটস্থ অনেক বন্দীই তাদের কাজের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছিল আমার ওপর অত্যাচারের বহর। বেশ কয়েক ঘা মার খাবার পর, জ্ঞান হারিয়ে এই পাশবিক যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ঠিক আগেই আমি দেখতে পাই যে, আমার লড্ওয়ারের পুরনো বন্ধু কিরাগু ওয়ামুগুরে নিষ্পলকনেত্রে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আর তার দুই চোখ দিয়ে বেয়ে পড়ছে সমবেদনার অশ্রু। আমার মুখ উঠেছিল ফুলে আর কয়েক জায়গা কেটে রক্তও ঝরছিল। আমার ডান পায়ের হাঁটুর ঠিক নিচেই এক অদ্ভুত ধরনের ছুঁচাল অস্ত্র দিয়ে এতো জোরে ঘা দেওয়া হয়েছিল যে, সেখানকার হাড় কেটে গিয়েছিল। আমি প্রাণ হারাই নি এইটুকুই যা রক্ষা, কিন্তু আমার হাঁটুর ও বুকের ক্ষত রয়ে গেল চিরজীবনের সাথী হয়ে এবং আজও এতো বছর পরে আমি মাঝে মাঝে পেটে ও গলায় ভীষণ কষ্ট পাই তাই থেকে। আমাকে অপমান করার জন্য আমার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলা হয় এবং তাও ঠিক করে না করায় আমার মাথা থেকেও রক্ত ঝরছিল। প্রহরীরা আমার রক্তাক্ত, অর্ধমৃত, অজ্ঞান দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে সমস্ত বন্দীকে দেখায় তাদের সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পরে শুনেছিলাম আর তাদের সবাইকে ডেকে প্রহরীরা এ কথাও বলে : এসো দেখ তোমাদের নেতার কি হাল হয়েছে গোঁয়ার্তুমি করার ফলে।" একটি ছোট অন্ধকার ঘুপচি ঘরে আমাকে ফেলে রেখে দরজা বন্ধ করে চলে যায় প্রহরীরা, পুরো দুদিন সে দরজা কেউ খোলেনি বা কোনরকম খাবার দেয়নি আমাকে। অবশ্য আমার শরীরের এবং বিশেষ করে মুখের যা অবস্থা হয়েছিল তাতে খাবার পেলেও মুখ খুলে খেতে পারতাম কি না সন্দেহ আছে। যেদিন আমার ওপর মারধোর করা হয় সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় চার নম্বর এলাকায় একজন অন্তরীণ মনঃকষ্ট সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার শয্যাসঙ্গী, এমবু অঞ্চলের জিমি পরে আমায় বলেছিল যে, গলায় দড়ি দেবার অল্প কিছুক্ষণ আগেই সে জিমিকে বলেছিল "কারিয়ুকির কি হাল করেছে সরকার তা আজ স্বচক্ষে দেখলাম, এরকম জীবন্ত নরকে আর বেঁচে থাকা যায় না—তার থেকে মরাই বোধহয় ভাল।" কারাগার থেকেই প্রদত্ত দড়ি, যা আমাদের হাফ্ প্যান্টকে কোমরে বেঁধে রাখবার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তা দিয়েই বেচারা তার ইহজীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তার আত্মার শান্তির জন্য।

তৃতীয় দিনে কয়েকজন বন্দী আমার কাছে কিছু খাবার আনবার অনুমতি পায়। তারা আমাকে বলে যে, শিবিরের সমস্ত বন্দীই আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, তাদের মতে কর্তৃপক্ষ আমাকে এভাবে মেরে ফেলতেই চান এবং সেজন্য আমার উচিত যা হোক একটা কিছু স্বীকারোক্তি দিয়ে দেওয়া। সবাই জানবে যে, এই স্বীকারোক্তি জোর-জুলুম করে আদায় করা হয়েছে, কাজেই পরে তাকে আবার ফেরত নেওয়া চলবে। এভাবে নিজেকে এমন প্রাণে বাঁচিয়ে নিতে পারলেই আমি পরে আবার চিঠি লিখে ওপরওয়ালার কাছে অবশেষে নালিশ করতে পারবো [illegible]-কার নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তারা সবাই আরও চায় যে-কোনভাবেই হোক না কেন, আমি যেন প্রাণে বেঁচে যাই এ যাত্রা।

উপরোক্ত কথাবার্তার ফলে আমি কর্তৃপক্ষের কাছে একগাদা মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিই এবং আমার নির্জন কারাবাস থেকে আবার আমাকে অন্যান্য বন্দীদের কাছে ফেরত নিয়ে আসা হয়। পরের দিনই আমি এক বিরাট লম্বা-চওড়া নালিশভরা চিঠি লিখি এবং যে ক'টা নাম মনে আসে তাদের প্রত্যেককে এর একটা অনুলিপি পাঠিয়ে দিই : ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী বারবারা ক্যাসেল (ব্রিটিশ বিধানসভার সভ্যা), জন স্টোনহাউস (ব্রিটিশ বিধানসভার সভ্য), টম্ মুবায়া ও আর গুইংস্ কোডেথ্ (কেনিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক নেতাদ্বয়), জেল বিভাগের মহাধ্যক্ষ এবং কেনিয়া বিচারালয়ের সর্বপ্রধান সরকারী উকিল। চিঠিগুলি আমি কাগুয়োন্গো এবং মাইয়োটা গিথেন্গিকে দিয়ে বলি যে, কোন প্রহরীকে বশ করে সেগুলো ডাকে দেবার বন্দোবস্ত করতে। এরা দুজন এ সময় জেলের এলাকার বাইরে কুয়া খোঁড়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। চিঠি ডাকে দেবার জন্য আমার পয়সারও অভাব ছিল না এ সময়, কারণ লড্ওয়ারে থাকাকালীন আমি অনেকগুলি মুকোমা (হাতে বোনা ঝুড়ি বা মাদুর) তৈরি করে বেচেছিলাম এবং সব সমেত আমার কাছে তখন প্রায় ১৪০০ শিলিং-এর মত ছিল। আমার নালিশের ফলে কয়েকদিনের ভেতরই নাইরোবি থেকে সরকারী অনুসন্ধান বিভাগের মুখপাত্র আসেন আমাদের শিবিরে। আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় যে, চিঠির লেখক আমি কি না? আমি স্বীকার করে নিই এ কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বলি যে, ভবিষ্যতে আর আমি চিঠি লিখবো না। অবশ্য এ আশ্বাস দেওয়ার কোন অর্থই ছিল না আর আমার মনে, কারণ যেভাবে আমার ওপর মারধোর করা হয়েছিল তার পর সত্য কথা বলার আর কোন দায়িত্ব ছিল না বলেই মনে হচ্ছিল আমার।

আথিরিভার বন্দিশিবির ছিল স্বীকারোক্তির আড্ডা যদিচ আরও কিছু কিছু কাজ হচ্ছিল সেখানে। এই শিবিরের সর্বপ্রধান কর্মসূচী ছিল বন্দীদের বাছাই করা এবং আমাদের পক্ষে সেখানে যাওয়ার মানেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাছাই হওয়া ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক না কেন।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চার ॥

অতএব বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার আছে, আত্মার অতীন্দ্রিয় অনুভূতিও আছে। প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক এষণা এবং আধ্যাত্মিক এষণা একই জ্ঞানানুশীলনের দুইটি শাখা হিসাবে পরিগণিত হত। ভারতের মনীষীরা ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে এক সামগ্রিক সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল প্রকৃত সত্য নির্ধারণের জন্য চাই যুগপৎ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে জ্ঞানের অনুশীলন। এ কারণে দেখা যায় ভারতের প্রাচীন দর্শন ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে। উপনিষদ্, কপিলের সাংখ্য-দর্শন ও পতঞ্জলির যোগদর্শন এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের খাওয়া-পরার সমস্যা মিটুক, অভাব-অনটন, নিষ্পেষণ থেকে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করুক, শোষণহীন সুখী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক—অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে গোষ্ঠীবদ্ধ স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে পৃথিবীর সুখ এবং ধনসম্পদের পুনর্বিন্যাস ঘটুক—এ সব সমস্যার সমাধান হলে ভুয়া আধ্যাত্মিক বুজরুকির অবসান ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক এষণার অবসান ঘটবে বলে যে তত্ত্ব প্রচার করা হয় তা যদি বাস্তবে সত্য হত, তবে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বা ইতিহাসের উষালগ্নে সহজ সরল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যখন খাওয়া-পরার সমস্যা ছিল না বা শোষণ ছিল না তখন এই অধ্যাত্মিক এষণার উদয় হল কি করে? ভয় এবং বিস্ময় থেকে? তা হলে ত' এই সত্যকেই স্বীকার করা হয় যে, বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা বাইরের দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও ভিতরের দিক থেকে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। Expanding Universe-এর মত মানুষের মনের জগৎও সতত সম্প্রসারণশীল।

মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ-জীবনের প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এক কথায় মানুষের চেতনা বদলে যায়—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এও সত্য যে, মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা ঘন ঘন বদলায় না। বদলায় যুগ-যুগান্তরে—যখন বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। অথচ একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার একদিনেই মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে—তার উৎপাদনভিত্তিক বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও। ব্যক্তিগত বা সমাজগত জীবনে একটি তুচ্ছ বা বৃহৎ ঘটনা এক নিমেষে মানুষের প্রচলিত ধারণা, মতামত বা বিশ্বাসের ভিত্তিকে চূর্ণ করে নতুনের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে—বাস্তব অভিজ্ঞতায় এর সাক্ষ্য এতই প্রবল যে, এর বিরোধিতা করতে হলে সত্যকে খাটো না করে পারা যায় না।

এই তো সেদিন একমাত্র শিশুসন্তান নিয়ে মাসিক দু' হাজার টাকার আয়ে যে অধ্যাপক দম্পতি সুখের নীড় বেঁধেছিলেন, তাঁদের মধ্যে [বিজ্ঞানে ডক্টরেটপ্রাপ্ত] অধ্যাপক স্বামী যখন সহসা অতি তুচ্ছ কারণে আত্মহত্যা করে বসলেন—অধ্যাপিকা স্ত্রীর চোখেরই সামনে—তখন বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থায় যদিও কোনো পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু মহিলার আজন্মপোষিত ধারণা, মতামত ও বিশ্বাসে যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন ঘটে গেল—উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে তার কোনো বুদ্ধি-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। তারপর যখন একই বা অনুরূপ বৈষয়িক অস্তিত্বের মধ্যে বাস করে একই সমাজদর্শনে বিশ্বাসী দু'-দল ব্যক্তি বা দুইটি জনসমাজের মধ্যে তাত্ত্বিক বা প্রয়োগ বিধিগত মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ঘনায়মান হয়ে ওঠে এবং নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন এই ধারণাই অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে, মানুষে মানুষে মনের কাঠামোতে ফারাক আছে, আর সেই ফারাক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপরেই সর্বথা নির্ভরশীল নয়। এমনি অজস্র বাস্তব উদাহরণের দ্বারা দেখানো যেতে পারে যে যেসব শক্তি বা অবস্থা মানুষের মনকে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করে, বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থা তার মধ্যে একটি মাত্র, কিন্তু একমাত্র নয়। কথাটা অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, মানুষের মনের জগৎ বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে গঠিত এবং মানুষের মনের পরিবর্তন বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে কড়ায়-গণ্ডায় মান্য করে চলে—এ তত্ত্ব ধোপে টেকে না।

মানুষের মন কি দিয়ে তৈরি তা জানবার উপায় নেই। জড়বাদীরা তাদের নিজস্ব যুক্তিধারাকে অনুসরণ করে কল্পনা করেছেন যে, মানুষের মন বা চেতনা বিশ্বের [illegible] জড়পদার্থের

এক জটিল বিকাশমাত্র, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত মানুষ তার দেহ-মন নিয়ে একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে মানবমনের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে তারা একথা স্বীকার করেছেন যে, মন যা থেকে উদ্ভূত, উদ্ভবের পর উল্টে সে তার উপরেই প্রভাব খাটায়—খবরদারি করে। অধ্যাত্মবাদীরা প্রশ্ন করেন, এই খবরদারি করার শক্তি সে পেল কোথা থেকে? এই শক্তির উৎস কোথায়? এখানে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর নেই। বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক বিজ্ঞান কতকগুলি পুরনো বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়ের ভিত্তি এমনভাবে শিথিল করে দিয়েছে যে, মানুষের মনের জগৎ নিয়ে বিজ্ঞানজগতেও এক নতুন কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। অণুপরমাণু বা শক্তিকণিকার সমবায়ে গঠিত এই বিশ্বজগতের স্বরূপ যেমনটি হোক না কেন, যে জগৎ নিয়ে আমাদের কারবার, আমাদের মায়াবী মনই তাকে রচনা করে, নিজের রং-এ রঞ্জিত করে, নিজের মাধুরী মিশায়ে আপন উপভোগের উপকরণ সাজিয়ে নেয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যেমন তার নিজস্ব সৃষ্টি, মান-অভিমান, অনুরাগ-বিরাগ, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ, হাসি-কান্নার আলো-আঁধারি তেমনি তার রহস্যভরা মায়াবী চরিত্রের বৈচিত্র্য। মানবমনের এই অন্তহীন অতল রহস্য ভারতীয় মনীষী এবং সাধকবৃন্দকে এমনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল যে, তাঁরা অন্তর্জগতের অনুসন্ধানকে জ্ঞানসাধনায় শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন। তাঁরা অনন্যনিরপেক্ষ হয়ে অতন্দ্র শ্রমসাধনায় আপন মনের গভীরে ডুব দিয়ে সেখানকার বৈচিত্র্য অনুধাবন করতেন। তাঁরা অন্তর্জগতের নানা তথ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষে ঘোষণা করেছেন, বহির্জগৎ জয় করা যেমন মহৎ, অন্তর্জগৎ জয় করাও তেমনি মহৎ—এমন কি মহত্তর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"আমি যেন এ বিজ্ঞানের বহির্বাসের প্রান্তটুকু স্পর্শ করিয়াছি। কিন্তু আমি ধারণা করিতে পারি যে, এ বিজ্ঞানটি সত্য, সুবিশাল ও আশ্চর্য।"

[পৃঃ ২১৪—৩য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে, এই অত্যাশ্চর্য জগতের গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে ভারতীয় ঋষিরা যেসব দার্শনিক প্রত্যয় জগতে প্রচার করেছেন, তার মধ্যে একটা মৌলিক প্রত্যয় হল মুক্তিতত্ত্ব। ভারতীয় ঋষিগণ কর্তৃক কথিত এই মুক্তিতত্ত্ব একটি সর্বাবগাহী প্রত্যয়। মুক্তি বলতে সাধারণত যা আমরা বুঝি তা হল আমাদের দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি—সংসার বন্ধন থেকে অব্যাহতি। কোনো কোনো ধর্মে মুক্তি অর্থে বোঝানো হয়—"ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণ।" কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের এই দার্শনিক প্রত্যয়টি অতটুকু সংকীর্ণ অর্থের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ—অস্তিত্বের সমগ্র অংশ জুড়ে সকল পর্যায়ে সকল স্তরে এর পরিব্যাপ্তি। বিশ্বজগৎ মুক্তির ছন্দে দোলায়িত—মুক্তির দ্যোতনায় চিরসঞ্চরমাণ, চিরচঞ্চল। স্বামীজী বলেছিলেন—

"এই [মুক্তির] আকাঙ্ক্ষা-ই আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করে, আমাদের গতিবিধি সম্ভব করে, পরস্পরের সহিত আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শুধু তাই নয়, ইহা যেন মানবজীবনরূপ বস্ত্রের টানা ও পোড়েন। বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞান ইহাকে তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে হঠাইয়া দিতে চায়, ইহার রাজ্য হইতে একটির এর একটি দুর্গ অধিকার করিতে চায় এবং প্রতিটি পদক্ষেপ কার্যকারণের লৌহ পথের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের এসব প্রচেষ্টায় মুক্তি হাসিয়া ওঠে। আর কি আশ্চর্য! মুক্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কার্যকারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনো নিজেকে ঐগুলির ঊর্ধ্বে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহার অন্যথা কিরূপে হইতে পারে? সসীমকে যদি নিজের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদাই তাহাকে অসীমের উচ্চতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করিতে হইবে।"

[পৃঃ ৩৩৭—৩৩৮—২য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

একটু ভেবে দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, মানুষের অন্তর্জগৎ এই মুক্তির দ্যোতনায় সর্বদাই ক্রিয়াশীল। বাস্তব সত্য এই যে, মানুষের কাছে নতুন অতি শীঘ্রই পুরাতন হয়ে ওঠে। বর্তমান অবস্থা যেন বন্ধন হয়ে তাকে আবদ্ধ করতে চায়। সে বর্তমানের বন্ধন কাটিয়ে ভবিষ্যতের মুক্তিপথে অগ্রসরমান। সে অপূর্ণতার অসন্তোষে ভরা এবং পূর্ণ সন্তোষের রাজ্য সর্বদাই তাকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ছুটে চলেছে, কিন্তু যাত্রাপথের শেষ নেই। যেসব ধারণা, বিশ্বাস, যুক্তি বা আবেগ মানুষ এবং তার সমাজকে নানা কাজের মধ্যে টানছে, জগৎসত্তার অন্তরে মুক্তির এই সর্বানুস্যূত নিগূঢ় দ্যোতনাই তার উৎস। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে অতি আধুনিক পদার্থতত্ত্বে যেন এই মুক্তিতত্ত্বের এক প্রতিধ্বনি বেজে উঠছে। কথাটি একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। বিজ্ঞানের একটি সনাতন প্রত্যয় এই যে, অঘটন কিছুই ঘটবার উপায় নেই। সৃষ্টিবিধান পরে সবই কার্যকারণের নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা। যা ঘটছে, যা ঘটবে সবই অনতিক্রমণীয় নিয়মসূত্রে গ্রথিত। এই প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের Law of Determinism. কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বিজ্ঞানের নব নব পরীক্ষায় যেসব তথ্য জানা গেল—যথা আলোকরশ্মি, অণু-পরমাণু এবং আদিম জড়কণিকার অবস্থাবিশেষে তরঙ্গধর্ম, অবস্থাবিশেষে কণিকাধর্ম—তাতে Law of Determinism গেল শিথিল হয়ে। কিন্তু এটাও শেষ কথা নয়। এর থেকে আরও গভীরে নেমে এলেন বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ। উদ্ধার করলেন এক নতুনতর তথ্য—যার নাম হল Principle of Uncertainty or Law of Indeterminism. এতে অণু-পরমাণুর রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের একানুবর্তিতা বা Law of Uniformity of Nature যাচ্ছে বদল হয়ে। [পূর্বোল্লিখিত স্বামীজীর উক্তি—"মুক্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কার্যকারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনো নিজেকে ঐগুলির ঊর্ধ্বে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে"—এখানে স্মরণীয়] আপন অবস্থায় কেউ-ই যেন স্থির হয়ে থাকতে চায় না। আপন অবস্থার আবরণ উন্মোচন করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সর্বদাই সে নতুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। স্থির-নিয়মের বন্ধন হতে সে মুক্তি চায়। এ যেন সেই "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।" প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ গ্রহ-উপগ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে অনন্তকাল। তারা নিয়মের দাস, কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের এই আবর্তনের নিয়মের মধ্যেও রয়েছে আর একটা নিয়ম—যে নিয়মে তারা আবর্তনের নিয়মকে ফাঁকি দিয়ে সততই স্বতন্ত্র যাত্রাপথে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নিরন্তর সচেষ্ট।

সমাজ-ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে এই মুক্তির দ্যোতনা বিকাশ লাভ করে সমাজের পরিবর্তনে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবে। আমরা আগেই দেখেছি মার্ক্স, হেগেল এবং স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মতেই সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিপ্লবের মূলে শ্রেণীবৈষম্য। এই শ্রেণীবৈষম্যের মূলে আবার দ্বন্দ্বতত্ত্ব। স্বামীজীর চিন্তা-সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্বের একধাপ পরের কথা। অর্থাৎ অস্তিত্বের সঙ্গে যে অনস্তিত্বের ভাব জেগে ওঠে, তার কারণ দ্বন্দ্বের ভিত্তি-মূলে মুক্তিতে প্রোথিত। পদার্থজগৎ এবং প্রাণজগৎ—সমগ্র অস্তিত্বে এই সর্বানুস্যূত মুক্তির ভাব থেকে গতি, এর থেকেই দ্বন্দ্ব, এর ফলে বৈষম্য, এর ফলেই পরিবর্তন, বিপ্লব ও বিকাশ। এর ফলে মানুষের বক্ষে এক চিরন্তন ক্রন্দন চলেছে যুগ যুগ

ফেস্টুনে

মৃদুলেন্দু সরকার

বাদামী রঙের চিন্তাগুলো এখন আর আসছে না।
প্রেম, আমাকে ক্ষমা করো।
পুরনো জুঁই ফুলের গন্ধ খাবার পাতে মনে হলে
আকবর শা সামনে এসে দাঁড়ায়, দু'হাত জোড়ে
বলে--
এক টুকরো রুটি দাও।

পিসি তো মরে গেছে কবেই
তার শাড়ির স্মৃতি এখনকার কাঁথাগুলো বহন করে।
জ্বলতে জ্বলতে জোনাকিরও তেল ফুরিয়েছে রাজা।
সানডায়ালটা এখনো বিনা দমেই চলে।

আগামী মঙ্গলবার অশ্বের দঙ্গলে তুমি আসবে
আলতো পায়ে লাল সুরকি বিছানো পথ দিয়ে।
তোমাকে ফুলের অভ্যর্থনা জানাবার কেউ নেই যে।
মাই ফেয়ার লেডির ফুলওয়ালি
কচুর শাক ফেরি করে বড় ক্লান্ত এখন।
তাই তোমার বন্ধ্যা নয়নে দৃষ্টি গাঁথবার জন্যে
ইতিহাসের কান্না আর সব ফুলের বসন্ত
এঁকে রেখেছি ঐ ফেস্টুনে।

ধরে। অতৃপ্তির অপূর্ণতাই এই ক্রন্দন। স্বামীজী বলেছিলেন—

"আমরা দারিদ্র্য দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, তাই ধন অর্জন করি। আবার ধনের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই। আমরা হয়ত মূর্খ, তাই বিদ্যা অর্জন করিয়া পণ্ডিত হই। মানুষ কখনো সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। তাহাই দুঃখের কারণ, আবার তাহাই আশীর্বাদের মূল। ইহাই জগতের প্রকৃত লক্ষণ। তুমি কিরূপে এই জগতের মধ্যে তৃপ্তি পাইবে? যদি আগামীকাল এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়, তখনো আমরা বলিব ইহা সরাইয়া লও,—অপর কিছু দাও। এই অসীম মানবাত্মা স্বয়ং অসীমকে না পাইলে কখনো তৃপ্ত হইতে পারে না।"

[পৃঃ ২৫৯—২৬০, ৩য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

মানুষের সুখ এবং পরিতৃপ্তির জন্য কি কি প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করে তার নিজের মন—যার তৃপ্তি ক্ষণিক মাত্র। বাস্তব সত্য এই যে, তৃপ্তির পিছনে অতৃপ্তি সর্বদাই ওৎ পেতে বসে রয়েছে। সে অচিরেই তৃপ্তিকে পিছনে ঠেলে দিয়ে নিজে এগিয়ে আসে তার সন্তোষ বিধানের দাবি নিয়ে। দাবি পূর্ণ হয়। আসে নতুন অতৃপ্তি। তাই প্রয়োজনের কোনো শেষ নেই। পৃথিবীর বুকে লভ্য ভোগসুখের সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভ করার পর সে অন্য গ্রহ-উপগ্রহে লভ্য ভোগসুখের জন্য কাতর হয়ে উঠবে—এই হল মুক্তিকামী মানবমনের বাস্তব প্রকৃতি।

মানুষের সমাজ-বিন্যাসে একদিন আমূল পরিবর্তন ঘটবেই। সেদিন উৎপাদনশক্তি ও পদ্ধতি সর্বসাধারণের যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে সমাজ-জীবনে জীবিকার উপায় ও উপকরণ নতুনভাবে বিন্যস্ত হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়, এই পৃথিবীর ভোগসুখের জন্য সকল মানুষের সমষ্টিগত প্রয়োজন মেটাবার কোনো উপকরণের অভাব সেদিন থাকবে না। কিন্তু সেদিন পরিতৃপ্ত প্রয়োজন কি অতৃপ্ত প্রয়োজনের জন্ম দেবে না? অগ্রসরমান ইতিহাসের নির্দেশ এবং মানুষের বাস্তব চরিত্রকে স্বীকার করে নিলে একথা মানতে হবে যে, নিশ্চয়ই দেবে। অতএব সংগতভাবেই একথা বলা চলে যে, দূর বা অদূর-ভবিষ্যতে অগ্রগামী মানবসমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে উন্নত সুপরিণত শ্রেণী-হীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষকে "সাধ্যমত কাজ করার পরিবর্তে প্রয়োজন-মত উপকরণ" দেওয়া সম্ভব হবে না, যদি না মানুষ পূর্বশর্ত হিসাবে পরিতৃপ্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, মানুষের পরিতৃপ্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা কেমন করে সার্থক হয়ে উঠবে? বস্তুবাদী মার্ক্স এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন নি বা তার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। ভবিতব্যের হাতে এর সমাধান ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজে নিরুত্তর রয়েছেন। ব্রহ্মবিজ্ঞান-বাদী স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এর উত্তরেই বলেছেন, সমাজের মানুষকে সেদিন বৈদান্তিক অর্থে ব্রাহ্মণ হতে হবে। শ্রেণী-হীন সমাজপ্রতিষ্ঠার দিন যেদিন সমাগত হবে, সেদিন মানব-ইতিহাসে মুক্তি অভি-যানের শেষলগ্ন। বিপ্লবের এই শেষ অঙ্ক সম্পূর্ণ করার জন্য মানুষের জীবন থেকে সেদিন ইন্দ্রিয়ের একাধিপত্যেরও অবসান ঘটবে। মানুষ সেদিন সামন্ততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের দাস নয়, স্বৈরাচারতন্ত্রের সেবক নয়, শোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থার শিকার নয়, আবার ইন্দ্রিয়েরও অনুগত ভৃত্য নয়। অন্তরে-বাইরে সে স্বাধীন, মুক্ত। তার স্বাধীন, মুক্ত আত্মায় সেদিন পরমেশ্বর জেগে উঠবেন।

কিন্তু সেই মুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে, সামাজিক দিক দিয়ে আবার পরমেশ্বরের কি প্রয়োজন? পরমেশ্বরের স্থান কোথায়? কে এই পরমেশ্বর? স্বামীজী বলেছেন—

"বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক এক জগতে সিংহাসনে সমাসীন সম্রাট নন। ......স্বর্গস্থ রাজা আজ কোথায়? মর্ত্যের রাজারা যেখানে—সেইখানে। গণতান্ত্রিক দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার অন্তরে। বেদান্তধর্মে তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের ভিতরে। বেদান্ত বলে জীব ব্রহ্মই। এই জন্য বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয় না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী, শূন্য হইতে খুশিমত সৃষ্টিকারী মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে অন্তর্যামী, ঈশ্বর সর্বরূপে সর্ব-ভূতে। দেশ হইতে মহিমান্বিত রাজা বিদায় লইয়াছেন, স্বর্গস্থ রাজ্যপাট বেদান্ত হইতে শত শত বৎসর পূর্বেই লোপ পাইয়াছে। ...এই জন্য বেদান্তের সিদ্ধান্ত বিশ্বভ্রাতৃত্ব নয়—বিশ্বাত্মৈক্য। আমি অপরাপর মানুষ, জন্তু—ভালমন্দ —যে-কোনো জিনিসের মতই একজন। সর্বত্র এক শরীর, এক মন, একটি আত্মা বিরাজিত। সকল মনই আমার। সকল পায়ে আমি ভ্রমণ করি—সকল মুখে আমি-ই কথা বলি—সর্বশরীরে আমি অধিষ্ঠিত।"

["বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম?" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

[পৃঃ ৩৭০—৩৯১—৩য় খণ্ড, বাণী ও রচনা]

[সমাপ্ত]

কারখানায় ধর্মঘট চলছিল।

সরমা নিজেই জানে না কি করে সংসার চলবে। কেন না পরিমল একে গোঁয়ার, তার ওপর মজদুর ইউনিয়নের পাণ্ডা। সে সহজে কাজে যোগ দেবে না। হাতে যে ক'টা টাকা ছিল তা প্রায় শেষ। এখন একমাত্র ভরসা সেলাই-কল ও দর্জির কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সরমা অর্ডার সংগ্রহ করে। মেয়েদের ফ্রক, ব্লাউজ ইত্যাদি ভালই করে এবং সময়ে ঠিক সময়ে দেয়। সেইজন্য অর্ডারের অভাব হয় না। ভাগ্যিস বিয়ের আগে এই কাজটা সখ করে শিখেছিল। বর্তমানে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, না হলে যে কি হত তা ভাবতে পারে না। আত্মবিশ্বাস আর মিষ্টি স্বভাব তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখে নি—চারজনের অন্ততঃ যোগাচ্ছে। অবিশ্যি রাত-দিন পরিশ্রম করে সরমা। কষ্টের জন্য আফশোষ নেই।

পরিমল অলস, বোকা লোক নয়—চলনে-বলনে রীতিমত স্মার্ট। শ্রমিকদের প্রতিনিধি। আর ঐ হচ্ছে সর্বনাশের কারণ। এখন শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ মা লি ক প ক্ষ কে জানাতেই হবে। দায়িত্বটা তো কম নয়। লেখাপড়া জানা শ্রমিক-দরদী পরিমল ব্যতীত আর কে আছে। অর্থনীতির উপপাদ্যের মত কথাটা সহজ না হলেও, এক্ষেত্রে সহজ। শ্রমিকদের কিসে ভাল হবে, এই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকে। নিজের জন্য, সংসারের জন্য কোন ভাবনা নেই। কারখানা-শ্রমিক ওর কাছে বড়। অবিশ্যি এই নিশ্চিন্তে থাকার জন্য কতকটা সরমা নিজেই দায়ী। নিজের কাঁধে সম্পূর্ণ ভারটা নিয়েই ভুল করেছে। বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝাপটা সব সরমার ওপর।

এত দ্রুত যে একটা সংসারে ওলট-পালট হবে, এ ধারণা পরিমলের ছিল না। মালিকপক্ষ দীর্ঘদিন ধর্মঘট জিইয়ে রাখতে বিস্মিত হল। সময় চলে যাওয়ার ফলে দিন-দিন সরমার মুখটা গম্ভীর হতে থাকে। কারোর সংগেই তেমনভাবে কথা বলে না। চুপচাপ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

বারান্দাতে বসে পরিমল সরমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে সেই কেনে

জানা গ্রামের কথা। প্রাইমারি স্কুলে একটা সামান্য মাস্টার ছিল। নদীর কিনারে গাছ-গাছালিতে ঘেরা একটা ছোট্ট বাড়ি ছিল। চারিদিকে উপচে পড়ছিল সুখ-আনন্দ। কিন্তু অত সুখ কপালে সইল না। হঠাৎ সবকিছু যেন চলে গেল। বাড়িঘর, মানুষজন চির-দিনের মত চলে গেল। সকলের মত তাকেও স্রোতের টানে ভেসে এসে ক্যাম্প-জীবন নিতে হল।

সংগ্রামের সিঁড়ি অতিক্রম করার পর একটা কলোনীতে একটু জমি পেল। মাথা গোঁজবার মত বাড়িও হল। এর পর কারখানায় এই চাকরি। ক্রমে ক্রমে নতুন কর্মক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠিত হল। পরিমলের চেষ্টায় কলোনীতে সমবায় সমিতি গড়ে উঠল। লোকের সুখ-সুবিধা সে করে দিয়েছে বলে না, তবে তাদের সঙ্গে নিজেও অক্লান্ত খেটেছে। কলোনীটাকে সুন্দর সুশ্রী করার জন্য, এখানকার লোকের সুখ-সুবিধা আনার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। ব্যাপারটা ছিল আন্তরিক।

ওদের ঘরে ইতিমধ্যে দুটি সন্তান এসেছে। ছেলে পান্না, মেয়ে রীতু। সরমা এদের নিয়ে কত আনন্দে ছিল। রাত্রে ছেলে-মেয়েদের রূপকথা শোনাত। পরিমলও সেই গল্প শুনে ভাবত, একদিন এই সংসারে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনবে। ছেলে-মেয়েদের মনের মত ক'রে মানুষ করবে। এই কঠিন সংসার প্রাঙ্গণে দুঃখ-দৈন্যের দৈত্য-দানবকে পরাজিত করে নিজে বাঁচবে, এদের বাঁচাবে। কিন্তু আজ সে ক্ষত-বিক্ষত। তবে মনের জোর হারায় নি। সে যুদ্ধ করবে শেষ পর্যন্ত। সংগ্রামই ত' জীবন।

সরমা ভাবে ধর্মঘট কতদিন চলবে। কেনই বা ধর্মঘট। মালিকের সঙ্গে ক্ষুদ্র শক্তি শ্রমিকেরা কতদিন যুদ্ধ করবে। কে বোঝাবে কাকে। দুপক্ষের ব্যাপার। সরমা পরিমলকে বোঝায়, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া কি আমাদের মত চুনোপুঁটিদের চলে? কে শোনে কার কথা। এক পক্ষকে একটু নরম হতেই হবে। অবিশ্যি বিচার যেন নীতিসঙ্গত হয়। এখানেই ত' প্রশ্ন। সর্বত্রই জোর যার মাটি তার। আগে ছিল রাজার জোর—এখন হয়েছে সরকারের। ধনী লোকদের জন্যই যেন সরকার। মালিক যদি একেবারে কার-খানা বন্ধ করে দেয় ত' কি হবে? সেলাই করে কোনরকমে ছেলে-মেয়েদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আর যাদের কোন কিছু অর্থকরী কাজ জানা নেই, তাদের কি হবে। পরিমলের ওপর রাগ হয়। গজগজ করে সরমা।

আবার ভাবে, পরিমলের কি সব দোষ? হয়তো এই ধর্মঘট করতে বাধ্য করা হয়েছে। অশান্তি যাতে না হয়—আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিলেই ভাল হত। আজ আসুক বাড়ি। কোথা থেকে রোজ ভাত আসে, তা জিজ্ঞেস করবে। মনে মনে ভীষণ জ্বলতে থাকে। কে তাকে পরামর্শ দিয়েছে এই দুঃখ-দুর্দশা আনতে। সকল অলঙ্কার এক এক করে কেন বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। আর নয়, পরিমলের অনেক লম্বা লম্বা বুলি সে শুনেছে। সকলের দুঃখ দেখলে চলবে না। নিজে মরে যাচ্ছে তা কে দেখছে। ইউনিয়ন! পোস্টার মারবেন। মিছিল করবেন। বক্তিমা দেবেন। এই যদি করার ইচ্ছে ছিল, বিয়ে না করলেই হত। দেশের কাজ করেই বেড়াকগে। কারোও কিছু বলার থাকবে না। এদিকে হাঁড়িতে চাল নেই—দেশের সেবা। লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে। পোড়াকপাল!

শ্রান্ত পায়ে দুপুরে বাড়ি এল। ইতিমধ্যে সরমা কোনরকমে চাল যোগাড় করে উনুনে চড়িয়েছে। আজ শুধু ভাতে ভাত ছাড়া আর কিছু হবে না। পরিমলকে দেখে সরমা চেঁচিয়ে বললে: এতক্ষণে বাবুর সময় হল। বলি কি করে সংসারটা চলে—খোঁজ-খবর রাখ!

পরিমল থতমত খেয়ে গেল। সরমার তো অত রাগ হয় না কোনদিন। আজ আবার কি অঘটন ঘটল! বুঝতে পারল আজ নানা প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাঙা চেয়ারটা টেনে এনে শক্ত করে বসল এবং সহজভাবেই উত্তর দিল: জানি তুমি এই সংসার আর বহন করতে পারছ না। কিন্তু কি করবো বল। আমি কি ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি। এ সময় অধৈর্য হলে চলবে না।

সরমা কথার উত্তর দিতে গিয়ে চোখটা মুছে নিল. অজান্তেই চোখে জল এসে পড়ছিল। নিজেকে সংযত করে বললে: কেন এই ঝঞ্ঝাট নিতে গেলে। কতবড় দায়িত্ব তুমি নিয়েছ জান? কারখানা আর না চললে, তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আবার শুনেছি কোম্পানির দালালরা সবাইকে ঘুষ দিয়ে কাজ করতে প্রলোভন দেখাচ্ছে।

: বাজে কথায় কান দিও না। পরিমল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইল। পরিমল বুঝতে পারছে সরমা সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। যদিও অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহারা হয়েছে, সহানুভূতি আছে। কেন না এর আগে বহুবার বুঝিয়েছে। দিন দিন বাজার বাড়ছে। সংসার চালানো কষ্টকর ব্যাপার। এর পরে আছে চিকিৎসা, স্কুল। এই সব অভাব-অভিযোগ সরমারও অজানা নয়। সেই জন্যেই রেগে গেলেও তেমনভাবে কিছু বলে না।

কলোনীর পাশে শুধু কারখানাটা নয়। পাশে রয়েছে একটা বস্তি। এই বস্তিতে থাকে অবাঙালী অনেক মজুর। এই ধর্মঘটের জন্য কেউ কেউ দেশে চলে গেছে। কেউ অন্য স্থানে ঠিকা কাজ করছে। কিন্তু যারা কোন কিছুই জোটাতে পারে নি, তারাই পড়েছে বিপদে। এখন এই অকর্মণ্য লোকেরা পেটের দায়ে চুরিচামারি করবে, এ আর অসম্ভব কি? আবার ধৈর্যহারা হয়ে কোম্পানীর দালাল হবে, এও অসম্ভব নয়।

কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে নির্ধারিত কিছু সংখ্যক কর্মীকে নিয়ে প্রথমে কারখানা খোলার সর্তে ইউনিয়ন রাজী হল। এ ছাড়া উপায় ছিল না। শ্রমিক-দের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। অবিশ্যি মালিকপক্ষ দাবীদাওয়ার ব্যাপারে সন্তোষজনক-ভাবে সুরাহা করবে কথা দিয়েছে। পরিমল দেখল মান থাকতে এই প্রস্তাবে রাজী না হলে ভাঙন ধরবে। দীর্ঘদিন ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়। আবার কারখানা খুললে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। নিজেদের ঐক্যও অটুট থাকবে। পরিমলের কাছে দুনিয়াটা শুধু লড়াই আর কিভাবে নিজেরা ঠিকমত একতাবদ্ধ থাকবে এই নিয়ে ঘুরছিল। এখন তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে ভেবে যেন শান্তি পেল। সরমাও বিরক্ত করছিল।

প্রফুল্লমনে বাড়ির উঠানে পা রাখতেই সরমা টিয়াপাখির মত চোখ ঘুরিয়ে এক পলক পরিমলের দিকে তাকিয়ে মুখটা নিচু করল। সেলাই মেশিনটা জোরে চালাল। চোখে-মুখে হাজার বিতৃষ্ণা। অবহেলার ভাব। সে যেন এ বাড়ির কেউ নয়। সে যেন ফালতু লোক। খেল না খেল কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। এই বুঝি সংসারের নিয়ম। টাকার সংগে সকলের সম্পর্ক।

হাত-পা ধুয়ে খেতে বসল পরিমল। সরমা কল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল ঃ আসার সময় হল। গলার স্বরটা বিকৃতি শোনাল।

পরিমল এ সব কিছু গ্রাহ্য না করে সহজভাবে কথাটা পাড়ল ঃ কাল কারখানা খুলবে।

ঃ কি বললে। তা আমি বুঝেছি আমার হাড়-মাস না খেয়ে তোমার শান্তি নেই। কারখানা খুলবে কতবারই তো বললে।

ঃ খুলবে, খুলবে এবার দেখে নিও। কথার ফাঁকেই বাড়া ভাত টেনে নিয়ে পরিমল গোগ্রাসে গিলতে লাগল। কথাটা সরমা এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কেন না পরিমল এমন কথা বলে আগে বহুবার সান্ত্বনা দিয়েছে। হাতের কাজটা বন্ধ করে পরিমলকে উদ্দেশ্য করে বলল ঃ গোবিন্দদের বাড়ি থেকে কাপড়টা নিয়ে এস। বলেই নিজের কাজে মন দিল। যাকে বলল সে একমনে ভাত খাচ্ছে। মুখ তুলে মায়া হল সরমার। কি বিশ্রী চেহারা হয়েছে। হবেই বা না কেন? সময়মত খাওয়া নেই, স্নান নেই, ঘুম নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে সরমা আরো দুমুঠো ভাত দিল। পরিমল সংগে সংগে বলল ঃ না না-না আর নয়। তুমি খাবে কি? সরমা কোন কথা শুনল না। পরিমল কিছুটা খেয়ে উঠে পড়ল। কোনরকমে হাত ধুয়ে পরিমল চলে যাচ্ছিল দেখে সরমা ডাকল, বলল ঃ আঁচলে টাকা রয়েছে নিয়ে যাও। ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এস।

পরিমলের ফেলে-যাওয়া ভাতগুলি দেখে সরমার চোখে জল এল। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মানুষটা যেন কেমন হয়ে গেল। অথচ এরকম ছিল না। সাধ-আহ্লাদ ছিল। রঙ্গ-তামাসা ছিল। কিন্তু আজ আর যেন কিছু নেই। সংসারের ঝামেলায় এবং কারখানার পরিবেশে মানুষটা মেশিন হয়ে গেছে। আর এই ধর্মঘটের জন্য সংসারের প্রতি নিস্পৃহ হয়েছে আরো বেশি। রাতদিন ভাবে। সভা-মিছিল নিয়ে মেতে রয়েছে। আগে কারখানার কত গল্প করতো। কাদিনে কি রান্না হত। কার প্রমোশন হল ইত্যাদি কত বিষয় নিয়ে কত কথা বলতো। ছুটির দিন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গড়ের মাঠে, কখনো চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যেত। মাঝেমধ্যে সিনেমায় যেত। এখন যেন সব পাল্টে গেল। কেন? সে কথার জবাব খুঁজতে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই উঠে পড়ল। সন্ধ্যার আর বেশি দেরী নেই।

পরিমল বেশ একটু রাতে বাড়ি ফিরে দেখল—সরমা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে মেশিনটা চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প আলোয় সরমার মুখটা করুণ দেখাচ্ছে। পরিমল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল ঃ জান, কাল কারখানা খুলবে। পাকাপাকি কথা হয়ে গেল।

ঃ সত্যি। সরমার চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল।

ঃ হ্যাঁ, কয়েকটি সর্তে। কিস্তিতে কিস্তিতে লোক নেবে। বলেছিলাম না আমরা জিতবো। কি জানো—একতাই শক্তি।

তোমাকে নেবে তো?

কেন এ কথা বলছো।

তুমি যে লিডার।

মেশিনটা বন্ধ কর। কোথাকার যমদূত।

এটা ছিল বলেই বেঁচে ছিলে—অবহেলা করো না।

রাখ দিকিনি।

তুমি খাবে না।

না, একগাদা খেয়ে এসেছি।

কে খাওয়ালে।

ঃ শ্রমিক ভাইরা।

অনেকদিন পর প্রাণ খুলে দুজনে কথা বলল। কথা বলতে বলতে রাত্রি গভীর হয়ে গেল। কি মনে করে পরিমল হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিল। অন্ধকার গ্রাস করে নিল এক মুহূর্তে। পরেই জ্যোৎস্নার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। পূর্ণিমা কাছেই হবে। আকাশে তারারা ঝলমল করছে। দূরের গাছ-গাছালিতে জোনাকিরা জ্বলছে-নিভছে। দূরে কোথাও বস্তিতে গানের জলসা বসেছে। তার সুরের মূর্ছনা এখানেও ভেসে আসছে। দীর্ঘদিন পর সংগ্রামী মুখগুলো আবার খুশিতে মশগুল হচ্ছে। পরিমলের ভাল লাগল। গুনগুন করে একটা গান ধরল। সরমা চুপ করে বসে রয়েছে।

চাঁদের আলোয় সরমার মুখটা যেন আগের মত মিষ্টি লাগছে। চাঁদ চাঁদ [illegible] : আবদার করছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সরমা বললে ঃ কারখানা খুললে যে টাকা পাবে—আমায় দেবে।

ঃ কি করবে।

ঃ মোড়িও কিনবো।

ঃ আচ্ছা।

কথায় কথায় চাঁদ গাছের মাথায় নেমে এসেছে। পরিমল সরমাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল।

ধর্মঘটের পর কারখানা খুলেছিল। বিরাট লোহার গেট দিয়ে কর্মীরা ঢুকছে। অদূরে একটা পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদল শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। আজ যারা ঢুকছে তাদের মধ্যে শুধু কার্যকরী সমিতির সদস্য ব্যতীত সকলেই রয়েছে। পরিমলের কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু সহসা কিছু করতে মন চাইছিল না। সকল শ্রমিক ঢুকে গেলে দারোয়ান একটা লিস্ট গেটে মেরে দিল এবং সংগে সংগে গেট বন্ধ করে দিল।

পরিমল ও ইউনিয়নের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখে কোম্পানী কার্যকরী সমিতির সবাইকে বাদ দিয়ে কারখানা চালাবার জন্য সদম্ভ ঘোষণা করছে—অনির্দিষ্টকালের মত নিম্নলিখিত শ্রমিকদের কর্তৃপক্ষ পুনর্বহাল দিতে অক্ষম। নোটিশটা পড়ার সংগে সংগে সুবোধ লোহার গেটে সজোরে ঘুষি মারল। কয়েকজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। শোকের ছায়া নেমে এল। পরিমল হতভম্ব হয়ে গেছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। শরীর কাঁপছে। কারখানাটা চোখের সামনে ঘুরছে। কিছুই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কারখানায় হুটার পড়ল। আর সংগে সংগে পরিমল হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। আর তক্ষুণি মন্ত্রবলের মত সকলে পরিমলের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল—সকলে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে। ধাপ্পাবাজি চলবে না—চলবে না। বিশ্বাসঘাতক, বেইমান—জবাব দেবে—জবাব দেবে।

চিমনির ধোঁয়া—বন্ধ লোহার গেটের সামনে তারা এই বেইমানীর জবাব দেবার শপথ নিল।

Burglars of Hearts ('Soviet Land' Nehru Award Winner) : Oles Benyukh and Darshan Singh: Jaico Publishing House, 125 Mahatma Gandhi Road, Bombay 1 : Price in India only Rs. 4/-.

ইউক্রেন এবং পাঞ্জাবের দুই সাহিত্যিকের এই যৌথ প্রয়াস প্রশংসনীয়। পঞ্চ নদের দেশ এবং ইউক্রেন অঞ্চলে ভ্রমণ করে তাঁরা যা কিছু দেখেছেন, তার বিবরণ যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই কৌতুকরসে পরিপূর্ণ। হাস্যরসের মাধ্যমে দুই দেশের সামাজিক এবং অর্থনীতিক যেসব চিত্র এটিতে অঙ্কিত হয়েছে, তা সত্যনিষ্ঠ এবং শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতায় আকর্ষণীয়। সাধারণত য়ুরোপীয়দের সাথে আমাদের দেশের লোকেরা একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু রুশ দেশের মানুষের সাথে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে আমাদের কোন সঙ্কোচ হয় না। কারণ তাদের সাথে কোথায় যেন আমাদের একটা মিল আছে। তাছাড়া পশ্চিম য়ুরোপের মানুষ এদেশের মানুষকে যেমন অশ্রদ্ধা করতে অভ্যস্ত, তাতে তাদের সাথে আমরা স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে কোনমতেই পারি না। কিন্তু রুশ দেশের মানুষ আন্তরিকভাবে আমাদের সাথে কেবল মেলামেশাই করে না, আমাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু জানাতেও তারা নারাজ নয়। দুজন লেখকই গতানুগতিক সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে দুটি বিরাট দেশের সম্পর্কে যে সমীক্ষা করেছেন, তা অন্তরকে স্পর্শ করে। গ্রন্থটি 'সোভিয়েত দেশ' নেহরু পুরস্কার লাভ করেছে।

গীতিমালঞ্চ—ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক : শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ, প্লট নং ৩৯, শহীদনগর, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা। মূল্য : তিন টাকা।

প্রাচীনকাল থেকেই সংগীতের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যখন পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের লোকেরা অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন ছিল, তখন সনাতন ভারতের মুনি-ঋষিরা বেদগানের মধুর সুরে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। সঙ্গীতের মনোমোহিনী সুরে নাদব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নাদোপাসনা করতেন। তখন থেকেই আজ পর্যন্ত সংগীতের নানা শাখার মধ্যে ভক্তিমূলক গানের স্থান সুদৃঢ় হয়ে আছে।

ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ রচিত 'গীতি-মালঞ্চ' বইখানি কয়েকটি ভক্তিমূলক বাংলা খেয়াল গানের সঞ্চয়ন। উড়িষ্যার সিভিল সার্জেন থাকাকালীন গ্রন্থকার এই গানগুলি রচনা করেন এবং নিজেই সুরসংযোজনা করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সঙ্গীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক ও শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী প্রমুখ সংগীতবিদ ও শিল্পী এই বইটির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন—যা বইয়ের মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে।

৭খানি উত্তর ভারতীয় এবং ১৩খানি দক্ষিণ ভারতীয় রাগের বাংলা গানের সংকলন আছে এই বইটিতে। এর মধ্যেই আছে প্রত্যেকটি রাগের পরিচয়, বিস্তার, তান, বোলতান, সরগম, তারানা প্রভৃতির সহজবোধ্য স্বরলিপি। উত্তর ভারতীয় রাগের মধ্যে আছে ভৈরব, জয়জয়ন্তী, মালকোষ, আড়ানা, বাগেশ্রী, বাহার, মিঞাটোড়ী এবং দক্ষিণ ভারতীয় রাগের মধ্যে আছে জগনমোহিনী, কিরবাণী, কল্যাভরণ, মলয়-মারুতম, সরস্বতী, চারুকেশী, শিবরঞ্জনী, সাবেরী, বসন্ত-মুখারি, বাচস্পতি, মায়াবকুমড়, সুধাকাম্ভোজী ও কন্নড পঞ্চম। প্রচলিত ও দুষ্প্রাপ্য দুরকম রাগের সংকলন থাকায় বইটি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাবিদ উভয়েরই সহায়িকা হিসেবে বিশেষ উপযোগী।

বইটির ছাপা পরিষ্কার এবং বাঁধাই সুদৃশ্য, প্রচ্ছদটিও সুন্দর।

[illegible] ৫৭/১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।

এদেশে এখনও কিশোর-সাহিত্যের বড় অভাব। তাদের উপযোগী হাসির নাটকও বেশী নেই। 'অদ্বিতীয় ছোটকাকা' তাদের অফুরন্ত হাসির খোরাক যোগাবে। নাট্যকারের নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি প্রশংসার যোগ্য। প্রতিটি চরিত্র সু-অঙ্কিত এবং প্লটটিও চমৎকার। নাটকটি কিশোর মহলে শুধু নয়, সকলের কাছেই সমাদর পাবার যোগ্য। শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত প্রচ্ছদটি আকর্ষণীয়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। তরুণ নাট্যকার সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়কে সাধুবাদ জানাই।

উত্তরণ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭)—সম্পাদক : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭। এক টাকা।

'উত্তরণ'-এর বর্তমান সংখ্যাটি মূলত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক সংকলন। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ ব্যতিরেকে যথারীতি অন্যান্য রচনা অর্থাৎ কবিতা, আলোচনা এবং প্রবন্ধ ইত্যাদিও 'উত্তরণের' বর্তমান সংখ্যায় স্থান লাভ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ নানা কারণেই অত্যন্ত সময়োচিত এবং মানিক যে বাংলা সাহিত্যের সত্যিকারের মানিক—বাংলার কবিদের তাঁর প্রতি নিবেদিত নানা ব্যঞ্জনার অকপট কথামালার মধ্যেই সেকথার সত্যাসত্য প্রতিষ্ঠিত। এই পর্যায়ে বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকের কবিতা 'উত্তরণ'-এর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। নিবেদিত কবিতাগুচ্ছের প্রারম্ভে কবিদের চোখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত নাতিদীর্ঘ ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমান অংশের সম্পাদনায় কিঞ্চিৎ এলোমেলো ভাব লক্ষ্য করা গেল। নিবেদিত কবিতাগুচ্ছে কবিদের নাম এবং কবিতার শীর্ষনাম একই ধারায় রাখা হয় নি, ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই (একাধিক ক্ষেত্রে) রচয়িতা বলে মনে হতে পারে (পৃঃ ১১।১২।১৩)। প্রতিষ্ঠিত কবিতা পত্রিকা হিসেবে 'উত্তরণ'কে আরো আধুনিকভাবে সজ্জিত এবং মুদ্রণপ্রমাদহীন হিসেবে দেখতে আমরা আগ্রহী।

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রোলান্ড বিয়ার তার থিসিসে আরও লিখেছে : "যে-কোন দেশের নাটকের গাঠনিক দিকটার অনেকটাই নির্ভর করে সেই দেশের তৎকালীন নাট্যিক পরিস্থিতির উপর। সুতরাং আমাদের প্রথমেই পুরাকালের ভারতীয়দের সম্বন্ধে এবং তাদের নাট্যিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা দরকার। আমাদের খুঁজে বের করা দরকার যে-আকারে নাটকগুলো আমরা পেয়েছি কিভাবে অভিনীত হবার জন্য সেগুলো রচিত হয়েছিল।

পুরনো ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে চিরাচরিত ইওরোপীয়ান স্টেজের অনেক পার্থক্য ছিল। ভারতীয় অভিনেতারা খোলা জায়গায় অভিনয় করতেন—কোন উইংস বা সেট থাকতো না—সামান্য ছোটখাট প্রপার্টিজের ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

অভিনেতাকে যদি গিয়ে দৃশ্যের প্রথম দিকে সিংহাসনে বসতে হোত, যদি তাকে কোন ছবি দেখতে হোত, অথবা প্রেমাভিনয়ের দৃশ্য করতে হোত, সে স্বাভাবিকভাবে রঙ্গস্থলে ঢুকতো, নিজের আসনে গিয়ে বসতো এবং তারপরে যে ভূমিকায় অভিনয় করছে তার ধরনধারণ নিজের ভেতর ফুটিয়ে তুলতো।

ইওরোপীয়দের মত পিকচার ফ্রেম স্টেজে ভারতীয় অভিনয় হোতো না—কার্টেনের ব্যবহারও তাঁরা করতেন না। ভারতীয় রঙ্গালয়ে পিকচার ফ্রেম স্টেজের মত ম্যাজিক এফেক্ট সৃষ্টি করবার বা দর্শকদের স্থান, কাল ভুলিয়ে দেবার কোন প্রচেষ্টা করা হোতো না—

No attempt was made to create the illusion of a non-existent reality by means of a manyfold stage technique.

ভারতীয় অভিনয়ে নৃত্য ছিল একটি প্রধান অঙ্গ। ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কীয় মূকাভিনয় এবং নৃত্যের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল। এই সব দিকগুলো সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলে অর্থাৎ ভারতীয় অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গী থেকে শুরু করে হাতের আঙুলের কাজ ইত্যাদির ব্যঞ্জনা না বুঝতে পারলে ইওরোপীয়দের পক্ষে পুরনো ভারতীয় নাটকের মঞ্চরূপায়ণ সম্বন্ধে ধারণা করা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

সংলাপকে বাদ দিয়েও ভারতীয় অভিনেতার আয়ত্তে থাকতো বহুবিধ শিল্পসম্মত দেহভঙ্গী করবার অধিকার। চিরাচরিত প্রচলিত রীতি অনুসারে দেহের প্রত্যেক অঙ্গকে নানা ভঙ্গিমায় কার্যকরীভাবে অভিনয়ের সময় ব্যবহার করা যেত। এই সব ভঙ্গিমার দ্বারা যে চরিত্রে অভিনয় করা হোত তার অন্তরের অন্তস্তলের ভাবানুভূতিগুলিকে প্রকাশ করা হোত। ভাবাভিব্যক্তির জন্য হাত এবং চোখের যথেষ্ট ব্যবহার করতো ভারতীয় নটনটীরা।

In Shakuntala we find many scenic annotations referring to such a play in gestures for instance !

—Shakuntala expresses shy love—

—He wants to hold her back but controls himself—

—(The King) indicates being tired of the throne—

একদিকে দৃশ্যপটহীন রঙ্গমঞ্চে ভাবাভিব্যক্তিকে ঘনীভূত এবং রসঘন করবার জন্য যেমন নৃত্যের সাহায্যের দরকার হোত, তেমনি দরকার হোত অতিরিক্ত স্টাইলাইজড মূকাভিনয়ের। সংস্কৃত নাটকে অভিনেতারা সাঁতার কাটে, ঘোড়ায় চড়ে এবং উড়ে বেড়ায়—এ সবই সম্পন্ন হোত মূকাভিনয়ের সাহায্যে। অন্ধকার বোঝাতে হলে স্টেজের আলো নেভাতে হোতো না—পূর্ণালোকিত রঙ্গগৃহে হাতের ভঙ্গীর সাহায্যেই অন্ধকারের সংকেত দেওয়া হোত। কালিদাসের শকুন্তলায় রাজা দুষ্মন্ত অদৃশ্য রথ চড়ে স্টেজে আসতেন। শকুন্তলা যে ফুল তুলতো তাও চোখে দেখা যেত না, তার সখীরাও অদৃশ্য গাছগুলিতে জল সেচন করতো।

নাটকের টেক্সটে পরিচালকের প্রতি যে সব নির্দেশ আছে তার ঠিকমত অনুবাদ করলেই এসব কথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

—Indicating the impetuous dispatch of the chariot—

—Indicating that a bee swarms round irritatingly—

এ ছাড়া আরো অনেক উদাহরণ আছে।

দৃশ্য বদলের ব্যাপারেও অভিনেতাকেই দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে হয় সাংকেতিক ভঙ্গীর দ্বারা। শকুন্তলা নাটকে কবি এইভাবে কাজ সেরেছেন :

Doorkeeper : "Here is the staircase....will the gentleman please step up ?"

Or :

King: (Walking about and looking around) "This is the entrance to the grove of penitence; I want to enter it now." (He makes a movement to this effect).

কালিদাসের শকুন্তলা নাটক সামন্ত রাজসভায় ধনী দর্শকদের সামনে অভিনীত হবার জন্য রচিত। তাঁর কাব্য যে ভাষায় রচিত তা তখনকার সময়ের কথিত ভাষা ছিল না। শুধুমাত্র ঐতিহ্যসম্পন্ন সুশিক্ষিত দর্শকরাই তাঁর নাটকের অভিনয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলো উপভোগ করতে পারতো। দর্শকসংখ্যা স্বভাবতই ছিল সীমিত। থিয়েটারের জন্য বিশেষভাবে কোন রঙ্গগৃহ তৈরি করা হোতো না। বোধ হয় মন্দিরের কোন অংশে বা রাজপ্রাসাদের বড় আকারের হল জাতীয় ঘরে অভিনয় হোত।

সুন্দর গাঠনিক আকারের দ্বারা সংস্কৃত নাটকের কাব্যাংশকে গদ্য সংলাপের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এবং এইভাবেই কাব্যাংশ নাট্যিক বিশেষ পরিস্থিতির থেকেও আলগাভাবে অবস্থান করে। সংস্কৃত নাটকের মঞ্চ ব্যবস্থাপনা এবং অভিনয়ের ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টি থাকে নাটকের কাব্যময় দিকটাকে ঘটনার অগ্রগতির দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। অভিনেতার কাব্যাংশ বলবার বাচনভঙ্গী এবং গদ্য সংলাপ বলবার ভঙ্গীও হোত বিভিন্ন ধরনের—এভাবেও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করা হোত। একথাও আমাদের অজানা নয় যে, পুরনো ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীতের একটা বড় অংশ ছিল। সংস্কৃতের পদ্য স্তবকে অসংখ্য রকমের ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়—সুতরাং অনুমানে বোঝা যায় এই কাব্যাংশ যখন গানে রূপান্তরিত হোত, সে গানেও প্রচুর বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য নিশ্চয় থাকতো এই সব সঙ্গীতের মাধ্যমেও অভিনেতারা নাটকে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করতেন।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পুরনো সংস্কৃত নাটকে পদ্যাংশের একটা নির্দিষ্ট নাট্যিক

কর্মকারিতা ছিল। নাটকের ... পদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় পদ্যাংশ একটা আবহ সৃষ্টি করতো।

প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারে কোরাস এসে ঠিক এই কাজই করতো। এই একই একস্টা ক্রিয়েট করবার জন্য শেক্সপীয়র সলিলকি বা স্বগতোক্তির ব্যবহার করতেন। দৃশ্যের অবাধ গতিতে দীর্ঘ মনোলগস বাধার সৃষ্টি করে—নাটকের অব্যাহত গতিকে স্থাণু করে দেয় স্বকীয় সৌন্দর্যের দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর দ্বারাই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। জাপানী নো-প্লে'তেও যা ঘটছে তার পাশে পাশেই থাকে একদল কোরাস—তারা স্বকীয় ঢঙে গান গায়। নাটকের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকের বর্ণনা করে, মতামত দেয়, নায়কের ভাবাবেগের ভাষ্য করে এবং সময় সময় অল্প কথায় "সংলাপে" অংশ গ্রহণ করে। আজকাল অনেক ইওরোপীয়ান এবং আমেরিকান নাটকে ভাষ্যকার এসে নাটক সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন।

In Brecht's "The Caucasian Chalk Circle" e.g. a singer or several musicians give lyric and epic explanations to the dramatic actions on the stage.

জার্মান কবি, শব্দতত্ত্ববিদ এবং অনুবাদক ফ্রাইডরিশ রুকার্ট সর্বপ্রথম ইওরোপে সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন ঘাতমাত্রা সংক্রান্ত গাঠনিক দিকটা (multi-dimensional structure) আবিষ্কার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণগুলো তাঁর সমসাময়িকেরা গ্রহণ করেন নি। আসলে সে সময়ের জার্মান রঙ্গমঞ্চ এমন একটা পরিণতিতে পৌঁছয় নি যে, সংস্কৃত নাটকের যথাযথ মঞ্চরূপায়ণ করবে। ১৮৩৪ সালে রুকার্ট এইচ এইচ উইলসন কৃত কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন এই সব অনুবাদে সংস্কৃত নাটককে শেক্সপীরিয় আমার গঠনাকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে মূল নাটকের সঙ্গে অনুবাদের বৈষম্য দেখা দিয়েছে। রুকার্টের মতে:

The dialogue in them is certainly prose—even the emotions and the affects can only be expressed in prose. The verses are only outstanding flowers of phantasy, a collection of reflections on situations and emotions, but not the bursts of emotions and therefore they are many pictures full of art, many little drawings forming an entity…The artistic composition of these verses bestows beauty and meaning on them ; they stand for a chorus disintegrated so to speak embodied in each of the characters representing general features in particular circumstances.

রুকার্ট সংস্কৃত নাটকের অপভাষ্যের কথা প্রমাণ করে দিলেন তাঁর সমালোচনায়। আর ঐ সব অপভাষ্যের ওপর নির্ভর করেই এক সময় ফ্রাইডরিশ শিলার জার্মানীতে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মঞ্চরূপায়ণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এই ধারণায় এডাল্বার্ট (শকুন্তলা'র উইলিয়ম জোনস এবং জি ফরস্টার কৃত অনুবাদের ওপরই শিলারকে নির্ভর করতে হয়েছিল) ভারতীয় নাটকটির মঞ্চপ্রয়োগের অনুপযোগিতার কারণ হচ্ছে গতির অভাব—কারণ কবি কালিদাস গতিকে ব্যাহত করে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন তাঁর নাটক শকুন্তলায়। শিলারের এই ভুল ধারণার জন্য দায়ী হচ্ছেন ইংরাজ অনুবাদক। ইংরাজী অনুবাদে নাটককে ছোট করতে গিয়ে কাব্যিক স্তরের বিভিন্ন অংশকে এক করে ফেলা হয়েছিল এবং সংলাপে এপিক ও লিরিক কিস্তৃতির কোন শ্রেণী বিভাগ করা হয় নি।
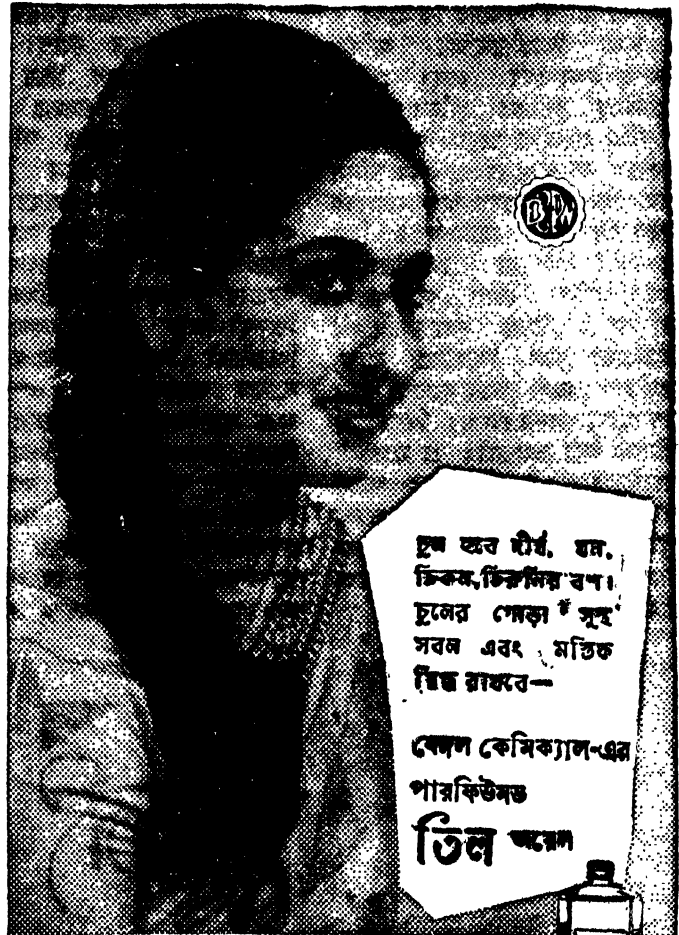
[ক্রমশ]

লোভের টাকা পিঁপড়েয় খায়

সম্প্রতি কলকাতার একটি নামকরা থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়ে আসনের দুরবস্থার জন্য বড় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। যার জন্য নাটক উপভোগ করতে আসনটি অসুবিধা সৃষ্টি করছিল। আসনটি ছিল ছেঁড়া, ভেতরের ফ্রেম বেরিয়ে এসেছে, ফলে ঘাড়ে যেমন লাগছে, তেমনি নারকেলের ছোবড়ার খোঁচায় বেশিক্ষণ একভাবে বসে থাকা দুঃসাধ্য ছিল। বেশি নড়াচড়া করলে পেছনের দর্শকের বিরক্ত হবার কথা, অথচ এক ঠাঁই বসে থাকারও উপায় নেই, কারণ নারকেল ছোবড়ার খোঁচা। অথচ আসনটি ছিল 'এফ' সারির, অর্থাৎ সামনের দিকে ছয় সারির। এই আসনগুলির টিকেটের দাম বেশি, সুতরাং দর্শকরা আরামে বসবার অধিকারী। সামনের দিকের সারিতে যখন আসনের এই অবস্থা, তখন পেছনের সারির দর্শকদের কি হাল!

অথচ থিয়েটারগুলির আর্থিক অবস্থা এখন বেশ ভাল। প্রতিটি থিয়েটারে দর্শকের ভীড়। এ ছাড়া প্রতিদিন হলগুলি ভাড়া খাটে মোটা টাকায়। যে টাকা দেওয়া এখন অফিস ক্লাব ছাড়া ছোট দলের পক্ষে সাধারণত সম্ভব হয় না। প্রমোদকরের দিক থেকেও পেশাদার থিয়েটারগুলি কিছুটা সুবিধা ভোগ করে থাকে। আমি যে থিয়েটারের কথা বলছি এই থিয়েটারের যেমন নিজেদের নাটক, তেমনি হল ভাড়া দেবার ব্যাপারে এখন বেশ তেজী অবস্থা চলছে। থিয়েটারের মালিকও ধনী ব্যবসায়ী। তা হলে এই থিয়েটারের এত দৈন্য কেন? আসন ছেঁড়া, মাঝখানটায় পাখার হাওয়া তেমন পৌঁছয় না। কীট ও দুর্গন্ধনাশক পদার্থ দেওয়া হয় কি না—এ সব কথা না হয় তুললাম না।

লোকনাথ চিত্রমন্দিরের 'রাজকুমারী' ছবিতে তনুজা

সাধারণত সিনেমার তুলনায় থিয়েটারে টিকেটের দাম বেশি। নাটক-রসিকরা বেশি দাম দিয়ে টিকেট কেনেন। সুতরাং সিনেমার তুলনায় তাঁরা বেশি আরাম পাবার অধিকারী। বিশেষত যেক্ষেত্রে এখন থিয়েটার ব্যবসাটা বেশ তেজী চলছে। অথচ একমাত্র স্টার থিয়েটার ছাড়া আর কোন থিয়েটারে তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই, আসনের ব্যবস্থাও তাচ্ছিল্যপূর্ণ। বিদেশী দর্শক এলে একমাত্র স্টার থিয়েটারেই থিয়েটার দেখানো চলে, সুযোগ থাকলে নিউ এম্পায়ারে। অথচ সারা ভারতে কলকাতার থিয়েটারের নামডাক এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু দর্শক আসেন কলকাতার থিয়েটার দেখতে। কিন্তু কলকাতার পেশাদার থিয়েটার মালিকদের ব্যবসা-বুদ্ধি এত বেশি হয়েছে যে, দর্শকদের জন্য ভাল আসনের ব্যবস্থা করতেও তাঁদের মন সরছে না। যে থিয়েটারের ব্যবসা-বুদ্ধির জন্য আমি নাটকটি ভাল করে উপভোগ করতে পারলাম না, সেই থিয়েটার সম্পর্কে কয়েকটি অফিস ক্লাবের কর্তৃরাও একই অভিযোগ ইতিপূর্বে করেছেন। অথচ এক সময় এই থিয়েটার হাতে নিয়ে মালিকরা দর্শকদের কত আরাম দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন; কয়েক বছর পরে দেখা যাচ্ছে—বড়লোকদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থাটাই কেবল বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিচ্ছে। ...সুজন।

ইচ্ছাপূরণ

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'ইচ্ছাপূরণ'-এর চলচ্চিত্র রূপদান করেছেন পরিচালক মৃণাল সেন। এই ছবিটির প্রযোজনা করেছেন চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটি। সাত রীলের এই ছবিটি গত ২রা আগস্ট প্রাচী সিনেমায় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিটি কিশোর ও তরুণদের ভাল লাগবে, বড়রাও বেশ আনন্দ পাবে। এক কথায় বলতে গেলে ছবিটি ভাল হয়েছে।

'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের মূল চরিত্র এক দুরন্ত কিশোর, নাম তার সুশীল।

গ্রামে দুর্দান্ত হলেও, আচরণে সে একে-বারে নামের উল্টো। স্কুল পালানো, রাত জেগে যাত্রা শোনা, বাবার পকেট মেরে ছেলেদের লজেন্স খাওয়ানো ইত্যাদি নিয়ে সে মেতে থাকে। বেতো রোগী বাবা তাকে সামলাতে পারে না। বাড়িতেও তা নিয়ে অশান্তি। অবশেষে সুশীলের বাবার মনে এল ছোট-কালের কথা। হায়, সে যদি সুশীলের মত হত তা হলে এই অচল দেহ নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করে চলতে হতো না। আর একদিকে সুশীল ভাবছিল সে যদি বাবার মত বড় হতো তা হলে তাকে শাসন করার কেউ থাকতো না। ইচ্ছা-পূরণ দেবী দুজনার মনের কথা জানতে পেরে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করে দিলেন। ফলে বাবা হলো সুশীল, আর সুশীল হলো বাবা। বুড়ো লোকটা ছেলের মত আচরণ করতে থাকলো, তা দেখে পাড়ার লোক নিন্দে করতে শুরু করলো। আর ছোট ছেলে সুশীল হুকো হাতে রাস্তায় এলে পাড়ার লোক ছিঃ ছিঃ করতে লাগলো। আর একদিকে সুশীলের শাসনে বাবা অস্থির হয়ে উঠলো। তখন দুজনারই মনে এল আগে যা ছিলাম তাই ভাল ছিল, যদি আগের মত হতে পারতাম। ইচ্ছাপূরণ দেবী এই প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন। ছেলেরা ছেলেদেরই মতন আচরণ করবে, বড়রা বড়দের মত। কোন ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়ি ভাল নয়; ছেলেদের মনকেও বুঝে শাসন করা উচিত।

ছোট গল্পকে রূপদান করা কঠিন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের। গল্পের পরিধি ও চরিত্রগুলি সীমা-বদ্ধতার মধ্যে যদি রাখা সম্ভব না হয়, তা হলে পরিচালককে কিছুটা স্বাধীনতা নিতে হয়, কিন্তু সেই স্বাধীনতা মূল গল্পকারের রসবোধ, মেজাজ ও রুচির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না সেই প্রশ্ন ওঠে। এখানে পরিচালক কয়েকটি চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন গল্পের বিস্তৃতির জন্য। গল্পের বিস্তৃতি সে কারণে উপভোগ্য হয়েছে।

ছবিতে বাবার চরিত্রে অভিনয় করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, এক বেতো রোগী বয়স্ক লোকের চরিত্রে তিনি চমৎকার অভিনয় করেছেন, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে একটু মাত্রাধিক মনে হয়েছে। সুশীলের চরিত্রে কিশোরটির অভিনয় প্রশংসনীয়। মায়ের ভূমিকা নিয়েছেন শোভা সেন। ছবিটির চরিত্র ও গ্রামের পরিবেশ রূপায়ণে পরিচালক বাস্তববোধ সর্বত্র রক্ষা করেছেন। চিলড্রেনস ফিল্ম সোসাইটির ছবি-

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে 'আলো ও ছায়া' ছবির নেপথ্য গায়িকা গীতা মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন বিজন পাল।

গুলির মধ্যে 'ইচ্ছাপূরণ' ছেলে-মেয়েদের কাছে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

নাটকের কথা

অনুশীলন সম্প্রদায়ের একা একা

অনুশীলন সম্প্রদায় আগামী উনিশে আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত অঙ্গনে সুব্রত নন্দীর নির্দেশনায় আবার তাঁদের বহু প্রশংসিত নাটক জাঁ পল সার্ত্রের একদা সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী "ক্রাইম-প্যাসনেল"-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত "একা একা" মঞ্চস্থ করছেন।

ষোড়শী

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চঃ—স্বাধীনতা দিবসে ১৫ই আগস্ট দুটি বিশেষ অভিনয় রজনীর ব্যবস্থা করেছেন। শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী" প্রায় এক যুগ পরে মঞ্চস্থ হবে। জীবানন্দ চৌধুরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তরুণ রায়। এককড়ি—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ষোড়শী—দীপান্বিতা রায়। এছাড়া রবীন মজুমদার, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, অজিত মিত্র, সমরেশ চক্রবর্তী, স্নিগ্ধা পলিন প্রমুখ শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবেন।

তিন অঙ্কের নতুনভাবে সাজানো এই নাটকটি পরিচালনা করেছেন তরুণ রায়।

মঞ্চাভিনয়ে উত্তমকুমার

জনমনজয়ী শিল্পী উত্তমকুমার বহু বছর পরে আবার মঞ্চে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল। নাটকটির নাম "আলিবাবা"। শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় নাটকটি আগামী ২১শে আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হবে। "আলিবাবা" নাটকে উত্তমকুমারের সঙ্গে আর যাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের মধ্যে আছেন—মলিনা দেবী, দীপক মুখার্জী, সুরদাস ব্যানার্জী, রূপক মজুমদার, অমর মুখার্জী, প্রভাত ঘোষ ও জয়শ্রী সেন।

শিল্প ও শিল্পীর তিনটি একাঙ্ক

আগামী ১০ই আগস্ট মুক্ত অঙ্গনে কলকাতার সুপরিচিত নাট্যসংস্থা শিল্প ও শিল্পী তিনটি একাঙ্ক নাটকের চতুর্থ অভিনয় মঞ্চস্থ করছেন। নাটক তিনটি যথাক্রমে মোহিত চট্টো-পাধ্যায়ের "বাজপাখী", মনোজ মিত্রের "কালবিহঙ্গ" এবং ক্লিফোর্ড ওদেতের "ওয়েটিং ফর লেফটিং" অনুপ্রাণিত "বিজয়ের অপেক্ষায়"; নির্দেশনার দায়িত্বে আছেন শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভদ্র।

কৌশিকী

আগামী ১৮ই আগস্ট কৌশিকী সংস্থা মিনার্ভা মঞ্চে দুটি একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করবে। নাটক দুটি হল সময়

বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমের অন্ত-পরায়ার ছায়া অবলম্বনে রচিত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের "প্রেমতত্ত্ববোধিনী সভা" ও সিরাজ চৌধুরী রচিত "বিজ্ঞাপিত বিবর"। দুটি নাটকই পরিচালনা করবেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবারের বিকেল

অনুভব নাট্যসংস্থার প্রখ্যাত প্রযোজনায় "শনিবারের বিকেল"-এর দ্বাদশ অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে ১৬ই আগস্ট, রবিবার, মুক্ত অঙ্গনে, সকাল সাড়ে দশটায়। নির্দেশনায় শ্রীদীপেন্দ্র সেনগুপ্ত।

মহাকবি কৃত্তিবাস

নারায়ণ চিত্রমের প্রথম নিবেদন বাংলার আদিকবি কৃত্তিবাসের পুণ্যময় জীবনকাহিনী। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিনশ্বর সৃষ্টি, কৃত্তিবাস লোকপ্রিয়, জনগণের কবি। তাঁর সহজ সরল কাব্যগাথা বাঙালীর ঘরে ঘরে যে আনন্দ-সুধা ভরে দিয়ে গেছে, তা মহাকালের স্পর্শ বাঁচিয়ে আজও আমাদের জাতীয় জীবনকে বেঁধে রেখেছে ভাব, ভাষা ও প্রেমের বন্ধনে। আদিকবির রসমধুর জীবনকাহিনীকে চিত্রে রূপ দিয়েছেন "লবকুশ" খ্যাত চিত্র পরিচালক অশোক চ্যাটার্জী।

এই সঙ্গীতবহুল ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন—শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদার, নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জী, আরতি মুখার্জী, চন্দ্রাণী মুখার্জী, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, মাধবী রুদ্র, অধীর চ্যাটার্জী, অমর পাল, শিবানী পাল।

কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া, রাজা গণেশের রাজধানী গৌড় এবং অযোধ্যায় "মহাকবি কৃত্তিবাস" ছবিটির বহু বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন—অসীমকুমার, অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন—লিলি চক্রবর্তী, সুমন মুখার্জী তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সুধা সরকার, কল্যাণী মণ্ডল, দীপ্তি প্রধান, রবীন ব্যানার্জী, সুস্মিতা মিত্র, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, জ্যোতির্ময় ব্যানার্জী, শম্ভু-নাথ কুণ্ডু, অরুণ ভট্টাচার্য, অশোক সেন, চিত্রালী মুখার্জী, মঞ্জুলা মুখার্জী,

অপরাহ্নের বন্ধুজী

মঞ্জু মিত্র, পঞ্চানন ব্যানার্জী, কুল রায় প্রভৃতি।

অর্ধেন্দু চ্যাটার্জী ছবিটির প্রধান সম্পাদক, নৃত্যাংশে আছেন—"গোপীকৃষ্ণ" ও "সুস্মিতা মিত্র"।

শ্রীরণজিৎ শিকদার-এর পরিবেশনায় ছবিটি শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

নলদময়ন্তী

গোপালকৃষ্ণ রায় পরিচালিত জে এস ফিল্ম প্রোডাকসন্সের "নলদময়ন্তী" ছবিটি সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বীণা, বসুশ্রী, মিত্রা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগৃহসমূহে মুক্তিলাভ করবে।

বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত মহাভারতের অমর প্রেমকথা—"নলদময়ন্তী"র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—মণি বর্মা। সঙ্গীতাংশ ছবিটির অন্যান্য অনেক আকর্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। কালীপদ সেনের সুরে ছবিটিতে কণ্ঠদান করেছেন—মান্না দে, সতীনাথ মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, গীতা দাস ও গঙ্গা দে। বিশ্বনাথ নায়ক ছবিটির প্রধান সম্পাদক।

প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করেছেন—অসীমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—রবীন ব্যানার্জী, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, দীপিকা দাস, রেণুকা রায়, মণি শ্রীমানী, জয়নারায়ণ মুখার্জী, গীতা দে, লীলাবতী দেবী, পদ্মা দেবী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, ইন্দিরা দে, লীনা চক্রবর্তী, সুস্মিতা দে, সীমা ভৌমিক, ধীরাজ দাস, গোপী চক্রবর্তী, রত্না ঘোষাল, নবাগতা জয়ন্তী, সুনীলেশ ভট্টাচার্য, অজিত ব্যানার্জী, তপন চ্যাটার্জী, সুমন মুখার্জী, জীবনকুমার, ঋষি ব্যানার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, কল্পনা দাস, খাতা চক্রবর্তী ও শতাধিক শিল্পী।

পারফেক্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর প্রাঃ লিঃ ছবিটির পরিবেশক।

আজব শহর

রবীন বোস প্রডাকসন্সের প্রথম নিবেদন "আজব শহর"। এই ছবির কাহিনীকার গৌর শী। ছবির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গীত পরিচালক—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, কথা—বীরেন ভট্টাচার্য, কণ্ঠসঙ্গীতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত। শিল্প নির্দেশনায়—সুধীর খান। সম্পাদনায়—রমেশ যোশী। চিত্রগ্রহণে—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন—সর্বশ্রী উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, মঞ্জু দে, অনুপকুমার, গীতা

'রাজপথ'

মুকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

দে, সুব্রতা চ্যাটার্জী, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সুশীল চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, অজিত চ্যাটার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, মুকাভিনেতা তপন দত্ত, অনু দত্ত, শীতল ব্যানার্জী, বেণু সেনগুপ্ত, কানু মুখোপাধ্যায়, অমর বিশ্বাস এবং এই ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় বোম্বের একজন অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন রবীন বোস।

আলো ও ছায়া

গুরু বাগচীর পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের "আলো ও ছায়া" ছবিটির কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে চলছে। গত ২৫শে জুলাই ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সঙ্গীত রেকর্ড করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক বিজন পালের আয়োজিত সুরে গান গেয়েছেন সুধীর সরকার, বেলা পাল, হেমন্ত মুখার্জী, মঞ্জুশ্রী কুণ্ডু, মানবেন্দ্র মুখার্জী ও মীনা মুখার্জী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন নন্দিনী মালিয়া, দিলীপ রায়, জুঁই ব্যানার্জী, পদ্মাদেবী, আনন্দ মুখার্জী, আশা দেবী প্রমুখ।

মুর্শিদাবাদ মিউজিক কলেজের সমাবর্তন উৎসব

গত ২৭শে জুন '৭০ মুর্শিদাবাদ মিউজিক কলেজের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন—লালবাগ মহকুমার শাসক কুমারী আর মিত্র, আই. এ. এস. প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন—মুর্শিদাবাদ জেলার বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক শ্রী বি ঘোষ.

ব্যানার্জী এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী কে- ব্যানার্জী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ও অভিজ্ঞানপত্র দান করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংগীত বিদ্যাপীঠ লক্ষ্ণৌ-এর পাঠক্রম অনুযায়ী এই মহাবিদ্যালয় থেকে সংগীত প্রথমায় ১জন, সংগীত মধ্যমায় ৬ জন, সংগীত বিশারদ-এ ২ জন এবং নৃত্য মধ্যমায় ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী সর্ব-ভারতীয় পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয় এবং নৃত্য মধ্যমায় সর্বভারতীয় পরীক্ষায় এই মহাবিদ্যালয় থেকে কুমারী কৃষ্ণা আচার্য, কুমারী চন্দ্র আচার্য এবং মধুমিতা নন্দী যথাক্রমে প্রথম বিভাগে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

হরিদাস স্মৃতি সংগীত সংসদের দ্বিতীয় সংগীতানুষ্ঠান

৬৭-ই বিডন স্ট্রীটস্থ রামদুলাল সরকার মঞ্জিল-এ গত ২রা আগস্ট হরিদাস স্মৃতি সংগীত সংসদ-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সংগীতানুষ্ঠান হয়ে গেলো। ঐ অনুষ্ঠানে সংসদের সম্পাদক শ্রীস্মৃতিকুমার মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণের পর সভাপতি শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল স্বর্গত সংগীতাচার্য হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ সংগীতজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ঐ আসরের প্রথম শিল্পী শ্রীবুদ্ধদেব দাশগুপ্ত সরোদ বাজিয়ে শোনান। তিনি রাগ ইমন ও কাফি ও পরে ঠুংরী পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন আগ্রা ঘরানার প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীকুমার মুখার্জী। তিনি প্রথমে জয়জয়ন্তী রাগে খেয়াল ও পরে কতকগুলি ঠুংরী শোনান। শ্রীমহেশ-প্রসাদ মিশ্র সারেঙ্গীতে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন রাখেন। তরুণ তবলীয়া শ্রীগোবিন্দ বসু উভয় শিল্পীর সাথে তবলা সহযোগিতায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর রাখেন।

সোভিয়েত শিল্পীর কণ্ঠে ভারতীয় কাব্যের আবৃত্তি

মস্কোর স্টেট ফিলহারমনিক সোসাইটির শিল্পী শ্রীমতী ইরিনা চিজোভা ভারতীয় কাব্য আবৃত্তিতে খ্যাতি অর্জন করেছেন, এ খবর দিয়েছে এ. পি. এন।

শ্রীমতী চিজোভার অনুষ্ঠানের নাম

'মৃগয়া' ছবিতে সন্ধ্যা রায়

হল "ভারত—প্রাচীন থেকে আধুনিক-কাল"। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি আবৃত্তি করে শোনান "মহাভারত" থেকে "নল-দময়ন্তী"র উপাখ্যান, তা পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় শতাধিক বছর আগে রুশ অনুবাদে। অনুবাদ করেন তৎকালীন বিশিষ্ট কবি ভ্যাসিলি ঝুকোভস্কি। কালিদাসের "শকুন্তলা"র রুশ অনুবাদ করেছিলেন বিশিষ্ট কবি ব্যালমণ্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলীও বিভিন্ন খণ্ডে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শ্রীমতী চিজোভা তাঁর প্রকাশভঙ্গী ও অভিব্যক্তিতে ভারতীয় কাব্যের ব্যঞ্জনা এমনভাবে ফুটিয়ে তোলেন যে, শ্রোতা-দের কাছে সেগুলির আবেদন সজীব হয়ে ওঠে।

শ্রীমতী চিজোভা আজ প্রায় ১৫ বছর ধরে আবৃত্তি-শিল্পী হিসেবে সোভিয়েত শ্রোতাদের চিত্ত জয় করে আসছেন। স্টেট ইনস্টিটিউট অব থিয়েট্রিক্যাল আর্টের ছাত্রী অবস্থাতেই তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর শিল্পী হিসেবে কাজ করেন।

কলামন্দিরে যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়

গত ১লা আগস্ট কলামন্দিরে ভারতীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্তের একক মূকাভিনয় অনুষ্ঠিত হলো। শ্রীদত্তের এবারের মূকাভিনয়ের মান উন্নততর। তিনি কয়েকটি নতুন মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। বহু দর্শক স্থানাভাবে ফিরে যান। শিল্পীর এই একক প্রচেষ্টা আমাদের দেশের মূকাভিনয় মানকে অনেক উন্নত করেছে। আলো ও মঞ্চে তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত, আবহসংগীতে হিমাংশু বিশ্বাস, পোশাকে খালেদ চৌধুরী ও রূপায়ণে অনন্ত দাশ—এঁরা সকলেই নিজ নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

"ফিল্ম সোসাইটি সংবাদ"

সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা এ মাসের ৯ তারিখে ম্যাজেস্টিক প্রেক্ষাগৃহে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের "সটস্ আন্ডার দি গ্যালোজ" ছবিটির এবং ১৩, ১৪ এবং ১৬ তারিখে সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে "ট্রেন উইদাউট টাইম্ টেবল্" (যুগোশ্লাভিয়া) এবং "এ বমব্ ওয়াজ স্টোলেন" (রুমানিয়া) ছবি দুটির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

বলাকার মিলনোৎসব

গত ৫ই আগস্ট মহাজাতি সদনে 'বলাকা'র বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে এ বছর যাঁরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনকে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে। অভিনন্দিত হয়েছেন দেবাশিস গুহ, দেবাশিস বসু, আশিষ রায় ও গৌতম রায়। এই মিলনোৎসব উদ্বোধন করেন ডঃ রমা চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেছেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, আর বক্তৃতা দিয়েছেন ডঃ দিলীপ মালাকার।

সংস্থার পক্ষ থেকে বার্ষিক ক্রীড়া, সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। তার পরে রবীন্দ্র, নজরুল ও অতুল-প্রসাদের গানের আসর বসে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৩৪ সালে ভারত ভ্রমণ শেষ করে ইংলন্ড দল ফিরে গেল! ফিরে গেল রাবার জয় করেই। জার্ডিনের নেতৃত্বে শক্তিশালী ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ভারত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারে নি বটে—কিন্তু ঐ সফরের ফলে ভারত যা পেয়েছে তাও খুব একটা কম নয়। ১৯৩২ সালে টেস্ট ক্রিকেটের আসরে যাত্রা শুরু করলেও ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভারত বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে ভারত তখন নিজের আসনটা পাকা করে নিয়ে চলেছে।

অবশ্য এর পেছনে ছিল ইংলন্ডের অনেক নামকরা খেলোয়াড়দের অবিস্মরণীয় অবদান। এঁদের মধ্যে সি. বি. ফ্রাই, হ্যারল্ড লারউড, উইলফ্রেড রোড্স, জর্জ হার্ট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজকুমারের চেষ্টায় জ্যাক হবস, সার্টক্লিফ প্রভৃতিরাও বারবার ভারতে এসেছেন খেলতে।

ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির পেছনে যাঁদের অবদান ছিল, সব থেকে বেশি তাঁদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক টেরাণ্টের নামই করতে হবে সবার আগে। টেরাণ্ট ছিলেন সেযুগের নাম করা খেলোয়াড় আর কোচ। অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলন্ডে গিয়ে বসবাস শুরু করে তিনি খেলেছিলেন মিডলসেক্সের পক্ষে। তারপর ভারতে এসে বাঁধলেন ঘর আর সেই সংগে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্যে মন-প্রাণ ঢেলে আরম্ভ করলেন কাজ করতে। আর তাঁরই হাতে তালিম নেওয়া দল ১৯৩২ সালে ইংলন্ডে গিয়ে সকলকে চমকে দিয়ে এলো।

আর তারপরই ভারতীয় ক্রিকেটের দিনটি। এ শুধু ভারতীয় ক্রিকেটেই নয়—বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে সেই দিনটির কথা চিরকাল কালো অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ক্রিকেটের রাজপুত্র, বিশ্বক্রিকেটের প্রাণপুরুষ রণজিৎ সিংজী মারা গেলেন।

প্রিন্সেস প্রোটেকশান বিল পাশ করিয়ে রণজি ফিরে এলেন জামনগরে। দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ২৭শে মার্চ। ক্লান্ত রণজি। প্রচণ্ড পরিশ্রমের ফলে বিপর্যস্ত। রণজি যেন বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে।

দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ২রা এপ্রিল। ঠিক রাত তিনটের সময় সকলকে কাঁদিয়ে যেন হাসতে হাসতে চলে গেলেন বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময়, ভারতীয়

স্টেশনে দিগ্বিজয় সিংজীকে সংগে নিয়ে রণজি সমস্ত রাজধানীটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। যেন আর কোনদিন দেখতে পাবেন না—যেন এই তাঁর শেষ দেখা—দিগ্বিজয় সিংজী কিন্তু রণজির মনোভাবের কিছুই বুঝতে পারলেন না। কথা ছিল ওখান থেকে খুব শীঘ্রই রণজি ইংলন্ডে যাবেন। তাই দিগ্বিজয় জানালেন যে, স্টেনসের বাড়ি গুছিয়ে রাখার জন্যে দেওয়ান সাহেব ইংলন্ডে চলে গেছেন আর তাঁর যাত্রার সব কিছুই গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

দিগ্বিজয়ের কথার কোন উত্তর দিলেন না রণজি। কি উত্তরই বা দেবেন। তিনি যেন তাঁর ভবিষ্যৎ, দিন-খন সব কিছু জেনে বসে আছেন—তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেন অজানা আর কিছুই নেই। তাই দিগ্বিজয় সিংজীর কথা শুনে রণজির মুখে খেলে গেল ম্লান হাসি। কিন্তু সেই হাসির অর্থের ছিটেফোঁটাও ধরতে পারলেন না দিগ্বিজয়।

পথে দিগ্বিজয়কে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে শুরু করলেন রণজি। কোথায় বাজার হবে, কোথায় ব্যাংক হবে, কোথা দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে সব কিছু বলে দিলেন।

দিগ্বিজয় ভাবলেন, রণজি তো বেশ কিছুদিনের জন্যে ইংলন্ডে চলে যাচ্ছেন। তাই সব কিছুর ভার তিনি তাঁরই উপর দিয়ে যাচ্ছেন। দিগ্বিজয়ের মনের ভাব বুঝতে এতোটুকুও দেরী হলো না রণজির। কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। শুধু তাঁর মুখে লেগে রইলো ম্লান সেই হাসির ছিটে......।

রাত্তিরে শোবার আগে আত্মীয়-স্বজন

সকলকে ডেকে ডেকে কথা বললেন। এক-একজনকে নিয়ে গেলেন এক-এক রকমের উপদেশ। কার কি করতে হবে, না হবে তাও জানাতে ভুললেন না।

আসল কথাটা কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। দিগ্বিজয়ের মতো সকলেই ভাবলেন যে, রণজি ইংলেণ্ডে যাচ্ছেন, হয়তো অনেকদিন থাকবেন। তাই তাঁদের বলে যাচ্ছেন এই সব কথা। তাই তাঁদের দিয়ে যাচ্ছেন অমন সব উপদেশ।

সে ভুল ভাঙতে কিন্তু খুব একটা বেশি দেরী হলো না। রাত না পোহাতেই জামনগরের বড় বড় ডাক্তাররা ছুটে এলেন রাজপ্রাসাদে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে—রণজি অসুস্থ। রোগ উপশমের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বেড়েই চলেছে ধীরে ধীরে। শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রণজির অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন সকলে।

ওদিকে তখন যমের সংগে চিকিৎসকদের চলেছে তীব্র লড়াই। যে মানুষটি চিরজীবন সোজা ব্যাটে খেলে গেছেন, যে মানুষটি কোনদিন কাউকে পরোয়া করেন নি—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি কিন্তু সেদিনও ছিলেন নির্বিকার। তাঁর মুখে লেগেছিল ম্লান হাসির ছটা।

নাকি এও ছিল রণজির কাছে খেলাই.... .!

ব্যাট হাতে নিয়ে যিনি চিরজীবন লড়াই করে গেছেন ক্রিকেটকে সামনে রেখে, তিনি যেন শুয়ে শুয়ে দেখছিলেন তাঁকে সামনে রেখে যমের সংগে মানুষের লড়াই-এর দৃশ্যগুলো।

দীর্ঘ পাঁচদিন ধরে চললো এই লড়াই। তারপর......তারপর এসে গেল সেই মুহূর্ত।

দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ২রা এপ্রিল।

ঠিক রাত তিনটের সময় সকলকে কাঁদিয়ে যেন হাসতে হাসতে চলে গেলেন বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় আর ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ রণজিৎ সিংজী...।

রণজির মৃত্যুর ক্ষতি নিরূপণ করতে যাওয়া বাতুলতা। যা গেল তা আর কোনদিনও ফিরে আসবে না। কিন্তু তিনি যা দিয়ে গেলেন, আমাদের জন্যে তিনি যা রেখে গেলেন—ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে যে কতো বড় পাওয়া, তা জানতে আজ আর বোধ হয় কারোরই বাকী নেই।

রণজির মৃত্যু সংবাদে সমস্ত বিশ্বে নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া। চোখের জলে ভেসেছিল জামনগরের জনগণ। ভারতীয় সংবাদপত্রের কথা ছেড়ে দিলাম, বিদেশী সংবাদপত্রে রণজির মৃত্যু সংবাদের প্রচারিত খবরের সামান্য অংশ তুলে দিলেই বোঝা যাবে তাঁদের চোখে রণজি ছিলেন কতো ওপরে। সমস্ত বিশ্ববাসীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা লাভ করে রণজি বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারতকে যে কতো বড় করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়!

রণজির মৃত্যু সংবাদ দিয়ে 'দি মর্নিং পোস্ট' যে সংবাদ পরিবেশন করেছিল, তার থেকে সামান্য অংশ তুলে দেওয়া হলো—

"...East and West met in him ; what a glorious innings his life has been! In the present crisis in the fortunes of India the loss of his statesmanship first of all will be lamented...."

'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়েন'-এ প্রকাশিত বিস্তারিত বিবরণ ও রণজি সম্বন্ধে প্রকাশিত লেখার কিছু অংশ—

"...Modern lovers of the game, jealous of their own heroes will no doubt tell us that Ranji, like all other masters, was a creation of our fancy in a world old fashioned and young. We who saw him will keep silence as the sceptics commit their blasphemy. We have seen what we have seen. We can feel the spell yet...."

রণজি আর নেই। ভারতীয় তথা বিশ্ব ক্রিকেট রণজিহারা—এ কথা ভাবতেও কেমন লাগে। ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু তাই বলে চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। রণজির স্মৃতিরক্ষার জন্যে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

এমন একটা কিছু করতে হবে—যার মাধ্যমে রণজি চিরকাল আমাদের মধ্যে বাস করবেন। ক্রিকেটের রণজির স্মৃতিরক্ষার সব থেকে ভালো উপায় হলো ক্রিকেট খেলার সংগেই রণজির নাম যুক্ত করে রাখার ব্যবস্থা করা। তার সেই ব্যবস্থা করারই ভার পড়লো ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের ওপর।

অনেক আলাপ, অনেক আলোচনার পর ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ করলেন রণজির নামে একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। রণজির স্মৃতিরক্ষার জন্যে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে রণজিৎ সিংজী চিরকাল ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনের মণিকোঠায় বাস করবেন। কেউ কোনদিনই তাঁকে ভুলে যাবেন না। সকলের মনের মন্দিরে চিরকাল থাকবে রণজির নাম।

তারই জের টেনে ১৯৩৪ সালে শুরু হলো সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার রণজি ট্রফি। আর খেলাগুলোর নাম হলো রণজি ট্রফির খেলা।

[চলবে]

মরছে—মরবে

কলকাতা ময়দানের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। খেলা আজ আর খেলা নেই। ফুটবল খেলার মান দিনের পর দিন নেমেই চলেছে। আর তারই সংগে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে অসন্তোষ, অরাজকতা আর সৃষ্টি হচ্ছে অভাবনীয় সব পরিস্থিতি। সবগুলো এক করে খোলা চোখে একটু দেখলেই বোঝা যাবে যে, আজ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, একটা চক্রাবর্তের মধ্যে কলকাতার ফুটবল শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে। কিছুতেই আর বেরুতে পারছে না সেই আবর্তের মধ্যে থেকে। কিন্তু এই আবর্ত যে ফুটবলের মৃত্যুকূপ, আর কলকাতা ফুটবল যে মরছে, এ কথা কেউই আজ আর ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষর দুর্বলতা আর কলকাতার বড় বড় দলগুলোর কর্মকর্তাদের খামখেয়ালীপনা এবং একগুয়েমীই কলকাতা ফুটবলের অন্তিম অবস্থার জন্যে দায়ী। আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ সব সময় তাকিয়ে থাকেন কলকাতার প্রধান তিনটি দলের দিকে। আর তারই সুযোগ তারা নেয় পুরোদমে। তারা জানে যে, তাদের বাদ দিলে কলকাতার ফুটবল কাণা, তাদের না হলে কলকাতার ফুটবল অচল, তাই আই· এফ· এ চায় তাদের হাতে রাখতে। কিন্তু হাতে রাখতে গিয়ে আই· এফ· এ-ই আজ হয়ে গেছে ওদের হাতের পুতুল।

পুতুল তো! তা না হলে একটি বিশেষ দল কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা নিয়ে বার বার কেন ছেলেমানুষী করছেন? রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন কিম্বা খেলার মাঠেই খেলা ছেড়ে রেফারীকে ঘেরাও করছেন—কই তাদের বিরুদ্ধে তো কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি! ছোট কিম্বা মাঝারি দলগুলোর বিরুদ্ধে বড় দলগুলো গোল করতে না পারলে মাঠে ঢিল ছুড়ে হোক কিম্বা যে-কোন ভাবেই হোক, খেলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। যারা বন্ধ করে দিচ্ছে তারা ভাবছে আজ পারে নি তাতে কি—আবার খেলা তো হবেই, তখনই না হয় গোল দেওয়া যাবে। তাই যেভাবেই হোক খেলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা অনেক পুরোন, তাই আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষেরও অজানা নয়। কিন্তু আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে কিছু করার বা বলার প্রয়োজন তো অনুভব করছেন না। অথচ অনেক আগেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার ছিল। শুধু তাই নয়—কলকাতার ফুটবলকে বর্তমানের এই অরাজক অবস্থার হাত থেকে বাঁচাতে হলে এর প্রতিবিধানের একটা ব্যবস্থা এখনই করা উচিত। কিন্তু তা যে হবে না, সে কথা সকলেরই জানা। কারণ, যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আই· এফ· এ যে তাদেরই হাতের পুতুল। সুতরাং কলকাতার ফুটবলকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই—একমাত্র ক্রীড়া উৎসাহীদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া। শেষ পর্যন্ত কি সেই পথেই নামতে হবে আমাদের? নাকি কলকাতার ফুটবল মরছে, কলকাতার ফুটবল মরবে—আর সেই দৃশ্যগুলো আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো ......!! —শান্তিপ্রিয় ॥

ফুটবল মাঠে

কলকাতার ফুটবল মরশুমের ওপর এখন চলেছে ভাটার টান। ভারত এখন খেলছে কুয়ালালামপুরের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায়। কলকাতার কয়েকটি দল গেছে গৌহাটিতে বড়দলৈ ট্রফিতে আর নওগাঁর ইনডিপেনডেন্স কে কাপ খেলতে। এ ছাড়া কলকাতা ময়দানের মেজো, সেজো আর ছোট—অনেকগুলো স্তরের লীগের খেলার পালা হয় শেষ হয়ে গেছে, না হয় তো শেষ হতে চলেছে। কিন্তু টুকটাক করে খেলা চললে কি হবে, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং দল মাঠে না নামলে খেলা যেন ঠিক জমতেই চায় না।

ওদিকে ঐক্য সম্মিলনীকে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যেতে হবে। ভ্রাতৃ সংঘ, কুমারটুলী, টালিগঞ্জ অগ্রগামী আর ঐক্য সম্মিলনী এই বছর দ্বিতীয় বিভাগ থেকে উঠে প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। ভ্রাতৃ সংঘ ছাড়া অন্য কোন দল আশানুরূপভাবে খেলতে না পারলেও ঐক্য সম্মিলনী ছাড়া বাকী দুটি দল এবারের মতো প্রথম বিভাগে থেকে যাবার সুযোগ পেল। যাই হোক, ঐক্য সম্মিলনীর জায়গায় প্রথম বিভাগে আসছে কলকাতা খিদিরপুর খালাসী ক্লাব।

কুয়ালালামপুরে গিয়ে ভারতীয় দল প্রথম খেলাতেই হেরেছে তাইওয়ানের কাছে। বার্মার কাছেও হার স্বীকার করতে হয়েছে ভারতকে। তবে মালয়েশিয়া আর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পেরে ভারত এখন একটু সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। শেষ খেলায় ভারত যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামকে হারাতে পারে, তাহলে ভারত হয়তো ফাইন্যাল রাউন্ডে খেলার সুযোগ পেলেও পেতে পারে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়।

গত বছর মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৮টি দেশের মধ্যে ভারত ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে ৮টি দল। ভারত এবার কোন্ স্থানটি লাভ করে, তাই দেখার জন্যে আমরা এখন গভীর উৎসাহে অপেক্ষা করে আছি।

॥ সোবার্স ॥
সোবার্সের নেতৃত্বে বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ ইংলন্ডের বিরুদ্ধে রাবার জয় করেছে।

সোমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উইকেটের পিছনে সতর্কপ্রহরী হিসাবে ইংলন্ডের লেসলী এমিসের একসময়ে ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি। আর এই এমিসই উইকেটরক্ষকদের মধ্যে একটি মরশুমে সর্বাধিক পরিমাণে সাফল্যলাভ করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ক্রিকেট মরশুমে উইকেটের পিছন থেকে তিনি ১২৭ জন ব্যাটসম্যানকে বিদায় করেছিলেন। এর মধ্যে ৭৯ জন তাঁর হাতে ধরা পড়ে আর বাকী ৪৮ জন তাঁর হাতে স্ট্যাম্পড্ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন প্যাভেলিয়ানে।

* *

মাত্র ৫৮ রানের বিনিময়ে একদিনের মধ্যেই এই বোলারটি লাভ করেছিলেন সতেরটি উইকেট—তাও আবার প্রথম শ্রেণীর এক ক্রিকেট খেলায়। ১৯০৭ সালে নর্দাম্পটনে নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে কেন্টের সি ব্লাইথ্ এই অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করেন। প্রথম ইনিংসে ৩০ রান দিয়ে ১০টি উইকেট আর দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮ রান দিয়ে সাতটি উইকেট দখল করে ব্লাইথ ঐ খেলার একদিনের মধ্যেই নর্দাম্পটনশায়ারকে হারিয়ে দেন।

সমাচার দর্পণ

লর্ডসের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ নাটকীয়ভাবে জিতে গেছে। খেলাটি শেষের দিকে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যখন সকলেই ভেবেছিলেন যে, ইংলন্ড হয়তো শেষ মুহূর্তে জিতে যাবে। কিন্তু শেষের দিকে সোবার্স আর রিচার্ডস খেলার হাল ধরায় বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ ২ উইকেটে জিতে যায়। ফলে, ৫টি টেস্টের মধ্যে ৩—১ খেলায় জেতায় বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ রাবার লাভ করলো। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে জেতার জন্যে বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ ২,০০০ পাউন্ড পুরস্কার পেল। আর সিরিজ জেতার জন্যে পেল ৩,০০০ পাউন্ড।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল:

ইংলন্ড—১ম ইনিংসে ২২২ ও ২য় ইনিংসে ৩৭৬ রান। বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ—১ম ইনিংসে ৯ উইঃ ৩৭৬ ডিক্লে ও ২য় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২২৬ রান।

* *

অনেক আশা আর উৎসাহ নিয়ে ভারতীয় দল ডেভিস কাপের খেলায় খেলতে নেমেছিল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে। অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার পর ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে যে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ভাব জেগেছিল, সেই ভাবের আতিশয্যই বোধ হয় ভারত শেষ পর্যন্ত ৫—০ খেলায় হেরে গেলো। চারটি সিংগলস আর একটি ডাবলস-এর কোনটিতেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা জিততে পারেন নি।

কেন পারেন নি—সে প্রশ্ন এখন তোলা থাক। কিন্তু ভারত যে জিততে পারে নি, সেই বাস্তব সত্যটাই আমাদের মনে এখন ধরিয়ে দিয়েছে জ্বালা।

॥ ১২ থেকে ১৪ ॥

(৪৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আসবেন। শুধু হাতে ফিরে এসে অভিযোগ করলেন যে আমাদের দেশে তা ধোপে টেকে না—তা কর্মকর্তারা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু ভারতীয় মল্লবীররা ঐ বিভাগে শুধু পাঁচটা স্বর্ণপদকই পান নি, প্রথম স্থানটিও অধিকার করেছেন। সুতরাং...

সুতরাং ভারতীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে খেলোয়াড়রা যে অভিযোগ করেছেন, তার তদন্ত হবেই।

প্রশ্ন-উত্তর

প্রদীপ, প্রকাশ ও শেখর (বজবজ, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ব্রেজিল যে বিশ্ব কাপ জয় করেছে, তার মূল্য ভারতে কতো?

উত্তর : অমূল্য নিশ্চয়ই...! পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য (কলেজ রোড, হাইলাকান্দি, কাছাড়)

উত্তর : জয়দীপ মুখার্জীকে আপনি C/o. সাউথ ক্লাব, এলগিন রোড, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

খেলার রাজার রাজা আপনার ভালো লাগছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

এম. জি. সেন (গড় জয়পুর)

প্রশ্ন : ভারতের পি উমরিগড় ছাড়া আর কারো ক্রিকেট খেলায় দশটির বেশি সেঞ্চুরী আছে কি?

উত্তর : আপনি একটু ভুল করেছেন, পলি উমরিগড়ের সেঞ্চুরীর সংখ্যা ৮টি।

এ ছাড়া মঞ্জরেকার ও বোরদে যথাক্রমে ১০টি ও ১১টি করে সেঞ্চুরী করেছেন।

খেলার রাজার রাজা আপনার ভালো লাগছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি।

কপোত চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ী, বীরভূম)

উত্তর : সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা কোথায় আবিষ্কৃত হয়, এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন ইংলণ্ড, কেউ বলেন চীন, আবার কেউ বলেন গ্রীসেরকথা। সুতরাং...

এ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় দল যাবে। ভারতের অধিনায়ক পাতৌদিকে এবারও অধিনায়ক মনোনীত করা হবে কিনা এখনও ঠিক হয় নি।

স্ট্যাম্প পাঠালে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়।

কমনওয়েল্থ গেমস শুরু হবার আগেই পত্র-পত্রিকায় ভারতের শিশু মল্লবীর ভেদ প্রকাশের বয়েস নিয়ে খবরের ছড়াছড়ি ছিল। একবার খবর বেরুলো, ভেদ প্রকাশের বয়েস ১২, তাই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

সেইটাই স্বাভাবিক। কারণ, কমনওয়েল্থ গেমস-এর নিয়ম হলো, যে প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দৈহিক সংযোগ বা সংঘর্ষ হবে, তাদের সর্বনিম্ন বয়েস হবে ১৫। কিন্তু পাসপোর্টে ভেদ প্রকাশের বয়েস লেখা ছিল ১২। সুতরাং......।

ভারতীয় কর্মকর্তারা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তাঁরা তখন কমনওয়েল্থ গেমস-এর কর্মকর্তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এডমণ্টনের বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভেদ প্রকাশকে যখন অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে তখন এডিনবার্গেই বা দেওয়া হবে না কেন? কিন্তু কমনওয়েল্থ গেমস-এর কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কর্মকর্তাদের এই যুক্তিতে কানই দিলেন না। তাঁরা তাই সাফ জানিয়ে দিলেন যে, ভেদ প্রকাশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

এর পর ভারতীয় কর্মকর্তারা সকলকে চমকে দিয়ে প্রমাণ দেখালেন যে, পাসপোর্টে যাই লেখা থাকুক না কেন, ভেদের বয়েস ১৪ বছরই। কিন্তু এই বয়েস নিয়ে যেভাবে ন্যক্কারজনক প্রচার হয়েছে—অল্পবয়স্ক ভেদ কেন, যে কোন প্রতিযোগীর কাছেই তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

এই প্রসংগে ভারতের চীফ ডি মিশন অশ্বিনীকুমারও ন্যক্কারজনক সংবাদ প্রকাশনের ঢাকে একইভাবে ঢিল ছুড়েছেন। তাঁকে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন ভেদের বয়েসের বিষয়ে, তখন তিনি বললেন যে, ভেদের বয়েস নিয়ে নানারকম প্রচার হচ্ছে ঠিকই—কিন্তু সেই মুহূর্তে তিনি জানেন না ভেদ প্রকাশের বয়েস কতো!

এই শেষ নয়, এর পরেও আছে। আর সেই আছেটাকে নিয়ে বাজার এবার গরম হবে। কারণ পোষাক-পরিচ্ছদ এবং খাবারদাবার নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ভারতীয় মল্লবীররা। তাঁরা তো শুধু হাতে ফিরে আসেন নি! তাঁদের জন্যেই কমনওয়েল্থ গেমস-এ অংশগ্রহণকারী ৪২টি দেশের মধ্যে ভারত ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। তাই তাঁদের অভিযোগের মূল্য আজ অনেক।

ভুল অবশ্য কর্মকর্তারা বোধ হয় করেন নি। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে, অন্য প্রতিযোগীদের মত ভারতের মল্লবীররা প্রায় শুধু হাতে ফিরে

(শেষাংশ ৪৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়		পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বৃহস্পতিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 20th August, 1970

স্বাধীনতা দিবস ও রাষ্ট্রপতির ভাষণ

চব্বিশতম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। এই দিবসটি সমস্ত ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হবার পর সেদিন থেকেই আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব, দেশগঠনের কর্তব্য।

স্বাধীনতা লাভের পর কর্তব্য সমাপন করতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল, এ-দেশের ধনসম্পদ ইতিপূর্বে সাগরপারে চলে গিয়েছিল, উপরন্তু স্বাধীনতা দিবসের প্রথম সেই আনন্দ মুহূর্তে দেশবিভাগের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল বহুরকম নতুন সমস্যার। তবু আশা ছিল, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সুদৃঢ় পদক্ষেপে সমস্যাগুলির সমাধান হবে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ শৃঙ্খলমুক্তির সুখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। আর্থিক সুরাহার জন্য গৃহীত হয়েছিল পাঁচশালা পরিকল্পনা। একটির পর আরেকটি সেই পরিকল্পনা বাস্তবভাবে কার্যকর হলেও, সেগুলিও ত্রুটি-মুক্ত ছিল না এবং সেই ভুল যখন ভাঙলো তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে নেমে এসেছে হতাশা, শিক্ষিত যুবকরা বেকার জীবন নির্বাহ করে হয়ে উঠেছে নিরুদ্যম—যা দেশের পক্ষে কখনোই কল্যাণকর নয়। অথচ দায়িত্বশীল নেতৃত্ব যথাসময়ে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক হতে পারেন নি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ণ তেইশ বছরে এই বিরাট ভারতের হৃদয়ের নির্দ্বিধ ভালোবাসা হারিয়েছে জাতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসও আজ দ্বিধাবিভক্ত। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠস্বর যতোই উদাত্ত হোক না কেন, একক শক্তিতে কোনো দলই বিশাল জনশক্তির কর্তব্য পালনে সমর্থ নয়। রাজ্যে রাজ্যে এখন গণতন্ত্রের নামে চলছে দল-বদলের পালা, ভাঙা-গড়ার মহড়া। তাছাড়া স্বাধীন ভারতে আজো ভাষা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নি, অঞ্চল নিয়ে বেধে ওঠে বিরোধ, আর যে কোনো মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচনায় জেগে ওঠে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ।

স্বাধীনতার প্রতি সাধারণ ভারতবাসীর মর্যাদাবোধ নেই, এটাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তবু স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতবাসীরা যা করবে বলে আশা করা গিয়েছিল, তা করতে কি তারা সত্যিই পরাঙ্মুখ?

আমরা মনে করি, ভারতের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ অশিক্ষায় নিমজ্জিত থেকে, স্থায়ী দৈন্যে নিত্য-নিয়মিত ভুগতে ভুগতে এখন বুঝতে শিখেছে যে, ভারত স্বাধীন হলেও, বোধ হয়, তারা স্বাধীন হতে পারে নি। আর এই রকম বোধের মূল কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। অধিকন্তু সরকারী প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনায় জনকল্যাণমূলক যে সব কাজ হয়েছে, আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতার জন্য তা সর্বত্রই সমান সাফল্যলাভ করে নি। তাছাড়া পুরো তেইশ বছরে, যে কাজে সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল সেই চরিত্র গঠনের কাজ কিছুই হয় নি। প্রতিটি দেশে যুব-চরিত্রে যে আদর্শ, চেতনা ও আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং প্রাক-স্বাধীনতার দিনগুলিতে আমাদের এই দেশে যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যুবকদের তুলনায় ছিল ঢের বেশি বিস্ময়কর ও সম্মোহন, বর্তমানে তার লেশমাত্র আছে বলে অনেকেই মনে করেন না। বলা বাহুল্য, স্বাধীন দেশের পক্ষে ঐ অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

২৪তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তির পথনির্দেশ করে বলেছেন, "কালক্ষেপের সময় নেই। স্বাধীনতা লাভের ২৩ বছর পরেও আমরা আমাদের জনগণকে সভ্য জীবনযাপনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও দিতে পারি নি। পূর্ণতর ও সমৃদ্ধতর বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনই শুধুমাত্র সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে পারে।

"আমার স্থির বিশ্বাস, বেকার সমস্যার সমাধান হলে তা অন্যান্য গুরুতর সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করবে। দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্যজনিত হতাশা থেকেই বিভেদকামী শক্তির প্রকাশ ঘটে। আন্তরিকতার সঙ্গে দারিদ্র্যের সমস্যা মোকাবিলার প্রয়াসী হলে আমাদের জনজীবন থেকে সমাজবিরোধী শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র অথচ সংগঠিত হিংসাশ্রয়ী দলগুলির বিরুদ্ধে সমাজের বিবেককে সচেতন করে তুলতে হবে।"

বলা বাহুল্য, আন্তরিকতার সঙ্গে সেই কাজ করার লোকের সংখ্যা অধুনা নগণ্য বলা চলে। রাষ্ট্রপতি আত্মসমালোচনার দ্বারা তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, "আমাদের বৃত্তি ও আচরণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আজ সারা দেশে আস্থা ও চরিত্রের একটা গুরুতর সংকট সৃষ্টি করেছে।"

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি তাঁর বক্তৃতার উপসংহার করেছেন সুগভীর আশাবাদিতার মধ্যে। নৈরাশ্যপীড়িত এই দেশে ভবিষ্যতের শেষ সম্বল আশাটুকুর পুনরুজ্জীবন ঘটুক এই আমাদের কামনা। প্রগতিশীলতা যদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির মুখের বুলি না হয় এবং তা বাস্তবোচিত কর্মের দ্বারা প্রসারিত হতে থাকে, তাহলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাময়িক নৈরাশ্যের অবসান হবেই হবে।

ব্যুরোক্রাটরা কি দেশ-শাসন করেন না? অবশ্যই করেন এবং রাজনীতিকদের চেয়ে কিছু যে খারাপ করেন না তার প্রমাণও আমরা এদেশে পেয়েছি। অন্য পার্লামেন্টারী দেশের মত আমাদের দেশ এ-দৃষ্টান্তও দিয়েছে যে, রাজনীতিক তথা মন্ত্রীদের আসলে পরিচালনা করেন দুঁদে ও জবরদস্ত আমলারাই। জারিং অবশ্য সে-অর্থে তাঁর দেশের মন্ত্রীদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরান নি, যদিও আমলা হিসেবে সুইডিশ সরকারী মহলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন নেগোশিয়েশন বা কথাবার্তা চালাতে গিয়ে। বিবদমান দু' পক্ষ সরাসরি তাদের মধ্যে কথা বলতে গিয়ে কাজিয়া বাধায়, একের সংকাটা যুক্তি অপরের কাছে ছেঁদো অজুহাত বলে মনে হয়। কাজেই সেক্ষেত্রে মধ্যস্থ রেখে আলোচনা চালানোই সভ্য দুনিয়ার রীতি বা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই মধ্যস্থের ভূমিকায় ডঃ গানার জারিং যেন তুলনাহীন। পশ্চিম এশিয়া প্রসঙ্গে মার্কিন শান্তি প্রস্তাবকে কার্যকর করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্য ডঃ জারিং-এর ডাক পড়েছে আবার। শান্তি প্রস্তাবে ৯০ দিনের সাময়িক যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়েছে। সেই সময়ে দু' পক্ষ—আরব ও ইস্রায়েলের মধ্যে আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করার গুরুদায়িত্ব পড়েছে ডঃ জারিং-এর ওপর।

ডঃ গানার ওয়ালফ্রিড জারিং কিন্তু পেশায় রাজনীতিক নন, তিনি সুইডেনের একজন দক্ষ ব্যুরোক্রাট। কিন্তু অধুনা তাঁকে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় তাঁকে ইতিপূর্বেও একবার আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে বন্ধ হয়েছিল। তখন সেক্রেটারি-জেনারেল উ থান্ট সুইডিশ রাষ্ট্রদূত ডঃ গানার জারিংকে পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর ব্যক্তিগত দূত করে পাঠান দু' পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে। রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব যে তিন

গানার জারিং

পক্ষ মেনে নিয়েছিল সেই তিনটি দেশের রাজধানী—কায়রো, আম্মান এবং তেল আভিভে তিনি ক্রমাগত চরকিবাজি করেছেন। প্রায় ২৮ বার তিনটি রাজধানীতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিম এশিয়া সমস্যার সমাধানের সন্ধান করেছেন। তাঁর সে-মিশন [illegible] যদি পশ্চিম [illegible] আবার অঘোষিত লড়াই লেগে গিয়ে থাকে তো তার দায়িত্ব কি ডঃ জারিং-এর ঘাড়ে ফেলা যাবে? কখনই না। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে দু' পক্ষের কথা শুনেছেন, এ-অঞ্চলে যুদ্ধের বিপদ এবং শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেছেন। কিন্তু ডঃ জারিং কখনই—হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও—কোনো বিবৃতি দিয়ে সমস্যাকে জটিলতর করে তোলেন নি। ঘটনা যেমন গড়িয়েছে তেমনি কর্তা উ থান্টের কাছে তিনি রিপোর্ট পেশ করেছেন।

কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাক বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্যেও ১৯৫৭ সালে ডঃ জারিংকে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে তলব করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে ব্যর্থতার জন্যেও কেউ তাঁকে দোষী করেন নি।

তার আগে ডঃ জারিং ছিলেন রাষ্ট্রসংঘে সুইডেনের স্থায়ী প্রতিনিধি, তাঁর আসন ছিল রাষ্ট্রদূত মর্যাদার। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে তাঁর স্বল্পকালীন উপস্থিতিতেই তিনি বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার আগে ডঃ জারিং ছিলেন তাঁর দেশের ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদূত। বর্তমান কার্যভার গ্রহণের আগে ডঃ জারিং ছিলেন মস্কোস্থ সুইডেনের রাষ্ট্রদূত, যদিও শান্তি মিশনের কাজে তাঁকে অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছে নিকোসিয়ায়।

এত বড় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও ভূমিকা আজ যাঁকে পালন করতে হচ্ছে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন অধ্যাপনা দিয়ে। সুইডেনের মাল্মোহাস প্রদেশের ব্রানবির এক সাধারণ কৃষক পরিবারে গানার জারিং-এর জন্ম আজ থেকে ৬৩ বছর আগে। লান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার পর তিনি তুর্কী ভাষায় অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে এই ভাষায় ব্যুৎপত্তির দৌলতে তিনি ১৯৪০ সনে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। পরে বৈদেশিক দপ্তরের রাজনীতিক শাখার প্রধানের পদ পেয়েছিলেন। তিনি পার্শি এবং আরবী ভাষাও জানেন। কূটনীতিক হিসেবে ডঃ জারিং ইতিমধ্যেই আঙ্কারা, বাগদাদ, তেহরান, কলম্বো, করাচী, নয়াদিল্লী ইত্যাদি রাজধানীতে উপনীত হয়েছেন। কর্তব্যের আহ্বানে ডঃ জারিং এই পৃথিবী গ্রহ ছেড়ে গ্রহান্তরে যেতেও বোধ হয় আপত্তি করবেন না।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, প্রবীণ বিপ্লবী জননায়ক, অনুশীলন পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ৮২ বছর বয়সে অকস্মাৎ নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করেছেন। দেশের এমন এক পরিস্থিতিতে আমরা তাঁকে হারালাম, যখন তাঁর মত সৎ, ত্যাগব্রতী, নির্ভীক অথচ অমায়িক বিপ্লবীর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করার ছিল। চিকিৎসার জন্য ও সহকর্মী, সতীর্থ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে তিনি কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঠিক ছিল, যথাশীঘ্র জন্মভূমি পূর্ব বাংলায় ফিরে যাবেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কাটাবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প।

পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল মানুষদের, বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের পক্ষে মহারাজের এই আকস্মিক মৃত্যু যে ক্ষতি করল, তা অপূরণীয়। কারণ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন আসন্ন এবং এই নির্বাচনে মহারাজ ছিলেন প্রগতিশীল শক্তির স্বপক্ষে। মহারাজের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, পাকিস্তানের নির্বাচনে প্রগতিশীলরা জয়ী হবে। পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন হবে—ওখানে বইবে মুক্তির হাওয়া।

মহারাজ ইংরেজ আমলে এবং ডিক্টেটার আয়ুবের আমলে জীবনের প্রায় ৩২ বৎসর জেলে কাটিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতার পিছনে কোনদিন ছোটেন নি, বরং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনের শেষ বাণী ছিল পাক-ভারত মৈত্রী। পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল গণ-জাগরণের প্রতি পশ্চিম বাংলার মানষের দৃষ্টি তিনি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন এবং দুই দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আরও সক্রিয় ও তৎপর হবার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর জীবনের এই শেষ ইচ্ছা বা সংকল্পকে দুই বাংলার মানুষ সফল করে তুলুন—এটাই আমাদের কাম্য।

কলকাতার বস্তি

কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ ও নগর উন্নয়ন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ লোকসভায় আভাস দিয়েছেন যে, কয়েকটি পর্যায়ে কলকাতার বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, তিন বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে, ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকার মত, এবং এই বছরের বাজেটে ৬৮ লক্ষ টাকা প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সত্যই কতটা কি করা হবে তা আমরা জানি না, কেন্দ্রীয় সরকারের মতিগতি সম্পর্কে আমাদের কোন আস্থা নেই, কেন না ইতিপূর্বেও এই বিষয়ে লম্বা-চওড়া কথা অনেক হয়েছে, কিন্তু কাজ কিছু হয় নি। কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বস্তি রিক্লামেশন স্কীম চালু করা হয়েছিল এবং সেই অনুসারে কলকাতার কিছু বস্তি তুলে দিয়ে কম ভাড়ায় হাউসিং এস্টেট করা হয়েছিল বস্তির লোকেদের বসবাসের জন্য, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় এত নগণ্য যে তার দ্বারা আসল সমস্যার বিশেষ কোন সুরাহা হয় নি, এমন কি প্রকৃত বস্তি-বাসীও সেখানে স্থান পায় নি। যেখানে লবণ হ্রদের মত পরিকল্পিত উপনগরী তৈরি হচ্ছে, যেখানে শহরের নানা প্রান্তে নিত্য নতুন গগনচুম্বী অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে খাস কলকাতার বুকের ওপর ঘিঞ্জি বস্তিতে আলো-বাতাসহীন কক্ষে, কাঁচা নর্দমা, পাঁক ও কাদার মধ্যে ছেঁড়া চট টাঙিয়ে যেভাবে মানুষ বাস করে সেভাবে গোয়ালঘরে গরু-ছাগলও বাস করে না। কলকাতার বস্তিগুলিতে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন, অথচ মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য এই বস্তিগুলির উন্নয়ন আজও হল না। পশ্চিমবাংলার যুক্তফ্রণ্ট সরকার বস্তির ট্যাক্স হ্রাস করেছিলেন এবং বস্তি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের পথ অনেকখানি রুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এটা হচ্ছে ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করার মতন। আসল সমস্যার সমাধানের জন্য চাই বস্তির বর্তমান মানচিত্র নতুন করে অঙ্কন করা, আধুনিক শহরের উপ-যুক্ত করে বস্তির জনপদকে গড়ে তোলা। কিন্তু যে কায়েমী স্বার্থ আজও পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে তাকে আঘাত না করে এই কর্মটি সম্পন্ন হবে তো? কেন্দ্রীয় সরকার কি ততদূরে যেতে রাজী আছেন?

মাছের বাজারে আগুন

মাছের দর বৃদ্ধি পেতে পেতে

থেকে গরীব ও নিম্নমধ্যবিত্তের আহার-তালিকা থেকে মাছ কার্যতঃ বাদ হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যবসায়ীর অত্যধিক লাভের প্রবণতার ফলেই হয়েছে, যদিও মাছের পাইকারী কারবারীরা, যাদের কারসাজিতে এই অবস্থা হয়েছে, মূল্য-বৃদ্ধির জন্য মাছের সরবরাহ হ্রাসকে দায়ী করছে, বলাই বাহুল্য, যা একটি ছেঁদো কথা। তর্কচ্ছলে যদি মেনেও নেওয়া যায় যে, সরবরাহ কিছু হ্রাস পেয়েছে, তাহলেও মাছের দর দশ-বারো টাকা কিলো হবে কেন, এটা অনেকেরই বোধগম্য হচ্ছে না। অসহায় দর্শকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত গভর্নমেন্ট বলছেন যে, মাছ ধরা থেকে মাছ বিক্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মৎস্য কারবারীর হাতের মুঠোয়। মাছ ধরা বন্ধ রেখে অথবা মাছ অন্যত্র চালান দিয়ে তারা যে কোন মুহূর্তেই কৃত্রিম মৎস্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সরকারের ভাবগতিক দেখে মনে হয়, মাছের এই মুষ্টিমেয় একচেটিয়া কারবারীদের বশে রাখবার কোন ক্ষমতা তাঁদের নেই। শতকরা নব্বই জন বাঙালী মাছ খাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন, কেন না কালো টাকার মালিক ভিন্ন দশ-বারো টাকা কিলো দরে মাছ কেনার ক্ষমতা কারুর নেই। মাছ না হলেও পেটের জ্বালায় ভাত ঠিকই খাওয়া যায়, কিন্তু একটা মানুষকে সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকার জন্য কিছুটা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করলে চলে না। মাছের মূল্যে তাল রেখে স্বাভাবিক নিয়মেই মাংস ও ডিমের দর বেড়েছে, আর তা ছাড়া একটু সামান্য মাছের ঝোল রেঁধে একসঙ্গে বহু লোক খেতে পারে, যা মাংস ও ডিমে সম্ভব নয়। দুধ অগ্নিমূল্য ও ভেজালে পরিপূর্ণ, সর্বোপরি তা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। ঘি-মাখনের অবস্থাও তদ্রূপ। কাজেই শাক-চচ্চড়ি ও ডাল ছাড়া গরীব মানুষের আর কিছু খাবার নেই। কিন্তু এই রকম প্রোটিনবিহীন খাদ্যগ্রহণ যদি বরাবর চলতে থাকে, তাহলে তা কি জাতিকে পংগু করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়? এ অবস্থায় সরকারের কিছুই কি করণীয় নেই? আমাদের মনে হয় আছে। কেন না কয়েক বছর পূর্বে মাছের বাজারের ঘুঘুরা আকস্মিক দর চড়িয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত জনমতের চাপে তদানীন্তন প্রফুল্ল সেন সরকার মাছের বাজারের কয়েকজন ঘুঘুকে গ্রেপ্তার করেছিলেন পি ডি অ্যাক্টে। বর্তমান সরকার এমন ধরনের কোন ব্যবস্থা কি গ্রহণ করতে পারেন না?

শিল্প প্রসারের সুযোগ-সুবিধা

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য রাজ্য সরকার সম্প্রতি শিল্পপতি ও বৃহৎ শিল্পপতি-দের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। যে-সব শিল্প-সংস্থার মূলধন এক কোটি বা তদপেক্ষা কম সেই সব শিল্প সংস্থাই এইসব সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হবে। দশ লক্ষ হতে এক কোটি টাকা মূলধনওয়ালা কোম্পানীকে এই সব সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে, তাঁদের শিল্প-সংস্থায় অন্তত ৫০ জন কর্মচারী থাকা চাই এবং সেই কর্মচারীদের মধ্যে অন্তত পাঁচ শতাংশের ডিগ্রী অথবা ডিপ্লোমা থাকা চাই। তা ছাড়া সরকার যে বিশেষজ্ঞের তালিকা প্রণয়ন করবেন, তা থেকেও একজনকে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে নিয়োগ করতে হবে। নতুন নতুন শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা করার ব্যয় সরকার আংশিক বহন করবেন। সরকারী মালপত্র ক্রয়ের সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার তাঁদের মূলধন, জমি, ক্রয়-বিক্রয় ও কর ছাড় ইত্যাদি সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী আছেন। এই উদাম নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। মহারাষ্ট্র, গুজ-রাট, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য সরকার শিল্প-পতিদের এই ধরনের বিশেষ বিশেষ সুযোগ দিয়ে আসছেন, যার ফলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেই সব রাজ্যের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও সরকারী ঔদাসীন্যের ফলে বিগত কয়েক বছরে এই রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ কোন সম্প্রসারণ হয় নি। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নিদারুণ বেকার সমস্যা ও নানা ধরনের জটিল সামাজিক ব্যাধি। কিন্তু আমাদের মনে হয়, শুধু সুযোগ-সুবিধার লোভ দেখিয়ে মানুষকে শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত করা সহজ হবে না। অবাঙালী শিল্প-পতিরা চরিত্রের দিক থেকে ফাটকাবাজ, যে কোনভাবেই হোক অতি মুনাফার দিকে তাদের আগ্রহ, এবং যেহেতু দশ লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা মূলধন তারাই একমাত্র বার করতে পারে, তারাই এর সুযোগ নেবে, কিন্তু তাতে অন্য রাজ্যের ছেলেদের বেকার সমস্যার সমা-ধান হলেও বাংলার ছেলেদের কাজ জুটবে না। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে সর-কারী উদ্যোগেই শিল্প-সংস্থা খোলা উচিত এবং সুপরিচালিত হলে তাতে লাভ নেহাৎ কম হবে না। এ ছাড়া আরও অনেক কম মূলধনে বাঙালী ছেলেদের ছোটখাট শিল্প গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এখানে বেকার ইঞ্জিনীয়ারের অভাব নেই। তারা কাজ

জানে, কিন্তু বাজার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এদের প্রত্যক্ষভাবে যদি সরকার গাইড করেন, তবেই সমস্যা মেটে। তাদের মূলধন ও যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করতে হবে, এবং কিসের কারখানা করতে হবে, কোথায় মাল বেচতে হবে, এইগুলি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বিভিন্ন সংস্থার তদারকির জন্য সরকারী উপদেষ্টা থাকা দরকার। এ ছাড়া ছোট ছোট শিল্পকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে, সেগুলিকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন পশ্চিমবাংলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া এবং বিদ্যুতের দাম কম করা। নচেৎ সরকারী প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হওয়াও অসম্ভব নয়।

দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে, কেন না এই কারখানায় যে পরিমাণ উৎপাদন হতে পারে এখন তার মাত্র তিরিশ শতাংশ উৎপাদিত হচ্ছে। গত মে মাসে এই কারখানায় ৯৮ হাজার মেট্রিক টন ইস্পাত তৈরি হবার কথা ছিল, কিন্তু সে জায়গায় তৈরি হয়েছে ৫২ হাজার মেট্রিক টন। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই কারখানাকে লোকসান দিতে হয়েছে ১৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এভাবে চলতে থাকলে প্রায় তিন শ' কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই কারখানার সমূহ সর্বনাশ হতে আর দেরি নেই। কারখানার বর্তমান দুর্দশার কারণ নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কেউ কেউ উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদেরই দায়ী করছেন, আবার কেউ বলছেন পরিচালনা ও কর্তৃপক্ষের দোষেই এই অবস্থা হয়েছে। আমাদের মনে হয় দু' তরফের কোন তরফই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সংকটের মুখে পতিত হবার একটি প্রধান কারণ সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একই ইউনিয়নের ভিতর উগ্রপন্থীদের চাপের সামনে অন্যদের নতি স্বীকার এবং সাধারণভাবে কর্মীদের উচ্ছৃংখলতা। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষও দুর্নীতি ও ব্যভিচারে ভরপুর, অপদার্থ আমলাতান্ত্রিকতার চাপে বিপর্যস্ত এবং তাদেরও দায়িত্ব এই অধঃপতনের মূলে বড় কম নয়। শুধু ইস্পাত কারখানা নয়, সমগ্র দুর্গাপুর উপনগরীই আজ একটা বিস্ফোরক অবস্থায় উপনীত হয়েছে, এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যে তাঁদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছেন তা বলা যায় না। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবিরোধী একটি লবী পার্লামেন্টে আছে এবং দুর্গাপুরের অবনতির এই সুযোগ নিয়ে তারা দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা বন্ধ করে দেবার দাবি তুলছে। এদিকে দুর্গাপুরে উপনগরীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, ইস্পাত কারখানা সহ লাগাতার ধর্মঘটের সূত্রপাত হয়েছে, এবং কার্যত সেখানে যে কি হচ্ছে এখান থেকে তার স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যাচ্ছে না। আজকের পশ্চিমবঙ্গের সংকটময় জীবনে দুর্গাপুরে বৃহত্তম সংকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এখন যত শীঘ্র পারা যায় কেন্দ্রীয় সরকার যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারেন, পরিচালনার গলদ এবং শ্রমিকদের শৃংখলাহীনতার কারণগুলি দূর করতে না পারেন, তা হলে শুধু দুর্গাপুর কেন, এদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত যে কোন শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে বাধ্য।

ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকারের রসায়ন ও পেট্রোলিয়াম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন কিছুকাল ধরেই ঔষধের দাম কমানোর জন্য চেষ্টা করছেন এবং সেই মর্মে একটি আইনও পাশ হয়েছে যার ফলে কয়েকটি বিশেষ ধরনের ঔষধের দাম প্রস্তুতকারকেরা কমাতে বাধ্য হয়েছে। দেখানো হয়েছিল যে, ওই সব ঔষধের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় অযৌক্তিকভাবে ঔষধ নির্মাতারা দাম বেশি ধার্য করে এতাবৎকাল অকল্পনীয় মুনাফা ভোগ করে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, টেরামাইসিন সিরাপের খুচরো দাম ইউনিট পিছু সাড়ে ছ' টাকা হলেও খুব বেশি দাম নেওয়া হয়, কিন্তু আগে তা সাড়ে দশ টাকা দামে বিক্রি হত। সরকারী নির্দেশনামার ফলে বাধ্য হয়ে ঔষধ নির্মাতারা নির্দিষ্ট ঔষধগুলির দাম কমিয়েছে। কিন্তু অত সহজে এ দেশের উৎপাদকেরা হৃদয় পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধী হয়ে যাবে সেটা আশা করাই ভুল হয়েছিল। ফলে দেখা গেল, সরকার যে ঔষধগুলির দাম কমাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলির দাম কমানো হল ঠিকই, কিন্তু বাকিগুলির দাম ওই একই সঙ্গে দ্বিগুণ করে দেওয়া হল। পৃথিবীর কোন দেশে ঔষধের দাম ভারতের মত এত বেশি নয়, এটা বুঝেই এবং দেশবাসীর দারিদ্র্য ও ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করেই দাম কমানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন ফল হল উল্টো। কার্যত সমস্ত ঔষধেরই দাম বেড়ে গেল, বরং দ্বিগুণ হয়ে গেল, সরকার কর্তৃক ঘোষিত কয়েকটি স্পেসিফায়েড ড্রাগ ছাড়া। আমাদের জিজ্ঞাস্য, সরকার কেন এখনো এই ঔষধ প্রস্তুতকারকদের সমাজবিরোধী হিসাবে গ্রেপ্তার করছেন না? কেন সরকার তাদের এই আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য কৈফিয়ৎ তলব করছেন না? এরা পয়সাওয়ালা ও সমাজের ওপরতলার লোক বলেই কি পার পেয়ে যাবে? আর দেশের গরীব মানুষদের সস্তায় ঔষধ দেবার নামে কি এইভাবে প্রবঞ্চিত করা হবে?

আফ্রো-এশীয় লেখক প্রস্তুতি সম্মেলন

আফ্রো-এশীয় লেখক আন্দোলনের চতুর্থ সম্মেলন নভেম্বর ১৯৭০-এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা আগামী ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী এক প্রস্তুতি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মধ্যে এই সম্মেলনকে নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। বিশিষ্ট কবি-লেখক-সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি সমিতিও গঠিত হয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আফ্রো-এশীয় লেখকদের বিভিন্ন সমস্যা, সমসাময়িক বিশ্ব বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত প্রস্তুতি কমিটি গ্রহণ করেছেন।

প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, সম্পাদক শ্রীচিন্মোহন সেহানবিশ, শ্রীগোলাম কুদ্দুস ও শ্রীমণীন্দ্র রায় এই সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্যে সাহিত্যরসিক জনসাধারণের কাছে এই সম্মেলনের সদস্য বা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হয়ে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সম্মেলনের সদস্য চাঁদা দু' টাকা ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য চাঁদা পাঁচ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সকলকে ১৪৪, লেনিন সরণী, কলকাতা—১৩ এই ঠিকানায় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে যোগাযোগের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

স্বাধীনতার ২৩ বছর পূর্তি

গত ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তেইশ বছর পূর্ণ হল। দেশের সর্বত্র সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে এই তিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ডঃ গিরি এক বেতার ভাষণে বলেছেন যে, জাতি আজ বেকারী ও দারিদ্র্যের দুষ্টগ্রহের দ্বারা আচ্ছন্ন। বিগত ২৩ বছরে ভারতের বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও বেকারী আর দারিদ্র্য এখনও শিকারী কুকুরের মত জাতিকে অনুসরণ করছে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে সকলের জন্য কাজের সংস্থান এবং দ্রুত বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিনাশক শক্তিগুলো দারিদ্র্য এবং সামাজিক অবিচার থেকেই জন্মলাভ করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্য এবং ক্লেশের উপর স্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। তার ফলে শুধু সৃষ্টি হয় পারস্পরিক ঘৃণার। ঘৃণাই হিংসার জনক।

তিনি আশা করেন যে, বাস্তবভিত্তিক এবং গঠনমূলক পদ্ধতিতে বেকারী সমস্যার সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। আন্তরিকতার সঙ্গে দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা হলে রাজনৈতিক জীবনে সমাজবিরোধী শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ হবে।

কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ডঃ গিরি বলেছেন যে, আদর্শগত মতপার্থক্য থাকলেও কঠোর পরিশ্রম ছাড়া জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। একমাত্র কঠোর পরিশ্রমই সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সাম্য আনতে পারে।

রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার মত সাহস প্রশাসন কর্তৃপক্ষের থাকা উচিত। তাদের যেমন বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে হবে, তেমনি ক্ষেত-খামার আর কারখানায় কর্মরত মানুষগুলির কল্যাণের জন্যও কাজ করতে হবে।

জনগণকে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ডঃ গিরি তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

স্বাধীনতার ২৩ বছর বাদে ভারতের চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে, তার কয়েকটি তথ্য এখানে দেওয়া হচ্ছে ঃ —

(১) ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, সেটা আমরা এখন কাটিয়ে উঠেছি। ১৯৬৮ সালে ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৪·৯ শতাংশ এবং ১৯৬৯ সালে ৬·৯ শতাংশ। কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পণ্যমূল্যও ক্রমবর্ধমান। ১৯৬৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৭০ সালের মে মাসের মধ্যে পণ্যমূল্য বেড়েছে ৭ শতাংশ। বাজারে পণ্যের তুলনায় মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধিই তার কারণ। উল্লিখিত সময়ে বাজারে মুদ্রার সরবরাহ বেড়েছিল ১৪ শতাংশ হারে।

(২) "ইকনমিক টাইমস্" পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পণ্যের পাইকারী মূল্য ৭১·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ সালের এক টাকার দাম কমে এখন ৫৮ পয়সায় এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ ১৯৬১ সালে ৫৮ পয়সা দিয়ে যে পণ্য কিনতে পাওয়া যেতো, সেটা এখন এক টাকা দিয়ে কিনতে হয়।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক ও অসামরিক কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৩০ হাজার। রাজ্য সরকারগুলোর কর্মচারীর সংখ্যা ৩৯ লক্ষ, আধা সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোয় কর্মচারীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তাদের যদি মাথাপিছু এক টাকা করেও মাইনে বাড়ানো হয়, তাহলে বছরে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

(৪) এক বছর আগে রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষায় ধরা পড়েছিল যে দেশে বকেয়া বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। তার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। এই ৫০ লক্ষের মধ্যে বেকার ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ৬০ হাজার। ৪র্থ পরিকল্পনার শেষে বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বছরে আরও ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোক চাকরির সন্ধানে বাজারে আবির্ভূত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২৪,৮৮২ কোটি টাকার পরিকল্পনা যদি পুরোপুরি কার্যকর হয়, তাহলে পাঁচ বছরে বড় জোর ১ কোটি ৪০ লক্ষ নতুন চাকরির পদ সৃষ্টি হতে পারে। তার অর্থ ১৯৭৪ সালের শেষে দেশে বকেয়া বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ৭০ লক্ষ। রাষ্ট্রপতি ডঃ গিরি সম্প্রতি "জবস্ ফর দি মিলিয়নস্" (লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য চাকরি) বইতে লিখেছেন, বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা ৫ কোটি এবং আধা বেকারের সংখ্যা ১০ কোটি।

(৫) ৩রা আগস্ট লোকসভায় পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী ৩০শে এপ্রিল ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৬৮৩ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে ঋণ পরিশোধ বাবদ আসল খাতে আমরা ৯৭·০৬ কোটি টাকা খরচ করেছি আর সুদ খাতে করেছি ৯৮·৫ কোটি টাকা। এই সব ঋণ বৈদেশিক মুদ্রায় শোধ করতে হয়েছে। এ ছাড়া পণ্য রপ্তানি করেও গভর্নমেন্ট আসল খাতে ৬০·৭ কোটি এবং সুদ খাতে ১২·৩ কোটি টাকার ঋণ শোধ করেছেন। এ বছর ঋণ শোধ বাবদ আসল খাতে ১৮৫·৭৭ কোটি ও সুদ খাতে ১৬৫·৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। গত তিন বছর আমরা গড়ে ১০ কোটি ডলার করে বৈদেশিক ঋণ লাভ করেছি। অর্থাৎ এখন আমরা বৈদেশিক ঋণ বাবদ যে টাকাটা পাচ্ছি, তার চেয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য আমাদের অনেক বেশি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।
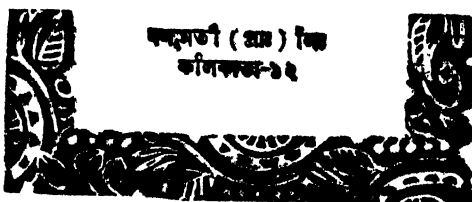
(৬) উপরের চিত্র দেখে মনে হবে দেশের লোকের অবস্থা খুবই কাহিল। কিন্তু সত্যিই কি তাই? গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মীর ঘোড়দৌড় মাঠে জ্যাকপট খেলায় মোট ৬৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। (নির্দিষ্ট পাঁচটি রেসের ফলাফল নির্দিষ্ট করার জুয়া খেলা)। এই টাকার ট্যাক্স ও কমিশন আদায়ের পর জুয়াড়ীদের প্রাপ্য দাঁড়ায় ৪৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। ৪ জন জুয়াড়ী সেই টাকাটা পেয়ে গেছেন। জ্যাকপটের খেলা ভারতের সর্বত্রই হচ্ছে এবং তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি সপ্তাহে উড়ে যাচ্ছে। এ টাকাটা আসছে কোত্থেকে?

বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে লটারী চালু করেছেন তাতে গত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৪৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। তার মধ্যে ২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে প্রাইজে এবং অন্যান্য খরচে। আর রাজ্য সরকারগুলো পেয়েছেন বাকী টাকাটা। তার মধ্যে একমাত্র তামিলনাড়ুই পেয়েছে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, মহারাষ্ট্র ১০ কোটি টাকা।

(৭) সম্প্রতি রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রী চ্যবন ঘোষণা করেছেন যে, ভারতে বছরে একশ' থেকে দেড়শ' কোটি টাকার চোরাই চালানের কারবার হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা চোরাই চালানের পরিমাণ হাজার কোটি টাকার কম নয়। গত ১২ই জুলাই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বলা হয় যে, ১৯৭০ সালের মে মাস পর্যন্ত এক বছরে ২৪ কোটি টাকার চোরাই মাল (বিদেশ থেকে চোরাপথে আমদানী) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত চোরাই মালের মধ্যে আছে সোনা, ঘড়ি, সিন্থেটিক সুতো এবং কাপড়। বাজেয়াপ্ত চোরাই সোনার দামই সাড়ে ৫ কোটি টাকা। চোরাই চালানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৩০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যারা এই চোরাই মাল কিনছে, তাদের হাতে নিশ্চয়ই অঢেল পয়সা আছে।

(৮) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী গ্রামের ৫২ শতাংশ মানুষ এবং শহরের ৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যের সর্বনিম্ন স্তরে বাস করেন। অর্থাৎ তাঁদের ভোগের স্তর শূন্য থেকে ১৫—১৮ টাকা (মাসিক) মাত্র দৈনিক পঞ্চাশ পয়সায় যে একটা পেট ভরবার মত কোন খাদ্যই কিনতে পাওয়া যায় না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ওয়ালটার শিল্ আন্দ্রে গ্রোমিকোকে (ডান দিকে) শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন :

১২ই আগস্ট মস্কোতে ঐতিহাসিক রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন এবং পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তিতে একটি প্রস্তাবনা সহ পাঁচটি ধারা রয়েছে। চুক্তিতে উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছেন, পারস্পারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেবে না। কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। সকল প্রকার বিরোধ আপস-আলোচনার দ্বারা মেটানো হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া উভয় পক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে, য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বর্তমান সীমানা তারা মেনে চলবে।

অনাক্রমণ চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়েছে, পশ্চিম জার্মানী একটি পৃথক বিবৃতি দিয়ে দুই জার্মানীর একীকরণের প্রস্তাবে তাদের সমর্থন পুনরায় ঘোষণা করবে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন এতে আপত্তি করবে না। তাছাড়া এই চুক্তিকে শান্তি চুক্তিরূপে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা হল, এমন মনে করা হবে না। পশ্চিম জার্মানী পৃথকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেনকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিম জার্মানীতে তাদের যেসব অধিকার রয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিম জার্মানীর বিগত সাধারণ নির্বাচনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টিকে পরাজিত করে উইলি ব্র্যান্ডের সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও ওয়ালটার শিলের ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি জয়লাভ করে সরকার গঠনের পর থেকে পশ্চিম জার্মানীর রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড সোভিয়েট য়ুনিয়ন সহ পূর্ব জার্মানী ও অন্যান্য পূর্ব য়ুরোপীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। তীব্র মনোমালিন্য সত্ত্বেও ব্র্যান্ড নিজে পূর্ব জার্মানী গিয়ে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানকার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মস্কোতে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হয়েছে।

গত মাসে এই আলোচনা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। একটি চুক্তির খসড়া পাকা করার জন্য পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালটার শিল্ মস্কো যান এবং সেখানে সোভিয়েট য়ুনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকোর সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত কিছু পরিবর্তনের পর চুক্তির খসড়া উভয় পক্ষ গ্রহণ করে।

অনাক্রমণ চুক্তি পশ্চিম জার্মানীর মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে এবং স্থির হয়, চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড মস্কো যাবেন আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য। ওয়ালটার শিল্ এই চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, "আমাদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।" আন্দ্রে গ্রোমিকো বলেন, "আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোড় ঘুরল।"

সত্যি, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পঁচিশ বৎসর পর জার্মানীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

মহাযুদ্ধ শেষে জার্মানীর বিভক্তিকরণ ও বার্লিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে য়ুরোপে প্রথম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে তার যুদ্ধকালীন মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের তীব্র মতবিরোধ হয়। জার্মানী থেকে য়ুরোপ এবং য়ুরোপ থেকে সমগ্র বিশ্বে ঠাণ্ডা বা 'কোল্ড ওয়ার' ছড়িয়ে পড়ে।

দুই জার্মানীর মধ্যে পূর্ব জার্মানী কমিউনিস্ট শাসনে পরিচালিত হয় এবং জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী বা জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পাশ্চিমীদের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে যুদ্ধনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। 'ন্যাটো' সামরিকচক্রের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। এখানে প্রাক্তন নাৎসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভয় হয়, আবার হয়তো জার্মানীকে কেন্দ্র করে নতুন বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবে। কনার্ড আদেনুর ও জর্জ কিসিংগার পশ্চিম জার্মানীকে এই দিকেই ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উইলি ব্র্যান্ড চ্যান্সেলার হয়ে রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেন।

আজ যদি দুই জার্মানীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়, পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা হলে য়ুরোপের উত্তেজনার বারো আনা কারণ দূর হবে।

বার্লিন সমস্যার সমাধানের জন্যও ইতিমধ্যেই আলোচনা সুরু হয়েছে। মস্কোতে ওয়ালটার শিল্ ও আন্দ্রে গ্রোমিকোর মধ্যে এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। উইলি ব্র্যান্ড বার্লিন প্রশ্নে সোভিয়েট য়ুনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে চতুঃশক্তি আলোচনার প্রস্তাব করেছেন। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে এই আলোচনা সুরু হবে।

য়ুরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের প্রস্তাবও হয়েছে। গত বৎসর প্রথমে সোভিয়েট য়ুনিয়ন এই প্রস্তাব করে। য়ুরোপের সকল রাষ্ট্র এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে য়ুরোপের নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এই সম্মেলনে যোগদান করে, তাহলেও সোভিয়েট য়ুনিয়নের আপত্তি নেই। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এই য়ুরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে।

'ন্যাটো' ও ওয়ারশ গোষ্ঠী, উভয় পক্ষের মধ্যে অস্ত্র ও সৈন্য হ্রাসের আলোচনাও নিশ্চয়ই সুরু হবে। বর্তমানে জার্মানীর দুই দিকে 'ন্যাটো' ও ওয়ারশ গোষ্ঠীর সৈন্যরা প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অনাক্রমণ চুক্তির ফলে এই দুই পক্ষের যুদ্ধের মনোভাব যদি কমে, তবে তা সব দিক দিয়েই লাভজনক হবে।

সুতরাং সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে স্বাক্ষরিত মস্কো চুক্তি য়ুরোপ তথা বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনা প্রশমনের বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যদি একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয়, তা হলে য়ুরোপের রাজনীতি আবার প্রাধান্য পাবে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে য়ুরোপ নতুন করে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে। য়ুরোপের রাজনীতিতে মার্কিন প্রভাবও এর ফলে বিশেষভাবে হ্রাস পাবে। দুই জার্মানীর পক্ষেই রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করা সহজ হবে।

পশ্চিম জার্মানীর পরবর্তী প্রচেষ্টা হবে পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা। ওডার নিসে সীমান্তের প্রশ্নে পশ্চিম জার্মানী ও [illegible] বিরোধ রয়েছে, পশ্চিম জার্মানী তা মিটিয়ে নেবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করবে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কের প্রসারের জন্য পশ্চিম জার্মানী বিশেষ উৎসাহী। কমিউনিস্ট দেশগুলির উৎসাহও এ ব্যাপারে কম নয়। মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিশেষ অবদান রয়েছে।

অবশ্য এখনও সমস্যা অনেক। পশ্চিম জার্মানীর আইনসভা বাণ্ডেস্টাগের দ্বারা চুক্তি অনুমোদন করাতে হবে। বাণ্ডেস্টাগে উইলি ব্রাণ্ডের কোয়ালিশন সরকারের মাত্র ১২ জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। বিরোধী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি এই চুক্তির ঘোরতর বিরোধী। জার্মান প্রথা অনুসারে খসড়া চুক্তি আলোচনার সময় জার্মান প্রতিনিধিদলে বিরোধী দলের সদস্য থাকার কথা। কিন্তু, এই চুক্তি আলোচনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না বলে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রতিনিধিদলে যোগ দেয় নি। তারা প্রস্তুত হচ্ছে সর্বশক্তি দিয়ে একে বাধা দেবার জন্য।

জার্মান ঐক্য ও পূর্ব জার্মানীর [illegible] জার্মানী এখনও একীকরণের প্রস্তাব ছাড়ে নি। পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করবে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবে, কিন্তু কূটনৈতিক স্বীকৃতি সহজে তাকে দিতে চাইবে না, এই হল পশ্চিম জার্মানীর মনোভাব।

কিন্তু, এদিকে আবার রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব জার্মানীর কমিউনিস্ট প্রধান ওয়াল্‌টার উল্‌ব্রিখ্‌ট্‌ 'ন্যাটো'ভুক্ত সকল রাষ্ট্র-প্রধানের কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন, পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁরা পূর্ব জার্মানী অর্থাৎ জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিন।

কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও, পশ্চিম জার্মানী এখনও পশ্চিমী গোষ্ঠীর সঙ্গে তার পূর্ব সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করবে। চুক্তি স্বাক্ষর করার পূর্বে তাই উইলি ব্রাণ্ড মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ও ফরাসী রাষ্ট্রপতি জর্জ পাম্পিদুকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্ক ঠিকই থাকবে।

(১৬-৮-৭০)

কার ছিপে উঠবে ?
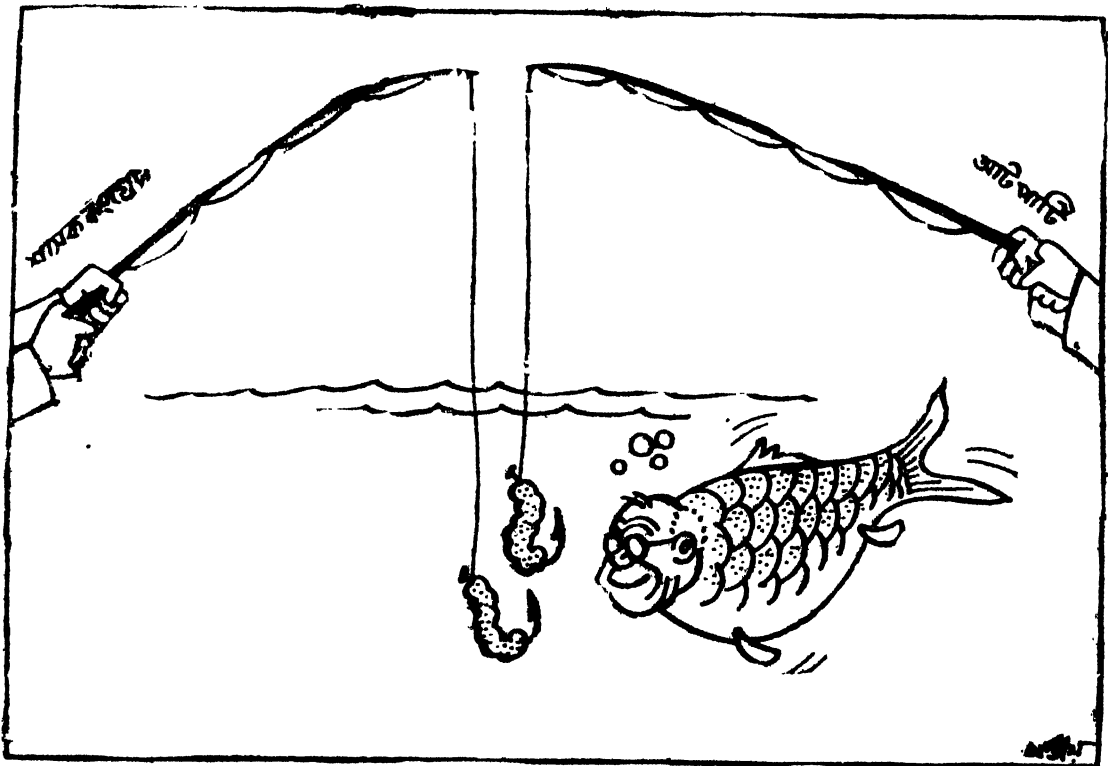
কিন্তু তার পর কি হবে? এই প্রশ্নের জবাব—এক কথায় সামরিক শাসন। তবে সামরিক শাসন বাস্তব-সম্মত না হলে সমগ্র রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দেওয়া। আমার তার পর কি হবে এই প্রশ্নের জবাবে পশ্চিম-বঙ্গে আগামী দিনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা বা সামরিক শাসনের কথা যিনি বললেন, তিনি কোন হেলাফেলার লোক নন বা কোন বে-হিসাবে বে-ওজনের কথা বলার মানুষ নন। কথাটা শুনবার পর বারে বারে রাজ্যের পরি-স্থিতি ও আগামীদিনের সম্ভাব্য রাজ-নৈতিক চিত্রটি চোখের উপর মেলে ধরেছি এবং এক সময় নিজের মনেই প্রশ্ন এসেছে—তাহলে এর পর কি আমাদের জন্য একমাত্র সামরিকবাহিনীর হাতকড়া অপেক্ষা করছে? কিন্তু দেখা গেল সপ্তাহখানেক আগে থাকতে যে প্রশ্ন ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমি বিড়ম্বিত রাজ্যের প্রভাবশালী রাজ-নৈতিক নেতা শ্রীসুশীল ধাড়া সেই কথাটা খোলাখুলি বলে দিয়েছেন। শ্রীধাড়া বলেছেন—রাজ্যের পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তে আনতে রাজ্যের পুলিশ যথেষ্ট নয়। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলার দরকার হলে মিলিটারী ডাকতে হবে। শ্রীধাড়াকে ধন্যবাদ—যে কথাটা উচ্চারণেও মন ভয় পাচ্ছিল, সেই কথাটা তিনি স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পেরেছেন। কিন্তু শ্রীধাড়া মশায়কে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, তার পর কি হবে? অর্থাৎ মিলিটারী ডাকা হল, মিলিটারী রাজ্যের আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব নিল, রাইটার্স-লালবাজার-এণ্ডারসন হা উ স, লর্ড সিংহ রোড—সব কিছুর ওপরে বসলেন জেনারেল অরোরা বা জেনারেল পাণ্ডা, কিন্তু তার পরও তো প্রশ্ন থাকে। তার তো জবাব চাই, সেই প্রশ্ন হল—মিলিটারীর পরে কি?

যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠনকালে শ্রীধাড়া মনে করেছিলেন দলের মুখ্যমন্ত্রী না হলে মন্ত্রিসভা গঠন করা অর্থহীন, মন্ত্রিসভা চালানো অসার। সি-পি-এম'কে মুখ্যমন্ত্রিত্ব না দিয়ে সেটা বাংলা কংগ্রেসকে দেওয়া উচিত ও দরকার। অবশ্য এই কথা সত্য গত যুক্তফ্রণ্টের যে কম্বিনেশন ছিল এবং গত যুক্ত-ফ্রণ্টের যে সব পরিস্থিতি ছিল, তাতে বাংলা কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রিত্ব চাইবার দরকার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্ব পাওয়া ছিল নন-কণ্ট্রোভারসিয়াল্ এবং স্বাভাবিক ঘটনা। স্বাভাবিক ঘটনা এই কারণে যে, তখন সকলেই জানতেন ও মনে করতেন বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সমস্যা মোকাবিলা সহজ হবে। তাই ৮৩ জন এম-এল-এ'র পার্টি সি-পি-এম মুখ্যমন্ত্রিত্ব দাবী করার কোন অবকাশ পেল না, মুখ্যমন্ত্রিত্ব পেল ৩৩ জনের পার্টি বাংলা কংগ্রেস। স্বরাষ্ট্র দপ্তরটিও সি-পি-এম'কে পেতে হল অনেক কাকুতি-মিনতি, ধর্ণা ও সংকট সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মন্ত্রিসভা গঠিত হল, চলতে লাগলো, কিন্তু এই সময় প্রশ্ন উঠলো,—না; সব কিছু গোলমাল হচ্ছে এই কারণে যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর রয়েছে সি-পি-এম'এর হাতে। সি-পি-এম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সুযোগ নিয়ে সব কিছু তছনছ করে দিচ্ছে। তাই মন্ত্র পড়লেন, পরে দাবী উঠলো সি-পি-এম তথা শ্রীজ্যোতি বসুকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে হটালেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু যখন দেখা গেল সেইখানে অনেক বাধা, তখন বাংলা কংগ্রেস মনে করলো মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়াই হল একমাত্র সমাধান। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস সি-পি-এম'কে শায়েস্তা করতে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে গেল। মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল। কেউ কেউ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—বাঁচা গেল, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সি-পি-এম'এর হাতে আর নেই, রাজ্য-পালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন চলবে। এইবার শান্তি আসবে, সি-পি-এম শায়েস্তা হবে। কিছুদিন পরে আবিষ্কার হল—না, শান্তি তো আসছে না, তাহলে কি হবে? এইখানেও বাংলা কংগ্রেস দ্রুত দাবয়াই আবিষ্কার করলো। সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভার পর বলা হল—সি-পি-এম'এর তাঁবেদার কিছু আমলা রয়ে গেছেন অর্থাৎ শ্রীজ্যোতি বসু গেছেন, কিন্তু শ্রীবসু যাঁদের দিয়ে কাজ করাতেন, তাঁরা রয়ে গেছেন—অতএব হঠাও আমলা। বাংলা কংগ্রেস থেকে বেশ কিছু আমলার নাম দিল্লী গেল। এর পর একদিন মহাকরণ থেকে শ্রীমুস্তাক মুর্শেদ, শ্রীএস বি রায় বিদায় নিলেন। এইবার আর একবার

স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। হ্যাঁ, এতদিনে দাওয়াই পাওয়া গেছে—শ্রী এস বি রায়, শ্রীমুর্শেদ চলে গেছে, অতএব এইবার শান্তি।

কিন্তু হায়, কিছুদিন পর দেখা গেল যে তিমিরে সেই তিমিরে। তখন বলা হল, বোলাও সি-আর-পি। পুলিশ পারছে না, ভিন রাজ্যের পুলিশ আর সি-আর-পি এসে সব ঠান্ডা করে দেবে। এল সি-আর-পি, এল আরো কতরকমের পুলিশ। রাজ্যের পুলিশকে কতরকমে কতভাবে সাজানো হ'ল—শক্তিশালী করা হ'ল, কত চটকদার নামের সেল তৈরি হ'ল, কত ওলট-পালট বদলী হ'ল। রাজ্যের মানুষের প্রতি পাঁচজনের মাথাপিছু একজন করে পুলিশ বা তার সমধর্মী নিয়োগ করা হ'ল। কিন্তু সকলি গরল ভেল। এখন দেখা যাচ্ছে সেই পুলিশ আর সি-আর-পি দিয়েও কাজ হচ্ছে না।

তাই শ্রীসুশীল ধাড়ার প্রস্তাব—পুলিশ যথেষ্ট নয়, দরকার হলে মিলিটারী নিয়োগ করতে হবে। আমার প্রশ্ন এই-খানে—মিলিটারীও না হয় এল, তারপর কি হবে? মিলিটারীর বেয়নেট-বন্দুকও যদি অভীপ্সিত শান্তি না আনতে পারে, তাহলে কি হবে? এমন কথা তো সত্য নয় যে, রাজ্যের পুলিশ ও সি-আর-পি'র বন্দুকের নল দিয়ে রসগোল্লা বের হয়, আর মিলিটারীর বন্দুক দিয়ে গুলী, ছর্‌রা বের হবে! এখন না হয় প্রতি পাঁচজনে পুলিশ আছে, তখন না হয় প্রতি তিনজনে পুলিশ ও মিলিটারী হবে—কিন্তু তাতেও শান্তি না আসলে কি হবে? কই শান্তি তো আসে নি মন্ত্রিসভা ভেঙে বা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের পদত্যাগে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সি-পি-এম'এর হাতছাড়া করে, শান্তি তো আসে নি মুস্তাক মুর্শেদ আর এস বি রায়কে সরিয়ে বা শ্রী পি কে সেনের অবসরে, শান্তি তো আসে নি সি-আর-পি আমদানী করে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স আমদানী করে, তবে? কোথায় ভরসা শান্তি আসবে মিলিটারী এনে—মিলিটারী বসিয়ে? এই আমার প্রথম প্রশ্ন—বাংলা কংগ্রেস তথা তার নেতা শ্রীসুশীল ধাড়ার কাছে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সি-পি-এম দল তথা তার নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে। সেই প্রশ্নও এই একই প্রশ্ন—সে হ'ল সমগ্র রাজ্য আজ কয়েদখানায় পরিণত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ আজ কয়েকজন বৃদ্ধ সুজনী ও জীবনশক্তিহীন মানুষের হাতে, রাজ্য আজ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা কলোনীতে পরিণত হয়েছে এবং আগামী দিনে সামরিক আইন ও শাসনের আওতায় যাবার পথে চলেছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য দায়ী কে? এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির দায়িত্ব কে নেবে? রাজ্যের সর্ববৃহৎ দল, সর্ববৃহৎ সংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সি-পি এম তার অগণিত সংগঠনশক্তি যে পথে পরিচালিত করছে, সেই পথে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, না অপহরণের সহায়ক হচ্ছে? সি-পি-এম দলের কাজে বাংলা দেশের মানুষের হাতের শিকল ভাঙছে, না আরও জোরদার করে শিকল পরাবার ছল সৃষ্টি হচ্ছে?

। পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।

॥ চার ॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের শাসক পার্টি বর্তমানে যে ঐতিহ্যের অধিকারী, সেটা কিছু গৌরবময় নয় এবং সাম্প্রতিককালেও কোন গৌরবময় নজীর সৃষ্ট হয় নি। পক্ষান্তরে, বামপন্থী আন্দোলন, আমরা যা দেখলাম, এখনো সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাবালকত্ব অর্জন করে নি। আর এর মাঝামাঝি বিশেষ করে উত্তর ভারতে, একটি চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট শিবিরের অভ্যুদয় ঘটছে। অথচ এদিকে হিমালয়-প্রমাণ সমস্যা এবং তা সমাধানের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। এ বিষয়টা ঠিক একটা সরকারের বদলে আর একটা সরকার হলেই মিটছে না, অথচ নেতৃত্ব এমনই কথ্যা যে, মিটবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সর্বরোগহর দাওয়াই হিসাবে সমাজতন্ত্রের কথা মুখে আওড়ানো হয় বটে, কিন্তু শুধু তো কথাতেই চিঁড়ে ভেজে না। যে জিনিসটা কার্যে পরিণত করার স্লোগান দেওয়া হচ্ছে, আসলে নেতৃবৃন্দের সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই, বা ধারণা থাকলেও সত্যকারের কর্মক্ষেত্রে সেই আদর্শকে রূপ দেবার কোন মতলবই শাসকবর্গের নেই।

আসলে এই গোঁজামিলটা দীর্ঘকাল ধরে দিয়ে আসা হচ্ছে বলেই জীবনের সর্বস্তরে উন্নতির লক্ষণ তো দূরের কথা, হতাশা ও দুর্যোগকেই দিনের পর দিন আহ্বান করা হচ্ছে। যেখানে দেশ সম্পর্কে নেতাদের কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নেই, সেখানে ভাঙন যে অবধারিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যেখানে নেতৃত্ব দূরদৃষ্টিহীন, যেখানে কোন্ কাজের কোন্ ফল হতে পারে, সেটুকু বোঝার ক্ষমতা পর্যন্ত নেতাদের নেই, সেখানে যে দেশ এখনো খণ্ড খণ্ড হয় নি, এটাই আশ্চর্য। নেতৃত্বকে বজায় রাখতে গিয়ে কিছু অল্পবুদ্ধি ক্ষমতা-লোভী মানুষ ন্যক্কারজনকভাবে বিচ্ছিন্নতা-কামী মনোভাবসমূহকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। সম্পূর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাদ্রাজে সরকার চলছে. পাঞ্জাবের রাজনীতি এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে. অন্ধের অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে একদা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বৃহৎ অন্ধের ডাক দিয়েছিল। সেই শ্লোগান উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধের ধাক্কায় আত্মগোপন করেছে। স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে ঘর শুধু ভাঙছে, গড়ছে না।

॥ পাঁচ ॥

নিছক নিন্দা করাই আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছি যে, একটি ঘুণধরা নেতৃত্বের কবলে এ দেশটা গোল্লায় যেতে বসেছে, অন্ধকার ও হতাশার গাঢ় মেঘ সকল দিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিটি কার্যেরই সমান ফল আছে। দেশজোড়া যে হতাশা, তা ঠিক বিরুদ্ধ ফল প্রসব করে চলেছে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপে। একে ঠেকানোর কোন ক্ষমতা বর্তমান সরকারের থাকতে পারে না, কেন না, যে পরিস্থিতি উগ্রপন্থার সৃষ্টি করেছে বা অনিবার্য নিয়মে করে যাবে, তাকে বদলানোর ক্ষমতা বর্তমান সরকারের নেই, বদলে ভিন্ন সরকার এলেও সম্ভবপর নয়, ডিক্টেটরশিপও অচল, মিলিটারী শাসনও নিষ্ফল, কেন না, সর্বস্তরে ঘুণ ধরেছে।

অথচ এও সত্য কথা যে, এমন কোন সমস্যা নেই যা সমাধানের অতীত। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছি, সমাধানের কোন প্রচেষ্টা নেই, আজও যেখানে ক্ষমতার স্বার্থে শিবসেনাদের মত শক্তিদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতাকে উস্কানী দেওয়া হয়, সেখানে দেশের সমস্যা সমাধানের কোন সৎ মতলব শাসকদের মধ্যে আছে, তা বিশ্বাস করার পক্ষে কোন যুক্তিই নেই।

॥ ছয় ॥

পক্ষান্তরে বামপন্থী শক্তিগুলির কিছু করণীয় ছিল, অন্তত পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে, যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পটপরিবর্তন করতে পারত বলে আমার ধারণা। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক বামপন্থী দলগুলি গাছে ওঠার আগেই এককাঁদি পেতে চাইলেন এবং তার চূড়ান্ত ফল বামপন্থী শক্তিগুলির দ্বিধাবিভক্তি। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন তাঁদের সামনে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছিল। প্রত্যেকটি বামপন্থী দলই যে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে কিছুটা চাইবেন, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু তারও একটা নিয়ম আছে। প্রত্যেকেই অতি বাড় বাড়তে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের পতনের মূলও সেখানে। এঁরা শুধু যুক্তফ্রন্টকেই ধ্বংস করেন নি, বামপন্থী আন্দোলনকেও কয়েক যুগ পিছিয়ে দিয়েছেন।

১৯৭০ পর্যন্ত এই হচ্ছে সর্বভারতীয় চিত্র এবং এ চিত্র নিছক হতাশার। ভারতে বর্তমানে একমাত্র প্রয়োজন আমূল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং সেটা দুরূহ হলেও কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে এ দায়িত্ব কে নেবে, কারা নেবে?

॥ সাত ॥

একটা সংগত প্রশ্ন অনেকেই তুলতে পারেন : অতীত দিনের তিক্ত বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের আদ্যশ্রাদ্ধ করলেই কি আর সমস্যার সমাধান হবে? কোন্ যাদুমন্ত্র-বলে এই বিরাট দেশের পর্বতপ্রমাণ সমস্যাসমূহের সমাধান হবে তা আমার জানা নেই, থাকতেও পারে না। তাঁদের প্রতি আমার দোষারোপের কারণ তাঁরা যে দেশের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা নয়, আসলে তার পরিবর্তে তাঁরা সমস্যার সৃষ্টি করেছেন অগণ্য। সর্বভারতীয়ত্ববোধ যা বৃটিশ ভারতে ভারতবাসীর মধ্যে বর্তমান ছিল তার মূলে তাঁরা কুঠারাঘাত করেছেন। ক্ষমতালাভের জন্য বা ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা যে কোন ধরনের সুবিধাবাদের আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হন নি, যার ফলে বিভেদের শক্তিই বেড়েছে, যার পরিণামে ভারতের অখণ্ডত্ব অদূর ভবিষ্যতে বজায় যে থাকবে সে কথা হলফ করে বলা যায় না।

বিগত তেইশ বছরের প্রধান ব্যর্থতা, এতকাল সংসদীয় গণতন্ত্র এদেশে চললেও, আমাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী কোন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে পারেন নি, যার একমাত্র কারণ তাঁদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, যেন-তেন-প্রকারেণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার নীতি। শাসকদলের অগণতান্ত্রিক আচরণসমূহ বিরোধী দলগুলিতেও সংক্রমিত হয়েছে। যে অবিভক্ত কংগ্রেস সর্বদা মুখে গণতন্ত্রের কথা আউড়েছে সেই দল কখনও দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রবর্তন করে নি, কেন না তা করলে অকর্মণ্য স্থবির নেতৃত্ব কখনই দলের শীর্ষে অথবা গদীতে শোভা পেত না। কংগ্রেসের কথা এই কারণে বিশেষভাবে বলছি যে, এতাবৎকাল কেন্দ্রে কংগ্রেসই একমাত্র শাসকদল এবং চতুর্থ নির্বাচনের পূর্বে পর্যন্ত সর্বভারতীয় পর্যায়ে তার চেয়ে প্রভাবশালী কোন দল ছিল না এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে আজও কোন দলের অতটা জোর নেই। যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে, সেখানে দলীয় নেতৃত্ব সদস্যদের নির্বাচনের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। কাজেই সেই সকল নেতৃত্বে একটা গতিশীলতা থাকে। এখানে কংগ্রেস সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটি মূলত মনোনয়ন-নির্ভর, আপস ক্ষমতা ভোগ করার ব্যাপার, ফলে তেইশ বছরে নেতৃত্বের চরিত্র একেবারেই বদলায় নি। সেই স্থবির ও পঙ্গু নেতৃত্ব, বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তনমুখী হলেও, কার্যত এখনও বর্তমান।

ঠিক এই কারণে কোন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরও সৃষ্টি হয় নি। নেতাদের অধিকাংশই অর্ধশিক্ষিত, সামন্ততান্ত্রিক যুগ ও মনোভাবের ঐতিহ্যবাহী এবং সকল রকম কুসংস্কারেই পূর্ণ। আধুনিক যুগের কিছু কিছু ধ্যান-ধারণা তাঁদের মাথায় আছে, গতানুগতিকভাবে তাঁরা সেগুলি আবৃত্তিও করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় যত গণ্ডগোল, কথা ও কাজের মধ্যে ফাঁকি দুস্তর। বেশিদূর যাবার দরকার নেই, মাত্র কিছুকাল আগে বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি জগজীবন রাম, আমার যতদূর স্মরণে আছে, ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি ভূমি-সংস্কার কার্যকর করা না হয়, ভূমিহীনের অবশ্যই অধিকার আছে বলপূর্বক জমি দখল করার এবং তা তাদের করা উচিত। তখন তিনি একথা ভাবেন নি যে, তাঁর নিজের জমিই এর ফলে দখল হবে এবং এখন যখন সত্যই তা হতে যাচ্ছে, তখন তিনি অন্য কথা বলছেন। গত তেইশ বছরে ঠিক এইভাবে কথার ফুলঝুরি ছড়ানো হয়েছে, কিন্তু কারো কায়েমী স্বার্থে খোঁচা দেওয়া হয় নি, এবং এখন যদি জনসাধারণ তাঁদের ওইসব বাণীকে অনুসরণ করে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়, সেক্ষেত্রে কিভাবে তাদের দোষ দেওয়া যাবে? কথা ও কাজের মধ্যে এই যে বিরাট ফাঁক, এর ফলে মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, আর বিশ্বাসই হচ্ছে সকল মূল্যবোধের ভিত্তি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরও। আইন যখন হয়েছে, তখন সেই আইন কার্যকর হবে, আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণপূর্বক অপেক্ষা করা এবং সুশৃংখলে সব কিছু হতে দিতে সাহায্য করাই কর্তব্য, এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গোড়া ঘেঁষে নেতারাই কোপ দিয়েছেন। এখন আমি আর রীতিনীতি মানব না, আইন-কানুন মানব না, যেন-তেন-প্রকারেণ আমার প্রাপ্য আদায় করব, আইনের শাসন আমি বুঝি না, কেন না ওটা আমার কল্যাণে কোনদিনই প্রযুক্ত হবে না, যদিও তেইশ বছর ধরে আমাকে স্তোকবাক্য দেওয়া হয়েছে।

॥ আট ॥

আসলে যে আদর্শগুলির কথা এতাবৎকাল অনর্গল প্রচার করে আসা হয়েছে, তা আমাদের এই চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা দিয়ে কার্যকর করা যায় না। যে দেশের মানুষের পেটে অন্ন নেই, পরিধানে কাপড় নেই, রোগে চিকিৎসা নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, লেখাপড়া শিখে চাকরি নেই এবং যেখানে একটি স্বাধীন দেশ, যার বয়স তেইশ বছর, সেগুলি সাধারণ মানুষকে দিতে অপারগ হয়েছে, সেখানে তথাকথিত গণতন্ত্র যে একটি প্রহসনে পরিণত হবে, তাতে সন্দেহের কি আছে এবং পরিণামস্বরূপ যদি সেখানে উগ্রপন্থী (বাম ও দক্ষিণ) মতবাদসমূহ ও ক্রিয়াকলাপের বিকাশ ঘটে তাহলে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই।

সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বারা কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভবপর কি না, সে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায় যে, যতটুকু এর দ্বারা করা সম্ভব ছিল, ততটুকুও করা হয় নি, ফলে এদেশে ধনী ও দারিদ্রের ব্যবধান গত তেইশ বছরে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। জনকল্যাণমূলক অনেক কাজই সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বারা করা চলতে পারত। বিনা ক্ষতিপূরণে সম্পত্তির জাতীয়করণ হয়ত সংবিধান অনুমোদন করে না, কিন্তু সম্পত্তির উপর চড়া হারে ট্যাক্স বসাতে নিশ্চয়ই সংবিধান বাধা দেয় না। ধনী ও সুবিধাভোগীর স্বার্থে নানাভাবে আঘাত করা যায় এবং সেগুলির মধ্যে প্রগতিমূলক প্রত্যক্ষ করনীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, দুর্ভাগ্যক্রমে যা কোনদিনই এদেশে অনুসৃত হয় নি। অথচ একটি বলিষ্ঠ করনীতি দ্বারা সরকারের পক্ষে ধনীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করা সম্ভব পর ছিল। কিন্তু সরকার কোনদিনই ধনীদের স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত করার চেষ্টা করে নি। এর পরিণামে দুটি অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

॥ নয় ॥

প্রথমটা হচ্ছে একটি সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণীর অভ্যুদয়। শাসকশ্রেণী কথাটা আমি একটু অন্যভাবে ব্যবহার করছি। গত তেইশ বছরে সমাজের একাংশ রীতিমত টাকা করতে সক্ষম হয়েছে। স্বদেশ ও বিদেশের ব্যাংকে তাদের টাকার অন্ত নেই, এ ছাড়া হাতে আছে অফুরন্ত কালো টাকা, যা খরচ করে শেষ করা যায় না, হোটেলে, নাইট-ক্লাবে, ঘোড়ার মাঠে হাজার হাজার টাকা প্রত্যহ ব্যয় করেও যাদের টাকা ফুরোয় না। এরা নিজেদের মধ্যে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার যেগুলি কলঙ্ক, ওখানকার বিবেচক মানুষের কাছে যেগুলি আস্তাকুঁড়ে ফেলার সামগ্রী, সেগুলিই এদের সংস্কৃতি। এদের ছেলেমেয়েরা পড়ে ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে এবং কলেজে এবং পরবর্তী স্তরে ইউরোপে বা আমেরিকায় (এরা আবার আমেরিকা বলে না, স্টেটস বলে)। ওপরওয়ালার মানুষ—মোটা মাইনের চাকরি জীবনের শুরু থেকে বাঁধা। সূচনাতেই পিতা বা মাতুল বা পিরবন্ধুরে

ফাজের পাঁচ-হাজারী মনসবদার। শুধু তাই নয়, সরকারী বড় বড় পদগুলিও এদের একচেটে হতে চলেছে। এরাই সারা দেশকে কার্যত শাসন করে। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রারম্ভিক সুখ-সুবিধার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়গুলিও এরা দখল করে ফেলেছে। শাক-চচ্চড়ি খাওয়া গরীবের ছেলে যতই মেধাবী হোক, এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠা সম্ভবপর নয়, কারণ এদের প্রত্যেকের শিক্ষার পিছনে মাসে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। একেবারে অপদার্থ হলেও ক্ষতি নেই, সেক্ষেত্রেও ডিগ্রী কেনাও যায়। আর এদের লেজুড় যে শ্রেণী, তারাও মোটামুটি দুধে-ভাতে আছে, ভবিষ্যতের ভাবনা বড় নেই, গাড়ি-বাড়ি আছে, আর কালো টাকার ভাগও কিছু হাতে আসে।

কিন্তু সমাজের অবশিষ্টাংশ? সে দুরবস্থার বর্ণনা দেবার ভাষা নেই, আর তা দেবারও প্রয়োজন নেই। বলাই বাহুল্য, এখানে বিক্ষোভ আছে, প্রতিমুহূর্তে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে, আর এই বিক্ষোভই হচ্ছে একশ্রেণীর পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের মূলধন। বাংলাদেশ ছাড়া সর্বত্রই এই বিক্ষোভকে রূপ দেওয়া হচ্ছে জাতিবিদ্বেষে। বলা হচ্ছে তোমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী অমুক প্রদেশের লোকেরা, তারাই এখানে সব কিছু লুটে-পুটে খাচ্ছে, তাদের ঠেঙাও। এইভাবে জাতিবিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এই জাতি-বিদ্বেষই ফ্যাসীবাদের জন্ম দিচ্ছে এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তার সুযোগ নিয়ে পাকাপাকি ফ্যাসিস্ট রাজ কায়েম করার চেষ্টা করছে। তাই আমরা দেখি, এই প্রাদেশিকতা ও জাতিবিদ্বেষের বিষ সারা দেশের সর্বাঙ্গে এমনভাবে সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছে যে, তামিল-নাড়ুতে একটি জাতিবিদ্বেষী সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। অনেকে বলবেন, ডি-এম-কে তো মাঝে মাঝে প্রগতিশীল শক্তিগুলির স্বপক্ষে আসে। সেটা কৌশল-গত ব্যাপার। প্রাদেশিকতা ও জাতি-বিদ্বেষ ছাড়া ডি-এম-কে'র আর কি ভিত্তি আছে? ঠিক একইভাবে মহারাষ্ট্রে শিব-সেনার উদ্ভব হয়েছে। এই জঙ্গীবাহিনীর পরিচয় নতুন করে দেবার নেই এবং বলাই বাহুল্য, এর পিছনে মহারাষ্ট্র সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষ করে চৌহান সাহেবের সস্নেহ প্রশ্রয় আছে। শিবসেনার তাণ্ডবে মহারাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না, অথচ নকশালী উপদ্রবে নাকি পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা নেই। নকশালীরা তো লোক বেছে বেছে মারে, কিন্তু এরা যা করে, তা গণহত্যা, জেনো-সাইড। অথচ এই দলকে ক্ষমতার স্বার্থে নিষিদ্ধ করা হয় না, এদের কুখ্যাত নেতা-দের সমাজবিরোধী বলে গ্রেপ্তার করা হয় না! খুঁচিয়ে গেলা জাতিবিদ্বেষের ধাক্কায় আসাম বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল, দ্বিখণ্ডিত পাঞ্জাব আবার বিভক্ত হল, আর পাঞ্জাবের রাজনীতির যারা সবচেয়ে বড় শরিক, তারা একটি সাম্প্রদায়িক জাতিবিদ্বেষী দল। উত্তরপ্রদেশে জাতিবিদ্বেষী শক্তিগুলিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগানো হচ্ছে, কোন্ যুক্তিতে আর-এস-এস'এর মত একটি সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক জাতিবিদ্বেষী গুণ্ডাবাহিনীকে পুনরায় বৈধ সংগঠন বলে ঘোষণা করা হল, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য বুদ্ধির অগম্য বলে সত্যের অপলাপ করা হবে, উদ্দেশ্য একটিই, ক্ষমতার স্বার্থ, যে স্বার্থ এমন কি মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় পুনর্জাগরণ ঘটাতে চলেছে। অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থের টিকে থাকার পক্ষে বঞ্চিত নিরন্ন মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজন এবং সেই বিভেদের সৃষ্টি করে কিছু চতুর্থ শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক মুনাফা লুঠছেন, তাদের ন্যায্য বিক্ষোভকে বিপথে চালনা করে ফ্যাসীবাদকে সাদরে আহ্বান করে আনা হচ্ছে।

॥ দশ ॥

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সৌভাগ্যক্রমে এই বিক্ষোভ জাতিবিদ্বেষ এবং প্রাদেশিকতায় রূপ নেয় নি, তার কারণ এখানকার বাম-পন্থী ঐতিহ্য। কাজেই দিল্লীর শাসক-দের পক্ষে বাংলাকে নিয়েই ভয়ের কারণ সবচেয়ে বেশি, কায়েমী স্বার্থ ভীত এই কারণেই যে, বাংলাদেশের গরীব মানুষেরা তাঁদের মূল শত্রু চিনতে ভুল করেন নি। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ ও প্রাদেশিকতার ধুয়া তুলে এখানকার খেটে-খাওয়া মানুষদের বিচ্ছিন্ন করা যায় নি, যদিও সেই অপচেষ্টা যে বার বার করা হয় নি তা নয়। কাজেই ভারতজোড়া অপ-প্রচার বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে। বাঙালী মাত্রেই কমিউনিস্ট, তারা বিপজ্জনক। খোদ রাজধানী দিল্লীর ইস্কুল-কলেজগুলি তো বাঙালী ছাত্র ভর্তি করা বন্ধ করে দিয়েছে।

বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান হিসাবে বাংলাদেশ গৌরব বোধ করতে পারে বটে, কিন্তু তাতেই তো আর সমস্যার সমাধান নেই। বামপন্থী আন্দো-লনের অসংখ্য দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির ইতিহাসও বাংলাদেশ বহন করছে এবং সেগুলিকে মিথ্যা মায়া ভ্রম বলে উড়িয়ে দিলে সত্যের অপলাপ করা হবে। গত সংখ্যায় লিখেছি, এদেশে বামপন্থী আন্দো-লন [illegible] কেতাবী নেতার সৃষ্টি করলেও কোন জননেতাকে গড়ে তুলতে পারে নি। ফলে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা ও পরিবর্তনের আগ্রহ দেখা গেলেও, নেতৃত্বের ব্যর্থতায় সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে এবং এই কারণেই উগ্রপন্থী রাজনীতি বাংলাদেশে পা রাখার মাটি পেয়ে গেছে। আসলে বামপন্থী নেতৃত্ব যে কতটা অকর্মণ্য, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৬৬-র খাদ্য-আন্দোলনের সময় থেকে। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে বামপন্থী নেতারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। জন-সাধারণ আসলে নেতাদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে যেতে রাজী ছিলেন, কিন্তু নেতারাই প্রস্তুত ছিলেন না। এই বাস্তবতাকে তো অস্বীকার করা যায় না। বামপন্থী নেতারা বিশ্বাস করেন্নই রাজী ছিলেন না যে, ১৯৬৭-র নির্বাচনে বাংলা-দেশ কংগ্রেসকে নির্মূল করে দেবে। কিন্তু কার্যত তাই ঘটল। বামপন্থী নেতারা ঐক্যবদ্ধ না হতে পারার দরুণ কংগ্রেসের শতগুলি আসনে হারা উচিত ছিল, তার চেয়ে কম আসনে তারা হারল। ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট তো বামপন্থী নেতারা করেন নি, জনসাধারণই তাঁদের যুক্তফ্রন্ট গড়তে বাধ্য করেছিলেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অবশ্য তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, ১৯৬৯-এর উপ-নির্বাচনে তাঁদের সাফল্যই যার প্রমাণ। কিন্তু এই সাফল্যকে তাঁরা ধরে রাখতে পারেন নি এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন

মহারাজ

[illegible]

মহা অতিথির বেশ
চির যৌবনের বিপ্লব-দিশারী
আরো নিবিড় কর্ম-বাধ্য, প্রশান্তিমগ্ন।

তাপস কাদের নাম?
দেখিনি সে যুগ।
আরাম নেই এ যৌবন সাধনায়
ত্রিংশতি বর্ষের কারাগৃহ শ্রমময় চিরন্তন।
অগ্নিধৌত বজ্রাস্থিতে লৌহ সংযোজন
অত্যাচারের উৎসাদনে প্রবুদ্ধ—
দুর্বার বিদেশী-দেশী কলুষ
উৎপাটনের চিত্তচর্যা—সেই এক নাম তপস্যা।
কর্ম-প্রেমে মুক্তি-মন্ত্রে—আর এক তপস্যা।
চির যৌবন দিশারী
কালান্তকে নির্জিত করে যৌবনেরে
আর এক নাম রাখেন চরিত্র-চরিত্র-চরিত্র শুদ্ধ।
বহু বিপ্লবীর রক্তধারা নিষিক্ত,
কোটি কোটি হীরকদ্যুতি প্রভা,
বিপ্লব-মানসীর অন্তরাল—ফল্গুধারা বয়ে যায়
সেই পারাবারে জনতার স্নান।
এ যে অর্ঘ্য নয়, বিড়ম্বনা নয়, জবাবা নয়
অজ্ঞতার সংস্কার অশ্রুতীর্থে
নির্বাক মহাতাপসের পুণ্য বেদীমূলে।

সূর্য নিভলেও

[illegible]

মাটির প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নেভাও : ঘর অন্ধকার,
আগুনের সূর্য ফুঁ দিয়ে নেভাও : পৃথিবী অন্ধকার।

এমনি-এক অন্ধকারের বিছানা থেকে তুলে চোখের
পিচুটি জলে ধুয়ে ঊর্ধ্বমুখ আমাকে কে বলেছিল
—ওই দ্যাখ সূর্য। নতমুখ আমাকে কে বলেছিল
—চিনে রাখ তোর জননী।

জননী জন্মভূমি
আমি চিনেছিলাম। জেনেছিলাম সূর্য পিতা এবং
পিতা সূর্যের ঔরসে মাতা জন্মভূমির গর্ভে আমার
যা কিছু অস্তিত্বের অহংকার।

আর শুনেছিলাম
দস্যুর হাতে বন্দী সেই জননীর মুক্তির সর্ত —
ভেসে-আসা অগ্নিমন্ত্রের সুর আমার কানে
: মৃত্যুই জীবন, জীবনই মৃত্যু।

প্রদীপ ফুঁ দিয়ে নেভাও : ঘর অন্ধকার,
সূর্য ফুঁ দিয়ে নেভাও : পৃথিবী অন্ধকার।

তবু থাকে
চেতনার রাজ্যে থাকে জীবন-মৃত্যুর মহান্ শিল্পী
অক্ষয় অম্লান স্বাধীন ত্রৈলোক্য মহারাজ॥

ঘটল। এই পতন ঘটার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছিল না এবং জনসাধারণকে অধিকতর হতাশা ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের দিকে ঠেলে দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করা হয় নি। এখন এ কথাটা কোন দল বা নেতাকে বলতে গেলে তাঁরা পত্রপাঠ দোষটা অপর কোন দল ও তার নেতাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন, যা তাঁরা দিয়ে থাকেন, কিন্তু সেটা কোন কাজের কথা নয়। যেটুকু প্রত্যাশা যুক্তফ্রন্টকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের জনমানসে গড়ে উঠেছিল, তার অপমৃত্যু ঘটানোর দায়িত্ব কোন বামপন্থী দলই—তা ঘোর লাল, লাল, ফিকে লাল, গোলাপী যে দলই হোক না কেন—অস্বীকার করতে পারবেন না।

॥ এগার ॥

এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে যে হতাশা নেমে এসেছে, তা যুবসমাজের একাংশকে অনিবার্যভাবে উগ্রপন্থী করে তুলছে এবং বলাই বাহুল্য, এই ক্রিয়াকলাপকে রোধ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। আইন করে, পুলিশ-মিলিটারী, সি-আর-পি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না, সমাধান হবার পথ একটিই, তা হচ্ছে বর্তমান সমাজ থেকে হতাশা ও হতাশার কারণগুলিকে দূর করা, যা আবার বর্তমান সমাজ-কাঠামো, বর্তমান প্রশাসনকে টিকিয়ে রেখে সম্ভবপর নয়। এমন একটা সময়ে উপনীত হওয়া গেছে, যখন আমূল পরিবর্তন দরকার, প্রয়োজন ব্যাপক সার্জারির, হোমিওপ্যাথি ওষুধে কাজ হবে না, অথচ বর্তমান শাসনব্যবস্থা এর চেয়ে বেশি দিতে অপারগ। স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে পা দিয়ে আমরা একটা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, যেখানে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট তীব্রতম হয়েছে, তা বিস্ফোরণের আকার নেবার পথ খুঁজছে অথচ পাচ্ছে না, বিপ্লবের মুহূর্ত প্রস্তুত, অথচ তার প্রস্তুতি নেই, এদিকে শাসকশক্তিরও অবস্থাকে সামাল দেবার মত কোমরের জোর নেই। সোজা বাংলায়, যা হচ্ছে, হতে দাও, এই নীতি অবলম্বন করে সকল তরফই চলছেন। কিন্তু এভাবে চলতে দেওয়াটা কতদূর সঙ্গত হবে? সময় হিসাবে তেইশ বছর বড় কম নয়। রুশ-বিপ্লবের তেইশ বছর পরে সোভিয়েট রাশিয়া হিটলারের জার্মানীকে হারিয়ে দেবার মত শক্তি অর্জন করেছিল এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঐ প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেও যুদ্ধান্তের কিছুকালের মধ্যেই নিজেকে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করতে পেরেছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা কতটা জোরাল ভিত্তির উপর স্থাপিত হলে এটা সম্ভবপর হয়? বিপ্লবের তেইশ বছরের মধ্যে তারা যদি নিজেদের অর্থনীতিকে এতটা জোরাল ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়ে থাকে, সেদিক থেকে বিচার করলে স্বাধীন ভারতের তেইশ বছরের ইতিহাসকে নিছক অকর্মণ্যতার ও অক্ষমতার ইতিহাস বললে কিছু ভুল হবে কি? বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের চেয়ে কিছু ভাল ছিল না, বরং অধিকতর খারাপ ছিল। গৃহযুদ্ধ, প্রতিবিপ্লব, বিদেশী আক্রমণ—সমস্ত কিছুকে মোকাবিলা করে তাদের অগ্রসর হতে হয়েছে, অথচ জাতি হিসাবে ভারতবাসী, ব্যক্তি হিসাবে ভারতীয়রা, পৃথিবীর কোন দেশের লোকের চেয়ে কম পরিশ্রমী নয়, বরং অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাত্রা, অনাহার-অর্ধাহার, অপুষ্টিজনিত রোগ, এতকিছু সত্ত্বেও তারা যে আন্দাজ পরিশ্রম করে, ব্যাক-ডেটেড যন্ত্রপাতি নিয়ে একান্ত প্রতিকূল পরিবেশে তারা যে পণ্য তৈরি করে, তা মোটেই নিম্নমানের নয়। অথচ গত তেইশ বছরে অতুলনীয় এই মানবশক্তির প্রচণ্ড অপচয় ঘটা ভিন্ন আর কিছুই হয় নি।

[ক্রমশ]
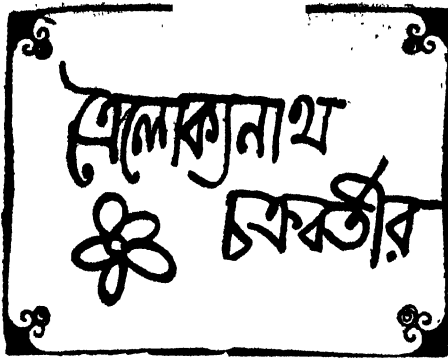
কাপাসাটিয়া
৬।৭।৬৭

প্রিয় শামসু দোহা সাহেব,

এক সময় আপনার সহিত আমার পরিচয় ছিল। আপনি যখন I. G. P. ছিলেন, তখন ডি আই জি, এম, আর, খন্দকার সাহেবের মারফৎ আমাকে সংবাদ দিয়া আপনার সহিত দেখা করার সুযোগ দিয়াছিলেন। আমি পাকিস্তানেই আছি, আমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বর্তমানে আমার বয়স ৭৯ বৎসর।

আপনি খাদ্যমন্ত্রী, অধিক খাদ্যশস্য ফলানের চেষ্টা করিতেছেন: এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এখন খাদ্যশস্যের অপচয় সম্বন্ধে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ সম্বন্ধে কয়েক মাস পূর্বে আমি Secretary Home, Dacca যে চিঠি দিয়াছি, এই সঙ্গে তাহার নকল পাঠাইলাম, আমি গভর্নার সাহেবের নিকটও একখানা চিঠি দিয়াছিলাম এবং ইহাও লিখিয়াছিলাম, গরু দিয়া ক্ষেত খাওয়ান এবং ক্ষেতের ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া বন্ধ করা কঠিন নয়. ইহাতে অর্থব্যয়ও হইবে না। শুধু থানার উপর কড়া সার্কুলার দেওয়া (১) গরু দিয়া ক্ষেত খাওয়ান এবং ক্ষেতের ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। (২) এরূপ ব্যবস্থা করা. ঐ শ্রেণীর অপরাধীর ২০০ টাকা অর্থদণ্ড হইবে। (৩) যে থানায় এই শ্রেণীর অপরাধ বন্ধ হইবে না, সেই থানার অফিসারকে অযোগ্য মনে করিয়া প্রমোশন বন্ধ করা হইবে। B. D. মেম্বার এবং চেয়ারম্যানদের জানা উচিত, তাহাদের গ্রামে কাহারা এই শ্রেণীর অপরাধ করে। তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করিতে হইবে। আমি গভর্নারের পত্রের উত্তর পাই নাই, ক্ষেতের ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া এবং গরু দিয়া ক্ষেত খাওয়ান বন্ধ হয় নাই। কয়েক দিন পূর্বে আমার একটা বড় আউস ধানের ক্ষেত, ধানের ছড়া বাহির হইতেছে. রাত্রে অনেকটা অংশ কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। আমি পূর্বের ন্যায় থানায় লিখিত এজাহার দিয়া যাইতেছি. ফল কিছুই হইতেছে না।

সংখ্যালঘুরা কি অবস্থায় আছে তাহা প্রেসিডেন্ট বা আপনারা জানেন না। প্রেসিডেন্টের উচিত সংখ্যালঘুদের নেতৃস্থানীয় লোকদের সহিত আলাপ করিয়া তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জানা। শুধু তাহাদের উপর দোষারোপ করিলে চলিবে না, প্রকৃত অবস্থাও জানিতে হইবে। প্রেসিডেন্টের সহিত দেখা করার কোন্ শ্রেণীর লোক সুযোগ পায়? মেরুদণ্ডহীন, তথাকথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের সহিত দেখা করিয়া লাভ নাই। প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নেলী সেনগুপ্তা, মনোরঞ্জন ধর এবং আমার মত লোকদের সহিত দেখা করিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল প্রেসিডেন্টের নিকট ডেপুটেশন যাওয়া এবং মেমোরেন্ডাম দেওয়া। অবশ্যই আপনি ইহা বুঝেন, ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া চলে না।

আমি ১৯৬৪ সনের পূর্বে গভর্নারের সহিত দেখা করিয়া পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু কনফারেন্স ডাকিয়াছিলাম। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য তাহা হয় নাই। পরে আমরা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে বিভিন্ন জিলার ২২ জন প্রতিনিধি গভর্নারের সহিত দেখা করিয়া মেমোরেন্ডাম দিয়া আসিয়াছিলাম। ফল অবশ্যই কিছু হয় নাই।

সংখ্যালঘুরা চায় শুধু নিরাপত্তার ব্যবস্থা, তাহারা শান্তিতে বসবাস করিতে চায়, তাহারা চায় নাগরিক অধিকার। সংখ্যালঘুরা সরকার-বিরোধী নয়। তাহারা জানে একমাত্র গভর্নমেন্টই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে। সংখ্যালঘুদের সরকার-বিরোধী কোন কাজ করার ক্ষমতা নাই।

আমি এ যাত্রা জেলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী ছিলাম, মশারি পর্যন্ত পর্যন্ত ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই. জেলে আমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি পাই। আমি চিকিৎসার জন্য ঢাকা দুইবার যাই। প্রথমে ডাঃ হকের চিকিৎসাধীনে ছিলাম। বর্তমানে ডাঃ রবের চিকিৎসাধীনে আছি।

আমি এ যাত্রা জেল হইতে বাহির হইয়া গত ৮ মাসের মধ্যে গভর্নারের সহিত দেখা করার জন্য ৪ খানা চিঠি দিয়াছি, গভর্নারের মিলিটারী সেক্রেটারীর নিকটও ৪ খানা চিঠি দিয়াছি, গভর্নারের সহিত দেখা করার ব্যবস্থা করিয়া দিতে, কিন্তু কোন উত্তর পাই নাই। আমার উদ্দেশ্য ছিল গভর্নারের সহিত প্রথম আলাপ করিয়া পরে বিভিন্ন জিলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু নেতৃস্থানীয় লোক লইয়া সংখ্যালঘুদের অবস্থা সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করা।

একবার আপনার সহিত দেখা করার সুযোগ পাইলে সুখী হইতাম।

ইতি—

শ্রী ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী (মহারাজ)
Ex-M.P.A.

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ একুশ ॥

মনীশদা এসেছিল ঘোষ সাহেবের কাছে। কী জরুরি আলোচনা চলছিল দুজনের। বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাতের কাজ নামিয়ে টুলু বেরুতে যাচ্ছিল, মনীশদা বললে, 'একটু বোসো টুলু, তোমায় লিফ্‌ট্‌ দেব।'

মন্দ কী—বারো আনা রাস্তার বাসের ঝাঁকুনি বেঁচে যায়, ক'টা পয়সাও। পার্টিশনের ওপার থেকে ও'দের কথা কানে আসছিল, কোন্‌ এক কারখানা, ফ্যাক্টরী আইন, লক-আউট, কোম্পানীর লিকুইডেশনে যাওয়া - এইসব নিয়ে খুব বিব্রত আর উত্তেজিত ছিলেন দুজন।

'ওদের ইউনিয়নের অন্ততঃ জনতিনেক পার্চে'জেব্‌ল্‌—' ঘোষ সাহেব বলছিলেন।

'কিন্তু সাহসে কুলোবে না—' মনীশদা বলছিল: 'যে-রকম আগুন হয়ে আছে লেবার! একটু আঁচ পেলে একেবারে জ্যান্তে কবর দিয়ে দেবে।'

'ওরা আজকাল কবর দেওয়াটা খুব পছন্দ করছে। —ঘোষ সাহেব ঠাট্টা করছিলেন: সব সময় বলছে, এই মাটিতে কবর দিন। কিন্তু হিন্দুরা তো কবরে যেতে আপত্তি করতে পারে।'

'সে ব্যবস্থাও আছে। পুড়িয়ে মারো, পুড়িয়ে মারো—এটাও খুব ফেবারিট্‌ শ্লোগান।'

এসব টুলু শুনছিল, শুনছিল না। বাইরের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ বাড়ছিল ক্রমশ, এখন সব ঘরে ফেরবার তাড়া। আর ঘণ্টা দেড়-দুই বাদে এমন ব্যস্তবাস্ত হাইকোর্ট পাড়া একেবারে ঝিমিয়ে যাবে। তার এদিকের জানলা দিয়ে বিশাল লাল বাড়িটার যেটুকু দেখা যায়, তার ওপর এখন ছায়া ঘন হচ্ছে। এ ঘরে আলো সারা দিন জ্বলেই—দুপুরে তার অস্তিত্ব ভালো করে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই আলোটা টেবিলের তলায়, আলমারীর কোণায়, র‍্যাকের আশেপাশে ছায়ার ছক কাটছে এখন। বেলা একটু একটু করে পড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো, কাগজ আর ক্লান্তির গন্ধে ভরে উঠছে ঘরটা।

মনীশদার কথা চলছে—চলছেই। টুলুর হাই উঠতে লাগল অবসাদে। বেরিয়ে বাস ধরলে এতক্ষণে ভবানীপুরে পৌঁছে যেত সে। কিন্তু মনীশদা বসতে বলেছে। বসাই যাক্‌।

উঠে টাইপরাইটারটার সামনে গিয়ে বসল। অল্প অল্প শিখছে, সামান্য স্পীডও আসছে। উৎসাহটা এ-সময়ে একটু বেশিই থাকে। হাতের আঙুলগুলো এখনো সেট হয় নি, প্রায়ই দেখে দেখে টেপাটিপি করতে হয়।

বাঁকা চোখে তাকিয়ে হেড ক্লার্ক মধ্যে মধ্যে বলেন, 'মেশিনটার বারোটা তো তুমিই বাজাবে দেখছি। দয়া করে ভেঙো না—এখন আবার রেমিংটন কোম্পানীতে গণ্ডগোল যাচ্ছে।'

হেড ক্লার্ক বেরিয়ে গেছেন, এই সুযোগ। টুলু মেশিনে কাগজ চাপিয়ে যা খুশি টাইপ করতে লাগল।

এস-ডাবলু-এ-পি-এন-এ, এস-ডাবলু-এ—

স্বপ্না!

টুলুর আঙুল থেমে গেল। ঘুরে-ফিরে ওই নামটা। এই পাঁচ-সাতটা বছর তো বেশ ছিল, আড্ডা মেরে, ইয়ার্কি দিয়ে, যথামো করে চমৎকার কেটেছে। তখন কিছুই মনে পড়ত না। বাড়ি ফিরলে দাদা চাঁচামেচি করত এক-একদিন, মা কাঁদত—কিছুই আসত-যেত না। স্বপ্না কোথাও ছিল না, কোনো স্বপ্নের মধ্যেও না। কিন্তু তারপরে দাদার পাল্লায় পড়বার আগে সেই হাজত—একজন কনস্টেবল কয়েকটা থাপ্পড় মেরেছিল, দারোগা দুটো লাথি বসিয়েছিলেন—আর হাজতের সেই দুর্গন্ধ। মার খেয়ে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসেছিল কার্তিক, ফণী গোঁ-গোঁ করে বলেছিল, 'সালাদের একবার রাস্তায় জুৎমতো পেলে—' আর লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে টুলু সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। যত কামড়েছে মশায়, মনের ভেতরটা জ্বলেছে তার চাইতেও বেশি।

দাদা ছাড়িয়ে আনল মুরারি হালদারকে ধরে। এমন সময় দিদি। নিজের মধ্যে একটা কিছু ঘটে গিয়েছিল নিশ্চয়, না হলে হঠাৎ এমন ভালো ছেলে হওয়ার সুবুদ্ধি জাগল কেন তার! আর তখন স্বপ্না ফিরল।

স্বপ্না ফিরল।

এই মেয়েটা তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। সেই ছেলেবেলার ভালোবাসার যদি মানে থাকে কোনো। কবে কথাটা প্রথম জানা গিয়েছিল—কবে?

[—ইস, তুমি কী ভালো অংক কষতে পারো টুলুদা! কত তাড়াতাড়ি!

'অঙ্ক তো ভালো করেই শিখতে হবে। নিখুঁত চুলচেরা হিসেব জানা চাই, যন্ত্রপাতি চেনা চাই। না হলে তো একেবারে সোজা ক্র্যাশ—দারুণ অ্যাকসিডেন্ট।'

'সে কি! কিসের ক্র্যাশ! কিসের অ্যাক্‌সিডেন্ট?'

'বা-রে, আই-এসসি পাশ করে আমি পাইলট হবো যে। জানিস স্বপ্না, দমদমে একটা এক্‌জিবিশন করেছিল একবার, আমি দেখতে গিয়েছিলুম। এরোপ্লেনের এগ্‌জিবিশন। মানে—ঠিক এরোপ্লেন নয়—নানা রকম প্লেনের এঞ্জিন, তার যন্ত্রপাতি সব দেখিয়েছিল। কত যে সব সূক্ষ্ম

ব্যাপার না—দেখলে তোর মাথা একেবারে ঘুরে যেত। সেই দেখেই তো আমার মনে হল যে, আমাকে পাইলট হতে হবে। আর অঙ্কে মাথা না থাকলে, সব হিসেব করে, বুঝে প্লেন না চালাতে পারলে, ব্যাস্—হয়ে গেল।'

'না টুলুদা, না। তোমার পাইলট হয়ে কাজ নেই।'

'কেন রে, কত সম্মানের কাজ। তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ—কিরকম থ্রিলিং! মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি—পায়ের তলায় পড়ে থাকছে নদী-পাহাড়-সমুদ্র—বোঁ করে দেখতে দেখতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে একেবারে লণ্ডনে পৌঁছে গেলুম!'

'যেতে হবে না তোমায় লণ্ডনে। প্লেন চালিয়ে।'

'তবে কী করব?'

'কেন, ডাক্তার হবে, এন্‌জিনীয়র হবে, আরো কত কী হতে পারো।'

'আরে, ঠিকমতো চালাতে পারলে অ্যাক্‌সিডেণ্ট হবে কেন! আর কত লোকই তো পাইলট হয়।'

'হোক গে। তুমি চালাতে যাও না প্লেন, তার আগে আমি মরে যাব।'

'তুই মরে যাবি কেন?'

'আমি—আমি যে—'

বাকীটা চোখের জলে মিলিয়ে গেল তারপর।]

টুলু টাইপ-করা কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। এস-ডবলু-এ—স্বপ্না। না, এখনো যে সব সময় ভাবছে স্বপ্নার কথা, তা নয়। কিন্তু কোথায় জড়িয়ে গেছে মনের ভেতর, একটা সুরের মতন ঝিনঝিন করে বুকের মাঝখানে কাঁপতে থাকে কখনো কখনো। আর বিশেষ করে সেদিন, সেই কার্তিক আর তার দলবলের হাতে পড়বার সময়—

মনীশদা ডাকল: 'টুলু, চলো।'

'আসছি মনীশদা।'

মেশিনটা বন্ধ করে টুলু উঠল। টাইপ-করা কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কী ভেবে ভাঁজ করে নিলে নিজের পকেটে।

ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মনীশদা নামল, টুলু মনীশদার ফোলিয়ো-ব্যাগটা হাতে টেনে নিয়ে পিছে পিছে চলল। এখানে আর মনীশদা তার ভগ্নীপতি নয়—তার মনিবের বন্ধু। এখানে মনীশদাকে আলাদা সম্মান করা উচিত, সে সঙ্গে থাকতে ভারী ব্যাগটা তাকে বইতে দেওয়া যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘোষ সাহেব নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন, মনীশদার সঙ্গে টুলু উঠল তার গাড়িতে। কিছুক্ষণ বাজার মুখে চুপ করে মনীশদা স্বগতোক্তি করল: আ—দিস্ লেবার-ট্রাব্‌ল! বাংলা দেশে একটা ইণ্ডাস্ট্রিও আর থাকবে না!

টুলু চুপ করে থাকল। তার কিছু বলবার নেই। এসব ভাবনার ভার সে বইতে পারে না—ওগুলো দাদার এক্তিয়ারে। লেবারের জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই তার।

'লেবার মুভমেণ্ট নয়—স্রেফ ইউনিয়ন-বাজী। চমৎকার হয়েছে এই যুক্তফ্রণ্ট সরকার! যুক্তফ্রণ্ট মানেই চৌদ্দ দলের লাঠিবাজী। যেমন করে হোক নিজের পার্টি বাড়াতে হবে। ইণ্ডাস্ট্রির অবস্থা বোঝবার দরকার নেই, ডিম্যাণ্ড কতটা রিজনেব্‌ল্—শেষ পর্যন্ত কোম্পানীই উঠে যাবে কি না সে-সব ভাবনাও নেই—স্ট্রাইক কল দিতে পারলেই পপুলারিটি! ইম্‌পসিব্‌ল্! দিস প্রভিন্স অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ডুম্‌ড্!'

টুলু তেমনি চুপ করে রইল।

মনীশদা—একটা সিগারেট ধরিয়ে—ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকল বাইরের দিকে। ময়দানে—শহীদ মিনারের নিচে বিরাট জনসভা। চৌরঙ্গীর ট্রাফিক চলছে, তার আওয়াজ ছাপিয়েও মাইকের গর্জন কানে আসে।

'সেই বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নিন কমরেডরা—যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—'

মনীশদা বিষ-ছড়ানো গলায় বললে, 'হুঃ, তোমরাই কেবল সিজার্স ওয়াইফ—বাকী সবাই বিশ্বাসঘাতক!'

গাড়ি চলল। পার্ক স্ট্রীট ছাড়াতে ট্রাফিক হাল্কা হয়ে আসছে। বাতাসে দক্ষিণের অজস্রতা। ঝরা পাতা উড়ে উড়ে আসছে পথের ওপর।

একটু চুপ করে থেকে মনীশদা বললে, 'কাজকর্ম কেমন চলছে?'

'ভালোই।'

'শিখে নিচ্ছ তো?'

'যতটা পারি।'

'যদি এক-আধটা পরীক্ষাও দিত, তা হলে অনেক বেটার জায়গায় দেওয়া যেত তোমাকে। আজকাল এসব কোয়ালি-ফিকেশনে বেয়ারার কাজও জোটে না। নেহাৎ ঘোষ আমার বন্ধু বলেই—'

অপমানের একটা কাঁটা টের পেলো টুলু। ঠিক কথা, মনীশদার অনুগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু অনুগ্রহ যিনি করেন বার বার সেটা তিনি মনে করিয়ে দিলে ভালো লাগে না, কেমন বিস্বাদ হয়ে যায় সব। তখন বলতে ইচ্ছে করে—দরকার নেই আপনার দয়ায়, ওটা বরং ফিরিয়েই নিন আপনি!

কিন্তু বলা যায় না সে কথা। মনীশদা এ নিয়ে বোধ হয় বার-সাতেক তাকে মনে করিয়ে দিল, তবুও বলা যায় না। টুলু এখন জীবনকে বদলাতে চাইছে; এখন সাত বছরের সমস্ত অপচয়গুলোকে তার মুছে ফেলা দরকার; এখন আবার রক্তের ভেতরে সুর তুলেছে স্বপ্না, অল্প বয়সে, বয়ে-যাওয়ার আগে যে সুরটা তার মনকে খানিক নেশার মধ্যে তলিয়ে রাখত।

টুলু একবার ঠোঁট চাটল।

'আমি প্রাইভেটে পাশ করবার কথা ভাবছি মনীশদা।'

'তাই নাকি?'

'ইচ্ছে আছে শীগ্‌গিরই পড়াশোনাটা আরম্ভ করে দেব।'

(ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে, তবু এখনো কোচিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া গেল না। অথচ যাওয়া-আসার রাস্তার ধারেই তো ক'টা টিউটোরিয়াল হোম পড়ে! কী যে হচ্ছে, কোনোমতেই আর সময় পাওয়া যাচ্ছে না!)

মনীশ সামান্য একটু হাসল। অবিশ্বাসের হাসি।

'সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু পড়াশুনোর এনার্জি আছে এখনো? যে দলে মিশেছিলে!'

'এনার্জি আমার আছে মনীশদা। তবে অফিসে কাজের যা চাপ—'

মনীশ টুলুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল মুখটা।

'পরিশ্রম না করলে মাইনে দেবে কেন তোমাকে? আর পরিশ্রম না করা ছাড়া কোন্ যোগ্যতা তোমার আছে?'

আবার সেই অপমানের আঘাত।

খিদেয় ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে আসতে চাইছিল, একরাশ তীক্ষ্ণ বিরক্তি মনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল টুলুর। বলতে ইচ্ছে করল: 'বার বার শোনাচ্ছেন কেন ওভাবে, গাধার মতো খাটুনি আর হেড্ ক্লার্কের সারা দিন দাঁত খিঁচুনির পরে ওই মাইনের মুষ্টিভিক্ষা আমি চাই না। কাল থেকেই দেব ঘোষ সাহেবের চাকরি ছেড়ে।'

কিন্তু, এখনো, এত অসহ্য হলেও বলা যায় না। জীবনটা বদলাতে হবে তাকে। স্বপ্না এখনো তাকে মনে রেখেছে। স্বপ্নার জন্যেই তৈরি হতে হবে তাকে।

নেবা গলায় টুলু বললে, 'তা ঠিক।'

মনীশদা তেমনি শক্ত ভঙ্গিতে বললে, 'কাজ করো, কাজ। খাটো। এসব স্বপ্নেও কখনো ভুলো না। আর মনে রেখো ঘোষ নেহাৎ মার্সি গ্রাউণ্ডেই তোমায় চাকরি দিয়েছে, আমার রিলেটিভ না হলে—'

যদি আসো

[illegible]

(শ্রীশীতলদাস জোয়ারদার-কে)

১...যদি আসো, পথ চিনে নিতে হবে না কিছুই দেরি।
কেন না, তেমনি আছে সব
মরা নদী,
শুকনো খাল, ভাঙা সেতু—
সব তুমি পাবে পথে।

২...লাউয়ের সীমের জাংলা,
দুগ্ধবতী গাভী,
(আগের মতন দুধ দেয় না যদিও)
হাড় বের-করা গোটা দুই হালের বলদ
দেখবে রয়েছে মাঠে বাঁধা।

৩...অতিবৃষ্টিতে, অনাবৃষ্টিতে মাঠের ফসল মারা যায়
কি বছর।
চড়া সুদে
অথবা বকেয়া খাজনায়
অনেকের জমি-জিরেত
নেই আর।

৪...তোমার সেই পালোয়ান ফজলু
দিনের পর দিন
একবেলা আধবেলা খেয়ে না খেয়ে
হারিয়েছে পেশির উদ্দামতা;
এখন সে
যায় না কোথাও
বাজি রেখে আর লড়তে।

৫...তবু দেখতে পাবে তুমি (যদি আসো)
হাট-ফেরত মানুষজন
হাঁটু অবধি ধুলোয়
ডুবিয়ে, দুর্ভাবনাকে ক্ষণিকের জন্যে ভুলে
খুশি মনে সওদা কিনে ফিরছে—
সব তুমি দেখতে পাবে।

৬...যদি আসো
পথ চিনে নিতে
কষ্ট হবে না তোমার।

টুলু আর কথা বলল না, কেবল একটা হাতের মুঠো তার শক্ত করে সীটটাকে আঁকড়ে রাখল। মনীশদার গাড়িতে ইহজীবনে আর কখনো লিফ্‌ট্ নেবে না সে। এর চাইতে বোম্বাই বাসের পা-দানীতে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া অনেক ভালো।

আর—অ্যাটর্নি অফিসের এই চাকরি ছাড়া ভদ্র জীবিকার আর কি পথ নেই কোনো? এর চাইতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রি করলে কেমন হয়!

মনীশ বলছিল: 'গোটা বাঙালী জাতটাই যা হয়েছে—পরিশ্রম করতে হলেই—'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল টুলু। গলার ভেতরটা যেন কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে, তার কান্না পাচ্ছিল।

গাড়িটা বাড়ির সামনে পৌঁছোনোর অপেক্ষামাত্র। প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে এল দিদি। একেবারে পাগলের মতো চেহারা।

অদ্ভুত স্বরে দিদি বললে, 'তুমি ছিলে কোথায়? তোমার অফিসে তিনবার ফোন করেছি, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

টুলু আগেই নেমে যেতে চেয়েছিল, মনীশদা বলেছিল, 'তোমার দিদির ওখান থেকে চা খেয়ে যাবে।' কিন্তু এখন আর চা খাওয়ার প্রশ্ন নয়—ভয়ে থমকে গেল দুজনে।

মনীশদা কাঁপা গলায় বললে, 'আমি ঘোষের অফিসে গিয়েছিলুম, কাজ ছিল। কিন্তু ব্যাপার কী? অমন করছ কেন উমা?'

দিদি এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল। 'টিনটিনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

অন্য ফ্ল্যাটগুলো থেকে অনেকগুলো মুখ উঁকি মেরেছে তখন।

মনীশ আর টুলু পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। শাদা হয়ে গেল মনীশের মুখ, থর থর করে কাঁপতে লাগল ঠোঁট।

'কী বলছ তুমি? পাওয়া যাচ্ছে না মানে?'

'পাওয়া যাচ্ছে না—স্কুল থেকে সে ফেরে নি। স্কুলে নেই, তার বন্ধুদের বাড়ি কোথাও যায় নি।'—উমা কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল মাটির ওপর: 'ওগো, কোথায় গেল আমার মেয়ে—ফিরিয়ে আনো- যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো তাকে—'

দিদি এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম। অবিকল আরো দশজন বাঙালী মেয়ের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল: 'ফিরিয়ে আনো, আমার টিনটিনকে ফিরিয়ে আনো—'

[ক্রমশ]

॥ এক ॥

"আমার প্রশংসায় কাজ নেই—
ধর্ম-অধর্মের অতীত
কার্য-কারণ থেকে পৃথক
অতীত অনাগত বর্তমান থেকেও ভিন্ন
যা তুমি জানো
আমাকে বলো!"

—যমের প্রতি নচিকেতা
(কঠোপনিষদ: অনুবাদ সুভাষ
মুখোপাধ্যায়)

●

সুকান্তকে নিবেদিত 'উজ্জীবন' কবিতায় সুভাষ কঠোপনিষদ থেকে যে উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছেন, উপনিষদের পৃষ্ঠায় তা একজন কিশোর মানুষের জ্ঞানপিপাসাতেই চিরদিনের জন্য নিবেদিত। অবশ্যই ঐ কিশোরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল, কেন না তাঁর পিতা যজ্ঞের জন্য যে গাভী দান করেছিলেন, সেখানে চাতুরী এবং ফাঁকি ছিল। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলেও নচিকেতা কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে ত্যাগ করেন নি। সম্মুখের তমসাকে যা তাঁর পিতার অজ্ঞানতা, সম্পূর্ণই অতিক্রম করে তিনি আরো বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন; কেন না, তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল।

আমার মনে হয়, ঐ প্রশ্নকে যমের সম্মুখে উপস্থিত করার অধিকার শুধু সেই মানুষেরই থাকে, যিনি জ্ঞাত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে অজ্ঞাত সত্যকে জানবার পিপাসায় অধিকতর আর্ত: এবং যাঁর জীবনে অন্তত একবার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, এমন স্বপ্ন, যা তাঁর নিজস্ব অস্তিত্বের তুলনায় অধিক মূল্যবান।

বিশেষ করে আমি 'স্বপ্নভঙ্গ' কথাটির ওপর জোর দিচ্ছি এই কারণেই যে, অত্যন্ত কোন মানুষ জীবিত অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে না। অবশ্যই, অনুরূপ অস্থির, প্রায় উন্মাদ হয়ে যাওয়ার মুহূর্তেও যিনি বিচলিত হন না, এবং অত্যন্ত ধৈর্য ধরে যমকেই বারবার জিজ্ঞাসা করেন, 'এই মৃত্যুর পর কোন্ জীবন?' —তিনি আমাদের নমস্য এবং এই কারণেই, আমাদের কাছে প্রশ্নকর্তার যে চেহারাটি ভেসে ওঠে, তা একজন অভিজ্ঞ মানুষের, যদিও জ্ঞানলাভের পিপাসায় তিনি শিশুর মতই সরল হতে পারেন।

॥ দুই ॥

এমন কয়েকজন মানুষকেই আমি কল্পনা করতে পারি, যাঁদের সঙ্গে নচিকেতার তুলনা করা যায়। অবশ্যই কিশোর সুকান্তর চেহারা আমার কাছে অন্য রকম, কেন না, সত্যকে জানবার জন্য নয়, জ্ঞাত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন। হয়তো নচিকেতাও তাঁর জ্ঞাত সত্যকে মর্যাদা দেবার জন্য নিজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করেছিলেন, কিন্তু আমরা জানি তাঁর মনে অন্য গভীর প্রশ্ন ছিল। আমার বিশ্বাস, এই প্রশ্ন, যা অজ্ঞাত সত্যকে জানবার পিপাসা, সুকান্তর তুলনায় সুভাষের চরিত্রেই অধিকতর নিহিত ছিল, এবং এই জিজ্ঞাসা ক্রমেই তাঁকে জ্ঞাত সত্য থেকে দূরে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি না, ইতিমধ্যেই সুভাষের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটিতে কোন-রূপ চির ধরেছে কি না। তিনি কখনো এমন কোনো দৃশ্য দেখেছেন কি না, পিতার সমান শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা যজ্ঞ করছেন এবং যজ্ঞের দানস্বরূপ তাঁরা যা দিচ্ছেন, তা নিজেদের হৃৎপিণ্ড নয়, মৃত পশু-দের অস্থি আর পঞ্জর, যাদের মূল্য কানা-

এই ভয়ংকর দৃশ্য সুকান্তকে চাক্ষুষ দেখতে হয় নি; তার আগেই তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই দেশকে দু' টুকরো করার চীৎকার ও হুল্লোড়, যা এক বিরাট যজ্ঞশালার হৈ-হল্লাকেও ছাড়িয়ে যায়, নানা দিক থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেখানে যাঁদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে উঁচুতে উঠেছিল, তাঁরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ। সুকান্তর মনে এই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ বা প্রশ্ন ছিল না, বরং তাঁর পার্টির ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আগস্ট বিপ্লবের প্রতি পার্টির অস্বাভাবিক অনীহাতেও তিনি বিচলিত হন নি। যদিও সেদিনকার স্বাধীনতা যজ্ঞে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টি উলঙ্গ বুভুক্ষু বঞ্চিত স্বদেশবাসীদের, অর্থাৎ যারা স্বদেশের সর্বহারা, তাদের কি কি মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী দান করেছিল, তা একমাত্র চিন্মোহন সেহানবীশের মত বিজ্ঞ লোকদেরই আজ গবেষণার বিষয়।

॥ তিন ॥

আমি তাই নচিকেতার মত মুখের সন্ধান করি অন্য অভিজ্ঞ মানুষদের মধ্যে যাঁরা দ্বিখণ্ডিত জন্মভূমির যন্ত্রণায় জীবিত অবস্থাতেই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন; অথবা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য, স্বদেশের মাটিতে বিপ্লবের বীজ তখনই অঙ্কুরিত হবে না এই কঠিন সত্য জেনে নিয়ে যাঁরা দেশের বাইরে স্বাধীন সেনাবাহিনী গড়তে চেয়েছেন এবং সেই চেষ্টায় প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দিয়েছেন। আমার অভীষ্ট মানুষ খণ্ডিত ভিয়েত-নামের পাহাড়ে-জঙ্গলে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন। একবার তাঁর স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু ঐ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর

মানব এবং মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ সমর্পিত। হয়তো তিনি দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার আগেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, অন্য এক স্বাধীন দেশের মাটিতে, ভিয়েতনামের মানুষটির চেয়ে অনেক বেশি তিক্ততা বুকে নিয়ে, কিন্তু তাঁরই মত নিজের প্রত্যয়ে অটল থেকে। আবার, এমনও তো হতে পারে, দ্বিখণ্ডিত বাংলায় তিনি যেখানে পায়ের নিচে মাটি সেখানেই স্থির ছিলেন। স্বাধীন, নাকি স্বাধীন স্বদেশের জেলখানায় পিঞ্জরাবদ্ধ, সে চিন্তা পরে করা যাবে। আমরা বরং এই মুহূর্তে একটি মানুষের অতীতের দিকে চোখ তুলে তাকাতে চাই। হো চি মিন অথবা সুভাষচন্দ্রের মত ততটা ভাগ্যবান ছিলেন না তিনি। একথা ঠিক, তাঁর সমস্ত জীবন স্বদেশের এবং মানবসমাজের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত। পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী যুবশক্তিকে হয়তো তিনিই একদিন একত্রিত করেছিলেন। অথবা তিনি একা নন, তাঁর মত কয়েকজন নির্ভীক মানুষ। তারপর একদিন কিন্তু তাঁর এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি হিমালয়ের সমান ব্যর্থ, তাঁর স্বদেশ এখন অন্য রকম মানুষদের নেতৃত্ব কামনা করে। পরাজয়ের এখানেই শেষ নয়। তাঁর চোখের সামনে নিকৃষ্ট মানুষদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ নিজেকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হতে দিয়েছে; অর্জন করেছে এক অদ্ভুত বিকৃত স্বাধীনতা, যার ফলে দেশের অর্ধ-উলঙ্গ মানুষগুলি সম্পূর্ণই উলঙ্গ হয়েছে, আর যেখানে যতটুকু শস্য-শ্যামলা মাটি ছিল, তাও ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাদের পায়ের নিচের মাটিতেও যেন আগুনের তাপ লেগেছে। এক বাংলা থেকে অন্য বাংলায় ভুয়া-স্বাধীনতার তাড়া-খাওয়া মানুষগুলো আশ্রয়ের জন্য, দু' মুঠো অন্নের জন্য নির্লজ্জ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। একদিন যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের 'মহারাজ' ছিলেন, স্বাধীন জন্মভূমির এই সর্বনাশা চেহারাটাই তিনি দীর্ঘকাল ধরে দেখে এসেছেন। এবং আরো বীভৎস কিছু দৃশ্য—সাম্প্রদায়িকতা, বিনা অপরাধে নরহত্যা, দাঙ্গার চেয়েও যা বেশি খারাপ; যখন লড়াই করার মত প্রতিপক্ষ নেই।

কিন্তু যাঁদেরই নাম আমরা উপনিষদের কিশোর নায়কের সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করি, তাঁরা সকলেই অত্যন্ত কঠিন মানুষ। বারবার স্বপ্নভঙ্গের বেদনাগুলিকে তাঁরা সহ্য করেন এবং মনে করেন, এ-ও একরকমের অভিজ্ঞতা, যা থেকে ভবিষ্যতের পথ চলার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁরা একথাও জানেন, মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হলে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের প্রয়োজন আছে এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই যখন মহারাজের মত মানুষকেও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মীরা একে একে ছেড়ে চলে যান, সকলেই অন্যত্র, অন্য এক স্বাধীন দেশে তাঁদের জন্য নিরাপদ ঘর আছে মনে করেন, যে যাঁর জীবনের শপথ ও ব্রতকে বিসর্জন দিয়ে এবার পুরস্কৃত হবার সময় এসেছে মনে করেন, তখনো মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকেন, পায়ের নিচে যেখানে তাঁর জন্মভূমির মাটি স্থির রয়ে গেছে, সেখানেই অপেক্ষা করেন পালা বদলের দিনটির জন্য। পুরাতন বন্ধুদের তিনি এই বলে ক্ষমা করেন যে, হয়তো সবাই কাপুরুষ বা পুরস্কারলোভী নন; তাঁদের মধ্যে এমন মানুষই বেশি, যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, এখন খণ্ডিত পাকিস্তানের চেয়ে খণ্ডিত ভারতেই তাঁদের স্বপ্নকে সফল করার সময় ও সুযোগ বেশি। হয়তো পশ্চিম বাংলাতেই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার কাজ নিয়েছেন তাঁরা। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তাঁর নিজস্ব কাজটিও ইতিমধ্যে

> **শ্রীগোপালচন্দ্র সেন নির্যাতিত প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী। এখনো পর্যন্ত তিনি অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য। স্বর্গত মহারাজের তিনি অন্তরঙ্গ অনুজ সুহৃদ। মহারাজ যখন পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন, তখনো শ্রীসেন তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন।**
>
> **'মহারাজের সঙ্গে কয়েকদিন' লেখাটিতে ভারত সফরে মহারাজের কয়েকটি কর্মব্যাপ্ত দিনের ছবিই শুধু ফুটে ওঠে নি, এতে পুরাতন দিনগুলিও যেন মুখর হয়ে উঠেছে।**
>
> **সঃ সাঃ ব**

বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন মৃত্যুর মতই ভয়ংকর অভিজ্ঞতাগুলোর জন্য এবং সময় হলেই যমকে প্রশ্ন করবেন, 'এইসব মৃত্যুর পর আর কি আছে, আমাকে জানাও!' তিনি স্থির জানতেন, একদিন না একদিন যমকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; কেন না, মৃত্যুর পর মানুষের জন্য যা রয়েছে, তা তো নবজন্ম।

এই নবজন্ম, হো চি মিন জেনেছিলেন, ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যা আমাদের চোখের সামনেই আজ দ্রুত স্পষ্ট হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র কি একই স্বপ্ন দেখেন নি? সেদিনকার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই বা আজ কোথায়? ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী'ও তাঁর প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। তিনি জেনেছেন, দুই বাংলার যুবশক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে অসাম্যের, শোষণের, সাম্প্রদায়িকতার মরণবাণ। তাঁর এই পুনর্জন্ম কি আমাদের চোখে কিছুটা বিবর্ণ মনে হচ্ছে? তিনি আমাদের জন্য কোন বজ্রকণ্ঠ শপথের উচ্চারণ করেন নি; বরং দুই বাংলার গুটিকয়, অথবা কয়েক হাজার, অথবা কয়েক লক্ষ যুবক-যুবতীই যে তাঁর মত প্রবীণ লোকদের সঠিক নেতৃত্ব দেবে এরকম শিশুসুলভ(?) কথা কত সহজেই কলকাতায় আর ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরে বিনা দ্বিধায় এবং বিনা অভিমানে উচ্চারণ করে গেলেন! তিনি কি আমাদের অভিমানে আর অহংকারেও কিছুটা ঘা দেন নি?

আমাদের এখনও বুঝতে কষ্ট হয়, নচিকেতার আসল চরিত্র কী ছিল। 'আমার প্রশংসায় কাজ নেই'—নচিকেতারা প্রশংসার জন্য, নেতৃত্বের জন্য, অভিমান এবং অহংকারকে বুকের মধ্যে পুষে রাখার জন্য স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেন না। তাঁরা সমস্ত জীবন ধরে সত্য কি, তাই জানতে চান। কিন্তু তাঁদের এই জ্ঞানপিপাসার পিছনেও গভীরতর মূল্যবোধ নিহিত আছে, যার স্পষ্ট উচ্চারণ 'মানুষ' এবং 'মনুষ্যত্ব'।

আমি নচিকেতা নই। কোন কোমল-হৃদয় কবিই (আর, কবিমাত্রই নিজেকে সামান্য ভালবাসেন) নচিকেতা হতে পারেন না, যদি না তিনি কলম ছুড়ে দিয়ে অন্য কিছু তাঁর হাতের মুঠোয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কবিতা লিখি বলেই আমার কাছে লেনিন, বিদ্যাসাগর হো চি মিন অথবা সুভাষচন্দ্রের, যতীন দাসের, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর, অথবা নকশালবাড়ির কোন এক অজ্ঞাতনামা ছাত্রের মুখ এক সময় একাকার হয়ে যায়। কার কতটুকু সাফল্য, কার কতখানি ব্যর্থতা, এই ধরনের হিসাব কষে আমি নিজেকে ছোট করবো না। এসময়ে যদি নজরুল বা সুকান্তর মত কবি-যোদ্ধাদের মুখগুলিও আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়, তাঁদের থেকে চোখ ঘুরিয়ে নেবো, এমন স্পর্ধাও আমার নেই। আমরা সেই মৃত্যুত্তীর্ণ মানুষদের মিছিলকেই বুকের মধ্যে অনুভব করতে চাই, যাঁরা অন্ধকার দিনগুলিকে এবং অন্ধকারের চেয়েও ভীষণতর পশু-মানুষদের হীনতা, লোভ, পাশবিক উত্তেজনাকে নিজেদের রক্তে ধুয়ে-মুছে দিয়ে আমাদের জন্য, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য সুস্থ, স্বাভাবিক ও মানবিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। আমাদের মধ্যে তাঁরাই প্রকৃত মানুষ এবং একমাত্র তাঁরাই মৃত্যুকে অতিক্রম করেছেন।

মহারাজ চলে গেলেন। ভারত-পাক উপমহাদেশের একজন খাঁটি, নির্ভেজাল, নির্ভীক, সর্বজনপ্রিয় মানুষ চলে গেলেন। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমার অনেক কথাই মনে আসছে। মহারাজ গত ২৪শে জুন চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা ত্রৈলোক্য মহারাজকে দেখার বাসনা আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। সেই বাসনা আমার পূর্ণ হল মহাজাতি সদনে সম্বর্ধনা সভায় গিয়ে। মহাজাতি সদনেই আমি সহজ সরল এই লোকপ্রিয় মানুষটিকে প্রথম দেখি। আমরা কয়েকজন ছাত্রী মিলে মহারাজকে দেখবার জন্য মহাজাতি সদনে গিয়েছিলাম। দেখলাম মঞ্চের ওপর মহারাজ বসে আছেন। স্থির-শান্ত মূর্তি, মুখে সরলতাপূর্ণ মৃদু হাসি। বেশ কিছু ছেলেমেয়ে লাইন দিয়ে মহারাজকে প্রণাম করছে। তিনি সকলেরই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। আমি মহারাজের কাছাকাছি যাবার জন্য এগিয়ে গেলে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এসে আমাকে বাধা দিল। আমি তখন পেছনের গেট দিয়ে গিয়ে মঞ্চে উঠলাম। লাইনে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে লাইন অগ্রসর হতে লাগল। কেউ কেউ শুধু প্রণাম করছিল। আবার অনেকে প্রণামের সংগে তাঁর অটোগ্রাফ নিচ্ছিল। একজন কর্মী এসে মহারাজকে বললেন, "মহারাজ আপনার কষ্ট হচ্ছে, এভাবে অটোগ্রাফ লিখতে লিখতে আপনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।" মহারাজ তৎক্ষণাৎ এর উত্তরে বললেন, "আমি তো শুধু এক লাইন সই করিয়া দিতেছি, লিখে দিতেছি—এতেই আমার কষ্ট হবে, আর ওরা যে দূর দূরান্ত থেকে কত কষ্ট করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।"

তার পর আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্তটি এল। আমি মহারাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি বিস্ময়ে এত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম যে, ভাবতেই পারছিলাম না আমি সত্যিই মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পেছনের একটি মেয়ের ধাক্কায় আমি কল্পলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। মহারাজকে প্রণাম করতে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং অতি পরিচিতের হাসি হেসে বললেন—পাশে বসো। আমার মনে হল আমাকে দেখে তাঁর বোধ হয় অতীতের কথা মনে হল। তারপর আস্তে আস্তে প্রণামও শেষ হয়ে এল।

তিনি আমাদের উদ্দেশে বলতে আরম্ভ করলেন, "আমি পূর্ববঙ্গে শুনিয়াছি পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা দুর্বিনীত হইয়া গিয়াছে, তাহারা গুরুজনদের মর্যাদা দিতে জানে না। আজ আমার সেই ভুল ভাঙিয়া গেল। এই ছেলেমেয়েদের দেখিয়া আমার অতীতের কথা মনে হইতেছে। এরা গুরুজনদের মর্যাদা ঠিকই দিতে জানে। এখানে ছাত্রদের মধ্যে যদি কিছু অন্যায় ঢুকিয়া থাকে, তবে তার জন্য দায়ী তাহারা নয়, দায়ী আমাদের দেশের কর্ণধারেরা।

"স্বাধীনতা লাভের পর জাতি গঠনের বা জাতীয় চরিত্র গঠনের কোন চেষ্টাই হয় নাই। বৃটিশ ভারত-পাকিস্তান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার সময় তাহাদের সমস্ত আবর্জনা-দুর্নীতি আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে। আমরা তাহার জের টানিতেছি। জাতির সম্মুখে ত্যাগের কোন আদর্শ না থাকিলে জাতি কি করিয়া গড়িয়া উঠিবে? আমাদের যুবকদের সম্মুখে ত্যাগের কোন আদর্শ আছে কি? তাহারা কি দেখিতে পায়?

"শৈশব হইতে দেখিতে পায় দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিতে পারিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। ঘুষ না দিলে কোন কাজ হয় না, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয় না, যাহার প্রচুর অর্থ আছে তিনিই বড়লোক, তিনিই দেশের মধ্যে গণ্যমান্য নেতা। যাহারা সৎ লোক সাধারণত তাহারা গরীব, কেহ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না।

"বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ সংস্কার। বর্তমানে দরকার দূষিত আবহাওয়ার পরিবর্তন করিয়া নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা। ইহার মূল হইবে দেশপ্রেম। দেশপ্রেম থাকিলে প্রত্যেকেই মনে করিবে আমি জাতির সেবা করিতেছি; তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইবে।"

এই কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজের মুখমণ্ডল অদ্ভুত দৃঢ়তা ও উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। [illegible] জীবনে ত্যাগ ও আদর্শের প্রেরণায় যে জননায়ক জাতিকে নতুন পথ দেখিয়েছেন, অশীতিপর বয়সে তাঁর পক্ষেই শুধু যুব-ছাত্র সমাজের প্রতি এই আহ্বান দেওয়া সাজে।

সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন স্তরে আজ যে দারুণ কৃত্রিমতা, অধৈর্য, লক্ষ্যহীন উত্তেজনা, সময়ে সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতার বেপরোয়া প্রকাশ ঘটছে, তার মূল কারণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, দেশপ্রেমের অভাবই আজ সমাজজীবনকে পঙ্গু করে তুলেছে। ত্রৈলোক্য মহারাজের মতন সর্বত্যাগী আদর্শবাদী নেতাই আজ এই বিপর্যস্ত সমাজজীবনে নতুন আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারতেন।

অনেক দিন যাবৎই মহারাজের ভারত ইউনিয়নে আসার ব্যাপারে পত্রালাপ হইতেছিল। তিনি প্রায়ই জানাইয়াছেন, পাকিস্তান তাঁহাকে পাশপোর্ট দিতেছে না। তাই তাঁহার ভারতে আসা সম্ভবপর হইতেছে না, যদিও তাঁহার সহকর্মী ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রাণের খুবই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। হঠাৎ জুন মাসে একদিন অনুশীলন ভবন হইতে টেলিফোনে জানিতে পারিলাম মহারাজ পাশপোর্ট পাইয়াছেন এবং ২৪শে জুন সকালে বনগাঁ সীমান্ত পার হইয়া ভারতে আসিবেন। সংবাদটা পাইয়া মন আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম কেমন করিয়া এত সকালে বনগাঁ পৌঁছিব। অনুশীলন ভবনের শ্রীসত্য ঘটক আমাকে বলিলেন যে, সুলেখা কোং-এর মালিক শ্রীশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ও তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিতে বনগাঁ যাইবেন। শঙ্করবাবু আমার প্রতিবেশী, যাদবপুরে থাকেন। রাত্রি ৯টায় শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সহিত বনগাঁ যাওয়া স্থির করিয়া নিলাম। পরদিন সকাল ৫টায় আমরা বনগাঁ চেকপোস্টে পৌঁছিলাম। আমরা সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই মহারাজ তথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। লোকে লোকারণ্য, চেকপোস্টের বাঁশটা উঠাইয়া দিতেই মহারাজ ভারতে পদার্পণ করিলেন। আমি তখনও অনেক দূরে। হঠাৎ একটা মানুষের ভীড় আমাকে মহারাজের নিকটে ঠেলিয়া লইয়া গেল। আমাকে দেখিয়া তিনি ঘাড়ে হাত দিয়া বলিলেন "আসিয়াছেন?" এবং আমাকে লইয়া একখানা বেঞ্চের নিকট গেলেন। এক মিনিট পরেই তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি পাকিস্তানের নাগরিক এবং এখানে এক মাস থাকিয়াই পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইব।" একটু পরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম। তিনি শ্রীযুক্ত পরেশ চ্যাটার্জি মহাশয়ের গাড়ি চড়িলেন আর আমি শ্রীশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ের গাড়িতে পুরে তাঁহার ভাইপো শ্রীজিতেন চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে পৌঁছিলাম। তখন হইতেই মহারাজের সঙ্গে অনেক সময় কাটাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলায় রোজই তাঁহার নিকট যাইতাম, দেখিতাম ঘর ভর্তি লোক। যাহার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন করিতেছেন আর তিনি উত্তর দিতেছেন। তাঁহাকে ডাক্তাররা বিশ্রাম নিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রি ১১টার পূর্বে তাঁহাকে বিশ্রাম লইতে দেখি নাই। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও তাঁহার নিকট আসিত এবং বসিবার জায়গার অভাবে মাটিতে বসিয়া যাইত। তাহাদের তিনি উপদেশ দিতেন, তোমরা পরীক্ষায় নকল করিবে না, চরিত্রবান হইবে, কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না। অধিক কথা বললে শরীর খারাপ হইতে পারে ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বেশি কথা বলিতে নিষেধ করিলে ক্রুদ্ধ হইতেন এবং বলিতেন, "আমি এখানে সকলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; আমি কি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিব? ডাক্তাররা ত অনেক কিছুই বলে, তাহাদের কথা শুনিলে কোন কাজই হইতে পারে না। সুতরাং আমি তাহাদের কথা মানিয়া চলিতে পারি না।" তিনি আরও বলিতেন, আমি ভারতে আমার যে সব সহকর্মী ও আত্মীয় আছেন তাঁহাদের সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি অধ্যাপক জ্যোতিও ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিবেন। চন্দননগরে তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। চন্দননগরে মহারাজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়কে কত প্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। বুঝিলাম সহকর্মীদের জন্য তাঁহার কত প্রেম ও ভালবাসা।

তারপর আমরা মহারাজের সঙ্গে বহরমপুরে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। প্রভাসদা শয্যাগত, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়াই থাকেন। পঞ্জতেশ লাহিড়ী মহাশয়ের ছেলে শ্রীদিবোশ লাহিড়ী তাঁহাকে প্রভাসদার ঘরে লইয়া গেলেন। মহারাজ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভাসদা কাঁদিতে লাগিলেন। বুঝিলাম সহকর্মীর জন্য কত প্রেম কত ভালবাসা। সেখান হইতে কলিকাতা ফিরিবার সময় তিনি বলিলেন, "আমি ফুলিয়া যাইব। সেখানে আমাদের গ্রামের একটি বিধবা দুঃস্থা মেয়ে থাকে তাহাকে দেখিয়া যাইতেই হইবে। তাহার ঠিকানা তিনি জানেন না। আমরা যে বাড়িতে উঠিলাম সেই বাড়ির একটি মহিলাকে নাম বলায় তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে লইয়া আসিলেন। উক্ত মহিলাটিকে দেখিয়া তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দিনান্তে খাওয়া জোটে কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন। কত স্নেহ কত মমতামাখা তাঁহার কথাগুলি তাহা আর কি বলিব। বলিলেন, আমি দেশে ফিরিয়া তোমার বাবাকে (যিনি কাপাসাটিয়া গ্রামের পোস্ট মাস্টার) তোমার কথা সব বলিব।

মহারাজ ফিরিবার সময় দাদপুর নামে একটা গ্রামে নামিলেন। ঐ গ্রামটা বহরমপুর জেলায়। প্রায় সবই মুসলমান বাসিন্দা। তাহাদের নিকট বলিলেন, পাকিস্তানে এখন হিন্দু-মুসলমান বলিয়া পার্থক্য কেহ রাখে না, তাহারা সকলেই বলে, "আমরা বাঙ্গালী, বাংলা আমার দেশ।" দ্বিজাতীয় ভাব এখন মোটেই নাই।

আমার প্রতি স্নেহ-মমতার কথা কত বলিব। সর্বদাই তাঁর সঙ্গে রাখিবার কেমন যেন একটা আগ্রহ। তিনি যখন দিল্লী যান তখন আমাকে তাঁর সঙ্গে দিল্লী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। যখন গাড়ি ছাড়ে তখনও বলিলেন, "গোপালবাবু ফার্স্ট ক্লাশে একটা সিট রিজার্ভ করা আছে, তাহাতেই উঠিয়া পড়ুন।" আমি বলিলাম, কাপড় আনি নাই বা বাসায়ও বলিয়া আসি নাই, সুতরাং কেমন করিয়া যাই!" যাওয়া হইল না,

মিত্রেন্দ

মিনি' অবসানকালে

মিনি, মিনি, মিনি! যা নিয়ে এতো চাকচক্য, মাত্র ক'টা দিন তাই নিয়ে কলকাতা যেন ছিনিমিনি খেলল। কত টেলর যে কত দামি কাপড় বাড়তি লাভের সুযোগ পেলেন। কত স্ত্রী-অঙ্গ পোষাক স্বল্পতার দরুণ রোদে তাপে পুড়ে ঝলসে কুশ্রী হয়ে গেল। কত-কাল পরে বাঙলা ভাষায় একটি অদ্ভুত স্মার্ট শব্দের আমদানি হল। এবং কয়েকজন রাজনীতিক 'মিনি' খেলিয়ে পাল্টি অভিযোগের হুজ্জুত বাধিয়ে দিলেন তর্কাতর্কির আসরে। ঘন ঘন ঘরোয়া বৈঠক বসল নেতাদের। মিনিফ্রন্ট, মিনি মিনিস্ট্রির মাথা ব্যথা। তবে অবশ্য, এই মিনিস্রোতে জোয়ার-ভাটার ধাক্কায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি শুধু একটি চিজ, মিনিবুক। সব যখন ডুবু ডুবু, মিনিবুক পেপার স্টলের তক্তা আঁকড়ে ভরে গেছে সবার অলক্ষ্যে। কিন্তু মিনি স্কার্ট চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটে পা পাততে না পাততেই অবসোলেট।

পয়সাওয়ালা ঘরে ফ্যাশন আসে যায়, গায়ে লাগে না। কিন্তু যে সব মধ্যবিত্ত ঘরে স্কার্টেরা বসল 'ব্লাউজ' ওয়ারড্রোব অধিকার করেছিল, মুস্কিল হয়েছে সেই সব হতভাগ্য সাংসারিক-দেরই। মিনি ব্লাউজ এখন ফেলে দেওয়াও যায় না, আবার গায়ে চাপালে শুধু পরাভনী নয়, ঝঞ্ঝাট আর সাংঘাতিক সব বিপদের সামনে পড়তে হচ্ছে। শুনছি, মিনি ব্লাউজের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু হয়েছে পথে-ঘাটে। 'অপারেশন মিনি'র ধ্বজাধারীরা নাকি দাড়িকামানো ব্লেড সহযোগে সার্জিক্যাল অপারেশনে নেমেছেন। সাদা-কালো দুধ-আলতা খোলা-পেট, খোলা-পিঠ, খোলা হাত কখন অজ্ঞাতসারে চিরে দিচ্ছে তারা জনবহুল রাজপথে। অথচ ফ্যাশনের ঢেউ যে-সব মধ্যবিত্ত সংসারে আছাড় খেয়েছিল, রাতারাতি বোনের, বৌয়ের আর একপ্রস্থ জামা বানাবার সংস্থান নেই সেই সব সংসারের। হত-ভাগ্য তাদেরই, ভয়ঙ্কর মহানগরীর পথে বিকারগ্রস্ত পারভার্টেড ব্লেডের আক্রমণ থেকে এখন আত্মরক্ষাই এক সমস্যা। শহর কলকাতার অ-ভূত-পূর্ব সমস্যা। অথচ এই অমানবিক মোকাবেলার কোনো বাস্তবিক প্রয়োজনই ছিল না। মিনি ব্লাউজের মিনিসুখ যেহেতু ফ্যাশন, অত-এব তার দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার উপায় নেই। শারদীয় মেঘের মতই ফ্যাশনের আবির্ভাব। হাল্কা পক্ষে ভর দিয়ে যেমন আসে, হাল্কা পাখায় ভর করেই তেমনি অদৃশ্য হয়ে যায় আপনা থেকে।

বল-বটম ট্রাউজার এখন ফ্যাশন-চটুল না, লালালা মেয়েদের শোড়াশি ছুঁয়েছে। অতএব মিনি যে ইলেকট্রিক চুল্লীতে চড়ল অথবা গোরস্থ হ'ল এতে আর সন্দেহ কি? কলকাতার হৃৎকেন্দ্রে এখন বর্মী লুঙ্গী, ফিতে বাঁধা প্যান্ট, নিম্নাঙ্গ চওড়া পাজামা, যা লক্কা পায়রার পায়ের মতো অধিকাংশ শ্রীচরণেষু। তবু আটপৌরে কলকাতায় মরা সাহেবের কোটের মতো মেয়ে-অঙ্গে মিনি জামা এখনো দিনকয় চলবেই, কেন না পাড়াবিশেষে যত সাধ তত সাধ্য নেই মানুষজনের। তবু কুব্জারও চিৎ হয়ে শোওয়ার বাসনা হয়েছিল সেদিন। ফ্যাশানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার এই সব মিনি সুখ। এটুকুর ওপর আর আক্রমণ কেন? যে মহৎ ক্ষুদে সংস্কারকের দল চোরের মতো ব্লেড পকেটে স্ত্রী-অঙ্গ চৌচির করে বেড়াচ্ছেন বলে খবর, তাঁরা ব্লেডে টান দিয়ে আক্রান্তার মুখ দেখলেই হয়ত টের পাবেন, ও-মুখ বুর্জোয়ামুখ নয় ; ঘিয়ে-দুধে ও শরীর নবনীতো নয়। ওসব মুখ আক্রমণকারীদেরই প্রতিবেশিনী, চাই কি জায়া-জননী ভগিনী-ভাগি-নেয়ীরও হতে পারে। সুতরাং কেন এই মিছে মাতব্বরী! ও জামা এমনিই শখানের খাতায় উঠবে। জমার খাতায় পুজোবোনাস পড়লেই মধ্যবিত্ত কলকাতাকে দেখা যাবে ম্যাক্সিযুগের সাজ পরে পথে নামতে। মিনি অবসানকালে, সুতরাং, মড়া খুঁচিয়ে কাঁধকাটের দায়িত্ব না পালনেও চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলের ফ্যাশন-ঘৃতে ও বারুদে আপনি চড় চড় করে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[illegible] তের স্বতন্ত্র [illegible] জমা হয়ে আছে। নরসুন্দর সংস্কারকগণ নারী ছেড়ে অতঃপর নরায় মনঃসংযোগ করতে পারেন। তোবড়া চুমড়ানো গালে রেটে লম্বা জুলফি বাড়ছে তাতে দেশটার অষ্টাদশ শতকে প্রত্যাবর্তনে আর বিলম্ব নেই। এ্যাক-শনের যুগে এই মহতী রিয়্যাকশনের বিপত্তি অবিলম্বে বন্ধ না হলে জুলফির প্রতিক্রিয়ায় সামন্ততান্ত্রিক ফ্যাশিস্ত মনোভাব গজিয়ে উঠতে পারে।

পুং মুখে লম্বা জুলফি পুরুষ-কারের লক্ষণ বলে ভুল করার কারণ নেই। বরং ওটা বীভৎস, বিশেষ বাঙালী লালিমা পাল পুং মুখাবয়বে। নরসুন্দর সমাজ সংস্কারকের ব্লেড অতঃপর গালে গালে ক্ষৌরকর্ম করলে বোধ হয় একটা কাজের কাজ হবে।

কারণ লম্বা জুলফির স্ট্যাটিসটিকস বড় দুশ্চিন্তাজাগরুক। আশুতোষ মুখুজ্যে রোডের ওপর সেদিন স্ট্যাটিস-টিকস সংগ্রহ করছিলাম। তখন বেলা পড়ে এলেও, যে বয়সে জুলফি মানায় তাঁদের সান্ধ্য আড্ডার ডাক পশ্চিম দিগঙ্গন থেকে তখনও ভরাট গলায় ঝুঁকে পড়ে নি। তাতেই পনের মিনিটে পঞ্চাশটি লম্বা জুলফি পাশ করে যেতে দেখলাম। সরু প্যান্ট, ছুঁচো জুতো, লম্বা জুলফি রাস্তার একদিকের ফুট-পাতে মিনিটে তিন পূর্ণ একের তিন। ঐ সময় তা ছাড়াও আবার পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই ছিল সমধিক। ছিলেন বৃদ্ধ শিশু কিশোর নাগরিক এবং না হোক কিছু টাকমাথা লোক তো বটেই। তা ছাড়া জুলফি নিয়ে চিন্তা করার যাদের অবসর কম, এমন মুটে-মজুর-মুদ্দোফরাসও ছিলেন পর্যাপ্তিক। সর্বোপরি নির্বাচিত স্থানটি লোকনেত্রে মোটেই নামকরা জায়গা নয়। তাতেই এতো। না জানি অফিস টাইমে চৌরঙ্গী বি বি ডি বাগ, শিয়ালদা হ্যারিসন, বৌবাজার, হাওড়া স্টেশনের অবস্থা কী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার বিনা নোটিশে এতো জুলফি গজগজিয়ে উঠল কী করে। এখনো অসংখ্য মুখে জুলফি-লক্ষ্য দাড়ির চাষ চলছে। তামাম কলকাতা দু দিন পরে জুলফিময় হয়ে উঠবে। এখন শুধু বিজ্ঞাপনের অপেক্ষাঃ আমরা দায়িত্ব নিয়ে লেটেস্ট ডিজাইন জুলফি বানাইয়া থাকি। জুলফি কাটিং-এ বিশেষ অভিজ্ঞ হেয়ার কাটার একমাত্র এখানেই পাবেন। ভবদীয় নফরচন্দ্র পরামাণিক, প্রোঃ 'স্টাইলো জুলফি' অথবা 'স্টাইল দ্য জুলফি'! চাই কি এমন হ্যান্ডবিল হাতে আসাও অসম্ভব নয়, উত্তম জুলফি ছাঁটাই-এর জন্য যেখানে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊন-বিংশ শতকের প্রথম দিবসের মনীষীদের

ঙ্কারিত সার্টিফিকেট মুদ্রিত আছে। বদেশী তো বটেই, প্রদেশী-ও। জুলফির ন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন আছে। কারণ জুলফি শুধু কর্ণমূল-প্রলম্বিত রোম-রাজি হলেই চলছে না। লম্বা জুলফির র রকম ফেরও চোখে পড়ল। কারও ময়ে-হাতের ঘড়ি-ব্যান্ডের মতো সমান বং পাতলা (আধুনিক তাগা-টাইপ নয়)। টাইপ রিবনের মতো অল্প ইঞ্চি চওড়া করে যায়। কারো আবার নিচ দিকে ঠোঁটের কষ পর্যন্ত ত্রিকোণিক।

এসব জুলফি ছেলেবেলার বারো-য়ারী থিয়েটারের স্টেজে কারভালোর ভূমিকায় কালা সাহেবের গালে দেখেছি। কসাই এবং নিষিদ্ধ পাড়ার দালালদের চওড়া চোয়ালে জুলফি-বাহার কোনকালে স্টাইল বলে মনে হয় নি। অথচ ও বস্তু আজন্ম দেখে আসছি আমরা। ঐ গাল থেকেই লম্বা জুলফি নিষ্ঠুরতা ও নারকীয় বীভৎসতার প্রতীক হয়ে আছে মনে মনে। উদলো গা রঘু ডাকাতদেরও মনোমত জুলফি ঐ

[৪৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

"কোন মানুষ
বা কোন দেশ
অপরকে ঘৃণা করে
বাঁচতে পারেনা"

স্বামী বিবেকানন্দ

প্রাণের মানুষ মহারাজ

মহারাজের আকস্মিক অন্তর্ধানে ভারতবাসী যে কি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু অতীব দুঃখের সংগে লক্ষ্য করলুম যে, পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই দুঃসংবাদে তেমন কোন শোক প্রকাশের চিহ্ন নেই। আজ এই মুহূর্তে লক্ষ্য করছি, ভারতীয় বেতার-কেন্দ্রগুলি থেকে যখন এক শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তখন পাকিস্তান বেতার এ বিষয়ে এমনই নীরব ও উদাসীন যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। পাকিস্তান সরকারের এই হীনমন্য আচরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মহারাজের ভারত সফর পাক সরকারের কতখানি অনভিপ্রেত ছিল— যিনি দীর্ঘ চেষ্টা চরিত্রের পরই মাত্র ভারতে আসার অনুমতি লাভ করেছিলেন। আমরা মনে-প্রাণে আশা করেছিলুম যে, মহারাজের মরদেহ তাঁর স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাক সরকার নিশ্চয় বিশেষ আগ্রহী হবে; কিন্তু পাক সরকারের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, মহারাজের মৃত্যুতে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

অথচ প্যাক সরকার হয়ত বা ভেবেছিল, মহারাজের আচার-আচরণে তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় নি। অর্থাৎ মহারাজ এদেশে এসে পাকিস্তানের কোন কুৎসা প্রচার করেন নি। বরং তিনি সে দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কারমুক্ত মনের কথাই এদেশের মানুষের কাছে ব্যক্ত করে দু' দেশের মৈত্রীর বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে চেষ্টা করেছেন। এবং এদেশের মানুষরাও আশা করেছিল যে, এদের মনের কথাও ওদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের ভাব-ভালবাসার সম্পর্ককে তিনি আরও সুদৃঢ় করে তুলবেন। এটা ছিল মহারাজেরও অন্তরের একমাত্র কামনা। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, মহারাজ আর ফিরে গেলেন না।

এমন একদিন ছিল যখন মহারাজের অন্তরে একটিমাত্র বাসনাই জাগ্রত ছিল সর্বদা—মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসনমুক্ত করা। সেদিনই তাঁর অন্তরে নিঃসন্দেহে অংকিত হয়ে গিয়েছিল সেই ঈপ্সিত স্বাধীন ভারতবর্ষের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় রূপরেখা—একটা আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো। আর তারই মোহে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অমানুষিক লাঞ্ছনা-অত্যাচার সহ্য করেও অমিততেজে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, বীরদর্পে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর সেই লক্ষ্য-পথের শেষ প্রান্ত অবধি। কিন্তু মহারাজের সে বাসনা ঠিক পূর্ণ হয় নি। গন্তব্যস্থলে হাজির হয়েও সেই মঙ্গল ঈপ্সিত স্বাধীনতার রূপটি চোখে পড়ে

নি। সেদিন তিনি এক নিদারুণ আঘাত সহ্য করেছিলেন নীরবে। সেদিন তাঁর মত দেশপ্রেমিকদের অন্তরের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় নি। রাজনীতির দাবা-খেলায় স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ মানসিকতার চাপে পড়ে সেদিনকার ভুঁইফোড় নেতারা এমনই উন্মত্ত হয়েছিল যে, তাদের সেই স্বার্থ-দ্বন্দ্বের নগ্ন দৃশ্য তাঁকে যেন বিমূঢ় নির্বাক করে দিয়েছিল।

এবং আজও মহারাজ ওপার থেকে ছুটে এসেছিলেন তাঁর মনের কোণে আর একটি গোপন বাসনা লুকিয়ে রেখে। সে বাসনা হচ্ছে দু' দেশের জনসাধারণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার বাসনা, তাদের ভালবাসার সেই পূর্বতন অভিন্ন রূপটি ফিরিয়ে আনার বাসনা। প্রতিটি সভাসমিতি ও সাক্ষাৎকারে মহারাজ তাঁর সেই বাসনার কথাই ব্যক্ত করেছেন সবাইয়ের কাছে। সংসদ সদস্যদের প্রতিও তিনি সেই একই আবেদন জানিয়েছেন। মহারাজ বলেছিলেন, মৃত্যুর আগে তিনি শুধু দেখে যেতে চান—এই দু' দেশের মানুষের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতির আদান-প্রদান এবং পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনে সেখানকার গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল জনসাধারণের বিজয়োল্লাসের দৃশ্য। মহারাজ ছিলেন গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার এক মূর্ত প্রতীক।

বস্তুত মহারাজ ছিলেন এমনই এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ও উজ্জ্বল আদর্শ যে, আজকের দিনের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতাদের তাঁর কাছে নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যে-মানুষটা কৈশোরেই আত্মদান করলেন দেশের কাজে, যাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অর্ধেক সময় কেটে গেল কারার অন্ধকারে, সহ্য করলেন অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার, গদির মোহ যাঁকে টেনে আনতে পারল না ওপার থেকে এপারে, অন্ধকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে পড়ে থাকলেন নির্বাসিত, নিষ্পেষিত হয়ে—শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে। তিনি যে জাতির অন্তরে চিরদিন

অমর হয়ে থাকবেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দেশ বিভাগের তিনি যে কতখানি বিরোধী ছিলেন, মহারাজ সেটাই প্রমাণ করে গেছেন সমস্ত কিছু ভবিষ্যৎ জেনেও পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে এবং অন্তর দিয়ে পাকিস্তানেরই শুভ কামনা করে। অথচ পাকিস্তান সরকার তার কর্তব্য পালন করে নি।

—সেখ ওয়াশিম আলি
হাওড়া

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

কার্জন পার্কের অনশন মণ্ডপে শঙ্খধ্বনির মধ্যে যে চক্রান্তের জন্ম, গত ৩০শে জুলাই রাজ্যপাল আকস্মিকভাবে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে তার মৃত্যু ঘটালেন। বাস্তবে রাজ্যপালের ভূমিকা সামান্যই। এই চক্রান্ত বা চেষ্টার আসল নায়ক-নায়িকা যুক্তফ্রন্টের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। রাজ্যপাল এঁদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সেতুমাত্র। বাস্তব ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই চক্রান্ত যাঁরা শুরু থেকেই আঁচ করেছিলেন, যাঁরা প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন বিভিন্ন বক্তৃতায় কিংবা পত্র-পত্রিকায় (আপনাদের পত্রিকাতেও), তাঁদের একটি নির্দিষ্ট বামপন্থী দলের অনুগামী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিলো। এবারের (ষষ্ঠ সংখ্যা) সম্পাদকীয়তে এই সুনিপুণ চক্রান্তের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও এর জন্য কারোকে দোষারোপ করা হল না।

গত দশ মাসের বিভিন্ন সংখ্যা পড়ে মনে হোত আমরা বুঝি শ্রীঅজয় মুখার্জীকে পশ্চিম বাংলা নামক দেশটা ইজারা দিয়েছি। কেউ এ ব্যাপারে বিরোধিতা করলে তাকে বরদাস্ত করা হবে না। গত জুলাই মাসে ৯।১০ বার তিনি (যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী নন এবং কোনও গণ-আন্দোলনের নেতা হিসাবেও নন) রাজ্যপালের সাথে দেখা করেছেন। আপনারা তো কোনও লেখায় তার জন্য সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। এমন কি ২৯ তারিখেও অনেকক্ষণ তিনি রাজ্যপালের সাথে ছিলেন। দু'দিন আগে রাজ্যপাল দমদম এয়ার পোর্টে ঘোষণা করলেন—বিধানসভা ভেঙে দেবার কথা তিনি চিন্তা করছেন না, হঠাৎ কোনও নিগূঢ় কারণে তিনি তাঁর মত পাল্টালেন? এর থেকে এটাই কি প্রমাণ হয় না যে, শ্রীঅজয় মুখার্জী এবং রাজ্যপালের মধ্যে জুলাই মাসের সাক্ষাৎকারগুলো ছিলো ওই চক্রান্তের অংশ। আপনাদের সপ্তাহের বোঝাতেও সন্দেহ করা হয়েছে "বিধানসভাকে এই ভেবেই ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছে না—এই

পার্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। কিছু দল আর বাংলা কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে না থেকে সি পি এম-এর দিকে মুখ ফেরাবে।” তবে কি বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পূর্বেই রাজ্যপালকে বাংলা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো এবং তা হলে শ্রীঅজয় মুখার্জী বাংলা দেশের জনগণ এবং আট পার্টির প্রায় সকলকেই সন্দেহের চোখে দেখেন, এটা প্রমাণ হয় না কি? তর্কের খাতিরে যদি ধরা যায় বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে সি পি এম-কে সরকার গঠনে তৎপর হতে আট পার্টির কিছু দল সাহায্য করতো, তাতে বাধা কোথায়? তাহলে আসল উদ্দেশ্য ছিলো সি পি এম-কে কিছুতেই সরকার গঠন করতে দেওয়া যাবে না এবং এই উদ্দেশ্য ছিলো, সি পি এম-বিরোধী এখানকার বামপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সমস্ত দল সহ কেন্দ্রীয় সরকারের। কারণ যুক্তফ্রন্টের রাজত্বকালে চূড়ান্ত আইন-শৃংখলার অবনতির” জন্য নাকি সি পি এম পার্টি এবং সেই দলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু দায়ী। এই প্রসংগে আপনার ৯ই জুলাইয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য আমি পুনরুক্তি করতে চাই। রাষ্ট্রপতির শাসনকালে জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী না থাকা সত্ত্বেও আইন-শৃংখলার এই অবস্থা কেন? পত্র-পত্রিকায় গুণ্ডামি, ছিনতাই, রাহাজানিকে নকশালী আন্দোলনের নাম করে প্রচারের চেষ্টা কেন? এই সমস্তকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ বলে প্রচার করতে পারলে সি আর পি-কে পশ্চিম বাংলায় বহাল তবিয়তে রাখা চলে, তাই না? এই সম্পর্কে সমস্ত পত্র-পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী অংশ এবং আইন-শৃংখলার উন্নতিকল্পে অনশনকারী শ্রীঅজয় মুখার্জী নীরব কেন? দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের শুরু থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত বাংলা দেশের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে এইটুকুই বোঝা যায় যে, বাংলার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক উন্নতির গালভরা বুলির আড়ালে সি পি এম-বিরোধী দলগুলো নিজেদের নাক কেটে সি পি এম-এর যাত্রাভংগকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই নয় কি? মাত্র চার মাস আগে আপনারা লিখেছিলেন “রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘজীবী হউক”, কিন্তু আজ শ্রীঅজয় মুখার্জীর মত আপনারাও বুঝতে পেরেছেন, আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই এবারের (৬ষ্ঠ)

সংখ্যার নিবন্ধেই পুনর্নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এই বিষয়ে বাংলার প্রধান বামপন্থী একটি দল যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার বহু আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল, সরকার ভাঙার পর মুহূর্তেই নির্বাচনের জন্য সোচ্চার হয়েছিলো। তখন আপনাদের মত প্রগতিশীল পত্রিকাও তার এই চিন্তার বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। আর আজ বাস্তব ঘটনা উপলব্ধি করে সেই পার্টির শ্লোগানে গলা মেলাতে বাধ্য হচ্ছেন।

—শ্রীকণ্ঠ সেনগুপ্ত
মাগের বাজার, দমদম

শহর কলকাতা
[৪৭৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রকারই। তাই বলে কিন্তু জুলফিই বদ মেজাজের লক্ষণ, এমন বলতে পারি না। আমেরিকার মুক্তিদাতা ওয়াশিংটন থেকে বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ জেফারসন এণ্ড্রু জ্যাকসনদেরও ছিল আকর্ণ জুলফি। আমাদের মাইকেল মধুসূদন, ডিরোজিওর ছবিতেও জুলফির ইঙ্গিত। জুলফি ছিল অনেক ব্রিটিশ গভর্নরের। কিন্তু সেসব জুলফি বাবরি চুলের সংগে ভারসাম্য বজায় রাখত। পোষাকের দৌলতে, গলাবন্ধের চমৎকারিত্বে জুলফির একক উৎকট চেহারা অনেকটা মিনিমাইজড হয়ে যেত। আমার হাতের কাছে ফোটো এ্যালবামের অভাব, নয়ত বলতে পারতাম, ইংলণ্ডের কোন্ কোন্ রোমান্টিক কবির জুলফি ছিল আকর্ষণীয়। কিন্তু ঐ ফুলো-ফাঁপা ফুল স্লিভ জামা, ঘাড় ঢাকা কোট-কলার, গলাবন্ধ রুমালী ‘বো’ জুলফিকে ‘স্মার্ট’ করে তুলত। যেমন জজ সাহেবের ‘উইগ’ যদি পঞ্চাননতলার পাঁচুর মাথায় চাপান দেওয়া যায় তাহলে যেমন বিসদৃশ দেখায়, বাঙালী পুং-এর হাড়তোলা পাংশুটে মুখে লম্বা জুলফি তেমনি বেমানান, যা অষ্টাদশ শতকে হয়ত ছিল দেহে পোষাকে মানানসই মর্যাদার লক্ষণ। স্যার আশুতোষের বিখ্যাত গোঁফজোড়া শরৎচন্দ্রের মুখে চাপিয়ে দিলে কেমন লাগে?

সৌন্দর্য অসৌন্দর্যের জন্য নয়। ফ্যাশনের হাওয়ায়ই জুলফি চলছে, চলবে। নরসুন্দর সংস্কারকের ব্লেড শাণিয়ে না উঠলে হয়ত বেশ কিছুকালই চলবে। শুধু চমৎকারিত্বে হেরফের হতে পারে। লম্বমান জুলফি একই মধ্যে কনেমুখের চন্দনরেখার মত দুই গালে পাক মেরে ঊর্ধ্বমুখে শুঁড় তুলছে। সম্প্রতি এক ভদ্রলোককে পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে দাড়ি হাঁকাতে দেখছি, যিনি জুলফি, গালপাট্টা এবং দাড়ির সমন্বয় সাধন করে মুখাচ্ছন্ন [illegible] রোম গজিয়ে তুলেছেন। টকটকে ফর্সা মুখে রোমশ আইল্যান্ড দু'টি বড় বড় একজোড়া আঁচিলের মতো মনে হয়। তা এই ভদ্রলোক কয়েকবার চৌরঙ্গীতে পায়ে পায়ে পাক খেলে নয়া ফ্যাশন চালু হতে পারে। কিছু তোবড়া ভাঙা গাল রোমপালনের ফলে ঢাকা পড়বে হয়ত।

তবে হ্যাঁ, মিনিযুগে লম্বা জুলফি একটা পারুষিক বিদ্রোহ বটে। তবে বড্ড দেরি হয়ে গেছে, না? মিনি অবসানে ম্যাক্সিযুগের মাথা উঁকি মারছে। মায় দেশের রাজনীতিতেও মিনি মিনিস্ট্রির গয়া গংগা ঘটে ম্যাক্সিমাম সুবিধেভোগী আই এ এস আমলাদের রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে। এখন নিউ ওয়েভ চালাতে হলে লম্বা জুলফি কুপিয়ে কাটাই বাঞ্ছনীয়। গালে গালে রোমশ আইল্যান্ডই বা মন্দ কি? তা ছাড়া ফ্যাশন তো ভিসাস সার্কেলের মতো চক্রবৎ পরিবর্তন্তে। তাহলে আজ থেকে কয়েক বছর আগে হঠাৎ যে চশমা-কাট জুলফিহীনতা চালু ছিল তাতেই বা প্রত্যাবর্তনে আপত্তি কোথায়! কয়েকটি মাথা তো রগের চুল, মাথার তেলো ক্লপ করে মুড়িয়ে ফেলেছেন। সম্মুখভাগে থোকাটাক শোভিত থোতো মাত্র।

যে সব কচিমুখে এখন দাড়ি ভর্তি হচ্ছে জুলফি-বাহারে মুণ্ড ভরানোর জন্য সেগুলি যথাযথ থাক। সেলুন খরচা, যা বাপেদেরই গুণতে হবে পুজোর আগে কিছু বেঁচে যাক্। বারোয়ারীর জুলুম-চাঁদার কিছু মিটবে ঐ এ্যাকাউন্টে।

তবে মিত্রেনের এই ভবিষ্যদ্বাণী জেনে রাখুন, মিনি অবসানে জুলফির কেরামতি বিশেষ টেকসই হবে না। আপনার পার্শ্ববর্তিনীই খুব শীঘ্র ধমক দিয়ে বলবেন, ‘ম্যাগো, ঐ উৎকট লোমগুলো কামিয়ে ফেল না! একা একা তোমার মুখ আর মনে করতে পারি না। চোখ বুজলেই দুদুটো জুলফির পর্দা সব কিছু ঢেকে দেয়। বাঙালী পাঁঠার দোকানটা মনে পড়ে!’

আশুতোষের গোঁফ, রবীন্দ্রনাথের দাড়ি, হিটলারের বাটারফ্লাই, চার্লির চার্লিচেক, এরোল ফ্লিনের গুম্ফ জানা (ফ্লিন) ই টিকল না, জুলফির ওপর ক্ষুর না বুলিয়ে যাবেন কোথায়।

একজোড়া জুলফির জন্য খুব গর্ব বোধ করে থাকেন তো শ্রীমুখের খান দুই করে ফোটো তুলে রেখে কামিয়ে ফেলুন। খামকা নিজেকে কুৎসিত করার বোকামি থেকে রেহাই পাওয়ার চালাকিটা আপনারই প্রথম প্রাপ্য হবে।

॥ পনের ॥

যদ্যপি বাঁচিবে নূরুল
দালালি করিবে।
দালালির কমিশনে
কোমী লীডার সাজিবে॥

ছড়াটা বেঁধেছিল আমাদেরই এক কৃষক কর্মী। তাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তার দূরদৃষ্টি ছিল বলতে হবে। আজ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমিন সাহাবের নয়া, নয়া দালালি দেখে বার বার ছড়াটা মনে পড়ে যাচ্ছে। জন্মজন্মা দালাল বটে নূরুল আমিন! পি, ডি, এম-এর চালিয়াতী ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তাকে কেউ এতটুকুও মুষড়ে পড়তে দেখে নি, সে তখন নতুন ফন্দী আঁটতে ব্যস্ত। ঘন ঘন সাকরেদদের সাথে "গোপন বৈঠক" করছে আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেটোয়া সাংবাদিকদের বিবৃতি দিচ্ছে। আমরা বুঝলাম যে, গণ-আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য নূরুল, নছরুল্লারা বদ্ধপরিকর। সুতরাং সজাগ থাকলাম।

ইতিমধ্যে ন্যাপ বা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে ভাঙন এসেছে। কেন ন্যাপ ভাঙল, তার পুরো ইতিহাস এই চিঠির আলোচনার বিষয় নয়, বারান্তরে তা নিয়ে লিখব, কেবল এইটুকু জানিয়ে দি যে, মাস্টার মোজাফ্ফর আমেদ ন্যাপ ভাঙার অজুহাত হিসাবে নীতিগত বিভেদের কথা তুললেও আসলে সে ও তার বন্ধুরা নূরুলের খপ্পরে পড়েছিল এবং কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের মারমুখী আন্দোলনের উৎসবকেন্দ্র পুরোন ন্যাপকে ধ্বংস করার জন্য নূরুলের চক্রান্তের অংশীদার হোয়েছিল। মৌলানা ভাসানী সম্পর্কে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে। তিনি আজ নয়া শোধনবাদী এবং দক্ষিণপন্থী, প্রতি-ক্রিয়াশীলদের মত তাঁর কণ্ঠেও আজ অহোরাত্র কোরান আর ইসলামী সমাজ-তন্ত্রের অর্থহীন চিৎকার উঠছে। আজ আমরা ঠিক যে অর্থে চীনের পথকে আমাদের পথ বলছি, যে অর্থে মহান চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙকে আমাদের তথা সারা দুনিয়ার বিপ্লবী সেনা-বাহিনীর পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করেছি, ভাসানী তা' করেন নি। ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসককে মদত দেবার জন্য তিনি চীনকে আহবান করেছেন। কিন্তু এই কথা তাঁর কখনও মনে আসেনি যে, আমাদের লড়াই দুনিয়ার সকল শাসকের বিরুদ্ধেই। ভারত, পাকিস্তান—উভয় দেশের শোষিত মানুষ সবাই আমাদের বন্ধু, উভয় দেশেরই প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের শত্রু। আর তাই যদি হয়, তা' হোলে এক দেশের শাসককে মেরে আর এক দেশের শাসককে কোলে নেব, এটা কোন্ বিপ্লবী নীতি, কোন্ বিপ্লবী আদর্শ? যাই হোক, এই সব বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও সেদিন মৌলানা ভাসানী আমাদের কাজে বাধা দেন নি। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং জীবনের বিভিন্ন পথের আরও অনেক মেহনতী আওয়ামকে পাশে নিয়ে সেদিন আমরা বৈশাখের ঝড়ের মত, ভাদ্রের উত্তাল সাগরের কোটালের মত আয়ুবশাহীর পাথুরে দেওয়ালে ঘা দিয়ে দিয়ে শাহেনশার বুকের কলজে আর তার শাহী তখত্, দুটোকেই নাড়িয়ে দিয়েছি। সেদিন কোথায় ছিল "বাংলার বাঘ" মুজিবর। সে তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের খাঁচার মধ্যে বসে হাত-পায়ের নখ খাচ্ছিল, আর তার সাকরেদরা করছিল "আন্ডার গ্রাউন্ডে" "আন্ডার হ্যান্ড" বিপ্লব। অপরদিকে, খচ্চর মাস্টার মোজাফ্ফর আহ্মদ, যে ঐক্যের নাম করে জনতার চোখে ধুলো দিয়ে মাই ডিয়ার হওয়ার চেষ্টায় আজও তৎপর, সে সেদিন আমাদের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অশ্রাব্য গালি দিচ্ছিল এবং সভা-সমিতি-মিছিল করে আর বিবৃতি দিয়ে আদালতের নামে আয়ুব খাঁকে সুরসুরি দিচ্ছিল। ঐ অবস্থায় আমরা, পুরোন ন্যাপের সদস্য, কর্মী এবং সমর্থকরা গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নিজেরাই এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরা কেবল তাদের পাশে ছিলাম।

শয়তান দালাল নূরুল আমিন যখন দেখল যে, তার দ্বিতীয় অভিযান গাড্ডায় পস্তাতে বসেছে, গণ-আন্দোলনকে সে রুখতে পারে নি, মনিব আয়ুব এক্ষুণি তাকে কমিশন থেকে বঞ্চিত করবে এবং অন্য কাউকে চাকরিতে বহাল করবে, তখন সে তার উপস্থিত দুঃখ আর অনুশোচনাকে দাফনের দিনের জন্য জমা রেখে নতুন কিছু করা যায় কি না ভাবতে বসল। সৃষ্টিকর্তা (অর্থাৎ নূরুলের বাপ, আমরা ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাই না) তার মাথায় যথেষ্ট মারপ্যাঁচ দিয়েই জগতে পাঠিয়েছিলেন। তাই তাকে আর বেশি ভাবতে হোল না। ভাবতে বসামাত্রই নয়া ফন্দী তার সামনে হাজির হোল, সে ঠিক করল শোধনবাদী মাস্টার মোজাফ্ফর আহ্মদকে কাজে লাগাবে। ঐ সময় অর্থাৎ সাতষট্টির শরৎকাল থেকেই মোজাফ্ফর দল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। নূরুল এসে গোপনে গোপনে তাকে উস্কে দিল। ন্যাপ ভেঙে যাওয়ার পেছনে এই ভয়ানক ধরিবাজ খচ্চরটির যে একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তা সহজেই বোঝা গেল। কারণ আটষট্টি সালের বারই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মোজাফ্ফর আহ্মেদ, মাহ্-মুদুল হক ওসমানী প্রমুখরা এক দলীয় সভা ডেকেছিল। ঐ সভায় ওসমানী এমন সব মন্তব্য করল যে, বুঝতে বাকী রইল না সে নূরুলের পি, ডি, এম-এ যোগ দিয়ে নতুন কোনও ষড়যন্ত্রের অংশীদার হোতে চায়। নির্লজ্জতা আর কাকে বলে? আমার একটি চিঠি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। আমি লিখেছিলাম যে—"নির্লজ্জতাই বুর্জোয়া রাজনীতির প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য"। ঐ চিঠিতে আমার উক্তির প্রমাণ দিয়েছিলাম। ওসমানী-মোজাফ্ফর সম্পর্কেও প্রমাণ দিচ্ছি। ন্যাপ ভেঙে নূরুলের গলায় মালা দিলেও মাত্র কয়েক মাস আগে মোজাফ্ফররা অন্য কথা বলত। আমা-দের বেশ মনে আছে যে, সাতষট্টিরই দশই মে পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দ্রা-বাদে ওসমানী পি, ডি, এম-কে খিস্তি করেছিল, বলেছিল "পি, ডি, এম-এর প্রোগ্রাম আদপেই কোন কাজের নয়, ওদের ভরাডুবি হবেই। "তা ওসমানী তুমি ঠিক কথাই বলে ফেলেছ। গণ-বিপ্লবের দুর্বার তরঙ্গের ওপর দিয়ে তুমি আর নূরুল আমিনের দল যে সুবিধাবাদের নৌকা বাইছ, তা' আমরা ডুবিয়ে দেবই, কোনও চিন্তা কোর না, তোমাদের রূহের সদ্গতি আমরাই করব।"

ঐ বছরেরই বারই মে ঢাকায় এক জনসমাবেশে মোজাফ্ফর আমেদ এবং তার স্থানীয় সাকরেদ মহীউদ্দিন আমেদ, নূরুল আমিন, মিয়া মমতাজ

দৌলতনা, চৌধুরী মহাম্মদ আলী প্রমুখ পি, ডি, এম-ওয়ালাকে প্রচুর গালি দিয়েছিল। মোজাফ্ফর হাত-পা নেড়ে বলছিল, "আজ পি, ডি, এম করে যে দেশসেবা দেখাচ্ছ, তা' গত আট বছর কোথায় ছিলে? এই আট বছর ধরে তোমরা কোন্ মহৎ কাজ করেছ শুনি?" শেষ পর্যন্ত এই "আট বছর বপাত্তা হয়ে থাকা পি, ডি, এম-ওয়ালা"দের সাথেই কিন্তু মোজাফ্ফরকে গাঁটছড়া বাঁধতে হোল! বুর্জোয়া রাজনীতির রঙ আর ঢঙ, কোনটাই কম নয়!

ন্যাপ থেকে মোজাফ্ফরকে বার করে আনার পর নূরুল আমিনের নজর গেল আওয়ামী লীগের দিকে। এখানে তার রাস্তাটা আগে থেকেই কিছুটা পরিস্কার হোয়েছিল। কারণ, এন, ডি, এফ বা "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট" করার সময় আবদুস সালাম, আতাউর রহমান প্রমুখ বড দরের আওয়ামী লীগার সহ আরও অনেক সদস্য ও কর্মী মুজিবরকে ছেড়ে নূরুলের দলে ঢুকেছিল। এবার তাদেরই কাজে লাগাল আমিন সাহাব। ছয় দফা প্রচার করার পর থেকেই মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ কোণঠাসা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের ছয় দফা প্রণয়নের পিছনে পাকিস্তানের কয়েকটি পুঁজিপতির, বিশেষ করে ইউসুফ হারুণের অদৃশ্য হাত আছে। ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের তোড়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের মোটা মুনাফার ব্যবসাটা উঠে যাবে, এই ভয়ে হারুণের দল এক অক্ষম দাঁও প্যাঁচ ঝাড়ল। তারা মুজিবরের ঘাড়ে চেপে সোজা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বরাবরের মত পূর্ব পাকিস্তানে "ডোমিসাইল্ড্" হতে চাইল। এর দরুণ সুবিধে হবে অনেক বেশি। পশ্চিমে নিয়মিত পুঁজি বা মুনাফা পাচারের ঝক্কি থাকবে না। এ দেশে বসেই এ দেশের মানুষকে শোষণ করা যাবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিমা পুঁজিপতিদের হাঁটিয়ে দিয়ে মাত্র কয়েকজন মিলে পূর্ব পাকিস্তানে চুটিয়ে ব্যবসা করা যাবে। তৃতীয়ত, পূর্ব বাংলা কোনদিন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও অসুবিধা হবে না, কেন না মুজিবর বলে, "আমি ডানও নই বামও নই; আমি "সেন্টিস্ট"। কাজেই কোনও দুশ্চিন্তা নেই। কেন না মাঝামাঝি যে থাকে সে হাফগেরস্থ মেয়েছেলে। তাকে দিয়ে যা খুশি করান যায়। তা ছাড়া ইউসুফ হারুণ তো তাকে টাকা দিয়ে কিনেই রেখেছে। সোহ্রাবর্দী মারা যাওয়ার পর থেকে তার বিশ্বস্ত বন্ধু ইউসুফ হারুণ নিয়মিত মুজিবরকে টাকা দিয়ে আসছে। বেশ কয়েক বছর মুজিবর ইউসুফের বেঙ্গল ওরিয়েন্টাল ইনস্যুরেন্স কোম্পানী থেকে নামমাত্র চাকরির বিনিময়ে প্রতি মাসে তিন-চার হাজার টাকা বকশিস পয়েছে। আর সে যখন ছেষট্টি সাল থেকে জেলে পচছিল, তখন এই ইউসুফই তার পরিবারকে নিয়মিত দানাপানি দিয়ে জিইয়ে রেখেছিল। মুজিবর যেদিন আগরতলা মামলা থেকে "রিলিজড্" হোল, সেদিন ইউসুফ হেলিকপ্টারে চড়ে তার গোপালগঞ্জের বাড়িতে গড়ুর-পাখীর মত উড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এদেরই টাকায় মুজিবর ধানমন্ডীতে বাড়ি, গাড়ি হাঁকিয়ে গোটাকয়েক জীপ, ডজনখানেক লাউডস্পীকার, গাদা গুচ্ছের বন্দুক, বোমা আর শত শত গুন্ডা কিনে দেশোদ্ধার করছে।

কিন্তু কি কারণে হারুণ-মুজিবর সৃষ্ট ছয় দফা আয়ুবকে ক্ষেপিয়ে দিল? কারণটি খুব পরিষ্কার। জমিদারের নায়েব + হাবিলদার + ছোট জোতদারের সন্তান আয়ুব খাঁ নিজেও তার সুপুত্তুরদের সাহায্যে পুঁজিপতি হয়ে উঠেছিল এবং বেশ কিছু পশ্চিমা পুঁজিপতির সেই ছিল বড় দালাল। ঐ পুঁজিপতিরা যখন দেখল যে, হারুণের দল ছয় দফার খেল দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের দফা রফা করছে, তখন তারা আয়ুবের শরণাপন্ন হোল, এ ছাড়া ইউসুফের সঙ্গে আয়ুবের বহুদিন ধরে কোঁদল চলছিল। আয়ুব ভাবল হারুণকে সে এতদিনে বাগে পেয়েছে, সুতরাং "আর ছাড়ব কেন" এমন মনোভাব নিয়ে সে হঠাৎ একটা অর্ডিন্যান্স ঝেড়ে বসল।

"ক্রিমিনাল ল' অ্যা মে ন ড্ মে ন্ট্ (স্পেশ্যাল ট্রাইবুনাল) ছয় নং অর্ডিন্যান্স" অনুযায়ী সাতষট্টি সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ কয়েকটি লোক গ্রেপ্তার হোল। কিন্তু ব্যাপারটা জনসাধারণকে জানান হোল কিছু দেরীতে, আটষট্টির পয়লা জানুয়ারী এক সবকারী প্রেস নোটে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা প্রকাশিত হোল। ছয়ই জানুয়ারী নাগাদ সবশুদ্ধ আঠাশ জন গ্রেপ্তার হোল আর আঠার তারিখে মুজিবরকে মামলার প্রধান আসামী সাব্যস্ত করা হোল। শুরু হোল "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান মামলা।" মুজিবরের বিরুদ্ধে আয়ুবের অভিযোগ যে, "মুজিবর ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তে নেমেছে। কিন্তু আমাদের মতে, এই মামলার নাম দেওয়া উচিত ছিল আয়ুবগোষ্ঠী পুঁজিপতি বনাম হারুণ-গোষ্ঠী পুঁজিপতি মামলা। কিন্তু আয়ুব নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। তার ইচ্ছে হোল যে, সে একই সঙ্গে হারুণকেও ডোবাবে, আবার ভারতকেও জড়াবে। কাজেই ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ আনা হোল। ভারতের যোগসাজস কতটা ছিল তার আলোচনা এখানে অবান্তব, কেবল এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে, হারুনের দল পূর্ব পাকিস্তানের উপনিবেশটা একচেটিয়া করে নেবে এটা আয়ুব ও তার দলের অন্যান্য পুঁজিপতিরা কোনও মতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না।

যাই হোক, একদিকে আয়ুবের ঠ্যাঙানি, অপরদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামীদের অর্থাৎ আবদুস সালাম, নছরুল্লাদের আক্রমণ—এই ভয়ানক জাঁতা কলে পড়ে মুজিবরের ছয় দফা আওয়ামী লীগের নাভিশ্বাস উঠে গেল, প্রাণ যায় আর কি! ঠিক সেই মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে দিল ধুরন্ধর আমিন। বলা বাহুল্য যে, মুজিবরপন্থীরা তার হাত দুখানিকে বেহেস্তের হুরীর ডানা মনে করে সাগ্রহে ও সজোরে চেপে ধরল।

আটষট্টির অক্টোবর মাসের শুরু থেকেই নূরুল আমিন, মামুদ আলী, নছরুল্লা এবং তাদের নবদীক্ষিত শিষ্যবৃন্দ অর্থাৎ মোজাফ্ফর আমেদ, মাহ্মুদুল হক ওসমানী, ওয়ালী খাঁ (ন্যাপ-দক্ষিণ) এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মাণিক মিয়া (তোফাজ্জল হোসেন), কামরুজ্জমান (আওয়ামী লীগ-ছয় দফা) ইত্যাদিরা "আওয়ামের মুক্তির জন্য নব যুক্তফ্রন্ট" গঠনে তৎপর হোয়ে উঠল। পি, ডি, এম এরই এক অংশীদারের কাগজ "আজাদ" প্রতিদিন কলামের পর কলাম জুড়ে এই নতুন দালালির গালভরা বিজ্ঞপ্তি দিতে লাগল এবং ন্যাপ ও আওয়ামী লীগকে একই গোয়ালে, একই গামলায় জাবনা খাওয়াতে পেরেছে জন্যে নূরুলকে বিস্তর বাহবা দিল।

অক্টোবরের আট তারিখে আজাদ তার চালিয়াতীর একটি বিশেষ নমুনা দেখাল। সে লিখল, "জনমতের চাপে আর রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভাসানীপন্থী ন্যাপের একলা চলা মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে", অর্থাৎ যে এই খবরটা পড়বে, সেই ভাববে ভাসানীও বুঝি নূরুলের সাথে হাত মিলিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা, পুরোন ন্যাপের প্রাক্তন কর্মী ও সমর্থকরা সেদিন আমাদের দলকে একটা নিশ্ছিদ্র প্রাচীর করে রেখেছিলাম, এক ফোঁটা বেনো জল ভিতরে ঢোকার রাস্তা সেদিন ছিল না।

হুঁইউনেন্যে ভাসানী টাংগাইলে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। কমাই বাহুল্য যে নাগপাইক মাস্টার মোজাফফর বা তাঁর অনুগামীদের আমরা আমন্ত্রণ জানাই নি। এই ব্যাপারটিকেই যথেষ্ট কাজে লাগাল নুরুল। আমাদের বিরুদ্ধে মোজাফফরের বিদ্রোহী ন্যাপ ও ছয় দফা-আওয়ামীদের উস্কে দেওয়ার চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেল সে। নয় তারিখ মালবাজারে ছয় দফাওয়ালাদের কার্যকরী সভার এক অধিবেশনে ভাসানীর সম্মেলনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল, আওয়ামীদের মতে, মোজাফফরকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে আমরা ঘোরতর অন্যায় করেছি। সুতরাং তারাও আমাদের আমন্ত্রণ নিল না। যেচে সেধে এই অপমান নেওয়ার জন্য আমরা ভাসানীকেই দায়ী করি। টাংগাইলের সম্মেলনে এই সব কলকাঠি নাড়া দালালকে ডাকার কি দরকার ছিল? কুড়ি তারিখ ঢাকায় হোটেলে ইডেনে আওয়ামীদের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধন হোল। সেখানে মোজাফফরের দুই চেলা মহিউদ্দিন আহমদ আর পীর হবিবুর রহমান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে, মাত্র দু-এক বছর আগেও মুজিবর রহমান মোজাফফরকে তার দুষমন মনে করত আর দুই এক বছর পর তারা একই জোয়াল কাঁধে নিয়ে জোড়বলদ সেজেছিল।

মুজিবর আর মোজাফফরদের দলে পাওয়ার পর নুরুল আমিন যে বৃথা সময় নষ্ট করবে না, তা' আমরা আন্দাজ করেছিলাম। সত্যিই তাই হোল। ডিসেম্বরের আটাশ তারিখ নরুল্লা ঢাকায় উড়ে এল। ঢাকা শহর দালালদের দৌলতে জম-জমাট হোয়ে উঠল। তেসরা জানুয়ারী থেকে (উনসত্তর সাল) একদিকে বসল "পি, ডি, এম-এর" "ন্যাশনাল এক্সেকিউটিভের" বৈঠক, অপরদিকে চলল মুজিবর, মোজাফফরদের গোপন পরামর্শ। এই দুই শকুনীমার্কা ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ জানুয়ারীর আট তারিখ "ডাক" বা "ডেমোক্রেটিক অ্যাকসন কমিটির" আমদানী হোল। আটটি শয়তান পার্টি এই নয়া গণ-বিরোধী শয়তানীর অংশীদার হোল--ন্যাপ (বিদ্রোহী), জামাতুল উলেমায়ে ইসলাম, এন. ডি, এফ, আওয়ামী লীগ (নছরুল্লার গোষ্ঠী), কাউন্সিল লীগ, জমিয়তে ইসলাম, নিজামে ইসলাম এবং ছয় দফা আওয়ামী লীগ।

ডাকের আট দফা দাবীর মধ্যে সার পদার্থ কিছুই ছিল না, দফাগুলি পড়লেই তা বুঝতে পারবেন।

৯। কেন্দ্রের পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা (সার্বিক ভোটের গৌরব)
২। প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার (পুঁজিবাদ, সামন্তবাদকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা)
৩। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার
৪। নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
৫। রাজবন্দীদের মুক্তি
৬। একশ' চুয়াল্লিশ ধারার অধীন সকল আদেশ প্রত্যাহার
৭। ধর্মঘট করার অধিকার
৮। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

প্রতিটি দফাই কতকগুলি আশু সুবিধা আদায়ের কথা বলেছে। দফাগুলি পড়ে আমরা তখনই বলেছিলাম যে, 'ডাক'-এর আয়ুষ্কাল ক্ষণিকের, কয়েক মাস মাত্র। আমাদের কথাই ঠিক হোয়েছিল; তের মাস পরেই ডাক ভেঙে গেল।

মুজিবর বা হারুণ যদি বুদ্ধিমান হোত, তবে তারা কখনই "ডাকে" যেত না, কেন না "ডাকে"র মূল উদ্যোক্তা ছিল দালাল নুরুল এবং নুরুলের পিছনে ছিল আয়ুব খাঁ। আয়ুব খাঁ পশ্চিমা পুঁজিপতিদের সবচেয়ে বড় দালাল আর ধর্মবাপ ছিল। "ডাকে"র আয়োজন করে আয়ুব খাঁ নুরুলের সাহায্যে মুজিবরকে ফাঁদ পেতে ধরেছিল এবং গোলটেবিল বৈঠকে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল, কেন না সেখানে মুজিবরের ছয় দফা আদায় হোল না। সে রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাড়ি ফিরে এসে তার ছেলে আর ছোট শালাকে পাঠিয়ে দিল আয়ুবের চাকর মামুদ আলীকে ছোরা মারার জন্য। আমি এই ঘটনার আগেই উল্লেখ করেছি। "ডাক" যে একটা মস্তবড় কূটনৈতিক চাল তা' মুজিবরের বোঝা উচিত ছিল। উনসত্তরের বারই ফেব্রুয়ারী আয়ুব খাঁ রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘোষণা করল যে, "নছরুল্লা একজন আদর্শ রাজনীতিক, কেন না সে যুক্তি মেনে চলে"। মুজিবরের মাথা মোটা না হোলে সে বুঝত যে, ডাকের সঙ্গে আয়ুবের ভিতরে ভিতরে যোগসাজস আছে। তা' না হোলে সে কেন হঠাৎ বিরোধীপক্ষীয় "ডাকে"র নেতা নছরুল্লাকে সমর্থন জানায়?

মৌলানা ভাসানী সেদিন সঠিক পথ নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, "সুবিধাবাদী, স্বার্থপর কতকগুলি রাজনীতি ব্যবসায়ীর জোটে ন্যাপ কোনদিনই যোগ দেবে না।" বাস্তবিক, মূল ন্যাপ "ডাক"-এর সাথে হাত মেলায় নি। ডাক সৃষ্টির পর নুরুল, নছরুল্লা আয়ুবের পরামর্শে গোলটেবিল বৈঠক ডাকল। মোজাফফর লেজুড় মুজিবর পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষের নিষেধ অমান্য করে ঐ বৈঠকে যোগ দিল। আজও মনে আছে, বৈঠকের প্রাক্কালে কুমিল্লার চিয়াড়ায় বিশাল জনসমাবেশে মৌলানা ভাসানীর সেই ভাষণ-- "আমি পিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিয়ে কেন সুদূর গ্রাম বাংলার চিয়াড়ায় আপনাদের কাছে এলাম তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বহু গোলটেবিল বৈঠক দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কোন বৈঠকের মাধ্যমেই কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী জনতার মুক্তি বা পরাধীন ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নি। তাই স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও এই দেশের মেহনতী মানুষ এক সর্বগ্রাসী সংকটে জর্জরিত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে। এই জন্যই পেটে ক্ষুধার আগুন নিয়ে ক্ষেতমজুর, শ্রমিক ইত্যাদি শোষিত মানুষ বাঁধভাঙা স্রোতের মত দুর্বার গতিতে কার্ফিউ, জেল, গুলী ও বেয়নেটকে তুচ্ছ করে লড়াই করে চলেছে। আমি বিশ্বাস করি কোনও নেতা বৈঠকের মাধ্যমে এদের মুক্তি আনতে পারে না।" ভাসানীর প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। আমাদের মহান নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁর পদত্যাগপত্রে স্বীকার করেছেন যে, "যদিও বিগত গণ-অভ্যুত্থানে ন্যাপ সকল ক্ষেত্রে যথাযথ নেতৃত্ব দিতে পারে নি, তবুও আয়ুবের নির্বাচন বর্জন, গোলটেবিল বৈঠক বর্জন সম্পর্কে ন্যাপ সঠিক নেতৃত্ব দেয়" (তোয়াহার মূল চিঠি থেকে উদ্ধৃত)। ন্যাপের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ অন্য এক অধ্যায় এবং এই ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা কেবল বলতে চাই যে, সেদিন আজকের "বঙ্গেশ্বর" মুজিবর এবং "নির্ভেজাল, সাচ্চা কম্যুনিস্ট" মোজাফফর গণ-আন্দোলনকে প্রতিহত করার চক্রান্তে আয়ুব-নুরুল-নছরুল্লা সৃষ্ট "ডাকে" যোগ দিয়েছিল। মুজিবর শিখেছে ঠেকে এবং অনেক দেরীতে। তাই আজ পি, ডি, পি'র প্রতিটি সমাবেশে নুরুল তাকে "মিরজাফর" বলছে আর মুজিবর নুরুলের দলকে দালাল বলে ব্যঙ্গ করছে। বর্তমানে পি, ডি, পি আর আওয়ামী লীগ এই পারস্পরিক খেয়োখেয়ি করে নির্বাচনের ময়দান জমিয়ে রেখেছে।

পঞ্চ—সবুর খাঁ বেশ কিছুদিন হোল কয়ুমের জিম্মা মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছে। কনভেনশন লীগের আস্ত বাজেয়াপ্ত হওয়ার সুবিধাবাদী সবুর কায়ুমের সাথে হাত মিলিয়েছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্বীকারোক্তি পাওয়াটাই সব থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল সরকারী পক্ষে, ইচ্ছায় দিলে তো ভালই, না হলে জোর-জুলুম করেও। যারা বাছাইয়ের কাজে সাহায্য করত কর্তৃপক্ষকে, তারা বেশির ভাগই ছিল আফ্রিকান রিজার্ভগুলি থেকে আগত বয়োবৃদ্ধরা। তাই তারা নিজ নিজ এলাকার ছেলেছোকরাদের চিনতো। এখানেই আবার অনেকদিন পরে আমি 'নোয়ার' দেখা পাই, যে এক সময় নাকুরুর কোয়্যা নেয়ানগুয়েথু বাছাই শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল। আমি নোয়াকে জিজ্ঞাসা করি যে কোয়্যা নেয়ানগুয়েথু অনেক অন্তরীণদের জোর করে কেন খোজা করা হয়েছিল। নোয়া স্থূল হেসে উত্তর দেয় যে, এর দুটো কারণ ছিল। প্রথম তারা চরমপন্থীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ধরে ধরে খোজা করে দিয়েছিল এবং আমার খুব সৌভাগ্য যে, আমাকেও তখনি সেই পর্যায়ে ফেলা হয় নি। আর দ্বিতীয়ত দেখতে চেয়েছিল যে, যৌন-লিঙ্গহীন ষাঁড়ের মতো খোজা করার পর মানুষগুলোও ফুলেফেঁপে উঠবে কিনা! নোয়া এক স্থূলবুদ্ধি অপদার্থ গবেট মূর্খের জীবন্ত প্রতীকবিশেষ।

আথি-রিভারে সকালবেলায় আমাদের বাছাই করা হত, কিম্বা আমরা দিন-মজুরের কাজে যেতাম। বিকেলবেলায় কর্তৃপক্ষ আমাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন সব প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন ও আমাদের ব্যস্ত রাখতেন যে, আমরা নিজেদের সঙ্ঘ-বদ্ধ করার বা নিজে থেকে কিছু করার জন্য এক মুহূর্তও সময় পেতাম না। এ বিষয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন তাঁদের প্রচেষ্টায়। কারণ আমরা সেখানে কোনরকম কার্যনির্বাহক সমিতি গড়তে সক্ষম হই নি। নিম্নলিখিত কার্যসূচী যে কোন দিনের 'বৈকালিক সময়যাপনের' একটি নমুনা:—

এক নম্বর এলাকা : শিক্ষাদীক্ষার ক্লাস : পড়ানর বিষয়বস্তু ছিল কেনিয়ার ইতিহাস, যাতে সাদা মানুষের এদেশে আগমনের ঠিক পূর্বেই বিভিন্ন উপজাতি-সমূহ কিরকম অন্তর্কলহে ব্যস্ত ছিল তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হত। তারপর থাকত সাদা মানুষেরা এসে কি করে আমাদের এই বর্বরতার হাত থেকে বাঁচায় এবং সর্বশেষে আমাদের বলা হত যে, সাদারা কতো কষ্ট সহ্য করে শুধুমাত্র আমাদের উন্নতির জন্যই এদেশে কতো রকমের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করেছে। (এখানে বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, শিক্ষক এবং ছাত্র দল এই দু'পক্ষ পাঠের বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বা একমত কোনদিনই হতে পারে নি।)

দুই নম্বর এলাকা : বাছাই করে বয়োবৃদ্ধদের ভাষণ শোনবার জন্য একত্রিত হওয়া। আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল কি করে স্বীকারোক্তি দিতে হয়, কি বলতে হয় এবং বাদবাকি সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে সরকারকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে।

তিন নম্বর ও চার নম্বর এলাকা : ঐতিহ্যগত নাচগানসমূহ, যাতে কেনিয়ার বিভিন্ন উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো, যেমন : মুকুনগোয়্যা, মুগইয়ো, মুথুও, কুমুণ্ডামবুরি, মুকুওগো এবং কামানো। বয়োবৃদ্ধরা বসে বসে মারোবা নাচের কথা-গুলি গেয়ে যেত একটানা সুরে। আমরা চেষ্টা করতাম গানগুলির ভেতর নানা-রকম সরকারী প্রতিকূল কথার প্রবর্তন করতে। কিন্তু বাছাইকার বয়োবৃদ্ধরা কড়া পাহাড়া রাখতেন আমাদের উপর এর বিরুদ্ধে।

ছয় নম্বর এলাকা : চলচ্চিত্র দেখা।

উপরোক্ত কার্যসূচী অবশ্য সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে শিবিরের বিভিন্ন এলাকায় হত।

প্রত্যেক তাঁবুতে বা কুঁড়ে ঘরে একটি করে শব্দ-বিবর্ধক যন্ত্র লাগান ছিল, হয়তো বা দুটো। এর দ্বারায় সারাদিন অন্তরীণদের কানে বর্ষিত হত সরকার পক্ষের প্রচারকার্য : বৃটিশরা কেনিয়ার 'ভাল'র জন্য কি কি করছেন, সরকার পক্ষে কার্যরত কেনিয়ার কালো আফ্রিকানরা কতো মহান্ চরিত্র, পুঁজিবাদি দেশগুলি আফ্রিকার কল্যাণে কি কি কল্পনা জল্পনা করছেন ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে এই অনাহূত প্রচারকার্য এতো অসহ্য হয়ে উঠতো যে, আমরা কয়েকটি কম্বল দিয়ে যন্ত্রটিকে চেপে দিতাম, ফলে তার ভেতর থেকে শুধুমাত্র এক হাস্যকর ঘড়্ঘড়্ শব্দমাত্র বার হত। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ভেতরের কোন সরকারী অনুকম্পানুরাগী বন্দী এ খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতো এবং প্রহরীদের কেউ এসে কম্বলের তলা থেকে টেনে বার করতো যন্ত্রদানবকে আবার আমাদের কানে মধুবর্ষণের উদ্দেশ্যে। যাই হোক, এভাবে কম্বল চাপা দিয়ে যেটুকু সময়ের জন্য শান্তি পেতাম আমরা, তাই মহালাভ বলে মনে করতাম। এ ছাড়া যন্ত্রের দ্বারায় আর একটি কার্য সাধিত হত নিয়মিত : আমাদের ভেতর যার যার পালা পড়তো তার পরদিন বাছাইকারের সামনে উপস্থিত হবার জন্য, তাদেরও ডাক পড়তো এই যন্ত্রের দ্বারাই। যন্ত্রের ভেতর থেকে নামের বর্ষণ আরম্ভ হওয়ামাত্র আমরা চুপ করে যেতাম এবং ফিস্‌ফিসিয়ে বলতাম, "শোন, শোন, কার গলায় দড়ি পড়বে এবার"। আথি-রিভারের বাছাই নির্ঘণ্ট ছিল বড় শক্ত, এখানে যেদিন যার নাম ডাকা হত, সে রাত্রে আর বেচারার ঘুম হত না। বাছাইকারেরা, বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ বন্দীদের উপর যেরকম দুর্ব্যবহার করতো তাতে আমার খুবই খারাপ লাগতো। এর ভেতর ছিল কিরোরি মটোক্, ওয়ামবুগু কামুইরু (উপস্থিত কানুর নেয়েরী শাখার কোষাধ্যক্ষ) এবং আমাদের লড্ ওয়ার শিবিরের গ্রন্থাগারিক ওয়াচিরা কারিগে। কিরোরি যেরকম বর্বরতা, অন্যায় ও দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও হাসিমুখে ও ক্ষমাশীলতার সঙ্গে সব কিছু সহ্য করে গিয়েছিল তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। সে কোন-দিনই ভেঙে পড়ে নি এবং সব সময় এতো মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করা সত্ত্বেও আমাদের সদুপদেশ দিত এবং ধৈর্য ও সংযমের আশ্বাস দিত। এই সময় আমরা খবর পাই যে, নেয়েরীর সরকার নিযুক্ত আফ্রিকান জেলা পরিষদ তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার আটাশ একর চা-জমি

আত্মসাৎ করেছে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রাপ্ত একরাপিছু মাত্র তিনশো শিলিং বরাদ্দ করেছে। খোলা বাজারে ঐরকম জমির দাম তার দশ গুণেরও বেশি।

রচেস্টার একদিন হঠাৎ আথি-রিভার থেকে অন্য কোথাও বদলি হয়ে যায় এবং তার জায়গায় ডেনিস লেকিন বলে আর একজন ইউরোপীয়ান আসে। লেকিন আমাকে কোনদিন মারধোর করে নি। বরঞ্চ সে আমার সঙ্গে খুব ভালভাবেই কথাবার্তা বলতো। তার অভিপ্রায় ছিল প্রত্যেক অন্তরীণকে নিজ নিজ গ্রামীণ এলাকায় বা রিজার্ভে ফেরৎ পাঠান এবং সেখানকার স্থানীয় চীফের হাতে তার পুনর্বাসনের পরবর্তী কর্মসূচী তুলে দেওয়া। আমরা চরমপন্থীরা সে সময় সংখ্যায় খুব বেশি ছিলাম না আথি-রিভারে এবং আমাদের একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত লেকিন অন্য কোন শিবির থেকে আরও অন্তরীণ সেখানে আনারও বিরুদ্ধে ছিল। তার মতে, আমরা নবাগতদেরও হয়তো বিষিয়ে তুলবো চরমপন্থী প্রথায়। এই সব সাতপাঁচ ভেবে লেকিন ওপরওয়ালার কাছে এই মর্মে সুপারিশ করে যে, আমাকে ওথাইয়া জেলার শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক পুনর্বাসনের পূর্ববর্তী ধাপ হিসাবে।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে, কয়েকদিন কাবাটিনার শিবিরে কাটিয়ে আমি ওথাইয়া পৌঁছাই। আমার ভাগ্যে হয়তো আরও দুর্ভোগ লেখা আছে, তা না-হলে এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কেন সেই হবে, যে লড্ওয়ারে বাকস্টনের পরে এসেছিল? ওথাইয়া পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেখলাম যে, আবার শত্রুর সামনে পড়েছি, সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। প্রাথমিক পরীক্ষা, নামডাকা ইত্যাদির পরই কর্মাধ্যক্ষের আদেশে আমাদের সকলকার দাড়িগোঁফ জোর করে কামিয়ে দেওয়া হয় এবং এও বলা হয় যে প্রত্যেক সপ্তাহেই তার পুনরাবৃত্তি হবে। পরনের জন্য এক প্রস্থ পুরান জামাকাপড় আমরা পাই এবং আমাদের নিজস্ব বলতে যা কিছু ছিল—চটিজুতা, হাতঘড়ি, টাকাপয়সা ইত্যাদি সবই শিবিরের ভাঁড়ারে জমা করে দিতে হয়। ওথাইয়াতে নিজস্ব একটা রুমাল বা পিন কারো কাছে রাখারও অধিকার ছিল না কোন অন্তরীণের। কাপড়জামা বদলানর পর আমাদের তাঁবুর চারিদিকে জোর কদমে সৈন্য দলের মত নিয়মিত পদক্ষেপে চলতে আদেশ দেওয়া হয়, আর সেই সময় একজন প্রহরী যথেচ্ছ মারতে থাকে আমাদের বেতের বাড়ি। সবশেষে আমাদের ছয় নম্বর তাঁবুতে যেতে বলা হয়। ঐ একটি করে কামিজ ও হাফপ্যান্ট ছাড়া আর অন্য কোন কাপড়-জামা দেওয়া হয় নি আমাদের, এমন কি গেঞ্জি বা জাঙ্গিয়া পর্যন্ত নয়। ওথাইয়া শিবিরটি ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভাগে আমাদের একমাস করে থাকার কথা, অর্থাৎ ভাগ্য ভাল হলে ছয় মাস পর ছাড়া পাওয়া যেতে পারে। সে রাত্রে এই শিবিরের পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা ভেবে, বিশেষ করে আমাদের মনুষ্যত্বের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে তার কথা চিন্তা করে, আমার মোটেই ঘুম হয় নি।

আমাদের তাঁবুতে এম্বু জেলায় অবস্থিত 'মেওয়া' নামক বিশেষ বন্দিশিবির থেকে আগত কয়েকজন অন্তরীণও ছিল, তাদের কাছে আমি সেখানকার দুর্ব্যবহার ও দুর্ভোগের কথা জানতে পারি। বিশেষ করে নবাগত অন্তরীণদের উপর খুবই খারাপ ব্যবহার করা হ'ত সেখানে, যার ফলে "হোলা"-র শোকাবহ ঘটনা ঘটে কিছুদিন পরে। নবাগত চরমপন্থীদের মেওয়ায় আসবার পরই কয়েকটি সরকারী আদেশের সম্মুখীন হ'তে হ'ত, যাকে নাকি চুলচেরা বিচার করলে ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে হবে, কিন্তু অন্তরীণরা এ আদেশগুলি অমান্যই করতো। এক নতুন সরকারী আদেশে বলা হয়েছিল যে, যদি অন্তরীণরা ন্যায়সঙ্গত নিয়মাবলী মেনে চলতে অস্বীকার করে, তবে তাদের উপর "জোর" করা যেতে পারে সেগুলি মানতে বাধ্য করার জন্য। এই 'বাধ্য' করার জন্য একদল ইউরোপীয়ান কর্মচারী ও প্রচুর সংখ্যক আফ্রিকান প্রহরী রাখা হয়েছিল মেওয়া শিবিরে। তারা নবাগত অন্তরীণকে বেশ ভালভাবেই স্বাগত জানাত। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বাধ্য করার নামে যে সমস্ত দুরাচার ও ক্রিয়াকলাপের সাহায্য নিত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা, তা ছাপার অক্ষরে লেখা সম্ভব নয়। মনের সমস্ত জোর এইভাবে নষ্ট করার পর অন্তরীণদের "স্বীকারোক্তি" লিখিয়ে নেওয়া হ'ত আরও প্রয়োজনীয় চাপ দিয়ে। তথাকথিত অভিজ্ঞ কর্মচারীরা নাকি মত দিয়েছিলেন যে, চরমপন্থীদের এভাবে পিটিয়ে শায়েস্তা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না! এই স্বীকারোক্তির মূল্য যে কি, আশা করি অভিজ্ঞ কর্মচারীরা তা জানেন! কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্য যে কি ছিল আমাদের, তার খবর কর্মচারীরা রাখতেন না, সে বিষয় কোন সন্দেহই নেই। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, আমরা সবাই এক-একটি নীতিভ্রষ্ট লম্পট, অমানুষবিশেষ, কিন্তু আসলে আমরা ছিলাম শুধুমাত্র চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একমাত্র মৃত্যু ছাড়া কর্তৃপক্ষের জোর করে নেওয়া শত শত স্বীকারোক্তিও আমাদের এই মহান আদর্শ তাকে টলাতে পারতো না একেবারেই।

এইভাবে নবাগতদের একপ্রস্থ পিটিয়ে ঠাণ্ডা করার পর মেওয়া শিবিরে তাদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা আরম্ভ হ'ত এবং এই কার্যে রত "শিক্ষকরা" একজন কিকুয়ু জেলা-সহায়কের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাদের শিক্ষা প্রণালীর ধারা ছিল অদ্ভুতঃ যেমন অন্তরীণের মাথায় এক বালতি পাথর চাপিয়ে তাকে জোরকদমে হাঁটানো বা এক বিশেষভাবে পাথরছড়ান পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে হাঁটুগেড়ে চলানো। আকুলিনো নামে একজন অন্তরীণ এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে একদিন থিবা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রহরীরা তাকে জল থেকে টেনে তোলে। কয়েকদিন পরেই কিন্তু বেচারা তার কুঁড়েঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে এই পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ওথাইয়া শিবিরে আমরা যে কাজ করতাম, তাতে পরিশ্রম করতে হতো প্রচুর। খুব ভোরেই মাথা গোণা শেষ হবার পরই, আমরা শিবির থেকে বেরিয়ে পড়তাম শাবল, গাঁইতি বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে। কখনো আমরা চাষজমি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঢালু জমি কেটে তাকে থাক্ থাক্ করে সাজাতাম এবং নিচের দিকে বাঁধ দিতাম জলের প্রবাহের বেগ কমাবার জন্য, আবার কখনও বা স্থানীয় চাষাদের টুকরো টুকরো জমি সরকারী ব্যবস্থায় একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে নতুনভাবে বণ্টিত এলাকায় নতুন করে বেড়া দিতাম। এইসব কাজের জন্য আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবধি হেঁটে যেতে ও ফিরে আসতে হয়েছে—সারাদিন খাটবার পরও। কাজ যাই হোক না কেন, বেলা চারটের আগে কোন দিনই ছুটি হ'ত না এবং দুপুরে খাওয়া বা বিশ্রামের কোন বন্দোবস্তই ছিল না। একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে যতগুলি বন্দিশিবিরে আমি থেকেছি, তার ভেতর এখানকার কাজেই শারীরিক পরিশ্রম ছিল সব থেকে বেশি এবং তার ফলস্বরূপ এখানকার অন্তরীণদের শারীরিক অবস্থাও ছিল সব থেকে খারাপ।

সরকারী ব্যবস্থায় ভূমি একত্রীকরণের উদ্দেশ্য ছিল খুবই ভাল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে গলদ দেখা গিয়েছিল। আমাদের প্রাচীন ও ধারাবাহিক নিয়মকানুনের ফলে বেশির ভাগ চাষীর জমিই গ্রামের নানা জায়গায় ছড়িয়েছিল টুকরো টুকরোভাবে। সরকারী প্রযোজনায় এই সমস্ত টুকরোগুলির মাপ করে প্রত্যেক চাষীর মোট জমির পরিমাপ করা হয়েছিল তারপর এর এক অংশ স্কুল, হাসপাতাল, যুব-

সমিতি, চা-বাগান বা কফির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইত্যাদি সর্বজনীন কাজের জন্য রেখে দিয়ে বাকি সমস্ত অংশই সেই গ্রামের মানচিত্রে একসঙ্গে আঁকা হয়েছিল এবং আমাদের কাজ ছিল মানচিত্রে দাগ দেওয়া এই সীমারেখাকে মাটিতে কেটে দেওয়া। জমির মালিক লিখিতভাবে এই নতুন বন্দোবস্ত স্বীকার করে নিত এবং একরপিছু দশ শিলিং অন্দাজ পয়সা দিলে পর তাকে নতুন জমির মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করা কাগজ-পত্র দেওয়া হত। এই দলিলের সাহায্যে তখন চাষী মহাজনের কাছে জমি বাঁধা রেখে ধার বা আগাম নিতে পারতো চাষ-বাসের জন্য। কাগজে-কলমে এই সমস্ত ব্যাপার খুব সোজা বা মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর ব্যবহারে ছিল অনেক রকম গলদ ও গোঁজামিল। কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্যরা ছিল সবাই সরকারী পক্ষের লোক, কর্মচারীরা কোন-দিনই উৎকোচ নিতে দ্বিধা করে নি এবং যেসব অন্তরীণের জমি নিয়ে একত্রীকরণ হয়েছিল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নি। শুধু তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের আত্মীয় স্বজনেরা এ বিষয় দেখাশোনা করবে। তাছাড়া, নব-বিভাজিত উর্বর জমি ভাগের সময় যথেষ্ট প্রিয়-তোষণের নীতি নিয়ে-ছিলেন সরকার। কেনিয়া সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে দেশের এই সঙ্কটকালে জমি একত্রীকরণের কাজ বিনা দ্বিধায় চালিয়ে দেওয়া যাবে এই-ভাবে জমি একত্রীকরণের ফলে দেশের

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং একত্রিত জমির দালালাদি দেখিয়ে চাষীরা মহাজনের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত সুবিধায় টাকা ধার করতে পারবে চাষবাসের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনবার জন্য। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বহু সংখ্যক অন্তরীণই এই জমি একত্রীকরণের ব্যাপারে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে সরকারী জোরজুলুমের ফলে সরকারের ওপর বিরূপ হয়েছিল।

ওথাইয়াতে তৃতীয় দিনের দিনই আমি অন্য সমস্ত অন্তরীণকে বলে দিই যে, আমি একজন শিক্ষিত অন্তরীণ একথা যেন তারা কোন প্রহরী বা কর্মচারীর কাছে প্রকাশ না করে। আমার মতলব ছিল একজন নির্বুদ্ধি লোকের মত ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে কৌশলে ভেতরের খবর বার করে নেওয়া। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ছিল সলস্‌বেরী, কিন্তু তার অহেতুক তর্জন-গর্জন করার স্বভাবের জন্য আমরা তাকে 'কারু আলু' নাম দিয়েছিলাম; তার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম গুজব আমার কানে এসেছিল ইতিমধ্যেই। আমি সেখানে 'ভাঁড়ের' মত ব্যবহার করতাম ও প্রহরীদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত করে সম্বোধন করতাম; যেমন নিম্নতম সামরিক কর্মচারীকে (কর্পোরালকে) আমি সার্জেন্ট বলতাম, সার্জেন্টকে বলতাম ক্যাপ্টেন বা ঐ জাতীয় কিছু। যথাযথ চেষ্টা করার ফলে আমি যে সমস্ত অন্তরীণ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর দপ্তর ঝাঁট দেবার কাজ করত, সেই দলে মিশে গিয়েছিলাম ও আস্তে আস্তে সেখানকার হাঁড়ির খবর পেতে আরম্ভ করেছিলাম। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, কেনিয়ার সংকটকালের প্রথম দিকে সরকার প্রচুর পরিমাণে কাঁটা তার কিনে জমা করেছিলেন ওথাইয়া শিবিরের চারিদিকে ভাল করে ঘেরবার জন্য এবং তার অনেকাংশ সলস্‌বেরি বিক্রি করে দিয়েছিল গোপনে। বলা বাহুল্য বিক্রির পয়সা কিছু সরকারী তহবিলে জমা হচ্ছিল না। এ ছাড়া ওথাইয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এবং অন্তরীণদের উপার্জিত পয়সা-কড়ি নিয়েও কিছু গোলমাল হচ্ছিল বলে আমার সন্দেহ হয়। আর একবার নালিশভরা চিঠি লেখার দরকার হয়ে পড়েছিল এবং জোমেনিকো কিতোবো নামক আমার মানিয়ানির বন্ধু তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বন্দোবস্ত করে দেয়। রবিবার দিন শিবিরের একাকোণে আমরা গায়ে দেবার কম্বল ইত্যাদি দিয়ে একটি ছোট তাঁবুর মতো তৈরি করি এবং আমার বিশ্বস্ত কয়েকজন অন্তরীণকে পাহারায় রেখে আমি চিঠি লেখা শেষ করি। এক সামান্য চিঠির কল্যাণে, বিশেষ করে যদি তার প্রতিলিপি বিলেতের কয়েকজন রাজনৈতিক গণমান্যকে পাঠান হয়, আমাকে চিরদিনই অবাক করেছে এবং এই চিঠির ফলও খুবই আশাপ্রদ হয়েছিল।

নাইরোবি থেকে এক সরকারী সমিতি চিঠিতে অভিযুক্ত ঘটনাসমূহের খোঁজ-খবর করতে আসে। ফৌজদারী খোঁজ-খবর দপ্তরের লোকেরা কয়েক মাস ধরে ওয়াইয়ার লোকেদের জবানবন্দী গ্রহণ করে এবং যদিচ এক পাকাপোক্ত মোকদ্দমার সম্ভাবনা ছিল খুবই, তবু দুর্ভাগ্যবশত ভারপ্রাপ্ত প্রশাসন কর্মচারীরা শেষ অবধি ব্যাপারটাকে কেঁচিয়ে দিতে সক্ষম হন। ফলে মোকদ্দমা আদালত অবধি মূলে পৌঁছয়-ই নি; ১৯৫৫ সালে কেনিয়ার আরক্ষাবাহিনীর মহাধ্যক্ষ কর্নেল ইয়ং কেন হঠাৎ তাঁর চাকরিতে ইস্তাফা দিয়েছিলেন তার একটা কারণ হিসেবে উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করা যেতে পারে। সে সময় কেনিয়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় ভরে উঠেছিল একদল স্বার্থান্বেষী ও নীচ রাজপুরুষে। যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, নিজের পকেট ভারী করা এবং তারা যে চোরে চোরে মাসতুত ভাইয়ের মত প্রয়োজনে একে অন্যকে রক্ষা করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! যাই হোক, এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই সলস্‌বেরিকে ওয়াইয়া থেকে বদলি করে নেয়েরী অঞ্চলের দক্ষিণ টেটু শিবিরে পাঠাতে মনস্থ করেন সরকার। কিন্তু শেষ অবধি সলস্‌বেরি সেখানে কার্যভার গ্রহণ করতেই পারে নি, কারণ তার আগেই তাকে মেওয়া পুনর্বাসন শিবিরের ভার দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেওয়াতে যে কর্মচারীর যাবার কথা ছিল, সে সেখানকার হালচাল দেখে কার্যভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তাকে সলস্‌বেরির জায়গায় দক্ষিণ টেটুতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সলস্‌বেরি ছিল আকারে ছোট, চটপটে ও তীক্ষ্ণধার, কিন্তু তার সঙ্গে কোন বিষয় "আলোচনা" করা যেত না বা সে কারও অভিমত গ্রহণ করতো না। অন্যান্য কয়েকজন আঞ্চলিক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মত তার হাতেও দেশের সংকটকালীন অবস্থায় প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যার সে 'সদ্ব্যবহার' করতে পেছপা হয় নি। কিন্তু তার মনে দয়া-দাক্ষিণ্য বা কোন সদ্‌গুণের বড়ই অভাব ছিল। সে এও বুঝতে পারতো না যে, তার অধীনস্থ অন্তরীণরা এই জন্যই তার কর্মতৎপরতায় উৎসাহ দেখাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো সব সময়ই।

কাজ ছেড়ে যাবার কয়েকদিন আগে সে শিবিরের সবাইকে, এমন কি প্রহরীদেরও একত্রিত করে এক গালিগালাজপূর্ণ ভাষণ দিয়ে আমাদের মনের জ্বালা কিছুটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে যায়। তার ভাষণে সে ঐ চিঠির উল্লেখ করে এবং তারপর আমাকে ডেকে সবার সামনে দাঁড় করায়। আমাকে উদ্দেশ্য করে সমবেত লোকেদের সে বলে, "দেখ এই যে লোকটি, এ হচ্ছে আমাদের কেনিয়া সরকারের পক্ষে এক ভীষণ বিপজ্জনক লোক। আজ তোমরা যে যার কুঁড়েঘরে ফিরে যাও, কিন্তু আগামীকাল তোমাদের সকলকার কি হাল হয় দেখতে পাবে।" আমরা দেখতে ঠিকই পেয়েছিলাম, কারণ তার পরদিন আমাদের সবাইকে মহিগায় নড়ুই নামক স্থানে একটি রাস্তা খোঁড়বার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সারাদিন কেউ এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেলবার সময় পায় নি; সারাদিন ধরে আমরা মাটি কেটেছিলাম, গাঁইতির হাতল বেয়ে আমাদের গায়ের ঘাম লাল মাটির সঙ্গে গিয়ে মিশছিল। প্রহরীরাও সেদিন খুব দুর্ব্যবহার করেছিল আমাদের সঙ্গে। অন্তরীণদের কেউ একটু দাঁড়ালেই বেতের ঘা এসে পড়ছিল তার গায়ের উপর সপাং করে। তারা কিন্তু আমার গায়ে হাত দেয় নি; আমাকে প্রথমে সবাই গাধা বুদ্ধিহীন, ভাঁড় বলে মনে করেছিল এবং আমি যে ঐরকম একটা নালিশভরা চিঠি উপরওয়ালার কাছে লিখতে পারি, তা দেখে তারা বেশ চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাদের ভেতর খুব কম লোকই আসলে সলস্‌বেরির ব্যবহারের সমর্থন করতো এবং কয়েকজন আমাকে একথাও বলেছিল যে, সলস্‌বেরির বিরুদ্ধে আমার নালিশে তাদেরও সমর্থন আছে, কারণ এই নালিশগুলি ছিল যুক্তিসঙ্গত। এই রাস্তা খোঁড়ার কাজ এক সপ্তাহ ধরে করতে হয়েছিল, তারপর আমাকে আগুথীর জেলা-শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার চলে যাবার পরই রাস্তা তৈরির কাজও বন্ধ হয়ে যায়। সলস্‌বেরির আসল উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আর সমস্ত অন্তরীণের কাছে হাস্যকর প্রতিপন্ন করা এবং যদি এরা সরকারী রিপোর্টে যে রকম বলা হয়েছিল, সেই রকমভাবে সত্য-সত্যই পুনর্বাসিত হয়ে সরকারের পক্ষে যোগ দিতো, তাহলে আমাকে তারা ঘৃণা করত নিশ্চয়ই। কিন্তু আসলে তারা সবাই আমাকে ভালবাসতো এবং অনুরোধও করেছিল আমাকে তাদের হয়ে নালিশ করবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে।

[ক্রমশ]

মহারাজের মাতৃবন্দনা

ত্রৈলোক্য মহারাজ জীবনে মহৎ ছিলেন, মৃত্যুতে মহত্তর হলেন। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উৎসারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বাঙালী কণ্ঠ পরিপূর্ণ করল, কলকাতার আকাশে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গক্ষেপ ছড়িয়ে পড়ল। ব্যোমপথে একবার কোন ধ্বনি উঠলে তার তরঙ্গ চলতেই থাকে, এই নাকি প্রকৃতির নিয়ম। বিদেশী খেমটাভাঙার তাল সেলামে যারা অভ্যস্ত তাদের কানে এ কেমন লেগেছে জানিনে, আমাদের কানে এর স্বাদ নতুনতর হয়ে এসেছে।

এই ধ্বনি যে রক্তে-রাঙা, এ খবর আজকের লোভরহীন যুব সম্প্রদায়ের ভাববার কথা নয়, কেন না, এ তাদের দোষ নয়। বাংলারই কি, ভারতেরই কি, তেমন ইতিহাস নেই; ইতিহাস সম্পর্কে অনীহা নয়, উপেক্ষা আমাদের ঐতিহ্যগত; তারপর অপকর্ম দুষ্কর্ম ঢাকবার জন্য কলঙ্কিত ব্যক্তিরা যদি রাজদণ্ড পায়, তবে তো কথাই নেই।

৩০টি বছর পার হয়ে গেল নাকি আমাদের স্বাধীনতালাভের; যার আর এক নাম ক্ষমতা হস্তান্তর। এতদিনেও আমরা ইতিহাস লিখতে পারলাম না। লিখতে পারলে একালও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে কি ছিল জানতে পারত, বুঝতে পারত আকৈশোর ও আমরণ বিপ্লবী 'মহারাজ' ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে উপলক্ষ্য করে হঠাৎ কলপ্লাবী জনস্রোতে পূর্ণকণ্ঠ এই ধ্বনি উঠল কেন।

একালের দোষ নেই, যে অজ্ঞান তার অপরাধ নেই। ত্রৈলোক্য মহারাজকে উপলক্ষ্য করে সব ধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠল কেন 'বন্দে মাতরম্', 'বিজাতীয় চিন্তার অন্তঃহীন মায়া আমদানক সন্দেহ-ভর্ৎসনায় বাঁচিয়ে দেবে কে? নিপীড়িত নির্যাতেরা জয়ধ্বনিক এতোপমাড়ি অসমতে করতে একবার সমাজ এতদিন পর মনীষী অন্তিপুরুষের উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছে। পরিষ্কার দেখা যায়, অজ্ঞতার উপেক্ষারই এসব অপকাণ্ড ঘটছে। নইলে প্রতিদিন ভোরবেলা রেডিও খুললেই এই ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়; কিন্তু প্রাত্যহিকতার রুটিন কাজে এ যেন তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। ওতে কোন প্রাণ নেই। হঠাৎ তাতে প্রাণোৎসারিত করে দিলেন ত্রৈলোক্য মহারাজ; তাঁর নিষ্প্রাণ দেহের প্রাণ যেন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর শবদেহ-বাহকদের মধ্যে, তারই বিদ্যুৎ স্পর্শ জাগল প্রাণে প্রাণে।

কিন্তু অকারণ নয়। ত্রৈলোক্য মহারাজ পাকিস্থানের নাগরিক। বন্দে মাতরম্ সেখানে জাতীয় সঙ্গীত নয়। এতেও সারে না। যে সম্প্রদায় আলাদা রাজ্য গড়বার জন্য লড়ল, তাদের এ সঙ্গীতে ছিল ঘোর আপত্তি, সুতরাং ধ্বনিতেও। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার-ভাটিতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত এই ধ্বনি আল্লাহু আকবরের সঙ্গে চলেছে বটে, কিন্তু সখ্য হয় নি কখনো। শুধু যে অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদীরাই আপত্তি করেছেন, সংঘাত ঘটিয়েছেন তাই নয়, নিরীশ্বরবাদী ভাববাদীরাও তাঁদের সঙ্গ নিয়েছেন। এককালের একটা সতিকারের মাতৃভূমির বন্দনার ধ্বনি, বিপ্লবী জেলের ধ্বনি, রণধ্বনি, কালক্রমে বিচিত্র অর্থহীন ধ্বনিতে ধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেন্দ্রেও অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এ সঙ্গীত ও ধ্বনি মর্যাদা পেয়েছে।

যাঁরা আনন্দমঠের সঙ্গে জড়িয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে পর্যন্ত বর্জন করেন তাঁরা যেমন ইতিহাস জানেন না, তাঁদের উপলব্ধির গভীরতাও তেমনি সন্দেহজনক। বঙ্কিমচন্দ্র গানটি লিখেছিলেন আনন্দমঠ লেখার অনেক আগে। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেরণায় লেখা এ গানটি আনন্দমঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেখানে নিশ্চয়ই তার একটি বিশেষ অর্থ বা পারিপার্শ্ব বা পটভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। এ গান বা সঙ্গীত বঙ্কিমের জীবদ্দশায় কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে অলংকার হিসেবে উচ্চারিত হয় নি, ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলনের সময় নয়, ১৮৮৮ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির আমলকালেও নয়। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের আন্দোলন যখন দানা বেঁধে ওঠে তখন এই সঙ্গীত ও ধ্বনি বহুজনের মধ্যে প্রসার লাভ করে।

যাঁরা বলেন আনন্দমঠই সেকালের বিপ্লববাদীদের (তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের) অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁরা পুরো কথা বলেন না বা জানেন না। বহু গ্রন্থের মধ্যে আনন্দমঠও গীতার মতই বিপ্লবীদের অবলম্বনস্তু ছিল বটে, কিন্তু সে তাঁদের ভাষ্য মত। নতুবা আনন্দমঠের কাহিনীতে যাই থাক অথবা যেমন কোন ধর্মান্ধ একে সাম্প্রদায়িক বললেও, আসল কথা আসল উদ্দেশ্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

'প্রাণ তুচ্ছ, সবাই দিতে পারে, চাই ভক্তি—দেশভক্তি, এই হচ্ছে আনন্দমঠের প্রথম কথা। ১৯০৫-৮ এবং তার পরবর্তী বিপ্লবীরা (১৯৩৪ অবধি) এই দেশভক্তির পাঠই নিয়েছিলেন, ওতে কতখানি সাম্প্রদায়িকতা, কতখানি রাজানুগত্য আছে তা বিচার করেন নি। ঐ থেকে আর আহরণ করেছেন সন্তান-জীবন। দারাপুত্র পরিবার ছেড়ে দেশের জন্য অকুতোভয়ে আত্মনিবেদন।

ত্রৈলোক্য মহারাজের জীবনে এইটি সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই তো তাঁর শবানুযাত্রীদের মধ্যে সেই শব্দটি স্মরণ-মননের জন্য হলেও বিদ্যুৎ প্রবাহের মত সঞ্চারিত হয়েছিল। ত্রৈলোক্য মহারাজের

জীবন কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত ঐ সন্তানেরই জীবন, পাতার নিস্পৃহ, নির্লিপ্ত জীবন।

ত্রৈলোক্য মহারাজের যখন স্বদেশী দীক্ষা হয়, তখন সন্তানের কাছে মায়ের দাবি ছিল। মন্ত্রগুপ্তি তো সামান্য কথা, জীবনকে আদর্শোপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়। কবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আমি সাম্যবাদী হব, আজ বুর্জোয়াজীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভারতম্য ভোগ করব, এমন আদর্শনিষ্ঠ তিনি ছিলেন না, যখন মায়ের কাছে মায়ের নামে দিয়েছেন তখন সব দিয়েছেন। কিছু রাখেন নি নিজের জন্য, নিজের বলে। আজই এই মুহূর্তে এই হৃতসর্বস্বা মায়ের হৃতসর্বস্ব সন্তান হতে হবে, একমাত্র থাকবে ভক্তি। হ্যাঁ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিকতায় আত্মবিস্তার।

সম্প্রদায় বিশেষ মনে করেছিল বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত বা ধ্বনি ঠুনকো পেয়ালার মতো তাঁর একেশ্বরবাদী বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে পৌত্তলিকতার ভগ্নজড়তায় পরিণত করবে! কিন্তু ইংরেজেরা বুঝেছিল ঠিকই। প্রথমে হাস্যকর এই ধারণা হয়েছিল, বন্দে মাতরম্ অর্থ বেঁধে মারো—এবং ইংরাজকে। পরে, তরুণদের বেত্রজর্জরিত করে বুঝল, ওটা ওদের জেদ, রণহুংকার, কিছুতেই মানব না, মানব না। দেশের মাটির কাছে ওরা মাথা নোয়াবে আর কারও কাছে নয়। বরিশালে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার মাথা ফাটিয়ে বা সুশীলকে বেত মেরে অথবা ক্ষুদিরামকে ফাঁসী দিয়ে বুঝল, আনন্দমঠ-বিচ্ছিন্ন, উপন্যাস-বিচ্ছিন্ন, সঙ্গীত-বিচ্ছিন্ন এই মাতৃবন্দনার ধ্বনি তাদের রণধ্বনিও বটে। তাই তারা ছুটল চারদিকে এই শব্দটাকে স্তব্ধ করে দিতে।

বাংলাদেশের সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় একদিকে অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, অপরদিকে নির্মম-নিষ্ঠুর পীড়নের, লোভাতুর স্বার্থান্ধদের শাসকপক্ষ-সখ্যতার সংবাদ রয়েছে বিস্তারিত। ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য উৎসুক কিশোরেরাও তা খুঁজে পাবে। পরিণত বয়স্কেরা তার তাৎপর্যও খুঁজে পাবেন। দেখবেন, বিপ্লবীরা এই ধ্বনিটির কনোটেশান—তাৎপর্যই দিয়েছেন বদলে। তাঁদের আত্মত্যাগে স্বার্থত্যাগে এর অর্থ হয়েছে বিকশিত প্রস্ফুটিত—যা কুঁড়িতে ছিল আবৃত।

ত্রৈলোক্য মহারাজ তাঁদেরই অন্যতম। এবং আদর্শ নিষ্ঠা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্পায়ু, অনেক ক্ষেত্রে মহত্ত্বের চূড়োয় উঠেও পড়ে যেতে দেখা গেছে কাউকে কাউকে, দুর্দান্ত দুঃসাহসী কাজের পর পরবর্তী জীবনে আপন প্রাণ বাঁচার রীতি অনুসরণ করতেও দেখা গেছে, নয় তো আকস্মিক কোন লোভে পতন ঘটেছে। বিপ্লবীদের সকলেরই ক্ষুদিরামের মত ১৮ বছর বয়সে ফাঁসীর রজ্জু চুম্বনের সৌভাগ্য থাকলে ভাল হত, তাহলে দীর্ঘকাল বেঁচে পতনের বিড়ম্বনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন সকলেই; একটা মন্ত্রিত্ব কি পদাধিকারের জন্য রসলোলুপ হয়ে ওঠবার দুর্ভাগ্য ঘটত না। কিন্তু দীর্ঘকাল বেঁচেও রইলাম, আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র স্খলিত হলাম না, আকৈশোর আমরণ মাতৃচরণ বন্দনায় অচঞ্চল রইলাম, এ দৃষ্টান্ত বিরল এবং সে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত ত্রৈলোক্য মহারাজ।

কেমন মানুষটি? আমি তাঁকে অতি কাছে থেকে দেখবার অবকাশ পেয়েছি। আমার তারুণ্যে যে অনুসন্ধিৎসা ছিল সাহিত্যের তপোবনে তার খোঁজ চলছিল, তখন আনন্দমঠই শুধু নয়, বহু হারা-কাহিনী বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছিল। গোপ্রাসে যখন গিলে চলেছি, তখন কলেজেরই এক ছাত্রের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল এই স্কুল ছাত্রটির ওপর। সে-ই কোন এক অবসরে আমার হাতে চালান দিয়েছিল সিডিশান কমিটি রিপোর্ট। নতুন শ্লেটের মত নতুন আখরে চিহ্নিত হবার মত এরও দাগ পড়ল মোটা রকমের। আমার অজ্ঞাতেই আমি যখন বেশ জড়িয়ে গেছি এবং যখন হার পরতে গেলে লাগে এবং ছিঁড়তে গেলে বাজে, তখন জানলাম ছেলেটি অনুশীলন সমিতির, গুপ্ত বিপ্লববাদী দলের, সুতরাং, ন্যায়শাস্ত্রমত আমিও ঐ সমিতির, ঐ দলেরই।

আমার জন্মস্থান কোচবিহার ছিল দেশীয় রাজ্য, করদ রাজ্য, আমরা বলতাম স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন রাজার দেশ। সে রাজের সঙ্গে আমার বিরোধ ছিল না; আমার বিরোধ ঘটেছিল ওর সীমানা ডিঙিয়ে বৃটিশ রাজের সঙ্গে, ইংরেজ—ইংরেজ বিদেশী শাসক। এই শাসনের উচ্ছেদ এবং এজন্য গুপ্ত সমিতির সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অলক্ষ্য ষড়যন্ত্র। সব চুপে চুপে নির্বাক হয়ে। সম্ভবত, দেশীয় রাজ্যের সন্দেহভাজন হিসেবে অথবা অন্য কোন কারণে ঐ কলেজের ছেলেটি শহর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু সে যোগসূত্র রেখে গেছল। তাই ধরে ছিলাম।

ঐ রোমাঞ্চে একদিন আমাকেও ধরতে হল সন্ন্যাসের পথ এবং নিঃসম্বল কপর্দকহীন, কিন্তু অজ্ঞাত প্রেরণাতাড়িত আমি ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় আসি। এর নাম কি কৃচ্ছ্রসাধন? বিপ্লবী হবার প্রস্তুতি? সাটল ককের মতো নানা ঘটনাক্রম বিক্ষিপ্ত হতে হতে একদিন দেখা পাই মহারাজের। আমাদের বয়সের পার্থক্য ২০।২১ বছরের কম নয়।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পেছনে আছে এক বাড়ি। ১৬৪ নং। দোতলায় মস্ত বড় ঘর। আজ সব টোপোগ্রাফ মনের দৃষ্টিতে আবছা হয়ে গেছে, কয়েকটি মানুষ অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। বড় ঘরটায় অনেক সময় থাকত একটা মস্ত বড় সতরঞ্চি বিছানো, হয়তো বা তারই ওপর বা তার বাইরে কারও কারও ব্যক্তিগত বিছানো গুটোনো। এটা ছিল অনুশীলন সমিতির তখনকার বড় দাদাদের আনাগোনার কেন্দ্র, আড্ডা, কিন্তু সবই চুপিসারে। গম্ভীর প্রকৃতির প্রতুল গাঙ্গুলী, ভারিক্কি চালের রবি সেন, কথা না কইলে কথা বলতাম না। কোন-কিছু সম্পর্কে ঔৎসুক্য প্রকাশ করা ছিল রীতি বিরুদ্ধ। ভয়ে সংকোচে যথাসম্ভব চুপচাপই থাকতাম।

অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল না আমার, বলতে গেলে এক বস্ত্রই; আর ওটি ছিল কেদারেশ্বর সেনগুপ্তের ঢালাও হোটেল, অমৃত-স্বাদে দু'বেলা ভাত খেতাম পেট পুরে। অসাধারণ মানুষ ছিলেন এই কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত। কি একটা তুলোর দালালি ছিল বোম্বের সঙ্গে। সর্বস্ব ঢেলে দিতেন পার্টি হিতায়। মহারাজের মত ও'রও নিজের বলে কিছু ছিল না। বেশির ভাগ সময় ও'কে পেতাম। রুগ্নতায়ও তিনি ছিলেন অসাধারণ, কঙ্কাল, কিন্তু এমন মেধা দেখি নি খুব বেশি। লেখাপড়া চিঠি চাপাটির রেওয়াজ ছিল না গুপ্ত সমিতিতে; কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত ছিলেন জীবন্ত কম্পিউটার; যাঁর যা আছে সব বলে যেতেন কেদারদাকে, আশ্চর্য, যথাস্থানে যথা সময়ে নিবেদন করে দিতেন সে কথা। আমার সঙ্গে কথা হত অনেক, তর্কের সময় ধমকে ধমকে কথা বলতেন, কিন্তু স্নেহসিক্ত; পরবর্তীকালে সিউড়ী জেলেও ছিলাম এক ঘরে রাজবন্দী হিসেবে, রিকুইজিসান নিজের জন্য করতেন না। করতেন আমার জন্য। কি চাই তোমার? এমন মানুষের তদারকে ছিল ঐ মেস, সমিতির কেন্দ্রীয় আড্ডা। এমনি একটি সর্বত্যাগী মানুষের দিকে যখন অপলক চেয়ে চলেছি, তখন এ'রই জোড়া যে থাকতে পারে, কিন্তু দেহে বলিষ্ঠতর ও কাজে বেপরোয়া, জানলাম মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে যখন এখানেই দেখা হল, প্রথম বার, তারপর বার বার। সেকালে বাজেয়াপ্ত, আজ নিশ্চিহ্ন, আমার জীবনের প্রথম ছাপা বই "বিপ্লব পথে ভারত" তখন বেরিয়েছে, কেদারদাই তা শাখায় শাখায় বিলি-বন্দোবস্ত করেছেন, ধমক দিয়ে দাম আদায় করেছেন। সবাই

খুব খুশি; মহারাজ যেমন কয়েক তাতেই খুশি। আমি হাওয়ায় উড়ছি আর "ফাঁসীর আশীর্বাদের" পাণ্ডুলিপি তৈরি করছি। রবিদা (রবি সেন) কেদারদার পরামর্শক্রমে ঠিক করেছিলেন বইটা ও'রাই ছাপবেন, 'জবাব বদলে ছিন্ন শির' নামে তিনরঙা ব্লকটাও করিয়েছেন বৌবাজারে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীদের ওখান থেকে; তারপর অবশ্য ওটা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে ব্রজবিহারী বর্মণ ছেপে বের করে। ও'দের কাছে আমার আদর বেড়ে গেছল, মহারাজের অপরিমেয় স্নেহের স্পর্শ পেতাম, হাসি ছাড়া খুশি ছাড়া কথা বলতেই যেন পারতেন না, কেমন শিশু-সুলভ। এমন সময় "ফাঁসীর আশীর্বাদ" বাজেয়াপ্তর এবং প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মণের গ্রেপ্তারের খবর প্রসঙ্গে বেরোলো গ্রন্থকার পলাতক। আমি তখন এই ১৬৪ নং-এ; রবিদা বললেন, পচা শামুকে পা কাটলে বুঝি। অর্থাৎ আরও বড় কাজের আগেই ধরা পড়লাম বুঝি। নাঃ, আমি চালান হয়ে গেলাম আসামে।

সময়ের কিছু হেরফের হতে পারে। মেছুয়াবাজার বোমা সম্পর্কে ধরা পড়া ব্যাপারটাও সমসাময়িক। অনুশীলন সমিতির মেজদারা নাকি কেউ কেউ বিদ্রোহ করেছেন, বিনা অনুমোদনে অনুমতিতে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। যাঁরা করেন নি, তাঁরা এসে আনুগত্য জানাতে লাগলেন। আমি মেজদা নই ছোড়দাও নই, একেবারে রংরুট, কিন্তু "লেখক" তো বটি, তাই আমাকেও জেরায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য লেগেছিল যখন "মহারাজের" কথাটাও উঠেছিল। সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি বড়দের চাইতে ছোটদের সঙ্গেই মিশতে পছন্দ করতেন বেশি এবং ছোটরাও তাঁকে পেলে তাঁকে ঘিরে বসত। বাইরের চামড়া কঙ্কাল সব কিছু ভেদ করে ওঁর হৃদয়টাকে স্পষ্ট দেখতে পেতাম। মাঝে কদিন ছিলেনও না মহারাজ এই হট্ট-গোলের সময়; একদিন যখন এলেন, তখন বড়দাদাদের চাপা কথা চলেছিল তাঁদের সঙ্গে, সম্ভবত তাইতেই সংশয় নিরসন হয়েছিল। মহারাজ সর্বদাই ছিলেন এ্যাকশানের পক্ষপাতী। তাইতেই সন্দেহ। কেউ কিছু করতে চাইলে খুশি হতেন, তাই ওঁকে নিয়ে ছিল বড়দের ভাবনা।

তারপর কোথায় নানা ঘটনাচক্রে সঙ্গ হারিয়ে ফেলেছি; দলও কেমন বিলীন হয়ে গেছে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে গেল; দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠল মাঝখানে। তবু শুনলাম, মহারাজের পথ-চলা শেষ হয় নি; আত্মনিবেদিতপ্রাণ চলেছেন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে এবং ইংরাজের জেলেও যেমন, আয়ুবের জেলেও তেমনি জীবন কাটছে। একবার কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত এসেছিলেন পাকিস্থান ছেড়ে; তিনি আজ নেই। আবার হঠাৎ এলেন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী। আমি তখন সবরকমে ছোট হয়ে গেছি তাঁর জীবনের মাপে। তবু—

আসছেন শুনেই আমার বৈষয়িক সাংসারিক মন, রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন কোটি কোটির মত সাধারণ আমার এই মনেও একটা অব্যক্ত ব্যঞ্জনা জাগল। ছুটে যাই নি অবশ্য সীমান্তে, ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য ছিল না; কিন্তু প্রথম সুযোগেই দেখা করলাম।

আশ্চর্য! ঐ ভীড় কোলাহলের মধ্যেও এই সুদূর বিচ্ছিন্ন অতীতকে চিনলেন। বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের শোকসভায় মহাজাতি সদনে গুটি গুটি লাঠি আর সঙ্গী ভর করে যখন মঞ্চে উঠছেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম, নাম বললাম। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আমার নামটা বার দুই পুনরাবৃত্তি করলেন। মুখভরা হাসি।

তারপর গেলাম যাদবপুরে, যেখানে তাঁর অস্থায়ী শিবির পড়েছিল। লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। খেতে খেতে দুটো বেজে গেছল; বিশ্রাম করতে না-করতেই আমরা হাজির ছিলাম; আমার এককালের এক বন্ধুও হাজির ছিল। একটা এনগেজমেন্ট আগেই করা ছিল কয়েকজনের সঙ্গে। তার ওপর এসে দাঁড়াল গাড়ি, জ্ঞান মজুমদার অসুস্থ, তাঁকে দেখতে যাবেন। নিজের অসুস্থতার কথা মনেও নেই; সবাইকে দেখে বেড়াচ্ছেন।

ওরই মধ্যে বললেন, বল। বললাম। বললেন, নিশ্চয়ই। দিল্লী থেকে ফিরে এসে বসব তোমার সঙ্গে।

কথা হয়েছিল, তিনি তাঁর দেখা-শুনার অভিজ্ঞতা ধারণা বলে যাবেন, আমি লিখে যাব। পাকা কথা।

তারপর আবার দেখা এণ্ডরুজ স্কুল ভবনে তাঁর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। প্রাণের আবেগে যা বলবার বললেন। যখন ফিরছেন গাড়িতে, মুখ বাড়িয়েছিলাম। বললেন, মনে আছে, দিল্লী থেকে ফিরে।

সকালবেলা বজ্রপাত। রেডিও সংবাদ, ছোট মেয়ে এসে বলল। কল্পনাও করি নি। যে-মানুষ এই বয়সে হার্টের রোগ নিয়ে অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে যাচ্ছে, সে এমন অকস্মাৎ নিভে যেতে পারে? মনে হয়েছিল অপরিমেয় শক্তিধর। নিঃসন্দেহ, কিন্ত দেহ আর বইতে পারছিল না অত বড় হৃদয়কে। শারীরিক হার্টফেল করেছে, কিন্তু হৃদয় ছিল অপরাজিত। তাই তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল শত্রুমিত্র নির্বি-শেষে সকলের গৃহকোণে, সঙ্কীর্ণবাদীরা ছাড়া সকলের প্রাণে প্রাণে। তিনি কি, তাঁর প্রমাণ দিয়ে গেলেন যেন মৃত্যুতে।

হয়তো পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছেন এই অমর বিপ্লবীর শেষ নিশ্বাস ত্যাগে, কিন্তু বাংলার সৌভাগ্য তিনি প্রাণ দিয়ে গেলেন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে এবং মৃত্যুশয্যা দিলেন পশ্চিমবঙ্গকে। তাই তো সেই বহুদিন বিস্মৃত 'বন্দে মাতরম্' কলকাতার আকাশকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল। বন্দনা করি দেশকে। রুশিয়াকে যদি ভালবাসি তো সে রুশদের দেশাত্মবোধের জন্যই, চীনকে যদি ভালবাসি সে তাদের স্বাদেশিকতার জন্য, ইংলণ্ডকে যদি ভাল-বাসি সে তাদের দেশপ্রেমের জন্য, আমার দেশকেও লোকে ভালবাসবে আমরা যদি নিজেরা দেশকে ভালবাসি। আন্ত-র্জাতিকতা ফাঁকা শব্দ মাত্র, যেখানে জাতি, জাতীয়তা, দেশপ্রেম নেই। মহারাজ মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই মৌলিক সত্যকে উপহার দিয়ে গেলেন; তাই না অকস্মাৎ বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ পরিপূরিত হয়েছে। মহারাজের মহৎ জীবন তাই মহত্তর হয়ে উঠেছে মৃত্যুতে। ভারতকে পশ্চিমবাংলাকে এই তাঁর উপহার। তিনি মরণে আমাদের দেশ-মাতৃকার বন্দনাকে অবশ্য-কর্তব্য বলে স্মরণ করিয়ে দিলেন—তা ভারতেই কি, পাকিস্থানেই কি, দেশপ্রেম আজও মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস, আজও ভৌগোলিক সীমানাগুলো অতন্দ্র প্রহরীরক্ষিত এবং দেশপ্রেমই দিতে পারে আত্মস্বার্থমুক্ত দেশসেবা লোকসেবার অধিকার।

মহারাজের জীবনে এ ছাড়া দ্বিতীয় কথা নেই। কারাপ্রাচীর তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে নি, সীমানা তাঁর পথ আগলে দাঁড়াতে পারে নি; দেশপ্রেমই আত্মবিচ্ছিন্ন অথচ আত্মগত সকল মানুষকে ভালবাসতে শেখাতে পারে, বিশ্বমানবিকতার মূলে শেকড়টা ঐ দেশপ্রেমের চেতনায়, আন্ত-র্জাতিকতার সীমাহীনতা ওরই ভেতর বিস্তারিত।

পাকিস্থানের নাগরিক মহারাজের ভারতে দেহরক্ষা এই সত্যটাকেই দাগিয়ে দিয়ে গেছে। বন্দে মাতরম্ হচ্ছে সেই মৌল সত্য।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(১১)

শান্তিনিকেতনের গোড়ার কথা নিয়ে গুরুদেব একদিন আলোচনা করছিলেন। অনেকদিন থেকেই মনে একটা বিশেষ আকাংক্ষা ছিল ওঁর মুখ থেকে শুনে নেব বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূল ভাব ও সংকল্পটি কখন কী করে ওঁর মনে উদয় হয়েছিল, অর্থাৎ এর আরম্ভ কী করে হলো, আর ধীরে ধীরে এর পরিণতি কীভাবে হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সেই পরম সুযোগ সেদিন উপস্থিত—কথাটা ওঁর কাছে নিবেদন করলাম। বললেন,—"এতো একদিনে বলার কথা নয়, আর শুধু শোনার কথাও নয়। এর প্রাণের স্পন্দন যে অনুভব করে তারই কাছে এর মূল্য। কোনো জিনিসের শুরু কী করে হয় বলা যায় না; বিশ্বভারতী সম্বন্ধেও এই কথাটা খাটে এর আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত। এর সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে আমার মনে ভেবেচিন্তে উদয় হয়েছে তা নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, ধীরে ধীরে তা অজ্ঞাতসারে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। বাল্যকাল থেকে যে জীবন আমি অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকেই বিশ্বভারতীর আদর্শটি প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানে, যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন চলছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাদান করা। বিদ্যার বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে সব মনীষীকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, যাঁরা নিজের শক্তি ও সাধনায় অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাজে নিবিষ্ট রয়েছেন। তাঁরা যেখানেই মিলিত হবেন সেখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হবে। বিদেশী বিদ্যালয়ের নকল করে হবে না। দেশের শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটিকে আশ্রয় করে নেই, তারা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলমান। ভারতবর্ষে যদি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহলে গোড়া থেকেই সে তার অর্থবিদ্যা, তার কৃষিতত্ত্ব, তার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করে দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াবে। এই আদর্শে বিদ্যায়তনকে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দেবার সংকল্প করেছিলাম। এর আরম্ভকালের অবস্থাটা তোমরা অনেকেই দেখো নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই চলে। এখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন কি বিছানা তৈজসপত্র সমস্ত আমাকেই জোগাতে হতো। কিন্তু বর্তমানে এতো উজান-পথে চলা সম্ভব নয়, তাই এই শিক্ষায়তনের আকৃতি-প্রকৃতি আগেকার চেয়ে এখন অনেক বদলেছে। কিন্তু তা হলেও সেই মূল জিনিসটা আছে। এই আশ্রমে ছেলেমেয়েরা যত দূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়, বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল— টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয়, অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয় স্বরূপে অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার প্রচলন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁকে আবার আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল, তাঁকে এবার ক্লাশ পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হলো, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা সত্যকারের শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারদিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই, আর যদি না হন তাহলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে ও বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো। এমনি করেই কাজ শুরু হলো এই আমাদের "বিশ্বভারতীর" প্রথম বীজ বপন। তখন সহায়ক হিসেবে পাই কয়েকজন কর্মীকে—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ রায়, কালীমোহন ঘোষ। এঁরা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন, তখন হাওয়া ছিল অন্যরকম।

৩০/৫০ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে মিলে

কিন্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা...

বিশ্ববিদ্যালয়ের গড়ন করার সাধ্য আমাদের ছিল না, সেজন্য হতাশও হই নি। আমাদের সাধনায় সত্যবস্তু ছিল বলে উপকরণের অভাবে কিছু ক্ষতি হয় নি। আমাদের শিশু বিদ্যালয়ের আসনগুলি কিছুদিনের মধ্যেই ভরে উঠল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে ছিলেন সিংহলের মহাস্থবির, ক্ষিতিমোহনবাবু আর একটিতে, আর ছিলেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। অন্যদিকে এণ্ড্রুজের চারদিকে ইংরেজি-সাহিত্যপিপাসুরা সমবেত হলেন। ভীমশাস্ত্রী ও দিনেন্দ্রনাথ ভার নিলেন সংগীত অধ্যাপনার, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে যোগ দিলেন। তারপর এলেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে। তারপর ধীরে ধীরে এসেছেন আরো অনেক কৃতবিদ্য অধ্যাপক ও কর্মী। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এসেছেন, তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূরে থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এতে হয়তো দক্ষ পরিচালনা হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। একটা কথা মনে পড়ে গেল—পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে আমি প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম, আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না, কিন্তু যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করার চেষ্টা করেছি। এক সময়ে অনভিজ্ঞতার খেদে মনে হলো যে একজন হেডমাস্টারের নেহাৎ দরকার। একজন বললেন, 'অমুক ভদ্রলোক একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে'। তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখে-শুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এতো ভালো না'। আমি বললুম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না, এখন একটু চড়তেই দিন না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে, তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই বা'। আমার মতিগতি দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি কিন্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্ত এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন; তারপর থেকে আর 'হেডমাস্টার' রাখি নি।"

এখন অনেক ছাত্র, অনেক বিভাগ হয়েছে, চলছে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কর্মীরা সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না—বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে। সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয়, তবে এ ভার বহন করা কঠিন। তোমাদের কাছে আমার বক্তব্য এই দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই একত্র হয়ে বিশ্বভারতীর আদর্শের বিশুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, বিদ্যায়তনের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হলে চলবে না। অতি ছোট বিদ্যালয় ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে, এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ ও দুর্বল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না, তাদের অন্নবস্ত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন করেই হোক আমাকেই জোগাতে হোত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হতো। বিদ্যালয় বাড়তে লাগলো, দেখা গেল বেতন না নিলে বিদ্যালয় বাঁচানো যাবে না। বেতনের প্রবর্তন হলো, কিন্তু অভাব দূরে হলো না। নিজের সংসারকে প্রায় রিক্ত করে বিদ্যালয়ের কাজ চালাতে হলো। ক্রমে এভাবেই ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেকে এখানে এসেছেন, ছাত্ররাও এসেছে। ধীরে ধীরে এর সীমা আরো দূরে প্রসারিত হলো, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা ছিল প্রচ্ছন্ন তা ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হলো। সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী, এই আশ্রমে সে এসেছিল দীন ছদ্মবেশে ছোটো বিদ্যালয়রূপে, সেই তার শুরু কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে প্রার্থী গ্রহণ করতো, আহরণ করতো, আজ সে দাতা, দানের ভাণ্ডার খুলেছে, সে ভাণ্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আজ প্রার্থী হয়ে তার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে, তাকে তো ফিরিয়ে দিতে পারি না। কারণ দিতে না পারলেই হারাতে হয়, বিশ্বসংসার আমাদের দ্বার রুদ্ধ দেখে যদি অভুক্ত হয়ে ফিরে যায় তাহলে কী আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে? বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক, এই আমাদের একাগ্র সাধনা। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম' এই বেদমন্ত্রের মধ্য দিয়েই সে তার পরিচয় দিক। যে-আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে পেতে আমরা বিশ্বকে আহ্বান করব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই। বিশ্বভারতী আপন নিয়মে আপনি গড়ে উঠছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তারপর তার চলার পথে বহু নদনদীর সঙ্গে যতই সে সঙ্গত হলো, সমুদ্রের যতই নিকটবর্তী হলো, কতো তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম

সমবায়ে তার আর নেই; কত অনিকলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে; তবু তো কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া। সব নিয়ে যে পরিপূর্ণতা সেইটেই বড়ো। বিশ্বভারতীও আপন অন্তর্নিহিত বেগে ধাবিত হয়ে চলেছে, বহু মানবের চিত্ত-সম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় একটা মূলতম গতিবেগ, কিন্তু এর গতি প্রবলতর হয় সবার সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছু থাকে না, তবে এর মূলগত একটি গম্ভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে, সে হলো এই প্রতিষ্ঠান বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সবাই মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন ও যাঁরা এখানে রয়েছেন, তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখবেন, এ যেন কলের জিনিস না হয়। যন্ত্রের অংশ এখানেও এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়।

তোমরা তো তখন এখানে আস নি, বিদ্যালয়ের নিদারুণ অভাবের কথা জানো না, তখন আমার ঘাড়ে মস্তো একটা দেনা ছিল, পরিমাণ লক্ষ টাকারও বেশি। আমার গ্রন্থের স্বত্ব প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত জিনিসের কিছু কিছু করে বিক্রয় করে অভাব মেটাবার অসাধ্যসাধনে লেগে গেলুম, কিন্তু অভাব সম্পূর্ণ দূর হলো না। এদিকে-ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, স্ত্রীর অলংকার পর্যন্ত বিক্রয় করলুম। নিজের সংসারকে বঞ্চিত করে কাজ চালাতে হলো। ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। অসংখ্য অভাব, দৈন্য, বিরোধ ও ব্যাঘাতের মধ্য দিয়ে দুর্গম পথে এই বিদ্যায়তনকে বহন করে এসেছি। তখন প্রদেশবাসীর সহায়তা পাই নি, তাদের অহেতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণে বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাত করি নি। মনে আছে বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট হন, তিনি বললেন, 'এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে এই বিদ্যালয়ের জন্য কিছু দেব এই ইচ্ছা'। তিনি এক হাজার টাকা সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতে তুলে দিলেন, বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। অবশ্য এই সঙ্গে ত্রিপুরার মহারাজার আনুকূল্যের কথাও উল্লেখ করছি, আজও তাঁর বংশে এটা প্রবাহিত হয়ে আসছে। অকারণ পীড়া দেয় যে দুর্বুদ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুই গ্রহণ করে না। বিশ্ব-ভারতীর এই যে প্রকৃতি, তা এই অহেতুক বিরুদ্ধতাকে প্রতিহত করেই বেঁচে আছে। অর্থবর্গের আনুকূল্য হলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা কঠিন হতো, অনেক কিছু অসত্য খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতা এলে হয়তো বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর হবে, আমি হয়তো তখন থাকব না, তখন এ কথাটা কখনও ভুলে যেও না অর্থের আনুকূল্যে এই শিক্ষায়তন যেন আত্মসত্য-ভ্রষ্ট না হয়। যাঁরা এখানে আরম্ভের দিকে এসেছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, সাংসারিক কতো দীনতাই না তাদের সইতে হয়েছে। প্রলোভনের জিনিস আশ্রমে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিরও না। লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তখন ছিল আমাদের সাত্ত্বিকারের সাধনা। অর্থের এতো অভাব ছিল যে, আজ তা কল্পনাও করতে পারবে না। যাঁরা তখন এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন বাইরে কিছু নেন নি। কিন্তু স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা খুব কমই আছে। কর্ম বহুবিস্তৃত হয়ে যখন বন্ধুর পথে চলতে থাকে, তখন তার নানা ত্রুটিবিচ্যুতির মধ্যেও যদি তার প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকে, তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। ক্রমে এই আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল; অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সবাইকে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। নানা ভুল-ত্রুটি নানা বিক্ষোভ বিরোধের ভিতর দিয়েই জীবনের যে প্রকাশ ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত, তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। আমার কাছে যা শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ বলে যা আমি বরণ করেছি, অর্থাৎ শুধু আমারই আদর্শ সবাই মিলে অন্ধ-ভাবে অনুসরণ করবেন, এমন ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করিনে। পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হয়, একনায়কত্বের ব্যবস্থাটা সহজ হয় না, তার প্রভাবে আসে কৃত্রিমতা। শুধু এই কথাটি ধ্রুব হয়ে থাক, এই প্রতিষ্ঠানে যেন হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ সদা উন্মুক্ত থাকে, অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবন যেন আশ্রমে ধ্রুব সত্য হয়ে বিরাজ করে। নিজেকে নেপথ্যে সরিয়ে নিতে পারলেই অপরাজেয় মানবত্বের সন্ধান মিলে, এই সাধারণ শিক্ষকতার মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেই জন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে। আজ বার্ধক্যের টানে আশ্রমের সক্রিয় জীবন থেকে দূরে অপসৃত হয়েছি। একটা কথা আমার মনে রেখো, জৈবিক প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে মানুষ গড়ে ওঠা খুবই কঠিন, এর অভিশাপই হলো সব কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, আর মানব-সভ্যতার চিরদিনের আরাধ্য সামগ্রীকে বিদ্রূপ করা।"

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ওয়ার্ধা থেকে কয়েক দিনের জন্য এলেন শান্তি-নিকেতনে। সেদিন সকালে বঙ্গালীতি পাঠভবনের (যতদূর মনে পড়ে সপ্তম শ্রেণীর) ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের ক্লাশ চলছে; বিভিন্ন চুম্বকন প্রণালীতে কৃত্রিম চুম্বক তৈরির পরীক্ষা দেখানো হচ্ছিল। বৈদ্যুতিক চুম্বক কী শক্তিশালী হয় তা বোঝাবার জন্য একটা পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। ছোটো একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক কাঁচা লোহার একটা টুকরোকে এতো জোরে টেনে ধরে রেখেছে যে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোনো ছেলেমেয়ে লোহার টুকরোটিকে চুম্বকের গা থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না—এই পরীক্ষা যখন দেখানো হচ্ছে, গুরুদেব শ্রীযুক্তা নাইডুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন ল্যাবরেটরীতে, যেখানে ছোটো বৈদ্যুতিক চুম্বকটি দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে আটকানো আর লোহার টুকরোটি তার গায়ে লেগে আছে চৌম্বকশক্তির টানে। এই লোহার টুকরোর বিপরীত দিকে একটা আঙটা লাগানো; ছেলেমেয়েরা একে একে এসে আংটা ধরে টেনে লোহার টুকরোকে চুম্বকের গা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে বিফল হচ্ছিল। শ্রীমতী নাইডুকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই হলো আমাদের বিজ্ঞানের মাস্টার, এরই কথা তোমাকে বলেছি।' (প্রশ্ন ও তার জবাব সবই ইংরেজীতে হলো, তার যথাযথ বাংলা তর্জমা করে দিলাম)। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী নাইডু বললেন, 'এই ছোট্ট চেহারার মানুষটি তুমি, ছেলেমেয়েরা তোমাকে ভয়-ভক্তি-মান্য করে তো!' বললুম, 'দেহের আয়তনটাই কি মুখ্য? ওয়ার্ধার যাঁর আশ্রম থেকে আপনি এলেন, তাঁর দেহের আয়তন বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু সারা পৃথিবী তাঁকে মহামানব বলে মান্য করছে, আর তাঁরই দুর্দম প্রতাপে প্রবল পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য পর্যন্ত ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত।' উনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, 'তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি, দুঃসাহস তো তোমার কম নয়—গান্ধিজীর সঙ্গে নিজের তুলনা করছ?" গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এটা ঠিক তুলনা নয় সরোজিনী, মহাত্মাজীকে ওরা আদর্শ মানব বলে শ্রদ্ধা করে। তাঁরই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরই মহান্‌ জীবনকে যদি সাধনার সামগ্রী বলে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে একে ওর এমন একটা স্পর্ধা বলে বলব, যার মধ্যে আত্মপ্রচার বা

অহমিকার কসুরও নেই।' শ্রীমতো নাইডু এবার খুশি হলেন, বললেন, 'আমি একবার টেনে দেখব ঐ খুদে চুম্বকটার টান থেকে লোহাটাকে মুক্ত করতে পারি কিনা, দেহের আয়তন তো আমার কম নয়, হাত দুটোতে শক্তিও বেশ আছে বলেই তো মনে হয়, কী বলেন Poet?' গুরুদেব সহাস্যে বললেন, "মেয়েদের দেহের বিপুলতা নিয়ে উপহাস করে কিছু বললেও ওঁরা ভিতরে ভিতরে ক্ষুণ্ণ হন, কাজেই তোমার কথায় সায় দিয়ে আমি ঠকতে রাজী নই। শক্তি-সামর্থ্য তোমার যথেষ্ট আছে, একবার চেষ্টা করেই দেখ না। পঁচাত্তর বছরের 'যুবক' আমি, এই শক্তিপরীক্ষার দ্বন্দ্বে আমাকে কিন্তু আহ্বান করো না, তোমার বয়সের সীমায় থাকলে হয়তো আসরে নেমে পড়তুম—তার জড়ানো অতটুকু একটা লোহার দণ্ড আমাদের দৈহিক শক্তিকে পরাভূত করে এভাবে দণ্ড দেবে এ যেন ভাবতেই পারছি না।" শ্রীমতো নাইডু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হলেন, টানাটানির দ্বন্দ্বে চুম্বকেরই হলো জয়। ক্লাশে একটি মেয়ে ছিল, খুবই রোগা, দেখলেই বোঝা যায় বেশ দুর্বল, তাকে বললুম, 'সবাই দেখলো, তুমি এসে একবার টেনে দেখ না'। সবাই হেসে উঠল, মেয়েটি বললে 'ওরে বাবা, আমি পারব না।' বললুম 'ভয় কি, এসো না একবার।' মেয়েটি এসে টান দিতেই লোহার টুকরোটা চুম্বকের গা থেকে খসে ওর হাতে চলে এলো। দেখেই শ্রীমতো নাইডু বললেন 'এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো কারসাজি আছে।' গুরুদেব সহাস্যে বললেন, 'নিঃসন্দেহে, সরোজিনী তুমি তো ওর ছোটো চেহারা দেখে ওর শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে একটু কটাক্ষ করেছিলে, ও দেখছি ছোটো খুদে চুম্বকের প্রচণ্ড শক্তি দেখিয়ে পাল্টা জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে বৈদ্যুতিক চুম্বকের বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত করে চুম্বকত্বের অবসান ঘটিয়ে দেখালো বড়ো দেহ নিয়ে তোমরা যা পারো নি, এই ছোট্ট মেয়েটি অবলীলাক্রমে তা করলো—এই হলো কারসাজি।' শ্রীমতো নাইডু সহাস্যে বললেন, 'ভারি দুষ্টু, একেবারে ছেলেমানুষ।'

গ্রীষ্মাবকাশের সময় গুরুদেব আলমোড়া যাবেন, আদেশ হলো 'বিশ্ব-পরিচয়ের' সমগ্র পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে খুব শীঘ্র ওঁর হাতে পৌঁছে দিতে। আলমোড়ায় নিভৃতে 'বিশ্বপ্রকৃতির' সান্নিধ্যে বসে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজটা সমাধা করবেন। ওখান থেকে ফিরে এসে বইখানা ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন বিশ্বভারতী প্রেসে। এমনি সময় 'বীরেনদা' (বীরেন্দ্রমোহন সেন, শান্তিনিকেতনে প্রায় সবারই বীরেনদা, গুরুদেবের অত্যন্ত স্নেহভাজন) তাঁর তিন-চার বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করে বললেন, 'গুরুদেব', সেদিন দাদামশায় (নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়) ভারি মুস্কিলে পড়েছিলেন—শ্রীভবনের মেয়েদের নিয়ে 'বাসে' করে হেমবালা দেবী (শ্রীভবনের প্রণেত্রী শ্রীযুক্তা হেমবালা সেন) যাবেন কেন্দুলী মেলায়, দাদামশায় যাবেন ওঁদের সঙ্গে। বাস এসে দাঁড়িয়েছে হেমবালা দেবী, সুহাসিনী দেবী ও আর কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে; দাদামশাই বাসে উঠে হেমবালা দেবীর পাশে বসলেন। কিছুক্ষণ পর উনি একটু চঞ্চল হয়ে বললেন, 'বাস ছাড়বে কখন? হেমবালা দেবী বললেন, 'কয়েকটি বড়ো মেয়ে এখনো আসে নি, এলেই রওনা হব।' আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে দাদামশাই ওঁকে বললেন, 'দেখুন মিস সেন, বেশি বয়েস পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকলে মেয়েদের কর্তব্যজ্ঞানে শিথিলতা আসে।' মিস্ সেন এই কথা শুনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন; ওঁর অকস্মাৎ এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে দাদামশাই বুঝলেন এভাবে কথাটা বলা তাঁর ঠিক হয় নি, (কারণ হেমবালা দেবীর বয়েস তখন চল্লিশের বেশি, আর তিনি নিজেই তখনও অবিবাহিতা), সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বললেন, 'মিস্ সেন, তাই তো বড়ো অন্যায় হয়ে গেল, আপনাকে কোনো কটাক্ষ করি নি, ক্ষমা করুন।' গুরুদেব শুনেই হেসে উঠলেন, 'নেপালবাবুর মুস্কিল তো লেগেই আছে, এই জনাই বোধ হয় কয়েকদিন এদিকে আসেন নি। তারপর বীরেন তোর খবর কী?' বীরেনদা বললেন, 'আমার ছেলের নামকরণের জন্য এলাম।' গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, "ও, 'বরেন্দ্রমোহন' নামটা বুঝি তোদের পছন্দ হয় নি, বেশ একটা আধুনিক নামই দেব এখন।" বীরেনদার অবস্থাটা অবর্ণনীয়। প্রায় দু-তিন বছর আগে গুরুদেব এই ছেলের নাম রেখেছিলেন 'বরেন্দ্রমোহন',—এই নামটা ওঁদের বাড়ির কারও পছন্দ হয় নি। তাই ভাবলেন যে, ঐ তিন বছরে কতো ছেলেমেয়ের গুরুদেব নামকরণ করেছেন, তিনি কী আর মনে করে রেখেছেন, কার ছেলেমেয়ের কি নাম দিয়েছেন! গুরুদেবের স্মৃতিশক্তি যে অনন্যসাধারণ, সে খেয়ালই বীরেনদার হয় নি। বীরেনদার চরিত্রে কতকগুলি বিশেষ গুণে—উনি খুব পরোপকারী, আপদে-বিপদে এমন বুক দিয়ে সাহায্য করতে খুব কম লোককেই দেখেছি, অন্তঃকরণ উদার ও মহৎ। কারও বিপদের খবর পেলেই হলো—তিনি সাহায্য প্রার্থনা করুন আর না-ই করুন—উপযাচক হয়ে নিজেই তাঁর বিপদ মুক্তির জন্য অগ্রণী হতেন। অনেককে গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন, অতিমাত্রায় অতিথিবৎসল, বাইরে থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতন দেখতে আসতেন, তাঁরা বীরেনদার এই বিরাট 'অতিথিশালায়' আপ্যায়িত হতেন—তা সে বেলা দুপুরেই হোক বা রাত দুপুরেই হোক! একটা অপূর্ব মেজাজ, সদাপ্রফুল্ল মুখ, কথায় কথায় রসিকতা ও গুরুদেবের কবিতা আবৃত্তি—এসব কবিতার যে-কোনো একটা লাইন বললেই গোটা কবিতাটা মুখস্থ বলে-যাওয়া! সুগঠিত সবল দেহ, অসাধারণ পরিশ্রমী, একজন দক্ষ ক্রীড়াবিদ্—বিশেষ করে ফুটবল খেলায় 'ব্যাকে' খেলতেন, যেন একটি দুর্ভেদ্য দেয়াল! এমন একজন 'বন্ধু' সত্যিই দুর্লভ—মনে হয় এই ধরনের মানুষ দেখেই বোধ হয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা 'বন্ধুর' সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন 'উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।' অনেক সময় বলাবলি করেছি—এই রকম কয়েকজন বীরেনদা যদি বাংলাদেশে থাকতো তাহলে এর চেহারাটা হয়তো বদলে যেত।

বীরেনদার রসিকতা ও পরোপকারের দু'-একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। একবার গ্রীষ্মের ছুটির সময় কলকাতা এসেছি; বীরেনদা খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। অনুরোধ করলেন, তখনই ও'র সঙ্গে বের হতে, দমদম ছাড়িয়ে ২০।২৫ মাইল, কি একটা বিশেষ কাজ আছে, যাঁর সঙ্গী হওয়ার কথা তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ও'র সঙ্গে বের হওয়া মানে কখন বাড়ি ফিরব তা অনিশ্চিত, আর এতো বেশ দূরের পাড়ি; প্রতিবাদ নিষ্ফল, সঙ্গে যেতেই হলো। গাড়িটা নতুন কিনেছেন, নিজেই চালান, চাকায় পাম্প বেশি বলে রাস্তায় বেশ 'বাম্প' করছিল, লেক রোডে এসেই হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়িটা থামিয়ে পিছনের দরজা খুলে দিয়ে কা'কে জানি ডাকলেন। তাকিয়ে দেখি, এক দশাসই চেহারার ভদ্রলোক, ওজন কমপক্ষে সাড়ে তিন মণ, 'মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া গতি নেই' অবস্থা। হাত-পা দ্রুত সঞ্চালন করে হেঁটে চলেছেন অতিকষ্টে ভারসাম্য রক্ষা করে অত্যন্ত অসহায়ভাবে, কিন্তু শক্তি-প্রয়োগের তুলনায় দেহের গতিবেগ খুবই মন্থর। যেন শক্তি ও ওজনের প্যাঁজোয়ানীতে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। দেহের বিপুল ওজনের উপর ভারাকর্ষণের শক্তি ও তাতে গতি-সঞ্চারণের প্রযুক্ত শক্তির দ্বন্দ্বে প্রাধান্য লাভ করেছে ভারাকর্ষণের শক্তিটা, তাই প্রয়াসের অনুপাতে গতিবেগ হয়েছে অনেক মন্থর। বীরেনদা তাঁকে বললেন, 'এই যে, লেকে বেড়াতে যাচ্ছেন তো, আসুন গাড়িতে, আমরাও লেকের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে যাব।' বহুকষ্টে ভদ্রলোক তাঁর ঐ বিশাল বপু নিয়ে গাড়িতে উঠে একটা আরামের নিশ্বাস ফেললেন। লেকের কাছাকাছি গাড়িটা থামলে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বীরেনদাকে জোড়হাতে নমস্কার করে বললেন, 'ধন্যবাদ, আমার খুব উপকার হলো, আপনাদের পরিচয় জানতে পারলে খুব খুশি হব।' বীরেনদা নির্বিকারচিত্তে বললেন, ল্যান্সডাউন রোড এক্সটেনশনে বি এম সেন, ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টর ও আর্কিটেক্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী আমরা।' ভদ্রলোক একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে অম্লানবদনে বললেন, 'তাই বুঝি, বি এম সেন আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আপনাদের এই অযাচিত সাহায্যের কথাটা আমি নিশ্চয় তাঁকে বলব; আচ্ছা, নমস্কার।' ভদ্রলোক চলে যাবার পর বীরেনদাকে বললাম, 'এটা কী হলো, যে-ভদ্রলোককে সত্যি আপনি চেনেন না, তাঁকে ডেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এই রসিকতা করার অর্থ কী।' উনি বললেন, 'দেখছেন না, চাকায় পাম্প বেশি, গাড়িটা কিরকম 'বাম্প' করছিল, ঐ বিপুল ওজন পিছনের সীটে চাপিয়ে 'ব্যালাস্ট'-এর কাজ হলো, রাস্তাটা খুব খারাপ, তাই গাড়ির স্প্রিংকে একটু বাঁচাবার চেষ্টা। আর ভদ্রলোকেরও উপকার হলো, এতোটা পথ ঐ বপুখানি নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে আসা এক বিষম ব্যাপার হোত, সেই হয়রানি থেকে তো ভদ্রলোক আজ অন্তত রেহাই পেলেন।' বললুম, 'তা তো পেলেন, কিন্তু দেহ স্থূল হলে হবে কি, ভদ্রলোক বি এম সেনকে না-চেনার ভাণ করে যে-ভাবে ধন্যবাদ দিয়ে গেলেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনি তীক্ষ্ম বুদ্ধিমান। আপনার পরিচয় গোপন করাটা ঠিক ধরে ফেলে যেন ব্যঙ্গ করেই চলে গেলেন।'

তারপর শান্তিনিকেতনের আরো দু'-জন অধ্যাপককে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিলেন। তাঁরা যেতে রাজী হলেন এই শর্তে যে, বেলা এগারটার মধ্যে তাঁদের ফের পৌঁছে দিতে হবে। এদের মধ্যে একজনের মেজাজ অত্যন্ত চড়া, তিনি এমনিতে বেশ ভালো, তবে মেজাজ বিগড়ে গেলে একে-বারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন; তখন স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়ে যে-আচরণ করতেন, তা মোটেই অধ্যাপকজনোচিত নয়, যদি কেউ একে মস্তিষ্কের সাময়িক অসুস্থতার লক্ষণ বলে বলেন, তাহলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। যাত্রা হলো শুরু, এখানে-ওখানে-সেখানে থামতে থামতে বীরেনদা আমাদের নিয়ে চললেন। কলকাতার রাস্তাঘাটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব কম, হঠাৎ একসময় যেন মনে হলো দমদম যাওয়ার বদলে গাড়ি নিয়ে উনি দক্ষিণ দিকে চলেছেন, তখন বেলা সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বললেন, 'আজ আর দমদমের দিকে যাবার সুবিধা হলো না, দেরি হয়ে গেছে, ছোটোখাটো দু'-একটা কাজ সেরে নিয়ে আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দেব।' তারপর ঘণ্টাখানেক যে কোন্ রাস্তায় কোথায় ঘুরলাম জানি না। লক্ষ্য করলাম চড়া মেজাজের অধ্যাপকের নাসিকা ঘন ঘন স্ফুরিত হচ্ছে, অর্থাৎ ঝড়ের পূর্বাভাস, ধৈর্যচ্যুতি আসন্ন। কিছুক্ষণ পর গাড়ি গিয়ে ঢুকলো মস্ত গেটওয়ালা প্রকাণ্ড এক বাড়ির ভিতর; গাড়িটাকে লনের পাশে একটা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে বীরেনদা বললেন, 'আপনারা মিনিট দশেক বসুন, আমি জাস্টিস...... এর সঙ্গে একটা কাজের কথা বলে আসছি।' বোঝা গেল, সারা কলকাতা শহর সকাল থেকে টহল দিয়ে কোনো এক জজসাহেবের বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করেছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। গাড়ির মধ্যে এই প্রচণ্ড গরমে বসে থাকা অসম্ভব, তাই অগত্যা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসলাম, ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তখন আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বীরেনদার 'মিনিট দশেক' শেষ হলো না, 'চড়া মেজাজের' এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, সোজা দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে সজোরে নিজের কান দু'টি মলতে শুরু করলেন, ঘন ঘন কর্ণ-মর্দনের সঙ্গে বলে চললেন, 'এই কান মলছি, আর কোনোদিন যদি বীরেনদার সঙ্গে বের হই তাহলে আমার নাম...... নয়।' ঠিক তখনই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এক সৌম্যশান্ত মূর্তি, তাঁর পিছনে বীরেনদা। ভদ্রলোক অঙ্গুলি-নির্দেশে কর্ণমর্দনরত অধ্যাপককে দেখিয়ে মনে হলো বীরেনদাকে কিছু বললেন, তারপর ফিরে গেলেন ঘরের মধ্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বীরেনদার আবির্ভাব, এসেই ঐ অধ্যাপককে বললেন, 'জাস্টিস্... আপনার নিজের কান নিজহাতে মলতে দেখে ধরে নিয়েছেন আপনার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ সব পরিস্ফুট। আমাকে জিজ্ঞেস করতেই বললাম, "ঠিক ধরেছেন, আর এই গরমে এতক্ষণ মাঠে বসে থাকার ফলে এই বিকৃতির মাত্রাটা এতো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নিজের হাতে নিজের কান মলে যাচ্ছেন।" এরপর সারা গাড়ির সবাই চুপ; এই ব্যাপারের পর ঐ অধ্যাপক বেশ কিছুদিন বীরেনদার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আর একদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। বিকেলের দিকে গাড়ি নিয়ে বের হলেন হাবড়ায় ও অধুনা বাণীপুর নামে খ্যাত এক জায়গায় এরোড্রোম নির্মাণের কাজে। সেদিন আমাকে ছাড়া আর কাউকেই সঙ্গী পেলেন না! ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল, বারাসাতের কাছাকাছি এসে দেখা গেল এক বিশালদেহী ভদ্রলোক সপরিবারে একটা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক দু'হাত তুলে আমাদের গাড়ি থামাতে সংকেত করলেন, রাত তখন প্রায় আটটা। বীরেনদা বললেন, 'মনে হচ্ছে, গাড়ি 'ব্রেক-ডাউন' হয়ে ভদ্রলোক এই নির্জন জায়গায় সপরিবারে খুবই বিপদে পড়েছেন, দেখি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না।' বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি এভাবে পরোপকারে লেগে গেলে কলকাতা পৌঁছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে, আমার ন'টার সময় একটা জরুরী 'এনগেজমেণ্ট' রয়েছে, সময় মতো না পৌঁছাতে পারলে বেশ মুশকিলে পড়ব।' কার কথা কে শোনে! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল ও'র গাড়ির 'এ্যাক্সেল' (axle) ভেঙে গেছে একটা লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে, ও'রা সবাই অল্পবিস্তর কিছু আঘাত পেয়েছেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে

[illegible] নিয়ে [illegible] ঐ গাড়ীর নম্বরটা নেওয়াও সম্ভব হয় নি। ঐ পথে চলতি অনেক গাড়ি থামিয়ে তিনি সাহায্যের আবেদন করেছেন, কিন্তু এ্যাক্সেল-ভাঙা গাড়িকে উদ্ধার করে কলকাতা নিয়ে যেতে কেউ কিছু করতে পারেন নি, আর তা ছাড়া গোটা পরিবারের ৫।৬ জন লোককে একসঙ্গে 'লিফ্‌ট' দেওয়ার দুঃসাহস কারও হয় নি। তবে এক ভদ্রলোক বলে গেছেন তিনি কলকাতা গিয়ে 'ব্রেক-ডাউন সার্ভিসে' ফোন করে একটা 'ভ্যান' পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, আর তা না হয় তো 'ফায়ার ব্রিগেডে' খবর দেবেন। এই অনিশ্চিত ভরসার উপর নির্ভর করে ভদ্রলোক প্রায় দু' ঘণ্টা সপরিবারে ঐ জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছেন। বীরেনদা হঠাৎ এক বিষম কাণ্ড করলেন—অজানা-অচেনা এই ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি আমার গাড়িতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা চলে যান, আপনার ড্রাইভার আমার গাড়িটা নিশ্চয় চালাতে পারবে। আপনি কলকাতা পেঁ৭ছে হয় একটা 'রেসকিউ-ভ্যান' পাঠিয়ে দেবেন, আর না হয় তো আপনার গাড়ি মেরামত করে নিয়ে যাবার জন্য নতুন এ্যাক্সেল সহ কোনো দক্ষ 'মেকানিক' আমার গাড়ির সঙ্গে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন।' প্রস্তাবটা ভদ্রলোকের খুব মনঃপূত হলো না, বললেন, 'তা কী করে হয়! চলুন সবাই মিলে আপনার গাড়িতেই কলকাতা ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে আমার গাড়িটা ফিরিয়ে নেবার একটা ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করতে পারব।' বীরেনদা সহাস্যে বললেন, 'হলে ভালোই হোতো, তবে কিনা আপনার ও আমার মতো দু'জন 'শীর্ণকায়' লোক একসঙ্গে এক গাড়িতে বসার পর আরো ৫-৬ জনের বসার স্থান একমাত্র বাস বা লরীতে হতে পারে, কোনো প্রাইভেট গাড়িতে নয়। যদিও বা ঠাসাঠাসি করে আমার গাড়িতে এই ৭।৮ জন উঠে বসি, তাহলে আরো একটা অপঘাতের জন্য তৈরি থাকতে হবে।' ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে সপরিবারে বীরেনদার গাড়িতেই কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। যাবার সময় বীরেনদার ঠিকানা নিয়ে গেলেন আর ও'র ঠিকানাও বীরেনদাকে দিয়ে গেলেন। [illegible] হাত দুটি যুক্ত করে বীরেনদাকে নমস্কার করে বললেন, 'অজানা-অচেনা একজন লোককে আপনার এই অযাচিত সাহায্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম, শরীরের কুটিরে একদিন পদধূলি দিতে হবে কিন্তু।' বীরেনদার গাড়ি চোখের [illegible] সপরিবারে [illegible] [illegible] [illegible]। এই নির্জন [illegible] প্রান্তরে [illegible] [illegible] গাড়ি নিয়ে পড়ে রইলাম আমি ও বীরেনদা। অনিশ্চিত [illegible] হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে। সামনে-পিছনে যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, কিছু দূরে একটা পরিত্যক্ত ভাঙা-বাড়িতে শেয়ালের ঐকতান ছাড়া প্রাণের আর কোনো সাড়া নেই, অপ্রাকৃত কোনো অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না জানি না, অন্তত তাদের উপস্থিতির কোনো স্পষ্ট নিদর্শন নেই। কবিতা করার উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ বটে। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে গাড়ির পা-দানে বসে বীরেনদা তখন গুরুদেবের কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন, হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তার তখন দশটা বেজে গেছে। একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি চললো, মাঝে মাঝে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করছেন জেগে আছি কি না। ঘুম চোখ থেকে অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছে, আর গাড়ির পা-দানীতে বসে [illegible] কৌশলটা আয়ত্ত করা নেই। [illegible] এই যে, আধুনিক কবিতা বীরেনদার জানা ছিল না, থাকলে আমার অবস্থা হয়তো 'ব্রহ্মদৈত্যের' মতোই হতো! এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদৈত্যের গল্পটা মনে পড়ে গেল—

"একটা পরিত্যক্ত ভাঙাবাড়িতে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করতো, রাত্রে মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেড়ানোই তার পেশা। একথা শুনে একদল কলেজের ছাত্র অপদেবতা সম্বন্ধে মানুষের এই অবিশ্বাস্য দূর করার জন্য স্থির করলো তারা দলবেঁধে ঐ পরিত্যক্ত হানাবাড়িতে এক রাত্রি কাটিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, এসব মিথ্যে বা কোনো দুষ্ট লোকের কারসাজি। একদিন রাত দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়েকটা টর্চলাইট ও সতরঞ্চি নিয়ে তারা ঐ পড়ো ভিটেতে জমিয়ে বসে তাস খেলতে শুরু করলো; রাত বারটা পর্যন্ত ব্রহ্মদৈত্য দূরে থাক, একটা শেয়াল-কুকুরেরও সাড়া পাওয়া গেল না। তাস খেলা ছেড়ে তারা তখন কবিতা আবৃত্তি শুরু করলো: রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত থেকে শুরু করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিদের কবিতা অনেকক্ষণ আবৃত্তির পর একটি ছেলে স্বরচিত আধুনিক কবিতার আবৃত্তি শুরু করলো। ঐ কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তির পর ঐ ভিটের উঠোনে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রচণ্ড "ধপাস" শব্দ হলো ও একটা মর্মান্তিক গোঙানির আওয়াজ কানে এলো ছেলেদের। হৈ-হৈ করে ওরা টর্চ জ্বালিয়ে উঠোনে নেমে এসে এক নিদারুণ দৃশ্য দেখলো:—পায়ে খড়ম, গলায় পৈতে জড়ানো এক ব্রহ্মদৈত্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। আধুনিক কবিতার [illegible] [illegible] [illegible] আঘাতেই এতো বড়ো দুর্দান্ত ব্রহ্মদৈত্যের পতন ঘটেছিলো!" এতক্ষণে [illegible] [illegible] বারটা পর্যন্ত বসে থেকে, অন্ধকারে এমন প্রচণ্ড আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি, হঠাৎ চোখে পড়লো একজোড়া হেডলাইটের তীব্র আলো। একটা গাড়ি এসে থামলো, চেয়ে দেখি বীরেনদার গাড়ি নিয়েই ঐ ভদ্রলোকের ড্রাইভার ফিরে এসেছে সঙ্গে আরো দু'জন লোক। এদের একজন নাকি দক্ষ মেকানিক, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এ্যাক্সেল বদলে গাড়িটাকে সচল করার ভরসা দিল; এদের সঙ্গে এনেছে খুব জোরালো তিন-চারটে টর্চলাইট আর ব্যাটারীতে জ্বলে তেমন দুটো বাল্ব ও অনেক যন্ত্রপাতি। ড্রাইভার বীরেনদাকে নমস্কার করে বললো, 'সাহেব, অনেক রাত হয়ে গেছে, আপনি এবার কলকাতা ফিরে যান, বাড়িতে নিশ্চয় সবাই খুব ভাবছেন। আপনার গাড়ি করে আমার সাহেবকে যদি আজ কলকাতা ফিরে না পাঠাতেন, তাহলে খোদা জানেন কী সর্বনাশ হতো! দেখছেনই ঐ চেহারা, সাহেব কিন্তু হার্টের রুগী, একটুও ধকল সইতে পারেন না। খোদা মেহেরবান যে, রাস্তায় ব্যাপারটা ঘটে নি, বাড়িতে গিয়ে দোতলায় উঠেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, সবাই মিলে ধরাধরি করে বসবার ঘরের সোফায় ও'কে শুইয়ে দিয়ে আপনার গাড়ি নিয়েই ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এলাম। ডাক্তারবাবুর কড়া দাওয়াই খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ মেলে তাকালেন, তারপর বললেন, "আবদুল, তুই এখনও গাড়ি নিয়ে ফিরে যাস্‌নি; আমার যা হয় হবে, তুই এক্ষুণি বেরিয়ে পড়। ডাক্তারবাবু যখন এসে পড়েছেন, তখন আমার জন্য ভাববার আর কোনো কারণ নেই। তুই 'মেকানিক' ও যন্ত্রপাতি নিয়ে এক্ষুণি রওনা হয়ে যা। এই বিপদে যিনি সাহায্য করলেন, তাঁকেই তোরা ভুলে বসে রইলি!" তারপরই এই দু'জন মেকানিক আর এসব যন্ত্রপাতি, আলো যোগাড় করে একটানা গাড়ি চালিয়ে এই এলাম।' ওরা এসেই গাড়ি মেরামতের কাজে লেগে গেল, আমরা যাত্রা শুরু করলাম কলকাতার দিকে। কিছুক্ষণ পরে বীরেনদা গান ধরলেন, হাতজোড় করে বললাম, 'দোহাই আপনার, থামুন, এই গভীর রাতে বেসুরো গান শুনে ব্রহ্মদৈত্য না হোক, কুকুরে তাড়া করতে পারে না হয় দুর্ব্যাগুণে অপ্রকৃতিস্থ মনে করে পুলিশে ধরাও খুব অসম্ভব নয়।' বীরেনদা নিরস্ত হলেন, রাত প্রায় দুটোর সময় কলকাতা ফিরলাম। বলা বাহুল্য, এতো রাতে বাড়ি ফিরলে পরিবারবর্গের, বিশেষ করে স্ত্রীর কাছে যে অভ্যর্থনা মেলে ও যে সম্বন্ধ-বিরোধী সম্ভাষণ আর বাক্যসুধা বর্ষিত হয়, তা লিপিবদ্ধ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভুক্তভোগী মাত্রই আমার অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করবেন। [ক্রমশ]

আর কতক্ষণ জেগে থাকবে মল্লিকা? কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকা যাচ্ছে না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে হাতের পাখাটাও তার অজান্তে থেমে যাচ্ছে। এখন রাত ক'টা কে জানে। পাশের বাড়ির রেডিওর গান অনেকক্ষণ হল বন্ধ হয়ে গেছে। চারপাশটা মোটামুটি নিস্তব্ধ।

মল্লিকার ঘুম পেয়েছে। তবুও সে ঘুমোতে পারছে না। বাবার রুগ্ন দেহটার দিকে ভাল করে চোখ পড়ামাত্রই তার তন্দ্রার ঘোর কেটে যাচ্ছে। আর তখনই পাখাটা নিয়ে জোরে জোরে বাতাস করছে।

একটা ছোট্ট হাই তুলে পা টিপে টিপে উঠে দাঁড়াল মল্লিকা। সাবধানে অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে বারান্দায় এসে চোখে জলের ঝাপটা দিল সে। চোখ দুটো একটু একটু জ্বলছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে আবার ঘরে এসে দাঁড়াল সে। স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইল বাবার দিকে। এবং ভাবল এবারে শোয়া যেতে পারে। শোয়ামাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়বে না। শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে বুকের ওপরে হাত দু'টি রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করবে। তারপরে একটু একটু করে ঘুম ঘুম আমেজ আসতেই উপুড় হয়ে বালিশ জড়িয়ে ধরে শোবে। আরো চিন্তা করবে। আরো ভাববে। ভাবতে ভাবতে চোখের জলে বালিশ ভিজাবে। কিংবা সুখ-স্বপ্নে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হবে।

বেণীমাধব একটু বোধ হয় কাশলেন। মল্লিকা ভয় পেল। তাড়াতাড়ি পাখাটা তুলে নিয়ে পাশে বসে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।—কি জানি, যদি আবার টান ওঠে! তাহলে হয়ত সারা রাত আর ঘুমই হবে না।—আজ বছর তিনেক হল এ রোগের আক্রমণ শুরু হয়েছে। প্রতিবার এই গ্রীষ্মকালেই রোগটা যেন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। শীতকালে অতটা নয়। এবারে বাড়াবাড়িটা যেন আরো বেশী।—মাথার কাছে একগাদা ওষুধের শিশি। এফিড্রিনের ফাইলটা সামনেই।

ঘুমিয়ে আছেন বেণীমাধব। নিশ্বাসের তালে তালে শাঁই-শুঁই আওয়াজ। মাঝে মাঝে গলার কাছে কেমন যেন ঘর্ঘর শব্দ হয়। আর মল্লিকা তখনই ভয় পায়। জোরে জোরে বাতাস করে। আজ সারাদিন বেণীমাধব কেশেছেন। গলার শিরা ফুলিয়ে চোখ বড় বড় করে দম নেবার চেষ্টা করেছেন। আর হাপরের মত হাঁপিয়েছেন। বড় কষ্ট। রোগের জ্বালায় চেহারাটাও আধ-খানা হয়ে গেছে। সেই সাথে মেজাজ-টাও। সর্বদাই খিটখিটে, নইলে সুশীতকে কি কখনও মুখের ওপরে ঐরকম কথা বলতে পারেন!

সুশীত মল্লিকার বন্ধু। মল্লিকা তাকে ভালবাসে। অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সব স্বপ্নই সেদিন চুরমার হয়ে গেছে। সুশীত তাদের বাসায় আসত। অনেক সাহায্য করত। ডাক্তারখানা বাজার, বিনি-মিনিকে অঙ্ক আর ট্রান্সলেশন করে দেওয়া, বেণীমাধবের সাথে পলিটিক্স আলোচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা, সব দিক থেকেই বাড়ির ছেলের মতই হয়ে গিয়েছিল। মল্লিকা তাই মাঝে মাঝেই

[illegible], [illegible] [illegible] গেছে—দেখছি।

—কেন, হিংসে হয় নাকি?

—উঁহু। দুঃখ হয়।

—আহা-হা। দুঃখের চোটে গালে যে আরো রং ধরেছে।

—যাঃ। —মল্লিকা পালাত। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়?

পায়রার খুপরীর মত ছোট্ট দুটো ঘর তো তার দুনিয়া। এ-ঘরে বাবা। ও-ঘরে রিনি-মিনিরা। সামনের এক চিলতে বারান্দায় তোলা-উনুনে রান্না হয়। উনুনে আঁচ দেওয়ামাত্রই ধোঁয়ায় সব ঘোলাটে হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। তবুও মল্লিকা তার মধ্যে খুশির নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে এই ঘিঞ্জি এলাকার রূপ দেখে। এ-বাড়ির ছাদ টপকে, সে-বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে, ও-বাড়ির চিলে-কোঠার পাশ কাটিয়ে আকাশকে দেখবার চেষ্টা করে। এক টুকরো আকাশ। তার আশা আর আনন্দের আকাশ। পাড়াটা বড় নোংরা। ঠিক বস্তিও নয়, আবার ভদ্রপাল্লীও নয়। দুটোরই এক বিশ্রী মিশ্রণ। দেখে মনে হয়, সব ক'টি বাড়িই পুরনো। বিবর্ণ, রং-চটা আর স্যাঁতসেতে। তারই মাঝে মাঝে খোলার ঘর। এখানে-ওখানে আবর্জনার স্তূপ। সর্বদাই দুর্গন্ধ। মাসে একবারও পরিষ্কার হয় কি না সন্দেহ। সমস্ত এলাকাটা জুড়ে সরু সরু ব্লাইন্ড লেনের গোলকধাঁধা। এক ফোঁটা বৃষ্টিতেই জলে-কাদায় এক-কোমর।

তবু ভাগ্যি। অন্ততপক্ষে মাথা গোঁজ-বার ঠাঁইটুকু পাওয়া গেছে। বহু ঘোরা-ঘুরির পর সুশীতই এই আস্তানাটুকুর সন্ধান এনে দিয়েছিল। আর সেই সুশীতকেই কিনা বাবা—সে কথা ভাবলেই যেন একটা চাপা বেদনা চোখের জলে মুক্তি পেতে চায়। মনের মণিকোঠায় যেন একটা ক্ষোভ ছটফটিয়ে মাথা ঠুকবার চেষ্টা করে। আর যত অভিমান, রাগ এসে জমা হয় একজনের ওপর। কিন্তু বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারে না। কেন না বেণীমাধব অসুস্থ। আর এই অসুস্থতাটা ক্রমে ক্রমেই যেন তার জীবনকে পঙ্গু করে তুলছে—এই ভাবনায় মাঝে মাঝেই সে শঙ্কিত হয়। তবুও স্বপ্ন দেখে মল্লিকা।

যদিও সুশীত আজকাল আসা-যাওয়াটা একটু কমিয়ে দিয়েছে, তবুও তাদের ভালবাসার মধ্যে কোন ছলচাতুরী ফাঁকি নেই। ওরা স্থির বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত। সুশীতই সেদিন বলেছিল,—এর পরেও কি তোমাদের বাসাতে আসাটা ঠিক হবে?

অস্ফুটস্বরে মল্লিকা বলেছিল,—আমিও তাই ভাবছি।

—তোমার বাবা আর আমাকে পছন্দ করছেন না। তুমিও তো শুনেছ উনি কি বলেছেন। বিয়ে যখন দেবেনই না, তখন আর মিথ্যে মায়া বাড়িয়ে লাভ কি বল?

—তুমি কিছু মনে কোর না লক্ষ্মীটি। রোগের জ্বালায় বাবার মাথার ঠিক নেই। আমাকেও তো চব্বিশ ঘণ্টা বকেন।

—মনে করবার মত যথেষ্ট কারণ ঘটেছে মল্লি। আমার যাতায়াতটাও উনি যখন পছন্দ করছেন না, তখন না হয়—

মল্লিকা কোন কথা বলতে পারে না। তার সজল চোখে করুণ মিনতি ফুটে ওঠে। একটু পরেই ধরা-গলায় বলে,—প্লীজ, ভুল বুঝ না।

এবারে সুশীত জোরে হেসে ওঠে,—তুমি কি সত্যি সত্যিই ধরে নিলে নাকি যে, আমি এসব সিরিয়াসলি বলছি!

মল্লিকা কিছু বলে না। তার সজল চোখের কালো তারায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের স্থির ছায়া প্রতিফলিত হয়।

—অসুখের চোটেই মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে গেছে। খুবই স্বাভাবিক। হাঁপানির মত এত বদ রোগ আর নেই। ভয় কি, সেরে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। —সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে সুশীত।

—তুমি না এলে......

—জানি, তোমার খুব কষ্ট হবে। তোমাদের অসুবিধা হবে। কিন্তু এরকম অবস্থায় ও'র অবাধ্য হওয়াটাও ঠিক নয়। —ভাবনা কি? মাঝে মাঝে চুপিসারে ঠিক চলে আসব। তুমি দেখে নিও।

মল্লিকা হেসেছে। গভীর তৃপ্তির। চোখ মুছে ফিস্ ফিস্ করে বলেছে—কথার নড়চড় যেন না হয়। —তুমি এক্ষুণি যেও না। একটু বস, চা খেয়ে যাবে।

—একেবারে শেষবারের মত!

—সুশীতের কণ্ঠে কৌতুক উপচে পড়ে।

—না মশাই, আজকের মত।

—এর পরে তো ছ' মাসে ন' মাসে একবার আসব। তখনও কি শুধু এক-কাপ চা জুটবে?

—তা নয় তো কি, অন্য কিছু আশা কর নাকি?

—তা একটু করি বৈ কি!

—কি— —মল্লিকা হাসিমুখে বড় বড় করে তাকায়।

—একটু বেশি আদর, বেশি যত্ন ইত্যাদি ইত্যাদি।

—ইস্।—তখন শুধু এই জুটবে! —বুড়ো আঙুল দুটো দেখিয়ে চলে গেছে মল্লিকা।

সুশীত কথা রেখেছে। দুদিন অনুপস্থিত হতে-না-হতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন পাশের বাড়ির রেডিওটা ফুল ভল্যুমে ছাড়া থাকে, ওপরতলার আধোটা বিয়ের কোয়ালিফিকেশন বাড়ানোর জন্যে মিষ্টি সুরে গলা সাধে, ওপাড়ার ঘরের ছোঁড়া দুটো তাদের দজ্জাল মায়ের ভয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে, কানাগলির ভাঙা রকে লণ্ঠন জেলে কয়েকটা বুড়ো হল্লা করে পাশা খেলে, তখন পা টিপে টিপে এসে উপস্থিত হয়েছে। রিনি-মিনি কিছু বলার আগেই ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চোখ বড় বড় করে চুপ করতে ইসারা করেছে। তাই দেখে মল্লিকা হেসেছে। শঙ্কিতও হয়েছে।

দু'-চার দিন এরকম লুকোচুরি খেলা চলতে-না-চলতেই একদিন পাশের ঘর থেকে বেণীমাধব কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস করেছেন,—কে এসেছে, কার সাথে কথা বলছিস রে মল্লি?

—কেউ না বাবা, গয়লা। দুধে আজ-কাল বড় বেশি জল দিচ্ছে।

—ও। —অবিশ্বাসের কাশি কেশেছেন বেণীমাধব।

—সখী, শুনেছি কেষ্টঠাকুর গরু চরাতেন। তা আমি না হয়.....

—আঃ, কি হচ্ছে কি? বাবা শুনতে পাবেন। —চাপা গলায় ধমক দিয়েছে মল্লিকা।

ঘুমের ঘোরে দু'বার কেশে উঠলেন বেণীমাধব। আর তখনই মল্লিকার ভাবনার ভেলা থমকে দাঁড়াল। জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল সে। —রাত নিশ্চয়ই অনেক হয়েছে। জানলার বাইরে আঁধার: সবাই এখন ঘুমিয়ে। কিন্তু আর কতক্ষণ জেগে থাকবে সে? আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল মল্লিকা। আর নয়। এবারে শুতে হবে। এতক্ষণে রিনি-মিনি বোধ হয় তার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে।

* * * *

ভয় পেয়েছে মল্লিকা।

বড় কষ্ট পাচ্ছেন বেণীমাধব। ভুগে ভুগে চেহারাটা আধখানা হয়ে গেছে। হাতের, গলার, মুখের চামড়া অতিরিক্ত কুঁচকে যেন অকালে বার্ধক্য ঘোষণা করছে। টানের ঠেলায় প্রতিটি কাশির ঝোঁক দেখে মনে হয়, এই বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে গেল। বেণীমাধবের অবস্থা দেখে ভয় পেয়েছে মল্লিকা। কেন না, তিনি এখন মারাত্মক রকম অসুস্থ এবং ওষুধের শাসনের বাইরে। তাঁর কাশি দেখলে প্রায় প্রতিবারই মল্লিকার সদ্য জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের কথা মনে হয়। পর পর বেশ কয়েকটা রাত জেগেছে মল্লিকা। চিন্তায় চিন্তায় তার চোখের কোণে দুর্ভাবনার কালি গভীর হয়েছে। প্রাণপণে বেণীমাধবের পরিচর্যা করেছে কিন্ত তাতেও রোগের একটুক উপশম হয় নি। বরং আরো বেড়েছে যেন।

মল্লিকা ভয় পায়।

সুশীত আশ্বাস দেয়,—তুমি মিছিমিছি

—সেইটেই তো সমস্যা। —মল্লিকা গম্ভীর হল।

দ্বজনেই গভীর ভাবনায় ডুব দিল।

—এই যে তোমরা এখানে?

বেণীমাধবের কণ্ঠস্বরে ওরা দ্বজনে অপ্রস্তুত হল। ভয়ও পেল। রিনি-মিনি অভিযোগ করে বলল,—তোমাদের সেই কখন থেকে খ্বজছি। তোমরা পালিয়ে এলে কেন? মেলা সন্দর সন্দর জিনিস ফ্বরিয়েছি।

—ইয়ংম্যান বসে থাকলে চলবে কেন? চল বেড়িয়ে আসি।

সন্দীত উঠে দাঁড়াল এবং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও মল্লিকাদের পিছনে ফেলে বেণী-মাধবের সঙ্গে বালি ভেঙে হাটতে লাগল।

বেণীমাধব নানান বিষয়ে অ:লোচনা করতে লাগলেন। অনেক খোঁজ-খবর নিলেন। সন্দীত কিছ্ব শ্বনল। কিছ্ব শ্বনল না, ট্বকরো ট্বকরো জবাব দিল। এক সময়ে বেণীমাধব বললেন,—মেয়েটার আমার জন্যে বড়ই কষ্ট। মল্লির মত মেয়ে হয় না। সেবাযত্নে, কথাবার্তায় ওর মায়ের সব গ্বণগ্বলোই পেয়েছে। ভাবছি, এবারে ওর বিয়ে দেব।

সুশীত শঙ্কিত হল। ঢেউ দেখতে লাগল সে এবং ভাবল সমুদ্রে অনেক হাঙ্গর, অনেক হিংস্র জীবজন্তু আছে।

—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ক'টা পেলেই খুব শিগ্‌গির তোমাদের বিয়েটা দিয়ে দেব।

চমকে উঠল সুশীত এবং কথাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হল তার।

—সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যেই পেয়ে যাব মনে হয়। ততদিনে তুমিও একটু দাঁড়িয়ে নাও।

ডুবন্ত সূর্যের শেষ আভায় সমস্ত আকাশটা লাল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কে যেন মুঠো মুঠো সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ যেন আনন্দে নাচছে। আর শেষ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে রং বদল করছে। ঢেউ ভেঙে জেলে-নৌকোগুলো নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা করছে।

সুশীত মুগ্ধ হল। বেণীমাধবের প্রতি পূর্ব মনোভাবের জন্য অনুশোচনায় ভরে উঠল তার মন। এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে তার দেহ-মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সে ভেবে পেল না ঠিক এই মুহূর্তে তার কিছু বলা উচিত কি না। ভাল করে তাকিয়ে দেখল মানুষটিকে। দৃষ্টি মেলে দিল বিশাল উদার সমুদ্রে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। দূরে আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখী উড়ে গেল। সমুদ্রের গর্জনও যেন অনেক কম মনে হয়। এক সময়ে বেণীমাধবই বললেন,—এবারে ফেরা যাক।

লোকালয়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে সুশীত ভাবল, আগামীকাল সে শুধু মল্লিকাকে নিয়ে কোণারকের সূর্যমন্দির দেখতে যাবে।

* * * *

কলকাতায় ফেরার পর আরো মাস দেড়েক কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে সুশীত নানান কাজের চাপে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। তাই সে মল্লিকাদের বাসায় বেশিদিন যেতে পারে নি। তবুও ভাল দিনগুলি একটা মিষ্টি আমেজের মধ্যে দিয়ে কাটছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকটা সময় হাতে নিয়ে সে মল্লিকাদের বাসার পথে একটা খুশির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রওনা হল। —রাস্তায়, দোকানে, পার্কে সব আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। চতুর্দিকে হাজার মানুষের মিছিল। সবাই যেন হাসছে, ছুটছে, আনন্দের জোয়ারে ভেসে চলেছে। কোথাও যেন কোন দুঃখ নেই। কোন সমস্যা নেই। খাদ্যে ঘাটতি নেই, লাল ত্রিকোণের প্রয়োজন নেই, রাজনৈতিক অরাজকতা নেই। সব রাতারাতি মিটে গেছে। প্রত্যেকের মুখ থেকেই সুখ চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। —একটা সিগারেট ধরিয়ে সুশীত এগিয়ে চলল।

মল্লিকাদের বাসায় দরজার কাছে এসে সুশীত দেখল এদিককার রকে কয়েকটা বুড়ো লণ্ঠন জেলে মহা উল্লাসে পাশা খেলছে। হাসি পেল তার। বাসার ভিতরে এল সে। —দরজা খোলা। কিন্তু কারো কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? রিনি-মিনিকেও তো দেখা যাচ্ছে না! তবে কি ওরা বেড়াতে কিংবা সিনেমায় গেছে? রিনি-মিনির নাম ধরে দু'বার ডাকল সে। তারপর পাশের ঘরে উঁকি দিতেই বেণীমাধবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কাশতে কাশতে বেণীমাধব তাকে কাছে বসতে বললেন। একটু ধাতস্থ হতেই সুশীত জিজ্ঞাসা করল,—কেমন আছেন?

—ভালই। তবে হাঁপের একটু টান আবার দেখা দিয়েছে। —গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন বেণীমাধব।

সুশীত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কি বলবে চট করে ভেবে পেল না। তারপর পাশের ঘরের দিকে চোখ রেখে বলল,—রিনি-মিনিদের দেখছি না যে!

—মল্লির সাথে বাজারে গেছে। ফিরতে দেরি হবে। —বেণীমাধবের কণ্ঠস্বর আরো গম্ভীর শোনাল।

সুশীত অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। ঘরের মধ্যে কেমন যেন গুমোট গরম অনুভব করল সে।

—তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই সুশীত।

একটু যেন শঙ্কিত হল সুশীত। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে ভাল করে তাকাল সে। —ঘর ঈষৎ অন্ধকার। একটা আরামকেদারায় হেলে বেণীমাধব বসে আছেন। যথাসাধ্য গলাটাকে পরিষ্কার করে সে বলল,—বলুন।

—তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, আমাকে নিশ্চয়ই ভুল বুঝবে না। তোমার এখানে আসা-যাওয়াটা হয়ত অনেকেরই মনঃপূত নয়।

সুশীত ঘামতে লাগল।

—যদিও মল্লিকার বিয়ের বয়েস হয়েছে, তবুও এখন আমি ওর বিয়ে দেব না। আমি অসুস্থ। রিনি-মিনি ছোট।

সুশীত তার মাথার মধ্যে কেমন যেন যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। কপালের দু'পাশের রগগুলো যেন টনটন করে উঠল।

—তাছাড়া তোমাদের মত শিক্ষিত ছেলের মেয়ের অভাব হবে না বাংলাদেশে।

—বেণীমাধব চুপ করে রইলেন।

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুশীত। রাগে, দুঃখে, অপমানে তার চিন্তাশক্তি লোপ পেল। সারা শরীর জ্বলতে লাগল।

গলিতে পা দিতেই নোংরা আবর্জনার গন্ধে তার মনটা যেন আরো বিষিয়ে উঠল। —না, মল্লিকার সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নয়। সমস্ত কিছুরই ইতি এইখানে। বিট্রেয়ার! মানুষকে বিশ্বাস করাও পাপ। এত ছলনার তো কোন প্রয়োজন ছিল না।

উৎকট হাসিতে সচকিত হল সুশীত। দেখল ভাঙা রকে ভুতুড়ে আলোয় শকুনিরা পাশা খেলছে। —কি বিশ্রী এই গলিটা। এর ক্ষয়ে-যাওয়া গায়ে লাগালাগি বাড়িগুলো। আর এখানকার মানুষগুলো। এই ঘিঞ্জি পট্টির কোন কিছুই স্বাভাবিক নয়। কোন কিছুই সহজ-সরল-ভদ্র নয়। এ এলাকার সমস্ত বাতাসই দূষিত। সমস্ত পাড়াটাই যেন কুষ্ঠরোগীর মত দগদগে ঘায়ে পঙ্গু।

বড় রাস্তায় এসে কিছুটা যেন সুস্থ হল সুশীত। অযথা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। চতুর্দিকে বার কয়েক চাইল। তারপরে হাঁটতে লাগল। ভাবল মল্লিকার সঙ্গে দেখা হলে আচ্ছা করে দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া যেত। হাঁটতে হাঁটতে একটা পার্কের সামনে এসে পড়ল সে। ঢুকে পড়ল ভেতরে। খুঁজে খুঁজে একটা ফাঁকা বেঞ্চে গিয়ে বসল।

ভারি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া বইছে। এখানকার বাতাস কত হাল্কা, কত মিষ্টি। সুশীত চারদিকে চাইল। —পার্কের বাইরে নতুন ডিজাইনের বাড়িগুলো কি সুন্দর। পার্কের ভেতরে ছোট ছোট ঝাউগাছগুলোকেও চমৎকার লাগছে দেখতে। আকাশে অজস্র তারা। আর একটু পরে হয়ত চাঁদ উঠবে। দূরে কোথায় যেন মাইকে সানাই বাজছে। —বেচারী মল্লিকা! ওর তো কোন দোষ নেই। ও হয়ত এসবের কিছুই জানে না। জানতেও পাবে না।

মল্লিকার ভাগ্যের কথা ভেবে কষ্ট পেল সুশীত। আর সমস্ত রাগ গিয়ে জমা হল বেণীমাধবের ওপর। সমস্ত নষ্টের মূলে ঐ একটি লোক। কিন্তু বেণীমাধবের ওপর প্রকৃতপক্ষে যতটা রাগ করা উচিত, ততটা সে যেন রাগতে পারল না। তার বদলে যেন হঠাৎ একটা নিশ্চিন্ত হাল্কা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সশীত ভাবল, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। আগামী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত।

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জিলার তাঁর প্রবন্ধে আরও লিখেছেনঃ "যুদ্ধকালের পরবর্তী আমলে ভারতীয় নাটকের অনেক মূল্যবান অনুবাদ করা হয়েছে—ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এসব অনুবাদ সার্থক সৃষ্টি। এই অনুবাদগুলিতে প্রচেষ্টা করা হয়েছে মূল নাটকের গাঠনিক দিকটা বজায় রাখতে। তবে বেশির ভাগ জনপ্রিয় সংস্করণগুলিতে বা রঙ্গমঞ্চের জন্য তৈরি অনুবাদ-পাণ্ডুলিপিতে ভারতীয় নাটকের গাঠনিক দিকটার ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। Considering the usual way of acting in German stages the realisation of such dramatic forms was not possible

একমাত্র এই শতাব্দীতেই বের্টল্ট ব্রেশটের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে ভারতীয় নাটক অভিনয় করবার সত্যিকার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একথা সত্য যে, এমন কোন প্রমাণ নেই যে, ব্রেশটের কাজে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় নাটকের সাক্ষাৎ প্রভাব পড়েছে। তবে একথাও অজানা নয় যে, ব্রেশট্ চায়না, জাপান প্রভৃতি দেশের অর্থাৎ ইস্ট এশিয়ান রঙ্গমঞ্চ থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এপিক থিয়েটার সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি চরম সাফল্য অর্জন করেছেন 'দি ককেশিয়ান চক্ সার্কল' নাটকে। এটি তাঁরই রচিত এবং এর পরিচালনাও করেছিলেন তিনিই। মাল্টি ডিমেনশনাল সিন-ইক্ এক্সপ্রেসনের সার্থক রূপায়ণ দেখা যায় 'চক্ স্যার্কল' নাটকে।

এই নাটকটিতে আমরা নানা ধরনের কাব্যিক বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখতে পাই—এই বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি করবার জন্যই দরকার হয়েছে নানা স্তরে দৃশ্যের অবতারণা করবার—ঠিক এমনিভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি করা হোত পুরনো সংস্কৃত নাটকে।

অর্থাৎ সহজ কথায় রোনাল্ড জিলারের মত হচ্ছে এইঃ ব্রেশটের আগে জার্মান ট্র্যাডিশনাল থিয়েটারে যেভাবে নাটকের অভিনয় হোত, সেইভাবে সংস্কৃত নাটকের মঞ্চরূপায়ন করতে গিয়ে নাটকগুলোও অভিনয়ে দাঁড়াতে পারে নি। যেহেতু ব্রেশট্-পূর্ব জার্মান নাটকগুলো ছিল ড্রামাটিক নাটক, সেই কারণেই এপিক শ্রেণীর সংস্কৃত নাটক ঐ একই পদ্ধতিতে মঞ্চস্থ করলে তা সাফল্যলাভ করতে পারে না। ব্রেশট্ এসে জার্মান স্টেজে এপিক নাটকের প্রবর্তন করলেন—এপিক বলতে এখানে বর্ণনাত্মক ভঙ্গির নাট্য রচনাকেই বোঝাচ্ছে। এপিক থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদকে গ্রহণ করতেই হবে—আর এই বিচ্ছিন্নতাবাদ থাকার ফলে দর্শককে সচেতন মন নিয়ে অভিনয় দেখতে হবে—নাটকের বক্তব্যকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে—দর্শকমনের ওপর কোন সম্মোহনের ভাব প্রক্ষিপ্ত হবে না। কালিদাস প্রমুখ পুরনো ভারতবর্ষের সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকেও বিচ্ছিন্নতাবাদের একটা বিরাট প্রভাব ছিল। সুতরাং ব্রেশটীয় ধারায় আজকের দিনে যদি ইওরোপে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করানো যায়, তবে সে অভিনয় সাফল্যলাভ করবেই করবে।

বার্লিনে ব্রেশটের যেসব প্লে দেখবার সুযোগ হয়েছিল, সেগুলোর নাম হচ্ছেঃ "কোরিওলান"—এটি শেক্সপীয়ারের "কোরিওলেনাসের" ওপর ভিত্তি করে লেখা। ভলামনিয়ার ভূমিকায় অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন হেলেনে ভাইগেল। 'দি ব্রেডশপ'—একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ট্র্যাজিক নাটক। বন্ধুবর জন উইলেটের 'দি থিয়েটার অভ্ বেরটল্ট ব্রেশট' বইটি সঙ্গে থাকাতে ব্রেশটের নাটকগুলোর বিষয়বস্তু মোটামুটি বুঝতে পারতাম—কারণ বইটিতে ব্রেশটের সমস্ত নাটকেরই সারাংশ ইংরাজীতে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আমার সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেম—চোটেল উন্টার ডেন লিন্ডেন—জন উইলেট। ইনি বৃটিশ ব্রেশট-বিশেষজ্ঞ, প্রডিউসার এবং নাট্যকার। উইলেটের সঙ্গে অবসর সময়ে ব্রেশটের নাটক নিয়ে আমার বিস্তৃত আলোচনা হোত। অবশ্য সব সময়েই যে আমাদের মতৈক্য হোত, তা নয়। যেমন "কোরিওলান" (ব্রেশট পরিশোধিত কোরিওলেনাস) নাটকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন উইলেট—আমি বললাম, শেক্সপীয়ারের নাটকের এটি একটি বিকৃত রূপায়ণ। অভিনয়ের ব্যাপারেও আমরা একমত হতে পারি নি। জার্মানদের অভিনয় উইলেটের ভাল লেগেছিল—আমার মনে হয়েছিল, গিলগুড বা অলিভিয়ারের মত শক্তিশালী অভিনেতা ছাড়া কোরিওলেনাস চরিত্রের রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। তবে হেলেনা ভাইগেলের কথা আলাদা—তাঁর মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী যে ভূমিকাতেই অভিনয় করুন তা সব সময়েই হবে প্রথম শ্রেণীর। ১৯৫৬ সালে প্রথম হেলেনা ভাইগেলের অভিনয় দেখি প্যালেস থিয়েটারে প্রদর্শিত 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক সার্কলে।' তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এমন অভিনেত্রী সারা ইওরোপে আর দ্বিতীয়টি নেই। টি-ভিতে হেলেনা ভাইগেল 'দি ভিসন্স অভ্ সেমোন মাচার্ড'-এ কেবল রোলে অভিনয় করেছিলেন—দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বার্লিনে দুটি ব্রেশট রচিত ওপেরা দেখি—'রাইজ এ্যান্ড ফল অভ্ দি টাউন অভ্ মেহাগনী' ও 'দি কন্ডেমনেশন অভ্ লুকুলাস।' গর্কির 'মাদার' উপন্যাসের ওপর রচিত ব্রেশটের 'দি মাদার' নাটকটি দেখবারও সৌভাগ্য হয়েছিল—ভ্যাসোভার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন হেলেনা ভাইগেল—শেষ দিকে তিনি যখন লাল পতাকা হাতে যুদ্ধ-বিরোধী মিছিলের পরিচালনা করছেন, সে দৃশ্যের মাহাত্ম্য ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ব্রেশটের 'দি ডেইজ অভ্ দি কমিউন'-এর নাট্যরূপায়ণ করেছিলেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বার্লিনার আসেম্বল। প্যারিস কমিউনের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে কিছু ঐতিহাসিক এবং কিছু কাল্পনিক পথচারীদের দ্বারা—এঁরা সবাই এসে জড় হয়েছিলেন মোমার্টের একটি কাফেতে। 'ম্যান ইক্ট-ম্যান' নাটকটিও খুব ভাল লেগেছিল—নাটকটির বহিরঙ্গে প্রসারস—ভেতরে রয়েছে চিন্তা করবার যথেষ্ট মালমশলা।

এ ছাড়া বার্লিনে বিখ্যাত রাশিয়ান নাটক 'দি ড্রাগন'-এর জার্মান ভাষায়
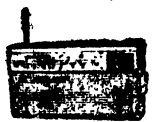
মঞ্চাভিনয় দেখেছিলাম। এ নাটকটি ইওরোপে খুব জনপ্রিয় হয়েছে—আমার নিজের কিন্তু এ নাটক ভাল লাগে নি—এর সাংকেতিকতার দিকটা আমার বড্ড রূঢ় লেগেছে। আসলে এটি প্রচারধর্মী নাটক—কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ছেলেমানুষীতে পর্যবসিত হয়েছে। বরং এটিকে শিশুনাট্য সংজ্ঞা দিলে এর প্রতি সুবিচার করা হবে। মেতারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড'ও শিশুনাট্য—তবে এর সংগে নাট্যকার যে দার্শনিক তত্ত্ব জুড়ে দিয়েছেন, তার ভেতর যথেষ্ট শিল্প-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়—'ড্রাগনের' তত্ত্বের দিকটা অত্যন্ত স্থূল—অত্যন্ত বেশি প্রকট। জার্মানীতে—ঠিক কোন্ জায়গায় মনে নেই—'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স'-এর জার্মান ভার্সন দেখেছিলাম মঞ্চের ওপর। টেক-নিকের দিক থেকে এ প্রডাকসনটি হয়েছিল অতুলনীয়—ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার কাজ করছিল লম্বা লাঠির মাথায় ঘোড়ার মাথা আঁটা এবং তলার দিকে বর্শার ফলা লাগানো এক-একটি দণ্ড। লাঠির ওপর বসে ঘোড়সওয়ার যখন গ্যালপ কর-ছিলেন, ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে চমৎকার ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল—ঘোড়া থামিয়েই দণ্ডটির বর্শার দিকটা সওয়ার গেঁথে দিচ্ছিলেন স্টেজের ওপর। অথচ এর দ্বারা মোটেই হাস্যরসের সৃষ্টি হচ্ছিল না।

বার্লিনে ডয়েচে থিয়েটারে লেসিং-এর বিখ্যাত নাটক 'নাথান দি ওয়াইজ' দেখেছিলাম—এখানকার স্টার এ্যাক্টর ছিলেন ভোলফ্‌গ্যাঙ্গ হাইনজ্‌—ইনিই নাথানের পরিচালনা এবং নামভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। এ থিয়েটারের অভিনয়রীতি বাস্তবধর্মী—মস্কো আর্ট থিয়েটারের মত।

এবার ভাইমার, ড্রেসডেন, লাইপজিগ এবং রস্টকে যে সব শো দেখেছিলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিচ্ছি: ভাইমারে দেখে-ছিলাম পাঁচ অঙ্কের বিখ্যাত ব্যালে 'গাজানে'। ডয়েচে ন্যাশনাল থিয়েটারে এটি প্রডিয়ুস করেছিলেন। এর ডিরেক্টো ছিলেন আর এন ডেরশাউইন, মিউজিক ডিরেক্টর রুডলফ ব্রানের এবং কোরিওগ্রাফার রুথ ভোলফ্। ওপেরা হাউসে হেবারের 'ডেয়ার ফ্রাইসুটস্'-এর মঞ্চরূপায়ণ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

লাইপজিগের ঐতিহ্যমণ্ডিত গেভান্ড হাউস অর্কেস্ট্রা মঞ্চস্থ করেছিলেন পিটার চায়কোভস্কির সোয়ানলেক—চার অঙ্কের ব্যালে। এক হিসাবে এই থিয়েটার হাউসটি সংগীতরসিকদের কাছে খুবই স্মরণীয়। ফেলিক্স মেণ্ডেলসন এইখানেই তাঁর জীবনের শেষ এবং শ্রেষ্ঠ পর্বটি কাটিয়েছিলেন ডিরেক্টর হিসাবে। এখানে কাজ করতে করতেই তিনি খৃষ্টানদের সেরা ধর্মসংগীত ইয়োহান সেবাস্টিয়েন বাখের 'সেইন্ট ম্যাথুজ প্যাসন' রিভাইভ করেছিলেন।

রস্টকে এসে পৌঁছেছিলাম এক বিকেল বেলায়। ওখানকার সমস্ত থিয়েটারের পরিচালনার ভার একজন ডিরেক্টরের উপর—ম্যানেজারও একজন। এই ম্যানেজার আমি পৌঁছনোর আধ ঘণ্টার ভেতর আমার হোটেলে এসে হাজির—সংগে কোন্ থিয়ে-টারে কি প্রোগ্রাম হচ্ছে তার চার্ট। আমাকে অনুরোধ করলেন কোথায় কি শো দেখবো তা তাঁকে বলতে। সব দেখে শুনে বললাম—"এখানকার লিট্‌ল্ থিয়েটার দেখবো। দেখেওছিলাম—সত্যিই এটি একটি পরীক্ষানিরীক্ষামূলক থিয়েটার। ঐ ম্যানেজার ভদ্রলোককে বলেছিলাম, পিটার ভাইসের কোন একটি নাটক দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা। তিনি বললেন, ও'দের একটি স্টেজে ভাইসের ভিয়েটনাম বিষয়ক নাটকটির মহড়া চলছে—উনি আমার রিহার্সাল দেখবার ব্যবস্থা করবেন। ভাইসের এই বিখ্যাত নাটকটির মহড়া দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম এইভাবেই। রস্টকে 'সুরেল' নামে একটি তিন অঙ্কের ব্যালেও দেখেছিলাম। এর কোরিওগ্রাফার ছিলেন ভেরা ব্রয়ার এবং সংগীত পরি-চালক কার্ল হাইনজ্ রিখ্‌টার।

ড্রেসডেনেও আবার হেবারের 'ডেয়ার ফ্রাইসুট্‌স্' দেখেছিলাম।

[ক্রমশ]

মুক্তি সংগ্রামের ছবি

[illegible] এই দিনটিকে এখন শুধু [illegible] স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক শহীদের আত্মদানে, অনেক বীরত্বপূর্ণ ঘটনায় এবং অনেক মানুষের ত্যাগে বহু অমর কাহিনী রচিত হয়েছে। এই সমস্ত কাহিনীর কিছু কিছু অংশ গল্পে, উপন্যাসে যেমন, তেমনি চলচ্চিত্রে রূপ লাভ করেছে। বাংলায় ও অন্যান্য রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে অনেকগুলি ছবি নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্র মানের দিক থেকে সবগুলি উন্নত না হলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস যদি কোলকাতায় মুক্তিসংগ্রামের ছবি দেখাবার জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তবে এই দিনটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়। কোলকাতায় ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী-চিত্র নয়, সেই সঙ্গে পৃথিবীর সারা দেশের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী-চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করা উচিত। অতীত দিনের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী-চিত্র থেকে আজকের দিনের কিউবা, ভিয়েতনাম পর্যন্ত। তা হলে এই দিনটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন এ বিষয়ে ভাবতে পারেন —সুজন।

এভেজিং স্টেয়ার্ট 'গাদ, ম্যাড ওয়্যান'

লালন ফকির

রূপকার নাট্য সংস্থার শ্রীসবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় নতুন নাটক 'লালন ফকির'। একদিকে সবিতাব্রত দত্তের গানের খ্যাতি আর একদিকে লালন ফকিরের ইতিকথা জানবার আগ্রহ, দুয়ে মিলে এই নাটকটি সম্প্রতি নাট্যজগতে গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে। রূপকারের এই নাটকাভিনয়ে তৃপ্তি মিত্রের অংশ গ্রহণে দর্শকদের মধ্যে আরো আকর্ষণ বেড়েছে।

বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত ও জাতীয় জীবনে লালন ফকির একটি আগ্রহ সৃষ্টিকারী নাম। তিনি একজন সহজিয়া-ধর্মী সাধক ছিলেন। তাঁর বাউল গানের কাব্য-সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে লালন ফকিরের গানের প্রভাব দেখা যায়। এই প্রভাবের কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। লালন ফকির সম্বন্ধে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন ডাঃ মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন। তিনি লিখেছেন: "লালন ফকির অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী পাঠে স্বতঃই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়।...... হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মরমিয়াবাদ তাঁহার চিত্তে প্রয়াগ সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে। এই লোককবির বাণী আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ মূল্য অবধারণে ইহাই বিশেষ প্রয়োজন......"।

ডাঃ মনসুর উদ্দিন এ কথা লিখেছেন বহু বৎসর আগে। বাংলা তখন অবিভক্ত। তখন সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের জন্য আমরা সাম্রাজ্যবাদীর উপর দোষ চাপাতাম। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, ইংরেজ যদিও নেই কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষাকারীরা রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান ভেদ-বিভেদে এখনো প্রতি বছর আমাদের জাতির জীবন কলঙ্কিত হয়। এখনো সাম্প্রদায়িকতার লজ্জা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নি। এই পরিস্থিতিতে লালন ফকিরের সাধনা ও কাব্য-সঙ্গীতকে যদি দেশবাসীর সামনে আর একবার তুলে ধরা যায় তা হলে অন্তত আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করা যাবে। এ কারণে রূপকারের এই নাট্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। যেকালে নাট্য সম্প্রদায়ের একাংশ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার আবর্তে পড়েছে এবং বিমূর্ত নাটকের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে জাতীয় নাট্য ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বিদেশীয়ানার নকল, বিলাস

হয়ে উঠেছে, সে কালে রূপকারগোষ্ঠী একটি সময়োপযোগী নাটক উপস্থিত করেছেন।

হিন্দু-মুসলমানের আত্মীয়তা যে ধর্মের ঊর্ধ্বে, এক দেশ এক জলবায়ুর মানুষ, জাতীয়তায় তার পরিচয়। লালন ফকিরের বাণীতে এ কথা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। আলোচ্য নাট্যরূপে মোটামুটি এই বাণীকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। লালন ফকিরের জীবন বৃত্তান্ত বড় কৌতূহলজনক। তিনি ছিলেন হিন্দুর ঘরের মানুষ। বিয়ের পরে তীর্থ ভ্রমণে যাবার পথে বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে পথে পরিত্যক্ত হন। এক মুসলমান দম্পতি তাঁকে সেবাযত্নে বাঁচিয়ে তোলেন। কিন্তু মুসলমানের ঘরে অন্ন গ্রহণের জন্য সেকালের হিন্দু সমাজে তাঁর স্থান হয় না। সিরাজ ফকিরের সংস্পর্শে এসে সহজিয়া মতবাদে তাঁর জীবনের গতি ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। সমাজে জাতি ও ধর্মভেদ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের পূর্ণ প্রকাশ—লালন ফকিরে।

নাট্যকার এই কাহিনীর মূল অংশকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। তবু সব কিছু মিলিয়ে দেখলে লালন ফকির সম্পর্কে আমাদের মনে যে ইমেজ তৈরি হয়ে আছে তাকে যেন অনুভব করতে পারি না। সিরাজ ফকির এখানে বেশি সহজ ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকটি কিছুটা কিংবদন্তী আশ্রিত। অন্তত লালনের হিন্দু স্ত্রীর ভূমিকা দেখে তাই মনে হয়েছে। স্ত্রী ও মা লালনকে ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু সমাজের কত বড় চাপ থাকলে এবং তার সঙ্গে সংস্কার যোগ হলে তা সম্ভব হয় এই পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে না উঠলে মনে হতে পারে লালন যেন একদিকে হিন্দু স্ত্রী আর একদিকে মুসলমান স্ত্রী নিয়ে মানসিকভাবে টানাপোড়েনে ভুগছেন। যে মহত্তর প্রেম প্রজ্জ্বলিত শিখা বিস্তার করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমের মোহ ও ক্ষুদ্রতাকে পুড়িয়ে দিল, স্ত্রীর প্রতি প্রেম বিকশিত হয়ে উঠলো মানুষ ও সমাজের প্রতি ভালবাসায়, তার অনুভূতিতেই ত' নাটকের সার্থকতা, লালন ফকিরের বৈশিষ্ট্য হয়ে ফুটে ওঠা উচিত। লালন ফকির সাধারণ মানুষের কবি ও দার্শনিক, তিনি সাধারণ মানুষের ভাষায় তাদের মনের কথা বলতে পেরেছিলেন বলে এত জনস্বীকৃতি ও গুরুর আসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপে তাঁকে স্বীকৃতির পরিবেশ কি উনবিংশ শতাব্দীর কূপমণ্ডূকতার যুগে ছিল? নবদ্বীপের দৃশ্যটি দেখে

'মহাকবি কৃত্তিবাস' ছবিতে অসীমকুমার

রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আমার মনে হয়েছে : "আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা।" হিন্দুয়ানীটা আসলে আমাদের মজ্জায় মিশে আছে। আজকের কালচেতনা নিয়ে অনুভব করলে সময় সময় সংলাপ আরো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন দেখা গেছে। তাতে নাটক প্রযোজনার উদ্দেশ্য আরো সার্থক হবার অবকাশ ছিল। নাটকে একটি চরিত্র ভুবন ডাকহরকরা (ভুল শুনেছি কি না জানি না)। লালন ফকিরের শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন গগন হরকরা। তিনি কুষ্ঠিয়ার ঠাকুরদের জমিদারী এলাকায় ডাক পিয়ন ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। লালন ফকিরের গান ও দার্শনিকতার প্রচারে গগন হরকরার একটি ভূমিকা ছিল।

লালন ফকির নাটকে নামভূমিকাতে রূপদান করেছেন সবিতাব্রত দত্ত। গায়ক অভিনেতা হিসাবে বাংলার নাট্যজগতে তাঁর স্থান অদ্বিতীয় বলা যায়। এই নাটকে যুবক লালনের প্রাণচঞ্চল প্রথম জীবন, স্মৃতিশক্তিহীন অসহায় মধ্যবর্তী জীবন এবং এক সহজিয়া কবি ও জীবনদর্শনের নায়ক—জনগণের আপনজন লালন ফকিরের চরিত্রকে সবিতাব্রত

'জয়য়ন্তী' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দত্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রূপদান করেছেন। ফকিরের অংশে অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা অভিনেতা অপেক্ষা নাটকের ত্রুটির জন্য। সেকথা আগে বলেছি। লালনের হিন্দু স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন গীতা দত্ত। এক সরল বালিকা বধূর আন্তরিকতা ও প্রেমের অভিব্যক্তিতে গীতা দত্তের অভিনয়ে চরিত্রটি দর্শকদের মনে রেখাপাত করে; কিন্তু চরিত্রটিকে নাট্যকার কিছুটা প্রয়োজনের বাইরে টেনে এনেছেন মনে হয়েছে। লালন ফকিরের মুসলমান স্ত্রী ও সাধন সহযোগিনীর চরিত্রে তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় গভীর ভাবোদ্যোতক। প্রলোভন ও স্বার্থবুদ্ধিবিমুক্ত একটি গ্রাম্য নারী চরিত্রকে শ্রীমতী মিত্র ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার অন্তঃসলিলা প্রেমের ধারায় দর্শক-মন মুগ্ধ হয়। সিরাজ ফকিরের চরিত্র অভিনেতার এক সার্থক সৃষ্টি। চেহারায় ও সংলাপে দর্শকরা তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেছে।

এই নাটকের অন্যতম প্রাণশক্তি অসংখ্য বাউল গান। সবিতাব্রত দত্ত ও সিরাজ ফকিরের কণ্ঠে গীত গানগুলি দর্শকদের পরম তৃপ্তি দান করেছে। তবে দু-একটি গানের সুরের ব্যাপারে মনে হল একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি উদ্ধৃত করলে সতর্কতার কারণ বোঝা যাবে। "কবির প্রতিভা থেকে যে রসধারা বয় মন্দাকিনীর মত অলক্ষ্যলোক থেকে সে নেমে আসে; তারপরে একদল লোক আসে যারা খাল কেটে সেই জল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরী করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর বিশুদ্ধতা চলে যায়, কৃত্রিমতায় নানা প্রকারে বিকৃত হতে থাকে।" আজকাল চলতি হাটে বাউল গানের দশা দেখে এই সতর্কতার কথা মনে এল।

নিউ প্রভাস অপেরার তিনটি নতুন পালা

নিউ প্রভাস অপেরা ভাঁর ব্যানার্জীর "সিরাজের কান্না", দেবেন নাথের "বিপ্লবী ভিয়েৎনাম" এবং ভৈরব গাঙ্গুলীর "নিহত গোলাপ" এই তিনখানি ভিন্নধর্মী নতুন পালা নিয়ে এ বছরে বিভিন্ন যাত্রা আসরে উপস্থিত হবেন। "সিরাজের কান্না" পালায় দীর্ঘদিন পরে যাত্রামোদীরা পূর্ণেন্দুশেখর ব্যানার্জীকে 'সিরাজ' চরিত্রে দেখতে পাবেন। "বিপ্লবী ভিয়েৎনাম" পালায় পূর্ণেন্দুবাবু 'হো-চি-মিন' চরিত্রে রূপ দেবেন। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে থাকবেন অভয় হালদার, অনাদি চক্রবর্তী, জয়ন্ত কুমার, নবীন চ্যাটার্জী, অমূল্য ভট্টাচার্য, ঋষি চ্যাটার্জী, নিমাই দত্ত, মহেন্দ্র ব্যানার্জী, প্রফুল্ল ব্যানার্জী, গীতা দত্ত, বীণা চক্রবর্তী, অনিলা ভট্টাচার্য, মঞ্জু ব্যানার্জী, অরুণা গোস্বামী।

"বিপ্লবী ভিয়েৎনাম" পরিচালনা করবেন নাট্যকার ও নির্দেশক রমেন লাহিড়ী। "সিরাজের কান্না" ও "নিহত গোলাপ" পরিচালনা করবেন পূর্ণেন্দুশেখর ব্যানার্জী। দল পরিচালনায় আছেন রমেন বসুমল্লিক।

নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা

গত ১২ই আগস্ট ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে সন্ধ্যা অনুষ্ঠান হয়েছে। ছুটির পরে আয়কর কর্মচারীরা সমবেত হয়ে এই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলেন। কর্মচারীদের মধ্যে থেকে শ্রীবিমল ভট্টাচার্য ও শ্রীরবীন্দ্র বড়াল রাগাশ্রয়ী নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন। বিখ্যাত নজরুলসংগীতশিল্পী শ্রী সত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় উদাত্তকণ্ঠে নজরুলের দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্য কলিকাতা শাখার শিল্পীরা সুকান্তের 'বিদ্রোহ আজ', 'অবাক পৃথিবী' প্রভৃতি গণসংগীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত। তিনি সমাজ বিপ্লবে নজরুল ও সুকান্তের কাব্য ও সংগীতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

হরিপদ চ্যাটার্জী স্মৃতিসভা

গত ১৩ই আগস্ট মেট্রো সিনেমায় সকাল দশটায় হরিপদ চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে এক সভা হয়। মেমোরিয়াল কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমনোরঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশিবনাথ চ্যাটার্জী অভিনেতৃ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শ্রীঅনুপকুমার দাস, সিনে টেকনিসিয়ান এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীউজ্জ্বলকুমার ব্যানার্জী, সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার পক্ষ থেকে শ্রীবিমান বসু, স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীসুজিতকুমার দাস, শ্রীসুধী প্রধান, শ্রীপশুপতি চ্যাটার্জী এবং বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি এম এ সয়ীদ ভাষণ দেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে—"কমিটি প্রথমত স্বাস্থ্যনিবাস প্রকল্পের জন্য এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ইতিমধ্যে প্রায় ৯,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন এবং সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৮,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এ ব্যাপারে কমিটি সরকারের কাছে ২০,০০০ টাকা এককালীন অর্থ-

'এই করেছো ভাল' ছবিতে রবি ঘোষ ও দিলীপ চক্রবর্তী

সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটি সরকারের কাছে এই অর্থ মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করা সত্ত্বেও সরকারী সাহায্য এখনও পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া কমিটির পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র মালিকদের প্রতিষ্ঠান ই আই এম পি-এর কাছে একদিনের বিক্রয়লব্ধ অর্থের শতকরা তিনভাগ এককালীন সাহায্য হিসাবে চাওয়া হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীর পক্ষে কল্যাণকর এই প্রস্তাব মালিকপক্ষ প্রত্যাখ্যান করেছে।

মালিকপক্ষ এবং সরকারের উপর নির্ভর না করে কমিটি অর্থ সংগ্রহের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনেতৃ সঙ্ঘের নাট্যানুষ্ঠান এবং সিনে সেন্ট্রাল, ক্যালকাটার উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার যাদুশ্রেয়সীর নেপাল সফর

যাদুজগতের অন্যতমা মহিলা যাদুকর যাদুশ্রেয়সী ডি পুষ্পা সম্প্রতি নেপাল সফর করে ফিরে এলেন। নেপাল মহারাজার ৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বীরগঞ্জে পনের দিনের এক আনন্দ উৎসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানী, গুণী এবং শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

যাদুকরী ডি পুষ্পা সদলবলে আমন্ত্রিত হন। একের পর এক ক্রমাগত সপ্তদশ পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীতে সুদক্ষ যাদুর কলাকৌশল দেখিয়ে তিনি দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জনে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

প্রতিটি খেলাই উপভোগ্য, বিশেষত ভৌতিক বাক্স, বেনারসের মন্দির, নারী-ডলস্, স্পুটনিক, মাদার অব নেপাল খেলাগুলি দেখে দর্শকরা বিস্মিত হন।

বড়ুয়ার ছবি

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি দেখাবার প্রশংসনীয় আয়োজন করেছিল। গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই আগস্ট সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে প্রমথেশ বড়ুয়া সৃষ্ট হিন্দী "মুক্তি" ও "দেবদাস" এবং বাংলা "অধিকার" ছবি দেখানো হয়েছে। প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি দেখার জন্য দর্শকরা আজও কৌতূহলী এবং ছবিগুলি দেখে বড়ুয়ার প্রতিভা অনুভব করা যায়।

"শপথ নিলাম" ছবির মামলা

রূপ ও বাণী প্রযোজিত ইস্টার্ন ফিল্ম এক্সচেঞ্জ পরিবেশিত ঊনিশশো তিরিশ সালের বাংলার বিপ্লবী অধ্যায় নিয়ে লেখা "শপথ নিলাম" ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির পরিচালক শ্রীশচীন অধিকারী। ছবিটির নাম, কাহিনী এবং চিত্রনাট্য নিয়ে সিটি সিভিল কোর্টে একটি মামলা শুরু হয়েছে। শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম কোর্টে এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, প্রযোজক এবং পরিচালক তাঁকে দিয়ে কাহিনী এবং চিত্রনাট্য লিখিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিচালকের নামে সেটি চালাবার চেষ্টা করছেন। এমন কি তাঁকে প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ছবিটির নামও (পূর্বনাম "এক অধ্যায়") আকস্মিকভাবে পরিবর্তন করেছেন তাঁরা।

প্রথমে ছবিটির স্যুটিং এ্যাড-ইন্টেরিম ইনজাংশনে দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। বর্তমানে সিটি সিভিল কোর্টের চীফ জজের ঘরে মূল কেস শুনানীর জন্য মুলতুবী আছে। মামলার নম্বর
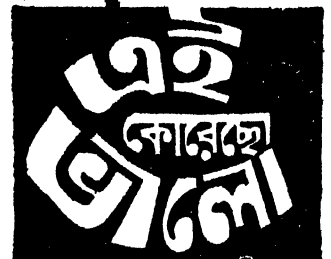
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রণজি ট্রফি খেলা শুরু হবার সংগে সংগেই ভারতীয় ক্রিকেটের দিন বদলে গেল, মোড় ঘুরে গেল ভারতের ক্রিকেট খেলার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে সকলের মন জয় করে নিল। এতোদিন যা সম্ভব হয় নি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মেতে উঠলেন ক্রিকেটানন্দে। ক্রিকেট খেলার মেলা বসলো উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত আনন্দ, অদ্ভুত একটা উন্মাদনার জোয়ারে যেন ভেসে গেল সমস্ত দেশ। রাজা-রাজরা, জমিদার আর বিত্তবানদের খেলা ক্রিকেট ভারতের অগণিত সাধারণ মানুষের মন দখল করে বসলো।

আর তারই জের টেনে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা শুরু করলেন ক্রিকেট খেলতে। আর তাঁদেরই মধ্যে থেকে ভারত একে একে পেল তার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-রত্নদের।

সত্যি কথা বলতে কি, জার্ডিনের এম· সি· সি দলের ভারত ভ্রমণের সময় থেকে ক্রিকেট খেলা এ দেশের জনগণের মনে পাকা আসন লাভ করেছিল। ভারত ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে যাবার সময় জার্ডিন বলে গেলেন :

"I fully believe that in the next ten years India will be on top of the Cricket-world!"....

এ শুধু কথার কথা নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের স্বনামধন্য পুরুষ ডি· আর· জার্ডিন এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করতেন। আর তাঁর সেই বিশ্বাস-উদ্দীপ্তবাণী ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে, ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তাদের মনে জাগালো পরম উৎসাহ। তাঁরা যেন দেখতে পেলেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় ভরা আশার আলোর সন্ধান।

নতুন উৎসাহে মেতে উঠলেন তাঁরা। এবার তাঁদের চোখ পড়লো অস্ট্রেলিয়ার ওপরে। অস্ট্রেলিয়াকে কিম্বা অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা শক্তিশালী দল আনার জন্যে তাঁরা উঠে-পড়ে লাগলেন। এই বিষয়ে সব থেকে বেশি উৎসাহ ছিল পাতিয়ালার মহারাজার।

তিনি আর ফ্রাঙ্ক ট্যারেন্ট—দুজনে মিলে ব্যবস্থা করে অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা বেসরকারী দল ভারতে আনার ব্যবস্থা করলেন। জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত ভ্রমণের বিষয়টি পাকা হয়ে গেলো। সে দলে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সব নামী খেলোয়াড়। কিন্তু ক্রিকেটের গভর্নর জেনারেল চার্লস ম্যাকারটনিই ছিলেন সেই দলের প্রধান পুরুষ। তাঁর আকর্ষণই ছিল আলাদা।

পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের তালিকা বানালে সেই তালিকায় যেমন ডব্লিউ· জি· গ্রেস, ভিক্টর ট্রাম্পার, জ্যাক হবস্, জন ব্রাডম্যান প্রমুখ খেলোয়াড়রা স্থান পাবেন—তেমনি বাদ যাবে না চার্লস্ ম্যাকারটনির নামও।

নিঃস্ব ক্রীড়াভঙ্গীতে ম্যাকারটনি ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর খেলা, খেলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সবই ছিল অন্য রকম। আর তাঁর মেজাজ...সেই মেজাজের জন্যেই তাঁর অনুরাগীরা দিয়েছিলেন তাঁর গভর্নর জেনারেল নাম। সত্যিই তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেল—ছিলেন যেমন উদ্ধত তেমনি বিনয়ী, ছিলেন যেমন কঠোর তেমনি কোমল, ছিলেন যেমন সতর্ক তেমনি উদাসীন। ব্যাট হাতে মাঠে নেমে তিনি যেমন যে কোন মুহূর্তে অবলীলায় ঝটাতে পারতেন, তেমনি এক এক সময় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে খেয়ালের মাথায় ফিরে আসতেন প্যাভেলিয়নে। এক কথায় বলা যায় ম্যাকারটনি ছিলেন প্রতিভায় অনন্য—বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় এক মহান পুরুষ।

তিনি কোনদিন মানেন নি কারো প্রভুত্ব। চিরকাল প্রভুত্ব বিস্তার করে গেছেন অপরের ওপর। তা তিনি যতো বড় বোলারই হোন না কেন—তাঁর নিস্তার ছিল না ম্যাকারটনির হাত থেকে। কোনদিন তিনি কোন কিছুকেই পরোয়া করেন নি। নিজের ইচ্ছেমত খেলে গেছেন—করে গেছেন যা খুশি তাই। জীবনে কারো সংগে কোনদিন আপোষ করেন নি তিনি, চিরকাল শুধু লড়েই গেছেন। তাই তিনি গভর্নর জেনারেল।

১৯২৬ সালে লীডস্ মাঠের সেই ঘটনার কথা তখনো সকলের মুখে মুখে ঘুরতো। লীডস্ মাঠে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলছে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ। টসে জিতে ইংলণ্ডের অধিনায়ক এ ডব্লিউ কার অস্ট্রেলিয়াকে পাঠালেন ব্যাট করতে।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারেন বার্ডস্লের বিরুদ্ধে বল করতে এলেন সেকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার মরিস টেট। প্রথম ওভারের প্রথম বলেই স্লিপে হার্বার্ট সাটক্লিফের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন বার্ডস্লে। কোন রান করার আগেই বার্ডস্লের উইকেটটি হারালো অস্ট্রেলিয়া। প্রথম উইকেট পড়ার সংগে সংগেই মাঠে নামলেন ম্যাকারটনি। কিন্তু সেই ওভারের পঞ্চম বলে স্লিপে ক্যাচ তুললেন তিনি। ইংলণ্ডের অধিনায়ক কার পারলেন না সেই ক্যাচটা লুফতে।

নির্ঘাৎ আউটের মুখ থেকে ফিরে এসে মুহূর্তের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ম্যাকারটনি। না, আপোষ নয়—আক্রমণ। সিদ্ধান্ত নিতে তাঁর সময় লাগলো না এতোটুকুও। হাতের গ্লাভস্ দুটো ঠিক করে নিয়ে আর টুপিটা একটু টেনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর......?

তার পর মুহূর্তের মধ্যে মাঠের চেহারাই গেল বদলে। ব্যাট-বলের লড়াইকে কেন্দ্র করে সাংঘাতিক সব কান্ড ঘটতে লাগলো সমস্ত মাঠ জুড়ে। ম্যাকারটনির হাতের ব্যাট যেন এরোপ্লেনের প্রপেলারের মতো ঘুরতে লাগলো। আর তারই আঘাতে বলগুলো ছুটে ছুটে যেতে লাগলো বাউন্ডারীর দিকে।

রানের পর রান—বাউন্ডারীর পর বাউন্ডারী। মাঠের চেহারাই তখন গেছে বদলে। মাঠের মধ্যে তখন যেন ঝড় বইছে। সেই ঝড়ের ঝাপটায় ইংলেন্ডের আক্রমণের সমস্ত ধার তছনছ হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে এক সময় পঞ্চাশ রান আর তারপরে একশ' রান করে ফেললেন ম্যাকারটনি। মধ্যাহ্ন ভোজের তখনো অনেক দেরী।

এর আগে একমাত্র ভিক্টর ট্রাম্পারই লাঞ্চের আগে করতে পেরেছিলেন সেঞ্চুরী। দ্বিতীয় ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে সেই সম্মান লাভ করলেন চার্লস্ ম্যাকারটনি।

সেই ম্যাকারটনি আসছেন ভারতে।

সময়টা ছিল ১৯৩৫-৩৬ সাল।

আর ম্যাকারটনির বয়স তখন ৪৯-৫০ বছর।

তবু ম্যাকারটনিই ছিলেন বেসরকারী সেই অস্ট্রেলিয়া দলের প্রধান পুরুষ। তিনিই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ, তিনি ছিলেন সব।

কারণ তিনি তখন বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নর জেনারেল......!

ম্যাকারটনি ভারতে এলেন, জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে এলো বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারতকে আরো উঁচুতে স্থান দেবার জন্য।

রাইডারের নেতৃত্বে বেসরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের বয়েসের গড় ছিল প্রায় চল্লিশ। কিন্তু অভিজ্ঞতা আর নৈপুণ্য যেখানে প্রধান, বয়স সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

পারেও নি। ভারত সফরের প্রথম দিকটায় ভারতীয় দলগুলোকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বয়স্ক ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা। তাঁদের খেলার ধারার সংগে ভারতীয় খেলোয়াড়রা কোন সময়ই তাল দিতে পারেন নি। পরে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত টেস্ট ম্যাচে এবং অন্য খেলাগুলোতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়—জয়লাভের মুখও দেখেছিল ভারত। সে পরের কথা পরে আলোচনা করা হবে।

এখন শুধু এই কথাটাই বলা যায় যে, ভারতের পক্ষে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে বেসরকারীভাবে অস্ট্রেলিয়া দল এসেছিল ভারতে।

আর অস্ট্রেলিয়া দলকে ভারতে আনার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি করে যিনি দাবী করতে পারেন তিনি হলেন ফ্রাঙ্ক ট্যারান্ট। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্যে তিনি যা করে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। অস্ট্রেলিয়ার নামকরা খেলোয়াড় ট্যারান্ট ইংলণ্ডের কাউন্টি লীগে কিছুদিন খেলার পর ভারতে এসে শুরু করেছিলেন বসবাস করতে। আর তিনি একাই ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অনেকখানি।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের কোচিং থেকে শুরু করে প্রায় সব কিছুর দায়িত্বই তিনি স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। আর তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা পেয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল চার্লস্ ম্যাকারটনির মতো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ।

আর সেই সুযোগ যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে কতো বড় আশীর্বাদ ছিল তা বুঝতে কারো দেরী হয় নি। সেই দিক দিয়ে এবং ভারতীয় ক্রিকেটের সত্যিকারের হিতৈষী হিসেবে ফ্রাঙ্ক ট্যারান্টের নাম চিরকাল ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

॥ চার্লস্ ম্যাকারটনি ॥
বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নর জেনারেল

(চলবে)

খেলাধুলা ও রাজনীতি

খেলাধুলার সংগে রাজনীতির সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, সাধারণত থাকেও না। কিন্তু তাতে কি হবে—খেলাধুলার নিজেরই যে একটা আলাদা 'রাজনীতি' আছে। আর সেই নীতির আবর্তের মধ্যেই খেলাধুলার বিভিন্ন দিকগুলো শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে। এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার যেন আর কোন উপায় নেই। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলার সমস্ত বিভাগগুলি ময়দান-নীতির মজ্জায় মজে আছে। আর এই নীতির নিয়মে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের খেলাধুলা আজ ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের খেলাধুলার ওপর মহলে যাঁরা আছেন, তাঁরা খেলাধুলাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এতোকাল লাগিয়ে এসেছেন। লাগিয়ে এসেছেনই বা কেন বলা হবে—এখনো লাগাচ্ছেন। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে খেলাধুলার মান দিনের পর দিন নেমেই চলেছে। কেউ কেউ তো আবার খেলাধুলাকে ব্যবসার স্বার্থেই কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ খেলাধুলাকে সামনে রেখে তাঁরা যে যার কাজ হাসিল করেছেন, করছেন এবং হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতেও করবেন। আর এই সব কাণ্ডের জন্যে কি হতে যে কি হয়েছে আর কি হচ্ছে, সেই সব কেলেঙ্কারীর কিছু কিছু এখন জানা যাচ্ছে। বাংলাদেশেই বোধহয় এই নাটকটা সব থেকে ভালো জমেছে। বাদ-প্রতিবাদের ঢেউ-এ সংবাদপত্রের খেলার পাতাগুলো এখন রীতিমত উপাদেয়। বেচু দত্তরায় মহাশয়, অমর ঘোষ, নন্দু জালান কিম্বা ও প্রান্তের নাগরওয়ালা সাহেব—যে যাই বলুক না কেন, আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি যে, এই সব বলাবলির পেছনে আছে স্বার্থে ঘা লাগার জ্বালা। যে জ্বালায় আজ নন্দুবাবু জ্বলছেন, কিম্বা যে জ্বালা সয়ে সয়ে বেচুবাবু কিম্বা অমরবাবু মুখ খুলেছেন অথবা এঁদের চেয়ে অনেক ওপরের ঝানু ক্রীড়া-রাজনীতিবিদ নাগরওয়ালা সাহেব পদত্যাগ করেছেন এবং তারপর নিজের রাজ্যের সংস্থা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন—সেই একই জ্বালা এবার বোধহয় আমাদের সকলেরই সইবার সময় এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতবর্ষের খেলাধুলার জগতে একটা অদ্ভুত সময় এসেছে—এই পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে যদি আজ আমরা খেলাধুলার জগৎ থেকে ক্রীড়া-রাজনীতি দূর করতে পারি তাহলেই শুধুমাত্র ভারতবর্ষের খেলাধুলার মান উন্নত হবে। আর এই উন্নতির জন্যে আজ চাই সরকারী তত্ত্বাবধান। আমরা চাই অন্য দেশগুলোর মতো আমাদের দেশেও কর্মকর্তাদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হোক এবং তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। আর তার আগে ক্রীড়াজগতের সংগে জড়িত বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের মানে মানে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু এ-কাজ করবেন কে? কিন্তু এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার' সময় আজ এসেছে। যদি দরকার হয়, আমরা যারা খেলাধুলাকে ভালোবাসি তারাই এগিয়ে যাবো সেই ঘণ্টা বাঁধতে......।

—শান্তিপ্রিয়

শেষ পর্যন্ত ভারত হেরেই গেল। মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠে নিজেদের ভুলের জন্যে ভারত হারালো ফাইনালে ওঠার সুযোগ।

বিরতির সময় পর্যন্ত যে দল দু' গোলে এগিয়ে থাকে—বিরতির পর সেই দল যে কি করে পর পর তিনটি গোল খায় তা তো ভেবেও পাওয়া যায় না। দক্ষিণ কোরিয়া যে তিনটি গোল দিয়েছে সেই তিনটিই হয়েছে ভারতের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভুল বোঝা-বুঝির জন্যে।

প্রথম গোলটির জন্যে দায়ী নটরাজন আর সেনগুপ্ত। বল ধরতে যাওয়ায় তাঁদের ইতস্তত করার সুযোগ নিয়েই কোরিয়া গোলটি করে। দ্বিতীয় গোলটির জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী অশোক ব্যানার্জী, গোলের মুখে তিনি বল আয়ত্তে রাখতেই পারেন নি—দাঁড়িয়ে ছিলেন গোলরক্ষককে একদম আড়াল করে। ফলে জেতার খেলায় শেষ পর্যন্ত ভারতকে ৩—২ গোলে হেরে যেতে হলো দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে।

মারদেকা ফুটবলের এ গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে ভারত বার্মার সংগে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। বার্মা সহজেই হংকংকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। আর এদিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ফাইনালে উঠলো ভারতকে পরাজিত করে। আর এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততোদিনে ফাইনাল খেলাও শেষ হয়ে যাবে।

যাই হোক ভারত এবার মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ স্থান ... সম্ভব কথা

গল্প হলেও সত্যি

খেলার মাঠে দর্শকেরা যান অনাবিল আনন্দ লাভের প্রত্যাশায়। এদিক দিয়ে কিন্তু ক্রিকেটের জুড়ি মেলা ভার। কারণ খেলার রাজা ক্রিকেট। আবার তার রাজা হলেন, যাঁরা ক্রিকেটের বিশ্ববন্দিত ব্যাটসম্যান এবং পৃথিবীর দুর্ধর্ষ বোলার। আজ এখানে এমন একজন ব্যাটসম্যান ও একজন বোলারের কথা উল্লেখ করছি, যাঁদের কৃতিত্ব পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসে আজও অম্লান।

ইংলেণ্ডের ভুবনবিজয়ী ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের নাম কে না জানে। ইনি ক্রিকেট ও ফুটবলে সমান পারদর্শী ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ক্রিকেট মরশুমে তিনি ১৮ বার শতরান সহ মোট রান করেছিলেন ৩৮১৬ এবং সেই মরশুমে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই করেছিলেন মোট ৬ বার শতরান, যার গড় হিসাব দাঁড়ায় ৮৪·৭৮ কিন্তু টেস্টে তাঁর সংগৃহীত রান সংখ্যা হল ৫৮০৭।

আর একটি ঘটনা : ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডের বার্মিংহাম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৎকালীন দুরন্ত বোলার সনি রামাধীন মোট ১২৯ ওভার বল করেছিলেন এবং এক ইনিংসে ৯৮ ওভার বল করেছিলেন। এটি আজও একটি বিশ্ব রেকর্ড।

—শেখর ব্যানার্জী, কলিকাতা-৪।

চিয়াংকাপে। অবশ্য, গত বছর এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ৮টি দলের মধ্যে ভারত লাভ করেছিল প্রথম স্থান।

তবে এবার ভারত প্রায় সব কটা খেলাতেই ভালো খেলেছে। তাইওয়ানের কাছে ভারত হেরেছিল, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম না পেয়ে রাত্তিরের ফ্লাড লাইটে খেলার জন্যে। আর বার্মার সংগে ভালো খেলেও হেরে গেছে। বার্মা সেরা দল হিসেবেই জিতেছে। তবে ভারতের পক্ষে মালয়েশিয়াকে হারানো নিঃসন্দেহে প্রশংসার ব্যাপার। এ ছাড়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামকে পরাজিত করার জন্যেও ভারতীয় খেলোয়াড়েরা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

তাই মনে হয় ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের ব্যাপারে আর একটু নজর দিলে মারদেকা ফুটবলের খেলার ফলাফল অন্য রকম হলেও হতে পারতো। কারণ যাঁরা গেছেন দলের সংগে তাঁদের চেয়ে যাঁরা যান নি তাঁদের অনেকেরই যোগ্যতা কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং বেশিই.....।

॥ নঈম ॥

নঈমের নেতৃত্বে ভারতীয় দল এবার মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল।

মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার এ গ্রুপে ... বিরুদ্ধে খেলায় ভারতের গোলরক্ষক ... কাঁপিয়ে পড়ে একটা বল ...

॥ সুভাষ ভৌমিক ॥
স্কোরার হিসেবে সুভাষ কুয়ালালামপুরে নাম কিনেছেন।

কেউ যদি ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ গঠন করেন তাহলে সেই দলটি কেমন হবে। এই বিষয়টি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। সেই নানা মতের একটি এবার প্রকাশ করা হ'ল। সকলের মতের সংগে লেখকের মত মিলবে না ঠিকই। তাই আমরা এই বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাদের মতামত আহ্বান করছে

—ক্রীড়া সম্পাদক

ভারতীয় ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ

কিছুদিন আগে বিশ্বের ৪০টি দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ভোটে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একাদশ দল গঠিত হয়েছে। তাই দেখে আমাদেরও ইচ্ছে হয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে একটা সর্বশ্রেষ্ঠ দল গঠন করার। আজ পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলে যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন তাঁদের মধ্যে থেকে ১১ জনকে বেছে নিতে হবে এই দলটির জন্য।

এই দল গঠন করতে গেলে প্রথমেই বেছে নিতে হবে একজন সুদক্ষ গোলরক্ষককে। অনেকে থঙ্গরাজের কথা বলবেন, উঁচু সট-প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থঙ্গরাজের অপূর্ব। কিন্তু নীচু গড়ানো সটে তিনি প্রায়ই অসহায় বোধ করেছেন। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে পেরুর বিরুদ্ধে খেলার সময় তিনটি গড়ানো সটে যে তিনটি গোল তিনি খেয়েছিলেন, সেকথা তো আমরা

কোনদিনই ভুলতে পারবো না। এদিক দিয়ে ১৯৪৮ এবং '৫২ সালের অলিম্পিকে ভারতীয় গোলরক্ষক মহীশূরের জে ডি ভরদ্বাজকে আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। রাইট ব্যাক হিসাবে শৈলেন মান্নার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ওঁর ক্লি-কিকের কোন তুলনা তখনকার দিনে ছিল না, বর্তমানেও নেই। তা ছাড়া একজন ব্যাকের পক্ষে যা দরকার তার সব কিছুই ওঁর মধ্যে ছিল। এর পরেই আসে স্টপারের কথা। স্টপার হিসাবে সব থেকে আগে যে নামটি মনে আসে, তিনি হলেন জার্নৈল সিং। ওঁর পরিশ্রম করার ক্ষমতা, পায়ে প্রচন্ড সট, সব থেকে বড় কথা ওঁর আত্মবিশ্বাস ছিল প্রচন্ড। অনেকে হয়তো অরুণ ঘোষের নাম করবেন। অরুণের খেলা বুদ্ধিদীপ্ত, নিজ দলের ফরোয়ার্ডদের অফুরন্ত বল জোগাতে পারেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তবুও বলবো আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা অরুণের থেকে জার্নৈলের অনেক বেশি। বরং জার্নৈলের পাশে লেফ্‌ট ব্যাক হিসাবে অরুণ ঘোষকে রাখা যেতে পারে। ওভাবে ওঁরা একসাথে অনেক দিন খেলেছেন। এর পর আসে দুটি হাফ-এর কথা। রাইট হাফ হিসেবে কেম্পিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ, লেফট হাফ হিসেবে মহাবীর প্রসাদ। কেম্পিয়া ১৯৫৬ ও '৬০ সালের অলিম্পিকে মহাবীর ১৯৪৮ সালের অলিম্পিকে খেলেছিলেন। ওঁদের দুজনেরই ছিল অফুরন্ত দম, উঠে ও নেমে খেলার যোগ্যতা—এক কথায় বলতে গেলে ওঁরা ছিলেন সঠিক 'লিংক-ম্যান'।

এর পরেই আসে রাইট উইংগার-এর কথা। ভেঙ্কটেশ ও প্রদীপ ব্যানার্জী দুজনেরই খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ভেঙ্কটেশ ক্ষিপ্রগতি ছিল কিন্তু প্রদীপের মতো সময় সময় জায়গা

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

বদলিয়ে লেফট-ইনের জায়গায় চলে যাওয়া বা কোন কোন ক্ষেত্রে ইনসাইড ডজ করে ভেতরে ঢোকার ক্ষমতা ছিল না। তা ছাড়া বলে কন্ট্রোল ছিল প্রদীপের অপূর্ব। এই সব বিচারে প্রদীপকেই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে।

রাইট ইন হিসেবে চুনী গোস্বামীর নাম সর্বাগ্রে আসে। শুধু রাইট ইন কেন, লেফট ইনেও চুনীর সমান দক্ষতা ছিল। শৈলেন মান্নার যেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, ইন হিসেবে চুনীরও কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে ধনরাজ, মেওয়ালাল ও কাননের মধ্যে কাননকেই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশের অন্যান্য খেলোয়াড়দের চেয়ে কাননের যোগ্যতা অনেক কিন্তু কি করবেন, দুঃখের কথা কাননের চেয়ে

[প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য]

[তৃতীয় কলমের শেষাংশ]

ভাল সেন্টার ফরোয়ার্ড আমাদের দেশে আর হয় নি।

লেফট্‌ ইন হিসাবে আমেদ খানই যোগ্য। চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলায় ভারত ১০টি গোল খেয়েছিল কিন্তু ভারতের পক্ষে আমেদ খান ১টি গোল দিয়েছিলেন। আমেদ খানই সত্যিকারের একজন ভাল লেফট্‌ ইন। প্রদীপ-চুনীর সঙ্গে বলরামকে রাখতেই হবে। প্রদীপ-চুনীর সঙ্গে বলরামের কোন পার্থক্য নেই। এই তিনজনের জন্যই ভারত ১৯৬২তে জাকার্তায় এশিয়ান গেমস-এ জয়ী হয়েছিল। তাই লেফট আউট হিসাবে বলরামকে দলে রাখাই যুক্তিযুক্ত। যে দল গঠন করা হল সেটা তিন ব্যাক প্রথায়। কারণ—এই প্রথায় খেলেই ভারত ফুটবলে নাম করেছিল। যে দলটি গঠন করা হলো সেটা নিম্নরূপ :—

গোল—জে ডি ভরদ্বাজ, রাইট ব্যাক—শৈলেন মান্না, স্টপার—জার্নৈল সিং, লেফট্‌ ব্যাক—অরুণ ঘোষ, রাইট হাফ কেম্পিয়া, লেফট্‌ হাফ—মহাবীর প্রসাদ, রাইট আউট—প্রদীপ ব্যানার্জী, রাইট ইন—চুনী গোস্বামী, সেন্টার ফরোয়ার্ড—কানন, লেফট্‌ ইন—আমেদ খান, লেফট্‌ আউট—বলরাম।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্‌স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বৃহস্পতিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা— মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 27th August, 1970

মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী প্রহসন

যেখান-সেখানের খবর নয়, খোদ বোম্বাই-এর খবর : গত ১৫ই মে ঔষধের যে দাম ছিল, সেই দামে বর্তমানে ঔষধ বিক্রি করার জন্য কয়েকটি ভারতীয় সংস্থা পাইকারী বিক্রেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় : আমাদের দেশে প্রস্তুত ঔষদের ২০% ঔষধ ভারতীয় সংস্থাগুলি উৎপাদন করে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত গত একুশে আগস্ট তারিখের বোম্বাইয়ের খবরে দরিদ্র ক্রেতাসাধারণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল এই ভেবে যে, ঔষধের মূল্যের পুনর্মূল্যায়ন ঘটলেও তা মন্দের ভালো। যাক, আমাদের দেশের ঔষধ উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা দেশের দুস্থ রোগীদের কথা ভোলেন নি।

কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সত্য কি-না, এখনো পর্যন্ত তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কারণ ক্রেতারা উর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং বহু রকম ঔষধ বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে।

পেট্রোলিয়াম ও রসায়নমন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন প্রায় কড়া সুরেই গত ২০শে আগস্ট বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, যদি তাঁরা ঔষধের মূল্য হ্রাসে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তাহলে সরকার তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার নিয়ে নিতে কোন রকম ইতস্তত করবেন না।

সরকারের ঐ হুমকির পর ঔষধ উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা মাথা নত করবেন, একথা যারা ভাবে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। ইতিমধ্যে ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জয়-পরাজয়ের যে খেলার সূচনা হয়েছিল, প্রথম রাউণ্ডেই কেন্দ্রীয় সরকার তাতে পরাজয় বরণ করেছেন। মূল্য হ্রাস করানো তো দূরের কথা, ঔষধের মূল্য বাড়িয়েছেন এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার জন্য আবেদন-নিবেদনের পথ বেছে নিয়েছেন। দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের এই জয়-ই প্রমাণ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজের মান-ইজ্জৎ কিভাবে বৃহৎ মুনাফাভোগী ব্যবসায়ীদের কাছে বন্ধক রেখেছেন। এর পরও কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে ধমক দিয়ে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার নেবার কথা বললে তাতে সরকারের মুখের জোরের প্রমাণ পাওয়া গেলেও বুকের পাটার জোরের প্রমাণ মেলে না।

বলা বাহুল্য, নিত্য-নিয়মিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতোই ঔষধও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার এমন কতকগুলি ঔষধ আছে, যেগুলির ব্যবহার হয় সর্বাধিক। ঐ সব ঔষধের দাম কি রকম বেড়েছে, নীচের তালিকাটি দেখলেই আন্দাজ করা যাবে।

ঔষধের নাম	পূর্ব মূল্য	বর্তমান মূল্য
ট্যার্নাডিরল (প্রতি বড়ি)	২৫ প	৩৬ বা ৩৭ প
নোভালজিন (প্রতি বড়ি)	২০ প	২৫ প
নোভালজিন কুইনাইন (প্রতি বড়ি)	২২ প	৩০ প
কোডোপাইরিন (প্রতি বড়ি)	৮ প	১০ প
সারিডন (প্রতি বড়ি)	১৩ প	১৮ প
সালফাডাইজিন (প্রতি বড়ি)	৬ বা ৭ প	১০ বা ১২ প
লেডারপ্লেক্স (বড় ফাইল)	৭·৭৫	১০·৭৫

ঐ জাতীয় বহুল ব্যবহৃত ঔষধের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সরকারের বেশি নজর নাকি জনস্ব-

পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন—

ঔষধের নাম	পূর্ব দাম	বর্তমান দাম
লিনডিরল	৪·৮০	৫·২৫
নোয়াসাইক্লিন	৫·২০	৫·৬০
ভলডিস	৬·৫০	৭·০০

মোটের উপর এটা আর একবার হাতে-নাতে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সরকার কর্তৃক কোনো বস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য হ্রাস করার হৈ-চৈ-এর অর্থ যেন মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো।

এর পর আমরা শুধু এই কথা বলতে পারি যে, জনগণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দরদ যদি যথার্থ হয়, তা হলে সরকার ইচ্ছে করলে ঔষধ ব্যবসায়ীদের এখনো সঠিক পথে আনতে পারেন। সেই সঠিক পথে আসার প্রথম উপায় হচ্ছে, পেটেণ্ট আইনের আমূল সংস্কারসাধন করা। তারপর সরকারী ঔষধ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে যে-সরকারী কারখানায় প্রস্তুত ঔষধের উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারণ করে বাজারদর বেঁধে দেওয়া। ঔষধের দাম বৃদ্ধি করে দিয়ে ঔষধ প্রস্তুতকারীরা সরকারের বিরুদ্ধে এখন যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, আমরা মনে করি, উপরি উক্ত ব্যবস্থাই হবে তার একমাত্র সঠিক জবাব। তবে তার আগে দরকার সরকারের দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা। সরকারী দৃঢ়তা যে শুধু বক্তৃতাবাজী ও হুমকীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা বোঝা যায়, ১৫ই মে ঔষধের যে দাম ছিল সেই দামে ফিরে যাওয়ার জন্য ঔষধ প্রস্তুতকারীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আকুল আবেদনে।

ভারতে একজন দুর্লভ অতিথি এসেছেন। মাত্র তিন দিনের সফরে নয়াদিল্লী উপস্থিত হয়েছেন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিইচি আইচি। গত দশ বছরের মধ্যে জাপানের কোনো সামনের সারির রাজনৈতিক নেতা এই ভারত-পাক উপমহাদেশে পদার্পণ করেন নি। আইচির শুভ আগমন তাই সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

জাপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুধু ভারত সফরই করেন নি, এর পরে তিনি পাকিস্তানেও গিয়েছেন। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর ভারত সফরের তাৎপর্য অনেকখানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হবার পরেও এক আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তাকে অবলম্বন করে জাপান মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আজ রূপকথার মত চিত্তাকর্ষক। আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও জাপানে এ পর্যন্ত স্থিতাবস্থা চলে আসছে. সরকারের পরিবর্তন হয় নি। প্রধানত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে তার অবিশ্বাস্য অগ্রগতির কারণে জাপান নিজেকে এশীয় রাষ্ট্রগুলির ওপর নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা পোষণ করে এসেছে। কিন্তু জাপান সম্পর্কে ভারত সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে একটা মোটামুটি ক্ষোভ রয়েছে যে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, তার স্বাধীন সত্তা নেই। জাপান সম্পর্কে প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে এ [illegible] যে ভাবমূর্তি সৃষ্ট হয়েছে যে, সে-ই এশিয়াতে আমেরিকার ভিয়েৎনাম নীতির প্রধান সমর্থক এবং চীন বা কমিউনিজম বিরোধী রক্ষণশীল দেশ। কিইচি আইচির ভারত সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য—জাপান সম্পর্কে এ-সমস্ত ধারণার অবসান ঘটানো। তাঁর সে-কাজে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন, তা অবশ্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কিইচি আইচি একজন প্রবীণ রাজনীতিক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য আজ পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার নিলেও আইচি প্রধানত অর্থনীতি এবং বিষয় বাণিজ্যের লোক। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ফ্যাকাল্টি

কিইচি আইচি

থেকে ১৯৩১ সালে গ্র্যাজুয়েট হবার পর তিনি জাপান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। প্রথমেই তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। পরের বছরেই তাঁকে পাঠানো হয় লন্ডনে। বৃটেনের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সেদিন আইচি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁকে ধরে [illegible] [illegible] [illegible] এখানে বসেই ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। তারপরে তাঁকে দেখা গেল লন্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বৈষয়িক সম্মেলনে বিরাট এক পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে। জাপানী প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইচি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাঙ্ক ব্যুরোর ডিরেক্টর হন।

রাজনীতিতে আইচির আবির্ভাব দীর্ঘদিনের নয়। তিনি ১৯৫০ সালে নির্বাচনে জিতে হাউস অফ কাউন্সিলর্স-এ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতার কারণে তিনি দু' বছর বাদে উপ-অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রীর পদে বৃত হন। আর প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হলেন তিনি ১৯৫৫ সালে এবং বছর দুয়েকের মধ্যে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। বাস্তবিক সেই থেকে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটতে থাকে। কখনও তাঁকে দেখা গিয়েছে বিচার-মন্ত্রীর পদে, কখনও শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা দপ্তরের মন্ত্রিপদে।

মাত্র দু' বছর আগে কিইচি আইচি পররাষ্ট্র দপ্তর পেয়েছেন। অর্থাৎ যে আমেরিকা-ঘেঁষা পররাষ্ট্র নীতির কারণে জাপান সরকার সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছেন তার পুরো দায়িত্ব আইচির ঘাড়ে ফেলা বোধ হয় উচিত হবে না। বরং ওকিনাওয়া দ্বীপ থেকে মার্কিন ঘাঁটি অপসারণ এবং মার্কিন নির্ভরতামুক্ত পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে মনে হয় আইচির প্রগতিশীল মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। জাপান এশিয়ার একটা সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত দেশ হয়েও খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে তার মার্কিনমুখী পররাষ্ট্র নীতির কারণে। আজ ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে তাই নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদে কিইচি আইচির শুভ পদার্পণ ঘটেছে এই উপমহাদেশে। বলা বাহুল্য তাঁর এ-সফর একেবারে বিফলে যাবে না, এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

সাময়িক সাফল্যের অন্তে সুভাষচন্দ্র যখন শিলং ছেড়ে চলে গেলেন, তখন পিছনে আনন্দ ও আক্রোশ যুগপৎ আছড়াতে লাগল। ক্ষুদ্র আসামের মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপার সর্বভারতীয় মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠল এবং সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটাকে সর্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত করতে চেয়েছিলেনও বটে। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কূটনৈতিক বুদ্ধি দেখিয়েছিলেন। আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা যেভাবে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে সবটাই সরল ব্যাপার ছিল না এবং থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ, অধিকতর অসরলভাবে সাদুল্লা মন্ত্রিসভাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। গভর্নর প্রথম দিকে গোপীনাথ বরদলৈকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান ক'রে এবং বিশেষ গেজেটে সাদুল্লার পদত্যাগপত্র গ্রহণ ও বরদলৈ মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ প্রকাশ ক'রে কংগ্রেসের যে প্রাথমিক সুবিধা করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর সে ভূমিকা বদল করতে তিনি যতই চেষ্টা করে থাকুন, তাতে সফল হন নি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য। এইকালে আমরা দেখেছি, কয়েক দিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বিবৃতির ঝড় বইয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে গভর্নরের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতির কথা বারবার বলা হয়েছিল এবং ইউরোপীয় ও মুসলিম দলগুলির সাংগাতের কথাও। এই সব বিবৃতির দ্বারা সুভাষচন্দ্র গভর্নরকে কোণঠাসা করতে চেয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ইউরোপীয় চক্রান্তের পথে বাধা সৃষ্টিও করছিলেন। কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিগুলি সর্বভারতীয় প্রচার পাচ্ছিলই। তার ফলে একদিকে ইউরোপীয়দের তথাকথিত নিরপেক্ষতার মুখোস খুলে যাচ্ছিল, অন্য দিকে অপরাপর প্রদেশের ইউরোপীয় মহলের চাপ আসামের ইউরোপীয়দের উপর পড়বার সম্ভাবনা বাড়ছিল।

আসামের কংগ্রেসী রাজনীতি যথার্থ কূটনীতি হয়ে উঠেছিল একটি ক্ষেত্রে। বরদলৈ মন্ত্রিসভার নাম ঘোষিত দেখান। যুক্তিগুলির মূল্য কম নয়, একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে, স্পীকারের ঐ কাজের ফলে বরদলৈ মন্ত্রিসভা আশু পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

স্পীকারের কাজের পিছনে সুভাষচন্দ্রের হাত ছিল না বললেও চলে।

সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে ইউরোপীয় এবং সাদুল্লাপন্থীদের কাছে সাধারণ শত্রু বলে গৃহীত হলেন। বিবৃতির পর বিবৃতিতে তাঁকে আক্রমণ করা হল। সাদুল্লা-সমর্থকেরা এক যৌথ বিবৃতিতে বললেন (২২ সেপ্টেম্বরের স্টেটসম্যানে প্রকাশিত): বরদলৈ মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা। সাদুল্লার সমর্থক মুসলমান সদস্যদের ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও সাদুল্লার দলে ৫৬ জন সদস্যের সমর্থন থেকে গেছেই। সুভাষচন্দ্রের আস্ফালন সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যদের নাম ঘোষণা করা যায় নি। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার যে পাঁচজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র গোপীনাথ বরদলৈ খাঁটি কংগ্রেসী; বাকি কামিনীকুমার সেন স্বতন্ত্র হিন্দু, রূপনাথ ব্রহ্ম উপজাতি, অক্ষয়কুমার দাস ও রামনাথ দাস অনুন্নত।

সুভাষচন্দ্র এবং মৌলানা আজাদ কিভাবে সাদুল্লার দল ভাঙিয়েছিলেন, সে বিষয়ে ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল:

"ইতিমধ্যে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু। প্রথম জন এক-জন মুসলমান সদস্য ভাঙাতে সমর্থ হলেন এবং শেষোক্ত জন বাবু অক্ষয়কুমার দাস ও তাঁর দু'জন অনুগামীকে কংগ্রেস-প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করাতে পারলেন—মন্ত্রিসভায় অক্ষয়কুমার দাসকে স্থান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।"

আসাম ইউনাইটেড পার্টির নেতা আবদুল মতিন চৌধুরী সুভাষচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা করলেন দীর্ঘ বিবৃতিতে। মুসলমান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে গোপন চুক্তির কথা মতিন চৌধুরী অস্বীকার করলেন; বললেন, তাঁরা মোটেই বাইরে থেকে গুণ্ডা আমদানী করেন নি; তবে আসামের চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে অনেক বাইরের লোক এসে জুটেছে, যেমন স্বয়ং কংগ্রেস-সভাপতিই ছুটে এসেছেন।

জোখের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের হুমকির উত্তর দিলেন। (স্টেটস-ম্যান, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

আসামের ঘটনা নিয়ে লীগ-মহলে রোষ-বিদ্বেষের সীমা ছিল না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক ওয়েলেসলি স্কোয়ারের মোসলেম ইনস্টিটিউটে এক ভাষণে কংগ্রেসের জঙ্গী মনোভাবের সমূহ প্রতিবাদ জানালেন, সেই সঙ্গে আপত্তি জানালেন সুভাষচন্দ্রের মন্তব্যের বিরুদ্ধে।১

আর, আসাম মন্ত্রিসভার ব্যাপারটি যাঁর কাছে সবচেয়ে অশুভ সংবাদ বহন করে এনেছিল, সেই মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর ক্ষোভ ও নৈরাশ্য উজাড় করে দিলেন এক ভাষণে। করাচীতে অনুষ্ঠিত সিন্ধুর প্রথম মুসলিম সম্মেলনে জিন্না যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তার মধ্যে 'হিন্দু কংগ্রেসে'র অনেক কুকীর্তির কথা ছিল। আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেনঃ সাদুল্লা পদত্যাগ করা মাত্র কংগ্রেস-সভাপতি সেখানে পড়ি-মরি করে ছুটে গিয়ে তথা-কথিত মন্ত্রিসভা গঠন করিয়েছেন এবং সেই কাজ করার সময়ে 'কোয়ালিশনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক থাকবে না'—কংগ্রেসের এই পূর্বতন ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির কথা একেবারে ভুলে গেছেন। বরদলৈ অনেক চেষ্টা করেও একজনের বেশি মুসলমান মন্ত্রী যোগাড় করতে পারেন নি, অথচ বলেছেন, তিনি তিনজন মুসলমান মন্ত্রী রাখবেন। অ্যাসেমব্লির অধিবেশন মুলতুবী করায় স্পীকারের কাজও প্রশংসনীয় নয়। কংগ্রেসের মত বিরাট দলের পক্ষে আইন-সভায় পরাজয়ের ভয়ে অবাঞ্ছিত উপায় অবলম্বন করা কাপুরুষতা ভিন্ন আর কিছু নয়। কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের এখন একটিমাত্র ভাবনা, কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষত মুসলিম লীগের মধ্যে কিভাবে ফাটল ধরাতে পারে। তার জন্য যে-কোনো পথই কংগ্রেস নিতে পারে, ইত্যাদি।২

অনেক বেশি আশাভঙ্গ ও নৈরাশ্যের ক্ষেত্র ছিল অন্যত্র ইউরোপীয় মহলে। ইউরোপে প্রবল সঙ্কট চলেছে, চেকো-শ্লোভাকিয়ার সর্বনাশ সমুপস্থিত, এই পরিস্থিতিতে পূর্ব ভারতের শাসনকর্তৃত্ব কখনই ইউরোপীয়দের পক্ষে হাতছাড়া করা সম্ভব ছিল না। ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে ইউরোপীয় দল পুরো সমর্থন জানিয়ে টিকিয়ে রেখেছিল, যুক্তি ছিল, প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে ইউরোপীয়রা রয়েছে। একই যুক্তিতে পূর্বে তারা সাদুল্লা-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন জানিয়েছে; এবং তা জানানো উচিত ছিল বরদলৈ মন্ত্রি-সভাকেও। সে কাজ তো তারা করলই না, বরং গোপনে চক্রান্ত করতে লাগল, যাতে বরদলৈ মন্ত্রিসভা গঠন করতে না পারেন। গভর্নরের প্রারম্ভিক 'ভ্রান্তির' জন্য

---

১ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, স্টেটসম্যানে ফজলুল হকের বক্তৃতার রিপোর্টের শিরোনামাঃ

CONGRESS 'GAME' IN ASSAM

CABINET CHANGE

BENGAL PREMIER'S SPEECH

২ জিন্না বলেছিলেনঃ

"In Assam the Saadulla Ministry resigned. Immediately the Congress President went posthaste with others to help the formation of so-called Congress Ministry in utter disregard of all previous professions and declarations and contrary to the avowed Congress determination to have nothing to do with coalitions. But when forming a Ministry Mr. Bardolai was not able to announce the name of even one of the three Moslem ministers who were to be included in the Ministry. The move to get the President to adjourn the Assembly *sine die* was hardly creditable. For a great party, not to face the legislature, knowing full well that they had not the majority at their back was sheer cowardice. It is under the threat of suspension of the oath-taking ceremony that the President of the Congress party agreed to a session of the Assembly being called at an early date.

"Upto the present moment Mr. Bardolai has not been able to get more than one of the three Moslem ministers. He is still hunting for the remaining two Moslem ministers. Fifty-six members of the Assembly out of 107 are not only against the so-called Congress Ministry but have tabled a vote of no-confidence.

"The Congress High Command is obsessed with one idea and is determined to divide the Moslems, and particularly to break the solidarity of the Moslem League, no matter what the method may be." *(Statesman, Oct. 9, 1938)*

নিয়মতান্ত্রিকতার অবশ্যই প্রতিমূর্তি! যখন বরদলৈ মন্ত্রিসভার গঠন ঘোষিত হয়ে গেল, তখন শপথ গ্রহণের আগেই ইউরোপীয় দলের নেতা এফ ডব্লিউ হকেনহাল অনাস্থা প্রস্তাব হাজির করলেন। ইউরোপীয় দলনেতা বললেন, কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মনীতির বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি আছে বলে এই অনাস্থা প্রস্তাব তুলছেন না—কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বলেই তাঁদের বিরোধিতা।৩

চা-বাগানের মালিক ইংরেজদের ন্যায়পরায়ণতা! হাসির কথা বটে। কয়েকদিনের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মনীতির বিরুদ্ধে আপত্তি আছে বলেই কংগ্রেসের বিরোধিতা করছি—একথা পরিষ্কার বিবৃতিযোগে জানালেন কেন্দ্রীয় আইনসভার ইউরোপীয় দলের গ্রিফিথস সাহেব। বক্তব্যের এই অসংলগ্নতা দেখিয়ে দেয়, সুভাষচন্দ্র ইউরোপীয়দের খুঁচিয়ে কতখানি অস্থির করে তুলেছিলেন। ইউরোপীয়দের রাগের আরও কারণ, সুভাষচন্দ্র হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ইউরোপীয়রা যদি আসামে কোনো শাসন-সঙ্কট বাধায়, তাহলে কংগ্রেস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে তার নীতির পুনর্বিবেচনা করবে; কংগ্রেস একটা অখণ্ড প্রতিষ্ঠান—তাকে যেখানেই আঘাত করা হোক না কেন, সে আঘাত সর্বত্র বাজে।৪

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ইউরোপীয়রা কতখানি রুষ্ট ছিল তার প্রমাণ তাদের সার্কুলার, যাতে বলা হয়েছিল, আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা সুভাষচন্দ্রই জোর করে তৈরি করে দিয়েছেন, গোপীনাথ বরদলৈর মন্ত্রিসভা গঠনে ইচ্ছা ছিল না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও গররাজি ছিল। এই সার্কুলারের প্রতি সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি খুব নিরীহভাবে বলেছিলেন, "ঐ প্রদেশের কংগ্রেসীরা এবং তার পশ্চাদ্বর্তী জনগণ যদি মন্ত্রিসভা গঠনে সর্ব-সম্মতি প্রকাশ না করতেন, তাহলে আমি কদাপি এক্ষেত্রে কিছু করতাম না। বস্তুতপক্ষে আমরা যদি বর্তমান মন্ত্রি-সভা গঠনের বিষয়টি অনুমোদন না করতাম, তাহলে আসামের কংগ্রেস মহলে বিস্তৃত অসন্তোষ দেখা দিত। ওয়ার্কিং কমিটির বিষয়ে বলতে পারি, বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি তার সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।"৫

---

৩ "When the Assembly met to-day Mr. F. W. Hockenhull, the European leader wanted to move a motion of non-confidence against the new Ministry but the Speaker ruled that he could not do so at present.

"The no-confidence motion tabled by the European group is based entirely on the fact that the group does not believe that a Congress-guided Ministry enjoys the support of a majority of the House. *It has nothing to do with any programme which the Congress Ministry may or may not introduce.*" (বক্রলিপি লেখক-নির্দেশে)

(*Statesman*, Sep. 26, 1938)

৪ সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন:

"To my mind this attitude of the Assam European Assembly Party amounts to an open war on the Congress, for which there is not the slightest justification. The attitude of the European Group in Assam will, I am afraid, have repercussions all over the country, and it is but natural that it will influence our own attitude towards the European community all over India. It would be fatal mistake to regard the events of Assam as an isolated phenomenon. Congress is a unitary organisation and whatever happens to the Congress in one part of the country, naturally has repercussions all over India."

(*Statesman*, Oct. 7, 1938)

৫ এই সার্কুলারটি আমরা পাই নি। সংবাদপত্রে এর উল্লেখ দেখেছি। এই সার্কুলারটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে, আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনে মুখ্য ভূমিকা সুভাষচন্দ্রেরই ছিল। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে বেরিয়েছিল:

"On his (Bose's) attention being drawn to a circular by the European Group in Assam that Mr. Bose forced the formation of the Bardoloi Ministry in Assam against the desire of Mr. Bardoloi and the Working Committee, Mr. Bose said, 'I would have been the last man to do anything with the formation of the present Ministry, if it had not been the unanimous desire of Congressmen in that province and the public behind the Congress. As a matter of fact if we had not sanctioned the formation of the present Ministry, there would have been wide spread discontent in the ranks of the Congress in Assam. "So far as the Working Committee is concerned it is a matter of common knowledge that the present Ministry has the fullest support of that body."

(*Amrita Bazar*, Nov. 24, 1938)

সুভাষচন্দ্রের এই কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল অনেক কথাই। আসাম মন্ত্রিসভার গঠনে সুভাষচন্দ্রকে কেবল বাইরেই নয়, ভিতরেও লড়তে হয়েছিল। কংগ্রেস কোয়ালিশনে যোগদান করবে না—এত বড় প্রতিজ্ঞাকে সুভাষচন্দ্র টলিয়েছিলেন, সে কি বিনা সংগ্রামে? তিনি কি কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে নিজ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেন নি? ওয়ার্কিং কমিটি যখন সেই সিদ্ধান্ত গলধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন বাইরে অবশ্য সুভাষচন্দ্র খুবই সরল সুন্দর কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে আমরা সবাই একমত। কিন্তু উল্টোদিকে আর একটা গূঢ় ইঙ্গিতও ছিল—এক্ষেত্রে হাই কম্যান্ড গররাজি হলে গোটা আসামের কংগ্রেস-মহলে অসন্তোষের ঢেউ উঠত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপরের কথাগুলির মধ্যে তিনি কংগ্রেস-বিরোধীদের যেমন উত্তর দিয়েছেন, একই সঙ্গে কোয়ালিশন-বিরোধী কংগ্রেসীদেরও কিছু সমঝে দিয়েছেন।

অনেকগুলি বিবৃতিতে ক্রমান্বয়ে সুভাষচন্দ্র ইউরোপীয়দের আক্রমণ করেছেন, সুতরাং কংগ্রেস-বিরোধী চক্রান্তের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার ইউরোপীয় নেতা পি জে গ্রিফিথসের পক্ষে উত্তর না দিয়ে উপায় ছিল না। খুব অনিচ্ছায়, বাধ্য হয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি উঁচিয়ে আছে আক্রমণের জন্য। ১০ অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত বিবৃতির গোড়ায় তিনি বললেন, "মিঃ বসুর সকল ভুল বিবৃতি এবং মিথ্যা সিদ্ধান্তের আলোচনা করতে গেলে যে জায়গার দরকার, ততখানি গুরুত্ব তাঁর বিবৃতিগুলি পেতে পারে না, কিন্তু ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে তাঁর মনোভাবের বিষয়ে কিছু বলতেই হবে।"

মিঃ বসুর বিবৃতিগুলি দীর্ঘ উত্তরের যোগ্য না হলেও গ্রিফিথ সাহেব কিছু দীর্ঘ বিবৃতিই দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি মিঃ বসুকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কাকে বলে সে বিষয়ে কিছু সৎ শিক্ষা দান করেন। প্রতিটি সদস্য কিভাবে নিজ বিবেক অনুযায়ী কাজ করবে, কিভাবে বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সদস্যদের বিবেক নিয়ন্ত্রিত হবে—সেসব কথা প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়েছিলেন, কেবল একটি কথা জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন—যেসব ইউরোপীয় সদস্যের পক্ষে ঐসব অধিকার তিনি দাবি করছেন, তাঁরা কেউই যথারীতি নির্বাচিত হন নি। গ্রিফিথ সাহেব বলেছিলেন:

"মিঃ বসু তাঁর বিবৃতির আরম্ভে আক্রমণ করে বলেছেন, আসামের ইউরোপীয় দল 'রাজার সরকার' চালু রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নতুন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। রাজার সরকার চালু রাখা বলতে যদি মিঃ বসু বোঝাতে চান—যে-দলই সরকারে আসুক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা কার্যনীতি বিবেচনা না করে তাদের সমর্থন করে যাওয়া—তাহলে জোরের সঙ্গে বলছি, এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি বা হতে পারে না। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি পার্লামেণ্টারী গভর্নমেণ্টের মূল ভাবের বিরোধী। পার্লামেন্টারী রীতিতে বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে—একথা না বুঝলেই ঐ ধরনের প্রতিশ্রুতির কথা কেউ ভাবতে পারে। মিঃ বসুকে আমি কি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, বৃটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দল 'হিজ ম্যাজেসটিজ অপোজিশন' বলে পরিচিত এবং বিরোধী দলের গুরুত্বের স্বীকৃতিরূপে বিরোধী দল-নেতা সরকারের কাছ থেকে মাহিনা পান?"

অতঃপর গ্রিফিথস সাহেব শিক্ষাদানচ্ছলে জানিয়েছিলেন, পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে সদস্যরা বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মপদ্ধতিকে খুঁচিয়ে-খাচিয়ে দেখেন। তারপর তিনি সরকার পক্ষ বা বিরোধী দল কোনো একটা দলে যোগ দেন; কিন্তু তিনি তখন যে-দলেই থাকুন, 'রাজার সরকার' চালু রাখার ব্যাপারে অংশ নিচ্ছেন।

গ্রিফিথসের বিবৃতি একটি সুন্দর স্বপ্ন এনে দিয়েছিল—ভারতবর্ষ একেবারে ইংলণ্ড হয়ে গেছে, সেখানে ইংলণ্ডের অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত রয়েছে। এই স্বপ্নের অংশীদার হতে অসমর্থ ভ্রান্তবুদ্ধি সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে গ্রিফিথসের আরও কিছু সহাস্য শিক্ষা: "ইউরোপীয় দল যদি সম্পূর্ণ উদাসীনতার ভূমিকা গ্রহণ করে বলত, 'যতক্ষণ আমাদের স্বার্থ বজায় থাকছে ততক্ষণ কে এই প্রদেশ শাসন করছে তা আমরা গ্রাহ্য করি না, আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এমন যে-কোনো দলকে আমরা সমর্থন করতে রাজি আছি'—তাহলে মিঃ বসু কী বলতেন? সে ক্ষেত্রে মিঃ বসুর এই অভিযোগ কি সত্য হয়ে উঠত না—আইনসভায় ইউরোপীয় দল যথাযোগ্য অংশ নিচ্ছে না।" গ্রিফিথস জানালেন, আসামের ইউরোপীয় দল অন্য সকল দল অপেক্ষা আসামের স্বার্থ সম্বন্ধে অধিক সচেতন। সুতরাং এদেশের শ্রেষ্ঠ স্বার্থসাধক দলের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আসামের ইউরোপীয় দল চলবে। গ্রিফিথসের ঝুলি থেকে অতঃপর বিড়াল বেরিয়ে পড়ল—তিনি পরিষ্কারভাবেই জানালেন—কংগ্রেস দল নয়, সাদুল্লার দলই আসামের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ সংরক্ষণ করবে এবং সেজন্য তাঁরা সাদুল্লার সমর্থক।[৬]

৬ গ্রিফিথসের বক্তব্যের অংশ:

"The European Graup in Assam is probably in closer contact with the needs of the province as a whole than any other party and its consequent interest in the welfare of the province compels it to consider the policies and programmes of the different parties which appear to it to be working in the best interests of the country. It may be that the Congress Party in power would have a very different policy from

আপনার মেক-আপে...
৫0,000 টাকা
জিতে নিন
প্রথম পুরস্কার ১০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ৫,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার ২,৫০০ টাকা
আফগান স্নো সৌন্দর্য প্রসাধন 'আমার রূপ আমার পছন্দ' প্রতিযোগিতা

বিবৃতির শেষে প্রবল ঘৃণা ও প্রবলতর গাম্ভীর্যের সঙ্গে মিঃ গ্রিফিথস মিঃ বসুর হুমকির বিরোধিতা করলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় অংশ সেইটুকু যেখানে তিনি জানিয়েছিলেন—বসুর বিরুদ্ধে তাঁরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই সমর্থন পাবেন। গ্রিফিথস বললেন:

"পরিশেষে আমি মিঃ বসুর সম্পূর্ণ আনপার্লামেন্টারী মনের চেহারার জন্য ক্ষোভ বোধ করছি, যে-মনের বশে তিনি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হুমকি জানিয়েছেন এবং ইঙ্গিত করেছেন যে, আসামে ইউরোপীয়রা যদি কংগ্রেস দলের বিরোধিতা করে, তাহলে তারা সারা দেশে বয়কটে পড়বে।

"পার্লামেন্টারী সংস্থাসমূহ তার প্রত্যেক সদস্যের বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতার উপর এবং সেই বিশ্বাস মনঃপূত না হলেও অপর সদস্যগণ কর্তৃক তাকে সম্মান করে চলবার মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। মিঃ বসুর হুমকিতে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভীত নয়, কারণ কংগ্রেস দলের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বেশি শ্রদ্ধা আছে, যার জন্য বিশ্বাস করতে পারি, পার্লামেন্টারী ভাবের মর্মগ্রহণে মিঃ বসুর অসামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশি মর্মগ্রহণের সামর্থ্য ঐ দলের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে রয়েছে।

"আমরা অধিকন্তু একথা স্মরণ করতে পারি, হুমকিই মিঃ বসুর রাজনৈতিক অস্ত্রাগারের প্রধান অস্ত্র। এবং ফেডারেশন-প্রশ্নে মিঃ বসু নিজ দলের বিরুদ্ধে যে হুমকি জানিয়েছেন, তার জন্য তাঁর দল যতখানি বিচলিত, আমরা নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর হুমকিতে তার বেশি বিচলিত নই।"৭ (স্টেটসম্যান, ১১ অক্টোবর, ১৯৩৮)

গ্রিফিথসের ঐ বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "এক্ষেত্রে তিনি বাংলার আইনসভায় অনাস্থা প্রস্তাব ওঠার পরে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল যে-বিবৃতি দেন তার প্রতি মিঃ গ্রিফিথসের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে চান। প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে ইউরোপীয় দলের মনোভাব সম্বন্ধে স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের বক্তৃতায় ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রবৃত্তি ছিল। হুমকির কোনো প্রশ্নই এখানে ওঠে না। কিন্তু আসামের ইউরোপীয়দের নীতি অন্যান্য স্থানের ইউরোপীয় দলের নীতির সঙ্গে সমরূপ নয়। এক্ষেত্রে মিঃ গ্রিফিথস যদি হুমকির কথা বলেন তাহলে তা তাঁর 'অপরাধী বিবেকের' রূপেই দেখিয়ে দিচ্ছে। মিঃ গ্রিফিথস ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে সেখানকার ইউরোপীয় দল ভিন্ন নীতি গ্রহণ করত।"

সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেন: "আইনসভা এড়িয়ে চলার ইচ্ছা আসাম মন্ত্রিসভার নেই। পূজা ও রমজানের ছুটির জনাই স্পীকার আইনসভা আহ্বান করতে পারছেন না। অবশ্য একথা সত্য যে, গত মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে যেখানে কাজকর্ম ফেলে রেখে গেছে, সেখান থেকে নিজেদের নীতি অনুযায়ী কাজ গুছিয়ে তুলতে বর্তমান মন্ত্রিসভার কিছু সময় লাগবে।"

(অমৃতবাজার, ১৫ অক্টোবর, ১৯৩৮)

[ক্রমশ]

that which it has advocated in Assam during the past 18 months. Political alignments, however, must be based on known facts about the past and not on speculations as to future changes of mentality, and in the light of what has been the avowed policy of the Congress Party in the province of Assam since the inauguration of provincial autonomy the European Group had no choice but to support the Saadullah Ministry." (*Statesman*, Oct. 11, 1938)

৭ ইউরোপীয় সংকটে মানসিকভাবে ভারতের ইউরোপীয় সম্প্রদায় এতই উদ্বিগ্ন ছিল যে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি এই ব্যাপারটাকে প্রকাশ্যে বেশি ঘাঁটাতে চায় নি। তবে পায়োনীয়ার ১৪ অক্টোবর, ১৯৩৮-এ *Mr. Basu Rebuked* নামে সম্পাদকীয় না লিখে পারে নি। তার শেষাংশ ছিল:

"What was the meaning of his recent outburst against the Europeans in Bengal for having stood by Mr. Huq on the motion of no-confidence in his ministry. In refusing to be cowed by his threats ; veiled or naked, the Europen Group in Assam Assembly has acted constitutionally, correctly, and with courage. Incidentally, it is amusing to find Mr. Bose now playing the role of the Defender of the Parliamentary Faith, and now what of the champion wrecker of Constitutions !"
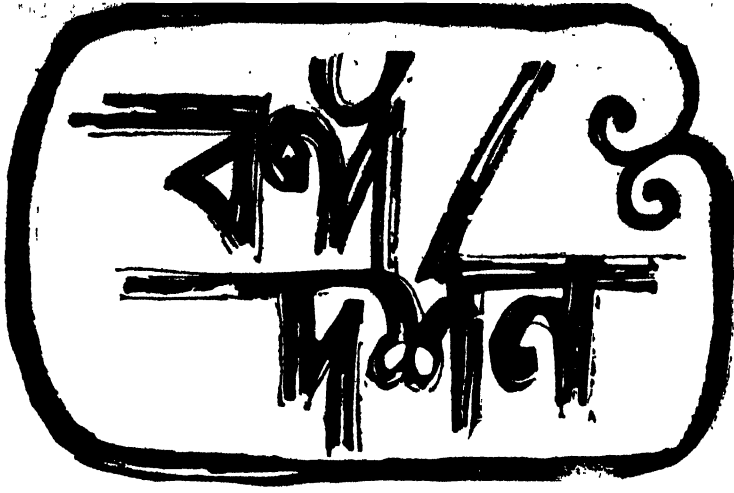
পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর অশান্তি, হাঙ্গামা ও অরাজকতা বন্ধ হবে বলে যাঁরা আশা করেছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে দেখছেন যে, হাঙ্গামা ও অরাজকতা বন্ধ হওয়া দূরে থাক– তা যেন বহুমুখী হয়ে সারা বাংলাদেশকেই গ্রাস করতে বসেছে। এমন দিন একটিও পওয়া যাবে না যেদিন কোথাও-না-কোথাও সংঘর্ষ, হানাহানি, প্রকাশ্য বা গুপ্ত হত্যাকান্ড, বোমাবাজি, লাঠালাঠি, ছুরি চালাচালি ইত্যাদি না ঘটছে। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাঁচ-সাতটি খুন এবং কুড়ি-পঁচিশটি সশস্ত্র সংঘর্ষের সংবাদ পাঠ করতে করতে মানুষ এমনই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করাই এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কলকাতা শহর শুধু কলকাতাবাসীদের নিয়ে নয়, মফস্বল অঞ্চলসমূহ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যহ রোজগারের ধান্দায় কলকাতায় যাওয়া-আসা করেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের উদ্বেগের অন্ত নেই, মানুষটা জ্যান্ত ফিরতে পারবে কিনা তাই নিয়েই উৎকণ্ঠা। সংঘর্ষ ঘটছে প্রকাশ্য রাজপথে। কোথাও দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে আবার কোথাও পুলিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ হচ্ছে। এক দলের লোক অপর দলের কর্মীকে বাড়ি থেকে টেনে এনে প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারছে। আবার সেই দলের লোক প্রতিপক্ষ দলের নিরীহ কর্মীকে রাস্তাঘাটে চোরাগোপ্তা মেরে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্রত্যেকটি খুনোখুনির পর এক-একটি দলের আহ্বানে এক-একটি এলাকা 'বন্ধ' হচ্ছে।

পুলিশের ওপরে কোন ভরসা নেই। এক-একটি পাড়া ঘেরাও করে অপরাধী সন্ধানের নামে পুলিশ শত শত নিরীহ যুবককে ধরে অমানুষিক অত্যাচার করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই অত্যাচারের ফলে কেউ কেউ পৃথিবী থেকে চিরকালের মত বিদায় নিচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ যে, সমীর ভট্টাচার্য নামে আঠারো বছর বয়সের একটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ থানায় এনে তাকে এমন প্রহার দেয় যে, সে প্রাণত্যাগ করে। পুলিশের তরফ থেকে এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ প্ররোচনামূলক এবং এরই ফলে কলকাতায় আবার আগুন জ্বলেছে। পুলিশের তরফ থেকে এ-সংবাদ অস্বীকার করা হলেও, এই রকম প্রায়ই ঘটে, তার নজির আছে। আমরা পূর্বে থানার অভ্যন্তরে ধৃত বিচারাধীন বন্দীদের ওপর পুলিশের অমানুষিক পীড়নের কথা লিখেছিলাম। যদি কারো বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, কোর্টে তার বিচার হওয়া উচিত এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ধৃত ব্যক্তিদের পীড়ন করার অধিকার পুলিশকে কে দিয়েছে, বিশেষ করে সে পীড়ন যদি নরহত্যায় পর্যবসিত হয়, তাহলে সে ঘটনা আরও অশান্তির প্ররোচনা যে যোগাবে, তাতে আর সন্দেহের কি আছে?

গোটা কলকাতা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে আজ এক প্রচন্ড সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়েছে। কখন কোথায় বোমা ফাটবে, তার আঘাতে কার হাত-পা উড়ে যাবে কেউ জানে না। সাধারণ মানুষ যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন তাঁদেরও নিস্তার নেই। কারণ আকস্মিক বোমার আঘাতে আহত বা নিহত হবার ভয় যেমন আছে, তেমনি ভয় আছে সি আর পি-র হাতে ঠ্যাঙানি খাবার। এই বিপজ্জনক ও সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়ায় সমাজবিরোধী দাঙ্গাবাজ, পেশাদার গুন্ডা-বদমায়েশেরাই সবচেয়ে বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অরাজকতা ও গুন্ডাদের দৌরাত্ম্য যে কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে, তা মাণিকতলা অঞ্চলে কয়েকদিন আগে একটি কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের কাহিনী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে একজন ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে, সঙ্গে বোমা ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে, তাতেই বুঝতে পারা যায় এরা আজ কত বেপরোয়া, কত দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। কলকাতার মত শহরে বোমা নিয়ে নারী ধর্ষণকারী যদি বাড়ির ওপর চড়াও হবার সাহস পায়, তবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা যে কোন্ অধঃপাতে গেছে, তা কারুরই বুঝতে বাকি নেই।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে কোথাও কারো জীবন নিরাপদ নয়। এই ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তারা কিন্তু একেবারেই উদাসীন। গত কয়েক মাসে কয়েকশো লোক খুন হয়েছে, অথচ একটি ক্ষেত্রেও অপরাধীদের ধরবার অথবা খুনের কিনারা করার চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। এমন কি, থানায় থানায় খুনের ডায়েরি নিতেও পুলিশ অফিসারদের মধ্যে অনীহা দেখা যাচ্ছে। অথচ সরকারী কর্তারা বলে বেড়াচ্ছেন আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা নাকি ভালোর দিকে যাচ্ছে। একমাত্র গঞ্জিকা-সেবী ছাড়া আর কেউ এ-ধরনের আত্ম-সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দায়িত্বস্খালনের চেষ্টা আগে করেছেন বলে শোনা যায় নি। অবস্থা আজ কত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক তা স্বাধীনতা দিবস ও তার পরের দিনের কলকাতা ও দমদমের ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসেই কলকাতা শহরের ২১টি জায়গায় সংঘর্ষ হয়েছে এবং মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে তিরিশ রাউন্ড গুলী ছুড়তে হয়েছে। এই সব ঘটনায় এক-জন নিহত ও তিরিশজন আহত হয়েছে। ঐ দিনই দমদমে নকশালপন্থী শিক্ষক কনক অধিকারীকে খুন করা হয়। পরের দিন সকালে গ্রামোফোন কোম্পা-নীর শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী সি পি এম নেতা শ্রীঅনন্ত দত্তকে একা পেয়ে তলোয়ারের আঘাতে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে। ওই দিন বিকেলে মানস মিত্র নামক একজন নকশালপন্থী যুবককে দমদমের নল-পাড়া অঞ্চলে বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ যে কোন্ নোংরা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, তা এই সব ঘটনার পর আর ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না। রাজ্যের আইন-শৃংখলা রক্ষায় পুলিশ একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু সে ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা মোটেই গৌরবজনক নয়। উগ্র-পন্থীদের সঙ্গে সি পি এম-এর সংঘর্ষ

[illegible] পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, [illegible] একে অপরকে নেকড়ে বাঘ বলে মনে করছে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সমাজজীবনে সুস্থ আবহাওয়া ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন তৎপরতাই দেখাচ্ছেন না। এই সব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, তা কেউই চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করছে না। যে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের কর্মী ও সমর্থকদের এই রকম জঘন্য নরহত্যা ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথে প্ররোচিত করছেন, তাঁরা আজকের যুবসমাজকে কোন্ নরকের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তা তাঁরা ভেবে দেখছেন না। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচারের দ্বারা হানাহানির উস্কানি দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি যে পথে চলেছে তা গৃহযুদ্ধের পথ, কিন্তু এই গৃহযুদ্ধের শিকার জনসাধারণের শত্রুরা নয়—জনসাধারণ নিজেরাই। এই রক্তক্ষয়ের পিছনে কোন মহৎ লক্ষ্য নেই, মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কোন সুচিন্তিত আদর্শ নেই, আছে শুধু অন্ধ বিদ্বেষ, যুক্তিহীন ঘৃণা আর অর্থহীন আত্মপীড়ন। আর এই ব্যক্তিগত সন্ত্রাস ও খুনোখুনি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা বন্ধ চোরাগলির ভেতর দিয়ে বিপর্যয়ের অতল গহ্বরে টেনে নিয়ে চলেছে, যার পরিণামে ফ্যাসীবাদের উত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

কলকাতায় হাঙ্গামা

বৃহস্পতিবার ২০শে আগস্ট তারিখ থেকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে প্রচণ্ড হাঙ্গামা শুরু হয়, তার জের কলকাতার অপরাপর অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। নকশালপন্থী নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সেদিন সকাল থেকেই সারাদিন ধরে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যুবকদের সংঘর্ষ ঘটে। হাঙ্গামায় কতকগুলি বাস ও ট্রাম ভস্মীভূত হয়েছে। পুলিশ প্রথম দিনে বিভিন্নস্থানে দশ রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ে এবং বহুবার কাঁদানে গ্যাস ফাটায়। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে প্রথম দিন বারজন নিহত ও পনেরজন আহত হয়।

হাঙ্গামার প্রচণ্ডতা আর তার মোকাবিলায় পুলিশ ও সি আর পি-র ভূমিকায় ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটা ত্রাসের রাজত্ব চলে। ট্রাম আর স্টেট বাস রাজপথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকা মহানগরীর অন্যান্য এলাকা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্কুল-কলেজগুলি সব বন্ধ হয়ে যায় এবং দোকানপাটও বন্ধ থাকে। ক্রুদ্ধ যুবকেরা যেমন বাসে ট্রামে আগুন লাগায় তেমনি তারা পুলিশের মোকাবিলায় অনেক সময়ই [illegible] আর বোমা ব্যবহার করে। পুলিশ আর সি আর পি সমগ্র এলাকা ছেয়ে রাখায় ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে মাথার ওপর হাত তুলে চলতে হয়। শ্যামপুকুর অঞ্চলে এই বিক্ষোভের সঙ্গে সমীর ভট্টাচার্যের মৃত্যুর প্রতিবাদেও বিক্ষোভ যুক্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মৃত্যুকে হত্যা আখ্যা দেয়। এ দিন সকালে সমীরের মৃতদেহ তার বাড়িতে দেখার পর ঐ এলাকা সহ আশ-পাশের এলাকার মানুষ প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে।

পরদিনও এই হাঙ্গামার বিরাম ছিল না। এবং তা কলকাতার আরও নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বঙ্গদর্শন এই অবস্থারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হচ্ছে, হাঙ্গামার গতি শেষ পর্যন্ত কোনদিকে যাবে তা আমরা পূর্বাহ্নে বলতে পারছি না, তবে এটুকু প্রতিমুহূর্তে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, রাজ্যপাল প্রশাসনে পশ্চিমবঙ্গের নাভিশ্বাস উঠেছে। এ এক আজব অবস্থার শুরু হয়েছে, যেখানে রক্তক্ষয়ের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টানা যাবে না।

ওদিকে দুর্গাপুর

একদিকে সি আর পি-র লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও গুলীচালনা এবং অন্যদিকে বিক্ষোভকারী জনতা কর্তৃক অগ্নিসংযোগ ও দোকানপাট লুঠতরাজের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের চলতি ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটে এবং দুর্গাপুর স্টীল টাউনশীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। অবস্থা মোকাবিলার জন্য আরও প্রচুর সি অর পি পাঠানো হয়েছে। স্টীল টাউনশীপ ছাড়াও বেনাচিতি, এ ভি বি টাউনশীপ ও এম এ এস সি টাউনশীপ কার্ফুর কবলে পড়েছে। গত ২০শে আগস্ট প্রায় সাড়ে ন'টায় স্টীল টাউনশীপের 'এ' জোনে স্থানীয় হাসপাতাল স্টাফের সঙ্গে সি আর পি-র সংঘর্ষ বাধে। হাসপাতালের জানলা-দরজা ভেঙে সি আর পি ভেতরে প্রবেশ করে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রহার করে। বেলা ১১টায় 'এ' জোনের অশোক এভিনিউতে ব্যারিকেড সরাতে একদল মহিলা সি আর পি-কে বাধা দেয়। ওই সময় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনী মহিলাদের ওপর লাঠি-চার্জ করে ও ১৫ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। কিন্তু তাতেও নারীবাহিনীকে হটানো যায় না। 'এ' জোনে সি আর পি ব্যারিকেড সরাতে গেলে প্রবল বাধায় [illegible] পার্টি [illegible] ওপর পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে ও পরে গুলী চালায়। ফলে দুজন আহত হয়। পুলিশ মোট বারো রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ে।

দুর্গাপুরে অশান্তির সূত্রপাত বেশ কিছুকাল আগে থেকেই শুরু হয় এবং বর্তমানে এই স্থানটি একটি শক্তিপরীক্ষার লড়াই-এর আসরে পরিণত হয়েছে। এই লড়াই-এর একদিকে রয়েছে সি পি এম পরিচালিত ছয় পার্টি জোট আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং সি পি এম বিরোধী প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। এই লড়াই-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল অনেকদিন আগেই—অর্থাৎ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পতনের পর থেকেই। তার পর থেকেই হয়েছে দুই তরফের মল্লযুদ্ধের সূত্রপাত। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার গুরুত্ব শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়েই যে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ তা নয়, শ্রমিক আন্দোলনের দিক দিয়ে এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অসাধারণ। এই মহৎ ও সরল সত্যটা সকলেই বুঝেছেন এবং তার ফলে ইস্পাত কারখানাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে এসপার-ওসপার লড়াই। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গাপুরে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স পাঠাবার পর থেকেই প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাপুরের সি পি এম নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়ন কর্তৃক ধৃত দিলীপ মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এবং সি আর পি ও সিকিউরিটি ফোর্স তুলে নেবার দাবিতে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটল, তারপর থেকেই ধাপে ধাপে অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে শুরু করেছে। গভর্নমেণ্ট নতি স্বীকার করতে রাজী হন নি, সি পি এম বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্টি জোট এই ধর্মঘটের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন, সরকারী মনোভাবের প্রতিবাদে বর্তমান বন্ধ হয়েছে, দুর্গাপুরে গুলী চলেছে, কার্ফু জারি হয়েছে, কিন্তু ধর্মঘট শুরু হবার পর অনেকদিন কেটে গেলেও সমস্যার অবনতি ছাড়া উন্নতি ঘটে নি। ধর্মঘটের সমর্থক ও বিরোধী দুই পক্ষই এই লড়াইকে মর্যাদার লড়াই-এ পরিণত করেছেন এবং দুই পক্ষই ধরে নিয়েছেন যে, এই লড়াই-এ জয়-পরাজয়ের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করবে বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন্ তরফের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

—[illegible] আগস্ট, ৬৯

উদ্বৃত্ত জমি দখলের আন্দোলন

গত ১লা জুলাই থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) ভারতব্যাপী উদ্বৃত্ত জমি দখলের আন্দোলন সুরু করেন। তাঁদের কার্যক্রম অনুযায়ী তাঁরা জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি (জোতের সর্বোচ্চ-সীমার বাইরের জমি) এবং খাস জমি দখল করতে গিয়ে কোথাও কোথাও জোতদারের লোক, আবার কোথাও কোথাও পুলিশের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। কোন কোন ক্ষেত্রে জমি দখল করতে গিয়ে তাঁরা কোন বাধার সম্মুখীন হন নি। জমি দখলের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কিছু লোক হতাহত হন। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় সুরু হয় ৯ই আগস্ট। ১৬ই আগস্ট সি-পি-আই-এর তরফ থেকে সেই আন্দোলনের যে বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মী সেই আন্দোলনে যোগদান করেছেন এবং ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার কর্মী তাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ভূপেশ গুপ্ত এবং এস এ ডাঙ্গে সহ ১২ জন এম-পি এবং বহু সংখ্যক এম-এল-এ আছেন।

সি-পি-আই-এর হিসাব অনুযায়ী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নাকি ৩ হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হয় এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমি দখল করা হয়। তবে সরকারী হিসাব অনুযায়ী দখলের পরিমাণ নাকি ১০ হাজার একরের বেশী নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের জমি দখল আন্দোলনে পি-এস-পি এবং এস-এস-পিও যোগ দিয়েছেন, তবে তাঁদের জমি দখল আন্দোলনের সঙ্গে সি-পি-আই-এর জমি দখল আন্দোলনের কোন সাংগঠনিক যোগসূত্র নেই।

জমি দখলের আন্দোলনে ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই ব্যাপক সমর্থন হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। শাসক কংগ্রেসের একাংশও ভূমি দখল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। কংগ্রেসী এম-পি মোহন ধারিয়া বলেছেন যে, সরকার ভূমি সংস্কারের কোন ব্যবস্থা চালু করতে না পারার ফলেই বামপন্থী দলগুলি আজ উদ্বৃত্ত জমি দখলের আন্দোলন সুরু করার সুযোগ পেয়েছে। সুবিচার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করা অন্যায় বলে তিনি মনে করেন না। পার্লামেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থা যদি ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে কৃষকদের পক্ষে জমি দখলের আন্দোলনে নেমে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মোহন ধারিয়ার বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সারবস্তু আছে। কংগ্রেস দল ভূমি সংস্কারে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর ২৩ বছরে সেই পথে তাঁরা বেশিদূর এগোতে পারেন নি। মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মধ্যেও একটি ভূমি সংস্কারের কার্যক্রম ছিল। মহাত্মা গান্ধী মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিসারকে বলেছিলেন যে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরাও জমি দখল করতে সুরু করবে এবং জোতদার ও ভূস্বামীরা গ্রাম ত্যাগ করে সেই আন্দোলনে কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশা করেন। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর জমিদারী উচ্ছেদ এবং জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারক আইন পাশ হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাক্তন ভূস্বামীরা কংগ্রেসী সরকারের যোগসাজসে সেই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্বনামে-বেনামে নিজেদের জমিজমা পূর্ববৎ ভোগ করে যাচ্ছেন। অনেক জায়গায় কুকুর-বেড়ালের নামেও জমিজমা বেনামা করা হয়েছে। উপরন্তু কৃষিপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে প্রলুব্ধ হয়ে সমস্তর শহুরে ধনীও গ্রামাঞ্চলে জমিজমা কিনে খামার বসিয়েছেন। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদের অবৈধ প্রণয় ঘটতে সুরু করেছে। তার ফলে গ্রামের কৃষিজীবীরা ক্রমশই নিঃস্ব হতে বসেছেন। তার ফলে গ্রামের অসন্তুষ্ট কৃষিজীবীরা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসী সরকারগুলো যদি সরকারী আইন যথারীতি প্রয়োগ করতেন, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবেই গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্রের শেষ চিহ্ন বিলোপ করা যেতো। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টগুলো মূলত গ্রামের এই সম্পন্ন ভূস্বামী শ্রেণীর ভোটের জোরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হেতু তাঁরা তাঁদের বে-আইনী ক্রিয়াকলাপের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বহু রাজ্যে কুপোকাৎ হয় এবং কোন কোন রাজ্যে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাঁরা ভূমি সংস্কার প্রয়োগের চেষ্টা করেন এবং তাতে গ্রামাঞ্চলে নতুন আলোড়নের ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ আজ সারা ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের কৃষকদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন থামবে বলে মনে হয় না। দেশের শাসনভার যাঁদের উপর ন্যস্ত, তাঁরা এ-সম্পর্কে যত তাড়াতাড়ি সচেতন হন ততই মঙ্গল। নইলে অর্থমন্ত্রী চ্যবনের ভাষাতেই বলা যায়, ফসল বিপ্লব শেষ পর্যন্ত লাল বিপ্লবে পরিণত হবে এবং তাতে শুধু গ্রামের ভূস্বামী শ্রেণী নয়, সহরে ধনিক শ্রেণীর প্রাধান্যও অটুট থাকবে কি না কে বলতে পারে?

কেরালার আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচন

কেরালায় নির্বাচন স্থগিত রাখবার জন্য স্থানীয় বিরোধী কংগ্রেস কেরলা হাই কোর্টে এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দিল্লী হাইকোর্টে যে দুটি মামলা দায়ের করেছিলেন, তা খারিজ হয়ে গেছে। কাজেই সেপ্টেম্বরেই কেরালায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কেরালার বড় বড় পার্টিগুলো ইতিমধ্যেই তাঁদের প্রার্থী বাছাই শেষ করে ফেলেছেন। সি-পি-আইয়ের নেতৃত্বাধীন মিনিফ্রন্ট ৭৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। তাঁরা এই ৭৬টি আসন ছাড়া অন্য কোন কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। আসন ভাগাভাগি হয়েছে এইভাবেঃ সি-পি-আই—৩২, মুসলিম লীগ—২১, আর-এস-পি-১৪ এবং পি-এস-পি—৯। মিনিফ্রন্ট ভি-এম-কে দলের সঙ্গে কোন সমঝোতা করেন নি। কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) দলের সঙ্গে এঁদের যে বোঝাপড়া হয়েছে, অনুযায়ী এঁরা কংগ্রেসকে ৫৭টি আসন ছেড়ে দিয়েছেন। সি-পি-এম দলের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট

নিজেদের মধ্যে আসন ভাগাভাগি করেছেন এইভাবে: সি-পি-এম—৪৬, এস-এস-পি—১২, কে-টি-পি—৪, কে-এস-পি—৪। এছাড়া আই-এস-পি দলের সংগেও এঁদের ১০টি আসনে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে। আই-এস-পি দলের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীকুরুপ বলেছেন যে, তাঁর দল সি-পি-এম জোটের সংগে নির্বাচনী সমঝোতা করেছে বটে, তবে সেই জোটের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। তবে যে আসনে আই-এস-পি'র প্রার্থী থাকবে না, সেই আসনে তাঁরা উপরোক্ত জোটের প্রার্থীকে সমর্থন জানাবেন।

কেরালা কংগ্রেস (খৃস্টান প্রধান) সিন্ডিকেটের সংগে জোটবদ্ধ হয়েছেন। স্থানীয় সিন্ডিকেটের প্রেসিডেন্ট টি-ও-বাভা এবং কেরালা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট কে-এম-জর্জ এক যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা একটি অ-কমিউনিস্ট গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে তৃতীয় জোট হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

কেরালায় নায়ার সার্ভিস সোসাইটি নামে একটি শক্তিশালী সংস্থা আছে। এঁরা দাবী করেছেন যে, কেরালার ১ কোটি ভোটারের এক-পঞ্চমাংশের ওপর এঁদের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। নায়ার সার্ভিস সোসাইটি আসলে অব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কেরালার প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা (নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন) উচ্ছেদের ব্যাপারে এই সোসাইটির বৃদ্ধ নায়ক পদ্মনাভন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই ভোটারদের ওপর সোসাইটির প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। এঁরা ঠিক করেছেন যে, নির্দিষ্ট ২৭টি আসনে "গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো তাঁদের মনোমত প্রার্থী না দিলে তাঁরা সেখানে নির্দলীয় প্রার্থীদের সমর্থন করবেন। গণতান্ত্রিক পার্টি বলতে তাঁরা কাদের বোঝাতে চাইছেন, তা স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে সি-পি-এম, এস-এস-পি-আই এবং আর-এস-পিকে তাঁরা গণতান্ত্রিক পার্টি বলে গণ্য করেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাঁরা হয় সিন্ডিকেট জোট, না হয় ইন্দিরা কংগ্রেস দলের প্রার্থী ছাড়া আর কাউকে সমর্থন করবেন বলে মনে হয় না।

কেরালায় সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়েছে ১৭ই সেপ্টেম্বর। আর কেরালা বিধানসভায় আসনের সংখ্যা হচ্ছে ১৩৩টি।

একই দিনে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী স্বর্গত গোবিন্দ মেননের শূন্য আসনেও (লোকসভা) উপনির্বাচন হবে। মিনিফ্রন্টের সংগে সমঝোতা অনুযায়ী কংগ্রেস (ইন্দিরা) সেই আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবেন।

কেরালায় বিভিন্ন দল যেভাবে প্রার্থী দাঁড় করাচ্ছেন, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, নির্বাচনের পর সেখানে কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট গঠিত হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই নির্বাচনের পরই সেখানে যে ব্যাপকভাবে ফ্রন্ট ভাঙাভাঙি এবং দল ভাঙাভাঙির ব্যাপার ঘটবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে হয়।

সরকারী তালিকায় বেকারের সংখ্যা

গত সপ্তাহে লোকসভায় জ্যোতির্ময় বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রমমন্ত্রী ডি সঞ্জীবায়া বলেছেন যে, সরকারী তালিকায় (এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের খাতায়) গত ৩০শে জানুয়ারী বেকারের সংখ্যা ছিল ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার ৩ শত। তার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ২১ হাজার ৬৭৭ জন। ঐ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩২ হাজার। ১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত সেক্টরে চাকুরীজীবীর সংখ্যা ২২ লক্ষ ১০ হাজার।

গম সংগ্রহ

এ বছর ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ৩০ লক্ষাধিক টন গম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য সংগ্রহের লক্ষ্য ধার্য ছিল ৩২ লক্ষ টন। কাজেই লক্ষ্য শতকরা ৯৫ ভাগের বেশিই পূরণ হয়েছে।

এ বছর (১৯৬৯-৭০) চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ২৩ লক্ষ টন। তার মধ্যে ২০ লক্ষ টন চাল ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যের ৯০ শতাংশ পূর্ণ হয়ে গেছে।

গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী আমেদ বলেছেন যে, এ বছর যে রকম ফসলের পক্ষে অনুকূল বারিপাত হয়েছে, তেমন বহুকাল হয় নি। আসামে, অন্ধ্র, বিহার এবং কাশ্মীরের কোন কোন অঞ্চলে বারিপাতের অবস্থা ভাল না হলেও সাধারণভাবে যে বারিপাত হয়েছে, তাতে ফসলের ফলন ভাল হবে বলেই আশা করা যায়।

নিজের জালে শেখ আব্দুল্লা

কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লা নিজেকে সব সময়ই ধর্মীয় গোঁড়ামীর ঊর্ধ্বে বলে প্রচার করে থাকেন, কিন্তু আত্মপ্রচারের জন্য এবং ভারত বিদ্বেষী জিগির তোলবার জন্য তিনি সব সময়ই ধর্মীয় সংস্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়বার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে সমবেত হয়ে থাকেন। শেখ আব্দুল্লা এতকাল সেই সব ধর্মীয় সমাবেশে গিয়ে নিজের "স্বাধীন কাশ্মীরের" তত্ত্ব প্রচার করতেন এবং এখনও করেন। সেই সব সমাবেশে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা তাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। নিছক ধর্মীয় সমাবেশে এই ধরনের নোংরা রাজনীতি যে খুবই নিন্দনীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা এতদিন সম্ভব হচ্ছিল না। সম্প্রতি কাশ্মীরের ছাত্র সমাজই শেখের এই বিধি-বহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। গত ২১শে আগস্ট শ্রীনগরের হজরতবাল মসজিদে নামাজের পর শেখ আব্দুল্লা যথারীতি বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেন, সেই সময় রুখে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তার প্রতিবাদ করে। শেখ সাহেব তাদের ধমকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর ধমকে কর্ণপাত করে নি। তারা মুসলমান সমাজের ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য শুরু করে দেয়। শেখ সাহেব তখন তাদের বলেন যে, ধর্মীয় সভায় ধর্ম ছাড়া আর কিছু প্রচার করা চলে না। তখন ছাত্র-ছাত্রীরা বলে, "তাই যদি হয়, তাহলে আপনি রোজ এই ধর্মীয় সভায় এসে রাজনীতি প্রচার করেন কেন?" জবাব শুনে সেখ সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ। তিনি আর সেখানে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে সাহস পান নি। কাশ্মীরের মুসলিম ছাত্রদের এই গণতন্ত্র বোধ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। শুধু কাশ্মীরে নয়, ভারতের বহু এলাকাতেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচারকার্য হয়ে থাকে। তার বিরুদ্ধে দেশের যুব সমাজ যে ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছে, সেটা আশার কথা। ২৩।৮।৭০

রাষ্ট্রসংঘ :

ঔপনিবেশিক শাসন অবসানকল্পে গঠিত রাষ্ট্রসংঘ কমিটি '১৮ই আগস্ট' পর্তুগালের অধীন সকল দেশের স্বাধীনতার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছে।

কমিটির প্রস্তাবে 'ন্যাটো' জোটের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে : কোন প্রকার সামরিক অস্ত্র কিংবা ঔপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে, এমন কোন জিনিস পর্তুগালকে দেবেন না।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, পর্তুগাল 'ন্যাটো'র সদস্য।

কেবল 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর প্রতিই নয়, রাষ্ট্রসংঘ কমিটির প্রস্তাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, পর্তুগালের শক্তিবৃদ্ধির কাজে সহায়তা করা হয়, এমন কোন কাজ যাতে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী না করেন, তার জন্য প্রতি রাষ্ট্র উদ্যোগী হোন, নিজের নিজের দেশের নাগরিক ও কোম্পানীকে পর্তুগালের সংগে সহযোগিতা থেকে নিবৃত্ত করুক। বিশেষ করে প্রস্তাবে মোজাম্বিকে পর্তুগীজ শাসন বজায় রাখার চেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এখানে পর্তুগীজ সরকার কাবোরা বাসা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের যে কাজ সুরু করেছে, তার সংগে যেন কেউ সহযোগিতা না করে।

প্রস্তাবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়েছে, পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে মোজাম্বিক, অ্যাংগোলা, ম্যাকাও প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হল : পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অ্যাংগোলা ও মোজাম্বিকে পর্তুগীজ [illegible] ছাড়িয়ে গেছে। তাই রাষ্ট্রসংঘ কমিটিকে এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়েছে।

ভারত, আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, ইরাক, মালাগাসি, মালি, তানজানিয়া, সিয়েরা লিওন, তিউনিসিয়া ও যুগোস্লাভিয়া এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। কমিটির সভায় ১৪—২ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ইতালী ও নরওয়ে ভোটদানে বিরত ছিল।

'ন্যাটো'চক্রের অন্যতম অংশীদার পর্তুগালের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবে কি করে সায় দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেন? তা সে প্রস্তাব যতই যুক্তিসংগত হোক না কেন!

আর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি না চায়, তবে নিরাপত্তা পরিষদকে দিয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভব নয়। তবু, এই প্রস্তাবের গুরুত্ব রয়েছে। পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমতের চাপ এর ফলে আরও বাড়বে।

ইতালী :

রুমর মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর ইতালীতে যে মন্ত্রিত্ব সংকট সুরু হয়েছিল, তার অবসান ঘটেছে। রাষ্ট্রপতি সারাগাত এমিলিও কলোম্বোকে নতুন প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেছে।

কলোম্বো ইতালীয় প্রজাতন্ত্রের ৩২তম মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এমিলিও কলোম্বো রুমর মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রী ছিলেন। কলোম্বোর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি পুরোনো কোয়ালিশন সরকারের চারটি দলকেই আবার একত্র করে নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছেন। এই চারটি দল হল : ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি ও সোস্যালিস্ট পার্টি। সরকারের বিরোধী পক্ষ কমিউনিস্ট পার্টির সংগে সোস্যালিস্ট পার্টি আমব্রিয়া, টাসকানি ও এমিলিয়া রোমাগনার একত্র আঞ্চলিক সরকার গঠন করায় রুমর মন্ত্রিসভা ভেঙে গিয়েছিল। অবশ্য অর্থনৈতিক [illegible] সরকারের অংশীদার [illegible] মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। তাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের দিন [illegible] মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়।

চারটি দলকে একত্র করে তাদের মিলিত বক্তব্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এমিলিও কলোম্বো তাঁর সরকারের নতুন কর্মসূচী স্থির করেছেন। এই কর্মসূচী ভিত্তি ইতালীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে, চেম্বার অব্ ডেপুটিজ ও সেনেটে পেশ করেছেন। কলোম্বো পার্লামেন্টের আস্থাসূচক ভোটে জয়লাভ করেছেন।

কলোম্বো রুমর মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তাই ইতালীর বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে তাঁর এই 'মধ্য-বাম' মন্ত্রিসভা কি নতুন নীতি গ্রহণ করেন, তা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করে আছেন। তবে, ইতালীর অর্থনৈতিক সংকট যে রূপ ধারণ করেছে, তাতে বৈপ্লবিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে হয় না। দক্ষিণঘেঁষা মধ্যপন্থীরা যে সরকারে প্রধান অংশীদার, তাঁদের নিয়ে এমন কোন কাজ ইচ্ছা থাকলেও কলোম্বো করতে পারবেন না।

বৃটেন :

বৃটেনের নতুন রক্ষণশীল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন সম্প্রতি সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ঘুরে লন্ডন ফিরেছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে সিংগাপুর ও মালয়েশিয়ায় বৃটিশ প্রতিরক্ষা দায়িত্বের বিষয়ে এই সব দেশের নেতাদের সংগে আলোচনার জন্য ক্যারিংটনের এই সফর।

সুয়েজের পূর্বে কোন বৃটিশ সৈন্য থাকবে না। সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করেই রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম তা নাকচ করে দিয়েছেন। রক্ষণশীল সরকার এশিয়ায় তাঁদের সামরিক ঘাঁটি রাখতে চান।

মালয়েশিয়া, বিশেষ করে সিংগাপুর এই সিদ্ধান্তে খুশি।

তবে বৃটেন একক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায় না। তারা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকেও এর সংগে জড়িয়ে রাখতে চায়। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডেরও নিজস্ব নিরাপত্তার সমস্যা আছে।

আগামী মাসে এই চারটি দেশ ও বৃটেনের মধ্যে এক যুক্ত প্রতিরক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

(২২-৮-৭০)

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে আমার প্রতিবেদন পেশ করার আগে একটা কথা পরিষ্কার বলে নেওয়া দরকার। সেই কথা হ'ল এই—প্রতিবেদন যদিও পেশ করা হচ্ছে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সমীপে, কিন্তু লক্ষ্য শ্রীদাশগুপ্ত একা নন বা তিনি যে দলের নেতা সেই দল নয়। এই প্রতিবেদনের বক্তব্য সব দলেরই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল সকলেই আছেন শ্রীদাশগুপ্ত মহাশয়ের নামের আড়ালে। আমি শ্রীসুশীল ধাড়া বলতে যেমন একটি ব্যক্তির নাম বুঝি না, বুঝি পাতি বুর্জোয়া সোস্যাল ডেমোক্রাট রাজনীতির প্রতীকরূপে, তেমনি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলতে বুঝি বামপন্থী, উগ্র রাজনীতির প্রতীকরূপে। এছাড়া আরো একটা কারণও আছে শ্রীসুশীল ধাড়া ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের নাম দুটি ব্যবহারের মধ্যে। এই কারণ হ'ল রাজ্যের রাজনীতির বর্তমান সময়ে নিয়ামক শক্তি হ'ল দুইটি প্রধান ধারা—একটি ধারার ষ্টীয়ারিং ধরে আছেন শ্রীদাশগুপ্ত—অন্যটির ধরে আছেন শ্রীধাড়া। মাঝে অন্য যাঁরা আছেন—তাঁরা মূলত দাদা ধরে আছেন অথবা মিশনারী মিশনে রয়েছেন।

মিশনারী মিশন হ'ল—যথা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বা শ্রীঅশোক ঘোষের রাজনীতির বর্তমান লক্ষ্য হ'ল সি পি এম-কে সঠিক রাস্তায় আনতে বাধ্য করা। সি পি এম তার আগ্রাসী মনোভাব ত্যাগ করবে, ভাল ছেলে হবে, তারপর সেই গুড বয় সি পি এম-কে নিয়ে তাঁরা ফ্রন্ট করবেন। আবার এঁদের একই মনোভাব বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে। বাংলা কংগ্রেসও ভাল ছেলে হয়ে তাঁদের হাত ধরবে, সঙ্গে চলবে, কংগ্রেসের দিকে ফিরে তাকাবে না। অর্থাৎ এই মধ্য মার্গের দলগুলির মূল লক্ষ্য হল—তাঁরা এক হাতে ধরবেন সি পি এম-কে, অন্য হাতে বাংলা কংগ্রেসকে—তারপর দুই পক্ষকে নিয়ে ওঁরা এগিয়ে যাবেন। এই পরিস্থিতি ও মূল্যায়নের ভিত্তিতেই আমার প্রতিবেদন শ্রীসুশীল ধাড়ার উদ্দেশ্যে—শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে।

একদা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একান্ত আশা-ভরসার প্রতীক যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছিল শরিকী সংঘর্ষ ও ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনির সূচনায়। আজ সেই খুনোখুনি, মারামারি সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাজ্য জঙ্গলের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই জঙ্গলের রাজ্য সম্পর্কে—নিত্যদিনের গুপ্ত বীভৎস হত্যাকান্ডে বিচলিত হয়ে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীসুশীল ধাড়া দুই রকমের দাওয়াই বাতলাচ্ছেন। শ্রীসুশীল ধাড়া বলেছেন—মিলিটারী ডেকে সব ঠান্ডা কর, মিলিটারী ছাড়া পথ নেই। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলছেন—হরতাল-ধর্মঘট-বাংলা বন্ধ ও প্রশাসন অচল করেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। শ্রীধাড়ার মিলিটারী ডাকার প্রসঙ্গ নিয়েই গত সপ্তাহে আমার প্রতিবেদন রেখেছি, তাই প্রতিবেদন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে।

রাজ্য রাজনীতি আজ চলছে জোর-জুলুম, খুন-খারাপি, ভীতি প্রদর্শনের পথে। একটা বোমা, একটা বন্দুক, একটা ছোরা যে কোন সময়ে যে কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিতে পারে। মানুষকে আজ সম্পূর্ণ এক অনিশ্চিত ভবিতব্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। মানুষের মৃত্যু আজ আর কোন ঘটনা নয়—দুর্ঘটনা মাত্র। সম্প্রতিকালে যে নৃশংস হত্যাকান্ডগুলি ঘটেছে, সেইগুলিকে সঠিক বিবরণে ছাপালে সেই বিবরণ কোন মানুষ নার্ভ ঠিক রেখে পড়তে পারবে না। আজ সমাজে নিরাপদ মাত্র দুই শ্রেণী—এক শ্রেণী, যারা হাতে বোমা, পিস্তল, পাইপ গান, ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর নিরাপদ হল সে সব ব্যক্তি, যাঁদের পিছনে ছায়ার মত সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষ পাহারা দেয়। যারা পাহারা দেয় তাদের হাতেও অস্ত্র থাকে। অতএব আজ বেঁচে থাকবার অধিকারী একমাত্র তারাই—যাদের হাতে অস্ত্র আছে অথবা যাদের পিছনে অস্ত্রের পাহারা আছে।

এইবার প্রশ্ন করি শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক ঘোষ ও সর্বোপরি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে—কোন্ রাজনীতি আপনারা করছেন, যে রাজনীতির ফল হ'ল মানুষের জীবনের মূল্য কানাকড়ি নয় এই স্তরে পৌঁছানো, জীবনের নিরাপত্তা যেখানে থাকে না, সেখানে কোন বিচারের প্রশ্নও থাকে না! তাহলে জীবনের মূল্য থাকবে না, বিচারের আশা থাকবে না, অপরাধীর সাজা থাকবে না—এই সমাজই কি আপনাদের কাম্য? রাজ্যে সংগঠিত কেতাদুরস্ত দপ্তর লক্ষ-অর্ধ লক্ষ সদস্যে গর্বিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এক ডজন। এই দলগুলির কাছে বর্তমান অবস্থা যদি অসহনীয় হয়, তবে কেন প্রতিরোধ হয় না? প্রতিরোধ দূরে থাক, যদি প্রশ্ন করা যায় ওই সব ঘটনার পিছনে কারা আছে—তারা কি সবাই সমাজবিরোধী? সমাজবিরোধীমুক্ত সমাজ কোনদিন ছিল না, কিন্তু সমাজবিরোধীরা কোনদিন তো এইভাবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারে নি, সমাজবিরোধীদের হাতে এত পরিমাণ রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু ঘটে নি।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন থেকে প্রতিহিংসায় রূপ নিয়েছে এবং প্রতিহিংসা পূরণে যখন থেকে জোর-জুলুম, খুন-খারাপিকে পথ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন থেকেই ধীরে ধীরে রাজনীতির তত্ত্বের সঙ্গে ছোরা-পিস্তল-বোমা-বন্দুক এসেছে। প্রমোদবাবু আপনি কি এই বিশ্লেষণে একমত হবেন? আপনার দলের প্রায় একশত সভ্য, সমর্থক কর্মী এইভাবে গুপ্তহত্যায় বা রাজনৈতিক হত্যায় নিহত হবার পরও কি আপনার মনে এই প্রশ্নে কোনপ্রকার দ্বিমত দেখা দেবে? এই একই কথা শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জী ও শ্রীঅশোক ঘোষও মেনে নেবেন নিশ্চয়ই, কারণ ১৯৬৭ সালের পর এই জাতীয় হত্যায় সব দলেরই কর্মী মরেছে। এই জোর-জুলুমের রাজনীতি কিন্তু শুরু হয় বেশ অহিংস পথে। একদা শান্তিপূর্ণভাবে কোন ব্যক্তিকে দৈহিকভাবে আটক রেখে এই রাজনীতি সুরু হয়—তারপর দৈহিক আটক অত্যাচারে রূপ নেয়। যেমন প্রথমে দাবী আদায়ের জন্য কাউকে ঘেরাও করা হল। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও চলবে: এই ঘেরাও-এর ব্যক্তি স্কুলের হেডমাষ্টার হতে পারেন, মিলের ম্যানেজার হতে পারেন, রেলের গার্ডও হতে পারেন। তারপর এই ঘেরাও ধীরে ধীরে নির্যাতনের রূপ নিল, ঘেরাও কর, জল খেতে দেওয়া হবে না, মলমূত্র ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না। এইভাবে সুরু হল জোর জুলুমের রাজনীতি, যা রাজ্যকে আজ এখানে এনেছে। এই কথা তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলেও নিত্যদিনের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপরীত যুক্তি অনেক আছে নিশ্চয়ই। শোষণ বঞ্চনা, অবিচার মানুষকে নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্ত করেছে, কিন্তু বিক্ষোভকে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেওয়াই তো রাজনৈতিক দলের কর্তব্য। মানুষের বিক্ষোভ যাতে বিপথে চালিত না হয়, বিক্ষোভ যাতে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে—সেই নেতৃত্ব দেওয়াই তো

বিপ্লবী আদর্শের রাজনৈতিক দলের কর্তব্য।

আমার প্রশ্ন—সেই কর্তব্য কি পালন করা হচ্ছে? বেলগাছিয়া দুধের কেন্দ্রের উপর কলকাতার হাজার হাজার শিশু-রোগী-প্রসূতির জীবন নির্ভর করে। সেই দুধের কেন্দ্রের শ্রমিকদের যে কোন মামুলি দাবিকে কেন্দ্র করে আকছার দুগ্ধ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ব্যক্তিবিশেষ কয়েকজন কর্মীর প্রতি অন্যায়-অত্যাচার হ'ল, কিন্তু তার জন্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব রেলের বিরাট অংশ সাতদিন বন্ধ থাকলো: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উত্তরবঙ্গ আসাম বন্ধে থেকে যাত্রীদের দুর্গতির এবং অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও ৭০ টাকা মণের পাট কৃষকরা ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রি করলো। আদ্রায় রেল কর্মচারীরা অতি তুচ্ছ কারণ উপলক্ষ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেল ক'দিন বন্ধ রইল। সেই বন্ধের ক্ষতির কি কোন হিসাব করে দেখা হয়েছে? একজন বা কয়েকজন রেল কর্মচারীর দাবি বা নিগ্রহের সঙ্গে এই রেল বন্ধের ক্ষতির কি কোন তুলনা হতে পারে? বহু আলোচিত দুর্গাপুরের কথাই ধরা যাক। কয়েকজন কর্মী, সেই সঙ্গে শ্রীদিলীপ মজুমদারকে ধরা হলো। খুব অন্যায়ভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার ও আটক রাখা হয়েছে, কিন্তু সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে যেসব ঘটনা ঘটছে অর্থাৎ দুর্গাপুরের হাজার হাজার কর্মী ধর্মঘট করে যে মূল্য দিল, তার চেয়ে কয়েকজন কর্মীর আটক থাকায় মূল্য কি বেশি? আমি জানি মূল্যের হিসাব সেইভাবে হয় না। জানি প্রতিবাদ নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তবু দেশে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার-আটক শ্রীদিলীপ মজুমদার কি প্রথম হয়েছেন এবং এই কথা বলতে পারবেন কেউ যে, দুর্গাপুরের এই আন্দোলন শেষ হলে আর কোন অন্যায়-ভাবে গ্রেপ্তার করা বা আটক করা হবে না, এই আন্দোলনের পর অত্যাচারী বা অন্যায় প্রশাসনের শেষ হয়ে যাবে?

জানি সেই কথা সত্য নয়। খণ্ড খণ্ড আন্দোলনে শিশুদের-রোগীদের দুধ বন্ধ হতে পারে, হতে পারে দিনের পর দিন রেল বন্ধ—যার ফলে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কষ্ট হবে, ৭০ টাকার পাট ৩০ টাকায় বিক্রি হবে। দুর্গাপুর বন্ধ হবে, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হবে, মানুষের কাজের দিন নষ্ট হবে—তার বেশী কতটা হবে।

আজ প্রশ্ন—এই পথেই কি রাজ্যে শান্তি আসবে? এই পথেই কি বিপ্লব আসবে? এই পথেই কি সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র আসবে? শ্রীসুশীল ধাড়া মিলিটারী এনে সব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্যেরা সেই মিলিটারী আসা বন্ধ করবেন কি এই পথে? এই পথই কি সবচেয়ে প্রশস্ত ও শান্তিপূর্ণ পথ? পথ প্রশস্ত কিনা তার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। পরন্তু যা দেখা যাচ্ছে, সে হ'ল রাজ্যে সি আর পি আমদানী ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সি আর পি আজ শুধু মানুষ মারা নয়, শহীদ বেদী ভাঙছে—শহীদ বেদীর উপর প্রস্রাব করতে আদিষ্ট হচ্ছে। সি আর পি অত্যাচার করে পার না পেলেই মিলিটারী ডাকা হবে—পশ্চিমবঙ্গ সেই মিলিটারী আগমনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে আছে। তাই প্রশ্ন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের মাধ্যমে রাজ্যের বামপন্থী দলের উদ্দেশে। যে পথে রাজ্য চলছে, এই পথই কি সঠিক পথ? আজ কি সময় আসে নি, সকলকে ডেকে বসে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং বলবার—দেশ আমাদের, রাজ্য আমাদের, আমরাই দায়িত্ব নেব শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার, সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার। মিলিটারী আসতে দেব না, সি আর পিকে রাজ্য থেকে বিদায় দেব।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

ছাম সমস্যা
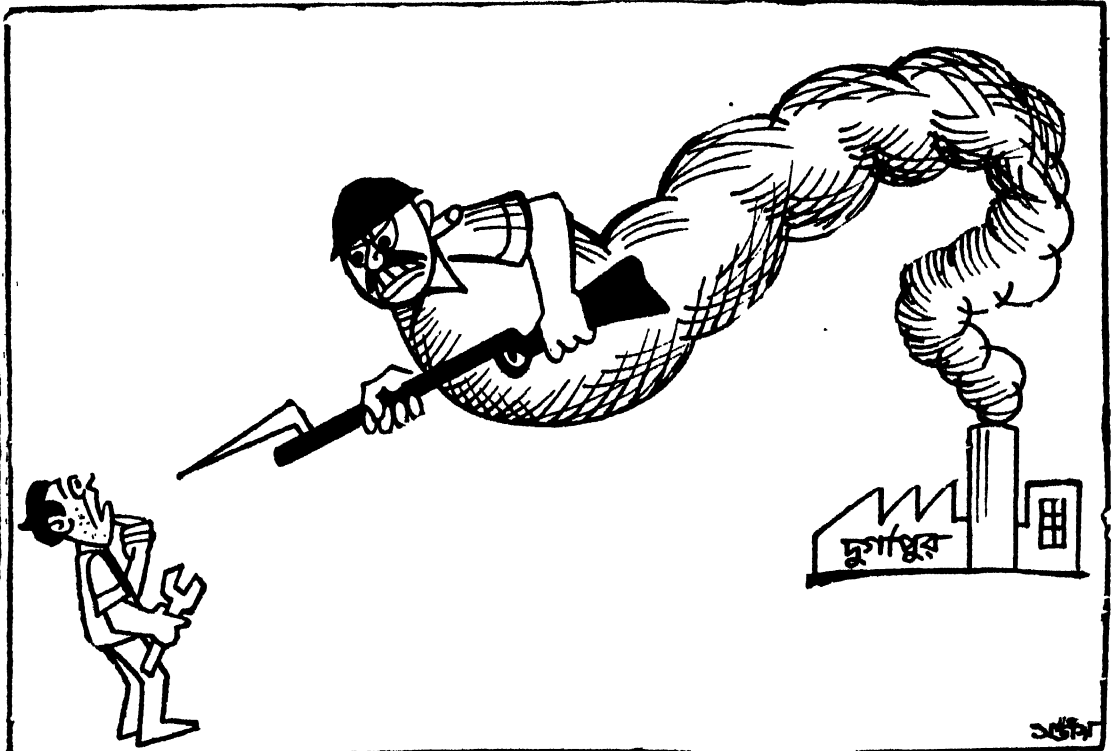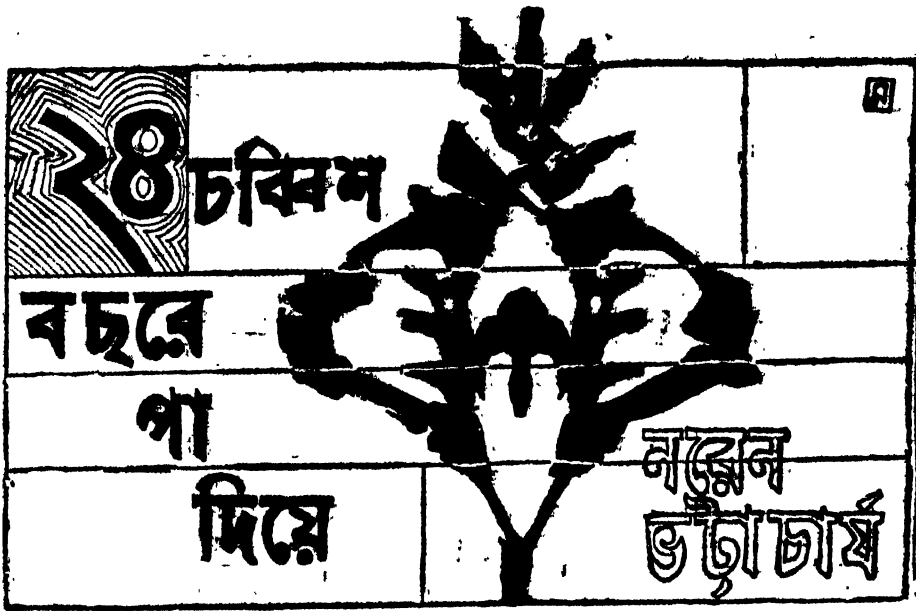
॥ ১ ॥

"অবস্থা অতি শোচনীয়" এই একটি-মাত্র বাক্যেই বিগত দু'সংখ্যায় যা লিখেছি তার সারমর্ম করা যায়। কিন্তু এ লেখার সার্থকতা কি আছে, যদি অন্ধকারের মধ্যে আলোর বিন্দু খোঁজার চেষ্টা না করা হয়? আর তা ছাড়া পূর্বে যা বলেছি, তা ত' নিছক আমার ধারণা-প্রসূত এবং লিখতে লিখতে আমার মনে হয়েছে যে, আলোচনার ধারাকে যদি বিষয়ভিত্তিক না করা হয়, তাহলে তার কোন মূল্য থাকে না। আর সমস্যা-গুলিকে ভাল করে উপলব্ধি করতে না পারলে, সমাধানের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই 'আগামীবারে সমাপ্য' লিখে দিয়েও সমাপ্তি শেষ পর্যন্ত ঘটানো গেল না।

উগ্রপন্থী রাজনীতির সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান সকলেরই টনক নড়িয়ে দিয়েছে এবং সবচেয়ে বেশি তা ঘা দিয়েছে বাম-পন্থী নেতাদের, যাঁরা মুখে বিপ্লবের কথা বললেও কার্যত কর্মধারার দিক দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের ছত্রচ্ছায়ায় থাকাটাকেই আপাতত শ্রেয় বোধ করছেন। কারা ঠিক, কারা ভুল সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, এ বিষয়ে আমার নিজস্ব কিছু বক্তব্য আছে—যা পরবর্তী একটি রচনায় পেশ করব। এক্ষেত্রে যা বক্তব্য তা হচ্ছে এই যে, উগ্রপন্থী রাজনীতি আজ ভারতবর্ষের সমগ্র রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সামনে চ্যালেঞ্জস্বরূপ উপস্থিত হয়েছে। বিগত তেইশ বছরে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে অসাম্য, অবিচার ও শোষণ দিনের পর দিন বর্ধিত হয়েছে এবং যে সব রাজনৈতিক মতবাদ, বিশ্বাস ও আচরণসমূহ এই দুরবস্থাকে লালন-পালন করেছে, সেগুলির সামনে নক-শালপন্থী রাজনীতি একটি চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ। বর্তমানে দু'টি ক্ষেত্রে এই রাজনীতির ক্রিয়াকলাপ অনেকেরই চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। একটি হচ্ছে ভূমি, অপরটি হচ্ছে শিক্ষা। বর্ত-মান নিবন্ধে ভূমি প্রসঙ্গই আলোচিত হবে।

॥ ২ ॥

১৯৪২ সালে মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিসারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন যে, ভূমিহীন চাষীর পক্ষে জমিদারের জমি দখল করাতে কোন অন্যায় নেই এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ওই ভূমিহীন চাষীদের পক্ষেই যেতে হবে, জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বলা বাহুল্য, তথাকথিত গান্ধীশিষ্যেরা এই গুরুবাক্যটিকে সযত্নে আড়াল করে রেখে-ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকগুলিতে ভূমিসংস্কারের কথা মাঝে মাঝে উঠত, এ বিষয়ে গালভরা প্রস্তাবও নেওয়া হত। কিন্তু কার্যত কিছুই করা হত না। কারণ কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন প্রচুর ভূমির মালিক। সবচেয়ে মজার কথা, স্বাধীন ভারতে যখন একটা লোক-দেখানো ভূমিসংস্কার আইন পাশ হল, যখন জমির ঊর্ধ্বতন সীমা বেঁধে দেওয়া হল, যাঁরা যে রাজ্যে এই আইন পাশ করলেন, তাঁরা নিজেরাই সর্বপ্রথম আইনভঙ্গ করে প্রচুর উদ্বৃত্ত জমি দখলে রাখলেন, যথা মহারাষ্ট্রের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি পি নায়েক, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম আর সুখাড়িয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ ভূমিসংস্কার আইন নিছক লোক-দেখানো ছিল, তা যে কোনদিন কার্যকর করা হবে, একথা কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি। জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হল, কিন্তু ইচ্ছা করেই তার পূর্বে ভূমি হস্তান্তর নিরোধ আইন পাশ করা হল না। তার ফলে সিলিং-বহির্ভূত সকল জমিকেই বেনামা করার সুযোগ দেওয়া হল। আর সেই সুযোগে যে ছেলে জন্মায় নি তার নামেও জমি বরাদ্দ হয়ে গেল। ভূমিসংস্কারের নাম করে ভূমিহীন কৃষকের নাকের ডগায় অপক্ক কদলী জোড়ায় জোড়ায় প্রদর্শন করা হল।

নকশালবাড়িতে জমি দখল ও জোত-দার খুনের আগে ক' কাঠা জমি ক'জন কৃষক পেয়েছে? সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হয়েছে, আর সাতষট্টিতে যে আগুন নকশালবাড়িতে জ্বলল, আর তার স্ফুলিংগ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখনই শুরু হল রীতিমত সোর-গোল। বোঝা গেল যে, নকশালপন্থীদের আন্দোলন যতই হিংসাশ্রয়ী হোক না কেন, এই আন্দোলনের মূলে রয়েছে একটি ন্যায্য দাবি—বেনামী জমি রাখা চলবে না, উদ্বৃত্ত জমির মালিকানা ভূমি-হীনদের দিতে হবে। কেন্দ্র তখনো বধির, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন রাজ্যের অকংগ্রেসী সরকারগুলির শরিক-দলসমূহের মধ্যে সংহতির অভাব দেখে দলভাঙানি রাজনীতির মহড়া দিচ্ছে। কিন্তু বামপন্থী দলগুলির পক্ষে এ

বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা আর সম্ভবপর হল না, কেন না ক্ষমতা পাবার আগে তারাও এ ধরনের কথা বলে এসেছে এবং এ বিষয়ে সক্রিয় না হলে বামপন্থী দল হিসাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ফলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকারের সমর্থনে বেনামী জমি দখলের কাজ শুরু হল। বলাই বাহুল্য, জোতদার পক্ষ এক্ষেত্রে নতি স্বীকার করল না, স্থানে স্থানে সংঘর্ষ দেখা দিল, জমি দখলকে কার্যকর করতে গেলে যা অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। কেন না এমন বাপের সুপুত্তুর খুব কমই আছে যে, এতদিনের ভোগ করা সম্পত্তিকে বিনা বাধায় ছেড়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে রব উঠল আইন গেল, শৃংখলা গেল, অথচ গত বিশ বছরে আইন-শৃংখলার ভক্তদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। জমিদারী বিলোপ আইনকে ফাঁকি দিয়ে যখন গ্রামাঞ্চলের জোতদারেরা লাখ লাখ একর পরিমাণ জমি বেনামী করে চাষীদের ফাঁকি দিয়েছিল, তখন আইন-শৃংখলাওয়ালাদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এই একটি সৎকাজ শুরু হচ্ছিল, বহু একর বেনামী জমি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছিল. কিন্তু দুটি কারণে তার কোন সুফল পাওয়া যায় নি। একটি হচ্ছে শরিকী সংঘর্ষ যা ভূমি দখল আন্দোলনকে বহুলাংশে ব্যাহত করেছিল, যেটাকে এড়াতে পারলে এতদিনে নিশ্চয়ই সকল বেনামা জমি উদ্ধার হয়ে যেত। যৌথ প্রচেষ্টা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত, শরিকী সংঘর্ষ তাতে বাদ সাধল এবং তা ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র মালিকদের হাতে যুক্তফ্রন্ট বিরোধী প্রচার চালাবার একটি শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিল। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যাওয়া। যে সব বেনামী জমি দখল করা হয়েছিল এবং যে সব ভূমিহীন কৃষকেরা সেই সব জমিতে চাষবাস শুরু করেছিল, তাদের সেই সব জমির ওপর আইনসঙ্গত অধিকার দেবার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় থাকা প্রয়োজন ছিল। এবং সেটা না হবার ফলে, যার জন্য প্রত্যেকটি শরিক দলই অল্পবিস্তর দায়ী. বর্তমানে আবার সেই উদ্ধার করা বেনামী জমিগুলিকে পূর্বতন অধিকারীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে. যে আশংকাটা অনেক আগেই করা হয়েছিল।

॥ ৩ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন প্রথম ইউরোপ থেকে মানুষ গিয়ে বাসা বাঁধতে শুরু করে, সেই সময় যাতে বহু মানুষ আমেরিকায় যেতে এবং স্থায়ীভাবে বাস করতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য দরাজ হাতে জমি দেওয়া হয়েছিল, আমার ঠিক পরিমাণটা মনে নেই, মাথাপিছু ২৫০ একরের মত। সেই হিসাবে আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু লোকেরই জমির মালিক থাকা উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জমি আজ মুষ্টিমেয় কয়েকজনেরই করতলগত। এর কারণ একটিই। ভূমির ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির প্রবেশ। বৃহৎ পুঁজির এই অনুপ্রবেশের স্বপক্ষে পুঁজিপতিরা কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল 'সবুজ বিপ্লবের' যুক্তি। বলা হয়েছিল যে, উৎপাদনবৃদ্ধি ও শস্যের উৎকর্ষের জন্য কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন বিস্তৃততর কৃষিক্ষেত্র। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন পুঁজিপতি প্রথমে কয়েকটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর পত্তন করে এবং হাজার হাজার একর জমি নিয়ে তাদের ফার্ম গড়ে ওঠে। এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ছোট জমির মালিকেরা অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জমি মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতির হাতে চলে আসে। মার্কিনী ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটাই নাকি আসল ভূমিসংস্কার! আর এর সার্থকতা প্রমাণে তারা ফলন বৃদ্ধির যুক্তি দেখায়! ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ঠিক এইভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতি সমগ্র জমির মালিক হয়ে বসে আছে।

ভারতবর্ষেও ভূমিসংস্কারের নামে ওই একই মার্কিনী নীতির আমদানী করা হয়েছে এবং উৎপাদনবৃদ্ধির অজুহাতে দেশের সমগ্র জমির মালিকানা পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত দীর্ঘকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে। যেখানে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই মাথাপিছু জমির ঊর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে. সেখানে বিড়লারা পঞ্চাশ হাজার একর জমি রাখতে পারে কোন্ অধিকারে? বিড়লাদের খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এরকম কত পুঁজিপতি কত লক্ষ একর জমি হাতিয়ে নিয়ে বর্ণচোরা আমটির মত ভারত সরকারের সাধের 'সবুজ বিপ্লবের' নীট ফল পকেটস্থ করছে, তার খবর কে রাখে? পাঞ্জাবের রূপার গ্রামটি যখন বিড়লারা নিল, সে তো বেশিদিন পূর্বের ব্যাপার নয় (সেই বিষয় নিয়ে আমি বোধ হয় এই সাপ্তাহিক বসুমতীতেই লিখেছিলাম), তখন তাদের সেই দখল করার ব্যাপারে সরকারের সহযোগিতা ছিল লক্ষ্য করার মত। সেই গ্রামের কয়েক সহস্র বাসিন্দাকে জোর করে উচ্ছেদ করা হল (তারা আজ ভারতের জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। আমাদের 'পবিত্র সংবিধান' ধনীদের সম্পত্তি রক্ষার মৌলিক অধিকার স্বীকার করেছে, কিন্তু দরিদ্রকে তার দু'বিঘা জমি আর কুঁড়েঘর থেকে উচ্ছেদ করলে মৌলিক অধিকারে হাত দেওয়া হয় না!), সমগ্র গ্রামটিকেই ধুলায় মিশিয়ে দেওয়া হল, বিড়লাদের ট্রাক্টর আর বুলডোজার কয়েক মুহূর্তেই সেই কর্ম নিষ্পন্ন করল। উদ্দেশ্য মহৎ। উৎপাদন তো বাড়বে! তার জন্য হাজার হাজার মানুষ যদি উদ্বাস্তু হয়ে যায় ক্ষতি কি! "গেছে গুটিকতক জীর্ণ কুটির, কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর, কত ধন যায় রাজমহিষীর এক প্রহরের প্রমোদে?"

॥ ৪ ॥

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভূমির ক্ষেত্রে এই বিপজ্জনক সম্ভাবনাটির দিকে যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন, যদিও তাঁর নামকরা ভক্তরা এই সব বিষয় নিয়ে মাতামাতি করতে চান না, তাঁরা কবিগুরুকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরূপে দেখতে পেলেই খুশি। আমি এখানে ভূমি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করছি. পরিসরের অভাবে উদ্ধৃতি দেব না, তবে যদি কেউ চান তো মূল থেকে তাঁর রচনাংশ উদ্ধৃত করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন জমিদার ছিলেন এবং জমিদার-জোতদারেরা কিভাবে চাষীকে ঠকিয়ে তার জমি অপহরণ করে তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকের জোতদাররা যে হাজার হাজার বিঘা জমির বেনামী দখলদার হয়ে বসে আছে, তারা সেই জমি পেল কোথা থেকে? পরের জমি আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা তো আজ থেকেই নয়। মুখ্যত তিনি দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে কৃষকের ঋণগ্রস্ততা। সে যা উৎপন্ন করে তা বেচে তার পেট চলে না, আরও নানা রকম দায়-অদায় আছে, কাজেই সে ঋণ করতে বাধ্য। সকল ক্ষেত্রেই জমি বন্ধক পড়ত এবং চক্রবৃদ্ধি হারে চড়া সুদ মিটিয়ে সেই জমি পুনরায় ফিরিয়ে নেবার কোন উপায় থাকত না। অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতা জমিদার বা জোতদার জমি বিক্রির বন্ডই লিখিয়ে নিত. অমুক সময়ের

অপ্রতিহত

মহেন্দ্র নাথ

কোনো এক, রিক্ত সন্ন্যাসীর, উদাত্ত আহ্বানে—
প্রতিজ্ঞা যেন বজ্রমুষ্টির মত।
তার অপ্রতিহত দুর্বার স্রোত—
সজীবতার নেশা যেন ধরিয়ে দিলো
ভাঙা বাংলার তারুণ্যের গায়ে।

যে মাটির অর্থে ভালোবাসা অগাধ
সেই মাটির, একটি মানুষকেও
চিনতে বিলম্ব হয় আজ।

মহারাজ সেই-ই,
একই ভারতবর্ষের, একই বাংলার রূপ সৌন্দর্যে
যে বার বার মগ্ন স্বকীয় স্বপ্নে,

স্বার্থবাদের কান্নায় খোঁজেনি যে একক স্বর্গসুখ
বরং মুক্তির কাঠামোয় উদ্দীপ্ত আলো জ্বালার
প্রয়াস যার বার বার।

ছাড়পত্রের বেড়া তুলতে যে অক্লান্ত যোদ্ধা,—!
উদ্যোগের বাণী ছড়ায়,
সে রিক্ত, এক, সন্ন্যাসী মহারাজ—
নিঃসঙ্গ নয়।

তবু যদি কালের হাওয়ায় নিঃস্বার্থবাদ—
না আসে, না আসে, আত্মার পরিশুদ্ধি....,
তবে এ গান, আমার অপরাজের নয় বন্ধু
এই আমি শেষ মানবিক;—জানবো।

মধ্যে সুদ সমেত ঋণ মেটাতে না পারলে জমির উপর অধিকার থাকবে না—এই রকম চুক্তি। অনেকে আবার সোজাসুজি কৃষকের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে প্রবঞ্চিত করত। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি ছিল গায়ের জোরে দখল, কারণ জমিদার-জোতদারেরা জানত যে তা একবার করতে পারলে আদালতে মামলা করে নিজের অধিকার ফিরে পেতে তার সাতপুরুষ কেটে যাবে, আর তার ব্যয় যোগাতেই তার ভিটেমাটি উচ্ছন্ন হবে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি অতি বাস্তব পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে, কৃষকের জমি হস্তান্তর করার ক্ষমতা আইনের দ্বারা বেশ কিছুকালের জন্য নিষিদ্ধ করা হোক এবং পূর্বে যে জমিগুলি কৃষকেরা অভাবে পড়ে হস্তান্তর করাতে বাধ্য হয়েছে, সেগুলি ফেরৎ দেওয়া হোক। তাঁর বক্তব্য, রাজপথে হাঁটার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু যানবাহনবহুল রাজপথে শিশুর একা হাঁটার অধিকারকে স্বীকার করে নিলে তার গাড়ি চাপা পড়াটা রোধ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কৃষি যাতে লাভজনক বৃত্তি হয়ে ওঠে এবং সরকারী প্রচেষ্টা যাতে সেই দিকে চালিত হয়, এটাও তাঁর দাবি ছিল। কেন না, তাঁর মতে, আমাদের উত্তরাধিকার প্রথা এবং আরও নানা কারণে জোতের পরিমাণ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। বন্ধক দিয়ে, বিক্রি করে চাষীর জমির পরিমাণ আরও কমে যায়, যার ফলে চাষটা আর লাভের ব্যাপার থাকে না, খরচ ওঠে না, সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয় না, এমন কি বছরের খাদ্যটাও ঘরে আসে না। এমতাবস্থায় চাষী জলের দরে জমি বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্রনাথের সময়ে, আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে কৃষকদের ওই জলের দরে বেচা জমি কেনার প্রবণতা শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে প্রচুরভাবে দেখা দিয়েছিল। যারা শহরে চাকরি-বাকরি করত এবং বসবাস করত, তাদের মধ্যে এই জমি কেনার হিড়িক ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। এটা রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত হয় নি। কেন না, তাঁর মতে, এতে উৎপাদন ব্যবস্থার কোন হেরফের হয় না। কারণ এখানে জমি কেনার উদ্দেশ্য কৃষিকাজ নয়, কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগ নয়, কৃষিকে লাভজনক করে তোলা নয়, যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে বজায় রেখে খোদ শহরে বসেই চাষীর পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসলের কিছুটা ভাগ নেওয়া। এই দেখে তিনি খুব সঙ্গতভাবেই অনুমান করেছিলেন যে, যে সব শহুরে ভদ্রলোকেরা গ্রামে জমি কিনছেন এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁরা তা কিনছেন, তা স্থায়ী হবে না, তাঁরা শেষ পর্যন্ত গ্রামে নিজেদের জমিকে ধরে রাখতে পারবেন না, বিক্রী করে দিতে বাধ্য হবেন। কারা সেই জমি কিনবে? গ্রামবাসীদের তো আর ক্রয়ক্ষমতা নেই, আর শহরবাসী ভদ্রলোকেদের স্বশ্রেণী তো ততদিনে গ্রামের জমি সম্পর্কে মোহমুক্ত। ফলে এবারের যারা ক্রেতা তারা হচ্ছে মাড়োয়ারী।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন, এই যে শহুরে বেনো জল গ্রামে ঢুকছে, তার উপর নৌকা বেয়ে গ্রামে ঢুকবে মাড়োয়ারী অর্থাৎ পুঁজিপতিরা এবং তারা জানে কিভাবে মুনাফা তুলতে হয়। কালক্রমে দেখা যাবে, সারা দেশের কৃষিক্ষেত্রে মাড়োয়ারীদেরই জয়েন্ট স্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হবে, সমগ্র জমি কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোকের সম্পত্তিতে পরিণত হবে। তাতে হয়ত উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের একমাত্র প্রকৃত সম্পদ, অর্থাৎ ভূমি, তা এক বিঘা, দু' বিঘা যেটুকুই হোক না কেন, তা থেকে বঞ্চিত হবে। সর্বভারতীয় দৃষ্টিতে দেখলে সেই লক্ষণই কি চোখে পড়ে না?

॥ ৫ ॥

কাজেই ভূমির ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশ রোধ করাই সেই সরকারের একমাত্র কর্তব্য—যে সরকার আদর্শ হিসাবে সমাজতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করে। দুটি উপায়ে তা করা সম্ভব। প্রথমটি হচ্ছে, সমস্ত জমির রাষ্ট্রীয়করণ—যা সোভিয়েট রাশিয়ায় হয়েছে। কিন্তু তা করতে গেলে কেন্দ্রে একটি অতি শক্তিশালী, সর্ববিষয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী একটি কমিউনিস্ট সরকারের প্রয়োজন। কিন্তু সে বহুতে দূরস্থান। পশ্চিমবঙ্গে বাম-শক্তির প্রভাব দেখে বিচার করলে তো আমাদের চলবে না। খোদ রাজধানী দিল্লীতেই দেখেছি, কম বয়সী যুবক-যুবতীরা, যে বয়সে মানুষ সবচেয়ে বেশি বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন হয়, 'গো হামারা মাতা হ্যায়'—এই শ্লোগান সহ বিরাট মিছিল বার

[৫৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বাইশ ॥

সাবিত্রী বললে, 'কী হল, মুখের চেহারা ও-রকম কেন?'

'এক গ্লাশ জল দাও, তারপরে বলছি।'

'চা খাবে?'

'না—দরকার নেই। মুকুলের পাল্লায় পড়ে বড়ো এক পেয়ালা গ্রীণ টী খেয়েছি। চায়ে উৎসাহ নেই আর। জলই আনো।'

জল নিয়ে এল সাবিত্রী। এক চুমুকে শেষ করল গ্লাশটা।

'কী হয়েছে তোমার?'—একটা স্নিগ্ধ উৎকণ্ঠা নিয়ে সাবিত্রী প্রবীরের দিকে চাইল।

'বলছি। তুমি কখন ফিরেছ কলেজ থেকে?'

'আজ ক্লাস হয় নি। স্ট্রাইক করেছে মেয়েরা।'

'কিসের স্ট্রাইক?'

'ওদের ইউনিয়নের দুজন লীডারকে কলেজ থেকে টি-সি নিতে বলা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে।'—সাবিত্রী একটু হাসল।

'বুঝেছি। কিন্তু এই দুটি মেয়েকে কলেজ থেকে সরিয়ে দেওয়া কি এতই জরুরি?'

'গভর্নিং বডি মনে করে এরাই ট্রাবল-মেকার। আমি অবশ্য স্টাফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আছি গভর্নিং বডিতে। আমি বলেছিলুম, এখানে এসব প্যানিটিক অ্যাকশন নিয়ে লাভ নেই, বরং অন্যভাবে—কিন্তু ওঁরা রাজী হলেন না। বললেন, মেয়ে দুটো অত্যন্ত উদ্ধত—ওদের কিছুতেই রাখা চলবে না।'

'তা হলে স্ট্রাইক এখন চলতে থাকবে?'

'খুব সম্ভব।'

'সময়টাই ওদের উদ্ধত করে তুলছে—ওদের দোষ নেই। সেই সঙ্গে যদি তোমরাও অসহিষ্ণু হও, তা হলে জটটা আরো পাকাবে, খুলবে না।'

সাবিত্রী বললে, 'কী করা যাবে, বলো। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে যাঁরা স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করে গেছেন, তাঁদের চোখে সেই সময়ের ইমেজটাই ভাসছে। টীচার আর স্টুডেন্টের ভেতরে তাঁরা সেই ভয় আর শ্রদ্ধার সম্পর্কটুকুই আশা করছেন এখনো।'

'ভয়ের কথা জানি না, কিন্তু শ্রদ্ধাটা এখনো থাকতে বাধা নেই। মুশকিল হল, দু'পক্ষ দুটো যুগের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তোমরা যারা পড়াও—তারা একটু বেশি করে যদি ওদের চিনতে চাও—'

খুব বেশি সরল করে ফেললে প্রবীর। সব কিছুর মূলটা যে কোথায় সে তুমিও জানো, আমিও জানি। দেশ-সমাজ-জীবন—সব কিছু যে হতাশা আর অনিশ্চয়তায় পাক খাচ্ছে, তাকে একটা উজ্জ্বল লক্ষ্যে যদি তুলে ধরতে না পারি, তা হলে এর শেষ কোথাও নেই।'—সাবিত্রী একটা নিশ্বাস ফেলল : 'জানো—এক সময় আমি ভেবেছি, এখনো ভাবি—ছাত্র-রাজনীতি কেন তার নিজস্ব পথ ধরে এগোয় না—কেন সব সময় পার্টি-পলিটিক্সে জড়িয়ে যায়! কিন্তু তারপরেই দেখি—আজ পার্টি-পলিটিক্স ছাড়া আর কী আছে বাংলা দেশে? সব লেফ্ট-পার্টিগুলোর ইডিয়োলজীর দিকে তাকাও—নিছক কতগুলো থিয়োরীর পার্থক্য ছাড়া আর সেগুলো এখন শেলফে তুলে রাখলেও দেশের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—দেশ তাকে যা চাইছে, তার মধ্যে তফাৎ কোথায়? অথচ পার্টি বাঁচাতে কিংবা বাড়াতে হয়, নেতারা তাঁদের মহিমায় ডিস্টিংটিভ থাকতে চান, অতএব যেখানে সাধারণ ঐক্যে এক বছরে দশ বছর এগিয়ে যাওয়া যেত—সেখানে তাঁরা ক্যাডারদের খেপিয়ে দেন—পঁচিশ বছরের চেষ্টা পঞ্চাশ বছর পেছিয়ে যায়, লেবার-কৃষক-ছাত্র—নিখিল-ওয়রের আবহাওয়া তৈরি করে।'—সাবিত্রী একটু চুপ করল : 'প্রবীর, একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা, সবচেয়ে বড়ো সুযোগ যখন এল, তখন সেই সুযোগটাকে আমরা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলছি। ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে কী করব—ওরা তো সময়ের বাইরে নয়।'

একটু চুপ। তারপর সাবিত্রী অপ্রস্তুতের মতো হাসল।

'যাক গে, এ সব থাকুক এখন। আমি তো একেবারে চুপ করেই থাকব ভাবি, তবু মধ্যে মধ্যে এমন অশান্তি লাগে, যে—কিন্তু তোমার কথা বলো। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ ভালো নেই।'

সাবিত্রীর কথাগুলো প্রবীরের ভাবনা-টাকে আবার একটা বিরস দিকে সরিয়ে দিয়েছিল, কাগজে অজয় মুখোপাধ্যায়

এবং জ্যোতি বসুর বিবৃতি-পাল্টা বিবৃতির বিস্বাদ অনুভূতিটা জাগিয়ে তুলেছিল। মুখ্য এবং উপমুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য কোন্দলে গলা চড়াচ্ছেন—কী রমণীয় যুক্তফ্রন্টের চেহারা। ওদিকে আর এক নেতা দিনক্ষণ গুণে ঘোষণা করছেন কবে এই মন্ত্রিত্বের বারোটা বাজবে। খাসা চলছে।

আর শ্রমিক ঝরাচ্ছে শ্রমিকের রক্ত, কৃষক কৃষকের ঘরে আগুন দিচ্ছে। আমরা দায়ী নই—ওরা। ওরা কারা? প্রতি-বিপ্লবী? তা ছাড়া আর কী—আলাদা পার্টি যখন!

সাবিত্রীর কথায় প্রবীর জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে আনল মানসিক অবসাদ থেকে।

তুমি বারাসতে গিয়েছিলে?'

একটা ছায়া পড়ল সাবিত্রীর মুখে।

'গিয়েছিলুম। কিছু বলা যায় নি। ভেবেছিলুম, অফিসে ফোন করে তোমায় খবর দেব, কিন্তু কেমন লজ্জা করল। সুজাতা আর ফিরতে চায় না। স্বরাজদার নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে: বলে, এবার ভালো দেখে স্বরাজদা আর একটা বিয়ে করুক, এতটুকুও আপত্তি নেই তার।'

'এত অভিমান?'

'অভিমান?'—সাবিত্রী কপাল কুঁচকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রইল: 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'দশ বছরের সম্পর্ক মুছে যায় এত সহজে? স্বামী-স্ত্রীর?'

'ভাঙনটা খুব আস্তে আস্তে শুরু হয়, প্রবীর। তখন বুঝতে পারা যায় না, কিন্তু তারপর একদিন এক সঙ্গে নেমে আসে। তা ছাড়া—' সাবিত্রী যেন নিজের সঙ্গে কথা বলে চলল: 'তা ছাড়া সুজাতা যে স্বরাজদাকে ভালোবেসেছিল, সেখানে স্বরাজদার আর একটা ইমেজ ছিল। আজকের রাজনীতিতে স্বরাজদা এমন করে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে বলেই এমন বিশ্রী হয়ে এসেছে ভাঙনটা।'

'স্বরাজ যদি যে-কোনো একজন মানুষ হত—'

'আর সুজাতার যদি কোনো পলিটিক্যাল কন্‌ভিক্‌শান না থাকত। কোথাও বাধত না ভুলু—ওদের জীবনটা চমৎকার এগিয়ে যেত।'

হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। একালে আমাদের মনগুলো অতি মাত্রায় আত্মসচেতন। আসলে আগেকার মতো স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়—কাউকেই আমরা সবটুকু দিয়ে ফেলতে পারি না—অনেকখানিই নিজেদের জন্যে রেখে দিতে হয়। সেই বাড়তি জায়গাটুকুতেই কখনো-কখনো কাঁটা বন জন্ম নেয়। যাদের আমরা খুব স্বাভাবিক বলে জানি, তারা কি সত্যিই স্বাভাবিক? সবটা?

প্রবীর সাবিত্রীর দিকে তাকালো। চোখ দুটো ক্লান্ত। সুজাতার কথাই ভাবছে বোধ হয়।

সাবিত্রী বললে, 'কিন্তু তোমার কথা তো বললে না।'

'আজ ময়দানে ওদের পার্টির ম্যামথ্ গ্যাদারিং ছিল একটা। সেখানে সুজাতা বৌদিকে দেখলুম।'

'তাই নাকি?'

'একটা মিছিলের সঙ্গে আসছিল।'

'দেখা হল তোমার সঙ্গে?'—একটু উত্তেজিত হল সাবিত্রী: 'কিছু বললে?'

'দূর থেকে দেখেছি। তা ছাড়া সঙ্গে ছিল মুকুল—সে নক্‌শালাইট্—এমন একটা কমেন্ট্ করে বসল যে আর একটু হলে মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হত। তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে হল ওকে।'

'তা হলে আবার পুরো পলিটিকসে নামল সুজাতা।'

'হাঁ, ফেরবার পথটা বন্ধ করে দিলে চিরকালের মতো।'

'কিংবা এইটেই ওর দরকার ছিল। এখন নিজেকে কাজের মধ্যে ভুলিয়ে না দিলে নীলুকে ও ভুলতে পারবে না।'

'নীলুর জন্যে টান ওর আছে নাকি?'

'সেইটে ছিল বলেই হয়তো এতদিন ওখানে থাকতে পেরেছে। কিন্তু আর সইল না।'

প্রবীর আবার চুপ করে গেল। দাম দিতে হয়—নিশ্চয়। কিছু না দিয়ে বিপ্লবের সৈনিক হওয়া যায় না—নিজের নাড়ী পর্যন্ত ছিঁড়ে দিতে হয় কখনো-কখনো। আজ সুজাতাকেও এইভাবেই ছেড়ে যেতে হয়েছে নীলুকে। কিন্তু এই মূল্য কোথায় গিয়ে পৌঁছোচ্ছে শেষ পর্যন্ত? ময়দানে যাঁরা বিপ্লবের ডাক দিচ্ছিলেন, তাঁরা কতটা সংগ্রামের কথা বলছিলেন, কতখানিই বা বিদ্বেষের?

'সাবিত্রী।'

'কী।'

'ভাবছি, ভাগ্য ভালো যে সাহস করে কখনো বলি নি যে, আমার মতো একজন সাধারণ কেরাণীকে তুমি বিয়ে করে ফেলো।' সাবিত্রীর গাল লাল হয়ে উঠল।

'এতই ভয় আমাকে?'

'ভয় তোমাকে নয়—সময়কে।'—সাবিত্রীর হাতটা আবার মুঠোর মধ্যে টেনে আনল প্রবীর: 'এই যা, তোমার আঙুলে আবার ব্যথা দিলুম নাকি?'

'না—ওটা সেরে গেছে।' —সাবিত্রীর চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এল: 'কিন্তু কাকে ভয় করো বললে।'

'সময়কে। জানো'—প্রবীরের মুঠোটা আরো শক্ত হতে লাগল: 'সময়টাকে আমরা যতই বেশি আশা-আনন্দ-ভবিষ্যৎ—ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছি ততই সে ভেঙে যাচ্ছে—হাত থেকে ছিটকে পড়ে

যাচ্ছে। একটা স্রোতের টানে আমরা ভাসছি—যেটাকে মনে হয়েছিল অনুকূল, ঠিক এইবারে একটা নিশ্চিত আর শক্ত ডাঙায় পৌঁছে যাব, তখন দেখছি আমরা মোহানায় হারানো নৌকোর মতো চলে যাচ্ছি সমুদ্রের দিকে। আমরা পরস্পরকে পাশে চাইছি আর ক্রমাগত আলাদা হয়ে যাচ্ছি। জানি, তোমার হাত ধরে আমি রওনা হবো—তারপর দেখব স্বরাজদা আর সুজাতা বৌদির মতো আমরাও কখন—'

'কিন্তু ভুল—' সাবিত্রী প্রায় নিঃশব্দ গলায় বললে, 'আমি তো তোমাকে কখনো কোনো আলাদা চোখ দিয়ে দেখব না। আমি তো কোনোদিন কল্পনা করব না যে, সম্রাটের মতো তুমি মাথা ছাড়িয়ে উঠবে সকলের। তুমিও সাধারণ, আমিও সাধারণ। যদি স্রোতে ডুবতেই হয়, গাঁটছড়া বেঁধেই ডুবব। সুজাতার মতো আমার স্বপ্ন নেই—স্বপ্ন কোনোদিন ভাঙবেও না।'

'কী জানি।'

'আমাকে বিশ্বাস হয় না?'

'তোমাকে নয়—সময়কে। কিন্তু একটু ভুল বললে সাবিত্রী। আমি সাধারণ সন্দেহ নেই, কিন্তু তুমি সাধারণ নও। তুমি এম-এস্‌সি পাশ করেছ, কলেজে পড়াও। আমি পাশকোর্সের বি-এ, বিদ্যেয় তোমার কাছে কিছু নই। কাজেই তোমাকে বিয়ে করব—এরকম ধৃষ্টতা আমি ভাবতেই পারি না। তবু হয়তো তোমার দয়া হল—'

'এই, চুপ।'

'না—না, কথাটা বলতে দাও। হয়তো তুমি—'

আর বলতে দিল না সাবিত্রী। প্রবীরের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে এনে হাতটাকে জড়িয়ে দিলে প্রবীরের গলায়। একেবারে টেনে আনল নিজের কাছে।

'ভীরু—ভীরু কোথাকার! সময়ের কাছে হার মানবে কেন, সময়ের কাছ থেকে নিজের পাওনা ছিনিয়ে নিতে হয়।'

সাবিত্রী একটু আগে স্নান করে এসেছে, তার হালকা সুগন্ধ; সারা শরীরে ঠাণ্ডা দীঘির জলের শীতল শান্তি; প্রবীরের মুখের ওপর নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন।

'ভীরু—ভীরু কোথাকার! এরকম কাপুরুষকে কে ভালোবাসে!'

ভালো যে বাসে না, তার প্রমাণ দিল তৎক্ষণাৎ। আর এক হাতে কাপুরুষের মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে গভীর গলায় বললে, 'চুপ।'

তারপর প্রবীরের ঠোঁটে শক্ত করে চেপে ধরল নিজের ঠোঁট দুটো।

সময়ের কাছ থেকে নিজের পাওনা আদায় করে নিতে হয়। ঠিক কথা। কিন্তু কিভাবে? আমরা তো ভেবেছিলুম—অনেক দুঃখের পাড়ি শেষ হয়ে গেছে, এইবার আমরা ঘাটে পৌঁছুব। অনেক রক্ত, অনেক ভুল শেষ হল, অনেক শত্রুর সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা আমরা করে নিয়েছি। এর পরে আরো অনেক পরীক্ষা দিতে হবে—আরো অনেক নিষ্ঠুর কঠোর দায় মেটাতে হবে—কিন্তু তখন আমরা প্রস্তুত। প্রাচীর যখন একবার ভেঙেছি, লঙ্কা যখন একবার নিশ্চিত—

কিন্তু ঘাটে আমরা পৌঁছুতে পারি নি। স্রোত আমাদের কূলে উঠতে দিল না। আমরা কি—

বাস কণ্ডাক্টর এসে দাঁড়ালো : দাদা—আপনার টিকিটটা—

চিন্তাটা কেটে গেল।

ডবল-ডেকারের দোতলায় হাওয়ার ঢেউ। বাতাসে বসন্ত। এক-একটা ভালো লাগার দিনকে মনে পড়ে এইরকম হাওয়ায়। একদিন সে আর সাবিত্রী—একদিন কেন—কতদিন এইভাবে হাওয়ার ভেতরে নিজেদের ভাসিয়ে দিয়ে পাশাপাশি বসেছে বাসে-ট্রামে, গাছের তলা দিয়ে—পাতার শব্দ আর ছায়ার মধ্য দিয়ে হেঁটেছে কতক্ষণ। আশ্চর্য—আজ সাবিত্রীর সঙ্গে মাসে একবার দেখা করবার সময় পর্যন্ত হয় না। নিজের কাজ বেড়েছে, সাবিত্রী সন্ধ্যা পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

তবু—তবু—এখনো, এই বিস্বাদ দিনগুলোতে—যখন মনে হয়, জীবনটার কাছে অনেক কিছু চাওয়ার ছিল, নেবার ছিল, যখন কিছুই নেওয়া যাচ্ছে না—কেবল মুঠো থেকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, তখনো কিছুক্ষণের জন্যে সাবিত্রীর কথা মনে পড়ে। হঠাৎ মনে হয়—এখনো আশা আছে, আমরা হারব না, আমরা হারাবো না।

এতক্ষণে একটা মাধুর্যের স্বাদ স্বপ্নের মতো তাকে ঘিরতে লাগল।

বাড়ির সামনে পৌঁছে আশ্চর্য লাগল তার। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কে এল? রাত তো এখন সাড়ে দশটার কাছাকাছি। কে বাড়িতে এসেছে এই অসময়ে?

চিনতে দেরী হল না। দিদির গাড়ি।

[ক্রমশ]

॥ বোল ॥

প্রবল বর্ষা আর বন্যার দরুণ নির্বাচন দুই মাস পিছিয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের মানুষ বুর্জোয়া বিপ্লবীদের মুষলযুদ্ধের রঙ্গ-তামাসা উপভোগ করার আরও কিছু সময় পেয়েছে। আশা করা যায় যে, এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে ভোটের কাঙাল বুর্জোয়া দলগুলি শিশুর মাথায় দফা আর প্রতিশ্রুতির চোথা ঝুলিয়ে নতুন উৎসাহে পানি এবং কাদাভরা পূর্ব পাকিস্তানের মাঠে-ঘাটে দাপাদাপি করে বেড়াবে। আওয়ামী পার্টি ইত্যাদি দুই-একটি দল —যারা এতদিন পর্যন্ত পাঁচই অক্টোবরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল, তারা ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে। কারণ নির্বাচনটা তাড়াতাড়ি চুকে গেলে তাদের অনেক সুবিধে হোত। "বঙ্গেশ্বর" মুজিবর রহমান বা "একেশ্বর" ভুট্টো অনেক যত্নে ও কৌশলে তাদের নিজের নিজের প্রদেশের বেশ কিছু ভোট প্রায় বাগিয়ে এনেছিল। এখন বন্যার তোড়ে সেইসব অতি কষ্টের ভোটগুলি ভেসে যাচ্ছে দেখে তারা "ইয়া আল্লা" বলে মাথায় হাত দিয়ে মাজাভাঙা 'দ'-এর মত বসে পড়েছে এবং তাদের কোমর থেকে জমকালো সিল্কের লুঙ্গি খসে গেছে! পার্লামেন্টারী খাটালে বছরের পর বছর বাস করে . মুজিবর বা ভুট্টো বেশ বুঝতে পেরেছে যে, এখানে যে কোনও সময় যে কোনও নেতা বা দল তার যে কোন দোসরের সাথে জাবনার গামলায় মিতালী করতে পারে আর এইখানেই হোচ্ছে তাদের ভয়! বাস্তবিক, পাকিস্তানের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকটিই চরম সুবিধাবাদী। আজ যদি কেউ কোনও একটি জোটে থাকে কাল তার নাম অপর জোটে দেখা থাকে, কাল তার নাম অপর জোটে দেখা কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। পিছনের উদাহরণ দিলাম না, কেন না তা পর্বতপ্রমাণ। জনাব নূরুল যখন প্রবল উৎসাহ নিয়ে তার চতুর্থ ভেল্কী অর্থাৎ পি, ডি, পি'র আমদানী করল, তখন জাস্টিস্ পার্টিওয়ালা "উড়ুক্কু" খান অর্থাৎ এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ তার দলে ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উড়ুক্কু খাঁ তার অনুচরদের নিয়ে পি, ডি, পি'র তাঁবু ছেড়ে এল। কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হোল না। উড়ুক্কু খাঁ "তেহরিক ই-ইস্তিক্‌লাল" বা "গণ ঐক্য আন্দোলনে"র শুভ সূচনা করে আমাদের পিলে চমকে দিল। কাইয়ুম খাঁর মুসলিম লীগ আর মিয়া দৌলতানার মুসলিম লীগ মাত্র দিন পনের আগেও "কনফার্‌মড্" সতীনের মত চুলোচুলি করছিল। সম্প্রতি কাইয়ুম প্রস্তাব করেছে যে, কাউন্সিল মুসলিম লীগ এবং জামাতিদের সঙ্গে সে নির্বাচনী জোট বাঁধবে। হয়ত কোনদিন শুনব যে, ফকা চৌধুরীর কনভেনশন লীগের সঙ্গেও দৌলতানা বা কাইয়ুমের দোস্তালী হয়েছে। আপনারা নিশ্চয় জানেন, কাইয়ুম আর দৌলতানা বর্তমানে ফকা চৌধুরীদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের কেচ্ছা ছড়াচ্ছে? কিন্তু এই সব বিরোধ সৃষ্টি করতেও তাদের যেমন দেরী হয় না, তেমনি মেটাতেও না! কৃষক সমিতিকে কেন্দ্র করে শোধনবাদীদের গুরু মজাফ্‌ফর আমেদের ন্যাপ এবং নয়া শোধনবাদী মৌলানা ভাসানী ও মশিউর রহমানদের একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা হচ্ছিল, কিন্তু তা আবার ভেস্তে গেছে। গত চব্বিশে জুন লাহোরে পি, ডি, পি, জামাতে ইসলামী, মরকজাই—জমিহাতুল-উলেমায়ে-ইসলাম, জমিয়াতুল-উলেমা-ই-পাকিস্তান. কেন্দ্রীয় জমিয়াত ই-আহ্‌লে-হাদিস ইত্যাদিরা "ইসলামী মুত্তাহিদা মহাজ" বা "সংযুক্ত ইসলামী ফ্রন্ট" গঠন করেছিল। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, জামাতীরা এই ফ্রন্টের বিরোধিতা করছে। তারা বলছে যে, প্রতিটি ব্যাপারেই ফ্রন্টের কথা মেনে নিতে হবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নাকি তারা অন্তত দেয় নি! দল ভাঙা আর দল গড়ার এই কেচ্ছার মধ্যেই লুকিয়ে আছে নির্বাচন আগু-পিছুর বন্যার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তড়পানির রহস্য। যারা গুছিয়ে নিতে পেরেছিল, তারা পাঁচই অক্টোবরে মজুব মারার আনন্দে নাংগা বাবা হয়ে নাচছিল আর যারা গুছিয়ে নিতে পারে নি, তারা "বন্যার জলে গোটা দেশ ভেসে যাচ্ছে, আগে ওদের বাঁচাও" বলে "হঠাৎ সতী"র মত ডাক ছেড়ে কাঁদছিল। বঙ্গেশ্বর মুজিবর রহমান হারুণের টাকায়, আদমজীর টাকায় ভোট কিনে "নিশ্চিন্ত মেয়ের বাপের" মত মেজাজ নিয়ে বসে ছিল, সিন্ধুতে সে জি, এম সৈয়দের মত একজন বড়গোছের মাতব্বর দোস্তও পেয়েছিল। এখন নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ায় সে খুবই মুষড়ে পড়বে। বলা যায় না, জি, এম. সৈয়দ যে রাজনীতি বলতে কেবল সিন্ধুর উন্নতি বোঝে, সে হয়ত কিছু সুবিধের বিনিময়ে আর কারও সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে পারে। তখন মুজিবরের উপায় কি হবে? জুলফিকর ভুট্টো দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ মজাফ্‌ফর আমেদের ন্যাপের পশ্চিমা শাখার লোক ভাঙিয়ে এনে নিজের দল ভারী করছে। মামুদ আলী কাসুরী সহ কুড়ি-পঁচিশজন দক্ষিণপন্থী ন্যাপ নেতা ভুট্টোর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বলা বাহুল্য, তারা পিপলস পার্টির টিকিটেই নিজের নিজের জায়গা থেকে ভোটে দাঁড়াবে এবং তারা জিতলে জনাব ভুট্টোরই পোয়া বার। কিন্তু নির্বাচন দুই মাস পিছিয়ে যাওয়ায় ভুট্টো সাহেবের মাথার টাক দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে! পাকিস্তানে দল পালটাতে কয়েক ঘণ্টাই যথেষ্ট, সেখানে দুই মাস অর্থাৎ ষাট দিন! ষাট দিনে কি না হোতে পারে এবং কি না হবে? মামুদ আলী কাসুরী যদি অন্য কোনও দিকে হাত বাড়ায়, সিন্ধুতে জি, এম সৈয়দ যদি আরও বেঁকে ওঠে, তবে? তবে কি হবে। নির্বাচন এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়ায় বাদ-প্রতিবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলির যে কেবল কায়েমী স্বার্থই জড়িয়ে আছে, তা ভুট্টো নিজেই বেমক্কা বেফাঁস করে ফেলেছে। এই মাসের আট তারিখে লাহোরের এক জনসভায় সে বলেছে যে, "নির্বাচনে যারা হেরে যেতে পারে, তারাই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।" "তা হোলে বুদ্ধির কাঁঠাল ভুট্টো, আমরাও বলতে পারি যে, যারা নির্বাচনে জিতে যাবে তারাই নির্বাচনের তারিখ ঠিক রাখার পক্ষপাতী অর্থাৎ হারার সম্ভাবনা থাকলে তারাও নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করত, তাই না কি?" জনাব ভুট্টো মনে করে যে, মাকাল ফলের মত রাঙা চেহারাটি নিয়ে কিছু গরম বুলি ছাড়লেই মেহনতী [illegible] ব্যাকুল যোগিনী হোয়ে ছুটে

আসবে—এমন আহাম্মকী বুদ্ধি নিয়ে রাজনীতিকরা চলে না। যাই হোক, মুজিবর রহমান বা জুলফিকর ভুট্টোকে আমরা অভয় দিচ্ছি—"আপলোক মত ঘাবড়াইয়ে। দল থেকে দোস্তরা বেরিয়ে গেলেও নয়া দোস্ত নিশ্চয়ই ছুটে যাবে, কেন না বুর্জোয়া রাজনীতির প্রকৃতিই তাই। এই দুই মাসে অনেক সাদী, অনেক তালাক, অনেক নিকে হবে। সুতরাং সাতই ডিসেম্বর পর্যন্ত একেবারে কৃষ্ণপক্ষ নয়, মেঘাচ্ছন্ন চতুর্দশীর চাঁদ দেখতে পাবে।"

এইবার আমিন সাহেবের অভিযানের কেচ্ছাকাহিনীর চতুর্থ অধ্যায়ে ফিরে আসি। আপনারাও এই পুণ্যাত্মা ঘোরতর বিপ্লবীর সুকীর্তির ইতিহাস পাঠ করে রাজনৈতিক দালালির রকমফের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। ডাক বা ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির মাধ্যমে রথ দেখা এবং কলা বেচা শেষ করে অর্থাৎ একদিকে হারুণ মুজিবরের ছয়দফা প্ল্যানকে স্যাবোতাজ করে এবং অপরদিকে দেশজোড়া ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনকে

পথে বসিয়ে নরুল যখন তার দাড়িতে পাক দিতে দিতে ঢাকায় এসে নামল, তখন তার ওপরওয়ালাদের হেড আপিসে অর্থাৎ ইসলামাবাদে বড় দালালের আসনটা খালি হোয়ে গেছে। আয়ুব খাঁর বদলে ইয়াহিয়া খাঁ এসেছেন এবং পশ্চিমা পুঁজিপতিদের লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছেন। নরুলের অবশ্য চাকরি গেল না। বরং তার মনিবরা তাকে নতুন উৎসাহে নতুন কিছু করার জন্য মদত দিতে লাগল। কারণ, ইয়াহিয়া পাকিস্তানের সর্বত্র জঙ্গী আইন জারী করলেও এবং মৌলানা ভাসানীর মত নেতা তাকে "সৎ সৈনিক", "আদর্শ দেশসেবী" ইত্যাদি বলে তেল দিলেও মারমুখী কৃষক—শ্রমিক এবং অন্যান্য মেহনতী আওয়াম থেমে ছিল না। তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, যেমন আজও চালিয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়ছিল,—"নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী বদল করা যায়, জনতার শোষণ বন্ধ করা যায় না, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ো, কৃষিবিপ্লব সফল কর"। হাতে হাতে ঘুরছিল সভাপতি মাওয়ের লাল বই, যা কি না জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মন্ত্র এবং অসংখ্য কণ্ঠে উঠছিল ধ্বনি—"রেড বুক, রেড ফ্ল্যাগ, রাইফেল"। কেঁপে কেঁপে উঠছিল "গোল টেবিলে"র দালালরা, যাদের ষড়যন্ত্রে ঊনসত্তরের সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল। ফলে পশ্চিমা তথা নিখিল পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের নির্দেশে নুরুল আমিন তার নয়া অভিযানে নামল। জন্ম নিল "পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি।" মাত্র কয়েকদিন আগে মার্কামারা পি, ডি, পি ওয়ালা—আবদুস সালাম খাঁ "পাকিস্তান অবজারভারে"র পাতায় কলমের পর কলম জুড়ে শাসিয়েছে যে, ক্ষমতায় এলে তাদের দল আমাদের দেখে নেবে (অক্টোবর, পাঁচ)। মাঝে মাঝেই পি ডি পি'র এঁড়ে গরুগুলি আমাদের উদ্দেশ্যে এই সব গরম বাকা ছাড়ছে। গত একত্রিশে মে "শওকতে ইসলাম দিবস" পালন করতে গিয়ে তাদের নয়া জোট "ইসলামী মুত্তাহিদ্দা"র অংশীদার জামাতীরা দৈনিক "সংগ্রামের" পাতা ভরে আমাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার আস্ফালন করেছিল। কিন্তু তাদের এই সব কাণ্ড দেখে আমরা কেবল হাসতেই পারি এবং খতমের লিস্টে তাদের নামের নিচে যত্ন করে লাল রঙে দাগা দিতে পারি। নির্বাচন যারা বাঁচিয়ে দিতে চেয়েছিল, পি ডি পিরা তাদের একদল। তবে সময় বেশি পেলেই বা কি হবে? বড় জোর কয়েকটা আসনের হেরফের হতে পারে। বরং ক্ষতিই হবে বেশি। কেন না যত দিন যাবে ততই এই সব দালালদের রঙচঙে মুখোসগুলো খসে পড়বে। আগামী চিঠিতে পি ডি পি সম্পর্কে অনেক খবর দেব।

॥ চব্বিশ বছরে পা দিয়ে ॥

[৫০২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করেছে। এই গোপুত্রদের মানদণ্ডে হতে অনেক দেরী।

দ্বিতীয় পর্যায়টি হচ্ছে, বর্তমান অবস্থাকে বজায় রেখেই ভূমির ক্ষেত্রে যাতে বৃহৎ পুঁজি নাক গলাতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা এবং এটুকু না করলে ওই অনুপ্রবেশকে রোধ করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন সিলিং-বহির্ভূত জমি যারা ধরে রেখেছে তাদের কাছ থেকে জমি উদ্ধার এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন। এই কাজ কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছিল, কিন্তু শেষ আর করা হল না। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলিতে বিন্দুমাত্র হয় নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এবং কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদল মুখে অবশ্য খুব বড় গলায় বলছেন যে, ভূমিসংস্কার আইন কার্যকর করতে হবে, ভূমিহীনদের অধিকার আছে বেনামা জমি দখল করার, কিন্তু এই গালভরা বুলিসমূহ ছাড়া কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কিছু করতে যে ইচ্ছুক, তার ন্যূনতম পরিচয়ও এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি কয়েকটি দল সারা ভারতব্যাপী ভূমি দখল আন্দোলন শুরু করেছিল। সেই আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আচরণ, তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে ফাঁকিটাকেই অত্যন্ত কুৎসিতভাবে প্রকাশ করেছে। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুব গর্বের সঙ্গে বলেছেন যে, ভূমি দখল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য, যাঁরা মুখে ভূমিসংস্কারের কথা বলেন, যদি তাঁরা ভূমি দখল আন্দোলনের ব্যর্থতায় আনন্দিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা ভূমিসংস্কার চান না, যা বলেন, তা নিছক স্তোকবাক্য, নিছক ভাঁওতা।

॥ ৬ ॥

কাজেই যে সকল দল ভূমি দখলের আন্দোলন সমর্থন করেন তাঁদের কর্তব্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই দাবি জানানো যে, তাঁরা সোজাসুজি বলুন যে, তাঁরা ভূমিসংস্কার চান কি না, তাঁদের ভূমিসংস্কারের নীতিকে তাঁরা কবে এবং কিভাবে কার্যকরী করবেন।

আমার নিজের ধারণা, যদি আন্তরিকতা থাকে, তা হলে মাত্র কয়েকদিনের প্রচেষ্টাতেই বেনামা জমি উদ্ধার এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য এখুনি নতুন সেটলমেণ্টের আদেশ দেওয়া। গতবারের সেটলমেণ্টে কাজ করেছিলেন এমন লোক অনেকে আছেন এবং আরও কিছু লোক নেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি গ্রামেই এই উদ্দেশ্যে একটি করে কোর্ট বসানো হোক এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করা হোক। কার কত বেনামা জমি আছে তা গ্রামবাসীদের অজানা থাকার কথা নয়। এখানে তাদের দলিলপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হোক এবং সেক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, ভূমিসংস্কার বিল পাশ হবার পর যে সকল জমি হস্তান্তরিত হয়েছে, সেগুলি অবৈধ ঘোষণা করার জন্য একটি আইন পূর্বাহ্ণে পাশ করিয়ে রাখা দরকার। তাহলে সিলিং-বহির্ভূত সকল জমিই বেরিয়ে যাবে এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে অতিদ্রুত বণ্টন করে দেওয়া হোক একেবারে দলিল-পরচাদি করে দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন আন্তরিকতার ও তৎপরতার।

এই কাজ যদি এই মুহূর্তে শুরু করা না যায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, তাহলে সরকারকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে—যার মোকাবিলা করা শিবেরও অসাধ্য। বস্তুত সরকার কি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন ইতিমধ্যে হন নি? কেন্দ্রীয় সরকার কি পারছেন পশ্চিমবঙ্গে রুল অফ ল বজায় রাখতে? পুলিশ, সি-আর-পি, মিলিটারী—কোন কিছুতেই অবস্থার সামাল দেওয়া কি যাচ্ছে?

ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্যা, যা ভূমিসংস্কারের দ্বারা আংশিক মিটলেও সম্পূর্ণ মিটবে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে এই দিকটাই সর্বাধিক উপেক্ষিত, যা বারান্তরে আলোচনা করব। আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে জনৈক মনীষী বলেছিলেন, ইউ কান্ট বিল্ড এ রুম বাই বিগিনিং টু বিল্ড ইট ফ্রম দি রুফ। আর তা করতে গিয়েই যত গণ্ডগোল।

[চলবে]

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

গত ২৩শে জুলাইয়ের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'পাঠক-মন' স্তম্ভে আমার সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ একটি চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর সুদূর কেরালা থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র জনৈক পাঠক (মনে হয় উর্দুভাষী) এক পত্রে আমাকে ২১শের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একটি কপি সংগ্রহ করে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। 'বসুমতী' কার্যালয়ে খোঁজ করেও নাকি তিনি এই সংখ্যাটি পান নি। বলা বাহুল্য, পত্রলেখকের সংগে পূর্বে আমার কোনরূপে যোগাযোগ ছিল না। যা হোক, দুঃখের সংগে স্বীকার করছি—আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র নিয়মিত পাঠক ঠিকই, কিন্তু এর গ্রাহক বা নিয়মিত ক্রেতা নই। তাই ঐ সংখ্যাটি আমার কাছে নেই। সময়াভাবে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যাঁরা নিয়মিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী' কেনেন, তাঁদের সংগে যোগাযোগ করতে পারি নি। যা হোক, যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয় ২১শে মে'র 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একটি কপি দয়া করে নীচের ঠিকানায় পাঠালে সুদূর কেরালার ঐ পত্রলেখক বিশেষ উপকৃত হবেন। প্রয়োজনবোধে পত্রলেখক প্রেরককে পত্রিকাটি পাঠ করার পর ফেরত (পত্রলেখকের ভাষায় 'আপস') দিতেও রাজি আছেন।

—অজিতকুমার দাস

পত্রিকা প্রেরণের ঠিকানা :

M. N. Satyardhy,
P.O. Marikunnu,
Calicut-12,
Kerala.

মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে

গত ২৪শে আষাঢ় তারিখের পত্রিকায় 'রঙ্গজগৎ' বিভাগে 'সজনে'র 'মিনি স্কার্ট' নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব শীর্ষক লেখাটি খুব মূল্যবান হয়েছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক মিনি স্কার্টের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এ ব্যাপারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণী আবেদন জানিয়ে সমাজের রুচিশীল জনসাধারণের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতালাভের অধিকারী হয়েছেন। এই প্রসংগে সিনেমা-সংস্কৃতির আলোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "এই বিকৃত মানসিকতা বিজাতীয় ফ্যাসনের প্রধান প্রচারক সিনেমা।"

শুধু সিনেমা নয়, সাহিত্যের প্রভাবও এক্ষেত্রে কম নয়। আজকাল একটি বহু বিতর্কিত শব্দ প্রায়ই কানে আসে। শব্দটি হচ্ছে "শিল্প"। এই

সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে যৌনতার যে অবাধ ব্যাপ্তি ঘটছে তা জনমানস ও সমাজজীবনে এক বিপর্যয়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অথচ এ বিষয়ে যখনই কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বলতে শুনি, নাকি শিল্পের খাতিরেই এ সবের আমদানি। এবং শিল্প এমনই এক বস্তু, যা যে-কোন প্রকার সমালোচনা ও বিধিনিষেধের আওতার বাইরে। এই "শিল্প" বস্তুটির কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি এবং সমাজ ও সভ্যতার প্রতি এই শিল্পের অবদান কতখানি সে প্রশ্নেরও উত্তর মেলে নি। এ নিয়ে যখনই কেউ প্রশ্ন তুলেছে তাকে গোঁড়া বা অনুদার বা বেরসিক বলে হাঁকিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। কোন এক সমালোচক সখেদে মন্তব্য করেছিলেন, 'শিল্প হচ্ছে যেন এক ফুলের বাগান যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু পেট ভরাতে হলে আলু-পটলেরই চাষ কর।' অপর এক সমালোচককে শিল্পের প্রশস্তি গাইতে শুনেছি, 'আর্ট ফর আর্টস সেক। তাই শিল্প সমাজের পক্ষে অকল্যাণকরও হতে পারে, কিন্তু সেটা কোন আলোচনার বিষয় নয়।' কি অদ্ভুত যুক্তি!

বস্তুত এই তথাকথিত শিল্পের খাতিরেই আজকাল সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব গড়ে উঠছে এবং এর প্রতিরোধের চেষ্টা করলে তা শিল্পীর পক্ষে আরও সুবিধার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শিল্পরসিকরা বলে থাকেন, সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে বাস্তবের নিখুঁত প্রতিফলনই শিল্প সৃষ্টির চাবিকাঠি এবং বাস্তবে যা ঘটছে সাহিত্য ও সিনেমায় তা রূপায়ণের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। এই কারণে উচ্চমানের শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে খোশলা কমিটি সিনেমায় চুম্বন ও নগ্নতার সুপারিশ করেছেন এবং এই নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড়ও বয়ে গেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সাহিত্য ও সিনেমা যথার্থই বাস্তবের ফটোগ্রাফি হচ্ছে কি? বরং বাস্তবই হয়ে ফটোগ্রাফি। বিশেষত সিনেমায় নায়ক-নায়িকারাই আজ সমাজের প্রকৃত নায়ক-নায়িকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পরিণত ও অপরিণত মনের তরুণ-তরুণীরা এদেরকেই অনুকরণ করার মধ্যে যথার্থ আভিজাত্য ও আনন্দ আহরণ করে বেড়াচ্ছে। বস্তুত সিনেমাই আজ সমাজজীবনের মানসিকতাকে ওলট-পালট করে দিচ্ছে বা দিতে চলেছে। সিনেমাতে যখনই কোন নতুন বই চালু হয়, অমনি তার গানগুলো সবার মুখে মুখে এবং নায়ক-নায়িকাদের শুধু বেশবাসই নয়, তাদের চুল কাটা থেকে সুরু করে চলনভঙ্গিটি পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় নতুন নতুন ফ্যাসনের আদর্শ।

অবশ্য এই ফ্যাসনের আমদানি আজই নতুন নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হবার সংগে সংগেই এ দেশের নারীরা নিজেদের অপরের দৃষ্টিতে লোভনীয় করে তোলার বিদ্যাটি রপ্ত করে নিয়েছে।

যাই হোক, সরকারকে এ বিষয়ে অবিলম্বে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এই বহু বিতর্কিত শিল্পের মোহ ছেড়ে সুস্থ সমাজ রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য তথাকথিত শিল্পরসিকরা হয়ত অনেক চেঁচামেচি করবে, কিন্তু সেদিকে কর্ণপাত করলে চলবে না। কারণ, শিল্প যদি বিপণি-দ্রব্যের মতই ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে বিষ পরিবেশন করছেন কি-না, তাও পরীক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া শুধু শিল্পেরই দোহাই নয়, সমাজে যাই কিছু ঘটুক, আমরা সেই অপকর্মের সবটুকু দোষ নির্বিবাদে যুগধর্মের ওপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চেষ্টা করি। অথচ এ কথা ভুললে চলবে না যে, যুগ আপনা হতে সৃষ্ট হয় না, মানুষই যুগ সৃষ্টি করে এবং সমাজজীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে সুস্থ মানসিকতার এই ক্রম অবক্ষয়েই বিকৃত-রুচি যুগের জন্মলাভ ঘটে। সাহিত্যে যৌনতার স্বপক্ষে গেয়ে যাঁরা বলেন যে, যৌনতা জীবনের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ, তাঁদের বোঝা উচিত যে, জিহ্বাও মুখগহ্বরের অপরিহার্য অংশ কিন্তু তা যদি মুখগহ্বরের বাইরে এসে ঝুলতে থাকে, তবে বলতে হবে—নিশ্চয় তার বিকৃতি ঘটেছে।

বাংলা দেশের খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সাপ্তাহিক বসুমতীই একমাত্র পত্রিকা, যে সংবাদ পরিবেশন ও সাহিত্য সম্পাদনায় সততা ও রুচিশীলতার পরিচয় রাখছে। আশা করি, সাপ্তাহিক বসুমতী এ বিষয়ে আরও মনোযোগ দেবে।

—সেখ ওয়াশিম আলি,
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

এবার গাড়ি দখল ?

অশোভনভাবে বাস স্টপে ডিগবাজি খেয়ে যেদিন অপলক অধিকারীর হাতে ব্যান্ডেজ উঠল তার পর দিন থেকেই চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ানোর সময় স্ত্রী দ্বারে এসে দাঁড়ায়। তার ভাঙা রেকর্ডের একই জায়গায় পিন বিঁধিয়ে সরম-সলজ্জ কণ্ঠে রোজ একই অনুরোধ করে, 'দেখে শুনে ট্রামে-বাসে উঠো!' আর আমার তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি স্মরণীয় পাবলিসিটি মনে পড়ে যায়। সেই স্বামীর চোখে চোখ পেতে যুবতী বধূর করুণ মিনতি, 'কথা রেখো!' অর্থাৎ ভিড় সামলে চোলো। কিন্তু ঘরের শ্রী, ঘরের স্ত্রীর মাথা-ব্যথা তো অফিসের হামলা অফিসর-আমলা-দের থাকার কথা নয়। নয় বলেই অপলক অধিকারীকে হাতে পট্টি বাঁধতে হল। করুণাময়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটল। আর ও'দের অফিস শুদ্ধ জমানো প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা বছর চারেক ঘুরিয়ে করুণা-ময়ের হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'আমরা যে কী গভীর শোক পেয়েছি কী বলব মশায়। অমন পাংচুয়াল কর্মী সচরাচর মেলে না। আমরা দু'মিনিট শোকস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছি। এবং বলাই বাহুল্য, সেই শোক সভায় হামলা অফিসার-আমলারাও বোধহয় গলার দড়ি (নেকটাই) আঙুলে প্যাকাতে প্যাকাতে ঘড়ি ধরে দু'মিনিট আপন মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন।

তবে আমি জানি, লাল ঢিকের লেট এ্যাটেন্ডান্স বাঁচাতেই শহরের রাস্তায় অন্তিমশয্যা নিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা।

অপলক অধিকারীর এ্যাটেন্ডান্স অফিসকে ক্রমাগত লাল সেলাম জানাচ্ছিল। ক্যাপা ষাঁড়ের মতো ক্ষেপে গিয়ে ঢিকে মারা হামলা অফিসর একদিন খুব করে হেঁকে দিয়েছিলেন ওকে। ফলত লেট বাঁচাতে বেচারীর ঐ দুর্ভোগ। না হ'লে কিছু মেডিক্যাল এক্সপেন্স হয়ে গেল। জমা ছুটি

অপলক এসব কথা বলতে বলতে ওর্কোদর উজবুকের মতো কেঁদে ফেলেছিল, যদিও জানত, 'কলসী' শহরে তার কান্না উপলক্ষে কানে কোনোদিনই পৌঁছবে না। বলেছিল, 'লেট বাঁচাতে কম করি নি মিত্তিরদা। যেদিন পড়লাম সেদিনই ঠিক সময় ধরে বাস স্টপে হাজির হয়েছিলাম। জুটে গণ্ডগোল। বাসের দেখা নেই। শেষে যেটা এলো, একেবারে ভরা-পেটে পক্ষীরাজ। গোটা দুই শিশু (ওরা স্কুলে যাচ্ছিল) আর এক লাইন মেরে যাত্রী ঠেলে বীর-পুরুষের মতো কোনো রকমে ঐ বাসটাতেই একটা পা সেঁধিয়ে দিয়েছিলাম। আর আপনি যদি কোনোক্রমে একটা পা তুলে দিতে পারেন, দেহটা পাঁচজনের সাহায্যে কখন গাপ করে ভেতরে ঢুকে যায় জানতেও পারবেন না। আমিও পারি নি। বাস, আমাকে নিয়ে বেশ জোরেই ছুটছিল। আমিও হামলা সাহেবের ঢেরা কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হব ভেবে আরামে ঘামছিলাম। এমন সময় বিকট একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে গাড়ি গেল দাঁড়িয়ে। হুড়মুড় করে যাত্রীরা নামলেন, স্রোতের তোড়ে আমি। অনেকে 'কাটা টিকেট ফেলা না যায়' এজন্য কণ্ডাক্টরের সাহায্যে অন্য কোনো বাসে স্থানান্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার সে অবসর নেই। ছুটোছুটি গলদ-ঘর্ম। শেষে একটা ট্রামেই চাপলাম মাঝ পথে। হাতে যা সময় তাতে হাজিরা খাতা টানার আগেই হয়ত পৌঁছে যাব। কিন্তু কপাল সঙ্গ ছাড়ে না। ট্রামও মাঝ পথে ঘড়াং করে থেমে গেল। ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর নেমে পড়ে ঘাসরুটে উবু হয়ে বসে চাকা পরীক্ষা শুরু করল। আমি অক্রান্ত নিলাম ডাকের মতো সরকারী ডাকে আমি ফের ছুটে গেলাম বাসতলায়। উর্বর মগজ ব্যবস্থাপকদের কল্যাণে এখন তো বাসতলা থেকে ট্রামতলা বড় কাছাকাছি নেই। দূরে একটা বাসে একপেয়ে জায়গার সম্ভাবনায় ছুটেছিলাম, মাঝে বিপত্তি। হাতটা গেল। ইনজেকশন, ব্যাণ্ডেজ, প্রেসক্রিপশন।'

অপলকের ইতিহাস নেহাৎ মামুলী।

[illegible] ভালবাসে। আমি বলেছিলাম, 'আমলার রাস্তায় গামলা ভরে রক্ত দাও তবে না চাকরির উন্নতি। এতেই অমন মুষড়োলে চলে! চাঙ্গাব আশু, কাল থেকে ফের বাসকুস্তি শুরু করে দাও!' কিছুমাত্র সহানুভূতি দেখাই নি।

কিন্তু উপদেশ যাই দিই না কেন অপরকে; বাস্তব সমস্যা বিচলিত করবেই। আমলারা হামলা করেন কারণ তাঁদের গাড়ি আছে। নিদেন অফিসের লিফট ভ্যান তো আছেই। তা ছাড়া মোটা মাহিনা। ঘরে বৌ ছাড়াও দাস-দাসী। বাজার, দুধের লাইন, রেশন, ট্যুইশন, নিজের ছেলে পড়ানো, গৃহিণীর অন্নপাক ঘটিত বিলম্ব, বাড়িতে অসুখ-বিসুখ, কলের জল নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিবাদ ইত্যাকার সমস্যা ও'দের নেই। কিন্তু আমি, আমার তো ঐ সব ক'টি সমস্যাই বর্তমান! সুতরাং অপলকের অবমাননা আমার গায়েও বিঁধেছে বৈকি। করুণাময়ের স্ত্রী তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে। তা ছাড়া আমারও স্কুটার, বাইক, মোটর বা ভ্যান নেই। এই ভাইটাল ইস্যু নিয়ে অফসাঁর নক্সা করার ব্যামো আমার তাই থাকার কথা নয়। তবে যানবাহন সমস্যা একটা ক্লোজড ফাইলের মতই পুরনো সাবজেক্ট; একে নতুন করে ওপেন করায় পৌনপুনিকতা দোষ লাগে। প্রসঙ্গটা সুতরাং 'শহর কলকাতা'র আওতার বাইরেই রেখেছিলাম। ধরে নিয়ে-ছিলাম, লাল ত্রিকোণের বিজ্ঞাপনী প্রচারের প্রভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে বছর কুড়ি পর হয়ত এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাঝে পড়ে যদি আবার সার্কুলার রেল ফেল হয়ে যায় তবে তো কথাই নেই। তাই আর কেন ও প্রসঙ্গে।

কিন্তু জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। ইতিমধ্যে আর একটি ইন্সিডেন্ট সেই পুরনো সমস্যাকেই গোঁৎ খাইয়ে উড্ডীন করেছে। আমিও দোয়াত-কলম বাগিয়ে বসেছি, কর্তব্যবোধে সমস্যাটা রীতিমত সিরিয়স এবং প্যাকিয়ে উঠলে যে ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাতে ওপর তলার ত্রাহি রাজ্যপালম্ রবে হয় আমলা-দের হামলানো বন্ধ করতে হবে, নয় বি বি ঘোষ মহাশয়কে দিল্লী গিয়ে তুরন্ত কয়েক বস্তা টাকা এনে সার্কুলার রেল চালু করে দিতে হবে। না হলে অন্তত অফিসে অফিসে কর্মীদের জন্য লিফট ভ্যানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

সমস্যাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের মনেই একটা ভবিষ্য সম্ভাবনায় চমকে উঠেছিলাম। শুরু থেকেই আরম্ভ করি:

সি-পি-আই জমি দখল করছে, সি-পি-এম করেছে [illegible] আমলে, অন্যান্য পার্টিও যে যার [illegible] সুবিধেমত [illegible] পড়েছে। কেন? না [illegible] নেই।

তা করতেই হয়। শুধু সম্পত্তির ওপর আর আয়ের ওপর 'সিলিং কর' শ্লোগানে তো বর্তমান হিড়িকে পার্টি জিইয়ে রাখা যায় না। অতএব ওঁরা বললেন, লাগাও লাগাতার বাড়ি দখল। সম্প্রতি দেখলাম, এ-গুড়ে মধুর সন্ধান পেয়ে ফরোয়ার্ড একও বাড়ি দখলে ফরোয়ার্ড হচ্ছেন। নির্বাচনের আগে অন্তত পাবলিসিটিও কম জরুরী নয়। শ্লোগান তুলে ঝুলে পড়লেই হল। বিপদ হয়েছে বাংলা কংগ্রেসের। সেই যে বলে, 'থাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে', তা এঁদেরও তাই। চলছিল দিন চরকা কেটে, কাল হল বামপন্থা ঘেঁটে! এখন সামাল সামাল হাঁকছেন সুশীল ধাড়া। জমি-বাড়িতে হাত লাগানোর সম্বনেশে ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে পার্টি যায়। তাই লাও সি-আর-পি, লাও মিলিটারী পরিত্রাহী চীৎকার ওনাদের। কিন্তু অমন কাটখোট্টা পলিটিক্স যাঁদের চলে না তাঁরা কি করবেন! বাড়ি-জমির চাইতে চটকদার আর কোনো শ্লোগান পেলে এখন বাদ-বাকি বামপন্থীরা

পাপয়ে পড়েন। সম্প্রতি আবার চাকরির দখলও হয়ে গেল।)

আর শ্লোগান জিনিসটা মানুষের অভাববোধ থেকেই সৃষ্টি। শহরের পিচ তপ্ত পথে নিত্য একশ' শ্লোগান জন্ম নিতে পারে। তারই এক ভগ্নাঙ্কুর সেদিন হঠাৎ আমাকে উচ্চকিত করল। স্পষ্ট স্বকর্ণে শুনলাম। বাস স্টপে শুনলাম নতুন শ্লোগান জন্ম নিচ্ছে। ভাগ্যিস এখনো তা কোনো পার্টির কানে ওঠে নি। কিন্তু উঠতেই বা কতক্ষণ।

বাস্তবিক যদি যা শুনলাম তাই-ই শুরু হয়, আর তা হওয়াই বা বিচিত্র কি, তাহলে সে হবে সাংঘাতিক আর একটি ব্যাপার। ব্যাপারটা বলি তবেঃ

সাপ্তাহিক ফীচারের সাবজেক্ট সংগ্রহের জন্য আমাকে সদা উৎকর্ণ থাকতে এবং উচ্চকিত দৃষ্টি রাখতেই হয়। বর্তমানে ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এই স্বভাববশতই সেদিন ওভারহিয়ার করে ফেললাম কিছু উঠতি বয়সীর আলাপ।

তখন ঝেড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাদুড়-ঝোলা ট্রাম-বাসের কোলে-পিঠে কাকভেজা অফিসযাত্রীর করুণ দৃশ্যে ছোকরা তিনটি অকস্মাৎ উত্তেজিতভাবে বলছিল, 'নিজের মুখ দেখ শালা, নিজের মুখ দেখ। অদৃশ্য কাছিতে-বাঁধা জানওয়ারের মতো আমরা ছুটছি। গুঁতোগুঁতি, খেওখেয়ি, ঘামাঘামি, এমন কি গরম বাড়লে মাথা গরম জনিত মারপিট, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা স্বভাব-চরিত্র দুবেলার শহুরে অব্যবস্থায় এক কোমর কাদায় ডুবে আছে। দেখো, গাড়ি-গুলোর অবস্থা।'

'এই শহুরে অবস্থায় ঠুঁটো সরকার যদি নাই-ই কিছু করতে পারে তো দুটো সার্কুলার ছাপুক না। অফিসের সময় ভাগ করে দিক। আটটা থেকে সাড়ে এগারটায় ভেঙে ভেঙে অফিস টাইম করুক। ৮টায়, ৯টায়, সাড়ে ৯টায়, দশে, সাড়ে দশে, এগারোয়, সাড়ে এগারোয়। চাপ তের কমে যাবে। এক-এক টাইপের অফিস শুরু হোক এক-এক টাইমে।'

'কে শালা তোমার সুখ-সুবিধে ভাবছে!' ক্রমে আলোচনার উত্তাপ বাড়ছিল।

'বরং কত বেশি করে অত্যাচারের বোঝা চাপানো যায়, আমলাভারী শাসনযন্ত্রের ফন্দি-ফিকির তাই-ই।'

'আরে ওরাই তো কংগ্রেসের বারোটা বাজাল। নিজের কোলে অনবরত ঝোল টেনে মুষ্টিমেয়ের পার্টি বানিয়ে ছাড়ল একটা জাতীয় দলকে।'

'তা তোমার সেই জাতীয় দলের চেতনা তো আজও জাগে নি। আজকের শহরটার দিকে তাকিয়ে দেখো, রাজ্যপালের আমলা মিনিস্টারদের ব্যুরোক্র্যাটিক শাসন পদ্ধতি কের সেই রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষজনের কী দুর্দশা।'

'আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? দুর্ভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে ওটা গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে যায়। না হ'লে মানুষ কখনো যুগ যুগ ক্রীতদাস থাকতে পারে! অথচ তাই সম্ভব হয়েছে। দুর্ভোগটা বুঝতে পারে না মানুষে।'

'বাস্তবিক আজকের এই দুর্ভোগ লোকে যখন ইতিহাসের পাতায় পড়বে একদিন, যেদিন দুর্ভোগের অবসান হয়েছে, সেদিন তারা ভাববে, উরে বাস রে, লোকগুলো বেঁচেছিল কী করে।'

'যানবাহনের ব্যবস্থা যদি নাই করতে পার তো হাজিরার কড়াকড়ি কি করে কর হে? চাকুরে মানুষ কি সেকেলে গৃহবধূ? সব ঝঞ্ঝাট তুমি পোয়াও, ব্যর্থ হলে শুকিয়ে মর! আর আমরা গৃহস্বামীর মতো সুখের অংশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চেটে খাই।'

'ঠিক। মোটা মাইনের ওপরও ওদের জন্য আছে অফিসের গাড়ি। কি কর বাপু তোমরা? সব দায়িত্ব তো নিচ তলার, তোমরা শুধু গোছানো ফাইলে সই কর, আর মালিকের শাসকের দালালি কর, সর্দারদের মতো অত্যাচার কর। জমিদারের নায়েবের মতো, ইংরেজের পেয়াদার মতো ঘুষের সুখের চাকরি। অথচ এক তক্কে আমলা-কতিপয়ের চারশ' থেকে নশ' টাকা ভাতা বাড়ে।'

'দূর শালা, আর বাঁচতেই ইচ্ছে করে না। ওদের মগজে কি সাধারণের চাইতে বেশি ঘিলু আছে?'

'তাই থাকলে কি ওদের ঠ্যাঙাড়ে নিয়ে রাজত্ব করতে হয়। আসলে ওরা একটা ছাঁচে ফেলা জাত। অসুবিধে ছাড়া কোথাও কখনো সুবিধে সৃষ্টি করার প্ল্যান ওদের মগজে আসে না। এই ছাঁচে এক জাতের অত্যাচারী সৃষ্টি হয় মাত্র।'

'দেখো না, বাস-ট্রামের জন্য মানুষ যখন খামচা-খামচি করছে আর একদল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়িতে একা ফেলে-ছড়িয়ে মৌজ করে চলেছে। চোখে কী লাটসাহেবী দৃষ্টি!'

'এ-ও আর বেশি দিন নয় হে। জমি দখল, বাড়ি দখল অবধি পৌঁচেছে, গাড়ি দখলই কি বাদ থাকবে!'

'গাড়ি দখল?'

'করলেই হয়। কতকগুলো পার্টি এখনো ভেবে পাচ্ছে না নতুন শ্লোগান কি দেবে। জমি দখল চলছে, বাড়ি দখলের আওয়াজ দিয়েছে। এবার গাড়ি দখলের আওয়াজও উঠবে। পার্টিতে না দেয়, শালা, আমরাই একদিন নেমে পড়ব।'

'সাংঘাতিক কথা।'

'কিন্তু কথাটা ঠিক। যদি একবার খালি গাড়ি চাপতে শুরু কর, বাপ বাপ করে যানবাহন সমস্যা সমাধানের জন্য তখন বড় লোকরা আমলাদের নেকটাই ধরে টান দেবে। আর ওদের বকলেস তো ওখানেই বাঁধা। দেখবে আই এ এসের মাইনে বাড়ানোর মতো তাড়াহুড়ো তখন শহরের যান সমস্যার ফাইল ক্লিয়ার করা হচ্ছে।' এই হল কথোপকথন।

কীর থেকে কী! স্বকর্ণে শোনা এই উত্তেজিত আলোচনায় চমকে উঠেছিলাম। কথাগুলো যে ঠিক ঐ ভাষাতেই বলা হয়েছিল এমন নয়, তবে বক্তব্যের ধারাবিবরণী যথাযথ রাখবার চেষ্টাই করেছি।

ইচ্ছার অঙ্কুর এই করেই তো পাক ধরায়। আর অসম্ভবই বা কি! যদি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর জমি দখলের চিন্তা বাংলার বাইরে জাগতে পারে, তো খোদ বাংলায় খালি গাড়িতে চেপে বসা এমন কিছু দিবাস্বপ্ন নয়।

আর চাপতে শুরু করলে, ছোকরা কটি ঠিকই বলেছে, আমলাদের ওপর চাপ আসবে একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য। চাপ না এলে ওঁদের মগজ খেলে না। সরকারী খরচের খাতায় আমলারা রাজবাড়ির হাতীর মতো। প্রভু পিঠে ঘণ্টা বাজিয়ে মধুর বাণী দুলিয়ে ঘুরতে পারে শুধু। প্রভুর অসুবিধা দেখলে ক্ষ্যাপা মাতঙ্গ দলে পিষে মারতে পারে নির্দয় আক্রোশে। কিন্তু কাজের কাজ ওঁদের দিয়ে হয় না।

আন্দোলনের ধাক্কায় আমরা সাধারণ মানুষেরাই কিন্তু মারা পড়ি। তাই আন্দোলনকে ভয় আমাদেরই। আমরাই আনপ্রটেক্টেড। ওরা না হয় কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ঢুকবে। রাইটার্সে ঘেরাও হলে ভোজ-সভায় সাধারণের আরও শাস্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আমরা? এই পদাতিক দরিদ্র নগরবাসী? কাছে-পিঠে আন্দোলনের পেটো ফাটলে সি-আর-পি'র ডাণ্ডা নেমে আসবে। যদিও পুলিশে, সশস্ত্র পুলিশে সংখ্যা এখন পাঁচজন নাগরিকে একজন, তবু হামলার মোকাবিলায় ওরা নির্দোষের ওপর অত্যাচার করে লোক ক্ষ্যাপানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

এই, যে দেশের অবস্থা, সেখানে নতুন-তর আন্দোলন মানেই গৃহস্থের যন্ত্রণা।

'গাড়ি দখলের' আওয়াজটা সুতরাং একেবারে অবাস্তব মনে হচ্ছে না। এ শহরে কিছুই অসম্ভব নয়। দুশ্চিন্তা তাই পেয়ে বসেছে। যানবাহন সমস্যার আশু সমাধান চাইছি অনেকদিন থেকে। এবার সেটা সিরিয়াসলি চাই।
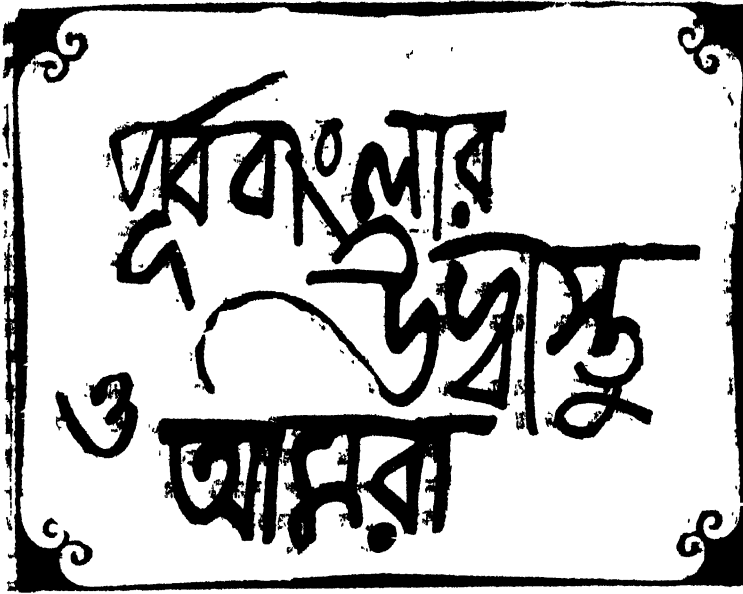
সাগর বিশ্বাস

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ জাতিকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য যে দীর্ঘমেয়াদী মুক্তিযুদ্ধ ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিলো, তাতে পূর্ব বাংলার দান ছিল অপারসীম। মুক্তিযুদ্ধে পূর্ব বাংলার অসংখ্য তরুণের রক্তের ঋণ কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজের ভেদ-নীতি এবং মুসলিম লীগের দ্বি-জাতিতত্ত্বের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ভারতের ক্ষমতালোভী 'ক্লান্ত' হিন্দু-নেতৃত্ব স্বাধীনতার জন্মলগ্নে পার্টিশনকে মেনে নিয়েও এই ঋণ অস্বীকার করতে পারেন নি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটি উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে : উত্তর ও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে একত্র ভোগ করতে না পারলে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা আমরা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারি না। বিদেশীর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে আমাদের দেশ-জননীকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা হাসিমুখে যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন এবং যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা আমরা কেমন করে ভুলব? তাঁদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি সরকার এবং ভারতীয় জনসাধারণকে অতি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

বস্তুত সর্দার প্যাটেলের এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালের ২রা আগস্ট তারিখে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু নেতারা দেশবিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি সর্দার প্যাটেল যদিও ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনসাধারণকে 'অতি সতর্ক দৃষ্টি' রাখতে আবেদন জানিয়েছিলেন, তথাপি গত ২৩ বছরের মর্মান্তিক ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, স্বাধীন ভারত সরকার প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে রাজনৈতিক ছিনিমিনি খেলেছেন। আজ যে মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের সামরিক পাহারাকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার সর্বহারা উদ্বাস্তু তাদের ভারতীয় ভাই-বোনদের সামনে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই মুহূর্তে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখলে এই কথাই মনে হবে যে মানবিক মূল্যবোধ বলতে বোধহয় আজ আর কিছুই আমাদের অবশিষ্ট নেই। সংবাদপত্রটির সম্পাদক একজন বাঙালী; যদিও প্রধান সম্পাদক বাঙালী নন। আমি ওই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশবিশেষের বাংলা তর্জমা সামনে রাখছি: পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে নিরবচ্ছিন্ন হিন্দু উদ্বাস্তু-প্রবাহ একটি অস্বস্তিকর ব্যাপার। বর্তমান বছরের জানুয়ারী মাস থেকে এই উদ্বাস্তুর সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১,২৫,০০০-এর ওপরে পৌঁচেছে এবং এই উদ্বাস্তু-স্রোত হ্রাস পাবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।...... হিন্দুদের এই প্রস্থানের কারণ যা-ই হোক না কেন, ভারত সরকার একথা ব্যাখ্যা করেন নি যে, কেন তাঁরা এভাবে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কোন বৈধ ছাড়পত্র ছাড়া ভারতে ঢুকতে দিচ্ছেন। এই বে-আইনী প্রবেশের জন্য আজ পর্যন্ত কোন উদ্বাস্তুকেই শাস্তি দেওয়া হয় নি। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন...। ......এই উদ্বাস্তুরা প্রকাশ্যেই আসুক আর অপ্রকাশ্যেই আসুক, ভারত সরকারের অবশ্যই এ ব্যাপারে কঠোর নীতি নির্ধারণ করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই ভারতে আর উদ্বাস্তু গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বে-আইনীভাবে প্রবিষ্ট প্রত্যেক উদ্বাস্তুকে অবশ্যই সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

এই প্রবন্ধের বক্তব্যের মধ্যে কেউ যদি ভারতের ভূতপূর্ব পুনর্বাসনমন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পান, তবে সম্ভবত তিনি ভুল করবেন না। আজ যে বৈধ ছাড়পত্রের কথা বলা হচ্ছে, পূর্ব বাংলা থেকে আগমনেচ্ছু সংখ্যালঘুদের, তা পাবার ক্ষেত্রে ভারত সরকার কতটা ব্যবস্থা করেছেন? ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত যদিও বৈধ ছাড়পত্র দেবার একটা মোটামুটি ব্যবস্থা ছিল, ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার চক্রান্তে কিভাবে কার্যত একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল, সে কথা গত ১৬ই জুলাই-এর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধে বলেছিলাম। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করবো না। শুধু বলতে চাই আজও বৈধ ছাড়পত্র পাবার ক্ষেত্রে সেই নৈরাজ্য চলছে এবং পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা নিরুপায় হয়েই সব কিছু সীমান্তের ওপারে ফেলে রেখে শুধু হাতে ভারতের করুণাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে যে, যে দেশের ওপর তাদের নৈতিক এবং জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে আজ তারা করুণার প্রত্যাশী। ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস! আজ তাদের বিদেশী বলে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রয়াস চলছে। যাঁরা এই অপপ্রয়াসে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা সম্ভবত ভুলে যান, স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নে তাঁদের প্রতি ভারতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতির কথা—ভুলে যান ভারতের সংবিধানের কথা যার ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: পঞ্চম অনুচ্ছেদে যা-ই বলা হয়ে থাকুক, কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কোন অঞ্চল থেকে ভারতীয় এলাকায় চলে এলে তাঁকে এই সংবিধানের সূচনাকাল থেকেই ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে—যদি,

(ক) তিনি বা তাঁর পিতা বা মাতা কিংবা পিতামহ, মাতামহ, পিতামহী বা মাতামহীদের কেউ ১৯৩৫ সালের ভারত

[illegible] আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভারতীয় এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, এবং—

(খ) (১) যদি তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর আগে পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতীয় এলাকায় বাস করে থাকেন, অথবা—

(২) যদি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পরে এসে এই সংবিধান চালু হবার আগে ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত করে থাকেন।

তবে আবেদন করার আগে অবশ্যই অন্তত ছয় মাসকাল তাঁকে ভারতীয় এলাকায় বসবাস করতে হবে।

আজ যাঁরা এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে ভারত রাষ্ট্রের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চান তাঁরা শুধু আত্মবিস্মৃত হন না, সংবিধানের এই বিশেষ ধারাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও উপেক্ষা করেন।

উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছেঃ ভারত সরকার কি এই অশুভ 'মুক্তদ্বার-নীতি' অনুসরণ করে চলবেন? সরকার যদি পাকিস্তানের এই তথাকথিত 'ভারতীয়'দের দায়িত্ব অনির্দিষ্টকাল স্বীকার করেন তাহলে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের আগমন রোধ করা কষ্টকর হবে।

কিন্তু কেন? আজ যে সব ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা তাঁদের ওপর কি কেউ ওইসব দেশের নাগরিকত্ব জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল? কিন্তু আজ যাঁরা পাকিস্তানের বাসিন্দা, একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন যে, দেশবিভাগের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তই তাঁদের ওপর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব চাপিয়ে দেয় নি? এক কোটি পঁচিশ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষ নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় সেদিন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি? তা যদি করতেন তাহলে আজ স্বাধীনতার ২৩ বছর পরেও তাঁদের নিশ্চয়ই সীমান্ত অতিক্রম করবার প্রয়োজন হতো না। ভারতের সংবিধান তাঁদের যে নাগরিক অধিকার দান করেছে, এ কথা ইচ্ছে করে ভুলে যাবার প্রবণতার মধ্যে এই সত্যকে-ই এড়িয়ে যাওয়া হয় না কি? সিংহল, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে এদের অসংগত তুলনা করবার অর্থ কি আত্মপ্রতারণা নয়?

প্রবন্ধটিতে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ যে সকল 'উদ্বাস্তু' আসছে এবং ভবিষ্যতেও আসবে, ভারত সরকার তাদের নিয়ে কি করবেন? তাদের জন্য কি কর্মসংস্থান করা যাবে? তারা কি জমি পাবে?—ঘর পাবে? কোথায়? কে তাদের পুনর্বাসনের টাকা দেবে এবং ভারতবর্ষের যে লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে আছেন, তাঁদের তুলনায় এই উদ্বাস্তুদের জন্য অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হবে কেন?... পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চয়ই তাদের স্থান দিতে পারবে না। আর অন্যান্য রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে তার অবাঞ্ছিত।

ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে জাগানো যায়। কিন্তু জেগে-ঘুমোনো মানুষকে জাগানো সম্ভব নয়। প্রবন্ধের এই সমস্ত প্রশ্ন মনকে চোখ ঠারার অপূর্ব নিদর্শন। দায়িত্ব স্বীকার করার থেকে দায়িত্ব পালন করাটাই বড় কথা। ভারত সরকার এই উদ্বাস্তুদের দায়িত্ব যদিও অস্বীকার করেননি, তথাপি এদের প্রতি সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন কখনোই করা হয় নি। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারই এদের সামনে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অন্ধ্র, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার ৮০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য যে দন্ডকারণ্য পারকল্পনা রচিত হয়েছিল তা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল কার অভিশাপে? দন্ডকারণ্য প্রকল্পের জনপ্রিয় চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মিঃ এ এল ফ্লেচারকে সরিয়ে মিঃ এস জে জনসনকে নিয়োগ করে এই প্রকল্পের বারোটা বাজাতে এগিয়ে এসেছিল কারা? ১৯৬১ সালে পুনর্বাসন বিভাগ তুলে দেবার সার্কুলার জারী করে অসহায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে 'প্যানিক' সৃষ্টি করা হয়েছিল কার চক্রান্তে? পুনর্বাসনের টাকার প্রশ্ন ত' পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বেলায় ওঠে নি? (পুনর্বাসনমন্ত্রী খান্নাজী একজন পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তু ছিলেন)। তবে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের বেলায় এ প্রশ্ন কেন উঠবে? খাস পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি প্রকল্প (যেমন—রাজ্য পরিবহন সংস্থা) রচিত হয়েছিল সেখানে ক্রমবর্ধমান অবাঙালী অফিসার-কর্মচারীর অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উদ্বাস্তুদের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছেন কারা? আজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দ্বারই বা তাদের সামনে রুদ্ধ হচ্ছে কেন?

১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী পূর্ব বাংলার হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৯২ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি হিসাবে দেখা যায়, '৬১ সাল থেকে '৬৩ সাল পর্যন্ত বৈধ ছাড়পত্র নিয়ে মোট ৩৬,৪৬৯ জন এবং '৬২-৬৩ সালে অবৈধভাবে ২৪,৮০৬ জন উদ্বাস্তু পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। '৬৪ সালে এসেছে ৬ লক্ষ উদ্বাস্তু এবং এবছর দেড় লক্ষ। সুষ্ঠু পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও আমরা অনুমান করতে পারি, ১৯৬১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দশ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু ভারতে এসেছে এবং এখনো ৮০ লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পূর্ব বাংলায় অপেক্ষমাণ। এদের পুনর্বাসনের টাকা কে দেবে এ প্রশ্ন করার আগে আমরা ত' কখনো ভাবতে চাই না ৫৮ কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষের সংস্থান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে কেন? অন্যান্য রাজ্যের কাছে হয়তো তারা অবাঞ্ছিত কিন্তু যে সকল রাজ্য এদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দিতে প্রতিশ্রুত, সেই সব জমিকে ভারত সরকার কতটা ব্যবহার করতে পেরেছেন? খাস পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার প্রাক্কালে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ ২৮ হাজার একর। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে দেখা যায় ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সরকার ৬২,৯১৪ একর জমি উদ্ধার করেছেন এবং ৩২ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বাকী ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমির কি হলো? ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে। অবশ্যই এই দশ লক্ষ একর জমি সবই 'অনাবাদী' পতিত জমি নয়, এর মধ্যে বহু পরিমাণে আবাদী বেনাম জমি আছে। ধরা যাক, ৫ লক্ষ একর অনাবাদী জমি এর মধ্যে আছে। তাহলেও প্রশ্ন থাকে বাকী ১১ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমির খবর কি? আসল কথা হলো, আন্তরিক সদিচ্ছা না থাকলে কোন কিছুই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উদ্বাস্তুরা রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে মন্তব্য করে লেখা হয়েছেঃ On the other hand, failure to rehabilitate them and provide them with jobs will through them into the arms of the Naxalities and other extremists; and in another six to eighteen months from now the very authorities that are unmindfully holding the door open for every East Pakistan Hindu to migrate to India will be shooting down the same people as a 'law and order problem....'

যুক্তির দিক থেকে এটা নিঃসন্দেহে খুবই দুর্বল যুক্তি। ধরা যাক, পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু আসা বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে ভারতের রাজনৈতিক উগ্রতা ও অস্থিরতা কমে যাবে বলে কি কেউ

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

স্মৃতির কুঠার

মানস রায়চৌধুরী

তোমার যাওয়ার পর চার বছর কেটে গেল
চার বছর মানে কত দিনরাত্রি ঘণ্টা ও মিনিট সমবায়ে
আমার রক্তের মধ্যে ওঠাপড়া
উড্ডীন বাজপাখি আর মরুভূমি ক্যারাভান অথবা বোয়িং

আমার রুমালে কতো অশ্রুপাতের মতো তোমার রক্তের
ভিজে রেখা
বিদ্যুৎ চমকের সাদা হাড় আর গঙ্গোদকে বিসর্জন [illegible]
স্নেহছায়া দূরে যায়, দূরে যায় দীর্ঘনিশ্বাসের ঘূর্ণি ঝড়ে।

তবু কি গিয়েছে সব ঝড়ে উড়ে? ওই যে দীপ্ত দুটি শিশু
আমার বুকের পাশে হেসে খেলে জীবনকে সত্য বলে যায়
অথবা আগুন রঙ হাতে করে ওই মাতা তোমার
শিশুর স্বপ্নে মেলায় দিগন্ত
চার বছর কেটে যায়, বয়ে যায় আমার আয়ুর ক্ষীণ স্রোত
অনন্ত অরণ্য দেখি চৈতন্যে এখন শুধু ওঠে পড়ে স্মৃতির কুঠার।

গ্যারাণ্টি দিতে পারেন? তা পারা সম্ভব নয়। কারণ এই অস্থিরতার উৎস অন্যত্র, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের অনেক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অজুহাতে পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের গায়ে অযথা কলঙ্কলেপন করা হয়েছে বহুবার—আজও হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক উগ্রতা বা অস্থিরতা কি কেবল পশ্চিমবঙ্গেই আছে? অন্ধ্র প্রদেশের যে এলাকা উগ্র রাজনীতির পীঠস্থান—সেখানে ক'জন উদ্বাস্তু আছে? মহারাষ্ট্রের শিবসেনা কি পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু নিয়ে গঠিত? গুজরাটের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুরা গিয়ে বাধিয়েছিল? দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। চিন্তার সংকীর্ণতার জন্য অন্যকে দোষারোপ করে লাভ কী? অপরের দায়িত্বহীনতার প্রতি কটাক্ষ করে নিজের দায়িত্ব স্খলন করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তাই উদ্বাস্তু সমস্যার সকল দায়িত্ব যাঁরা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে একটি গোঁজামিল প্রশ্রয় দিতে চান। উপরোক্ত দৈনিক পত্রিকাটির ওই সম্পাদকীয় প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও একই সুরে লেখা হলো: কোনও দেশ, তা যত শক্তিমানই হোক, কখনও রাতারাতি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে না। নিঃশব্দে সে বোঝা বহন সম্ভব নয়, বহনের প্রশ্নও ওঠে না। বিশেষত, অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যখন অজ্ঞাত। আজিকার দেড় লক্ষ যে আগামীকাল দশ লক্ষে পৌঁছাইবে না, সে নিশ্চয়তা কোথায়? তা ছাড়া মনে রাখা চাই, এই আগন্তুক দল অন্য আর একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নৈতিক দায়িত্ব ভারতের বটে, কিন্তু উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে পাকিস্তানের দায়িত্ব আরও অনেক বেশি।

হ্যাঁ, পাকিস্তানের দায়িত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারে না। পাকিস্তানও আলোচনায় বসে কোনদিনই এই দায়িত্ব অস্বীকার করে নি। তাই 'নেহরু-লিয়াকত' চুক্তিতে পাকিস্তান সই করেছিল, সই করেছিল তাসখন্দ চুক্তিতেও। কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার করা আর তা পালন করা দুটি আলাদা জিনিস। তাই পাকিস্তান নীতিগত দিক থেকে যদিও সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব অস্বীকার করে নি, কিন্তু কার্যত এই দায়িত্ব সে কখনোই পালন করে নি। তা যদি করতো তাহলে আজ ২৩ বছর পরেও এমন করে সংখ্যালঘু মানুষের দল ভারতবর্ষে পাড়ি জমাতো না। এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে উদ্বাস্তু সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ না হলে আমাদের ভুল হবে। দুটো জিনিস আমাদের ভাবতে হবে, তা হলো সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানে বাস করতে পারবে, কি পারবে না। প্রথমটির উত্তরে একটি দশ বছরের শিশুও বলবে, না পারবে না. কারণ পাকিস্তান ইসলামিক রিপাবলিকে সে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা সেখানে বাস করুক, এটা সে দেশের সরকার কখনো চায় না। তা যদি চাইতো তাহলে এই নিরবচ্ছিন্ন উদ্বাস্তু-স্রোত অনেক কাল আগেই বন্ধ হয়ে যেতো। এ ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের সনদটুকু পর্যন্ত লঙ্ঘন করেছে। অতএব পাকিস্তানের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা আশা করা বৃথা।

তাহলে আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে, তাদের পক্ষে সে দেশে বাস করা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্বাধীনতা-বঞ্চিত ওই কয়েক লক্ষ মানুষের দায়িত্ব নৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের ওপর বর্তায়। এখন প্রশ্ন হলো—ভারত এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে? এ সম্পর্কে দুটি পথের কথা ভাবা যায়—। (১) রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার ওপর সহযোগিতার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং (২) নিজের দায়িত্বে ভারতের ৫৮ কোটি মানুষের মধ্যে এদের মানবিক মর্যাদা স্থাপন করা। প্রথমটি কতটা সার্থক হবে বলা শক্ত। কারণ চাপ সৃষ্টি করে সহযোগিতা আদায় করা যায় না। তা ছাড়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেও সেই চুক্তিকে কার্যে রূপান্তরিত করতে হবে—পাকিস্তানের রাজনৈতিক [illegible] এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম তাদের কাছে খোঁজ পাওয়া যায় নি। এ প্রচেষ্টা সফল কিংবা আংশিক সার্থক হলে ভাল কথা, না হলে সমস্ত দায়িত্বই ভারতকে মাথা পেতে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেবল নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে চুপ করে বসে থাকা চলে না। দায়িত্ব যদি পালন করাই না যায় তাহলে কেবল মুখে নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করা-না-করা সমান কথা। তাতে সমস্যার কোন হেরফের হয় না। এটি এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা ও পলায়নী মনোবৃত্তি। এ বোঝা বহনের প্রশ্ন ওঠে না বললে এই সত্যকে কি গোপন করা হয় যে, ভারত তার স্বাধীনতার জন্মলগ্নে এই কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভারতের সংবিধানের ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ সেই প্রতিশ্রুতিরই তাৎপর্য বহন করে? জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ যদি কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর সুষ্ঠু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারে, তবে ৫৮ কোটি মানুষের দেশ এই বিশাল ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ মানুষের স্থান হবে না কেন?
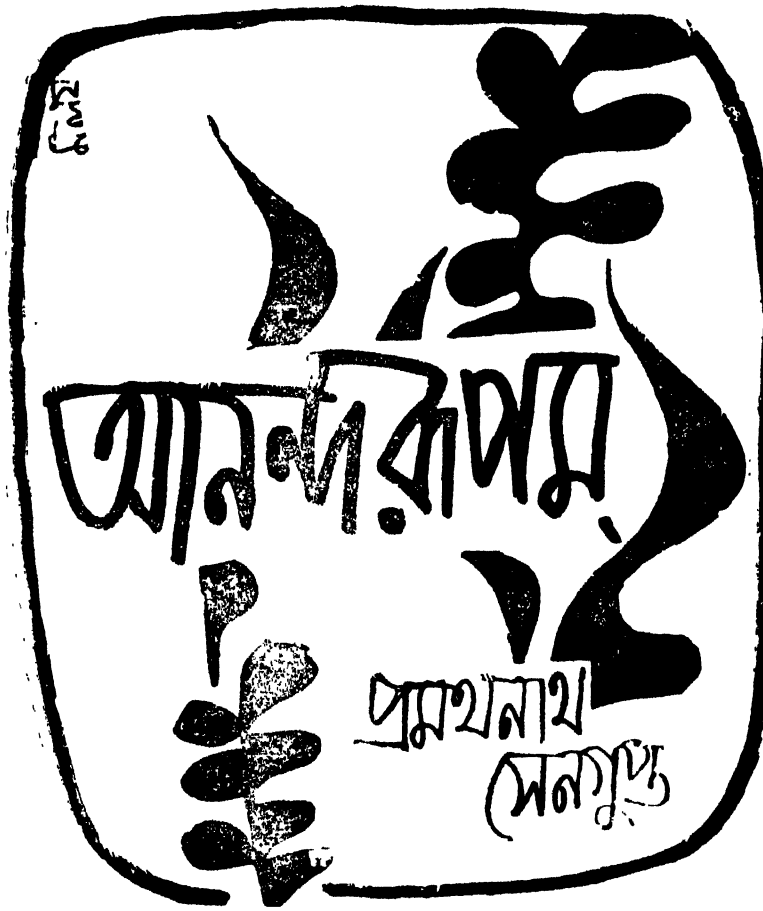
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(১২)

এই প্রসঙ্গে তখন যাঁরা শান্তি-নিকেতনে ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের কথা না বললে এই রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। প্রথমেই মনে পড়ে ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র ও ইঞ্জিনীয়ার কেশবচন্দ্র সেনকে, 'সেবক' নামেই যিনি ওখানে সুপরিচিত। আশ্রমে ইঞ্জিনীয়ারের কাজ ছাড়া তিনি পাঠ-ভবনের কিছু ক্লাশও নিতেন। আমি কাজে যোগ দেবার কয়েকদিন পরেই তিনি এলেন, থাকতেন শিশুবিভাগের পূর্বদিকের একখানা ঘরে। বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী, খুব বুদ্ধিমান ও অক্লান্ত পরিশ্রমী—খদ্দর পরতেন সর্বদা, মনটাও খদ্দরের মতোই শুভ্র, পরোপকার করতে পারলে সদা প্রফুল্ল। এরূপ দরদী বন্ধু বিরল। তবে মাঝে মাঝে ওঁর দেশের খাঁটি মেজাজটি প্রকাশ পেত, একবার 'না' বললে 'হাঁ' বলায় কার সাধ্য! পাঠভবনের ছেলে-মেয়েরা ওঁকে খুব ভালোবাসতো. যখন যেখানে চলতো না। কী তাঁর উৎসাহ, কী অসামান্য উদ্দীপনা! যাঁরা দেখেন নি তাঁদের পক্ষে তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তখনকার দিনের ইঞ্জিনীয়ার, অনেক জায়গা থেকে ভালো ভালো চাকরির ডাক এসেছে, কিন্তু শান্তিনিকেতনের আদর্শের সঙ্গে নিজেকে এমনিভাবে মিশিয়ে দিয়ে-ছিলেন যে বাইরের বেশি মাইনের চাকরি বা আর্থিক স্বচ্ছলতা বা পদ-মর্যাদার কোনো মোহই তাঁকে শান্তি-নিকেতনের কর্মকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। একটা সেবাধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন, ৩৫।৩৬ বছর পরেও তিনি সেখানেই রয়ে গেছেন, 'সেবক' নামটা তাঁর সত্যি সার্থক।

এর কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষাভবনে বোটানীর অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন পুণ্যময় সেন, 'কিস্টুদা' নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তাঁকেও পাঠ-ভবনে অনেক ক্লাশ নিতে হতো। থাকতেন প্রথমে এক আত্মীয়ের সঙ্গে, গোছালো স্বভাবের, একজন অক্লান্ত কর্মী, সপ্তাহে কখনো কখনো চাল্লিশ পিরিয়ড্ ক্লাশও নিয়েছেন। এ কথা শুনে এখন অনেক অধ্যাপকই হয়তো অবিশ্বাসের হাসি হাসবেন, অতি-শয়োক্তির অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত করতে দ্বিধা করবেন না। ছেলে-মেয়েদের এমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে ও আপন করে নিতে খুব কম অধ্যাপককেই দেখেছি; 'কিস্টুদা'-'সেবকদা' বলতে তখনকার ছেলে মেয়েরা পাগল। শিশুবিভাগে যে সব ছেলে চিঠি লিখতে পারত না তাদের অভি-ভাবকের কাছে নিয়মিত চিঠি লেখার কাজটা কিস্টুদাকেই করতে হতো। ওদের অসুখ-বিসুখ করলে হাসপাতালে নিয়মিত দেখাশোনাও ওঁর নির্দিষ্ট কাজ ছিল। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাপনাকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন বলেই তিনি ছিলেন শিক্ষার্থীদের অতিপ্রিয়, তার উপর অন্তরের উদারতায় ও পরিপূর্ণতায় সহজেই তিনি শিক্ষার্থী সহ সকলেরই মন জয় করে-ছিলেন। সদা প্রফুল্ল মুখ, কর্তব্যে দৃঢ় এই নির্বিরোধী ও নিরহংকার ভদ্রলোকটিকে ওখানে সবাই খুব ভালোবাসতেন।

এর পর এলেন ক্ষিতীশ রায়, সুধীর রায়, তারপর সুধীর গুপ্ত। ক্ষিতীশ রায় ছিলেন বয়োকনিষ্ঠ, সবাই ডাকতো 'বাণী' বলে। ইংরেজিতে সদ্য এম-এ পাশ করা, শিক্ষাভবনে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলেন; ওঁকেও পাঠভবনে অনেক ক্লাশ নিতে হতো। শুধু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নন, এক-জন প্রতিভাশালী লেখক, যেমন সুন্দর ইংরেজি লিখতেন তেমনি লিখতেন বাংলা; বিশেষ করে তাঁর ছোট কবিতা ও গল্প ছেলে-মেয়েদের খুবই প্রিয় ছিল। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল মুখ, স্বভাবে একেবারে ছেলেমানুষ, তাই সবারই প্রিয় এই প্রিয়দর্শন যুবকটি। কোথাও কোনো 'পিক্‌নিক্' বা 'আউটিং' হলে ছেলে-মেয়েদের ক্ষিতীশদাকে চাই—নানা রকমের নানা ছন্দের ইংরেজি, বাংলা গান-কবিতা ও খেলার প্রবর্তন করে সহজ সরল আনন্দে আসর সরগরম করে রাখতেন। তাঁর 'London Burning' গানের খেলাটা আজও কানে লেগে রয়েছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে তিনি ছিলেন ভরপুর: হয়তো ছেলেমানুষি স্বভাবের জন্যই বা অন্য কী কারণে ঠিক জানি না ওঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা ওঁর প্রতি আকৃষ্ট

সুধীর রায় ও সুধীর গুপ্ত দুজনেই ইতিহাসের অধ্যাপক। সুধীর রায় অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, ছোটখাটো মানুষটি। পড়াশুনো নিয়ে সদা মগ্ন, তবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'আউটিং'-এ যাওয়া চাই-ই। একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, কিন্তু সুরসিক, লোকচরিত্র অনুধাবন করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, আর প্রত্যেকের জড়িমার নকল করতে পারতেন অনায়াসে। আপনভোলা মানুষ, কখন কোন্ ক্লাশ, কবে কখন কোথায় কোন্ মিটিং বেমালুম ভুলে যেতেন। প্রায়ই চশমা টেবিলে ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়তেন, পথ চলতে চলতে হোঁচট খেলেই বলতেন, "আজ রাস্তাটা এতো খারাপ কেন? এতো গর্তই বা এলো কী করে?" তারপরেই হঠাৎ আবিষ্কার করতেন চোখে চশমা নেই, বলতেন 'দেখেছো, চশমাটা ভুল করে ফেলে এসেছি, তাই চলাফেরার একটু অসুবিধা হচ্ছে।' ঘন লোমশ শরীর, তাই সর্বদা জামা পরে থাকতেন; শুনেছি ঢাকায় যখন ছিলেন একদিন কার অতর্কিত ডাকে অসতর্ক মুহূর্তে খালি গায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের সামনে পড়লেন। গাড়োয়ান ওঁর দিকে তাকিয়েই নাকি বলে উঠল, "এইটা কী করছেন কর্তা! আর জামা কিনোনের দরকার অইব না, হামনে (সামনে) কয়টা বুতাম লাগাইয়া লইলেই অইব।" একবার অধ্যাপক-মণ্ডলীর জরুরী মিটিং-এ উনি এলেন মিটিং যখন শেষ হয়ে গেছে তখন. সবিনয়ে বললেন, "মিটিং-এর সময়টা ও তারিখটা ভুলে গিয়েছিলাম।" অধ্যক্ষ মহাশয় ওঁকে একটি ডায়েরী উপহার দিয়ে বললেন, "এতে সব এনগেজমেন্টের সময় ও স্থান লিখে রাখলে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।" এর কিছুদিন পরেই আর এক মিটিং-এ আবার বিপর্যয়; বললেন, "ডায়েরীটা দেখতেই ভুলে গিয়েছিলাম, এক অধ্যাপকের কাছে খবর পেয়ে মিটিং-এ এলাম।"

সুধীর গুপ্তের দীর্ঘদেহী ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত শরীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র, প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণী, সম্ভবত প্রথম স্থানই অধিকার করে এসেছেন। শুনেছি 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসেস্'-এর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন খুব উচ্চস্থান অধিকার করে, কিন্তু দুর্দৈবশতির পারেন নি। যেমন ছিলেন লেখাপড়ায় ভালো খেলাধুলোতেও তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা খেলোয়াড়, অর্থাৎ সেখানেও প্রথম শ্রেণী। লেখাপড়া ও খেলাধুলা এই দুটি গুণের এমন একটা অপূর্ব সমন্বয় ছিল ওঁর মধ্যে যা বড়ো একটা দেখা যায় না। কঠিন মানুষ, নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা সে ক্লাশের মধ্যেই হোক বা খেলার মাঠেই হোক। এর জন্যে অনেকে এই ভদ্রলোককে অনেক সময় ভুল বুঝেছেন।

নিতাইবিনোদ গোস্বামী, 'গোঁসাইজী' নামেই ওখানে সবাই জানেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক। পণ্ডিতমশাই বলতে তখনকার দিনে ছাত্রমহলে শিখাধারী, রুদ্ররোষে প্রদীপ্ত, ছাত্রপ্রপীড়ক বলে যিনি সদা শিশুমনে ভীতির সঞ্চার করতেন গোঁসাইজী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন অমায়িক সদাপ্রফুল্ল, মধুরস্বভাব, প্রতিভাধর মানুষ অত্যন্ত বিরল। নিজ চরিত্রের গুণেই তিনি সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন; কী শিক্ষার্থী, কী অধ্যাপক, কী কর্মী, তা তাঁরা যে কোনো স্তরেরই হোন, ওঁকে ভালোবাসতেন। ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী, বিপদে অবিচলিত এই নিরভিমান মানুষটিকে সবাই অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন। যেদিন তাঁর একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর তরুণ বয়সে মেনিনজাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলো সেদিনের কথা ভুলবার নয়—মৃত ছেলের শয্যাপার্শ্বে বসে আছেন সীমাহীন বেদনায় পাষাণে রূপান্তরিত গোঁসাইজী, চোখে জল নেই। হঠাৎ সেই পাষাণের বুক ফেটে বেরিয়ে এলো এই কথা, "মহাভারতে লেখা আছে এক শ্লোকঃ অপুত্রকঃ, আমার জীবনে যে এই ঋষিবাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করার জন্য এমনি অকরুণ অভিঘাত এসে পড়বে তা কোনোদিন ভাবি নি।"

তেজেশচন্দ্র সেন ছিলেন পাঠভবনের অধ্যাপক—প্রকৃতি-পরিচয়. গা ছ পা লা, পশু-পাখী, পোকা-মাকড় এ সব বিষয়েই তিনি শিশুদের শিক্ষা দিতেন। ছোটোখাটো গোলগাল চেহারা, সবাই বলতেন 'গোলবাবু'. থাকতেন মন্দিরের পূর্বদিকে একটি উঁচু জলাধারকে কেন্দ্র করে তৈরি করা একটি গোলাকার খড়ের ঘরে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রসিক মানুষটি, অবিবাহিত, নিজে রান্না করে খেতেন; কেউ ওঁর বাড়িতে এলে নিজের হাতে চা করে খাওয়াতেন। উপাসক, শান্তিনিকেতন 'চা-চক্রের' নিয়মিত উপস্থিতশীল সদস্যের মধ্যে ছিলেন তিনি ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। 'গোলবাবু' আশ্রমে আছেন অথচ চা-চক্রে অনুপস্থিত এমন দুর্ঘটনা কোনোদিন ঘটেছে বলে তো শুনি নি। এতো বয়েস অবধি অবিবাহিত, কেউ যদি বলতেন 'তেজেশবাবু, এবার একটা বিয়ে করুন, কতকাল আর স্বপাক খেয়ে একা একা কাটাবেন?' সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মগাম্ভীর্যের আড়ালে পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলে উঠতেন, "মশায়, চেষ্টার ত্রুটি করি নি, কিন্তু পাত্রী জুটলো না, আমি যাঁকে পছন্দ করি তিনি করেন আমাকে অপছন্দ, এভাবেই তো এতদিন চলছে। দিন্ না একটি মনোমত সুস্থ চাকুরে-পাত্রী জুটিয়ে যিনি বয়সের অসমতায় ক্ষুব্ধ না হয়ে হাসিমুখে স্বামীসেবা করবেন। তা হলে তো শেষের দিনগুলি পরমানন্দে স্ত্রীর রোজগারে বসে বসে খেতে পারি। সত্যি বলছি, দিন না একটি সুপাত্রী জুটিয়ে!"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশ্বভারতীর 'গ্রন্থাগারিক', আর সহ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। প্রভাতবাবু বেশ ফর্সা রঙের সুন্দর চেহারার মানুষ, দীর্ঘদেহী, দাড়ি গুরুদেবের দাড়ির মতো করে রাখার প্রচেষ্টায় যত্নবান। অধ্যাপনাও করতেন, সুনাম ছিল বেশ। গ্রন্থাগারিক হিসেবে ভারতের সর্বত্র তাঁর খ্যাতি। দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল প্রভূত। নতুন বই এলে সযত্নে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অননুকরণীয় পদ্ধতিতে ঐ বইয়ের 'রিভিউ' করে লাইব্রেরীর বারান্দায় টাঙিয়ে দিতেন. উদ্দেশ্য সহজেই তা অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টি যাতে আকর্ষণ করে। বিশ্বভারতীর সব গ্রন্থের মুদ্রণ ও প্রকাশনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, 'বুক অব নলেজ' বা শিশু-ভারতীর মতো 'জ্ঞান-ভারতী' নামে একখানা বড়ো গ্রন্থ লিখেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী, সদা কাজে ব্যস্ত মানুষটি, কিন্তু সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত।

সত্যচরণবাবু ছিলেন অতি অমায়িক মানুষ; দীর্ঘদেহী, মুখে হাসি লেগেই আছে। অধ্যাপকই হোন আর ছাত্রই হোন, ওঁর কাছে ব্যবহারের এতটুকু পার্থক্য নেই। কোন্ বই কোন্ 'সেল্ফে' আছে তা ছিল ওঁর নখদর্পণে, বইয়ের নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই বলে

[illegible] অত [illegible] আলমারি দেখুন'। কোনো-দিন ভুল হতে দেখিনি।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 'হাঁদু মুখুজ্জে' বলেই সুপরিচিত, পাঠভবনের গণিতের অধ্যাপক। সুন্দর ফুটবল খেলতেন, শান্তিনিকেতন ফুটবল টিমের একটি স্তম্ভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। উনি ছিলেন 'ছাত্রপরিচালক', পাঠভবনের আবাসিক ছেলেদের সম্পূর্ণ ভার ছিল ওঁর উপর। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনি প্রাক্তন ছাত্র, পরবর্তীকালে উচ্চতর শিক্ষা শেষ করে সেখানেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। 'শমীন্দ্র কুটির', যেখানে তখন ছিল পাঠভবনের 'ডর্মিটরী', তারই সংলগ্ন একটি ঘরে থাকতেন, সব সময় ছেলেদের চোখে-চোখে রাখতেন, ওদের ভালোবাসতেন খুব, ছেলেরাও ওঁকে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু কেউ 'ডিসিপ্লিন' ভাঙলেই মনে করতেন ওঁরই পারদর্শনের কোনো ত্রুটিতে তা ঘটেছে, অর্থাৎ ছাত্রপরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ওঁর নেই! কতদিন 'তনয়দা' ও ডঃ সেনকে বলেছেন ঐ কঠিন কাজের তিনি অনুপযুক্ত, তাঁকে ঐ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু যিনি ছাত্রের অশালীন ব্যবহারের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করেন তাঁর মতো একজন আদর্শ শিক্ষককে তো এই গুরুভার থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না। তাই ছাত্রপরিচালকের নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ কাজ থেকে মুক্তি পান নি। ছেলেরা সবাই ডাকতো 'বিশ্বনাথদা', ওঁর চার-পাঁচ বছরের ছেলে 'শিশির' একবার এলো ওখানে, এসে দু-একদিনের মধ্যেই 'বিশ্বনাথদা বাবা' বলতে শুরু করলো। শান্তিনিকেতনকে খুবই ভালোবাসতেন, তাই অবসর গ্রহণ করেও তিনি ওখানেই আছেন।

সরোজরঞ্জন চৌধুরী ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র, 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' সমরকার, যতদূর জানি সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সমসাময়িক। 'সরোজদার' মতো বন্ধুবৎসল, ধীর-স্থির-শান্ত ও অমায়িক মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। ছাত্রজীবনে নামজাদা ক্রীড়াবিদ ছিলেন, আলমারি ভরতি সযত্নে রক্ষিত 'কাপ, মেডেল' তার সাক্ষী। শান্তিনিকেতন 'ফুটবল টিমের' তিনি ও বীরেনদা ছিলেন নামকরা 'ব্যাক', অনেকে বলতেন দুর্ভেদ্য 'চীনের দেয়াল'। বীরেনদা পরিহাস করতেন 'জীবনে অনেক পদ্মি-মহাপীঠ দেখেছি কিন্তু [illegible] স্থান' আর দেখিনি, কতো অব্যর্থ গোল যে এই পিঠে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে তা বলা কঠিন।' সরোজদা ছিলেন উদার ও মহৎচরিত্রের মানুষ, কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। কতো ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে ওঁর জীবনে, বিশেষ করে জীবনসীমার শেষের দিকে, কিন্তু একদিনের জন্যও মুখের স্নিগ্ধ হাসিটি মলিন হতে দেখি নি। কোনো অবস্থা, তা সে যতো প্রতিকূলই হোক না কেন, এই সহজ সরল মানুষটির ভারসাম্য কখনো ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে যাঁরা ছিলেন সরোজদার চীনেভাষায় বক্তৃতার কথা আজও ভোলেন নি। চমৎকার অভিনয়প্রতিভা ছিল ওঁর, পরশুরাম বিরচিত 'বিরিঞ্চিবাবা' নাটকে ওঁর নিবারণের ভূমিকায় ও শচীন ডাক্তারের স্রেদম খাঁর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় শান্তিনিকেতনে অমর হয়ে আছে। একবার 'বর্ষামঙ্গল' অভিনয়ের পর অধ্যাপক ও কর্মিমণ্ডলী 'ভরসামঙ্গল' নামে একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ করেন সিংহসদনে। স্বয়ং গুরুদেব এলেন সেই নাটক দেখতে। সরোজদা চীনেম্যানের রূপসজ্জা করে চীনেভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করে গেলেন, চীনাভবনের প্রফেসার 'তান্ য়ুন্ সান্' ঐ বক্তৃতা শুনতে শুনতে অনুধাবন করার ভঙ্গিতে ঘন ঘন মাথা নাড়তে শুরু করলেন। সবাই বলাবলি করছেন, সরোজদা এতো অল্পদিনের মধ্যে এমন সুন্দর চীনেভাষা কার কাছে শিখলেন! শাস্ত্রী মশায় চীনেভাষায় সুপণ্ডিত, বললেন 'সরোজের বক্তৃতার কিছুই বুঝতে পারলাম না।' প্রফেসার তান্ য়ুন্ সান্ও স্বীকার করলেন এই বক্তৃতার কিছুই অনুধাবন না করতে পেরে তিনি ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন। এমন কি গুরুদেবও সরোজদাকে ডেকে বললেন, "হ্যাঁরে সরোজ, তুই চীনেভাষা শিখলি কার কাছে?" তখন সরোজদা বললেন, ওটা গোটেই চীনেভাষা নয়, তবে কিছুদিন আগে চীনের রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল 'চিয়াং কাইশেক' আম্রকুঞ্জে অভ্যর্থনা সভায় চীনেভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারই অনুকরণে চীনেপাড়ার চীনে দোকানের নামগুলি তিনি পর পর বলে গেছেন।

শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এলেন শান্তিনিকেতনের ডাক্তার হয়ে, সবাই বলতো 'ডাক্তারবাবু'। ডাক্তারের মধ্যে যে এমন একটি কোমল হৃদয়ের মানুষ অধিষ্ঠিত থাকতে পারে তা এই শচীন ডাক্তারকে দেখার আগে জানা ছিল না। উচ্চতম ডাক্তারী খেতাব না থাকলেও চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ, আর এমন একটা অন্তর্দৃষ্টি ওঁর ছিল যে মামুলী নাড়িপরীক্ষা ও স্টেথেস্কোপ দিয়ে বুক-পিঠ পরীক্ষার পরই ঠিক রোগটিকে আবিষ্কার করে ফেলতেন। তাই বিধিমতো ঔষধ প্রয়োগে রোগ সারতে দেরী হতো না। রোগের প্রকোপ বেশি হলে রোগীর পাশে সারা রাত বসে থেকে নিজ হাতে তার শুশ্রূষাও করতেন। শান্তিনিকেতনে কারো বাড়িতে অসুখের খবর পেলে গিয়ে যাঁকে সর্বাগ্রে দেখা যেত তিনি হলেন 'শচীন ডাক্তার'। রোগের যন্ত্রণায় রোগী ছট্ফট্ করছে, তার কষ্টে ওঁরই চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখেছি। গোঁসাইজীর একমাত্র ছেলে বীরু যেদিন শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলো, গোঁসাইজী গভীর শোকে স্তব্ধ, কিন্তু শচীন ডাক্তারের সে কী কান্না! মনে হলো যেন ওঁরই পুত্রবিয়োগ ঘটেছে। আরো একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। উত্তরায়ণের বাগানে মালী ছিল নলিন, তার ছেলে 'গোবিন্দ' আমার কাছে কাজ করতো। গোবিন্দকে আমার স্ত্রী ছেলের মতো স্নেহ করতেন, গোবিন্দও ওঁকে 'মা' বলে ডাকতো; সুন্দর প্রাণোচ্ছল

ছেলেটি, বয়েস ১৫।১৬ বছর। হঠাৎ একদিন গোবিন্দ নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলো; খবর পেয়ে বিকেলে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি শচীন ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করছেন। গোবিন্দ তখন প্রলাপ বকছে আমার মার কাছে নিয়ে চলো, আমি এখানে থাকবো না। ওর মা বললেন, "কাল থেকে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে—মা, মা তুমি কোথায়? আমি কাছে গিয়ে বলি —এই যে বাবা আমি।" সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠে, "তুমি আমার মা নও, আমার মাকে নিয়ে এসো।" বললাম, 'কাল সকালে নিয়ে আসব। ভোরেই খবর এলো, শেষরাতের দিকে গোবিন্দ মারা গেছে। গিয়ে দেখি মৃত ছেলেকে সামনে রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে নলিন ও তার স্ত্রী। আমাকে দেখেই গোবিন্দের মা বললেন, "মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও প্রলাপ বকেছে—আমার মা এখনও এলো না? ও আমাদের কেউ নয়, আপনাদেরই ছেলে, ওর শেষ কাজ আপনাদেরই করতে হবে, আমরা করলে ওর আত্মার শান্তি হবে না।" শচীন ডাক্তার এলেন 'ডেথ সার্টিফিকেট' লিখে দিতে; শুনলাম দুপুর রাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত গোবিন্দের পাশেই তিনি ছিলেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এই তরুণ জীবনটিকে রক্ষা করতে। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টাকে ব্যর্থ করে একটি নিষ্পাপ প্রাণ চলে গেল। 'ডেথ সার্টিফিকেট' লিখে দিতে ডাক্তার একেবারে ভেঙে পড়লেন, সে কী কান্না, মনে হলো যেন ওঁরই পুত্রবিয়োগ ঘটেছে।

ডাক্তারী ছাড়া গান-বাজনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শচীন ডাক্তার ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। একবার একটা গানের আসরে উপস্থিত ছিলাম, সমঝদার হিসেবে নয়, কারণ সুর ও তালের সঙ্গে আমার চিরবিরোধের কথা ওখানে সর্ববিদিত; তাই এই রস পরিবেশনের আসরে একজন 'অসুরের' অনধিকার উপস্থিতি সঙ্গীতরসসুধা পান করার জন্য নয়। জলসা শেষে দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে যে-বিপুল আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ভোজ্যদ্রব্যের সদ্গতি করার জনাই এই অরসিকের আমন্ত্রণ, কারণ সুর-রসিক না হলেও খাদ্যরসিক হিসেবে বেশ একটু খ্যাতি ছিল। দেহের আয়তনের তুলনায় খাদ্যসম্ভার যে-পরিমাণে জঠরস্থ করতাম তার বিপুল অসংগতি দেখে অনেকেই বিস্মিত হতেন। 'সেবক' তো একদিন বলেই ফেললেন যে, আমার দেহটা নাকি 'বালিশের খোলের' মতো আগাগোড়া ফাঁপা, এমন কি হাড়গুলিও, তা না হলে এতো দ্রব্য এই ক্ষুদ্র জঠরে স্থান পায় কী করে! যাক, যা বলছিলাম, সঙ্গীতের জলসায় বসে আছি অন্তেবাসী হয়ে, হয়তো বা সঙ্গীতসাধনার রঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়ার জন্য মনে মনে অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিচ্ছি, হঠাৎ শচীন ডাক্তার পাশে এসে বসলেন। হেমেনদা (হেমেন্দ্রলাল রায়, সঙ্গীতভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ) একটি সুন্দর সুর বাজিয়ে তারের যন্ত্রটি রেখে দিলেন, চারদিক থেকে "সাধু, সাধু" ধ্বনি উঠলো। হঠাৎ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম শচীন ডাক্তার ঐ যন্ত্রটাকে কাছে টেনে আনছেন। বলে উঠলাম, 'এ২ ডাক্তার! কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!' হেমেনদার অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় ডাক্তার এমন অভিভূত যে, আমার কথা হয় ওঁর কানে গেল না, আর না হয়তো আমার নিষেধবাণী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। যন্ত্রটা এনেই এমন একটি সুন্দর সুর তাতে বাজালেন যে, উপস্থিত সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলেন। হেমেনদা বললেন, "এ যে দেখছি 'বর্ণচোরা আঁব', এতদিন নিজেকে প্রকাশ করেন নি কেন? গলায়ও নিশ্চয় সুর আছে, একখানা গান এবার নিবেদন করুন এই সুধী-সমাজে।" পর পর কয়েকখানা গান গাইলেন ডাক্তার, চারদিক থেকে 'সাধু সাধু' ধ্বনি। বললেন, ছেলেবেলায় শচীনকর্তার (প্রখ্যাত সংগীতাচার্য শচীন দেববর্মণ) শিষ্য ছিলেন, অনেক সুরই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। 'ভরসা-মঙ্গলে' মেদম খাঁর রূপসজ্জায় লুঙ্গি পরে হাতে থালাভর্তি ফল নিয়ে অপরূপ লীলায়িত ছন্দে নৃত্য করতে করতে গুরুদেবের সামনেই পরিবেশন করলেন তাঁরই রচিত গান "বাকি আমি রাখব না কিছুই......।" গুরুদেব মুগ্ধবিস্ময়ে ওঁর এই নৃত্যগীত দেখে বললেন, "ওহে ডাক্তার, বাকি তো কিছুই রাখলে না দেখছি। এখন আবার এই সুরে আমাকে আর একটা গান লিখতে হবে। এটা মেদম খাঁর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাক, বিবিশিববাবা থাকলে হয়তো বলতেন, 'মেদম খাঁর' জন্যই এই গানটা আমি 'রবিকে' দিয়ে রচনা করিয়েছিলুম, 'রবির' কবিতা ও গান লেখার হাতেখড়ি তো আমারই কাছে কিনা।" এই 'ভরসা-মঙ্গল' অভিনয় দেখে গুরুদেব এতো খুশি হয়েছিলেন যে, 'তারক ধরসুরেন করের' মুখে বেসুরো গান শুনে একটা গান লিখে উপহার দিলেন। এতদিন পরে গানের সবটা মনে নেই, তার শুরু হলো "ওরে ও ভাই গাইয়ে, মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে......ইত্যাদি", পুরো গান ও তার স্বরলিপি শৈলজাবাবুর কাছে ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অনেক বছর যুক্ত ছিলেন। মনে আছে আশ্রমের যখন ঘোর দুর্দিন, নিদারুণ অর্থসংকট, তখন (তিনি দিল্লীতে ভারত সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি অর্থমন্ত্রকের কাছ থেকে বিশ্বভারতীর জন্য পঁচিশ হাজার টাকার সর্তহীন বাৎসরিক অনুদান মঞ্জুর করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। গুরুদেব ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর ও তাঁর সুযোগ্যা পত্নী রেণুকা রায়ের যোগসূত্র ছিল অত্যন্ত গভীর। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ'দের সম্মিলিত দান অপরিসীম, লোকচক্ষুর অন্তরালে কাজ করেছেন নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখে, তাই তাদের এই অপরিমিত মহান দানের ইতিহাস অনেকেরই অজ্ঞাত। তাঁরা দুজনেই ছিলেন বিশ্বভারতীর সংসদ সদস্য, শুধু যে জরুরী কাজের জনাই শান্তিনিকেতনে আসতেন তা নয়, প্রায় প্রতিটি উৎসবেই উপস্থিত হতেন বাইরের সব কাজ বন্ধ রেখে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কৃতী ছাত্র ও আই-সি-এস; ভারতবর্ষের যেখানেই তিনি কাজ করেছেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে এসেছেন। অত্যন্ত সুরসিক ছিলেন, সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন, আই-সি-এসী মেজাজ বা আভিজাত্য বলতে যা আমাদের ধারণা কখনো তাঁর মধ্যে তা দেখি নি। যখনই দেখা হতো নানা বিষয়ে গল্প করতেন, তাঁর শিকারের গল্প, নানা ধরনের যে সব লোকের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের কথা, এক অপরূপ ও অননুকরণীয় টীকা-টিপ্পনী সহযোগে পরিবেশন করতেন।

ডঃ সুধীরঞ্জন দাশ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র। 'গোটা মানুষ' বলতে গুরুদেব যা বোঝাতে চেয়েছেন 'সুধীদার' মধ্যে তার অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যায়। একজন প্রখ্যাত আইনবিদ, ব্যারিস্টার ও জজ হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, স্বাধীন ভারতের সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছেন। শান্তিনিকেতনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ শান্ত, ধীর, স্থির, অমায়িক মানুষটি। প্রথম পরিচয় হয়েছিল সরোজদার বাড়িতে ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে ১৯৩০ সনে। প্রথম দিনের পরিচয়েই মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন এই সৌম্য স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, ঋজু, দীর্ঘদেহী মানুষটি তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল ব্যবহারে। প্রায় প্রতিটি পৌষ উৎসবেই সুধীদা শান্তিনিকেতন আসতেন। একটা কথা মনে পড়ে গেল, একদিন হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম একদল শিক্ষাবিদকে অভ্যর্থনার জন্য, দিল্লী থেকে আসবেন ওঁরা, ট্রেন ঘণ্টাখানেক 'লেট'। অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই, হঠাৎ দেখি আর একটা গাড়ি প্লাটফরমে দাঁড়ানো, তারই একটি প্রথম শ্রেণীর কামরাকে ঘিরে বেশ ভিড়, পুলিশ জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যস্ত। ভিড়, জনতা ও পুলিশ এই ত্র্যহস্পর্শকে চিরদিন এড়িয়ে গেছি, সেদিনও তার কোন ব্যতিক্রম হয় নি। ভিড় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতেই একজন পুলিশ অফিসার

আমার পথরোধ করে দাঁড়ালেন, বললেন, "You are under arrest, please follow me." অপরিচিত এই অফিসারটি আমার পরমাত্মীয় নন যে ঠাট্টা করবেন, ভাবলাম কোথাও একটু ভুল হয়েছে। তাঁকে অনুসরণ করে এসে পৌঁছলাম সেই পুলিশ-জনতা-ঘেরা প্রথম শ্রেণীর কামরার দরজায়। ভিতর থেকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাক এলো "আয়, আমার কাছে।" তাকিয়ে দেখি কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বসে আছেন সুধীদা, হাত ধরে টেনে ওঁর পাশে বসিয়ে সহাস্যে বললেন, "তোকে দুবার ডাকলাম, এলি না দেখে আমার এক বন্ধুকে পাঠিয়ে ধরে আনলাম।" পরিহাস করে বললেন, "জানিস ভারতের শাসনতন্ত্রে মর্যাদার তালিকায় যাঁর স্থান বেশ উচ্চ, তাঁকেই অগ্রাহ্য করে চলে যাবি এ তো হতে পারে না, তাই গ্রেপ্তার করে আনতে হলো। এবার বোস, অনেকদিন দেখা হয় না, কিছু গল্প করি, সময়টা কাটবে ভালো।" ওঁর সংসর্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা জানেন উনি কী রকম রসিক মানুষ—কথায় কথায় ওঁর এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা সুধী, ডিফেন্স সার্ভিসে তোমার যে ছেলেটি কাজ করে তার নাম কী?" সুধীদা জবাব দিলেন, "আমারই নাম, শুধু 'ধী'টুকু বাদ দিয়ে।" সবাই হেসে উঠলেন, বললাম, "তোমার নামের 'ধী' শব্দটি বাদ দিয়ে, না তোমার 'ধী'টুকু বাদ দিয়ে।" বললেন, "দেখ, জেরা করার অধিকার আমার তোর নয়, যা তোদের ইচ্ছে ধরে নে। দেখছিস না তোদের বৌদি রয়েছেন, কিছু একটা বলে মুস্কিলে পড়ি আর কি!" সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সুধীদা বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ গ্রহণ করেন, বিনা বেতনে। খুব দক্ষতার সঙ্গে ছয় বছর এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন মহিলার কথাও বলে রাখি। প্রথমেই মনে পড়ে বীরেনদার মার কথা—এমন স্নেহশীলা, নিরহংকার, অতিথিসেবাপরায়ণা ও গৃহকর্মনিপুণা মহিলা খুবই বিরল। প্রতিটি বাড়ি গিয়ে তাদের কুশল সংবাদ নেওয়া ও আপদে-বিপদে সাহায্য করা ছিল ওঁর চরিত্রের একটি মহান বৈশিষ্ট্য। শান্তিনিকেতন যেন এক বৃহৎ যৌথ পরিবার, এক শ্রেণীহীন সমাজ, এখানে সবাই একই উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেত হয়ে এক সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার মহৎ কাজে নিয়োজিত—এই সত্য ওঁর কাজের মধ্য দিয়েই প্রথম সুস্পষ্ট হয়। ওঁর সঙ্গেই মনে পড়ে 'আনন্দীদির' কথা, রবীন্দ্রসংগীতে প্রথিতযশা [illegible] সেনের মা, যদিও তিনি ওখানে [illegible] অনেক পরে। বিদুষী মহিলা, সাহায্য করতেন তাই ছিল ওঁর একান্ত সম্পদ। এই সঙ্গে আশ্রমে দুজন মহিলার কথা মনে পড়ে—বীরেনদার স্ত্রী কমলা সেন ও [illegible] সেনের স্ত্রী [illegible] সেন, প্রসন্ন শান্ত, ধীর, সুন্দর, নিরাভিমান, সেবাপরায়ণ ও নির্বিরোধী মহিলা খুবই বিরল।

'মামাদি', ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রী—কিরণবালা সেন। শান্তিনিকেতনে 'মহিলা সমিতি' গড়ে তুলেছিলেন; এই সমিতির উদ্দেশ্য হলো ওখানকার ও আশেপাশের পরিবারের অভাব-অভিযোগের সন্ধান করা ও তাদের প্রতিবিধান করা। কী করে অসচ্ছল পরিবারের আয়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করা যায়, সুষ্ঠুভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা যায় ও তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে, এই ছিল সমিতির প্রধান লক্ষ্য। এই মহৎ কাজের অনেক ভার নিয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর স্ত্রী সুধীরা বসু, একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই আশ্রমেরই কাজে। শান্তিনিকেতনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কী করে সাধন করা যায় এই পুণ্যব্রতই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিমা দেবী,—রথীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী, গুরুদেবের পুত্রবধূ যাঁকে তিনি 'আশ্রম-লক্ষ্মী' বলতেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের তিনি ভাগ্নী, প্রায় ৬০ বছর আগে গুরুদেবের পুত্রবধূরূপে তাঁর পরিবারে এসেছিলেন। তখন থেকেই গুরুদেবের ও আশ্রমজীবনের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন গুরুদেবের আদরের 'মা-মণি' ও আশ্রমের 'বৌঠান', এঁদেরই পরিচর্যায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। যে সাধনার ক্ষেত্র গুরুদেব শান্তিনিকেতনে স্থাপন করেছিলেন তাতেও বৌঠানের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। গুরুদেবের নাটকে নৃত্য সংযোজন করে তাকে 'নৃত্য-নাট্যে' রূপান্তরের পরিকল্পনায় কৃতিত্ব বৌঠানের, এই জন্মান্তরের নেপথ্য ইতিহাস অনেকেরই অজ্ঞাত। এদেশে সংগীতের নূতন দিগন্ত উন্মুক্ত হলো তাঁরই সাহায্যে প্রবর্তিত এই নৃত্যলীলার ছন্দে। আশ্রমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মঞ্চসজ্জা ও পাত্রপাত্রী সজ্জায় নন্দলাল বসু যে অভিনব সৌন্দর্যের প্রবাহ এনেছিলেন সেই প্রবাহের ধারাকে বৌঠান রক্ষা করেছেন, অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শান্তিনিকেতনে, শ্রীনিকেতনে কারুশিল্পের চর্চা এবং পার্শ্ববর্তী পল্লীতে মেয়েদের মধ্যে তার প্রচলনের প্রচেষ্টার মূলে তাঁর যে কী অবদান তা অনেকের কাছে আজও অজ্ঞাত। যে কালে শান্তিনিকেতন ছিল জনবিরল সেকালে তিনি রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসে গুরুদেবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সেকাজ ছিল সৃষ্টির কাজ, তাতে বৌঠানের দান। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেই সেই সৌন্দর্যের লিখন তিনি রেখে গেছেন, নিজের স্বাক্ষর কোথাও রাখেন নি। আশ্রমের যা-কিছু শুভ্র সুন্দর যা কিছু শুচি বৌঠান ছিলেন তারই প্রতীক। দীর্ঘকাল ধরে শান্তিনিকেতনে 'শ্রী'র উপাসনায় তিনি রেখে গেছেন অনন্ত মাধুর্যের এক অম্লান অক্ষয় অর্ঘ্য। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু জ্ঞানী-গুণীজন এসেছেন গুরুদেবের কাছে, তাঁদের আতিথেয়তায় পূর্ণ দায়িত্ব ছিল বৌঠানের হাতে। এই দায়িত্ব সহজ না, কিন্তু তিনি আনন্দের সঙ্গে, অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেছেন। প্রায়ই বলতেন, "এই এতটুকু মেয়ে যখন ছিলাম বাবামশাই আমাকে এই বাড়িতে এনে আপন মেয়ের মতো স্নেহে আদরে আমাকে পালন করেছেন, তাঁরই জয়গান করে যেন শেষনিঃশ্বাস ফেলতে পারি, এর চেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।" ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে বৌঠানের জীবনদীপ নির্বাপিত হলো শান্তিনিকেতনে। তাঁরই তিরোধানে বিশ্বভারতীর সঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রের অবসান ঘটলো। এই বছরই ১৫ই মার্চ গুরুদেবের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর ৭৫ বছর বয়সে তিরোধান ঘটলো, ধাবমান কাল একটা গাঢ় যবনিকা টেনে দিল গুরুদেবের জীবনপথের শেষ রেখাটির উপর, পরিসমাপ্তি ঘটলো রবীন্দ্রনাথের বংশধারায়।

[ক্রমশ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ওথাইয়া বন্দিশিবির ভাল ছিল না। কোন অন্তরীণের কাছে নস্যি পাওয়া গেলে বেচারাকে প্রচুর পরিমাণে মার খেতে হতো। সেখানকার বেশির ভাগ প্রহরীই পূর্বতন রক্ষীবাহিনীর লোক ছিল এবং তারা আমাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করত, কিন্তু পরবর্তী জীবনে ছাড়া পাবার পর আমরা তাদের উপর কোনরকম প্রতিশোধ নিই নি। আমরা তাদের সবাইকে ক্ষমার চোখেই দেখেছি বরাবর, কারণ তারা ছিল আসলে নিরক্ষর, অবুঝ এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, যা তাদের আদেশ দেওয়া হবে, তা নির্বিচারে পালন করা। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পূর্বতন সরকার পক্ষের লোকেদের শাস্তি দিলে আজ আর স্বাধীন কেনিয়ার কোন লাভ তো হবে না, বরং ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট।

প্রতি শনিবার আমরা নিকটবর্তী থুটি নদীতে স্নান করতে যেতাম এবং সেই সময়ই আমাদের পরনের একমাত্র কাপড়-জামা কেচে পরিষ্কার হবতাম। থুটি ছিল পাহাড়ী নদী, তার পরিষ্কার ঝকঝকে জল এক পাথর থেকে অন্য পাথরে নেচে-কুঁদে বেড়াত, আর তার প্রাণবন্ত ধাবমান গতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমি কল্পনা করতাম আমাদের দেশের অদূরভবিষ্যৎ, যা নাকি প্রাণবন্ত, আবেগময় ও আশায় ভরা থাকবে। বন্দিশিবিরের ধারে-কাছেই সমস্ত মাঠেই স্থানীয় কিকুয়ু চাষীরা ফসল ফলাত খুব উৎসাহের সঙ্গে এবং তাদের কষ্টোৎপাদিত আম, ভুট্টা বা কলাবাগানের মাঝে মাঝে বাগান এরারুটের গাছগুলি দেখতে ভারি ভাল লাগত আমার। এই কচি সবুজের মাঝে প্রত্যেক টিলার উপর নির্মিত গ্রামের কুঁড়েঘরগুলি শুধু কেমন যেন বিসদৃশ লাগতো আমার চোখে। কেনিয়ার সংকটের প্রথম দিকেই সরকার গ্রামবাসীদের একত্রিত করে টিলাগুলির উপর নতুন কুঁড়েঘর নির্মাণ করতে বাধ্য করেছিলেন, যাতে তারা সবাই একজোট হয়ে মাউ-মাউ সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। আমরা—কিকুয়ুরা কোনদিনই এইভাবে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে ভালবাসি না, এতে আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে এবং আমরা চাই না যে, আমাদের উঠানের বা ঘরের কোন দৃশ্যই পৃথিবীর অন্য কারুর চোখে পড়ুক। পাহাড়ী নদীতে চান করে পরনের কাপড়গুলি কেচে দিয়ে তাদের শুকোবার অপেক্ষায় আমি জেলখানার মোটা ভারী ও অস্বস্তিকর কম্বলে গা ঢেকে বসে বসে এইসব কথা ভাবতাম এবং স্বাধীনতার পর আমাদের কত কি কাজ করবার আছে তার তালিকা তৈরি করতাম মনে মনে।

প্রতি রবিবার দিন আমাদের কাঁটাতারে ঘেরা শিবিরের বাইরে এক খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ত এবং সেখানে প্রহরীবেষ্টিত এক বিরাট মনুষ্যচক্রের ভিতর আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য নির্বিঘ্নে আলাপ-আলোচনা করতে পারতাম। প্রথম রবিবারে আমার অনেক আত্মীয়রাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, যাতে ছিলেন আমার মাসী ওয়ানগুয়ী, যার কাছে আমি উগান্ডা থেকে ফেরবার সময় বাকুনীতে কিছুদিন ছিলাম; মাসীর মেয়ে ন্যায়াকিন্ উয়্যা, আমার বোন নজোকি এবং তার স্বামী জন কিমোন্ডো; আমার আর এক বোন ওয়ানগুয়ী, যে গাটিরু ওয়াম্বুরাকে বিয়ে করেছিল (তার সঙ্গে আমি দক্ষিণ য়্যাটা শিবিরে একসঙ্গে ছিলাম কিছুদিন); আমার দুই খুড়তুত ভাই সাইমন্‌গাচিরেনগু এবং গুডরে মুগে- ওয়েন্দু এবং আমার সম্পর্কের বোন ওয়ানগারী, যে নাইরোবীর একজন বর্ধিষ্ণু লোকের স্ত্রী। ওয়ানগারী কিকুয়ু প্রথানুযায়ী আমার মেয়ে, আসলে সে আমার মাসী ওয়ানগুয়ীর মেয়ে ন্যায়াকিন্ উয়্যার মেয়ে। তারা সবাই আমাকে দেখে প্রচুর পরিমাণে কান্নাকাটি করে, কিন্তু ততদিনে আমি কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি শুধু তাদের বলেছিলাম যে, আমার জন্য তাদের দুঃখ করা উচিৎ নয়, কারণ দেশকে স্বাধীন করতে হলে এরকম কষ্ট স্বীকার আমাদের করতেই হবে। তারা আমার জন্য বাগানের কলা এনেছিল আর এনেছিল নুজাহী, এরারুট এবং দুধ। সেদিন সেখানে বসেই আমরা সবাই মিলে ঐসব সুস্বাদু খাবার খেয়েছিলাম।

আর সকলের ভেতর কিন্তু আমার মাকে আমি দেখতে পাই নি সেদিন এবং মাসী ওয়ানগুয়ীকে আমি মার শরীর খারাপ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। মাসী গভীর সমবেদনার সঙ্গে আমাকে তখন বলে যে, আমি আথী রিভার শিবিরে থাকাকালীনই আমার মা মেরী ওয়ান্‌জিকু ইহকাল ত্যাগ করে চলে যান। প্রথমটায় আমি কি রকম হতবাক্ হয়ে যাই এবং মাসীকে আর একবার মার কথা জিজ্ঞাসা করি। তার কথা যথার্থ বোধগম্য হবার পর আমি মিনিট পাঁচেক চুপ করে বসে থাকি, তারপর আমার হঠাৎ ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সমবেত আরও সাতশো অন্তরীণ এবং তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সামনে আমি প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারি নি। আমার মুখ গিয়েছিল শুকিয়ে, আর জিহ্বার স্বাদ তেতো লাগছিল, মাথা ঘুরছিল এবং চোখের দৃষ্টি এতো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যে, কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তাদের হেসে বলি, "তোমরা ভাবনা করো না, এরকম দাম আমাদের সবাইকেই দিতে হবে। আমার মা তাঁর কাজ করে গেছেন, আমাদের সবাইকেই একদিন জীবনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হবে আর প্রত্যেকটি দিনই সেই মহাজনকে টেনে আনছে আমাদের কাছে।" এর পর আমরা আবার খাওয়া-দাওয়ায় মগ্ন হয়ে যাই, যদিও আমার বুকের উপর এক নতুন বোঝা চেপে বসেছিল।

কিকুয়ু পুরুষের জীবনে মার চেয়ে বড় আর কোন নারীই নেই। মা-ই হলেন তার সবচেয়ে আদরের, সবচেয়ে নিকটের। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে নয়মাস তার কষ্ট ভোগ করেন, তারপর গভীর যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাকে পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে আনেন—আর সেই সময় থেকে চলে মার একটানা কর্মজীবন, সন্তানের লালনপালন, তাঁর জীবনের এক-

[illegible] লক্ষ্য—মহান উদ্দেশ্য। আমার মা আবার তার উপর খুবই অর্থকষ্ট ভোগ করেছিলেন ছেলেবেলায় আমাকে লেখা-পড়া শেখাবার জন্য। আমার কাছে তাঁর একটা ছবিও ছিল না, যা দেখে আমি অন্তত একটুও তাঁর মুখের ভাব চোখে দেখতে পাই—যার সবটাই ছিল আমার মনে। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা আমি যাকে বিয়ে করে সংসারধর্ম করব তাকে যেন তিনি দেখে যেতে পারেন, কিন্তু হায়! তাঁর সে ইচ্ছা আর কোনদিনই পূরণ হলো না। মাকে এভাবে হারানই আমার সংগ্রামী জীবনের সর্বশেষ কঠিন মূল্য, যা আমাকে দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে দিতে হয়েছিল। স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয়ানদের কাছে এ বিষয়ে আমার মনের ভাব বুঝিয়ে বলা কঠিন। তারা তাদের সভ্যতা অনুযায়ী বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা-মার আশ্রয় ছেড়ে স্বাবলম্বী হয়, বিয়ে করার সময় অনেকেই মা-বাবার কথা ভাবেও না।
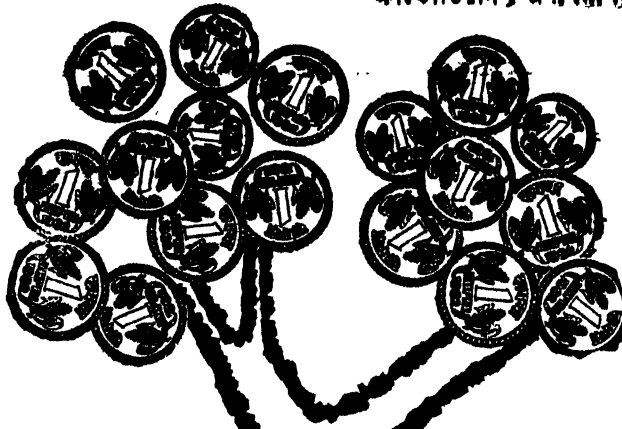
মা ও সন্তানের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন তা [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], পুরুষ এবং তার স্ত্রীর সম্পর্ক [illegible] পারস্পরিক বন্ধুত্বের ও শ্রদ্ধার, যার মূল উদ্দেশ্য হল সন্তান-সন্ততির জন্ম ও তাদের পালন। এই বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার ভেতর দিয়েই পুরুষ ও তার স্ত্রীর ভেতর ক্রমশ গড়ে ওঠে গভীর আত্মিক অনুরাগ ও একতা। কিন্তু অনেক সময় এই আত্মিক অনুরাগ ব্যতিরেকেও স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন ও একত্র বাস সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রেই আত্মিক একতা কোনদিনই আসে না। কিন্তু কিকুয়ু ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, "নইনা য়্যা মন্দু নিটা উই নগাই য়্যা কেরি", অর্থাৎ মা তার সন্তানের কাছে দ্বিতীয় ভগবানেরই স্বরূপ। তাছাড়া মা এবং সন্তানের বন্ধনের যে গভীরতা তা আর কোন সামাজিক বা সাংসারিক বন্ধনেই নেই। আমাদের সমাজে মাকে হেলাফেলা করা বা আঘাত করার মত দুষ্কার্য আর নেই এবং নিজের স্ত্রীর উপর মারধোর বা জবরদস্তি করার সংগে এর কোন তুলনাই হয় না। মার মৃত্যু সংবাদে আমি যত বেদনা ও আঘাত পেয়েছিলাম, অন্তরীণ জীবনের সমস্ত মারধোর, লাঞ্ছনা, অপমাননা তার তুলনায় কিছুই নয়।

পরে আমি আমার আত্মীয়দের কাছে জানতে পারি যে, সে সময় তারা আমাকে মা কিভাবে মারা যান তা বলাতে চায় নি আসলে। কারণ তাদের ভয় ছিল আমি হয়ত ভয়ানক কিছু একটা করে ফেলব। পরে তাঁরা আমায় বলেন যে, কেনিয়ার সংকটের সে সময় দিনের চব্বিশ ঘণ্টার তেইশ ঘণ্টাই সান্ধ্য আইন জারী থাকত —সে সময় মা আমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্যাথলিক মিশনারী চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তিনি অল্প ভাল হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরে আবার রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীর এত ফুলে ওঠে যে, চোখের পাতাও খুলতে অসুবিধা হত তাঁর। এইভাবে কয়েক মাস অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি ইহকাল ত্যাগ করে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হন।

সেদিনকার সাক্ষাৎকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর আমি গভীর ব্যথাহত হৃদয়ে শিবিরে আমার খাটে ফিরে আসি এবং জেলের রুক্ষ কঠিন কম্বলে আমার চোখের জল উজাড় করে দি। পর পর কদিন রাত্রিই কাটে আমার এইভাবে এবং সর্বক্ষণ আমি মার আত্মার শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

১৯৫৮ সালের চব্বিশে জুন আমি নেয়রী অঞ্চলের অগথী শিবিরে এসে পৌঁছই এটা হল আমার অন্তরীণ বন্দী জীবনের এগার নম্বর বন্দিশালা। এর ভেতরটা আট ভাগে ভাগ করা ছিল এবং প্রত্যেক [illegible] [illegible] [illegible] করে অন্তরীণ থাকতো। শিবিরের চারিদিকে বিদ্যুতের বেড়া দেওয়া ছিল এবং এক [illegible] প্রহরীর টহলদারী। এই ধরনের ন্যাক্কারজনক রাতে অতিকষ্টে আসায় পড়ে এই বিদ্যুতের বেড়ায় আটকে প্রাণ হারায়। নেয়রী অঞ্চলের যে সমস্ত অন্তরীণরা মেওয়া, মানিয়ানি এবং আথিরিভার বন্দি-শিবিরে ছিল, তাদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যেই আগথি শিবির তৈরি করা হয়েছিল, যাতে এখানে কিছুকাল কাটাবার পর অন্তরীণরা ধীরে ধীরে নিজের নিজের এলাকায় ফিরে যেতে পারে। ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে কেনিয়ার রাজ্যপাল এক বিশেষ আইন জারী করেন, যার বলে যে সমস্ত বিদ্রোহীরা ছোটখাট 'মাউ-মাউ' কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তাদের বাদ বাকি সাজা মাপ করে দেওয়া হয় এবং সেই সংগেই তাদের অন্তরীণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়, যাতে তারাও আমাদের মত পুনর্বাসনের ক্রিয়াকলাপের আওতায় আসতে পারে। এইরকম অনেক লোককেই প্রথমে বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং কারাগারে সাধারণ ছিঁচকে চোর-বদমাসদের থেকে এরা আলাদা থাকতো। এই চোর-বদমাসদের নাম ছিল 'মানুরু কানগা'। মানুরু শব্দের অর্থ হল শকুনি, তাদের এই নামের কারণ ছিল যে, তারা নিজেদের ভেতরেই ঝগড়া-মারামারি করতো, চুরি করতো পরস্পরের জিনিসপত্র এবং পুরুষরা নিজেদের ভেতরও যৌনক্রিয়া করতেও পিছপা হত না। এরা সংযম কি জিনিস তা জানতো না এবং শকুনির মত ময়লা অপবিত্র, মৃত জিনিসপত্র ঘাঁটতে বা খেতে তাদের কোন আপত্তি ছিল না। 'মাউ মাউ' কার্যকলাপে লিপ্ত লোকেরা ছিল সংঘবদ্ধ এবং তাদের আচার-ব্যবহারের মাপকাঠি ছিল খুব কড়া। এবং তার থেকে সামান্যতম বিচ্যুতি হলে পারেই তারা সংঘের কাছ থেকে পেত কঠিন সাজা। মানুরীদের ভেতর যারা সেরেসীর কারাগারে ছিল, তাদের থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রায় তিরিশজন করে আগথিতে বদলি হয়ে আসতো। মেওয়া শিবিরে নবাগত বন্দীদের জন্য পূর্ববর্ণিত যে 'অভ্যর্থনার' নিষ্ঠুর ব্যবস্থার প্রচলন ছিল আগথিতে তার অন্যথা হয় নি। শিবিরে পৌঁছলে পর তাদের সবাইকে সেখান কত এক বিকট বড় নির্দেশ: "মাত্তিরিটিথিয়া নিরাত্তিথাগিও", অর্থাৎ যে নিজেকে সাহায্য করে অন্যরাও তাকে সাহায্য করবে। তারপর তাদের এ বিষয় মনস্থির করার জন্য মাত্র পনের মিনিট সময় দেওয়া হত। যারা এ নির্দেশ স্বীকার করে নিত তাদের শিবিরের ভেতর পাঠান হত, আর যারা স্বীকার করত না (এরাই দলে ভারি হত অধিকাংশ সময়) তাদের পাঠান হত শাস্তি গহ্বরে। এই গহ্বরগুলির [illegible] [illegible] [illegible] অন্তরীণদের উপর জেল রক্ষী [illegible] জোরজবরদস্তি করে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করা হোত। গহ্বরগুলির আয়তনে বারো ফিট লম্বা ও [illegible] ফিট চওড়া এবং দশ ফিট গভীর। এদের মাটিতে কাটা এই গর্তগুলির ভেতর বেয়াড়া অন্তরীণদের নামতে হত এবং নিচে রাখা একটি ঝুড়িতে মাটি কেটে ভরে ঝুড়ি শুদ্ধ মাথায় করে উপরে উঠে আসতে হত। মাথায় ঝুড়ি ভর্তি মাটি নিয়ে উপরে উঠবার সময় দুই হাতই জোড়া থাকতো, কাজেই টাল সামলান ছিল খুবই দুরূহ কাজ। আমি একদিন এক হতভাগ্য অন্তরীণকে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতে দেখেছিলাম, ফলে ঝুড়ি ভর্তি মাটি তার বুকের উপর গিয়ে পড়েছিল; বলা বাহুল্য, বেচারার খুবই চোট লেগেছিল। শাস্তি গ্রহণের পর অন্তরীণরা যখন আবার উপরে উঠে আসত তখন তাদের সারা গায়ে কাল মাটি লেগে চেহারা হত অদ্ভুত, আর মাটির সঙ্গে মিশে মনের অবস্থাও হয়ে যেত তদ্রূপ।

যখন একসঙ্গে অনেক অন্তরীণ জমা হওয়ার ফলে গহ্বরগুলিতে জায়গার অকুলান হ'ত, তখন বাড়তিদের মাথায় এক পাথর-ভর্তি বালতি নিয়ে খেলার মাঠে দৌড়তে বলা হ'ত। আমি আগথিতে যখন এসে পৌঁছই, সে সময় এই সমস্ত কার্যকলাপের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিল মিথা নামক এক আফ্রিকান; তাকে সবাই 'বক্তা' বলে ডাকতো। মিথা খুব সাহসী ও বীর ছিল, আমার খুব ভাল লেগেছিল তাকে। সে কোন কিছুকেই ভয় করত না বা কোন কাজেই পেছপা হ'ত না। কেনিয়ার সংকটের আগে সে একজন ব্যবসাদার ছিল, যদিও তার সে সময়কার ক্রিয়াকলাপ থেকে তার সরকারী মনোভাবাপন্ন হবার কোন চিহ্নই কেউ লক্ষ্য করে নি। সে যদি সন্ত্রাসবাদে যোগ দিত, তাহলে নিঃসন্দেহে সে খুব উঁচু দরের সন্ত্রাসবাদী হ'তে পারতো, কিন্তু আমার অজ্ঞাত কোন কারণবশত সে বরাবরই সরকার পক্ষেই কাজ করেছিল সংকটের দিনগুলিতে। এই সময় তার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি এবং বন্দিশিবিরে কাজ করার সংগে সংগে সে তার ফোর্ট হলের ব্যবসাও চালু রেখেছিল। সে আমাদের এই বলে ভয় দেখাত যে নিজের হাতেই সে দু'শোর বেশি সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে এবং তার কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ-ই ছিল না। সে এবং আরও কয়েকজন সরকার পক্ষের আফ্রিকানরা মিলে পূর্বোক্ত "[illegible] সৈনিক" [illegible] [illegible] [illegible] এবং তাকে

কার্যকরী করে তোলে। এই নকল সৈনিক দলের লোকেরা আসলে ছিল সরকারী গুপ্তচর, কিন্তু তারা সন্ত্রাসবাদী সেজে অন্যান্য সংগ্রামীদের সঙ্গে থাকতো, তাদের মতোই কাজ করতো লোক-চক্ষে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। মিথা এখন সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের বাস চালনার ব্যবসা আরম্ভ করেছে। সরকারী কাজে সে জেলা সহকারীর পদ পর্যন্ত উঠতে পেরেছিল। বাস চালনার কাজ আরম্ভ করার প্রথম দিকে অনেকেই তার বাসে চড়তো না, তারা বলতো, "মিথার বাসে চেপ না, তাহলে মারা পড়বে।"

একদিন নেয়েরী জেলা কারাগার থেকে একদল অন্তরীণ এসে পৌঁছয় মিথার কাছে, সে সময় আমি নিকটবর্তী এক জায়গায় কাজ করছিলাম, কাজেই তাদের সম্বর্ধনা কি রকমভাবে হয়েছিল, তা স্বচক্ষে দেখতে পেয়েছিলাম। মিথার তত্ত্বাবধানে তাদের সবাইকে প্রথমেই এক-প্রস্থ মারধোর করা হয় এবং কাবুগি নজুমা ও গাচি কারানজো নামক দুজন অন্তরীণের ভাগ্যেই এর প্রকোপ পড়ে সব থেকে বেশি। কাবুগি সেইদিনই মারা যায় এবং গাচি যদিও প্রাণে বেঁচে যায়, শুধু অনেকদিন অবধি তাকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল, বেচারা আজও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তার পরদিন সকালে আমি ও আরও কয়েকজন অন্তরীণ নেয়েরীর রেড ক্রস শিক্ষা কেন্দ্রের বাড়ি তৈরির সাহায্যের জন্য গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমি চিঠি লেখবার কাগজ যোগাড় করে নিয়ে আসি এবং পরের রবিবার দিন পায়খানায় বসে বসে সেই অমানুষিক মারধোরের বিশদ বিবরণ লিখি। এই কাজ করার সময় অন্য কয়েক-জন অন্তরীণ কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার উপর পাহারা রেখেছিল, যাতে আমি কোন অনুসন্ধানরত কর্মচারীর কাছে ধরা না পড়ে যাই। শিবিরের সবাই খুব চুপচাপ ছিল এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী-দের সকলকেই খুব উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল এইভাবে একজন অন্তরীণ মারা যাওয়ার ফল চিন্তা করে। চিঠিখানার দুইটি নকল করে আমি ইরুনগু নামক একজন গাড়ির চালককে দিই বিলেতে এবং কেনিয়া সরকারের কাছে পাঠাবার জন্য। এক সময় ইরুনগুও আমার মতো বন্দিজীবন কাটিয়েছিল মানিয়ানি শিবিরে এবং তার বিশ্বাস ছিল যে, যাই হোক না কেন, আমি তাকে কোনদিনই বিপদে ফেলব না এ চিঠি ডাকে দেওয়ার জন্য।

সরকারী খোঁজ-খবরের পর মিথার নামে অভিযোগ আনা হয়, ফলে তার দু' বছর কারাদণ্ড হয়। বিলেতে চিঠি পাঠানোর ফলে মিসেস বারবারা ক্যাসেল সেখানকার বিধানসভায় তুমুল ঝড় তোলেন এ বিষয়ে।* এর পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন কেনিয়া সরকার সাধারণভাবে সব কয়েদীদের সাজা মকুব করেন, তখন মিথাও মুক্তিলাভ করে। মিথার দু' বছরের সাজা হবার পরও অবশ্য আমাদের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে, ভাবে নির্যাতনের ব্যাপারে যারা করতো অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং স্বয়ং যে মারধোর করতো তাতে তার নিজের উৎসাহের চেয়ে উপরওয়ালার আদেশই ছিল বেশি। হোলার খোঁয়াড়ের ঘটনার মতো এ ব্যাপারটাও ঘটিয়েছিল সেই সরকারী কর্মচারীরা, যাদের মধ্যে ন্যায় ও অন্যায়ের কোন প্রভেদ ছিল না।

অপ্রাকৃত কবিতাগুচ্ছ

[illegible]

[illegible] দেখে

আহাম্মক কি গাছে ফলে?
আহাম্মক আগাছায় ফলে।
কিন্তু বুদ্ধিহীন বেইমান
গাছেই ফলে, মাচায় ফলে।

[illegible]

গোলামী করিয়া মনে নাই সুখ
তাই সে এবার হ'য়েছে দালাল;
এবং তেনারো আছে মোসাহেব
চেটে দিতে জুতো সকাল-বিকাল॥

পদোন্নতি

রামছাগলের ছা,
বেশ মানিয়েছে
সিংহের চামড়া!
খেল্ দেখাতে চাস্
দিল্লী চ'লে যা!

হাততালি দেবে
আফ্রো-এশিয়া॥

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে নেয়েরী শহরের কাছেই এক কার্যশিবিরে বদলী করা হয়। যদিও এখানকার বন্দোবস্ত খুব ভাল ছিল না, তবু এখানে কোন মারধোর করা হয় নি আমাদের উপর এবং এই শিবিরটি আমাদের গ্রাম্য লোকেদের খোলার ছাদের বাড়ির খুব কাছে থাকায় সেখানকার ধোঁয়া আমাদের নাকে এসে লাগতো। তার থেকে আমরা পেতাম সেই পুরনো পরিচিত, সাধারণ নিরহংকার ও শান্তিময় জীবনের আবেশ-মাখা স্বাদ। আমার আসার কয়েকদিন পরই এই শিবিরে জন স্টাইন নামক ওথাইয়া জেলার এক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সেখানে আসেন এবং বলেন যে, তাঁর জেলার লোকেরা কাঁটাতারের বেড়ার পেছনে বন্দি-জীবন যাপন করুক তা তিনি চান না, কাজেই আমাদের সকলকে শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে। ডিসেম্বরের নয় তারিখে আমাদের সকলকে ওথাইয়া পুলিশ দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার কারাথি নামক ভারপ্রাপ্ত প্রহরী আমাদের সম্বোধন করে বলে, "তোমরা এখন ইচ্ছে করছে যে-যার বাড়ি চলে যেতে পারো। অবশ্য সর্ব-প্রথম তোমরা নিজ নিজ এলাকায় চীফের কাছে হাজিরা দেবে। তারপর তোমাদের গ্রামের প্রধানের কাছে গিয়েও হাজিরা দেবে। সে যখনই তোমাদের বিনা পয়সায় খাটতে বলবে (গিটাটি), তখন আর পাঁচজনের সুখ-সুবিধার জন্য তা তোমরা করবে। প্রত্যেক বুধবার দিন তোমরা চীফের দপ্তরে গিয়ে একবার করে হাজিরা দেবে। যদি কোন সময় কোন সরকারী সান্ধ্য আইন জারি হয়, তবে তা নিশ্চয়ই মানবে তোমরা, কারণ তাই হ'ল নিয়ম। তোমাদের এইসব বুঝিয়ে বলে দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অবশেষে মুক্তিলাভ করে বন্দিশিবিরের ফাটকের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। নিজেকে বললাম—"আমি মুক্ত, আমি এখন নাচতে পারি, গান করতে পারি, দৌড়তে পারি বা আস্তে হাঁটতে পারি, যা ইচ্ছা তাই করতে পারি!" চারিদিকে চেয়ে দেখলাম যে, মানুষের মুখগুলো বদলে যায় নি, পাহাড়, রাস্তা, গাছপালা কিছুই বদলে যায় নি, নিশ্বাস নিয়ে দেখলাম যে, হাওয়াও বদলে যায় নি, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, আমিও খুব বেশি বদলে যাই নি, হয়তো বা একটু রোগা হয়ে গেছি। কিন্তু নিজের মনের দিকে তাকিয়েই আমি সেদিন সব থেকে বেশি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, সেখানেও আমি বদলে যাই নি, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বার স্পৃহা তখনও প্রতিটি স্নায়ুতে স্নায়ুতে। আমি একটু দৌড়লাম, একটু হেঁটেও-ছিলাম, কিন্তু কেউ কিছু আপত্তি করে নি বা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে নি বা অন্য কিছু করার জন্য হুকুম দেয় নি। তখন আমি আস্তে-ধীরে রাস্তা ধরে নিজের গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম, রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হ'ল তাকেই অভিবাদন করলাম—প্রত্যেককেই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে হ'ল। কারিকো গ্রামে আমার মাসী ওয়ানগুই-র বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার সঙ্গে বেশ একটি দল জমা হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ দশ বছর পর আবার আমি তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

অন্তরীণ হিসেবে থাকাকালীন আমরা প্রায়ই ছাড়া পাবার পর প্রথমে কি করব তা নিয়ে প্রায়ই জল্পনা-কল্পনা করতাম। হিতৈষীরা সাবধান করে দিয়েছিলেন: "জোসেফ, যেন ভুলেও শুধু একটি মুরগী মেরে তোমার ছাড়া পাবার উৎসব সম্পন্ন করো না, তাহলে আবার ফিরে আসতে হবে। একটা বড় ভাল মদ্দা ছাগল কাটবে, আর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ডেকে খাওয়াবে।" একটু পরেই ওয়ান-গুয়ী ফিরে এসে আমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয়। নানান কথাবার্তার পর সে একটা বড় মোরগ দেখিয়ে বলে যে, আমার মা মরবার আগে তাকে বলে-ছিলেন, "জোসেফ ফিরে এলে এটাকে কেটে খাওয়াস তাকে।" তার কথা শুনে আমার মনটা অল্পক্ষণের জন্য দমে যায়, কিন্তু তারপরই আমি স্থির করলাম যে, ঐ মোরগটাই কাটা হবে, কারণ, এইটাই আমার মা-র শেষ ইচ্ছা এবং আমি তা পূরণ করব নিশ্চয়ই। তাছাড়া, আমাকে যে কেউ আর জেলে পুরবে না, সে বিষয়ে আমার মনে এক বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কাজেই ছাগল কাটার সংকল্প আর একদিনের জন্য স্থগিত রেখেছিলাম। সেদিন আমার দরকার ছিল শুধু ছাড়ার আনন্দ উপভোগ করার, আর আগামীকাল থেকেই আবার দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতি করার। [ক্রমশ]

---

* Parliamentary debates, 24 Feb. 1959, V. 600. 1036–39 and 28 April, 1959, V. 604. 1081–2.

ভারতীয় দর্শন : অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামী। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা-নূতন দিল্লী। দাম—আট টাকা মাত্র।

দর্শন সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে এখনও একটি ভ্রান্তি আছে। এ সম্পর্কিত ব্যাপক চর্চার অভাব থেকেই এই ভ্রান্তি। কেউ কেউ দর্শনের অঙ্গে ধর্মের অলঙ্কার পরিয়ে সে সম্পর্কে কিছু আত্মসমীহ-ভাব বোধ করেন, কেউ বা দর্শনকে জীবনযাত্রার বহির্ভূত বিশেষ কোনো মনীষার আধাররূপে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত থাকেন। আসলে দর্শন কি, বিশেষত ভারতীয় দর্শন বলতে কি বোঝায়, এ সম্পর্কে আমাদের দেশের পণ্ডিত-সমাজও পূর্ণমাত্রায় আলোকিত নন। তাঁরা যেটুকুও বা জানেন, তাও খণ্ড ও দ্বিধাবিভক্তভাবে জানেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যত বেশি অজ্ঞতা, পণ্ডিত-সমাজে তত বেশি তর্কযুদ্ধ। মূল দর্শনের জগতে কোনো পক্ষই এসে পৌঁছাতে পারছেন না।

এই অবস্থার মধ্যে অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামীর 'ভারতীয় দর্শন' গ্রন্থখানি এদেশের বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ এক আলোকপাত করেছে। যদিও তিনি স্নাতকশ্রেণীর দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে সংক্ষিপ্তাকারে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে রচনাবহির্ভূত রাখার প্রয়াস পেয়েছেন, তবু 'ভারতীয় দর্শন'-এর বিভিন্ন পর্যায়কে নানাভাগে বিভক্ত করে এক-একটি বিষয়কে ধরে ধরে যেভাবে তাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তা এদেশের অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকের জানস্পৃহা নিবারণে যেমন সহায়ক হবে, তেমনি অনেক ভ্রান্তি অপনোদনেও কার্যকরী হবে। ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট 'ভূমিকা' অংশে অধ্যাপক গোস্বামী অনেকাংশে নিজস্ব মত আরোপ করে ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, মুক্তি, আত্মা, ব্রহ্ম, চৈতন্য, নীতিবাদ, সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, অদ্বৈত বেদান্ত ও রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ সম্পর্কে আলোচনা যেমন ব্যাপ্তিলাভ করেছে, তেমনি 'পরিশিষ্ট' অংশে প্রমাণ-অপ্রমাণ, ভ্রম, যোগাচার, খ্যাতি-অখ্যাতি ও অসৎখ্যাতিবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে অধ্যাপক গোস্বামী ছাত্রসমাজের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বহুকালের বদ্ধ সংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অনীহার উপর এক বিশেষ আলোক-সম্পাত করেছেন। এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যতখানি শ্রদ্ধাবান হওয়া দরকার, তা অধিকমাত্রায় অধ্যাপক গোস্বামীর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি। ধর্ম, দর্শন ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে ইতি-পূর্বে প্রকাশিত তাঁর 'বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি' একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে আমরা পেয়েছি। তিনি শুধু দর্শনেরই অধ্যাপক নন, মার্ক্সীয় দৃষ্টিসম্পন্ন তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্। অতএব 'ভারতীয় দর্শন' তার অনেক অপ্রাসঙ্গিকতা থেকে উদ্ধার পেয়ে তাঁর হাতে যে পরিশুদ্ধ রূপ পাবে, তা স্বাভাবিক। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন-শাস্ত্রী রচিত 'প্রাক্-কথন' সংযোজিত হওয়ায় আলোচ্য গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রন্থশেষে প্রশ্নমালা সংযোজিত হওয়ায় ছাত্রসমাজের প্রচুর উপকার হবে, সন্দেহ নেই। যাঁরা দর্শনজগতের অভি-যাত্রী, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁদের প্রথম সোপান হিসেবে একান্ত অপরিহার্য।

মনীষীদের কৌতুককণা : শৌরীন্দ্র-কুমার ঘোষ। ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গে ভরা"। কিন্তু এখন এই কবিবাণী মিথ্যা হতে বসেছে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দুঃখজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বনামধন্য বাঙালী মনীষীদের কয়েকজনের ছোট ছোট গুটিকতক কথার ভিতর দিয়ে তাঁদের পরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন যাতে আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্যেও সব কিছু ভুলে গিয়ে হেসে উঠে মনটা লঘু করতে পারি। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দাশ-রথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ভূদেব মুখো-পাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, শঙ্কর পণ্ডিত প্রমুখ মনীষীদের কৌতুককণা পরিবেশিত হয়েছে। এই সব কৌতুককণার মধ্যে মনীষীদের জীবনের যে লঘু দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো কৌতূহলো-দ্দীপক এবং তাঁদের পূর্ণাঙ্গভাবে বোঝবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এই গ্রন্থের কিছু কিছু কৌতুককণা পরি-চিত হলেও অনেকগুলিই বিশেষ জানা নয় এবং সবগুলি একসঙ্গে গ্রথিত হওয়ায় সত্যিই হাসির সুখকর আয়োজন হয়েছে বলা যায়।

বসন্তরাগ : অবিনাশ সাহা। পরি-বেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আড়াই টাকা।

'প্রাণগঙ্গা', 'জীবনদেবতা', 'ঢাকাই গল্প' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের লেখক অবি-নাশ সাহার 'বসন্তরাগ' প্রেমের আকর্ষণীয় ছোট উপন্যাস। উত্তমপুরুষে লেখা 'আমি' এই এক সাংবাদিক ('নিউজ ফ্রন্টের বার্তা সম্পাদক)-এর জীবনে পুরীযাত্রার সূত্রে কি করে ব্যক্তিগত প্রেমের উদয় ও প্রতিষ্ঠা হল তাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সাংবাদিক চলেছেন রেলপথে পুরী ভ্রমণে। রেলের কামরায় তাঁর সহযাত্রিনী হলেন একজন মহিলা। এই মহিলার ঔদাসীন্য সাংবাদিককে দুর্বারভাবে আকর্ষণ করলো যা ক্রমেই রূপান্তরিত হতে লাগল অনুরাগে। শেষ পর্যন্ত পুরীতে সাংবাদিকের পুরনো স্নেহপাত্রী শোভার দৌত্যে এই উদাসিনীই হলেন তাঁর কোণারক যাত্রার সঙ্গিনী এবং পরিশেষে জীবনসঙ্গিনী। মিলনান্তক কাহিনীটি হাল্কা চালে বেশ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হওয়ায় একঘেয়েমির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তা হয় নি এবং এক কথায় বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। কৃষ্ণা ও শোভার চরিত্র অঙ্কনে লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।

সুজনের মেজাজটা ভাল নেই। মাসের ছাব্বিশ তারিখে কোন্ লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কেরই বা মেজাজ ভাল থাকে? অভাব-অনটন-ঋণ-এ্যাডভান্স—এ সবই ত' তাদের জীবনে স্বাভাবিক। প্রথম প্রথম অসহ্য লাগলেও এক সময় এ সব গা-সওয়া হয়ে যায়। সুজনেরও হয়ে গেছে। কিন্তু আজ বুঝি তার সহ্যের সেই পুরানো বাঁধটার কোথাও একটা চিড় খেয়েছে। তার ভেতরকার মানুষটার কোন একটা নরম জায়গার চোরা ফাটলের ফাঁক দিয়ে সমস্ত বাঁধটা বুঝি ভেংগে পড়তে চাইছে।

পিওনটা ঘন ঘন এসে তাগিদ দেয়, সুজনবাবু! বড়বাবু এই ফাইলগুলো তাড়াতাড়ি চাইছেন।

সুজন জানে সওদাগরী অফিসের প্রত্যেকটি মুহূর্তের দাম আছে—প্রতিটি কাজেরই লাভ-ক্ষতির অংক কষা আছে। এন্ড্রু বার্ন কোম্পানীটা সত্যি যখন বৃটিশ সাহেবদের ছিল, তখনো হিসেব কষা ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে দেশী সাহেবদের হাতে কোম্পানী গেছে, সেদিন থেকে কেবল লাভ-ক্ষতির হিসেবই হয়েছে চুলচেরা, মানবিকতার হিসেবটা গেছে হারিয়ে। বুকের মধ্যে কিসের একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে ওঠে।

ফাইলের মধ্যে মন ডোবাতে চেষ্টা করে সুজন। কিন্তু প্রতিক্ষণেই মা'র করুণ মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মা'ই বা কেন মুখটা অমন কাতর করতে গেলেন! লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের মা হয়ে অত সাধ কেন নাতিকে নিয়ে? যত সব এঁদোপচা পাতি-বুর্জোয়া মানসিকতা! মা অবশ্য অত-শত বোঝেন না! বুঝবেনই বা কি করে—ঢাকা থাকতে কখনো ত' দারিদ্র্যের সংগে পরিচয় হয় নি! দেশ ভাগ না হলে কি সুজনও আজ কলম ঘষ? অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে সুজন। স মাখা সেই দিনগুলো দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু দৃষ্টি ঝাপ্সা হয়ে আসে। সে সব যেন অনেক দিনের পুরানো ইতিহাস! আজকের বাস্তব সম্পূর্ণ অন্য রকম। আজ তার টাকা চাই—বেশি নয়, গোটা কুড়ি হলেই হবে। কুড়িটা টাকাই বা কম কিসে? কে আজ সুজনকে টাকা ধার দেবে? ধার করার ত' কোন রাস্তাই বাকি রাখে নি! ধার না করেই বা কি করে সুজন? সেই যে একদিন বাবা থ্রম্বোসিসের ধাক্কায় হঠাৎ মারা গেছেন, সেই থেকে ত' মা'র শরীরে নিত্য নতুন ব্যাধি লেগেই আছে। মা'র পুরো চিকিৎসাটাই কি সুজন করতে পারছে? মা'র কথা মনে হতেই চোখ ফেটে জল আসতে চায় সুজনের। মা যেন কেমন সম্পূর্ণ বদলে ভিন্ন একটা মানুষ হয়ে গেছেন। ঢাকা থাকতে কি হাসিখুশিই না ছিলেন! আজ কি তাঁর শুকনো মুখটার দিকে তাকিয়ে সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে? ভেংগে-চুরে একেবারে দুমড়ে গেছে চেহারাটা। সারাদিন বহু রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন আর নানা ব্রতের ছুঁতোয় উপোস করেই কাটিয়ে দিচ্ছেন মাসের অর্ধেক দিন। একটা মানুষ যে কয়েকটা বছরের মধ্যে এত বদলে যেতে পারে

মাকে নিজের চোখে না দেখলে সুজন বিশ্বাসই করতে পারত না। মার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না সুজন। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। দূর থেকে মাকে দেখে ওর মনে হয় মার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন বুঝি সৌমিত্র—সুজনের ছেলে।

আজকের সমস্যাটা সৌমিত্রকে নিয়েই। কোন এক আচার্য মশায় মাকে বলেছেন, সৌমিত্রকে হাতেখড়ি দেবার জন্য কালকের দিনটাই নাকি প্রশস্ত। অফিসে আসার ঠিক আগে অপরাধীর মত কাতর মুখ করে এই দুঃসংবাদটা জানিয়েছেন মা।

সুজনের চোখের সামনে আবার তার মার সেই অসহায় ছবিটা ভেসে ওঠে—মলিন মুখে মা দাঁড়ানো আর কোলে সৌমিত্র, সুজনের একমাত্র সন্তান।

ভাবতেও ভাল লাগে সুজনের, সৌমিত্র লেখাপড়া শিখবে—বড় হবে—আলোহাসিতে ঝলমল করবে! কাজে ভুল হয়ে যায় সুজনের।

কই সুজনবাবু, আবার আসে পিওনটা, বড়বাবু ভীষণ রাগ করছেন যে!

দিচ্ছি—দিচ্ছি! ফাইলগুলোর মধ্যে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করে সুজন।

কিন্তু মনটা আজ যেন কিছুতেই বশে আসতে চায় না। থেকে থেকে মনে পড়ে, মা বলছিলেন, সৌমিত্রই ত আমার শ্বশুরের বংশের একমাত্র প্রদীপ—তাই ওর লেখাপড়ার শুরুতে বিধিমত হাতেখড়িটা দিতে চাই। ওর দাদু থাকলে—কথাটা শেষ করতে পারেন নি মা। সুজনও সাহস করে তাকায় নি মা'র দিকে।

হঠাৎ বড়বাবুর দিকে চোখ পড়ে সুজনের। ঐ লোকটার নাকি অনেক টাকা! কিছু ধার চাইলে হয় না ওর কাছে? কিন্তু কি বিশ্রী কুতকুতে চোখ লোকটার! যেমন বিদঘুটে মোটা শরীর তেমনি ভয়াবহ কুৎসিত ঐ চোখ দুটো! ছোট হলে কি হবে, চোখ দুটো কিন্তু অনবরতই চতুর্দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। সতর্ক নজর রাখতে হবে না সব কেরানীদের উপর! এই ফাইলগুলো জরুরী না ছাই! এই যে সুজন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সেটা দূর থেকেই ধরতে পেরেছে ব্যাটা, আর ঠিক সে কারণেই এত ঘন ঘন তাগাদা। আজ এতদিন ধরে চাকরি করছে, লোকটাকে চেনে না সুজন? পাজীর হদ্দ ঐ লোকটা! ও দেবে টাকা? টাকা চাইলেই উদাস চোখ করে একটা জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেবে—কেরানীর অত অভাব কেন? কুঁড়েমো আবার শিখছ হয়ে গোল্লায়? আর নয়ত কুতকুতে চোখ দুটো স্থির করে সোজা জিজ্ঞেস করবে, ধার যে চাইছ, শোধ দেবে কি করে? সারা মাস ধরে অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়ে মাসকাবারে পাওয়ার মত মাইনের কি আর অবশিষ্ট কিছু আছে? দূর্ ছাই! ও লোকটার কাছে টাকা চাওয়ার কোন মানে হয় না।

পিওনটা আবার এসে দাঁড়ায়।

দুটো ফাইল ওর সামনে এগিয়ে দেয় সুজন।

: না সুজনবাবু, বড়বাবু ফাইল চান নি, ছোট সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

: ছোট সাহেব? বলগে যা হাতের এই ফাইলটা সেরেই আসছি।

: না সুজনবাবু, বড়বাবু বলে দিয়েছেন আপনাকে এখখুনি যেতে।

: যাচ্ছি, ফাইলটা ওল্টাতে ওল্টাতে বলে সুজন।

কী বদ লোক ঐ বড়বাবুটা—ছোট সাহেবের কানে ইতিমধ্যেই লাগিয়ে দিয়েছে! জঘন্য! আরেকটা অপদার্থ লোক ঐ ছোট সাহেব। মামার জোরে চাকরি করে, তবু ডাট কত! এক পাতা ইংরেজী লিখতে পারে না কিন্তু বকুনির চোটে ভূত পালায়। কোন কেরানীর সংগে ভদ্রভাবে কথা পর্যন্ত কয় না।

সুজন ঘরে ঢুকতেই ভুরু কুঁচকে চিৎকার করে ওঠে ছোট সাহেব, কই হে, আমার সেই রিবেনট্রপ ইণ্ডিয়ার ফাইলটা তো আজও এসে পৌঁছয় নি আমার হাতে!

: আজ যে বড়বাবু অন্য কতকগুলো ফাইল দিয়েছেন!

: হোয়াট? রাগে ফেটে পড়ে এনড্রু বার্ন কোম্পানীর ছোট সাহেব, আমার কাজ ফেলে তুমি বড়বাবুর কাজ করছ? আবার আমারই মুখের সামনে সেই কথা জাহির করে বলছ? শেমলেস! আই ওয়ার্ন ইউ সুজন, এসব বেয়াদবী সহ্য করার মত লোক আমি নই। কুড ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড! যাও, সব কাজ ফেলে দিয়ে ঐ ফাইলটা কমপ্লিট করে বিকেল চারটের মধ্যে আমার কাছে তুমি নিজে নিয়ে আসবে।

একবার দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকায় সুজন।

: ঘড়ি দেখছ কি? ইট ইজ টুয়েলভ ও ক্লক নাউ। আই হ্যাভ গিভেন ইউ ফোর আওয়ার্স টাইম।

মাথাটা নিচু করেই নিজের চেয়ারে এসে বসে সুজন।

সব কটা ফাইল ঠেলে সরিয়ে রিবেনট্রপ ইণ্ডিয়ার ফাইলগুলো নিয়ে বসে। এতগুলো চিঠি পড়ে তার ব্রীফ লিখে টাইপ করা কি চাট্টিখানি কাজ! চার ঘণ্টা কেন, পুরো দু দিনেও সম্ভব নয়। তবু করতে হবে—ছোট সাহেবের হুকুম।

ছোট সাহেবের চরিত্র জানতে বাকি নেই সুজনের। সুজন কেন, গোটা অফিসটাই জানে। নিজের পেটোয়া একটা অপদার্থকে অফিসে ঢোকাবার জন্য কীভাবে অপমান করে লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে আধাবয়সী মিত্র মশায়ের চাকরিটা খেয়েছে ছোট সাহেব। বড়বাবু কিন্তু ঐ ছোট সাহেবেরই অনুগত। বড়বাবুর মেজো ছেলের চাইতেও ছোট এই ছোট সাহেব। তবু ছোট সাহেবের সংগে এমন ব্যবহার করে বড়বাবু যে, দেখলেও গা ঘিন ঘিন করে। মানুষ যে কত বড় ইতর হতে পারে এদের দেখলেই তা বোঝা যায়। এই ত সেদিন ছোট সাহেবের সংগে অফিসে এসেছিল তার বান্ধবী আর বান্ধবীর কুকুরটা। সেই কুকুরটাকে নিয়ে কি কাণ্ডটাই করেছিল বড়বাবু—ছিঃ ছিঃ! শেষমেশ ত আবেগের আতিশয্যে বড়বাবু বলেই ফেললে, স্যার—হে হে স্যার, সত্যি বলছি স্যার, আপনি স্যার, আপনি কুকুরটাকে এত ভালবাসেন দেখে আমার না স্যার, বড় ইচ্ছে হয় আপনার কুকুর হতে।

গাটা ঘুলিয়ে ওঠে সুজনের।

রিবেনট্রপ ইণ্ডিয়ার ফাইলগুলো থেকে ব্রীফ তৈরি করতে থাকে। যে কাজ করতে পুরো দু দিন সময়ের প্রয়োজন সে কাজ চার ঘণ্টায় শেষ করতে না পারলে সুজনকেও যে মিত্র মশায়ের মত লাঞ্ছনা ভোগ করে চাকরিটা খোয়াতে হবে, সুজন সে কথাটা ভাল করেই জানে।

টিফিন টাইমে সবাই যখন একে একে ক্যান্টিনে চলে গেল, সুজন তখনও ঝড়ের বেগে সমানে টাইপ করে চলে।

হাত-পিঠ কনকন করে। ঘড়ির দিকে সোজা চাইতে ভরসা পায় না। তবু আড়চোখে একবার দেখে সুজন। তখন সময় সাড়ে তিনটা। সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে সুজনের।

হঠাৎ একটা দুষ্প্রাপ্য সেন্টের মাদকতা-মাখা গন্ধ নাকে যেতেই চোখ তুলে তাকাল সুজন। ছোট সাহেবের সেই কুকুরপ্রিয় বান্ধবীটি লীলায়িত ভঙ্গীতে ছোট সাহেবের চেম্বারের দিকে তখন এগিয়ে যাচ্ছিল। অতি্য সুন্দরী

মেয়েটা! কিন্তু তাই বলে আপন দেহের যৌবনটুকু অমনভাবে অনাবৃত রেখে এতগুলো লোকের সামনে দিয়ে যেতে লজ্জা করে না ওর! নিজের মনকে চোখ রাঙায় সুজন, ওসব সেকেলে নীতিজ্ঞান তোমার হেঁসেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, সে সব এদের জন্য নয়! তবু কে যেন সুজনের মনের মধ্যে ফিস ফিস করে ওঠে, মেয়েটার দেহ যত সুন্দর, ঠিক ততটাই কুৎসিত তার চরিত্র। আজকে এ সময়ে মেয়েটার এসে পড়াটা কিন্তু ভাল লাগে সুজনের। একটা ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে—হয়তো এখন সব ভুলে যাবে ছোট সাহেব; আজ আর ডাক পড়বে না তার। একটু পিঠটা সোজা করে নিতে চায় সুজন।

ছোট সাহেবের খাস আর্দালী এসে বলে, বাবুজী! সাব আপকো সেলাম দিয়া।

মুখ তুলে দেখে সুজন ঘড়িতে তখন চারটে।

ছোট সাহেবের সেলামের অর্থ সে বোঝে। একগাদা ফাইল বগলদাবা করে ঢোকে ছোট সাহেবের ঘরে। ব্রীফটা এগিয়ে দেয়।

ব্রীফটা হাতে পেয়ে একটু যে চমকে উঠেছিল ছোট সাহেব, সেটা নজর এড়ায় নি সুজনের।

একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ছোট সাহেব, দ্যাট্স্ লাইক এ গুড্ বয়! দেখলে ত ইয়ংম্যান, উইল থাকলেই সব কাজ হয়!

বয়সের দিক থেকে ছোট সাহেবের সংগে সুজনের ব্যবধান কয়েকটা মাসের বেশি নয়। একই বছর ওরা দুজন ম্যাট্রিক পাশ করেছে—ছোট সাহেব কিশোরীলাল জুবিলী হাই স্কুল থেকে আর সুজন সেণ্ট গ্রেগরীস স্কুল থেকে। দুজন দুজনকে তখন থেকেই চেনে। সুজন যে তখন ঢাকার একটি উজ্জ্বল রত্ন! আজ অবশ্য সে সব কথা ছোট সাহেব ভুলে গেছে; সুজনও মনে করাতে চায় না।

ব্রীফটা দেখতে দেখতে মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে ছোট সাহেবের, হোয়াট্স্ দীজ্? পিকিউনিয়ারি স্টিনজেন্সি ডিউ টু রিসেস ইন দ্য ন্যাশনাল প্ল্যানিং! আমি ত এ সব লিখিনি!

ঃ না স্যার, আপনি লিখেছিলেন, ফিনান্সিয়াল ডিফিকাল্টিজ ডিউ টু ব্যাড বিজনেস!

ঃ দেন—হু হ্যাজ ড্রন ইট?

মাথাটা নিচু করে বলে সুজন, কোম্পানীর প্রেসটিজের জন্য—

ঃ দিস ইজ অডাসিটি—হাউ ইউ ডেয়ার টু কারেক্ট্ মাই রাইটিং—ইন্টলারেব্ল্! তুমি যদি এতই ভাল ইংরেজি জান ত যাও না কেন স্কুলে বা কলেজে মাস্টারি করতে—সে বিদ্যেও ত নেই! লুক হিয়ার সুজন, এ সমস্ত বেয়াদবী আমার সংগে করতে এসো না। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট ইউ আর জাস্ট এ ক্লার্ক!

কানটা গরম হয়ে ওঠে সুজনের! মুখটা একটু তুলতেই দেখে ছোট সাহেবের বান্ধবীটি একটা সিগারেট দাঁতে চেপে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। মাথাটা আবার নিচু হয়ে যায় তার। সুজনের মনে হয় পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আগুনের হল্কা যেন উঠছে।

কিন্তু সেখানেই শেষ নয়।

ব্রীফটা পড়তে পড়তে আবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ছোট সাহেব, হোয়াট্স্ দীস্? ইউ হ্যাভ্ নট্ কপিড্ দীজ টু লেটার্স?

ঃ আগের চিঠিগুলোতেও একই বক্তব্য ছিল বলে শুধু রেফারেন্স দিয়ে গেছি।

ঃ শাট আপ! কাজে ফাঁকি দিয়ে আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে! লিসেন্—শুধু টাকা চুরিকেই চুরি বলে না, কাজ চুরিও চুরি—এবং যে তা করে সেও চোর।

মাথাটা তুলে সোজা ছোট সাহেবের দিকে তাকায় সুজন। কিন্তু মৈত্র মশায়ের কথাটা মনে হতেই নিজেকে সামলে নেয়।

ঃ হোয়াট ফর ইউ আর লুকিং স্ম্যার্ট্ মী? ডু ইউ থিংক্ মি এ ফুল?

আপ্রাণ প্রয়াসে নিজেকে সংযত রাখে সুজন। চাকরিটা খোয়া গেলে তার চলবে না।

সুজনের নিঃশব্দতা কিন্তু ছোট সাহেবকে চুপ করাতে পারে না। ছোট সাহেব চিৎকার করে সেই একই কথা বলতে থাকে, ডু ইউ থিংক মি এ ফুল?

সহ্যের আগলটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল সুজন; কিন্তু হঠাৎ সেটা এক সময় ভেংগে গেল। সুজন বলে, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব? যদি আমার আপনার মধ্যে চেয়ার দুটো পাল্টে নেওয়া সম্ভব হত, তা হলে অবশ্য বলতে পারতাম!

ঃ হোয়াট ডু ইউ মীন? তোমার বেয়াদবী দেখছি সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আই সে ইউ গেট আউট—এণ্ড রিমেম্বার—আই উইল সী ইউ!

ছোট সাহেবের চেম্বার থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে সুজন। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অপমানের জ্বালাটা তীব্র হয়ে তার হৃদয়কে পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে থাকলেও সান্ত্বনা পায় এই ভেবে যে বান্ধবীর সামনেই বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে ছোট সাহেবকে। কিন্তু তবু শান্তি পায় না সুজন, মৈত্র মশায়ের মুখটাই বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অফিস শুদ্ধ লোক ঘিরে ধরে তাকে ব্যাপারটা জানার জন্য—ছোট সাহেব কি কি ভাষায় সুজনকে গাল দিয়েছে শোনার জন্য।

সবাই খুব বাহবা দেয় সুজনকে। সুজন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে—স্বার্থপরের দল! আমার চাকরিটা গেলে এক বেলাও ত তোমরা খাওয়াবে না, যেমন পারনি মৈত্র মশায়কে এক দানা সাহায্য করতে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না। এ সব কথা বলা চলে না।

অফিস থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরতে পারে না সুজন। সেই দুশ্চিন্তাটা পেয়ে বসে—টাকা চাই। সামান্য ক'টা টাকা আজ তার না হলেই চলবে না।

ঘুরতে ঘুরতে কলেজ স্কোয়ারে আদিনাথের দোকানের দিকে পা বাড়ায় সে। আদিনাথ তার বাল্যবন্ধু—কলকাতায় ব্যবসা করে ভাল টাকা করেছে। যদি আজ সে কিছু ধার দেয় সুজনকে!

আদিনাথের দোকানে ঢুকতেই কয়েকজন হৈ-হৈ করে উঠে—সবাই সুজনের বাল্যবন্ধু, শুধু একজনকে সে চেনে না। সবাই যায় কমলা কেবিনে। পথে ঐ অচেনা ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বলে বন্ধুরা, জানিস সুজন, আজ তুই খুব ভাল দিনে এসে পড়েছিস। এই যে দেখছিস এই ভদ্রলোককে, এঁর নাম ওমপ্রকাশ। আদিনাথের ব্যবসা-জগতের বন্ধু। এই ভদ্রলোকের সংগে তুই যদি পাঞ্জা লড়ে জিততে পারিস ত তিরিশ টাকার বাজী জিতবি!

কে একজন বলে, শুধু তিরিশ কেন, ও-কিকে হারাতে পারলে সুজনকে আমিই দেব পঞ্চাশ টাকা। বুঝলি সুজন, এটা আমাদের প্রেস্টিসের ফাইট—আমরা কেউ ওর সংগে পারি নি।

লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখে সুজন—এমন কিছু পালোয়ান ত নয়, বরং রোগাই বলা চলে। বাজী রেখে

পাঞ্জায় অনেক লোককে হারিয়েছে সুজন। তখন অবশ্য সে বালক সংঘের আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়াম করত। আজও নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় সুজন। মনে মনে ভাবে ভালই হল, ধার-দেনা চাইতে হবে না, বাজীর টাকা বন্ধুদের খাইয়েও প্রয়োজন-মত ঘরে নিয়ে যাওয়া চলবে। মা'র সেই অপরাধী-অপরাধী মুখটা আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সৌমিত্রর উজ্জ্বল মুখটাও। ওদের সবাইকে আজ খুশি করতে পারবে সে—একটা তৃপ্তির স্বাদ পায় সুজন।

কমলা কেবিনের একটা টেবিলে মুখোমুখী বসল সুজন আর ওমপ্রকাশ। চারদিকে দাঁড়িয়ে রইল বন্ধুরা। প্রত্যেকের চোখেই দারুণ উত্তেজনা।

সুজনের মনে হল ওমপ্রকাশ রোগা হলেও হাতে জোর রাখে। সুজন আর ওমপ্রকাশের মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। বন্ধুদের উত্তেজনাও বেড়ে গেল। প্রায় মিনিট দুই পর ধীরে ধীরে সুজনের হাতটা টেবিলের ওপর চিৎ করে ফেলল ওমপ্রকাশ। মাথার রগটা দপ্ দপ্ করতে থাকে সুজনের। হাতে পাওয়া টাকাটা ফস্কে যাওয়ার বেদনাটা তার বুকে একটু বেশি করেই লাগে।

বন্ধুরাও হতাশায় চুপ হয়ে যায়। এক গ্লাস জল খায় সুজন।

তারপর ধীরে ধীরে বলে, বহুদিনের অভ্যাস নেই ত। ঠিক আছে ওমপ্রকাশবাবু, আরেকবার ট্রাই করা হোক—কি বলেন?

বিজয়ের আনন্দে সাগ্রহে হাতটা বাড়িয়ে দেয় ওমপ্রকাশ।

হাতটা কাত করে আনে সুজন। ঐকান্তিক মানসিক আবেগে হাতের শিকারকে ছিঁড়ে ফেলার জান্তব আনন্দে সমস্ত দেহের শক্তি দিয়ে ওমপ্রকাশের হাতে চাপ দেয় সুজন। দাঁত কামড়ে নিজের হাত সামলায় ওমপ্রকাশ। প্রায় মিনিট তিনেক বাদে সুজনের কাঁপা কাঁপা হাতটাকে আবার চিৎ করে ফেলে টেবিলে।

পরাজয়ের গ্লানিতে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে সুজনের হাতটা।

পাঞ্জার লড়াইয়ে হেরে গিয়ে বন্ধুদের কাছে আর টাকা চাইতে পারেনি সুজন। বুকের মধ্যে সেই বিষণ্ণ বোঝাটা আবার চেপে বসে—হৃদয় ঠেলে কি যেন একটা বেরিয়ে আসতে চায়। পেটটার মধ্যেও যেন একটা জানোয়ার খ্যাপার মত ঘুরেতে থাকে। ক্ষুধার্ত সে। অসহ্য!

অসহ্য এই টালিগঞ্জের ট্রামগুলো। কোন সময়ে একটু নিশ্চিন্তমনে দাঁড়ানো পর্যন্ত যায় না। দুটো লোক বিনা দ্বিধায় সুজনের পা মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। একবার ইচ্ছে হল সুজনের ঠাস করে লোক দুটোর গালে চড় কষিয়ে দেয়। কিন্তু পাঞ্জায় হেরে গিয়ে হাতে যেন আর জোর পায় না সে।

প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের মোড় আসতেই ঝুপ ঝুপ করে নেমে পড়ে একগাদা লোক। নামে সুজনও। তারপর কলাবাগানের দিকে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চলতে থাকে। মা'র কাতর মুখটা মনে পড়ে তার—সৌমিত্রর উজ্জ্বল মুখটাও। কোন অর্থ খুঁজে পায় না সুজন এই সব পাতি-বুর্জোয়া সেন্টিমেন্টের। এ সমস্তই পুঁজিহীন মধ্যবিত্তের বুর্জোয়া অনুকরণের নির্লজ্জ মনোবিলাস! নির্মম কঠিন হস্তে এ সব অর্থহীন বিলাস-বাসনা গুঁড়িয়ে দেবে সে। সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ঘরে ফেরে।

সুজনকে ফিরতে দেখেই ছুটে আসে সৌমিত্র, বাবা, ছেলেট এনেছ—থবির বই?

সুজন দেখতে পায় পাশের ঘর থেকে তৃষিত দৃষ্টিতে মা তাকিয়ে আছেন তার মুখের দিকে। কোন কিছুকেই গ্রাহ্য না করে পুরুষকণ্ঠে বলে সুজন, তোর মা কোথায়? আমায় খেতে দিতে বল।

পাশের ঘর থেকেই যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ করতে করতে বলেন মা, বৌমা এতক্ষণ তোর আশায় বসে থেকে এখন গেছে রায়েদের বাড়ি—যদি কিছু ধার পায়! তোর ঘরেই খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

সারাদিন মস্ত বড় হবার অনেক স্বপ্ন সৌমিত্রকে দেখিয়েছে ঠাকুমা। অনেক আশায় সৌমিত্র অস্থির। সে সুজনের শার্টটা ধরে টানে, বাবা, আমার ছেলেট আননি কেন? আমি লিখব না!

ছেলেটার আদেখলেপনায় সুজনের সারা শরীর জ্বলে যায়, ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দেয় সৌমিত্রর নরম পিঠে।

আচমকা বাবার এই অদ্ভুত শাসনে কেঁদে ফেলে সৌমিত্র, বাবা, আমাকে মারলে!

সৌমিত্রর চোখে জল! সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সুজন। বেনোজলের টানে তলিয়ে যায় তার সকল সংকল্প—নিঃশেষ হয়ে যায় সমস্ত প্রত্যয়। আবার হেরে যায় সুজন; আজ শুধু তার হারারই পালা। ছেলেটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, না বাবা, না—তোমায় মারি নি তো!

অশ্রুর বাষ্পে সুজনের শেষ কথা কয়টা মুখের মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

লেনিন ও নাটক

সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

'বিপ্লবী', 'পাকা কমিউনিস্ট', 'মার্কসবাদী পণ্ডিত' এবং 'বিশ্ব শ্রমিক ও মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতা' হলেই যে রসকষবর্জিত আবেগহীন তত্ত্ববাগীশ হতে হবে, মতামতি লেনিন এই ধারণার এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন সাধারণভাবে আবেগপ্রবণ, পরিহাসপ্রিয়, হাসিখুশি মানুষ। সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দুর্বার। শিল্পচর্চার নিরবচ্ছিন্ন সুযোগ তিনি কোনদিন পান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেবেলা থেকেই এই বরেণ্য মনীষীর ছিল এক আশ্চর্য শিল্পীমন, যে-মন নিসর্গ-প্রকৃতির সৌন্দর্যে পাগল হ'ত, সংগীত আর লোকসংগীত শুনে মুগ্ধ না হয়ে পারত না, শিল্প-সাহিত্যের অনাবিল রাজ্যে পরিভ্রমণ করে বেড়াত।

শিল্পী-মনীষী লেনিন কিন্তু যে-কোন শিল্পকেই তারিফ করতেন না। জীবনরসবর্জিত, অবাস্তব, দুর্বোধ্য, মধ্যবিত্ত ভাবালুতা-আচ্ছন্ন এবং বুর্জোয়া নৈতিকতাভরা সাহিত্য-নাটক-শিল্পের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। থিয়েটার দেখাকে তিনি কোনদিন 'বুর্জোয়া-বিলাস' বলে মনে করেন নি। আর্ট থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুব উঁচু। তাঁর চুয়ান্ন বছরের জীবনে অবসর প্রায় ছিলই না। তবু কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে থিয়েটারে যেতেন। কিন্তু শিল্পের নামে যা-ইচ্ছে-তাই পরিবেশিত হলে তিনি উঠে আসতে বাধ্য হতেন। তাঁর অসহ্য লাগত অভিনেতাদের অতি-অভিনয় দেখে। যে ম্যাকসিম্ গোর্কির তিনি ভক্ত ছিলেন, তাঁর 'নিচের মহল'-এর অভিনয় দেখে লেনিন বেশ কিছুদিন থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ রেখে-ছিলেন। চেকভের 'চুল্লীতে ঝিঁ ঝিঁ' নাটক ছিল রীতিমত জনপ্রিয়। এ-হেন নাটকও লেনিনের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তিনি রীতিমত বিরক্ত হতেন নাটকের ভাব-সর্বস্বতায়, সংগ্রামী জীবনের প্রতি উদাসীনতায় এবং পলায়নসমর্থনতায়। আঙ্গিক-সর্বস্ব সাহিত্য-শিল্পও তাঁর পছন্দ হ'ত না। 'আবার, তলস্তয়ের জীবন্ত শব', চেকভের 'ভানিয়া কাকু' তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন আরো কয়েকটি নাটক দেখে যার মধ্যে 'প্রলয়' এবং 'গাভোরান হেনশেল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সম্বন্ধে লেনিনের সুচিন্তিত অভিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন রচনায় এবং বৈঠকী আলাপ-আলোচনায়। কথা প্রসঙ্গে একবার তিনি প্রখ্যাত জার্মান সাম্য-বাদিনী ক্লারা সেৎকিনকে বলেছিলেন—'Art belongs to the people. Its roots should be deeply im-planted in the very thick of the labouring masses. It should be understood and loved by these masses. It must unite and elevate their feelings, thoughts and will.' অর্থাৎ শিল্প মানুষেরই সম্পদ। ব্যাপকতম মেহনতী জনতার গভীরে তার শিকড় থাকা দরকার। তাকে হতে হবে জনগণের বোধগম্য ও প্রিয়। তাদের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে সম্মিলিত ও উত্থিত করতে হবে তাকে।'

আবার বিখ্যাত সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা আনাতলি ভাসিলিয়েভিচ লুনাচারস্কিকে ১৯০৫ সালে লেনিন বলেছিলেন, 'শিল্প-ইতিহাস কী অপূর্ব ক্ষেত্র! মার্কসবাদীদের পক্ষে এখানে কত কী-ই না করবার রয়েছে।' কিন্তু প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়ায় শিল্প-সংস্কৃতির উদার রাজ্যে খেটে-খাওয়া মানুষ প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায় নি। জনগণ এবং সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান ছিল। বুর্জোয়া সরকারের নির্মম অত্যাচারের ভয়ে শিল্পী-সাহিত্যিক শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করত মালিকের জন্য, জনতার জন্য নয়। সাহিত্য-শিল্প-নাটক ছিল ধনীর গৃহে টাকার শিকলে বন্ধ। যে শিকল মেহনতী মানুষের সুখ-দুঃখের ঝংকার এবং উন্মেষকার, তার পেছনে ছিল পুলিশের কোপদৃষ্টি। সুতরাং শিল্পের আনন্দ-যজ্ঞে শোষিত মানুষের নিমন্ত্রণ হ'ত না।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে বিপ্লবী-শ্রেষ্ঠ লেনিনের নেতৃত্বে সফল হল মহত্তম বিপ্লব। শুরু হল লেনিনের নেতৃত্বে পৃথিবী-কাঁপানো সর্বহারা মানুষের বিজয় অভিযান। শোষকের, [illegible]

নির্মম অত্যাচার থেকে,' মুটে-মজুর খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ। কোটি কোটি অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষ ভীড় জমালো বিদ্যাঙ্গনে। ঘুচে গেল শিল্প ও জনগণের বিরাট ব্যবধান। বিপ্লবের পীঠস্থান থেকে জন্ম নিল সত্যকারের প্রলেতারীয় কবি, শিল্পী, নাট্যকার।

নতুন এবং যথার্থ বস্তুবাদী গণ-শিল্পীকে লেনিন সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বার বার বলেছেন—'ধনতন্ত্র যে সংস্কৃতি রেখে গেছে, তার সবটাই আমাদের নিতে হবে এবং তাই দিয়েই গড়তে হবে সমাজতন্ত্র।...এ ছাড়া আমরা কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলতে পারব না।' অক্টোবর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই লেনিন বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যাতে দেশের পুরাতন সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা পায়। 'একদিন ভ্লাদিমির ইলিচের আপিসে এসে বললাম', স্মৃতিচারণ করেছেন লুনাচার্স্কি, 'দেশের সেরা থিয়েটারগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে চাই।...ভ্লাদিমির ইলিচ মন দিয়ে আমার কথা শুনে বললেন যেন আমি ঠিক ওই নীতিটাই অনুসরণ করি, তবে বিপ্লবের প্রভাবে যে নতুনের জন্ম হচ্ছে তাকে সমর্থনের কথা যেন না ভুলি।'

লেনিন চাইতেন নাটক এবং থিয়েটারগুলি মেহনতী মানুষের আনন্দের উৎস হয়ে উঠুক। কিন্তু যার প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক বিজয়লাভের পক্ষে অপরিহার্য তা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র থিয়েটারের জন্যে অর্থ ব্যয় করতে তিনি সম্মত হতেন না। দেশ গঠনের প্রথমেই এই মহান কর্মযোগীকে বিশেষ-ভাবে নজর দিতে হয়েছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণের দিকে। তাই ঐ কঠোর সময়ে বলশয় থিয়েটারের জন্য বরাদ্দের অঙ্ক তিনি হ্রাস করে দিয়েছিলেন। শুধু যে তা 'একখণ্ড বিশুদ্ধ জমি-দারী' ছিল তা নয়, এর পেছনে ছিল এক গভীর তাৎপর্য, যা লুনাচার্স্কিকে লেনিন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে দেন—'গাঁয়ের মামুলী সব স্কুল চালাবার মতো সঙ্গতি যেখানে জুটছে না, সেক্ষেত্রে প্রচুর টাকা দিয়ে অমন সাড়ম্বর একটি থিয়েটার পোষা সাজে না।' লেনিনের বিপ্লবী মন প্রথমেই চেয়েছিল নির্যাতিত, শোষিত, অজ্ঞ মানুষ সর্বাগ্রে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠুক। না হলে ব্যর্থ হবে সমাজতন্ত্র, ধসে পড়বে গণতন্ত্রের বনিয়াদ। ক্লারা সেৎকিনকেও তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—'একদিকে যখন মস্কো তে আজ দশ হাজার, কাল আরো দশ হাজার লোক যখন আমাদের থিয়েটারগুলির চমৎকার অভিনয় দেখে আনন্দে আত্ম-হারা হচ্ছে, কোটি কোটি লোক তখন শিখতে চেষ্টা করছে নিজের নামের বানান আর এক-দুই গুণতে; পৃথিবী যে সমতল নয়, গোল এবং ডাইনি, যাদুকর আর এক 'স্বর্গীয় পিতা' দ্বারা তা শাসিত হয় না, শাসিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা, চেষ্টা করছে সেইটুকু জানার মতো সংস্কৃতি অর্জন করতে।'

লেনিন দেখে যেতে পারেন নি তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ হয়েছে। অতি দ্রুত অপসারিত হয়েছে রাশিয়ার নিরক্ষরতা, আর গড়ে উঠেছে শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর রাজ্য।

'আমাদের সংবাদপত্রগুলির চরিত্র' প্রবন্ধের একস্থানে লেনিন যে উপদেশ আর পথনির্দেশ দিয়েছেন, তা শুধু আমার সাংবাদিকদেরই নয়, সব দেশের কবি-শিল্পী-নাট্যকারের আদর্শ হওয়া উচিত—'আরো ঘনিষ্ঠ হও জীবনের সঙ্গে। শ্রমিক ও কৃষকেরা তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়ে, বাস্তব-ক্ষেত্রে যে নতুনকে গড়ে তুলেছে, তার প্রতি আরো নজর দাও...।' তবেই রচিত হবে যথার্থ গণ-সাহিত্য। তবে সৃষ্টি হবে বিদেশ থেকে ধার করা কৃত্রিম উপাদানের পরিবর্তে, দেশের ধুলো-কাদা-মাখা, ঘাম-ঝরা মেহনতী মানু-ষের আশ্চর্য জীবনবেদ, তাদের জীবনের চিরন্তন পৌষ-ফাগুনের পালা।*

* [সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায় এ-বছর মস্কো রেডিও থেকে লেনিনের জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছেন।]

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গ্রীসের সেরা নাট্যকারেরা তাঁদের বিষাদান্তক নাটকগুলিতে কাব্য, সঙ্গীত এবং নৃত্যের অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। অভিনয়ের সময় নটেরা কখনো কখনো একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁদের সংলাপ আবৃত্তি করতেন। এই সংলাপের সঙ্গে ধীরে ধীরে লায়ার অথবা বাঁশী বাজানো হত। প্রাচীন গ্রীসের এই নাট্যীয় রীতি য়ুরোপের মানুষ এক সময় ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু রেনেসাঁসের সময় থেকে গ্রীক সভ্যতা সম্পর্কে য়ুরোপীয়দের তীব্র অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ ফ্লোরেন্সে কাউন্ট বার্ডি নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে মিলিত হয়েছিলেন। ইতিহাসে এই সম্প্রদায় 'ক্যামেরেটা' নামে পরিচিত। আগামী যুগের সংগীতে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

ক্যামেরেটা সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শকেরা যতক্ষণ না একটি নাটকের গান ভাল করে শুনতে পান ততক্ষণ তাঁদের পক্ষে নাটকটির রস সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই গোড়াতে কি করে দর্শকদের সুষ্ঠুভাবে নাটকের গান শোনানো যায় সে চেষ্টা তাঁরা করেছিলেন। রিনুচিনির 'ইউরিডাইস' কাব্যটিতে সুরারোপ করে জ্যাকোপো পেরী নামে 'ক্যামেরেটার' এক সভ্য যে গানগুলি রচনা করেছিলেন, সৃষ্টিমূলক কাজ হিসাবে তা হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে রসোত্তীর্ণ। বিভিন্ন চরিত্র গানের মাধ্যমে যেমন করে এ কাব্যকাহিনীর বর্ণনা করেছিলেন তা ছিল সত্যিই অশ্রুতপূর্ব। পেরীর রচিত এই সঙ্গীত ১৬০০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্থ হেনরী এবং মারিয়া দা মেদিচির বিবাহ উপলক্ষে ফ্লোরেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গ্রীক নাটকের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা হিসাবে এটি ব্যর্থ হলেও এর মধ্য দিয়েই ললিতকলার ওপেরা নামে এক নতুন শাখার জন্ম হয়।

ওপেরার একটি নিজস্ব ইতিবৃত্ত আছে। সেখানে আমরা দেখি যে, বহু বিখ্যাত সুরকার সঙ্গীতের এই শাখায় অসামান্যতম সাফল্যও অর্জন করতে পারেন নি। য়ুরোপের সেরা সুরকারদের মধ্যে অনেকে একটিও ওপেরা রচনা করতে পারেন নি। বাখ একটিও ওপেরা লেখেন নি। বিটোফেনের একমাত্র রচনা হল 'ফিডেলিও'। ফিডেলিওর প্রথম অনুষ্ঠান হয়েছিল ভিয়েনায়, ১৮০৫ খৃস্টাব্দে। The Oxford Companion To Music-এ আছে—**The composer made four attempts at the** overture, in the following order, employing the accepted but incorrect enumerations: Leonora No. 2 (1805), Leonora No. 3 (1806), Leonara No. 1 (1807), Fidelio (1814): The last is the one now always used with the opera, but Leonora No. 3 (The most developed and finest) is sometimes interpolated between the acts. The libretto is by Sonnleithner, alter the French play by Bonilly, Leonore, on l' amour conjugal.

The Spanish nobleman Florestan, having incurred the hatred of Pizarro, has been secretly lodged in the prison of which his enemy is the Governor. Pizarro has given it out that Florestan is dead, but the nobleman's devoted wife, Leonora, suspects the truth, and, disguising herself as a boy and calling herself 'Fidelio', she gets employment in the prison as assistant to the chief jailor, Rocco.

The only other solo characters during the greater part of the opera are Rocco's daughter, Marcellina; and her assistant-jailor lover, Jaquino. বিটোফেন মূলত বিশুদ্ধ সংগীতের স্রষ্টা ছিলেন। তাই তাঁর প্রতিভার যে স্পর্শ তাঁর রচিত সিম্ফনি বা কনচের্টোগুলিতে অনুভব করা যায় এটিতে তার অভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হয়।

মোৎসার্ট বিটোফেনের পূর্বসূরী। ...ছেন। তাঁর ওপেরাগুলির মধ্যে ম্যাজিক ফ্লুট সর্বশ্রেষ্ঠ। মিশরের রাজপুত্র টামিনো এবং রাত্রের রাণী পামিনার কন্যা প্রেমকাহিনী এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভা ওপেরা করতে মোৎসার্ট বলতেন—**an opera is sure of success when the plot is well worked out, the words written solely for the music and not shoved in here and there to suit some miserable rhyme... Verses are indeed the most indispensable element for music—but rhymes —solely for the sake of rhyming—the most detrimental.** এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন—**The best thing of all is when a good composer, who understands the stage and is talented enough to make sound suggestion, meets an able poet, that true phoenix;** in that case no fears need be entertained as to the applause even of the ignorant. স্বরচিত ওপেরাগুলিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। মোৎসার্ট যদিও খুব বেশি ওপেরা রচনা করেন নি, কিন্তু 'দি ম্যারেজ অভ ফিগারো' অথবা 'ডন গিয়োভানি' তাঁকে চিরস্মরণীয় সুরকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে মোৎসার্ট সেণ্টিনারী উপলক্ষে জর্জ বার্নার্ড শ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: There are operas. .on which you can put your finger and say, 'Here is final perfection in this manner; and nobody, whatever his genius may be, will ever get a step further on there lines.' এই প্রবন্ধটির উপসংহারে বার্নার্ড শ লিখেছিলেন—**In my small boyhood I by good luck had an opportunity of learning the Don thoroughly, and if it were only for the sense of the value of fine workmanship which I gained from it, I should still esteem that lesson the most important part of my education. Indeed it educated me artistically in all sorts of ways, and disqualified me only in one—that of criticising Mozart fairly. Everyone appears a sentimental, hysterical bungler in comparison when anything**

brings [illegible] back to [illegible] থেকে মোৎসার্ট অপেরা রচনা শুরু করে-ছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তাঁর অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গীতের অন্যান্য শাখাগুলির সাথে অপেরারও অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

মোৎসার্টের আগে যেসব জার্মান [illegible] অপেরা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হ্যান্ডেল এবং হাইডেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এঁরা কেউই সার্থক অপেরা রচয়িতা ছিলেন না, তাই এঁদের রচনাগুলির কথা সবাই আজ ভুলে গিয়েছে। হ্যান্ডেল জার্মানীতে জন্ম-গ্রহণ করেও জীবনের দীর্ঘতম এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সময় ইংলণ্ডেই কাটিয়েছিলেন এবং সেজন্য ইংরাজরা তাঁকে ইংরাজ সুরকার বলেই দাবি করে থাকেন। পারসেলের মৃত্যুর পর প্রথমবার ইংলণ্ড ভ্রমণে গিয়ে মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে রিনাল্ডো নামে যে অপেরাটি তিনি রচনা করেছিলেন, তা ইংরাজ জাতিকে বিমোহিত করেছিল। এমন অপেরা ইংলণ্ডে কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি। এটি প্রকাশ

"যে অন্যদের ঘৃণা করে
ঘৃণা তাকেই আঘাত দেয়
ঘৃণিতকে নয়"

মহাত্মা গান্ধী

[illegible] এক ইংরেজ প্রকাশক প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন যে, হাণ্ডেল তাঁকে নাকি বলেছিলেন—'এর পরের বার আপনি ওপেরা রচনা করবেন আর প্রকাশনার ভার গ্রহণ করব আমি।' লণ্ডনে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করার পর The Royal Academy of Music নামে একটি বড় ওপেরা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন হাণ্ডেল। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি ওপেরাও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হন নি। এর জন্য দু'বার সর্বস্ব হারিয়ে দেউলিয়া হতেও হয়েছিল। বিখ্যাত যন্ত্রসংগীত রচয়িতাদের মধ্যে সুমানের 'গেনোভেভা' নামে একটি ওপেরা আছে। কিন্তু এটিকেও সুমানের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির পাশে স্থান দেওয়া যায় না। ওপেরা রচয়িতাদের মাঝে সবার সেরা আসনটি যিনি দখল করে আছেন, তাঁর নাম রিখার্ড ভাগনার। ভাগনারের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর ওপেরা সম্পর্কে দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন। ঊনিশ শতকের জার্মান ওপেরার মেজাজ ছিল পুরোপুরি রোমান্টিক। গ্রাণ্ড ওপেরার উন্নতির সংগে সংগে এক শ্রেণীর হাল্কা গীতিনাট্যও সে যুগে লোকপ্রিয়তা লাভ করে। হেববার, স্ফোর এবং মারস্নার এ যুগের শ্রেষ্ঠ রচয়িতার স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচীন কমেডি থেকে Opera buffa (হাসির ওপেরা) রচিত হবার পরিবর্তিকালের মধ্যে গ্রাণ্ড ওপেরার বিভিন্ন অঙ্কের মাঝে কিছু কমিক চরিত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। ক্লাসিকাল ওপেরার সর্বপ্রকার আঁটাআঁটিকে বাদ দিয়ে এ সময় থেকেই ওপেরার সংগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিবিড়তর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।

ভাল ওপেরার অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র কিছু উচ্চাংগ সংগীত পরিবেশন করলেই চলে না। সুন্দর কাব্যের সাহায্যে তার আখ্যানভাগটিও বর্ণনা করতে হয়। তাই ওপেরার মূলত দু'টি ভাগ থাকে—(১) বর্ণনাত্মক অংশ এবং (২) লিরিক অংশ। বর্ণনাত্মক অংশটির নাম Recitative. তার মাধ্যমেই ওপেরার কাহিনী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা যায়। আর লিরিক অংশটির নাম Aria. ওপেরার সাংগীতিক সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তোলার জন্য সুরচিত Aria অপরিহার্য। ঊনিশ শতকের ওপেরা রচয়িতারা অন্ধভাবে প্রাচীন রীতি অনুসারে recitative এবং aria রচনা না করে স্বাভাবিকভাবে সংলাপ লিখতে শুরু করেন। জার্মেনীর হাসির ওপেরার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল মোট্‌সার্টের 'দি ম্যারেজ অভ ফিগারো' এবং 'দি ম্যাজিক ফ্লিউট'।

হাসির ওপেরার সাথে Opera Comique-এর একটা পার্থক্য আছে। Opera Comique সব সময় হাস্যরসাত্মক হয় না। গ্রাণ্ড ওপেরার সঙ্গে তার পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গেলে একথাই বলা উচিত যে, গ্রাণ্ড ওপেরার মত Opera Comique-এর সব সংলাপ গীত না হয়ে কিছু কিছু অংশ সাধারণভাবে কথা বলার ভঙ্গিতেও ব্যক্ত হয়ে থাকে। জার্মান 'সিংগস্পিল' (নাট্য-গীতি)-এর মধ্যে এর দু'টি ভাল উদাহরণ হ'ল বিটোফেনের 'ফিডেলিও' এবং হেববারের 'ডেয়ার ফ্রাইস্‌ট্‌জ্‌'।

তারিখ-সালের হিসাবে ভাগনারকে জার্মেনীর সর্বপ্রথম ওপেরা রচয়িতা বলা চলে না। তবে স্বীয় প্রতিভার বলে জার্মেনীর সর্বশ্রেষ্ঠ ওপেরা রচয়িতার স্থানটি তিনি অনায়াসেই দখল করে নিয়েছিলেন। ভাগনারের জীবন ও কর্মের মাঝে এমন এক বিচিত্র যোগাযোগ রয়েছে যে, তাঁর শিল্প-কর্মের অনুধাবন করতে গেলে তাঁর জীবনচর্চার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ভাগনার সম্পর্কে দীপঙ্কর সেন তাঁর 'য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী' গ্রন্থে লিখেছেন :

খর্বকায় ক্ষীণদেহী মানুষটির সারা শরীরের মধ্যে প্রকাণ্ড মাথাটিই প্রথম চোখে পড়ত। নানাবিধ অসুস্থতার মাঝে স্নায়বিক ব্যাধি এবং চর্মরোগে তিনি সবচেয়ে বেশি ভুগেছেন। চর্মরোগের যন্ত্রণায় সিল্ক ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তৈরি অন্তর্বাস পর্যন্ত তিনি ব্যবহার করতে পারতেন না। তাঁর আত্মম্ভরিতা ছিল অতি প্রবল। নিজেকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করতেও তিনি পারতেন না। মনে করতেন তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সুরকার এবং দার্শনিক। তাঁর কথা শুনে মনে হ'ত একই দেহে যেন সেক্সপীয়ার, বিটোফেন এবং প্লেটো বিরাজ করছেন, আর কথা শুনবার জন্য কায়মনে অপেক্ষা করে থাকতে হ'ত না। কারণ, তাঁর মত বাক্যবাগীশ সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। কথাটা তিনি ভালই বলতেন, তাই আলাপ-আলোচনা করতে এসে সবারই শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হ'ত। এসব আলোচনা যেখান থেকেই শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে এবং নানা বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণার পর্যালোচনায় গিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করত।

ভাগনারের বাবা ছিলেন লাইপজিগের একজন পুলিশ অফিসার। ভাগনারের জন্মের কয়েক মাস পরেই তিনি মারা যান। এ ঘটনার কিছুদিন বাদে তাঁর বিধবা পত্নী লুডভিহ্‌ক গেয়ার নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। গেয়ার শক্তিধর অভিনেতা ছিলেন। তাঁর ছবি আঁকার হাত ভাল ছিল এবং তিনি কবিতাও লিখতেন। কেউ কেউ ভাগনারকে গেয়ারের অবৈধ সন্তান বলেছেন, কিন্তু এ-কথার কোন প্রমাণ নেই। তবে গেয়ার ভাগনারকে অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং নানাভাবে তাঁকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। শৈশবে ভাগনারের প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি, তবে নিতান্ত শিশুকাল থেকেই পড়াশুনায় তাঁর খুব 'ঝোঁক' ছিল। গ্রীক ভাষা ভাল লাগত বলে বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের বাইরে অনেক কিছুই তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। সেক্সপীয়ারের মূল রচনায় অসাধারণ আগ্রহ ছিল বলে খুব যত্ন সহকারে ইংরাজী শিখেছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েটের কিছু অংশ জার্মান ভাষায় তর্জমাও করেছিলেন। জার্মান কাব্য, ইতিহাস এবং ভূগোল পড়তেও তাঁর ভাল লাগত। স্কুলে থাকতে থাকতেই কয়েকখানি নাটক তিনি রচনা করেছিলেন এবং স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর ১৮৩১ খৃস্টাব্দে সংগীতশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তখনও শিল্প-কর্মে তেমন মন দেন নি।

উদ্দেশ্যহীন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল টমাস স্কুলের সংগীত-শিক্ষক ভাইন্‌লিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর। তিনিই ভাগনারকে প্রথম পথের সন্ধান দেন। কাউণ্টার পয়েন্ট নিয়ে গবেষণা শুরু হল। একটি সোনাটা, একটি পলনেইজ এবং ফ্যাণ্টাসিয়া রচনা করার পর একখানা সিমফনি লিখে ফেললেন ভাগনার। ১৮৩৩ খৃস্টাব্দে গেভাণ্ড হাউস ওপেরাতে এটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উর্‌ট্‌জবুর্গ থিয়েটারে তাঁর বড় ভাই অভিনয় করতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভাগনার সেখানকার কোরাস মাস্টারের পদটি লাভ করেন। চাকরির জন্য নানা শহরে সফর করতে হ'ত। মাগ্‌ডেবুর্গ শহরে মিনা প্লানার নামে এক অভিনেত্রীর সংগে তাঁর পরিচয় হয়। কিছুদিন পরে তিনি এই মহিলাকে বিবাহ করেন। প্যারিসে মেয়ার বিয়ারের লোকপ্রিয়তার কথা শুনে রিয়েনট্‌জি ওপেরাখানি নিয়ে তিনি সেখানে গেলেন। আশা ছিল ফরাসী শ্রোতারা তাঁকেও সমাদর করবেন। কিন্তু সেদিক থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে হতাশ হন। স্বয়ং মেয়ার বিয়ার সর্বপ্রকারে সাহায্য করা সত্ত্বেও প্যারিস সফরে তিনি একটুও সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ভাগনারের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল না বললেও চলে। কারণ, এ ঘটনার ১৩ বছর পরে তাঁর 'ওপার উন্‌ট্‌ ড্রামা' গ্রন্থে তিনি মেয়ার বিয়ারকে কুৎসিত ভাষায় সমালোচনা করেন। প্যারিসে বহু সংগ্রামের পরও আশার আলো দেখতে না পেয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন।

[ক্রমশ]

এরই সময়ে এলেন একজন নতুন 'কর্তা' অপেরা পরিচালক ইওয়াখিম হার্ৎস। তিনি এসে লাইপৎসিকের অপেরা-গোষ্ঠীতে ও অপেরা রীতিতে নতুন প্রাণসঞ্চার করলেন।

হার্ৎস হচ্ছেন প্রফেসর ফেলসেন-স্টাইনের শিষ্য। বার্লিনের কোমিশে অপেরা এখনো পর্যন্ত তাঁকে মঞ্চ-পরিচালনার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। লাইপৎসিকের অপেরাগোষ্ঠীকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে, এই গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান বারে বারেই হয়ে উঠেছে নিখুঁত প্রশংসনীয়। তরুণ প্রতিভাকে তিনি সুযোগ দিয়েছেন ও বড়ো করে তুলেছেন। যেমন, একটি দৃষ্টান্ত, উচ্চকণ্ঠ গায়ক জিগরিত কেল্। ইউরোপের ও সমুদ্রপারের মঞ্চগুলিতে এই একক গায়কদের এখন খুবই চাহিদা। স্থায়ী নাটকের ভান্ডার-বিশিষ্ট একটি রঙ্গালয়ের জটিল অবস্থার মধ্যেও তিনি প্রবর্তন করেছেন বাস্তববাদী সঙ্গীত-নাট্যের নীতি-সমূহ। বিশ্বে এ কৃতিত্বের কোন তুলনা নেই। তাঁর নিখুঁত প্রযোজনায় দর্শকরা বারে বারেই স্তম্ভিত হয়েছেন।

'এই করেছো ভালো' ছবিতে অনুপকুমার ও জুঁই বন্দ্যোপাধ্যায়

গত কয়েক বছরে ইওয়াখিম হার্ৎস-এর পরিচালনায় চোখে পড়ার মত বহু অনুষ্ঠান বহুবার হয়েছে। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা চলে : প্রকো-ফিয়েভের 'যুদ্ধ ও শান্তি', শোস্টা-কোভিচের 'কাটেরিনা ইসমাইলোভা', ব্রেশট। ভাইল-এর 'মহোগানী নগরের উত্থান ও পতন,' ভের্দির 'ডন কার্লোস', ভাগনারের 'লোহেনগ্রিন', বোরোদিনের 'প্রিন্স ইগোর' ও ব্রিটন-এর 'আলবার্ট হেরিং'।

অপেরা পরিচালনার জন্যে হার্ৎস বছরে একবার কি দু'বার বিদেশে

বোরোদিনের 'প্রিন্স ইগর' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

দিয়ে থাকেন। যেমন, তিনি দিয়েছেন বুয়েনোস আয়ার্সের থিয়েটারে, কোলোন-এ, ভিয়েনার ফোলক্‌-স্‌ওপেন-এ, মস্কোর বলশয় থিয়েটারে। বিদেশে আমন্ত্রিত হয়ে অপেরা পরিচালনা করে ফিরে আসার পরে প্রতিবারেই লাইপৎসিকে তিনি আরো চিত্তাকর্ষক কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার আরো একটি উৎস এই একই ভবনে রয়েছে—বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতগোষ্ঠী লাইপৎসিক গেভান্ট হাউস অর্কেস্ট্রা। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এই সঙ্গীত গোষ্ঠীর অর্কেস্ট্রা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

বর্তমানে লাইপৎসিক অপেরার ভাণ্ডারে আছে মঞ্চে উপস্থাপনার উপযোগী ৪০টি অপেরা। রচয়িতাদের নামের তালিকায় রয়েছেন মোৎসার্ট, ভেবের, ভাগনার, ওফেনবাখ, ভের্দি থেকে শুরু করে ব্রিটেন, বুশ, শোসটাকোভিচ, চাইকোভস্কি, প্রোকোফিয়েভ ও মাথুস পর্যন্ত। এই তালিকা থেকেও বোঝা যায় লাইপৎসিক অপেরায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্লাসিকের চর্চা যেমন হয়ে থাকে, তেমন প্রখ্যাত আধুনিক সঙ্গীতকারদের রচনাও উপস্থাপিত হয়।

স্বদেশে লাইপৎসিক অপেরার খ্যাতি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানও বৃদ্ধি পেয়েছে। গত কয়েক বছরে লাইপৎসিক অপেরাগোষ্ঠীর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে কিউবা, জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক ও যুগোস্লাভিয়া থেকে আর লাইপৎসিক অপেরা মঞ্চে অনুষ্ঠান করে গিয়েছে বেলগ্রেড, লন্ড্‌স, মস্কো, মিউনিক ভুপেরটাল ও স্টুটগার্টের অপেরাগোষ্ঠী। লাইপৎসিক অপেরার একক গায়করা ইউরোপের ও সমুদ্রপারের দেশগুলিতে এত বেশি জায়গায় গিয়েছেন যে, তার তালিকা উপস্থিত করা প্রায় অসম্ভব। গত কয়েক বছর ধরে মস্কোর বলশয় থিয়েটারের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে লাইপৎসিক অপেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মস্কোর বলশয় থিয়েটারে ইওয়াকিম হার্ৎস ছিলেন প্রথম জার্মান পরিচালক। তিনি উপস্থিত করেছিলেন ভাগনার-এর 'ফ্লাইং ডাচ ম্যান'। তারপর থেকেই এই দুই নাট্যভবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মুখ্য প্রযোজক প্রফেসর প্রোকোভস্কি ও মুখ্য পরিচালক বোরিস খাইকিন ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে লাইপৎসিকে [illegible] করেছেন চাইকোভস্কির 'পীক ডেম', রিমস্কি কোরসাকভের 'গোল্ডেন কক', স্পার্টাকাস, আইদ্যাকার ও আর্মেনিয়ান স্যুইট।

বিশ বছর আগে

গত ৬ই আগস্ট তমলুক খাদ্য ও সরবরাহ কর্মচারী রিক্রিয়েশন ক্লাবের সদস্যবৃন্দ শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের "বিশ বছর আগে" অভিনয় করলেন স্থানীয় রূপশ্রী সিনেমা হলে। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীরাজেন দাস। নাটকটি দর্শকদের কাছে বেশ রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সমর মুন্সী (দুঃখহরণ), সুভাষ রায় (প্রদীপ), অরবিন্দ দত্ত (দীপক), নন্দলাল দে (যদুপতি), অসিত সেনগুপ্ত (সনাতন), ছবি পাল (মনীষা), প্রতিমা ব্যানার্জী (তমসা), কানন ঘোষ (বনলতা)। এ ছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—রণজিৎ কর, রতন সাহু, পরিতোষ

গান্ধর্বী'র অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধিত শিল্পী শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে উপহার দিচ্ছেন শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীরণজিৎকুমার সেন।

চুক্রা, নিরঞ্জন গুহাইত, রঞ্জিৎ ব্যানার্জী, প্রভাত মহাপাত্র, সুখেন্দু পাল, নলিনী মান্না, রুমা চক্রবর্তী, রঞ্জনা আচার্য ও নমিতা চক্রবর্তী।

নবীন মাস্টার

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে অবকাশ-এর শিল্পীরা ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত "নবীন মাস্টার" নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। পুলিনবিহারী চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটকাভিনয় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ্য অভিনয় করলেন : অরূপ আচার্য, হিমাংশু ব্যানার্জী, লালন বসাক, চন্দন সেন, দীপঙ্কর মুখার্জী, স্বপন সিকদার, দীপক নাথ, অসীম নাগ, গোপীনাথ সাহা ও দীপক ব্যানার্জী।

শবরী'র মহরৎ

গত ১১শে আগস্ট নিউ থিয়েটার্স ২ নম্বর স্টুডিওতে ইউনাইটেড আর্টিস্ট এন্ড টেকনিসিয়ানস্-এর 'শবরী' ছবির শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন সিদ্ধ মেনজারী। কাহিনী, চিত্রনাট্য,

পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণ সব কাজের দায়িত্ব একাই পালন করছেন অশোককুমার দাস। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন অনিল বাগচী। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে থাকবেন অনুপকুমার, বিদ্যা রাও, শিবানী ও গীতা দে।

"ত্রিনয়নী মা"

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত রূপঋষি চিত্রমের "ত্রিনয়নী মা" ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সংগীতাংশ ছবিটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। অনিল বাগচীর সুরে ছবিটিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী ও অলক বাগচী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত, অমিয় মুখার্জী ও সুবোধ দাস।

চরিত্র চিত্রণে আছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, গুরুদাস ব্যানার্জী, অজিত ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, মণি শ্রীমানী, শমিত্র বিশ্বাস, আনন্দ মুখার্জী, শচীন মল্লিক, সীমা দেবী, অমরেশ দাস, কালীপদ চক্রবর্তী, অলক বাগচী, সিদ্ধু ডাওরান, সত্য দে, তাপস চ্যাটার্জী, মধুমিতা এবং কমাগতা রূপা।

সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

মহুয়ার অনুষ্ঠান

"জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মহুয়ার সারা-রাত্রিব্যাপী নাট্যানুষ্ঠান। নীতীশ সেন রচিত "বর্বর বাঁশী" ও চন্দ্রনাথ সুর রচিত ও পরিচালিত "সব পেয়েছির দেশ"। স্থান :—শালিমার রেলওয়ে ইন্স-টিটিউট। সময় রাত ১০টা। অভিনয়ে :—জয়দেব রায়, চন্দ্রনাথ সুর, সমীর মজুমদার, কুমার রায়, শচীন বাগ্নিক, জগন্নাথ নারায়ণ, প্রভাত, জগবন্ধু, আনন্দ, কার্তিক এবং মৈত্রী দেবী ও রুণু বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বৈতানিকের প্রতিষ্ঠা দিবস

গত শনিবার ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠান বৈতানিক তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়ো-জন করেছিলেন। সাধারণত রবীন্দ্র সদন মঞ্চে নাটকের অভিনয় ও নৃত্য-নাট্যানুষ্ঠান দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন কদাচিৎ হয়, তাও প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্র সদন মঞ্চে বৈতানিক তাদের প্রাক্তন এবং বর্তমান শিল্পীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে-ছিলেন তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রয়াস।

অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারা সঙ্গীত সহযোগে আলোচনা। আলো-নায় শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রসবোধ ও সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমানসের ক্রম-বিবর্তনের ধারাটির সুচারু বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ভানু সিংহের পদাবলী থেকে শুরু করে কাব্য সঙ্গীত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্বের গানে সুর সংযোজনায় [illegible]

[illegible]

সমর চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসুমী মন' ছবির একটি দৃশ্যে সর্বেন্দু ও মিত্রা চৌধুরী।

রাগ মিশ্রণ পদ্ধতির মধ্যেও সুরকারের অনায়াস পটুত্বই প্রকাশিত। তাঁর ভাষণ সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীতের সুপরিবেশিত দৃষ্টান্তে মূর্তি গ্রহণ করেছে। এককথায় আলোচনা এবং গানের মাধ্যমে রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশের ধারাটি যেভাবে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠেছিল তাতে রবীন্দ্র সদনের উপস্থিত সকল শ্রোতাই মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়েছিলেন।

বৈতানিকের রবীন্দ্রসংগীতের পরিবেশনা সেদিন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল। সমবেত সংগীতে তাঁদের খ্যাতি বহুদিনের। কিন্তু একক সংগীতেও এবার বৈতানিকের কোন কোন শিল্পী যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে শ্রীমতী সুমিত্রা সেন, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও শ্রীশৈলেন দাসের গান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তবে শ্রীশৈলেন দাসের কৃষ্ণকলির গানটি যন্ত্র-সংগীতের মূর্ছনায় ব্যাহত হয়েছে। কিশোর শিল্পী শ্রীসুবিদ ঠাকুর সম্বন্ধেও অনেকেই আশান্বিত। একটি নাম এক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—যাঁর কণ্ঠের 'নীলাঞ্জন ছায়া...' এবং 'আপন মিজে পরানের ব্যথার মাঝা' গান দুটির অপূর্ব সুরঝঙ্কার শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। তিনি হলেন শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়। বৈতানিক ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মঞ্চস্থ করেন।

গান্ধর্বীর অষ্টম বার্ষিকী ও সমাবর্তন উৎসব

সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। গান্ধর্বীর অষ্টম বার্ষিকী ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সভাপতি—শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আচার্য—শ্রীতারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। সম্মিলিত বেদগানের দ্বারা অনুষ্ঠান শুরু হয়। গান্ধর্বীর আট বছরের ইতিহাস বর্ণনা করে সকলকে স্বাগত জানান গান্ধর্বীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীরণজিৎকুমার সেন। অধ্যক্ষ ও কর্মসচিব শ্রীসন্তোষ ঠাকুর অন্ত্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীবৃন্দকে আচার্যের নিকট উপস্থিত করলে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞানপত্র ও পদক উপহার পান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে এ বছর গান্ধর্বী থেকে সম্বর্ধনা জানিয়ে মানপত্র ও উপহার দেওয়া হয় ঠাকুর পরিবারের বর্ষীয়সী রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমতী ঠাকুর দুখানি রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। পাশ্চাত্য সুর প্রভাবিত ছখানি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন অনুষ্ঠানের এক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে সকলকে আনন্দ দেয়। এতদ্ব্যতীত একক সংগীতে ও নৃত্যে সর্বশ্রী সন্তোষ ঠাকুর, সমীর মজুমদার, মনোজ সেনগুপ্ত, জয়ন্তী চক্রবর্তী, সুজিত চক্রবর্তী, নবঘনশ্যাম সিং, খেলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সভাপতি এবং আচার্যের আনুষ্ঠানিক ও সমাবর্তন ভাষণ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বয়স্ক খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দল হলে কি হবে—প্রথম দিকে তাঁরা যা খেললেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম দু'টি টেস্টে আর তৃতীয় টেস্টের আগের প্রথম শ্রেণীর খেলাগুলোয় ভারতীয় খেলোয়াড়রা মোটে সুবিধেই করতে পারলেন না।

বোম্বাই-এর প্রথম টেস্টে ভারতীয় দল পরিচালনা করেছিলেন পাতিয়ালার যুবরাজ। কিন্তু কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হলেন কর্নেল সি কে নাইডু।

সেলিম দুররানীর বাবা আব্দুল আজিজ আর তরুণ খেলোয়াড় মুস্তাক আলীও ছিলেন ভারতীয় দলে।

খেলার আগের দিন রাত্তিরে নামল বৃষ্টি। তাই টসে জিতে জ্যাক রাইডার ভারতকেই পাঠালেন ব্যাট করতে। ওয়াজির আলীর সংগে মুস্তাক ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন করতে এলেন। পিচের অবস্থা ভালো না। দুজনেই তাই খুব সতর্ক হয়ে খেলছেন।

দেখতে দেখতে এক সময় রোদ উঠলো। শুকোতে আরম্ভ করলো পিচ। আর তার সুযোগ নিতে রাইডার স্লো বোলারদের ওপর দিলেন আক্রমণভার। ২০ রান করে আউট হয়ে গেলেন ওয়াজির আলী। অমরনাথ এলেন আর ফিরে গেলেন কোন রান করার আগেই। মার্টিনের ঝোলানো বলে এগিয়ে মারতে গিয়ে স্টাম্পড হলেন মুস্তাক। সি কে নাইডুও আউট হলেন একইভাবে।

পিচের অবস্থা তখন সাঙ্ঘাতিক। ব্যাটসম্যানরা মোটে দাঁড়াতেই পারছেন না। পারলেনও না কেউ রুখে দাঁড়াতে। মাত্র ৪৮ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস।

প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়াও দু'টি উইকেট হারিয়ে করলো ২৮ রান। ভারতের ফাস্ট বোলার নিসারই নিয়েছেন উইকেট দু'টি।

কিন্তু স্লো বোলারের প্রয়োজন যখন সব থেকে বেশি, ঠিক সেই সময়ই জ্বরে পড়লেন মুস্তাক। ভীষণ জ্বর। মাঠে নামতেই পারলেন না। মুস্তাক মাঠে নামতে পারলে খেলার ধারা হয়তো অন্যরকম হতো। তবু খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না অস্ট্রেলিয়া। ৯৯ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল তাদের প্রথম ইনিংস। মহম্মদ নিসারের ফাস্ট বল আর বাকা জালানীর লেগ ব্রেক বলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা অসহায় হয়ে পড়লেন।

॥ কার্তিক বসু ॥

কার্তিক বসু খেলার প্রথম পেয়েছেন টেস্ট খেলার সুযোগ।

কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারত আবার বিপর্যের সম্মুখীন হলো। এই বিপর্যয় শোচনীয়। একমাত্র অমরনাথ ছাড়া ভারতের আর কোন ব্যাটসম্যানই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেন না। একের পর এক আউট হয়ে ফিরে এলেন।

একা অমরনাথ আর কি করতে পারেন। তবু তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে ভারতকে কিছুটা এগিয়ে দিলেন। কিন্তু অতো অল্প রানে এগিয়ে থাকারই কি বা মূল্য থাকতে পারে।

থাকলোও না। মাত্র দু'টি উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া তুলে নিল জয়লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় রান। ফলে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারত হেরে গেল ৮ উইকেটে।

এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল ভারত তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে। ভারতের এই জয়লাভের পেছনে ছিল ওয়াজির আলীর সব চেয়ে বেশি অবদান। তাঁর ব্যাটিংনৈপুণ্যের কথা চিরকাল যেমন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তেমনটি সেই সময় ওয়াজির আলীর খেলার ধারা ভারতীয়দের মনে জাগিয়েছিল বিশ্বাস, এনে দিয়েছিল আস্থার ভাব—ওয়াজির আলীর খেলা দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই খেলেওছিলেন জান লড়িয়ে।

আর তারই জের টেনে জান লড়িয়ে খেললেন মৈনুদ্দৌলা একাদশের খেলোয়াড়রা। সেকেন্দ্রাবাদের সেই খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হলো। অস্ট্রেলিয়া হেরে গেল এক ইনিংস ও ১৯৫ রানে।

[illegible]

ইনিংসে হেরে গেল মৈনুদ্দৌলা একাদশের কাছে।

আর চতুর্থ টেস্টের প্রাক্কালে অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে এনে দিলো উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরা নতুন আশার আলোর সন্ধান।

কিন্তু কর্নেল নাইডু বাদ গেলেন দল থেকে। লায়েরের ম্যাচে তিনি খেলেন নি আর না খেলার জন্যে দেখান নি কোন কারণও। তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে বাদ দেওয়া হলো মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট দল থেকে। তবে বাংলার কার্তিক বসুকে সেবার দেওয়া হলো প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ।

কার্তিক বসু কিন্তু একদম সুবিধে করতে পারলেন না। মুস্তাক আলীর সংগে খেলতে নামার একটু পরেই আউট হয়ে গেলেন। মুস্তাক তখন খেলছেন তাঁর স্বাভাবিক ভংগীতে। লালা অমরনাথ এসে যোগ দিয়েছেন মুস্তাকের সংগে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ৪০ রান সংগ্রহ করার পর মুস্তাক আলী রান আউট হয়ে গেলেন। ভারতের প্রথম ইনিংসে ফাস্ট বোলার অমর সিং দর্শনীয়ভাবে ব্যাটিং করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১৮৯ রানের মাথায়। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরাও কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। পারবেনই বা কি করে। একদিক থেকে অমর সিং আর অপর দিক থেকে মহম্মদ নিসার যেভাবে বোলিং শুরু করেছিলেন, তার তুলনা মেলাই ছিল ভার। ফলে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও করতে পারলো না ১৬২-র বেশি রান।

দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা আবার দিলেন শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। ইনিংস সূচনা করতে এসে মাত্র এক রান করে বিদায় নিলেন কার্তিক বসু। ৭ রানের মাথায় আউট হলেন মুস্তাক আলী।

এমন একটা খবর এলো যখন দেখা গেল যে, একটি উইকেট হারিয়ে ভারত করেছে মাত্র ৮২ রান। শেষ মুহূর্তে নিসারের আর মঙ্কড়ের খেলায় ভারতের রান সংখ্যা কোন রকমে পুর হলো শয়ের কোঠা।

অস্ট্রেলিয়ার সামনে তখন জয়লাভের সুযোগ। জেতার জন্যে দরকার মাত্র ১৪১টি রান। হাতে আছে অফুরন্ত সময় আর দশ-দশটি উইকেট। জয়লাভের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা ব্যাট করতে নামলেন।

ভারতের বোলাররাও কিন্তু বসে নেই। তাঁরাও তখন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের জয়লাভের স্বপ্ন ভেঙে দিতে বদ্ধপরিকর।

আরম্ভ হলো অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস। আর সংগে সংগেই সংহার মূর্তি ধরলেন অমর সিং আর মহম্মদ নিসার। নিসারের বোলিং-এর সামনে অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের সমস্ত চাতুর্য যেন মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

একটার পর একটা পড়তে লাগলো উইকেট। দাপটে বল করতে লাগলেন মহম্মদ নিসার। অমর সিং সেই আক্রমণে যোগালেন ইন্ধন। অস্ট্রেলিয়ার শেষ ব্যাটসম্যান যখন আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন তখন স্কোর বোর্ডে হয়েছে মাত্র ১০৭ রান। জয়লাভের জন্যে তখনো দরকার ৩৩ রানের।

সেই ৩৩ রানের ব্যবধানেই ভারত হারালো অস্ট্রেলিয়াকে। আর মাত্র ৩৬ রান দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ছজন ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মহম্মদ নিসার।

সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পেছনে ছিল যেমন মহম্মদ নিসারের বোলিং সাফল্য, তেমনি ছিল ওয়াজির আলীর ব্যাটিংনৈপুণ্য।

সত্যি কথা বলতে কি, নিসার আর ওয়াজির আলীর জন্যেই সেই টেস্টে ভারত জিতেছিল...।

[চলবে]

ডন ভালো আছেন

ডন ভালো আছেন। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি এখন নিচ্ছেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। নিজের বাড়িতে একটু-আধটু পায়চারি ছাড়া প্রায় সব সময়েই ক'দিন ধরে শুধু ঘুমিয়েছেন তিনি।

মাত্র ক'দিন আগে স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের হঠাৎ অসুস্থতার সংবাদে সমস্ত বিশ্ব চমকে উঠেছিল। একটা হোটেলে দুপুরে লাঞ্চের সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ডন। প্রায় দশ মিনিট

ছিলেন সংজ্ঞাহীন অবস্থায়। ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সকলে।

পরে ডাক্তারবাবুরা দেখে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, ভাইরাস ইনফেকশনের জন্যেই ব্র্যাডম্যান অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ক'দিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান এই সপ্তাহেই ৬২টি বছরের ঘরে পা দিয়েছেন। এখনো তিনি মনে-প্রাণে পাকা ক্রিকেটার, তাজা পুরুষ। তাই তাঁর হঠাৎ অসুস্থতার খবরে চমকে গিয়েছিলেন সকলে।

ডন ব্র্যাডম্যান মোট ৫২টি টেস্ট

[শেষাংশ ৫৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভণ্ডুল

কলকাতা ময়দানে এখন একটা নতুন জিনিষ দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটার গুরুত্ব যে কতোখানি তা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। তবে কলকাতা ময়দানের কয়েকটি ছোট ছোট দল এরই মধ্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটার গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। আর এ ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ কিছু করার নেই দেখে আরো বেশি হতাশ হয়েছেন। বড় ক্লাবগুলোর অন্ধ সমর্থকরা তাতে খুশি। কিন্তু যাঁরা ফুটবল খেলাকে সত্যিই ভালোবাসেন আর যাঁরা দলবাজী পছন্দ করেন না—তাঁরা ঠিক খোলা মনে ব্যাপারটাকে শুধু মেনেই নিতে পারছেন না, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন। অবশ্য তাঁদের প্রতিবাদের যে বিশেষ কোন মূল্য নেই—একথা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন। তবু ফুটবল খেলার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা চুপ করে থাকা যে সম্ভবও নয়—একথাও বোধহয় ফুটবলরসিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। স্বীকার করবেন যে, এই সংক্রামক রোগটাকে বাড়তে দিলে একদিন এই রোগই সব কিছু অর্থাৎ ফুটবল খেলার ভূত-ভবিষ্যৎ, এমন কি বর্তমানকেও বিনাশ করে ফেলবে। ফেলবে কেন—ফেলছে বলাই বোধ হয় উচিত।

কারণ, আজকাল প্রায়ই বড় দলের খেলায় দেখা যাচ্ছে যে, বড় দলগুলো গোল দিতে না পারলে সেই দলের এক শ্রেণীর উগ্র সমর্থক মাঠে ইট-পাটকেল প্রভৃতি ছুড়ে খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেন রেফারীকে। তাঁরা ভাবেন যে, তাঁদের দল সেদিন গোল দিতে পারে নি তাতে কি হয়েছে। খেলা শেষ হবার আগেই হামলা করে খেলা বন্ধ করে দিতে পারলে আর একদিন খেলা হবেই—আর সেদিন নিশ্চয়ই তাঁদের দল গোল করতে পারবে। ফলে শুধুমাত্র এই কারণেই এ বছরের কয়েকটি খেলা সম্ভবত ভণ্ডুল হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটি কি সত্যিই তাই? ক্লাবগুলোরও কি এই ব্যাপারে সম্মতি আছে? বোধ হয় আছে—তা না হলে এই বিশ্রী ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ভণ্ডুল খেলার ফলাফল বজায় রাখার জন্যে আই এফ এ-র কাছে আবেদন জানাতো বড় দলগুলো। তারা কিন্তু তা করে নি। বরং নিয়েছে ভণ্ডুল খেলাগুলোর পুনরনুষ্ঠানের সুযোগ। আজ তাই এই ব্যাপারটি বন্ধ করার জন্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর দৃষ্টি দেবার জন্যে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, খেলোয়াড় এবং দর্শকদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। আমরা চাই, এই আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন এবং বন্ধ করে দিন এই অরাজক অবস্থা.....!

ফুটবল মাঠে

ভারতের ক্ষেত্রে এবার অবশ্যই বলতে হবে। তা নাহলে কি আর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করতে পারতো? গত বছর এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী আটটি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল অষ্টম। আর এ বছর বারোটি দেশের মধ্যে ভারত পেয়েছে তৃতীয় স্থানটি।

তাও দুর্ভাগ্যের জন্যেই। তা না হলে হয় প্রথম না হয় তো দ্বিতীয় স্থানটি ভারতের কাছে একরকম বাঁধাই ছিল। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়াকে দু-গোল দেওয়া সত্ত্বেও আর বিরতি পর্যন্ত দু-গোলে এগিয়ে থেকেও ভারত যে শেষ পর্যন্ত ৩—২ গোলে হেরে যাবে তা বোধ হয় ভারতও ভাবেন নি।

॥ হাবিব ॥

মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের তৃতীয় স্থান লাভের পেছনে ছিল হাবিবের প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্য।

কিন্তু হলোও শেষ পর্যন্ত তাই। অবশ্য তার আগে অর্থাৎ সেমি-ফাইন্যালেই ভারতের ওঠার সম্ভাবনা ছিল কম। কিন্তু ঠিক সময়ে তাইওয়ান আর মালয়েশিয়া হেরে যাওয়ায় ভারত বার্মার সংগে একযোগে এ গ্রুপ থেকে উঠলো সেমি-ফাইন্যালে। বি গ্রুপ থেকে সেমি-ফাইন্যালে উঠেছিল দক্ষিণ কোরিয়া আর হংকং।

প্রথম সেমি-ফাইন্যালে প্রথমটিতে বার্মা সহজেই হারিয়ে দিয়েছিল হংকংকে। আর দ্বিতীয়টিতে দক্ষিণ কোরিয়া হারতে হারতেও শেষ পর্যন্ত জিতে গেলো ভারতের বিরুদ্ধে খেলায়।

ফাইন্যালে দক্ষিণ কোরিয়া বার্মাকে হারিয়ে দিয়ে ১৯৫৭ সালের এই প্রতিযোগিতা শুরু হবার পর এইবারই সর্বপ্রথম এককভাবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার টুংকু আব্দুল রহমান ট্রফি লাভ করলো। এর আগে তারা অবশ্য তিনবার যুগ্মভাবে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভের জন্যে ভারত ও হংকং তারপর সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হয়। সেই খেলায় ভারত সহজেই হংকংকে হারিয়ে দিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

প্রতিযোগিতার প্রথম ৫টি দল—

দক্ষিণ কোরিয়া	—প্রথম
বার্মা	—দ্বিতীয়
ভারত	—তৃতীয়
হংকং	—চতুর্থ
মালয়েশিয়া	—পঞ্চম

॥ সোবার্স ॥

ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের নেতৃত্ব করবেন সোবার্স। সোবার্সের অধিনায়কত্বে সম্প্রতি বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ ইংলণ্ডকে ৪—১ টেস্টে হারিয়ে দিয়েছে।

গল্প হলেও সত্যি

খেলার রাজা ক্রিকেটের অনেক রকম মজার ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটি সত্যিই কিন্তু আশ্চর্যজনক।

এ সেই ১৮৯৩ সালের কথা। ইংলণ্ডের সেণ্টেনহ্যামে প্রথম শ্রেণীর একটি খেলা চলছিল সমারসেট ও গ্লাসেস্টারের মধ্যে। আর সেই খেলায় তখন ব্যাট করছিল সমারসেট। ওদিকে তখন বিপক্ষ দলের বোলার সি এল টাউনশেণ্ডের হাতে ছিল বল। টাউনশেণ্ডের হাত থেকে বলগুলো ছাড়া পাওয়ার আগেই যেন ওৎ পেতে বসেছিলেন উইকেটরক্ষক ডব্লিউ এইচ ব্রেন। হঠাৎ টাউনশেণ্ডের পর পর তিনটি বলেই বিপক্ষের তিনজন ব্যাটসম্যান যখন পরাস্ত হলেন তখন দেখা গেল ঐ তিনজনই আউট হয়েছেন ব্রেনের হাতে স্ট্যাম্পড হয়ে। আর তাই সেদিনের খেলায় সৃষ্টি হলো এক অভাবনীয় নজির! বোলারদের সংগেই হ্যাট্রিক করলেন উইকেটরক্ষক। হলো 'হ্যাট্রিক অব্ স্ট্যাম্পিংস'।

—[illegible]
[illegible] ২৩ [illegible]।

॥ কাউড্রে ॥

ইংলণ্ডের বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কলিন কাউড্রে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে যাচ্ছেন দলের সংগে। তাঁর ওপর দলের সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করছে।

কলকাতা ফুটবলে এখন ভাটার টান। একক লীগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বসবে সুপার লীগের আসর। আর তারপর শুরু হবে আই এফ এ শীল্ডের খেলা।

বিদেশী ইরানের প্যাস ক্লাব এ-বছর সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ডে খেলতে আসছে। এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি দল ও স্থানীয় দলগুলো আই এফ এ শীল্ডকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে।

শ্যামকুমার নন্দী (কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

প্রশ্ন: টেস্ট ক্রিকেটে যে ক'জন ব্যাটসম্যান ১,৫০০-এর ওপর রান করেছেন তাঁদের এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

নাম	টেঃ	ইঃ	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	সেঞ্চুরী	গড়
পলি উমরিগড়	৫৯	৯৪	৮	৩৬৩১	২২৩	১২	৪২'২২
মঞ্জরেকার	৫৫	৯২	১০	৩২০৯	১৮৯*	৭	৩৯'১৩
বোরদে	৫৪	৯৫	১১	৩০৪২	১৭৭*	৫	৩৬'২১
পঙ্কজ রায়	৪৩	৭৯	৪	২৪৪১	১৭৩	৫	৩২'৫৪
পাতৌদি (ছোট)	৩১	৫৬	২	২২০৩	২০৩*	৬	৪০'৭৯
বিজয় হাজারে	৩০	৫২	৬	২১৯২	১৬৪*	৭	৪৭'৬৫
ভিনু মানকাদ	৪৪	৭২	৫	২১০৯	২৩১	৫	৩১'৪৭
জয়সীমা	৩৫	৬৪	৪	২০১৭	১২৯	৩	৩৩'৬১
কন্ট্রাক্টর	৩১	৫২	১	১৬১১	১০৮	১	৩১'৫৯

*নট আউট (ভারত-অস্ট্রেলিয়ার এই মরশুমের খেলাগুলো ধরা হয় নি)

প্রদীপ বিশ্বাস (মোহরগঞ্জ টি এস্টেট, গুলেমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : হ্যাসেট, মিলার, পনসফোর্ড-এর ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেষ্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান	গড়
হ্যাসেট	৪৩	৬৯	৩	৩০৭৩	১৯৮*	১০	৪৬'৫৬
মিলার	৫৫	৮৭	৭	২৯৫৮	১৪৭	৭	৩৬'৯৭
পনসফোর্ড	২৯	৪৮	৪	২১২২	২৬৬	৭	৪৮'২২

বীরেন্দ্রনাথ পাল (বংশীহারী, পশ্চিম দিনাজপুর)

প্রশ্ন : পাশিং সম্পর্কে জানতে চাই!

উত্তর : কিসের পাশিং জানাবেন।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য (শঙ্কর বসু রোড, কলকাতা-২৭)

উত্তর : চুম্বক বিভাগের জন্যে আপনি আর একটা লেখা পাঠান।

মধুসূদন, রতন ও বাসুদেব (শ্রীকলোনী, কলকাতা-৪৭)

উত্তর : আপনারা যখন কলকাতাতেই থাকেন তখন যে-কোন দিন দুপুরে তিনটে নাগাদ অফিস থেকে শুক্রবারের মধ্যে আমাদের অফিসে এসে নিশ্চয়ই খুঁজতে পারবেন।

গল্প হলেও সত্যি, চুম্বক এবং 'আমার মতে' বিভাগে আপনারা নিশ্চয়ই লেখা পাঠাতে পারেন।

সুকেশ, সুকোমল ও কল্যাণ রায়চৌধুরী (বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর)

প্রশ্ন : জীবনের প্রথম টেস্টে নেমেই সেঞ্চুরী করেছেন, কিন্তু আর কোন সময় সেঞ্চুরী করতে পারেন নি—এমন কোন খেলোয়াড় আছেন কি?

উত্তর : বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, আমাদের ভারতের ক'জনই তো রয়েছেন। সব ক'জনই—লালা অমরনাথ, দীপক সোধন, আব্বাস আলী বেগ, কৃপাল সিং, হনুমন্ত সিং আর নতুন খেলোয়াড় বিশ্বনাথ। এ'রা কেউই দ্বিতীয়বার সেঞ্চুরী করতে পারেন নি।

সিদ্ধার্থ, সোমদত্তা ও শচীনকে (পুরুলিয়া)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমাদের বিশেষ ফুটবল সংখ্যায় পাবেন।

* শেষ টেস্টেও শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড হারলো। অভিনব এই রেকর্ডকারী টেস্ট মরশুমের ব্যাপার আগেই বিশ্বের অর্থাৎ একাদশ জয় করেছিল।

এই টেস্ট-ম্যাচ সম্বন্ধে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই খেলাগুলো ইংলণ্ড দলের আগামী অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রস্তুতিপর্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাই হোক, শেষ টেস্টে ইংলণ্ড খুঁজে পেয়েছে একজন সার্থক বোলারকে। লেভার তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টেই এক ইনিংসে ৭টি উইকেট দখল করে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। শেষ টেস্টে লেভারের উন্নত বোলিং আর বরকটের ব্যাটিং-এর জন্যেই ইংলণ্ড ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

এই মরশুমের সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স আর সেরা বোলার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার বারলো ১০০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। ফিল্ডিং-এ শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে ১০০০ টাকা করে পেয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লয়েড আর ইংলণ্ডের উইকেটরক্ষক এ্যালান নট। দ্বিতীয় সেরা ব্যাটসম্যান ও বোলার মনোনীত হয়েছেন দুই দেশের দুই অধিনায়ক—ইলিংওয়ার্থ আর সোবার্স।

* * *

হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের জীবন নিয়ে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন একটা তথ্যচিত্র শীঘ্রই তৈরি করবেন। ৬৫ বছরের ধ্যানচাঁদ এখন কটকে আছেন। তিনি ১৯৩২ সালে লস এঞ্জেল ও ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিক ভারতীয় হকি দলের প্রতিনিধি করেন। ভারত সেই দুবারই স্বর্ণ পদক লাভ করেছিল।

[৫৭৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

খেলায় অংশগ্রহণ করে সংগ্রহ করেছেন ৩,৯৯৯ রান। তাঁর সর্বোচ্চ রান সংখ্যা হলো ৩০৪। টেস্ট খেলায় তিনি ২৯ বার দেখেছেন শতরানের মুখ। টেস্ট ক্রিকেটে ইনিংস প্রতি তাঁর রান সংখ্যা হলো ৯৯.৯৪।

সম্পাদিকা—[illegible] সেন
[illegible] (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
[illegible] প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।